দশে দশ

দশে দশ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস সঙ্কলন

ISBN 978-93-83015-00-9

ভবিষ্যৎ-এর পক্ষে সরূপ দত্ত কর্তৃক
১এ কলেজ রো (তৃতীয় তল) কলকাতা
থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য : ৫৫০ টাকা

উৎসর্গ

উমা ও আশিস বসুকে

সূচিপত্র

একটি নারীর পুনর্জন্ম

এই স্টেশনে কখনও এত ভিড় থাকে না। ছোট, নিরিবিলি স্টেশন, কোনও রকম কলকারখানা কিংবা বাণিজ্যের কেন্দ্রও নয়। শীতকালে বাইরে থেকে কিছু মানুষ হাওয়া বদল করতে আসে, অনেক সপ্তাহ থেকে যায়, কিন্তু এখনও তো শীত পড়েনি, সে-রকম কোনও লম্বা ছুটিরও সময় নয়।

তবু ট্রেন আসার পর জানলা দিয়েই অতনু দেখতে পেল, প্ল্যাটফর্ম একেবারে লোকে লোকারণ্য। তারা কিন্তু হুড়োহুড়ি করে কামরায় উঠছে না, সবাই উৎসুক ভাবে ট্রেনের দিকে চেয়ে আছে। প্রতীক্ষা করছে কারওর জন্য।

ওপর থেকে ব্যাগটা নামিয়ে অতনু দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। রবি নিশ্চয়ই নিতে আসবে। সব কিছু ব্যবস্থা করে রাখার জন্যই তো আগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে রবিকে। ভিড়ের মধ্যে রবিকে খুঁজতে খুঁজতে সে রবিকে দেখতে পেল না। কিন্তু হঠাৎ যেন তার দিব্যদর্শন হল।

দরজার কাছে না দাঁড়িয়ে অতনু যদি নেমে পড়ত প্ল্যাটফর্মে, তাহলে তার এ দৃশ্য দেখার সুযোগ হত না। ওপর থেকে এক সঙ্গে অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যায়।

খুব দূরে নয়, আর দু-তিনটে কামরার পরে দরজার কাছে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চোদ্দো-পনেরো জন নানা বয়েসের নারী। তারা লাল পাড় সাদা শাড়ি পরা, মৃদু স্বরে কিছু একটা গান গাইছে, তাল দিচ্ছে হাতচাপুড়ি দিয়ে, কারওর কারওর শরীরও দুলছে নাচের ভঙ্গিতে। মনে হয় এরা কোনও আশ্রম-টাশ্রম থেকে এসেছে। এদের মধ্যে এক জনের দিকে অতনুর দৃষ্টি আটকে গেল। ধক করে উঠল বুক। মানুষ এত সুন্দর হয়? মফস্সল শহরের আশ্রমে এ যেন এক স্বর্গচ্যুত দেবদূতী। শ্বেত ও রক্তচন্দন মেলানো গায়ের রঙ, টানা টানা চোখ, গভীর ভুরু, আবেশমাখা মুখ, পাতলা ঠোঁটের গড়ন দেখলেই বোঝা যায়, বেশ শিক্ষা-দীক্ষা আছে। মানুষের শিক্ষার ছাপ বেশি করে পড়ে ঠোঁটে। নামতে ভুলে গেল অতনু, তাকিয়েই রইল।

পর পর দু'টি চিন্তা এল তার মনে।

এমন একটি রূপসী তরুণী আশ্রমে যোগ দিয়েছে কেন?

তার পরই সে ভাবল, এ মেয়ের সঙ্গে কি পরিচয় করা সম্ভব? অন্তত একবার কথা বলতে না পারলে তার জীবনটাই যেন ব্যর্থ হয়ে যাবে।

এই সময় আরও অনেকে মিলে যেন একটা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল।

ভিড় ঠেলেঠুলে রবি কাছে এসে বলল, কী রে, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ব্যাগটা দে।

ঘোর ভেঙে গেল অতনুর। প্ল্যাটফর্মে নেমেই সে একটা সিগারেট ধরাল। আজকাল ট্রেনেও ধূমপান নিষেধ, গলা শুকিয়ে এসেছিল।

এত ভিড় কেন রে রবি?

রবি বলল, সিগারেটের প্যাকেটটা পকেটে ভরলি কেন? দে...। কী যেন একটা আশ্রম হয়েছে এখানে। এই ট্রেনে তাদের গুরু আসবে। সব সাইকেলরিকশা, টাঙ্গা বুক্ড। তোকে কিন্তু হেঁটে যেতে হবে। অবশ্য মালপত্তর তো বেশি নেই।

অতনু দাঁড়িয়েই রইল। এখান থেকে তরুণীটিকে ভাল দেখা যাচ্ছে না, লোকের আড়াল পড়ে গেছে, তবু তার দৃষ্টি উৎসুক।

এবারে একটা কামরা থেকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে যাঁকে নামানো হল, সবাই আবার জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল, তিনি পুরুষ নন, এক জন প্রৌঢ়া মহিলা। গুরু নন, গুরুমা।

আজকাল মাঝে মাঝেই এ-রকম গুরুমাদের কথা শোনা যায়। এটা নারীশক্তির এক প্রকার জয় বলতে হবে। পুরুষদের বদলে মহিলারা বসছে গুরুর আসনে।

অতনু বলল, রবি, ওই গুরুমার ডান পাশের মেয়েটিকে দেখ। মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা।

আগেই দেখেছি। কী সাঙ্ঘাতিক রূপ রে। আগুন। কাছে গেলেই যেন হাত পুড়ে যাবে।

ওদের আশ্রমটা কোথায় রে? দেখতে যাওয়া যায় না?

অমনি বুঝি মনে কু-চিন্তা জেগেছে? সাবধান বন্ধু। ওই আশ্রম খুব বড়লোকদের ব্যাপার।

তা বলে দেখতে যাওয়া যায় না বুঝি? আমি ওই গুরুমা সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড, কথা বলে দেখতে চাই, কী-ভাবে এক জন মহিলা এতগুলো লোকের মাথা নুইয়ে দিতে পারেন। নিশ্চয়ই কিছু ম্যাজিক আছে। হিপনোটিজম?

মাস হিপনোটিজম বলে কিছু হয় না। ওটা গাঁজাখুরি ব্যাপার। ম্যাজিশিয়ান পি সি সরকার সম্পর্কে একটা গল্প আছে। এক দিন তার ম্যাজিক শো শুরু হবার কথা ছ'টায়, হল ভরতি, হাউজফুল, উনি এসে পৌঁছোননি। যখন পৌঁছলেন, তখন সাড়ে ছ'টা। স্টেজে এসেই উনি বললেন, আমি কি দেরি করে ফেলেছি? আমার ঘড়িতে তো দেখছি ছ'টা বাজতে তিন মিনিট বাকি। আপনাদের ঘড়িতে ক'টা বাজে দেখুন তো। সব দর্শক দেখল, তাদের ঘড়িতেও ছটা বাজতে তিন মিনিট বাকি। শুনেছিস গল্পটা? ওই ব্যাপারটা কিন্তু কোনও দিনই ঘটেনি। পি সি সরকারের পাবলিসিটি ম্যানেজার ওই গল্পটা রটিয়েছিল। অনেক লোক বিশ্বাসও করে। পৃথিবীর কোনও ম্যাজিশিয়ানেরই সাধ্য নেই, এক সঙ্গে বহু লোককে হিপনোটাইজ করার।

অতনু ভুরু কুঁচকে বলল, তাহলে এই সব গুরু এত লোককে বশীভূত করে কী করে?

রবি হেসে বলল, মার্কস না লেনিন কে যেন বলেছিলেন, ধর্ম হচ্ছে জনগণের আফিম। এই লোকেরা নিশ্চয়ই আফিম গোলা জল খায়।

ওই মেয়েটির কত বয়েস হবে? বড় জোর তিরিশ। অমন রূপ, ও কেন লাল পাড় শাড়ি পরে আশ্রম-বালিকা হবে? ও তো অনায়াসে সিনেমা স্টার হতে পারত, অথবা, মানে, অনেক কিছু। ওর পক্ষে ধর্মকে আঁকড়ে ধরা কি স্বাভাবিক?

গুরুমাকে নিয়ে সবাই বেরিয়ে গেছে। এখন প্ল্যাটফর্ম খালি। ওরা বাইরে এসে দাঁড়াল, সত্যিই একটাও রিকশা বা টাঙ্গা বা গাড়ি-টাড়ি কিছু নেই। রবি অতনুর ব্যাগটা নিয়েছে, ব্যাগটা বেশ ভারি, ভেতরে কয়েকটি বোতল আছে।

অতনু বলল, ব্যাগটা আমাকে দে।

রবির একটা পা বেশ খোঁড়া। ক্রাচ নিয়ে হাঁটতে হয়, তবে সে দু'টোর বদলে একটা ক্রাচ নেয়। সে ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে ফেলেছে, দিল না।

এখন পরিপক্ক বিকেল, সন্ধে হতে কিছুটা দেরি আছে। এই সময়কার আলো বেশ নরম। স্টেশনের পেছনেই পটভূমিকায় একটা পাহাড়। এ-দিককার সব পাহাড়ের ওপরেই একটা করে মন্দির।

অতনু এই দ্বিতীয় বার এল মহুলডেরায়। একটা প্রধান পিচের রাস্তা ছাড়া আর সব রাস্তার রঙ লাল। কোনও বাড়িই ঘেঁষাঘেঁষি নয়, কোথাও এমনই ফাঁকা জমি পড়ে আছে। কোথাও এক সঙ্গে বেশ কয়েকটা লম্বা শালগাছ। শহর থেকে এসে এ-সব রাস্তায় হাঁটলে চোখের আরাম হয়।

অতনু জিজ্ঞেস করল, গেস্টহাউসটা ক'দিনের জন্য বুক করেছিস?

রবি বলল, গেস্টহাউস নয়, ওসমান সাহেব নিজের বাড়িতে ব্যবস্থা করেছেন। এক রকম জোর করেই।

অতনু ভুরু কুঁচকে বসল, বাড়ির মধ্যে? কোনও অচেনা পরিবারে আমি থাকা পছন্দ করি না।

বাড়ির কম্পাউন্ডের মধ্যে, কিন্তু ফ্যামিলির সঙ্গে নয়। কম্পাউন্ডের মধ্যে কয়েকটা আলাদা কটেজ আছে। সব ব্যবস্থা আলাদা।

ওখানে ড্রিঙ্ক করা যায়? অনেক সময় বাড়ির লোক পছন্দ করে না।

ওসমান সাহেব নিজেই রোজ ড্রিঙ্ক করেন। কাল তো উনিই আমাকে খাওয়ালেন।

আর রান্না-বান্না?

এক জন লোক আছে। আমার জন্য অবশ্য কাল রাতে বাড়ির ভেতর থেকেই বিরিয়ানি এসেছিল। তোকে বলছি অতনু, এত চমৎকার স্বাদের বিরিয়ানি আমি জীবনে খাইনি।

তুই তো খেয়ে নিয়েছিস। রোজ নিশ্চয়ই বিরিয়ানি রান্না হবে না। আমার ভাগ্যে জুটবে না।

বলে দেখতে পারি।

না, কিছু বলাবলির দরকার নেই। আমাদের বাড়িটার কী অবস্থা?

এখনও রিপেয়ারিঙের কাজ চলছে। থাকার মতো হয়নি। আমি অবশ্য বলেছি, একটা ঘর আর বাথরুম অন্তত আগে তৈরি করে দিতে হবে। আমরা এক রাত্রি ওখানে থাকব। একটা কি ব্যাপার জানিস, স্থানীয় লোকজনদের ধারণা, ওটা নাকি ভূতের বাড়ি। মিস্ত্রিরাও কী-সব শব্দ-টব্দ শোনে, ভয় পায়। সন্ধের পর কেউ থাকতে চায় না।

অতনু হেসে বলল, এ-রকম গুজব থাকা ভাল। বাইরের লোক কাছে ঘেঁষবে না। ওই জন্যই বাড়িটা কিছুটা সস্তায় পেয়েছি।

মিনিট দশেক হাঁটার পর একটা জিপ গাড়ি উলটো দিক থেকে এসে ওদের কাছে ব্রেক কষে দাঁড়াল।

ড্রাইভারের আসন থেকে মুখ বাড়ালেন এক জন হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তি, দাড়ি নেই, শুধু গোঁফ আছে, জুলপি দুটোও নিচে নেমে এসেছে অনেকখানি, গোঁফের প্রান্ত ছুঁয়েছে।

তিনি বললেন, আরে ছি ছি, আপনাদের হেঁটে আসতে হল। আমাকে বললেই আমি গাড়ি নিয়ে স্টেশনে যেতাম।

অতনু বলল, হাঁটতে ভালই লাগছে। কলকাতায় তো বিশেষ হাঁটা হয় না। কেমন আছেন ওসমান সাহেব? খবর সব ভাল তো?

ওসমান বললেন, জি, সব ভাল, উঠুন, গাড়িতে উঠে পড়ুন। রবিবাবুর হাঁটতে কষ্ট হয়।

রবি বলল, তা একটু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু একেবারে না হাঁটলে যে অথর্ব হয়ে যাব। তাই অভ্যেস রাখতে হয়।

জিপে ওঠার পর ওসমান জিজ্ঞেস করলেন, ট্রেন ঠিক সময়ে এসেছে?

অতনু বলল, দশ মিনিট লেট, এমন কিছু না।

ওসমান বললেন, দশ মিনিট আমরা ধরিই না। গত কাল ছিল আড়াই ঘণ্টা লেট।

এই সব ছোট জায়গায় কুশল সংবাদের চেয়েও জরুরি ট্রেন বিষয়ে আলোচনা। ট্রেন-নির্ভর জীবন। ট্রেনে খবরের কাগজ আসে, বাইরের মানুষ আসে।

অতনু জিজ্ঞেস করল, আজকের ট্রেনে কে এক জন গুরুমা এলেন। আমি আগে যেবার এসেছিলাম, আমি তো এখানে কোনও আশ্রমের কথা শুনিনি।

ওসমান বললেন, আগে ছিল একটা ছোটখাটো। ছ'মাস আগে সেটাকে খুব বড় করা হয়েছে। কী একটা বেদান্ত সংঘ, একটা চেইনের মতো, আরও অনেক জায়গায় লোক আছে। অনেক টাকাওয়ালা লোক আছে এর মধ্যে মনে হয়। বিউটিফুল বাড়িটা বানিয়েছে। দেখবার মতো।

অতনু বলল, একবার দেখতে যেতে হবে।

রবি আপন মনে অনুচ্চ গলায় হেসে উঠল।

ওসমান বললেন, অবশ্যই যাবেন। আমিও দেখে এসেছি। তবে একটা ব্যাপার ঠিক বুঝলাম না। বেদ তো আপনাদের ধর্মগ্রন্থ। কিন্তু বেদান্ত কী?

অতনু বলল, সেটা আমিও জানি না ঠিক, তবে রবি নিশ্চয়ই জানে, ও অনেক পড়াশুনো করে। কিন্তু ওকে জিজ্ঞেস করলেই ও একটা লম্বা লেকচার দেবে। আপনি বরং পরে শুনে নেবেন।

রবি বলল, না আমি লেকচার দেব না। শুধু এই কথাটা বলতে পারি, মিস্টার অতনু মজুমদার এর আগে কখনও মন্দির কিংবা আশ্রম দেখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেনি। এমনিতে উনি ঘোর নাস্তিক।

অতনু বলল, নাস্তিক হলেও মন্দির-টন্দিরের যদি সুন্দর স্ট্রাকচার হয়, ঐতিহাসিক মূল্য থাকে, তাহলে আগ্রহ থাকবে না কেন? কোনারক মন্দিরে গেছি, দিল্লির জামে মসজিদে, সে বিশাল ব্যাপার, দশ হাজার লোক এক সঙ্গে নামাজ পড়তে পারে, সেটা একটা দেখার মতো ব্যাপার নয়? আর একবার মনে পড়ে, টুয়েন্টিফোর্থ ডিসেম্বর রাত বারোটার সময় সেন্ট পল্‌স ক্যাথিড্রালে গিয়েছিলাম। অর্গান বাজিয়ে কী অপূর্ব গান হচ্ছিল, এ-সব আমার ভাল লাগে।

ওসমান বললেন, ওই আশ্রমেও প্রত্যেক সন্ধেবেলা গান হয়। আর একটা ভাল ব্যাপার কি জানেন, এখানে তো হাসপাতাল ছিল না, চিকিৎসার জন্য যেতে হত আসানসোলে, এই আশ্রমের সঙ্গে একটা হাসপাতাল হয়েছে, ছোট হলেও খুব মডার্ন, হিন্দু-মুসলমান কোনো বাছবিচার করে না। আমার ছেলের কিডনিতে স্টোন হয়েছিল, ওনারাই তো সারিয়ে দিলেন, অপারেশনও করতে হল না।

ওসমান সাহেব, রবির কাছে শুনলাম, আপনার বাড়িতেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন। সে-জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমাদের কেনা বাড়িতেও আমরা দু-এক রাত কাটিয়ে যেতে চাই। সে-রকম তৈরি করা যাবে তো?

আর দু'দিনের মধ্যেই হয়ে যাবে। পাম্পে পানি উঠেছে। আলো এসে গেছে। শুধু বাথরুমের কাজ কিছুটা বাকি আছে।

আলো এসে গেছে মানে? আগে তো ইলেকট্রিসিটি ছিল না।

এই তো ছ'মাস আগে কানেকশন পেয়েছি, সে-ও ওই বেদান্ত আশ্রমের জন্য। অনেক মন্ত্রী-টন্ত্রি আসে, আগে কত দরবার করেও আমরা বিদ্যুৎ পাইনি। আশ্রমের জন্য সাধারণ মানুষেরও অনেক উপকার হয়েছে, থানাটাকেও বড় করা হয়েছে। এ-দিকে মাওবাদীদের উপদ্রব শুরু হয়েছে জানেন তো, জঙ্গলের মধ্যে তাদের ডেরা, প্রায়ই খুন-টুন হয়। অবশ্য এই দিকে তারা এখনও আসেনি, গ্রামে গ্রামেই ওরা প্রচার করে।

ওদের তো ঝগড়া রাজনৈতিক দলের সঙ্গে। আপনি কোনো রাজনৈতিক দলে আছেন নাকি?

আমি ব্যবসা করে খাই। কোনও দলেই নেই, আবার সব পলিটিশিয়ান পার্টির সঙ্গেই ভাল সম্পর্ক রাখতে হয়। সব দলকেই চাঁদা দিই। এমনকী ওই মাওবাদীদেরও চাঁদা দিয়েছি।

কত চাঁদা দিয়েছেন!

চেয়েছিল কুড়ি হাজার। রফা করেছি দু'হাজারে। দেখুন, ওই মাওবাদীদের একটা অনেস্টি আছে। চাঁদার রসিদ দেয়। আর একবার রফা হয়ে গেলে পরে আর হাঙ্গামা করে না। বলেই দিয়েছে আর এক বছরের মধ্যে কিছু চাইবে না।

আপনি ক্যাশ টাকা চেয়েছিলেন। আমি বাকি টাকা এবার সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আপনার বাড়ি পৌঁছেই সব টাকা আপনার কাছে জমা করে দেব। আমার কাছে এত টাকা রাখতে চাই না।

ঠিক আছে, ঠিক আছে, রেজিস্ট্রেশনের সব কাগজপত্রও তৈরি। এই শীতকাল থেকেই আপনারা লোক পাঠাতে পারবেন। এক জন কেয়ারটেকার রাখতে হবে। সেজন্য একজন লোকও দেখে রেখেছি।

রবি বলল, আমাকে কেয়ারটেকার রাখলে কেমন হয়? আমি এখানেই থেকে যাব ভাবছি।

অতনু বলল, তুই একে খোঁড়া, তার ওপর ইনটেলেকচুয়াল, তুই কেয়ারটেকার হবার একেবারেই অনুপযুক্ত।

খোঁড়াকে খোঁড়া বলতে নেই, তা জানিস না?

নিজের বন্ধুকে সব কিছু বলা যায় রে শালা!

ওসমান সাহেবের বাড়ির গেটের দু'দিকে দুটো বাতি জ্বলছে। বাড়ির সব ক'টা ঘরে আলো জ্বলা। নতুন ইলেকট্রিসিটি এসেছে বলেই যেন এই আলোর উৎসব।

দুই

রাত্তিরটা আড্ডা ও পানাহারে বেশ ভালই কাটল।

বাইরে এলে সবাই সাধারণত কিছুটা দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে। স্বাস্থ্য-বায়ুগ্রস্তরা ভোরে উঠে হাঁটতে বেরোয় কিংবা জগিং করে, অতনুর ও-সব বাতিক নেই।

তবু তার ঘুম ভেঙে গেল বেশ সকালেই। কিছুক্ষণ বিছানায় গড়িমসি করে সে উঠেই বসল। আর ঘুমের আশা নেই।

পাশের খাটে অঘোরে ঘুমোচ্ছে রবি। গা থেকে চাদরটা সরে গেছে, পাজামা পরা, খালি গা। অতনু লক্ষ্য করল, বেশ রোগা হয়ে গেছে তার বন্ধুটা। গাড়ির অ্যাকসিডেন্টে একটা পায়ের পাতা ছেঁচে যাবার পর থেকেই রবির চেহারা ও স্বভাবে অনেক পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। কিন্তু পা খোঁড়া হবার সঙ্গে রোগা হওয়ার সম্পর্ক কী? আগে রবির প্রায় কথাতেই নানা রকম রসিকতা থাকত, এখন এসেছে সূক্ষ্ম বিদ্রূপের ভাব। সব কিছুই সে বাঁকা চোখে দেখে। আগে তার অনেক মেয়ে বন্ধু-টন্ধু ছিল, এক জনের সঙ্গে তো বিয়ে প্রায় ঠিকঠাক, অ্যাকসিডেন্ট হবার পর সে নিজেই সেই মেয়েটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিল, আর কোনও মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও করে না।

রবিকে একটা ধাক্কা দিয়ে অতনু বলল, এই, আর কতক্ষণ ঘুমোবি? আমরা বেড়াতে বেরোব।

রবি উঠে বসে চোখ কচলাল। তারপর বলল, বেড়াতে? অর্থাৎ প্রথমেই সেই বেদান্ত সংঘের আশ্রমে। তাই না?

অতনু বলল, তার কোনও মানে নেই। এ-দিক ও-দিক ঘুরে ভাল করে দেখতে হবে না জায়গাটা? আমাদের গেস্টহাউসটার জন্য একটা পাবলিসিটি ফোল্ডার বানাতে হবে!

রবি জিজ্ঞেস করল, তোর সঙ্গে মেয়েটার একবারও চোখাচোখি হয়েছিল?

কোন মেয়েটা?

যার কথা বলছি, তুই ঠিকই বুঝেছিস। ওই যে কালকের দেখা, মাথায় চুল চুড়ো করে বাঁধা, রূপের ছটায় ধাঁধানো মেয়েটা।

না, চোখাচোখি হয়নি। আমাকে সে দেখতেও পায়নি।

তবু তুই মদনবাণে বিদ্ধ হয়ে গেছিস, বোঝাই যাচ্ছে। রাত্তিরে ওকে স্বপ্ন দেখেছিলি?

যাঃ, কাল অত নেশা করা হয়েছে, তারপরে আর স্বপ্ন দেখা যায়?

খানিক বাদে ওরা দু'জন তৈরি-টৈরি হয়ে বেরোবার উপক্রম করছে, ওসমান সাহেব এসে বললেন, এ কী, এত সকাল সকাল কোথায় চললেন? নাস্তা তৈরি হচ্ছে, খেয়ে যাবেন তো?

অতনু বলল, এই সব জায়গায় এলে রাস্তার ধারের দোকানে কচুরি আর জিলিপি কিনে তেলেভাজা চপটপ খেতে আমার ভাল লাগে। বাড়ির নাস্তা তো রোজই খাই।

রবি জিজ্ঞেস করল, আপনার বাড়ির নাস্তায় নিশ্চয়ই কিছু মাংস থাকে?

ওসমান বললেন, হিন্দু বাড়িতে কিন্তু সকালে মাংস খাওয়া হয় না। বড় জোর ডিম। তা-ও কোলেস্টেরলের ভয়ে অনেকে ডিমও বাদ দেয়।

অতনু বলল, হিন্দুরা তো ভাল করে মাংস রান্না করতেই জানে না। মুসলমানরা আবার মাছটা তেমন ভাল পারে না। হিন্দুরা জানে না মাংসে ঠিক কী-ভাবে মশলা মেশাতে হয়, আর মুসলমানরা জানে না মাছ ভাজার আর্ট।

ওসমান সাহেব বললেন, দুপুরে তাড়াতাড়ি ফিরুন, আজ চিতল মাছের পেটি খাওয়াব। দেখবেন, আমার স্ত্রী কেমন মাছ রান্না করেন। কচুরি-জিলিপি যদি খেতে চান, তাহলে ইস্কুল-মোড়ে চলে যান, ওখানে একটা দোকানে ও-সব ভাল পাওয়া যায়।

রাস্তায় এসে ওরা একটা সাইকেলরিকশা থামাল।

উঠে বসার পর অতনু কিছু বলার আগেই রবি বলল, বেদান্ত আশ্রমে আমাদের নিয়ে চলো তো ভাই, যেটা নতুন হয়েছে।

অতনু বলল, আগে জিলিপি-টিলিপি খাব না?

খাওয়ার চিন্তা আর কামের চিন্তা, এর মধ্যে কোনটা বেশি জোরালো?

যাঃ, তুই কী-সব কাম-টামের কথা বলছিস? আমি মোটেই সে-রকম কিছু ভাবিনি। মেয়েটিকে আর একবার দেখার ইচ্ছে হয়েছে ঠিকই।

দেখার ইচ্ছেটাও এক ধরনের কাম তো বটেই। হিন্দিতে সব কাজকেই বলে কাম। বাঙালরাও বলে। ঠিকই বলে। সব কাজের মূলেই তো কাম। দেরি করে গেলে আশ্রমে ভিড় হয়ে যাবে। সকাল সকাল যাওয়াই ভাল। খাওয়া-টাওয়া পরে হবে।

একটুখানি যাবার পর অতনু বলল, কাল রাত্তিরে ওসমান সাহেব কত কী ব্যবস্থা করেছিলেন। তিন-চার রকমের কাবাব, আমি বোতল এনেছি, তবু নিজের ড্রিঙ্কস খাওয়ালেন জোর করে। বাড়িটা কেনার সময় কী দরাদরিই না করতে হয়েছে। এখন আমাদের জন্য দু'হাতে পয়সা খরচ করছেন। নিজের গাড়িতে জঙ্গলে বেড়াতে নিয়ে যাবেন বললেন।

ব্যবসা আর আতিথেয়তা, দুটো আলাদা ব্যাপার। আতিথেয়তায় এঁরা সব সময় ওয়ান আপ।

আমরা বাড়িটা শেষ পর্যন্ত যে-দামে পেয়েছি, তা সস্তাই বলতে হবে। তুই অন্য দু'একটা বাড়ি দরদাম করে দেখেছিস এর মধ্যে?

হ্যাঁ। এটা ডেফিনেটলি সস্তা। তার একটা কারণ ভূতের বাড়ির বদনাম। এক বছর ও-বাড়ি ভাড়াই হয়নি। দ্বিতীয় কারণ, উনি একটা ফলের বাগান কিনবেন, তার জন্য ক্যাশ দরকার। এখন ফলচাষ খুব লাভজনক। আসানসোলে একটা ফুড প্রসেসিং সেন্টার হচ্ছে।

আমরা ভূতের বাড়ির গুজবটা চেপে না গিয়ে বরং পাবলিসিটি দেব। কলকাতার অনেকে ভূত দেখার জন্যই আসবে। এমনকী দু'একটা গ্যাজেট লাগিয়ে অলৌকিক শব্দ-টব্দের ব্যবস্থা করলে মন্দ হয় না।

এখানে বাড়ি কিনে গেস্টহাউস বানাবার আইডিয়াটা তোর না চন্দনার?

চন্দনারই বলতে পারিস। গত বছর বেড়াতে এসেছিলাম, কেউ এক জন সাজেস্ট করেছিল, জায়গাটা চন্দনার খুব পছন্দ হয়ে গেল। চন্দনাই প্রথম বলল, এখানে একটা বাড়ি করলে হয় না? আমরা মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকব। তখন আমি বললাম, নিজেদের জন্য বাড়ি কেনার কোনও মানে হয় না। কত দিনই-বা থাকব। তার চেয়ে কোম্পানির জন্য একটা গেস্টহাউস বানানোই ভাল। ভাড়া দিয়ে ক্যাপিটালটা উঠে আসবে, ইচ্ছে করলে, আমরাও এখানে এসে থাকবে পারব।

ভাগ্যিস এবার চন্দনা তোর সঙ্গে আসেনি।

ভাগ্যিস কেন? এলে কী হত?

তাহলে চন্দনার ভয়ে এই অপরূপা সুন্দরীকে তোর দেখতে যাওয়া হত না।

যাঃ! শুধু দেখায় কী দোষ? মুখে কিছু বলতাম না। চন্দনা নিজেই গরজ করে আশ্রমে যেতে চাইত। ও পুজো-টুজো দিতে ভালবাসে। আমার মতো নয়।

বেদান্ত আশ্রমটি মহুলডেরার একেবারে অন্য প্রান্তে। ফাঁকা জায়গা, আশ্রমভবন ছাড়া কাছাকাছি অন্য পাকাবাড়ি নেই। এক পাশে এত গাছপালা যে মনে হয় জঙ্গলের মতো।

আগেকার দিনে ধর্মস্থানগুলি থাকত অবারিত দ্বার। এখন দিনকাল বদলেছে। চোর-ডাকাতরা ধর্ম মানে না, তাদের পাপের ভয়ও নেই। মন্দিরের মূর্তির গলায় সোনার হার চুরি যায়। এমনকী দামি ধাতুর মূর্তি হলে পুরো মূর্তিটি কেউ চুরি করে পালিয়ে যায়, কিন্তু কোনও দিন শোনা যায়নি সেই চোর দেবতার অভিশাপে ভস্ম হয়ে গেছে। চোরেরাও সেটা জানে। পুলিশ ধরতে না পারলে তারা দিব্যি ঘুরে বেড়ায়। সব দেশই ধরা-না-পড়া চোরে ভর্তি।

এখন আশ্রমের সামনে লোহার গেট, দু'পাশে দু'জন পাহারাদার। দিনেরবেলা গেট অবশ্য খোলা থাকে।

রবি ঠিকই বলেছে, এখনও এখানে তেমন ভিড় জমেনি। গেট থেকে সোজা এ-দিকে গেলে শ্বেতপাথরের মন্দির। কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হয়। সব কিছু বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

মন্দিরের একেবারে ভেতরের দিকে কীসের একটা মূর্তি রয়েছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। বাইরের লোক মূর্তির খুব কাছে যেতে পারে না, একটা কাঠের জালির বেড়া রয়েছে। মাঝখানের অনেকটা অংশ ফাঁকা, বোধহয় পুজো-টুজোর সময় ওইখানে আশ্রমবাসীরাই বসে।

সামনের অংশে চার-পাঁচ জন লোক বসে আছে হাত জোড় করে। অতনু আর রবি তাদের পাশে গিয়ে বসল, হাত জোড় করল না। ভেতরে মূর্তিটার কাছে ওদের দিকে পেছন ফিরে বসে আছে তিনটি রমণী, সেই অবস্থাতেই বোঝা যায় তাদের মধ্যে এক জন কালকের সেই অতুলনীয়া।

পুজো শুরু হতে দেরি হচ্ছে, ওই তিন রমণী মূর্তিটিকে ফুল-টুল দিয়ে সাজাল।

অতনু ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল, বেদান্ত ব্যাপারটা কী, খুব সংক্ষেপে আমাকে বুঝিয়ে দে তো!

রবি বলল, তুই বেদ পড়েছিস কখনও?

অতনু বলল, ওরে বাবা, সে তো খুব শক্ত বই। সংস্কৃত পড়তে গেলে দাঁত ভেঙে যায়। না, আমি কখনও চেষ্টা করিনি পড়ার।

রবি বলল, বাংলা অনুবাদেও পাওয়া যায়। যাই হোক, বেদের অন্ত, মানে শেষ দিকের অংশটাকে বলে জ্ঞানকাণ্ড। তাতে একটা দর্শনের কথা আছে। মূল কথাটা হচ্ছে জীবাত্মা আর পরমাত্মার মিলেমিশে এক হয়ে যাওয়া।

অতনু বলল, ও-সব আমার মাথায় ঢুকবে না। পরমাত্মা মানে কি পরম ব্রহ্ম? তার কোনও মূর্তি থাকে?

রবি বলল, না। হিন্দুদের পরমব্রহ্মও নিরাকার ঈশ্বর। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা বুঝবে না কিংবা কল্পনায় ঠিক করতে পারবে না বলে একটা না-একটা দেবদেবীর পুজো হয়। এই সব দেব-দেবীই পরমব্রহ্মের অংশ। এখানে মনে হচ্ছে একটা কৃষ্ণের মূর্তি রয়েছে। কৃষ্ণ তো আসলে একটা মিথ।

অতনু একটু অস্থির ভাবে বলল, মেয়েগুলো একবারও এ-দিকে ফিরছে না কেন?

রবি বলল, ধৈর্য ধরো বৎস। একটু কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।

অন্য ভক্তরা ওদের দিকে আড়চোখে চাকাচ্ছে। তারা সবাই বুড়ো বুড়ি। এরা দু'জন যুবক, দেখলেই বোঝা যায় স্থানীয় নয়, এ-রকম কেউ সচরাচর এত সকালে আসে না। তাছাড়া এই ভাবগম্ভীর পরিবেশে সবাই চুপ করে থাকে, এরা দু'জন ফিসফিসিয়ে কথা বলছে।

একটু পরে সেই তিন রমণী উঠে গিয়ে মূর্তিটার পেছন দিকে দাঁড়াল। সেখানেও কী-সব সাজাচ্ছে।

এবার দেখা যাচ্ছে তাদের মুখ ও সম্মুখ শরীর। আজও লাল পাড় সাদা শাড়ি পরা। আঁচল কাঁধে জড়ানো। অন্য মেয়ে দু'টির সাধারণ চেহারা, মাঝখানের মেয়েটি সত্যিই অসাধারণ রূপসী। রঙ ও শরীরের গঠনে তো বটেই, মুখশ্রীতে রয়েছে এমন একটা গভীর নিবিষ্টতার ভাব, যা খুবই দুর্লভ।

অতনু দারুণ তৃষ্ণার্তের মতো চেয়ে রইল তার দিকে।

সেই তিন রমণী বাইরের লোকেদের দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করল না। একটু পরেই চলে গেল ভেতরের দিকে।

ওরা দু'জন আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রইল। এক জন পুরুত টাইপের লোক এসে ঘণ্টা বাজানো শুরু করল, মেয়ে তিনটি আর ফিরল না।

অতনু রবিকে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বাইরে এসে রবি বলল, কী রে, সাধ মিটেছে?

অতনু বলল, সাধ কি আর মেটে? আরও তৃষ্ণা বেড়ে যায়। একবার অন্তত কথা বলারও চান্স পাওয়া যাবে না? ওর গলার আওয়াজটা শুনতাম।

নিশ্চয়ই বাইরের লোকদের সঙ্গে এদের কথা বলা নিষেধ।

এরা কনভেন্টের নানদের মতো? একা একা দোকান-বাজারও করতে যায় না?

মোস্ট প্রোবেব্‌লি, নো।

কী দারুণ সেক্সি চেহারা! এ-রকম আগে আর দেখিনি।

সেক্সি! তা হবে! তোর মতো যার মাথায় সব সময় সেক্স ঘোরে, তার ও-রকম মনে হবেই।

শালা, তোর মাথায় সেক্স নেই? এ-রকম একটি রমণীরত্ন সংসারধর্ম পালন না করে কেন এ-রকম একটা আশ্রমে ঢুকে বসে আছে, তা তোর জানতে ইচ্ছে করে না?

যে-কোনও মানুষের জীবনেই একটা করে গল্প থাকে। একটি সুন্দরী মেয়ের জীবনের গল্প বেশি আকর্ষণীয় হবেই। তবে, সন্ন্যাসিনীরা আগেকার জীবনের কথা কিছুই বলে না।

ইস, যদি মেয়েটার নামটাও জানতে পারতাম।

এবারে রবি রহস্যময় ভাবে হেসে বললেন, ওর নাম আমি জানি।

অতনু সিঁড়িতে থেমে গিয়ে বলল, তুই ওর নাম জানিস? সত্যি?

রবি বলল, হ্যাঁ জানি। ওর নাম শকুন্তলা। আর দু'পাশের দু'টি মেয়ের নাম অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা।

তুই বানাচ্ছিস।

আর তুই হচ্ছিস রাজা দুষ্মন্ত। আমি কে জানিস? দুষ্মন্তের এক জন বিদূষক ছিল, আমি হচ্ছি সে। আমি তোকে ভাল ভাল পরামর্শ দিতে পারি, কিন্তু তা শুনবি না।

কী পরামর্শ দিবি, শুনি।

সখা, আগেকার দিনের রাজাদের পাঁচটা-দশটা বউ থাকত, তা ছাড়াও রাজারা যে-কোনও মেয়েকে ইচ্ছে করলেই ভোগ করতে পারত। সেই সব রাজা-টাজার দিন শেষ। এখন কোনও বিবাহিত লোক অন্য মেয়ের সঙ্গে অ্যাফেয়ার করতে গেলে তাকে বলে ব্যভিচার। ধরা না পড়লে ঠিক আছে, সুতরাং,

ও-মেয়েটির দিক থেকে মন ফেরাও। মন থেকে মুছে ফেলো। নতুন ব্যবসা বাড়াচ্ছ, তাই নিয়ে থাকো।

ধ্যাত। ব্যভিচার-ট্যাভিচারের কথা আসছে কেন? এমনিই কারওকে ভাল লাগলে আলাপ করা যায় না? দেখিস, ওর সঙ্গে এক দিন আমি আলাপ করবই করব।

তিন

ওসমান সাহেবের খাতির-যত্নের চোটে কয়েক দিনের মধ্যেই ওদের ওজন বেড়ে যাবার উপক্রম। প্রত্যেক দিন দু'বেলা এত মশলা দেওয়া খাবার খাওয়ারও তো অভ্যেস নেই কারওর।

আজ চলে এসেছে নিজেদের নতুন বাড়িতে।

বাড়িটি দো-তলা, মোট সাতখানা ঘর। সামনে-পেছনে বারান্দা। বাগানও আছে। এ-বাড়ি ওসমান সাহেব কিনেছিলেন এক সাহেবের কাছ থেকে। এক সময় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা এই ধরনের নিরিবিলি পাহাড়ি জায়গায় বাড়ি বানিয়ে কাটাত শেষ জীবন। হঠাৎ এক সময় তাদের অস্ট্রেলিয়া যাবার সুযোগ খুলে যায়। তখন জলের দরে এখানকার বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে চলে গেছে।

বাড়িটার অনেক অংশ এখনও মেরামত করা বাকি আছে, তবে একটা ঘর একেবারে তৈরি। নতুন রঙ করাও হয়েছে। সারা দিন ঘুরে ঘুরে অতনু ও রবি কিছু কিছু ফার্নিচার ও খাট-বিছানা কিনেছে। এই ঘরটা কোম্পানির ডিরেক্টরদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

দক্ষিণ দিকের জানলা খুললেই পাহাড়টা দেখা যায়। ট্রেনের যাওয়া-আসাও চোখে পড়ে, শব্দ শোনা যায় না। দূর থেকে ট্রেন দেখলে এখনও বাচ্চা বয়েসের মতো ভাল লাগে।

অতনু কোনও রকম আচার-অনুষ্ঠানে বিশ্বাস না করলেও চন্দনা বিশেষ করে বলে দিয়েছে, একটা কিছু গৃহপ্রবেশের পুজো-টুজো করতেই হবে। বিশেষত ভূতের বাড়ি। চন্দনার নিজেরই আসার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এই শনিবারই তাকে যেতে হয়েছে বার্লিনে, তার দিদির মেয়ের বিয়ে। ওরা টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছে।

দুপুরে এক জন পুরুত এসে ঘণ্টা-ফণ্টা নেড়ে কী-সব মন্ত্র পড়ে গেছে। দক্ষিণা নিয়েছে একশো পঁচিশ টাকা। সস্তাই বলতে হবে, কলকাতার পুরুতরা অনেক বেশি নেয়।

এখানে অনেক জিনিসই এখনও কিছুটা সস্তাই আছে। বাজার ঘুরে দেখেছে অতনু। তরকারি-শাকসবজি যেমন টাটকা, তেমনই কম দাম। পাঁঠার মাংসের দামও দশ টাকা কম কলকাতার চেয়ে। তবে মাছটা ভাল পাওয়া যায় না। কাছাকাছি বড় নদী নেই। এটা একটা খুঁত। বাঙালিরা যেখানেই যায়, মাছ খেতে চায়। অবশ্য এখনকার বাচ্চা ছেলেমেয়েরা মাছ পছন্দ করে না। এখানে মাংস-মুরগি সস্তা, এটাই ভাল করে পাবলিসিটি করে দিতে হবে।

সন্ধের সময় ওসমান সাহেব মালপত্র সমেত ওদের পৌঁছে দিতে এলেন। বিকেলবেলায় ওঁর বাড়িতে স্থানীয় দারোগার সঙ্গে নেমন্তন্ন ছিল। দারোগার নাম বিনয়, পাহাড়ের অধিবাসী। পুলিশ-টুলিশের সঙ্গে পরিচয় থাকা ভাল।

ওসমান সাহেব আজ রাতে এখানে আসবেন, থাকবেন না, তাঁর বাড়িতে আজ মেহমান আসবে। তবে আজ রাতের খাবারও আসবে তাঁর বাড়ি থেকে, এখানে রান্নার ব্যবস্থা করা যায়নি। ফোটানো জল সঙ্গে আনা হয়েছে পাঁচ বোতল। অতনু নতুন জায়গার জল বিশ্বাস করে খেতে পারে না। যদিও আগেকার দিনে বলা হত, এমন জায়গায় এসে জল খেলে তাড়াতাড়ি সব কিছু হজম হয়ে যায়, খিদে বাড়ে। এখন অতনুর পেটের চরিত্র বদলে গেছে।

বিদায় বলবার আগে ওসমান সাহেব বললেন, সব ঠিক আছে? কোনও অসুবিধা হবে না আশা করি।

না না, আপনার ব্যবস্থাপনার কোনও ত্রুটি নেই। কী করে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব।

এ আর এমন কী। মানুষের সঙ্গে শুধু কাজকর্মের সম্পর্ক ছাড়াও তো বন্ধুত্ব হতে পারে। বাই দ্য ওয়ে, এখানে চোর-ডাকাতের উপদ্রব নেই, খুব পিসফুল জায়গা...তবে আপনাদের ভূত-টুতের ভয় নেই তো?

রবি অতনুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, আমার এই নাস্তিক বন্ধুটি ভূত বা ভগবান, কোনওটিতেই বিশ্বাস করে না।

ওসমান সাহেব একটু হকচকিয়ে বললেন, এই দু'টার মধ্যে মিল কোথায় তা তো বুঝলাম না!

রবি বলল, ভূত বা ভগবান, দুটোকেই কখনও দেখা যায় না। অদৃশ্য। সে-জন্যই অবিশ্বাস।

ওসমান বললেন, ভগবানকে চোখে দেখা যায় না ঠিকই, কিন্তু ভূত তো কেউ কেউ দেখেছে।

এবার অতনু জিজ্ঞেস করল, আপনি দেখেছেন? নিজের চোখে?

না, মানে, আমি কখনও দেখিনি, কিন্তু কেউ কেউ খুব রিলায়েবল —।

কেউ দেখেনি। ভূত কেউ নিজের চোখে দেখে না, অন্য কেউ দেখেছে, সেই উদাহরণ দেয়। অন্য কেউই আসলে দেখে না। যদি কেউ বলে, হ্যাঁ আমি দেখেছি, তাহলে বলতেই হবে, সে একটা ডাহা মিথ্যুক। কিছুটা হ্যালুসিনেশানে ভোগে। তার অসুখ আছে। এ নিয়ে অনেক গল্প ছড়ায়। কিন্তু কেউ দেখে না। আপনি বুঝতে পারছেন না, ওসমান সাহেব, এক জন মৃত মানুষকে যদি আবার দেখা যায়, তাহলে তো ফিজিক্সের থিয়োরিটাই মিথ্যে হয়ে যাবে।

রবি বলল, ভূত বিশ্বাস না করলেও অনেকে ভূতের ভয় পায়।

অতনু বলল, দ্যাটস রাইট। সেটা মন্দ নয়। দড়াম করে একটা দরজা খুলে গেল, [illegible] শোনা গেল বাতাসে, সিঁড়িতে কার যেন পায়ের শব্দ মাঝ রাতে, এ-সব [illegible] উঠবে, বেশ রোমাঞ্চ হবে, সেটা উপভোগ করা যাবে। অবিশ্বাস যদি দৃঢ় হয় তাহলে তো আগেই জানা থাকবে যে-কোনও অশরীরীর পক্ষেই মানুষের কোনও ক্ষতি করা সম্ভব না। মানুষকে ছুঁতেই পারবে না।

ওসমান বললেন, আপনার মশাই সত্যিই মনের জোর আছে। আমিও ঠিক বিশ্বাস করি না, কিন্তু একলা বাড়িতে থাকতে পারি না। ঠিক আছে, গুড নাইট।

অতনুও বলল, গুড নাইট। খোদা হাফেজ!

ফিরে দাঁড়িয়ে ওসমান হেসে বললেন, আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, তবে খোদা হাফেজ বললেন কেন?

অতনু বলল, ওটা তো একটা বিদায় সম্বোধন। এ-সব তো কেউ মানে বুঝে বলে না। সামাজিকতা হিসেবে বলাই যায়। আমরা তো মেরি ক্রিসমাসও বলি।

ওসমান বললেন, আচ্ছা তবে খোদা হাফেজ। ন'টা-সাড়ে ন'টায় আমার লোক এসে খাবার দিয়ে যাবে। তারপর দরজা-টরজা বন্ধ করে দেবেন।

ওসমান চলে যাবার পর অতনু বলল, উফ!

রবি জিজ্ঞেস করল, উফ করলি কেন? ভদ্রলোক ভাল মানুষ, এত উপকার করছেন। তুই কি তবু বিরক্ত হচ্ছিলি নাকি?

না, তা নয়। ভদ্রলোক সত্যিহ ভাল মানুষ। বিরক্ত হবার কোনও কারণ নেই। তবু কি জানিস, সর্বক্ষণ এক জন অন্য লোক কাছে থাকলে নিজেদের মধ্যে হার্ট-টু-হার্ট কথা বলা যায় না। খিস্তি-খেউড় করা যায় না।

মেয়েছেলে নিয়ে আলোচনাও করা যায় না। এক জন মেয়ে উপস্থিত থাকলেও এ-রকম হয়।

আমি কোনও মেয়ে উপস্থিত থাকলে আগেই জিজ্ঞেস করি, অ্যাডাল্ট তো? সব ধরনের কথা হজম করতে পারবে তো? তারপর প্রাণ খুলে যা খুশি তাই বলি।

তোর বউয়ের সামনে তো বলতে পারিস না। চন্দনা খুব কড়া ধাতের মেয়ে।

আঃ, তুই সব সময় আমার বউকে টেনে আনিস কেন? মাল-ফাল খাবি না? ঢাল না গেলাসে।

দু'টি গেলাসে হুইস্কি ঢালল রবি। এখানে সোডা পাওয়া যায় না, শুধু জল দেখতে হবে।

গেলাস তুলে অতনু বলল, চিয়ার্স।

রবি বলল, বাংলাদেশে বলে, উল্লাস।

ফরাসিরা বলে, আ ভত্র্ শান্তে। মানে জানিস?

জানতে চাই না। চুমুক দিয়েই আমার প্রথম কী মনে হল জানিস? তুই যে চ্যালেঞ্জ করেছিলি, শকুন্তলার সঙ্গে ঠিক আলাপ করবি। কই, পারলি?

অতনু একটুক্ষণ চুপ করে রইল।

এর মধ্যে সে আরও তিনবার গিয়েছিল বেদান্ত আশ্রমে। এক দিন সকালে ও দু'বার বিকেলে। পুজো-টুজো ছাড়াও ওখানে নানা রকম সেবামূলক কাজকর্ম হয়। অনেকটা রামকৃষ্ণ মিশনের মতো। লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে গ্রামের মানুষরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করায়। ব্লাড টেস্টেরও ব্যবস্থা আছে। পোশাক বিতরণ হয়, একটা ইস্কুল বাড়িও তৈরি হচ্ছে। গাড়ি-চড়া বাবুরা এ-সব কাজ পরিদর্শনে আসে, বোঝা যায়, বাইরে থেকে আসে অনেক টাকা। বিদেশি সাহায্যও থাকতে পারে।

এই তিনবারের মধ্যে একবার মাত্র দূর থেকে সেই মেয়েটিকে এক ঝলক দেখেছে অতনু। অন্য দু'বার দেখাই হয়নি, কথা বলার সুযোগের তো প্রশ্নই ওঠে না।

সিগারেটে টান দিয়ে অতনু বলল, আমি যেটা জেদ ধরি, সহজে ছাড়ি না। আর ক'টা দিন থাকতে পারলে ডেফিনিটলি আলাপ করে নিতে পারতাম। কিন্তু চন্দনা এখন বার্লিনে, আমি বেশি দিন এখানে থাকলে ব্যবসাটা দেখবে কে? তাই আমাকে ফিরে যেতে হচ্ছে। আবার শিগগিরই আসব। তখন আর একবার।

রবি বলল, ধরা যাক মেয়েটির সঙ্গে তোর দেখা হল। তুই প্রথমেই কী কী বলবি?

বলব, তুমি কী সুন্দর!

কোন ভাষায় বলবি!

তার মানে?

যদি বাংলায় বলিস, আর মেয়েটি যদি বাঙালি না হয়? কিছুই বুঝবে না। অমন গায়ের রঙ কি বাঙালি মেয়েদের হয়?

তুমি কী সুন্দর, এটা একটা ইউনিভার্সাল ল্যাঙ্গুয়েজ। সবাই বুঝবে।

মোটেই না। ওড়িয়া, অসমিয়া এমনকী বিহারি হলেও বাংলা বুঝতে পারবে, কিন্তু যদি কাশ্মীরি হয়? এক বর্ণও বুঝবে না। ওকে দেখতে অনেকটা কাশ্মীরি মেয়েদেরই মতো।

এখানে কাজ করছে, নিশ্চয়ই বাংলা শিখে নিয়েছে।

মনে হয় লেখাপড়া জানে। সেফ সাইডে থাকার জন্য প্রথম সেনটেন্সটা ইংরেজিতে বলাই ভাল। কিন্তু কথা হচ্ছে, 'তুমি কী সুন্দর' শুনলে অধিকাংশ মেয়েই খুশি হয়। কিন্তু যে-মেয়ে সংসার ছেড়ে

এসেছে, সে-ও কি খুশি হবে? বরং বিরক্ত হতে পারে। রূপের সঙ্গে জড়িত থাকে কামনা-বাসনা, সে-সব ছেড়েই তো ও সন্ন্যাসিনী হয়েছে।

আমি এর পরেই তো জিজ্ঞেস করব, তুমি এই ভরা যৌবনে সংসার ছেড়ে এসেছ কেন? আসলে সেইটুকু কৌতূহল মেটানোই তো আমার উদ্দেশ্য।

তুই প্রথম আলাপে জিজ্ঞেস করলেই সে গড় গড় করে বলে দেবে? সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীরা তাদের আগের জীবন নিয়ে কোনও কথাই বলতে চায় না, সেই জন্য তারা নামও বদলে ফেলে। অতনু, তোর চেহারা-টেহারা ভাল, এমনি মেয়েরা তোকে দেখলে খানিকটা চুম্বক মেরে যায়, কিন্তু মনের জোরে যে সংসার ছেড়েছে, সে তোকে বিশেষ পাত্তা দেবে বলে মনে হয় না।

দেখ রবি, তুই প্রথম থেকে আমাকে ডিসকারেজ করতে চাইছিস! আমার সঙ্গে যদি একবার আলাপ হয়, ঠিক ওর পেটের কথা বার করে ফেলব।

আমার কী ভয় হয় জানিস, ওর সঙ্গে ওই ধরনের কথা বললে তোকে হয়তো অপমানিত হতে হবে।

যাক গে, বাদ দে, ও-সব কথা এখন বাদ দে। আমাদের এই গেস্টহাউসটার নাম কী হবে? তোকে ভাবতে বলেছিলাম না?

ভেবেছি। আমার মনে হয়, কোনও শৌখিন নাম দেবার বদলে খুব সহজ, সাধারণ নাম, যেমন মহুলডেরা ভ্যাকেশান লজ, এই রকমই ভাল। মহুলডেরা নামটা কলকাতার লোকেদের কাছে পরিচিত নয়। বেশ একটা এক্সটিক ভাব আছে।

ইংরেজি নাম!

বাংলা নাম দিলে লোকে ভাববে সস্তার জায়গা। আর সস্তা মানেই মিস ম্যানেজমেন্ট। তোকে ধরতে হবে আবার মিডল ক্লাস ক্লায়েন্টস। অবাঙালিরাও আসতে পারে।

প্রথমে তো ঠিক করেছি, কয়েক মাস থাকবে ঘর ভাড়া পার ডে দুশো টাকা। সাধারণ মধ্যবিত্তরাও আসতে পারবে। মাস ছয়েক পরে অবশ্য ভাড়া বাড়বে। খুব গরমের সময়, লিন সিজন, তখন আবার রেট কমাতেও হতে পারে।

ইলেকট্রিসিটি এসে গেছে, গোটা তিনেক ঘর এয়ারকন্ডিশান করে দিতে পারিস। তাতে লোকে আরামে পাঁচশো-সাতশো টাকা দেবে।

তুই যখনই আসবি, তোর জন্য ফ্রি। তুই এই ঘরটায় থাকবি।

আমি একা আসব? এখানে কেউ একা আসবে না, সবাই মেয়ে-টেয়ে নিয়েই আসবে।

তুই বুঝি সারা জীবনে আর কোনও মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক করবি না? তুই তো দেখছি সন্ন্যাসীর মতো বখে যাচ্ছিস রে রবি।

না, আমি সন্ন্যাসী হতে পারব না। কারণ আমি মদ খাই, সিগারেট খাই। মেয়েদের কাছে না ঘেঁষলেও মেয়েদের কথা তো চিন্তা করি অবশ্যই।

আচ্ছা, সাধু-সন্ন্যাসী, ফকির-দরবেশ এরা কি সত্যিই মেয়েদের কথা চিন্তা করে না? এরা লিবিডো দমন করে কী করে?

সেটা ওদের অবস্থায় না পৌঁছলে আমরা বুঝতে পারব না। হয়তো সাধনা-টাধনা করলে মনের জোর অনেক বেড়ে যায়।

কিছু কিছু সো-কলড সাধু তো মেয়েদের নিয়ে বেলেল্লাও করে। মাঝে মাঝে কাগজে বেরোয়।

তারা সো-কল্‌ড সাধু। খাঁটি নয়। তাদের কয়েক জনের জন্য সবাইকে ছোট করে দেখা ঠিক নয়। অনেকে নিশ্চয়ই সাধনার উচ্চমার্গেও ওঠে।

আমি তো মনে করি, কর্মই সাধনা।

এই সব কথাবার্তার মধ্যে মদ্যপানও চলছে। বোতল অর্ধেক খালি। অতনু একবার ঘড়ি দেখল। মাত্র সাড়ে আটটা বাজে।

হঠাৎ এক সময় শোনা গেল সিঁড়িতে কয়েকটি পায়ের শব্দ। ফিশফাশ কথা। দো-তলার কাছে এসে সব থেমে গেল। আবার চুপচাপ।

অতনু রবির দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। প্রথমে মনে হয়েছিল, বাইরে থেকে কেউ দেখা করতে আসছে। তারপর শব্দ থেমে গেল কেন? এই কি ভূতের ব্যাপার? ফিজিকসের থিয়োরি মিথ্যে হয়ে যাবে?

রবি বলল, আমি বাইরেটা দেখে আসছি।

সে উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ভেজানো দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল। সেখানে দাঁড়ানো তিন জন যুবক। না, ফিজিক্সের থিয়োরি মিথ্যে হয়নি, এরা সত্যিকারের মানুষ।

তিন জনই প্যান্ট-শার্ট পরা, মাঝারি চেহারা, বয়েস পঁচিশ থেকে পঁয়তিরিশের মধ্যে। মাঝখানের যুবকটি একটু বেশি লম্বা, চোখে চশমা, মাথার ঝাঁকড়া চুলে কখনও চিরুনি ব্যবহার করে বলে মনে হয় না।

সে তীব্র গলায় বলল, আপনারা কে? এখানে কী কবছেন?

ভুরু কুঁচকে অতনু বলল, সে-প্রশ্ন তো আমরাই করব। আপনারা কে? এখানে কেন এসেছেন?

লোকটি ধমক দিয়ে বলল, যা জিজ্ঞেস করছি উত্তর দিন।

রবি জানে, অতনু বদমেজাজি, কারওর খারাপ ব্যবহার দেখলে পট করে একটা অশ্লীল গাল দিয়ে ফেলতে পারে।

সে হাত তুলে বন্ধুকে নিবৃত্ত করে শান্ত গলায় বলল, আমরা এই বাড়ির মালিক, আমরা এখানে থাকব, সেটাই তো স্বাভাবিক।

আমাদের বাড়ি মানে?

আমরা এই বাড়িটা কিনেছি। আজই দখল নিয়েছি।

কিনেছেন? এই অঞ্চলে সমস্ত বিক্রি নিষেধ, তা জানেন না?

নিষেধ? গভর্নমেন্টের সার্কুলাব আছে? সে-বকম তো কিছু শুনিনি।

গভর্নমেন্টের নয়, আমাদের সার্কুলার। ওই ওসমান ব্যাটা বুঝি চুপি চুপি আপনাদের এই বাড়িটা গছিয়েছে? ব্যাটা মহা ধড়িবাজ ক্যাপিটালিস্ট।

চুপি চুপি কেন হবে? রীতি মতো দরদাম করে, আমরা উকিল দিয়ে বাড়ির টাইটেল সার্চ করিয়েছি, কোর্টে রেজিস্ট্রি হবে।

সে-সব কিছু হবে না! এ বাড়িতে আমরা রাতে থাকি।

এবার অতনু বলে উঠল, সেই জন্যই বুঝি ভূতের গল্প রটানো হয়েছে?

লম্বা লোকটির এক জন সঙ্গী বলল, শাট আপ!

রবি নিরীহ ভাবে জিজ্ঞেস করল, আপনারা এ অঞ্চলের সব বাড়ি বিক্রি না-করার সার্কুলার দিয়েছেন কেন জানতে পারি? যদি কেউ অভাবে পড়ে বেচতে চায়?

লম্বা লোকটি চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, আপনারা এই বাড়িটা কিনতে চাইছেন কেন? এখানে এসে পাকাপাকি বসবাস করবেন? নিশ্চয়ই না। এটা বাগানবাড়ি বানাতে চান?

রবি বলল, ঠিক তা নয়। আমাদের একটা ট্রাভেল এজেন্সি আছে। এ বাড়িটাকে আমরা একটা গেস্টহাউস বানাব। শহর থেকে লোকেরা আসবে।

অতনু বলল, বাইরের লোকেরা এখানে আসবে, তারা জিনিসপত্র কিনবে, টাকা খরচ করবে, তাতে এখানকার স্থানীয় লোকেদেরই তো উপকার হবে।

আ-হা-হা-হা! স্থানীয় লোকদের উপকারের চিন্তায় যেন আপনাদের ঘুম নেই! আপনারা গেস্টহাউস করছেন নিজেদের ব্যবসার জন্য। শহর থেকে লোকেরা এখানে ফুর্তি করতে আসবে। নিজের বউ ছাড়া অন্য মেয়ে নিয়ে আসবে। মদ খাবে।

লম্বা লোকটির এক জন সঙ্গী বলল, মধুদা, এরা দু'জনেও তো বসে বসে মদ প্যাঁদাচ্ছে।

অতনু বলল, মদ্যপান সম্পর্কে আপনাদের খুব আপত্তি দেখছি! আপনারা খান না বুঝি? এখানকার সব আদিবাসীরাই তো মদ খায় রোজ। হাঁড়িয়া মহুয়া। আপনারা বুঝি বিপ্লবী? কার্ল মার্কস কিংবা লেনিন মদ খেতেন কি না খোঁজ নিয়েছেন? ও-সব দেশে তো সবাই ভদকা খায়।

অন্য লোকটি বলল, শাট আপ!

এবার অতনুও গর্জে উঠল, ইউ শাট আপ! অ্যান্ড গেট আউট ফ্রম মাই প্রপার্টি। লম্বা লোকটি পকেট থেকে একটা রিভলবার বার করে গুলি চালাল তিনবার। দুটো গুলি অতনুর গায়ে লাগল, সে ঢলে পড়ে গেল।

চার

অতনুর জ্ঞান ফিরল প্রায় দু'দিন পরে। তা-ও অ্যানেসথেশিয়ার ঘোর রয়েছে খানিকটা। চোখ মেলে সে ঘাড় ঘুরিয়ে এ-দিক ও-দিক দেখে জিজ্ঞেস করল, এ জায়গাটা কোথায়?

গলায় স্টেথোসকোপ ঝোলানো এক জন ডাক্তার, তাঁর পাশে দু'টি তরুণী। তাদের মধ্যে এক জন সেই পরমা সুন্দরী, যার সঙ্গে পরিচয় করার জন্য অতনু ব্যাকুল হয়েছিল। কিন্তু এখন অতনু তাকে চিনতে পারল না। শরীর অসুস্থ থাকলে ও-সব মনে পড়ে না।

ডাক্তাররা মৃদু স্বরে বলল, আপনি আমাদের আশ্রমের হাসপাতালে। ইউ আর কমপ্লিটলি সেইফ নাও!

অতনু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, আমি হাসপাতালে কেন? আমার কী হয়েছে? অ্যাকসিডেন্ট?

আপনার মনে নেই, কী হয়েছিল?

নো, আই ডোন্ট রিমেমবার এনিথিং। আমি হাসপাতালে...। আমার কি একটা পা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে?

না না, পা ঠিক আছে। আপনার দুটো গুলি লেগেছে, দুটোই সাকসেসফুলি রিমুভ করা গেছে। একটা গুলি লেগেছিল হার্টের ঠিক তিন ইঞ্চি নিচে, ওটা ফেটাল হতে পারত। অন্যটা কাঁধে।

অতনু ঠিক বুঝতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, আমার দুটো হাত কোথায়? ঠিক আছে!

ডাক্তার বলল, হাতও ঠিক আছে।

কোথায়? আমার হাত কোথায় দেখান?

একটা হাত তো দেখানো যাবে না, বুকের সঙ্গে ব্যান্ডেজ বাঁধা। অন্য হাতটা আপনি অনায়াসে তুলতে পারবেন।

অতনু আপন মনে বলল, পা ঠিক আছে, হাত ঠিক আছে, তাহলে আমি এখানে শুয়ে আছি কেন?

ডাক্তার হেসে বললেন, একটু তো শুয়ে থাকতেই হবে। কয়েক দিন বিশ্রাম দরকার।

অতনু চোখ বুজল।

একটু পরে ডাক্তার ও একটি তরুণী বেরিয়ে গেল। অন্য তরুণীটি একটা টুলে বসে রইল তার শিয়রের কাছে।

অতনু তাকে অগ্রাহ্য করে পাশ ফিরল অন্য দিকে।

প্রায় ছ'ঘণ্টা পরে সে আবার চোখ খুলল। এখন ডাক্তারটি নেই, রয়েছে দু'টি মেয়ে।

এক জন বলল, এবারে একটু খেয়ে নিন, সারা দিন পেটে কিছু পড়েনি।

অতনু জিজ্ঞেস করল, কী খাব? খিদে তো পায়নি।

অন্য জন বলল, খিদে না পেলেও একটু খেয়ে দেখুন। যতটা পারেন। আজ লিকুইড, কালকেই ভাত পাবেন।

একটা পোর্সিলিনের বাটি থেকে চামচে করে তুলে অতনুকে কিছু একটা তরল খাদ্য খাওয়াতে লাগল মেয়েটি।

অতনু মুখ কুঁচকে বলল, একটুও ঝাল নেই। লঙ্কা দেয়নি কেন?

মেয়ে দু'টিই হাসল। হাসপাতালের রোগীকে ঝাল খাবার দেবার কথা কেউ কখনও শোনেনি। সব হাসপাতালের খাবারের স্বাদ এক।

বার বার আপত্তি জানিয়ে মাথা নাড়ছে অতনু, মেয়েটি বেশ শক্ত করে তাকে ধরে আছে। একবার সে অন্য জনকে বলল, জলের গেলাসটা দে তো দীধিতি!

অতনু শুনল, একটি মেয়ে অন্য মেয়েটিকে ডিডিটি বলে ডাকছে। ডিডিটি কারওর নাম হয়? হাসপাতালে ডিডিটি কাজে লাগে।

যাকে ওই নামে ডাকা হল, সে সেই খুব ফরসা রূপসীটি। কিন্তু তার রূপের প্রতি এখন কোনও আকর্ষণ নেই অতনুর, শুধু নামটা শুনে তার খটকা লেগেছে।

একবার সে বলেই ফেলল, কী নাম বললে ওর? ডিডিটি?

দু'জনেই হাসল।

এক জন বলল, প্রথমে ওর নাম শুনে সবাই অন্য একটা কিছু ভাবে। আমার নাম অনুপমা, ওর নাম দীধিতি। দী-ধি-তি।

অতনু বলল, এটা কি বাংলা?

হ্যাঁ, বাংলাই বলতে পারেন। সংস্কৃত থেকে এসেছে।

মানে কী?

এবারে যার নাম, সে-ই খুব নম্র গলায় বলল, দীপ্তি, রশ্মি।

কখনও শুনিনি।

আর আগ্রহ হারিয়ে ফেলে সে খানিকটা বিরক্তির সঙ্গে বলল, আঃ, আর খেতে ইচ্ছে করছে না, কেন জোর করছ! আমার ঘুম পাচ্ছে!

আবার সে জেগে উঠল, মধ্যরাতে।

ঘরের এক কোণে টেবল ল্যাম্প জ্বলছে, সেখানে টুলে বসে বই পড়ছে একটি মেয়ে। অনুপমা না দীধিতি, কোন জন, তা সে চিনতে পারল না। নাম দুটোও মনে নেই। অনেক কিছুই তার মনে নেই।

চোট লেগেছে তার শরীরে, কিন্তু তার মাথার মধ্যেও খানিকটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে।

তাকে নড়াচড়া করতে দেখে মেয়েটি উঠে এসে জিজ্ঞেস করল, আপনার কিছু কষ্ট হচ্ছে? জল খাবেন?

অতনু বলল, না।

মেয়েটি বলল, এখন সাড়ে বারোটা বাজে, আপনার ব্লাড প্রেশারটা একবার চেক করব?

অতনু কোনও উত্তর দিল না।

মেয়েটি অতনুর অক্ষত হাতটিতে পট্টি জড়াতে লাগল।

নির্জন ঘর, এত কাছাকাছি একটা তরুণী মেয়ে, তার নিশ্বাসও গায়ে লাগছে, তবু ভোগবাদী অতনুর শরীরে কোনও সাড়া নেই।

একটু পরে সে জিজ্ঞেস করল, আমার নাম কি অতনু হালদার? তুমি জানো?

মেয়েটি বলল, হ্যাঁ, কার্ডে তাই লেখা আছে।

আমি কি কারওর সঙ্গে মারামারি করেছিলাম?

তা জানি না। রিপোর্টে লেখা আছে, আপনার গায়ে গুলি লেগেছে দুটো। পুলিশ এসেছিল আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে। আপনি ঘুমোচ্ছিলেন, তাই জাগাইনি। কাল সকালে আবার আসবে।

পুলিশ তো চোর-ডাকাতদের ধরতে আসে, আমি কি তাই?

ধরতে আসবে না। ঘটনাটা কী ঘটেছিল, জানতে আসবে।

আমি যে কিছুই জানি না।

আপনার সঙ্গে এক বন্ধু ছিল, তারও গুলি লেগেছে।

সঙ্গে সঙ্গে রবির কথা তার মনে পড়ল। আঁতকে উঠে সে বলল, রবি রবি, তার কী হয়েছে? সে মরে গেছে?

না, গুলি লেগেছে তাঁর পায়ে।

অন্য পা-টাও খোঁড়া হয়ে গেছে?

না। সে পা-টাতেই গুলি লেগেছে। মানে একই পায়ে। উনি নিচেব একটি ঘবে আছে।

তুমি কে? তুমি কি নার্স?

কিছুটা ট্রেনিং নিয়েছি। আমাদের এখানে এক জনই মাত্র ট্রেইন্ড নার্স আছে। দরকার হলে আমরা দু'জন কাজ চালিয়ে দিই।

আমি একবার উঠব। বাইরে যাব।

আপনার এখনও বিছানা থেকে নামা নিষেধ। সেই জন্যই তো আমি এখানে রয়েছি। আপনার কী দরকার বলুন!

আঃ, কী মুশকিল, আমাকে একবার বাইরে যেতে হবে।

না, যেতে হবে না। শুয়ে থাকুন, আমি ব্যবস্থা করছি।

সে একটা বেডপ্যান বার করল খাটের তলা থেকে। অতনুর গা থেকে চাদরটা সরিয়ে নিল। নিম্নাঙ্গে শুধু একটা কাপড় জড়ানো। সেটাও সরিয়ে বেডপ্যান রাখল দুই উরুর মাঝখানে।

তারপর সেই অনিন্দ্যসুন্দর রমণী অতনুর পুরুষাঙ্গ ছুঁয়ে সেটিকে ঠিক জায়গায় স্থাপন করল।

শেষ হয়ে গেলে অতনু বলল, আঃ! এবার আমি ঘুমোই?

তাকে শুইয়ে দিয়ে আবার গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে দিল দীধিতি।

পরদিন সকালে অতনু অনেকটা স্বাভাবিক। তবু আজও তার বিছানা থেকে নামা নিষেধ। ব্লাড প্রেশার অনেক নেমে গেছে।

বিছানাতেই বালিশে হেলান দিয়ে বসে নিজে নিজে দাঁত মাজল অতনু। ঘরে এখন দু'টি মেয়ে উপস্থিত। দু'জনেরই সে নাম ভুলে গেছে, কাল রাতে কে তাকে পাহারা দিয়েছে, তা-ও মনে নেই।

একটু পরে সে ঘরে ঢুকলেন ডাক্তার। সহাস্য মুখে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছেন মিস্টার হালদার?

মানুষের স্মৃতি দুর্বল হয়ে গেলেও ব্যথাবোধ ঠিকই থাকে। সে বলল, এই দিকটায় বেশ ব্যথা।

ডাক্তার বললেন, কমে যাবে। আপনার রিমার্কেবল তাড়াতাড়ি উন্নতি হচ্ছে। আর দু'দিনের মধ্যে আপনি ফিট হয়ে যাবেন।

আমার সব সময় এত ঘুম পায় কেন?

আপনাকে কিছুটা সিডেটিভ দেওয়া হচ্ছে। ব্যথা কমাবার সেটাই তো উপায়। ঘুমোনোও তো ভালই।

ডাক্তার মেয়ে দু'টির সঙ্গে কী-সব আলোচনা করতে লাগলেন।

একটু পরে শোনা গেল ঘণ্টাধ্বনি।

অতনু জিজ্ঞেস করল, ও কীসের আওয়াজ?

দীধিতি বলল, আমাদের আশ্রমে পুজো শুরু হয়েছে।

আশ্রম? কীসের আশ্রম?

বেদান্ত সংঘের আশ্রম। আপনি তো আগে এসেছেন এখানে।

আগে এসেছি? কই না তো। আমি কোনও আশ্রমের কথা জানি না।

হ্যাঁ আপনি এসেছেন। এক দিন সকালে...আমি আপনাকে দেখেছি। আপনার মনে নেই?

না। আমি কবে আশ্রম দেখলাম?

তখনই রবিকে ধরে ধরে নিয়ে এল এক জন সঙ্গী। রবির সারা শরীরে অন্য কোনও চিহ্ন নেই, শুধু তার এক পায়ে প্লাস্টার।

রবি বলল, কেমন আছিস অতনু?

অতনু বলল, হু! কেমন আছি? কে জানে! তোর গায়েও গুলি লেগেছে?

রবি কাছে এগিয়ে বলল, হ্যাঁ, লেগেছে, পায়ে।

আগের রাতে যা শুনেছে, তা মনে নেই অতনুর। সে বলল, তোর দুটো পা-ই গেল? তুই হাঁটবি কী করে?

রবি বলল, সৌভাগ্যের বিষয়, আমার খারাপ পা-টাতেই গুলি লেগেছে। আমি তখন টেরই পাইনি, আমি তখন তোর জন্য...আমি তো জ্ঞান হারাইনি, তোকে দেখে এত ভয় হচ্ছিল, গল গল করে রক্ত বেরোচ্ছে। ওরা চলে যাবার পরই আমি ছুটে বাইরে গেলাম।

ওরা মানে কারা?

টাকা-পয়সা কিছু নেয়নি। কোনও পলিটিক্যাল পার্টির ক্যাডার। তোর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হতেই গুলি চালিয়ে দিল।

আমরা তো গুলি করিনি।

আমরা গুলি করব কী করে! আমাদের সঙ্গে কি বন্দুক-পিস্তল কিছু ছিল? আমরা তো ভাবতেই পারিনি, অমন ভাবে বাড়ির মধ্যে ঢুকে — অতনুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে রবি আড়চোখে দেখছে দীধিতিকে। এই সেই আশ্রমকন্যা শকুন্তলা। কাছ থেকে দেখে মনে হচ্ছে, এর জন্য কোনও কোনও পুরুষ তো পাগল হতেই পারে। শেষ পর্যন্ত তাহলে, অন্য রকম অবস্থায়, অতনুর কথাটা মিলে গেল, আলাপ হল এর সঙ্গেই।

কিন্তু অতনু যে মেয়েটির কথা একেবারেই ভুলে গেছে, তা সে জানে না।

পুলিশ আসবার পর সব কিছু উত্তর দিতে হল রবিকেই। অতনুর উত্তর অসংলগ্ন। সে মন দিয়ে শুনতে লাগল রবির কথা, যেন একটা অচেনা কাহিনি। এখানে একটা বাড়ি কেনা হয়েছে? কেন? বাড়ি দিয়ে কী হবে? আততায়ীদের তো ধরা যায়নি, তারা পালিয়ে গেছে গভীর জঙ্গলে। পুলিশ খুঁজছে। ওসমান সাহেব কারওকেই চেনেন না বলেছেন। কে ওসমান?

বিকেলের দিকেও ডাক্তারটি দেখতে এলেন আবার।

অতনুর কথাবার্তা যে অসংলগ্ন, তা জেনেও গুরুত্ব দিলেন না তিনি। তিনি শল্য চিকিৎসক, তাঁর অপারেশন সার্থক হয়েছে, এতেই তিনি তৃপ্ত। মনস্তত্ত্ব নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না। আকস্মিক শকে এ-রকম হতেও পারে, আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে।

আজ রাতেও অতনুকে একবার বেডপ্যান নিতে হল। আজ অবশ্য দীধিতি নয়, অন্য মেয়েটি রয়েছে পাহারায়।

পরদিন, সারা দিন দীধিতিকে দেখাই গেল না।

অনুপমা আর এক জন পুরুষ সঙ্গী মিলে একবার অতনুকে খাট থেকে নামিয়ে হাঁটাতে হল কয়েক পা। হাঁটতে তার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। পায়ে জোর আছে, ঘুম ঘুম ভাবটাও কেটে গেছে। এখনও অবশ্য সে বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বসবার অনুমতি পায়নি।

আজ এক জন পরিপূর্ণ পোশাক পরা নার্স এল শেষ বিকেলে। এই আশ্রমের যিনি গুরুমা, তিনি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁর কাছেই এই ট্রেইন্ড নার্সটিকে সর্বক্ষণ থাকতে হয়। এক ফাঁকে এসে সে অভিজ্ঞ হাতে অতনুর সারা শরীর নগ্ন করে গরম জলে স্পঞ্জ করে দিল। বুকের ব্যান্ডেজটাও খুলে দেখা গেল, তার রক্ত বেরোচ্ছে না। ক্ষত সেরে এসেছে অনেকটা।

অতনু জিজ্ঞেস করল, আমি কবে এখান থেকে ছাড়া পাব?

নার্সটি অধিকাংশ কথাই ইংরেজিতে বলে। সে বলল, হোপফুলি ইন অ্যানাদার থ্রি ডেইজ। তারপর ইউ উইল বি ফ্রি।

অতনু জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাব?

নার্সটি খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, আপনি কোথায় যাবেন, হাউ কুড আই পসিবলি নো? আপনার নিজের বাড়িতে যাবেন।

অতনু জিজ্ঞেস করল, আমার নিজের বাড়িটা কোথায়? আমি যদি মরে যেতাম তাহলে কি আমার নিজের কোনও বাড়ি থাকত?

নার্সটি দু-কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, আই হ্যাভ নো অ্যানসার।

সন্ধের দিকে অতনুর এমনই মন খারাপ হয়ে গেল যে রবি দেখা করতে এলেও সে ভাল করে কথা বলল না।

অনুপমা তাকে একটু গলা ভাত আর মুরগির স্টু খাওয়াতে নিয়ে এল, সে মুখ সরিয়ে নিল একটু পরেই।

তাকে ধমক দিয়ে বলল, আমাকে একটা সিগারেট দিতে পারো না?

অনুপমা বলল, হাসপাতালে তো সিগারেট পাবেনই না। এখান থেকে বেরিয়েও আর সিগারেট খাবেন না।

মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়ল অতনু। রাতে কে তার ঘরে রইল, তা সে লক্ষ্যও করল না। কোনও সাহায্যও চাইল না, যদিও ঘুম ভেঙে যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

রবির কাছ থেকে কাহিনিটা শোনার পর এখন সে মাঝে মাঝেই দেখতে পাচ্ছে, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এক জন লম্বা চেহারার লোক রিভলবার থেকে গুলি করছে তার দিকে। দৃশ্যটা চোখে ভেসে ওঠা মাত্র তার মনে হচ্ছে, সে মরে যাচ্ছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে তার শরীর।

দীধিতি আবার এল পরদিন সন্ধের পর।

তার দিকে কয়েক পলক এক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে সে রীতিমতো প্রখর গলায় জিজ্ঞেস করল, তুমি দু'দিন আসোনি কেন?

দীধিতি বলল, আমি যে দু'দিন আসিনি, তা আপনি খেয়াল করেছেন?

রূপের মতোই মেয়েটির গলার আওয়াজও খুব মিষ্টি। ভদ্রতা আর বিনয়ের ভাবও আছে।

আবার সে বলল, আমাদের গুরুমা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আমি তাঁর কাছে ছিলাম। একটু আগে তিনি কলকাতায় ফিরে গেলেন।

তুমি আমাকে একটু ধরবে? একবার বাথরুমে যাব।

আজ না, কাল থেকে। এখন কিছু লাগবে?

ঠিক আছে, এক্ষুনি না। তুমি আগের দিন যে আমাকে ওই ব্যাপারে সাহায্য করলে, তখন কিছু বোধ করিনি। এখন একটু একটু লজ্জা করছে। আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তুমি যে রোগীদের জন্য ওই সব করো, তোমার ঘেন্না করে না?

না, ঘেন্না করে না। এ তো মানুষের সেবা। আর মানুষের সেবা মানেই ঈশ্বরের সেবা।

ঈশ্বর কে? তোমাদের এখানকার কোনও বড়বাবু?

কী বলছেন আপনি! ঈশ্বর তো সব মানুষেরই।

আমার নয়। আমার কোনও ঈশ্বর-টিশ্বর নেই। শোনো, আমি অতনু হালদার, আমি বিচ্ছিরি ধরনের নাস্তিক। আমার বন্ধুরা আমাকে বলে শয়তান, কালাপাহাড়। কিন্তু আমি একটা একজাম্পল সেট করছি। ছোটবেলা থেকেই আমি কোনও ধর্ম মানি না, ভগবান মানি না। কোনও দিন প্রার্থনা-টার্থনা করিনি। তবু, আমি দেখাতে চাই, এইভাবেও সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যায়। ধর্ম নিয়ে মাতামাতি না করেও মানুষ আনন্দের সঙ্গে বাঁচতে পারে।

আপনি হয়তো ঠিকই বলছেন। তবে আপনি যে-জীবনযাপনের কথা বলছেন, তার সঙ্গে যদি এই সৃষ্টির বিস্ময়, কোনও গভীর অনুভূতি, যিনি এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেছেন, তার কাছে পৌঁছনোর পথ খোঁজা, এই সব করলে নিশ্চিত জীবনযাপনের আনন্দ আরও অনেক বিশুদ্ধ হত। মনটাকে সব গ্লানি থেকে মুক্ত করা যেত।

মাথা নেড়ে অতনু বলল, না। আমি অনেক ধর্ম আশ্রিত, ভক্তি আশ্রিত মানুষ দেখেছি, তাদের কোয়ালিটি অফ লাইফ মোটেই আমার চেয়ে ভাল না। দেখেছি, তাদের লোভ আছে, ঈর্ষা আছে, মিথ্যে কথা বলে। কিন্তু আমি মিথ্যে বলি না, আমি কোনও মানুষের ক্ষতি করি না। পারলে যথাসম্ভব অন্যের উপকার করি। আমি ধর্মের বইগুলো ঘেঁটে দেখেছি। সব ক'টা ধর্মই বেশ কাঁচা ধরনের ছেলে-ভুলোনো রূপকথা। কোনও শিক্ষিত, সিভিলাইজ্‌ড, অ্যাডাল্ট লোকের কাছে ধর্মের কোনও প্রয়োজনীয়তাই নেই।

এক সঙ্গে এতগুলি কথা বলে হাঁপাতে লাগল অতনু। এখন মাঝে মাঝে ভুলে যাওয়ার ব্যাপারটাও নেই।

দীধিতি মৃদু গলায় বলল, আপনার এই যে নাস্তিকতার তীব্রতা, তারও একটা গুণ আছে। নিশ্চয়ই দেখবেন, এইভাবে যুক্তি দিতে দিতে আপনি হঠাৎ এক দিন বিশ্বাসের দরজায় পৌঁছে গেছেন। তখন আপনার বিশ্বাসও এই রকমই তীব্র হবে।

অতনু হেসে বলল, সেই রকম দিন কখনও আসবে না। এলেও তুমি তা জানতে পারবে না।

· দীধিতি বলল, এখন একবার ব্লাডপ্রেশারটা দেখে নিই? এখনও প্রেশারটা ফ্লাকচুয়েট করছে।

অতনুর বাহুতে পট্টি বাঁধতে লাগল দীধিতি। অতনু জিজ্ঞেস করল, তোমার কোনও ডাকনাম নেই?

ছিল একটা। সেটা বলতে এখন আমার লজ্জা করে।

কী শুনি, শুনি। তোমার নামটা বড্ড খটোমটো।

পরি।

বাঃ। এটা তো বেশ মানানসই নাম! তবে আমার একটা ভুল হয়ে গেছে। প্রথম থেকে তোমাকে তুমি বলছি। তখন তো ঘোরের মধ্যে ছিলাম। আপনি বলাই উচিত ছিল, যদিও আমি বয়েসে বড়, তবু এখন থেকে আপনিই বলব।

দীধিতি হেসে বলল, একবার যখন তুমি বলেই ফেলেছেন, আর কী করা যাবে। আর আপনি করার দরকার নেই।

তাহলে তুমিও কি আমাকে নাম ধরে তুমি বলতে পারবে?

আমরা তো কারওর নাম ধরি না। সব পুরুষকেই বলি প্রভু!

প্রভু? নারীবাদীরা শুনতে পেলে তোমাদের পিণ্ডি চটকাবে। প্রভু মানে তো মালিক, আর তোমরা তাহলে দাসী?

দাসী হতে আমাদের আপত্তি নেই। সব পুরুষই তো পরম ব্রহ্মের অংশ, সেই হিসেবে তাঁদের সেবা করা।

পুরুষরা পরম ব্রহ্মের অংশ, আর মেয়েরা কি বাণের জলে ভেসে এসেছে? এ-সব ধর্মীয় ন্যাকাপনা শুনলেই আমার রাগ হয়। তোমরা মেয়েরা যে এত ধর্মকর্ম করো, তোমরা জানো না যে সব ধর্মেই মেয়েদের ছোট করে দেখা হয়েছে? সব ধর্মই পুরুষতান্ত্রিক। যে-সব ধর্মে ঈশ্বর নিরাকার, তারাও সর্বনামে বলে হি অর্থাৎ নিরাকার হলেও পুরুষ। ইট তো বলে না। নিরাকারের তো নিউট্রাল জেন্ডার হওয়া উচিত।

আমি আমার নিজের ধর্ম মানি। আপনি অত উত্তেজিত হবেন না, প্রেশার নিচ্ছি। ভুল হয়ে যাচ্ছে, আবার নিচ্ছি!

অতনু সত্যিই উত্তেজিত হয়েছে। শুধু মস্তিষ্কে নয়, শরীরেও। সে টের পাচ্ছে, কেউটে সাপের ফণার মতো আস্তে আস্তে উঁচু হচ্ছে তার পুরুষাঙ্গ। বেশ কয়েক দিন পরে এই প্রথম।

তার খুব কাছেই এই রমণীর শরীর। সাধারণ লাল পাড়, সাদা শাড়ি পরা, কোনও রকম প্রসাধন কিংবা অলঙ্কার নেই, তবু অপূর্ব রূপের বিভা। ওর নামের অর্থ দীপ্তি। সত্যি যে দীপ্তি, টের পাওয়া যায়।

ওর হাতে ব্যান্ডেজ, অন্য হাতে এখন পট্টি বাঁধা। তবু একবার ওকে স্পর্শ করার জন্য অতনুর মনটা আকুলি-বিকুলি করতে লাগল।

প্রেশার দেখা শেষ হয়েছে, পরির কপালে চিন্তার রেখা। পট্টিটা খুলে নেওয়া মাত্র অতনু ওর মাথায় হাত রাখল।

আয়ত চোখ দু'টি অতনুর মুখে ন্যস্ত করে পরি জিজ্ঞেস করল, এ কী করছেন?

অতনু বলল, তুমি এত সুন্দর তাই তোমাকে একটু ছুঁয়ে দেখছি।

সব মানুষই সুন্দর। যে দেখছে, তার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর অনেকটা নির্ভর করে।

তা জানি। তবু রূপের একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে। সব স্ট্যান্ডার্ডেই তুমি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।

ও-সব বলবেন না। মানুষের চেহারা, রূপ, এই সবই অবাস্তব। মানুষের মনটাই তো আসল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, হৃদয়ের কথা কহিতে ব্যাকুল, শুধাইল না কেহ...।

হৃদয়ের কথা আসল তো বটেই। কিন্তু শরীরও তুচ্ছ করা যায় না। আমি যদি তোমাকে একটু ছুঁতে চাই, সেটা কি অন্যায়?

ন্যায়-অন্যায়ের কথা আলাদা। প্রশ্ন হচ্ছে কী উদ্দেশ্যে ছোঁওয়া! আমি কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে নিয়েছি। সেই জন্যই আপনাকে ছুঁতে তো আমার কোনও অসুবিধে হয় না।

আমি অবশ্য বাসনাবদ্ধ জীব। আজই প্রথম তোমাকে আদর করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

হাতটা সে মাথা থেকে সরিয়ে এনে পরির নবনীত-তুল্য গালে রাখল।

করুণ গলায় পরি বলল, ও-রকম করবেন না প্লিজ!

নিজেকে সে সরিয়ে নিল একটু দূরে অতনুর হাতের সীমার বাইরে।

অতনু বলল, তোমার মুখে-চোখে একটা পবিত্রতার ভাব আছে। হয়তো আমার এ ধরনের ব্যবহার ঠিক নয়। তোমার সঙ্গে কথা বলতেও ভাল লাগে, ঠিক আছে, কিন্তু আমাকে যে একবার উঠতেই হবে।

কেন?

একবার বাথরুমে যাওয়া খুব দরকার।

আজ নয়। প্রেশারের যা অবস্থা, হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারেন, আমি বেডপ্যান দিচ্ছি।

না না। আজ আমি তোমাব কাছ থেকে বেডপ্যান নিতে পারব না। আমি যেতে পারব বাথরুমে।

আমি বেডপ্যান দিলে কী হয়েছে, আগেও তো দিয়েছি।

আজ আমার লজ্জা করছে। আমি আস্তে আস্তে হেঁটে যাব। মাথা ঘুরবে না।

চুপটি করে শুয়ে থাকুন। এতে লজ্জার কী আছে!

সে বেডপ্যানটা বের করে আনল। অতনুর গা থেকে কম্বল আর নিম্নাঙ্গের কাপড়টা সরিয়ে ফেলতেই দেখতে পেল এক উত্থিত, দৃঢ় দণ্ড। কয়েক মুহূর্ত মাত্র সে-দিকে তাকিয়ে রইল পরি, লজ্জারুণ হয়ে গেল মুখ।

তারপর দ্বিধা না করে বেডপ্যানটি যথাস্থানে স্থাপন করে সেই দণ্ডটি ছুঁল।

চোখ বন্ধ করে রইল অতনু।

কাজ হয়ে যাবার পর বেডপ্যানটি নিয়ে বেরিয়ে গেল পরি। আর ফিরে এল না।

রাত্তিরেও ঘরে এল না কেউ।

পরদিন সকালে এল অন্য মেয়েটি। সাবা দিনেও সে আর এ ঘরমুখো হল না। অতনু তার জন্য মনে মনে অপেক্ষা করছে বটে, কিন্তু আগের দিন সন্ধেবেলা ঠিক কী হয়েছিল, তা এর মধ্যেই অস্পষ্ট হয়ে গেছে তার স্মৃতিতে।

আজ আবার তার কথাবার্তা অসংলগ্ন।

ডাক্তার দেখতে এসে বললেন, আর একটা দিন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তার পরেই অতনুর ছুটি। প্রেশারটা স্টেডি না হলে তাকে ছেড়ে দেওয়ার ঝুঁকি আছে। ওষুধ বদলে দেওয়া হয়েছে, আশা করি এবার ঠিক হয়ে যাবে।

অতনু ভাবল, ছুটি? তার মানে কী? এরপর সে কোথায় যাবে? এই নরম বিছানায় শুয়ে থাকাটাই তার ছুটি নয়?

কলকাতার বাড়ি, নিজের স্ত্রী, সংসার, ব্যবসার কথা তার মনে পড়ছে না।

ওসমান সাহেব এলেন দেখা করতে।

অতনুর মনে হল, এই লোকটিকে কোথায় যেন আগে দেখেছে। মুখটা চেনা চেনা, নাম মনে পড়ছে না। কী একটা যেন বাড়ির কথা বলছে, তার বাড়ি?

রবিকে ঠিকই মনে আছে। সে রবিকে বলল, একটা সিগারেট খাওয়াতে পারিস না?

তার উত্তরে রবি বলল, এখানে এরা চিকিৎসার জন্য পয়সা নেয় না। কিন্তু কিছু ডোনেশান দেওয়া উচিত। তোর ব্যাগে হাজার পাঁচেক ছিল, আর পাঁচ হাজার আমি ওসমান সাহেবের কাছ থেকে ধার নিচ্ছি। ঠিক আছে?

ঘরে যখন কেউ নেই, সে আস্তে আস্তে নামল খাট থেকে।

বুকের বড় ব্যান্ডেজটা খুলে দিয়ে ছোটো করে ব্যান্ডেজ বেঁধেছে। শুধু স্লিং বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছে একটা হাত।

পা টিপে টিপে সে গেল বাথরুমের দিকে। মাথাটা টলটল করছে ঠিকই। দেয়াল ধরে ধরে গিয়ে সে সংলগ্ন বাথরুমের দরজা খুলল।

অন্যের সাহায্য ছাড়াই সে বাথরুম ব্যবহার করতে পারছে। এটাই তো সুস্থতার লক্ষণ। কিন্তু মাথাটা পরিষ্কার হচ্ছে না কিছুতেই। এখান থেকে বেরিয়ে সে কোথায় যাবে, কিছুতেই মনে করতে পারছে না। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এক জন আচমকা রিভলবার বার করে গুলি চালাল। এ-রকম সরাসরি গুলি খেয়ে কেউ বাঁচে? সে বেঁচে আছে। তারপর?

মাথাটা ঝাঁকিয়ে সে তারপরে কী হবে, সেটা বোঝার চেষ্টা করে।

নিজে নিজেই সে ফিরে এল বিছানায়।

দুপুরের খাবার নিয়ে আসে যে-মেয়েটি, সে পরি নয়, তার নাম অতনুর মনে নেই। এ মেয়েটিও মোটেই অসুন্দর নয়। কিন্তু একে দেখে অতনুর কোনও চিত্তবিকার হয় না।

সে খাবারের সঙ্গে নিয়ে এসেছে খবরের কাগজ। জিজ্ঞেস করল, আপনি কোনও বই-টই পড়বেন? আমাদের লাইব্রেরি আছে। এনে দিতে পারি।

ছোটবেলা থেকেই অতনু প্রচুর বই পড়ে। বাংলা ও ইংরেজি। কিন্তু কোন বই আনতে বলবে? এক জনও লেখকের নাম মনে নেই।

সে খবরের কাগজটার ওপর চাপড় মেরে ইঙ্গিতে জানাল, এটাই যথেষ্ট।

আজ তাকে ভাত, ডাল ও পনিরের তরকারি দেওয়া হয়েছে। সে নিজেই চামচে করে দিব্যি খেতে লাগল। মেয়েটি বলল, এই তো বেশ খিদে হয়েছে, এবার আপনি চাঙ্গা হয়ে উঠবেন। ছুটির সময় হেঁটেই নামতে পারবেন সিঁড়ি দিয়ে।

অতনু বলল, ছুটি? আমি যদি এখান থেকে আর না যাই?

মেয়েটি হেসে বলল, বা বেশ তো। থাকুন না। আমাদের বুঝি পছন্দ হয়েছে আপনার? থাকুন, আমাদের আশ্রমের কাজ করবেন। কিন্তু আপনার স্ত্রী কি রাজি হবেন?

আমার স্ত্রী?

শুনলাম তো আপনার স্ত্রী এখন জার্মানিতে আছেন। খবর পেয়ে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন। আপনি ভাল আছেন, তাই তাঁকে বারণ করা হয়েছে। আপনি তো বেশি কথাই বলতে চান না, কিন্তু রবিবাবু আমাদের সঙ্গে অনেক গল্প করেন।

অতনু নিজের ওপরেই বিরক্ত হয়ে উঠল। তার এক জন স্ত্রী আছে, অথচ তার মুখ মনে করতে পারছে না। সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে? না পাগলদের মনে কি এই প্রশ্ন জাগে?

খবরের কাগজ পড়তে তার একটুও মন লাগল না। সবই যেন অবান্তর।

তার চেয়ে ঘুম ভাল। অনেকক্ষণ ঘুমোবার পর সে জাগল ঘণ্টার আওয়াজে। আশ্রমের মন্দিরে আরতি হচ্ছে। সকাল ও সন্ধেবেলা দু'বার। অতনু কোনও দিন কোনও মন্দিরে আরতির সময় উপস্থিত থাকেনি। এখন বাধ্য হয়ে শুনতে হল ঘণ্টাধ্বনি ও বৃন্দগান। যাদের হৃদয়ে ভক্তিভাব নেই, তাদের মনে হয় ওই গানের সুর একঘেয়ে। প্রত্যেক দিন ওই একই গান শুনে দেবতাদেরও খুশি হওয়ার কথা নয়।

আরতি শেষ হবার পর এক জন সেবক এসে প্রত্যেক ঘরে প্রসাদ দিয়ে যায়। আতপচাল কলা দিয়ে মাখা, বাতাসা আর একটা নারকেল নাড়ু। অন্য দিন অতনু কিছুই খায় না। আজকে নারকেল নাড়ুটা মুখে দিল।

নাড়ুটাতে সে মা-মা গন্ধ পেল। মা প্রায়ই নাড়ু বানাতেন, অতনু ভালবাসত খুব। মাকে তার মনে পড়ল, মা যেন বহু দূরের মানুষ। মুখখানা ঝাপসা।

এক জন ঘরে ঢুকে বলল, অন্ধকার কেন, আলো জ্বালেনি?

আলো জ্বেলে দিল দীধিতি। তাকে দেখেই তার সম্পর্কে সব কিছু মনে পড়ে গেল অতনুর। আগের দিনের কথাও। দু'দিন ও আসেনি বলে তার মনে অভিমানও জমেছে।

সে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন?

তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অতনু বলল, তুমি যে আজ এলে বড়? তোমার তো আর আসার কথা নয়?

কেন, আসার কথা নয় কেন?

আগের দিন তুমি আমার কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে চলে গিয়েছিলে!

হ্যাঁ, কেউ আমাকে ডেকেছিল। আজ এলাম, আপনি তো চলে যাবেন দু-এক দিনের মধ্যে, আর যদি দেখা না হয়। তাই বিদায় নিতে এলাম। আশ্রমের কাজে আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়।

সত্যি কথা বলো তো পরি, সে-দিন তুমি আমার ব্যবহারে ভয় পেয়েছিলে?

একটু ভয় পেয়েছিলাম, তা সত্যি।

তবু আবার এলে?

কাল সারা দিন ভাবলাম, এই ভয় পাওয়াটা আমার দুর্বলতা। এটাকে জয় করতে না পারলে তো কোনও কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়।

কেমন ভয়কে জয় করেছ দেখি? কাছে এসো। তোমার হাতটা আমাকে ধরতে দাও।

খাটের কাছে এসে, ঠোঁট টিপে হেসে সে বলল, আপনি ধরবেন, না আমি আপনার হাত ধরব। আপনার পাল্‌স বিট চেক করব।

ও-সব এখন থাক। তোমাকে দেখে আমার বুক কাঁপছে। সম্পূর্ণ আশ্রমবিরোধী এক চিন্তা আমাকে পেয়ে বসেছে। তোমাকে এখন একটু আদর করলে কি তোমার ধর্মনাশ হবে? ধর্ম কি এত ঠুনকো!

আমার ধর্মনাশের কথা বাদ দিচ্ছি। কিন্তু ও-সব করে আপনার কী হবে?

আমার ডেফিনিটলি শারীরিক সুখ হবে। পৌরুষের তৃপ্তি হবে। আচ্ছা তুমি যে রোগীদের ঘরে অনেকক্ষণ একলা থাকো, এমনকী রাত্তিরেও থাকো, এর আগে অন্য কেউ তোমাকে ছুঁতে চায়নি? কেউ জোর করেনি?

অতনুর হাতের ও পর নিজের হাত রেখে পরি বলল, চেয়েছে, তার পরেই তারা হতাশ হয়েছে।

তার মানে? হতাশ হয়েছে কেন?

কারণ আমার শরীরটা যে ঠাণ্ডা বরফের মতো। আমি যে কামনা-বাসনা মুছে ফেলেছি একেবারে। এ শরীর আর মানুষের জন্য নয়। শুধু আমার আরাধ্য দেবাতার জন্য। আপনি মীরাবাইয়ের কথা শোনেননি? তাঁর সঙ্গে নিজের তুলনা করছি না। তিনি মহীয়সী, কিন্তু আমিও তাঁর পথেই চলেছি।

বাজে কথা বলো না। মীরাবাইয়ের কথা আমি জানি না। কিন্তু প্রত্যেক শরীরেরই একটা যৌবন ধর্ম থাকে। বায়োলজিক্যাল নিয়মেই সে শরীর জাগ্রত হয়। তোমরা সেটা যতই চাপা দেবার চেষ্টা করো, কিন্তু প্রকৃতি তো তার দাবি জানাবেই। প্রকৃতি চায় মিলন।

প্রকৃতিকেও অস্বীকার করা যায়। বিশ্বাস করুন, যায়। আমার গুরুমা কোনও দিন পুরুষসঙ্গ করেননি। অথচ ভাল পরিবারে ওঁর জন্ম। উনি তো পেরেছেন।

ওনার কি মেস্টুরেশান হত? তোমার হয়? এটাই তো প্রকৃতির ইঙ্গিত। তোমরা জোর করে সেটা আটকাবার চেষ্টা করলে, সেটা খুবই কৃত্রিম ব্যাপার। তার মধ্যে সত্যের গভীরতা কিছু নেই।

আপনি এমন কথা বলেন! আপনার মতো এমন একশো ভাগ নাস্তিক আমি আগে কখনও দেখিনি। আমাদের চেনাজানা বৃত্তের মধ্যে এমন মানুষ আসে না। বাপরে বাপ, কী তীব্রভাবে আপনি সব মূল্যবোধ অস্বীকার করেন! এক হিসেবে, আপনি অসাধারণ।

তার কারণ, তোমরা একটা ছোট বৃত্তের মধ্যে থাকো। নিজেদের গুটিয়ে রাখো। কতকগুলো আপ্তবাক্য মেনে চলো, যুক্তিবোধ দিয়ে বিচার করো না। আমি অসাধারণ কিছু নই, আমি সাধারণ মানুষ। শুধু আমি অন্য কারওর নির্দেশ ধার করি না, শুধু নিজের বিবেকের নির্দেশে চলি। আমি সামাজিক রীতিনীতি মানি না। তবে আমরাও নিজস্ব একটা নীতি আছে, এমনকী বলতে পারো, আমিও একটা ধর্ম মানি। তার নাম মানবধর্ম।

আমরা সবাই তো সেই মানবধর্মই মানি। হয়তো আমাদের পথ আলাদা।

না, তোমরা মানবধর্ম মানো না। মুক্ত চিন্তা ছাড়া মানবধর্ম হয় না। সে-ধর্ম মানতে গেলে শারীরিক সুখ, পার্থিব উপভোগ, এ-সব বাদ দেবার কোনও প্রশ্ন নেই। যেমন আমি মনে করি, এক জন নারী ও পুরুষের যদি পারস্পরিক সম্মতি থাকে, তাহলে তাদের মিলনও পবিত্র। আমি কোনও দিন কোনও মেয়ের ওপর জোর করিনি, করবও না। সেই জন্যই আমি তোমাকে এখন জিজ্ঞেস করছি, আমি তোমার হাতটা আমার হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ ঘষি, তাতে তোমার আপত্তি আছে?

তাতে কী হবে?

দেখতে চাই, তোমার হাতে উত্তাপ আসে কি না। এখন বেশ কিছুক্ষণ এ ঘরে আসবে না কেউ।

না, প্লিজ, ও-সবের দরকার নেই।

একটা সামান্য এক্সপেরিমেন্টে তোমার ভয়? তুমি বললে, তোমার শরীর হিমশীতল হয়ে গেছে। আমি মিলিয়ে দেখব, সেটা সত্যি কি না। তুমি ভয় পাবে কেন?

না, আমি ভয় পাই না।

পরির কুসুম-কোমল হাতখানিতে অতনু নিজের হাতটা ঘষতে লাগল। বেশিক্ষণ নয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই হাতে এল তাপ। এই তাপ লুকিয়েছিল তার শরীরেই, এখন আত্মপ্রকাশ না করে পারল না।

শুধু তাই-ই নয়, পরির দু-গালে লাগল রাঙা ছোপ, স্ফীত হল ওষ্ঠাধর। কপালে খুব সূক্ষ্ম ঘামের বিন্দু।

অতনু বলল, দেখেছ প্রকৃতির দাবি কত জোরালো?

ধরা গলায় পরি বলল, আমি এখন যাই।

অতনু ঘাড় হেলিয়ে বলল, হ্যাঁ যেতে পারো।

পরি এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

অতনু বলল, এখান থেকে বেরিয়েই কারওর সামনে যেয়ো না। কিছুক্ষণ একা থেকো। এখন তোমার মুখচোখ দেখলে যে-কেউ চমকে উঠবে, হয়তো ভাববে, কেউ তোমার ওপর অত্যাচার করেছে।

দৌড়ে আবার খাটের কাছে ফিরে এসে কান্নাভরা গলায় পরি বলল, এ আপনি আমার কী করলেন? আমার সারা শরীর কাঁপছে।

তার থুতনিটা তুলে ধরে অতনু বলল, আমি মাটির মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছি। এখন যে তোমাকে আরও কত সুন্দর দেখাচ্ছে, তা তুমি জানো না।

থুতনিটা ছেড়ে দিয়ে অতনু খাট থেকে নামার চেষ্টা করল।

পরি জিজ্ঞেস করলেন, ও কী করছেন? নামছেন কেন?

অতনু বলল, দরজার ছিটকিনিটা বন্ধ করে দিচ্ছি। আমাকে যখন তুমি পরিষ্কার-টরিষ্কার করে দাও, তখনও তো দরজা বন্ধই থাকে।

পাঁচ

কলকাতায় ফিরিয়ে আনার পরও অতনু পুরোপুরি সুস্থ হল না। ট্রেনে যখন রবি তাকে ফিরিয়ে আনে, তখন সে প্রায় অর্ধ-উন্মাদ। কিছুতেই আশ্রমের হাসপাতাল ছেড়ে আসতে চায় না। বার বার বলতে লাগল, আমি কোথায় যাচ্ছি? কলকাতায় আমার কে আছে?

নিজের বাড়িতে এসেও সে কোন দিকে সিঁড়ি, বাথরুমের দরজা ভুলে গেছে। চন্দনা তখনও ফেরেনি।

দো-তলা বাড়ি, এক পিসি আর পিসতুতো ভাই থাকে। পিসিই সংসার চালান। চন্দনা অতনুর ব্যবসার সক্রিয় অংশীদার, নিয়মিত অফিস করে, কাজের জন্য তাকে বাইরেও যেতে হয়। ব্যবসার মালিকানা তাদের দু'জনের সমান সমান। চন্দনার এক ভাই বসন্তকে ম্যানেজার করা হয়েছে, সে অবশ্য বেতনভোগী।

বুলেটের আঘাতজনিত ক্ষত অংশটা সেরে গেছে। কিন্তু মানসিক বিষয়টা সে কিছুতেই সামলাতে পারছে না। মাঝে মাঝেই সে দেখতে পায়, দরজার কাছে দাঁড়ানো একটা লম্বা লোক রিভলবার তাক করে সোজাসুজি গুলি করছে তাকে। সে মরে যাচ্ছে। এই ছবিটা দেখার পরই তার চিন্তার জগৎ লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। আবার দু-তিন দিন পর সে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, ঠিকঠাক কথা বলে।

চন্দনা ফেরার আগেই রবি অতনুকে নিয়ে গেল এক জন বিশিষ্ট মানসিক-রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে। তিনি অতনুকে পরীক্ষা করলেন তিন দিন ধরে। তারপর রায় দিলেন যে এটা একটা সাইকো সোমাটিক ব্যাপার, তার কোনও চিকিৎসা নেই। শুধু সময়ের অপেক্ষা। মাঝে মাঝে সে সুস্থ হয়ে ওঠে, সেটাই আশার লক্ষণ।

মহুলডেরার কথা একেবারেই ভুলে গেছে অতনু। সেখানকার বাড়িটার প্রসঙ্গ উঠলেই সে চোখ কুঁচকে থাকে। মহুলডেরা কী, কোথায়, কেন সেখানে বাড়ি কেনা হয়েছিল।

চেক সই করতে বললে, সে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। বার বার তাকে তার নামটা মনে করিয়ে দিতে হয়। দেখানো হয় তার আগেকার সই। তারপর অবশ্য সে ঠিকঠাক সই করে দেয়, তবে আগেকার মতো সে টাকা তোলার কারণটা খুঁটিয়ে জানতে চায় না।

চন্দনা এসে পৌঁছবে সামনের শনিবার। গিয়েছিল এক মাসের জন্য, বিয়েবাড়ি ছাড়াও সে ও-দিককার প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে অফিসের প্রচারের কিছু কাজ করে আসবে। অতনুকে গুলি করার ব্যাপারটা তাকে জানানো হয়নি, বলা হয়েছিল গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট, তা-ও মারাত্মক কিছু নয়।

চন্দনা সম্পর্কেও অতনুর স্মৃতি খুব দুর্বল, তা বুঝতে পেরে রবি চন্দনার অনেকগুলি ছবি দেখিয়ে দেখিয়ে নানা গল্প বলতে লাগল। ওদের বিয়ের সময় কত মজা হয়েছিল, বিয়েবাড়িতে শর্ট-সার্কিট, হঠাৎ অন্ধকার। তারপর একবার দল বেঁধে সবাই মিলে যাওয়া হয়েছিল কালিম্পং, অক্টোবর মাস, আচমকা এক দিন বরফ পড়তে শুরু করল। এ-রকম কখনও হয় না। অভাবনীয় সেই দৃশ্য, সব সাদা, তার কত ছবি রয়েছে অ্যালবামে। ঘোড়ায় চড়া অতনু আর চন্দনা পাশাপাশি।

চন্দনাকে এয়ারপোর্ট থেকে আনতে গেল রবি আর বসন্ত। অতনুকে আর সেখানে নেওয়া হল না।

বাড়িতে এসে চন্দনা যখন দেখল, অতনু শয্যাশায়ী নয়, গাড়ির শব্দ শুনে নেমে এসেছে নিচে, তাতেই সে আশ্বস্ত হল। এর আগে পর্যন্ত সে দুর্ঘটনার গভীরতাটা কতখানি, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি।

ঘণ্টা খানেক পর, চা-টা খেয়ে, শয়নকক্ষে এসে স্বামীর সঙ্গে নিভৃতে মুখোমুখি হয়ে সে জানাল তার নিজেরই একটা দুর্ঘটনার কথা।

এই দম্পতির এখনও সন্তান হয়নি। বিয়ে হয়েছে আট বছর। এর মধ্যে মিসক্যারেজ হয়ে গেছে দু'বার। এবারে বার্লিন যাত্রার সময়ও চন্দনা গর্ভবতী ছিল চার মাসের, দু'জন ডাক্তার ভরসা দিয়েছিলেন, এবারে গণ্ডগোলের কোনও সম্ভাবনাই নেই। দুই ডাক্তারই বলেছিলেন, তার বিদেশে ঘুরে আসারও কোনও বাধা নেই। এ-রকম অনেকেই যায়।

তবু এবারেও গর্ভপাত হয়ে গেল ওখানে থাকার সময়েই।

বলতে বলতে কান্না এসে গেল চন্দনার। অতনুর হাত জড়িয়ে ধরে সে বলল, তোমাকে ওখান থেকে এ খবর জানাইনি। একেই তো তুমি নিজে অসুস্থ, এটা শুনলে আঘাত পাবে. .আমাদের কী হল বলো তো? এরপর কি আর কখনও...

অতনুর আঘাত পাবার কথা, কিন্তু তার মুখ ভাবলেশহীন। অবশ্য শোকে-দুঃখে তো মানুষ পাথরও হয়ে যায়। নীরবে বসে থাকে।

অতনুর কোলে মুখ গুঁজে চন্দনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, অতনু হাত বুলিয়ে দিল তার মাথায়।

জার্মানিতে রক্তক্ষরণের পর চন্দনাকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল মাত্র দু'দিন। তারপর স্বাভাবিক ভাবে ঘোরাফেরা করেছে। কিন্তু ফিরে এসে বেশ দুর্বল হয়ে পড়ল, নিজেই সে শয্যাশায়ী রইল চার দিন।

অতনুর ব্যবহার যে স্বাভাবিক নয়, তা বুঝতে চন্দনার এক দিনও সময় লাগেনি। সে চলাফেরা করতে পারে, ঠিকমতো খায়-দায়, অথচ বাড়ি থেকে বেরোয় না। অফিসেও যায় না। সারা দিনই প্রায় চুপ করে থাকে।

দু'জনেই অফিসে না গেলে ব্যবসা চলবে কী করে? ট্রাভেল এজেন্সির ব্যবসায় যেমন প্রতিযোগিতা, তেমনি একটি দিনের জন্যও রাশ আলগা করা যায় না। একটু সুযোগ পেলেই অন্য কোম্পানি তাদের ক্লায়েন্ট ভাঙিয়ে নেবে।

চার দিনের মধ্যে জেট ল্যাগ ও বিষাদ কাটিয়ে উঠে নিজেকে তৈরি করে নিল চন্দনা।

পঞ্চম দিন সকালে উঠেই সে অতনুকে জিজ্ঞেস করল, তুমি আমার সঙ্গে আজ অফিস যাবে?

অতনু মাথা নেড়ে বলল, না। আমার জ্বর হয়েছে।

চন্দনা কাছে এসে তার কপালে হাত দিয়ে দেখল, কোনও তাপ নেই।

সে বলল, আচ্ছা, ঠিক আছে। একটা অ্যাসপিরিন খেয়ে নিয়ো!

সে-দিন সে যথাসময়ে অফিসে গিয়ে ফিরল সাতটার পর।

দো-তলার বারান্দায় আলো না জ্বেলে একটা ইজি চেয়ারে চুপ করে বসে আছে অতনু। শীত পড়ে গেছে, তবু গায়ের চাদরটা লুটোচ্ছে মাটিতে।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তার মুখোমুখি বসে পড়ে চন্দনা জিজ্ঞেস করল, তোমার গাড়ির অ্যাকসিডেন্টের গল্পটা বানানো, তাই না?

অতনু আলগা ভাবে বলল, গাড়ির অ্যাকসিডেন্ট?

চন্দনা বলল, তোমাকে উগ্রপন্থীরা গুলি করেছিল?

অতনু এবার বেশ খানিকটা গলা চড়িয়ে বলল, হ্যাঁ, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে লম্বামতো এক জন আমাকে সোজাসুজি গুলি করেছে। আমি মরে গিয়েছিলাম, আবার বেঁচে উঠেছি।

চন্দনার গায়েই যেন গুলি লেগেছে, এইভাবেই সে বলল, ও, ও, কী সাংঘাতিক ব্যাপার! তোমার ওই বন্ধুটা, রবি, গাদা গাদা মিথ্যে কথা বলে। আমাকে কিছু জানায়নি। আমি ভেবেছিলাম, গাড়ির অ্যাকসিডেন্টে তোমার মাথায় চোট লেগেছিল। তাই এ-রকম হয়েছে। এ তো আরও সিরিয়াস! কোথায় গুলি লেগেছিল? স্পাইনাল কর্ডে?

না। বুকে।

বুকে? ও মা, এখনও ব্যথা আছে?

ব্যথা আছে।

পরদিনই চন্দনা দু'জন স্পেশালিস্ট ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ফেলল। সে বিয়ের আগে থেকেই স্বাবলম্বিনী ধরনের নারী। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও অতনু ছিল বুদ্ধিজীবী, সে যতটা বাক্যবাগীশ, অতটা কার্যে উদ্যোগী নয়। চন্দনা একা সব কাজের ভার নিতে পারে, নিজেই যে কোনও ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। অনেক খরচ করে ডাক্তার দেখিয়েও উপকার হল না বিশেষ কিছুই। তবু এই ধরনের পরিবারে চিকিৎসার জন্য টাকা খরচ করা একটা বড় ব্যাপার। আত্মীয়-বন্ধুরা বুঝবে যে, অবহেলা করা হয়নি।

চন্দনা এক দিন বলল, আমার একটা কথা শুনবে, অতনু?

বলো।

তুমি আমার সঙ্গে এক দিন বেলুড় মঠে যাবে? ওষুধপত্রে অনেক সময় কাজ হয় না। কিন্তু উচ্চমার্গের সাধকদের আশীর্বাদ পেলে অনেক সময় কাজ হয়। এটাকে ফেইথ হিলিং বলো কিংবা যা-ই বলো, কিন্তু কাজ হয়। সত্যি হয়, আমি দু-এক জনের ব্যাপার জানি। মাধবানন্দ মহারাজের সঙ্গে আমার চেনা আছে।

অতনু বলল, ফেইথ হিলিং! যার ফেইথ নেই? মঠ, মন্দির, আশ্রম, না না, ওই সব জায়গায় যেতে আমার ভয় হয়।

ভয় হয়? কেন, ভয় হবে কেন?

যদি আমি গেলে ওই সব জায়গা অপবিত্র হয়ে যায়? আমি একটা খারাপ লোক। চন্দনা, ও-সব জায়গায় আমার মতো মানুষদের যেতে নেই।

চন্দনা হেসে বলল, তুমি খারাপ লোক হবে কেন? আজ তো তুমি বেশ ভালই কথা বলছ। তোমাকে গুলি করার পর তো মহুলডেরার একটা আশ্রমের হাসপাতালেই তোমার চিকিৎসা হয়েছে।

কী জানি। মনে নেই। একটা হাসপাতাল ছিল নিশ্চয়ই।

আমাদের অফিসের সবাই জানে, শুধু আমিই জানতাম না। ওই রবি আমাকে কিছু বলে না।

রবি কোথায়? সে আর আসে না কেন?

কী জানি! যা বাউণ্ডুলে স্বভাব! কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে! লক্ষ্মীটি, আমার সঙ্গে একবার চলো বেলুড় মঠে। তোমাকে কিছু করতে হবে না, তুমি চুপ করে বসে থাকবে।

না।

ঠিক আছে, আমি একলাই যাব। তোমার হয়ে আমি আশীর্বাদ নিয়ে আসব। শোনো, আর একটা কথা। মহুলডেরার বাড়িটা নিয়ে কী করা যায় বলো তো? শুধু শুধু বাড়িটা পড়ে থাকবে?

বাড়ি? বিশ্বাস করো, সে-বাড়ির কথা আমার একেবারেই মনে নেই।

অথচ সেই বাড়িতেই তোমাকে গুলি করা হয়েছিল। আশ্চর্য! মনে পড়বে, ঠিক আস্তে আস্তে মনে পড়বে। ডক্টর দেব বলেছেন। ছ'মাস, এক বছরও লাগতে পারে। আজকে ট্রেড উইন্ডের মালহোত্রা আমাকে কী বললেন জানো? বললেন, মিসেস হালদার, আপনাদের মাথা খারাপ হয়েছে? ওই রকম জায়গায় অতগুলো টাকা ইনভেস্ট করতে গেছেন। বিহার-বাংলা বর্ডারে উগ্রপন্থীদের হানা দিন দিন বাড়ছে। ওখানে গেস্টহাউস বানালে এখন কে যাবে? লোকে গাড়ি নিয়ে ওই সব জায়গা দিয়ে পাস করতেই ভয় পায়। এখন একমাত্র ভরসা সাউথ বেঙ্গল। মোটামুটি পিসফুল। আমি বললাম, কিন্তু সাউথ বেঙ্গলে তো পাহাড় নেই, বাঙালিরা পাহাড় ভালবাসে। উনি বললেন, পাহাড় নেই, কিন্তু সুন্দরবন আছে, সমুদ্র আছে। এমনকী শান্তিনিকেতনেও একটা কিছু করা যায়। ওখানে এখন অনেক লোক যাচ্ছে। সত্যি, মহুলডেরায় আমাদের সাড়ে চার লাখ টাকা ইনভেস্টমেন্ট কি জলে যাবে? এতগুলো টাকা, সামলাব কী করে?

এতগুলো কথা বোধহয় মন দিয়ে শুনলই না অতনু। সে বলল, ডাক্তাররা আমাকে ড্রিঙ্ক করতে বারণ করেছেন। তা কি মানতেই হবে? বাড়িতে কিছু রাখোনি?

চন্দনা বলল, অন্তত ছ'মাস বন্ধ। অ্যালকোহলে উলটো এফেক্ট হতে পারে। বাড়িতে কিছু রাখিনি, দেখছ না, আমিও কিছু খাচ্ছি না।

চন্দনা মাঝে মাঝে অতনুকে সঙ্গ দেবার জন্য ভদকা কিংবা বিয়ার খেয়েছে প্রায় নিয়মিতই। এখন সে-ও সংযম দেখাচ্ছে।

টানা আড়াই মাস অতনুর সেবা-যত্ন এবং মানসিক পরিচর্যা করার পর ধৈর্য হারিয়ে ফেলল চন্দনা।

এক জন মানসিক রোগীর সঙ্গে ঘর করা খুবই শক্ত। একটা মানুষ মাঝে মাঝে দু-তিন ঘণ্টা বেশ ভাল ও স্বাভাবিক থাকে, আবার হঠাৎ হঠাৎ এ-রকম দিনের পর দিন সহ্য করা যায় না। এক সময় মনে হয়, পুরোটাই বুঝি অতনুর ভান কিংবা অভিনয়। দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা।

এখন তো আবার সে অনেক বই-টই পড়ছে। পাগলরা কি বই পড়ে? পড়লেও বোঝে?

সংসার আর অফিস, দুটোই সামলাবে চন্দনা? সে আর পারছে না। শুরু হয়ে গেল খিটিমিটি।

সে এখন জোর করে অতনুকে অফিসে নিয়ে যায়।

দক্ষিণ পার্ক স্ট্রিটে অফিস। মোটামুটি বড়ই, তেইশ জন কর্মচারী। স্বামী ও স্ত্রীর আলাদা চেম্বার। অতনু এত দিন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও প্ল্যানিং দেখেছে। বাকি পড়ে গেছে অনেক কাজ। কিন্তু অদ্ভুত এক ক্লান্তি পেয়ে বসেছে অতনুকে। সে শুধু বসে বসে সিগারেট টানে, আর চুপ করে চেয়ে থাকে সামনের দিকে।

মাঝে মাঝে তার মনোজগতে বিরাট তোলপাড় চলে। কী যেন একটা চাপা পড়ে যাচ্ছে ভেতরে, কিছুতেই উপরের দিকে আসছে না। সে তার চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকুনি দেয়।

আগে অন্য সব কর্মচারীর সঙ্গে তার ব্যবহার ছিল বন্ধুর মতো। যে কেউ যখন তখন আসত তার চেম্বারে। এখন তারা কী যেন বুঝে গেছে, না ডাকলে আসে না কেউ। একমাত্র তার শ্যালক এবং ম্যানেজার বসন্ত ছাড়া। বসন্ত কী সব তাকে বোঝায়, সে হাঁ-হাঁ করে বলে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি যা ভাল বোঝো, করো।

বাড়িতে এখন প্রত্যেক দিন ঝগড়া হয় চন্দনার সঙ্গে। অনেকটা একতরফা, চন্দনাই বেশি অভিযোগ করে, সে একটা-আধটা উত্তর দেয়। চন্দনার অভিযোগের তালিকা সুদীর্ঘ। আসল কারণ কিন্তু একটাই, দাম্পত্যের মূল সম্পর্ক। একই শয্যায় দু'জনে রাত্রিবাস করে বটে, কিন্তু শরীর বিচ্ছিন্নই থাকে। অতনুর দিক থেকে কোনও সাড়া নেই।

তিন-তিনবার গর্ভ নষ্ট হয়ে গেছে চন্দনার, কিন্তু সন্তান কামনায় একটা চাপা কান্না রয়ে গেছে তার বুকের মধ্যে। সেই কান্না কখনও-কখনও আর্তনাদ হয়ে ওঠে।

তিনবার এ-রকম হবার পরেও কি আর সন্তান-সম্ভাবনা থাকে! কারওর কি দোষ আছে! এক সঙ্গে গিয়ে ডাক্তারের পরামর্শও নেয়া হয়েছে, কারওরই কোনও খুঁত নেই। এবং আবার সন্তান-সম্ভাবনা তো হতেই পারে!

তবু চন্দনার ধারণা, দোষটা অতনুর। শুধু তো জৈবিক ব্যাপার নয়। একটা ইচ্ছাশক্তি থাকা দরকার। অতনুর যে সেটাই নেই। সন্তান না হওয়াটাও যেন সাধারণ ব্যাপার। আর এখন তো শরীরও জাগে না।

এক দিন চন্দনাই জিজ্ঞেস করল, তোমার আর ইচ্ছে করে না?

অতনু বলল, হ্যাঁ, ইচ্ছে করে।

তারপর সে যা করল, তা একেবারে হাস্যকর।

সে চন্দনাকে জোরে আঁকড়ে ধরল। তারপর সেইভাবেই নিস্পন্দ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। চন্দনা গায়ে একটা খোঁচা মেরে জিজ্ঞেস করল, এই, কী হল? হু-হু করে কেঁদে ফেলল অতনু।

এই কান্নায় সহানুভূতি হয় না, মায়া হয় না, রাগ হয়। বিছানা ছেড়ে উঠে গেল চন্দনা। পরদিন থেকে সে অন্য ঘরে শোয়।

ঠিক দু'মাস পরে, এক ছুটির দিনে চা-টা খাবার পর চন্দনা বলল, শোনো, তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে। আজ মাথার ঠিক আছে তো? যা যা বলব, বুঝতে পারবে?

অতনু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

চন্দনা বলল, সামনের সপ্তাহে আমি আবার জার্মানি চলে যাচ্ছি।

জার্মানি? কেন?

ওখানে আমি একটা চাকরি পেয়েছি। আমি আর এ-দেশে থাকব না, আমাদের কোম্পানিটা তো ডুবতে বসেছে, এটাকেও আর সামলানোর ক্ষমতা আমার নেই। আমার শেয়ারটা আমি বিক্রি করে

দিতে চাই। এখনই দিচ্ছি না, পরে সেই রকমই একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি চেষ্টা করে দেখো, যদি চালাতে পারো।

অতনু আলতো গলায় বলল, তুমি চলে যাবে?

চন্দনা বলল, হ্যাঁ। আমার এখানে অসহ্য লাগছে। আমি হাঁপিয়ে উঠছি। তুমি বিশ্বাস করো, অতনু। আমি অ্যাডজাস্ট করার অনেক চেষ্টা করেছি। এখন বুঝেছি, তা আর সম্ভব নয়। নাউ আই অ্যাম ফেড আপ। আমাদের কনজুগাল লাইফ শেষ হয়ে গেছে।

অতনু বলল, আমি জানি না, কেন আমি একটা জলে আধডোবা জাহাজের মতো, কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না। গুলিতেই আমার পুরোপুরি মরে যাওয়া উচিত ছিল।

চন্দনা বলল, আমি তোমাকে একটা সাজেশন দেব, অতনু কোম্পানি তুমি বিক্রি করে দাও, আমার শেয়ারের টাকাটা তুমি পরে দিয়ে দিয়ো। আপাতত তুমি কোনও একটা নার্সিংহোমে গিয়ে থাকো। যত দিন না তুমি পুরোপুরি সুস্থ হও। এখানে কে তোমার যত্ন করবে?

অতনু বলল, বিক্রি? দেখি।

চন্দনা চলে যাবার পর সত্যিকারের বিপদে পড়ে গেল অতনু।

একটা লোকসানে চলা কোম্পানি বিক্রি করতে চাইলেই তো হুট করে বিক্রি হয় না। একটা অফিস ইচ্ছে করলে হঠাৎ বন্ধ করা যায় না। আরও লোকসান দিয়েও চালিয়ে যেতে হয়। এতগুলো কর্মচারীকেও বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়া যায় না।

অতীত স্মৃতি ফিরে না এলেও বর্তমান সম্পর্কে অনেকটা সজাগ হয়ে গেল অতনু। সে সচ্ছল পরিবারের সন্তান, কখনও টাকা-পয়সার অভাব বোধ করেনি। ব্যবসাটাও এক সময় বেশ ভালই দাঁড় করিয়েছিল। এখন প্রতি দিন অর্থচিন্তা। পেটের ভাতে টান পড়লে পাগলামিও ঘুচে যায়।

এর মধ্যে এক দিন রবি এসে উপস্থিত। আর্ত মানুষের মতো তাকে প্রায় আঁকড়ে ধরল অতনু। তার আর বিশেষ কোনও বন্ধু নেই, যে দু-এক জন ছিল, তারাও দূরে গেছে।

আহত অভিমানে অতনু জিজ্ঞেস করল, তুই কোথায় ছিলি এত দিন? এই অবস্থায় আমাকে ফেলে চলে গেলি?

সরাসরি উত্তর না দিয়ে রবি বলল, এই ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম উত্তর ভারতে। দেশের অবস্থা বোঝার জন্য। আমার উপর দেশ চালানোর ভার নেই। তবু জানতে ইচ্ছে করে।

আসলে, রবি জানে, চন্দনা তাকে একেবারেই পছন্দ করে না। চন্দনার ধারণা, রবির প্রভাবে, রবির দেওয়া বই-টই পড়েই অতনু এমন গোঁয়ার ধরনের নাস্তিক হয়েছে। কাজের বদলে তর্কাতর্কিতেই বেশি সময় নষ্ট করে।

চন্দনার এ-রকম মনোভাবের জন্যই রবি দূরে সরে গেছে, তবে মোটামুটি সব খবরই সে রেখেছে।

অতনু বলল, রবি, আমি এই কোম্পানিটা চালাতে পারছি না। তুই আমাকে সাহায্য করবি না? তুই একটা কিছুর ভার নে।

রবি বলল, আমি তো ভাই কোনও দায়িত্ব নিয়ে আটকা পড়তে পারব না। তা আমার ধাতে নেই। তবে, বাইরের বিজনেস মহলে যা শুনছি, তোর ওই শ্যালকটি, বসন্ত, সে-ই নাকি তলায় তলায় কোম্পানিটাকে ফাঁক করে দিচ্ছে। এখন চন্দনা নেই, তুই ওকে স্যাক কর।

অতনু বলল, বসন্ত? সে ম্যানেজার। হঠাৎ এক কথায় কি তাকে তাড়িয়ে দেওয়া যায়?

তাহলে প্রত্যেক দিন ওকে ডেকে কাজের ফিরিস্তি নে। ব্যাঙ্কে ওভারড্রাফ্ট দিয়েছে। তার জবাবদিহি চা। তোকে শক্ত হতে হবে অতনু। আমি একটা ব্যাপার দেখে অবাক হচ্ছি, গুলি লাগবার পর যখন

তুই হাসপাতালটায় ছিলি, তখন তোর বুকে অত বড় ব্যান্ডেজ, তবু তোর কথাবার্তায় যথেষ্ট তেজ ছিল। মাঝে মাঝে খানিকটা অসংলগ্ন হলেও জোর দিয়ে, যুক্তি দিয়ে বলতিস। কিন্তু কলকাতা আসার পর থেকেই তুই কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছিস, আরও বেশি করে সব কিছু ভুলে যাচ্ছিস, এমন হচ্ছে কেন?

কী জানি। সব সময় মাথাটা অবশ অবশ লাগে।

ওষুধগুলো যে খাচ্ছিস, তার জন্য হতে পারে। এই সব বেশির ভাগ ওষুধই মাথাটাকে ঝিম পাড়িয়ে রাখে। সব ওষুধ কিছু দিন বন্ধ করে দিয়ে দেখ তো। সাইকো সেমাটিক প্রবলেম নিজের মনের জোরে সারাতে হয়। অফিসের ব্যাপারটা খানিকটা সামলে নে, তারপর তোকে আমি একবার মহুলডেরায় নিয়ে যাব। তাতে কিছু উপকার হতে পারে। হ্যাঁ, ভাল কথা, সেখানকার বাড়িটার কথা এখন মনে পড়েছে তো?

রবি, তুই বলেছিস, চন্দনাও বলেছে, ওখানে একটা বাড়ি কেনা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বাস কর, সে-বাড়িটার কথা বিন্দুবিসর্গ মনে পড়ে না। আমি শুধু দেখতে পাই একটা দরজা, সেখানে তিন জন লোক, তাদের এক জনের হাতে রিভলবার...।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। বাড়িটা কেনা হয়েছে এই কোম্পানির নামে। অফিসের কাগজপত্রেই দেখতে পাবি। আমি এর মধ্যে মহুলডেরায় একবার গিয়েছিলাম।

কেন?

এমনিই, কৌতূহল। বাড়িটা তালাবন্ধ পড়ে আছে। উগ্রপন্থীরা দখল নিতে পারেনি, ওখানে পুলিশের আনাগোনা বেড়েছে। ওসমান সাহেবও বলেছেন, নজর রাখছেন। কিন্তু বাড়িটা নিয়ে এখন কী হবে? বিক্রির কোনও চান্স নেই। ওসমান সাহেবও ন্যাচারালি ফিরিয়ে নেবেন না, টাকাটা তিনি অন্য জায়গায় অলরেডি ইনভেস্ট করে ফেলেছেন। আমাকে খুব খাতির-যত্ন করলেন অবশ্য। যাই হোক, এ বাড়ির এখন কোনও রি-সেল ভ্যালু নেই। একটা মাত্র উপায় আছে, সেই কথাটাই তোকে বলতে এলাম।

কী?

ওই অঞ্চলে সেন্ট্রাল পুলিশের একটা বড় ফাঁড়ি হবে শুনেছি। তাদের কাছে বাড়িটা ভাড়া দিতে পারিস। তাতে মাসে মাসে তোদের ভাল আয় হবে।

ঠিক তো, ঠিক তো।

ও-রকম ঠিক তো, ঠিক তো বললেই হবে না। এখন সব ব্যাপারে উমেদারি করতে হয়। ওদের অফিসে গিয়ে ধরাধরি করতে হবে। যদি টেন্ডার ডাকে, দু-একখানা ফলস্ টেন্ডার দিবি। এবং শুভস্য শীঘ্রম।

কে করবে এ-সব?

আশ্চর্য ব্যাপার। তোর অফিসে অতগুলো লোক থাকে কী করতে? ওদের বললেই বুঝবে।

রবি, তুই আমার পাশে এসে রোজ একটু বসবি?

না, রোজ বসব না। মাঝে মাঝে আসতে পারি। কিন্তু তোকে আর ম্যাদা মেরে থাকলে চলবে না। উত্তিষ্ঠিত, জাগ্রত, ইয়ং ম্যান। যুদ্ধক্ষেত্রে গুলি খেয়েও অনেকে স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকে।

এর দু'দিন পরে যে-ঘটনাটি ঘটল, সে-দিন রবি আসেনি।

সে-দিন অতনুর মেজাজ খুবই খারাপ।

নিজের চেম্বারেই মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে অতনু। একটু আগে বসন্ত এসে বলে গেছে, বাইরের থেকে অনেক টাকা জোগাড় করতে না পারলে এ মাসে কর্মচারীদের মাইনে দেওয়া যাবে না। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট শূন্য।

এ নিয়ে বসন্তর সঙ্গে খানিকটা রাগারাগিও হয়ে গেছে।

রাগের সময় সমস্ত অনুভূতি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। সে ভাবছে, নিজের বসতবাড়িটাই বেচে দেবে।

এই সময় নিচ থেকে রিসেপশনিস্ট জানাল, এক জন মহিলা তার সঙ্গে দেখা করতে চান।

অতনুর আগের অভ্যেস ছিল, কেউ দেখা করতে চাইলে সে ফেরাত না। তবু জিজ্ঞেস করল, আমার নাম করেই দেখা করতে চান, অথবা কোনও কাজে? যদি কাজের জন্য হয়, সেই ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দাও।

না, তিনি অতনুর সঙ্গেই দেখা করতে চান, ব্যক্তিগত ভাবে।

একটু পরেই সুইং ডোর ঠেলে ঢুকলেন এক জন মহিলা, সালোয়ার কামিজ পরা, চুল খোলা, রঙ ফরসা হলেও চোখের নিচে কালো দাগ, শরীরের গড়নও খানিকটা বেঢপ ধরনের। অতনু একে আগে কখনও দেখেনি।

অতনু মুখ তুলে তাকাল, মহিলাটি একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। তারপর নিচু গলায় বলল, তুমি কেমন আছ?

প্রশ্নটা অতনুর কাছে ধাক্কা দিল। তুমি?

সেই নিস্পৃহ গলায় বলল, আই থিংক উই আর নট প্রপারলি ইনট্রোডিউসড। আমার নাম অতনু হালদার। আপনি?

সে বলল, চিনতে পারছ না! পোশাক অন্য রকম। আমি দীধিতি।

অতনু বলল, ডিডিটি? হোয়াট কাইন্ড অফ আ নেইম ইজ দিস? আগে কখনও শুনিনি।

আমি এত দিন যোগাযোগ করিনি তোমার সঙ্গে, ভেবেছিলাম, তুমিই আসবে। আমি আর আশ্রমে থাকি না। শুধু তোমাকে একবার দেখতে এসেছি।

আমি তো এ-সব কিছুই বুঝতে পারছি না। আশ্রম? আমার সঙ্গে কোনও আশ্রমের সম্পর্ক নেই? আপনি কী চান আমার কাছে?

আমি কিছুই চাইতে আসিনি। তুমি কি আমাকে সত্যিই চিনতে পারছ না, না ইচ্ছে করে চিনতে চাইছ না?

এবার অতনু দপ করে জ্বলে উঠল। এই সময় তার ভাষার ঠিক থাকে না।

সে বলল, ইচ্ছে করে চিনতে চাইব না মানে? বাজার থেকে যে-কোনও মেয়ে এসে আমার সঙ্গে তুমি তুমি করে কথা বললেই তাকে চিনতে হবে? আমি আজ খুবই ব্যস্ত আছি, যদি সত্যি কোনও দরকার না থাকে, প্লিজ।

না, কোনও দরকার নেই।

ভেতরে এসে একবার বসেওনি, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেল দীধিতি।

ছয়

একটা অন্ধকার ঘরের দরজা-জানালা হঠাৎ খুলে গেল, বাইরে থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিশুদ্ধ আলো। অনেকটা সেই রকম হল অতনুর।

অবশ্য একেবারে হঠাৎ হয়নি।

অফিসের অবস্থাটা সামলে নেবার পর রবিই তাকে নিয়ে গেল ব্যাঙ্গালোরে। সেখানে নতুন ধরনের চিকিৎসার কথা শোনা যাচ্ছিল কিছু দিন ধরে। অ্যাসপিরিনের মতো সামান্য একটা ওষুধকে ভিত্তি করে নতুন একটা ওষুধ বেরিয়েছে, সেই ওষুধেই আশ্চর্য কাজ হল অতনুর। চোদ্দো দিনের

মধ্যে সে পরিপূর্ণ স্মৃতি ফিরে পেল। ডাক্তারের সামনে সে গড় গড় করে মুখস্থ বলল টি.এস.এলিয়টের একটি সম্পূর্ণ কবিতা। ধাঁধার উত্তরের মতন সে টকাটক বলে দিতে লাগল, ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতির নাম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোন দেশ সবচেয়ে শেষে আত্মসমর্পণ করে। রামধনুর সাতটা রঙ, তার বাবার মৃত্যুর তারিখ, শিল্পী হুসেনের পুরো নাম। এ সেই আগেকার বুদ্ধিদীপ্ত, সপ্রতিভ অতনু।

ফেরার পথে ট্রেনে অতনু বলল, প্রথমেই যেতে হবে মহুলডেরায়, দীধিতির সঙ্গে দেখা করতে হবে, আমি তার কাছে খুবই অপরাধী।

রবি বলল, সে তোর কাছে একবার এসেছিল, তুই তাকে অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছিস।

হ্যাঁ। তা-ও মনে পড়েছে। কিন্তু তখন আমার মাথা তো দুর্বল ছিলই, তা ছাড়া ওর সাজপোশাক অন্য রকম। তা ছাড়া সেই রূপও ছিল না। ঠিক চিনতে পারিনি।

খুব বেশি মানসিক যন্ত্রণা হলে রূপের উপর তো তার ছায়া পড়বেই।

কিন্তু অত তাড়াতাড়ি, মাত্র কয়েক মাসে তার ফিগারটাও নষ্ট হয়ে যাবে?

তোর কাছে যখন সে এসেছিল, তখন সে সাত মাসের প্রেগন্যান্ট। সেই সময় কোনও মেয়ের ফিগার ঠিক থাকে?

প্রেগন্যাণ্ট? যাঃ তুই কী বলছিস! তুই কী করে জানলি?

আমার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তোর সঙ্গে যে-দিন দেখা করতে আসে, সে-দিন আমাকে জানালে আমি উপস্থিত থাকতে পারতাম। তাহলে হয়তো ব্যাপারটা অন্য রকম হত।

জানাযনি কেন?

বোধহয় ও আমার সাহায্য নিতে চায়নি। আমি তোর অসুস্থতার কথা ওকে জানিয়েছি আগে। ও ঠিক বিশ্বাস করেনি। ও নিজের চোখে দেখতে চেয়েছিল। তোকে দেখে তো কিছু বোঝা যেত না।

অতনু বিহ্বল ভাবে বলল, প্রেগন্যান্ট? কী করে হল?

রবি বলল, সেটা তুই-ই ভালো জানিস!

অতনু জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না।

রবি বলল, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নই নেই। এটা একটা বাস্তব ঘটনা। ওর একটি মেয়ে আছে।

অতনু কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল বাইরে। এখানকার প্রকৃতি বাংলার মতো সজল নয়। রুক্ষ, পাহাড়ি।

এটা একটা ফার্স্ট ক্লাস কুপ, শুধু দু'জনের জন্য। দরজা বন্ধ করে এখানে মদ্যপানে কোনও বাধা নেই। রবি সব ব্যবস্থা করে এনেছে।

দু'টি গেলাসে ঢালার পর রবি বলল, নে। তুই এখন চন্দনার সঙ্গেও মিটিয়ে নিতে পারিস। ওর কাছে ক্ষমা-টমা চেয়ে নে। কিছু দিন জার্মানিতে ঘুরেও আসতে পারিস।

অতনু শিশুর মতো সরল ভাবে জিজ্ঞেস করল, চন্দনার কাছে আমি কী অপরাধ করেছি?

কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই। স্বামী-স্ত্রীর ভেতরকার ব্যাপার তো, বাইরের লোক সব জানতে পারে না।

আমাকে অসুস্থ জেনেও চন্দনা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আমার অসুস্থতাটাই ও সহ্য করতে পারছিল না। রোগের জন্য কি রোগীরা দোষী হয়?

তোর রোগটা ছিল বড় পিকুলিয়ার ধরনের। বাইরের থেকে বোঝা শক্ত ছিল। দীধিতিও এই ধারণা নিয়ে গেছে যে, তুই তাকে ইচ্ছে করে চিনতে চাসনি।

চন্দনার কাছে ক্ষমা চাইবার কিছু নেই। কিন্তু দীধিতির কাছে...আমার কোনও খারাপ মতলব ছিল না, ব্যাপারটা হয়ে গেল, আমি আগে থেকে কিছু ভাবিনি, কিন্তু, ওর বাচ্চাটা বেঁচে আছে?

হ্যাঁ। বেঁচে আছে। আমি যত দূর জানি।

আশ্রমে ওর নিশ্চয়ই খুব অসুবিধে হয়েছে?

ও তো আর ওই আশ্রমে নেই।

নেই? কোথায় গেছে?

আশ্রমকন্যা হয়ে একটি অবৈধ সন্তানের মা হয়েও কি আর সেখানে থাকা যায়? কখনও-কখনও এ-রকম ঘটে বটে। তখন গোপনে গোপনে বাচ্চাটাকে নষ্ট করে ফেলতে হয়।

অতনু চিৎকার করে বলে উঠল, না!

সে এখন ক্রুদ্ধভাবে রবির দিকে চেয়ে রইল, যেন এ-সব কথা উচ্চারণ করার জন্য সে রবিকেই শাস্তি দেবে।

খানিক বাদে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে সে শান্তভাবে বলল, ওই আশ্রমে নেই, তাহলে কোথায় থাকে এখন?

জানি না।

জানিস না? তুই জানিস না? কেন জানিস না?

কী মুশকিল, তোর অফিস থেকে ফিরে সে তো আর আমার সঙ্গে দেখা করেনি। শুধু ফোন করেছিল। কোনও অভিযোগ করেনি, কিছু না। শুধু বলেছিল, আপনারা ভাল থাকবেন। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করারও সুযোগ দেয়নি।

তবু কলকাতার ফেরার এক সপ্তাহ পরেই দুই বন্ধুতে গেল মহুলডেরায়। সেখানকার আশ্রমে গিয়েও দেখা করল পুরোনো পরিচিতদের সঙ্গে।

প্রায় ছ'মাস আগে দীধিতি কোনও রকম কারণ না জানিয়েই এই আশ্রম ছেড়ে চলে গেছে। খুব সম্ভবত ফিরে গেছে সংসারধর্মে। এ-রকম তো কেউ কেউ যায়। একটা ঝোঁকের মাথায় বাড়ি ছেড়ে এসে আশ্রমে যোগ দিয়ে কঠোর আত্মনিগ্রহের জীবন ধারণ করে। বেশি দিন সহ্য করতে পারে না, বিশেষত শিক্ষিত মেয়েদেরই এটা বেশি হয়।

দীধিতির বাড়ির ঠিকানা কেউ বলতে চায় না। তা জানাবার নিয়ম নেই। অনেক অনুরোধ করাব পর অনুপমা নামে এক জন সেবিকা আভাস দিল, দীধিতি জামসেদপুরের মেয়ে, ওর পদবি চক্রবর্তী। বাবা-মায়ের তুমুল ঝগড়া, মায়ের প্রতি বাবার অত্যাচার দেখেই ও বাড়ি ছেড়েছিল।

অনুপমা বলল, এই জায়গাটা ওর খুব ভাল লেগেছিল, আশ্রমের কাজ, হাসপাতালের কাজ করত মনপ্রাণ দিয়ে, বাইরে যেতেই চাইত না। তবু চলে গেল। যাবার কয়েক দিন আগেও খুব কেঁদেছিল। সারাক্ষণ কাঁদত।

অনুপমা হয়তো আরও কিছু জানে। সে অতনুর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, আমার বন্ধুটা খুব ভাল মেয়ে। খুব খাঁটি মেয়ে, খুব ইমোশনাল!

জামসেদপুরে প্রচুর বাঙালি। তাদের মধ্যে একটি চক্রবর্তী দম্পতি খুঁজে বার করা সহজ নয়। চক্রবর্তীও কম নয়। তবু সেখানে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে একটি চক্রবর্তী পরিবারের সন্ধান পাওয়া গেল, দীধিতির মতো একটি রূপসি মেয়ের কথা অনেকে মনে রেখেছে। তার মা আত্মহত্যা করেছেন।

বলাই বাহুল্য, দীধিতি সেখানে ফিরে আসেনি। তার সন্ধান কেউ জানে না।

তার ডাকনাম পরি। সে যেন পরিদেরই মতো অদৃশ্য হয়ে গেছে। এত বড় দেশে কোথায় পাওয়া যাবে তাকে? খড়ের মধ্যে আলপিন খোঁজাও এর চেয়ে সহজ।

অসুখ থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার পরেও লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল তার জীবন।

চন্দনার সঙ্গে সম্পর্ক জোড়া লাগার আর কোনও সম্ভাবনাই রইল না।

তিন-তিনবারেও সে চন্দনাকে মা হবার সুযোগ দিতে পারেনি। আর মাত্র এক দিনের মিলনেই অন্য একটি নারী তার সন্তানের জননী হয়ে রয়েছে কোথাও। তাকে ভুলে গিয়েও চন্দনার কাছে ফিরে যাবে, এমন বিবেকহীন মানুষ তো সে নয়। দীধিতির দেখা না পেলেও তার স্মৃতি উজ্জ্বল হচ্ছে দিন দিন।

চন্দনা মনে করেছিল, তার পিতৃত্বের ক্ষমতাই নেই। অসুখের সময় সে অতনুকে ছেড়ে চলে গেছে। অতনু জানিয়ে দিল, চন্দনাকে বিবাহ-বিচ্ছেদ দিতে তার আপত্তি নেই। সে চন্দনার অযোগ্য।

ট্রাভেল এজেন্সির ব্যবসাটা সে শেষ পর্যন্ত বিক্রি করেই দিল। চন্দনার অংশের টাকা জমা রেখে ছিল ব্যাঙ্কে। পিসতুতো ভাইটি এর মধ্যে একটি চাকরি করে বিয়েও করে ফেলেছে। এ বাড়িতেই ভাড়া থাকে। তাদেরই সংসারে যেন অতনু অতিথি। তবে দো-তলাটা তার নিজস্ব।

এর মধ্যে এক বছর কেটে গেছে, তবু আশা ছাড়েনি রবি। সে এখনও দীধিতির খোঁজ করে চলেছে। বিচিত্র তার মনস্তত্ত্ব, সে নিজের জন্য কোনও নারীকে খোঁজে না। কোনও নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় না। তবু বন্ধুর জীবনে বিশেষ এক নারীকে সে হারাতে দিতে চায় না। সে-জন্য সে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে।

কিংবা সে হয়তো দীধিতির জীবনটাকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। তার বন্ধুটি নাস্তিক, সিনিক হতে পারে, নারী-পুরুষের মুক্ত সম্পর্কে বিশ্বাসী। কিন্তু লম্পট তো সে নয়। একটি মেয়েকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে গর্ভবতী করে পালিয়ে যাবে, এমন মানুষ নয় অতনু। দীধিতির কাছে এটা প্রকাশ করা যেন বিশেষ প্রয়োজনীয়।

রবি ধরে নিয়েছে, দীধিতি আত্মহত্যা করতে পারে না। এ-রকম অপমানজনক অবস্থায় পড়লে কোনও কোনও মেয়ে আত্মহত্যা করে ফেলে ঠিকই, কিন্তু যে সদ্য জননী হয়েছে, সে তার সন্তানের জন্য সব রকম দুঃখকষ্ট সহ্য করতে পারে।

বেঁচে থাকলে দীধিতি জীবিকার জন্য একটা কিছু কাজ নেবে নিশ্চয়ই। আর কোনও আশ্রমে যোগ দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে লেখাপড়া জানে, খানিকটা নার্সিং-এর ট্রেনিং নিলেও পুরোপুরি নার্স নয়, হাসপাতালে ভাল কাজ পাবে না। খুব সম্ভবত সে কোনও বড় শহরেও থাকতে চাইবে না।

এই সব মেয়ের পক্ষে কোনও স্কুলে কাজ নেওয়াই স্বাভাবিক। তা-ও রবি ভেবে দেখল, কোনও সাধারণ স্কুলে সে বোধহয় যাবে না। তার সঙ্গে রয়েছে একটি পিতৃপরিচয়হীন সন্তান। অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা তার ব্যক্তিগত জীবনে উঁকিঝুঁকি করবে। কন্যাসন্তানটির পিতৃপরিচয় নিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলতে পারবে দীধিতি? মিথ্যে কথা ওর মুখে মানায় না।

একমাত্র ক্রিশ্চান মিশনারির স্কুলগুলোতেই এই সমস্যা কম। বিদেশে কুমারী মা অনেক হয়। ওরা মেনে নেয়।

রবির দৃঢ় ধারণা হল, কোনও ক্রিশ্চান মিশনারি স্কুল কিংবা অনাথ আশ্রমেই কাজ নিয়েছে দীধিতি।

কিন্তু তাতেও তো কিছু সুরাহা হয় না।

সারা দেশে এ-রকম হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। ক্রিশ্চানদের মধ্যেও কত রকম ডিনোমিনেশান। একে অপরের থেকে দূরত্ব রক্ষা করে।

রবি থাকে তার দাদাদের সংসারে। অবশ্য বাড়িতে থাকে খুব কম, সারা বছরই টো-টো করে বেড়ায়। মস্ত বড় পৈতৃক বাড়ি, অনেকগুলো দোকানঘর ভাড়া আছে। রবি তার একটা অংশ পায়। সেই টাকা সে উড়িয়ে দেয় ভ্রমণে।

মাঝে মাঝে সে আসে অতনুর কাছে। অতনু এখন আর তার সঙ্গে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে উৎসাহী নয়। সে আজকাল বইপত্রের মধ্যেই ডুবে থাকে। সে লেখক নয়, এত জ্ঞান সে কোন কাজে লাগাবে? সে পড়াশোনা করে নিজের আনন্দের জন্য।

এর মধ্যে বাংলা ও বিহারের সমস্ত ক্রিশ্চান মিশনারি স্কুল ঘুরে দেখে এসেছে রবি। এবার তার ধারণা হয়েছে, কেউ যাতে খুঁজে না পায়, তাই দীধিতি নিশ্চিত চলে গেছে অনেক দূরে। কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর, কয়েক হাজার মাইলের ব্যবধান। সে কোথায় থাকে?

তবু শেষ পর্যন্ত রবির উদ্যম সার্থক হল।

দীধিতিকে শেষ পর্যন্ত সে দেখতে পেল হিমাচল প্রদেশের মানালিতে। কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নানা রকম হিংসাত্মক আক্রমণের জন্য এখন অনেক ভ্রমণকারীই সেখানে যেতে ভয় পায়। কাশ্মীরের বদলে প্রায় অনুরূপ একটা জায়গার খোঁজাখুঁজি করে পাওয়া গেছে মানালি, প্রায় একই রকম, হিমালয় পাহাড়ের সৌন্দর্য, তুষারপাত, সাধারণ মানুষের আতিথেয়তাবোধ, তাই এখানে কয়েক বছরের মধ্যে গজিয়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি পাঁচতারা হোটেল, তৈরি হয়েছে রাস্তা, সেই সঙ্গে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল।

রবির ধারণাই ঠিক প্রমাণিত হয়েছে, অনাথ শিশুদের জন্য ক্রিশ্চান মিশনারিদের একটা স্কুলের সঙ্গে যুক্ত আছে দীধিতি।

রবি তাকে আবিষ্কার করলেও দেখা দেয়নি।

যদি দীধিতি তাকে দেখলেই আবার সেখান থেকে উধাও হয়ে যায়! তাছাড়া রবি তো একা তার সঙ্গে দেখা করে কোনও কথাও বলতে পারবে না।

কলকাতায় ফিরে এসে সে অতনুকে প্রথমে কিছু বলল না। সে দিল্লির প্লেনের টিকিট নিজেই এনেছে, সে অতনুকে জানায় দিল্লি নিয়ে যাবেই।

অতনু প্রথমে রাজি হল না। বাড়ি থেকে না বেরোনোটাই তার অভ্যেস হয়ে গেছে। আলস্যের একটা নেশা আছে। দীধিতির সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে না ধরে নিয়ে সে এখন ওর সম্পর্কে কল্পনা করেই মশগুল হয়ে থাকে। প্রেমিক-প্রবর অতনু এখন আর কোনও নারী সম্পর্কেও আগ্রহী নয়। আর, আশ্চর্যের ব্যাপার, সে এখন আর মদ্যপান করে না।

রবির পীড়াপীড়িতে তাকে দিল্লি যেতেই হল। এখানে কী আছে? কিছু নেই। এখান থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করে যেতে হবে পাহাড় প্রদেশে। প্রায় দশ ঘণ্টার যাত্রা। হরিয়ানা, পাঞ্জাব ছাড়িয়ে পাহাড়ের রাস্তাই অর্ধেকটা।

অতনু জিজ্ঞেস করল, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস বল তো?

রবি বলল, তোর মেয়ের মুখ দেখবি। ইচ্ছে করে না?

মাণ্ডি থেকে কুলু। তারপর মানালি। এমনই পথের দৃশ্য যে সমতলের মানুষেরা মুগ্ধ, বিভোর হতে বাধ্য। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে বিপাশা নদী। শত পৌরাণিক কাহিনি এর সঙ্গে জড়িত, নাম শুনলেই রোমাঞ্চ হয়।

স্কুলটি খুবই ফাঁকা ও নিরিবিলি জায়গায়। চতুর্দিকে পাহাড়। শীতকালে এখানে বরফ পড়ে, তবু গাছপালাও প্রচুর। একটা সাদা রঙের বাংলোর সামনে অনেকখানি সবুজ প্রান্তর।

বারান্দায় একটা রকিং চেয়ারে বসে আছে দীধিতি। হালকা নীল রঙের শাড়ি পরে, একটা ঘি রঙের শাল গায়ে জড়ানো। সে উল বুনছে। আর সদ্য হাঁটতে শেখা একটি মেয়ে খেলা করছে তিনটে কুকুরের সঙ্গে। শীতের দেশের ঘন লোমভর্তি বাচ্চা কুকুর, দেখতে খেলনার পুতুলের মতো।

গাড়ি থেকে নেমে, খানিকটা বাগান পেরিয়ে দু'জন পুরুষ এসে দাঁড়াল দীধিতির সামনে।

নিশ্চয়ই দূর থেকে ওদের আসতে দেখেছে দীধিতি, তবু ওরা কাছে এলেও সে কিছুক্ষণ উল বুনল, তারপর গলা তুলল, লছমি বাচ্চিকো ভিতর লে যানা।

এক জন আয়াজাতীয় স্ত্রীলোক এসে খুকিটিকে নিয়ে গেল ভেতরে। সে আপত্তি করল না। কুকুর তিনটেও লাফাতে লাফাতে গেল ওদের সঙ্গে।

দীধিতি বলল, আপনারা বসুন।

অতনু বলল, চিনতে পেরেছ?

দীধিতি মৃদু হেসে বলল, এ আবার কী কথা? আমার তো মানসিক অসুখ নেই, চিনতে পারব না কেন?

অনেকটা রূপ ফিরে এসেছে দীধিতির। শরীরের গড়নেও চমৎকার সৌষ্ঠব। তবে মুখের মধ্যে একেবারে অকৃত্রিম সরল ভাবটা নেই, অনেক কিছুর ছাপ পড়েছে। এসেছে ব্যক্তিত্বের জোর।

একটুক্ষণ তিন জনেই নিঃশব্দ।

ঠিক কী বলবে, ভেবে না পেয়ে অতনু বলল, মেয়েটাকে ভিতরে পাঠিয়ে দিলে? ওকে একটু দেখতে পারি না?

দু'দিকে মাথা নেড়ে, হাসিমুখে দীধিতি বলল, না। আমি বাইরের লোকদের সামনে ওকে আনি না।

পাংশু মুখে অতনু বলল, বাইরের লোক! পরি, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি!

খুব স্বাভাবিক কৌতূহলে দীধিতি বলল, ক্ষমা, কীসের জন্য!

অতনু বলল, সব কিছুর জন্য। পরি, আমি যা কিছু করেছি, সব তো সজ্ঞানে নয়, আমার মাথার ঠিক ছিল না, বিশ্বাস করো। আমি কি আমার মেয়ের মুখটা দেখতে পারব না!

দীধিতি বলল, আপনার মেয়ে? এ আপনি কী বলছেন! ছিঃ, এ-সব কথা বলতে নেই। ও একটা বাজারের মেয়ের সন্তান। ওর বাবার ঠিক নেই।

এগিয়ে এসে, দীধিতির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে অতনু একেবারে নিঃস্ব মানুষের মতো বলল, এ-রকম কথা যখন আমি বলেছি, তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না, বিশ্বাস করো! তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে, আমি মিথ্যে কথা বলছি না, সে-জন্য আমি ক্ষমা পেতে পারি না?

দীধিতি বলল, ক্ষমার কথা বলছেন কেন, আপনি তো ঠিকই বলেছেন! সন্তানের বাবা কে, তা কে ঠিকঠাক বলতে পারে? বাবারা বললেই কি ঠিক হয়? অন্য যে-কেউ তো হতেই পারে, তাই না? মায়েরাই শুধু জানে। আমি জানি, ও বাজারের মেয়ে।

তুমি এটা রাগের কথা বলছ। আমি তোমাকে ভুলতে চাইনি। আমি তোমাকে এই কথাটি জানাতে এসেছি তোমাকে পেয়ে সেই রাতে আমি যে যে মাধুর্য পেয়েছি, তা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা। কী করে যেন সেটা হয়ে গিয়েছিল। তোমাকে ছাড়া, পৃথিবীর আর কোনও মেয়েকে ভালবাসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

দীধিতি একটু ঝুঁকে, অতনুর চুলে হাত দিয়ে খুব কোমল ভাবে বলল, অতনু, আমার সেই অভিজ্ঞতাও কোনও দিন ভুলব না। কিন্তু তারপর আমি ভাল শিক্ষাও নিয়েছি। পুরুষরা ইচ্ছে করলে ভালবাসা দেখাবে, ইচ্ছে করলে ভুলে যাবে। দূরে সরে যাবে। তা তো আমরাও করতে পারি, তাই না? মেয়েরা সন্তান চায়, আমি চেয়েছি। এখন আমার ইচ্ছে করলে, যদি প্রয়োজন হয়, যদি শরীর তেমন জাগে,

তখন তো আমি যে-কোনও পুরুষকেই ডাকতে পারি! কোনও পুরুষের সঙ্গে পাকাপাকি সম্পর্কে আমি বিশ্বাস করি না। আমি স্বাধীন থাকতে চাই।

অতনু বলল, পরি, তুমি অবশ্যই স্বাধীন থাকতে পারো। কিন্তু আমার আর কোথাও যাবার জায়গা নেই। আমি তোমার কাছে থাকতে চাই।

দীধিতি বলল, না, তা সম্ভব নয়। ও বোধহয় তা পছন্দ করবে না।

দীধিতি আঙুল দিয়ে এক দিকে দেখাল। একগাদা কাঠের বোঝা কাঁধে নিয়ে বাগান পেরিয়ে আসছে এক জন পাহাড়ি মানুষ।

দীধিতি বলল, ওর নাম প্রীতম সিং। আপাতত প্রীতমই রাত্তিরে আমার শয্যাসঙ্গী। একসেলেন্ট পার্টনার। আমি অবশ্য ওর কাছ থেকে সন্তান চাই না, এখন শিখে গেছি, কন্ট্রাসেপটিভ ব্যবহার করি। ও কিন্তু আপনাদের পছন্দ করবে না। আপনারা বরং এবার উঠে পড়ুন।

তারপর রবির দিকে তাকিয়ে সে বলল, আপনি তো এ পর্যন্ত একটাও কথা বলেননি। তাতেই আমি সব বুঝেছি, আপনি আপনার বন্ধুকে এবার নিয়ে যান।

কাঁধে বোঝা নিয়ে পাহাড়ি মানুষটি প্রায় কাছে এসে পড়েছে। রবি আর অতনু উঠে পড়ল।

গাড়ির কাছে এসে অতনু বলল, রবি, তুই কিছু বললি না কেন রে? তুই আমাকে একটুও সাহায্য করলি না!

রবি বলল, আমি দেখলাম, শেষ পর্যন্ত মিলল না!

অতনু বলল, কী মিলল না?

রবি বলল, তোর মনে আছে, প্রথম দিন ওই মেয়েটিকে দেখে বলেছিলাম ওর নাম শকুন্তলা?

হ্যাঁ, মনে আছে। তুই কালিদাসের নাটকের সঙ্গে তুলনা দিচ্ছিলি, তাই না?

আমার আশা ছিল, শকুন্তলার সঙ্গে অনেক দিন পর দেখা হলে হয়তো ওই নাটকের মতোই কিছু হবে। কিন্তু দীধিতি শেষকালে যা বলল, তা কালিদাসের বাবাও কল্পনা করতে পারত না। ইচ্ছেমতো যে-কোনও পুরুষের সঙ্গে রাত কাটানো? বাপ রে বাপ! আমার পক্ষেও হজম করা শক্ত!

অতনু একটা লম্বা নিশ্বাস টেনে বলল, সে-যুগ, আর এ-যুগ! কিন্তু দীধিতি কি সত্যি কথা বলছিল? ওই লোকটির সঙ্গে...।

রবি বলল, তা আমি জানি না। কিন্তু ও যে আমাদের তাড়াতে ব্যস্ত ছিল, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই।

অতনু বলল, এত দিন আমি ওর স্মৃতি নিয়ে ছিলাম। এখন কী করব বল তো? কী নিয়ে বাঁচব?

রবি হাসতে হাসতে বলল, খুঁজে দেখ! তবে, তোর মতো নাস্তিকদের নিয়তি হচ্ছে একাকিত্ব! নাস্তিকরা কাউকেই আঁকড়ে ধরতে পারে না। তারা নিজেকেই খুঁজে বেড়ায়!

জল-জঙ্গলের কাব্য

এ কী অদ্ভুত হাসি

ব্যাপারটা হল কী, মনোরঞ্জন তার বউয়ের কাছে একটা মিথ্যে কথা বলে ফেলল।

তা পুরুষ মানুষ, বিয়ের পর আট মাস পার হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে বউয়ের কাছে দু-একটা মিথ্যে কথা তো বলবেই। হাটখোলায় কোনও কাজ না থাকলেও সাতজেলিয়া চলে যায়। মোহনবাগানের নামে পাঁচ টাকা বাজি ধরে, 'বঙ্গেবর্গী' পালায় ভাস্কর পণ্ডিত হিসেবে যার খুব নামডাক, সে-রকম মানুষের প্রতি দিন অন্তত গোটা তিনেক মিথ্যে কথা না বললে চলবে কেন? তবে এই বিশেষ মিথ্যেটি বলার সময় তারও বুক কেঁপেছিল।

নদীর ধারে একলা মনোরঞ্জন দাঁড়িয়ে ছিল বিকেলবেলা। এই সেই বিশেষ ধরনের বিকেল, যে বিকেলে পৃথিবী প্রত্যেক দিনের মতো আটপৌরে নয়। পৃথিবীরানি যেন আজ বেনারসি শাড়ি পরে, যত্ন করে সেজেগুজে আজ কোথাও বেড়াতে যাবেন। নদীর ওপরের আকাশ খুনখারাবি লাল। নদীর জলে লম্বা লম্বা লকলকে লাল শিখা, কিছু দূরের একটি পালতোলা নৌকো এখন ক্যালেন্ডারের ছবি হয়ে গেছে, লালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আকাশের বাকি অংশ প্রগাঢ় নীল, এক ঝাঁক বেলেহাঁস চন্দ্রহার হয়ে উড়ে আসে লাল থেকে নীলের দিকে।

মনোরঞ্জন পরে আছে সাদা থানের লুঙ্গি, খালি গা, ডান বাহুতে কালো কার দিয়ে বাঁধা একটা তামার কবচ, তার সরু কোমর থেকে ত্রিভুজ হয়ে উঠেছে বুক, লোহার মতো গায়ের রঙ, সরু চিবুক, ধারালো নাক, চোখ দু'টি মুখের তুলনায় ছোট, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। মনোরঞ্জন আকাশে সূর্য-বিদায়ের দৃশ্য দেখছে না, সে চেয়ে আছে পাল-তোলা নৌকোটির দিকে। শীত সদ্য শেষ হয়েছে, বাতাস এখনও মন্থর, বঙ্গোপসাগরের অনেক দূরে মেঘ, এ-দিকে আসতে দেরি আছে।

এই যে মনোরঞ্জন, এমন সুঠাম চেহারার যুবা, আজ বিকেলে তার মন ভাল নেই।

দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করতে করতেই যেন মনোরঞ্জন নৌকাটিকে টেনে আনল নিজের কাছে। নৌকোটি জেটি ঘাটের পাশে এসে ভিড়ল। এক জন মাঝি ছাড়া নৌকোর আর কোনও যাত্রী নেই।

বাঁধের ওপব থেকে নেমে গিয়ে নৌকোটির কাছে এসে মনোরঞ্জন জিজ্ঞেস করল, কী মাধবদা, কেমন উঠল আজ?

মাধব মাঝি জেটির থামের সঙ্গে দড়ি বাঁধতে বাঁধতে সংক্ষেপে উত্তর দিল, কিছু না!

মনোরঞ্জন নৌকার ওপর নেমে গিয়ে মাধব মাঝিকে পাল গুটোতে সাহায্য করতে লাগল। সে-কাজ সমাপ্ত হলে সে তার লুঙ্গির ট্যাঁক থেকে বার করল একটি ছোট জার্মান সিলভারের কৌটো। তার থেকে আবার বিড়ি এবং কেরোসিন লাইটার বার করে বলল, নাও মাধবদা, বিড়ি খাও।

দু'জনে দু'টি বিড়ি ধরাল।

নৌকার খোলে অনেকখানি জল উঠেছে। সেঁচে ফেলা দরকার। মনোরঞ্জন জিজ্ঞেস করল, জল ছেঁচে দেব নাকি?

এবারও মাধব সংক্ষিপ্ত ভাবে বলল, ছাঁচ!

মনোরঞ্জন নারকোল মালা নিয়ে জল সেঁচতে লাগল আর মাধব বিড়ি টানতে টানতে সরু চোখে চেয়ে রইল সে-দিকে। মাধবের জলে ভেজা, রোদে পোড়া শরীরটা দেখলে বয়েস বোঝা যায় না। তার মেদহীন শরীরটা এমনই টন্‌কো যে মনে হয় তার চাতালো বুকটায় টোকা মারলে টংটং শব্দ হবে। তার মুখে তিন-চার দিনের রুখু দাড়ি, মাথায় একটা গামছা জড়ানো। মাধবের চোখ দু'টি এমনই উজ্জ্বল যে এক নজর দেখলেই বোঝা যায়, সে সাধারণ পাঁচ-পেঁচি ধরনের মানুষ নয়।

মনোরঞ্জনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মাধব জিজ্ঞেস করল, এত খাতির কীসের জন্য রে?

সাধুদা তোমাকে একবার ডেকেছে।

মাধব চিক করে জলে থুতু ফেলে বলল, যা যা, এখন ভাগ তো, তোগো ওই সব মতলোবের মধ্যে আমি নাই।

মনোরঞ্জন পাটাতনের ওপরে বসে বলল, এক কাপ চা তো খাবে, সারা দিন খেটে খুটে এলে?

আমার অত চায়ের শখ নাই।

অত রাগ করছ কেন? এখন তোমার কী কাজ আছে আর? একটু না হয় বসলেই আমাদের সঙ্গে। তাস খেলবে না?

না!

পাটাতনের নিচে হাত ঢুকিয়ে মাধব একটা খালুই টেনে বার করল। তাতে রয়েছে সাড়ে তিনশো-চারশো ওজনের একটা ভাঙর, আর দু'তিন মুঠো মৌরলা মাছ। বেচলে বড় জোর পাঁচ-ছ'টাকা পাওয়া যাবে, তার মধ্যে দু'টাকা দিতে হবে মহাদেব মিস্তিরিকে নৌকো ভাড়া হিসেবে, বাকিটা মাধবের আজ সারা দিনের উপার্জন। শীতের শেষের নদীতে মাছ পাওয়াই দুষ্কর।

খালুইটা হাতে নিয়ে মাধব জেটিতে উঠে গেল। মনোরঞ্জন বুঝল, মাধবের মেজাজ এখন নরম করা যাবে না।

সপ্তাহে এক দিন হাট, তবে বিষ্টুর চায়ের দোকান রোজই খোলা থাকে। একটা বার্লির কৌটোর তলা কেটে, তারের হাতল লাগানো তার চায়ের ছাঁকনি। কেটলিতে গুঁড়ো চা সব সময় ফুটছে। উনুনে কাঠের আগুনের আঁচ। একটু আস্ত বানীগাছের গুঁড়ির দু'পাশে দু'টি খুঁটি লাগিয়ে দোকানের সামনে বসানো। সেটাই খদ্দেরদের বেঞ্চি।

বিষ্টুর গোঁফ খুব বিখ্যাত, শিয়ালের ল্যাজের মতো পুরুষ্টু, সেই জন্যই হাটুরে লোকেরা তার নাম দিয়েছে মোচা বিষ্টু। তার দোকানের চায়ের ডাকনাম, মোচা বিষ্টুর পেচ্ছাপ। তবু হাটবারে কিংবা বিকেল চারটের লঞ্চ এসে যখন ভেড়ে, তখন অনেকেই সেই চা খেতে আসে।

বানীকাঠের গুঁড়ির বেঞ্চিতে বিষ্টুর দোকানের দিকে পিছন ফিরে বসে বিকেলের দিকে মনোরঞ্জনদের আড্ডা বসে। সে ছাড়া আর সুভাষ, বিদ্যুৎ, নিরাপদ আর সুশীল। আর সাধুচরণ, সে আগে আসে হঠাৎ হঠাৎ। যতক্ষণ না সন্ধে হয়। ঠিক সন্ধের সময় কোথা থেকে এক ঝাঁক পোকা উড়ে আসে, কান-নাকের ফুটোর, আর কথা বললেই মুখের মধ্যে ঢুকে যায়। তখন আর এক জায়গায় বসে থাকা যায় না।

এই কয়েক জনের মধ্যে বিদ্যুৎ বরাবরই রোগা প্যাংলা, সুভাষ একটু মোটা ধাঁচের, বাকি তিন জনের গড়াপেটা চেহারা, অবশ্য মনোরঞ্জনের মতো কেউ না। এবার ওদের চেহারা ক্ষয় হতে শুরু করবে। এখন তো ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি, বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে কেউ এসে মনোরঞ্জনকে দেখুক তখন তার কণ্ঠার হাড় জেগে যাবে, গোনা যাবে বুকের পাঁজরা ক'খানা, চক্ষু ঢুকে যাবে কোটরে, শরীরটাকে মনে হবে খাঁচা।

সেই অঘ্রাণের শেষ থেকেই ওদের হাতে কোনও কাজ নেই। কাজ না থাকলে আলস্যে ওদের শরীর ভাঙে। ওদের জন্য আবার কাজ আসবে, আকাশ থেকে, যদি বৈশাখে ঠিকঠাক সময়ে বৃষ্টি নামে। ভূমির মতোই, এই সব ভূমিজ মানুষেরও শরীর পুষ্ট হয় বৃষ্টির জলে।

কথাটা প্রথম তুলেছিল নিরাপদ। একবার জঙ্গলে গেলে হয় না?

অন্যরা প্রথমে উড়িয়ে দিয়েছিল কথাটা। দিনকাল পালটে গেছে। বাপ-ঠাকুর্দার মুখে যে-সব গল্প শুনেছে, তা আর আজকাল চলে না। এখন আইন-কানুনের হাত অনেক লম্বা হয়েছে। যখন তখন খপ খপ করে ধরে।

তবু ঘুষঘুষে জ্বরের মতো, খিদের মতো, রাতচরা পাখির ডাকের মতো কথাটা ফিরে ফিরে আসে। মনে মনে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে। অঘ্রাণ থেকে বৈশাখ, কিছু করার নেই, শুধু তাস পাশা খেলা আর বিড়ি টানা। যদি-বা দু'এক দিনের ফুরনের কাজ জোটে, কিন্তু এই সময়টা তাল বুঝে কেউ পুরো মজুরি দিতে চায় না। পরিমল মাস্টারের পরামর্শে দুটো শীতে মনোরঞ্জন রাশিয়ান বীটের চাষ দিয়েছিল, শালগমের মতো রাশিয়ান বীটের চারাগুলো তরতরিয়ে বাড়ে, দামও মন্দ পাওয়া যায় না। কিন্তু গত বছর অসময়ের ঝড়-বৃষ্টিতে সব নষ্ট হয়ে গেছে। মূলধন পর্যন্ত বরবাদ। তাই এ বছর কেউ ওই চাষে যায়নি।

হাটখোলার একটি খালি আটচালায় ওদের যাত্রার রিহার্সাল হয়, কিন্তু এ বছর কারুরই যেন রিহার্সালে মন নেই। গত মাসে কলকাতার এক পার্টি এসে জয়মণিপুরে তিন দিন তিনটে পালা করে গেল চুটিয়ে, আশপাশের দশখানা গাঁ থেকে লোক গিয়েছিল ঝেঁটিয়ে। এরপর আর নাজনেখালির জয়হিন্দ ক্লাবের যাত্রা কে দেখবে? গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। তাছাড়া অশ্বিনীকে সাপে কাটবার পর থেকেই জয়হিন্দ ক্লাবটা একেবারে ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেছে। অশ্বিনীই ছিল এই ক্লাবের প্রাণ, প্রমটার, ড্রেসার থেকে পরিচালক পর্যন্ত।

যদি অশ্বিনী ফিরে আসে। অশ্বিনী মারা গেছে, তবু অশ্বিনী ফিরে আসতে পারে। মনোরঞ্জন বিশ্বাস করে না, সুভাষ, বিদ্যুৎরা কেউ-ই বিশ্বাস করে না, তবু অশ্বিনীর দাদা হরিপদ যখন বলে যে লখিন্দর ফিরেছিল, অশ্বিনী কেন ফিরতে পারবে না — তখন প্রতিবাদ করে না ওরা। কলার ভেলায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে অশ্বিনীকে, সঙ্গে নাম-ঠিকানা লেখা কাগজ। এমন কাজের মানুষ ছিল অশ্বিনী, তাকে ফিরিয়ে দিলে ভগবানের সুনাম হত।

নিরাপদর কথাটা উস্কে দেয় সাধুচরণ। যদি বাপের ব্যাটা হোস, যদি হিম্মত থাকে, তবে চল জঙ্গলে যাই।

জেল থেকে ফিরে এসে সাধুচবণ খুব দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। চুরি-ডাকাতি নয়, জয়মণিপুরে জমি-দখলের দাঙ্গায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল সাধুচরণ, দেড়টি বছর ঘানি ঘুরিয়ে গ্রামে ফিরেছে। এ গ্রামে সে-ই একমাত্র জেল-ফেরত মানুষ। জেল-ফেরত তো নয়, যেন বিলেত-ফেরত। জেলে থাকলে স্বাস্থ্য ভাল হয়, আগে ছিল দোহারা গড়ন, এখন চেহারায় কী চেকনাই!

পরিমল মাস্টার সাধুচরণকে একটা কাজ দেবেন বলেছেন। তা-ও বৈশাখ মাসে। এমন নিশ্চিন্ত আশ্বাস পেয়েও সাধুচরণ জঙ্গলে যেতে চায় শুনে অন্যরা লজ্জা পায়।

হাটখোলার আটচালায় হোগলা পেতে শুয়ে, বসে আছে ওরা। রিহার্সাল বন্ধ বলে হ্যাজাক জ্বালানো হয়নি, অবশ্য আজ বেশ চাঁদের আলোর ফিনকি দিয়েছে। বিষ্টুর দোকানও বন্ধ হয়ে গেছে, চারদিক নিস্তব্ধ। এক সময় নদীর বুকে ঘ্যাসঘেসে আওয়াজ আর ভ্যাঁ ভ্যাঁ হর্নের শব্দ শুনে ওরা বুঝতে পারে পুলিশের লঞ্চ যাচ্ছে। প্যাসেঞ্জার লঞ্চ তো দিনে মাত্র সেই একবার।

বিদ্যুৎ মাটি থাবড়ে বলল, আমি রাজি!

সাধুচরণ খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে বিড়ি টানছিল, সে বলল, অন্তত ছ'জন তো লাগবেই।

মনোরঞ্জন বলল, আমি রাজি!

বিদ্যুৎ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, আরে দুর দুর তুই রাজি হলেই বা তোকে নেবে কে? তুই বাদ!

সাধুচরণ বলল, মনোরঞ্জনকে বাদ দিয়ে এই আমরা পাঁচ জন। আর যদি মাধবদা যায় —।

বিদ্যুৎ বলল, মাধবদাই তো আসল লোক।

মনোরঞ্জন দুর্বল ভাবে বলল, কেন, আমি বাদ কেন?

কারণটা তো মনোরঞ্জন নিজেই জানে, তাই তার গলার আওয়াজে জোর নেই। তার বিয়ের এখনও বছর পেরোয়নি, তার এখন জঙ্গলে যাওয়ার তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

সাধুচরণ বলল, তুই যা তো মনা, তুই এখন বাড়ি যা। আমাদের এখন অনেক কথা রইয়েছে।

সুভাষ উদারতা দেখিয়ে বলল, আমার টর্চলাইটটা নিয়ে যা।

কিন্তু মনোরঞ্জন তক্ষুনি বাড়ি যায় না, আরও কিছুক্ষণ বসে থাকে। গুম হয়ে বসে থেকে ওদের আলোচনা শোনে আর উদাসীন ভাবে বিড়ি টানে।

ওরা আলোচনাই চালিয়ে যায় শুধু, শেষ পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। জঙ্গলে যাওয়ার অনেক হ্যাপা। এ তো আর বেড়াতে যাওয়া নয়। সব বন্দোবস্ত করতে গেলে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। কোনও আড়তদারের কাছ থেকে দাদন নিয়ে যাওয়া যেতে পারে বটে, কিন্তু ওরা তা চায় না। ওরা চায় স্বাধীন ভাবে যেতে।

বাড়ি ফিরে মনোরঞ্জন প্রথমেই উঠোনে গোলার গায়ে হাত বুলোয়। ইঁদুরে গর্ত করেছে কি না দেখে নেয়। এঁটেল মাটিতে গোবর মিশিয়ে এমন ভাবে লেপে দেওয়া আছে, যেন সিমেন্ট করা। গোলার গায়ে দু'বার থাবড়া মারে মনোরঞ্জন। কত আর হবে, বড় জোর দু'বস্তা ধান। বাড়িতে পাঁচটি প্রাণী দু'বেলা খাবারের জন্য হাঁ করে আছে, এতে ক'টা দিন চলবে?

মনোরঞ্জনের বাপ-মা দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছে। কেরোসিনের খরচা বাঁচাবার জন্য ওরা সন্ধে-সন্ধেতেই ভাত খেয়ে নেয়। মনোরঞ্জনের বাপের নাম বিষ্টুপদ, মায়ের নাম ডলি। চাষির বাড়ির বউয়ের নাম ডলি? এতে অবিশ্বাসের কী আছে, এ-দিকে হ্যামিল্টন সাহেবের জমিদারি ছিল না? যখন আচ্ছা আচ্ছা গ্রামে ইস্কুল বসেনি, তখন থেকেই পাকাবাড়ির ইস্কুল আছে জয়মণিপুরে। দেখবার মতো ইস্কুল! বিষ্টুপদ এবং মনোরঞ্জন দু'জনেই মাঠে হাল ধরে বটে, দু'জনেই কিন্তু ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়েছে। মনোরঞ্জনের ছোট ঠাকুদ্দা, অর্থাৎ ঠাকুর্দার ছোট ভাইয়ের নাম জেমস সন্তোষ খাঁড়া, তিনি অবশ্য খ্রিস্টানই হয়েছিলেন।

সরু লাল-পেড়ে শাড়ি পরা মাঝবয়সি মনোরঞ্জনের মা যখন পাছ-পুকুরে বাস মাজতে যায়, তখন তাকে কেউ ডলি বলে ডাকলে তা শুনে নতুন কোনও লোক চমকে উঠতে পারে, কিন্তু এখানকার কেউ চমকাবে না। হ্যামিল্টন সাহেব নরেনের পিসিমাকে আদর করে ডাকতেন বেবি। বুড়ি বয়েস পর্যন্ত তাঁর সেই বেবি নামই থেকে গিয়েছিল।

মনোরঞ্জনের দুই দাদা বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে। বড়দা নিজের শ্বশুরবাড়ির গ্রামে জমি পেয়ে সেখানেই বসতি নিয়েছে, মেজদা গোসাবায় ডাবের ব্যবসা করে। ছ'ভাই-বোনের মধ্যে দু'টি টুপটাপ মারা গেছে অকালে, ছোট বোনটি ক্লাস নাইনে দু'বার ফেল করে বিয়ের দিন গুনছে মনে মনে।

মনোরঞ্জন বাড়িতে না ফেরা পর্যন্ত তার ছোট বোন কাবিতা তার বউ বাসনার সঙ্গে গল্প করে। ঐতিহাসিক, পৌরাণিক কাহিনির বদলে যাত্রায় আজকাল সামাজিক বিষয়বস্তু থাকে বলে গ্রামের ছেলে-মেয়েদের নামও পাল্টে যাচ্ছে। তাছাড়া সিনেমার নায়ক-নায়িকার নাম। ইলেকট্রিসিটি নেই, তবু এই গ্রামেও মাসে একবার সিনেমা আসে।

কবিতার ডাকনাম বুঁচি। গায়ের রঙ একটু ফর্সা-ফর্সা, মুখটা একেবারে লেপাপোঁছা।

ঘরে জ্বলছে হ্যারিকেন আর বাজছে রেডিয়ো। রেডিয়োতে এ-রকম একটা গান শোনা যাচ্ছে; অশ্রু নদীর...ঘ্যাটো ঘ্যাটো ঘ্যাটো ঘ্যাটো...সুদূর...ঘ্যাটো ঘ্যাটো...ঘাট দেখা যায়...ঘ্যাট ঘ্যাটো ঘ্যাটো। খুবই দুর্বল হয়ে গেছে ব্যাটারিগুলো, না পালটালে আর চলে না। রেডিয়োটা বিয়ের সময় পাওয়া, মাঝখানে দু'বার মাত্র চারখানা করে ব্যাটারি কিনেছে মনোরঞ্জন।

গানটা শুনেই মনোরঞ্জন বুঝতে পারে এখন পৌনে দশটা বাজে। এমন কিছু রাত নয়। তাস খেলা জমলে এক-এক দিন বারোটা-একটা বেজে যায়।

বারান্দায় বালতিতে জল রাখা আছে, মনোরঞ্জন হাত-পা ধুয়ে ঘরে এসে বোনকে বলল, আমার ভাত বেড়ে দে বুঁচি। তোরা খেয়েছিস?

কবিতা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই মনোরঞ্জন তার বউয়ের থুতনি ধরে বলল, বাসনা আমার বাসনা, একবারটি হাসো না!

বাসনা ফোঁস করে উঠল, এই কী হচ্ছে!

মনোরঞ্জন তবু বাসনার ডান গাল টিপে ধরে বলল, পুটু পুটু পুটু পুটু পুটু।

বাসনা ক্রুদ্ধ বিড়ালির মতো ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে, মনোরঞ্জন ততই খুনসুটি করতে থাকে। তারপর বুঁচি এসে ঘরে ঢুকতেই সে চট করে হাতটা সরিয়ে নেয়। এক দিন সে বাসনাকে চুমো খেতে গিয়ে বোনের সামনে ধরা পড়ে গিয়েছিল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে দিনের শেষ বিড়িটি ধরিয়ে মনোরঞ্জন একটু বারান্দায় বসে। উঠোনের মাঝখানে তুলসী মঞ্চ, বাঁ-পাশে গোয়াল ঘর, ডান পাশে রান্নাঘর, তার পাশে মাচা বাঁধা, সেখানে উচ্ছেগাছ দুলছে। বাড়িটি বেশ ঝকঝকে তকতকে, চালে নতুন খড় ছাওয়া হয়েছে এ বছরই। গোয়ালঘরটি অবশ্য এখন ফাঁকা, গত গ্রীষ্মে গো-মড়কে একটি হেলে বলদ মারা যাওয়ায় ঝটিতি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল অন্যটাকে।

শয়নঘর দু'টি, কবিতা বাপ-মায়ের ঘরেই মেঝেতে শোয়। ওর ভয়ের অসুখ আছে, মাঝে মাঝে ওকে ওলায় ধরে, ঘুমের ঘোরে গোঁ গোঁ করে চেঁচিয়ে ওঠে হঠাৎ। কটরাখালির সাধুবাবার কাছে ওকে নিয়ে যাব যাব করেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না। তিনি এই সব রোগের একেবারে ধন্বন্তরি। বিয়ের আগে কবিতার এই অসুখ তো সারিয়ে ফেলতেই হবে।

সুখটান দেবার পর বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘরে চলে আসে মনোরঞ্জন। তক্তপোশের ওপর উঠে বসে বলল, ওঃ হো, তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলেই গেছি। তোমার বাপের বাড়িতে তো কাল ডাকাত পড়েছিল।

বাসনা ভেতরের জামা খুলছিল পেছন ফিরে, চমকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, অ্যাঁ?

মনোরঞ্জন বলল, চারটের লঞ্চে লারানদা এল, তার মুখেই শুনলাম মামুদপুরে কাল বড় ডাকাতি হয়ে গিয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কার বাড়ি? কার বাড়ি? লারানদা বললে, যে নিতাইচাঁদ হরিণের মাংস বেচতে গিয়ে ধরা পইড়েছিল বসিরহাটে, সেই নিতাইচাঁদের বাড়ি। নিতাইচাঁদ তোমার কাকার নাম না?

বাসনার ছেলেমানুষি মুখখানি আতঙ্কে কালো হয়ে যায়। সে চোখ কপালে তুলে বলল, এ খবর শুনেও তুমি চুপ করে বসে রইলে?

তা কী করব, ল্যাজ তুলে দৌড়োব? লারানদা যখন কথাটা বললে, ততক্ষণে লঞ্চ ছেড়ে গিয়েছে। তা ডাকাতি যখন হইয়েই গিয়েছে, এখন আমার যাওয়া না-যাওয়া সমান।

ডাকাতরা আমাদের বাড়ি থেকে কী নেবে?

তোমার কাকাটা তো এক নম্বরের চোর। চোরাই মাল কত লুকিয়ে রেখেছিল কে জানে।

মানুষ মেরেছে?

দু'জনের তো মাথা ফেটেছে শুনলাম।

অ্যাঁ? কার? কার মাথাটা ফেটেছে?

তা আমি কী করে জানব। লারানদা তো আর নিজের চক্ষে দেখেনি।

এ-সব ইয়ার্কির কথা। প্রতি রাত্রেই মনোরঞ্জন এই ধরনের উদ্ভট কোনও গল্প বানিয়ে চমকে দেয় বউকে। বাসনার চোখে জল এসে গেলে সে হো-হো করে হেসে ওঠে। তখন বাসনা এসে তার বুকে গুম গুম করে কিল মারতে থাকে আর বলে, আমার কাকা মোটেই চোর নয়।

তখনও মনোরঞ্জন তার বউকে জড়িয়ে ধরে খুব আদর করে আর খেপায়, চোরই তো, নিশ্চয়ই চোর। তোমরা একেবারে চোরের বংশ, তুমি নিজেও তো একটু চুর্নী।

পাশের ঘর থেকে কবিতা এ-সব কিছুই শুনতে পায়। এমনকী নিয়মিত ছন্দে এ ঘরের তক্তপোষের মচমচানির শব্দ পর্যন্ত।

তবে এই আসল মিথ্যে কথাটা অবশ্য মনোরঞ্জন সেই রাত্রে বাসনাকে বলেনি। সেটা অন্য রাতের কথা।

সারা দিন মনোরঞ্জন তক্কে থাকে মাধবকে ধরার জন্য। তার নিজের কোনও স্বার্থ নেই, তবু বন্ধুদের রোমাঞ্চকর অভিযানটা যাতে পণ্ড না হয়ে যায়, সেই জন্য সে মাধবকে ভোলাবার চেষ্টা করে। মাধবকে আগ বাড়িয়ে বিড়ি দেয়, মাধবের বাড়ির উঠোনের আগাছা সাফ করে দিয়ে আসে, মাধবের ছোট ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে লোপালুপি খেলে। তবু মাধব তাকে পাত্তাই দেয় না।

দিন তিনেক এড়িয়ে এড়িয়ে থাকার পর মাধব শেষ পর্যন্ত নিজে থেকেই ধরা দেয়।

দুপুরবেলা আটচালায় তাস খেলা জমে উঠছে, কখন যে মাধব পেছনে এসে বসেছে ওরা টেরও পায়নি। মাধব তাসের পোকা। হঠাৎ মাধব এক সময় বলে উঠল, আরে ও মনা, কী কল্লি! আরে এডা দেখি একটা রামছাগল। হাতে রঙ রইছে, তুরুপ মারতে পাল্লি না।

মনোরঞ্জন ফিরে তাকাতেই মাধব তার অত্যুজ্জ্বল চোখ দু'টি ঝকমকিয়ে বলল, তোরা দাইরাবান্দা খ্যাল, তাস খেলা তোগো মগজে কুলাবে না।

চার খেলুড়িই ফেলে দিল হাতের তাস। সাধুচরণ বলল, মাধবদা, তোমার সঙ্গে একটা প্রাইভেট কথা আছে।

মাধব বলল, জানি, জানি, তোমাগো কী কথা। ও-সব আমার দ্বারা হবে না। আমার পিঠে এখনও দাগ রইছে।

দু'জনই এক সঙ্গে বিড়ি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, নাও মাধবদা, খাও।

দু'জনের থেকেই বিড়ি নিয়ে একটা ট্যাঁকে গুঁজে আর একটির পেছনে ফুঁ দিতে দিতে মাধব বলল, যতই খাতির করো, ও লাইনে আমি আর যেতে পারব না। আজকাল ও লাইন খারাপ হইয়ে গিয়েছে।

মাধবের মতো কর্মিষ্ঠ-পুরুষ সচরাচর দেখা যায় না। তাকে মাঝি বলা যায়, জেলে বলা যায়, চাষি বা কাঠুরে বা ঘরামিও বলা যায়, সব কাজে সে সেরা। তার কাজের ক্ষমতা এবং বুদ্ধি দুটোই আছে, সেই জন্য অনেকে তাকে সমীহ করে। যারা হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় পতাকা ওড়ায়, যারা অকূল সমুদ্রে নতুন দেশ আবিষ্কারের জন্য বেরিয়েছে এক কালে, যারা যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে শত্রুর দেশে দাঁড়িয়ে চওড়া কাঁধ আরও চওড়া করে গর্বের হাসি দেয়, তাদের মুখের সঙ্গে মিল আছে মাধবের।

তবু মাধব সংসারের ব্যাপারে বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। একটা ছোট চৌহদ্দির বাইরে সে কোথাও যায়নি কখনও। বেঁচে থাকাটাই তার একমাত্র অভিযান। তার জমিও নেই, মূলধনও নেই। শুধু গায়ে খেটে আর কতখানি সমৃদ্ধি হবে। বাড়িতে তার সাতটা পেট। তার নিজের নৌকোটি চলে যাওয়ায় সে আরও বিপাকে পড়েছে।

সাধুচরণ বলল, যদি পারমিট জোগাড় কবি মাধবদা?

মাধব সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বলল, পারমিট জোগাড় করবি, তুই? হেঃ! তোকে পারমিট দেবে? হেঃ!

ধরো না, যদি জোগাড় কবিই?

ধর না, আমি লাটের ব্যাটা বড়লাট আর আমার মেয়ে ইন্দিরে গান্ধী! ধরতে আর ঠ্যাকাটা কী, তাতে তো পয়সা লাগে না!

তুমি বিশ্বাস পাচ্ছ না, মাধবদা, পারমিটের ব্যবস্থা আমি সত্যিই করতে পারি। এখন তুমি রাজি হলেই হয়।

দেখ সাধু। আমার সঙ্গে ফোর টুইন্টি করিসনি! আমি তিন-তিনবার ধরা পড়িছি, মেরে আমার তক্তা খিঁচে দিয়েছে, আমার লৌকোটা পর্যন্ত সুম্মুন্দির পুতরা বাজেয়াপ্ত কইরা নিছে। আবার আমি তোগো কথায় নাইচ্যা আবার ও লাইনে যামু?

মাধবদা, সবাই বলে তোমার ভয়-ডর কিছু নেই, এখন দেখছি তুমিই ভয় পাচ্ছ।

ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি, ভয় পাব না? আমি মলে তুই আমার বউরে বিয়া করবি? আমার পোলাপানগো খাওয়াবি? যমরে ভয় করি না, কিন্তু পুলিশ আর ফরেস্টের লোক আমারে ছিবড়া কইরা দিছে।

সবাই বুঝতে পারে যে মাধব গরম হয়ে এসেছে। মাধব দুঃসাহসী। শুধু দৈহিক পরিশ্রম করে কোনওক্রমে টেনেটুনে সংসার চালানোয় সে বিশ্বাসী নয়। হঠাৎ কোনও ঝুঁকি নিয়ে ভাগ্য ফেরাতে চায়। ভাগ্য ফেরেনি বটে, তবে এ-রকম ঝুঁকি সে বার বার নিয়েছে। অন্তত তিনবার সে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে। একবার ডাকাতরা তার নৌকো থেকে সব কিছু কেড়েকুড়ে তার পরনের কাপড়ও খুলে নিয়ে ন্যাংটো করে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল চামটা ব্লকে। সেখান থেকেও প্রাণে বেঁচে সে ফিরতে পেরেছে।

এ-রকম ঝুঁকি যারা নেয়, তাদের স্বভাব সারা জীবনে বদলায় না।

সাধুচরণ সত্যিই অনেকটা এগিয়ে এনেছে কাজ। জয়মণিপুরের আকবর মণ্ডলের পারমিট আছে, এক ভাগ বখরা দিলেই সে পারমিট ব্যবহার করতে দিতে রাজি আছে। এর মধ্যে বে-আইনি কিছু নেই।

সকলের দিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকিয়ে মাধব বলল, সঙ্গে আর কে যাবে, এই সব চ্যাংড়ারা? এরা তো একটা হাঁক শোনলেই পাছার কাপড় নষ্ট কইরা ফ্যালাবে।

মূল প্রস্তাবকারী নিরাপদ এবার বলল, ও-কথা বোলো না মাধবদা! জঙ্গলে তুমি একাই যাওনি, আমরাও গেছি। আমি তো তিনবার গেছি।

মাধব বলল, হ্যাঁ, গেছিলি। গত সালে ফুলমালা লঞ্চে টুরিস্টবাবুদের রান্নার জোগাড়ে হয়ে গেছিলি না?

মাধবের গলার আওয়াজে রাজ্যের অবজ্ঞা ঝরে পড়ে।

সাধুচরণ বলল, শোনো আমরা কে কে যাব। তুমি, আমি, নিরা —।

মাঝখানে বাধা দিয়ে সুশীল বলে ওঠে, আমি কিন্তু যেতে পারব না। জয়নগরে আমার মামার মেয়ের বিয়ে আছে —।

মাধব আর সাধুচরণ দু'জনেই জ্বলন্ত চোখে তাকাল সুশীলের দিকে। মাধব পিচ করে থুতু ফেলল পাশে।

সাধুচরণ বলল, তোকে নিতামও না আমরা।

মাধব শুধু বলল, হেঃ।

সাধুচরণ আবার বলল, সুভাষ, বিদ্যুৎ, নিরাপদ, তুমি আর আমি।

মনোরঞ্জন বাদ। যদিও সে সামনে ঠায় বসা। সবার চেয়ে বলশালী চেহারা তার, এবং সে ভিতু এমন অপবাদ ঘোর নিন্দুকেও দিতে পারবে না।

সাধুচরণ বলল, আকবর মণ্ডলের পারমিট, তাকে নিয়ে মোট ছয় ভাগ।

মাধব বলল, নৌকোর এক ভাগ লাগবে না? নৌকো তোরে মাগনায় কেডা দেবে?

নিরাপদ বলল, ঠিক, নৌকোর ভাগ ধরা হয়নি। তা হলে সাত ভাগ। মহাদেবদার নৌকো।

মাধব বলল, আট ভাগ হবে, আমার দুই ভাগ। গুণিনের ভাগ নাই?

সাধুচরণ অন্যদের মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, রাজি!

এবার জোগাড়-যন্তরের পালা। শুধু পারমিটের দোহাই দিলেই তো হবে না। খোরাকি জোগাড় করতে হবে, যাওয়া-আসা অন্তত এক মাসের ধাক্কা। এই এক মাস বাড়ির লোকজন কী খেয়ে থাকবে তা ভাবতে হবে, নিজেদেরও রান্না করে খেতে হবে। আর আছে বনবিবির পুজো।

আগে যারা ধার-দেনা করে জঙ্গলে যেত, ফিরে এসে দেখত লাভের ধন সব পিঁপড়েয় খেয়ে গেছে। এখন আর মহাজনদের অতটা সুদিন নেই, অন্তত এ-দিককার পিঠোপিঠি কয়েকটা গ্রামে।

মনোরঞ্জন দল-ছাড়া হয়ে গেছে, তবু সে-ই আগ বাড়িয়ে বলল, পারমিট যখন আছে, তখন পরিমলমাস্টারের কাছে চলো না!

পরিমল মাস্টারের নামে সাধুচরণ একটা গা মোচড়া-মুচড়ি করে। কথাটা ঘোরাবার জন্য সে বলল, ক'বস্তা ধান লাগবে আগে হিসেব করো না!

মাধব এ-সব কথার মধ্যে থাকতে চায় না। ভাড়াটে সৈন্যের মতো সে শুধু নিজেরটা বোঝে। উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, আমার বাড়ির জন্য দু'বস্তা ধান আর অন্তত নগদা একশোটি টাকা রাইখ্যা যাইতে হবে। সে-ব্যবস্থা তোমরা করো।

ঘুরেফিরে আবার পরিমল মাস্টারের নাম আসে। সাধুচরণ বলল, মহাদেবদা যদি তিনশোমণি নৌকোটা দেয়, আর বিনা সুদে কিছু টাকা —।

মহাদেব মিস্তিরি সম্পর্কে কাকা হয় বিদ্যুতের। সেই বিদ্যুৎই বলল, ও দেবে বিনা সুদে টাকা? তুমি পেঁপেগাছে কাঁঠাল ফলতে দেখেছ বুঝি?

সাধুচরণ পরিমল মাস্টারের প্রিয়পাত্র, তবু সে কেন ওঁকে এড়িয়ে যেতে চাইছে, তা অন্যরা বুঝতে পারে না।

সাধুচরণ আবার ওদের প্রস্তাবে বাধা দেবার জন্য বলল, মাস্টারমশাই কলকাতায় গেছেন, কবে ফিরবেন, তার ঠিক নেই!

মনোরঞ্জন টপ করে জানিয়ে দিল, না না, মাস্টারমশাই কালই ফিরেছেন আমি দেখেছি। জলপরি লঞ্চে এলেন।

দু'দিন পরে খুব ভাল খবর পাওয়া যায়।

নিরাপদ আর বিদ্যুৎ দেখা করেছিল পরিমল মাস্টারের সঙ্গে। নিজের কোনও স্বার্থ না থাকলেও মনোরঞ্জনও গিয়েছিল বন্ধুদের সঙ্গে। পরিমল মাস্টার দারুণ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। টাকা-পয়সার আর কোনও প্রশ্নই নেই। চাল-ডাল-তেল-নুন যখন যা লাগবে, ওদের পরিবারের লোকেরা তা সময় মতো নিয়ে আসতে পারবে জয়মণিপুরের কো-অপারেটিভের দোকান থেকে। ওরা নিজেরাও প্রয়োজন মতো সেই সব জিনিস নিয়ে যেতে পারবে নৌকোয়। শর্ত হল, ফিরে এসে মাল বেচে আগে শোধ করে দিতে হবে ওই সব জিনিসের দাম। সুদ লাগবে না এক পয়সাও।

এরপর সাজ সাজ রব পড়ে যায়। আর কোনও বাধাই রইল না। সামনের বানেই যাত্রা শুরু।

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে উঠে মনোরঞ্জন চেঁচিয়ে উঠল, ওঃ মা, মা, মা মা!

ভয় পেয়ে কী হল, কী হল, বলে চেঁচিয়ে উঠল বাসনা। স্বামীকে জড়িয়ে ধরল।

মনোরঞ্জন হাত জোড় করে শিবনেত্র হয়ে বলতে লাগল, মা, মা, রক্ষা করো, মা! আমি আসছি মা!

বাসনা কেঁদে ফেলতেই পাশের ঘর থেকে ছুটে এল কবিতা। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বিষ্ণুপদ, তারপর ডলি।

বিষ্ণুপদ বলল, মাথায় থাবড়া দাও তো বউমা। স্বপ্ন আইটকে গিয়েছে! এক-এক সময় অমন আইটকে যায়।

কবিতা ভাবল, তারই নাকি ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে ওঠার রোগ আছে, সেজদার আবার হল কবে থেকে?

মনোরঞ্জন হাত জোড় করে বলে, যাচ্ছি, মা, মা, আমার অপরাধ নিয়ো না, মা! তোমার পায়ে আমার শত কোটি প্রণাম মা! তোমার পায়ে আমার শত কোটি প্রণাম মা! আমি আসছি মা।

একগাদা চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরে। তাতে দেখা যায় মনোরঞ্জনের দু'চোখ জলে ভাসছে।

ডলি ঘরে ঢুকে বলল, ও মনো, কী হয়েছে, অ্যাঁ? চক্ষু খোল, এই তো আমি! বালাই ষাট, তুই কেন অপরাধ করবি।

ডলি ভুল করে ভেবেছিল, ছেলে বুঝি কোনও কারণে তার কাছে ক্ষমা চাইছে। কিন্তু মনোরঞ্জন যাকে ডাকছে সেই এই মা নয়, আরও অনেক বড় ধরনের মা।

মনোরঞ্জন বিহ্বল ভাবে বলল, আমি বনবিবিকে দেখলাম গো, মা।

ও, স্বপ্ন দেইখেছিস। একবার উঠে দাঁড়া।

স্বপ্ন নয়-গো, একেবারে চোখের সামনে। গাছতলা আলো করে দাঁড়িয়ে আছেন মা বনবিবি, পাশে দুখে, মা আমাকে বললেন, বাদার সমস্ত জোয়ান মরদ আমাকে একবার পুজো দেয়, তুই বিয়ে করলি, আজও আমাকে পুজো দিসনি!

বলতে বলতেই বিছানায় দু'হাত ছড়িয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে, যেন প্রবল যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে বুক ফাটা গলায় সে বলতে থাকে, আমি আসছি মা, আমার ভুল হয়ে গেছে মা, আমার অপরাধ নিয়ো না মা।

আবার সে হঠাৎ উঠে বসে বাসনার হাত চেপে ধরে বলে, মা বনবিবি আমাকে ডেকেছেন!

পরদিন সকালেই রটে গেল যে মনোরঞ্জন মা বনবিবিকে স্বপ্নে পেয়েছে।

সারা সকাল সে বিছানা থেকে উঠলই না, এমনই অবসন্ন হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে সে কাঁদে, মাঝে মাঝে শূন্যভাবে চেয়ে থাকে।

বিকেলে সাধুচরণ আর তার দলবল দেখতে এল তাকে। বারান্দায় উবু হয়ে চুপ করে বসে আছে মনোরঞ্জন, বিদ্যুৎ তাকে একটা বিড়ি এগিয়ে দিতেও সে খেল না। মায়ের পুজো না-দেওয়া পর্যন্ত সে আর বিড়ি খাবে না। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কথা বলারও কোনও উৎসাহ নেই তার।

ঐ সে-রকম জঙ্গল এখান থেকে এক জোয়ারের পথ। যখন তখন যাওয়া হয় না। নিরাপদ-বিদ্যুৎরা যখন পারমিট নিয়ে কাঠ কাটতে যাচ্ছেই, তখন মনোরঞ্জনও ওদের সঙ্গে ঘুরে আসুক। পুজো দেওয়াও হবে, দুটো পয়সার সাশ্রয়ও হবে। স্বয়ং বিষ্টুচরণই দিল এই প্রস্তাব।

গোলা থেকে আরও এক বস্তা ধান এর মধ্যে বার করা হয়েছে। গোলাটায় এখন টোকা দিলে ঢ্যাপ ঢ্যাপ করে। সেই দিকে তাকিয়ে ডলিও আর কোনও আপত্তি করতে পারল না। তবু সে বার বার বাসনার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। একরত্তি কচি বউটা, তাকে ফেলে চলে যাবে! প্রথম সন্তান জন্মাবার আগে স্বামী-স্ত্রীর বেশি দিন ছাড়াছাড়ি থাকা ভাল নয়। এতে পুরুষ মানুষরা বার-মুখো হয়ে যায়।

সন্ধের সময় সে বাসনাকে জিজ্ঞেস করল, অ বউ, মনা তা হলে যাবে ওদের সঙ্গে? বাসনা সম্মতি সূচক ঘাড় হেলায়। ডলি তখন বলল, যাক তবে, ঘুরে আসুক, মা বনবিবি যখন ডেইকেছেন, এখন ঝড়-বৃষ্টি নেই, নদীতে ঢেউও তেমন তেজি নয়...।

বাসনাকে সে বলল, বউ, তোর সিঁদুরের কৌটোটা মনোকে দিয়ে দিস। মায়ের পা[illegible] নিয়ে আসবে।

সব ঠিকঠাক হয়ে যাবার পর যাত্রার আগের দিন রাত্রে মনোরঞ্জন বাসনার থুতনি ধরে বলল, বাসনা, আমার বাসনা, একবারটি হাসো না!

বাসনা ফোঁস করেও উঠল না, হাসলও না। গম্ভীর হয়ে রইল।

মনোরঞ্জন বলল, মায়ের পুজো দিতে যাচ্ছি, এ-সময় কেউ অসৈরন করে? জঙ্গলে ভাল কাঠ পেলে আমাদের পার হেড শ'পাঁচেক টাকা উপরি রোজগার হবেই। তখন তোমার জন্য একটা শাড়ি...এখানে নয়। একেবারে কলকাতার দোকান থেকে...বুঝলে...।

অত বড় নৌকোতে পাঁচ জন বসলেও যেন খালি খালি দেখায়। মনোরঞ্জন উঠে বসায় তবু [illegible] খানিকটা মানানসই হল। হালে বসেছে মাধব, শালবাহু নিয়ে মনোরঞ্জন ধরল একটা দাঁড। মনোরঞ্জনকে নিতে মাধব আপত্তি করেনি, কারণ এ ছেলেটাকে দিয়ে কাজ হবে সে জানে। যেবার কালীরচকের কাছে ডাকাতের পাল্লায় পড়েছিল মাধব, সেবার যদি এই মনোরঞ্জনের মতো আর একটা মানুষও থাকত তার পাশে তাই হলে লগি পিটিয়ে ডাকাতদের ঠাণ্ডা করে দিতে পারত।

সব সরঞ্জাম তোলা হয়েছে, ওদের বিদায় দিতে এসেছে অনেকে। একমাত্র বিদ্যুৎ শুধু জামা গায় দিয়েছে, আর সবাই খালি গায়ে তৈরি, গণ লেগেছে, এই তো যাত্রার পক্ষে শুভ সময়। নৌকো ছাড়তেই ডলি চেঁচিয়ে বলল, মামুদপুরের পাশ দিয়েই তো যাবি, একবার বউমার বাপের বাড়িতে দেখা করে যাস।

আচ্ছা!

সিঁদুরের কৌটোটা...মনে থাকে যেন।

বাঁধের ওপর অন্যদের জটলা থেকে একটু দূরে একটা নিমগাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাসনা। মনোরঞ্জন সে-দিকে তাকিয়ে হাসল। সেই হাসি দেখে ধক করে উঠল বাসনার মুখটা। কী অদ্ভুত হাসি! মন-খোলা মানুষ মনোরঞ্জনকে সে অনেক রকম ভাবে হাসতে দেখেছে, ভাস্কর পণ্ডিত কিংবা খিঁজির খাঁ রূপী মনোরঞ্জনের অট্টহাসিও সে শুনেছে, কিন্তু এ-রকম হাসি তো সে কখনও দেখেনি। চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে মনোরঞ্জনের, কেমন যেন স্থির দৃষ্টি, ঠোঁট অল্প একটু ফাঁক করা।

কাল রাতে বেশি কথা হয়নি, খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিল মানুষটা। আজ সকাল থেকেও নানা কাজে ব্যস্ত। একটুখানির জন্যও বাসনা তার স্বামীকে আড়ালে পায়নি। তাই কি মনোরঞ্জন ওই রকম হাসি দিয়ে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিতে চায়? কোনও মানুষ একেবারে নতুন ভাবে হাসতে পারে!

একটু পরেই নৌকোটা সামনের ট্যাঁক ঘুরে চোখের আড়ালে চলে গেল।

তিন বন্ধুর উপাখ্যান

জয়মণিপুরে টেলিফোন আছে।

বিদ্যুতের আলো নেই, নদী পেরিয়ে মোটরগাড়ি আসার কথা তো দূরে থাক, ঠিকঠাক গোরুর গাড়িরও রাস্তা নেই। ফুড ফর ওয়ার্কও এই জলা-অঞ্চল চেনে না, তবু এখানে টেলিফোন থাকে কী করে? আছে, আছে। বিজ্ঞানের অবদান। বিজ্ঞানের মন ভাল থাকলে টেলিফোন ঝিলিনিং ঝিলিনিং করে বাজে, আবার বিজ্ঞান ভুলে গেলে, দু-তিন মাস টেলিফোনেব ঘুম।

রাত পৌনে এগারোটায় কো-অপ অফিসে টেলিফোন বেজে উঠল।

এই দো-তলা মাঠকোঠাখানির একটা ঘরে বদন দাস শোয়। তার মানে এই নয় যে বদন দাস এই অফিসের দিন-রাতের কর্মী। সে-রকম কেউ নেই। বদন দাসের বাড়িতে লোক অনেক, জায়গা কম, তাই সে রাত্রে এখানেই থাকে। তারও শোওয়া হল আর অফিস ঘরটা পাহারাও দেওয়া হল।

ঘুম থেকে উঠে টেলিফোন ধরে বদন দাস ও-পারের কথা কিছুই বুঝতে পারল না। সে-ও হ্যালো হ্যালো বলে, ও-পার থেকেও হ্যালো হ্যালো। তখন সে বলল, আপনি ধরেন স্যার, আপনি ধরে থাকেন, আমি মাস্টারমশাইকে ডেকে আনতেছি।

মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি পাঁচ-সাত মিনিটের পথ। বদন দাস প্রথমে টর্চ খুঁজে পায় না। এমনই অভ্যেস যে টর্চ ছাড়া রাত্রে বাইরে বেরুতেই পারে না। বালিশের পাশে রাখা ছিল, টর্চটা কখন গড়িয়ে পড়ে গেছে খাটের নিচে।

সারা দিন গরম, কিন্তু রাতের হাওয়ায় এখনও সিরসিরে ভাব। প্রথম বর্ষণের আগে সাপগুলো সাধারণত গর্ত থেকে বেরোয় না। তবে অভ্যেসবশত পায়ে ধপ ধপ শব্দ করে বদন দাস। আর আপন মনে একটা গান গুনগুনোয়, কথা কয়ো না। শব্দ করো না। ভগমান নিদ্রা গিয়েছেন, ভগমান নিদ্রা গিয়েছেন, ভগমান নিদ্রা গিয়েছেন...।

মাস্টারমশাইয়ের কোয়ার্টারে আলো জ্বলছে দেখে বদনের অস্বস্তি চলে যায়। উনি অনেক রাত জেগে বই পড়েন। পড়াশুনা শেষ করে মানুষ চাকরি কবতে যায়। তার পরও কারুর রাত জেগে পড়াশুনো করার মন থাকে? বিচিত্র! ভগমান নিদ্রা গিয়েছেন, ভগমান নিদ্রা গিয়েছেন, কথা কয়ো না। গোসাবায় এসেছিল কলকাতার থিয়েটার পার্টি। একবার শুনলেই গানের সুর মনে থাকে বদনের।

মাস্টারমশাই, মাস্টারমশাই।

কো-অপারেটিভের মেয়েদের তাঁতে বোনা লুঙ্গি পরে বেরিয়ে এসে পরিমল মাস্টার জিজ্ঞেস করলেন, কী রে?

বদন দাসের মুখে টেলিফোনের বৃত্তান্ত শুনেই পরিমলমাস্টারের বুকের মধ্যে দু-চার লহমার জন্য ঢাকের শব্দ। প্রথম প্রতিক্রিয়াটা ভয়ের। তারপর প্রত্যাশার।

পাঞ্জাবিটা গায়ে চাপাবার কথা ভুলে গিয়ে শুধু হাওয়াই চটি পায়ে গলিয়ে তিনি বললেন, চল।

কোয়ার্টারের সামনের কঞ্চির গেটে হাত দিয়ে তিনি আবার থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, একটু দাঁড়া।

ফিরে গিয়ে চার্লি চ্যাপলিনের মতো দ্রুততম ভঙ্গিতে খাটের তলা থেকে টেনে বের করলেন একটা লোহার তোরঙ্গ। তার ডালাটা খুলে ভেতরের অনেক কাগজপত্রের মধ্যে হাত চালাতে লাগলেন অন্ধের মতো। সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই।

বাক্সটা বন্ধ করে খাটের তলায় আবার ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই দেখলেন, মাঝখানের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর স্ত্রী সুলেখা।

সব কিছু ব্যাখ্যা করে বোঝাবার সময় নেই বলে তিনি, টেলিফোন এসেছে, বলেই দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন।

পাঁচ দিন আগে কঠোর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সিগারেট ছেড়ে দেবেন। তখন প্যাকেটে ছ'টা সিগারেট। প্রথমে ভেবেছিলেন প্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলে দেবেন খালের জলে, তারপর ভাবলেন পয়সা দিয়ে কেনা জিনিস নষ্ট না করে ভূগোলের টিচার বিনোদবাবুকে দিয়ে দিলেই তো হয়। তা-ও দেননি। বাড়িতে সিগারেট নেই, পকেটে সিগারেট কেনার পয়সা রাখবেন না বলেই সিগারেট খাওয়া হবে না। এর মধ্যে বীরত্বের কিছু নেই। সিগারেট আছে তবু খাচ্ছেন না, এটাই আসল পরীক্ষা। সেই জন্যই টিনের তোরঙ্গের মধ্যে।

কিন্তু এই সব সংকটের সময় একটা সিগারেট না থাকলে বড় অসহায় লাগে।

মেয়ে থাকে লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের হস্টেলে। ছেলে ডাক্তারিতে ভর্তি হবার জন্য পরীক্ষা দেবে, তাই আছে মামাবাড়িতে। ওদের কারুর কোনও বিপদ হয়নি তো? প্রথমেই মনে আসে এই কথা।

কে টেলিফোন করেছে নাম বলেনি?

বুঝলাম না মাস্টারমশাই। খালি একনাগাড়ে হ্যালো হ্যালো, আর বললে এক্ষুনি মাস্টারমশাইকে ডেকে আনো, ঘুমিয়ে পড়লেও ডেকে তুলবে। সেই জন্যই তো এত রাতে আমি ছুটে এলুম। ক'টা বাজে এখন মাস্টারমশাই!

এগারোটা হবে।

এত জরুরি ডাক শুনেই আশা-নিরাশার ধন্দ। এক লাখ সত্তর হাজার টাকার একটা স্কিম দিয়েছিলেন সরকারকে, সেটা পাশ হয়ে গেছে? গত মাসে রাত সাড়ে-ন'টার সময় এক জন টেলিফোন করে জানিয়েছিল যে চিফ সেক্রেটারি তার পরদিন এ-দিকে আসবেন। সেই রকম কেউ? জেনিভাতে কো-অপারেটিভ মুভমেন্টের ওপর একটা সম্মেলন হচ্ছে, কে যেন বলছিল, জয়মণিপুরে এত ভাল কাজ হচ্ছে পরিমল মাস্টারের যাওয়া উচিত...টেলিগ্রাম অফিস থেকে অনেক সময় টেলিফোনে খবর জানায়...ছোট শ্যালিকা মিতুন রেজিস্ট্রি বিয়ে করেছে। খোকন বা মিতুর হঠাৎ কোনও অসুখ...।

তুই কী গান গাইছেস রে বদন? ভাল করে কর তো।

কথা কয়ো না, শব্দ করো না, ভগমান নিদ্রা গিয়েছেন, ভগমান নিদ্রা গিয়েছেন...আর কথাগুলো মনে নেই মাস্টারমশাই।

বেশ ভাল গান তো! পুরোটা শিখলি না? তুই আর একটা কী যেন গান গাস, সোনার বরণী মেয়ে —।

সোনার বরণী মেয়ে, বলো কার পথো চেয়ে, আঁখি দু'টি ওঠে জলে ভরিয়া-আ-আ-আ।

কাঠের সিঁড়িতে ধুপ ধুপ শব্দ করে দু'জনে উঠে এল ওপরে। পরিমল মাস্টার সব রকম উত্তেজনা দমন করে যত দূর সম্ভব শান্ত ভাবে বললেন, হ্যালো।

কোনও উত্তর নেই। লাইনও কাটেনি। ও-পাশে ঝন ঝন ঝ্যাঁকো ঝ্যাঁকো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বিলিতি বাজনা।

পরিষ্কার বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠল তাঁর কপালে।

তিনি হ্যালো হ্যালো বলে যেতে লাগলেন। নিজের উপস্থিত বুদ্ধি সম্পর্কে ঈষৎ গর্বের ভাব আছে পরিমল মাস্টারের। তিনিও ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না। দেরি দেখে, যে টেলিফোন করছিল সে রিসিভারটা রেখে অন্য কোথাও গেছে। কিন্তু কে এবং কোথা থেকে? সুন্দরবনের এই নিশুতি পাড়াগাঁয়ে যন্ত্র মারফত ওই বাজনার শব্দ যেন মনে হয় অন্য কোনও গ্রহ থেকে আসছে।

এবার ও-দিক থেকে কেউ রিসিভার তুলে বলল, হ্যালো, কাকে চান?

এবার রাগ হল পরিমল মাস্টারের। তিনি কড়া গলায় বললেন, আমি কারুকে চাই না। আমাকে কেউ এক জন টেলিফোনে ডেকেছে? আপনি কোথা থেকে —।

ধরুন!

আরও একটু পরে ও-পার থেকে কেউ এক জন প্রচণ্ড চিৎকার করে বলতে লাগল, হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো।

আপনি কাকে চাইছেন?

কে, পরিমল? বাপ রে বাপ, এতক্ষণ লাগে? আমি অরুণাংশু বলছি...।

পরিমল মাস্টারের বুক খালি করা একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

কলকাতা শহরতলির একই স্কুলে, একই ক্লাসে, একই বেঞ্চিতে বসে পড়ত তিন বন্ধু। ক্লাস সেভেন থেকে এক সঙ্গে। সুশোভন, অরুণাংশু আর পরিমল। অরুণাংশু অত্যন্ত লাজুক, সুশোভন জেদি আর দলপতি ধরনের, পরিমল টিপিক্যাল ভাল ছাত্র। সে কত কাল আগেকার কথা। ত্রিশ-বত্রিশ বছর তো হবেই। স্বভাবে আলাদা আলাদা হলেও ওই তিনটি স্কুলের বন্ধু ছিল একেবারে হরিহর আত্মা। স্কুলে সিরাজদ্দৌল্লা নাটকের অভিনয় হল, সুশোভনই তার নায়ক এবং পরিচালক। পরিমল লর্ড ক্লাইভ, কারণ তার রঙ ফরসা আর ইংরেজি উচ্চারণ ভাল। অরুণাংশুকে দেওয়া হয়েছিল সামান্য দূতের পাঠ, তা-ও সে পারেনি, রিহার্সালেই নাকচ।

সময় মানুষকে কত বদলে দেয়? সেই সুশোভন, অরুণাংশু আর পরিমল এখন কোথায়। ম্যাট্রিকে স্টার এবং স্কলারশিপ পেয়েছিল পরিমল, সুশোভন কোনওক্রমে ফার্স্ট ডিভিশন আর অরুণাংশু সেকেন্ড ডিভিশন। কলেজে এসে তিন বন্ধুর ছাড়াছাড়ি। অরুণাংশু মণীন্দ্র কলেজে পড়তে গেল সায়েন্স নিয়ে। সুশোভনও সায়েন্স, কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজে। আর যে-সব কলেজে ছেলে আর মেয়ে এক সঙ্গে পড়ে, সে-রকম কোনও কলেজে পরিমলের পড়া হল না, তার বাবার আপত্তি। তাই স্কলারশিপ পেয়েও সে স্কটিশ বা প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হল না, সে আর্টস পড়তে গেল সুরেন্দ্রনাথে।

যার যেখানেই কলেজ হোক, প্রত্যেক দিন বিকেলবেলা তিন বন্ধুর দেখা হবেই কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে।

ইন্টারমিডিয়েটের পর সুশোভন গেল শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে, অরুণাংশু কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যালে ফেল করে আত্মহত্যা করতে গেল। তাতেও ব্যর্থ হয়ে এবং কোনও রকমে কম্পার্টমেন্টালে পাশ করে অরুণাংশু কলেজ বদলে সেন্ট পলসে এল, বি.এসসি পড়তে। আই এ-তে বাংলা ও ইংরেজি দুটোতেই ফার্স্ট হয়ে পরিমল সিটি কলেজে ফ্রি ছাত্র হিসেবে বি.এ.-তে ইকনমিকসে অনার্স নিল।

এই তিন ছাত্রের জীবনের গতি কোন দিকে যাবে, তা এই সময়েও ঠিক করে বলা, কোনও জ্যোতিষী কেন, বিধাতারও অসাধ্য ছিল।

যেবার অরুণাংশু আত্মহত্যা করতে যায় সেবারই অরুণাংশুর প্রথম কবিতা ছাপা হয়, 'পরিচয়' পত্রিকায়। পরিমল তখন থেকেই রাজনীতির দিকে ঝোঁকে। আর প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢোকার পর

থেকে সুশোভন বড়লোকের মেয়েদের পেছনে ঘোরাঘুরি অভ্যেস করে এবং নিজের সাজপোশাকের প্রতি অত্যধিক নজর দেয়। নিজের ডিজাইনে দর্জির কাছ থেকে বানানো নিত্যনতুন কায়দার শার্ট তার গায়ে।

কোনওক্রমে বি.এসসি পাশ করে, কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে অরুণাংশু কাজ নিল এক কারখানায়, যে-কারখানার নামে তখন ব্রিটিশ গন্ধ। এম.এ-তে পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র পরিমল তখন ছাত্র নেতা, সুশোভন হবু-ইঞ্জিনিয়ার এবং ডন জুয়ান। পরিমলের মধ্যে প্রেমিকের ভাব কখনও দেখা না গেলেও সিক্সথ ইয়ারে উঠেই সে গোপনে বিয়ে করে সহপাঠিনী সুলেখাকে। তার বিয়ের সময় ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র অনুপস্থিত ছিল অরুণাংশু, সে তখন দ্বিতীয় বার আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে এবং কারখানার চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।

ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তেমন কিছু কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি সুশোভন, কয়েক বছর এখানে ওখানে অভিজ্ঞতা কুড়িয়ে সে চলে যায় নাইজিরিয়ায়। তার মধ্যেই অরুণাংশুর পর পর তিনটি কবিতা 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা হয়ে রীতিমতো সাড়া জাগিয়েছে। শত শত কবিদের মধ্যে থেকে এক লাফে ওপরে উঠে এসেছে অরুণাংশু। বিনীত ও লাজুক অরুণাংশুর সে-সময়কার কবিতার বৈশিষ্ট্য ছিল অত্যন্ত হিংস্র ও অসভ্য শব্দ ব্যবহার। এম.এ ফাইনাল পরীক্ষা দেবার আগেই সুলেখার সঙ্গে জেলে যায় পরিমল, জেলে বসেই সে অরুণাংশুর কবিতা পড়ে অবাক হয়েছিল। বাংলায় কোনও দিন ভাল নম্বর পায়নি অরুণাংশু, সে এমন কবিতা লিখতে পারে?

সুশোভন আর অরুণাংশুকে এখন বাংলার সকলেই এক ডাকে চেনে। বাংলা ছাড়িয়ে আরও দূরে গেছে তাদের খ্যাতি। অরুণাংশুর জীবনযাপনের নানা সত্য-মিথ্যে কাহিনি লোকের মুখে মুখে ঘোরে, কোথায় সেই লাজুক কিশোর, এখন সে দারুণ উগ্র ও অহঙ্কারী, কথায় কথায় সে লোকের সঙ্গে মারপিট বাধায় এবং মদ্যপানের রেকর্ডে ইতিমধ্যেই সে মাইকেলকে ছাড়িয়ে গেছে। যারা তার কবিতার ভক্ত, তারাই তার হাতে মার খেতে ভালবাসে।

নাইজিরিয়ায় গিয়ে সুশোভন প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে একটা শৌখিন নাটকের দল গড়েছিল। ভারতে ফিরে এল সে পুরোপুরি নাট্যকার হিসেবে। বেতার নাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে সে প্রথমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারপর সে গড়ল নিজের দল। এখন সে প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের পুরোধা। সুশোভনের পরিবর্তন আরও বিস্ময়কর। সেই উৎকট সাজপোশাকে আগ্রহী, ডন জুয়ানের সামান্য চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না তার মধ্যে, স্ত্রী ও দু'টি সন্তান থাকলেও সুশোভন এখন অনেকটা যেন গৃহী-সন্ন্যাসীর মতো, খদ্দেরের পাজামা ও পাঞ্জাবি ছাড়া কিছু পরে না, নাট্য প্রযোজনার অবসরে বা অবসর করে নিয়ে সে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় দেশের মানুষের সমস্যার গভীরে পৌঁছবার জন্য, তার কথাবার্তার মধ্যেও ফুটে ওঠে ব্যাকুল অনুসন্ধানীর সুর। শান্তিগোপালের যাত্রাদল যেবার রাশিয়ায় যায় নিমন্ত্রণ পেয়ে, সেবারই এক সেবা সংস্থার আমন্ত্রণে সুশোভন তার পুরো নাটকের দল নিয়ে ঘুরে এল আমেরিকা ও কানাডায়। তার সাম্প্রতিক নাটকটিতে ছিল ধনতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন দেশের প্রতি সমালোচনা ও কঠিন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ।

পরিমলের বাবার খুব আশা ছিল যে ছেলে আই.এ.এস পরীক্ষা দেবে। পরিমল জেল খেটে আসায় সে-সম্ভাবনা ঘুচে গেল, তার ওপরে আবার ছাত্র অবস্থাতেই অসবর্ণ বিয়ে। এ-সবের জন্য পরিমলের বাবার ধবল কথা-না-বলা রোগ। পরের বছর পরিমল এম এ-টা পাশ করে। পরিমল আর সুলেখা বাসা ভাড়া করল বরানগরে, বেহালার একটি কলেজে পরিমল যোগ দিল লেকচারার হিসেবে, আর দক্ষিণেশ্বরের একটা স্কুলে সুলেখা। তবে রাজনীতির সঙ্গে সুলেখা জড়িয়ে রইল বেশি করে। দ্বিতীয় বার গর্ভবতী অবস্থায় একাই জেলে গিয়ে সুলেখা ছাড়া পায় ঠিক তার প্রথম সন্তানের জন্মের দেড় মাস আগে।

একই স্কুলের এক ক্লাসের এক বেঞ্চের তিন জন ছাত্রের মধ্যে এক জন খ্যাতিমান নাট্যকার ও পরিচালক, অন্যজন বিশিষ্ট কবি। অথচ বাংলায় সব চেয়ে ভাল ছাত্র ছিল পরিমল। সে লেখার দিকে না গিয়ে অন্তত কোনও মন্ত্রী বা লোকসভা কিংবা বিধানসভায় বিরোধী দলের উল্লেখযোগ্য নেতা হলেও মানানসই হত। কিন্তু পরিমল সে-দিকে গেল না।

সক্রিয় রাজনীতি করার বদলে পরিমল আস্তে আস্তে হয়ে উঠল তাত্ত্বিক। সে পড়ুয়া মানুষ, মিছিলে গিয়ে চিৎকার কিংবা মাঠে গিয়ে আগুন-ঝরা বক্তৃতা দেওয়ার চেয়ে সে ঘরোয়া বৈঠকে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতেই ভাল পারে ও ভালবাসে। তাত্ত্বিকরা থাকে পেছনের দিকে, ক্যাডাররা সকলে তাদের চেনে না। তবু এই অবস্থাতেই পরিমল সন্তুষ্ট ছিল। সুলেখা তো অন্তত প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে আছে।

ভেতরে ভেতরে কবে যে পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে তা পরিমল নিজেও ঠিক টের পায়নি প্রথমে।

সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করার পর দু'টি ব্যাপারে গুপ্ত কাঁটার মতো পরিমলকে সর্বক্ষণ একটু একটু পীড়া দিত। বরানগর থেকে সেই বেহালায় কলেজে পড়াতে যাওয়া। এই যাতায়াতে শুধু সময় নয়, জীবনীশক্তিরও অনেকটা খরচ হয়ে যায়। প্রতি দিনের বিরক্তি। অথচ বাড়ি পালটানো যায় না নানা কারণে। বরানগরের বাড়ি থেকে সুলেখার স্কুল কাছে। সুলেখার বেশি সময় দরকার। অনেক চেষ্টা করে নিজের জন্য চাকরি জোটাবে, সেরকম মানুষই পরিমল নয়। তাছাড়া, এম.এ-তে তার রেজাল্টও ভাল হয়নি, সাধারণ সেকেন্ড ক্লাস। সুলেখা তো আর এম.এ পরীক্ষা দিলই না।

বাড়িটা বদলানো দরকার ছিল নানা কারণে। কিন্তু এ-দেশে চাকরিজীবীদের সন্তান জন্মালে আয় বৃদ্ধি হয় না, যদিও খরচ বেড়ে যায়। মিতু আর খোকন তখন জন্মে গেছে। বাড়ি পালটানো মানেই বেশি ভাড়া। প্রফুল্ল সেনের আমলে ডামাডোলের সময় কলকাতার বাড়ি ভাড়া দ্বিগুণ হয়ে গেল, তারপর লাফাতে লাগল তিনগুণ চারগুণের দিকে।

দু'খানা ঘর, একটা বারান্দা, আলাদা বাথরুম, রান্নাঘর, দো-তলায় মোটামুটি খোলামেলা, ভাড়া একশো পঁচাত্তর, ছাড়লেই অন্তত চারশো। ও-বাড়ির বাড়িওয়ালা অবশ্য পরিমলদের উঠিয়ে দেবার জন্য কোনও চক্রান্ত করেনি, লোকটা জানত যে ওই স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই রাজনীতি করে, ওদের পেছনে জোর আছে। তবু ওই বাড়িওয়ালার জন্যই পরিমলের মনে হত, আঃ, যদি এ বাড়িটা ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়া যেত। লোকটির অন্য কোনও দোষ নেই, দেখা হলে হেসে কথা বলে। তবু, ওই ব্যক্তিটি অসম্ভব রকম অমার্জিত। যখন তখন পরিমলের সামনেই লোকটা ফ্যাঁৎ করে সিকনি ঝাড়ে, ওয়াক ওয়াক শব্দ তুলে গয়ের ফেলে, এক তলায় উঠোনে খোলা নর্দমার কাছে দাঁড়িয়ে বাঁ-দিকের ধুতি উরু পর্যন্ত তুলে পেচ্ছাপ করে।

সুলেখা এ-সব গ্রাহ্য করে না, কিন্তু পরিমল কিছুতেই সহ্য করতে পারে না এমন অমার্জিত কোনও মানুষকে। লোকটা তার নিজের বাড়ি নোংরা করছে, তাতে তার বলারই-বা কী আছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোকটি কদর্য অশ্লীল ভাষায় অন্যদের সঙ্গে কথা বলে। সব নাকি রসিকতা। কিছু বলতে পারত না বলেই পরিমলের বেশি কষ্ট। তার সব সময় ভয়, যদি তার ছেলে মেয়েরা এ-সব দেখে শেখে।

সুলেখার সময় কম বলে পরিমলই বেশি নজর রেখেছিল মিতু আর খোকনের ওপর। সময় পেলেই সে ওদের নিয়ে পড়াতে বসেছে। সে জানত, মাস্টার-দম্পতির পুত্র-কন্যা, ওরা যদি ভাল রেজাল্ট না করে স্টাইপেন্ড স্কলারশিপ না পায়, তাহলে ওদের বেশি দূর পড়ানো সম্ভব হবে না।

বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে শুধু মুর্খই করে, এই স্লোগান তখন উঠতে শুরু করেছে, তত্ত্বের দিক থেকে এ-কথা পরিমল মানেও বটে, কিন্তু তার ছেলে মেয়েদের স্কুল ছাড়িয়ে পড়া বন্ধ করে দেবার কথা সে চিন্তাও করতে পারে না। এই বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থার এক-একটি যন্ত্র হয়েই তো সে আর সুলেখা জীবিকা সংগ্রহ করছে।

শুধু বেহালার দূরত্ব বা বাড়ি না পালটাবার জন্যই নয়, ভেতরে ভেতরে অন্য ভাবেও ক্ষয় হচ্ছিল পরিমল। দলের বৈঠকে নীরস তাত্ত্বিক আলোচনাতেও সে এক সময় ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল। এর চেয়ে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো অনেক ভাল। মাটিতে পা দিয়ে হাঁটা, নদীর ধারে বা গাছতলায় বসা মানুষকে তার নিজের পরিবেশে পাওয়া।

বিবাহিত জীবনের এগারো বছর পূর্ণ হবার পর পরিমল এক দিন অপ্রত্যাশিতভাবে সুলেখাকে জিজ্ঞেস করল, সুন্দরবনের জয়মণিপুরে একটা কো-এড হাইস্কুলের দু'জন টিচারের চাকরি খালি আছে, তুমি যাবে?

পাঁচ মিনিট কথা বলেই সুলেখা অনেকটা বুঝে ফেলল। স্বামীর মনের এই নিঃস্বতার দিকটির সন্ধান সে বিশেষ নেয়নি। সে পালটা প্রশ্ন করল, তুমি পারবে?

ইন্টারভিউ দিতে গেল দু'জনেই। সেই প্রথম ক্যানিং থেকে লঞ্চে চেপে ওদের সুন্দরবন দেখা। অনেকটা যেন বেড়াতে যাবার ভাব। স্বামী-স্ত্রীতে এক সঙ্গে বেড়াবার সুযোগ এ-রকম বিশেষ হয়নি। গোসাবার ভাতের হোটেলের গরম গরম ভাত আর পাতলা মাঝের ঝোল খেতেও খুব মজা লেগেছিল। অসুবিধে হল পরিমলকে নিয়ে। স্কুলের এম.এ পাশ শিক্ষকরা কলেজে সুযোগ নেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে, আর পরিমল কলেজ ছেড়ে স্কুলে আসতে চায় কেন? স্কুলে রাজনীতি ঢোকার ব্যাপারে সবাই তখন চিন্তিত। অর্থাৎ সবাই সতর্ক, অন্য পার্টির লোক যাতে না ঢুকে পড়ে।

পরিমল জবাব দিয়েছিল, খুব ছেলেবেলায় আমি গ্রামে কাটিয়েছি, তারপর টানা পঁচিশ-তিরিশ বছর শহরে। এখন আমার আবার গ্রামে এসে থাকতে ইচ্ছে করে।

হেডমাস্টারমশাই সদাশিব ধরনের। অর্থাৎ ভালো মানুষ কিন্তু অকর্মণ্য। তিনি পরিমলের মুখের ভাব দেখে আন্দাজ করলেন, এই লোকটির কাঁধে অনেক ভার চাপানো যাবে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই যখন আসতে চায়, তখন সহজে চলে যাবে না বলেই মনে হয়।

এ-দিকে আসতে চাইছেন কেন, বাদা অঞ্চলের মানুষজন চেনেন? থাকতে পারবেন এদের সঙ্গে? দখনে মানুষদের সম্পর্কে লোকে কী বলে জানেন না?

যেখানেই যাই, মানুষের সঙ্গেই তো থাকতে হবে।

গ্রাম ভালবাসেন, নেচার-লাভাব, কবিতা-টবিতা লেখেন নাকি মশাই?

ক্লান্তভাবে পরিমল বলেছিল, নাঃ, আমি জীবনে এক লাইনও কবিতা লিখিনি।

তারপর এখানে কেটে গেছে দশ বছর। এখন ক্যানিং থেকে মোল্লাখালি, এর মধ্যে পরিমল মাস্টারের নাম জানে না এমন কেউ নেই। মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করবার এতখানি শক্তি বা উৎসাহ যে তাঁর মধ্যে নিহিত ছিল, পরিমল তা নিজেই জানত না। এখানেও লোকে ফড়াত করে সিকনি ঝাড়ে, শব্দ করে গয়ের তোলে, পেচ্ছাপ করে যেখানে সেখানে, তবু পরিমলের খারাপ লাগে না। অল্প চেনা লোককে তুই বলতে একটুও আটকায় না তাঁর। এখানেও পোশাকের বাহুল্য নেই। মুখের ভাষাটাও বদলে নিয়েছে। প্রথম প্রথম লোকের মুখে 'নিদেষী' শুনলে বলত 'নির্দোষ' বলো, অলসকে কেউ আয়েসী বললে তাঁর কানে লাগত, 'আয়েসী' মানে তো পরিশ্রমী। এখন এ-সব চুকে গেছে। এই যে বদন, ও কিছুতেই সমবায় বলবে না, সব সময় বলে সামবায়। পরিমল ওর পিঠ চাপড়ে বলে, ঠিক আছে, ওতেই চলবে।

কী ব্যাপার, অরুণাংশু? এত রাত্রে?

তোর ওখানে সুশোভন গিয়েছিল গত সপ্তায়? আমাকে বলিসনি কেন?

সুশোভন তো নিজে থেকে হঠাৎ এসেছিল।

শালা, আমাকে বাদ দিতে চাস?

কোথা থেকে কথা বলছিস?

পার্ক স্ট্রিট থেকে। সুশোভনের সঙ্গে তোর বেশি খাতির? ও-সব নাটক-ফাটক আমি গ্রাহ্য করি না। বঙ্গের গ্যারিক! এক দিন একটা থাপ্পড় কষাব।

তুই কী বলছিস অরুণাংশু, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

এখানে আসবার পর প্রথম পাঁচ ছ বছর পরিমল কারুর সঙ্গেই যোগাযোগ রাখেনি। কলকাতায় গেলেও বন্ধুদের সঙ্গে পারতপক্ষে দেখা করত না। সকলের ধারণা হয়েছিল, সপরিবারে পরিমল অজ্ঞাতবাসে গেছে। রাজনৈতিক সহকর্মীরা দু-এক জন এখানে আসতে চাইলেও পরিমল বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি, এড়িয়ে গেছে। সুশোভনকেও ডাকেনি। কুমিরমারির হাটে সুশোভনের সঙ্গে এক দারুণ বৃষ্টিবাদলার সন্ধ্যায় হঠাৎ দেখা। সুশোভন নিজেই একা ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসে পড়েছিল। দু'জনেই দু'জনকে দেখে সবিস্ময়ে বলে উঠেছিল, আরেঃ! যেন জঙ্গলের মধ্যে লিভিংস্টোন ও স্ট্যানলির সাক্ষাৎকার।

তারপর থেকে সুশোভন মাঝে মাঝেই আসে। দু-তিন দিনের জন্য গ্রামের মধ্যে হারিয়ে যায়, ফিরে এসে পরিমলের কোয়ার্টারে পুরো এক দিন ঘুমোয়। অরুণাংশুও একবার এসেছিল গত বছর, সেই সূত্র ধরে বেশ কয়েক জন সাংবাদিক। সুন্দরবনে বেড়াবার নামে দল বেঁধে শহুরে লোকের এখানে আসা পরিমল মাস্টারের একেবারেই পছন্দ নয়। ক্রমশ তার মনে এই বিশ্বাসটা দানা বাঁধছে যে, শহরের ছোঁয়াচটাই খারাপ।

পার্ক স্ট্রিটের আলোর রাজ্যে বসে অরুণাংশু বোধ হয় কল্পনাই করতে পারছে না যে এখানে একেবারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ওখানে বাজছে বিলিতি বাজনা, এখানে ঘ্যা-ঘো-ঘ্যা-ঘো শব্দে ডাকছে কোলা ব্যাঙ। মদের টেবিলে অরুণাংশুর বন্ধুরা এক সন্ধেবেলা যা খরচ করবে, তাতে এখানকার একটি পরিবারের এক মাস সংসার চলে যায়। একটি পরিবার নয়, দু'টি পরিবার।

অরুণাংশু আরও কিছুক্ষণ টেলিফোনে রাগারাগি করল। তারপর ঘোষণা করল, আগামী রবিবার সে এখানে আসছে, মুরগি-ফুরগি কিচ্ছু চাই না, শুধু মাছ, টাটকা মাছ খাওয়ালেই হবে।

আপত্তি জানিয়ে কোনও লাভ নেই। বিখ্যাত লোকদের অনেক রকম যোগাযোগ থাকে, হয়তো অরুণাংশু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কোনও লঞ্চ নিয়ে এসে উপস্থিত হবে। অরুণাংশু তা পারে।

অরুণাংশু, তুই আসবি, খুব ভাল কথা, শুধু একটা অনুরোধ করব? সঙ্গে বেশি লোকজন আনিস না।

যদি বউ-বাচ্চা নিয়ে আসি?

তাহলে তো আরও ভাল। সুলেখা বলছিল —।

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! গুন্নাইট মাই বয়!

লাইন কেটে দিয়েছে অরুণাংশু। শেষকালে অমন হেসে উঠল কেন? এর মধ্যে হাসির কী খুঁজে পেল? পরিমল ভাবল, আমরা সবাই মধ্যবয়স্ক হয়ে গেছি, অরুণাংশুর মধ্যে খানিকটা ছেলেমানুষি রয়ে গেছে এখনও। কবিতা লিখতে গেলে, বা কিছু সৃষ্টি করতে গেলে বুকের মধ্যে বোধহয় শৈশব জাগিয়ে রাখতে হয়।

গত বছর এসে অরুণাংশু যেমন জ্বালিয়েছিল খুব, সে-রকম একটা ব্যাপারে অবাকও করেছিল।

অরুণাংশুর বায়নাক্কার শেষ নেই। সঙ্গে নিয়ে এসেছিল পাঁচ জনকে। দিনের মধ্যে দশ-বারোবার চায়ের হুকুম, তা ছাড়াও সর্বক্ষণ এটা চাই, ওটা চাই। গ্রামের একটি মাত্র দোকানে যা সিগারেট ছিল, তা মাত্র দু'দিনে অরুণাংশু বলতে গেলে একাই সব শেষ করে ফেলল, তারপর নৌকোয় করে এক জন লোককে পাশের গ্রামের হাটে পাঠাতে হল সিগারেট আনবার জন্য। অরুণাংশু এখানে যাতে মদ্যপান না করে সে-জন্য কাকুতি-মিনতি করেছিল পরিমল মাস্টার, কিন্তু অরুণাংশু শোনেনি, তার ওপর দুটো কাচের গেলাস ভেঙেছে, এবং খালি বোতলটা রাত্রির অন্ধকারে ফাঁকা মাঠ ভেবে ছুঁড়ে দিয়েছে মেয়েদের হস্টেলের কম্পাউন্ডে। এ-রকম মূর্তিমান উপদ্রব পরিমল মাস্টার এখানে চায় না।

ফিরে গিয়ে সুন্দরবনের গ্রামের পটভূমিকায় অরুণাংশু একটা ছোট গল্প লিখেছিল। সে-গল্পটা পড়ে পরিমলমাস্টার বিস্মিত না হয়ে পারেনি। একেবারে এখানকার গ্রামের নিঁখুত ছবি। সমস্যার খুব গভীরে সে ঢুকতে পারেনি হয়তো, সে-চেষ্টাও করেনি, কিন্তু চমৎকার ছবি ফুটিয়ে তুলেছে। অরুণাংশু গ্রামে ঘুরল না, লোকজনের সঙ্গে কথা বলল না, শুধু আড্ডা দিয়ে আর মদ খেয়ে চলে গেল, তবু সে এত সব পেল কী করে? তবে কি ওদের একঝলক দেখে নিলেই চলে? এরই নাম কি অন্তর্দৃষ্টি?

অরুণাংশুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার সময় অন্যমনস্কভাবে পরিমল মাস্টার প্যাকেটের সবকটা সিগারেটই শেষ করে ফেলেছে। এবার সে বদনকে বলল, একটা বিড়ি দে, বদন!

বদন বিড়ি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসব মাস্টারমশাই?

না রে পাগল! আমি ঠিক গান গাইতে গাইতে চলে যাব।

পরিমল মাস্টারের স্টকে একটিই মাত্র গান। আগুন আমার ভাই, আমি তোমারই জয় গাই। এক-এক সময় এই গানটাকেই সে প্রেম সঙ্গীতের মতো খুব ভাব দিয়ে গান, তখন তার চোখ দু'টি আধো-বোজা হয়ে যায়।

সুলেখা জেগে আছে। থাকবেই, কৌতূহল চেপে মানুষ ঘুমোতে পারে না। সব শুনে সে বলল, এর থেকে খারাপ খবরও তো হতে পারত!

একবার সিগারেট খেতে শুরু করায় পরিমল মাস্টারের মুখ শুল শুল করছে আর একটা সিগারেটের জন্য। অথচ উপায় নেই, এখন যত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়া যায়। পরিমল মাস্টার মশারি তুলে বিছানায় ঢুকে পড়ল আর সুলেখা গেল শিয়রের কাছে জানালাটা বন্ধ করতে।

তখনই সে শুনতে পেলেন কান্নার আওয়াজটা।

বাইরের অন্ধকারে নিঃসাড়ে পড়ে আছে পৃথিবী। আলো নেই, তাই কোনও ছায়া নেই, সেই জন্য কোনও কিছুর অস্তিত্বও নেই। এর মধ্যে কান্নার আওয়াজে কেমন যেন অপ্রাকৃত মনে হয়।

এক জন নয়, অনেকের কান্না। সুলেখা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনে মুখ ফেরাল।

কী?

কারা যেন কাঁদছে। এখন তো সাপখোপের দিন নয়।

মশারির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে একটু দ্বিধা করল পরিমল মাস্টার। জানলার কাছ থেকে সরে এসে খুব কাতর গলায় বলল, আমার খুব ঘুম পেয়েছে, এত রাতে করবার কিছু নেই। জানলাটা বন্ধ করে দাও, আমি একটু ঘুমোই।

মাধবমাঝির বিবরণ

তুমি তো সঙ্গে ছিলে, মাধবমাঝি, তবু কেন এ-রকম হল?

মাধব মাঝি এমন উত্তেজিত যে তার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে, চোখ দু'টি অন্ধকারে বেড়ালের চোখের মতো, মাথার চুলগুলো খাড়া খাড়া, কথা বলতে গিয়ে তোতলাচ্ছে।

আমি... আমি... শাল্‌লা, বাপের জন্মে এমন কাণ্ড দেখি নাই, কখনও শুনি নাই। কেউ... আমরা কেউ দ্যাখলাম না, একটা পাতা পড়ার শ-শ শব্দ শুনলাম না, আর একটা মানুষ মইধ্যখান থিকা...

মধু ভাঙতে, কাঠ কাটতে যে-দলটি গিয়েছিল জঙ্গলে, তারা অসময়ে ফিরে এসেছে। মাধব ছাড়া আর বাকি ক'জন মাটিলেপা দেয়ালের মতো মুখ করে বসে আছে ঠায়। কাঁদছে ডলি, কবিতা, বাসনা আর প্রতিবেশীদের কয়েকটি স্ত্রীলোক। মনোরঞ্জন ফেরেনি।

এত রাতেও নাজনেখালির মাতব্বর ব্যক্তিরা এসে জড়ো হয়েছে এ বাড়িতে। এ-রকম সংবাদ শুনলে সবাই আসে। একেবারে শেষে এল নৌকোর মালিক মহাদেব মিস্তিরি। প্রত্যেক বার নতুন করে বিবৃত হচ্ছে পুরো কাহিনি। পুরুষরা কেউ কাঁদে না, কারণ এমন কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা নয়, সুন্দরবনের আসল জঙ্গলে গেলে এক-আধ জনকে বাঘের মুখে পড়তে হবে, এতে অবার হবার কী আছে? যারা চোরাই কাঠ আনে, তাদের সঙ্গে কারবার আছে মহাদেব মিস্তিরির। এই তো গত মাসেই সে-রকম একটা দলের রফিকুল মোল্লা খতম হয়ে গেল। নাড়িভুঁড়ি বার করা অবস্থা রফিকুল মোল্লার লাশ নামানো হয়েছিল ন্যাজাট জেটিতে। গোসাবার কাছে একটা গ্রামের নামই বিধবা গ্রাম হয়ে গেছে না? কাঠ কাটা কেন, যত জেলে মাছ ধরতে যায়, তারা সবাই কি ফেরে?

কিন্তু এরা তো গিয়েছিল পারমিট নিয়ে, আইনসম্মত ভাবে। বাঘ বুঝি আইন মানে, পারমিট থাকলে কাছে ঘেঁষে না, সে-কথা হচ্ছে না। সুন্দরবনের কাঠ কেটে সুন্দরবনের অর্ধেক মানুষের পেট চলে। অথচ জঙ্গল কেটে সাফ করে ফেললে বাঘ বাঁচবে কী করে? আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা বাঘ দেখবে না? সেই জন্য তৈরি হয়েছে টাইগার প্রজেক্ট। সরকার বিভিন্ন জঙ্গলের বিশেষ বিশেষ অংশ 'কোর এরিয়া' বলে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। সেখানে শুধু বাঘ থাকবে, মানুষের প্রবেশ নিষেধ। বাকি জঙ্গলে পারমিট নিয়ে যার খুশি কাঠ বা মধু আনতে যাক না! চুরি করে কাঠ কাটতে গেলে তো ধরা পড়লে নৌকো বাজেয়াপ্ত হবেই, জেলও খাটতে হবে। যে-কোনও চুরিরই শাস্তি আছে। কার জিনিস কে চুরি করছে, সে আলাদা কথা!

একটা ছোটখাটো পাহাড়ের মতো চেহারা মহাদেব মিস্তিরির। পয়সার জোর, বন্দুকের জোর আর গায়ের জোর আছে বলেই না লোকে তাকে মানে। তবে নিজের গ্রামের লোকের রক্ত শুষে সে টাকা বানিয়েছে, এমন অপবাদ তাকে কেউ দিতে পারবে না। তার চালের ব্যবসা, কাঠের ব্যবসা সবই বাইরের লোকের সঙ্গে।

মহাদেব মিস্তিরিকে দেখে কবিতা কাঁদতে কাঁদতেই একখানা চাটাই এনে উঠোনে পেতে দিল। মহাদেব মিস্তিরি মাধব মাঝির সামনে গ্যাঁট হয়ে বসল, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। গাঁজার কল্কে টানার মতো হাত মুঠো করে সিগারেট টানলে তার আঙুলের চারটি আংটি দেখা যায়।

ছেলে-ছোকরাদের না হয় মাথা গরম, কিন্তু মাধব, তুমি তো পোড় খাওয়া মানুষ। তুমি কী বলে এমন আহাম্মুকি করলে?

আপনে, আপনে বিশ্বাস করেন মহাদেবদা, ঠাকুর ফরেস্টে আমি আগে কতবার গেছি, কোনও দিন কিচ্ছু হয় নাই —।

ঠাকুর ফরেস্টে বাঘ? তুমি বলো কী মাধব? সেখানে তো একটা শিয়ালও নেই।

দয়াপুরে বাঘ আছে? ছোট মোল্লাখালিতে বাঘ আসে ক্যামনে, আপনে আমারে কন তো? আসে নাই সেখানে বাঘ?

মিস্তিরি সম্প্রদায়ের সকলেই বৈষ্ণব। মহাদেবের গলায় কণ্ঠী আছে। হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে মহাদেব বলল, শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু! ছোট মোল্লাখালিতে যে-দিন বাঘ আসে, সে-দিন সেখানে মহাদেব উপস্থিত। হাটের কাজকর্ম সেরে সে রাত্তিরে-রাত্তিরেই নৌকোয় উঠেছিল। ভাবলে এখনও গা শিউরে ওঠে যে, তার নৌকোর পাশ দিয়েই বাঘটা সাঁতরে গিয়েছিল ছোট মোল্লাখালির দিকে।

আসল কাহিনি ভুলে গিয়ে সকলে কিছুক্ষণের জন্য ছোট মোল্লাখালির সেই বাঘ আসার দিনটির গল্পে মগ্ন হয়। দয়াপুর গ্রামের বাঘটাকে তো ধরে নিয়ে রাখা হয়েছে কলকাতার চিড়িয়াখানায়। কী যেন একটা শখের নাম রাখা হয়েছে সেই বাঘটার, দয়ারাম না সুন্দরলাল?

কাঁদতে কাঁদতে একটু থেমে গিয়ে ডলি হঠাৎ দাঁত কিড়মিড় করে বাসনাকে বলল, রাক্ষুসী, তুই-ই তো আমার ছেলেটাকে খেলি। হারামজাদি বিয়ের পর এখনও বছর ঘোরেনি, এর মধ্যে কেউ সোয়ামিকে জঙ্গলে পাঠায়? কতবার বলিছি, রাত্তিরে চুল খোলা রাখবি না, তা ঢঙি বউ সে-কথাই শোনে না! স্বামীর অকল্যাণের কথা যে না ভাবে... ছোটলোকের ঘরের মেয়ে... বিয়ের সময় একখানা শাড়ি দিয়েছে, শাড়ি তো নয় গামছা —।

বলতে বলতে উঠে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডলি বাসনার চুল ধরে টেনে ফেলে দিল মাটিতে। আজ বিকেল পর্যন্ত ছেলের বউ ছিল তার আদরের পুতুল। মাতৃস্নেহ তাকে হঠাৎ উন্মাদিনী করেছে।

অন্য স্ত্রীলোকেরা ডলিকে জোর করে ছাড়িয়ে দিল।

ডলি তখনও চিৎকার করছে, বনবিবির পুজো দেবে? কেন, জয়মণিপুরে বনবিবির থান নেই? খালিসপুরে নেই? উজিয়ে সেই বাঘের মুখে যেতে হবে? শতেকখোয়ারি মাগি, ছোটলোকের ঘরের মেয়ে...কোনও রকম হায়া জ্ঞান নেই...।

ডলিকে দু'জনে টানতে টানতে নিয়ে গেল অন্য দিকে।

পুরুষের দল কথা থামিয়ে এ-দিকে চুপ করে চেয়ে ছিল। মেয়ে ছেলেদের ব্যাপারে তারা মাথা ঘামায় না।

তারপর গোড়া থেকে সব খুলে বলো তো?

আমি বলছি।

তুই থাম সাধুচরণ, মাধবের মুখ থেকে শুনব।

হাঁটু দুটো দু হাত দিয়ে ঘিরে বসে আছে মাধব। ডান হাতটা মুঠো করে পাকানো আঙুলের ফাঁকে চেপে ধরা একটা বিড়ি। টানার কথা খেয়াল নেই। বিনা দোষে প্রচণ্ড শাস্তি পাওয়া মানুষের মতো তার মুখ। সে প্রায়ই ভাবছে নিজের কথা। মনোরঞ্জন মারা গেছে, কিন্তু সে নিজেই কি মরেনি? কাঠ বা মধু কিছুই আনা হল না, ফিরতে হল খালি হাতে, অথচ পরিমল মাস্টারের কো-অপ দোকানে ধার রয়ে গেল। এই ধার কী করে এখন শুধবে? মনোরঞ্জনের জন্য আপশোস করলে এখন তার নিজের পেটের জ্বালা মিটবে?

তাহলে শোনেন, প্রথম রাইতটা তো আমরা কাটাইলাম দত্ত ফরেস্টে, ফরেস্ট-অফিসের ধারেই। বড়বাবু ঘুমায়ে পড়েছিলেন, তেনারে তো জাগানো যায় না, পরদিন সকালে পারমিট দেখাতে হবে। সে-রাইতে রান্না করল সাধুচরণ আর বিদ্যুৎ, মনোরঞ্জন আমাগো দুই-তিনখান গান শোনাইল...। আহা কী যেন একখান, ভারি সুন্দর গান গেয়েছিল... আমরা কইলাম, মনোরঞ্জন, আর একবার গা, আর একবার...।

পরদিন সকালে ভাটা, তাই বসে থাকতে হল দুপুর পর্যন্ত। তারপর ওরা যেতে লাগল মরিচঝাঁপির পাশ দিয়ে। হাল এক জন, বৈঠা এক জন, অন্য চার জন তাস পেটায়। সন্ধের কাছাকাছি একটা খাঁড়ির মুখে নৌকো বেঁধে কতক খেপলা জাল ফেলে দেখা হল মাছের আশায়। জোয়ারের সময় মাছ পাওয়ার আশা খুব কম, শুধু শুধু পণ্ডশ্রম হতে হতেও শেষবারে সাধুচরণের হাতে উঠল একটা কচ্ছপ। বিদ্যুৎ ক্ষীণ আপত্তি তুলেছিল। কচ্ছপ অযাত্রা। সে-কথায় কেউ পাত্তা দেয়নি। নোনা জলের কচ্ছপের স্বাদই আলাদা।

নৌকোয় একটা মুরগি রয়েছে অবশ্য, কিন্তু সেটি ছোঁয়া যাবে না। ওটা বনবিবির কাছে মনোরঞ্জনের মানত করা।

রাত্তিরে নৌকো চালানো হবে কি না তা নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। ছ'জনের মধ্যে চার জনই এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে, কিন্তু দলনেতা হিসেবে মাধব বলেছিল, না। এরপর আর কোনও জনবসতি নেই, এখানে ডাকাতদের অবাধ স্বাধীনতা। প্রথম কয়েকটা রাত অন্তত হাল-গতিক বুঝে নেওয়া দরকার।

খুব ছোট একটা খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে এমন ভাবে নৌকো বাঁধা হল, যাতে বাইরে থেকে দেখাই যাবে না। দু'জন দু'জন পালা করে রাত জেগে পাহারা দেবে। কচ্ছপের মাংসটা জমে গেল দারুণ, ভাত কম পড়ে গেল মাধবের, যেটুকু ঝোল বাকি ছিল তাতেই সে আর এক থালা ভাত মেরে দিতে পারত।

গান গাওয়া নিষেধ বলেই ঘুমিয়ে পড়ল মনোরঞ্জন, সে আর নিরাপদ পাহারা দেবার পালা নিয়েছে শেষ রাত্রে। কিন্তু মাঝরাতেই জেগে উঠতে হল সবাইকে। বিদ্যুৎ জাগিয়ে দিল, খুব কাছ দিয়ে নৌকো যাচ্ছে দু'খানা। বিদ্যুতের ফিসফিসে গলা কেঁপে যাচ্ছে ভয়ে। সাধুচরণ আর মনোরঞ্জন পাটাতনের তলা থেকে বার কবল দু'খানা লাঠি। কিন্তু ঘুমচোখেই মাধব নৌকো দু'খানা এক নজর দেখে নিয়ে বলল, কী আপদ! এর জইন্যে কাচা ঘুমডা ভাঙাইয়া দিলি। ও কিছু না, অরা চোরাই কাঠের ব্যাপারী।

মাধব ভুক্তভোগী, সে ডাকাতেব নৌকো চেনে। একটা দল এ-দিকে ডাকাতি করে পালিয়ে যায় জযবাংলায়, আবার জয়বাংলায় ডাকাতি করে চলে আসে এ-দিকে। ওদেব হাতে পড়লে এই লাঠিতে কুলোবে না, ওদের কাছে বন্দুক থাকে।

নির্বিঘ্নে রাত কেটে গেল। আবাব যাত্রা। মরিচঝাঁপি থেকে কিছু শুকনো ডালপালা তুলে নেওয়া হল, জ্বালানির জন্য। এ জঙ্গলে ভাল জাতের কাঠ বিশেষ কিছু বাকি নেই, বাঙাল-রিফিউজিরাই কেটে সাফ করে দিয়ে গেছে প্রায়।

এবাব আসল দিনটার কথা। সেটা চতুর্থ দিন। তাব আগে এক দিন মাঝনদীতে পেট্রোলের লঞ্চ অর্থাৎ পুলিশ পেট্রল ওদের নৌকো আটকায়। সে-দিন বড় আনন্দ হয়েছিল মাধবের। পুলিশের নাকের ডগায় দেখিয়ে দিল পারমিটের কাগজখানা। এর আগে আর কোনও বার সে এমন গর্বোন্নত মুখে পুলিশের সামনে দাঁড়াতে পারেনি। পুলিশবাও চিনতে পেরেছে মাধবকে। তাকে বে-কায়দায় না পেয়ে বড়ই নিরাশ হয়েছিল তারা।

এরপর কাহিনির মধ্যে খানিকটা কারচুপি আছে। মাধব মিথ্যে কথা তেমন ভাল করে সাজিয়ে বলতে পারে না বলে সে হঠাৎ কাশতে শুরু করে দিল। কাশির দমকে বেঁকে গিয়ে কোনওক্রমে বলল, এবার থেকে তুই বল, সাধু... আপনেরা অর মুখ থেইক্যা শোনেন।

সাধুচরণ বলল, মঙ্গলবার দিনকে সকাল ন'টায় পৌঁছে আমরা প্রথমে বনবিবির পুজো দিলাম। সে-বেলাটা আর কাজে হাত না দিয়ে দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর... প্রথমেই শুভ লক্ষণ...দেখি যে সামনের একটা গরাণ গাছের মাথায় বসে আছে একটা কাঁক, এই অ্যাত্ত বড়।

কাক নয়, কাঁক। খুব লম্বা গলাওয়ালা একজাতীয় পাখি, সাদায় কালোয় মেশানো, কাটলে অন্তত সোয়া কেজি মাংস হবে, বড় লোভনীয়, খুব সুস্বাদু। এ-দিকে কাঁক প্রায় দেখাই যায় না। সুতরাং কাঁকের নাম শুনে এই শোকের উঠোনেও শ্রোতাদের মন আনচান করে উঠল।

মারতে পারলি সেটাকে?

নাঃ! নিরাপদ গুলতি নিয়ে গেসল, কিন্তু টিপ করার আগেই সে সুম্বন্ধির ভাই উড়ে পালাল।

সুন্দরবনের সব জঙ্গলই বাইরে থেকে দেখতে এক রকম। নৌকোয় বা লঞ্চে চেপে পাশ দিয়ে গেলে তিন নম্বর ব্লক বা সাত নম্বর ব্লকে কোনও তফাত নেই। তবে পারমিটের এলাকা মানেই বারোয়ারি। আর পাঁচ জন আগে থেকেই এসে সেখানকার ভাল ভাল মাল তুলে নিয়ে গেছে। ওদের পারমিট ছিল ওই তিন নম্বর ব্লকে গাছ কাটার।

কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে আসল জঙ্গল হল সাত নম্বর ব্লক। শুধু কাঁক কেন, শামুকখোল, কাস্তে-চরা, বাটাম পাখির ছড়াছড়ি সেখানে। ঝাঁকের পর ঝাঁক, গুলতি চালালে একটা-দুটো মরবেই। আর ভাল ভাল জাতের কাঠও আছে এই সাত নম্বরেই। মোটা মোটা হেঁতাল আর গরাণ — এই দুই জাতের কাঠের ভাল দাম পাওয়া যায়। সুন্দরী গাছ এ তল্লাটে নেই বললেই চলে, সবই পড়েছে বাংলাদেশের সুন্দরবনে, এ-দিকে যা কিছু আছে তা ওই সাত নম্বর ব্লকেই।

পৃথিবীর অন্যান্য সব নিষিদ্ধ দ্রব্যের মতোই নিষিদ্ধ জঙ্গলের প্রতিই মানুষের বেশি আকর্ষণ। আর, তিন নম্বর ব্লক থেকে সাত নম্বর ব্লক কতটুকুই-বা দূর, আড়াআড়ি দুটো নদী পার হয়ে তিনটে ট্যাঁক ছাড়ালেই হয়। এ-দিকে পেট্রোলের লঞ্চ বা নৌকোও তেমন আসে না। তিন নম্বর ব্লকে বনবিবির পুজো দিয়ে ওরা রওনা হয়েছিল সাত নম্বর ব্লকের দিকে। সুতরাং ওদের অভিযান সাত নম্বর ব্লকে হলেও সাধুচরণ সুকৌশলে বর্ণনা দিতে লাগল তিন নম্বরের নিরীহ জঙ্গলের।

তিন নম্বরে বাঘ নেই। সাত নম্বরে যদি বাঘ না থাকবে, তাহলে সেটা নিষিদ্ধ জঙ্গল হবে কেন? সাত নম্বর একেবারে কোর-এরিয়ার মধ্যিখানে। তবু পাঁচ-পাঁচটা জোয়ান ছেলে যদি সেখানে যেতে চায়, মাধব আপত্তি করতে পারে কি? মাধব পুলিশের ভয় পায়, ফরেস্ট অফিসের বাবুদের ভয় পায়, এমনকী ডাকাতদেরও ভয় পায়। কিন্তু কোনও জঙ্গলকেই সে ভয় পায় না। সে একলা যমেরও মুখোমুখি হতে পারে, যদি যম প্রকৃত বীরপুরুষের মতো খালি হাতে একা লড়তে আসেন তার সঙ্গে। যদি তিনি বড়মিঞার ছদ্মবেশে আসেন, তাতেও মাধবের কুছ পরোয়া নেই।

মাধব বার বার ওদের বাজিয়ে নিয়েছিল। সাধুচরণ, বিদ্যুৎ, নিরাপদ, সুভাষ আর মনোরঞ্জন একবাক্যে রাজি। একে তো পাখির মাংস খাওয়ার লোভ, তাছাড়া, এত কষ্ট করে এসেছে যখন, তখন নৌকো ভর্তি ভাল ভাল কাঠ নিয়ে না ফিরতে পারলে আর লাভ কী? এই লাভের চিন্তাটাই মাধবকে বেশি টানে।

নিয়ম হল, নৌকো বাঁধবার পর বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে জঙ্গলটা বুঝে নিতে হয়। সাত নম্বর ব্লকে অনেক বাঁদর আছে, এই বাঁদরের ডাকের ধবন শুনে টের পাওয়া যায় বাঘের গতিবিধির। সব লক্ষণই বেশ ভাল।

আশ্চর্য ব্যাপার। বাঘের নামে যেমন গা ছম ছম করে, তেমনি আকর্ষণও করে। দেরি সহ্য হয় না, মনে হয়, কখন জঙ্গলে নামবে। সাধুচরণ আর নিরাপদ অস্থির হয়ে বলেছিল, জঙ্গল তো একেবারে পরিষ্কার। তা বলে এবার...। মাধব তাদের ধমকে বলেছিল, দাঁড়া। এত হুড়োহুড়ি কীসের?

নদী এখানে খুব চওড়া। এ-পারে ও-পারে বনের সবুজ রেখা। আকাশ যেন এখানে বিশাল ডানা মেলে আছে। পাড়ের থকথকে কাদার মধ্যেও উঁচু উঁচু হয়ে আছে বড় বড় শূল। তারপর ছোট ছোট

হেঁতালের ঝোঁপ। জোয়ারের সময় ওই গাছগুলোর অর্ধেক পর্যন্ত জলে ডুবে যায়। আর এই হেঁতালের হলুদ-সবুজ ঝোপের আড়ালেই বাঘের লুকিয়ে থাকার সব চেয়ে ভাল জায়গা।

সন্ধের সময় পৌঁছে ওরা পাড় থেকে অনেক দূরে নৌকো বেঁধে রইল। বাঘ সাঁতরেও আসতে পারে বটে, কিন্তু ওরা তো দু'জন দু'জন পালা করে জেগে থাকবেই। আসুক না একবার সাঁতরে, জলের বাঘকে পিটিয়ে মারা বড় আরামের। ওদের প্রত্যেকেবই মনে একবার অন্তত একটা বাঘ মারার ব্যাপারে অংশ নেওয়ার সুখস্বপ্ন লুকিয়ে আছে। বাদা অঞ্চলে এমন মানুষ একটিও নেই যে পাশ ফিরে পড়ে থাকা নিহত বাঘের মুখ দেখে জীবনে অন্তত একবার আমোদ করতে চায় না। এরা জানে না, ডেনমার্কের যুবরাজের মনের খবর।

সারা রাত জঙ্গল একেবারে নিস্তব্ধ। এমনকী বাঁদরদের হুপোহুপিও নেই। শুধু সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল জলতরঙ্গ পাখির ডাক। ট-র-র-র। ট-র-র-র। ট-র-র-র! কেউ কোনও দিন এই জলতরঙ্গ পাখি চোখে দেখেনি। শুধু রাত্তিরবেলা এদের ডাক শোনা যায়।

ভোরবেলা কিছু দূরে মানুষের গলার আওয়াজ শুনে ওরা একেবারে তাজ্জব। মাধব তক্ষুনি চার হাতে বৈঠা চালিয়ে পালাতে চেয়েছিল, কিন্তু সামনের বাঁক ঘুরে একটি নৌকো এ-দিকে আসতেই ওরা আশ্বস্ত হল। পুলিশ বা বনরক্ষী নয়, ডাকাতও নয়, অন্য নৌকোটির হাল ধরে আছে কুমিরমারির দাউদ শেখ, ওদের সবারই চেনা। বেশ বড় একটা পার্টি নিয়ে এসেছে দাউদ শেখ, এদেরও চোরাই কাঠের ধান্দা। দু'টি নৌকো পাশাপাশি এসে বিড়ি ও শুভেচ্ছা বিনিময় হল। ওদের দলে এক জন মউলে রয়েছে, সে মধুর সন্ধান দিতে পারবে।

তাহলে তো একেবারে নিশ্চিন্ত। এত মানুষজন দেখলে বড় মিঞার বাবাও এ-দিকে আর ঘেঁষবে না। মাধব তক্ষুনি ঠিক করে নিল, খুব চটপট কাজ সারতে হবে, এখানে দু'দিনের বেশি থাকা নয়, সারাদিন খেটে এখান থেকে সংগ্রহ করতে হবে বারো আনা মতো কাঠ। বাকি চার আনার জন্য ফিরে যেতে হবে তিন নম্বর ব্লকে, সেখানে থেকে আবার কিছু কাঠ কেটে সেই কাঠ চাপা দিতে হবে ওপরে।

দাউদ শেখের নৌকো খুঁটি গাড়ল ওদের দৃষ্টিসীমাব দূরত্বের মধ্যেই। তবে ওরা যাবে বাঁ-দিকে। আর এরা যাবে ডান দিকে, যাতে জঙ্গলের মধ্যে নেমে দু'দলে গুঁতোগুঁতি না হয়। শুধু মৌচাকের সন্ধান যে-দলই পাক, অন্য দলকে তার সন্ধান দিয়ে অর্ধেক ভাগ দিতে হবে, এই রইল মৌখিক চুক্তি।

যত সহজ ভাবা গিয়েছিল, তত সহজ নয় পাখি মারা। যে-কাঁক পাখিটার কথা সাধুচরণ বলল তিন নম্বরে দেখেছে, আসলে তো সেটা ছিল সাত নম্বরে একটা গরাণ গাছের মাথায়। এই পাখিগুলোর অদ্ভুত স্বভাব, এরা গাছের মগডাল ছাড়া বসে না। নিরাপদ গুলতি চালিয়ে সেটাকে তো মারতেই পারল না, বরং সেই তোড়জোড়ে উড়ে গেল কাছাকাছি চরের ওপরে বসে থাকে একঝাঁক কাস্তে-চরা।

রাতের হিমেল হাওয়া লেগে সুভাষের গায়ে বেশ জ্বর এসে গেছে। এবং এক রাতের জ্বরেই মুখটা বেশ ফুলে গেছে তার, চোখ দুটো পাকা করমচার মতো। বেশ চিন্তার ব্যাপার। এই অবস্থায় তার পক্ষে গাছ কাটতে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আবার তাকে নৌকোয় একা রেখে যাওয়া যায়ই-বা কী করে? এক জন কেউ থেকে যাবে তার সঙ্গে? কে থাকবে, মনোরঞ্জন! বিদ্যুৎ! সবাই এ-ওর মুখের দিকে তাকায়। অর্থাৎ কারুরই থাকার ইচ্ছে নেই। জঙ্গলে পা দেওয়ার জন্য চাপা উত্তেজনা যেন আর দমন করতে পারছে না। সুভাষ বলল, না, নয় আমি একাই থাকব! দিনেরবেলা...হেঃ...তাতে আবার ভয়? সত্যিই দিনের আলোয় কোনও ভয় মনে আসে না। সুভাষকে রেখে যাওয়া হল নৌকোয়, রান্নাবান্নার ব্যবস্থা সে-ই করবে।

কুড়ুল আর করাত নিয়ে বাকিরা নেমে পড়ে নৌকো থেকে। লুঙ্গি পরা খালি গা, খালি পা। এদের মধ্যে একমাত্র মাধব ছাড়া বাকি চার জনই কিন্তু মাঝে-মাঝে শৌখিন জামা গায়ে দেয়, সাধুচরণ এবং মনোরঞ্জন ফুল প্যান্টও পরে। ক্যানিং-এ কখনও সিনেমা দেখতে গেলে ওরা বেশ সাজগোজ করেই যায়। মনোরঞ্জন শ্বশুর বাড়ি গিয়েছিল বিয়ের সময় কাবলি জুতো পায়ে দিয়ে।

হাঁটু পর্যন্ত থকথকে কাদার মধ্যে দিয়ে ওরা বেশ ফুর্তির সঙ্গেই এগিয়ে যায়। শূলগুলো বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে গেলেও ভাঙা শামুক-ঝিনুকে একটু আধটু পা কাটবেই। ওপরে উঠে আসার পর বোঝা যায় বনটি বেশ নিবিড়, এগোতে হবে ঝোপঝাড় ঠেলে। সামনের প্রথম সারির হেঁতালের ঝোপের ওপর কয়েক বার কুড়ুলের ঘা দিতেই ভন ভন করে ওড়ে ঝাঁক ঝাঁক মশা। একটা ছোট গো-সাপ সরসরিয়ে জলে নেমে পড়ে। এ সবই ভাল লক্ষণ।

জঙ্গলের মধ্যে এগোতে হয় লাইন করে। মাধবই সব চেয়ে ভাল চেনে জঙ্গল, সেই জন্য সে আগে আগে যায় পথ তৈরি করে। কোথাও কোনও শব্দ নেই, তাদের পায়ের শব্দ ছাড়া। ভাল গাছের জন্য যেতে হবে একটু ভেতরে, যত দূর পর্যন্ত জোয়ারের জল ওঠে সেই সীমারেখা ছাড়িয়ে।

দাউদ শেখের পার্টি এখনও পাড়ে নামেনি। এখান থেকে শোনা যাচ্ছে ওদের কথাবার্তা। ওদের তুলনায় মাধবের দলটির অবস্থা অনেক ভাল, যদি দৈবাৎ পেট্রলের নৌকো এসেও পড়ে, ওরা পারমিট দেখিয়ে বলবে, ভুল করে তিন নম্বরের বদলে সাত নম্বব ব্লকে এসেছে, নদী চিনতে পারেনি। তার জন্য বড় জোর দশ-বিশ টাকা প্রণামি দিতে হবে, নৌকো কেড়ে নেবে না, জেলেও দেবে না। দাউদ শেখ এ-সব ব্যাপারে একেবারে বেপরোয়া।

একটা গাছেও কোপ মারেনি। মাধব আগাছা সাফ করতে করতে অনেকটা এগিয়ে গেছে। তারপর সাধুচরণ, তারপর বিদ্যুৎ, তারপর মনোরঞ্জন, সব শেষে নিরাপদ। নিরাপদর কোমরে গুলতিটা গোঁজা। তার দু'চোখ এ-দিকে ও-দিক ঘুরছে পাখির সন্ধানে। একটু বুঝি সে অন্য মনস্ক হয়ে পড়েছিল।

মাথায় খুব জোর কেউ ঘুঁষি মারলে চোখের সামনে যেমন খানিকটা হলুদ দেখা যায়, সেই রকমই একটা হলুদের ঝিলিক শুধু দেখতে পেল নিরাপদ, তারপর একটু দূরের একটা ঝোপে হুড়মুড় শব্দ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তুমুল শোরগোল শোনা গেল দাউদ শেখের নৌকো থেকে।

কী হয়েছে ঠিক বুঝতে না পেরেই নিরাপদ চেঁচিয়ে উঠল, ওরে বাবা রে! মা রে!

সাধুচরণের বর্ণনায় এইখানে বাধা দিয়ে মাধব বলল, আমি যেই সেই চিখখৈর শুনিছি, অমনি আর চোক্ষের পলক না ফেইল্যা পিছন ফিরাই রোকেলের মতো (লোকাল ট্রেনেব মতো) ছুটে আসিছি। দেখি যে নেরাপদডা ভেউ ভেউ কইরা কান্দে। আমি যত জিগাই কান্দোস ক্যান —।

বিদ্যুৎ বলল, এই যে দেখুন নিরাপদটা এই বকম একটা বাঁশপাতার মতো থরথর করে কাঁপছিল।

নিরাপদ বলল, আমি কী করব। কিছুই ঠিক দেখিনি। কিছুই ঠিক বুঝিনি, তবু এমনি এমনিই আমার শরীরটা কাঁপতে লাগল, মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না, কিন্তু চোখ দিয়ে জল পড়ে। এমন আমার জীবনে কখনও হয়নি।

সাধুচরণ বলল, আমরা তখনও ভাবছি দাউদ শেখদেরই কোনও বিপদ হয়েছে।

সুভাষ বলল, আমিও নৌকো থেকে শুনছি দাউদ শেখরাই চ্যাঁচাচ্ছে বেশি। ওরা শুধু বলছে বড় মামা! বড় মামা! সেই শুনে তো আমারও কাঁপুনি ধরে গেছে।

মাধব বলল, আমিই প্রথম কইলাম, মনা কই? মনোরঞ্জন?

সবাই ঠিকঠাক আছে, শুধু মনোরঞ্জন নেই। সে সকলের সামনে ছিল না, একেবারে পিছনেও ছিল না, তবু বাঘ তাকেই বেছে নিল।

বর্ণনা শুনতে শুনতে মহাদেব মিস্তিরি বলে উঠল, অ্যাঁ? বলিস কী? শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু!

বিস্মিত হবারই কথা। কাহিনিটি যে এত সংক্ষিপ্ত হবে, তা কেউই কল্পনা করতে পারেনি। বাঘের গর্জন নেই, ঝটাপটি, লড়ালড়ি কিছু হল না, এর মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল? ওদের অভিযান শুরু হতে না-হতেই সারা?

এই সময় আবার ডুকরে কেঁদে উঠল মেয়েমহলে। কামোট-কুমির, জোঁক-সাপ-বাঘ, ভূত-পেত্নি-কলেরা নিয়ে ঘর করতে হয় বাদার মানুষদের, অপঘাতে মৃত্যুর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু যার বিয়ের পর এক বছরও পেরোযনি, সেই মনোবঞ্জনকেই টেনে নিল নিয়তি?

মহাদেব মিস্তিরি ঠোনা মেরে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কিস্যু করতে পারলে না?

মাধব উত্তর না দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

সাধুচরণ আবার শুরু করল তার বিবরণ।

সম্বিত ফিরতেই সকলে হাঁপর ঝাঁপড় করে দৌড়ে এল নৌকোয়। কিন্তু এ-কথা সবাই এক বাক্যে সাক্ষী দেবে যে শুধু একলা মাধব ফেরেনি। আবলুশ কাঠের মতো শক্ত হাতে কুড়ুলটা উঁচু করে তুলে সে পাগলের মতো চিৎকার করছিল, কোথায় গেলি শ্‌শালা, আয়। ওরে পুঙ্গীর ভাই, ওরে চুতমারানির ব্যাটা, আয়। ওরে হারামজাদা, ওরে শুয়ারকি বাচ্চা, শোগামারানি.. ।

দক্ষযজ্ঞের মহাদেবের মতন সে তাণ্ডব নাচতে থাকল বনেব মধ্যে। আর গালাগালির ঝড় তার মুখে। সবাই মাধবের নাম ধরে ডাকছে। সে শুনতেই পাচ্ছে না। তারপর খানিক বাদে দাউদ শেখের দল আর সাধুচরণবা এক সঙ্গে মিলে গেল মাধবেব কাছে। মাধবের তখন চোখ দু'টি লাল, টকটকে, মুখের পাশ দিযে ফেনা বেরুচ্ছে। সকলে গা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিল প্রবল ভাবে। এ-রকম শুনলে বাঘ শিকার ফেলে পালায়।

কিন্তু অত চেঁচামেচি কিংবা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মনোরঞ্জনের লাশ পাওয়া যায়নি।

সাধুচবণ বা মাধববা তো কেউ বাঘটাকে চোখেও দেখেনি, নিরাপদ পাখি-খোঁজায় একটু অন্য মনস্ক ছিল, সে শুধু দেখেছে একটা হলুদ ঝলক। দাউদ শেখ দাবি করে যে সে বাঘের পেছন দিকটা একবার দেখেছে ঝোপের মধ্যে। ওই রকম সা-জোয়ান চেহাবা মনোরঞ্জনের, তাকে মুখে নিয়ে বাঘটা একেবারে চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল?

কিন্তু তুমি তো গুণিন, মাধব? তুমি থাকতে সেখানে বাঘ এল। তুমি আগে মন্তর পড়ে জঙ্গল আটক করোনি?

এ-কথা ঠিক, মাধব এক জন গুণিনও বটে। সে সাপের বিষ ঝাড়ার মন্ত্রও জানে। সেই জন্যই তো সে জঙ্গলকে ভয় পায় না।

মাধব পিছনের অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরিয়ে খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে বলল, হ, আটক করেছিলাম। আমাব মন্তর খাটে নাই।

খাটেনি তা তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু কেন এমন হল?

এবার মাধব একটা অদ্ভুত যুক্তি উপস্থিত করল।

সে চিক করে বাঁ-পাশে থুতু ফেলে বলল, কী জানি! বোধ হয় সেই দিন আমার জন্মদিন আছিল

জন্মদিন?

হ। আপনে জানেন না, জন্মদিনে কোনও গুণিনেরই মন্তব খাটে না?

তা তোমার যে সে-দিন জন্মদিন, তুমি আগে জানতে না?

ক্যামনে জানব? মায় মরেছে সেই কোন ছুটকালে, আর আমার বাপে আমারে দুই চক্ষে দ্যাখতে পারত না। আমারে খ্যাদাইয়া দিছিল। আমারে আমার জন্মদিনের কথা কে কইয়া দেবে? জন্মদিন তো দূরে থাক, নিজের জন্মবারটাই জানি না। আমি আদাড়-ছাদাড়ের মানুষ, কোনও রকমে খুদ কুড়ো খেইয়ে এতগুলান দিন বেঁচে আছি আর কত দিন টানতে পারব কে জানে...।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেকে গেল মাধব। তারপর মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে রইল অন্ধকারের দিকে।

বাসনার বাসা বদল

পরিমল মাস্টারের ঘুম ভাঙল ধুম জ্বর নিয়ে। এই জন্যই সারা রাত ভাল করে ঘুম আসেনি, এ-পাশ ও-পাশ ছটফট করেছে। বড় বিচ্ছিরি এই দখনে জ্বর, যখন তখন আছে, একবার ধরলে সহজে ছাড়তে চায় না।

চোখ মেলার পর একটা হাত দিয়ে কপালটা অনুভব করেই তার ঠোঁট তেতো হয়ে গেল। তার পরই তাঁর মনে পড়ল, আজ অরুণাংশু আসবে। যদি ভোরের ট্রেনেই রওনা দেয় তা হলে এখানে পৌঁছতে পৌঁছতে আড়াইটে-তিনটে হবে। কতটা দূরত্ব হবে কলকাতা থেকে? মাইলের হিসেবে ষাট-সত্তর মাইল, বড় জোর আশি, পাখি-ওড়া মাপে এই দূরত্ব পেরুতেই পাক্কা দশ ঘণ্টা লাগে, তা-ও যদি ঠিকঠাক লঞ্চ ধরা যায় ক্যানিং থেকে। একটা লঞ্চ না পেলেই সারা দিন কাবার।

সুলেখা তখনও জাগেনি। ভোরবেলা উঠে বাগানে পায়চারি করা পরিমল মাস্টারের স্বভাব। মানুষের শরীরে বিদ্যুৎ থাকে, শিশিরভেজা মাটির ওপর খালি পায়ে হাঁটলে তা চলে যায়, মন প্রসন্ন হয়। আজ সকালে বাগানে যাওয়া হবে না। বাগান মানে কাঁচা লঙ্কা ও বেগুনের খেত, অন্য সময় হয় উচ্ছে বা শশা বা ঢ্যাঁড়শ, সামনের দিকে কয়েকটা জবাফুলের গাছও আছে অবশ্য।

আজ অরুণাংশু না এলেই ভাল হত। শহরের সংস্পর্শ পেতে আজ পরিমলের একটুও ইচ্ছে করছে না। আবার চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করল। ঘুম নয় একটু আবল্লী আসে, তাতে চলচ্চিত্রের মতো ছোট ছোট স্বপ্ন।

তোমার চা।

এরই মধ্যে কখন স্নান সারা হয়ে গেছে সুলেখার। তাঁর ভিজে চুলের প্রান্ত থেকে জল ঝরছে। স্নানের ঠিক পর সব মেয়েকেই কেমন যেন পুণ্যবতী পুণ্যবতী দেখায়। সুলেখার দিকে তাকিয়ে শীত করে উঠল পরিমলের।

চায়ের কাপে প্রথম চুমুকটা দিয়ে সিগারেটের টানটা ফিরে এল। সুলেখার সামনে উচ্চারণও করা যাবে না। অরুণাংশু এলে অবশ্য প্রচুর সিগারেট খেতে হবে। অরুণাংশু নিজে যতগুলো খায়, অন্যদেরও খেতেই হবে ততগুলো। নিজের প্যাকেটই হোক আর অন্যের প্যাকেটই হোক, হাতের সামনের প্যাকেট খুলে সে মুড়ি মুড়কির মতো সিগারেট ছড়ায়।

সুলেখার নিষেধের জন্যই নয়, পরিমল নিজেই চায় সিগারেট ছাড়তে। স্বাস্থ্যের ব্যাপার তো আছেই, তা ছাড়া অযথা বাজে খরচ, এবং কেন এই নেশার দাসত্ব? কিন্তু সিগারেট যেন ঠিক মশার মতো। বন্দুক দিয়ে বাঘ-ভালুক মারা যায়। কিন্তু মশা যেমন শেষ করা যায় না, তেমনি ছাড়া যায় না এই সব চেয়ে ছোট নেশাটা।

পরিমল অপেক্ষা করছে কখন সুলেখা নিজে থেকে বুঝতে পারবেন। তার আগে সে বলবে না তাঁর জ্বর হয়েছে।

এক সময় খবরের কাগজ ছাড়া সকালের চা খাওয়া কল্পনাই করা যেত না। এখানে কাগজ আসে দুপুর তিনটের লঞ্চে। না পড়লেও হয় সে-কাগজ।

হাতঘড়ির পাশের টেবিলের ট্রানজিস্টর রেডিয়োটা সে চালিয়ে দিল। রেডিয়োতে যে এত চাষবাস নিয়ে কথাবার্তা হয়, শহরে থাকতে কোনও দিন তা টের পাওয়াই যায়নি। অথবা এতটা বোধহয় আগে হত না। মন দিয়ে সে শুনতে লাগল চাষিভাইদের জন্য পাট চাষ বিষয়ে পরামর্শ। খুব একটা ভুল বলে না, অভিজ্ঞ লোকদেরই ডাকে রেডিয়ো। শুধু একটা জিনিস ওরা বোঝে না। যেখানে বৃষ্টি হয়নি, বিদ্যুৎ নেই বলে যেখানে পাম্প চলে না, নদীর নোনা জল সেখানে চাষের কাজে লাগাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না, সেখানকার চাষিরা রেডিয়োতে অভিজ্ঞ লোকদের মুখে সময় মতো জলসেচের পরামর্শ শুনে কতটা উপকৃত হবে?

তুমি উঠবে না?

হ্যাঁ এই আর একটু। ক'টা বাজে?

সময় জানবার জন্য ঘড়ি দেখতে হয় না। রেডিয়োর অনুষ্ঠানগুলো প্রতি দিন এত ছক বাঁধা, বাংলা খবরের পর রবীন্দ্রসঙ্গীত, অর্থাৎ পৌনে আটটা। এতক্ষণ কোনও দিন শুয়ে থাকে না পরিমল।

তোমার জ্বর হয়েছে?

গায়ে হাত না দিয়েও কী করে টের পেল সুলেখা? সত্যিই কি মেয়েদের সপ্তম ইন্দ্রিয় বলে কিছু ব্যাপার আছে? আসলে সুলেখারও একটু একটু জ্বর হয়েছে। প্রথম দু'এক দিন এ-রকম জ্বরকে উপেক্ষা করে সুলেখা, সেই জন্যই জোর করে স্নান করেছে। পরিমলের অসুখ-ভীতি বেশি, তাই স্বামীর স্পর্শ এড়িয়ে চলছে সুলেখা।

কী জানি, গাটা কেমন যেন ম্যাজ ম্যাজ করছে।

গ্রামসেবকদের মিটিং ক'টায়? এগারোটায় না?

যদি শরীরটা এ-রকম থাকে তাহলে ওদের একটা খবর পাঠাতে হবে, মিটিংটা বন্ধ রাখার দরকার নেই, ওরা নিজেরাই আলোচনা করুক।

বাইরের বারান্দায় দু'জন লোক বসে আছে। ওরা কোনও খবর দেয় না, নিজেদের উপস্থিতির কথাও জানায় না, বিড়ি ধরিয়ে উবু হয়ে বসে থাকে চুপচাপ। মাস্টারমশাই কিংবা দিদিমণি যখন বাইরে বেরুবে, তখন তো কথা হবেই।

ইলা নামে একটি তেরো-চোদ্দো বছরের মেয়ে এ বাড়িতে কাজ করে। সে দাসী নয়, সে স্কুলে যায়, রাত্তিরবেলা হ্যারিকেন জ্বেলে সে পড়তেও বসে। মহিলা সমিতিতে সেলাইয়ের কাজও শেখে, আবার রান্না-বান্নায় সুলেখাকে সাহায্য করে। ইলার বাবা ছিল বিখ্যাত ডাকাত বীরু গোলদার।

সেই বীরু গোলদারের নামে কত রোমহর্ষক কাহিনি প্রচলিত আছে এখনও। পুলিশের গুলি খেয়ে রায়মঙ্গল নদীতে লাফিয়ে পড়েছিল বীরু গোলদার, তারপর আর তাকে দেখতে পাওয়া যায়নি। অনেকের ধারণা সে আজও বেঁচে আছে, ঘাপটি মেরে আছে কোথাও। পাঁচ বছর বয়সের অনাথা মেয়ে ইলাকে আশ্রয় দিয়েছিল সুলেখা। এখন সে বাড়ির মেয়ের মতো।

বাইরের লোক দু'টিকে দেখতে পেয়েছে ইলা। সকাল ন'টার মধ্যে যারা এ বাড়িতে আসে, তারা চা পাবার অধিকারী। বিশেষ দরকার না থাকলে কেউ মাস্টারমশাইয়ের বারান্দায় এমন ভাবে এসে বসবেও না। এটা তো আড্ডাখানা নয়।

দু'টি গেলাসে করে চা এনে ইলা ওদের সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে যায়। ওরা তবু মুখে খোলে না। এমনকী নিজেদের মধ্যেও কোনও কথা বলে না, কারণ বলবার মতো কিছুই নেই। একেবারে চুপ। শুধু সুলুপ সুলুপ শব্দে চায়ে চুমুক দেয়।

প্রায় এক ঘণ্টা বাদে সুলেখা একবার বাইরে এলে ওদের মধ্যে এক জন বলল, দিদিমণি আমরা একবার নাজনেখালিতে যাস্যি, মাস্টারমশাই কি যাবেন?

কেন সেখানে কী আছে? নাজনেখালিতে পরশুদিন পাড়া-মিটিং হয়ে গেছে না?

তা তো হয়ে গিয়েছে। আমরা যাব একবার বিষ্টুপদ খাঁড়ার বাড়িতে। তার ছেলে, সেই যে একবার ভাস্কর পণ্ডিতের পার্ট করেছিল, আমাদের হাটখোলায় যাত্রা হল, আপনিও দেইখে ছিলেন।

হ্যাঁ কী হয়েছে তার?

তাকে বাঘে নিয়ে গিয়েছে নাকি।

এমন আলতো ভাবে ওরা সংবাদটি দেয়, যেন কারুর বাড়ির গাভিন গোরুর বাচ্চা হওয়া কিংবা সরষে খেতে শুঁয়োপোকা লাগার মতো নৈমিত্তিক ব্যাপার!

সুলেখার প্রথমেই মনে পড়ে গত রাত্রির সেই নদী-পেরুনো কান্নার আওয়াজের কথা। নাজনেখালির দিক থেকেই আসছিল বটে।

সুলেখাকে চুপ করে থাকতে দেখে দ্বিতীয় জন খবরটিকে আরও একটু বিশ্বাসযোগ্য করে বলল, জঙ্গল মহলে গেসলো, মাধব মাঝির পার্টির সঙ্গে। এই তো সিদিনকে বিয়ে হল মনোরঞ্জনের।

তোমরা কার কাছে খবর পেলে?

প্রথম খেয়ার মাঝি এসে খবর দিল।

এ-ভাবেই খবর ছড়ায়। এতক্ষণে গোসাবা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে নিশ্চয়ই।

লোক দু'টিকে সুলেখা ডেকে আনল শোঁয়ার ঘরে। পরিমল মাস্টার কাহিনিটা শুনতে শুনতেই খাট থেকে নেমে এল, দেয়ালের হুক থেকে ব্রাশ নিয়ে তাতে পেস্ট মাখাল। ভেতরের উঠোনের টিউবওয়েল থেকে দ্রুত দাঁত মেজে এসে তিনি বলল, ইলা, আমাকে একটা জামা দে তো মা।

নিজের ঈষদুষ্ণ ডান হাতটি এবার স্বামীর কপালে ছুঁইয়ে সুলেখা বলল, তোমার তো অনেক জ্বর দেখছি।

ও কিছু হবে না, ঘুরে আসি একবার।

সুলেখা লোক দু'টিকে জিজ্ঞেস করল, এখন ভাটার সময় না?

কোনও রূপক নয়। একেবারে আক্ষরিক অর্থে নদীর জোয়ার-ভাটা অনুসারে এখানকার জীবন চলে। প্রতি দিন জলের দিক পরিবর্তনের সময় তাই এদের সকলের মুখস্থ।

হ্যাঁ, ভাটা পইড়ে গিয়েছে।

সুলেখা স্বামীকে বলল, তোমাকে যেতে হবে না, আমি যাচ্ছি ওদের সঙ্গে।

না না, আমার সে-রকম কিছু হয়নি। আমি একবার চট করে ঘুরে আসব।

সরাসরি নৌকোয় গেলে এই ভাটার সময় শুধু যাওয়া আসাতেই সময় লাগবে অন্তত ছ'ঘণ্টা। কারণ নদীপথ অনেক ঘুরে। আর এখান থেকে কোনাকুনি কালী নদী পর্যন্ত হেঁটে গেলে, তারপর খেয়া পেরিয়ে আবার ও-পারে হাঁটা, তাতেও লাগবে প্রায় চার ঘণ্টা। যাওয়া মাত্র ফিরে আসা যায় না। অর্থাৎ এ-বেলা ও-বেলার ধাক্কা।

জোয়ারের সময় নদীর জল কানায় কানায় ভরা থাকে বলে জেটি থেকেই নৌকোয় ওঠা যায়। আর ভাটার সময় অন্তত এক হাঁটু কাদা ভাঙতেই হবে দুটো খেয়াঘাটেই। সেই জন্যই এত জ্বর গায়ে স্বামীকে পাঠাতে দিতে রাজি নয় সুলেখা।

গত আট-দশ বছরের মধ্যে আশপাশের গ্রামের যে-কোনও পরিবারের বিপদে আপদে পরিমল মাস্টার গিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে। নাজনেখালির লোকেরা ধরেই নিয়েছে যে যে-কোনও সময় পরিমলমাস্টার এসে পড়বেন। সাধুচরণ তাই সকালেই গা-ঢাকা দিয়েছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খানিকক্ষণ যুক্তি বিনিময় হল। ইলা সুলেখার পক্ষে। সে পরিমল মাস্টারকে যেতে দিতে চায় না, তাই জামা বার করে দেয়নি। শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করতে হল পরিমলকেই। আজ স্কুলে ছুটি, আজকের দিনটা বিশ্রাম নিলে পরিমল হয়তো কাল সুস্থ হয়েও উঠতে পারে। নয়তো আজ অসুস্থ অবস্থায় এত হাঁটাহাঁটি করলে কাল আরও শরীর খারাপ হবেই।

পরিমল থেকে যেতে রাজি হলে আরও এ জন্য যে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, বিকেলের দিকে অরুণাংশু আসতে পারে। তার অনুপস্থিতিতে অরুণাংশু এখানে এসে যদি কোনও গণ্ডগোল বাধায়? এই সব দিনে এই গ্রামের মধ্যে শহরের উপস্থিতি একেবারেই মানায় না।

সুলেখা ইলাকে বলল, আলু সেদ্ধ দিয়ে ফেনা-ভাত চাপিয়ে দিতে। নিজে বাড়ির অন্যান্য কাজ গুছিয়ে ফেলতে লাগল দ্রুত। এক ফাঁকে মহিলা সমিতি থেকেও ঘুরে এল। পাঁচটি মেয়ে সেখানে সেলাই কলে বসে লুঙ্গি বানাচ্ছে।

খানিকটা আপত্তি জানিয়ে তারপর সেই লোক দু'টিও ফেনা-ভাত আলুসেদ্ধ খেয়ে নিল সুলেখার সঙ্গে। ওরা বেরুবার সময় পরিমল মাস্টার এক জনকে বলল, সাধুচরণকে পরে আনিস আমার কাছে। ওর সঙ্গে আমার দরকার আছে।

ওরা চলে যাবার অন্তত আধ ঘণ্টা পরে একটা বই পড়তে পড়তে হঠাৎ মুখ তুলে পরিমল মাস্টার ভাবল, ইস, একটা খুব জরুরি কথা তো ওদের বলে দেওয়া হয়নি। আচ্ছা, থাক, এখন আর অন্য লোক পাঠাবার দরকার নেই, দু-এক দিন পর নিজে গিয়েই বলবে।

এক ঘণ্টা হেঁটে সুলেখা পৌঁছল কালী নদীর খেয়াঘাটে। সেখানে একেবারে ভিড়ে ছয়লাপ। খেয়ায় পারানি মাত্র পাঁচ পয়সা, তা-ও ধার রাখা যায়। নিয়মিত খেয়ার নৌকোটি ছাড়া একটি স্পেশ্যালও চালু হয়েছে। কারুর তো কোনও কাজ নেই, তাই এ-দিকের গ্রাম উজাড় করে সবাই চলেছে নাজনেখালিতে। সেখানে বাঘ নেই। সেখানে বাঘে-ধরা মানুষটার লাশও নেই, তবু তো বাতাসে ভাসছে রোমাঞ্চকর গল্পটি।

ছেলে-ছোকরারা হুড়োহুড়ি লাগিয়েছে আগে খেয়া পার হবার জন্য। সুলেখা ভিড় ঠেলে একেবারে সামনে চলে এল। তাঁকে সবাই চেনে, সবাই একটু ভয়-ভয় করে। বুড়ো মাঝির বদলে তার দুই ছেলে, এক জনের বয়েস তেরো-চোদ্দ, অন্য জনের বয়েস দশের বেশি না। এরা চালাচ্ছে নৌকো। বড় ছেলেটির দিকে চেয়ে সুলেখা বলল, এই, তোর-খেয়ায় কজন লোক যাওয়ার নিয়ম রে?

সে-রকম ধরাবাঁধা নিয়ম কিছু নেই। বারো-চোদ্দো জন লোক উঠলেই নৌকো মোটামুটি ভর্তি হয়ে যায়। সেটা জেনে নিয়ে সুলেখা বলল, খবরদার, বারো জনের বেশি লোক একবারে নিবি না। এই করেই নৌকো ডোবে।

ভিড়ের মধ্যে কয়েকটি যুবকের দিকে তাকিয়ে সে বলল, তোমরা ভাই একটা কাজ করো না। তোমরা দাঁড়িয়ে থেকে একটা বন্দোবস্ত করো, যাতে এক নৌকোয় বারো জনের বেশি না ওঠে। গত মাসেই একবার খেয়ার নৌকো ডুবেছিল —।

সঙ্গের এক জন লোকের কাঁধে হাত দিয়ে, শাড়ি উঁচু করে, প্রায় হাঁটু পর্যন্ত থকথকে কাদার মধ্য দিয়ে গিয়ে সুলেখা নৌকোয় উঠল। পা ধুল না। ও-পারে গিয়ে তো আবার কাদায় নামতেই হবে।

মাথার কয়েকটা সাদা চুল ঝিলিক মারতে শুরু করলেও সুলেখার বয়েস যে ছেচল্লিশ হয়ে গেছে, তা বোঝা যায় না। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। পরনে হলুদ-কালো মেলানো তাঁতের শাড়ি। কারুকে বকুনি দেবার সময়েও সুলেখার মুখখানি হাসি হাসি করে রাখে।

একটা লঞ্চ যাচ্ছে, বড় বড় ঢেউয়ে দুলে উঠছে খেয়ার নৌকো। লঞ্চটার নাম পড়ে সুলেখা জিজ্ঞেস করল, 'মহারানি' এ-দিক দিয়ে যাচ্ছে কেন?

যাত্রীদেরই এক জন উত্তর দিল, 'মহারানি' তো এক মাস ধরে ভাড়া খাটছে টুরিস্ট ডিপার্টে।

কোনও কোনও রুটের সার্ভিস লঞ্চ মাঝে মাঝে সরকারের হয়ে মাসিক ভাড়া খাটে। আশ্চর্য কিছু নয়। সাধারণ যাত্রী কমে গেলে বাঁধা নির্দিষ্ট আয়ের গ্যারান্টি পাওয়া যায়।

ছুটির দিন, একদল শহরের ভ্রমণকারী লঞ্চে চেপে এসেছে সুন্দরবন দেখতে। এই দিকে কিছু দূর গেলেই সজনেখালি পাখিরালায়। যদিও মানসের হাঁসেরা শীতের শেষে অধিকাংশই উড়ে চলে গেছে। সজনেখালির টাওয়ারের ওপর উঠে এই সব নারী-পুরুষ উৎসুক ভাবে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকবে যদি বনের বাঘকে এক পলক দেখা যায়। দেখতে পেলে কত আনন্দ, কত বড় অভিজ্ঞতা। সুলেখা এ-কথা না ভেবে পারল না যে, ঠিক এই সময়ই সে চলেছে একটি বাঘে-খাওয়া মানুষের বাড়িতে। সে এর মধ্যেই শুনে নিয়েছে যে, সেই ছেলেটি মাত্র কিছু দিন আগেই একটি কচি মেয়েকে বিয়ে করে এনেছে। বাদা অঞ্চলে বিধবা হওয়া যে কী ব্যাপার, তা সুলেখা এর মধ্যে অনেক দেখেছে।

যদি বছর খানেকের মধ্যেই শোনা না যায় যে, ওই বাসনা নামের বিধবা মেয়েটি গর্ভবতী হয়েছে, তাহলে সেটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার হবে। অবশ্য মেয়েটি যদি বাঁজা না হয়।

সুলেখা দেখতে এল শোকের বাড়ি, এসে দেখল সেখানে বিপুল ঝগড়া চলছে।

ডলির একেবারেই মাথা খারাপ হয়ে গেছে মনে হয়। পুত্র-শোক এখন দু'টুকরো হয়ে রূপ নিয়েছে হিংসে আর রাগের। বাসনাকে আর সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। তাকেই এই সর্বনাশের মূল মনে করে সে বাসনাকে এই দণ্ডেই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়। বার বার সে বাসনাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে বাড়ির বার করে দিচ্ছে, আবার অন্যরা ফিরিয়ে আনছে তাকে। কুৎসিত গালাগালির ঝড় বইয়ে দিচ্ছে ডলি। বাসনার শ্বশুর থাকতে না পেরে পুত্রবধূর পক্ষ নিয়ে দু'একটা কথা বলতে গিয়েছিল ডলিকে। আর যায় কোথায়, আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল। স্বামীকেও যা নয় গালাগালি শুরু করে দিল, এমনকী ডলি এমন ইঙ্গিতও করল যে, ছেলে মারা যাওয়ায় বাপ খুশি হয়েছে, তা তো খুশি হবেই, এমন ঢলানি বেওয়া মাগির জন্য...।

বাড়ির চারপাশে গিস গিস করছে ভিড়, অনেকে গাছে উঠে দেখছে। বাঘের গল্প এখন দূরে থাক, দুই স্ত্রীলোকের মারামারির মতো এমন মনোহরণ দৃশ্য আর হয় নাকি? টানাটানির সময় ওদের কাপড়চোপড় তো বেসামাল হচ্ছেই, তাছাড়া স্ত্রীলোকের মুখে যৌন-কথা পুরুষেরা বেশি উপভোগ করে।

বাসনাও একেবারে চুপটি করে নেই। কাল শেষরাত থেকে বেশ কয়েক বার মারধোর খাবার পর সে-ও মুখ খুলেছে। কবিতা বেচারি মা ও বউদির মধ্যে পড়ে থামাবার চেষ্টা করছে প্রাণপণে, কিন্তু কে শোনে কার কথা। অন্য প্রতিবেশিনীরাও একেবারে হয়রান হয়ে গেছে। কর্তাব্যক্তিরা সব চুপ। মেয়েদের ঝগড়া তারা কী করে থামাবে?

এর মধ্যে এসে দাঁড়াল সুলেখা।

যে-সব গালিগালাজ বার্ষিত হচ্ছে, তা শুনলে সুলেখার মতো অন্য যে-কোনও ইউনিভার্সিটিতে পড়া নারীর কান লাল তো হবেই, সঙ্গে সঙ্গে কানে হাত চাপা দিয়ে দৌড়ে পালাতে ইচ্ছে হবে। সুলেখা কিন্তু একটুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বুঝে নিল। খুব যে আশ্চর্য হয়েছে, তা-ও নয়।

বিষ্টুপদ যেন খুব ভরসা পেল সুলেখাকে দেখে। কাছে এসে সারা শরীর মুচড়ে বলল, দ্যাখেন তো দিদিমণি, কী পেড়ার! মাথাটা একেবারে খারাপ হইয়ে গিয়েছে। যত বলি, অন্তত শ্রাদ্ধ-শান্তিটা চুকুক, তারপর না হয় বউকে বাপের বাড়ি...। কিছুই শোনে না। আপনি একটু বুঝ দিয়ে বলেন।

সুলেখা কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ডলি তাঁকেও একটা জঘন্য গালাগালি দিয়ে বসল।

তিন-চার জন স্ত্রীলোক জোর করে জাপটে ধরে আছে ডলিকে। সুলেখা তীব্র দৃষ্টিতে ডলির দিকে তাকিয়ে থেকে তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে ওকে বশ করার চেষ্টা করল। কিন্তু তাতে কোনও ফল হল না, গালাগালির স্রোত চলতেই লাগল। ডলি সত্যিই যেন খ্যাপা হয়ে গেছে।

এবার সুলেখা বিষ্টুপদর দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বলল, হাঁ করে দেখছেন কী? দরকার হলে ওকে বেঁধে রাখতে হবে, এই কি পাগলামী করবার সময়? এখন অনেক কাজ আছে না?

দিদিমণির কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে বিষ্টুপদ এবার চেপে ধরল তার বউয়ের চুলের মুঠি, তারপর মনের সাধ মিটিয়ে দু'খানা বিরাট চড় কষাল। তারপর সকলে মিলে ডলিকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের মধ্যে। বাইরে থেকে দরজায় শিকল তুলে দিল বিষ্টুপদ। এখন ও চেঁচাক যত খুশি।

দক্ষ সেনাপতির মতো সুলেখা এবার ভার নিল সব কিছুর। সাধুচরণকে পাওয়া না গেলেও মাধব, সুভাষ, বিদ্যুৎ আর নিরাপদকে খবর পাঠিয়ে ডেকে আনা গেল। এ বাড়িতে এত ভিড়ের মধ্যে কোনও কাজ হবে না, তাই মহাদেব মিস্তিরির পুকুরের বাঁধানো ঘাটে গিয়ে বসল সুলেখা। মাধবের মুখ থেকে সমস্ত বিবরণটা আবার শুনে যাচাই করে নিল, কতটা সত্যি, কতটা অতিরঞ্জিত। মাধব যেখানে দ্বিধা করছিল, সেখানে খেই ধরছিল নিরাপদ।

সব শোনার পর সুলেখা অত্যন্ত পরিষ্কার উচ্চারণে বলল, বেশ, এবার আমি আপনাদের বলছি যে, আপনারা চক্রান্ত করে মনোরঞ্জনকে খুন করে তার লাশ নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে এখানে এসে রটিয়ে দিয়েছেন যে তাকে বাঘে নিয়ে গেছে।

ওরা চারজন স্তম্ভিতের মতন চেয়ে রইল সুলেখার দিকে। এই লেখাপড়া জানা, চশমা-পরা মেয়েছেলেটি এ কী সর্বনাশের কথা বলে?

নিরাপদ প্রায় তোতলাতে তোতলাতে বলল, আমরা ..আমরা মনোরঞ্জনকে খু...খুন করিছি? কেন?

সে আপনারাই ভাল জানেন!

আপনি এ কী বলছেন দিদিমণি। মনোরঞ্জন আমাদের বন্ধু, তাকে হঠাৎ কেন খুন করতে যাব?

বন্ধু বুঝি কখনও বন্ধুকে খুন করে না? শেফালির সঙ্গে বিয়ে হবার আগে সুরেন্দ্রর সঙ্গে নিরাপদর গলায় গলায় বন্ধুত্ব ছিল না?

সে-নিরাপদ অন্য নিরাপদ, অন্য গ্রামের! সুরেন্দ্রকে খুন করে চালান হয়ে গেছে। তবু দিদিমণির মুখে খুনি নিরাপদর নাম শুনে এই নিরাপদর বুক কেঁপে ওঠে। তার ইচ্ছে করে দিদিমণির পা দু'টি চেপে ধরতে।

নিজের স্বভাব অনুযায়ী মাধব তীব্র চোখে চেয়ে আছে সুলেখার দিকে। সে ধরেই রেখেছিল, মাস্টারমশাইয়ের বউ কো-অপের ধারের প্রসঙ্গ তুলবেন। কিন্তু এ আবাব কোন নতুন ঝামেলা? তবু তার অভিজ্ঞ কানে যেন মনে হয়, দিদিমণি মুখে যা বলছেন, আসলে তা বলতে চাইছেন না।

আপনি কী কইতাছেন খুইল্যা কন তো! একই গেরামের এক চাষিরে শুধাশুধি খুন করব, আমাগো কি মাথা খারাপ হইছে?

বিদ্যুৎ বলল, মনোরঞ্জনকে বাঘে নিয়ে গেল, আমরা চোখের সামনে দেখিছি। টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করতে পাইরল না —।

সুলেখা বলল, যে-বনে বাঘ নেই, সে-বন থেকে একটা জলজ্যান্ত মানুষকে বাঘে ধরে নিয়ে গেল? এ-কথা কেউ বিশ্বাস করবে? তোমরা এই ক'জন ছাড়া আর কেউ সাক্ষী আছে?

এবার দু-তিন জন এক সঙ্গে বলে উঠল, আছে, আছে! দাউদ শেখ আর তার দলের লোকজন ছিল —।

সুলেখা বলল, তাই যদি সত্যি হয়, তোমরা সে-কথা ফরেস্ট অফিসে জানিয়েছ? থানায় খবর দিয়েছ?

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। বাদা অঞ্চলে বাঘে মানুষ ধরার সংবাদ হাওয়ার আগে রটে যায়। ফেরার পথে যতগুলো নৌকোর সঙ্গে দেখা হয়েছে সবাই শুনেছে। তারাই তো বার্তাবাহক। এ ছাড়া দত্তফরেস্ট অফিসে আসবার পথে ওরা থেমে এসেছে। সেখানকার বাবুরা জানেন।

কিন্তু কানে শোনা খবর দিয়ে কোনও সরকারি অফিসের কাজ চলে না। সে-জন্য সুলেখা তৈরি হয়েই এসেছে। কাঁধের ঝোলানো ব্যাগ থেকে কাগজ-কলম বার করে সে বললে, থানায় আর ফরেস্ট অফিসে তোমাদের সকলের সই করা লিখিত দরখাস্ত দিতে হবে। তারপর সেই দরখাস্তের কপি পাঠাতে হবে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ। সরকার বাঘ পোষার জন্য অনেক টাকা খরচ করছেন, সেই আদুরে বাঘ যদি কোনও মানুষ মারে, তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে সরকারকে। তা ছাড়া, যে-জঙ্গলে কাঠ কাটার জন্য সরকার পারমিট দিয়েছেন, সেখানেও যদি বাঘ চলে আসে, তাহলে সেই দায়িত্ব সরকারের কাঁধেই বর্তায়।

বাংলায় দরখাস্তের বয়ান লিখে ওদের পড়ে শোনাল সুলেখা।

অন্যরা সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেও মাধব জিজ্ঞেস করল, ক্ষতিপূরণ কে পাবে? আমরা কিছু পামু না? আমাগো কি ক্ষতি কম হইছে!

সুলেখা বলল, আপনাদের কি নিজেদের কারুর নামে পারমিট আছে? নেই? আপনারা ভাড়া-খাটা লোক, আপনাদের কিছু দেবে না। মনোরঞ্জনের জন্যই কতটা কী পাওয়া যাবে, কে জানে। তবু চেষ্টা তো করতে হবে।

মাধব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, সব দিক থেকেই হেরে যাওয়ার ব্যাপার। কেন যে ছেলে-ছোকরাদের কথায় সে নেচে উঠেছিল। সই দিয়েই মাধব উঠে পড়ল। তার তো বসে থাকলে চলবে না, তাকে দিনের খোরাকি জোগাড় করতে হবে।

সাধুচরণের সই না পেলে চলবে না। সে কোথায় লুকিয়ে আছে, বিদ্যুৎ জানে। সে গিয়ে ডাকতেই সুড় সুড় করে চলে এল সাধুচরণ।

সে এসেই ঢিপ করে প্রণাম করল সুলেখার পায়ে।

সুলেখা একটুক্ষণ বিস্মিত ভাবে তাকিয়ে রইল সাধুচরণের মুখের দিকে। সে জানেন, তাঁর স্বামী এই লোকটিকে বিশেষ পছন্দ করে। সাধুচরণকে জমি চাষের জন্য ঋণ দিতে চেয়েছে পরিমল, এমনকী একটা চাকরি পাইয়ে দেবারও আশ্বাস দিয়েছে, তবু এই লোকটি তাঁদের বাড়িতে যেতে চায় না কেন? দশবার খবর পাঠালে একবার আসে।

সাধুচরণ অনুতপ্ত কণ্ঠে বলল, মাস্টারমশাইকে বলবেন, আমি কালই ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব।

সুলেখা জিজ্ঞেস করল, মনোরঞ্জনের বাবার নিজস্ব জমি কতখানি?

তিন বিঘে না চার বিঘে রে নিরাপদ?

তিন বিঘেটাক হবে।

সুলেখা মনে মনে হিসেব কষে নিল। তিন বিঘে এক-ফসলি জমি চাষ করে চার জনের নারী-পুরুষের একটা সংসার সারা বছর চালানো যায় না। মনোরঞ্জন ছিল জোয়ান চেহারার যুবক, সে বছরে কয়েক মাস জন-মজুরি খেটে কিংবা মাঝের সিজনে বাগদা-পোনা ধরে আরও কিছু টাকা রোজগার

করত। মনোরঞ্জনের বাবা বিষ্টুচরণ যথেষ্ট বৃদ্ধ, তার পক্ষে একা নিজের জমি চষে ওঠাই শক্ত। পরিবারের আর তিন জনই স্ত্রীলোক। এ ছাড়া বিষ্টুচরণকে শিগগিরই মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। জমি বিক্রি না হলে মেয়ের বিয়ে হয় না।

সুলেখার বুকের ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। জ্বর বাড়লে এ-রকম হয়। অনেকখানি পথ হেঁটে ফিরতে হবে।

মনোরঞ্জনের বাড়িতে আবার তাঁকে যেতে হল একবার। আলাদা একটি দরখাস্তে বাসনার সই লাগবে। বাঘের মুখে নিহত ব্যক্তির পত্নী হিসেবে সে সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন করছে।

কাজ সেরে উঠে দাঁড়িয়ে সে বাসনার দিকে চেয়ে নরম কণ্ঠে বলল, তুমি আমার সঙ্গে যাবে, না এখানেই থাকতে পারবে?

এই একটি মাত্র সহানুভূতির কথায় বাসনার শোকসাগর আবার উত্তাল হয়ে উঠল। সে সুলেখাকে জড়িয়ে ধরে আকুল ভাবে কাঁদতে কাঁদতে বলল, ও দিদিমণি, আমাকে এ যমপুরীতে ফেলে যাবেন না। ও দিদিমণি!

তাহলে তুমি চলো আমার সঙ্গে।

কিন্তু মনোরঞ্জনের শ্রাদ্ধ-শান্তি হবার আগেই তার বিধবা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, তা-ও কি হয়? সবই হয়, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

ডলি যখন বাসনাকে সহ্য করতে পারছেই না, তখন কয়েকটা দিন অন্তত দু'জনের দূরে দূরে থাকাই ভাল। বিষ্টুচরণ ও প্রতিবেশী স্ত্রীলোককে এই কথা বোঝাল সুলেখা। সে জয়মণিপুরের মহিলা সমিতিতে দু-এক দিন থাকুক, দরকার হয় সেখান থেকে তাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। শ্রাদ্ধের দিন না হয় এখানে আসবে আবার!

দু'খানা করে শাড়ি-ব্লাউজ-শায়া পুঁটলিতে বেঁধে নিয়ে বাসনা চলল সুলেখার সঙ্গে। এক দল লোক অকারণেই আবার আসতে লাগল পিছু পিছু। এত হই-হল্লায় বিরক্ত বোধ করছে সুলেখা, কিন্তু সে জানে, কিছু বলে লাভ হবে না। হাতে কারুর কোনও কাজ নেই বলেই এ-রকম একটা উত্তেজক ঘটনা ওরা তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে দিতে চায় না। মাথার ওপর গন গন করছে রোদ। যদি দু-এক দিন আগে বৃষ্টি নামত, তাহলে আর এত লোক হত না, অনেকেই ব্যস্ত হয়ে উঠত মাঠের কাজে।

ঠিক সময়ে বৃষ্টি নামলে মনোরঞ্জন আর তার বন্ধুবা হযতো যেতই না জঙ্গলে। অকালে-বেঘোবে প্রাণটা দিতে হত না তাকে। প্রকৃতির সামান্য অন্য মনস্কতার ওপরেও অনেকখানি নির্ভর করে মানুষের নিয়তি।

খেয়াঘাটেও এত ভিড় জমল যে নৌকোয় ওঠাই মুশকিল। সবাই বাসনাকে দেখতে চায়। যে-মানুষটাকে কয়েক দিন আগে বাঘে খেয়েছে, তাব যুবতী বিধবা স্ত্রীও তো কম দর্শনীয় নয়!

ছায়া ঢলে-পড়া শেষ বেলায় বাড়ি ফিরে সুলেখা দেখল, জ্বরের ঘোরে পরিমল অজ্ঞান হয়ে আছে। তাঁর কপালে জলপট্টি লাগিয়ে পাশে বসে হাওয়া কবছে ইলা।

দ্বিতীয় অভিযান

এখনও কিছু কাজ বাকি আছে মাধবের, দলপতি হিসাবে তারই দায়িত্ব। আবার ফিরে যেতে হবে জঙ্গলে। মনোরঞ্জনের লাশের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় কি না, তার জন্য খোঁজ করতেই হবে প্রাণপণে। লাশের চিহ্ন যদি পাওয়া যায় তো ভালই, না পেলেও একটা ডাণ্ডা পুঁতে তাতে উড়িয়ে দিতে হবে মনোরঞ্জনের নামে পতাকা। যদি কারুকে বাঘে নেয়, তারপর তার সঙ্গীরা যদি এই শেষ কর্তব্যটুকু পালন না করে, তবে তারা নরকে যায়।

দ্বিতীয় বার যাত্রার জন্য মহাদেব মিস্তিরি নৌকো ভাড়া নেবে না। গ্রামের প্রত্যেক পরিবার থেকে কয়েক মুঠো করে চাল দেবে এই অনুসন্ধান দলটির খোরাকির জন্য। দুর্গাপুজোর ফান্ড থেকে কিছু নগদ টাকাও পাওয়া যাবে পথখরচা হিসেবে। নাজনেখালির পাশেই একটি মাছের ভেড়ি আছে। ভেড়িটির মালিক আগে ছিল বসিরহাটের এক ব্যবসায়ী। পরিমল মাস্টারের পরামর্শে এবং নানা কৌশলে সেই ব্যবসায়ীটির ইজারা নষ্ট করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন ভেড়িটির মালিক গ্রামের সবাই, ওই মাছ বিক্রির টাকায় হয়েছে দুর্গাপুজোর ফান্ড। তাছাড়া বছরে এক দিন ওই ভেড়ি থেকে যার যত খুশি মাছ ধরে বিক্রি করতে পারে।

আজকাল নাটক-নভেলে, সিনেমা-থিয়েটারে ফরেস্ট অফিসের বড়বাবু কিংবা থানার দারোগাকে ঘুষখোর, বদমাস, অত্যাচারী এমনকী রক্তপায়ী দানব হিসেবে দেখানোই নিয়ম। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, এখানকার ফরেস্ট অফিসের রেঞ্জারবাবুটি অতি নিরীহ, সাদাসিধে, ভাল মানুষ? জয়নন্দন ঘোষাল মানুষটি সত্যিই তাই। দারোগার কথায় আমরা পরে আসছি।

জয়নন্দন ঘোষালের দোহারা চেহারা, মধ্যবয়স্ক, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, চোখের মণি দুটো বেড়ালের মতো। এই ধরনের মানুষ সচরাচর খুব ধূর্ত হয়ে থাকে, কিন্তু ইনি বরং একটু বেশি সরল, আড়ালে অন্যরা যাকে বোকা বলে। কণ্ঠস্বর নরম ও শান্ত। জয়নন্দন ঘোষালের এক মামা তাঁকে এই বন বিভাগের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলেন। এই রকম মানুষের পক্ষে যে-কোনও চাকরিই সমান। বিয়ে করেছিলেন যথাসময়ে। উত্তর বাংলায় যখন পোস্টেড ছিলেন, তখন তাঁর স্ত্রী এক চা-বাগানের ম্যানেজারের সঙ্গে নষ্ট হয়। অতি দুর্ধর্ষ ছিল সেই চা-বাগানের ম্যানেজারটি, গুলি করে মানুষ খুন করে ফেলা তার পক্ষে কিছুই নয়। বউ গৃহত্যাগ করার পর জয়নন্দন সম্পূর্ণ নারীবিমুখ হয়ে ধর্মের দিকে ঝুঁকেছেন। দু'বেলা পুজো-আচ্চা করেন। সেই জন্য এই নদী-জঙ্গলের মধ্যে নির্জন বাস তাঁর ভালই লাগে। টাকা-পয়সার দিকে তাঁর লোভ নেই, তাঁর নিচের কর্মচারীরা ঘুষ-ঘাস নেয় নিশ্চয়ই, সে-দিকে তিনি নজর দেন না, কারণ দিলেও কোনও লাভ হয় না। সরকারি অফিসে সহকর্মীদের কে কবে দমন করতে পেরেছে!

জয়নন্দন ঘোষাল খবর পাঠালেন যে, তিনি নিজেই সার্চ পার্টি নিয়ে যাবেন তিন নম্বর ব্লকে। মাধব মাঝির দল তাঁর সঙ্গেই চলুক। সজনেখালির ফরেস্ট অফিস বড় অফিস, তাদের লঞ্চ আছে, কিন্তু জয়নন্দন ঘোষের অধীনে কোনও লঞ্চ নেই। তাঁকে যেতে হবে নৌকোয়।

পাশাপাশি দুটো নৌকো চলল।

মাধবের শরীরে একটা অস্থির অস্থির ভাব। জয়নন্দন ঘোষালের চোখে চোখ রেখে সে কথা বলতে পারে না। মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। অন্তরে একটা চিন্তা পোকার মতো কুরে কুরে খাচ্ছে। তিন নম্বর ব্লকে তো হাজার খোঁজাখুঁজি করেও মনোরঞ্জনের লাশ পাওয়া যাবে না! ওইখানে উড়িয়ে দিতে হবে মনোরঞ্জনের নামে পতাকা? সে নিজে গুণিন হয়ে এমন ফেরেববাজি করবে! ফরেস্টবাবু সঙ্গে যেতে চেয়েই তো যত গোলমাল বাধালেন। নইলে সে ঠিক করেছিল, আর কেউ না যাক, সে নিজেই অন্তত আর একবার সাত নম্বরে গিয়ে মনোরঞ্জনের লাশের খোঁজ করবে। চুপি চুপি সেখানে উড়িয়ে দিয়ে আসবে আর একটা পতাকা। কিন্তু ফরেস্টবাবুর নৌকো সঙ্গে থাকলে সে যায় কী করে?

একবার চুপি চুপি সে জিজ্ঞেস করেছিল, ও সাধু, ফরেস্টের বড়বাবুরে খুইলে কবি নাকি সব সইত্যি কথা? এ বাবু ভাল লোক —।

সাধুচরণ উত্তর দিয়েছিল, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে মাধবদা? তাহলে একবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে না? আমরাও বিপদে পড়ব, আর মনোরঞ্জনের বাপ কোনও ক্ষতিপূরণ পাবে?

যা হবার তা তো হইয়েই গিয়েছে... এখন যদি সব বুঝায়ে বলি...ইনি ভাল লোক, নিশ্চয় সব বোঝবেন।

চুপ করো, একদম চেপে যাও মাধবদা। যতই ভাল লোক হোন, তোমার কথায় কি ইনি মিথ্যে রিপোর্ট লিখবেন? সাত নম্বরে লাশ পাওয়া গেলে ইনি লিখবেন তিন নম্বরে? খবরদার একেবারে মুখ খুলো না। দেখোনি, সাহেবের অন্য কর্মচারীরা আমাদের দিকে কেমন টেরিয়ে টেরিয়ে তাকায়!

এ-কথা ঠিক, জয়নন্দন ঘোষালের নিচের লোকেরা কেউই মাধবদের বিশ্বাস করেনি। তিন নম্বর ব্লকে বাঘ, মামদোবাজি, তারা সব জানে! ঘোষালবাবু যদি সঙ্গে না আসতেন, তাহলে তারা এই লোকগুলোকে চুষে নিঙড়ে নিত। ঘোষালবাবু বোকাসোকা লোক বলেই রিপোর্ট নিতে চলেছেন তিন নম্বরে সত্যি বাঘ এসেছে কি না। যদি বাঘের সন্ধান পাওয়া যায়, ও জায়গাটাকে নোটিফায়েড এরিয়া বলে ঘোষণা করতে হবে, কাঠ কাটার নৌকো আর ও-দিকে যেতে পারবে না। গভর্নমেন্টকেও খবরটা জানাতে হবে।

জয়নন্দন ঘোষালকে খাতির করবার জন্য সাধুচবণ দুপুরবেলা বলল, সার, আমারা পার্শে মাছের তরকারি রেঁধেছি, একটু চেখে দ্যাখবেন নাকি আমাদের রান্না?

জয়নন্দন পাশের নৌকো থেকে বললেন, আমি তো বাবা মাছ-মাংস খাই না। আমি নিরামিষ খাই।

ফরেস্ট অফিসের বড়বাবু নিরামিষ খান শুনে সাধুচরণরা সকলে থ হয়ে যায়। শোনা যায়, আগের বড়বাবুর মাংসের লোভ এত বেশি ছিল যে তিনি নিজে হরিণ মারতেন। এত বড় বে-আইনি কাজটা অন্য যে কেউ করলে শাস্তি দেবার ভারও ছিল তাঁরই হাতে।

জয়নন্দন জিজ্ঞেস করলেন, আর কী রেঁধেছ তোমরা?

আর বিশেষ কিছু বলার মতো নয়। ভাত, ডাল, আলু সেদ্ধ মাখা আর পার্শে মাছের ঝাল। আসবার পথে কয়েক খেপ জাল ফেলে কিছু এই ছোট পার্শে পাওয়া গেছে।

আলু সেদ্ধ কি পেঁয়াজ-লঙ্কা দিয়ে মেখেছ? তবে তাই দাও এক দলা, দেখি কেমন মেখেছ!

ও-নৌকো থেকে বন্দুকধারী ফরেস্ট গার্ড এদের দিকে কটমটিযে তাকায়। বড়বাবু মাছ খান না, কিন্তু তারা তো খায়। তাদের একবার অনুরোধ করা হল না পর্যন্ত!

ভাঁটার সময় দুটো নৌকো পাড়ের কাছে থেমে থাকে পাশাপাশি। কয়েকটা শামুকখোল পাখি উড়ে গেল খুব কাছ দিয়ে। গুলতিটা সঙ্গে আনলেও বার করতে সাহস গেল না নিরাপদর। নিরামিষভোজী বড়বাবুর সামনে পাখি-শিকারও নিশ্চয়ই দোষের হবে।

সময় কাটাতে হবে তো, তাই নিরাপদ একটা গান ধরল আপন মনে।

> অগো সুন্দরী
> তুমি কার কথায় করেছো মন-ভারী।
> অগো সুন্দরী
> যেখানে সেখানে থাকি অনুগত তোমারই
> অগো সুন্দরী...

হঠাৎ মাঝপথে গান থামিয়ে অপ্রস্তুতের মতো চুপ করে গেল নিরাপদ। তার সঙ্গীরা তার দিকে বিস্ফোরিত চোখে নিঃশব্দে চেয়ে আছে। ইস, সে এমন ভুল করল?

এই গানটা মনোরঞ্জন গেয়েছিল যাবার দিনে। বোধহয় নদীর বুকে ঠিক এই রকমই জায়গায়। মাঝনদীতে খোলা হাওয়ায় গলা ফাটিয়ে গান গাওয়ার স্বভাব ছিল মনোরঞ্জনের।

গানটা এত ভাল লেগেছিল যে, ওরা সবাই বার বার গাইতে বলেছিল মনোরঞ্জনকে। শুনে শুনে নিরাপদর মুখস্থ হয়ে গেছে, তবু এটা মনোরঞ্জনের গান, এ গান এখন আর অন্য কেউ গাইতে পারে না। নিরাপদ নিতান্ত অন্যমনস্ক ছিল বলেই —।

পাশের নৌকো থেকে জয়নন্দন বললেন, থামলে কেন, গাও না! বেশ তো গলাটি তোমার! ঠাকুর-দেবতার গান জানো না?

নিরাপদকে আবার গাইতে হল। এবার তার গলার আওয়াজ বদলে গেছে, বিষণ্ণ আর গম্ভীর।

হরি হরায়ে নমো কৃষ্ণ যাদবায়ে নমো
যাদবায়ে মাধবায়ে কেশবায়ে নমো
একবার বল রে...
গোপাল গোবিন্দ নাম, একবার বল রে...

বাঃ বেশ! আর একটা?

একবার গলা খাঁকারি দিয়ে নিল নিরাপদ —

দেশ জননী গো তোমার চরণে
এনেছি রক্তের ডালি...

'বঙ্গাধিপ পরাজয়' নামে যাত্রার গান, সবটা নিরাপদর মনে নেই। তাছাড়া এমনই করুণ রসের গান যে, গাইতে গাইতে গলা ধরে এল তার। শুধু নিরাপদ নয়, এখন এ নৌকোর সকলেরই খুব মনে পড়ছে মনোরঞ্জনের কথা।

তিন নম্বর ব্লক যখন মাত্র আর দু'বাঁক দূরে, সেই সময় হঠাৎ বৃষ্টি নামল ঝিরি ঝিরি করে।

আনন্দে নেচে উঠতে ইচ্ছে করল মাধব আর তার সঙ্গীদের। বৃষ্টি মানেই আনন্দ। বৃষ্টি মানে চাষের শুরু। বৃষ্টি মানে নতুন ভাবে বাঁচার আশা। অবশ্য, এই বৃষ্টিকে ঠিক বিশ্বাস করা যায় না, এ-দিকটা সমুদ্রের অনেক কাছে, এদিকে ঘন ঘন বৃষ্টি হয়। এখানে বৃষ্টি হলেই যে তাদের গ্রামেও বৃষ্টি হবে, তার কোনও মানে নেই। তবু তো বৃষ্টি। আঃ, কত দিন বৃষ্টি ভেজা হয়নি।

এই বৃষ্টিতে আরও বেশি খুশির কারণ আছে। এরপর আর তিন নম্বর ব্লকে বাঘের পায়ের ছাপের প্রমাণ দেখাবার কোনও দরকার হবে না। বৃষ্টিতে সব ধুয়ে গেছে না? এখন মাধবের মুখের কথাই যথেষ্ট।

সামনের ট্যাঁকেই তিন নম্বর ব্লক। এখানে একেবারে ঝড়-মেশানো তুমুল বৃষ্টি। জয়নন্দন ঘোষালের ছাতা উড়ে যাবার মতো অবস্থা। ঝড়-বৃষ্টির সময় দূরের বনরাজি-নীলা বড় সুন্দর দেখায়। কিন্তু তা দেখবার মতো মন এখন কারুর নেই। ওরাও নৌকো ভেড়াল, বৃষ্টিও থামল অমনিই।

এই দ্যাখেন বড়বাবু, এই যে মা বনবিবির থান। এখানে মনোরঞ্জন পূজা দিছিল। সে মানত কইর‍্যা আইছিল তো!

জয়নন্দন ঘোষাল ভক্তি ভরে গড় করলেন, তাঁর দেখাদেখি অন্য সকলেও। সাধুচরণের মনে একটি অভিমান হল মা বনবিবির প্রতি। মনোরঞ্জন তো সত্যিই পুজো দিয়েছিল, তবু মা তাকে রক্ষে করলেন না!

তারপর এই যে, এই গাছে আমরা পেরথমে কোপ দিছি। অ্যাখোনো দাগটা রইছে।

জয়নন্দন বললেন, তুমি তো বাপু গুণিন। তুমি আগে মন্ত্র পড়ে এই জঙ্গল আটক করো তো! কী জানি বলা যায় না!

যে-বনে বাঘ নেই জানা কথা, সেখানে মন্ত্র পড়ায় গুণিনের আর কী কৃতিত্ব! তবু মন্ত্র পড়তে হয় মাধবকে। শেষের দিকে সে চেঁচাতে শুরু করলে অন্যরাও যোগ দেয় সেই চিৎকারে। বন্দুকধারী গার্ডটি বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে। সে জানে, সোঁদরবনের বাঘ বড় টেঁটিয়া, লোকজনের গলায় আওয়াজ শুনলে আরও কাছে আসে। এ তো আর তরাই বনের বাঘ নয় যে, একের বেশি দু'জন মানুষ দেখলেই লেজ গুটিয়ে পালাবে।

তারপর কোন দিকে গিসলে তোমরা?

মাধব এবার সাধুচরণের দিকে তাকায়। ঠিক সাজিয়ে-গুছিয়ে মিথ্যে বর্ণনাটি দেবার ভার তার ওপর।

সে শুরু করল, এই যে বড়বাবু, এই বাইন গাছটার মাথায় কাঁকটা বসেছিল। নিরাপদ চেষ্টা করে মারতে পারল না। তাবপর আমরা সবাই লাইন করে...।

যে-বনে বাঘ নেই, সে-বনে এরপর অনেক খোঁজাখুঁজি করা হল বাঘের চিহ্ন! যে-বনে মনোরঞ্জন বাঘের মুখে পড়েনি, সেই বনে খোঁজা হল তার লাশ। মনোরঞ্জন খালি গায়ে নেমেছিল জঙ্গলে, কিন্তু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের এক জন গার্ড একটা ঝোপের মধ্য থেকে আবিষ্কার করল তার গেঞ্জি। তাতে আবার ছিটে ছিটে রক্ত মাখা। মাধবরা সবাই এক বাক্যে সাক্ষী দিল ওই গেঞ্জি মনোরঞ্জনেরই। নিরাপদ ওই গেঞ্জিটা লুকিয়ে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু লুঙ্গি আনতে পারেনি প্রাণে ধরে।

জয়নন্দন ঘোষাল তাতেই সন্তুষ্ট। কিন্তু বাঘ যে আবার তিন নম্বর ছেড়ে চলে গেছে, তা-ও প্রায় নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। এত হাঁকডাকেও বাঘের কোনও সাড়া নেই। সমুদ্রের মতো এত বড় চওড়া নদী, বাঘ তা-ও সাঁতরে আসে। কুমির-কামটের ভয়ও নেই বাঘের। জানোয়ারের মতো জানোযার বটে!

ফেরার পথে দুটো নৌকো আলাদ হয়ে গেল।

মাধব বলল, আইলামই যখন, তখন দুই-এক বোঝা কাঠ কাইট্যা লইয়া যাই, কী কস তোরা?

নিরাপদ সাধুচরণরা একটু কিন্তু কিন্তু করে। মহাদেব মিস্তিরি বিনা পয়সায় এই নৌকো দিয়েছে আসা-যাওয়ার বাঁধা সময়ের কড়ারে। দেরি হলে সে ধরে ফেলবে।

মাধব বলল, সবাই মিলে ঝপাঝপ হাত লাগালেই তো চাইব-পাঁচ বোঝা কাঠ হয়। বোঝোস না তোরা, ফিরা গিয়া খামু কী?

কিন্তু কাঠ নিয়ে গেলেই তো ধরে ফেলবে!

সে-চিন্তা নাই। যাওনের পথে ছুটো মোল্লাখালিতে নৌকো ভিড়ায়ে কাঠগুলা দাউদ শ্যাখের গুদামে ফেলাইয়া গ্যালেই হবে!

খাঁড়ি দিয়ে খানিকটা ঢুকে ওরা কাঠ কাটতে শুরু করে দেয়। বুদ্ধি করে দু'খানা কুডাল এনেছে মাধব। বাইন-গরাল-হেঁতাল যা সামনে পায় তাতেই ঝপাঝপ কোপ লাগায়। জ্বালানি কাঠ তো জ্বালানিই সই। যা পাওয়া যায়।

বাঘ নেই, তবু বাঘের ভয়ে গা ছম ছম করে নিরাপদর। সব সময় মনে পড়ছে মনোরঞ্জনেব কথা। মনোরঞ্জন ভূত হয়ে কাছাকাছি ঘুরছে না তো? কেন মরতে এসেছিলি মনোরঞ্জন, তোকে তো কেউ ডাকেনি।

পরদিন ওরা গাঁয়ে ফিরল সন্ধে-সন্ধি। ছোট মোল্লাখালিতে কাঠ নামিয়ে দু-চারটে টাকা যা পেয়েছে, তা নিয়ে অনেক দিন পর ওরা ধুম মাতাল হল। সাঁওতাল পাড়ার দু'টাকায় এক হাঁড়ি হাঁড়িয়া, তাই তিন-চার হাঁড়ি টেনে ওরা গড়াগড়ি দিতে লাগল নিশুতি অন্ধকারের মধ্যে হাটখোলায়।

নিরাপদ ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগল, ওরে মনোরঞ্জন তুই কোথায় গেলি? তুই ছাড়া কে হিরো হবে আমাদের যাত্রায়? ওরে, তোকে আমি একবার ক্যানিং-এর খানকি পাড়ায় নিয়ে গেসলাম, কত আনন্দ হল সেবার! ওরে মনা, মনা রে —।

অরুণাংশুর মনোবেদনা

জ্বরের ঘোরে দু'দিন প্রায় বেহুঁশ হয়ে রইল পরিমল মাস্টার।

যেহেতু এ-দিকে গোসাবা ছাড়া কোথাও ডাক্তার নেই, তাই সুলেখা নিজেই হাফ-ডাক্তার। গ্রামের লোকদের টুকিটাকি অসুখে সে নিজেই ওষুধ দেয়, হোমিওপ্যাথিক, অ্যালোপ্যাথিক দু'রকমই।

পরিমলের এতখানি অসুখ হওয়ায় সুলেখার জ্বরটা যেন আপনা থেকেই বিনীত ভাবে সরে গেল। প্রথম রাতে স্বামীকে নিজেই ওষুধ দিল। পরদিন বেলাবেলি এলেন ডাক্তার। তাঁর সন্দেহ, পরিমল মাস্টারের টাইফয়েড হয়েছে। অবশ্য রক্ত পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

অসুখ হয়েছে বলেই যে হুট করে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে, এমন মনে করে না সুলেখা। তাঁর মাথা ঠাণ্ডা, তাঁর বাইরের চাঞ্চল্য কদাচিৎ দেখা যায়। এই যদি সুলেখার এরকম অসুখ হত, তাহলে পরিমল খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়ত। ছেলে মেয়ের অসুখ হলে সেই ব্যস্ততা আরও চারগুণ হয়।

মাঝে মাঝে চোখ মেলে পরিমল আচ্ছন্ন ভাবে জিজ্ঞাসা করেন, তারপর কী হল নাজনেখালিতে? ছেলেটার নাম যেন কী? কোন বাড়ির ছেলে?

সুলেখা জানে, এই সময় পুরো কাহিনিটি তাঁর স্বামীকে জানানো বৃথা। জ্বরতপ্ত মাথায় কোনও চিন্তা দানা বাঁধে না। সে সংক্ষেপে দু-চারটে কথা বলে, তার মধ্যেই আবার ঝিমুনি এসে যায় পরিমলের।

মধ্যরাত্রে হঠাৎ জেগে উঠে পরিমল একবার জিজ্ঞেস করল, অরুণাংশু এসেছে?

সুলেখা বলল, এই সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে অরুণাংশুবাবুর আসবার দরকার কী?

একটা লঞ্চের শব্দ শুনতে পাচ্ছি যেন?

ওটা পুলিশের লঞ্চ। তুমি ঘুমোবার চেষ্টা করো তো।

না, দেখো, হয়তো ওই লঞ্চেই অরুণাংশু আসছে। ও সব পারে।

এলে আর কী হবে! থাকবে! তবে তোমার বন্ধু যদি এবার এসে এখানে মদ খায় কিংবা হল্লা করে, তা হলে স্পষ্ট দু'কথা শুনিয়ে দেব।

অ্যাঁ? কী বলছ?

অন্ধকারের মধ্যে স্বামীর মাথায় হাত রেখে সুলেখা নরম গলায় বলল, আর একবার জলপট্টি লাগাব? ঘুম ভেঙে গেল কেন হঠাৎ?

একটু জল দাও, বড্ড তেষ্টা।

খানিকটা বাদে পরিমল আবার বলে উঠল, বুঝলে না, এটা ওদের নেশা...এই নদী ওদের টানে, জঙ্গল টানে...ওরা যাবেই।

কাদের কথা বলছ?

ওই যে ওরা। যতই তুমি নিরাপত্তা দাও, পেটে খাবার দাও, তবু বিপদের ঝুঁকি নেওয়া মানুষের ধর্ম। সেই জন্য ইচ্ছে করে ওরা বাঘের মুখে যায়...।

ঘুমের ওষুধ দেওয়া ঠিক হবে কি না বুঝতে না পেরে সুলেখা নিঃশব্দে হাত বুলিয়ে যেতে লাগল পরিমলের পাতলা হয়ে আসা চুলের মধ্যে। আপন মনে কিছুক্ষণ কথা বলে থেমে গেল পরিমল।

পরদিনও জ্বর রইল একশো পাঁচ।

প্রলাপ বকার মতো মাঝে মাঝে কথা বলে যেতে লাগল স্ত্রীর সঙ্গে, দু-একবার শোনা গেল অরুণাংশুর নাম। কিন্তু অরুণাংশু আসেওনি। আর কোনও খবরও দেয়নি।

দ্বিতীয় দিনে ডাক্তার জানালেন যে পরিমলের রক্তে টাইফয়েডের জীবাণু পাওয়া যায়নি, জ্বর রেমিশানের জন্য তিনি পালটে দিলেন ওষুধের নাম। সে-ওষুধ অবশ্য গোসাবায় এখন পাওয়া যাচ্ছে না। বনমাতা লঞ্চের সারেংকে অনুরোধ করা হল, ক্যানিং থেকে প্রথম ফেরার লঞ্চের সারেং-এর হাতে যেন ওই ওষুধ পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বাসনাকে মহিলা সমিতির হস্টেলে এনে রেখেছে সুলেখা। এই দু'দিন তার প্রতি সে বিশেষ কোনও মনোযোগ দিতে পারেনি। ওখানে অন্য মেয়েরা আছে, তারা দেখবে। তাছাড়া এখন এ মেয়েটির কান্নারই সময়, একা নিজের ঘরে শুয়ে কাঁদুক।

তৃতীয় দিনে শুরু হল অন্য রকম উৎপাত।

মামুদপুর থেকে বাসনার বাবা এবং কাকা এসে হাজির। প্রথমে তারা গিয়েছিল নাজনেখালিতে, সেখানে মেয়ের শাশুড়ির কাছ থেকে গালমন্দ খেয়ে অপমানিত হয়ে তারা দাপাদাপি করতে লাগল জয়মণিপুরে এসে।

মহিলা সমিতির সামনে দাঁড়িয়ে তারা গালাগালির ভাণ্ডার উজার করে দিল। বাসনার বাবার চেয়ে তার কাকারই গলার জোর বেশি। কাকার নাম নিতাইচাঁদ, মুখে মোল্লাদের মতন দাড়ি, লুঙ্গির ওপর নীল ছিটের জামা পরেছে, বাঁ-হাতে একটা রুপোর তাগা বাঁধা। তার তুলনায় ধুতি ও গেঞ্জি পরা বাসনার বাবা শ্রীনাথ অনেকটা নিরীহ। নিতাইচাঁদ আর শ্রীনাথ কিন্তু পৃথক অন্ন, কিন্তু এই শোকের সময় তারা এক হয়ে গেছে।

তাদেব গালাগালির মূল বক্তব্য, তাদের মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি থেকে ঠেলে এখানে পাঠানো হয়েছে। তাদের মেয়ে কি অনাথ? এখনও মামুদপুরে নিতাইচাঁদ সাধুকে সবাই এক ডাকে চেনে। কী ভুল করেই না তারা এক হারামজাদার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল মেয়ের।

সেই গালাগালি শোনবার জন্য এখানেও একটা ভিড় জমেছে। শোকের ব্যাপার বলেই অন্য সবাই চুপ করে আছে, নইলে তারাও নানা রকম মন্তব্য করতে ছাড়ত না। শোকে-দুঃখে মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায়। তখন কত কী বলে, সে-সব কথা ধরতে নেই।

শুধু বদন দাস একবার বলল, ও দাদারা, একটু আস্তে কথা বলুন। মাস্টারমশাইয়ের খুব অসুখ।

সে কথা ওবা কানেই তুলল না।

ওই চেঁচামেচি অসহ্য লাগছে সুলেখার। স্বামীর শোওয়ার ঘরটায় জানলা-দরজা বন্ধ করে রেখেছে। যাতে তাঁর কানে কিছু না যায়। তবু পরিমল মাস্টার একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, ও কীসেব গোলমাল? আজ এখানে গ্রাম-সভা বুঝি?

শেষ পর্যন্ত আর থাকতে পারল না সুলেখা। সে ওদের সামনে এসে বলল, আপনারা এখানে এত চেঁচামেচি করছেন কেন? আপনাদের মেয়েকে কি আমি জোর করে এনেছি? আপনাদের ইচ্ছে হলে তাকে নিয়ে চলে যান।

এব উত্তরে নিতাইচাঁদ আরও জোরে বলল, কোন সাহসে ওরা বলে যে আমাদের মেয়ে অলক্ষ্মী? ভাতারখাগী? ছোটলোকের বাড়ি তো, জানে না আমরা কত বড় বংশ, আমাদের মেয়ে কোনও দিন মুখ তুলে কারোর সঙ্গে কথাটি বলে না...।

সুলেখা ক্লান্ত ভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এ-সব কথা তাঁর কাছে বলার কী মানে হয়? মনের মধ্যে দুশ্চিন্তা না থাকলে সে ধীরে সুস্থে বোঝাবার চেষ্টা করত। এখন ভাল লাগছে না। সে ধমক দিয়ে বলল, চেঁচামেচি করতে বারণ করলুম না? আপনাদের মেয়েকে নিয়ে যেতে চান কি না বলুন।

নিতাইচাঁদ বলল, চোখ রাঙাচ্ছেন কাকে? আমরা আপনার খাই না পরি? না আপনাদের কো-অপের ধার ধারি? আমাদের মামুদপুরেও কো-অপ আছে। এখানে প্রজেক্টের টাকা কী-ভাবে খরচা হয়, তা সবাই জানে...।

পরিমলমাস্টার থাকলে সে ওদের দু'জনের কাঁধে হাত দিয়ে টেনে নিয়ে যেত, রঙ্গ-রসিকতা করত, গাছতলায় বসে ওদের কাছ থেকে বিড়ি চেয়ে টানত। খানিক পরেই ওরা প্রতি কথায় ঘাড় হেলিয়ে বলত, হ্যাঁ মাস্টারমশাই, হ্যাঁ মাস্টারমশাই।

সুলেখা চলে গেল মহিলা সমিতির হস্টেলের ভেতরে। হস্টেল মানে তিনখানা চ্যাঁচার বেড়া দেওয়া ঘর, মেয়েরা চোখ গোল গোল করে শুনছে, তাদের মধ্যে গুম হয়ে বসে আছে বাসনা।

সুলেখা বাসনার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি চলে যেতে চাও, না থাকতে চাও?

বাসনা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে আবার কাঁদতে শুরু করল।

সুলেখা কড়া গলায় বলল, এখন কান্না থামাও। কাঁদাকাটা করার অনেক সময় পাবে পরে। এখন থেকে তোমার ভাল-মন্দ নিজেকেই বুঝতে হবে।

বাসনা তবু কোনও কথা বলে না। ফোঁপায় শুধু।

আমার মনে হয়, এখন তোমার বাপের বাড়ি চলে যাওয়াই ভাল। এই ননী, বিমলা, ওর জিনিসগুলো গুছিয়ে দে।

দুপুর প্রায় একটা। নারী সমিতির মেয়েরা বাসনাকে না খাইয়ে এ-সময় যেতে দেবে না। শ্রীনাথ আর নিতাইচাঁদ একটু দূরে একটা খিরিশ গাছের তলায় বসে গুজুর গুজুর ফুসর ফুসর করতে লাগল। খাওয়া জুটল না ওদের। এ গ্রামে তো হোটেল নেই। আর ও-রকম ঝগড়ুটে দু'জন লোককে কোন গৃহস্থ বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াবে?

নদীর বুকে প্রথমে জেগে উঠল ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দ, তারপর ভ্যাঁ ভ্যাঁ হর্ন। আড়াইটের লঞ্চ। বাসনাকে সামনে রেখে শ্রীনাথ আর নিতাইচাঁদ এগিয়ে গেল লঞ্চঘাটার দিকে।

পরিমল মাস্টার এসব কিছুই জানলেন না।

সেই মেঘমালা লঞ্চ থেকেই নামল বিখ্যাত লেখক অরুণাংশু সেনগুপ্ত। সে সদ্য বিধবা বাসনাকে লক্ষ করল না। এখানে আট-দশ জন যাত্রী ওঠে নামে, কে কার দিকে তাকায়! তাছাড়া এই জয়মণিপুর থেকে ওঠে ঘি-দুধের ড্রাম। বরং অরুণাংশুর দিকেই অনেকে আড়চোখে তাকাল, সে যে বিখ্যাত তা অবশ্য কেউ জানে না, কিন্তু তাঁর মুখের দিকে এক পলক তাকালেই বোঝা যায় সে এখানকার মানুষ নয়। শহরের গন্ধ মাখা প্রাণী।

গাঢ় নীল রঙের ট্রাউজার্স, ফুল ফুল ছাপা খাদির হাওয়াই শার্ট, মাথার চুল কাঁচাপাকা, দু'চোখের কোলে অনিদ্রার কালি, মুখে অসংযম ও অত্যাচারের ছাপ। লেখক হিসেবে অরুণাংশু রবি ঠাকুরের বংশধর নন। ইতিমধ্যেই কোনও কোনও ব্যাপারে মাইকেলকে ছাড়িয়ে গেছেন।

অরুণাংশু সাধারণত একা বাইরে যায় না, সঙ্গে দু-এক জন বন্ধুবান্ধব থাকে, যে-কোনও জায়গায় যাত্রাপথেই সে মদ্যপান করতে শুরু করে, অল্প অল্প নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় সে জোরে জোরে হাসে। হুকুম করার সুরে কথা বলে, সব জায়গায় তাঁর উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগ করে দেয় সকলকে। যাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকে, তারাই সর্বক্ষণ সরবে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করে। অধিকাংশ লেখকই ভোগেন এই রোগে।

আজ কিন্তু অরুণাংশুর একেবারে অন্য রকম রূপ। সে এসেছে একা, দেখে যত দূর সম্ভব মনে হয় নেশা করেনি, মুখে গাঢ় বিমর্ষতা মাখানো। বাঁ-হাতের আঙুলের ফাঁকে সিগারেট ঝুলছে। আগে একবার এখানে এলেও সে দিক ভুলে গেছে, লঞ্চ থেকে নেমে সে এ-দিক ও-দিক তাকাতে লাগল। জোয়ারের সময়, তাই পায়ে কাদা লাগেনি।

বদন দাসকেই সে জিজ্ঞেস করল, হেডমাস্টারমশাইয়ের বাড়িটা কোথায়?

বদন দাস বলল, আসেন আমার সঙ্গে।

এই লঞ্চে যারা কলকাতা থেকে আসে, তারা খেয়েই আসে সাধারণত। খবর না দিয়ে এলে আড়াইটে-তিনটের সময় কে ভাত রান্না করে দেবে? অধিকাংশ গ্রামের মানুষই বেলা এগারোটার মধ্যে ভাত-টাত খাওয়া সেরে ফেলে। অরুণাংশু খেয়ে আসেনি, কিন্তু সুলেখার সঙ্গে দেখা হবার পর সে তা বলল না। বন্ধুর অসুখ শুনে সে গিয়ে বসল তার খাটের পাশে।

ওষুধ ও জ্বরের ঘোরে পরিমল মাস্টার অজ্ঞানের মতো ঘুমোচ্ছে।

এই যদি অন্য সময় হত, অরুণাংশুর মাথায় টলটলে নেশা থাকত, তাহলে সে এই রকম কোনও ঘুমন্ত বন্ধুর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে বলত, এই শালা, ওঠ। জ্বর-ফর আবার কী রে, লোকের এত জ্বর হয় কেন, আমার তো কোনও দিন হয় না! আজ অরুণাংশু তাঁর বন্ধুর পাশে বসে আলতো করে একটা হাত রাখল কপালে।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সুলেখা, তোমাদের এখানে আমাকে একটা চাকরি দিতে পারবে? আমি এখানেই থেকে যেতে চাই।

এমনকী রসিকতা মনে করেও হাসল না সুলেখা। সঙ্গে সঙ্গে দু'দিকে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল, না। তারপর জিজ্ঞেস করল, চা খাবেন তো?

এখন না। আমিও একটু ঘুমোব। কোথায় ঘুমোব বলো তো?

ছেলে আর মেয়ের পড়ার ঘরটা এখন ফাঁকাই পড়ে আছে। খাটও আছে একটা, সেখানেই শোয়ার ব্যবস্থা হল অরুণাংশুর। কিন্তু শুয়েও ঘুমোল না। চিত হয়ে শুয়ে সিগারেট টেনে যেতে লাগল একটার পর একটা। সেই বিমর্ষ ভাবটা মুখে লেখেই রইল।

ক'দিন ধরে স্কুলে যাওয়া হচ্ছে না। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই না গেলে বেশ অসুবিধে হয়। তাই বিকেলের দিকে সুলেখা একবার স্কুলে ঘুরে আসতে গেল। কাছেই তো।

সন্ধের পরও অরুণাংশুর ঝোলা থেকে মদের বোতল বেরুল না। পরিমল জেগে ওঠার পর তার খাটের ওপর গিয়ে বসে সে চা খেল।

পরিমল প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, কীসে এসেছিস, পুলিশের লঞ্চে?

না তো!

রাত্তিরে পুলিশের লঞ্চের শব্দ পেলাম।

সময়ের হিসেবটা গুলিয়ে গেছে পরিমলের। দুপুরের লম্বা ঘুমের পর জেগে উঠে যেমন অনেক সময় মনে হয় সকাল।

আর কে কে এসেছে?

কেউ না!

মনোরঞ্জন বলে একটা ছেলের আসবার কথা ছিল না? নাজনেখালির মনোরঞ্জন। সে তোর সঙ্গে আসেনি?

সুলেখা বলল, তুমি কী বলছ? নাজনেখালির মনোরঞ্জনকে উনি চিনবেন কেন? আর সে এখানে আসবেই-বা কী করে? তাকে তো বাঘে নিয়ে গেছে!

এই প্রথম উঠল বাঘের কথা।

পরিমল মাস্টার ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, হ্যাঁ, তারপর কী হল বলো তো? ভুলেই গিয়েছিলাম। সেই যে তুমি নাজনেখালি গেলে... বিষ্টুপদর ছেলে না মনোরঞ্জন? তাকে সত্যিই বাঘে নিয়ে গেছে?

সুলেখা বলল, হ্যাঁ। তার বউয়ের বয়েস মাত্র উনিশ-কুড়ি। এই তো মোটে ক'মাস আগে বিয়ে হয়েছে।

এরপর সুলেখা অতি সংক্ষেপে বাসনা নাম্নী মেয়েটির এই কয়েক দিনের জীবনকাহিনি শোনাল।

মাথা পরিষ্কার হয়ে গেছে পরিমল মাস্টারের। সে ঠিক বুঝতে পারল ঘটনা পরম্পরা।

সে বললেন, মেয়েটা চলে গেল? তুমি তাকে যেতে দিলে?

বাঃ, তার বাবা-কাকা নিতে এসেছে, আমি তাকে আটকে রাখব নাকি?

দেখো না এবার কী-রকম মজা হয়।

সে হেসে উঠল হো-হো করে। সুলেখা অবাক। এমন অসুস্থ লোকের মুখে তৃপ্তির হাসি?

তুমি হাসছ?

বললাম তো, দেখোই না এবার কী মজা হবে।

অরুণাংশু আগাগোড়া চুপ। কোনও কিছুতেই তিনি উৎসাহ পাচ্ছে না। সিগারেটের শেষ টুকরোটা ঘরের মেঝেতে ফেলাই তাঁর চরিত্রের ধর্ম, আজ কিন্তু সে মনে করে প্রত্যেকবার জানলার বাইরে ফেলে আসছেন।

প্রসঙ্গ বদলে পরিমল বলল, আমি এমন করে কাবু হয়ে পড়লাম, তোকে নিয়ে কোথাও ঘোরাঘুরি করতে পারব না।

অরুণাংশু বলল, আমি এখানে কয়েকটা দিন চুপচাপ শুয়ে থাকবার জন্য এসেছি।

কিছু লেখবার জন্য?

না। লেখা-টেখার সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক নেই।

মানে?

আমি লেখা ছেড়ে দেব। দেব মানে কী, ছেড়ে দিয়েছি। কী হবে আর লিখে।

চারদিকে তোর লেখার জয় জয়কার...কাগজ খুললেই তোর বইয়ের বিজ্ঞাপন।

দুর দুর, ও সব বাজে!

তুই দু-চারখানা বই আনিসনি আমাদের জন্য?

নাঃ!

সুলেখা ভাবল, ও অকাল বৈরাগ্য? সেই জন্যই মুখখানা শুকনো শুকনো, উদাস উদাস ভাব? তা ভালই হয়েছে, এই জন্য যদি কয়েক দিন অন্তত মদ খাওয়া বন্ধ থাকে... অন্তত এখানে তো ও-সব কিছু চলবেই না।

পরিমল বলল, না রে, অরুণাংশু তোকে সিরিয়াসলি বলছি, তুই এখানকার মানুষজনদের নিয়ে লেখ না! তোর কলমের জোর আছে, তুই কিছু দিন এখানে থেকে দেখ সব কিছু...।

না, না, না! আমি বুঝে গেছি লিখে এই পৃথিবীর কোনও কিছু বদলানো যায় না। সাহিত্য-টাহিত্য সব বিলাসিতা।

পরদিন জ্বর ছেড়ে গেল পরিমলের। শরীর খুব দুর্বল, হাঁটতে গেলে মাথা ঝিমঝিম করে, তবু সে যেন অনুভব করল এবার সুস্থ হয়ে উঠবে। এই জ্বর ঝোঁকে ঝোঁকে আসে। এবার কড়া ওষুধের তাড়া খেয়ে পালিয়েছে।

অরুণাংশু সত্যিই প্রায় সারা দিন শুয়েই কাটাল। একটা বই পর্যন্ত পড়ে না।

পরিমল বলল, তুই গ্রামের মধ্যে একলা একলাই একটু ঘুরে আয় না। তোকে তো এখানে বিখ্যাত লোক বলে কেউ খাতির করবে না, নিজের চোখে এদের অবস্থা দেখবি।

নাঃ, ভাল লাগছে না।

গতবারে তো সজনেখালি যাওয়া হল না। এবার যাবি? ব্যবস্থা করে দিতে পারি। এক জন কাককে সঙ্গে দেব, তোকে নিয়ে যাবে। ইচ্ছে করলে, ওখানে একটা রাতও কাটিয়ে আসতে পারিস, বাঘের দেখা না পেলেও হরিণ দেখতে পাবি অনেক।

নাঃ, ইচ্ছে করছে না।

গ্রামের মানুষ অরুণাংশুকে না চিনলেও স্কুলের মাস্টারদের মধ্যে তার ভক্ত থাকবেই। শুধু জয়মণিপুরের তিন জন শিক্ষকই নয়, খবর পেয়ে গোসাবার দু'জন শিক্ষক এলেন অরুণাংশুর সঙ্গে দেখা করবার জন্য। লেখকদের সামাজিক দায়িত্ব, সাহিত্যে অশ্লীলতা, বাংলা সাহিত্যে এখন আর গ্রাম নিয়ে তেমন কিছু লেখা হচ্ছে না কেন। এই সব ভাল ভাল বিষয় নিয়ে বিখ্যাত লেখক অরুণাংশু সেনগুপ্তর সঙ্গে মনোজ্ঞ আলোচনা করবার বাসনা নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা। কিন্তু অরুণাংশু তাঁদের জিজ্ঞেস করল, ধানের দর কত, চাষির ছেলেরা লেখাপড়া শিখে কী করে হস্টেলে কী রকম খাওয়া দেয়, হ্যামিল্টন সাহেব আসলে বুর্জোয়া জমিদার ছিল কি না এই সব এলোমেলো প্রশ্ন। এবং একটু পরেই শিক্ষকদের নিজের ঘরে বসিয়ে রেখে পরিমলের খাটে গিয়ে শুয়ে রইল। আর এলই না।

মাস্টারমশাইরা কিছুক্ষণ মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বসে থেকে উঠে গেলেন এক সময়।

সৃষ্টিধর বেরার মিষ্টিপুকুরের খুব ভাল জিওল মাছ আছে, তার থেকে বেশ বড় বড় গোটা কতক মাগুর সে পাঠিয়ে দিল এ বাড়িতে। জ্বর থেকে উঠে মাস্টারমশাই আজ ঝোল-ভাত পথ্য করবেন সেই জন্য। সৃষ্টিধর ধানের কারবার করে, বেশ দু পয়সা আছে, তার এক জন দুর্বল প্রতিবেশীকে জোর করে জমি থেকে উৎখাত করবার চেষ্টা করছে লোকটিকে পছন্দ করে না পরিমল। গ্রামের অন্য লোকজনদের মধ্যে একটা জনমত সৃষ্টি করেও সে সৃষ্টিধরকে শায়েস্তা করতে পারেনি। অনেকেই আড়ালে গিয়ে সৃষ্টিধরের কাছে হাত পাতে। খোঁজ করলে হয়তো দেখা যাবে গ্রামের বেশির ভাগ লোকই সৃষ্টিধরের কাছে কোনও না কোনও ভাবে ঋণী

ও মাছ ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল পরিমল। কিন্তু ইলা আগেই কুটে ফেলেছে।

সুলেখা বলল, ঠিক আছে, সৃষ্টিধরবাবুকে দাম পাঠিয়ে দিলেই হবে।

তবু মুখখানা গোঁজ হয়ে রইল পরিমলের। মাগুর মাছ তার খুবই প্রিয়। এ রকম স্বাস্থ্যবান মাগুর আশেপাশের দশখানা হাট খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। তবু আজ এই মাছে কোনও স্বাদ পেল না পরিমল।

পাশাপাশি দুই বন্ধু খেতে বসেছে। মাগুর মাছ বিষয়ে এত সব কথাবার্তার মধ্যে একটিও মন্তব্য করলেন না অরুণাংশু। একেবারে নিঃশব্দ। আহারে রুচি নেই, খেতে হয় তাই খাওয়া।

তুই মুড়োটা খা। তুই তো মাছের মুড়ো ভালোবাসিস।

অরুণাংশু থালায় আঁকিবুকি কাটছে। অর্ধেক পাত পড়ে আছে। এমনিতে সে মাছ খেতে খুবই ভালবাসে, অথচ আজ কোনও আগ্রহই নেই।

সুলেখা স্কুলে চলে যাওয়া মাত্র পরিমল বলল, একটা সিগারেট দে।

অরুণাংশু অন্য মনস্কভাবে নীল রঙের ধোঁয়ার নানা রকম প্যাটার্ন পর্যবেক্ষণ করছে।

তোর কী হয়েছে বল তো? গুরুতর ব্যাপার মনে হচ্ছে।

অরুণাংশু বলল, না, সে-রকম কিছু না। এমনিই মনটা ভাল নেই।

ডিপ্রেশান?

তোর এ-রকম হয় না কখনও?

যারা ভাবের কারবার করে, তাদেরই মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়। আমি এখানে সব সময় একেবারে রূঢ় বাস্তবের মধ্যে থাকি, মানুষের নিছক খাওয়া-পরা জন্ম-মৃত্যু খরা-বন্যা, জমি ধান ঋণ খালকাটা এই সব — এই সব এলিমেন্টাল ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে থাকলে কখনও কখনও রাগ হয়, ক্ষোভ হয়, অস্থিরতা এমনকী হতাশাও আসতে পারে মাঝে মাঝে। কিন্তু যাকে মন খারাপ বলে, তা হবার কোনও সুযোগ নেই।

পরিমল এমন গুরুত্ব দিয়ে বলল কথাগুলো, কিন্তু অরুণাংশু শোনেনি। শূন্য ভাবে চেয়ে আছে, মন অন্য কোথাও।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ।

এই জায়গাটা অদ্ভুত ঠাণ্ডা। পাখি-টাখির ডাক ছাড়া কোনও শব্দ নেই। ট্রাম-বাসের আওয়াজ আর মানুষের চেঁচামেচি শুনতে হচ্ছে না, এ এক দারুণ শান্তি।

পরিমল ভুরু কুঁচকে তাকাল বন্ধুর দিকে। লেখার সময়টুকু ছাড়া যে-মানুষ সব সময় হইচই, মানুষের সঙ্গ, ফুর্তি, আত্মম্ভরিতায় সুড়সুড়ি লাগানো কথাবার্তা ছাড়া থাকতে পারে না, তার হঠাৎ এই নৈঃশব্দ্য-প্রীতি?

অরুণাংশু বলল, তোর এখানে আমি যদি বছর খানেক থেকে যাই? জমি চাষ করব, খাল কাটার জন্য কোদাল ধরব, নৌকো নিয়ে চলে যাব জঙ্গলে।

ব্যাপারটা আসলে কী? বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া? সান্ত্বনাকে নিয়ে আসবি বলেছিলি যে?

না, ব্যাপারটা মোটেই স্ত্রীঘটিত নয়। অরুণাংশু যে-রকম জীবন যাপন করে, তাতে প্রায়ই যে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি হবে সে আর এমন কী অস্বাভাবিক ব্যাপার। সান্ত্বনার সহ্যশক্তি খুবই। দু-তিনবার অবশ্য সেই সহ্যশক্তিরও সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় সান্ত্বনা ডিভোর্সের প্রস্তাব দিয়েছে। একটি অখ্যাত ছোট পত্রিকায় লেখা হয়েছে, এক কালের প্রতিভাবান বিদ্রোহী, আধুনিকতার ও যৌবনের প্রধান প্রবক্তা অরুণাংশু সেনগুপ্ত এখন এস্টাব্লিশমেন্টের কাছে বাঁধা পড়ে গেছেন। পয়সার জন্য লেখেন, জনপ্রিয়তার জন্য দুধে জল মেশাচ্ছেন।

এ-সব সমালোচনা গ্রাহ্য করে না অরুণাংশু। সাহিত্য-জীবনের প্রায় গোড়াতেই সে ধরে নিয়েছিল যে, অক্ষম লোকেরাই সমালোচনা করে। কোনও এক জন লোক বলে দেবে, তোমার লেখাতে এই এই দোষ, অমুক অমুক ত্রুটি, তাতেই কোনও লোক নিজেকে সংশোধন করে নেবে? এ-রকম কখনও হয়?

নিন্দে সে সহ্য করতে পারে না একেবারে। আর নিন্দে বা কটু সমালোচনা তো হবেই। কেউ সার্থক হলেই একদল লোক তাকে ছোট করবার চেষ্টা করে। বামনদের দেশে দু-এক জন যদি লম্বা হয় অমনি অনেকে তাদের টেনে হিঁচড়ে নিজেদের সমান করতে চেষ্টা করে। নির্লজ্জ ঈর্ষা নানা রকম রঙিন ভাষার পোশাক পরে সমালোচনার নামে আসরে নামে। আর সব যুগেই থাকে একদল নপুংসক ধরনের লোক, যারা নারী-পুরুষের শারীরিক মিলনের কোনও বর্ণনা দেখলেই সমাজ-সংস্কৃতি সব গেল গেল বলে আর্তনাদ করতে থাকে। অরুণাংশু এ-সব পত্র-পত্রিকা পেলেই ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় এক দিন একটি যুবক একটি পত্রিকা বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, অরুণদা এটা একটু পড়বেন। অরুণাংশু আগেই জানতে সে-পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে

কী লেখা হয়েছে। সে ঝট করে পত্রিকাটি সেই যুবকটির মুখে চেপে ধরে বলেছিল, নে, খা তোর বমি তুই নিজেই খা!

তবু কোনও এক সময় ভেতরের কোনও একটা জায়গায় হঠাৎ লাগে। কিছু একটা ঝন করে বেজে ওঠে। অক্ষম ব্যর্থদের ঈর্ষার জন্য নয়, এমনিই এক-এক সময় নিজের গভীরে গিয়ে নিজেকে দেখতে ইচ্ছে হয়। আপাত-সার্থকতার ওপর পড়ে ব্যর্থতার গোপন গভীর ছায়া। পত্রিকাটা উপলক্ষ মাত্র।

অরুণাংশু উদাসীন ভাবে বলতে লাগল, জীবনটা কী ভেবেছিলাম, কী হয়ে গেল! ভেবেছিলাম জীবনে কোনও বন্ধন থাকবে না, অথচ এই যে লেখালেখি, এ-ও তো বন্ধন, বছরে দুটো-তিনটে উপন্যাস লেখা, ইচ্ছে না থাকলেও অনেক সময় লিখতে হয়। ট্র্যাজেডি কি জানিস, যারা এস্টাব্লিশমেন্টের বাইরে থাকে, তাদের আসলে মনে মনে ইচ্ছে করে ওর মধ্যে ঢুকব, কবে বড় কাগজে সুযোগ পাব, তাদের গালাগালি হচ্ছে কংস রূপে ভজনা, আর যারা এস্টাব্লিশমেন্টের মধ্যে ঢুকে যায় তাদের মধ্যেও একটা অস্থির ছটফটানি থাকে, তারাও ভাবে, বন্দি হয়ে গেলুম? এর থেকে বেরুতে পারব না? ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক, সারা জীবন অনবরত লিখেই যেতে হবে? যে-ভাষার জন্য এত মায়া ছিল, সেই ভাষাও ক্ষয়ে যায়, ঠিক আয়ুর মতো।

এটাই তো স্বাভাবিক।

কী স্বাভাবিক?

যদি আয়ুর টার্মসে ভাবিস!

ঠিক বলে বোঝাতে পারব না, এক ধরনের কষ্ট...মনে হয়, এ পর্যন্ত যা কিছু করেছি সবই ব্যর্থ।

একটু একটু ঘুম এসে যাচ্ছে পরিমলের। কিন্তু সে ঘুমোবে না। জ্বরের পর ভাত-ঘুম ভাল নয়। সে অরুণাংশুর আত্মগ্লানির প্রশ্রয় দিতে লাগল। অরুণাংশুও এ-সব কথা কোনও দিনই মুখে বলে না, আজ বলছে যখন বলুক। মন থেকে বেরিয়ে যাক, সেটাই ভাল হবে।

ছেলে-মেয়েদের পড়বার ঘরে খাটে কাত হয়ে শুয়ে আছে অরুণাংশু, সে বসে আছে চেয়ারে। এর মধ্যে তিনটে সিগারেট খাওয়া হয়েছে খুবই দোনা-মোনা ভাবে। জানলা দিয়ে দেখতে পেল বাগানের গেট খুলে ভেতরে ঢুকছে সাধুচরণ।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সাধুচরণ ঠিক চোরের মতো মুখের ভাব করে বলল, নমস্কার মাস্টারমশাই।

অন্য চেয়ারটি ঠেলে দিয়ে পরিমল গম্ভীর গলায় বলল, বসো।

বসল না, চেয়ারের পেছন দিকটা ধরে দাঁড়িয়েই রইল সাধুচরণ। কথার মাঝখানে অন্য একটি লোকে এসে পড়ায় অরুণাংশু বিরক্ত হয়েছে।

পরিমল বলল, এর নাম সাধুচরণ পণ্ডা। এঁর স্বাস্থ্যটি দেখেছিস?

অরুণাংশু বলল, এ-দিককার লোকের স্বাস্থ্য তেমন খারাপ নয়। আমি পুরুলিয়া বাঁকুড়া গিয়ে দেখেছি গ্রামের মানুষ সবারই যেন রোগাটে ক্ষয়াটে চেহারা।

সত্যেন দত্ত যে-বাঙালিদের কথা লিখেছেন, এখানকার লোকদের সম্পর্কেই তা বেশি বেশি করে খাটে। এদের সত্যিই বাঘ কুমির আর সাপের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁচতে হয়।

কুমির কোথায় এখন? কুমির আর বিশেষ নেই।

কুমিরের জায়গা নিয়েছে দারিদ্র্য। আগে এ-দিকে এত দারিদ্র্য ছিল না। এই যে এর এক বন্ধুকেই তো ক'দিন আগে বাঘে নিয়ে গেছে।

সাধুচরণ এক মনে নিজের পায়ের নখ দেখছে।

বসো সাধু। দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

আপনি আমাকে ডেকেছিলেন মাস্টারমশাই?

মনোরঞ্জনকে কী করে বাঘে ধরল, আমাকে বুঝিয়ে দাও তো? সত্যি করে বলো। কোন জঙ্গলে কাঠ কাঠতে গিয়েছিলে তোমরা?

এই জন্যই তো সাধুচরণ আসতে চায় না মাস্টারমশাইয়ের কাছে। সবাই জানে মিথ্যে কথা বলার সময় সাধুচরণের চোখের পাতা কাঁপে না। কিন্তু এই মানুষটির কাছে এলেই তার কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়। কিন্তু এই ব্যাপারে চোখের পাতা কাঁপালে কিছুতেই চলবে না। আকবর মণ্ডলের কাছ থেকে পারমিট সে জোগাড় করেছিল নিজের দায়িত্বে। সাত নম্বর ব্লকের কথা জানাজানি হলে আকবর মণ্ডল বিপদের পড়বে, তখন সে সাধুচরণকেও ছাড়বে না।

কথাটা ঘুরিয়ে সে উত্তর দিল, ফরেস্টের বড়বাবুকে সেখানে নিয়ে গিসলাম, তিনি নিজের চোখে দেখে রিপোর্ট দিয়েছেন!

কী হয়েছিল, গোড়া থেকে আমাকে বলো তো!

একটু থেমে থেমে, সাহিত্যিকদের চেয়েও সতর্ক ভাবে শব্দ নির্বাচন করে সাধুচরণ পুরো ঘটনাটির বিবরণ দিল আবার। তারপর সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কোনও জায়গায় ভুল করেনি।

পরিমলের সঙ্গে অরুণাংশুও আংশিক মনোযোগ দিয়ে ঘটনাটা শুনল। বাঘের গল্পে খানিকটা রোমাঞ্চ থাকেই, শুনতে শুনতে মনের মধ্যেকার শিশুটি জেগে ওঠে।

অরুণাংশুর দিকে তাকিয়ে পরিমল বলল, এর গল্পের কতখানি মিথ্যে বল তো? ঠিক পঞ্চাশ ভাগ!

সাধুচরণ চমকে মুখ তুলতেই পরিমল বলল, তোমরা যে কোর-এরিয়ার মধ্যে গিয়েছিলে, তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। তবে ওই সত্যি কথাটা আর কারুর কাছে বোলো না। আমার কাছে যে-ভাবে মিথ্যে গল্পটি চালালে, অন্যদের কাছেও ঠিক সেইভাবেই বলবে। দলের লোকদেরও বলে রাখবে, যেন ফাঁস করে না দেয়।

এতক্ষণ বাদে সত্যিকারের আশ্বস্ত হল সাধুচরণ।

মনোরঞ্জন খাঁড়া...ছেলেটিকে দেখেছি আমি নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ। মাস্টারমশাই, আপনি অনেকবার দেখেছেন। কো-অপ থেকে জিনিসপত্তর ধার নেবার জন্য ও-ই তো আপনার কাছে হাঁটাহাঁটি করেছিল।

ও হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো। আমি ওকে ভাল রকম চিনি। জ্বরের জন্য মাথাটা গোলমাল হয়ে গেছে, বেশ তেজি ছিল ছেলেটা।

ও এমন ভাবে চলে গেল...এটা ভগবানের অন্যায়...বাড়িতে নতুন বিয়ে করা বউ...।

পরিমল সস্নেহে তার বাহু ছুঁয়ে বলল, এই লোকটি গত বছর ধান কাটার সময় একটি জমিতে লাঠি হাতে নেমেছিল। নিজের জমি নয়, এক গরিব চাষিব জমি, ও সাহায্য করতে গিয়েছিল নিঃস্বার্থ ভাবে। সে-জন্য জেল খেটেছে। জেল থেকে ফেরার পর আমি বলেছিলাম ওকে একটা কাজ দেব। আমাদের স্কুলে এক জন দফতরি লাগবে। কিন্তু গভর্নিং কমিটির মিটিং না হলে তো —।

অরুণাংশু বলল, এ-রকম একটা লোক ইস্কুলের দফতরি হবে, দ্যাটস এ পিটি!

তাহলে ওর দ্বারা আর কী করা সম্ভব? ওর নিজস্ব জমিও বিশেষ নেই।

অন্য দেশ হলে এ-রকম ভাল চেহারার মানুষ কুস্তিগির কিংবা বক্সার হত। ট্রেনিং পেলে খেলা থেকেও কত টাকা রোজগার করা যায়।

ও-সব আকাশকুসুম। এই সব ভূমিহীন লোকেরা সারা বছরই থাকে দৈনিক জন খাটার আশায়। বছরে কয়েক মাস কোনও কাজই পায় না। প্রত্যেক দিনের খাদ্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হলে তারপর এদের অন্য কাজে লাগানো যায়। সেই জন্যই ভেবেছিলুম ইস্কুলের দফতরির চাকরিটা দিয়ে ওকে কো-অপারেটিভের কাজে মাতিয়ে তুলব। কিন্তু আমি জানি, চাকরিটা দিলেও ও রাখতে পারবে না, দু-এক মাস বাদে পালিয়ে যাবে।

না, কাজ ছাড়ব কেন মাস্টারমশাই!

হ্যাঁ ছাড়বে আমি জানি। বুঝলি অরুণাংশু, এটাই ওদের নেশা। এই নদী, এই জঙ্গল এদের টানে, সেই জন্য বার বার এরা বিপদের মুখে যায়। এখন জঙ্গলে কাঠ কাটতে যাবার কোনও দরকার ছিল না, আর দু'মাস অপেক্ষা করলেই ও চাকরি পেত, কিন্তু ও নিজেই অন্য ছেলেগুলোকে তাতিয়ে বাঘের মুখে নিয়ে গেছে। কী সাধু, অস্বীকার করতে পারবে?

সাধুচরণের মুখে একটা অদ্ভুত ফ্যাকাসে ধরনের হাসি ফুটে উঠল। এবার সে মাস্টারমশাইয়ের কাছে সত্যি কথা বলবে। যত গরিবই হোক, তবু প্রত্যেক মানুষের ভেতরে খুব একটা অহঙ্কার আছে। নিজের অভাবের কথা অন্যকে জানাতে চায় না, যখন জানাতে বাধ্য হয়, তখন ওই রকম হাসি লেগে থাকে সেই মানুষের ঠোঁটে।

মাস্টারমশাই, কিছুতেই আমার খিদে মেটে না, রোজ যা খাই সব সময় তবু পেটে খিদে খিদে থাকে! আমি একটু বেশি ভাত খাই, কিন্তু অত ভাত দেবে কে? কার্তিক-অঘ্রাণ মাস থেকেই, বুঝলেন মাস্টারমশাই, আপনি তো জানেন, ভাতে টান পড়ে যায়, বউটা তো কম খেয়েই থাকে, ছেলে-মেয়ে দুটো ঘ্যান ঘ্যান করে, তাদের না দিয়ে আমি নিজে খাই কী করে? বর্ষা নামল না। জমির কাজ নেই, আর দুটো মাস বসে থাকা...। তাই ভাবলুম, জঙ্গলে যদি একটা খেপ মেরে আসি।

কথা বলতে বলতে মাঝখানে থেকে সে উদাস হয়ে যায়। ঠিকমতো ভাষা খুঁজে পায় না। হঠাৎ সে পিতা হয়ে গিয়ে নিজের ছেলে মেয়েদের কথা ভাবে।

পরিমল আবিষ্ট ভাবে তাকাল অরুণাংশুর দিকে। ভাবখানা এই, শুনছিস তো। একটু আগে তোর নিজের দুঃখের কথা বলছিলি, এই দেখ, সত্যিকারের দুঃখ কাকে বলে!

মাস্টারমশাই, আমাকে যদি বাঘে ধরত, তাতেও আমার কোনও দুঃখ ছিল না, খিদে সহ্য করার চেয়ে...। কিন্তু মনোরঞ্জন, ওকে আমরা সঙ্গে নিতে চাইনি, নিয়তি ওকে টেনেছে। তবে ওরও ঘরে ভাতের টান পড়েছিল।

যাকগে, মনোরঞ্জন গেছে...। এখন তার বাড়ির কী অবস্থা?

ওই যেমন হয়। আপনাকে তার বেশি কী বলব, আপনি তো সবই জানেন...।

মনোরঞ্জনের স্ত্রী চলে গেল, তাকে তোমরা আটকাতে পারলে না? এখনও শান্তি-স্বস্ত্যয়ন হল না।

সাধুচরণ চমকে উঠে বলল, সে আপনার এখানে নেই?

ছিল তো, তারপর তার বাবা-কাকা এসে নিয়ে গেল জোর করে।

নিয়ে গেল? আপনি যেতে দিলেন?

আমার তো তখন অসুখ...। তা তার বাবা-কাকা নিতে চাইলে আমরা আটকাবার কে? তোমাদের গ্রামের বউ, স্বামী মরতে না মরতেই...।

কী করব, মনার মা যে বড় চেঁচামেচি শুরু করল। এমন করতে লাগল যে বাড়িতে কাক-চিল পর্যন্ত তিষ্ঠোতে পারে না।

ঠিক আছে, আমার পায়ে একটু জোর আসুক, তারপর আমি গিয়ে এমন ওষুধ দেব যে, দেখবে তক্ষুনি মনোরঞ্জনের মায়ের চেঁচানি বন্ধ হয়ে যাবে।

সাধুচরণ এতক্ষণ বাদে খেয়াল করল যে, কয়েক দিনের অসুখেই পরিমল মাস্টার বেশ রোগা হয়ে গেছেন। দাড়িও কামাননি।

ও শুয়োরের বাচ্চারা কী বোঝে?

সাধুচরণ এবং পরিমল দু'জনেই চমকে তাকাল অরুণাংশুর দিকে। ওঁদের দু'জনের কথার মাঝখানে অরুণাংশুর এই চিৎকার এমনই অপ্রাসঙ্গিক যে ওঁরা বিমূঢ় হয়ে যায়। অরুণাংশু তাকিয়ে আছেন দেয়ালের দিকে। ওঁরা কী করে বুঝবে যে অরুণাংশুর এই হুঙ্কার তাঁর অনুপস্থিত সমালোচকদের উদ্দেশে।

অরুণাংশু উঠে বসে আবার বলল, ওরা কি জানে, এখনও আমি কত কষ্ট করি! এক-একটা লেখার জন্য দিনের পর দিন ছটফট করতে হয়, আমি কাঁদি, আমার মন-গড়া চরিত্রগুলোর জন্য আমার যে কী সাংঘাতিক অবস্থা হয়। লোকেরা অন্য কথা বলে, আমার মাথায় কিছু ঢোকে না। কেউ বুঝবে না, আমার কষ্ট কেউ বুঝবে না।

সাধুচরণ হাঁ করে অরুণাংশুর কথা শুনছে, কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না তার।

অরুণাংশুর বৈরাগ্য তিন দিন স্থায়ী হল। মাঠে হাল ধরা কিংবা খাল কাটার জন্য কোদাল ধরার সম্পর্কে চিন্তা ত্যাগ করে সে আবার শহরের কাছে আত্মসমর্পণ করবার জন্য ছুটল। ফেরার পথে গোসাবায় এক পরিচিত এস ডি পি ও-র সঙ্গে দেখা। ইনি পুলিশ হলেও সাহিত্য-রসিক, অরুণাংশুর এক বন্ধুর বন্ধু, সেই সুবাদে অরুণাংশুকে খাতির করে তুলে নিলেন নিজের লঞ্চে।

তারপর চলল খানাপিনা। আবার সারা দিন ধরে নেশা, লোকজনকে ধমক ও গান। আত্মবিস্মৃতির যতগুলি উপায় আছে কোনওটাই অরুণাংশু বাদ দিল না। ক্যানিং-এ না গিয়ে ফের চলে গেল নামখানায়। সেখান থেকে রায়দিঘি। সেখানেও এক পরিচিত সরকারি অফিসার থাকেন, তাঁর কোয়ার্টারে কাটল দু'দিন।

কলকাতায় ফিরে, এই কয়েক দিনে যা টাকা-পয়সা খরচ হয়েছে সেটা তোলবার জন্য সে খবরের কাগজের জন্য একটা লেখা তৈরি করে ফেলল চটপট।

খবরের কাগজে একটা যা হোক কিছু লিখলেই তাকে শ'দুয়েক টাকা দেয়। সব সময়ই অরুণাংশুর আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। যত খরচ বাড়ে, ততই বেশি লিখতে হয় রোজগারের জন্য। বেশি লিখতে লিখতে ধরে যায় বিরক্তি। তখন সেই বিরক্তি কাটাবার জন্য বাইরে যাওয়া, তার জন্য আবার খরচ।

কী লিখি, কী লিখি, ভেবে অল্পক্ষণ মাথা চুলকোতেই একটি চমৎকার বিষয়বস্তু মনে পড়ে গেল। বাঘের মুখে নিহত এক ব্যক্তির সদ্য বিধবা পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। পুরো লেখাটির জন্য রইল সত্য ঘটনার উত্তাপ।

বাসনার সঙ্গে অরুণাংশু একটি কথাও বলেননি। এমনকী চোখের দেখাও হয়নি। তবু এই কাল্পনিক সাক্ষাৎকারটি এমনই মর্মস্পর্শী হল যে পাঠক-পাঠিকার চিঠি এল ষাট-সত্তরটা। কয়েক জন সরকারি অফিসার সেই লেখাটি এক জন মন্ত্রীর নজরে আনলেন। মন্ত্রীর তো পড়বার সময় নেই। বিষয়বস্তুটি জেনে নিলেন এবং নির্দেশ দিলেন একটি ফাইল খোলার জন্য। নাজনেখালির মনোরঞ্জন খাঁড়া মহাকরণের নথিপত্রে অমর হল।

সেই মানুষটির উত্তাপ

এইখানে এসে প্রথম বসেছিল মনোরঞ্জন এই জলচৌকিতে, মেঝেতে ছিল আলপনা আঁকা। জামাই আসবে বলে এই ঘরখানাই বানানো হয়েছিল নতুন, সব কিছুতেই নতুন নতুন গন্ধ।

জলচৌকিটা নেই, ঠিক সেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছে বাসনা। ঘোর দুপুর। থান কাপড় পরা বাসনার মুখখানিতে স্বপ্ন মাখা। ঘরে এখন আর কেউ নেই, বাসনা অনেকক্ষণ ধরে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সম্পূর্ণ চুপচাপ। কিন্তু তাকে দেবী-প্রতিমার মতো দেখাচ্ছে এ-কথা বলা যাবে না! কারণ বাসনা সে-রকম একটা কিছু দেখতে ভাল নয়। নাকটা বোঁচার দিকেই, মুখখানা গোলগাল, আর এক ইঞ্চি লম্বা হলেই ওকে বেঁটে বলা যেত না। তবু এই বাইশ বছর বয়েসে বাসনা কোনও দিন এমন স্তব্ধ, স্থির ভাবে এতক্ষণ কোথাও দাঁড়িয়ে থাকেনি, সেই জন্য তাকে একটু অন্য রকম দেখাচ্ছে ঠিকই।

তোমার ডাকনাম বাসি, তাই না?

মোটেই না।

কেন লুকোচ্ছ? বাসনার ডাকনাম বাসি হবে না তো কী? ঠিক বাসি-বাসি চেহারা।

আমার কোনও ডাক নামই নেই!

বুঝেছি। কলাগাছের বাস্‌না হয় জানো তো? তোমাকে নিশ্চয় বাপের বাড়ির সবাই বাস্‌না বলে ডাকে। নামখানা কী মানিয়েছে, একেবারে সাক্ষাৎ কলাগাছ।

আর তোমার নামখানাই কী?

আমার মতো এমন ভাল নাম হোল টুয়েন্টি ফোর পরগনাজ-এ আর কারুর আছে? খুঁজে বার করো তো আর একটা মনোরঞ্জন?

আর খাঁড়া? শুনলেই ভয় করে।

ভয় তো করবেই। আমাদের কী যে-সে বংশ?

তোমাদের বংশের আগেকার লোকেরা ডাকাত ছিল, তাই না?

ডাকাত? আমার ঠাকুরদার বাবা ছিল কর্ণগড়ের রাজার সেনাপতি। মিদনাপুরে এখনও আছে কর্ণগড়। 'বীরের যা যোগ্য কাজ, লহ খড়গ, বধো এই বিশ্বাসঘাতকে' পতিঘাতিনী সতী পালা দেখোনি? সেই খড়গ থেকে খাঁড়া।

হি-হি হি-হি, সেনাপতি? ঢাল-তরোয়াল কোথায়?

আমার ঠাকুরদা মিদনাপুর থেকে চলে এসেছিল এই বাদায়। অনেক জমি-জায়গা ছিল আমাদের। নদীতে সব খেয়ে গেছে।

আমরাও মেদিনীপুর থেকে এসছি।

জানি! চুরি করে পালিয়ে এসছিলে। তাই তোমাদের পদবি সাধু।

এই, এই ভাল হবে না বলছি।

তোমার কাকাটাকে তো একদম চোরের মতো দেখতে।

এই হচ্ছে মনোরঞ্জন-বাসনার মধুযামিনীর নিভৃত সংলাপের অংশ। প্রতিটি শব্দ মনে আছে বাসনার। লোকটা খুব রাগাতে ভালবাসত। আর যাত্রা-পালার কত কথা যে মুখস্থ বলতে পারত পটাপট।

বিয়ের পর মাত্র একবারই সস্ত্রীক শ্বশুর বাড়িতে এসেছিল মনোরঞ্জন। তিনটি রাত কাটিয়ে গেছে এই ঘরে। শ্বশুর-জামাই সম্পর্ক প্রথম থেকেই একটু চিড়ধরা ছিল মনোরঞ্জনের ধারণা তাকে যথেষ্ট খাতির করা হয় না। সে বেলে মাছ খায় না জেনেও তাকে বেলে মাছের ঝোল খেতে দেওয়া হয়েছিল। বেলে, গুলে, ন্যাদোস — এই সব কাদা খাওয়া মাছ মনোরঞ্জন পছন্দ করে না। বাসনা তো জানত, সে কেন তার বাপ-মাকে বলে দেয়নি? এরা সবাই মাছের দেশের লোক, নতুন জামাইকে খাসির মাংস খাওয়াতে পারেনি এক দিন?

ব্যাপারটা হচ্ছে এই, মনোরঞ্জনদের তুলনায় বাসনার বাবা-কাকার অবস্থা কিছুটা ভাল। শ্রীনাথের বারো বিঘে খাস জমি। তাছাড়া কিছু খুচরো ব্যবসাপত্তর আছে। নাজনেখালির তুলনায় মামুদপুর অনেক বর্ধিষ্ণু জায়গা। কিছু দোকানপাট আছে, দিনে দু'বার লঞ্চ আসে, তাছাড়া আসে ব্যাঙ্কের লঞ্চ। সুতরাং মনোরঞ্জনের মতো গোঁয়ারগোবিন্দ এবং গরিব পাত্রের তুলনায় আরও কিছুটা অবস্থাপন্ন ঘরের ভাল ছেলের সঙ্গে বাসনার বিয়ে হতে পারত। কিন্তু ওই যে বলে না, কপালের লেখা।

বাসনার বিয়ে দিতে হল তো খুব তাড়াহুড়ো করে। শ্রীনাথ সাধুর বরাবরের গোঁ, মেদিনীপুরের লোক ছাড়া অন্য কোনও ঘরে মেয়ে দেবে না। এ-দিকে ফটিক নামে এক বাঙাল ছোঁড়া বাসনার পেছনে লাগল। সে-ছোঁড়াটা একেবারে হাড় হারামজাদা। এমন ভাল মেয়ে বাসনা, তার কানে ওই ফটিক এমনই ফুসমন্তর দিয়েছিল যে তাতেই বাসনার মাথা খারাপ হয়ে গেল। ওই ফটকের সঙ্গে বাসনা রওনা দিয়েছিল হাসনাবাদের দিকে, ভাগ্যিস পথেই নিতাইচাঁদের হাতে ধরা পড়ে যায়! ন্যাজাটের লঞ্চঘাটায় নিতাইচাঁদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক মহাজনের সঙ্গে হিসাব-পত্তর কষছিল, হঠাৎ চোখ তুলে দেখল, লঞ্চের খোলে বসে আছে বাসনা। প্রথমে নিতাইচাঁদ নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারেনি। বোকা-বোকা লাজুক মেয়ে বাসনা, কোনও দিন একলা বাড়ির বাইরে পা দেয়নি, সে কিনা লঞ্চে! সঙ্গে কে আছে? তক্তা তুলে নিয়ে লঞ্চ তখন সবেমাত্র জেটি ছেড়েছে, নিতাইচাঁদ চেঁচিয়ে উঠেছিল, ওরে থামা, থামা! ও সারেং ভাই, লঞ্চ ভিড়োন আবার!

বাড়িতে এনে বাসনাকে আগা-পাশ-তলা পেটানো হয়েছিল, তার মুখ থেকে জানাও গিয়েছিল ফুসলাইকারির নাম। কিন্তু ফটিককে তো কিছু বলা যায় না, তা হলেই সব জানাজানি হয়ে যাবে যে! তখন সাত-তাড়াতাড়ি করে মেয়ের বিয়ে না দিলে চলে না! মেদিনীপুরের ভাল ছেলে ঠিক তক্ষুনি আর পাওয়া গেল না। শ্রীনাথের শালা ওই নাজনেখালির মনোরঞ্জনের সন্ধান আনল, আর হুট করে বিয়ে হয়ে গেল।

বাসনার মা সুপ্রভা বলেছিল, তা যাই বলো, জামাই আমার খারাপ হয়নি। চেহারা-গতর ভাল, বুদ্ধি আছে, গায়ে খেটে এক দিন উন্নতি করবে ঠিকই। শ্রীনাথ বিয়ের দিনই জামাইকে আভাস দিয়েছিল, সে যদি নাজনেখালি ছেড়ে মামুদপুরে এসে থাকতে চায়, তাহলে এখানে তার জন্য বিঘে পাঁচেক জমির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাইতেই মনোরঞ্জন চটে আগুন! সে বছরের অর্ধেক সময় অপরের জমিতে জন খাটে বটে, কিন্তু সে কিছুটা লেখাপড়া শিখেছে, যাত্রা-নাটকে সে কত বীরপুরুষ আর আদর্শবান ব্যক্তির কাহিনি জানে, সে হবে ঘরজামাই?

সেই জন্যই তো মনোরঞ্জন বাসনার কাছে প্রতি কথায় একবার করে শ্বশুর বাড়িকে ঠোকে।

তুমি কলকাতা দেখেছ?

না।

গোসাবা?

ও মা, গোসাবা দেখব না কেন? একবার ক্যানিং পর্যন্ত গেসলাম, কলকাতা যাব বলে, ও হরি, সেখানে দেখি রেলগাড়ি চলছে না, রেলগাড়ির হরতাল! ব্যাস, আর যাওয়া হল না।

সে তো অনেক দিন আগে ট্রেনের হরতাল হয়েছিল। তারপর আর যেতে পারোনি?

না যাইনি। কে নিয়ে যাবে?

তোমার বাপ-মা একেবারে চাষাভুষো ক্লাস। মেয়েকে একবারও কলকাতা দেখিয়ে আনতে পারেনি পর্যন্ত! তোমাদের বাড়ির কেউই নিশ্চয়ই কখনও কলকাতা যায়নি?

আমার কাকা প্রত্যেক মাসে একবার কলকাতায় যায়।

চোরাই মাল বেচতে, তা জানি!

এই, আবার সেই এক কথা!

তোমার কাকার চেহারা অবিকল চোরের মতো নয়!

মোটেই নয়।

তোমার বড়দিদির যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, সে খেয়ার নৌকো চালায় না?

বড় জামাইবাবু? উনি তো ইস্কুলের মাস্টার।

হেঃ! খলসেখালিতে ইস্কুলই নেই, তার আবার মাস্টার! আমি খলসেখালিতে যাইনি ভেবেছ?

ইস্কুল তো পাশের গ্রামে! জামাইবাবু রোজ হেঁটে যাওয়া-আসা করেন।

তাহলে তোমার জামাইবাবুর ছেলে ওখানে নৌকো চালায়।

তা চালাতে পারে। তাতে দোষের কী হয়েছে?

না, এক দিন দেখছিলাম কিনা, ছেলেটা মার খাচ্ছে। ইজারাদারের কাছে পয়সা জমা দেয়নি। চুরি করেছিল। চোরের বংশ। কালো হ্যাংলাপানা একটা ছেলে আছে না তোমার দিদির? খুব পিটুনি খেয়েছে।

সে মার খাচ্ছিল, তা-ও তুমি থামাতে যাওনি?

তখন কি জানি ওই ছেলের মাসির সঙ্গে আমার বিয়ে হবে? শুধু শুধু একটা চোরকে আমি বাঁচাতে যাব কেন?

এ কী অদ্ভুত মানুষ রে বাবা!

হ্যাঁ, আমি দস্তুর মতো অদ্ভুত। সমুখেতে দেখিতেছি অদ্ভুত এক। নিরাকার নহে, উজ্জ্বল বসনে...

এই, একটা কথা বলব?

কী?

আমাকে একবার কলকাতায় নিয়ে যাবে?

খুব শখ না?

বলো না, নিয়ে যাবে কি না?

আচ্ছা নিয়ে যাব। তোমার বাপ তোমাকে কলকাতা দেখায়নি, আমি দেখাব। শেয়ালদায় আমার এক বন্ধু থাকে, কলকাতা আমার সব চেনা।

জামাই বলে তো আর কোঁচা দুলিয়ে, চুলে টেরি কেটে ফুলবাবুটি হয়ে বসে থাকবে না। চাষির ছেলে মনোরঞ্জনের ও-সব শখও নেই। হ্যাঁ, প্রথম বউ নিয়ে আসবার সময় সে মালকোচা মারা ধুতির ওপর নীল রঙের শার্ট পরে এসেছিল বটে, পায়ে রবারের কাবলি, কিন্তু আসা ইস্তক সে জুতো ও শার্ট খুলে রেখেছিল। মামুদপুরে ভাল বীজ ধান পাওয়া যায় সে শুনেছিল, একবার হাটখোলার দোকানগুলোয় খোঁজ নিয়ে এল। ফিরে এসে দেখল ডাব পাড়ার তোড়জোড় চলছে। এটাই তার জন্য এস্পেশাল খাতির।

শ্রীনাথ আর নিতাইচাঁদ বাড়ি ভাগাভাগি করে নিয়েছে। শ্রীনাথের পাঁচ ছেলে মেয়ের মধ্যে বাড়িতে আছে দুই ছেলে। বড়টি বিবাহিত, ছোটটির বয়স বছর চোদ্দো। শ্রীনাথ একটু দুর্বল স্বভাবের বলে নিতাইচাঁদই এখনও সর্দারি করে এ সংসারে।

দু'বাড়ির মাঝখানে ডাব গাছ, কিন্তু দু বাড়িতে এক জনও লোক নেই ডাব পাড়ার। বাসনার ভাইটা কোনও কম্মের না। এ বাড়ির বাঁধা মুনিষ কালাচাঁদকে খবর পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু সে গেছে জমিতে। লালমোহন বলে আর এক জন আছে ডাব পাড়ায় ওস্তাদ, তাকে ডাকতে গিয়েও ফিরে এল বাসনার ভাই। লালমোহনের কোমরে ব্যথা।

ওই সব দেখেশুনে আর থাকতে পারেনি মনোরঞ্জন। এই লোকগুলো কী? বাড়িতে গাছ পুঁতেছে, আর ডাব পেড়ে দেবে অন্য লোক এসে? বাসনার কাকা নিতাইচাঁদ শুধু বাজখাঁই গলায় চ্যাঁচাতেই পারে। কাটারিখানা বাসনার ভাইয়ের হাত থেকে নিয়ে সে বলল, দেখি, আমি উঠছি!

বাসনার ভাই বলল, দাঁড়ান, দড়ি আনি। পায়ে দড়ি বাঁধবেন না?

মনোরঞ্জন সগর্বে উত্তর দিয়েছিল, আমার দড়ি লাগে না। এই তো বেঁটে বেঁটে গাছ এ-দিককার —।

এই নতুন ঘরের দরজার সামনে বাসনা দাঁড়িয়েছিল সে-দিন। খুব গর্ব হয়েছিল তাব। তাঁর স্বামীর যেমন গায়ের জোর, তেমনি সাহস, কী সুন্দর তরতরিয়ে উঠে গেল নারকোল গাছে। যেন চোখেব নিমেষে! তারপর কোমর থেকে কাটারিখানা হাতে নিয়ে ঝকঝকে হাসি মুখে সে একবার তাকিয়েছিল বাসনার দিকে।

দরজার সামনে এসে বাসনা নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে নারকোল গাছটার দিকে। গাছটা ঠিক একই রকম আছে। সবই ঠিকঠাক আছে আগের মতো, শুধু এক জন নেই। অথচ ছবিটা সে স্পষ্ট দেখতে পায়।

নিচ থেকে হা-হা করে উঠেছিল নিতাইচাঁদ। অতগুলোর দরকার নেই, অতগুলো লাগবে না, গোটা চারেক।

ততক্ষণে পুরো কাঁদিটাই কেটে ফেলেছিল মনোরঞ্জন। ধপ করে সেটা পড়ল নিচে। নতুন জামাই গাছ থেকে নেমে এসে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকাল খুড় শ্বশুরের দিকে। আশ্চর্য এ-দিককার লোকজন। ডাব আর নারকোলেব তফাত চেনে না? এগুলো যে পেকে ঝুনো হয়ে গেছে প্রায়, আব কত দিন গাছে থাকবে?

ডাব হলে খেত, কিন্তু নারকোলের জল বা শুধু নারকোল কোনওটাই সে খাবে না বলে খুব একটা ফাঁট দেখিয়েছিল মনোরঞ্জন। এ বাড়িতে সে সব সময় মাথা উঁচু করে থেকেছে।

আর তাস খেলা? মামুদপুরের লোকেরা বিখ্যাত তাসুড়ে, এখানে টুয়েন্টি নাইন খেলার টুর্নামেন্ট হয় পর্যন্ত। বাসনার দাদা বদ্যিনাথ তার বন্ধু বঙ্কাকে পার্টনার নিয়ে সেই টুর্নামেন্ট জিতেছিল একবাব। প্রত্যেক সন্ধেবেলা বদ্যিনাথের তাস খেলা চাই-ই চাই। এই উঠোনে মাদুর পেতে হ্যারিকেন নিয়ে বসেছিল তাসের আসর। মনোরঞ্জনও এক পাশে বসে গলা বাড়িয়েছে। নতুন জামাই এসেছে বাড়িতে, তাকে খেলায় না নিলে ভাল দেখায় না। কিন্তু মনে মনে একটা অবজ্ঞার ভাব ছিল বদ্যিনাথের, ওবা জঙ্গলের জায়গার লোক, ওরা তাস খেলার কী জানে!

বদ্যিনাথ ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করছিল, কী হে জামাই, খেলবে নাকি এক হাত!

মনোরঞ্জনও দিয়েছিল তেমন উত্তর!

আমরা ব্রিজ খেলি। এ-সব টোয়েন্টি নাইন তো মেয়েদের খেলা। অনেক দিন অভ্যোস নেই, আচ্ছা দেখি তবু!

তারপর তো মনোরঞ্জন বসল তাস খেলতে। রান্নাঘর থেকে আসা-যাওয়ার পথে বাসনা ফিরে ফিরে তাকিয়ে যায় স্বামীর দিকে। দেখে দেখে আশ মেটে না। এই যে পাঁচ-ছ'জন পুরুষ মানুষ বসে আছে, তার মধ্যে মনোরঞ্জনের মাথাটাই যেন এক বিঘত উঁচু, চুলের ছাঁট কত সুন্দর!

বাপ রে বাপ, এ কী ডাকাতে খেলোয়াড়। পেয়ার না পেয়েও মনোরঞ্জন তেইশ পর্যন্ত ডেকে রঙ করে। প্রথম গোলামেই তুরুপ? সেভেনথ কার্ডে রঙ করেও সে খেলা জিতে যায়? ডবল দিলেই রি-ডবল দেয়। একবার খেলল সিঙ্গিল হ্যান্ড। পর পর কালো সেট খাওয়াতে লাগল অপনেন্টদের।

শেষ পর্যন্ত খেলোয়াড়দের এক জন, ছোট পাঁচু স্বীকার করল, দাদা, আপনি বললেন টোয়েন্টি নাইন খেলা অব্যেস নেই, তাতেই এই খেলা? অব্যেস থাকলে না জানি কী হত!

অবশ্য সেই খেলার আসরে একটা খুব মজার ব্যাপারও হয়েছিল।

তাস খেলায় গভীর মনোযোগ মনোরঞ্জনের, মাদুরের ওপর কী যেন সর সর করে যাচ্ছে, সে-দিকে না তাকিয়ে সেখানে হাত দিয়ে চলন্ত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কী যেন ঠেকল। সঙ্গে সঙ্গে সে, ওরে বাপরে বলেই মারল এক লাফ। সে একখানা লাফ বটে। বক্কার মাথা ডিঙিয়ে পড়ল অন্য দিকে। বসে বসে কোনও মানুষকে ও-রকম ভাবে লাফাতে কেউ কখনও দেখেনি।

সাপ! সাপ!

অন্য সবাই তখন হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। হ্যাঁ, সাপ বটে, কিন্তু ওটা তো সেই ঢ্যামনাটা। ওটা বাস্তু সাপ, যখন তখন আসে। বুড়ো হয়ে গেছে বেচারা, রেলগাড়ির মতো লম্বা, অত বড় শরীরটা নিয়ে নড়াচড়া করতেই পারে না, ওকে দেখেই মনোরঞ্জনের এত ভয়!

এত হাসি হাসতে লাগল সবাই যে খেলাই ভেস্তে গেল তারপর। যাক, নতুন জামাইকে একবার অন্তত জব্দ করা গেছে। মুখে কাপড় চাপা দিয়ে বাসনাও হেসেছে।

ছোট পাঁচু বলেছিল, দাদা, বসে বসে ও-রকম আর একখানা লাফ দিয়ে দেখান তো!

রাত্রে শুয়ে শুয়ে মনোরঞ্জন বলেছিল, তোমাদের এ-দিককার লোক তো ঢ্যামনা ছাড়া আর কোনও সাপ দেখেনি, ওরা সাপের মর্ম কী বুঝবে? আমাদের অশ্বিনীকে যেবার কাটল...।

বাসনা স্বামীর বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিল, তুমি রাগ কোরো না, তুমি রাগ কোরো না —

এ বাড়ির মধ্যে একমাত্র তুমি ভাল। আর সব ক'জনা কেমন যেন বেয়াড়া।

তুমি রাগ কোরো না।

এই সেই খাট। এবার ফিরে এসে ওই খাটে আর শোয়নি বাসনা। পুরুষালি উত্তাপের অভাবে ওটা এখন কী দারুণ ঠাণ্ডা!

যতবার মনোরঞ্জনের মুখখানা মনে পড়ে, ততবার বাসনার শরীরটা জ্বরের মতো ঝনঝনে গরম হয়ে যায়। মানুষটা নিজেও যেমন চনমনে, তেমনি অন্য কারুকে কখনও ঝিমিয়ে পড়তে দিত না।

ভরদুপুর, বাড়িতে বিশেষ কেউ নেই, বাসনার মা ঘুমোচ্ছে উঠোনের ও-পাশে বড় ঘরটায়। নারকোল গাছের পাতায় সর সর সর সর শব্দ হতে লাগল। জোর হাওয়া উঠেছে। কালো মেঘে থম থম করে আকাশ। আজ বোধ হয় ঝড় বৃষ্টি হবেই হবে।

খাটের একটা পায়া ধরে সেখানে মাথা ঠেকিয়ে থাকে বাসনা। এত কান্না কেঁদেছে এই ক'দিন, তবু ফুরোয় না, আবার চোখ ফেটে জল আসে। এত জল কোথায় জমা থাকে? যাদের চোখের জল খরচ হয় না, তাদের সেই জল কোথায় যায়? আর সবই ঠিকঠাক আছে, শুধু একটা মানুষ নেই, তাতেই পৃথিবীটা শূন্য। চোখের সামনেই তাকে দেখা যায়, তার কথাও যেন সব এখনও কানে শোনা যায়, তবু সে নেই।

এই একটা কথা বলব?

কী?

আমাকে একবার কলকাতায় নিয়ে যাবে?

খুব শখ না?

বলো না নিয়ে যাবে কি না?

আচ্ছা নিয়ে যাব। তোমার বাপ তোমাকে কলকাতা দেখায়নি, আমি দেখাব। শেয়ালদায় আমার এক বন্ধু থাকে, কলকাতা আমার সব চেনা...!

এ-পক্ষ আর ও-পক্ষ

মনোরঞ্জনের মা ডলির যদি চোপার জোর থাকতে পারে, তা হলে বাসনার মা সুপ্রভারই-বা থাকবে না কেন? সেই-বা কম যায় কীসে?

বাসনাকে ফিরিয়ে আনার পর থেকেই সুপ্রভা তার স্বামী ও দেওরকে একেবারে ধুইয়ে দিচ্ছে। উঃ, এত বোকাও পুরুষ মানুষ হয়? এরা বোধহয় কাছা দিয়ে ধুতি পরতেও জানে না। জানবেই-বা কী করে, সর্বক্ষণ মোল্লাদের সঙ্গে মিশে মিশে লুঙ্গিই তো পরে। বাসনার বাপ তো চিরকালই একটা জলঢোঁড়া কিন্তু নিতাইচাঁদ নিজে কী করে এমন গোখুরির কাজটা করল? এই সময় কেউ মেয়েকে ফিরিয়ে আনে?

একে তো ভাল করে না দেখে না শুনে হুট করে কোথাকার এক জংলি ছোঁড়ার হাতে তুলে দিল মেয়েকে। সম্বৎসরের খোরাকি ধান তোলার মতো জমি যাদের নেই, সে-বাড়িতে কেউ জেনেশুনে মেয়ের বিয়ে দেয়! কেন, তাদের মেয়ে কি জলে পড়েছিল? এর চেয়ে যে বাঙাল বাড়িতে বিয়ে দেওয়া ভালো ছিল! এত জায়গা থাকতে শেষ পর্যন্ত কিনা বাদাবন থেকে জামাই আনতে হল। ওই রকম গুণ্ডার মতো চেহারা, ও বাঘের পেটে না গেলেও কোনও দিন নির্ঘাত পুলিশের গুলি খেয়ে মরত! কী-রকম ছোটলোকের বাড়ি ভেবে দেখো, ছেলে মরতে না-মরতেই ছেলের বউকে তাড়িয়ে দেয়! এ-রকম কথা কেউ সাতজন্মে শুনেছে? চশমখোর, চামার কোথাকার!

সুপ্রভার ঢ্যাঙা চেহারা, মুখে সব সময় পান ঠোঁটের পাশ দিয়ে রস গড়ায়, মেটে সিঁদুরের বিয়ে সিঁথির দু'পাশে অনেকখানি চুল উঠে গেছে। সুপ্রভার স্তন দু'টি বেশি লম্বা ও ঝোলা। পঞ্চাশ বছর বয়স পেরিয়ে যাবার পর তার আর লজ্জা-শরমের বালাই নেই।

ঝগড়া-গালাগালি দেবাব সময সামনে পেলে প্রতিপক্ষ না থাকলেও সুপ্রভার কোনও অসুবিধে হয় না। শ্রীনাথ আর নিতাইচাঁদ কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে। তবু সুপ্রভার গালাগালির স্রোত চলেছে তো চলেছেই। এরই মধ্যে তার স্বামীকে মাঝে মাঝে খুঁজে এনে সে গলা চড়ায়।

ছি, ছি, ছি, ছি! পুরুষ মানুষ এমন বে-আক্কেলে হয়! হুঃ, পুরুষ মানুষ! সেই যে বলে না, গোঁফ নাইকো কোনও কালে, দাড়ি রেখেছেন তোবড়া গালে। একটা উটকপালে মাগির কাছে জব্দ হয়ে এল? যেমন দাদা তেমনি ভাই! ধরলে চিঁ চিঁ ছাড়া পেলেই সিংগি। মেয়েটার হাত ধরে জেটিঘাটে নামল, আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারি না! শাঁখা-সিঁদুর পরিয়ে এই ক'মাস আগে মেয়েটাকে পাঠালাম, সেই কপাল-পোড়া মেয়েকে কেউ এমন ভাবে নিয়ে আসে? কী আক্কেল!

এ-রকম চলতেই থাকে অনবরত বাক্যের স্রোত। এক-একবার গলা খাঁকাবি দিয়ে শ্রীনাথ বলবার চেষ্টা করে, আহা-হা, তখন থেকে যে বকেই যাচ্ছিস, আমরা কী করতুম তাহলে? মেয়েটাকে বাড়ির বার করে দিয়েছে, জানা নেই শোনা নেই অন্যের বাড়িতে পড়ে আছে, সেখানে ফেলে রাখা কি ভাল দেখায়? কপাল যখন পুড়েছেই — আমাদের মেয়েকে দুটো ভাত-কাপড় আমরা দিতে পারব না?

সুপ্রভা চোখ কপালে তুলে বলে, হায় আমার পোড়া কপাল! কোনঠেকায় কথা কোনঠে গেল। চত্তির মাসে বান হৈল! মেয়েকে ভাত-কাপড় দিতে পারব না, সে-কথা বলিছি? ওগো বুদ্ধির ঢেঁকি, এ-কথা বুঝলে না যে মেয়েটাকে ওরা একেবারে বেড়াল পার করে দিল? এরপর ওরা বলবে, শ্রাদ্ধ চুকবার আগেই বউ চলে গেল, ওই বউয়ের সঙ্গে আর সম্পর্ক নাই। হা-ঘরেব বংশের লোক ওরা, ওরা সব পারে!

শ্রীনাথ বলল, সম্পর্ক নাই তো নাই! কে আর ওদের ঘরে মেয়েকে পাঠাচ্ছে। সে তুই যাই বলিস বোকার মা, আমার মেয়েকে আমি আর কোনও দিন ওই নাজনেখালির ছোটলোকের বাড়িতে পাঠাব না। এই একখান কথা আমি কয়ে দিলাম।

এঃ! মরদ বড় তেজি, মারবেন বনের বেজি! একখান কথা আমি কয়ে দিলাম? বলি, দু'কানে দুটো ফুল, নাকছাবি আর দু'গাছা চুড়ি যে দিয়েছিলুম, সেগুলো যাবে কোথায়? সেগুলো এনেছ, আট মাসের বিয়ে, তার জন্য আমরা ঘরের সোনা গচ্চা দেব?

এবার শ্রীনাথের সম্বিৎ ফেরে। চটাস করে গালে হাত দিয়ে সে বলে, তাই তো!

নতুন ঘরে শুয়ে থেকে মায়ের বকুনি শুনতে শুনতে এত শোক-দুঃখের মধ্যেও এই কথাটি শুনে বাসনাও চমকে ওঠে। সোনার জিনিসগুলো তো আনা হয়নি! একবার মনেও পড়েনি সে-কথা!

বিজয়িনীর ভঙ্গিতে এক পাক ঘুরে গিয়ে সুপ্রভা বলল, তবে? আমাদের হক্কের সোনা ওর ওই শাশুড়ি মাগিটা কেন ভোগ করবে? কেন, শুনি? কেন? কেন?

তাই তো!

শুধু তাই তো বললেই কাজ হবে? হাসিও পায়, কান্নাও ধরে, এ-কথা আর বলি কারে? আর আমাদের ওই জমি?

আমাদের জমি?

সে-জমিটা আমরা এমনি এমনি মিনি মাগনা ছেড়ে দেব?

কী বলছিস তুই, আমাদের জমি কে নেবে?

আমাদের নয় তো কার? বিয়ের ট্যাকায় মনোরঞ্জন এক বিঘে সাত কাঠা তিন ছটাক জমি কেনেনি?

ওঃ হো!

ফের ওঃ হো! তোমার মাথায় ঘিলু দিয়ে গণ্ডাখানেক ঘুঁটে হবে শুধু। সে-জমি কার? ওর বাপের না চোদ্দো পুরুষের? আমাদের টাকায় জমি কিনেছে মনোরঞ্জন, গোঁয়ারের মতো সে জঙ্গলে মলো, এখন ও জমি আমরা ভূতের হাতে ছেড়ে দেব? অ্যাঁ? বাপের নামে কেনেনি, মনোরঞ্জন জমি কিনেছে নিজের নামে, স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রী পাবে সেই জমি। পাবে না? বাসনা যদি ওখেনে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকত, ওর জমি কেউ নিতে পারত? এ-সব ব্যবস্থা না করে তুমি মেয়েটাকে খালি হাতে নিয়ে চলে এলে?

স্ত্রীর বুদ্ধির কাছে হার মেনে শ্রীনাথ গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসল। ও-পাশ থেকে নিতাইচাঁদও শুনে ভাবে, এঃ হে, বড়ই কাঁচা কাজ হইয়ে গিয়েছে তো!

এবার ও-দিকের দৃশ্য দেখা যাক।

নাজনেখালিতে বিষ্ণুপদ খাঁড়ার বাড়ি একেবারে শান্ত। এ-দিকে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে বলে বিষ্ণুপদ মাঠে গেছে বীজতলা রুইতে। রান্নাঘরের উনুন থেকে গল গল করে বেরুচ্ছে ধোঁয়া, ভিজে কাঠের আঁচ। উঠোনে বসে থুপথুপিয়ে কাপড় কাচছে ডলি, দাওয়ায় বসে কবিতা সেলাই করে তার ব্লাউজ। স্বয়ং বিধাতা পুরুষও এখন হঠাৎ এসে পড়লে বুঝতে পারবেন না যে, মাত্র কয়েক দিন আগে এ বাড়ির একটি সমর্থ, বলিষ্ঠ যুবা-ছেলে বাঘের মুখে মারা গেছে।

বিধাতা পুরুষের বদলে উঠোনে এসে দাঁড়ালেন পরিমল মাস্টার। সঙ্গে সাধুচরণ। ডলি ওদের দেখেও দেখল না। আড়চোখে একবার তাকিয়ে বেশি মন দিল কাপড় কাচায়।

সাধুচরণ বলল, ও মাসি, মাস্টারমশাই এশ্চেন!

তা আমি কী করব? বাড়ির লোক এখন বাড়িতে নেই।

কবিতা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার দু'চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে অভিভূত শ্রদ্ধা। পরিমল মাস্টার তার চোখে সিনেমার নায়কের সমতুল্য। কত বড় বিদ্বান, অথচ সাধারণ চাষা-ভুষোর কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলেন, ঠিক চাষিদের মতো মাঠে উবু হয়ে বসেন।

ডলির থুপথুপানির শব্দ বেড়ে গেছে। ভদ্রলোক শ্রেণীর প্রতি তার একটা রাগ আছে, সে তার সহজাত বুদ্ধি দিয়ে বোঝে যে, তাদের সব দুঃখ-কষ্টের জন্য দায়ী শহরের লোকেরা। তাছাড়া, তার প্রথম যৌবন বয়সে এক ছোকরা স্কুলমাস্টার অনেক মিষ্টি মিষ্টি মিথ্যে কথা বলে তার সারা গায়ে হাত বুলিয়েছিল। তখন ছিল সুখ, এখন সেই স্মৃতি ডলির কাছে বিষ। সেই মাস্টার তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও পালিয়েছিল।

কবিতা চাটাই পেতে দেবার আগে পরিমল এসে বসলেন দাওয়ার এক কোণে। তারপর বললেন, মনোরঞ্জনের মা, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।

ডলি কোনও উত্তর দিল না, মুখও ফেরাল না।

বাড়ি থেকে বউটাকে তাড়িয়ে দিলেন?

বেশ করেছি!

একেবারে ফোঁস করে উঠল ডলি। দর্পিতার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, বাড়ি থেকে অলক্ষ্মী ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছি, এখন আমার শান্তি! ছেলে তো গেছে গেছেই। ওই ভাতারখাকিকে দুধ-কলা দিয়ে পুষব কেন?

সাধুচরণ অসহিষ্ণু ভাবে বলল, ও মাসি, কী হচ্ছে? একটু চুপ করো না।

পরিমল মাস্টার হাসল।

নাটক-নভেলে প্রায়ই গ্রামের আদর্শবাদী স্কুল শিক্ষকের একটা চরিত্র থাকে। তাদের পোশাক হয় পাজামা ও গেরুয়া পাঞ্জাবি, কাঁধে পথিক-ঝোলা। বড় বড় চুল। রবি ঠাকুরের ভাষায় কথা। পরিমল মাস্টারও সেই টাইপের চরিত্র হলেও এই সুমহান ঐতিহ্য তিনি রক্ষা করেনি পোশাক ও কথাবার্তায়। পরনে সেই লুঙ্গি আর একটা গেঞ্জি, পায়ে রবারের চটি। মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে।

ঈষৎ কৌতুকে সুরে, যেন ডলিকে আরও খেপিয়ে তোলার জন্যই সে বলল, কাজটা আপনি ভাল করেননি।

ভাল করিছি কি মন্দ করিছি, সে আমি বুঝব। অন্য কারুর ফোঁপর-দালালি করবার দরকার নেই। যার জন্য আমার ছেলেটাই চলে গেল, সেই রাক্ষুসিকে আমি বাড়িতে রাখব?

কিন্তু এ জন্য পরে যদি আপনাকে পস্তাতে হয়?

রাগের চোটে ডলি প্রায় লাফাতে শুরু করে দিল। মাস্টারবাবুটির এই ধরনের গেরেমভারি কথা সে একেবারে সহ্য করতে পারছে না।

সাধুচরণ থামাবার চেষ্টা করতে লাগল তাকে। পরিমল মাস্টার যেন ব্যাপারটা বেশ উপভোগই

সাধুচরণের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, বিড়ি আছে?

বিড়িটি ধরিয়ে সে বলল, মনোরঞ্জনের মা, আপনার সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে আসিনি। রাগ-মাগ না করে মন দিয়ে শুনুন। কাগজপত্রে আপনার ছেলের-বউয়ের কয়েকটা সই লাগবে। মনোরঞ্জনের নামে বারো হাজার টাকা পাওয়া যাবে।

কে কীসে সই করবে, তার আমি কী জানি?

কত টাকা বললুম, শুনতে পেয়েছেন? বারো হাজার টাকা। আপনারা পাবেন।

এক জন জাদুকর এসে জাদুর মায়া ছড়িয়েছে। ডলি, সাধুচরণ আর কবিতা নিশ্বাস বন্ধ করে, স্থির চক্ষে চেয়ে আছে জাদুকরের মুখের দিকে। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই।

পরিমল সাধুচরণকে উদ্দেশ করে বলল, তোরা যাবার আগে ফর্ম সই করে নিয়েছিলাম, মনে আছে? আমি জানি তো তোদের ধরন। তোদের নামে গ্রুপ ইনসিওরেন্স করিয়ে রাখা আছে। এক জন কেউ বাঘের পেটে গেলে তার নামে বারো হাজার টাকা পাওয়া যাবে। তুই মরলে তোর পরিবারও পেত।

মাস্টারমশাই, আপনি আগে তো বলেননি?

কেন আগে বললে তুই ইচ্ছে করে বাঘের পেটে যেতি?

বালতির জলে খলবলিয়ে হাত ধুয়ে আঁচলে মুছতে মুছতে ডলি দৌড়ে চলে এল কাছে।

বারো হাজার টাকা আমরা পাব? সে কত টাকা?

পরিমল জিজ্ঞেস করল, জমির দর এখন কত যাচ্ছে রে সাধু? বারোশো টাকা নয়? তাহলে ধরুন, এক লপ্তে দশ বিঘে ধানজমি।

ডলির চোখ দিয়ে জলের রেখা নেমে এল।

সাধুচরণ বলল, এই বুঁচি, শিগগির যা, মাঠ থেকে তোর বাবাকে ডেকে নিয়ে আয়।

কবিতা দাওয়া থেকে লাফ দিয়ে উঠোনে নেমেই ছুটল।

সেই জন্যই তো বলছিলুম বউকে তাড়িয়ে দিলেন, এখন বউয়ের সই না পেলে তো কিছু হবে না। তখন আমি অসুখে পড়েছিলাম।

কেন, বউয়ের সই লাগবে কেন?

বউ নমিনি। বউয়ের নাম লেখা আছে। আইনের চোখে বউই উত্তরাধিকারী।

চোখের জলের ফোঁটা নামতে না- তে থেমে গেল ডলির চিবুকে। এক দৃষ্টে সে চেয়ে রইল পরিমল মাস্টারের দিকে। সেই দৃষ্টিতে মিশে আছে ধিক্কার, অভিশাপ, ঘৃণা আর হতাশা। এই সবই শহরের লোকের ষড়যন্ত্র! মনোরঞ্জন তার পেট থেকে বেরোয়নি? তার নাড়িকাটা ধন নয়? তার শরীরের রক্ত জমানো বুকের দুধ খায়নি ছেলেটা? তার গু-মুত কে পরিষ্কার করেছে? নিজে না খেয়ে ডলি কত দিন তাব ছেলেকে খাইয়েছে। জন্মদাতা বাপ পাবে না, গর্ভধারিণী মা পাবে না, পাবে একটা পরের বাড়ির আবাগি মেয়ে? অট মাসের বিয়ে করা বউ!

এই অবিচারের জন্য ডলি মনে মনে একমাত্র পরিমল মাস্টারকেই দায়ী করল।

মাস্টারবাবু, আপনি এত বড় একটা ক্ষতি করলেন আমাদের?

এবার পরিমলের অবাক হবার পালা। সে নিজের উদ্যোগে গ্রুপ ইনসিওরেন্স করিয়ে দিয়েছিল, বারো হাজার টাকার বন্দোবস্ত হয়ে আছে, তার পরও তাঁর নামে এই অদ্ভুত অভিযোগ!

সে বলল, ও সাধু, কী বলছেন ইনি? আর একটা বিড়ি দে। কিংবা এক প্যাকেট সিগারেট কিনেই নিয়ে আয়, এ-দিকে পাওয়া যায় না? আচ্ছা থাক, একটু পরে যাস। হ্যাঁ বলুন তো, কী ক্ষতি করলুম আমি?

টাকা আমরা পাব না, সে পাবে?

আহা, হা, সে পাবে মানে কী, আপনারা সকলেই পাবেন। বউকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন, সে এখানেই থাকবে আপনাদের সঙ্গে। তার সই না পেলে তো কিছুই হবে না, তারপর টাকাটা পেলে যাতে পাঁচ ভূতে লুটেপুটে না খায়, জমি-জায়গা কিনে ঠিক মতো খাটানো যায়, সে-ব্যবস্থা আমি করব।

এই সময় ছুটতে ছুটতে হাজির হল বিষ্টুচরণ। উদভ্রান্তের মতো অবস্থা। সে ভেবেছে মাস্টারমশাই বুঝি পকেট বোঝাই করে হাজার হাজার টাকা এনেছেন তাদের দেবার জন্য। বাঘের পেটে মানুষ গেলে যে কেউ টাকা দেয়, সে-কথাটা বিষ্টুচরণের কিছুতেই বোধগম্য হবে না। তার মাথায় কেউ হাতুড়ি মেরে বোঝালেও না।

শুধু তো বিষ্টুচরণ নয়, তার পেছনে এল আরও অনেক লোক। মৃত মনোরঞ্জনের বাড়িতে নাকি টাকার হরির লুট হচ্ছে!

সব কিছু যে নির্ভর করছে একটা একরত্তি বিধবা মেয়ের ওপর, এই কথাটা কেউ বুঝছে, কেউ বুঝছে না, এই দু'দলে লাগিয়ে দিলে তর্ক। এরই মধ্যে নিরাপদ এক জনকে 'গাড়োলের মতো বুদ্ধি' বলে ফেলায় সে চটে আগুন! তখন দু'জনে হাতাহাতি লেগে যাওয়ার উপক্রম। অন্যরা ছাড়িয়ে দিল আবার।

পরিমল মাস্টার সামনে যাকে পাচ্ছে, তার কাছ থেকেই বিড়ি চাইছে একটা করে। বিড়ি টানতে টানতে এক সময় সে উদাসীন হয়ে গেল। মনোরঞ্জনের চেহারাটা খুব মনে পড়ছে তাঁর। যেন হঠাৎ সে এক্ষুনি এখানে এসে উপস্থিত হবে!

সে বারো হাজার টাকার ব্যাপারটা বলার পর সবাই এমন উত্তেজিত, যেন মনোরঞ্জন মরে গিয়ে ভাল কাজই করেছে।

গ্রুপ ইনসিওরেন্স ব্যাপারটা চালু হয়েছে ক'বছর মাত্র। এ-দিককার লোক কেউ জানতই না। মাস্টারমশাইয়ের কল্যাণে এর আগে তারা জেনেছে জেলেদের কো-অপারিটিভের কথা, এবার আরও শুনল বাঘে মানুষ মারার খেসারত-এর আজব খবর। মনোরঞ্জনকে মেরেছে বনের বাঘ, তাহলে টাকাটা কি ওই বাঘ দিচ্ছে? বাঘ নয়, গভর্নমেন্ট? মানুষ মরলে গভর্নমেন্টের কী মাথাব্যথা? বাঘের বদলে একটা মানুষ যদি আর একটা মানুষকে মারে, তাহলে সেই মরা-মানুষটার পরিবারকে গভর্নমেন্ট টাকা দেয় না কেন? এ-সব বোঝা সত্যিই খুব শক্ত নয়?

টাকা গভর্নমেন্টও দিচ্ছে না, দিচ্ছে ইনসিওরেন্স কোম্পানি? সে আবার কোন দাতা কর্ণ?

হ্যাঁ, গভর্নমেন্টও দিচ্ছে কিছু। মানুষে মানুষ মারলে গভর্নমেন্ট কিছু দেয় না বটে, কিন্তু বাঘের অভিভাবক হিসেবে গভর্নমেন্ট কিছু দেয়। পরদিন তিনটের লঞ্চে আসা খবরের কাগজে জানা গেল সেই খবর। সুলেখক অরুণাংশু সেনগুপ্তর মর্মস্পর্শী রচনার গুণের জন্যই হোক বা যে-জন্যই হোক, বিধানসভায় সরকারপক্ষ ঘোষণা করেছেন যে, এখন থেকে সুন্দরবনের ব্যাঘ্র-নিহত মানুষের পরিবারকে তিন হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হবে। সরকার শুধু সুন্দরবনের বাঘ সংরক্ষণের ব্যাপারেই উৎসাহী, সেখানকার মানুষদের কথা চিন্তা করেন না, এটা ঠিক নয়।

তাহলে দাঁড়াল, বারো আর তিন পনেরো। জ্যান্ত মনোরঞ্জন থুত্থুরে বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকলেও জীবনে কখনও পনেরো হাজার টাকার মুখ দেখত না।

নাজনেখালির মনোরঞ্জন বাঘের পেটে গেছে বলে তার বাড়ির লোক পনেরো হাজার টাকা পাবে, এ-কথা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একটি মানুষেরও জানতে বাকি রইল না। দিল্লিতে ষষ্ঠ যোজনায় কত কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে, তার থেকে এ সংবাদ অনেক বেশি মূল্যবান এখানে।

গোসাবার কাছে মালোপাড়ার বিধবাপল্লিতে থান কাপড় পরা মেয়েমানুষরা এ কথা শুনে তাজ্জব। তাদের ঘরের পুরুষরা তো সবাই বাঘের পেটে গেছে, কই তারা তো এক পয়সাও পায়নি সে-জন্য?

একটি সংক্ষিপ্ত অথচ ঘটনাবহুল অধ্যায়

এবার আর মিনমিনে শ্রীনাথকে সঙ্গে আনা হয়নি। নিতাইচাঁদের সঙ্গে এসেছে বদ্যিনাথ, আর মাঝপথে জুটে গেছে ফটিক বাঙাল। এই ফটিককে সঙ্গে আনার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না নিতাইচাঁদের,

সে এরই মধ্যে বাসনার সঙ্গে গুজ গুজ ফুস ফুস শুরু করেছে। তবু টাকা-পয়সার ব্যাপার, লোকবল থাকা ভাল। বাসনার গয়না উদ্ধার করতে হবে এবং সম্ভব হলে এবারই বেচে দিয়ে যেতে হবে ওই এক বিঘে সাত কাঠা তিন ছটাক জমি।

নিতাইচাঁদ ভেবেছে যে ফটিক বাঙালের সঙ্গে বুঝি হঠাৎই দেখা হয়ে গেছে লঞ্চে, কিন্তু ফটিকের জীবনে সব কিছুই হিসেব করা। তিরিশ একত্রিশ বছর বয়েস ফটিকের, এর মধ্যে সে তিনটি বিয়ে করেছে পুরুতের সামনেই। আরও বাদ বাকি তো আছেই। দূর দূর গ্রামে সে বিয়ে করে আসে নাম ভাঁড়িয়ে, তারপর এক বছর দেড়-বছর বাদে বউ ছেড়ে পালাতে তার কোনও রকম দ্বিধা থাকে না। মেয়েরা তার কাছে মিষ্টি আখের মতো, যতক্ষণ রস ততক্ষণ সোহাগ, তারপর সারা জীবন ছিবড়ে বয়ে বেড়াবার মতো আহাম্মক সে নয়।

ছিপছিপে ফর্সা মতো চেহারা, চোখ-নাক চোখা, দৃষ্টি সর্বদাই চঞ্চল। ফটিক ছেলেটি প্রতিভাবান, নইলে এত মেয়ে পটাপট পটে কেন তাকে দেখে? কথাবার্তায় অতি তুখোড়। এত দিনের মধ্যে মাত্র একবার সে হাঁসখালি গ্রামে ধরা পড়ে মার খেয়েছিল। সে কী শুয়োর-পেটা মার! তারপর তিন মাস বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল তাকে। তবু মেয়ে ধরাই এখনও ফটিকের জীবিকা।

গত কাল দুপুরে পুকুরে স্নান করতে করতে ফটিকের মাথায় একটা ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল হঠাৎ। বাসনা বিধবা হয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছে, এ খবর ফটিক যথাসময়ে পেয়েছে। প্রথমে সে ও নিয়ে মাথা ঘামায়নি। কিন্তু পুকুরের কোমরজলে দাঁড়িয়ে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এবং তৃতীয় নেত্র যেন আচমকা তাকে বলে দিল, এই মেয়েটার মধ্যে মধু আছে। ওরে ফটিক লেগে যা।

কয়েক দিন ধরে আড়ালে আড়ালে তক্কে তক্কে থেকে সব খবর সংগ্রহ করেছে ফটিক। বাসনারা যে আজ এই লঞ্চে যাবে, সে আগেই জানে। কিন্তু এক সঙ্গে এলে যদি কেউ সন্দেহ করে সেই জন্যই নিজের গ্রাম থেকে না উঠে সে পাটনাখালির কলেজ ঘাট থেকে লঞ্চ ধরেছে। ছাদে, কেবিনঘরে পিছনে ঠেস দিয়ে জবুথবু হয়ে বসে আছে বাসনা, এক পাশে তার দাদা, অন্য পাশে কাকা। ওদের দেখে কত স্বাভাবিক ভাবে চমকে উঠল ফটিক।

মেয়েদেব মন কী করে জয় করতে হয়, তা জানার জন্য ফটিককে ডেল কার্নেগির বই পড়তে হয়নি। সে ঠিকই জানে যে, সদ্য বিধবা মেয়ের সঙ্গে ভাব জমাবার শ্রেষ্ঠ উপায় তার মৃত স্বামীর প্রশংসা করা। সহানুভূতি বড় চমৎকার সিঁড়ি, একেবারে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেয়।

অ-বাঙাল মেয়ের সঙ্গে কক্ষনও বাঙাল ভাষায় কথা বলে না ফটিক। এ ব্যাপারে সে খুব সতর্ক।

ভগবানের কী বিচার! আমাদের মতো হেঁজিপেঁজি অকম্মা লোকদের নেয় না, আমরা বাঁচলেই-বা কী, মলেই-বা কী, আর নাজনেখালির মনোরঞ্জন খাঁড়া, অমন সোন্দর চেহারা, আর কী দরাজ দিল, সেই মানুষটাকে অকালে নিয়ে গেল।

এইভাবে কথা শুরু করে ফটিক। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, জীবন অনিত্য, কে কবে আছি, কবে নেই। দু'জন মাছের চালানদার এই মূল্যবান দার্শনিক তত্ত্বটিতে খুব মনোযোগের সঙ্গে সায় দেয়। এক জন মন্তব্য করে, যা বলেছেন দাদা, আমাদের বাঁচা-মরা দুই-ই সমান। বোঝা যায়, বহু দিনের নিষ্ফল অভিমান থেকে এই কথাটা বেরিয়ে আসছে।

রাজযোটক যাকে বলে! এমন বিয়ে কটা হয়? পাত্রটি যেমন ভাল, তেমন আমাদের গাঁয়ের মেয়েও রূপে-গুণে কিছু কমতি নয়, এ-রকম মিল সহজে দেখা যায় না। তা-ও সহ্য হল না ভগবানের?

মাথায় ঘোমটা দিয়ে কলা-বউ-এর মতো নিথর হয়ে বসে আছে বাসনা। মাঝে মাঝে ফোঁস ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে শুধু। ফটিক তাঁকে উদ্দেশ করে একটানা ওই ধরনের কথা বলে চলল।

ফটিকের নির্লজ্জতায় নিতাইচাঁদ প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে যায়। এই ছোঁড়াই বাসনাকে নিয়ে পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। ইচ্ছে হয় একটা লাথি মেরে ছোঁড়াটাকে নদীতে ফেলে দিতে।

নিতাইচাঁদের দিকেই তাকিয়ে ফটিক এর পরে বলল, কাকা কেমন আছেন? কইখালির নেবারণ দাস আপনার খুব সুনাম কচ্ছিল, আপনি নাকি বিনা সুদে ওকে দুশো টাকা হাওলাত দিয়ে অসময়ে বড় বাঁচা বাঁচিয়েছেন?

নিতাইচাঁদকে বাধ্য হয়েই হাসতে হয় একটু। প্রশংসা শুনে খুশি না হয়ে পারা যায়? নিবারণ দাসের কাছ থেকে সুদ নেওয়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কোনও জামিন ধরা হয়নি, সেই জন্য সে সুনাম করেছে?

ফটিক এরপর বদ্যিনাথের দিকে ফিরে বলল, ভূতোদা, তোমার পার্টি নাকি তাসের টুর্নামেন্ট জিতেছে? খেজুরিয়াগঞ্জে খেলতে যাবে? বড় খেলা আছে।

যাদের লোক চরিয়ে খেতে হয়, তাদের সব বকম খবরও রাখতে হয়। যে-লোকের সঙ্গে একবার পরিচয় হয়েছে, তার নাড়ি-নক্ষত্রের সন্ধান জানে ফটিক। বদ্যিনাথ একবার একটু উঠে গেলে ফটিক তার জায়গাটায় বসে, বাসনার পাশে।

গাদাগাদি ভিড়ে লঞ্চে এখন কে কোথায় বসল, তা নিয়ে কোনও কথা চলে না। ইঞ্জিনের ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দের জন্য কেউ কথা বললে একটু দূরের লোক শুনতে পায় না। ফটিক ফিস ফিস করে বাসনাকে বলল, জীবনে এ-রকম দুঃখ এলে, সে দুঃখ অন্য কারুর সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয়। তবেই না তা সওয়া যায়?

বাসনা ডাগর চোখ মেলে তাকাল ফটিকের দিকে। এই মানুষটির জন্য তাকে এক দিন দারুণ লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে, তবু এর ওপর সে রাগ করতে পারল না। ফটিকের মুখখানাই এমন যে, তাকালে আর রাগ থাকে না। তাছাড়া এত ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে এই এক জন মাত্র লোক শুধু কত নরম করে শুধু দুঃখের কথাটাই বলল।

মনোরঞ্জনের ছবি আছে তোমার কাছে?

ছবি?

ফটো তুলে রাখোনি এক সঙ্গে? গোসাবায় তো পাঁচ টাকায় ফটো তুলে দেয়। ইস, কী নিয়ে কাটাবে সারা জীবন!

কোনও রকম স্বার্থের গন্ধ নেই ফটিকের কথার মধ্যে। একটি নীতিতে ফটিক সব সময় অটল থাকে, ধীরে বন্ধু ধীরে!

এক সময় গলা খাঁকারি দিয়ে নিতাইচাঁদ জিজ্ঞেস করল, তুমি ইদিকে কোথায় যাচ্ছ ফটিক?

আজ্ঞে কাকা, আমি যাচ্ছি নাজনেখালি, সেখানে আমার এক মাসির বাড়ি —।

তাহলে চলো আমাদের সঙ্গে বাসনাব শ্বশুর বাড়িতে একটু গোলমাল কচ্ছে, তুমি আমাদের গাঁয়ের ছেলে, একটু পাশে দাঁড়াবে।

নিশ্চয়ই, ফটিক তো তাই-ই চায়। লঞ্চে সে কি হাওয়া খাওয়াব জন্য উঠেছে? তাব মাসির বাড়ি সাবা পৃথিবীতে ছড়ানো।

বাসনার যেন কোনও ইচ্ছে-অনিচ্ছে নেই। সে কোথায় থাকবে কোথায় যাবে, তা সে নিজেই ঠিক করতে পারে না। শ্বশুর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল, চলে এল বাপেব বাড়ি, আবার বাপের বাড়ির লোকই তাকে নিয়ে চলেছে শ্বশুর বাড়ি। সেখানে গেলে যে আবার কী কুরুক্ষেত্র শুরু হবে, তা ভাবলেই বাসনার রক্ত হিম হয়ে যায়। তার একটুও যেতে ইচ্ছে করছে না। ও-বাড়ির পেছনের একটুখানি জমিতে বেগুন গাছে ফুল দেখে এসেছিল বাসনা। এখন সেখানে নিশ্চয়ই কচি কচি বেগুন

ফলেছে। মনোরঞ্জন নিজে হাতে ওই বেগুনের খেত করেছিল। বাসনা সে-দিকে কী করে তাকাবে? ধানের গোলা, ঝিঙের মাচা, সব কিছুতেই মনোরঞ্জনের হাতের ছাপ।

নাজনেখালি এসে গিয়েছে বলে কিছু লোক উঠে দাঁড়াতেই তার বুকের মধ্যে দুপ দুপ করে উঠল। এই জায়গাটার নাম শুনলেই তার এ-রকম হচ্ছে ক'দিন ধরে। বিয়ের আগে নাজনেখালির নামই শোনেনি।

জেটিঘাটায় নামতেই বোকা নগেন দাসের সঙ্গে দেখা।

প্রত্যেক দিন এই সময় নগেন দাস এখানে দাঁড়িয়ে থাকে। সে কোনও দিন লঞ্চে উঠে কোথাও যায় না, তার কাছে কেউ আসে না, তবু এই একটা নেশা। এই লঞ্চের মানুষজনের ওঠা-নামা দেখাই তার কাছে এক ঝলক বাইরের পৃথিবী দেখা।

নিতাইচাঁদকে সে নিজেই ডেকে বলল, ও মশাই আবার এসেছেন? ভাল করেছেন। খবর শুনেছেন তো?

আর এক জন লোক বলল, এই তো মনোরঞ্জন খাঁড়ার বউ ফিরে এসেছে।

অন্য এক জন বলল, তাহলে আর চিন্তা নাই, বিষ্টু খাঁড়ার কপালডা ফিরা গ্যাল এবার!

ভুরু দুটো নেচে উঠল নিতাইচাঁদের। কী ব্যাপার? এরা কী বলতে চায়?

দু'পা বাড়ালেই মোচা বিষ্টুর চায়ের দোকান। সেখানে এসে চায়ের অর্ডার দিল ফটিক। এক দল লোক তাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। বাসনাকে বসানো হল বাণী কাঠের তক্তার বেঞ্চে।

আপনে শোনেন নাই, মনোরঞ্জনের বউয়ের নামে ভারত সরকার আর বাংলা সরকার পনেরো হাজার টাকা দেবে!

সাহেবরাও আরও কিছু দিতে পারে শুনছি!

আমেরিকা দেবে।

আমেরিকা দিলে রাশিয়াও দেবে।

দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধী ওর হাতে প্রাইজ দেবে না?

একটা হাসির রোল পড়ে যায়। মনোরঞ্জন খাঁড়ার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বেশ একটা রসিকতা জমে উঠেছে। বাঘে মরলে পনেরো হাজার টাকা। তুমি জলে ডুবে মরো, কেউ তোমাকে পাত্তা দেবে না। তুমি যদি ওলাউঠোয় মরলে তো মরলে, ব্যাস, ফুরিয়ে গেল! এমনকী, তোমাকে পাগলা কুকুরে কামড়াক কিংবা জাতসাপে কাটুক, কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। কিন্তু বাঘে তোমার ঘাড় ভেঙে দিলেই পনেরো হাজারটি টাকা পেয়ে যাবে। গভর্নমেন্ট দেবে। চমৎকার ব্যাপার না?

নিতাইচাঁদ একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। কিছুই বুঝতে পারছে না। পনেরো হাজার টাকা কাকে বলে এরা জানে? ওই মেয়ে এত টাকা পাবে কেন!

ফটিকের বুকের মধ্যে রেলগাড়ির ইঞ্জিন চলছে। তার মন বলেছিল না, এই মেয়ের মধ্যে মধু আছে? পনেরো হাজার টাকা। দেখা যাক ওই টাকা কে পায়! তার নাম ফটিক লস্কর।

নদীর ধারের বাঁধের ওপর দিয়ে দলে দলে লোক আসছে বাসনাকে দেখবার জন্য। আজ হাটবার, এমনিতেই অনেক লোক আসতে শুরু করে এখন থেকেই।

রীতিমতো ভিড় জমে গেল বাসনাকে ঘিরে। আর সেই সঙ্গে নানা রকম গুঞ্জন। মনোরঞ্জন খাঁড়ার বিধবা বউ এখন দারুণ এক দ্রষ্টব্য ব্যাপার। এক গলা ঘোমটা টেনে ওই যে পুঁটুলিটা নিয়ে বসে আছে, তার হাতের একটা সই-এর দাম এখানকার সকলের চেয়ে বেশি।

ফটিক নিতাইচাঁদের কাঁধে হাত ছুঁইয়ে বলল, কাকা একটু শোনেন!

তারপর ভিড়ের জটলা থেকে নিতাইচাঁদকে খানিকটা দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে দারুণ উত্তেজিত ভাবে বলল, কাকা ব্যাপারটা বোঝলেননি? আপনাগো মাইয়া এখানে আনছেন, সব টাকা তো অরা লইয়া যাবে।

নিতাইচাঁদ বলল, কার টাকা? কীসের টাকা বলো তো?

ওই যে শোনলেন না? মনোরঞ্জনরে বাঘে খাইছে, সেই জন্যই সরকার ক্ষতিপূরণ দেবে। অনেক টাকা। ক্ষতি কার, আপনাগো না?

এমন যে ধুরন্দর নিতাইচাঁদ, তারও বিষয়টা মাথায় ঢুকছে না এখনও। ফটিক অতি দ্রুত বুঝিয়ে দিল।

তাহলে এখন উপায়?

কাকা, এই ফটিক বাঙালের পরামর্শ যদি শোনেন, তাহলে আমি কই চলেন এখনি আমরা ফিরা যাই।

ফিরে যাব?

বাসনারে একবার শ্বশুর বাড়ি লইয়া গ্যালে হ্যারা আর ছাড়বে অরে? বাসনারে দিয়া সই-সাবুদ করাইয়া সব টাকা অরা হজম কইরা দেবে না?

টাকা...ওরা নেবে?

নেবে না? একবার বাসনাব সই পাইলেই হয়!

তাহলে এখন উপায়?

চলেন, এক্ষুনি ফিরা যাই। মনোরঞ্জনের বাবা আইস্যা কইলেও আপনে বাসনারে ছাড়বেন না, কিছুতেই ছাড়বেন না। আমাগো গ্রামের মেয়ে, আমাগো গ্রামেই থাকবে।

লঞ্চ ছেড়ে গেল, এখন আমরা ফিরব কী করে?

সে-ব্যবস্থা আপনার, আপনে যান বাসনার হাত ধইরা থাকেন, অগো সাথে কথা কইয়া সময় কাটান গিয়া একটু।

সত্যিই করিৎকর্মা ছেলে বটে ফটিক। হাটবার বলে অনেক নৌকো এসে লেগেছে আজ। তারই মধ্যে একটি নৌকোর মাঝির সঙ্গে সে দরাদরি করে ঠিক করে ফেলল।

তারপর ছুটে এসে বলল, কাকা, চলেন।

বদ্যিনাথ কিছু বুঝতে পারেনি। সে বলতে লাগল, কোথায়? কোথায়? মনোরঞ্জনদের বাড়ি তো এ-দিকে।

আগে একবার জয়মণিপুরে যেতে হবে, শিগ্‌গির।

ওদের দলটি আবার জেটিঘাটের দিকে ফিরে যেতেই ভিড়ের লোকজন বলল, এ কী, ওরা চলে যায় যে!

বিষ্টুরা কোনও খবর পেল না।

অবাক কাণ্ড, এখনও চিতের ধোঁ উড়ল না, আর বউ ড্যাংডেঙিয়ে চলল বাপের বাড়ি।

আবার এলই-বা কেন, ফিরে চললই-বা কেন?

মাঝপথে খেলা ভেঙে যেতে মজাটা যেন জমল না। সদ্য বিধবা বউ, বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়িতে এসে লঞ্চঘাটে পা দিয়েই ফিরে যাচ্ছে, এ কেমন ধারা ব্যাপার! দু-চার জন চলে গেল মনোরঞ্জনের বাপ-মাকে খবর দিতে।

ফটিক নিজে বাসনার হাত ধরে তুলল নৌকোয়। নিতাইচাঁদ কেমন যেন ন্যাবড়জ্যাবড়া হয়ে গেছে। নৌকোর দড়ি খুলে মাঝিকে তাড়া দিয়ে ফটিক বলল, আরে ভাই, ছাড়েন ছাড়েন।

ভাটার সময়। তবু নাজনেখালি থেকে যত তাড়াতাড়ি দূরে চলে যাওয়া যায়, ততই মঙ্গল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই হুই হুই করে এসে গেল সাধুচরণের দল। ভিড় ঠেলে এসে জেটিঘাটের ওপর দাঁড়িয়ে তর্জন-গর্জন করতে লাগল।

মাধবদা, তোমার চোখের সুমুখ দিয়ে মনোরঞ্জনের বউকে নিয়ে চলে গেল, আর তুমি কিছু বললে না?

মাধব এক মনে গাঢ় নীল রঙের নাইলনের জাল ধুয়ে পরিষ্কার করছিল, সম্পূর্ণ অনুত্তেজিত দু'টি চোখ তুলে সে তাকাল ওদের দিকে। ওরা আরও অনেক কথা বলে যাচ্ছে, মাধব চুপ।

তারপর হঠাৎ সে ধমক দিয়ে বলে উঠল, তা আমি কী করুম? পরের বউ লইয়া টানাটানি করুম?

তা বলে আমাদের গাঁয়ের বউকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে?

যার যা ইচ্ছে করুক।

প্রথমে প্রায় লাফিয়ে পড়ল নিরাপদ, তারপর সাধুচরণ, সুশীল, বিদ্যুৎ, সুভাষ সবাই নেমে এল নৌকোর ওপরে। আশপাশের কয়েকখানা নৌকো থেকে তারা চেয়ে নিল কয়েকটা দাঁড়, সবাই ঝপাঝপ হাত চালাল এক সঙ্গে।

ফটিক, নিতাইচাঁদ পেছন দিকে তাকিয়েই ছিল, ওরা এক নজর দেখেই বুঝতে পারল একখানা নৌকো তেড়ে আসছে ওদের দিকে। ফটিক চেঁচিয়ে উঠল, হাত চালাও, ও দাদা, হাত চালাও, আমাদের যেন ধরতে না পারে।

তাবপর শুরু হল নৌকো বাইচ।

কিন্তু নাজনেখালির জয়হিন্দ ক্লাবের দুর্দান্ত মেম্বারদের সঙ্গে পারবে কেন মামুদপুরের লোকেরা! নিতাইচাঁদ আর বদ্যিনাথ দু'জনেই বাবু ধরনের, তারা নৌকোর দাঁড় ধরতে জানে না।

মাধবের নৌকো একেবারে ঠকাস করে লাগল নিতাইচাঁদের ভাড়া নৌকোর গায়ে। সাধুচরণ আগে থেকেই ঝুঁকে ছিল, খপ করে চেপে ধরল বাসনার হাত।

নিতাইচাঁদ বলল, এই, এই, আমাদের মেয়ের গায়ে হাত দেবে না।

নিরাপদ বলল, শালা, চোর, আমাদের গেরামের বউকে চুরি করে পালাচ্ছ!

দু'দলই হাতের দাঁড়গুলো উঁচু করে তুলেছে, এই বুঝি কাজিয়া বাধে।

সাধুচরণ বাসনার হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিতেই উলটে গেল নিতাইচাঁদদের নৌকোটা। বেগতিক বুঝে ঠিক সেই মুহূর্তেই ফটিক জলে ঝাঁপ দিয়েছে।

অত্যন্ত কেরামতির সঙ্গে নিজের নৌকোটা সামলে আছে মাধব। এই সব ব্যাপারটিতেই সে বিরক্ত। সে সংসারী লোক, তাকে আবার জড়িয়ে পড়তে হবে ঝঞ্ঝাটে। সে চ্যাঁচাতে লাগল, আরে বইস্যে পড়, বইস্যে পড়, হারামজাদারা, এডারেও উলটাবি!

এত বড় একখানা নদীতে কেউ কোন ওদিন সাধ করে একবাবও ডুব দেয় না। ঘাটের কাছেও স্নানে নামে না। এমন কামটের উৎপাত। সেই নদীর জলে এতগুলো মানুষ। বাসনার হাত ছাড়েনি সাধুচরণ, তাকে ডুবতে দেয়নি। নিতাইচাঁদকেও টেনে তুলল সুভাষ আর বিদ্যুৎ। বদ্যিনাথ কিছুক্ষণ হাবুডুবু খেল। মাঝি দু'জন অনেক কষ্টে আবার ভাসিয়ে তুলল তাদের নৌকোটাকে।

শুধু তলিয়ে গেল ফটিক, তাকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। তবে, সত্যি সত্যিই কি আর তলিয়ে যাবে? বাঙালা দেশের ছেলে, ওরা নাকি জলের পোকা, ভুস করে আবার কোথাও মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে ঠিকই।

ধুতির কাঁছা-কোঁচা খুলে গেছে, নিতাইচাঁদের মাথা থেকে জল গড়াচ্ছে, ত্রিভঙ্গ মুরারির মতো দাঁড়িয়ে তড়পাতে লাগল, আমি থানায় যাব...জুলুমবাজি...এ কি মগের মুলুক...তোদের সব ক'টার কোমরে দড়ি দিয়ে জেলের ঘানি ঘুরোতে না পারি...আমার নাম নিতাইচাঁদ সাধু নয়। দিনদুপুরে ডাকাতি...মেয়েছেলের গায়ে হাত...আমি ছাড়ব না। সব ক'টাকে আমি...।

সেয়ানে-সেয়ানে

এবার দারোগার কথা।

গৌর দারোগা নিছক এক রঙা মানুষ নয়। ধপধপে সাদা বা কুচকুচে কালো রঙ দিয়ে তার চরিত্র আঁকা যাবে না নিছক সত্যের খাতিরেই।

সচরাচর মফঃস্বলের মাঝবয়েসি দারোগাদের মতো গৌর হালদারের পেটমোটা চেহারা নয়, বেশ লম্বা বলশালী শরীর, গায়ের রঙ শ্যামলা, মুখটা অনেকটা মঙ্গোলীয় ধরনের, চোখ ছোট এবং কম কথা বলা স্বভাব। থানার বাইরে বেরোতে না হলে তিনি ধুতির ওপর হাফশার্ট পরে থাকেন।

কেউ বলে, ওরে বাপ রে, এমন চশমখোর লোক আর হয় না। সেই যে যতীন ঘোষাল দারোগা ছিল কাঁচারক্তখেকো দেবতা, বছর দশেক আগে যার ভয়ে এ তল্লাটের মানুষ ভয়ে কাঁপত, সবাই ভেবেছিল এমন নিষ্ঠুর মানুষ আর হয় না। এই গৌর হালদার যেন তাকেও ছাড়িয়ে যেতে চায়। আবার কেউ বলে, গৌর দারোগা যেন ঝুনো ডাব, বাইরে শক্ত কিন্তু ভেতরে দয়া-মায়া আছে। কেউ বলে, পয়সা চেনে বটে গৌর দারোগা। পিঁপড়ের পেছন টিপে মধু বার করতে জানে। আবার কেউ বলে, শুধু হাতে থানায় গেলাম, বড়বাবু কথা শুনলেন, ঠারে-ঠোরেও পয়সা চাইলেন না। অথচ কাজ হাসিল হয়ে গেল। এমনটি আগে কখনও দেখিওনি, শুনিওনি।

একই মানুষ সম্পর্কে এমন পরিস্পর-বিরোধী কথা শোনা যায় কী করে? এ কোন রহস্য?

রহস্যটি আসলে সরল।

এই বাদা অঞ্চলে মোটমাট চার রকমের মানুষ। বন কেটে বসতির সময় এক দল এসেছে উড়িষ্যা থেকে, এক দল মেদিনীপুর থেকে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা আগেও এসেছে, পরেও এসেছে, আর এসেছে মুসলমান। এই চার রকমের মানুষ এত দিনেও এক সঙ্গে মিশে যায়নি, এদের আলাদা পাড়া ও আলাদা অস্তিত্ব আছে। উড়িষ্যার লোকেরা সবাই এখন খাঁটি বাংলায় কথা বললেও নিজস্ব সামাজিক পরিচয় মুছে ফেলেনি। আর মুসলমানদের সবাইকেই এখানে অন্যরা বলে মোল্লা।

গৌর হালদারের পক্ষপাতিত্ব আছে বিশেষ এক সম্প্রদায়ের প্রতি। ইনিও পার্টিশানের পরে আসা রিফিউজি। যাদবপুরের কলোনিতে জল-কাদা, নোংরা, মশা-মাছি, লাঞ্ছনা, অপমান ও দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে শৈশব ও কৈশোর। তারপর ভাগ্যচক্রে পুলিশে কাজ পেয়েছেন। এবার তিনি প্রতিশোধ নিতে চান। তিনি যে শুধু ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ঘোর সাপোর্টার, তাই নন। পশ্চিমবঙ্গীয় হিন্দুদের তিনি অন্তর থেকে ঘৃণা করেন। যাদবপুরে থাকার সময় ছাত্রাবস্থায় খেলার মাঠে তিনি মোহনবাগানের দর্শক গ্যালারির দিকে নিয়মিত ইঁট মারতেন, হাত-বোমাও ছুঁড়েছেন কয়েক বার।

গৌর হালদার শুধু বাঙাল নন। বাঙালদের মধ্যেও সূক্ষ্ম ভেদাভেদ মানেন তিনি। তাঁর জন্ম টাঙ্গাইলে, তিনি মনে করেন টাঙ্গাইল, মৈমনসিং, ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহি নিয়ে যে একটি বৃত্ত, এখানকার

মানুষই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। ফরিদপুর-যশোর-খুলনার বাঙালরাও ঠিক বাঙাল হিসেবে ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কারণ পশ্চিমবঙ্গের সংস্পর্শে আগে থেকেই ওদের খানিকটা চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, নিছক বাঙাল নামের জন্যই ওরা খানিকটা সহানুভূতি পাবার যোগ্য।

ওড়িয়া, মুসলমান এবং কিছু কিছু সাঁওতালও যে আছে বাদা অঞ্চলে, তাদের প্রতি গৌর হালদারের কোনও বিদ্বেষ নেই, তারা বিপদে পড়লে তিনি সাধ্য মতো সাহায্য করেন। তাঁর সমস্ত রাগ শুধু পশ্চিমবঙ্গীয় হিন্দুদের ওপর। বিশেষত কলকাতা শহর থেকে যে-সব জমির মালিক বা ভেড়ির মালিক মাঝে মাঝে এখানে আসে টাকা নিয়ে যাবার জন্য, তাদের কোনওক্রমে বাগে পেলে গৌর হালদার একেবারে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেয়ে ফেলেন। অনেক সময় আইনের পরোয়া না করে বে-আইনি ভাবেও তাদের নির্যাতন বা হয়রান করেন কিংবা অর্থদণ্ড ঘটান। টাঙ্গাইলের ছোট্ট ছিমছাম বাড়ি, পুকুর, ধান জমি সব ছেড়ে অসহায় ভাবে চলে এসেছেন এক সময়, তবু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আতিথেয়তার হাত বাড়িয়ে দেয়নি। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-উপহাস করেছে, যাদবপুরের জলাভূমিতে শুয়োরের খোঁয়াড়ের মতো ঘরে থাকতে দিয়েছে। সে-রাগ তিনি কখনও ভুলতে পারেন না। অর্থাৎ তিনি প্রায় একটি গুপ্ত-উন্মাদ।

মরিচঝাঁপির দ্বীপ থেকে যখন বাঙালখেদা অভিযান হয়, সেবার শোকে-দুঃখে রাগে-অভিমানে গৌর হালদার তিন মাসের ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে অসহায় ভাবে হাত কামড়েছেন। তারপর আবার কাজে যোগ দিয়েই তিনি অ-বাঙাল হিন্দুদের ওপর বাড়িয়ে দিয়েছেন অত্যাচারের মাত্রা। অবশ্য, এ-সবই গৌর হালদারের মনে মনে। বাইবে কিছু প্রকাশ করেন না। গৌর হালদারের ছেলে-মেয়েরা, যারা জীবনে কখনও পূর্ব বাংলায় যায়নি, তারাও যদি বাড়িতে কখনও বাঙালভাষা না বলে ঘটি-ভাষায় কথা বলে ফেলে, অমনি গৌর হালদার কানচাপাটি বিরাশি শিক্কা থাবড়া মারেন তাদের। বাইরে যত ইচ্ছে ঘটিভাষা বলুক, বাড়িতে চলবে না।

নাজনেখালির বাঘে-খাওয়া মনোরঞ্জনের বৃত্তান্ত ইতিমধ্যেই কানে এসেছে গৌর হালদারের। জয়মণিপুবেব সব ব্যাপারে নাক গলানো ইস্কুল মাস্টারনিটির হাতে লেখা একটি দরখাস্তও তাঁর কাছে এসেছে, তিনি চুপচাপ চেপে বসে আছেন। ওরা ভেবেছে একখানা কাগজ পাঠিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। গৌর হালদারের সঙ্গে একটি বার দেখা করারও দরকার নেই, না? আচ্ছা?

নিতাইচাঁদ গৌর হালদারের কাছে এসে সুবিধে কবতে পারল না। দারোগাবাবুর মন ভেজানোর জন্য সে অনেক রকম কাঁদুনি গাইল। সব কথা শুনে ডায়েরি না লিখেই হাঁকিয়ে দিলেন নিতাইচাঁদকে। ছেলের বউকে শ্বশুর বাড়ির লোকেরা নিজেদের কাছে রাখতে চায়, এতে আবার নারী-হরণ কী? বেয়াইতে বেয়াইতে কোঁদল, এর মধ্যে পুলিশ নাক গলাতে যাবে কেন? নৌকো ডুবিয়ে দিয়েছে? তা সে নৌকোর মাঝি কোথায়? তাকে ডাকো, কেস লেখাতে হয় সে লেখাবে।

ভাড়া নৌকোর মাঝির বয়েই গেছে থানায় আসতে। সুখে থাকতে সাধ করে কে ভূতের কিল খেতে যাবে।

নিতাইচাঁদ আরও অনেক ভাবে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করল বাসনাকে। দু-চারটে লোক লাগাল। যদি হাটবারে ভিড়ে গণ্ডগোলে কোনও রকমে ফুসলে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু নাজনেখালির জয়হিন্দ ক্লাবের সদস্যদের কড়া পাহারায় তা হবাব উপায় নেই। থানাতে ঘোরাঘুরি করেও কোনও সুরাহা হল না। শেষ পর্যন্ত নিতাইচাঁদ হাল ছেড়ে দিল।

এরপর এক দিন এল সাধুচরণ। পরিমল মাস্টার পাঠিয়েছে। এই সাধুচরণকে গৌর হালদারই জেলে পাঠিয়েছিলেন। তার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে গৌর হালদার বললেন, কী রে, আবার জেলের ভাত খাবার শখ হয়েছে বুঝি? ধান কাটার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা কর, আবার তোকে পাঠাব।

সাধুচরণ বলল, মাস্টারমশাই বললেন...।

তোদের মাস্টারমশাই কোন লাট সাহেব? নিজে আসতে পারে না?

বাসনার সই পাবার পর ইনসিওরেন্সের ব্যবস্থাটা অনেকটা পাকা হয়ে গেছে। চিঠি লেখালেখি হয়েছে সরকারের সঙ্গে। এখন দরকার শুধু থানার রিপোর্ট।

অতএব পরিমল মাস্টারকেই সশরীরে আসতে হল এক দিন।

গৌর হালদার সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন, আসুন, মাস্টারমশাই আসুন। ওরে, একটা চেয়ার দে। চা খাবেন তো? নাকি ডাব খাবেন? আমাদের থানার কম্পাউন্ডে বড় বড় পাঁচটা নারকোল গাছ।

শুধু মাস্টারমশাই তো নন, সোস্যাল ওয়ার্কার, অনেক টাকার প্রজেক্ট চালাচ্ছেন, এঁদের একটু খাতির দেখাতেই হয়। দু-চার জন মন্ত্রী-টন্ত্রীর সঙ্গে চেনা থাকে এঁদের। হুটহাট করে হোম সেক্রেটারি কিংবা চিফ মিনিস্টারের পি এ বেড়াতে আসেন এঁদের কাছে।

গৌর হালদার নিজে একটা চেয়ারের ধুলো ঝেড়ে বসতে দিলেন পরিমল মাস্টারকে। একই সঙ্গে চা আনাবার জন্য এবং ডাব পাড়বার জন্য হাঁকডাক করতে লাগলেন জমাদারদের। বিশিষ্ট অতিথির সম্মান জানাতে গৌর হালদারের যেন কোনও কার্পণ্য নেই।

টেবিলের দু'পাশে দু'জন মুখোমুখি বসবার পর গৌর হালদার তাঁর ছোট ছোট চোখ দু'টির তীব্র দৃষ্টি স্থাপন করলেন। এই পরিমল মাস্টারের মতো লোকরাও তাঁর এক নম্বরের শত্রু। শহরের লোক। নেহাত ভাগ্যগুণে পশ্চিমবঙ্গে জন্মেছে বলেই সারা জীবন পাকাবাড়িতে থেকেছে, ছেলেবেলায় ঠিকঠাক শিক্ষা পেয়েছে, হাত-খরচের পয়সায় সিনেমা-থিয়েটার দেখেছে, পার্কে কিংবা গড়ের মাঠে প্রেম করেছে মার্জিত, শিক্ষিত পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে, আর কোনও না-কোনও দিন মুখ বেঁকিয়ে বলেছে নিশ্চয়ই, এই রিফিউজিগুলোর জন্যই এমন সুন্দর কলকাতা শহরটা দেখতে দেখতে একেবারে যা-তা হয়ে গেল!

অথচ গৌর হালদারও তো প্রায় একই রকম পরিবারের সন্তান, তাঁদেরও পাকা বাড়ি ছিল, গোয়ালে গরু, পুকুরে মাছ আর জমিতে ধান ছিল। সে-সব কিছু থেকে বিতাড়িত হয়ে এসে থাকতে হয়েছে শহরতলির বস্তিতে। ক্যাশ ডোলের জন্য সরকারি অফিসারদের পা ধরতে হয়েছে, ঘুষ দিতে হয়েছে, এমন ইস্কুলে পড়তে হয়েছে, যেখানে পড়াশুনো কিছু হয় না, কলেজে পরীক্ষার সময় ফি জোগাড় করতে না পেরে ভিক্ষে করতে হয়েছে বড়লোকদের কাছে, অভাবের তাড়নায় বাড়ির একটা মেয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে বেশ্যা হয়েছে। এ-সব কার দোষে?

তা গৌরবাবু, কেমন আছেন? ভাল আছেন তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার মাঝে খুব জ্বর হয়েছিল শুনলাম।

সে-খবরও পেয়েছেন! আপনারা পুলিশের লোক, সব খবর রাখেন!

আপনি বিখ্যাত লোক, আপনার সব খবর এ তল্লাটে ছড়িয়ে পড়ে। আপনার ছেলে ডাক্তারিতে ভর্তি হয়েছে?

এখনও সিলেকশান হয়নি। তা গৌরবাবু, এসেছিলুম একটা বিশেষ কাজে।

কাজ ছাড়া আর কেন আসবেন! আমাদের যত চোরছ্যাঁচোড় নিয়ে কারবার, আপনাদের মতো মানী লোকের পায়ের ধুলো তো সহজে পড়ে না। আপনাদের ওখানে অ্যানুয়াল ফাংশান কবে হচ্ছে এবারে?

সামনের মাসে। আপনাদের যেতে হবে কিন্তু।

যাব, নিশ্চয়ই যাব।

আপনার কাছে এসেছিলুম একটা দরকারে। একটা ক্লেইম কেসের ব্যাপারে।

বলুন! আপনি নিজে এলেন কেন, লোক পাঠালেই হত।

নাজনেখালির মনোরঞ্জন খাঁড়া নামে একটি ছেলে...।

গৌর হালদার উঠে গিয়ে পাশের টেবিলে খোঁজাখুঁজি করে একটা ফাইল নিয়ে এলেন, সেটা খুলে মনোযোগ দিয়ে পড়বার ভান করলেন, যেন তিনি কিছুই জানেন না।

একবার মুখ তুলে বললেন, নিন, চা খান, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ডাবের জল আসছে।

তারপর একটু বাদে তিনি আবার বললেন, হ্যাঁ, আপনার স্ত্রীর পাঠানো একটা দরখাস্ত রয়েছে দেখছি।

ফরচুনেটলি, বুঝলেন গৌরবাবু, ওদের নামে গ্রুপ ইনসিওরেন্স করানো ছিল, ওর বাড়ির লোক...।

বাঃ, তবে তো ভালই।

সরকারও এই সব কেসে কিছু টাকা দেবে বলে ঘোষণা করেছে।

হ্যাঁ, আমার কাছে সার্কুলার এসেছে।

এখন আপনার কাছ থেকে একটা রিপোর্ট পেলেই...।

কোন ফরেস্ট গিয়েছিল বললেন?

তিন নম্বর ব্লকে।

আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?

দু'জনে চোখাচোখি হল। বুদ্ধির লড়াই এবাব আসন্ন।

পরিমল মাস্টার জানে, এক সঙ্গে অনেকগুলো কাজে হাত দিলে কোনওটাই ঠিক মতো হয় না। স্থানীয় ওসি যদি ঘুষখোর হয়, ফরেস্টবাবু যদি হয় অত্যাচারী, কোনও ব্যবসায়ী হয় অসাধু, এদের সবাইকে সরিয়ে দেওয়া কিংবা সব অভিযোগেব প্রতিকার করার সাধ্য তার নেই। মাত্র কাছাকাছি দশখানা গ্রাম নিয়ে তাদের প্রজেক্ট। ভূমিহীন কিংবা সামান্য জমির মালিক চাষিদের স্বাবলম্বী করে তোলা এবং তাদের অধিকারবোধ সম্বন্ধে সচেতন করাই আপাতত তার কাজ। এইটুকু হলেই যথেষ্ট। এইটুকু নয়, এটাই বিরাট ব্যাপার।

ওসি গৌর হালদারের ভাল আর মন্দ, দু'রকম ব্যবহারের কথাই শুনেছে পরিমল। লোকটির চরিত্রে বৈপরীত্যের ব্যাপারটা সে বুঝেছে, যদিও আসল কারণটা জানে না। এবং এ লোকটিকে সে ঘাঁটাতেও চায়নি, তার কাজে বাধা না দিলেই হল।

ফরেস্টের জয়নন্দনবাবু ঘুরে এসে রিপোর্ট দিয়েছেন।

কোথায় ঘুরে এসেছেন? সে রিপোর্টের কোনও কপি তো আমি পাইনি?

উনি তিন নম্বর ব্লকে গিয়েছিলেন। রাইটার্স বিল্ডিংসে নোট পাঠিয়েছেন শুনেছি।

রাইটার্স বিল্ডিংস? ও! তা তিনি তিন নম্বর ব্লক ঘরে কী দেখলেন? সেখানে বাঘ আছে, না নেই? সেখানে বাঘের কোনও প্রমাণ পেয়েছেন?

না, বাঘের কোনও প্রমাণ পাননি। তারপর ক'টা জোয়ার ভাটা গেছে, বৃষ্টিও পড়েছে।

জয়নন্দনবাবু তিন নম্বর ব্লকে বাঘের কোনও প্রমাণ দেখতে পেলেন না, পাবার কথাও নয়। সেখানে বাঘ কেন, একটা শেয়ালও নেই, আর সেখানে একটা তাগড়া লোক বাঘের পেটে চলে গেল?

দয়াপুরে যে বাঘ এসেছিল, কোনও দিন কি কেউ ভেবেছে যে দয়াপুরে বাঘ আসতে পারে?

না, কেউ ভাবেনি। যেখানে বাঘ নেই, সেখানে বাঘ এসেছে শুনলেই লোকে বিশ্বাস করবে কেন? তবে দয়াপুরের বাঘটিকে অনেক লোক চোখে দেখেছে, একটি ছোট মেয়েকে বাঘটা মেরেছে, আমি গিয়ে সেই মেয়েটির লাশ দেখেছি, তারপর বিশ্বাস করেছি।

ওখানেও অনেকে দেখেছে।

আপনি নিজে লাশ দেখেছেন?

না।

জয়নন্দন ঘোষাল বা অন্য কেউ সে-লাশ দেখেছে?

তা ঠিক জানি না। বোধহয় লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

লাশটা কোথায় গেল? আমি তো যত দূর জানি, বাঘ যাকে ধরে, তার সবটা খায় না, দেহের বিশেষ বিশেষ জায়গার মাংস খেয়ে চলে যায়। লোকটার জামা-কাপড়ই-বা গেল কোথায়?

গেঞ্জিটা পাওয়া গেছে।

বটে? শুধু গেঞ্জি?

তাই তো শুনেছি।

সেটা ফরেনসিক টেস্টের জন্য পাঠাতে হবে না? আমি তো দেখিনি সে গেঞ্জি।

তা হলে গেঞ্জিটা চেয়ে পাঠাতে হয়। আবার অনেক দেরি হয়ে যাবে।

দেরি? হ্যাঁ, তা দেরি তো হবে। মনোরঞ্জন খাঁড়ার বাড়িতে কে কে আছে? তার বউ আছে না?

হ্যাঁ, একেবারে কচি মেয়ে, সবে মাত্র বিয়ে হয়েছে।

তাকে আনা হয়নি?

তাকে কি থানায় আনার খুব দরকার? এখন শোকের সময়।

ছেলেটার বাপ কোথায়? সে-ও আসেনি। শুধু আপনি এসেছেন তদ্বির করতে? বুঝলাম।

আপনার রিপোর্টের ওপরই সব নির্ভর করছে। আপনি ফেভারেবল রিপোর্ট দিলে বিধবা মেয়েটা, ওই ছেলেটোর বাপ-মা টাকা পেতে পারে।

অর্থাৎ আর বুদ্ধির খেলা নয়, এবার হৃদয়ের কাছে আবেদন।

একটা সিগারেট টানার জন্য মুখ শুল শুল করছে পরিমলমাস্টারের। চারদিন একটাও সিগারেট খায়নি, তবু নেশাটা কিছুতে ছাড়ে না। এই রকম সময় খুব বেশি প্রয়োজন হয়।

গৌর হালদার বিড়ি-সিগারেট কিছু খান না। পাশের টেবিলে সাব-ইন্সপেকটর অবিনাশ ফুঁক ফুঁক করে একটা সিগারেট টানছে। সেই ধোঁয়াতেই আরও আনচান করছে পরিমল মাস্টারের মন। অথচ মুখ ফুটে চাওয়াও যায় না। অবিনাশের সামনের চেয়ারে বসে আছে দু'টি বাইরের ছোকরা। ওরা বন-বাণী নামে চার পৃষ্ঠার একটি নিউজ প্রিন্টে ছাপা পত্রিকা বার করে। কান খাড়া করে ওরা শুনছে সব কথা।

ঘটনাটা ঘটল কবে যেন, আট তারিখে? আর আমার কাছে একখানা শুধু দরখাস্ত পৌঁছল সতেরো তারিখে। অথচ এর মধ্যে থানায় একটা রিপোর্ট নয়, কিছু না। আমাকে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিলে আমি সরেজমিনে দেখে আসতে পারতাম না?

সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে পরিমল মাস্টার এবার বিনীত ভাবে বলল, সত্যিই, আপনাকে আরও অনেক আগেই খবর দেওয়া উচিত ছিল। এটা ভুল হয়ে গেছে খুবই, আর একটা ব্যাপার হল কি জানেন, আমিও তখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলুম।

গৌর হালদার আবার চোখ কুচকোলেন। অর্থাৎ পরিমল মাস্টার বলতে চায়, ওর অসুখ না থাকলেই ও সব ব্যবস্থা ঠিক ঠাক করে দিত। সব দায়িত্ব ওর, ও একাই সব গরিবদের মহান মুক্তিদাতা, কত দরদ! মরিচঝাঁপির অসহায় লোকগুলোর ঘর জ্বালিয়ে যখন মেরে তাড়ানো হল, তখন এই দরদ কোথায় ছিল পরিমলমাস্টারের? এরা শুধু নিজের লোকদের স্বার্থ দেখে।

আচ্ছা ধরুন মাস্টারমশাই, কোনও লোক যদি বলে, সে মনোরঞ্জন খাঁড়াকে বসিরহাট বাজারে দেখেছে।

একটু অন্য মনস্ক হয়ে গিয়েছিল পরিমল, চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, কী বললেন?

ধরুন, কেউ যদি বলে ওই ছেলেটাকে কেউ বসিরহাট বাজারে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে, তা হলে কী হবে? জঙ্গলে যাবার নাম করে কেউ যদি কিছু দিনেব জন্য অন্য কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকে, আর তার স্যাঙাতরা রটিয়ে দেয় যে তাকে বাঘে নিয়ে গেছে? আমি লাশ দেখলাম না, কিছু না, টাইগার-ভিকটিম বলে রিপোর্ট দিয়ে দিলাম, তারপর সে লোক সত্যি না মরলে আমার চাকরি থাকবে?

পরিমল মাস্টার স্তম্ভিত ভাবে বলল, তা কখনও হয়?

বন-বাণী পত্রিকার সম্পাদকদ্বয় গৌর হালদারের এই শেষের যুক্তিটা লুফে নিল। অবিকল সেই কথাগুলিই ছাপা হল তাদের কাগজে। লোকে বলাবলি করতে লাগল, মনোরঞ্জন খাঁড়াকে নাকি বসিরহাট বাজারে দেখা গেছে? কে দেখেছে? দেখেছে নিশ্চয়ই কেউ, নইলে দারোগাবাবু ও-কথা বলবেন কেন?

থানার রিপোর্ট না পেয়ে ইনসিওরেন্স দফতর বেগড়বাঁই কবতে লাগল। সরকারি বিভাগও চুপচাপ। অনেক চেষ্টা করেও ওসি গৌর হালদারকে নড়ানো গেল না। পরিমল মাস্টারও মনে মনে একটু দুর্বল হয়ে আছে। সে জানে, তিন নম্বর ব্লক আর সাত নম্বর ব্লক জঙ্গলের তফাত। সত্যি কথাটা বলে দেওয়া সম্ভব নয় তার পক্ষেও।

গৌর হালদারের সঙ্গে তর্ক করার মতো জোরালো যুক্তি তার মনে পড়ল না একটাও।

কয়েক দিন পরেই আর একটি চমকপ্রদ কাণ্ড হল।

রায়মঙ্গল নদীতে এক সঙ্গে বাপ আর ছেলেকে আক্রমণ করেছে বাঘ। তীর থেকে বেশ খানিকটা দূরে নৌকো বেঁধে রাত্রে ঘুমোচ্ছিল ওরা। বাঘ এসেছে সাঁতরে। অন্তত সাত বছরের মধ্যেও ও তল্লাটে বাঘের এমন উপদ্রব হয়নি। বাঘ প্রথমে এসে ধরেছিল ছেলেকে, হঠাৎ ছেলের আর্তনাদ শুনে বাপ ঘুম থেকে উঠেই দিকবিদিক জ্ঞানশূণ্য হয়ে বাঘের ওপব ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঘ মাত্র একটি থাবার আঘাতেই তার ঘাড় ভেঙে দিয়েছে। তারপর দু'জনেরই দু'টি উরুর রাং বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে সেই বাঘ।

বাপ-ছেলের লাশ নিয়ে আসা হয়েছে গোসাবায়। হাজার লোক ভেঙে পড়েছে তাদের দেখতে। কলকাতা থেকে এসেছে রিপোর্টাররা। পুলিশ ও বনের কর্তারা খুব ব্যস্ত। সেই রোমহর্ষক কাহিনি ছাপা হল সব কাগজে, তাই নিয়েই সর্বত্র আলোচনা। গত বছর বাঘের পেটে নিহত মানুষের সংখ্যা ছিল তেইশ, এ বছর সে-সংখ্যা এর মধ্যেই চব্বিশ ছাড়িয়ে গেল।

চোখের সামনে টাটকা লাশ, তাজা রোমাঞ্চকর গল্প, তারপর আর মনোরঞ্জন খাঁড়ার নিরামিষ কাহিনি কে মনে রাখতে যায়। প্রমাণের অভাবে নাজনেখালির কেস চাপা পড়ে গেল একেবারে।

দৈবক্রমে, রায়মঙ্গল নদীতে নিহত লোক দু'টিই পূর্ববঙ্গীয়। তাদের লাশের সামনে নিথর হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন ওসি গৌর হালদার। মনে মনে তিনি বলে চলেছেন, জানি, শুধু আমাদেরই বাঘে খায়। আমরাই সব জায়গায় মার খাই। কই, এখন তো কোনও পরিমল মাস্টার এল না এদের জন্য দরদ দেখাতে? জানি, জানি, সব জানি, আচ্ছা আমিও দেখে নেব!

মাঝ রাতে এক বিবাগি

এমন হয় না কোনও দিন মাধবের।

দেবীপুরের খাঁড়িতে ভাল মাছ পাওয়া যাচ্ছে শুনে সে চলে এসেছিল সে-দিকে। ক'দিন ধরে সংসারে বড় টান যাচ্ছে। শুধু গায়ের জোর আর মনের জোর দিয়ে সে আর সব দিক সামাল দিতে পারছে না।

কোথায় মাছ, সব লবডঙ্কা। সবাই মিলে জাল ফেলে ফেলে নদী একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে, সামান্য গোঁড়ি-গুগলিও আর ওঠে না। ভাল করে বর্ষা না নামলে আর মাছের কোনও আশা নেই। সেই যে কথায় বলে না, পরের সোনা না দিও কানে, কান যাবে তার হ্যাঁচকা টানে। এ হল সে-রকম। কে বলল দেবীপুরের কাঁড়িতে মাছ, অমনি সে চলে এল হেদিয়ে। এবার বোঝো ঠ্যালা! ভাটার সময় ফিরতে ফিরতে দেড় দিনের ধাক্কা।

সারা দিন জাল ফেলে ফেলে, কিছুই না পেয়ে, ক্লান্তি ও মনের দুঃখ নিয়ে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল মাধব। নৌকো বাঁধার কথাও খেয়াল হয়নি। মাঝ রাতে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ায় সে জেগে উঠল ধড়মড়িয়ে।

তার দৃষ্টিবিভ্রম হল। সে কোথায়? নদীর দু'ধারের মিশমিশে জঙ্গল, এ তো দেবীপুরের খাঁড়ি নয়! আকাশে যেন কেমন ধারা ছানা কাটা মেঘ, ফ্যাকাশে মতো ভুতুড়ে আলো, নদীর জল উঁচু-নিচু, এ কোন নদী? মাধবের মনে হল সব কিছুই অচেনা।

ছাড়া নৌকো জোয়ারের টানে ভাসতে ভাসতে কোথায় চলে এসেছে, তার ঠিক নেই। শহুরে ফিরিওয়ালো যেমন কখনও রাস্তা-গলিঘুঁজি ভুল করে না, মাধব মাঝিও সেই রকম এ-দিককার সমস্ত নদীর নাড়ি-নক্ষত্র জানে। কিন্তু সারা দিনের উপোসি পেট ও আধ-ভাঙা ঘুমে সে যেন আজ সব কিছুই ভুলে গেছে। তার মনে হল, এই নদীতে সে আগে কখনও আসেনি, দু'ধারেই সমান জঙ্গল এমন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, এত উঁচু উঁচু গাছ? সুন্দরবনের গাছ তো এত লম্বা হয় না, তবে ওই আকাশঝাড়ু গাছের জঙ্গল কোথা থেকে এল? শোনা যাচ্ছে না তো সেই পরিচিত জলতরঙ্গ পাখির ডাক?

নদী ও জঙ্গল একেবারে নিঃসাড়, কোথাও কোনও আলোর বিন্দু নেই, আর কোনও নৌকোর চিহ্ন নেই, মাধব সম্পূর্ণ একা। মাঝে মাঝে নৌকোয় উঠে দাঁড়িয়ে সে চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখে ঠাহর করবার চেষ্টা করছে। নৌকোটা আপন মনে এগিয়ে যাচ্ছে তরতরিয়ে। হাল ধরার কথাও তার মনে নেই। এ যেন ভরা কোটালের বান।

ভয় পাবার পাত্র নয় মাধব মাঝি, বরং একটা চাপা আনন্দ ছড়িয়ে পড়ছে তার শরীরে। সে যেন নতুন একটা নদীপথ আবিষ্কার করেছে, নতুন একটা দেশ, এখানে তার আগে আর কেউ আসেনি।

ও কী, মাধব মাঝি কি পাগল হয়ে গেল? হঠাৎ খ্যাপলা জাল বাঁ কনুইতে বাগিয়ে ধরে সে ছুঁড়ে দিল প্রাণপণ শক্তিতে। মাঝ-নদীতে এইভাবে কেউ জাল ফেলে? তার মতো অভিজ্ঞ লোক কি জানে না যে জালের কাঠি মাটি না ছুঁলে সেখানে জাল ফেলে কোনও লাভ নেই? জোয়ারের সময় নদীর মাঝখানে খুব কম করেও দশ-মানুষ জল হবে!

সে-সব কথা চিন্তাই করছে না মাধব, এমন কী জাল তোলার পর সে দেখছেও না মাছ উঠল কি না। একবার তুলে পরের বার সে ছুঁড়ছে আরও জোরে, আর কী যেন বলছে বিড় বিড় করে। যেন এই নদীর মাঝখানে কোথাও আছে অতুল সম্পদ। আর কেউ টের পায়নি, মাধব ঠিক তা তুলে নেবে।

মাঝে মাঝে জাল ফেলার ঝপ ঝপ শব্দ। অনৈসর্গিক আলো মেশানো অন্ধকারের মধ্যে এক খ্যাপা জেলে ছুঁতে চাইছে নদীর হৃৎপিণ্ড।

দৈত্যরাও তো ক্লান্ত হয় কখনও কখনও। মাধব মাঝিই-বা কতক্ষণ পারবে। এক সময় সে নৌকোর ওপর জাল ছড়িয়ে রেখে বসে পড়ল। তার হাঁটু কখনও এত দুর্বল হয়নি। সে আর দাঁড়াতে পারছে না। হাঁটু দু'টি হাতে জড়িয়ে ধরে সে মাথা গুঁজল। তারপর কাঁদতে শুরু করল একটু পরে।

সংসার যুদ্ধে পর্যুদস্ত কোনও বয়স্ক সেনাপতির কান্নার মতো এমন উপযুক্ত, নির্জন জায়গা আর হয় না।

সেইভাবেই সে বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর এক সময় ভোর হয়ে গেল। তখন চোখ তুলে মাধব আবার তাকাল তীরের দিকে। দিনের আলো বড় নির্মম, সব কিছু চিনিয়ে দেয়। মাধব বলল, ও হরি, এ যে দেখি রানি ধোপানির চক। আর দুটো ট্যাক ঘুরলেই সেই সাত নম্বর ব্লকের নিষিদ্ধ জঙ্গল।

একটু দূরেই আর একটি নৌকো। আপন মনে ঘুরছে। প্রথমে মনে হল, সে নৌকোতে কোনও মানুষ নেই, কেউ দাঁড় ধরেনি, কেউ হাল ধরেনি! এ কী! মাধব মাঝি স্তম্ভিত!

তারপর ভাল করে চোখ রগড়ে দেখল, নৌকোর ঠিক মাঝখানে হাঁটু গেড়ে বসে আছে এক বৃদ্ধ। মাথার চুল ধপধপে সাদা, মুখে সেই রকম দাড়ি। জানুর ওপর দু'টি হাত, চক্ষু দু'টি বোজা।

এ লোকটা কে? মাধব মাঝি তো রিফিউজি নয়। সে এসেছে পার্টিশানের আগে। বাদা অঞ্চলের কোন মাঝিকে সে না চেনে? হঠাৎ গা-টা ছম ছম করে উঠল তার।

কিছুক্ষণ লোকটিকে দেখার পর মাধব মাঝি হেঁকে জিজ্ঞেস করল, ও মিঞা সাহেব, আপনি কোনখানে যাবেন?

বৃদ্ধ চোখ মেলে শান্তভাবে মাধবের দিকে তাকালেন। তারপর বলল, আমি কোনওখানে যাব না রে ভাই! তুমি যেখানে যাবে যাও!

আপনি এখানে কী কবতাছেন? এ জায়গা তো ভাল না।

শব্দ কোরো না রে ভাই, শব্দ কোরো না। এ সময় আকাশ পরিষ্কার থাকে, মন পরিষ্কার থাকে, এ সময় আল্লাতাল্লা আমার সঙ্গে কথা কন। তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও।

মাধব মাঝি আর কথা না বলে কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল অন্য নৌকোটির দিকে। সেটি যেন নিজে নিজেই চলছে। মাধব মাঝির নৌকো স্থির, তবু ওই নৌকোটা যাচ্ছে কী কবে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে কপালে হাত ছোঁয়াল।

তার নিয়তি তাকে এখানে টেনে এনেছে? দেখা যাক তাহলে! নিয়তি ঠাকুরানির সঙ্গে একবার মুখোমুখি হতে চায় মাধব।

জোয়ার স্তিমিত হওয়ায় নৌকোটা থেমে গেছে। মাধব এবার দাঁড় ধরল। প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা সে মুখে একদানা অন্ন দেয়নি। মাটির হাঁড়িতে কয়েক মুঠো চাল আছে, কিন্তু এখন ভাত ফুটিয়ে নেবার ইচ্ছেও তার নেই। খানিকটা কাঁচা চালই মুখে দিয়ে চিবোতে লাগল। সে ওই সাত নম্বর ব্লকেই যাবে।

ডাঙার কাছে এসে সে সাবধানে অপেক্ষা করল একটুক্ষণ। হাওয়ায় গন্ধ শোঁকে। পাখির কিচির মিচির ছাড়া কোনও শব্দ নেই। যত দূর চোখ যায়, কোথাও কোনও ঝোপঝাড় পড়ে না। বাঁদরের পাল এ-দিকে আসেনি। হঠাৎ দূরে বেশ জোরালো গলায় শোনা গেল কোঁকর কোঁ, কোঁকর কোঁ কোঁ!

বন-মোরগ। বন-বিবিকে মানত করে লোকে দেশি মুরগি ছেড়ে দিয়ে যায়, সেগুলোই এক সময় বন-মুরগি হয়ে যায়।

ভাটার সময় কাদা-জলে নোঙর ফেলে মাধব নামল নৌকো থেকে। খোলের ভেতর থেকে একটা কুডুল সে বার করে নিয়েছে হাতে। শূল বাঁচিয়ে, কাদায় পা টেনে টেনে সে উঠল পাড়ে। প্রথমেই সামনের হেঁতাল-ঝোপটার ওপর মারল কুডুলের এক কোপ। কিছুই নেই সেখানে।

তারপর কুডুলটা পাশে নামিয়ে রেখে সে হাঁটু গেড়ে বসল মাটিতে। হাত জোড় করে মন্ত্র পড়তে লাগল। সে বন-আটক করবে। এক মাইলের মধ্যে কোনও দক্ষিণরায়ের বাহন থাকলে সে আর নড়াচড়া করতে পারবে না।

প্রথমে সে বিড় বিড় করে উচ্চারণ করল তার গুরুর শেখানো বীজমন্ত্র। তারপর সে চিৎকার করে বলতে লাগল বাঘ-বাঁধনের ছড়া —

এই আঁচির বন্ধন, পাঁচির বন্ধন, বন্ধন বাঘের পা —
আর শালার বাঘ চলতে পারবে না।
এই আঁচির বন্ধন, পাঁচির বন্ধন, বন্ধন বাঘের চোখ —
এইবার বেটা অন্ধ হোক।
এই হুঁকোর জল, কেঁচোর মাটি
লাগবে বাঘের দাঁত কপাটি।
ছাঁচি কুমড়ো বেড়াল পোড়া
ভাঙরে বাঘের দাঁতের গোড়া।
যদি রে বাঘ নড়িস চড়িস
খ্যাঁকশেয়ালির দিব্যি তোকে।
এনার কাঠি বেনার বোঝা
আমাব নাম মাধব ওঝা! .

মন্ত্র পড়া শেষ হলে মাধব প্রায দু'ঘণ্টা ধরে পবম নির্ভয়ে আতিপাতি কবে খুঁজে দেখতে লাগল জঙ্গল। একটা বাঘ আসুক, মাধব একবার মুখোমুখি দেখতে চায় তাকে। সামনাসামনি বাঘকে দেখলে সে বলবে, না শালা নে, পারিস তো আমার জ্বালা যন্তোন্না জুড়াইয়া দে এক্কেবারে। তোরও প্যাটে ক্ষুধা, আমারও প্যাটে ক্ষুধা, হয় তুই মরবি, নয় আমি মরুম।

সাত নম্বর ব্লকের বাঘ চলে গেছে অনেক দূরে। অথবা মাধবকে দেখে ভয়ে কাছে এল না। এ ঘোর জঙ্গলে এক জন একলা মানুষকে জঙ্গলে ঘুরতে দেখলে বাঘেরও ভয পাবার কথা। সে-জানোয়ারেরও তো প্রাণের ভয় আছে।

মাধবের আর একটা উদ্দেশ্য ছিল, মনোরঞ্জনের লাশের কোনও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া। যদিও তার অভিজ্ঞতা থেকে মনে মনে জানে, ঘটনার একুশ দিন পর লাশের চিহ্ন চোখে পড়া খুবই অস্বাভাবিক। বাঘ সবটা খায় না ঠিকই, কিন্তু জোয়ারে এই জঙ্গলের অর্ধেকটা ডুবে যায়। ভাটার সময যা পায়, নদী টেনে নিয়ে চলে যায়। বাঘ তো বেশি দূর লাশ টেনে নিয়ে যাবে না। খিদের জ্বালায় মারার পরই কাছাকাছি বসে খাবে।

অনেকখানি বন তন্ন তন্ন করে খুঁজেও মাধব বাঘ কিংবা লাশের কোনও চিহ্ন খুঁজে পেল না। তখন সে খুব মন দিয়ে একটা বড় গরাণ গাছ কাটতে লাগল। একা পুরো গাছটা কেটে, খণ্ড খণ্ড করে ডালপালা ছাড়িয়ে নিতেও তার কম সময় লাগল না। তার মন একেবারে শান্ত, বাঘ কিংবা বনরক্ষী কিংবা পুলিশের কোনও রকম আশঙ্কাই সে করছে না।

কাঠগুলো নৌকোয় তুলতে গিয়ে এক সময় সে দেখতে পেল, কাদার মধ্যে গাঁথা সাদা পাথরের মতো কী একটা জিনিস। গোটা সুন্দরবনে পাথরের কোনও অস্তিত্ব নেই। কৌতূহলী হয়ে সে জিনিসটাকে টেনে তুলতে গেল।

সেটি একটি নর-করোটি। মাংস-চামড়া চুল সমস্ত উঠে গিয়ে খুলিটা সাদা হয়ে গেছে। এই কি মনোরঞ্জন? হতেও পারে। না হতেও পারে। না হওয়াই সম্ভব, মনে হয় আরও বেশি দিনের পুরনো।

তবু মাধব ধরে নিল, এটা মনোরঞ্জনের খুলি। সে অনেকখানি স্বস্তি পেল। এবার সে গাছের একটা সরু ডাল পুঁতে দিল মাটিতে। নৌকো থেকে তার গামছাটা এনে, তার আধখানা ছিঁড়ে পতাকার মতো বেঁধে দিল সেই ডালে এবং মন্ত্র পড়ে দিল মনোরঞ্জনের নামে। সে গুণিন, অকুস্থলে সে নিহত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশে যদি একটা ধ্বজা পুঁতে দিতে না পারে, তা হলে তার ধর্মের হানি হয়! তবে কি তার গুরু শিবচন্দ্র হাজরাই এই উদ্দেশ্যে নিয়তির ছদ্মবেশ ধরে নৌকোটা টেনে এনেছেন এই সাত নম্বর ব্লকে?

কাঠগুলো নৌকোতে বোঝাই করে মাথার খুলিটাও মাধব নিয়ে নিল নিজের সঙ্গে। পুলিশের দারোগাই বলো, আর গবর্নমেন্টই বলো, কেউ এই খুলিটা দেখে বিশ্বাস করবে না যে, মনোরঞ্জন খাঁড়াকে বাঘে খেয়েছে। এই তার প্রমাণ। এর আগেও কত লোককে বাঘে খেয়েছে। তাছাড়া নদীতে ভাসতে ভাসতে কত মড়া আসে, ভাটার সময় কাদায় আটকে যায়। এ-রকম মাথার খুলি গণ্ডায় গণ্ডায় পাওয়া যেতে পারে। তবু একলা অনেক দূরের পথ ফিরতে হবে, এই খুলিটাই মাধবের সঙ্গী।

বেলা গড়িয়ে এসেছে, আকাশটা লালে লাল। পাখির ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে নদীর এ-পার থেকে ও-পারে। পৃথিবীটাকে এই সময় কী সুন্দর, শান্তিময় মনে হয়।

আশ্চর্য, এখনও এই নদীতে আর একটা নৌকোও কিংবা পেট্রোলের লঞ্চ দেখা গেল না। প্রায় দু-আড়াই দিন হয়ে গেল, মাধব কারুর সঙ্গে একটিও মন খুলে কথা বলেনি।

শুকনো লকড়ি, পাতা কিছু জড়ো করে এনেছিল মাধব, তা'ই দিয়ে তোলা উনুনে আগুন জ্বালাল। মিষ্টি জল নেই সঙ্গে, নদীর নোনা জল এত নোনা যে তা মুখে তোলা যায় না, বমি আসে। এই জল দিয়ে ভাত রাঁধলেও কেমন যেন অখাদ্য হয়। তবু কী আব করা যাবে। দু'মুঠো ভাত না খেয়ে মাধব আর পারছে না।

জোয়াব আর ভাটাব ঠিক মাঝামাঝি সময়টায় নদী যেন একেবারে থেমে থাকে। এই সময় আর নৌকো চালাবার মতো তাগদ মাধবের নেই। অত্যন্ত নোনতা আর হড়-হড়ে খানিকটা ভাত খেয়ে তার শরীরটা আরও অবসন্ন লাগছে। শুধু হালটা ধরে সে বসে রইল। অন্ধকাব নেমে এসেছে অনেকক্ষণ। নদীর দু'ধারের দৃশ্য আবার অচেনা। শেষ-বিকেলে যে অত রঙ ছিল আকাশে, সে সব কোথায় গেল? এখন শুধু ময়লা ময়লা মেঘ। তবে আজ ডান পাশেব জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে একটা জলতরঙ্গ পাখির ডাক। ট-র-র-র, ট-র-র-র! ট-র-র-র।

ঝুপসি অন্ধকারের মধ্যে, থেমে থাকা নৌকোয় অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকবার পর মাধব কথা বলতে শুরু করল।

অ মনো, মনো রে! তুই শুনতে পাস আমার কথা?

সাদা রঙের মাথার খুলিটা ঠিক মাধবের সামনে পাটাতনের ওপর বসানো. চোখ দুটোর জায়গায় দুটো কালো গর্ত। তবু যেন সে মাধবের দিকেই তাকিয়ে আছে।

অ মনো, চাইয়া দ্যাখ, আমি মাধবদা। অমন সোন্দর মুখখান আছিল তোর, কার্তিক ঠাকুরের মতো টানা টানা চক্ষু। হায় রে, সব কোথায় গেল। মরলে সব মানুষই সমান, আমি মরলে আমার মাথাডাও

এই রকমই হহয়া যাবে। আমার মাথার খুলি, তোর মাথার খুলি, মাইয়া মানুষের খুলি, সবই এক। ক্যান তুই আইলি আমাগো সাথে। ঘরে নতুন বিয়া করা বউ।

ফিন ফিন করে বাতাস বইছে। আজ আবার একটু পরেই বোধহয় বৃষ্টি আসবে।

হ্যামলেট নামের প্রসিদ্ধ নাটকটির কথা তো কিছুই জানে না মাধব। জানলে বোধহয় সে সেই অর্ধোন্মাদ রাজকুমারের অনুকরণ করত না।

সইত্য কথা ক তো, মনো তোর প্রাণডা কি পেরথম ঝটকাতেই ব্যায়রাইয়া গেছিল? কষ্ট পাস নাই তো? নাকি লড়ছিলি? অইন্তত একখান কোপও মারছিলি সে সুম্বুন্ধির ভাইডার মাথায়? তোরে আমরা অনেক বিছরাইছিলাম, বিশ্বাস কর মনো, খোঁজার আর কিছু বাকি রাখি নাই, তোরে এক্কেবারে ঝড়ে উড়াইয়া নিয়া গেল? সে সুম্বুন্ধির ভাইরে একবার সামনে পাইলে...। বিড়ি খাবি, মনো? আমি একটা খাই? আর দুই খান মাত্তর বিড়ি আছে, কত দূরের পথ।

উনুনের আঁচ এখনও নেবেনি, দেশলাই খরচ না করে সেখান থেকেই বিড়িটা ধরাল মাধব। কাল রাতে বৃষ্টি ভেজায় বিড়িটা স্যাঁতসেতে হয়ে গেছে। এই রকম স্যাঁতসেতে বিড় টানার যে কী যন্তোন্না, তা শুধু ভুক্তভুগীই বুঝবে। হে ভগবান, এইটুকু সুখও কি দেবে না।

অ মনো, কথা কস না কেন? অমন দম ফাটাইন্যা গলার আওয়াজ আছিল তোর! 'বঙ্গে বর্গী' পালায় ভাস্কর পণ্ডিত তুই বড় ভাল করছিল, জয়হিন্দ ক্লাব এবার এক্কেবারে কানা। অশ্বিনী চাইল্যা গেল, তুইও গেলি। দূর শালা।

বিরক্ত হয়ে নিবে যাওয়া বিড়িটা মাধব ছুঁড়ে ফেলে দিল জলে। তারপর সে একটি উন্মাদের মতো কাণ্ড করল।

মাথার খুলিটা হাতে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর সেই জনমানবশূন্য নদী ও জঙ্গলের মধ্যে গলা ফাটিয়ে চ্যাঁচাতে লাগল, শোনো, শুইন্যা রাখো তোমরা, আমি মাধব দাসমজুমদার, আমার বাপে আমারে খেদাইয়া দিছিল। মায়রে চোক্ষে দেখি নাই, তবুও আমি এ-জম্মে কক্ষনও চুরি করি নাই, ডাকাতি করি নাই, কাউর কোনও ক্ষতি করি নাই। নিজের বউ ছাওয়ালপানগো দুই মুঠা ভাত দেবার জইন্যে রোজ মাথার ঘাম পায়ে ফেলি। তাই তোমরা আমারে একটা বিড়ি পর্যন্ত মনের সুখে টাইনতে দেবা না? তোমরা ভাবছ কী? আমি মাধব দাসমজুমদার, আইজও মরি নাই। আমি মরব না। আমি হাজার বছর বাঁইচ্যা থাকম, আমারে মারতে পারবা না। আমারে এই রকম সাদা ফ্যাকফ্যাকে খুলি বানাইতে পারবা না। আমি লইড়া যামু। আয়, কে আসবি আয়। কে কোথায় আছোস আয়।

জোয়ার-ভাটা, ঢেউ ও ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে যুঝে মাধব মাঝি ছোট মোল্লাখালি এসে পৌঁছল তৃতীয় দিন সন্ধ্যায়। সারা শরীর জলকাদা মাখা। পেটটা যেন ঠেকে গেছে পিঠে। শুধু জ্বল জ্বল করছে দু'টি চোখ।

এ-দিকে ছোট মোল্লাখালিতে দারুণ হই চই, প্রচুর হ্যাজাক ও লণ্ঠনের আলো, তিনখানা লঞ্চ ও গোটা বিশেক নৌকো ভিড়ে আছে ঘাটে। পুলিশ ও বন-বিভাগের লঞ্চ এক নজরে দেখেই চিনেছে মাধব, একবার সে ভাবল, সরে পড়বে এখান থেকে। কিন্তু তার শরীর আর বইছে না। লোকালয় দেখার পর আর সে একলা একলা জলে ভাসতে পারবে না। যা হয় হোক।

নৌকো বেঁধে ওপরে উঠে আসবার পর সে দেখল, ব্যাপার একেবারে অন্য রকম।

নদী সাঁতরে এ-পারে চলে এসেছে এক বাঘিনি। আজু শেখের বাড়িতে এসে একটা গোরু মেরেছে। কিন্তু পালাতে পারেনি শিকার নিয়ে। অতিরিক্ত দুঃসাহসের জন্যই হোক বা খিদের জ্বালাতেই হোক, বাঘ সেখানেই গোরুটাকে খেতে শুরু করেছিল। লোকজন উঠে পড়ায় সকলের তাড়া খেয়ে সে রান্নাঘরে ঢুকে বসে আছে।

সকাল থেকে প্রায় হাজার খানেক লোক ঘিরে রেখেছে আজু শেখের বাড়ি। নরখাদক বাঘই আবার সব চেয়ে বেশি ভয় পায় মানুষকেই। সেই বাঘিনি আর কিছুতেই বেরুচ্ছে না রান্নাঘর থেকে দূর দূর গ্রাম থেকে লোকজন ছুটে এসেছে বাঘ দেখতে। কারুর প্রাণে যেন ভয়-ডর নেই। সবাই চা বাঘ বাইরে বেরিয়ে আসুক, দু'চোখ ভরে, প্রাণ ভরে দেখে নেওয়া যাক। সুন্দরবনের মানুষ প্রা কেউই কখনও জীবন্ত বাঘ দেখেনি। যে-দেখেছে, সে সচরাচর ফিরে আসে না সে-ঘটনা বলার জন্য।

খবর পেয়ে তড়িঘড়ি পুলিশ ও বনবিভাগের লোকও চলে এসেছে। বাঘটাকে রান্নাঘর থেকে কিছুতেই বার করতে পারছে না কেউ। দর্শকেরা মাঝে মধ্যে ইট-কাঠ ছুঁড়ে মারে, পটকাও ফাটানো হয়েছে দুটো, তাতে বাঘ আরও ভয় পেয়ে গেছে। এ পর্যন্ত টুঁ শব্দটি করেনি। কিন্তু সেটা যে রান্নাঘরের মধ্যে রয়েছে, তা বোঝা যায়। চ্যাঁচার বেড়ার ফাঁক দিয়ে একটু একটু দেখা যায় কালো-হলুদ ডোরাকাটার ঝিলিক।

বাঘকে মারার হুকুম নেই। গোসাবা বাঘ প্রকল্পে খবর গেছে। সেখান থেকে তাদের দ্রুতগামী স্পিড বোটে আসছে ঘুমের ওষুধের টোটা। সেই টোটা দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে বাঘকে নিয়ে যাওয়া হবে খাতির করে।

ওসি গৌর হালদার একবার এসে ঘুরে গেছেন। বনবিভাগ এবং টাইগার প্রজেক্ট যখন ভার নিয়েছে, তখন আর তাঁর করবার কিছু নেই। বাঘের বদলে যদি ডাকাত পড়ত আজু শেখের বাড়িতে, তাহলে তিনিই হতেন দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা। বাঘে গোরু মেরেছে। মানুষ তো মারেনি, সুতরাং কিছু রিপোর্টও দেবার নেই তাঁর।

ভিড়ের ফাঁক-ফোকর গলে একেবারে সামনের দিকে এসে দাঁড়িয়েছে মাধব মাঝি। অপরিচ্ছন্ন, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, জলে ভেজা শরীর, তবু উত্তেজনায় ধক ধক করছে তার বুক। এই বাঘিনিটাই কি মেরেছে মনোরঞ্জনকে? না, তা হতে পারে না, সেই সাত নম্বর ব্লক থেকে এত দূর ছোট মোল্লাখালিতে বাঘ আসবে কী করে? তবু বাঘ তো!

সাধুচরণ, নিরাপদ, বিদ্যুৎরা এসেছে কি না খুঁজবার চেষ্টা করল সে একবার। কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যে কিছু বুঝবার উপায় নেই। হঠাৎ তার মনে হল, মনোরঞ্জন যেন দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে। এক মাস আগে হলেও, এমন খবর পেলে মনোরঞ্জন ঠিক ছুটে চলে আসত দেখবার জন্য। এখনও সে আসবে না? শরীরে একটা তরঙ্গ খেলে গেল মাধবের।

ঘুমের টোটা এসে পৌঁছবার আগেই ঘটনার গতি গেল অন্য দিকে। ছোট মোল্লাখালির এক দল লোক দাবি তুলল, তারা বাঘকে নিয়ে যেতে দেবে না কিছুতেই। বাঘ এসে তাদের গাঁয়ের মানুষ মারবে, গোরু মারবে আর বাবুরা এসে সেই বাঘকে ঘুম পাড়িয়ে আদর করে নিয়ে যাবে? পুলিশ ও ফরেস্ট গার্ডদের ঘিরে ফেলে তারা বলল, হয় বাঘ মারো, নয় আমাদের মারো। বনবিভাগের নিরীহ

বড়বাবু জয়নন্দন ঘোষাল হ্যাঁ কিংবা না কোনওটাই বলতে পারলেন না, মুখ আমসি করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তখন উত্তেজিত জনতা জয়নন্দন ঘোষালকে বেঁধে ফেলল একটা খুঁটির সঙ্গে। বাঘ মারা নাহলে তাঁকে ছাড়া হবে না। পুলিশ ও ফরেস্ট গার্ডরা বুঝল যে ব্যাপার বে-গতিক, বাঘের বদলে মানুষ মারার ঝুঁকি তারা নিতে পারে না। এ-দিকে লোকজন যা খেপে উঠেছে, এরপর তাদের প্রাণ নিয়েই টানাটানি।

পুলিশ ও ফরেস্ট গার্ডদের মোট তিনটি বন্দুক, বিশেষ এক জনের ওপর যাতে দায়িত্ব না পড়ে সেই জন্য তিন জনই এক সঙ্গে বন্দুক উঁচিয়ে ধরল আজু শেখের রান্নাঘরের দিকে। কোনও রকম লড়াই দেবার চেষ্টা করল না বাঘটা, ভিতুর ডিম হয়ে নিঃশব্দে বসে আছে রান্নাঘরে।

গুডুম। গুডুম। গুডুম। আঃ কী মিষ্টি আওয়াজ।

দ্বিতীয় গুলিটা খেয়েই বাঘটা রান্নাঘরের চ্যাচার বেড়া ভেঙে এক লাফ দিয়ে পড়ল এসে উঠোনে। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে নিঃস্পন্দ।

কী সুন্দর চেহারা সেই বাঘিনিটার, কী অপূর্ব শরীরের গড়ন, যেন কোনও শিল্পীর সৃষ্টি। হাত আর পা দুটো ছড়িয়ে শুয়ে আছে লম্বা হয়ে, মুখে একটা কাতর ভাব।

লোকজন সরে গিয়েছিল অনেক দূরে। মাধবই চেঁচিয়ে উঠল, মার, মার, মার, সুম্বুন্ধির পুতকে মার।

আবার সবাই ছুটে এল সে-দিকে। হাতের কুড়ুলটা দিয়ে সেই সদ্য মৃত বাঘিনির ওপর কোপের পর কোপ মেরে যেতে লাগল মাধব। তারপর অন্যদের ধাক্কাধাক্কিতে এক সময় সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ওই ছিন্নভিন্ন ব্যাঘ্র-শরীরে।

ইচ্ছাপূরণ

বছর ঘুরে গেছে। আবার এসেছে ফাল্গুন মাস, এসেছে আকালের দিন। নদীর ধারে বাঁধের ওপর উবু হয়ে বসে থাকতে দেখা যায় জোয়ান-মদ্দ মানুষদের। হাতে কোনও কাজ নেই, ঘরে খোরাকির ধান ফুরিয়ে আসছে। আবার জঙ্গলে কাঠ কাটতে যাবার জন্য উসখুস করছে ছোকরাদের মন।

নিশ্চয়ই জঙ্গল থেকে চোরাই কাঠ নিয়ে নিরাপদে ফিরেও আসছে অনেকে। নইলে আর মহাদেব মিস্তিরির ব্যবসা চলছে কী করে? এই সময়টাতেই তার কারবার ফেঁপে ওঠে, তার বাড়ির সামনে জমে ওঠে কাঠের পাহাড়। দিনমজুরি হিসেবে মাধব মাঝিকে কাঠ ওজন করার একটা চাকরি দিয়েছে মহাদেব, মাছ ধরা ছেড়ে সে এখন ওই কাজ করে। প্রায়ই মাধব ভাবে, বউ-বাচ্চাদের নিয়ে এই বাদা অঞ্চল ছেড়ে সে অন্য কোথাও চলে যাবে। কোথায় যে যাবে, সেটাই জানে না।

দু-দশ জন ঘনিষ্ঠ লোক ছাড়া মনোরঞ্জনের কথা আর কেউ মনে রাখেনি। মৃত মানুষকে নিয়ে বেশি দিন হা-হুতাশ করা এ-দিককার নিয়ম নয়। যে গেছে সে তো গেছেই, যারা আছে, তারাই নিজেদের ঠ্যালা সামলাতে অস্থির।

শূন্য হাটখোলায় বসে দুপুরের দিকে তাস পেটায় সাধুচরণ, নিরাপদ, বিদ্যুৎ আর সুভাষরা। আবার কোনও একটা যাত্রাপালার মহড়া শুরু করার কথা মাঝে মাঝে ভাবে। 'মাটি আমার মা' নামে একটা

আধুনিক পালা ওদের খুব মনে ধরেছে, কিন্তু তার নায়কের মুখে গান আছে। তখন মনে পড়ে মনোরঞ্জনের কথা। বেশ ভাল গানের গলা ছিল মনোরঞ্জনের, ওর জায়গা আর কেউ নিতে পারবে না।

তাস খেলতে খেলতে সাধুচরণ মাঝে মাঝে অন্য রকম কড়া চোখে তাকায় মোটা সুভাষের দিকে। এ দৃষ্টির মানে আছে। সুভাষ চোখ নামিয়ে নেয়।

পরিমল মাস্টার কথা রেখেছিল, সাধুচরণকে তাঁর ইস্কুলে একটা কাজ দিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু সাধুচরণ সে-চাকরি রাখতে পারেনি। অতবড় একটা জোয়ান শরীর নিয়ে সে ইস্কুলের দফতরির ভূমিকায় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারল না। মাঠের জল-কাদা ভেঙে হাল চষা, চড়চড়ে রোদে নৌকো নিয়ে মাছ ধরা কিংবা আট টাকা রোজে সারা দিন কারুর বাড়িতে মাটি কাটায় সে অভ্যস্ত, দেহের ঘাম না ঝরলে কাজকে সে কাজ বলেই মনে করে না। তাছাড়া, রোজ সাত মাইল ভেঙে সে জয়মণিপুরে চাকরি করতে যাবে, তাহলে তার নিজের চার বিঘে জমি কে চাষ করবে? গোটা সংসার তুলে নিয়ে গিয়ে জয়মণিপুরে থাকাও তার পক্ষে সম্ভব নয়, মাইনের এ ক'টা টাকায় সে তাদের কী খাওয়াবে?

মাথা গরম সাধুচরণের, ইস্কুলের এক মাস্টারের ওপর রেগে এক দিন মারতে উঠেছিল। শহর থেকে আসা মাস্টারবাবুটি তুই তুই বলে ডাকতেন। প্রথম দিন থেকেই তাকে অপছন্দ করেছিল সাধুচরণ। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোক বলে, এ-দিককার চাষিরাও মাঠে পরস্পরকে আপনি বলে। মাস্টারবাবুটির ঘাড় চেপে ধরেছিল এক দিন, সেই অপরাধেই সাধুচরণের চাকরি গেল।

চাকরিটি হারিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য সাধুচরণের তেমন ক্ষতি হয়নি, বরং লাভই হয়েছিল। তখনই বাগদা-পোনার হুজুক উঠল। বছরের বিশেষ একটা সময়ে এই সব নদীর দু'ধার দিয়ে বাগদা চিংড়ির বাচ্চারা ভেসে যায়। প্রায় স্বচ্ছ, সরু আলপিনের মতো তাদের চেহারা, খালি চোখে প্রায় বোঝাই যায় না। হাজার হাজার বছর ধরেই তারা নিশ্চয়ই ভেসে যাচ্ছে, এত দিন কেউ লক্ষ্য করেনি। এখন বাগদা চিংড়ির দাম প্রায় সোনার মতো, সাহেবরা খায়, তাই ভেড়ির মালিকরা ওই বাগদা-পোনার অস্তিত্ব আবিষ্কার করে লাগিয়ে দিল গ্রামের লোকদের। ছেলে-মেয়ে-বুড়ো-মদ্দা কেউ আর বাকি রইল না, সবাই নেমে পড়ল নাইলনের জাল নিয়ে। সেই সময়টায় সাধুচরণ এবং তার বন্ধুরা দিনে প্রায় পঁচিশ-তিরিশ টাকা পর্যন্ত রোজগার করেছে। সেই কয়েকটা দিন বড় সুদিন গেছে।

সন্ধেবেলা মাঠে গিয়েছিল বাসনা, তারপর মহাদেব মিস্তিরির পুকুর থেকে গা হাত-পা ধুয়ে ফেরবার সময় হঠাৎ ভয় পেয়ে বলল, কে? কে?

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল কেউ নেই। অথচ সে স্পষ্ট পায়ের শব্দ শুনেছিল।

অন্ধকার হয়ে গেছে, এখানে খানিকটা বাগান মতো পেরিয়ে তারপর ওদের বাড়ি। ভয় পায়নি বাসনা। বন-বিড়ালির মতো শরীরে রোঁয়া ফুলিয়ে একটু বেঁকে দাঁড়িয়ে রইল। একটু ক্ষণের মধ্যেও কেউ এল না দেখে সে বলল, মরণ! কোন মুখপোড়া, একবার আয় না দেখি সামনে।

ভিজে কাপড়ে সপ সপ করে বাসনা ফিরে এল বাড়িতে। শরীরে গোলগাল ভাবটি খসে গিয়ে এখন তার বেশ ফুরফুরে চেহারা।

শোওয়ার ঘরের দাওয়া থেকে ডলি বলল, ওই এলেন নবাবের বেটি! বলি, ও-বেলা যে ঝিঙেগুলো কুটে রাখা হয়েছিল সেগুলো সাঁতলে না রাখলে পচে যাবে না? টাকা-পয়সা কি খোলামকুচি, না গাছে ফলে?

শাড়ি নিংড়োতে নিংড়োতে বাসনাও সমান ঝাঁঝের সঙ্গে উত্তর দিল, সেগুলো একটু আগেই রেঁধে রাখা হয়েছে। চোখ থাকলেই কেউ রান্নাঘরে গিয়ে দেখতে পারে।

বুঁচির বাপ কখন থেকে এসে বসে আছে। তাকে দুটো খেতে দেবে কোথায়, না পুকুরে গেছে তো গেছেই।

আর সবাই বুঝি ঠুঁটো জগন্নাথ? দুটো ভাত বেড়ে দিতেও পারে না?

এ-রকম চলে কথার পিঠে কথা। বাসনা তার শাশুড়ির সঙ্গে সমান তালে টক্কর দিয়ে যায়। আত্মরক্ষার সহজাত নিয়মেই সে বুঝেছে যে মুখ বুজে সইলে আর হবে না, তাকে লড়ে যেতে হবে সর্বক্ষণ।

বাসনার আর কোনও দিনই বাপের বাড়ি ফিরে যাবার আশা নেই। তার সইয়ের দাম কানাকড়ি হয়ে গেছে। পরিমল মাস্টার অনেক চেষ্টা করেও গ্রুপ ইনসিওরেন্স কিংবা সরকারের প্রতিশ্রুত টাকা আদায় করে দিতে পারেনি। সবাই জেনে গেছে যে তিন নম্বর নয়, সাত নম্বর ব্লকেই কাঠ কাটতে গিয়েছিল ওরা। সাধ করে বাঘের খপ্পরে গেছে, একটা বে-আইনি কাজ করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে মনোরঞ্জন, সে-জন্য কে ক্ষতিপূরণ দেবে?

বাসনার মা সুপ্রভা হঠাৎ মারা গেছে মাত্র দু'দিনের অসুখে। তারপর তিন মাস যেতে না-যেতেই শ্রীনাথ সাধু এক মাঝবয়সি বিধবাকে রক্ষিতা করে এনেছে বাড়িতে। বউ মারা যাবার পর এক জন রক্ষিতা না রাখলে তার মতো মানী লোকের মান থাকে না। কিন্তু তার ছেলে বদ্যিনাথ এটা মোটেই পছন্দ করেনি। সেই জন্য বাপ-ব্যাটাতে এখন লাঠালাঠি চলে। নিতাইচাঁদ বাংলাদেশের চোরাচালানিদের সঙ্গে যোগসাজসে বেশ ভালই রোজগারপাতি করছিল, হঠাৎ এ-দিন বিপক্ষ দলের হাতে বেধড়ক ধোলাই খেয়ে ঠ্যাঙ ভেঙে কাবু হয়ে পড়ে আছে বাড়িতে। ফটিক বাঙালও নদীতে তলিয়ে যায়নি, বরং পদোন্নতি হয়েছে তার। এখন তার দৌড় ক্যানিং পর্যন্ত। সেখানকার এক মাছের আড়তদারের মেয়ের সঙ্গে তার গভীর আশনাই চলছে। বাসনাকে মামুদপুরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আর কার মাথাব্যথা থাকবে?

সময়ের নিয়মে সময় চলে যায়, কেউ কারুর জন্য বসে থাকে না। শুধু বাসনা মাঝে মাঝে ঘুম থেকে উঠে গভীর রাত্রে খাটের উপর জেগে বসে থাকে। এখনও তার আশা, বুঝি হঠাৎ ফিরে আসবে মনোরঞ্জন।

বাসনার দিকে প্রথম নজর দিয়েছিল মহাদেব মিস্তিরির ছোট ভাই ভজনলাল। সে থাকে নামখানায়। মাঝে মধ্যে এ-দিকে আসে। দুর্গাপুজোর সময় ডামাডোলের মধ্যে বাসনার হাত ধরে টেনে অন্ধকারের মধ্যে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। চেঁচিয়ে উঠতেই ভোঁ দৌড়। এর দু'দিন পরে, দুর্গাপুজোর ভাসানের সময় কে বা কারা যেন একা পেয়ে খুব ঠেঙিয়েছিল ভজনলালকে। আততায়ীদের মুখ সে দেখতে পায়নি। চিনতেও পারেনি। হাটখোলার সবাই বলল, তা হলে নির্ঘাত ভূতে মেরেছে। এই কথা বলে, আর সাধুচরণের দল হেসে গড়াগড়ি যায়।

দ্বিতীয় জন মোটা সুভাষ। ছুঁক ছুঁক করে এ-বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, নানা ছুতোয় বিষ্টুচরণের সঙ্গে দেখা করতে আসে। বাসনা তার সঙ্গে হেসে কথা বলে, মোটা সুভাষের মনে হয়, তাকে বুঝি বাসনার খুব পছন্দ। কিন্তু বেশি দূর সে এগোতে সাহস পায় না, সাধুচরণ প্রায়ই তার দিকে অমন রাগি

চোখে তাকায় কেন? সাধুচরণ ঠিক ধরে ফেলেছে তার মতলব। এর মধ্যে এক দিন বাসনা হঠাৎ মোটা সুভাষকে বলল, আপনি কবিতাকে বিয়ে করেন না কেন? আপনার সঙ্গে ভাল মানাবে। তা শুনে একবারে মাটিতে বসে পড়ল মোটা সুভাষ। যাচ্চলে! এই ছিল মেয়েটার মনে?

সাধুচরণ বাসনার পরিত্রাতা, কিন্তু ইদানীং তারও মনটা ইতি-উতি করে। সেই যে নদীতে মামুদপুরের লোকদের নৌকোটা উলটে যাধার সময় সে বাসনার হাত ধরে টেনে এক হ্যাঁচকা টানে নিজের কোলের ওপর ফেলেছিল, সেই থেকে তার বুকটা খালি খালি লাগে। বার বার সে সেই দৃশ্যটা কল্পনায় ফিরিয়ে আনে, একলা থাকলেই সে শূন্যে হাত দিয়ে সেই রকম হ্যাঁচকা টান দেয়।

কোনও না-কোনও পুরুষমানুষ তো বাসনাকে খাবেই, সাধুচরণ ভাবে, সে খেলে দোষ কী? মনোরঞ্জন ছিল তার বড় আপনজন, সেই মনোরঞ্জনের অবর্তমানে তার জিনিস যদি সাধুচরণ ভোগ করে, তাতে কি খুব অন্যায় হয়? কিন্তু বাসনা তাকে সমীহ করে, তার দিকে ভাল করে মুখ তুলে তাকায় না। এটা বাড়াবাড়ি না? সাধুচরণ আবার সুভাষ-টুভাসদের মতো মিঠে-মিঠে কথাও বলতে পারে না।

আরও যে-ক'জন বাসনার শরীরটাকে খাবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় আছে, তাদের মধ্যে প্রধান হল তার শ্বশুর বিষ্ণুচরণ। এটাও এখানকার একটা প্রথা। যে ভাত দেবার মালিক, তার একটা ন্যায্য অধিকার আছে। একটু নিরিবিলিতে পেলেই বিষ্টুচরণ তার পুতের বউয়ের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে। বাঁ-হাতখানা প্রথমে রাখে বাসনার পিঠে। তারপর আঙুলগুলো লকলকিয়ে এগোতে শুরু করলেই বাসনা ছাঁটা মেরে সরে যায়। ষাট বছর বয়েস পেরিয়ে গেছে বিষ্টুচরণের, গত বর্ষায় আছাড় খেয়ে তার একটা পা সেই যে ভাঙল, আর সারেনি। এখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে, চোখে ছানি, তবু এখনও তার লালচ মরেনি। ডলি তো ভালভাবে জানে বলেই সর্বক্ষণ বিষ্টুচরণকে চোখে চোখে রাখে।

যে-সময় কাজ থাকে না, ঘরে ধান থাকে না, পেটে সর্বক্ষণ খিদে খিদে ভাব, সেই সময়টাতেই যে কেন মানুষের যৌন খিদে বাড়ে, তা বলে যাননি ফ্রয়েড সাহেব। নাকি বলে গিয়েছিলেন? সে-সব কিছু না জেনেও সাধুচরণ ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ভেতরে ভেতরে গজরায় বাসনার দিকে চেয়ে।

মোটমাট চার-পাঁচটা বাঘ ওৎ পেতে আছে বাসনার দিকে। যে-কোনও দিন লাফিয়ে পড়বে, খাবে। জঙ্গলঘেঁষা দেশে এটাই নিয়ম।

বাসনা অবশ্য এ পর্যন্ত কারুকে ধরা-ছোঁয়া দেয়নি। একমাত্র সে-ই প্রত্যেক দিন এখনও মনোরঞ্জনের কথা মনে করে অন্তত একবার। প্রায়ই মুচড়ে মুচড়ে কাঁদে। শুধু স্বার্থও নয়, আরও কিছু একটার সম্পর্ক ছিল মনোরঞ্জনের সঙ্গে। তার মাত্র আট মাসের বন্ধন, তারপর এক বছর কেটে গেছে, তবু সেই বন্ধন আরও তীব্র মনে হয়।

কিন্তু এই অবস্থায় আর কত দিন চলবে তার? মাত্র একুশ বছরের ডবকা চেহারার মেয়ে বিধবা হলে তারপর বাকি জীবনটা সে নিখুঁতি সন্দেশটি হয়ে থাকবে? কেউ তাকে খাবে না? এ-কথা বললে এই জল-জঙ্গল বাদা এলাকার একটা গোরুও বিশ্বাস করবে না। বাসনা নিজেও এ-কথা জানে, সে-ও তো কম দেখেনি।

এক-এক দিন মাঝ রাতে বাসনা নিদ্রাহীন চোখে আর খাটে শুয়ে থাকতে পারে না, বাইরে এসে দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে সামনের অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকে। ওই অন্ধকারের মধ্যে সে তার ভবিষ্যৎটা খোঁজে। মা নেই, তার বাপ আর ত'কে কোনও দিন কাছে ডেকে নেবে না। শ্বশুরের আর অথর্ব হতে বেশি দিন বাকি নেই। ননদের বিয়ে দিতে হবে, তাতে কিছুটা জমি চলে যাবে। আধপেটা খেয়ে, মান খুইয়ে, শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে কাটাতে হবে সারা জীবন। আর নয়তো...।

শুধু এক জন নেই। অথচ দুনিয়াটা যেমন চলছিল, তেমনই চলছে। মনোরঞ্জন থাকলে সে তার শক্ত কাঁধ দিয়ে এই সংসারটাকে তুলে ধরতে পারত। সে নেই, সে আর আসবে না।

হাওয়া নেই, রাতচরা পাখির ডাক নেই, মাঝে মাঝে কিট কিট কিট কিট শব্দ করছে ঘাসফড়িং, টুপ টাপ করে খসে পড়ছে গাছের পাতা, কোঁয়াক কোঁয়াক করে ডাকছে ব্যাঙ, তাদের ধরবার জন্য সর সর শব্দে এগোচ্ছে সাপ, সামনের খালটা থেকে উঠে আসছে পাট-পচানো জলের গন্ধ, চাঁদ ডুবে গেল মেঘের তলায়। চমৎকার, ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার, বলে কোনও এক বুড়ি হুতোম প্যাঁচা গাছের ডাল থেকে উড়াল দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাটিতে, চিক চিক চিক চিক শব্দে পালাতে লাগল ইঁদুর-ছুঁচোরা, দূরে একটা কুকুর অকারণে ঘেউ ঘেউ করে উঠল কয়েকবার।

জীবন চলছে নিজের নিয়মে। নদী বয়ে চলেছে এক মনে, আকাশে ঘুরছে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ, দেশ-বিদেশ থেকে উড়ে আসছে হাওয়া, একটা জোনাকি উড়ে যায় গোয়ালঘর থেকে রান্নাঘরের দিকে, ঠিক যেমন ভাবে গিয়েছিল গত বছর এই সময়, তার আগের বছর, তার আগের বছর ..।

মাঝ রাতের অন্ধকারে বাসনাকে একলা একলা বসিয়ে রেখেই কাহিনিকারকে বিদায় নিতে হবে। এই মেয়েটির জীবনে সুখ-শান্তি ফিরিয়ে দেবার মতো কলমের জোর তার নেই। ইচ্ছে মতো শেষ পরিচ্ছেদে সোনালি সূর্য এঁকে দেবার উপায়ও তার নেই। বাস্তবতার দোহাইতে সে লেখকের হাত বাঁধা।

আগামী কালের কোনও পাঁচালি-লেখক কিংবা পালাকার যদি মনোরঞ্জন খাঁড়ার জীবন উপাখ্যান রচনা করে, তবে সে হয়তো এইভাবে শেষ করবে —

বাসনা নামেতে মেয়ে বিধবা অকালে
একা একা কান্দে বসি হাত দিয়া গালে
স্বামী নাই সুখ নাই সম্মুখে আন্ধার
কোন খানে যাবে কন্যা সব ছারখার
জোয়ারের নদী যেন নারীর যৌবন
অসময়ে ভাটি কেবা দেখছ কখন?
মন দিয়া শুন সবে পরে কী ঘটিল
নারিকেল গাছে আসি কে তবে বসিল?
গাছে কেহ বসে নাই, প্যাঁচা দেখি এক
প্যাঁচার উপরে কেবা দেখহ বারেক।।
প্যাঁচার উপরে বসি হাসিছেন যিনি
তিনি জগন্মাতা লক্ষ্মী নারায়ণী

বাসনারে দেখি তাঁর দয়া উপজিল
মানবীর লাগি দেবী অশ্রু নিষ্কাষিল
বাহনেরে কন দেবী চল মোর বাছা
প্যাঁচাও সেই ক্ষণে ছাড়ে নারিকেল গাছা
এ-বন ও-বন ছাড়ি যান অন্য বনে
কাহারে খুঁজেন দেবী ব্যাকুলিত মনে ?
এক বন আলো করি আছেন বনদেবী
সিংহ ব্যাঘ্র থাকে তথা তাঁর পদসেবী
সেই বনে আসিলেন লক্ষ্মী নারায়ণী
বনদেবী তাঁকে কন এসো গো ভগিনী
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া কেন এলে এই বনে
কহ সব ত্বরা করি অতীব যতনে।
জগন্মাতা কন তারে, শুন মন দিয়া
এক গ্রাম আছে হোথা নাজনেখালিয়া
সেথা এক বালা কান্দে আছাড়ি পিছাড়ি
নদী কান্দে বন কান্দে আমি ছার নারী
তার পতি হরি নিলে তুমি কোন দোষে ?
সবিস্তারে তাহা তুমি বুঝাও বিশেষে।
হাসি কন বনদেবী, সে মনোরঞ্জন
বাসনার পতি সে যে জীবনের ধন
পরীক্ষার লাগি তারে রেখেছি লুকায়ে
যথাকালে দিব তারে স্বস্থানে ফিরায়ে
বছর পুরালে মেয়ে থাকে যদি সতী
অবশ্যই পাইবে সে গুণবান পতি
খাঁটি সতী হয় যদি তার কোন ভয়
সময়ে জীনে স্বামী আসিবে নিশ্চয়।
এই দ্যাখো হাড় মাস, এই দ্যাখো খুলি
এই দ্যাখো মাখিলাম মন্ত্রমাখা ধূলি...
তারপর কী কহিব আশ্চর্য ব্যাপার
চক্ষের নিমেষে হল জীবন উদ্ধার
মাটি থেকে লাফ দেয় সে মনোরঞ্জন
হাতে ঢাল-তরোয়াল বাজিছে ঝন ঝন
লাফ দিয়ে তিন বন চার নদী তীর
পার হয়ে এল চলি সেই মহাবীর

সর্ব অঙ্গ দিয়ে তার বাহিরায় জ্যোতি
বাসনার কাছে আসে তার প্রাণপতি
গলায় হিরার হার সর্ব অঙ্গে সোনা
সতীত্বের গুণে হল এমনই বাসনা
বাতাসে ফুৎকার দিল দুই জনা মিলে
নতুন অরূপ রাজ্য ফুটিল নিখিলে
তারপর কী কহিব, জয় জয় জয়।
জয় জয় বলো, জয় জয় বলো...

(এই উপন্যাসের সমস্ত ঘটনা ও চরিত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কোথাও কেউ কোনও মিল দেখতে পেলে তা সম্পূর্ণ আকস্মিক হলে গণ্য করতে হবে। — লেখক)

যুবক-যুবতীরা

অবিনাশ

আমি লম্বা ভাঙা আরাম কেদারায় এবং পরীক্ষিৎ খাটে শুয়ে ছিল। পাশের ঘরে অনিমেষের স্ত্রী। এক-এক সময় শীতের শুকনো হাওয়ায় জামাকাপড়ের নিচে আমার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছিল। দূরের বাঁধ থেকে মাটিকাটা কামিনদের অল্প ভেসে-আসা গোলমাল, এ ছাড়া কোনও শব্দ ছিল না। শুধু শীতের দুপুরে যখন ধপধপে ফর্সা নির্জন রোদ, তখন যেহেতু কাকের ডাক ছাড়া মানায় না, বড় বড় মিশমিশে দাঁড়কাকগুলো যা মফঃস্বলেই সাধারণত দেখা যায়, তাদের ডাকাডাকি মাঝে মাঝে আমাকে একাগ্র করেছিল। এবং টিনের চালে তাদের কুৎসিত পায়ের শব্দে আমি কখনও কখনও অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলাম।

মনে পড়ে সেই দুপুরবেলায় বসে থাকা। খাটে ঘুমন্ত পরীক্ষিৎ, পাশের ঘরে অনিমেষের স্ত্রী গায়ত্রী, এবং আমার চুপচাপ বসে থাকা। সেই দৃশ্যটার কথা ভাবলেই কেমন যেন ঝন ঝন করা শব্দ শুনতে পাই, জামার মধ্যে হঠাৎ কোনও পোকা ঢুকে যাওয়ার মতো অস্বস্তি বোধ করি। আমি জীবনে কোনও পাপ করিনি। আমার শাস্তি পাবার ভয় নেই। মাথার ওপর সব সময় দণ্ডাজ্ঞার ছায়া রয়েছে এমন মনে হয় না। তবু সে-দিনের সেই দুপুরের কথা মনে পড়লে কেমন যেন ভয় করে। জীবনে কারুর ক্ষতি করিনি সজ্ঞানে, চোখ মেলে পৃথিবীকে যে-রকম দেখা যায়, আমার কাছে পৃথিবী ঠিক সেই রকমই, আর কিছু না, না স্বপ্ন, না আয়না। আমি কোনও রকম বাসনাকে বন্দি করতে চাইনি কখনও, মৃত্যুর চেয়ে জঘন্য মানুষের অতৃপ্ত বাসনা, ভেবেছি। জব্বলপুরে আমি কী করেছিলাম, সে কি পাপ? গত বছর শেষ শীতে, সেই জব্বলপুরের দুপুরে?

পরীক্ষিৎ ঘুমিয়ে পড়েছিল অনেকক্ষণ আগেই। অদ্ভুত ঘুম ওর, যেন জন্মের সময়েই প্রতিজ্ঞা করে এসেছে, জীবনের এক-তৃতীয়াংশ ও ঘুমিয়ে কাটিয়ে যাবে। ও যখন জেগে থাকে, তখন ভয়ানক ভাবে জেগে থাকে, যখন ঘুমোয়, প্রবল ভাবে ঘুমোয়। দুপুরে খেয়ে ওঠার পর হঠাৎ আমার মনে পড়েছিল যে সিগারেট নেই। ডুবে গেছি মাইরি, সম্পূর্ণ ভাবে ডুবে গেছি।

পরীক্ষিৎ চেঁচিয়ে উঠেছিল, ভাত খাবার পর এই টক মুখ নিয়ে কী করব? গায়ত্রী বলেছিল, মশলা খান না, আমার কাছে ভাজা মশলা আছে। মশলা আর সিগারেট এক হল? পরীক্ষিৎ ধমকে উঠেছিল, তারপর সেই বিখ্যাত জার্মান উপন্যাসের নায়কের মতো বলেছিল, 'সিগারেট নেই তো ভাত খেলাম কেন? ভাত খাবার প্রধান কারণই তো এই — তারপর — সিগারেট টানতে বেশি ভাল লাগবে। ঘুরঘুরে ইঁদুরের মতো ও তখন বাড়ির সমস্ত কোণ খুঁজে দেখল — যাবতীয় প্যান্টের পকেট থেকে তরকারির ঝুড়ি পর্যন্ত। সিগারেটের দোকান প্রায় মাইল খানেক দূরে, চাকর চলে গেছে তার বাড়িতে, দরকার হলে পরীক্ষিৎ নিজেই ভরা পেটে এক মাইল ছুটত, কিন্তু হঠাৎ বাথরুমে পৌনে এক প্যাকেট পেয়ে গেল এবং পরম উল্লাসে আমাকে একটি এবং নিজে ধরিয়ে শুয়ে পড়ল।

কিন্তু যে-সিগারেটের জন্য ওর এত ব্যস্ততা, সেটা শেষ হবার আগেই এমন ভাবে ও ঘুমোল যে, যাতে ওর আঙুল কিংবা বিছানা পুড়ে না যায়, তাই আমি ওর ঘুমন্ত হাত থেকে সিগারেটটা ছাড়িয়ে নিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছিলাম। 'ঘুমন্ত হাত' কথাটা ঠিক ব্যবহার করেছি। ও যখন ঘুমোয় তখন ওর সমস্ত শরীর ঘুমোয়। ওর শরীরের প্রত্যেকটি অংশে আলাদা ঘুম আছে। যখন যেমন শোয়, ঠিক সেই রকমই শুয়ে থাকে আগাগোড়া, একটুও নড়ে না। কখনও ঘুমের মধ্যে ওকে জোর করে ডাকলে ও চোখ মেলে তাকায়, শরীরে সামান্যতম স্পন্দনও দেখা যায় না। আস্তে আস্তে ওর মুখ, ঘাড়, গলা, হাতের ঘুম ভাঙে। বিখ্যাত ঘুম পরীক্ষিতের। গায়ত্রী তখনও জেগে ছিল পাশের ঘরে, মাঝে মাঝে ওর শরীরের, কাপড়জামার এবং হার-চুড়ির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। একবার তবু ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, গায়ত্রী, ঘুমিয়েছ?

না, সেলাই করছি। আপনি কী করছেন?

কিছু না, কী করব তাই ভাবছি।

চা খাবেন?

না, একটু পরে, এখন এক গ্লাস জল খাব।

শব্দ করে খাট থেকে নেমে অল্পক্ষণ ও কী জন্য যেন দেরি করল। তারপর জল নিয়ে এল ঝকঝকে কাঁসার গেলাসে। গেলাসটা বোধহয় ওদের নতুন বিয়েতে পাওয়া, নয়তো এত ঝকঝকে গেলাস কারুর বাড়িতে দেখিনি। এই গেলাস এবং তার মধ্যেকার জলের শীতলতা যেন আমি বুক দিয়ে অনুভব করলাম। তখনই সেই জল থেকে আমার ভয় করল। বললাম, টেবিলের ওপর রাখো।

নিচু হয়ে যখন ইজিচেয়ারের হাতলে গেলাসটা রাখল, আমি ওর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ব্লাউজের নিচটা শাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে, শোবার সময় সব মেয়েই এ-রকম বের করে দেয়, নিচের বোতাম খোলা, ওর পেটের কাছে একটা ফর্সা ত্রিকোণ আমার চোখে পড়ল। এবং যে-হাত দিয়ে ও গেলাসটা রাখল, সেই হাতের নিচে ভিজে দাগ। শীতকালেও অনেক মেয়ের বগল ঘামে ভিজে থাকে এবং সাধারণত তারা কী-রকমের মেয়ে, আমি জানি।

আপনি ঘুমোবেন না? গায়ত্রী জিজ্ঞেস করে।

না, দুপুরে আমার ঘুম আসে না।

আমারও। ইয়ে কী রকম ঘুমোচ্ছে। খানিকটা হাসল, তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, রুমালে একটা ফুল তুলছি, যাই। যাবার সময় আমি ওর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকব জেনেও ও বেশ সপ্রতিভ ভাবে চলে গেল।

না, আমার কিছুই ভাল লাগছিল না, আমি দুপুরবেলা ঘুমোতে চাই না, কখনও ঘুমোইনি। অথচ এখন কী করব? বই পড়তে গেলে বমি আসে। গায়ত্রীকে আবার ডাকব কিংবা ওর ঘরে গিয়ে গল্প করব? কেন জানি না, আমার সমস্ত শরীরে যেন শিকল নাড়াচাড়ার মতো ঝন ঝন করে শব্দ হচ্ছিল। আমি উঠে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়ালাম। এ-দিকে আর বাড়ি নেই, অনেক দূর পর্যন্ত মাঠ ঢালু হয়ে নেমে গেছে, মাঝে মাঝে সবুজ নীল খেত, বেশ দূরে একটা নৈবেদ্য'র মতো পাহাড়। এ-সব কিছুই বেশিক্ষণ তাকিয়ে দেখবার নয়, মাঠের ডান দিকের কোণে একটা অতিকায় শিশুগাছ, ওখানে শ্মশান। অনিমেষের অফিস এখান থেকে দেখা যায় না, ও অবশ্য আজ গেছে তেঘড়িয়ায়, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এসেছে, সেখানে হাজিরা দিতে। মফঃস্বলের সরকারি চাকরি এই জন্যই জঘন্য। ছুটিতে থাকলেও নিষ্কৃতি নেই, ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা মন্ত্রী এলেই ছুটতে হবে। সকালে বেশ তাস জমে উঠেছিল, এমন সময় আর্দালি এসে ম্যাজিস্ট্রেটের শুভাগমনের কথা জানাতেই অনিমেষের মুখ শুকিয়ে গেল। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজিরা দেবার জন্য ওকে ছুটির দিনেও দাড়ি কামাতে ও জুতো পালিশ করতে হল।

আমি চুপ করে বসে ছিলাম। পৃথিবীতে কোথাও কোনও শব্দ নেই। মাটিকাটা কামিনরা এখন বোধহয় বিশ্রাম নিচ্ছে। খবরের কাগজটা আমার হাত থেকে খসে যেতেই আমি তাতে একটা লাথি মারলাম। আমার চোখ খর খর করছে, আমার কিছুই করার নেই।

কাল সন্ধেবেলা আমরা যখন বাইরে টেবিল পেতে বসে চা খাচ্ছিলাম, সে-সময় দু'জন ভদ্রলোক অনিমেষকে ডাকতে এসেছিল। ওদের দেখে যেন হঠাৎ বিব্রত হয়ে পড়ল অনিমেষ, তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে গিয়ে বলেছিল, আপনারাই যান, আমার অসুবিধে আছে, আমরা আর যাব না।

একটুক্ষণ কথাবার্তায় বোঝা গেল, আজ ওদের নেমন্তন্ন ছিল, কোনও কলিগের ছেলের অন্নপ্রাশন, আমরা এসেছি বলে অনিমেষ বিব্রত বোধ করছে। অথচ খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু বুঝতে পারলাম। আমার মধ্যে একটা কৃত্রিমতা আছে, লোকের সঙ্গে ফর্মালি পরিচিত না হলে বা কোনও কিছু জিজ্ঞাসিত না হলে কোনও কথা বলতে পারি না। পরীক্ষিৎ ও-সব মানে না, চেঁচিয়ে উঠল, যা না, ঘুরে আয়, আমরা ততক্ষণ খানিকটা বেড়িয়ে আসি। একটু ওষুধ খেতে হবে, মাথা ধরে যাচ্ছে।

যাঃ, তোরা একা একা থাকবি!

একাই একশো, পরীক্ষিৎ বলে, ওষুধ কোথায় পাওয়া যায় রে? একটু চোখ নিচু করে ইঙ্গিত করল।

স্টেশনের কাছে, এগিয়ে এসে বলল অনিমেষ, এ-দিকে পাওয়া যায়, দিশি। কথাবার্তার মধ্যে গায়ত্রী উঠে ঘরে চলে গিয়েছিল। অনিমেষও ভেতরে গেল। একটু বাদে গায়ত্রীর তীক্ষ্ণ, অশোভন গলা শুনতে পেলাম, না, আমি যাব না, তুমি একা যাও। লোক দু'টি আমাদের সামনে বসে ছিল। আলাপ করার চেষ্টায় মফঃস্বলেব লোকদের একমাত্র প্রশ্ন, দাদারা কোথা থেকে, ব্যগ্রভাবে নিক্ষেপ করেছিল।

ফরাক্কাবাদ! বলে পরীক্ষিৎ এমন ভাবে মুখ ঘুরিয়ে বসল যে, আর ওরা উৎসাহ পায়নি। গায়ত্রীর গলা শুনে ওরা হা-হা করে খানিকটা হেসে উঠল, বউদি ক্ষেপেছে মাইরি, চল দেখি। ওরা দু'জনে উঠে ঘরে গেল এবং খানিকক্ষণ চাষাড়ে রসিকতা, হি হি হো, মাইরি যা মশা পড়েছে এবার, ফাসক্লাস পর্দার রঙটা তো, কবে আপনার বাড়িতে অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন খাব বউদি, হ্যা-হ্যা-হ্যা, চলুন দাদা রাত হয়ে যাচ্ছে — ইত্যাদির খানিকটা পর গায়ত্রী এবং অনিমেষ সেজে বেরিয়ে আসে, খুব তাড়াতাড়ি ফিরব, অনিমেষ বলল; গায়ত্রীর মুখ নিচু করা, দাদাদের ফেলে রেখে গেলাম, হ্যা হ্যা। লোক দু'টির এক জন বা সমস্বরে বলে চলে গেল। আমি এতক্ষণ কোনও কথা না বলে চুপ করে ওদের দেখছিলাম। বেশ সবল লোক দু'টি, ওদের আমার ভাল লাগাই উচিত, ওই রকম সরল, শুয়োরের মতো নির্ভীক জীবনই তো আমি এত কাল চেয়ে আসছি।

ওরা চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষিৎ বেরিয়ে গিয়ে ঘুরে এল আধ ঘণ্টার মধ্যে। চুপচাপ দু'জনে আধবোতল শেষ করার পর ও প্রথম কথা বলল, কেমন লাগছে রে এদের দু'জনকে?

ভালই। বেশ তো সুখেই আছে অনিমেষ বউকে নিয়ে।

হুঁ, সুখে আছে, পরীক্ষিৎ বিড় বিড় করল। কী করে বুঝলি তুই সুখে আছে?

কেন, দেখাই তো যাচ্ছে, ছোট্ট সুখের সংসার।

সত্যি, অনিমেষটাকে আর চেনাই যায় না। যেন বাঘের গায়ে কেউ সাদা চুনকাম করেছে। বুঝলি, বাঘের গায়ে! হালুম করার বদলে এখন মিউ মিউ করে।

আমি পরীক্ষিতের এই খেলো উপমাটাকে পাত্তা না দিয়ে বললাম, দেখা যাচ্ছে বিয়ে করার পর অনিমেষই বেশ সুখে আছে।

হঠাৎ পরীক্ষিৎ চটে গেল, কেন সুখে থাকবে? কী অধিকার আছে ওর সুখে থাকার? আমি বললাম, বাঃ, পৃথিবীসুদ্ধু লোককে তুই অসুখী থাকতে বলবি নাকি?

আমরা ঘেন্না করে, পরীক্ষিৎ বলল, রাত্তিরবেলা যখন দড়াম করে দরজা বন্ধ করে, কী-রকম তেল-তেল মুখ হয় দেখেছিস? এত যে বন্ধুত্ব ছিল, বিয়ের আগে যে নদীর পাড়ে বসে এত কথা হল, সব হাওয়া? কাল বললাম, চার জনে এক সঙ্গে এক ঘরে শোব, হেসে উড়িয়ে দিল। কী হাসি দু'জনের। আমি কি ভাঁড় নাকি যে, হাসির কথা বলে মজা দেব? মজা তো বউ যথেষ্ট দিচ্ছে।

রাত্তিরবেলা বউগুলোর স্বভাব দেখেছিস, যেন ঘুরঘুরে নেউল। বাথরুমে গা ধোয়, মুখে আরাম করে স্নো, বিছানা পেতে (অশ্লীল), কথাবার্তা বলছে অথচ...' (ছাপার অযোগ্য)

ও-কথা থাক পরীক্ষিৎ, অন্য কথা বল।

না, এ-সব দেখলে আমার বমি আসে। অনিমেষটা আউট হয়ে গেল। আচ্ছা, এখানে ইলেকট্রিক নেই কেন? টিমটিমে টেমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। আই ওয়ান্ট গ্লোরিয়াস সানসাইন অলসো অ্যাট নাইট। আয়, ওই খড়ের গাদাটায় হ্যারিকেনটা ভেঙে উলটে দিই। খানিকক্ষণ বেশ আলো হবে। বলার সঙ্গে সঙ্গে ও হ্যারিকেনটা তুলে নিল।

তোর কি আধবোতলে নেশা হল, ছিঃ! আমি বললাম।

পরীক্ষিৎ ওর ছোট ছোট করমচার মতো চোখ দুটো সোজা তুলে যেন ছুঁড়ে দিল আমার দিকে, তুই কী বলছিস অবিনাশ, আমার দোষ হল? তোব খাবাপ লাগছে না? এত কথা হল, এত প্রতিজ্ঞা, আর এক জন বিয়ে করে বলবে, আমাকে ছেড়ে দাও ভাই।

তুই-ও এক দিন ছেড়ে দিবি।

বিয়ে করে? পরীক্ষিৎ ব্যগ্রভাবে নিক্ষেপ করে।

অথবা ক্লান্ত করে। সকলেই তাই দেয়। বয়স ঊনত্রিশ হল, খেয়াল আছে?

পরীক্ষিৎ নেশার ঝোঁকে আরও মুখ খারাপ করতে থাকে। আমার একটু একটু হাসি পায়, আমি চুপ করে থাকি। পরীক্ষিতের কি বয়স বাড়ে না? এক সময় কী সব ছেলেমানুষি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমরা, কেউ বিয়ে করব না, সারা দিনে মেয়েদের জন্য আধ ঘণ্টার বেশি ব্যয় করব না, শিল্পের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হবে — এই সব। এ-সব কেউ বেশি দিন মনে রাখে? এ-সব নিয়ে কেউ পরে সিরিয়াসলি অভিযোগ জানায়? পরীক্ষিৎটা পাগল, অনিমেষ বিয়ে করে সুখে আছে, তাতে দোষেব কী? বেশ তো ভালই আছে। আমি কথা ঘোরাবার জন্য বললাম, ও-পাশে কি ঝাউবন আছে নাকি রে? অমন শোঁ শোঁ শব্দ কীসেব?

পৃথিবীর। ঝাউ কি সুপুরি কি জামরুল, ও-সব আমি চিনি না। সবই পৃথিবী। আর পৃথিবী ঠিকঠাক আছে। গায়ত্রী মেয়েটা কেমন?

ভালই তো, বেশ ছিমছাম। হাসির সময় ঠোঁট অল্প ফাঁক করে, সুতরাং অভিমানী!

কী কবে জানলি? মেয়েদেব অভিমান কি হাসিতে বোঝা যায়? ও জন্য তো ওদের শরীর জানতে হয়।

এই কথায় আমি একটু কেঁপে উঠেছিলাম। আমার আঁতে ঘা লাগে, পরীক্ষিৎ আমার কথাটাই ফিরিয়ে দিয়েছে আমাকে এই প্রসঙ্গে। গায়ত্রীর সঙ্গে পরীক্ষিৎ বেশ সহজ ভাবেই কথাবার্তা বলে। আমি পারি না।

কোনও রকম শারীরিক বন্ধুত্ব না হলে অথবা করার চেষ্টা করে প্রত্যাখ্যাত না হলে আমার সঙ্গে কোনও মেয়ের অন্তরঙ্গতা হয় না। বেশির ভাগ মেয়ের কাছেই আমি এ-জন্য একটু অভদ্র বা লাজুক বলে পরিচিত। পরীক্ষিৎ আমাব ব্যাপারটা জানে বলেই খোঁচা দিয়েছে। আমি ওকে চিনি। ওর হাড়ে-হাড়ে গণ্ডগোল। ও আমাকে কী বলতে চায় তা আমি অনেকক্ষণ বুঝতে পেরেছি।

তারও আগের দিন রাত্রে খাওয়ার পর আমরা তিন জন বসে গল্প করছিলাম, গায়ত্রী আমাদের সঙ্গে বসেনি, খুটখাট করে সংসারের কাজ সারল, দু ঘরের বিছানা পাতল পরিপাটি করে, তারপর সব কাজ শেষ করেও ও আমাদের সঙ্গে গল্প করতে এল না। নিজের শোবার ঘরে চুপ করে বসে রুমালে ফুল তুলতে লাগল। ওর সেই একা বসে থাকা এক প্রবল প্রতিবাদের মতো, যেন প্রতি-মিনিট ও আশা

করছে আমরা কতক্ষণ আড্ডা শেষ করব এবং অনিমেষ শুতে যাবে, আমার তাই মনে হয়েছিল। সুতরাং আমি বলেছিলাম, চল এবার উঠে পড়ি, আমার ঘুম পাচ্ছে।

ঘুম পাচ্ছে? সে কী, তোর? পরীক্ষিৎ চেঁচিয়ে উঠল, মাঝে মাঝে সত্যি অবাক করে দিস তুই ঘুম পাচ্ছে অবিনাশ মিত্তিরের? রাত এগারোটায়, যে আসলে একটা রাতের ঘুঘু! তোর কি ফর্ম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে? বউ কোথায় গেল। পরীক্ষিৎ বিরক্তি মিশিয়ে উঁচু গলায় বলল, যে-গলায় পরীক্ষিৎ গান গায়, রাগ প্রকাশের সময়ও ওর গলা সেইরকম দীর্ঘ সুরেলা থাকে। অনিমেষ, বউকে বল, এক ঘরে বিছানা করতে, চার জনে এক ঘরে শুয়ে সারা রাত গল্প করব!

এ-কথা বলার সময় পরীক্ষিতের গলায় কোনও দ্বিধা ছিল না। বন্ধুত্বের চূড়ান্ত সঙেঘ ওর বিশ্বাস, বন্ধুদের সঙ্গে মারাত্মক সব পরীক্ষায় জীবন কাটাতে হবে এবং কখনও কোনও ক্লান্ত মুহূর্তে যার-যার ব্যক্তিগত শিল্প সৃষ্টি। পরীক্ষিৎ এ-কথা জোর করে বলে। শিল্প-শিল্প করে ও গেল, শিল্প ওর মাথার ভূত। অনিমেষ ওর প্রস্তাবে বিষম উৎসাহিত হয়ে গায়ত্রীকে ডেকেছিল। গায়ত্রী এল বারান্দায়। চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে।

পরীক্ষিৎ শেষ গ্লাসটা এক চুমুকে শেষ করে বলেছিল, আমি অনিমেষকে বড় ভালবাসি। ও-রকম কবি হয় না। ওকে ডুবিয়ে দিতে চাই। ও-রকম সুখী সেজে থাকলে ওর দ্বারা আর কিছু হবে না জীবনে, আমাকে একটু তোর গ্লাস থেকে ঢেলে দে।

আমি ওকে একটু দিয়ে আমার গ্লাস শেষ করে দিয়েছিলাম।

অনিমেষের সুখের তুই বারোটা বাজিয়ে দে, অবিনাশ। তুই কী করছিস, যাঃ তুই একটা নিরেট — ও একটা মেয়েমানুষ পেয়ে সব ভুলে যাবে? আমি বললাম, সব ভুলে গেছে কোথায়? অনিমেষ তো আগের মতোই আমাদের সঙ্গে মিশে আড্ডা দিচ্ছে।

কোনও কারণ নেই, তবু পরীক্ষিৎ আমার এ-কথা শুনে একটু মুচকি হাসি হাসল। রহস্যময় হাসি। বলল, তুই কি ভাবছিস, আমি বিয়ে করার বিরুদ্ধে কিছু বলেছি? করুক না বিয়ে যার ইচ্ছে। কিন্তু অনিমেষ ওর বউয়ের সঙ্গে যখন কথা বলে তখন দেখলে মনে হয় যেন ও আলাদা একটা জগতে আছে। এই জগৎটা ভেঙে দিতে হবে। একটা মেয়েমানুষ মানেই কি আলাদা জগৎ? কী ভয়ানক মেয়েগুলো, অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন খেতে আপত্তি করল কেন? যেহেতু এক বছরেই গোটা দুয়েক ডিম পাড়েনি। তুই ওর বিষ দাঁত ভেঙে দে না। আমি বললাম, আমি কেন ভাঙতে যাব? তাছাড়া, আমার কী-ই বা ক্ষমতা আছে? পরীক্ষিৎ আমার কথা শুনল না, নিজের মনেই বলে চলল, কী হচ্ছে কাল থেকে, খালি খাওয়া আর গল্প, কী সব গল্প, ওমুক লোকটা, ওর মেজ শালি, সে-দিন হাটে পুলিশ এসে...এ-সব কী? মনে আছে গতবার আমরা সকলে মিলে কী নিয়ে যেন মারামারি করেছিলাম? এই দ্যাখ, আমার থুতনিতে একটা কাটা দাগ আছে, তুই ঘুষি মেরেছিলি। সে-সব দিন —।

আমি বললাম, পরীক্ষিৎ, তুই তোর বিশ্বাস বা ইচ্ছে আমার ঘাড়ে চাপাতে চাস কেন? এটা তোর একটা রোগ। আমার আর অতটা ভাল লাগে না। কোনও মানুষকেই আঘাত করার ইচ্ছে নেই আমার। সকলে সকলের ইচ্ছেমতো বাঁচুক। আমিও সরল, স্বাভাবিক জীবন চাই, অনেক দিন বাঁচতে চাই। অনিমেষের সংসার দেখে আমার সেই দিক দিয়ে লোভ হচ্ছে।

সে কী রে? এ যে দেখছি বাংলা সাহিত্যে যাকে বলে 'জীবন-প্রেমিক'। যাঃ, আর হাসির কথা বলিসনি। তোর একটা অকারণে হিউমার করার স্বভাব আছে। অনিমেষের মধ্যে একটা গণ্ডগোল ঢুকিয়ে দে। ও ভয় পেয়ে যাক, সন্দেহ করুক নিজেকে। না হলে ও আর কোনও দিন লিখতে পারবে না। ও না লিখলে আমারও আর ইচ্ছে করে না। বাংলা সাহিত্যে আমার আর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

কেন, বিমলেন্দু?

ওই মোটা হুঁৎকোটা? ও তো পাবলিকে হাততালি চায়। তাই পাবে। ওর কথা ছাড়।

তাহলে বিশ্বদেব?

মনীষী বিশ্বদেব বল, এরপর তুই বুঝি শেখরের নাম বলবি? তুই আমাকে এত ছোট ভাবিস?

তুই কিন্তু বিমলেন্দুর সামনে মুখ নিচু করে থাকিস। ওকে বলিস গ্রেট। আড়ালে নিন্দে করা তোর স্বভাব। চল, বাইরে ঘুরে আসি। মাথায় ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলে ভাল লাগবে। তুই ঘোলাটে জল খেতে বড় ভালোবাসিস, পরিষ্কার জল দেখলে তোর বমি আসে, না রে?

একটু হেসে পরীক্ষিৎ চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেল, ওর পা একটু টলে যায়। আমি ওর হাতটা ধরে বাইরে এলাম। আঃ, ভারি সুন্দর চাঁদের আলো দিয়েছে। পরীক্ষিৎ বলল, এই আলো খেলে নেশা হবে?

আগেকার কালের লোকদের হত, যাদের মাথার মধ্যে ভালবাসা ছিল। নেশার ঘোরে উন্মাদ হয়ে যেত শেষ পর্যন্ত। ওই জন্য পাগলের ইংরেজি লুনাটিক। তোর ও-সব কিছু হবে না। তুই বড্ড সেয়ানা।

আমি চুপ করে বসে আছি। সেই দুপুরবেলা। আমার কিছুই করার নেই। পরীক্ষিতের বেশ নাক ডাকে দেখছি। অমন কায়দাবাজ নাক দিয়ে এ কী ভালগার আওয়াজ! এ-কথা মনে করিয়ে দিলে ওর মুখের চেহারা কী-রকম হয় বিকেলবেলা দেখতে হবে। চুপ করে বসে আমি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। ও-ঘরে গায়ত্রী বসে আছে, ওর সঙ্গে অনায়াসে গিয়ে গল্প করা যায়। যায়, যদি স্বাভাবিক ভাবে গিয়ে বসতে পারি। তা পারব না, কৃত্রিমতা একেবারে ঢুকে গেছে। কোনও যুবতী মেয়ের সঙ্গে যে একা ঘরে দুপুরবেলা বসে শুধু গল্প করা যায় এই বিশ্বাসটাই যে নেই। প্রিমিটিভ, একেবারে প্রিমিটিভ। দু-একটা হালকা গল্প-গুজব রসিকতায় কি গায়ত্রীর সঙ্গে এখন সময় কাটানো যায় না? কেন আমি শুধু শুধু একা বিরক্ত হয়ে বসে আছি? কাল আমি পরীক্ষিৎকে বলেছিলাম, গায়ত্রীকে নিয়ে তুই এমন ভাবে ভাবছিস কেন? বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে এসেছি, স্বামী-স্ত্রীর ছোট্ট চমৎকার সংসার এখানে। আয়, ঠাট্টা-ইয়ার্কি ফষ্টি-নষ্টি করি, লুকিয়ে প্রেম করার চেষ্টাও চলতে পারে। ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ লড়াই হোক-কেউ ব্যর্থ হয়ে দুঃখ পাক, কেউ সফল হয়ে নিরাশ হয়ে পড়ুক, কেউ জ্বলে-পুড়ে মরুক মনে-মনে সেইটাই তো স্বাভাবিক। জীবন এই রকম। তার বদলে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে-চিন্তে তুই আমাকে বলছিস ওর সঙ্গে সম্পর্ক করতে যাতে অনিমেষ দুঃখ পায়, ওর সুখ ভেঙে যায়, আর তুই থাকবি আড়ালে। আমার ব্যক্তিগত লোভ থাক বা না থাক, অনিমেষকে কষ্ট দেবার জন্য আমি একটি মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ব — এ কী! পরীক্ষিৎ যথারীতি নিজের ভাষায় আমাকে কিছু গালাগালি দিয়েছিল। আমি বলেছিলাম, না, অনিমেষ-গায়ত্রীর সুখের সংসার ভাঙতে আমার একটুও লোভ নেই। ওরা সুখে থাক।

আমি উঠে গিয়ে গায়ত্রীর ঘরের দরজা খুলে দাঁড়ালাম।

গায়ত্রী বলল, আসুন।

খাটে পা মুড়ে বসে দু'হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে ও সেলাই করছিল, আমাকে দেখে একটুও ভঙ্গি বদলাল না। লাল শাড়ির নিচে সাদা শায়ার লেস বেরিয়ে পড়েছে, তার নিচে পদ্মপাতার মতো গায়ত্রীর পায়ের রঙ, সে-দিক থেকে আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। গায়ত্রীর রঙ একটু কালো, গোল ধরনের মুখ। তেমন সুন্দর নয়, ছায়া কিংবা মায়ার পাশে দাঁড়ালে গায়ত্রীকে মেটেই রূপসী বলা যাবে

না। কিন্তু জলের মাছের মতো গায়ত্রীর চকচকে স্বাস্থ্য, সেই স্বাস্থ্যের অহঙ্কার ওর চোখে-মুখে। দু-এক ফোঁটা ঘাম জমে গড়িয়ে এসেছে থুতনি বেয়ে। ব্লাউজের একটা বোতাম খোলা, আমি সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলাম। ডিজাইন-করা ব্লাউজের হাতা টাইট হয়ে চেপে বসেছে ওর বাম বাহুতে, আমার মনে হল একটা কুমির যেন ওর হাত কামড়ে ধরেছে। আমি সে-দিক থেকেও চোখ ফিরিয়ে নিলাম। জানলা দিয়ে রোদ্দুর এসে ওর তৃণভূমির মতো ঘাড়ের ওপর দিয়ে গিয়ে পড়েছে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায়, সেখান থেকে ঠিকরে এসে লাগছে ওর চোখে, অথচ ও সরে বসেনি। ও কি জানত, আমি এক সময় এসে ওর উদ্ভাসিত মুখ দেখব?

আসুন, দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসবেন না?

কারাগারের দরজায় যখন জল্লাদ এসে দাঁড়ায়, তখন তাকে কী-রকম দেখায়? আমার নিজেকে মনে হল সেই জল্লাদের মতো। আমার হাতে মারাত্মক অস্ত্র। আমি নিজেকে বুঝতে পারিনি, আমার শরীর অন্য রকম লাগছিল। যেন কোথায় ঢঙ ঢঙ করে পাগলা ঘণ্টি বাজছিল। আমি তো এ ভেবে এ-ঘরে আসিনি, সরল পদক্ষেপে এসেছিলাম দরজা পর্যন্ত। এখন আমার বলতে ইচ্ছে হল, গায়ত্রী, শেষবারের মতো ঈশ্বরের নাম করে নাও।

দেখুন তো ডিজাইনটা কেমন হচ্ছে? ওর কণ্ঠস্বর ময়ূরের মতো কর্কশ।

আমি কাছে এসে চেয়ারে কিংবা খাটে বসব ভাবছিলাম — গায়ত্রী একটু সরে হাত দিয়ে জায়গা দেখিয়ে বলল, বসুন না।

আমি বললাম, গায়ত্রী, কেমন আছ?

ও এক ঝলক হেসে বলল, হঠাৎ এ-কথা?

সত্যিই হঠাৎ ও-কথা জিজ্ঞেস করার মানে হয় না। পরশু দিন এসেছি, আজ কি আর ও-কথা জিজ্ঞেস কবা যায়! কিন্তু মেয়েদের কোনও সময় চোখের দিকে তাকালেই আমার মুখ দিয়ে এই প্রশ্ন বেরিয়ে আসে। এর কী উত্তর চাই, তা আমি জানি না। হয়তো ওদের ভিতরের কোনও গুপ্ত খবর ওদের মুখ থেকে বিষম ভাবে শুনতে চাই। এর পরেই আমার বলতে ইচ্ছে হয়, কত দিন তোমাকে দেখিনি। কিন্তু এ-কথাও বলা চলে না, কারণ গায়ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপই ছিল না, অনিমেষের বিয়ের সময়ও আমি আসিনি, পা ভেঙে বিছানায় শুয়ে ছিলাম। তবু কত দিন তোমাকে দেখিনি এ-কথা বলার ইচ্ছে আমার মধ্যে ছটফট করে।

গায়ত্রীর সঙ্গে মিনিট দশেক কী-কী বিষয়ে যেন কথা বললাম। তারপর ও উঠে বলল, দাঁড়ান, চায়ের জল চাপিয়ে আসি। খাট থেকে নামতেই আমি ওর হাত ধরলাম। খাটের পাশে পা ঝুলিয়ে আমি বসে ছিলাম, ওকে হাত ধরে পাশে নিয়ে এলাম। ও বলল, দেখেছেন, আমি কতটা লম্বা, প্রায় আপনার সমান।

আমি ওর বুকে মুখটা গুঁজে দিলাম। গায়ত্রী বলল, এ কী এ কী! কিন্তু সরে গেল না। আমি দুই হাতে ওর কোমর শক্ত করে জড়িয়ে ওর দুই বুকের মাঝখানের সমতলভূমিতে গরম নিশ্বাস ফেলতে লাগলাম, একটু একটু করে বুঝতে পারলাম, ওর বুকে তাপ আসছে, ওর শরীর আকন্দ ফুলের আঠার মতো আমার চোখে-মুখে লেগে যাচ্ছে, ও সরে দাঁড়াচ্ছে না। আমি মনে মনে কাতর অনুরোধ করলাম, গায়ত্রী সরে যাও, মনে মনে বলেছিলাম, গায়ত্রী আমাকে একটা থাপ্পড় মারো, ডেকে জাগাও পরীক্ষিৎকে। আমাকে বলো, নরকের কুকুর। গায়ত্রী, প্রতিবেশী দিয়ে আমাকে মার খাওয়াও, আমি তোমার প্রতি সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকব, তোমাকে খুব ভালবাসব, সরে যাও গায়ত্রী।

খাটের ওপর জায়গা হচ্ছিল না বলে আমি লাথি মেরে পাশবালিশটা ফেলে দিলাম মাটিতে। গায়ত্রী সারা শরীর দিয়ে হাসছে। একবার বলল, ও, আপনার মনে এই ছিল। থুতনির এক বিঘৎ নিচে কামড়ে গভীর লাল করে দিতে ও নিঃশব্দে আর্তনাদ করল। আমি অশ্লীল ভাবে হেসে বললাম, তোমার শরীরে তো জোর কম নয়। ও বলল, আপনিও বুঝি কবিতা লেখেন?

না, তোমার মুখের ভেতরটা দেখি!

তবে বুঝি গল্প?

দু-একটা। তোমার লাগছে?

না-আ, কী-রকম গল্প, পড়লে বোঝা যায়? নাকি ওদের মতো?

মাথা খারাপ!

কী মাথা খারাপ? বোঝা যায় না!

তুমি ও-সব পড়তে যাবে কেন? ও-সব পড়ার কী দরকার। মুখটা ফেরাও।

সবাই বলে, অনিমেষ এক জন বড় কবি। আমি পড়ে কিছুই বুঝতে পারি না। আমাকে কপি করতে দেয় মাঝে মাঝে। আমি এক বর্ণ বুঝি না। অবশ্য বলি, খুব চমৎকার হয়েছে, বিশেষ করে শেষের লাইনটা। ও খুশি হয়। গায়ত্রী গোপন আনন্দে হাসল। তারপর বলল, বুঝতে পারি না কেন? লেখার দোষ না আমার মাথার দোষ?

সব তোমার দোষ। তুমি কেন এত সুন্দরী হয়েছ?

আমি আবার সুন্দরী! আমার তো নাক ছোট, চোখের রঙ কটা।

সৌন্দর্য বুঝি নাকে-চোখে থাকে? সৌন্দর্য তো এই জায়গায়। আমি হাত দিয়ে ওর সৌন্দর্যস্থানগুলি দেখিয়ে দিলাম ও চুমু খেলাম। ও বলল, আপনি একটি আস্ত রাক্ষস। আঃ, সত্যি লাগছে, দাগ হয়ে যাবে যে!

আমি বললাম, গায়ত্রী, আমার আর বাঁচার পথ রইল না।

কেন?

এই যে আমি তোমার মধ্যে ডুবে গেলাম। আমি এর আগে কোনও মেয়েকে ছুঁইনি, কিন্তু পরশু দিন থেকেই তোমাকে দেখে —।

গায়ত্রী পোশাক ঠিক করে উঠে বসল। তাকাল আমার দিকে এক দৃষ্টে। আমার মুখে সম্পূর্ণ সরলতা ছিল, মঞ্চে যে সরলতা দেখা যায়, যা ভয়ংকর বিশ্বাসজনক।

ও, আমারই বুঝি দোষ হল! গায়ত্রীর গলায় একটু ঝাঁঝ।

সব তোমার দোষ, কেন দুপুরে এ-ঘরে একা বসে ছিলে? এ-কথা বলার সময় গোপনে পিছনে হাত দিয়ে ওর ঘাড়ে সুড়সুড়ি দিয়ে দিলাম। ও এঁকে-বেঁকে হেসে উঠে আমার বুকে কিল মারতে লাগল। ওর তীব্র ঘনিষ্ঠতা দেখে হঠাৎ আমার সন্দেহ হল, আমার নাম কি অবিনাশ না অনিমেষ? এক বছর আগে আমিই কি ওকে বিয়ে করেছিলাম?

আমরা দু'জনে কিছুক্ষণ পাশাপাশি শুয়ে রইলাম। আমি ওর একটা হাত তুলে ঘামের গন্ধ নিতে লাগলাম। এই গন্ধে বেশ নেশা আসে আমার। পরে ঘুম পায়। এই ঘামের গন্ধই মেয়েদের শরীরের গন্ধ। অনিমেষ তোমাকে খুব ভালবাসে, না?

হ্যাঁ, সত্যিই খুব ভালবাসে। ওর জন্য আমার মায়া হয়। জানেন, আমি খুব সুখী হয়েছি। আমি তো সব পেয়েছি। এমন সুন্দর স্বামী, সংসারের কোনও ঝঞ্ঝাট নেই, ইচ্ছে মতো দিন কাটাতে পারি। অথচ মাঝে মাঝে তবু আমার বুকের মধ্যে হু-হু করে কেন বলুন তো?

আমি মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে বললাম, ও-সব গণ্ডগোলের প্রশ্ন আমাকে কোরো না।

এই সময় হঠাৎ আমার তাপসের কথা মনে পড়ে। তাপসের স্বভাবই হল পরে আসা। পরীক্ষিৎ নয়, তাপসই আমার সব চেয়ে সর্বনাশ করেছে। আমার কানের কাছে মন্ত্র দিয়েছে, স্ত্রীলোক মাত্রই সুলভ, ওরা ভালবাসা চায় না, ওরা গোপনতা চায়। ওদের জন্য ভালবাসা খরচ করার দরকার নেই। ওরা চায় গোপনে অত্যাচারিত হতে। আমার মনে পড়ল, গায়ত্রীকে একবারও আমি বলিনি, ভালবাসি, এমনকী অভিনয় করেও না, গায়ত্রীও শুনতে চাইল না। আমি প্রথম ওর ব্লাউজ খুলে স্তনের কুঁড়িতে আলতো করে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলেছিলাম, কী সুন্দর তোমার বুক! তাতেও ও খুশি-চোখে তাকিয়েছিল। কিন্তু আমি তো বলিনি, কী সুন্দর তুমি! আমি ওর সম্পূর্ণ বসন সরিয়ে বলেছিলাম, কী সুন্দর তোমার উরু। বলিনি, কী সুন্দর তুমি। সে-কথাও শুনতে ও চায়নি। অর্থাৎ ভালবাসা কথাটা শুনতে চায়নি। মাত্র তিন দিনের চেনা এর মধ্যে আবার ভালোবাসা! ধ্যুৎ!

কী দুঃসাহস গায়ত্রীর, ও-ঘরে পরীক্ষিৎ শুয়ে, মাঝখানের দরজাটা ভেজানো, এমনকী বন্ধ না পর্যন্ত। প্রথম যখন ওর কোমর জড়িয়ে ধরলাম, তখনও ও রেগে উঠলে, অনায়াসে আমি ঠাট্টা বলে চালিয়ে দিতে পারতুম। বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে এ-সব ঠাট্টা কি আর চলে না! কিন্তু ওর সমস্ত সত্তা যেন একটা বিশাল তালাভাঙা দরজার মতো ছিল, একটু ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। আসলে এর মধ্যে আমার কোনও লোভ, কোনও পরীক্ষা করার ইচ্ছে, অনিমেষকে যন্ত্রণা দেবার চেষ্টা, কিছুই ছিল না। শুধু দুপুরবেলার ঘুমহীনতা, শুধু এইটুকুই, এই জন্যই এসেছিলাম এ-ঘরে। কিছু দিন ধরে সব সময়ে আমি ছটফট করছি, কোনও রকম ভোগে আসক্তি নেই, মেয়েদের দেখলে তেমন একটা ইচ্ছে সত্যিই জাগত না, গায়ত্রীও তেমন কিছু রূপসী নয়। হঠাৎ আনমনে চলে এসেছি এ-ঘরে, কথা বলতে বলতে প্রায় অজান্তেই ধরেছি ওর হাত, স্বাভাবিক ভাবেই একটা হাত চলে গেছে ওর কোমরে, এবং তারপর বুকে মুখ না গোঁজার কোনওই মানে হয় না। আর বুকে মুখ গোঁজার পর কে না চায় পাশে টেনে শোয়াতে! অথচ যেন কী বিরাট কাণ্ড ঘটে গেল, লোকে শুনলে তাই ভাববে। এরই জন্য খুনোখুনি হয়, আত্মহত্যা। না, শুধু এইটুকুই না বোধহয়, যারা খুনোখুনি বা আত্মহত্যা করে তারা মাত্র এর জন্যই করে না, আর একটা কিছু জড়িত থাকে — ভালবাসা। সে-সম্পর্কে আমার তো কোনওই দাবি নেই, বোধ নেই, বোধ নেই বলা ঠিক হল না, আগে ছিল, আজ আর মনে পড়ে না। অনিমেষ, তোমার ভালবাসায় আমি কোনও ভাগ বসাইনি, তোমার স্ত্রীর ওপর কোনও লোভ করিনি, সম্পূর্ণ নির্লোভ আমার এই আজকের দুপুরের একটা ডুব, কোথাও কোনও মলিনতা নেই, এক নদীতে কেউ দু'বার ডুব দেয় না। কী ক্ষতি হয় এতে?

হঠাৎ বিষম ভয় পেয়ে আমি বিছানায় উঠে বসলাম। ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে মারাত্মক অজগরের মতো একটা নীল রঙের ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে ক্রমশ স্ফীত হতে হতে এগিয়ে আসছে। ধোঁয়ার রেখাটা এসে আমাকে ছুঁয়ে কেটে গেল। এর মানে পরীক্ষিৎ জেগে আছে, আর শেষ পর্যন্ত আমি পরীক্ষিতের প্যাঁচে পড়লাম। ও যখন আমাকে আর অনিমেষকে নিয়ে ভয়ঙ্কর খেলা খেলবে, আমাকে সুস্থ হতে দেবে না, আমাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে দেবে না। ওর এই নেশা আমি জানি। তাড়াতাড়ি আমি গায়ত্রীর মুখ এ-দিকে ফিরিয়ে দিলাম যাতে নীল ধোঁয়া ও দেখতে না পায়।

এখন চা খাবেন? ফিস ফিস করে গায়ত্রী জিজ্ঞেস করল। চলুন না, আমি রান্নাঘরে গিয়ে তৈরি করব, আপনি পাশে বসবেন।

অনিমেষ বুঝি রোজ বসে?

না, ও তখন কবিতা লেখে। এই বলে গায়ত্রী নিয়ন আলোর মতো কুৎসিত ঢঙে হাসল। তারপর বলল, কলকাতায় আপনাদের বাড়ি যাব।

আমি তো মেসে থাকি, সেখানে মেয়েরা থাকতে পারে না।

তবে কোথায় থাকব? যাব না কলকাতায়? আর দেখা হবে না?

বিমলেন্দুদের বাড়িতে থাকবে। ওদের বাড়িতে অনেক জায়গা আছে। বিমলেন্দু ছেলেও খুবই ভাল।

আমি তো চিনি। বিয়ের সময় এসেছিল। বড্ড গম্ভীর।

ওর চোখে-মুখে আমি লোভ দেখতে পাচ্ছি। আহা, অনিমেষের জন্য সত্যিই আমার দুঃখ হল। এই সব মেয়ে স্ত্রী কাঁকড়াবিছের মতো, তাদের স্বামীদের সম্পূর্ণ গ্রাস করে। আমার বুকের মধ্যে তবু হু-হু করে কেন বলুন তো? গায়ত্রী একটু আগে আমাকে যে জিজ্ঞেস করেছিল, তার উত্তর আমি জানি। পরীক্ষিৎ কিংবা শেখর হলে অনেক বড় বড় কথা বলত, নিঃসঙ্গতা, উদাসীনতা এই সব। আসলে মেয়েটা একটু বেশি চায়। অল্পে খুশি হতে চায় না। অনিমেষের মতো সূক্ষ্ম ধরনের ছেলেকে বিয়ে করে ওর আশ মিটছে না, চায় একটা ধারাবাহিক নির্লজ্জ অনুষ্ঠান। অনিমেষের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব বেশি দিনের নয়, ও যে ঠিক কী-রকম ছেলে আমি জানি না। বিমলেন্দু আর তাপসের বন্ধু হিসেবেই পরিচয় হয়েছিল। তবে ওকে বড় ভাল লাগে আমার, যেন সব সময় তারের ওপর দিয়ে হাঁটছে, এমন নিখুঁত। অনিমেষের কোনও ক্ষতি করতে চাই না আমি, আমি সত্যিই অনিমেষকে কোনও দুঃখ দিতে চাইনি। এতে কী আসে যায় অনিমেষের? এ তো হঠাৎ একটা দুপুরের দুর্ঘটনা। দুপুরবেলা কোনও কাজ ছিল না, ফাঁকা-ফাঁকা লাগছিল। যাই হোক, অনিমেষ, আমি মনে মনে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, হল তো?

আমার তো কিছুরই অভাব নেই, তবু মাঝে মাঝে বিষম মনখারাপ লাগে কেন বলুন তো?

তোমার মন বলে যে কিছু আছে এই প্রথম জানলাম। কথাটা বলেই বুঝলাম, খুবই বেফাঁস হয়ে গেছে, তবুও গায়ত্রীর ওপর আমার বিষম ঘৃণা এসে গেল। আমি আদর করার ভঙ্গিতে ওকে কামড়ে দিলাম। গায়ত্রী আমার কথায় ধড়মড় করে উঠে বসেছিল, কিন্তু আমার মুখে সেই মঞ্চাভিনেতার সরল হাসি দেখে তৎক্ষণাৎ ভুলে গিয়ে নিজেও হাসল। আমাকে বুঝি খুব খারাপ ভাবছেন?

তোমাকে খাবাপ ভাবতাম যদি না আজ দুপুরে তোমার কাছে আসতাম। তোমাকে মনে হত নিছক মফঃস্বলেব বউ। তুমি একটি রত্ন। তুমি বিয়ের আগে ক'টা প্রেম করেছ?

যাঃ! ও হাসল আবার। আমি মানুষ হয়েছি কাশীতে, ওখানে মেয়েই বেশি, ছেলে কোথায়?

তবু?

সে কিছু না। বলার মতো কিছু না।

আমি চোখ বুজলাম। একটু একটু ঘুম পাচ্ছে যেন।

খানিকটা পর চায়ের কাপ নিয়ে এসে আমাব থুতনিতে একটা টোকা মেরে বলল, উঠুন, এবার পাশের ঘরে গিয়ে বসুন, লজ্জা নেই আপনার? বন্ধু দেখলে কী ভাববে এ-ঘরে এসে খাটে ঘুমোচ্ছেন?

পরীক্ষিৎ? আমি বললাম, কে ওকে গ্রাহ্য করে, ও আবার মানুষ নাকি?

এরই মধ্যে গায়ত্রী কখন স্নান করে নিয়েছে এবং আবার শুদ্ধ পবিত্র লাগছে ওকে। আমার মধ্যে আবার আলোড়ন হল, রূপ দেখেই তাকে নষ্ট করার পুরনো ইচ্ছে জেগে উঠল, হাতও বাড়িয়ে ছিলাম কিন্তু হাওয়া থেকে ফিরিয়ে আনলাম হাত তুড়ি মারার ভঙ্গিতে। ধীরে-সুস্থে উঠে পাশের ঘরের ইজিচেয়ারে বসলাম। গায়ত্রী বোধহয় আশা করেছিল আমি যাবার সময় ওকে একবার চুমু খাব।

গায়ত্রী পরীক্ষিৎকে ডাকতে লাগল। পরীক্ষিৎ ঘুমের ভান করে পড়ে আছে। বিষম ডাকাডাকিতে ওঠে না। আমি ওকে একটা লাথি মারতেই আস্তে আস্তে চোখ তুলল, তারপর ঠোঁট ফাঁক করল, তারপর জিজ্ঞেস করল, ক'টা বাজে?

চা। নিন, উঠে মুখ ধুয়ে নিন। গায়ত্রী খুব মিষ্টি করে বলল ওকে।

অনিমেষ এল সন্ধের পর। খুব লজ্জিত মুখ। গলার টাই খুলতে খুলতে বলল, ইস, তোদের খুব কষ্ট দিয়েছি। এমন চাকরি, ছুটি নিলেও নিষ্কৃতি নেই! কী করলি সারা দুপুর? পরীক্ষিৎ বিরক্ত মুখে বলল, সারা দুপুর আমি পড়ে পড়ে ঘুমোলাম শুধু। বিশ্রী ঘুম। অবিনাশ বোধহয় লিখছিল নাকি?

না, আমি লিখি-টিখিনি।

আসবার সময় একটা জিনিস দেখে মনটা বড় ভাল লাগছে। অনিমেষ বলল অন্য মনস্ক গলায়, শ্মশানের পাশ দিয়ে আসবার সময় দেখি শ্মশান ধুচ্ছে। সব চিতা নেভানো, পরিষ্কার, কোনও লোকজন নেই। ডোমগুলো একটা সদ্য শেষ-হওয়া চিতা জল ঢেলে ঢেলে ধুচ্ছে। আমি খানিকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। মনে হল, পৃথিবী থেকে সব চিতা ওরা ধুয়ে ফেলছে। কোথাও আর কোনও মৃত্যু নেই।

আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। যাক, অনিমেষের মন এখন কবিত্বে ডুবে আছে। আমাদের দুপুর কাটানো নিয়ে ও আর বিশেষ মাথা ঘামাবে না।

বাইরে বসে চা খেতে খেতে খানিকক্ষণ আড্ডার পর পরীক্ষিৎ হঠাৎ অনিমেষকে একটু আড়ালে ডেকে বলল, শোন —।

আমি সাধারণত কেউ আড়ালে গিয়ে কথা বললে সেখানে যাই না, কান পাতি না, কিন্তু এখন আমি কিছুতে অনিমেষ আর পরীক্ষিৎকে এক সঙ্গে থাকতে দিতে চাই না। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে নিবীহ মুখে বললাম, কী বলছিস রে?

রাত্তিরের দিকে একটু খেলে হত না? পবীক্ষিৎ জিজ্ঞেস করল।

কিন্তু গায়ত্রীর সামনে, অনিমেষ বিব্রত মুখে বলল, কোনও দিন তো খাইনি। তুই যদি বলিস —

কোনও দিন খাসনি, আজ থেকে শুরু কর! পরীক্ষিৎ ওকে খোঁচা মারে। আমি বুঝতে পারলাম অনিমেষ সত্যিই চায় না। বললাম, তার চেয়ে বেরিয়ে গিয়ে মাঠে বসে —।

নদীর ধারে চমৎকার ঘাট বাঁধানো। দূরে মার্বেল পাহাড় দেখা যায়। বাকি অন্ধকার। একেবারে শেষ সিঁড়িতে এক জন সাধু বসে আছে অনেকক্ষণ। দূবে শ্মশান। অনিমেষের ধারণা সত্যি নয়। তিনটে চিতা এক সঙ্গে জ্বলছে হু-হু করে। শীতকালের এই শেষ দিকটাতেই বেশি লোক মরে, পুরনো রোগীরা টেকে না। তিন জনে চুপচাপ বসে, ওয়াটার বটলের গ্লাসে জল মিশিয়ে খাচ্ছি। পরীক্ষিৎ অস্বাভাবিক চুপ। সাধারণত ও একটু নেশা হলেই বিষম বক বক করে। আজ এমন চুপ কেন? ওর যে-কোনও ব্যবহারই আমার কাছে সন্দেহজনক লাগছে। অনিমেষ বলল, কাল সন্ধ্যাবেলা রূপগিরি ঝরনায় বেড়াতে যাব, ভারি সুন্দর জায়গাটা।

এই সময় অন্ধকারে সাইকেল রিকশার আওয়াজ হল। আমরা সচকিত হয়ে দেখলাম তাপস। আরে বাবাঃ, বহু দিন বাঁচবি তুই, পরীক্ষিৎ চেঁচিয়ে বলল, সোজা এখানে এলি কী করে, গন্ধ শুঁকে?

না, বাড়িতে গিয়ে শুনলাম তোরা নদীর পাড়ে এসেছিস। বাড়িতে বসতে পারতাম, কিন্তু গায়ত্রী রান্নায় ব্যস্ত, মাংস চাপিয়েছে, তাই সোজা চলে এলাম।

আমরা তিন জনে তিনটি বাতিস্তম্ভের মতো স্তব্ধ হয়েও মুখোমুখি বসে ছিলাম এতক্ষণ, তাপস এসেই প্রথমে এক চুমুকে বোতলের বাকিটুকু শেষ করে নিজের ব্যাগ থেকে একটা পুরো বোতল বার করল। তারপর বলল, খবরের কাগজ পড়িস? এখানে বাংলা কাগজ আসে?

না! কেন রে? আমরা সচকিত হয়ে উঠলাম।

সুধীন দত্ত মারা গেছেন।

সে কী? এই সে-দিনও তো দেখে এলাম সবিতাব্রতর বাড়িতে। রীতিমতো শক্ত চেহারা। কী হয়েছিল?

ঠিক জানি না। বিমলেন্দু, শেখর, অম্লান, ছায়া ওরা গিয়েছিল ওঁর বাড়িতে। ওরা শ্মশানে যাবার সময় খাটে কাঁধও দিয়েছিল। আমি যাইনি। মৃত্যুর পর মানিকবাবুকে দেখে এমন অসম্ভব ভয় পেয়েছিলাম যে, আর কারুর মৃত্যুতে যাই না। শুনলাম, হার্ট ফেলিওর। রাত্তিরবেলা নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছেন, মাঝরাত্তিরে উঠে একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে একবার কাশি, সঙ্গে সঙ্গে শেষ।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে রইলাম। খুবই আশ্চর্যের কথা, চুপ করে থাকার সময় আমার মন সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে ভুলে বার বার চলে যাচ্ছিল গায়ত্রীর সঙ্গে দুপুরের দিকে — সেখান থেকে আমার স্যুটকেসের চাবি হারিয়ে যাওয়ায়, তারপর পকেটের দেশলাইয়ে, হঠাৎ জলের শব্দে, শ্মশানের আগুনে, তারপর আবার সুধীন্দ্রনাথ দত্তে ফিরে এসে খুব আন্তরিকভাবে তাঁর জন্য দুঃখ বোধ করলাম। সবিতাব্রতর বাড়িতে তিনি আমাকে কী কী যেন বলেছিলেন, আমার মনে পড়ল না। আহা, ভারি সুন্দর দেখতে ছিল তাঁকে, মার গেলেন! যাকগে কী আর হবে। ওয়াটার বটলে একটুও জল নেই। এখন কোথায় জল পাব?

একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছিস, সুধীন দত্ত এবং জীবনানন্দ দাশ, এদের কারুরই মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। অনিমেষ বলল, অসুখে ভুগে ভুগে মরলে এদের যেন মানাত না।

আয়, সুধীনবাবুর নাম করে আমরা বাকি বোতলটা খাই। পরীক্ষিৎ বলল। শেষের দিকে আমাদেব চার জনেরই বেশ নেশা লেগে গেল। আমি কতবার মনে করার চেষ্টা করলাম, স্যুটকেসের চাবিটা আমি কলকাতাতেই ফেলে এসেছি, না এখানে এসে হারাল? কিছুতেই মনে পড়ে না।

পরীক্ষিৎ ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল নিচে। সাধুবাবার সঙ্গে কী নিয়ে কিছুক্ষণ বচসা করে ফিরে এসে বলল, না, নেই!

কী?

গাঁজা।

তাপস বলল, রাত্তিরটা কী করবি?

ঘুমোব, আমি বললাম।

ইয়ার্কি আর কী! এত দূরে এলাম ঘুমোবার জন্য? অনিমেষ ওর বউকে নিয়ে এক ঘরে ঘুমোবে, আর আমরা তিন-তিনটে মদ্দা এক ঘরে? ধ্যুৎ, এর কোনও মানে হয়?

অনিমেষ তাড়াতাড়ি বলল, আচ্ছা, গায়ত্রী পাশের ঘরে একা থাক, আর আমরা চার জনে এক সঙ্গে শোব।

কেন বাবা। তাপস ধমকে উঠল, আমি না হয় তোমার বউয়ের সঙ্গে আজ শুই, আর তুমি ওদের সঙ্গে শোও। একটা রাত্তিরে কিছু হবে না। আমি বিয়ে করলে তুমি এক দিন শুয়ে নিও। শোধ হয়ে যাবে।

তাই নাকি! হা-হা করে পরীক্ষিৎ অট্টহাসি করে উঠল। অনেকক্ষণ ধরে হাসল, হাসি থামতেই চায় না। চমৎকার বলেছিস, ওফ। আবার হাসি। শেষে একটা থাপ্পড় মেরে ওকে থামাতে হল।

অনিমেষ মুচকি হেসে বলল, এ-সব কি আর এত সহজে হয়! অন্য জনেরও তো একটা মতামত আছে!

তাপস বলল, ঠিক আছে, আমি ওর মত যাচাই করে দেখছি। তোর কোনও আপত্তি নেই তো?

এ-সব আলোচনা যত হয়, ততই আমার ভাল। ব্যাপারটা হালকা দিকে থাকে। আমার ঘটনা পরীক্ষিৎ বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। এরা তিন জনেই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কত স্বপ্ন, পরিকল্পনা করেছি এক সঙ্গে। কিন্তু আজ আমার কেমন খাপছাড়া লাগছে। মনে হচ্ছে আমি ওদের দলের বাইরে, আমার সঙ্গে আর মিলছে না। এই খেপে ওঠানো সময়, সব রকম নিয়মহীনতা। এখনও তো পৃথিবীতে আছে কত মানুষ, আত্মবিস্মৃত, হেমন্তের অবিরল পাতার মতো। ঘুমোতে যায় ও জেগে ওঠে, দশটায় অফিস যাবে বলে সারা সকালটাই যায় সেই প্রস্তুতিতে, এবং সত্যি সত্যিই অফিস যায় রোজ। তারা সিনেমা দেখে আনন্দ পায়, বউকে নিয়ে রিকশায় চাপতে পারে, তাস খেলায় দু'বাজি জিতে স্বর্গসুখ পায়। আমিও তাদের মতোই বাঁচতে চাই, দু-চারটে গল্প-কবিতা লিখে বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধার করার ভার আমাকে কে দিয়েছে? কী এমন বিষম দরকারি এই বন্ধুসঙ্গ, এই অসামাজিকতা, এই বিবেকহীন, বাসনাহীন, রমণীসম্ভোগ! না, আমি এ-সব আর চাই না। এখান থেকে কলকাতা গিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়ব, বহু দিনের ঘুম, সারাটা জীবন ঘুমন্ত মানুষের মতো ঘুরব-ফিরব অজ্ঞানে। আমার শিরা-উপশিরায় সমস্ত রক্ত ভীত এবং ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। এ-সব বখাটে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আমি মোটেই মিশতে চাই না আর।

কিন্তু তার আগে যদি এবারের মতো বেঁচে যাই, পরীক্ষিৎকে সামলাতে পারি, যদি দ্বিধাহীন রেখে যেতে পারি অনিমেষের মন। হঠাৎ কেন আজ দুপুরবেলা! খুব অন্যায় কি? আমি কিন্তু সত্যিই অনিমেষকে কোনও কষ্ট দিতে চাই না।

পরীক্ষিৎ হাই তুলে বলল, অসম্ভব ঘুমিয়েছি দুপুরে। এখনও ঘুম গায়ে লেগে আছে। তুই কী করলি রে?

অদ্ভুত ক্ষমতা আছে পরীক্ষিতের। যে যেটা চিন্তা করে গোপনে, ও ঠিক সেই প্রসঙ্গে কথা বলবে। অন্তত আমার সঙ্গে তো অসম্ভব মেলে। বললাম, দূরের বাঁধের কাছটায় গিয়েছিলাম আদিবাসীদের দেখতে। কিন্তু আজকাল আর আদিবাসী-মেয়েরা তেমন সুন্দরী নেই। পাঁচ-ছ'বছর আগেও ছত্তিশগড়ি মেয়েদের যা দেখেছি! এখন ব্লাউজ-শায়া পরে, কাচের চুড়ি পরে না, স্নান করার সময়ও সব কিছু খোলে না।

অনিমেষ বলল, আপনি বুঝি ভেবেছিলেন সব কিছু রেডি থাকবে খুটে-টুলে, আর আপনি গিয়ে চোখ ভরে দেখে আসবেন। আদিবাসীরাও সভ্য আর সজাগ হয়ে যাচ্ছে।

আমি অন্য মনস্ক গলায় বললাম, হয়তো আগেই ওরা বরং সভ্য ছিল, এখন আমাদের মতো অসভ্য হচ্ছে। বলেই মনে হল, এ-কথাটা বেশ বোকাবোকা হয়ে গেল, কারণ অনিমেষের কথায় বোধহয় ঠাট্টার সুর ছিল। কিন্তু আমার দুপুর-কাটানোর প্রসঙ্গের চেয়ে ছত্তিশগড়ি মেয়েদের নিয়ে সাধারণ কথাবার্তা ভাল। তাছাড়া, আমি আরও বললাম, সাঁওতালরা...আমার মনে হয় না, হ্যাঁ, আমি...কী কী বলেছিলাম মনে নেই, তবে আদিবাসী প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু কথা হয়েছিল। কিন্তু মোক্ষম কথা বলল পরীক্ষিৎ, অবিনাশটা মেয়েছেলে ছাড়া কিছু জানে না। এই তিন দিন তুই কাটাচ্ছিস কী করে? নাকি চালাচ্ছিস কিছু গোপনে?

আমার চোখ দুটো হঠাৎ ঝিমিয়ে এল। ইচ্ছে হল ওকে খুন করি সেই মুহূর্তে। একবার ওর দিকে তাকালাম এবং সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত উদাসীন হেসে আমি অনিমেষের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম, আপনি আজকাল কী লিখছেন?

অনিমেষ বলল, না, কবিতার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি বোধহয়। কলম হাতে নিয়ে বসি, সব ঠিকঠাক আছে কিন্তু ভাষা নেই।

আমার বড় খিদে পেয়েছে, তোদের পায়নি? তাপস জিজ্ঞেস করে। গায়ত্রীকে দেখে এলাম মাংস চাপিয়েছে। চল যাই।

অনিমেষ উঠে দাঁড়াল। পরীক্ষিতের পা টলছে। তাপস আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, মুখটা গম্ভীর করলে তোকে একদম মানায় না, অবিনাশ।

চার জনে আমরা এক ঘরে শুয়েছি। পাশের ঘরে গায়ত্রী। আজ খাবার পর সকলে এক সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করেছিলাম, গায়ত্রীও। তাপস খুব জমিয়ে দিয়েছিল। তাপস এসে পড়ায় খুব ভাল হয়েছে, পরীক্ষিতের পাগলামি আমাকে সহ্য করতে হচ্ছে না। তারপর বেশ রাত হলে অনিমেষ গায়ত্রীকে বলল, আজ এ-ঘরেই থাকি। তোমার একা থাকতে ভয় করবে?

না, ভয় কেন! না না। গায়ত্রী মিষ্টি হেসে বলল।

ভয় করলে আমি তোমার সঙ্গে থাকতে পারি। তাপস সরল মুখে জানাল।

তাহলেই আমার বেশি ভয় করবে। সমস্বরে হাসি। গায়ত্রীর চোখের দিকে তাকাইনি।

গায়ত্রী ও ঘরে গিয়ে আলো নিভিয়ে দেবার পর আমরা চার জনে খানিকক্ষণ তাস খেললাম। আমার ভাল লাগছিল না। একবার খুব ভাল হাত পেতেই আমি তাসগুলো ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, নাঃ, এবার তোল।

প্রত্যেকেরই অল্প নেশা ছিল তখনও, সুতরাং শুয়ে শুয়ে গল্প করার নাম করে আলো নিভিয়ে দিয়েই ঘুমিয়ে পড়তে দেরি হল না।

মাঝ রাতে বুকের ওপর প্রচণ্ড ঘুষি খেয়ে জেগে উঠলাম। অসম্ভব লেগেছিল, স্পষ্ট আর্তনাদ করে আমি উঠে বসলাম। আমার পাশে তাপস, তারপর অনিমেষ, তারপর পরীক্ষিৎ। আমার চোখে তখনও ঘুমঘোর কিন্তু বুকে যন্ত্রণা। মনে হচ্ছে এরা তিন জনেই বহুক্ষণ ঘুমন্ত। ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে আলো জ্বালাতেই পরীক্ষিতের সুরেলা গলা শুনতে পেলাম, অবিনাশ কোথায় গিয়েছিলি রে?

প্রথমটায় বুঝতে পারিনি ওর মতলব। বললাম, কোথাও যাইনি তো, হঠাৎ...।

এই যে দেখলাম, তুই বাইরে থেকে এলি, মিটিমিটি হাসল পরীক্ষিৎ, আলো নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, সাপখোপ আছে।

এবার বুঝলাম, ও কী চায়। ও সাজাতে চায়, আমি চুপি চুপি গিয়েছিলাম। অর্থাৎ গায়ত্রীর ঘরে হয়তো। পরীক্ষিতের খাড়া নাকটার দিকে একবার তাকালাম। তারপর পাজামার দড়িটা ভাল করে বেঁধে ওর দিকে এগুতে যাবার আগেই অনিমেষ বলল, না, না, আমি দেখেছি পরীক্ষিৎ আপনাকে ঘুষি মেরে জাগিয়েছে।

রাগ ভুলে সঙ্গে সঙ্গে আমার পুরনো হুল্লোড়ের ভাবটা এসে গেল। সে কী মশাই, আপনি জেগে আছেন? কেন? ওঃ হো — বলে এমন জোরে হেসে উঠলাম যে তাপসও ঘুম ভেঙে তাকাল। আমার মধ্যে একটা অসভ্য, বিকৃত, মজার ইচ্ছে আগেকার দিনগুলোর মতো হঠাৎ ছটফট করে উঠল। উঠুন, উঠুন, অনিমেষকে হাত ধরে টেনে তুললাম, তারপর গায়ত্রীর ঘরের দরজায় ধাক্কা

দিলাম বেশ শব্দ করে। এক শরীর ঘুম নিয়ে গায়ত্রী উঠে আসতেই আমি অনিমেষকে হিড় হিড় করে টেনে আনলাম। অমন ডেলিকেট ধরনের ছেলে অনিমেষ, আমার এ-রকম বর্বরতায় খুব বিব্রত বোধ করছিল, কিন্তু ওর চেয়ে আমার গায়ের জোর বেশি, ওকে উঁচু করে তুলে গায়ত্রীর ঘরে ঠেলে দিয়ে বললাম, এই নাও তোমার জিনিস। তারপর দরজা টেনে দিলাম।

আমার ব্যবহারটা বোধহয় জমল না, বোধহয় খানিকটা অতি-নাটকীয় হয়েছিল, তাই পরীক্ষিৎ বা তাপস যোগ দেয়নি। কিছুক্ষণ চুপচাপ শোনার পর তাপস জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার রে?

কিছু না, ঘুমের ঘোরে ও আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল, তাই বেচারাকে ঘরে পাঠিয়ে দিলাম। পরীক্ষিৎ বলল, শোন অবিনাশ... । আমি বললাম, আজ নয়, আজ আমার ঘুম পেয়েছে, কোনও কথা শুনব না।

সে-দিন রাত্রে আমি একটা ছোট স্বপ্ন দেখেছিলাম। স্বপ্নটা হয়তো ছোট নয়, কিংবা অনেকগুলো স্বপ্ন। কিন্তু আমার অল্প একটু মনে আছে।

স্বপ্নটা এই রকম :

প্রশ্ন: তোমার জিভটার বদলে কী দেবে?

আমি: আর যাই হোক, দু'চোখের মণি নয়।

প্রশ্ন: তবে?

আমি: আমার একটা পা —।

তা কি সমান হল? জিভের সমান একটা পা?

তবে, আমার হাতের আঙুলগুলো নিন, ডান হাতের আঙুল, যে-হাত দিয়ে আমি লিখি।

না, জিভ থাকলে তুমি অন্য লোক দিয়েও লেখাতে পারবে।

তবে কী দেব? বুকের একটা পাঁজরা নিন।

না, জিভের বদলে আর কিছু হয় না। আমি তোমার জিভটাই চাই।

কেন? কেন?

তুমি এক ধরনের সুখ চাও, তাই-ই পাবে। সে-সুখের জন্য মানুষের জিভটা অবান্তর।

না-না।

কেন, পৃথিবীতে বোবা মানুষেরা যৌনসুখ পায় না?

কী জানি। পায় হয়তো। অন্তত পাওয়া উচিত। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি, পাব না। আমাকে দয়া করুন!

কাজ সেরে যখন চলে যাচ্ছিল তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, আপনি কোন দেবতা তা তো জানা হল না! কিন্তু তখন আমার জিভ নেই। সুতরাং আমার কথা বোঝা গেল না, দেবতাটি অস্পষ্ট ঘড় ঘড় শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেলেন। আমি দরজার পাশে পরীক্ষিৎকে পুরো ব্যাপারটার সাক্ষী হিসেবে দাঁড়ানো দেখতে পেলাম।

পরদিন সকালে আমার ঘুম একটু দেরিতে ভেঙেছিল। স্বপ্নের কথাটা সকালে মনে পড়েনি। মনে পড়ল অনেক দিন পর, আজ লেখার সময়। আমি মুখ ধুতে বাথরুমে পেস্ট আনতে গেছি, গায়ত্রী বেসিনে কাপ-ডিশ ধুচ্ছিল, আমাকে দেখে চাপা গলায় বলল, আপনি একটি অসভ্য ও ইতর। কাল রাত্তিরে কী করলেন?

উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে আসার পর মনে পড়ল জিভ-ছোলাটা আনা হয়নি, মুখ ধোবার সময় ওইটা চাই-ই, নইলে বড় নোংরা লাগে। আমি আবার বাথরুমে ঢুকতেই গায়ত্রী: সামান্য একটুও কি — ছি ছি। আমি বললাম, খুব কি খারাপ করেছি? অনিমেষের জন্য আমার মায়া হচ্ছিল।

লজ্জা করে না আপনার?

আমি ওর নিচু থাকা ঘাড়ে আলতো দাঁত বসিয়ে দিতে গিয়েছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে ও বনবিড়ালির মতো ঘুরে দাঁড়াতেই আমি বেরিয়ে গেলাম।

আমলকি গাছের ছায়ায় বসে রোদ পোয়াচ্ছে পরীক্ষিৎ, তাপস খবরের কাগজের একটা শিটের উপর শুয়ে আর একটা শিট সম্পূর্ণ খুলে ধরে পড়ছে। অনিমেষ নেই। বেশ ঝকঝকে সকালটি, এক ছিটে মেঘ নেই আকাশে, ফটফট করছে নীল রঙ। তাপস চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, ওর চোখের মণি দুটোও খানিকটা নীলচে। ঘড় ঘড় করে একটা তিন চাকার কিম্ভূতকিমাকার গাড়ি চালিয়ে একটা লোক এসে উপস্থিত হল। আওয়াজটায় বিরক্ত হয়েছিলাম। আমি চোখ গরম করে জিজ্ঞেস করলাম, কী চাই? লোকটার বেশ তেল-চকচকে গোল মুখখানি, কিন্তু গলা কিংবা ঘাড় বলে কিছু নেই, থুতনির নিচেই বুক। বলল, আমি আজ্ঞে, মনোহারি জিনিসপত্তর এনেছি।

কী আছে তোমার?

পাঁউরুটি, বিস্কুট, গরম মশলা, বাঁধাকপি, তেজপাতা, ঘি, তিলকুটো, চন্দ্রপুলি, শোনপাপড়ি, আসল বাঙালির তৈরি —। লোকটা অনেক কিছু বলত এমন ওর মুখের ভাব, থামিয়ে বললাম, চাই না।

আজ্ঞে?

চাই না।

আজ্ঞে?

বিরাট চিৎকার করে বললুম, চা-ই না। লোকটা বুঝতে পেরে গাড়ি ঘোরাল। তাপস মনোযোগ দিয়ে কিছু পড়ছিল, শেষ না হওয়া পর্যন্ত চোখ তুলতে পারছিল না। এবার হঠাৎ বলল, ডাক, ডাক লোকটাকে। ভারি চমৎকার ওর মুখখানা, ওকে আমার কাজে লাগবে। বিষম হল্লা করে লোকটাকে অনেকক্ষণ ডাকার পর ঘাড় ফেরাল, ঠিক ঘাড় না, বুক ফেরাল বলা যায়। আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে এল।

দোকান খোল, দেখি কী আছে?

খাবাব-টাবার নেবেন, না তবকারি, স্টেশনারি?

কী খাবার, দেখাও।

চন্দ্রপুলি, তিলকুটো, শোনপাপড়ি।

দাম বলো, কত করে?

দু'আনা পিস। ডজন। দেড় টাকা। খাঁটি এক টাকা ছ'আনা পাবেন, স্যাব।

বারো আনা দিতে পারি, এর চেয়ে বেশি হয় না ভাই।

না, পারব না স্যার, কেনা দাম পড়ে না।

ওঃ, তোমার কেনা জিনিস নাকি? আমরা ভেবেছিলাম ঘরে তৈরি। তবে কে কিনবে?

না, মানে মালপত্তর স্যার, কিনতেই হয় স্যার, খরচ পোষায় না।

আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার ক্ষতি করতে চাই না। তুমি আদ্দেক-আদ্দেক দিয়ে যাও।

আধ ডজন করে নেবেন?

না, সব জিনিসের আদ্দেক। বারো আনায় চন্দ্রপুলির চন্দ্রটা দিয়ে যাও, পুলিটা তোমার থাক।

চন্দ্র? শুধু চন্দ্র?

হ্যাঁ। যেমন ধরো তিলকুটো। তিলগুলোই দাও (না হয় শালা তর্পণ করব এক মাস), তাপস আমার দিকে তাকিয়ে বলল। তুমি কুটোগুলো স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারো।

পারব না স্যার। লোকটা খানিকক্ষণ কী ভাবল, তারপর বিরাট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

তুমি হয়তো ভাবছ, পরীক্ষিৎ বলল, আমরা প্রথম দিকটা মানে ভাল দিকটা নিয়ে নিচ্ছি বলে তোমার ক্ষতি হচ্ছে। বেশ তো, শোনপাপড়ির প্রথমটুকুই তুমি নাও, আমাদের পাপড়িগুলোই দাও। কী হে?

না, হয় না, তা হয় না।

পাঁউরুটির কোন ভাগটা নিবি? তাপস জিজ্ঞেস করল, পাঁউ না রুটি?

আমি রুটি খাই না। পরীক্ষিৎ জানাল।

তবে বুঝি পাঁউ খাস? দাও, ওকে পাঁউটা দিয়ে দাও। পাঁউ দিতে পারবে তো?

লোকটা চুপ। ওর চোখের পলক পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। মূর্তির মতো তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

আর কী আছে দেখি? পরীক্ষিৎ এগিয়ে ওর দোকানগাড়ির ঢাকনা খুলে দেখল।

দারচিনি মানে দারুচিনি, শুধু দারু হ্যায় তুমারা পাশ? মহুল কিংবা পচাই?

না।

অ! দারচিনিকে আবার গরম মশলাও বলে। গরম মশলাটার পুরোটাই নেব। আমি মশলাটুকু খাব আর অবিনাশবাবুকে গরমটুকু দিয়ে দাও। তেজপাতারও পাতা চাই না। তেজ দাও অবিনাশবাবুকেই, ওর দরকার। আমি হাসলাম। লোকটা পকেট থেকে একটা সবুজ রুমাল বার করে মুখ মুছল। এটা কী? পরীক্ষিৎ হাত ঢুকিয়ে একটুকরো আদা তুলল। আচ্ছা, ভাল জিনিস পাওয়া গেছে। পরীক্ষিৎ অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠল।

পুরোটা নিসনি, পুরোটা নিসনি, ওর ক্ষতি হয়ে যাবে। শোনো, আমি বললুম, এরও তুমি আদ্দেক বেচে দাও, তোমার লাভই হবে ভাই। আদার আ-টুকু দাও পরীক্ষিৎবাবুকে, তুমি দা-টা নিয়ে যাও। এরপর তুমি চাই দা, চাই দা বলে ফেরি করবে। লোকে কিনতে এলে তুমি দায়ের বদলে আদা বেচে দেবে! আর পরীক্ষিৎবাবু আ নিয়ে যা করবার করবেন।

দুর শালা! যত সব বাজে ঠাট্টা এই নিরীহ লোকটাকে নিয়ে। তাপস বলল, আসল জিনিসটার খোঁজ নে!

পরীক্ষিৎ বলল, দাঁড়া, আমি বার করছি। খুব মনোযোগ দিয়ে বাক্সের ভেতরের জিনিসগুলো দেখল। তারপর একটা পাঁউরুটি কাটা ছুরি হাত দিয়ে তুলল। হ্যাঁ, এতেই অনেকটা হবে। শোনো ভাই, সিরিয়াসলি, তোমার কাছে মেরামত করার জিনিস আছে? এই ছুরিটা মেরামত করতে হবে। লোকটা কিছু একটা উত্তর দিল, বোঝা গেল না।

এই ছুরিটা মেরামত করা দরকার বুঝতে পারছ না? চন্দ্রপুলি তো দেখালে, চন্দ্রবিন্দু আছে?

লোকটা বিকট ঘড় ঘড় শব্দ করল।

আঃ, বুঝতে পারছ না? ছুরির ছ'য়ের মাথায় চন্দ্রবিন্দু বসাতে হবে, আর একটা অনর্থ ড় লাগবে মানে ড-এ শূন্য-র। এইটুকু বদলাতে পারলেই অবিনাশবাবু যত ইচ্ছে দাম দেবে। জিনিসটা তাহলে কী হল? ছুঁড়ি। তোমার হাতে ছুঁড়ি-টুঁড়ি আছে?

আসল কথায় এসো তো ভাই, তাপস বলল নিচু গলায়, তোমার সন্ধানে মেয়েছেলে-টেলে আছে?

আজ্ঞে?

দেখো না ভেবে। তোমাদের এখানে এসেছি, দাও দু'একটা জোগাড় করে। সন্ধের দিকে নিয়ে আসবে।

পারব না স্যার।

পারবে না একথা বলতে নেই! ছিঃ! চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই। চেষ্টা করো আগে, চেষ্টা করার আগেই কী করে বুঝলে যে পারবে না?

লোকটা একটা অপ্রত্যাশিত কথা বলল এবার। প্রায় ফোঁপানো গলায়, বাবু, আমি লেখাপড়া শিখিনি আপনাদের মতো, আমি গরিব মানুষ, আমি গরিব, ওই —।

একটুক্ষণ আমরা তিন জনেই চুপ করে রইলাম। তাপস লোকটার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, তুমি গরিব মানুষ। হায় হায়, আগে বলোনি কেন, আমরাও বিষম গরিব, হায় হায়। তাপস লোকটার গলা জড়িয়ে ধরতে গেল, ওঃ, বুক জ্বলে যায়, আমরা কত গরিব জানো না, আমাদের কিছু নেই, আমরা তোমার আধখানা করেও কিনতে পারব না, চলে যাও, আমরা ভিখিরি, লেখাপড়া-জানা ভিখিরি ওঃ। তাপস হঠাৎ এমন মড়াকান্না জুড়ে দিল যে গায়ত্রী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে, আর লোকটাও গাড়ি ঘুরিয়ে হাঁটতে লাগল মন্থর পায়ে।

গায়ত্রী লোকটাকে বলল, ও মুকুন্দ, আধ সের পিঁয়াজ দিয়ে যাও।

লোকটা কিছুক্ষণ মাটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ধরা গলায় বলল, পুরোটাই নেবেন তো মা, আদ্দেক দিতে পারব না আমি।

তাপস সমেত আমাদের তিন জনের হাসির চিৎকার অনিমেষ গেটের কাছ থেকে শুনতে পেল।

দুপুরে কী কী করেছিলাম মনে নেই। খুব বৃষ্টি হয়েছিল মনে আছে। আর খাবার সময় গায়ত্রী ভেবেছিল আমি শক্ত করে ধরেছি, সুতরাং গায়ত্রী ছেড়ে দিল এবং আমি ধরিনি, বাটিটা পড়ে ছিটকে ভেঙে গেল। আমি ব্যতীত সকলে হাসাহাসি করার সময় পরীক্ষিৎ টেবিলের তলা থেকে আমার পায়ে লাথি মেরেছিল।

বিকেলবেলা আমরা একটা সাপ মারলাম। দলবল মিলে বেরুতে যাচ্ছি, বাড়ির গেটে হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাপস বলল, সাপ! সাপ! গায়ত্রী! প্রত্যেকেই এক সেকেন্ডে তিন পা পিছিয়ে দেখলাম, গায়ত্রীর খুব কাছে একটা সাপ — বেশ বড়, কালো বেল্টের মতো, এতগুলো লোক দেখে চট করে ফুলবাগানে ঢুকে পড়ল। সর্বনাশ, বাড়িতে সাপ পুষে রেখেছিস? লাঠি নিয়ে আয়, তাপস বলল, যা যা। পরীক্ষিৎ গম্ভীর মুখে জানাল, ওটা সাপ নয়, এই শীতে সাপ আসবে কোথা থেকে? ওটা আসলে শয়তান। গায়ত্রীকে কোনও একটা গোপন কথা বলতে এসেছিল।

যাঃ, ঠাট্টা নয়, আমার বুক কাঁপছে এখনও, উঃ! গায়ত্রী সরে এসে অনিমেষ ও আমার মাঝখানে দাঁড়াল। পরীক্ষিৎ কথাটা এমন সুন্দর ভাবে বলেছে যে, আমি ছবিটা যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম। সাপটা গায়ত্রীর সায়ার ভেতর থেকে যেন বেরিয়ে এল, এই রসমণীর দুই উরুর মাঝখানে কোন গুপ্ত কথা বলে। যেন কোনও পৌরাণিক কাহিনির সত্য এই মুহূর্তে এখানে ঘোষিত হয়ে গেল। শয়তান শুধু নারীর কাছেই সে-সত্য ঘোষণা করে যেতে পারে। এই মুহূর্তের জন্য দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, চাক্ষুষ ভাবে দৃশ্যটা সত্যই ভয়ঙ্কর, আমি তাই অনিমেষকে বললাম, যান লাঠি নিয়ে আসুন, ওটাকে কি এখানে পুষে রাখবেন নাকি?

আমি আসছি, তাপস দৌড়ে ভিতরে চলে গেল সুরকির পথ পেরিয়ে। ও এমন ভিতু স্বভাবের, যাবার সময় এমনভাবে গেল পা ফেলে, যেন ওর কাছে সমস্ত পৃথিবীটাই এখন সাপে ভর্তি।

কী দরকার ওটাকে মারার, অনিমেষ বলল, এর আগেও ওটাকে কয়েক বার দেখেছি, কোনও ক্ষতি করে না কিন্তু।

কী যা-তা বলছেন! সাপ রোজ ক্ষতি করে না, এক দিনই করে। অন্ধকারে গায়ে পা দিলে চৈতন্যদেবের বাণী শোনাবে না। এখন ওদের হাইবারনেশন পিরিয়ড শেষ হচ্ছে, খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসছে নতুন জীবনে। এখন ওদের তেজও যেমন, বিষও সেই রকম মারাত্মক।

পরীক্ষিৎ বলল, যাই বল, জিনিসটা দেখতে ভারি সুন্দর। কী-রকম উদাসীন ভঙ্গিতে চলে গেল, অকারণে মারিসনি।

তাছাড়া, ওটার তো বিষ না-ও থাকতে পারে। অনিমেষ বলল, অত বড় সাপ-বোধহয় দাঁড়াস, অর্থাৎ যাকে ঢ্যামনা বলে।

মোটেই ঢ্যামনা নয়, ঢ্যামনা হয় ছাই-ছাই হলুদ, এটা একদম কালো।

বিষ নিশ্চয়ই আছে, পরীক্ষিৎ বলল, সম্পূর্ণ বিষহীন কোনও জিনিস কোনও মহিলার কাছে আসবেই-বা কেন?

ধ্যাত, আপনি সব সময় অসভ্য কথা বলেন।

অনিমেষ আর আমি হাসলাম। পরীক্ষিৎ আমার চোখে চোখ ফেলেছে।

তাপস দুটো দরজার খিল এনে এগিয়ে দিয়ে বলল, কে মারবে মারো, আমি ওর মধ্যে নেই। তবে মারা দরকার। এই হুস, বেরিয়ে আয়। বলে একটা খবরের কাগজে আগুন জ্বালিয়ে ঝোপটায় ছুঁড়ে দিল।

সাপটা ওখানেই আছে, কোথাও যায়নি, আমি লক্ষ্য রেখেছি, গায়ত্রী বলল।

কিন্তু ফুলগাছগুলো নষ্ট হবে। পরীক্ষিৎ নিচু গলায় বলল।

অনিমেষ লাঠিটা তুলে এগুতে গিয়েও যেন এই কথা শুনেই পিছিয়ে এল। ওদের অস্বাভাবিক কবিত্ব দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। একটু বিরক্ত বোধ হল। ঝাঁঝালো গলায় বললাম, ওগুলো তো দোপাটির ঝোপ, বিনা যত্নেই হয়, আবার হবে। তাছাড়া শোন, সাপ হচ্ছে মানুষের শত্রু। শত্রুকে কখনও আক্রমণের সুযোগ দিতে নেই, তার আগেই মারতে হয়।

ওঃ! পরীক্ষিৎ হঠাৎ চুপ করে গেল, যেন আমি এক অমোঘ যুক্তি দিয়েছি যার উত্তর হয় না। তারপর বলল, যদি মারতেই হয় সর আমি মারছি। পরীক্ষিৎ ঝোপটার অনেকটা কাছে এগিয়ে গেল খিল হাতে, তারপর খুব সহজেই কাজ হয়ে গেল। লাল-সাদা ফুলের ঝাঁকের ওপর আন্দাজে একটা বাড়ি মারতেই স্প্রিঙের খেলনার সাপের মতো সাপটা তড়াক করে ফনা তুলে উঁচু হল। আঁ-করে গায়ত্রী একটা সরু আওয়াজ তুলে পিছিয়ে গেল দৌড়ে। পরীক্ষিৎ সাপটার দিকে চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল, একটুও ভয় নেই, যেন ও কোনও এক গুণিনের মতো মন্ত্র দিয়ে বশ করতে চায় সাপটাকে। আমি ওর ডান পাশে এগিয়ে গেলাম। আমাদের দু'জনের হাতেই খিলের ডাণ্ডা, একটু দূরে সাপটা অল্প অল্প দুলছে। পরীক্ষিৎ আমার দিকে তাকাল, ওকে একেবারে মারতে হবে বুঝলি, পালাবার চেষ্টা করলে মুশকিল হবে। তারপর যেমন ভাবে গালে থাপ্পড় মারে, সেই রকম পরীক্ষিৎ ওর লাঠিটা দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে সাপটার ফনায় মারল, আমিও সেই সময় লাঠি চালিয়েছিলাম, ঠক করে শব্দ হল দু'জনেরটা লেগে। সাপটা মাটিতে পড়তেই আমরা দুজনে ধুপধুপ করে পেটালাম। অল্প সময়েই সাপটা নিস্তেজ হয়ে গেল।

সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকেই একটা সিগারেট ধরিয়ে পরীক্ষিৎ বলল, এখন এটাকে কী করবি? সাপকে ফেলে রাখলে আবার বেঁচে যায়। বৃষ্টি পড়লেই বেঁচে উঠবে। পুড়িয়ে ফেলা উচিত। কী করবি? সাপটা কিন্তু জাতের, খাঁটি চন্দ্রবোড়া।

কিন্তু কে এখন ওটাকে পোড়াবে বসে বসে?

এক কাজ করা যাক, আমি বললাম, ওটাকে নিয়ে চল বড় রাস্তায় ফেলে দিই। কয়েকখানা বড় বড় ট্রাক ওটার ওপর দিয়ে চলে গেলেই হবে।

সেটা মন্দ না। পরীক্ষিৎ ওর লাঠিটার মাথায় মরা থ্যাঁৎলানো সাপটাকে তুলল। তারপর সৈন্যবাহিনীর শোক-শোভাযাত্রার আগে নিচু পতাকা হাতে যে-লোকটা হাঁটে তার মতো ভঙ্গিতে পরীক্ষিৎ এগিয়ে চলল। যেন ওর সত্যিই খুব দুঃখ হয়েছে। পরীক্ষিৎকে আমি জ্যান্ত মুরগির ছাল ছাড়াতে দেখেছি। জীবজন্তুর ওপর ওর দয়ামায়া বোধ যে খুব প্রবল, তার তো কখনও পরিচয় পাইনি। কিন্তু বোধহয় সাপ, টিকটিকি এই জাতীয় ঠাণ্ডা রক্তের জীবের প্রতি ওর সত্যিকারের কোনও টান আছে।

তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। লাল আকাশটার কোনও এক দিকে সূর্য। এই সময় সূর্যের রশ্মিগুলো আলাদা ভাবে দেখতে পাওয়া যায়। এখন একটু চেষ্টা করলেই কল্পনা করা যায় যে, সন্ধেবেলার সূর্য থেকে অসংখ্য লাল রঙের সাপ পৃথিবীতে ঝরে পড়েছে। পরীক্ষিৎ লাঠিটা বাগানের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেবার আগে একবার সূর্যের দিকে তাকাল।

অনেক দিন আগে আমরা এখানে একবার বেড়াতে এসেছিলাম। বছর সাতেক আগে। তখনও জায়গাটা অন্য রকম ছিল। একটা ঝিরঝিরে ঝরনা। পাশে ছোট মন্দির। এখন দেখছি রীতিমতো একটা নদী। বেশ গভীর জল মনে হয়, প্রবল স্রোত। ও-পারে ব্রিজ বানিয়েছে, এ-সব ব্রিজ-ট্রিজ কিছুই আগে ছিল না। বেশ ঝকমকে চওড়া কংক্রিটের, নদীর চেয়ে ব্রিজটাও কিছু কম সুন্দর দেখতে নয়! প্রশস্ত চাঁদের আলোয় ফট ফট করছে সাদা রঙ। গায়ত্রী একটা হালকা নীল রঙের শাড়ি পরে এসেছে, সুতরাং প্রায়শই ও মিশে যাচ্ছে জ্যোৎস্নার সঙ্গে। আশেপাশে লোকজন নেই। মন্দিরের কাছে কয়েকটা দোকান। অনিমেষ কী যেন আলোচনা করছে তাপসের সঙ্গে। আমি রেলিঙের ওপর ঝুঁকে কী যেন খুঁজছিলাম নিচে। কী খুঁজছিলাম মনে পড়ছিল না, গভীর মনোযোগ দিয়ে চোখ ঘোরাচ্ছি অথচ কেন, ঠিক কী দেখতে চাই যেন মনে আসছে না। কী খুঁজছি অনেকক্ষণ পর মনে পড়ল, একটি বাইশ-তেইশ বছরের ছেলেকে। স্পষ্ট মনে আছে, আগের বার যখন এসেছিলাম, আমি অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলাম ঝরনাটার পাশে। আমার বার বার মনে হল, ঝুঁকে তাকালে এখনও সেই ছেলেটাকে দেখতে পাব। ঝরনার (এখন নদী) পাশে একটি মুগ্ধ যুবা বসে আছে। না, কিছু দেখা যায় না অন্ধকারে। তখন কী সুন্দর চোখ ছিল আমার, ঝরনার চাঁদের আলো দেখলে কী ভালই লাগত। আমি হু-হু করে ভেসে-আসা হাওয়ায় বার বার নিশ্বাস নিয়েছিলাম। আজ কিছুই ভাল লাগছে না, অথচ আজও এ জায়গাটা কম সুন্দর নয়। বন্ধুরা, গায়ত্রী, চমৎকার ঠাণ্ডা জ্যোৎস্না, এমনকী যথেষ্ট সিগারেট আছে পকেটে। কিন্তু আমার খালি মনে হচ্ছে, এখান থেকে চলে যাই। বন্ধুদের কারুকে না বলে পালাই। যেন ভুল জায়গায় এসেছি। এই যুগপৎ জ্যোৎস্না ও হাওয়ার রাত আমার জন্য নয়। বুকের মধ্যে ব্যথা ও ভয় হচ্ছে। বিষম পালিয়ে যাবার ইচ্ছে। তবু নিচে জলের কাছে পাথরের ওপর সেই ছেলেটাকে যদি বসে থাকতে দেখি, তবে হয়তো এবারের মতো বেঁচে যাব।

তাপস বলল, আই নীড এ উওম্যান, না হলে আমি ঠিক জ্যোৎস্নার মধ্যে দাঁড়াতে পারি না।

এবার একটা চটপট বিয়ে করে ফ্যাল, অনিমেষ বলল।

ভাগ শালা। চল অবিনাশ, ওই চায়ের দোকানটায় যাই, যদি ফোক টোক জোগাড় করা যায়।

না রে, আমাব ইচ্ছে নেই।

বিয়ে করাটাকে অত ঠাট্টা করিস না, অনিমেষ বলল।

কেন, কী এমন পরমার্থ পেয়েছিস?

অনেক সুবিধে আছে। আমি তো ভাই বেশ সুখে আছি।

কে চার হাত-পায়ে সুখ চায়! তাছাড়া সুখটাই-বা কী? কানের দুল, শাড়ি, মেনস্টুরেশান, ডাক্তার, নেমন্তন্ন — সব চেয়ে মুশকিল, কখনও একা থাকা যায় না। কিন্তু এ-সব বাদ দিয়েও তো মেয়েছেলে পাওয়া যায় বিয়ে না করে!

যাঃ, শুধু শুধু থিওরিটিক্যাল কথা বলিস না। যে-সম্বন্ধে তোর অভিজ্ঞতা নেই, সে-সম্বন্ধে কথা বলা উচিত না।

তাপস চকিতে অনিমেষের দিকে সোজাসুজি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, আমার অভিজ্ঞতার কথা আমি মুখে বলি না কখনও, লিখে জানাই। তাছাড়া বিয়ে সম্বন্ধে তোরই-বা কী নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে? তুই কি পৃথিবীতে নতুন বিয়ে করেছিস? পৃথিবীতে মানুষ বিয়ে করছে অন্তত পাঁচ হাজার বছর ধরে, তাদের সকলের অভিজ্ঞতার কথা আমরা জানি।

তাদের সকলেরই অভিজ্ঞতা খারাপ?

কী গাড়োলামি করছিস? বিয়ে করা উচিত কি না তাই নিয়ে সিম্পোসিয়াম চালাবি নাকি? যার ইচ্ছে করবে। কিন্তু একটা মেয়েছেলে চাই, এ-কথায় বিয়ের প্রসঙ্গ আসে কী করে?

আমাব বিয়ের কথাই মনে হল। কারণ বিয়ে করে আমি সুখ আলোক এবং শান্তি দুটোই পেয়েছি।

পরীক্ষিৎ গান গাইছিল। হঠাৎ গান থামিয়ে মন্তব্য ছুঁড়ে দিল, কিন্তু অনিমেষের মতো সুন্দরী বউ থাকলে ভাই শান্তি বেশি দিন রাখা যায় না।

অনিমেষ কথাটা শুনল, কিন্তু কান দিল না। বলল, তাপস, তুই আর এ-রকম পাগলামি কত দিন করবি? তোর তো লেখার জন্য সময়ের দরকার!

আমিও সুযোগ পেলে একটা ছোটখাটো বিয়ে করে ফেলব। আমি নিরীহ ভাল মানুষ হয়েই বাঁচতে চাই। আমি বললাম।

তাপস একাই চলে গেল চায়ের দোকানের দিকে।

পরীক্ষিৎ ব্রিজের রেলিঙের ওপর উঠে বসেছে। প্রথমে গুন গুন করে গান করছিল, তারপর বেশ গলা ছেড়ে দিল। পর পর তিনখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত না থেমে শেষ করার পর বলল, বিনা নেশায় চেঁচালে বড় গলা ব্যথা করে। গতবার আমরা সবাই মিলে কী গান গাইতাম রে?

কী জানি, আমার মনে নেই। আমি একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে একটা টান দিতে না-দিতেই সেটা হাত ফসকে জলে পড়ে গেল।

তাপস জানে। তাপস ওটা খুব গাইত। গেল কোথায় ছোকরা? একটু এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে পরীক্ষিৎ বলল, কাণ্ডটা দ্যাখ! সাধে কি আমি রাগি।

গায়ত্রী গিয়েছিল মন্দিরে। ফিরে এসে ব্রিজের ও-পাশে অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়েছে। অনিমেষ চলে গেছে ওর কাছে, দু'জনে নিবিষ্ট হয়ে কী যেন বলছে।

দেখেছিস, একটু চান্স পেয়েই জোড়া মেরে গেছে। এই জন্যই (অশ্লীল) আমি (ছাপার অযোগ্য, ছাপার অযোগ্য) একটু অন্ধকার পেলেই (অশ্লীল, ছাপার অযোগ্য)।

যাক গে, ছেড়ে দে। নতুন বিয়ে করেছে, একেবারে একা থাকতে পারছে না আমাদের উপদ্রবে।

শুনেছিস, কাল অনিমেষ কী বলল। একদম লিখতে পারছে না, ভাষা নেই ফাসা নেই, যত (অশ্লীল, ছাপার অযোগ্য)। বিয়ে করে মজে গেছে। ওই বলল না, শান্তি পেয়েছে। আমি ওর শান্তির বারোটা বাজাতে চাই। আজই —।

তোর নতুন বইটা কবে বেরুচ্ছে, নাটকটা শেষ করলি না?

কার জন্য লিখব? তুই লিখিস না আজকাল। তাপসটা লেখে ব্লাডি প্রোজ। এক অনিমেষ — তা-ও বিয়ে করে শান্তি পেয়েছে। দাঁড়া ওর শান্তি ভেঙে দিচ্ছি। ওকে বলে দিই, যাকে নিয়ে অত সোহাগ করছ, সেই তোমার বউয়ের (ছাপার অযোগ্য, ছাপার অযোগ্য)।

ও-সব চালাকি ছাড় অবিনাশ মিত্তির! আমি সোজা কথা বলব। পরীক্ষিৎ হাতের সিগারেটে জোর টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে ভর দিয়ে পাঁচিলের উপর দোল খেল।

পড়ে যাবি, পরীক্ষিৎ, ঠিক হয়ে বোস। আমি দেখতে পেলুম সেই অজগরের মতো নীল ধোঁয়ার কুণ্ডুলী ওর মাথার চারপাশে। লম্বা চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে। হঠাৎ মনে হল ওর মাথা দিয়ে দুটো শিং বেরুচ্ছে। গায়ত্রী মেয়েটা খুব ভাল, আমি বললাম, ওরা দু'জনেই দু'জনকে খুব ভালবাসে।

আমার মুখের দিকে গম্ভীরভাবে তাকাল পরীক্ষিৎ। বলল, আর তুই?

আমি হোপলেস, আমার দ্বারা কিছু হবে না।

আমার নাটকটার জন্য কাঁচা মাল দরকার। আমার অনিমেষকে চাই।

এ খুব ছেঁদো কথা হল। তোর কি মডেল লাগে লেখার জন্য?

ওকে নিয়ে লিখব কে বলেছে। ওর গণ্ডগোল নিয়ে লিখব। গল্প তো বানাতে পারি না রে, তাহলে তো এত দিনে উপন্যাস-ফুপন্যাস লিখে কেলেঙ্কারি করতাম। অনিমেষকে ঈর্ষা করে লিখতে ইচ্ছে হয়।

শেক্সপিয়ার কিংবা ইয়োনেস্কোকে ঈর্ষা কর না!

যাঃ, বাজে বকিস না। তুই আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করছিস। কিন্তু এরই-বা কী মানে হয়। বন্ধুরা রইল এক দিকে, আর বউয়ের সঙ্গে গুজুর গুজুর। শোন অবিনাশ, আমিও ওর সত্যিকারের বন্ধু। আমি ওর উপকারই করতে চাই। একটা মেয়ের কাছে ডুবে যেতে দিতে পারি না।

পরীক্ষিৎ, কাল ক'টার ট্রেনে ফিরব রে আমরা?

জানি না। অনিমেষকে ডাকি!

কলকাতায় ফিরে তোর নাটকটা স্টেজে করব। হল ভাড়া নিয়ে।

তুই আমাকে ভোলাতে চাইছিস? না, আমি অনিমেষকে ডেকে বলতে চাই, আজই এখনই, অনিমেষ —।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, তুই অনিমেষকে কী বলবি? যত সব পাগলামি!

পরীক্ষিৎ গাঢ় চোখে আমার দিকে তাকাল, একটাও কথা না বলে নিঃশব্দে হাসতে লাগল। কী বিশ্রি ওর সেই হাসি। সেই হাসির মধ্যেও নীল ধোঁয়া। আমি অস্বস্তিকর ভাবে ওর হাসির সঙ্গে যোগ দিতে চাইলাম। আমার তখন হাসি পেল না।

হঠাৎ পরীক্ষিৎ বিষম জোরে অনিমেষের নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠল। আমি থতমত খেয়ে বললাম, পরীক্ষিৎ, আগুনটা দে তো! বলে, ওর মুখের সিগারেট থেকে আমার সিগারেট ধরিয়ে নেবার জন্য এগিয়ে গিয়ে ওর ওপর ঝুঁকে পড়লাম। তারপর ডান হাত দিয়ে ওর পেটে একটা আলতো ধাক্কা দিতেই হাত দুটো ওপরে তুলে বাতাস ধরার চেষ্টা করে পরীক্ষিৎ উলটে পড়ে গেল। নিচের নদীর

জলে ঝুপ করে একটা শব্দ হল। আর শোনা গেল, পরীক্ষিতের আর্তনাদ নয়, জারুল গাছের একটা রাত-পাখির কর্কশ ডাক। গায়ত্রী আর অনিমেষ ছুটে এল চিৎকার করে।

পরমুহূর্তেই বিষম অনুশোচনায় আমার মন ভরে গেল। ছিঃ, কেন পরীক্ষিৎকে আমি জলে ফেলে দিলাম! খুবই বোকার মতো কাজ হল এটা। কোনও মানে হয় না। ও খুবই ভাল সাঁতার জানে, নিশ্চয়ই বেঁচে যাবে। এর বদলে ওকে চলন্ত ট্রেন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেই একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত।

বিমলেন্দু

ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে দেখলাম, অত্যন্ত গম্ভীর এবং নিবিষ্ট চোখ মুখে তাপস, অবিনাশ আর হেমকান্তি, সামনে তাস ছড়ানো। তিন জনে বসে আছে অথচ চার জনের তাস ভাগ করা। যেন চতুর্থ লোকের প্রতীক্ষায় ছিল, আমাকে দেখেই বলে উঠল, আয়, তাস তোল।

আমি তাস খেলতে জানি না।

শিখে নিবি, বসে পড়, অবিনাশ বলল।

না, ও-সব আমার ভাল লাগে না।

ও! অবিনাশ চোখ না তুলেই বলল। ওদের খেলা থামল না। অবিনাশ বলল, ফাইভ নো ট্রামপস্‌। চার জনের তাস বিছিয়েও যে তিন জনে ব্রিজ খেলা যায় আমি জানতাম না। এখন আমাকে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে হবে, অত্যন্ত বিরক্তিকর আমি উঠে গিয়ে রেডিয়োর চাবি ঘোরালাম, যুদ্ধের বোমা বর্ষণের মতো আওয়াজ ও মাঝে দ্রুত মিলিয়ে যাওয়া গানের লাইন। আঃ, বিরক্ত করিস না, তাপস বলল, দে, একটা সিগারেট দে! আমি উঠে পাশের ঘরে গেলাম। মায়া দাঁত দিয়ে কালো ফিতে চেপে ধরে চুল বাঁধছে আয়নার সামনে। ফর্সা গালে ফিতেটা। শায়া ও ব্লাউজ পরা, ভাঁজ করা শাড়িটা হাঁটুর উপর। আমাকে দেখে চমকে উঠল না, লজ্জা পেয়ে শাড়িটা তাড়াতাড়ি তুলে বুকে জড়াল না, ঠাণ্ডা চোখে আমার দিকে চেয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

দিদি কোথায়, মায়া?

বাথরুমে।

তোমার কাছে একটা খালি খাম আছে? একটি চিঠি পোস্ট করব।

না নেই। আপনি পাশের ঘরে বসুন। মায়া তখনও আমার চোখের দিকে চেয়ে ছিল, অত্যন্ত হিম সেই চেয়ে থাকা।

বাড়িতে আর কেউ নেই বুঝি? পিসিমা?

না। আপনি পাশের ঘরে বসুন। দিদি যাচ্ছে।

মায়া, তুমি আমাকে একটা রুমাল দেবে বলেছিলে।

মায়া ঘুরে দ্রুত চলে গেল ড্রেসিং টেবিলের সামনে, ড্রয়ার খুলে একটা ফর্সা ও সোনালি কাজ করা রুমাল এনে বলল, এই নিন, পাশের ঘরে বসুন।

আর কেউ আমাকে দেখেনি, তবু বুঝতে পারলাম, কী বোকা ও নির্লজ্জের মতো আমি রুমালটা চেয়েছিলাম। আর একটু দাঁড়াবার জন্য। কিন্তু মায়ার সঙ্গে আমি কিছুতেই কথা বলতেই পারি না, ভয় পাই। এক দিন ঘুমন্ত অবস্থায় মায়াকে ভাল করে দেখব, মনে মনে ভাবলাম।

ও-ঘরে কী কারণে ওরা চেঁচিয়ে উঠতেই মনে হল, তাস খেলা শেষ হয়েছে। ফিরে এলাম। অবিনাশ পয়সা গুনছে। হেমকান্তি ওর লম্বা মুখ তুলে আমাকে কিছু যেন বলতে চাইল। পরক্ষণেই আবার মুখ নিচু করল সতরঞ্চির দিকে। ওর স্বভাবই এই। মুখ দিয়ে ক'টা ওর কথা বের হয়, আঙুলে গোনা যায়। কোন কথাটা কী-ভাবে বলবে, ও হয়তো ভেবে পায় না। আমি বললাম, আজ কীসের মিটিং রে? হঠাৎ ফোন করে আসতে বললি কেন?

আজ মাংস খাব। পয়সা নেই। অবিনাশ বলল, তুই তো ইয়া লাশ আছিস, তোর উরু থেকে সের খানেক মাংস দে না, মশলা দিয়ে রাঁধি। মানুষের মাংস কেমন খেতে একটু চেখে দেখি।

যদি খেতেই হয়, তবে আমার কেন, কোনও সুন্দরী মেয়ের মাংস খা না।

দুর ব্লকহেড! ওদের মাংস খেতে হয় চেটে চেটে কিংবা চুষে চুষে। চিবিয়ে গিলে ফেললে তো একেবারেই ফুরিয়ে গেল।

মায়া ও ছায়াদি দুই বোন ঘরে এল। ছায়াদি সদ্য স্নান করে এসেছে। ওর চুল, চোখের পাতা, চিবুক, ভুরু এখনও ভিজে। বলল, চা খাবে? তোমরা যে আজ আসবে তা আগে জানাবে তো?

কেন, তাহলে কি চায়ের বদলে মদ খাওয়াতিস? তাপস বলল।

ধেৎ! তা নয়, মায়া যে দু'খানা সিনেমার টিকিট কেটে এনেছে।

তা মায়া যাক না অন্য কারুকে সঙ্গে নিয়ে, তুমি থাকো।

কে যাবে ওর সঙ্গে? তোমরা যাবে কেউ?

কেন, এত বয়স হল, কারুর সঙ্গে প্রেম-ট্রেম করে না?

করে, আমার সঙ্গে। অবিনাশ গম্ভীর গলায় জানাল।

আমার ভীষণ মাথা ধরেছে, আপনারা কোনও ওষুধ —? হঠাৎ হেমকান্তি বলে উঠল, বড় যন্ত্রণা করে, রোজ সন্ধে হলেই —।

অ্যাসপ্রো আছে, এনে দেব?

না, ওতে কমে না। অন্য কোনও...আপনারা.. ওষুধ।

আমি জানি, হেলান দেওয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে তাপস বলল, নেচার ট্রিটমেন্ট। কিন্তু একটু শক্ত, পারবেন?

না না, ও পারবে না, আমি জানালাম। তাপসের চোখে বদমাইসি।

কেন পারবে না? শুনুন, আপনি উঠে দাঁড়ান, ডান হাত দিয়ে বাঁ-কান ও বাঁ-হাত দিয়ে ডান কান ধরে ভাল করে ঈশ্বরকে প্রণাম করুন, তারপর মাথাটা জোর করে ঘুরিয়ে নিজের ঘাড়ে ফুঁ দিন, পারবেন তো? তারপর একটা বেগুনি রঙের পাখির কথা ভেবে উলটো মুখ করে সিঁড়ি গুণে গুণে নেমে যান, শেষ ধাপটায় একবার বসুন, আর ঘাড়ে ফুঁ দিন। এবার রাস্তার পানের দোকান থেকে দু'টো পান কিনে নিজে একটা খেয়ে বাকিটা প্রথম যে-মেয়ে ভিখারি দেখবেন, তাকে দান করুন। নির্ঘাৎ সেরে যাবে, সারতে বাধ্য।

মায়া ফুলে ফুলে হাসছিল। হেমকান্তি নিচু দিকে মুখ রেখেই বলল, ওঃ, আচ্ছা? এমন ভাবে বলল, যেন অব্যর্থ বলে বিশ্বাস করেছে, কিন্তু আজ নয় কাল পরীক্ষা করে দেখবে।

যাঃ, কেন ওকে বিরক্ত করছিস তাপস? সত্যি, মাথা ধরলে ভারি কষ্ট হয়, ছায়াদি বলল, আপনি বরং মায়ার সঙ্গে সিনেমায় যান না। সেরে যেতে পারে।

হেমকান্তি কোনও উত্তর দিল না। ওর লম্বা মুখখানা এমন ভাবে তুলে ধরল, যেন ওকে মৃত্যুদণ্ড দিলেও ভাল হত এর বদলে।

না না, এক জন অসুস্থ লোককে কষ্ট দেওযাব কোনও মানে হয না, মাযা জানাল।

আমি যাব? আমি নিজেই ব্যগ্র গলায বললাম।

হ্যাঁ, আপনি আব দিদি যান! মাযা সেই ঠাণ্ডা চোখ আমাব দিকে তুলেছে।

তাব চেযে এক কাজ কবা যাক না। অবিনাশ বলল, আমাদেব সকলেব নামগুলো নিযে লটাবি হোক। যাব নাম উঠবে সেই যাবে।

এই সময বেশ জুতোব শব্দ কবে পবীক্ষিৎ ঢুকল। মাথায ব্যান্ডেজ বাঁধা। অনিমেষদেব ওখানে বেডাতে গিযে ও নাকি নদীতে পড়ে গিযেছিল ব্রিজ থেকে। পবীক্ষিতেব চোখ অসম্ভব লাল। অবিনাশ টুকবো টুকবো কাগজে আমাদেব নামগুলো লিখে গুলি পাকাচ্ছিল। জিজ্ঞেস কবল, তোব নাম দেব? তুই যাবি পবীক্ষিৎ, মাযাব সঙ্গে সিনেমায?

হোযাই নট? কী ছবি? বাংলা?

হ্যাঁ, ছাযাদি বলল।

খাবাপ নয। বই খাবাপ হলেও মাযাও তো থাকবেই পাশে।

অবিনাশ কাগজেব গুলিগুলো হাতে ঝেঁকে ছডিযে দিল সতবঞ্চিতে। বলল, তুমি তোলো মাযা।

আমি না, দিদি তুলুক।

না, দিদি কেন? তুমিই বেছে নাও না, কে যাবে তোমাব সঙ্গে, অনেকটা স্বযম্বব সভাব স্বাদ পাওযা যাবে। জানি তো আমাকেই বেছে নেবে, সেটা মুখ ফুটে বলতে অত লজ্জা কীসেব?

কক্ষনো না, মাযা হাসতে হাসতে এগিযে এল। আমাব ইচ্ছে পবীক্ষিৎদাব সঙ্গে যাওযাব। দেখবেন, ওব নামই উঠবে। মাযা তুলতে যাচ্ছিল, অবিনাশ ওব হাতখানা চেপে ধবে বলল, কিন্তু শোনো মাযা, যাব নাম উঠবে তাব সঙ্গেই কিন্তু যেতে হবে, এমনকী হেমকান্তিব নাম উঠলেও।

আমি? অসহায চোখে হেমকান্তি।

মাযা একটা কাগজেব গুলি তুলে একা একা দেখে বলল, পবীক্ষিৎদাব নাম! ও ঠোঁট কামডে হাসি চাপছে।

দেখি দেখি, বলে তাডাতাডি কবে ছাযাদি আব আমি কাগজটা দেখলাম। না, অবিনাশেব —

জানতাম! অবিনাশ হেসে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মোজা পবতে শুরু কবে দেয।

মাযা হাসতে হাসতে বলল, ওঃ কী গবজ! কী হ্যাংলা আপনি বাবা!

পবীক্ষিৎ একটা লম্বা চুরুট ধবিযেছে। মুচকি হেসে অবিনাশেব দিকে তাকিযে বলল, তুই চললি, তোব সঙ্গে যে কযেকটা কথা ছিল। ফিবছিস তো এখানেই?

ফিবতে পাবি, কিন্তু যদি মাযা দেবী শো'ব পব আমাব সঙ্গে মযদানে ঘুবতে কিংবা বেস্টুবেন্টে বসতে বাজি হন। তবে দেবি হবে।

খববদাব মাযা, কোথাও যাবি না, মাযাব অভিভাবিকা বলে।

মাযা বলল, আপনি কিন্তু হলেব মধ্যে বসে ইযার্কি কবতে পাববেন না। নিজে সাহিত্যিক বলে, ইচ্ছে কবে চেঁচিযে চেঁচিযে মন্তব্য কববেন, ও-সব অহঙ্কাব চলবে না।

পাগল হযেছ, অবিনাশ বলল, তোমাব কাছে আমি অহঙ্কাব কবব! সুন্দবীব পাশে আবাব সাহিত্যিকেব কোনও মূল্য আছে নাকি! বিমলেন্দু, দশটা টাকা দে তো?

আমাব কাছে নেই।

নেই কী! খববেব কাগজে লিখে তো খুব টাকা পিটছিস। কিছু ছাড।

না বে, সঙ্গে কিছু নেই।

নেই? যাঃ শালা, শ্মশানের পাশে গিয়ে ব্যবসা কর।

এই নে। পরীক্ষিৎ চুরুটটা দাঁতে চেপে পকেট থেকে চামড়ার ব্যাগ বার করল। দুটো দশ টাক· নোট এগিয়ে গিয়ে বলল, আসবার সময় একটা পাঁইট আনিস।

তুই তো যথেষ্ট মেরে এসেছিস। আবার কেন?

বাড়ি নিয়ে যাব। রাত্তিরে দরকার।

অবিনাশ মায়ার বাহু ছুঁয়ে বলল, চলো যাই। ছায়া, এদের একটু সামলে টামলে রেখো। ওঃ, একট কথা বলিনি, অবিনাশ আবার ঘুরে দাঁড়াল, তারপর না-হাসার ভঙ্গি করে বলল, কাগজের গোল্লাগুলো খুলে দেখ, সবগুলোতেই আমার নাম লেখা। মায়া যেটা তুলত, সেটাই আমার। গুড নাইট, বয়েজ।

আমাদের সকলের হাসি থামলে তাপস বলল, হারামজাদা!

আমি খুব অপমানিত বোধ করছিলাম। মায়ার জন্য নয়। মায়ার সঙ্গে যাবার আন্তরিক ইচ্ছে হয়েছিল আমার, সে-জন্য। মায়ার সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করিনি, বরং ওকে সাহায্য করেছি অনেক, পরীক্ষার সময়। আসলে মায়া আমাকে ঘৃণা করে ছায়াদির জন্য। ছায়াদি এমন ভাব দেখায়, যেন আমাকে কত ভালবাসে। বেচারির এ পর্যন্ত বিয়ে তো হলই না, প্রেমিকও নেই। এতটা বয়স পর্যন্ত কুমারী। ছায়াদি যদি অনুরোধ করে, তবে অনায়াসেই ওকে বিয়ে করতে পারি আমি। শ্বেতি মোটেই ছোঁয়াচে রোগ নয়, তাছাড়া মেয়েটা বড় শান্ত, অনেকটা মায়ের মতো, আমার বড় শান্তি লাগে ছায়াদির কাছে। শুধু ওর ওই ন্যাকা পদ্যগুলো লেখার অভ্যেস ছাড়া দরকার। মায়া আমাকে ভুল ভেবেছে, আসলে যে, অবিনাশের সঙ্গে ওর এত মাখামাখি, ওই অবিনাশটাই লম্পট, বিবেকহীন, বদমাশ। ও-ই মজা লুটে পালাবে। মায়াকে নিয়ে ও শেষ পর্যন্ত কী করবে, কী জানি! ভাবতেও ভয় হয়। মায়ার ও-রকম ঝরনার জলে ধোওয়া শরীর। লেখাব জন্য জীবনটা কলুষিত কবতেই হবে? তাপস-পরীক্ষিৎ-অবিনাশদের তাই ধারণা। ওদের কারুর অসুখ হলে কপালের ওপর কে ঠাণ্ডা হাত রাখবে জানি না।

আমাদের বাড়ির ছাদে কয়েকটা সুন্দর গোলাপ ফুলের চারা টবে বসানো। এক দিন চা খেতে খেতে গাজিপুরের লালগোলাপটা দেখাচ্ছিলাম ওদের। অনেক চেষ্টার পব একটা গাছে সে-দিন প্রথম ফুল ফুটেছে। হয়তো আমার গলায় একটু বেশি উচ্ছ্বাস লেগেছিল, পরীক্ষিৎ হঠাৎ সেই টবটা আছড়ে ভেঙে দিল। আধুনিকতা সম্বন্ধে এ-রকম ছেলেমানুষি ধারণা ওদের! জানে না, একশো বছর আগে ফুলকে অবহেলা করে এখন আবার ফুলের স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে। অবিনাশটা আবার ফুল খায়। গোলাপ, রজনীগন্ধা, সূর্যমুখী — যেখানে যে ফুল দেখে — লোকের বাড়ির ফুলদানিতে বা উপহারে, বাগানে, ও অমনি ছুটে যায়, 'ফুল আমি বড্ড ভালবাসি' — বলে পাপড়িগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে চিবিয়ে খায়। আমি এক দিন সরল ভাবে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুই ফুল খাস কেন রে? দ্যাটস্ দা আন্‌লি ওয়ে অভ অ্যাপ্রিসিয়েসান! কথাটা খুব গর্বের সঙ্গে বলে, যেন ভবিষ্যৎকাল ওর এই বাণীটি মনে রাখবে।

পরীক্ষিৎ বিশাল কাঁধের হাড় দুটো উঁচু করে চেয়ারে উঠে বসল। ছায়া, চা খাওয়াচ্ছ না কেন? যাও, চা-খাবার টাবার নিয়ে এসো। ছায়াদি বেরিয়ে যেতেই তাপসের দিকে ফিরে বলল, তোদের একটা কথা আছে, ভুলে যাবার আগেই বলি। দিন কয়েক ও-পাড়ার দিকে যাসনি কিন্তু!

কেন?

পরশু একটা খুন হয়ে গেছে ও-পাড়ায়। পুলিশে ছেয়ে গেছে। দিন কয়েক —।

তুই ও-দিকে গিয়েছিলি কেন? তোর হঠাৎ একা...।

অবিনাশকে খুঁজতে খুঁজতে। তারপর কী রুক্ষু ঝঞ্ঝাট। এক মক্কেল পুলিশ তো আমাকে ধরে ফেলে আর কী! আমি দৌড়ে গিয়ে লক্ষ্মীর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। সে-বুড়িটা তো আমাকে দেখেই আঁতকে উঠেছে। আমি বললাম, চেঁচিও না মা লক্ষ্মী, চোর-ডাকাত নই, পুলিশের হামলা কমলেই বেরিয়ে যাব। ও সেই ক্যানকেনে গলায় বলল, আজ এখানে এসেছ কেন মরতে?

তাপস জিজ্ঞেস করল, কোন বাড়িতে খুন হয়েছে?

প্রসন্নর বাড়িতে। লক্ষ্মীর কাছে সব শুনলাম। প্রসন্নর বাড়ির তিন তলায় মল্লিকার ঘরের ঠিক পাশের ঘরটা অন্ধকার থাকত, তোর মনে আছে? ও-ঘরে হাসিনা বলে একটা মেয়ের কাছে আসত গোলক গুণ্ডা। সে নাকি মাস্তান, ও-পাড়ার সবাই তাকে চেনে। প্রসন্ন বাড়িওয়ালা এক দিন বলল, তুমি আর এসো না বাবা, তোমার ভয়ে আমার বাড়িতে লোক আসে না। চোপ শুয়ার! বলে গোলক তাকে ধমকে দিয়েছে। তখন প্রসন্ন হাসিনাকে বলল, তুই ওকে ঢুকতে দিবি না ঘরে। হাসিনা বলল, ও-মরদকে আমার সাধ্য কী, না বলি। জোর করে ঢুকবে। তাছাড়া টাকা-পয়সা ঠিক দিচ্ছে, এ বাড়িতে ও আসছে-যাচ্ছে ভদ্দরলোকের মতো। রুপিয়াও জায়দা দিচ্ছে। কোনওদিন তো এখানে হল্লা করেনি। করেনি, করতে কতক্ষণ। প্রসন্ন হেঁকেছে, তারপর দিয়েছে হাসিনার ঘরের আলোর লাইন কেটে। গোলক তাতেও কোনও আপত্তি করেনি। রোজ আসবার সময় মোমবাতি কিনে আনত। কাল মল্লিকার ঘরে সন্ধেবেলা তিনটে বাবু এসেছিল। তারা আর এক জন চেয়েছে। হাসিনা, তখন বাথরুম থেকে খালি গায় বেরুচ্ছিল, তাকে দেখেই বাবুদের পছন্দ। কিন্তু হাসিনা রাজি নয়, ওটা গোলকের আসবার দিন। তখন বাড়িওয়ালা জোর করে দুটো লোককে ঢুকিয়ে দিল ওর ঘরে। খানিকক্ষণ বাদে গোলক হাজির হতেই লেগে গেল।

পরীক্ষিৎ চুরুট ধরাবার জন্য দেশলাই জ্বালাতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, গোলক ধরা পড়ল?

মাথা খারাপ! দুটো লোক আর একটা মেয়েকে ছুরি মেরে সে হাওয়া। আমাকে লক্ষ্মী বলল, গোলকের কিন্তু দোষ নেই বাপু, যাই বলো। তার যা ব্যাভার ছিল, বাবুদের মাথায় হাগে। কেন তাকে ঘাটানো! সে তো নিজেকে বাঁচাবার জন্যই দুটোকে ছুরি চালিয়েছে। দেখলাম, গোলকের ওপর ওদের খুব ভক্তি। ওদের হিরো। আমি প্রসন্নর বাড়ি খুন শুনেই ভয় পেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম কাছাকাছি। তাতেই তো পুলিশের হাতে পড়ছিলাম প্রায়! লোক দুটোর চেহারার ডেসক্রিপশন শুনেই বুঝতে পারলাম অবিনাশ নয়, তাছাড়া অবিনাশ খুন হবার ছেলেই নয়।

আর মেয়েটা কে?

মল্লিকা! পরীক্ষিৎ অন্য মনস্ক গলায় বলল।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে রইলাম। মল্লিকার নাম শুনে ওরা বিষণ্ণ হয়ে গেছে মনে হয়। আমিও মল্লিকাকে চিনতাম। এক দিন ওদের সঙ্গে গিয়েছিলাম। ওরা জোর করে টেনে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে।

স্যাঁতসেঁতে সিঁড়ি দিয়ে তিন তলায় উঠে আলো ঝলমল পর পর ঘর। মল্লিকা মেয়েটার ঘর ছিল চমৎকার সাজানো-গোছানো। রেডিয়োতে ইংরিজি সুর বাজছিল। মা-কালি আর সিগারেট কোম্পানির ক্যালেন্ডারে ন্যাংটো মেয়ের ছবি পাশাপাশি দেয়ালে এবং অশ্বারূঢ় শিবাজি। এ ছাড়া কয়েকটি নকল টিকটিকি, আরশোলা, কাঁকড়াবিছে এখানে-সেখানে ঝুলছে। বিরাট ভাসে এক ঝাড় লাল গোলাপ, অমন সাটিনের মতো ঝলমলে লাল গোলাপ আগে কখনও দেখিনি। মেয়েটা একেবারে পাগলাটে ধরনের ফর্সা, টান করে চুল বাঁধা, অল্প নেশার ঘোরে দুলছিল। বলেছিল, তোমরা আবার কেন এসেছ? মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে ইংরেজিতে প্রাইভেট কথা বলবে, একদম দেখতে পারি না। ওই লোকটা আবার বই লেখে। তাপসের দিকে আঙুল দেখিয়ে, ও-সব লেখক-টেখক আমার সয় না,

মাইরি। অবিনাশ ততক্ষণে ওর বিছানায় টান টান শুয়ে পড়ে হুকুম করেছে, রেডিয়োটা বন্ধ করে দে মল্লিকা, পাখাটা খোল না! তারপর বলেছে, এই নে সিগারেট খাবি? ভাল সিগারেট আছে আজ। তাপসের সঙ্গে কী নিয়ে যেন কথা কাটাকাটি হল মেয়েটার। তাপস বলল, নাও, টাকা নাও, একটা বোতল আনাও। দু'ঢোঁক গিললেই মেজাজ শরিফ হয়ে যাবে।

না। আজ ভাগো। আমার শরীর ভাল নয়।

তাতে কী হয়েছে, না হয় একটু গল্প-গুজবই করব আজ।

না, হবে না। বেরোও বলছি! মেয়েটা খুবই রেগে গেছে কী জানি।

আচ্ছা বাবা, তোমার টাকা অ্যাডভান্স দিচ্ছি।

টাকা দেখাচ্ছ মল্লিকা মিত্তিরকে? কত টাকা, দেখি।

তাপস কুড়িটা টাকা এগিয়ে দিল। হাসতে হাসতে মেয়েটা গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে ঘুরে টলে গিয়ে দেয়াল ধরে সামলাতে সামলাতে কাশতে লাগল।

আচ্ছা, আর পাঁচ টাকা বেশি নাও।

পাঁচ টাকা, আবার পাঁচ টাকা! সরু গলায় বিশ্রীভাবে হেসে উঠল মল্লিকা।

তাপস চটে উঠল এবার। তোমার ওই রূপের জন্য আবার কত চাও?

কী! মল্লিকা বাঘিনীর মতো ফুঁসে ওঠে তাপসের দিকে। ঘন নিশ্বাসে ওর বুক ফুলে ফুলে উঠছে। আস্তে আস্তে বলল, রূপের দাম? রূপ কি কিস্মৎ পাঁচ ঘা জুতি! যাবার সময় পাঁচ ঘা জুতো মেরে যেও বলে দশ টাকার নোট দু'খানা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলল। আমি চুপ করে এই নাটক দেখছিলাম। অবিনাশ উঠে বলল, কী ঝঞ্ঝাট করছ মাইরি। দাও, এক গ্লাস জল দাও।

জল! মল্লিকা ছুটে গিয়ে খাটের তলা থেকে কাচের কুঁজোটা টেনে বের করল, তারপর হঠাৎ দুম করে কুঁজোটা ফেলে দিল মাটিতে। অবিনাশ আর কোনও কথাবার্তা না বলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল যাই, মাসির আজ মান হয়েছে! আমরা বেরিয়ে আসার সময় মল্লিকা বলল, দেখো, যেন কা ়র পা কাটে না কাচে। আমার ঘরে রক্ত-ফক্ত চলবে না।

আমি বললাম, খবরটা শুনলে অবিনাশ খুবই দুঃখ পাবে। অবিনাশের ওপর মেয়েটার সত্যিই টান ছিল।

না, পাবে না। তাপস বলল।

সত্যিই পাবে না। পরীক্ষিৎ বলে, ওই হারামজাদার বুকের মধ্যে দয়া মায়া কিছুই নেই। ওর আত্মাই নেই বোধহয়।

অবিনাশও তোর সম্বন্ধে এই কথা বলে। আমি বললাম।

যা যা! আমার বুকে ভালবাসা আছে, তাই আমি কবিতা লিখি। অবিনাশ যা লিখেছে, ওগুলো আবার লেখা নাকি? ওর দ্বারা কিছু হবে না।

তোদের ভালবাসা কী-রকম জানিস। একটা পিঁপড়ে মরলে তোদের প্রাণ কাঁদে, কিন্তু বাড়িতে তোর মা খেতে পেল কি না সে-সম্বন্ধে গ্রাহ্য নেই!

তাপস আমাকে বলল, শালা, তোর কথার মধ্যে বক্তৃতার ঢঙ এসে যায় কেন রে?

আমি চুপ করে গেলাম। পরীক্ষিৎ উদাস ভাবে বলল, ছেলেবেলায় মা মারা গেছে। মায়ের মুখটাও আমার ভাল করে মনে পড়ে না।

ছায়াদি ট্রেতে করে গরম নিমকি ভাজা আর চা নিয়ে এল। এতক্ষণ লাগে তোমার চা বানাতে? পরীক্ষিৎ চমকে উঠল। তাপস বলল, তোর কবিতাগুলো কখন শোনাবি?

চা খাওযাব পব না হয —।

না, চা খেতে খেতেই শোনা যাক।

ছাযাদি নির্লজ্জেব মতো বাঁধানো খাতাখানা এনে সতবঞ্চিব এক পাশে বসল।

খাবাপ লাগলে স্পষ্ট কবে বলবে কিন্তু, হেমকান্তিবাবু, আপনাব কি খুবই শবীব খাবাপ লাগছে?

না না, হেমকান্তি মুখ গুঁজে বসে ছিল। এবাব মাথা তুলল।

ছাযাদি পাতাব পব পাতা পড়ে যেতে লাগল। আমি একদম মনোযোগ দিলাম না সে-দিকে। সব ছন্দ-মিল দেওযা ট্র্যাশ। পবীক্ষিৎ, তাপসও নিশ্চিত শুনছে না। অন্য কিছু ভাবছে। ছাযাদিব কী যে এই দুর্বলতা! বাশি বাশি লিখে চলেছে এই সব, ছাপাও হয নানা জাযগায, তবু তরুণ সাহিত্যিকদেব শোনাবাব কী লোভ! মাঝে মাঝে ওদেব পিসিমা বাড়ি থাকে না, বা মনে হয ছাযাদিই ওঁকে কোথাও পাঠিযে দেয। তখন এ বাড়িতে দলেবলে আড্ডা। পিসিমা ভাবি ঠাণ্ডা মানুষটি, কাঁচা বেলেব ভেতবেব মতো গাযেব বঙ, সব সমযেই হাসিমুখ। এক দিন শেখব এসে বমি কবেছিল, পিসিমা নিজেব হাতে পবিষ্কাব কবেছিলেন। আমাদেব বাড়িতে মা-পিসিমাবা এ সব কবাব কথা কখনও ভাবতে পাবেন? তা নয, পিসিমা এদেব অভিভাবিকা তো নয, গলগ্রহ। বুদ্ধিমতী মহিলাব মতো তাই মানিযে নিচ্ছেন। আমাদেব পক্ষে অবশ্য ভালই, চমৎকাব আড্ডাব জাযগা। তাছাড়া দু'টি মেযে উপস্থিত থাকলে জমজমাট হয। একমাত্র মুশকিল, মাঝে মাঝে ছাযাদিব লেখা নিযে আলোচনা কবতে হয। তবে মেযেদেব স্তুতি কবাটা ঠিক মিথ্যে নয, চর্চা বাখা ভাল। দুপুবে তাপস যখন ফোন কবল তখনই বুঝতে পাবলাম, কপালে আজ কিছু বাজে পদ্য শোনাব দুঃখ আছে। মেযেব লেখা কবিতা — এ যেন গোল বোতলে চৌকো কর্ক মাইবি, অবিনাশ বলে। অনেকটা ঠিকই বলে। ও ধড়িবাজ ছেলে, কী চমৎকাব কেটে পড়ল মাযাকে নিযে। মাযাকে আমি অনেক দিন থেকে চিনি। কিশোবী অবস্থা থেকে আস্তে আস্তে ওকে বড় হযে উঠতে দেখলাম। ওই ওই সুকুমাব, স্বর্গীয শবীব অবিনাশ কবে নষ্ট কবে দেবে, কে জানে!

আমি বাথরুমে গিযেছিলাম, দেখলাম ছাযাদিও বেবিযে এসেছে। বলল, একটা কথা আছে তোমাব সঙ্গে।

বলো।

এখানে দাঁড়িযে বলব! না, চলো ওপবেব ঘবে যাই।

ওপবেব ঘবেব দবজা ঠেলে খোলাব আগেই বলল, না থাক, চলো ছাদে যাই। সুন্দব হাওযা দিচ্ছে। অনেকগুলো টবে সাদা ফুলগুলো ফুটে উঠেছে। তিন চাব বকমেব গন্ধ আমাব নাকে লাগছে। ছোট একটা ঘব আছে ছাদে। চাবদিকে চমৎকাব নির্জন। ছাযাদিকে কী-বকম বহস্যময দেখাচ্ছে। আমাকে কী বলতে চায! আমাকে দিযে কোনও কাজ কবাবাব মতলব নাকি? আমি এতক্ষণে ওকে নিশ্চযই একটা চুমু খেযে খুশি কবতাম, কিন্তু মাযাব ব্যবহাবে মনটা কী-বকম বিষিযে আছে। আমাকে ওব ভাল লাগতে না পাবে, কিন্তু আমাকে দেখে ওব ব্রেসিযাব-পবা বুকে শাড়িটা অন্তত জড়িযে নিতে পাবত।

চলো, এই কাঠেব সিঁড়িটা দিযে চিলেছাদে উঠবে? হু-হু কবে হাওযা ধাক্কা মাববে।

কী ব্যাপাব, মনে হচ্ছে তোমাব কথাটা বলাব জন্য যেন পৃথিবীব সব চেযে উঁচু জাযগা দবকাব?

হ্যাঁ, সে-কথা স্বর্গে দাঁড়িযে বলা উচিত।

আশা কবি তুমি এখন বলবে না, তুমি আমাকে ভালবাসো?

ছায়াদি থতমত খেয়ে আমার চোখে চোখ রাখল। তারপর খাদে গলার স্বর নামিয়ে বলল, তুমিও বুঝি প্রাণপণে হৃদয়হীন আধুনিক হবার চেষ্টা করছ বিমলেন্দু?

না, তা নয়, তুমি বলার আগে আমি বলতে চাই। পৃথিবীর দিন এসে গেলেও — একটি মেয়েকে আমি ভালবাসি, এ-কথা বলায় কোনও আধুনিকতা নেই। ছায়াদি, তুমি আমার কাছে কী চাও?

আমি তোমার কাছে অমৃত চাই।

আমার কাছে অমৃত নেই। সামান্য ভালবাসা আছে।

না, ইয়ার্কি নয় বিমলেন্দু, আমি সত্যি তোমাকে কিছু জানাতে চাই।

আমি ইয়ার্কি করছি না, আমি প্রাণ থেকে বলছি।

ও-কথা থাক। আমি অনেককে জানি, কিন্তু তোমাকেই আমার সব চেয়ে আপন লোক মনে হয়। কারুকে না বলে আমি আর পারছি না বিমলেন্দু, আমি আর বেশি দিন বাঁচব না।

সে তো আমরা কেউ-ই আর বেশি দিন বাঁচব না। মানুষ জাতটাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

না, সে-কথা নয়, অসুখ। আমার লিউকোমিয়া হয়েছে।

লিউকোর্ডামা? ও আবার একটা অসুখ নাকি?

লুইকোডার্মা নয়, লিউকোমিয়া। এ অসুখ হলে মানুষ বাঁচে না। রক্তের শ্বেত কণিকাগুলো নষ্ট হয়ে যায়। যাকে বলে ব্লাড ক্যানসার। এর কোনও চিকিৎসা নেই। চলো, তোমাকে ডাক্তারের রিপোর্ট দেখাচ্ছি। ডাক্তার বলেছে, আমি আর বড় জোর বছর খানেক।

ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলে কেন হঠাৎ?

হঠাৎ নয়, আজ ছ'মাস ধরে যাচ্ছি। তুমি যে-দিন আমার শ্বেতির দাগধরা ঠোঁটে আদর করলে, সে-দিনই মনে হল শ্বেতি দাগটা না সারিয়ে দিলে আমরা চলবে না। কারণ তোমার ঠোঁটে সে-দিনই একটা চাপা অহঙ্কার দেখতে পেয়েছিলাম। অহঙ্কার এই জন্য যে, তোমার মন এত বড়, তুমি ও-সব দাগ-টাগ ঘেন্না করো না, এটা দেখাতে পারলে। কেন, তোমাদের কাছে আমি এ-রকম ছোট হয়ে থাকব? জন্ম থেকে আমার শ্বেতি, তোমার নেই কেন?

তোমার ভুল ধারণা।

আমার সারা শরীর শির শির করে, জ্বালা করে। তাই ডাক্তারের কাছে —।

আজ থাক, এই সন্ধেবেলা ও-সব কথা আমার ভাল লাগে না। চলো নিচে যাই।

না, তোমাকে শুনতেই হবে। আমি আর সময় পাব না।

কী ছেলেমানুষি করছ, চলো নিচে।

না, বিমল, শোনো।

না, নিচে চলো। নিচে। আমার বড় অস্বস্তি লাগছে। আমার তেষ্টা পেয়েছে।

ছায়াদি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি এগিয়ে ওকে স্পর্শ করলাম। ওর সারা শরীরে যেন কোনও স্পন্দন নেই। আমি হাত ধরে নিচে নিয়ে এলাম। যেন ওর পায়ের তলায় চাকা লাগানো, সমস্ত শরীরটা অস্থিহীন, বাসনা বা প্রতিরোধ নেই, নেমে এল নিচে।

রাত্তির সাড়ে দশটার মধ্যেও অবিনাশ ফিরল না মায়াকে নিয়ে। এর মধ্যে আবার গন্ধ শুঁকে শুঁকে হাজির হয়েছে শেখর আর অম্লান। হই হই ও চিৎকারে কান পাতা যায়নি এতক্ষণ। শেখর কাচের গ্লাস ভেঙেছে, অম্লান হাতের তাস ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে জানালা দিয়ে, তাস অদৃশ্য করার ম্যাজিক দেখাবার ভান করে। এখন কী চেহারা হয়েছে ঘরটার। অসংখ্য পোড়া সিগারেটের, চুরুটের ছাই, কাপ উলটে চা পড়েছে বিছানা ও চাদরে, শ'খানেক দেশলাইয়ের কাঠি, তাপসের কানে একটা মরা প্রজাপতি।

ওটার উপর যতবার আমার চোখ পড়েছে আমি চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছি। প্রজাপতি নয়, হয়তো মথ, যেগুলো রাত্রে ওড়ে। হলুদ ও কালোয় মেশানো দুই ডানা মেলে ওটা পড়ে আছে। একটু আগে হঠাৎ উড়তে উড়তে ঘরে এসেছিল। সারা ঘরটা যখন পাক দিচ্ছিল অন্ধের মতো, তখন আমাদের সকলের চোখগুলি ছিল ওর পিছনে। আবার কাকে দল থেকে খসাতে এসেছেরে ওটা! পরীক্ষিৎ বলেছিল, কার হলুদ খামে ঝাঁপিয়ে পড়বে মানিক?

বেশ সুন্দর দেখতে রে পোকাটাকে, যা ছায়ার কপালে গিয়ে বোস। ওর যে বয়স পেরিয়ে গেল।

এই তাপস, আমি তোর চেয়ে বয়সে ছোট জানিস, ছায়াদি চেঁচিয়ে উঠল। হেমকান্তি এক দৃষ্টিতে ওকে দেখছিল। মাথা ধরার জন্যই কিনা, ওর দু'চোখ অসম্ভব লাল, দুই বিস্ফারিত চক্ষুতে প্রজাপতি দেখছিল হেমকান্তি। হঠাৎ ওটা ঝপ করে উড়ে বসল তাপসের গায়ে। এ কী রে, এ কী, উঃ — বলে আরশোলা গায়ে বসলে কোনও কোনও মেয়ের ভঙ্গির মতো ছটফট করে উঠল তাপস। এক ঝটকায় ওটাকে গা থেকে ফেলে দিল। সেইটুকুই যথেষ্ট ছিল, প্রজাপতিটা স্থির হয়ে পড়ে রইল।

এ কী, মেরে ফেললি নাকি? পরীক্ষিৎ আলতো ভাবে ওর হাতের চেটোয় তুলে নিল, তারপর নিজের দৃষ্টি যেন ওর শরীরে মধ্যে ঢুকিয়ে দেখে বলল, না, শেষ হয়ে গেছে। ওটাকে ফেলে দিয়ে আবার অন্য কথাবার্তা বলতে লাগল। তারপর থেকে আমরা ওটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। খানিকক্ষণ বাদে চুরুট ধরাবার সময় অন্য মনস্ক ভাবে পরীক্ষিৎ দেশলাইয়ের কাঠিটা ছুঁড়ে দিতেই সেটা গিয়ে পড়ল ওর ছড়ানো ডানায়, দপ দপ করে জ্বলতে ও কাঁপতে লাগল আগুনের ছোট্ট শিখা, ধোঁয়া উঠতে লাগল সেখান থেকে। ওরা কেউ লক্ষ্য করেনি। আমি খুব চুপি চুপি যেন কেউ দেখতে না পায় — যেন কোনও খুব অন্যায় করতে যাচ্ছি, এইভাবে কাঠিটা আস্তে তুলে অন্য জায়গায় ফেলে দিয়েছিলাম।

নাঃ, ভাল লাগছে না, বাড়ি যাই। পরীক্ষিৎ বলল। ওর শরীর যথেষ্ট খারাপ দেখায়, তবু কী করে ঘুরে বেড়ায়, কে জানে! মাথা ফাটিয়েছে ব্রিজ থেকে নদীতে পড়ে গিয়ে, তারপর কেউ আবার বেঁচে ওঠে, এ-কথা কখনও শুনিনি। ও বলেই বেঁচেছে।

শুধু তাই নয়, ব্রিজ থেকে নদীতে পড়ে যাওয়াও পরীক্ষিতের পক্ষেই সম্ভব। কী জানি ইচ্ছে করেই ঝাঁপ দিয়েছে কিনা, হয়তো প্রাণে বেশি কবিত্ব এসেছিল!

আমারও আর বসতে ইচ্ছে করছিল না। ছায়াদিকে বললাম, আজ যাই, কাল-পরশু তুমি আমার ওখানে আসবে একবার! আমিই যেতাম, কিন্তু তোমাদের অফিসের ওই ব্যানার্জি বড় বিশ্রীভাবে তাকায়।

তোমাকে যেতে হবে না। আমিই যাব।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে কাচের আলমারি খোঁজাখুঁজি করে দু'খানা পেপারব্যাক গোয়েন্দা উপন্যাস বেছে নিলাম।

এগুলো এখন কেউ পড়ছে নাকি? জিজ্ঞেস করলাম। ঘাড় নেড়ে ছায়াদি 'না' জানাল।

পরশু দিনের মধ্যে আমাকে ভাষাতত্ত্ব নিয়ে একটা লিখতে হবে, তার আগে এ-রকম কিছু হালকা বই না পড়লে আমার কিছুতেই মন বসে না।

তাপস, তুই এখন যাবি?

না, একটু অবিনাশের জন্য বসে যাই।

আপনি যাবেন নাকি পরীক্ষিৎবাবু?

অবিনাশের সঙ্গে আমার দরকার আছে। তাছাড়া টাকাটা নিয়ে গেল।

দেয়ালে পারিবারিক গ্রুপ ফটোগ্রাফের মধ্যে ফ্রকপরা মায়াকে দেখতে পেলাম। হঠাৎ মনে হল ওরা কী আজ সারা রাত এখানে বেলেল্লা করবে?

ছায়াদি বোধহয় আপত্তি করবে না। কিন্তু মায়া থাকতে দেবে না কারুকে। মায়া এ-সব ব্যাপারে খুব কঠিন, হয়তো তার কারণ মায়ার কবিতা লেখার রোগ নেই।

আমি যাব, দাঁড়ান। হেমকান্তি উঠে দাঁড়াল। যেন ওর বিষম দরকার, এখুনি না গেলে চলবে না। অথচ আমি জানি, আমাদের মধ্যে যে-কোনও এক জন যদি যাবার কথা না বলত, তবে হেমকান্তি এখানেই অনন্তকাল বসে থাকত।

আরেকটু বসে যা বিমলেন্দু, আমি যাব। শেখর বলল।

তুই তো অন্য দিকে। আমি যাই।

বোস না, তোকে এগিয়ে দেব এখন্।

কত দূর এগিয়ে দিবি?

নরক পর্যন্ত।

ওদের ফেলেই আমি আর হেমকান্তি বেরিয়ে এলাম। বাইরে বিষম ঠাণ্ডা। মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট কিনলাম। আপনার মাথা ধরা কমেছে?

হেমকান্তি ওর সুন্দর, বিষণ্ণ মুখ আমার দিকে তুলে বলল, না। হেমকান্তির মতো রূপবান যুবা আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে তো নেই-ই, দেখেছিও খুব কম। আমার চেয়েও প্রায় আধ হাত লম্বা, চৈতন্যদেবের মতো গায়ের রঙ, ছিপছিপে শরীর, কপালের ওপর জোড়া ভুরু। অথচ মেয়েরা হেমকান্তিকে পছন্দ করে না। অবিনাশের চেহারা গুণ্ডার মতো, এক মাথা চুল, চাপা নাক, তবু অবিনাশ ললনাপ্রিয়। হেমকান্তির কী অসুখ আমি জানি না, সব সময় চুপ করে থাকে, কথা বলতে চায় না, অথচ বন্ধু-বান্ধবদের সংসর্গ ভালবাসে। যে-কোনও আড্ডায় আসা চাই, শেষ পর্যন্ত চুপ করে থাকবে, না জিজ্ঞেস করলে একটাও মন্তব্য করে না। চরম উত্তেজনা, বিষম তর্কাতর্কির মধ্যেও হেমকান্তি নিঃশব্দ। এমন যখন ওর স্বভাব তখন ও একা থাকলেই পারে, কিন্তু কে বলবে, চাকরি-বাকরি করে না, তবু বাড়ির অবস্থা বোধহয় অসচ্ছল নয়। বাড়ির লোকেরা ওর এই অদ্ভুত জীবন কী করে সহ্য করে বুঝি না! ওর এই রকম নম্রভাবে চুপ করে থাকা আমারও বিরক্তিকর লাগে।

সব চেয়ে মজা হয় মেয়েদের সঙ্গে। যখন মেয়েরা থাকে, স্বভাবতই রূপবান হেমকান্তির দিকে তাদের বেশি কৌতূহল। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও মেয়ের দিকে তাকায়নি, কথা বলেনি, প্রশ্ন করলে এক অক্ষরে উত্তর দিয়েছে। মেয়েরা এখন ওকে নিয়ে প্রকাশ্যেই হাসাহাসি করে। মায়া ওকে একদম সহ্য করতে পারে না। হেমকান্তি সম্বন্ধে গভীর বিতৃষ্ণা মায়ার চোখে-মুখে ফুটে ওঠে, আমি দেখেছি।

অনেকক্ষণ পাশাপাশি চুপ করে হাঁটবার পর হেমকান্তি আমাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি... বাড়ি ফিরবেন?

হ্যাঁ, আমি বললাম, কেন, আপনি ফিরবেন না!

ঠিক...ইচ্ছে...আমার মায়ের খুব...অসুখ। হেমকান্তি দাঁড়িয়ে পড়ল।

তার মানে? অসুখ বলেই ফিরবেন না? কী-রকম অসুখ?

খুবই...বলা যায় —।

আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম হেমকান্তির অবস্থা। সকলে বিষম ব্যস্ত, উৎকণ্ঠা, ডাক্তার আসা-যাওয়া করছে। হেমকান্তি চুপ করে সারা দিন বসে আছে নিজের ঘরে, অথবা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে সকলের ব্যস্ততা দেখছে। তার নিজের কিছুই করার নেই, কেউ তাকে ডাক্তার ডাকতে বলবে না,

ওষুধের দোকানে পাঠাবে না। জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসেও ওর মা যদি একবার আকুল ভাবে ডেকে ওঠেন, হেম,কোথায়, হেমকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে, হেম — তখনও হেমকান্তি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ভাববে সাড়া দেবে কি না, জোরে কথা বলতে হবে না ফিসফিসিয়ে, মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াব না হাঁটু মুড়ে বসব, কপালে হাত রাখব না কাঁদপ পা ছুঁয়ে, এ-সব বিপুল সমস্যার বদলে বাড়ির বাইরে থাকাই ভাল — হেমকান্তি ভাবে নিশ্চিত। আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। অনেক পোষা কুকুরের মুখের দিকে মাঝে মাঝে তাকালে যেমন মনে হয়, মানুষের ভাষায় কথা বলার জন্য বেদনা জেগে উঠছে তাদের মধ্যে, হেমকান্তির মুখেও সেই বেদনা। যেন ও মানুষদের ভাষা জানে না।

আমি হেমকান্তিকে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, কী বলছেন? খুব বেশি অসুখ নাকি? এতক্ষণ কিছু হয়ে যায়নি তো?

জানি না।

আমার বিষম ভয় হল। হেমকান্তি বোধহয় মায়ের মৃত্যুর সময়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। এতক্ষণ কিছুই জানায়নি।

শিগ্‌গির চলুন বাড়ি। আমি যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।

কয়েক পা এগিয়েই হেমকান্তি আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, না, আপনি...মানে...আমি একাই যাই। এ-সব জিনিস দু'জনে ভাগ করে নেওয়া যায় না।

হেমকান্তির বাম বাহু জোর করে চেপে আমি ছুটে চললাম। কাছেই সাদার্ন রোডের মুখটায় বাড়ি।

বাড়ির সদর দরজা হাট করে খোলা। সদরের সামনে খোলা জায়গাটায় চড়া পাওয়ারের আলো। রাস্তায় বিপুল জ্যোৎস্না আজ। সুতরাং কাছের ইলেকট্রিকের আলো আর জ্যোৎস্না এক জায়গায় মিশেছে। আমি তৎক্ষণাৎ সেই মিশ্রিত আলোর মধ্যে মৃত্যুর গন্ধ পেলাম। কোথাও কোনও শব্দ নেই। ভেতরে ঢুকে সিঁড়িতে পা দিলাম দু'জনে। এ বিষয়ে আমার অনুভূতি একেবারে নির্ভুল। আমি জানি, হেমকান্তির মা আর বেঁচে নেই। এই নিস্তব্ধতা, সিঁড়ি কিংবা দেয়াল — এর যে-কোনও একটা দেখলেই এই মুহূর্তে মৃত্যুর কথা বুঝতে পারা যায়। যে-বাড়িতে মৃত্যু হয়, সে-বাড়িরই দরজা সে-রাত্রে হাট করে খোলা থাকে, আমি দেখেছি। কেন? চোর-ডাকাতের কথা তখন মনে থাকে না কারুর? কেন? মৃত্যুর থেকে আর বড় চুরি হয় না এই ভেবে? যাই হোক, মৃত্যুর বাড়িতে কখনও চুরি হয়েছে আমি শুনিনি। সে-বাড়ির দরজার একটা পাল্লা ভেজানো পর্যন্ত থাকে না। দুটো দরজাই সম্পূর্ণ খোলা থাকে, আমি বার বার লক্ষ্য করেছি। হঠাৎ আমার মনে পড়ল, আমার বাড়িতে ভাত ঢাকা দিয়ে মা আমার জন্য জেগে বসে আছে। আমি কেন এত দেরি করছি। আর কোনও দিন দেরি করব না। কিন্তু এখন তো হেমকান্তিকে ফেলে চলে যাওয়া যায় না।

দো-তলার বারান্দায় উঠতেই দেখা গেল তিন জন দামি পোশাক-পরা ভদ্রলোক দ্রুত বেরিয়ে আসছেন একটা ঘর থেকে। হেমকান্তিকে দেখেই তাঁরা থমকে দাঁড়ালেন।

এ কী, তুমি শ্মশানে যাওনি? সারা কলকাতা খোঁজা হচ্ছে তোমাকে!

তাঁদের কথার মধ্যে ভর্ৎসনার সুর ছিল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার বুক মুচড়ে উঠল। হেমকান্তি মুক নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল।

চলো, আমাদের গাড়ি আছে, শ্মশানে যেতে হয়, জুতো খোলো! সেই তিন জনের মধ্যে এক জন খুব নরম গলায় বললেন।

মামাবাবু, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি শ্মশান দেখতে পারি না।

সেই ভদ্রলোক কাছে এসে হেমকান্তিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর বুকের মধ্যে অনেকখানি হাওয়া টেনে নিয়ে হু-হু করা গলায় বললেন, তোকে আমি কী আর বলব হেম, চল, যেতে হয়। যে গেল সে ছিল আমার দিদি, তোর মা। তোকে সান্ত্বনা দিতে পারব না আমি। চল, হিন্দুধর্মের নিয়মগুলো মেনে দেখ, দুঃখ-কষ্ট আপনি কমে যাবে।

আমি হেমকান্তির মুখের দিকে ভাল করে খুঁজে খুঁজে দেখলাম। সাদা পাথরের মূর্তির মতো স্পন্দনহীন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কী জানি কী-রকম দুঃখ-কষ্ট ওর, চোখে-মুখে যার কোনও চিহ্ন ফোটে না। হঠাৎ হেমকান্তিকে আমার অত্যন্ত নির্লজ্জ রকমের বিলাসী পুরুষ বলে মনে হল।

ছায়া

ছেলেবেলায় বাবা বলতেন, ছায়া, তোকে আমি আর্ট স্কুলে ভর্তি করে দেব, তুই খুব নামকরা শিল্পী হবি। বাবা আমাকে রঙের বাক্স কিনে দিয়েছিলেন। তাই দিয়ে আমি হরপার্বতী, গাছের মাথায় চাঁদ আঁকতাম। বাবা আমার লেখাপড়া সম্বন্ধেও খুব যত্ন নিতেন। আমার জন্য মাস্টার রেখে দিয়েছিলেন। আমি ছেলেবেলায় খুব অসুখে ভুগতাম, বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়তাম শুধু। বাবা আমার জন্য লাইব্রেরি থেকে রোজ বই এনে দিতেন। বলতেন, লেখাপড়া শিখে বড় হবি, নিজের পায়ে দাঁড়াবি, পৃথিবীর কাউকে গ্রাহ্য করবি না। আজকাল মেয়েরা পুরুষের ওপর নির্ভর না করেও বাঁচতে পারে। পরে বুঝেছিলাম, বাবার অতসব কথা বলার মানে, আমার ঠোঁটের নিচে, কানের পাশে সাদা দাগ। শ্বেতি। তাপসই আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। তাপস বলত, দেখবি, ক্রমশ তোর সারা মুখ, হাত-পা সাদা হয়ে যাবে। তোর আর বিয়ে হবে না।

তাপস আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত — সেই তমলুকে, উনিশশো বেয়াল্লিশে, চুয়াল্লিশে। ওর বাবা ছিলেন পোস্টমাস্টার, আমার বাবা দারোগা। আমাদের কোয়ার্টারের সামনে আমি আর মায়া ফুলের বাগান করেছিলাম। মা সিঁড়ির ওপর বসে বসে দেখতেন। মায়ের হাঁপানি ছিল বিষম, হাঁটা-চলা করতে পারতেন না। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বলতেন, তোদের দু'জনের এক জনও যদি ছেলে হতিস, আমার কোনও ভাবনা থাকত না। আমরা আসলে পূর্ববঙ্গর লোক বলে 'বাঙাল বাঙাল' বলত অনেকে, দারোগার মেয়ে বলে ভয়ও করত। তাপসরা খুলনার, কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করত না। তাপসের মা বলত, খুকি বাড়ি যাও, ঝড় আসতিছে, পরে আর যাতি পারবা না।

তাপসরা হাতে লেখা পত্রিকা বার করত — আমাকে দিত তার ছবি আঁকতে। আমি সুন্দর করে নানা রঙের ফুল লতাপাতা এঁকে দিতাম। আমি একবার বলেছিলাম, তাপস, আমার একটা পদ্য ছাপাবি এবারের বইটাতে? তাপস বলেছিল, ভাগ, তুই আবার কবিতা লিখবি কী রে? মেয়েদের দ্বারা কবিতা হয় না। মেয়েদের নিয়েই তো কবিতা লিখতে হয়।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুই কোন মেয়েকে নিয়ে লিখিস রে?

সুরঞ্জনাকে নিয়ে। অম্লানবদনে ও বলেছিল। চৌধুরী বাড়ির মেয়ে সুরঞ্জনা। তাপসের কথা শুনে আমার রাগ হলেও খুব বেশি হয়নি, কারণ সুরঞ্জনা ছিল রাজকন্যার মতো রূপসী। আমি বলেছিলাম, যা যা, সুরঞ্জনা তোর দিকে কোনও দিন ফিরেও তাকাবে না। তাপস আর আমার দু'জনেরই বয়েস তখন তেরো। মায়ার আট।

তাপস ছিল ছেলেবেলা থেকেই একটু বখাটে ধরনের। স্কুলে পড়তে পড়তেই বিড়ি-সিগারেট খেত। দুপুরবেলা বাবা থানায় চলে যাবার পর তাপস আমাদের বাড়িতে আসত। মা ঘুমিয়ে পড়লে ও দিব্যি সিগারেট ধরাত, দেশলাই জ্বালাবার সময় খুক করে একবার কেশে শব্দটা চাপা দিত। নাক

দিয়ে ধোঁয়া বার করত, রিং করত, আমাকে বলত, খাবি? খা-না। মায়া এক-এক দিন ওকে ভয় দেখাত, বাবাকে বলে দেব। তাপস বাবাকে খুব ভয় করত। তখন থেকেই তাপস অসম্ভব নিষ্ঠুর আর নির্লিপ্ত হয়ে উঠেছিল। তাপসরা আজকাল নিজেদের বলে আধুনিক সাহিত্যিক। আধুনিকতা মানে বুঝি নিষ্ঠুরতা!

ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় টেস্টের পর আমরা দু'জনে এক সঙ্গে পড়াশুনো করতাম। তখনও বাবা মারা যাননি। আমাদের বাড়ির পিছন দিকটার ছোটঘরে বই-খাতা ছড়িয়ে বসতাম। তাপস অধিকাংশ সময়ই চিৎ হয়ে শুয়ে সিগারেট টানতে টানতে বলত, তুই থিয়োরেমগুলো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মুখস্থ কর তোর পড়া ধরব। আমারটা শুনে শুনেই তাপসের মুখস্থ হয়ে যেত। এমনিতে বদমায়েশি-বখামি করলেও পড়াশুনোয় ও ভাল ছেলে ছিল। নিজের সম্বন্ধে বিষম অহঙ্কার ছিল তখন থেকেই। বলত, দেখবি এক কালে তোদের ছেলে-মেয়েরা পরীক্ষার সময় আমার গল্প-কবিতার ব্যাখ্যা মুখস্থ করবে। দু'জন উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়ে এক সঙ্গে দুপুর কাটাতাম, কিন্তু কখনও কোনও অসভ্যতা করেনি তাপস। আমিই বরং মাঝে মাঝে ওর একটা হাত অনেকক্ষণ ধরে থাকতাম। তাপসের কোনও ভাবান্তর ছিল না। কখনও কখনও ও আমার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত, তারপর আমার ঠোঁটে-মুখে-কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলত, আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, তোকে আশীর্বাদ করছি ছায়া, তোর ওই দাগ এক দিন মিলিয়ে যাবে। এমনিতে তোকে বেশ সুন্দর দেখতে। তাছাড়া দাগ না উঠলেও ক্ষতি নেই। ও দাগ ছোঁয়াচে নয়, ওতে কোনও দোষ হয় না। তাপসের সঙ্গে খুব ছেলেবেলা থেকে মিশেছি, ছোট ছেলে-মেয়েরা যে কতগুলো ঠিকে অসভ্যতা করে — আড়ালে চুমু খাওয়া, জড়াজড়ি, কি প্যান্ট-ফ্রক খুলে দেখাদেখি সে-সব কখনও না।

যখন আমি প্রথম বালিকা থেকে নারী হলাম, তখন কয়েক দিনের জন্য আমি দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। সব সময় ছটফট করতাম, চুল বাঁধতে ইচ্ছে করত না, আয়নায় শরীর দেখতাম, নিজেই নিজের বাহুতে চুমু খেতাম। শুয়ে শুয়ে বা বাথরুমে আমি নানা ছেলের কথা ভাবতাম চোখ বুঁজে — যেন তারা আমাকে আদর করছে কিংবা পাশে শুয়ে আছে। কিন্তু কখনও তাপসের কথা ভাবিনি।

তাপস একবার মাত্র অদ্ভুত কাণ্ড করেছিল। সে-দিন দুপুরে ঘোর বৃষ্টি। আমি খাওয়ার পর পড়ার ঘরে বই খুলে বসে আছি, তাপস এল অনেক দেরি করে, ভিজতে ভিজতে। পরীক্ষার মাত্র এক মাস দেরি। তাপস সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ রইল, কোনও কথা নেই, যেন কান পেতে কোনও শব্দ শুনছে। কোথাও কোনও শব্দ নেই, বৃষ্টির আওয়াজে সর্বত্র শব্দহীন। বাড়িতে কেউ জেগে নেই, মায়া স্কুলে। জিজ্ঞেস করলাম, কী রে, ভূতের মতো রইলি যে? আজ না গ্রাফের অঙ্ক কষার কথা ছিল। ভিজে জামাটা খুলে ফেল না!

শুকনো মুখে তাপস বলল, আজ সকালে একটা গল্প লিখতে আরম্ভ করেছিলাম। শেষ হল না। গল্পটা শেষ করতে না পারলে মন স্থির হচ্ছে না। তোকে একটা কথা বলব?

কী?

কিছু মনে করিস না, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হিসেবেও ধরতে পারিস। মনে কর, আমরা হাইজিন পড়ছি।

কী ব্যাপার কী?

রাগ করা চলবে না কিন্তু। তোর শাড়ি-ব্লাউজগুলো সব একবার খুলে ফেলবি? আমি একবার তোকে দেখব।

শুনেই কী যে হল আমার, বৃষ্টির শব্দ ছাড়িয়েও বুকের মধ্যে অন্য একটা প্রচণ্ড শব্দ হল। বুঝতে পারলাম, শরীর হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আমি ঘরের কোণের দিকে সরে গেলাম।

না না, মানে জানিস, খারাপ কিছু না, আমি কোনও মেয়ের সম্পূর্ণ শরীর দেখিনি। একবার দেখতে চাই। শুধু দূর থেকে —।

তাপস!

তোর ভয় নেই, গায়ে হাত দেব না, দূর থেকে — একবার, কেউ তো নেই এ-দিকে।

তাপস, তুই এতটা —।

সত্যি, আমার খুব ইচ্ছে হয়। গল্পটা শেষ করতে পারছি না। গল্পে এ-রকম একটা ব্যাপার আছে। অথচ নিজে না দেখে, অভিজ্ঞতা ছাড়া...লুকিয়ে চুরিয়ে যে কখনও দেখিনি তা নয়, ছোটমাসিকে চান করার সময় বাথরুমের দরজার ফুটো দিয়ে দেখেছি, কিন্তু সামনা-সামনি স্পষ্ট দেখতে চাই। তোকে ছাড়া আর কাকে বলব?

আমার শরীর কাঁপছিল। বললাম, ইতর কোথাকার। এটুকুও জানিস না, এ-কথা কোনও মেয়েকে বলার আগে বলে নিতে হয়, আমি তোমাকে ভালবাসি।

তাপস হো-হো করে হেসে উঠল। তারপব বলল, ওঃ, তুইও বুঝি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চতুষ্কোণ' পড়েছিস?

না, পড়িনি। তোকে আমার সহ্য হচ্ছে না, তুই চলে যা।

পড়িসনি? তাহলে সব মেয়েই বুঝি এই কথা বলে? আচ্ছা থাক।

তাপসের চেহারা খারাপ নয়, মাজা মাজা গায়ের রঙ, বড় বড় চোখ, মুখে একটা পাগলাটে ধরনের শ্রী ছিল। কিন্তু সে-দিন আমার মনে হল ওর মধ্যে যেন শযতান ভর কবেছে। আমি বললাম, তুই এক্ষুনি চলে যা, আর আমাদের বাড়িতে আসিস না। তোকে বাদ দিয়েই আমি পাশ কবতে পাবব।

সেবার অবশ্য আমার পবীক্ষা দেওয়া হয়নি।

বছর আষ্টেক বাদে কলকাতায় শেষ পর্যন্ত তাপস আমার নিরাবরণ শরীব দেখেছিল। শেষ পর্যন্ত ওরই জিত হল। সেটা ছিল সম্পূর্ণ আমার দোষ। তখন তাপসরা তরুণ সাহিত্যিকদের দল আমাদের বাড়িতে আড্ডা দিতে শুরু করেছে। তখন আমি পাগলের মতো হয়ে উঠেছিলাম। মাথার ওপর কোনও অভিভাবক ছিল না। এখন আমি নিজেই নিজের অভিভাবিকা হতে পেরেছি। আমার স্বাস্থ্য এমনিতেই ভাল, দু'বেলা খিদে পায়, মাঝরাত্তিরেও অন্য রকম খিদে পেত। কিন্তু ছেলেরা কেউ আমাকে দিদি বলত, কেউ বন্ধুর মতো। কিন্তু কেউ আমাকে আড়ালে ডাকেনি, আমাকে কেউ একা চায়নি। আমি সবার সঙ্গে হাসছি, কথা বলছি, কিন্তু কান্না পেত, কারুর বুকে আমি জীবনে মাথা রাখিনি। সেই রকমই এক বৃষ্টির দুপুরে তাপস এল। এসেই বলল, হঠাৎ তোর কথা মনে পড়ল ছায়া। তাই এলাম। কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ অভিমানে আমার বুক ভরে গেল। কেউ আসে না হঠাৎ আমার কথা ভেবে, আমি জানি। ঠাণ্ডা গলায় বললাম, তাই নাকি? বোস।

তমলুক গিয়েছিলাম, আজই ফিরেছি। স্টেশন থেকে সোজা তোর এখানে এলাম। তোকে আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, হঠাৎ তমলুকে গিয়ে বিষম মনে পড়ল। তোদের কোয়ার্টারে অনেক লোক এসেছে। সামনের বাগানটায় ফুলের বদলে বেগুনের চারা লাগিয়েছে। বড় খারাপ লাগল। হঠাৎ এক ঝলক হাওয়া দিতেই মনে হল তোর মা যেন সিঁড়ির ওপর বসে আছেন আর তুই ফ্রক পরে জলের ঝারি হাতে ঘুরছিস। আমার ছেলেবেলাটাকে তুই বড় দখল করে আছিস। তখনই মনে হল, ফিরেই তোর কাছে যাব। বড় খিদে পেয়েছে। কিছু খেতে দিবি?

দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল তখন, পিসিমা ঘুমোচ্ছেন।

কী খেতে দেব? দুধ-চিঁড়ে খাবি?

হ্যাঁ, তাই দে না, খিদেয় পেট জ্বলছে।

তাপস সোজা আমার কাছে চলে এল, কী করে ওর এ-রকম দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল, জানি না। আমার মুখটাকে জোর করে ধরে ঠিক আমার ঠোঁটের নিচে ও কানের পাশে — যেখানে সাদা দাগ, দীর্ঘ চুমু খেল। আমার চোখে কান্না এসেছিল, আমি দু'হাতে ওকে ঠেলে দিতে গেলাম। কারুর মুখে কোনও কথা নেই। ও আমার ব্লাউজ, শাড়ি, শায়া সব খুলে ফেলল। আমি আর বাধা দিইনি। তাপস আমাকে বিছানায় শুইয়ে ফেলে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। আমি ক্লিষ্ট গলায় বললাম, তুই কি কখনও কোনও মেয়ের শরীর দেখিসনি?

হ্যাঁ, দেখেছি অনেক। কিন্তু প্রত্যেকে অন্য রকম। ছায়া, আমি তোকে সম্পূর্ণ ভাবে না দেখলে তোকে কখনও চিনতে পারতাম না। তুই সত্যিই অসাধারণ।

আমার শরীরের অন্য কোনও জায়গায় আর সাদা ক্ষত ছিল না বলে আমি সে-দিন খুশি হয়েছিলাম, নাহলে আমি চোর হয়ে যেতাম। আমি লজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তাপস, তুই আমাকে বিয়ে করবি!

না।

কেন!

কাবণ, তোর কথা কখনও আমি ভাবিনি।

তবে আজ কী জন্য এসেছিস? শরীর?

হ্যাঁ।

কেন?

কারণ, আমি তোকে ভালবাসি।

আমি উঠে বসে কাপড়টা জড়িয়ে বললাম, এর মানে কী?

মানে হয় না বুঝি? তাহলে জানি না। যা মনে হল তাই বললাম।

এ কী-রকম অদ্ভুত মনে হওয়া?

সত্যিই তা জানি না রে ছায়া! আমার যা মনে হয়, তাই বলি, তাই লিখি। বিচার-বিবেচনা করে অত দেখতে ইচ্ছে করে না। আজ যা বললাম, কাল হয়তো তা মনে হবে না। তাতে দোষ কী? আমি এ-রকম ভাবেই জীবন কাটাতে চাই।

আমি মুখ ফিরিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। আমার চোখের জল থামছিল না। সম্পূর্ণ বিচার-বিবেচনাহীন চোখের জল। বুক থেকে ঠাণ্ডা একটা গভীর উদাসীনতা উঠে এল। তারপর তাপসের দিকে ফিরে খাটের ওপর খানিকটা জায়গা করে দিয়ে বললাম, আয়, দেখি, তোকেও দেখে সম্পূর্ণ চেনা যায় কিনা।

সেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া হয়নি, কারণ পরীক্ষার সাত দিন আগে বাবা খুন হয়েছিলেন। বাবা গ্রামের দিকে গিয়েছিলেন ইন্সপেকশনে। রাত্রে ফিরলেন না। পরদিন তাঁকে নিয়ে আসা হল একটা গোরুর গাড়িতে, বরফের গুঁড়োয় সারা শরীর ঢেকে। মরা মানুষের চোখ যে কত বিশ্রী হয়, সেই প্রথম দেখলাম। সেই ঘটনায় মা কিছু দিন পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।

আমার বাবা ছিলেন বেশ হাসি-খুশি মানুষ, খুব বড় চরিত্রের নয়। বাবা ঘুষ নিতেন, সন্ধের দিকে রোজ খানিকটা মদ খেতেন, আমরা জানতাম। চোর-ডাকাতদের দমন করার বদলে তাদের নিয়ে

শান্তিতে বসবাস করাই ছিল তাঁর নীতি। ঘুষের টাকা জমিয়েই তিনি কলকাতায় আমার নামে এই ছোট বাড়িটা কিনে ভাড়া দিয়েছিলেন। তবে মদ চোলাই-এর দলটাকে দমন করবার জন্য তিনি কেন উঠেপড়ে লেগেছিলেন জানি না, বোধহয় তারা বাবার মদেই ভেজাল দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, ওটা টেররিস্টদের আড্ডা, আগস্ট আন্দোলনের রেশ তখনও থামেনি।

বাবা মারা যাবার পর আমাদের কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে হল। তার পরও কিছু দিন আমরা তমলুকে ছিলাম। অন্য একটা বাড়ি ভাড়া করে। কোয়ার্টার ছেড়ে দেবার সময় মায়া বলেছিল, দিদি, ফুলগাছগুলো তো আমাদের, ওগুলো নিয়ে যাব। আমি বলেছিলাম, থাক না। মায়া ছেলেবেলা থেকেই বিষম জেদি, যাবার সময় টেনে টেনে ফুলগাছগুলো তুলে নিল। যে-বাড়িটায় আমরা গেলাম, সামনে মাঠ নেই, ছোট, অন্ধকার মতো। মায়া একটুখানি জায়গার মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি করে গাছগুলো লাগাল, কিন্তু গোলাপ, ডালিয়া, যুঁই, ক্যানা একটাও বাঁচল না।

আমার পরীক্ষা দেওয়া হল না সেবার। বর্ধমান থেকে বড় পিসিমা এসে রইলেন কাছে, তাছাড়া বরদা উকিল বাবার বন্ধু ছিলেন, আমরা জেঠাবাবু বলতাম, তিনি আমাদের দেখাশনো করতে লাগলেন। বাবার টাকা-কড়ির ব্যবস্থা করা, কলকাতার বাড়ি থেকে ভাড়াটে তোলা, সবই করেছিলেন। তাপস তত দিনে পাশ করে কলকাতার কলেজে গিয়ে ভর্তি হল। সেবারই পুজোর ছুটিতে ওর সঙ্গে ওর দুই বন্ধু এসেছিল বেড়াতে, পরীক্ষিৎ আর অনিমেষ। তিনটে ঝকঝকে টাটকা ছেলে, সন্ধের সময় রাস্তা দিয়ে চেঁচিয়ে গান গাইতে গাইতে যেত। আমার সঙ্গে একবার বন্ধুদের নিয়ে দেখা করতে এসেছিল তাপস। কিন্তু তখন ওর ওপর আমার রাগ ছিল, সেই জন্য ভালভাবে কারুর সঙ্গে কথা বলিনি। তখন আমি কবিতা লিখতে শুরু করেছি, মাঝে মাঝে ডাকে নানা পত্রিকায় পাঠাতাম। কোনও কোনও সময় তাপস, পরীক্ষিৎ আর আমার লেখা একই পত্রিকায় বেরুতো, কিন্তু আমি ওদের লেখা পড়ে বুঝতে পারতাম না।

কলকাতার বাড়িতে এক তলায় নতুন ভাড়াটে বসিয়ে দো-তলায় আমরা উঠে এলাম বছরখানেক বাদে। তমলুক সেই ছেড়ে আসা চিরকালের জন্য আমার ছেলেবেলার তমলুক। আসবার সময় মনে হয়েছিল, ওখানে আমরা বাবাকে ফেলে এলাম। কিন্তু মায়ের চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসা দরকার ছিল।

মা বিছানায় শুয়ে পাঁচ বছর বেঁচে ছিলেন। তখন আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। মায়া ক্রমে যুবতী হয়ে উঠেছে। রাত্তিরে খাবার সময় অনেকক্ষণ ধরে গল্প করতাম আমি, মায়া, পিসিমা, মা। মা বলতেন, কলকাতা শহরে থাকার এই সুবিধে, পুরুষমানুষ না থাকলেও চলে। মায়ার নানা রকম ছেলেমানুষি কাণ্ড নিয়ে আমরা রোজ রাত্রে খুব হাসাহাসি করতাম। মায়া কোনও কারণে রেগে গেলে সাতখানা-আটখানা করে কাচের গেলাসই ভাঙত। স্কুলে যাবার সময় ছেলে-ছোকরারা যদি কোনও মন্তব্য করত, মায়া সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উত্তর দিত। মোড়ের মাথায় একটা ছেলে ওর সামনে শিস দিয়েছিল বলে মায়া সোজা সেই ছেলেটার বাড়িতে গিয়ে কড়া নেড়ে তার বাবাকে বলে দেয়। সেই ভদ্রলোক পরে এসে মায়ের সঙ্গে দেখা করে ক্ষমা চেয়ে যান। মায়া একবার বায়না ধরেছিল, শীতকালে প্যান্ট-কোট পরে রাস্তায় বেরুবে। মা, পিসিমা কত ঠাট্টা করলেন, বিবিসাহেব, মসিবাবা কত কী বলে হাসাহাসি করা হল, কিন্তু মায়া অটল। এ যে সম্ভব না, তা মায়াকে কিছুতেই বোঝানো গেল না। সেই নিয়ে শেষ পর্যন্ত রাগারাগি শুরু হয়ে গেল। আমি মায়াকে কোনও দিন বকিনি, কিন্তু ওর বোকা গোঁয়ারতুমি দেখে চড় মারতে গিয়েছিলাম। কিন্তু মায়া মত বদলাবে না, রাগ করে খাওয়া বন্ধ করে দিল। মা শেষটায় বললেন, দে ছায়া, ওকে এক সেট বানিয়ে দে। বাড়িতে দর্জি ডেকে মাপ দেওয়া

হল। যখন তৈরি হয়ে এল, সব পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মায়ার কী হাসি। মা বিছানার ওপর উঠে বসেছেন, পিসিমা আর আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, মায়া বাবার শোলার টুপিটা পর্যন্ত মাথায় দিয়ে দুলে দুলে হেসে খুন হল। মা বললেন, আমার ছেলে ছিল না, এই তো একটা ছেলে হল!

মায়া সে-পোশাক পরে এক দিনও বেরোয়নি। কখনও খুব রেগে গেলে মায়াকে আমি সেই পোশাকের কথা তুলে ঠাট্টা করি।

মায়া এক দিন সন্ধেবেলা এ-বাড়িতে তাপস আর পরীক্ষিৎকে নিয়ে এসেছিল। পথে দেখা হবার পর তাপস মায়াকে চিনতে পারেনি। ওকে এত বড় হতে তো দেখেনি তাপস। মায়াই তাপসদা, তাপসদা বলে চেঁচিয়ে ডেকে উঠেছিল, তারপর টেনে এনেছিল বাড়িতে। ক্রমে ক্রমে এল ওর বন্ধুবান্ধবদের দল — অবিনাশ, হেমকান্তি, অম্লান, অনিমেষ, শেখর, বিমলেন্দু। মা তখনও বেঁচে। বিমলেন্দুর দিদি আমার সঙ্গে বি.এ.-তে পড়ত, সে-জন্য ও আমাকে ছায়াদি বলে। সেই শুনে শুনে শেখর, অনিমেষ ওরাও। কেউ আপনি বলে, কেউ তুমি, তুই। অবিনাশ বলে, মেয়েদের মধ্যে একমাত্র আমার কবিতাই নাকি পাঠযোগ্য। মেয়েদের মধ্যে আমিই প্রথম আধুনিক। শেখর একটা কবিতা পত্রিকার সম্পাদক, প্রতি সংখ্যায় ও আমার লেখা আগ্রহ করে ছাপে। আমি যদিও আমার গোপন দুঃখের কথা কিছুই এ পর্যন্ত লিখতে পারি না। মায়া অবশ্য আমার লেখা সম্পর্কে ঠোঁট ওলটায়। একবার পুজো সংখ্যার লেখার জন্য মানি অর্ডারে টাকা পেয়েছিলাম। মায়া বলেছিল, সে কী রে দিদি, ওই পদ্য লেখার জন্যও লোকে টাকা দেয়? কে পড়ে রে?

মায়ের মৃত্যুর সময় তাপসের বন্ধুবান্ধবরা খুব সাহায্য করেছিল। ওদের মধ্যে কেউ ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর, কেউ উদাসীন, কেউ লোভী, কিন্তু ওরা কেউই অসৎ নয়। মনে মনে ওরা প্রত্যেকেই সম্রাট কিংবা জলদস্যু, কেউই ছিঁচকে নয়, সেই জন্যই ওরা সাধারণ নয় কেউ, ওরা সাহিত্যিক, আমি জানি। এক-এক জন পাগল।

মায়ের মৃত্যুর কথা মনে হলেই এখনও আমি সামনে-পিছনে তাকাই। এত ভয়ঙ্কর শান্ত মৃত্যু যে হয় আমি ভাবতে পারিনি। এখন যেটা বসবার ঘর করেছি, আগে ওই ঘরটায় একটা খাটে মায়ের দু'পাশে আমি আর মায়া শুতাম। সে-দিন ঘুমোতে যাবার আগে মা আমাদের দু'জনের চুল বেঁধে দিলেন টান করে। সে-দিন মায়া ওর তিন জন মেয়ে-বন্ধুর সঙ্গে সিগারেট খেয়েছে, এই কথা মাকে বলল। মায়ার কোনও কিছুই গোপন ছিল না, আমাকে আর মাকে সব কথা বলে দিত। ছেলেরা কেন সিগারেট খায় শখ করে সেটা দেখবার জন্য খেয়েছিলাম, জানো মা। প্রত্যেকে তিনটে করে টেনে দেখলাম গীতালিদের ছাদের ঘরে, গীতালি তো কাশতে কাশতে বাঁচে না। আমার কোনও কষ্ট হয়নি, তবে অত আহ্লাদ করে খাবার কী আছে বুঝতে পারিনি।

মা এক হাতে মায়ার চুলের গোছা ধরে আরেক হাতে চিরুনি চালাচ্ছিলেন। আমি মায়ার মুখোমুখি বসে। আমি বললাম, ও এক দিন খেলে কিছুই বোঝা যায় না, পর পর কদিন খেলে রোজ খেতে ইচ্ছে করবে। সেই রোজ খাওয়ার ইচ্ছেটাই নেশা।

ওঃ, তুই এমনভাবে বলছিস, যেন তুই রোজ খেয়ে দেখেছিস!

মা হাসতে হাসতে বললেন, দিদি লেখে কিনা, তাই জানে। লেখক-লেখিকাদের সব জানতে হয়।

আমি রোজ খেয়ে দেখব মা? ছেলেরা পারে তো আমরা পারব না কেন? খাওয়ার জিনিসে আবার ছেলে-মেয়ে কী?

খেতে পারিস, তবে বিড়ি-সিগারেট খেলে ঠোঁট কালো হয়ে যায়। মেয়েদের কালো ঠোঁট দেখা তো কারুর অভ্যেস নেই, তাই খারাপ লাগবে।

তবে মেমসাহেবরা যে খায়?

মেমসাহেবরা ঠোঁট লাল করার জন্য লিপস্টিক মাখে। তুই মাখবি?

না না, লিপস্টিক বিচ্ছিরি।

আমি আর মা হেসে উঠলাম। ক'দিন ধরে মায়ের শরীর একটু ভাল ছিল। আরও কিছুক্ষণ গল্প করার পর আমরা আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ি। সে-দিন সারা রাত আমার সুন্দর ঘুম হয়েছিল। এক ছিটে স্বপ্ন পর্যন্ত দেখিনি। সকালবেলা চোখ মেলে দেখলাম, মায়া উঠে বসে আছে, এক দৃষ্টে মায়ের দিকে তাকিয়ে। কোনও কথা নেই। মায়ের দু'ঠোঁট খোলা, পাশ দিয়ে রক্ত। মা মায়ার দিকে তাকিয়ে আছেন। মা বেঁচে নেই। সারা রাত আমরা মায়ের পাশে শুয়ে ছিলাম। কোনও এক সময় মা আমাদের ঘুম না ভাঙিয়ে চলে গেছেন। সারা রাত আমরা মৃতদেহের পাশে। এ-কথা যখনই ভাবি, শরীরে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যায়। এখনও মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গেলে মনে হয়, মায়া ও আমার মধ্যে মা শুয়ে আছেন। এমনকী অফিসে, ট্রামে, বাসেও মাঝে মাঝে আমার পাশে মায়ের মৃত শরীরের অস্তিত্বের কথা মনে পড়ে। এই অনুভূতির মধ্যে কোনও ভয় নেই, মায়ের চরিত্রের মতোই শান্ত স্নেহময়। কখনও কখনও মনে হয় এই স্নেহময় মৃত্যু আমার শরীরে ঢুকে গেছে। আমারও ইচ্ছে করে ও ওই শান্তভাবে মরে যেতে।

সারা দিন আমি কী করি? কিছুই না। মনে হয় চোখ বুজে কাটাচ্ছি। ভোরে ওঠা স্বভাব, উঠেই হিটারের প্লাগটা লাগিয়ে দিয়েই চায়ের কেটলিটা চাপিয়ে দিই। তারপরে বাথরুমে মুখ-হাত ধুয়ে স্নান করি। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে, আমি একা অনেকক্ষণ স্নানের ঘরে থাকি। মায়ার স্বভাবটা আদুরে ধরনের হয়েছে, বার বার ডাকাডাকি করলে ও উঠতে চায় না। বুনো ধরনের ঘুম ওর, কাপড়-চোপড় এলোমেলো করে দু'পা মুড়ে ঘুমোয়। স্নান করে বেরিয়ে এসে চায়ের কাপ ওর মাথার কাছে রাখি। বাবা মারা যাবার পর থেকেই আমি এমন সংসারী হয়েছি, খানিকটা বুড়োটে হয়ে গেছি আমি। সেই জন্যই মায়াকে ওর জলের মতো জীবন কাটাতে দিতে চাই। তাছাড়া ওকে কত সুন্দর দেখতে। আমি যদি মায়া হতাম, আমার এক-এক সময় মনে হয়। এক-এক দিন রাত্রে আমি যখন সংসার খরচের হিসাব লিখি, তখন হিসেব না মিললে আমার রাগ হয়, তার পরেই হাসি পায়, মনে হয় যদি আমিও মায়ার মতো এখন পাশের ঘরে বসে রেডিয়োর নব ঘুরিয়ে ট্যাঙ্গো নাচের বাজনা শুনতে পারতাম! কখনও কখনও নিচতলার ভাড়াটে ভুবনবাবু এসে বলেন, ছায়া দেবী, আমাদের নর্দমা দিয়ে জল সরছে না, একটা ব্যবস্থা করুন। তাছাড়া আপনাদের বারান্দা দিয়ে জল ঢাললে আমাদের রান্নাঘরের পাশে ছড় ছড় করে পড়ে। আমি তো বাড়িতে প্রায়ই থাকি না — হেঁ হেঁ, বুঝতেই পারছেন, কিন্তু আমার ওয়াইফ বললেন, যখন মাস মাস ভাড়া গুনে যাচ্ছি, তখন অসুবিধে ভোগ করব কেন? তুমি বাড়িউলিকে বলো! (বাড়িউলি শব্দটা উচ্চারণ করেই টুথব্রাশ-গোঁফওয়ালা ভদ্রলোক লজ্জা পান। আমার সম্পর্কে ওরা নিজেদের মধ্যে যে-ভাষা ব্যবহার করে তাই বেরিয়ে পড়েছে হঠাৎ। ছিপছিপে, চশমা-পরা, এমএ পাশ যুবতী যদি বাড়ির মালিক হয় তাহলে যে তাকে সামনাসামনি বড়িউলি বলা যায় না, এ বিশ্বাস ওর আছে মনে হল।) তখন ইচ্ছে হয় উঠে গিয়ে ঠাস করে লোকটার গালে চড় মারি। তার বদলে আমি এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে দেখি মায়া আছে কি না। ও থাকলে চড় না মেরেও নিশ্চিন্ত ঝগড়া বাধিয়ে দিত। আমি শান্তভাবে বলি, আপনি একটা লোক ডেকে ব্যবস্থা করুন, খরচ যা হয় ভাড়া থেকে কেটে নেবেন। লোকটা তখনও নড়তে চায় না, বুঝতে পারলাম, পর পর সাত দিন নাইট ডিউটি দেবার পর আজ ওর ছুটি। ভাঁজ করা কাপড়ের লুঙ্গি-পরা লোকটা চেয়ারের দিকে গুটি গুটি এগোয়। আমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বলি, একটা মিস্ত্রি পেলে আমাদের বারান্দাটাও সারিয়ে নেবেন।

আমার সব চেয়ে খারাপ লাগে ভিড়ের ট্রাম-বাস। হাজার-হাজার নিশ্বাসের গরমে আমার প্রাণ বেরিয়ে আসতে চায়। ইচ্ছে হয়, 'ডাকাত ডাকাত' বলে চেঁচিয়ে উঠি। লোকগুলো আমাকে প্রাণে মারতে চাইছে। কিন্তু উপায় নেই, ঠিক দশটার সময় আমাকে অফিসে যেতে হয়। কাজ ভাল লাগে না। পাবলিসিটির ফার্মের কাজ। নানা লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে হয়, লে আউট, ব্লক, কপি, ম্যাট, বিজ্ঞাপনের উমেদার, আর্টিস্ট। মাঝে মাঝে ছোটখাটো কাগজ থেকে ছেলেরা আসে। প্রথমে আমার কবিতা চায় একটা, তারপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিজ্ঞাপনের কথা বলে। রাগে আমার শরীর জ্বলে যায়, কিন্তু আমার এই-ই চাকরি, সুতরাং মিষ্টি করে হাসি, বলি, বিজ্ঞাপনের বাজেট তো শেষ হয়ে গেছে ভাই, এপ্রিলের আগে আর তো হবে না! কবিতা অবশ্য দিতে পারি — পনেরো পাতা, ছাপবেন? ছেলেগুলো কিন্তু কিন্তু করে হাসে, তারপর নেকস্ট উইকে আসছি বলে সরে পড়ে। তবু এ চাকরিটা এক দিকে থেকে ভাল, অন্য ঝামেলা নেই। ওপরের অফিসারদের মাঝে মাঝে গাড়ি করে পৌঁছে দেবার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারলে ছুটির পর সত্যিই ছুটি। কিছু দিন কলেজের প্রফেসারি করেছিলাম, হাজার প্রশ্ন সেখানে — বাড়িতে পুরুষমানুষ নেই কেন, কার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করি, কারা সব বাড়িতে আসে? অসহ্য!

আমি তো তবু ইচ্ছে মতো চাকরি বদলাতে পারছি। আর তাপস? একটা স্কুলে চাকরি করত, ঝগড়া করে ছেড়ে দিয়েছে, তারপর আজ প্রায় দেড় বছর বেকার। ছি ছি, ছেলেদের এত দিন বেকার থাকা মোটেই মানায় না। কিন্তু তাপসের তো দোষ দিতেও পারি না, ও তো চেষ্টাও কম করছে না। তাপসের মাথা খুব ভাল ছিল, মন দিয়ে পড়াশুনো করলে ব্রিলিয়ান্ট স্কলার হতে পারত। তবু যাই হোক ইংরাজিতে অনার্স নিয়ে বিএ তো পাশ করেছিল। শরীরে কোনও রোগ নেই, শক্ত স্বাস্থ্য, বিএ পাশ এক জন ছেলে কোনও চাকরি পাবে না? ব্রিলিয়ান্ট স্কলার তো অন্য অনেকেই হয়, কারুকে কারুকে তো লেখকও হতে হবেই, কিন্তু সে কোনও জীবিকার সন্ধান পাবে না? স্কুলের চাকরিটা হারাবার ব্যাপারেও তাপসের কোনও দোষ নেই। পড়াবার সময় ও ক্লাসে বসে সিগারেট খেত, তাই নিয়ে হেডমাস্টারের সঙ্গে ওর ঝগড়া। অঙ্কের মাস্টার কিংবা পণ্ডিতরা ক্লাসে বসে নস্যি নেয়, তাতে কোনও দোষ নেই, আর ইংরিজির মাস্টার ক্লাসে বসে সিগারেট খেলেই দোষ? ছেলেরা দেখে দেখে শিখবে? ক্লাস থেকে বেরুলে ছেলেরা আর কারুকে সিগারেট খেতে দেখে না? বাবাকে-দাদাকে দেখে না? ছেলেরা অনেক কিছু না দেখেও শেখে, শিখবেই। সে-সব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কী? স্কুলে এসে লেখাপড়াটা ঠিকমতো শিখছে কি না সেটুকু অন্তত দেখলেই যথেষ্ট। আসলে, শুধু সিগারেট খাওয়া নয়, তাপস যে হেডমাস্টারের কথা নতমস্তকে মেনে নেয়নি, সেইটাই আসল দোষ। প্রবীণ হেডমাস্টার যখন সিগরেট খাওয়া নিয়ে আপত্তি করেছিলেন, তখন তরুণ শিক্ষকের উচিত ছিল লাজুক মুখে নখ খুঁটতে খুঁটতে বলা, ভুল হয়ে গেছে স্যার, আর করব না। প্রধান শিক্ষককে অন্য শিক্ষকরা শ্রদ্ধা করবে, এইটাই তো নিয়ম। কিন্তু শ্রদ্ধা করবেই-বা কী করে? হেডমাস্টার মশাই তাপসকে একটা চিঠি লিখেছিলেন বাংলায়, তাপস সেটা আমাদের দেখিয়েছিল হাসতে হাসতে, চোদ্দো লাইনের চিঠিতে পাঁচটা বানান ভুল, গোটা দশেক ইংরিজি শব্দ। হেডমাস্টার মশাই ইতিহাসের লোক, তাই তাঁর চিঠিতে বানান ভুল থাকবে? একটা গোটা বাংলা চিঠিও লিখতে জানবেন না? এদের হাতে শিক্ষার ভার, এরা প্রধান শিক্ষক, এদের লোকে শ্রদ্ধা করবে কী করে? নিজের বানান ভুল না শুধরে অন্যের সিগারেট খাওয়ার দোষ ধরতে এসেছে!

তাপস আর একটা ইন্টারভিউ'র গল্প বলেছিল, শুনে হাসতে হাসতে আমরা মরি। রেলওয়ের গুডস ডিপার্টমেন্টের একটা কেরানির চাকরি। কেরানির চাকরি, তারই ইন্টারভিউ নিচ্ছে পাঁচ জন

জাঁদরেল অফিসার। তিন জন বাঙালি, এক জন পাঞ্জাবি, এক জন মাদ্রাজি। ইন্টারভিউতে ডাকা হয়েছে শ'খানেক ছেলেকে, তার মধ্যে এমএ পাশই জনাদশেক। তাপস ঢোকার পর সবাই নিবিষ্ট ভাবে ওর অ্যাপ্লিকেশনটা পড়তে লাগল। রেলের চাকরির অ্যাপ্লিকেশনে নাকি চোদ্দো পুরুষের ঠিকুজি কুষ্ঠি সব দিতে হয়, তবু ওদের এক জন তাপসকে আবার নাম, বয়স, কত দূর লেখাপড়া, এ-সব জিজ্ঞেস করল। তাপস কোনও গোলমাল না করে উত্তর দিয়েছে। গোঁফওয়ালা পাঞ্জাবিটা বলল, তোমার তো স্বাস্থ্য বেশ ভালই আছে, তুমি এ চাকরি করতে এসেছ কেন?

তাপস বলল, একটা কোনও চাকরি তো করতে হবে। আর কোনও চাকরি পাচ্ছি না।

তুমি এ কাজ পারবে?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি দায়িত্বের সঙ্গে সব কাজ করব এবং নিশ্চিত আশা করি, আমার কাজে আপনাদের খুশি করতে পারব।

অর্থাৎ তাপস বেশ বিনীত ভাবেই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ এক জন আচমকা জিজ্ঞেস করল, তুমি জানো, আকবর কত সালে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন?

তাপস চমকে গিয়েছিল, তবু বিনীত ভাবে বলেছে, ঠিক মনে নেই। এ চাকরির পক্ষে এটা জানা খুব দরকারি কি?

এ-সব সাধারণ জ্ঞান। সমস্ত শিক্ষিত লোকেরই জানা উচিত।

না, আমি ঠিক জানি না।

পৃথিবীতে তুলোর চাষ সব চেয়ে বেশি কোথায় হয়?

এটাও আমি ঠিক জানি না। পরে জেনে নিতে পারি।

ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো। নেক্‌স্ট।

এইবার তাপস জেগে উঠল। টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে বলল, স্যার আমার ইন্টারভিউ হয়ে গেল? আমার চাকরির খুবই দরকার, আমার ইংরিজি লেখার পরীক্ষা নিলেন না?

তোমার হয়ে গেছে, তুমি যেতে পারো।

না স্যার, অত সহজে আমি যাচ্ছি না। আমিও দু-একটা সাধারণ জ্ঞানের কথা আপনাদের কাছে জেনে যাব। বলুন তো, সিরাজদৌল্লার বাবার নাম কী? আমি এটা জানি। আপনি জানেন?

বলছি তো তুমি এখন যেতে পারো, বেয়ারা।

মাইরি আর কী, বেয়ারা ডাকলেই আমি যাচ্ছি! ওটা খুব শক্ত, না? আচ্ছা, বলুন তো, কোন সালে প্রথম বাষ্প এঞ্জিন চলেছিল? বলুন।

বেয়ারা, বাবুকো দরজা দেখা দেও।

ও-সব বেয়ারা-ফেয়ারা ডেকে কোনও লাভ হবে না। একটা সাধারণ জ্ঞানের কথা আমি জেনে যাবই। তোমাদের মধ্যে কার ক্যান্ডিডেট ঠিক করা আছে আগে থেকে?

বেয়ারা, দরোওয়ানকো বোলাও।

আবার দরোওয়ান দেখানো হচ্ছে। ও-কথার জবাব না পেলে আমি এখানে ডিগবাজি খাব, কাপড় খুলে নাচব, তোমাদের থুতনিতে চুমু খাব। ইয়ার্কি পেয়েছ শালারা? তোমাদের গুষ্টির পিণ্ডি করব আজ!

শেষ পর্যন্ত দরোওয়ানরা এসেই ওকে টেনে-হিঁচড়ে বার করে দেয়। তাপস অনবরত আস্ফালন করতে থাকে, সেই ইন্টারভিউ বোর্ডের পাঁচ জনের ও সর্বনাশ করে দেবে।

কিন্তু কিছুই সর্বনাশ তাপস ওদের করতে পারেনি। ওরা মোটরগাড়িতে চেপে ঘোরাঘুরি করে। সাহেবপাড়ায় থাকে, ওদের সমাজ আলাদা, দুর্গের মতো সে-সমাজ সুরক্ষিত। তাপসরা সেখানে কিছুই করতে পারে না। তাপস অবশ্য এখনও শাসায়, ও আর সারা জীবনে রেলে চড়ার সময় টিকিট কাটবে না, সুযোগ পেলেই রেলের বাথরুমে আয়নার কাচ ভাঙবে, বাল্ব চুরি করবে। কিন্তু তাতে ওদের কী ক্ষতি হবে?

তাপস আজও চাকরি পেল না, আমার বড় মায়া লাগে, যখন তাপস বন্ধুদের কাছে গাড়ি-ভাড়া চায়। যে-রকম সাংঘাতিক লেখক হিসেবে তাপসের নাম, ওইটুকু নামেই যে-কোনও ইংরেজ লেখক লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করত। এক-এক দিন তাপসের মুখখানা শুকনো দেখায়, বড় বেশি গম্ভীর থাকে। সেই সব দিনে ওকে দেখলে ভয় করে, মনে হয়, ও যেন কোনও ভয়ঙ্কর সর্বনাশের প্রতীক্ষায় আছে।

কিন্তু তাপসের কথা আমি ভাবছি কেন? তাপস নিষ্ঠুর, তাপস আমাকে গ্রাহ্য করে না। সেই এক দুপুরবেলা এসেছিল, তারপর থেকে আর আসেনি কখনও একা, ও আর আমাকে একা এসে দেখতে চায় না। আমিই কাঙালিনীর মতো ওর কাছে গিয়েছিলাম কয়েক বার, কী নির্লিপ্ত আর উদাসীন ওর ব্যবহার। একদিন শুধু সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিল, আয় ছায়া, তোকে একটা চুমু খাই। বলার সঙ্গে সঙ্গেই, আমার অনুমতির অপেক্ষা না করেই ঝট করে এগিয়ে এসে আমাকে চুমু খেল, তারপর চলে গেল। যেন হঠাৎই ওর আমাকে চুমু খাওয়ার কথা মনে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে সেটা চুকিয়ে নিল, আবার পরমুহূর্তেই ভুলে গেল আমার কথা। এই মানুষকে কেউ সহ্য করতে পারে? না। তাপস আমার কেউ না। এর চেয়ে বিমলেন্দু অনেক ভাল, বিমলেন্দু অনেক নির্ভরযোগ্য। ওর চোখের দৃষ্টিতে একটা সান্ত্বনা আছে।

কোনও কোনও দিন বিমলেন্দু খোঁজ করে অফিসে, ছায়াদি, আজ বিকেলে কী করছ? একটা ফিল্‌মে যাবে নাকি? বাইবেল হাউসের বারান্দার নিচে বুক-খোলা শার্ট গায়ে বিমলেন্দু দাঁড়িয়ে থাকে। একটু নার্ভাস ভাবে সিগারেট টানে। আমার জন্য কেউ দাঁড়িয়ে আছে ভাবলেই আমার গা শির শির করে, আমার শ্বেতির দাগ-ধরা ঠোঁট জ্বালা করে ওঠে যেন। দূর থেকে যখন হেঁটে আসি হাওয়ার বিপরীত দিক দিয়ে, শাড়ি উড়তে থাকে, বিমলেন্দুকে দেখে আমার লজ্জা করে, কেন লজ্জা করে ঠিক জানি না। সিনেমার অন্ধকারে বসে অন্য মনস্ক ভাবে বিমলেন্দু আমার বাঁ-দিকের বুকে চাপ দেয়। আমিও মাঝে মাঝে ওর হাত ধরে খেলা করি। এক-এক সময় ওর কোলের ওপর হাত রাখি। বোকা, অত্যন্ত বোকা ছেলেটা, বোকা —। আমি হাত সরিয়ে নিই না। আমার ভাল লাগে। বিমলেন্দুকে কোনও দিন চূড়ান্ত প্রশ্রয় দিইনি। কখনও ইশারাও জানাইনি। দেখতে চাই, ও কী করে। কোনও দিন হঠাৎ হুড়মুড় করে আমাকে জড়িয়ে ধরে কি না। অথবা এমন হতে পারে, আমি বিমলেন্দুকে পছন্দ করি না, আসলে ওকে দু'চোখে দেখতে পারি না। ওর ওই নির্লিপ্ত, হাঁসের পালকের মতো মুখ কেন কোনও মেয়েকে দেখায়? কেন বিমলেন্দু আসে আমার কাছে, ওর কী আর কোনও মেয়ে-বন্ধু নেই, না ও আমাকে ভালবাসে? নাকি ও আমাকে নিঃসঙ্গ মনে করে সঙ্গ দিতে আসে? বিমলেন্দু আমাদের মধ্যে সব চেয়ে বিখ্যাত, গল্প কবিতা দুটোই ভাল লেখে, প্রবন্ধ সমালোচনার দিকেও আছে, বড় কলেজের জনপ্রিয় অধ্যাপক। প্রবীণ লেখকরা আমাদের মধ্যে বিমলেন্দুকে দেখলেই সাগ্রহে চিনতে পারে — আমাকেও চেনে অনেকে, সেটা আমি মেয়ে বলে। কিন্তু বিমলেন্দুকে আমি বোধহয় চাই না, আমি চাই একটা ছটফটে, দুর্দান্ত, কেয়ারলেস যুবক। কার মতো? কার মতো? অবিনাশের না, অম্লানের মতো, একটু আনন্দ হলেই যে কোমর থেকে বেল্টখানা খুলে বোঁ বোঁ করে ঘোরায়।

যে-সব বিকেলে বিমলেন্দু আসে না, সাধারণত কোনও কাগজের অফিসে যাই, অথবা বাড়ি ফিরে আসি। মায়া সন্ধের পর বাড়ির বাইরে থাকে না, দু'জনে বসে দাবা খেলি। পিসিমা চায়ের সঙ্গে গরম-গরম ফুলকপি বা ওমলেট ভাজা দেন। রাত্রে খাওয়ার পর লিখতে বসি, অনেক লেখা পছন্দ হয় না, ছিঁড়ে ফেলি, কিন্তু প্রত্যেক দিন কিছু না-কিছু না লিখলে আমার ভাল লাগে না।

রাত্রে ঘুম আসে না, সাধারণত ঘুমের কথা ভাবি। এক-এক রাত্রে আমার শয্যাকণ্টকী হয়, বিছানার কোনও জায়গায় শরীর ছোঁয়াতে ইচ্ছে করে না, অসহ্য বমি বমি লাগে। মনে হয়, মা আমার পাশে শুয়ে আছে। মায়ের জন্য কষ্ট হয়।

এই রকম আমার জীবনের দিন কাটে। কিন্তু কী-ভাবে কাটাতে চাই? আমার ইচ্ছে করে না চাকরি করতে, ইচ্ছে হয় সকাল ন'টা পর্যন্ত ঘুমোই, ইচ্ছে হয়, প্রতি কথায় গালাগালি করি, রাস্তাঘাটের বখা ছেলেরা যে-রকম মুখ-খারাপ কুৎসিত কথা বলে, আমারও ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে সেই রকম বলি, দুর শালা, দুর — ছাপার অযোগ্য, তোমার ইয়েতে ইয়ে দিই। ইচ্ছে হয় খারাপ মেয়ের মতো কোমর দুলিয়ে হাঁটি। কখনও এ-সব বলতে বা করতে পারব না, তবু ইচ্ছে হয়। আয়নার সামনে এই রকম ভঙ্গি করে দেখি। ইচ্ছে করে, সারা দিন শুধু শায়া আর ব্লাউজ পরে থাকি। দুটো ষণ্ডামার্কা চাকর থাকবে, হুকুম মতো তারা আমার ফুটফরমাস খাটবে, ধমকালে কুঁকড়ে যাবে, সাহস করবে না চোখের দিকে তাকাতে। ইচ্ছে করে, গোপনে তাপসের বুকে ছুরি বসিয়ে দিই। কিংবা নিজের বুকে।

এ ছাড়া, একা একা কান্না পায়। মায়া না থাকলে আমি বাড়িতে শুয়ে কাঁদি। আসলে সারা দিন আমি কী করি, তা জানি না। আমি কী করতে চাই, তা জানি না। আমি খুবই শিগগির মরে যাব, জানি। আমার কান্না পায়। মা, তোমার জন্য আমার বিষম মন কেমন করে।

অনিমেষ

একটু সন্ধে হয়ে এসেছিল, তাই মাঠের মধ্য দিয়েই জিপ চালিয়ে দিয়েছিলাম। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, রণছোড়, তোমার ফিরে যাবার তেল আছে তো? কথাটা জিজ্ঞেস করার পরই আমাব লজ্জা হল। প্রায়ই আমি ভুলে যাই যে, ও বোবা। রণছোড় ওর বিশাল দুটো চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল। বুঝলাম, আছে। বোবা বলেই কি রণছোড়ের চোখদুটো এত বড? ওর চোখ সব কথার উত্তর দিতে পারে, কোনও মেয়ের চোখও এত পারে না। তাছাড়া ওর চোখের ভাষাও খুব সরল, শিশুরাও বুঝতে পারে। কিন্তু মেয়েদের চোখে ভাষা পড়তে হলে আলাদা বিদ্যে লাগে, আমাব তা নেই।

দূর থেকে আমার বাড়িটা দেখতে পেলাম। সব ঘরে আলো জ্বালা। গায়ত্রী সব ঘরে আলো জ্বেলে রাখতে ভালবাসে। একটা জানলায় ও বসে আছে। ও কী আমার জন্য বসে আছে, নাকি আলো জ্বালা ঘরে বসে দূরের অন্ধকার দেখতে ভাল লাগে। একটা কুকুর ডেকে উঠল প্রচণ্ড ঘেউ-ঘেউ করে। ডাকটা খুব মানিয়ে গেল। দূরে আলো জ্বালা বাড়ি, মাঠে অন্ধকার, অন্য মনস্ক নীল আকাশ — এর মধ্যে একটা কুকুরের ডাক না থাকলে মানাচ্ছিল না।

আজ সকালে অবিনাশ একটা চিঠি লিখেছে। কতবার বলেছি, অফিসের ঠিকানায় চিঠি দিতে, বাড়িতে নয়, ওর খেয়াল থাকে না। গায়ত্রীর একটা খারাপ স্বভাব আছে, চিঠি খুলে পড়া। কলকাতার মেয়েরা এ-সব করে না, স্বামীর চিঠিও খোলে না। কাশীর মেয়েদের ও-শিক্ষা নেই। আমার বন্ধুবান্ধবদের চিঠি গায়ত্রীর পক্ষে হজম করা একটু শক্ত। গায়ত্রী বলেছিল, কী অসভ্য আর কাঠখোট্টা তোমার বন্ধুগুলো। লিখেছে, মল্লিকাটা মারা গেছে। একটা মেয়ে, তা-ও মারা গেছে, তার সম্বন্ধে 'মল্লিকাটা'

কী? কী ভাগ্য আমার, মল্লিকা সম্বন্ধে বিস্তারিত লেখেনি, তাই আমি বললাম, মল্লিকা হল শেখরের ছোট বোন। খুব বাচ্চা তো, অবিনাশ ওকে খুব ভালবাসত, ওদের বাড়ি গেলেই খেলা করত তাই। মল্লিকা মারা গেছে, সে-খবর আমাকে জানাবার দরকারই-বা কী ছিল মল্লিকার কাছে আমি কখনও যাইনি, ওদের মুখেই নাম শুনেছিলাম, তাপস খুব বলত, তাপসের বোধহয় ওই বেশ্যাটির উপর সত্যিই খুব টান ছিল। আর অবিনাশের তো সবাইকেই ভাল লাগে। মেয়েটা নাকি কোন বিখ্যাত অভিনেতার বে-আইনি মেয়ে।

অবিনাশ লিখেছে, পরীক্ষিৎ ভাল আছে। মাথার ব্যান্ডেজ খুলে ফেলেছে। ওঃ, সে-দিনের রাত্রের কথা ভাবলেও ভয় হয়। পরীক্ষিতের ও-রকম মদ খাওয়া নিয়ে হইচই করা আমি মোটেই পছন্দ করি না এই জন্য। আর মদ খেয়ে ব্রিজের রেলিঙে বসা কেন? অপঘাতে মৃত্যুই পরীক্ষিতের নিয়তি। হঠাৎ একটা আর্তস্বর, তার পরেই নিচের নদীতে শব্দ। গায়ত্রী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিল, ফিরে এসে ব্রিজের কোণে দাঁড়িয়ে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। আমি কাছে যেতেই বলল, আমার আজ কেন জানি না ভাল লাগছে না, বোধহয় শরীরটা খারাপ, না এলেই ভাল হত মনে হচ্ছে। এই সময় ওই কাণ্ড। হা-হা-হা করে চারপাশের দোকান-জঙ্গল-মন্দির থেকে নিমেষে কয়েকশো লোক ছুটে এল। আমরা দু'জনে দৌড়ে এলাম। আমি ছুটে গিয়ে ওর হাত চেপে ধরে বললুম, কী হয়েছে? পরীক্ষিৎ পড়ে গেছে হাত ছাড়ুন, ওকে খুঁজে আনি। কথাটা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। পরীক্ষিৎ পড়ে গেছে, আর অবিনাশ এখান থেকে লাফিয়ে পড়বে তাকে বাঁচাবার জন্য? কোনটা বেশি ভয়ঙ্কর, পবীক্ষিতের পড়ে যাওয়া. না অবিনাশের এখান থেকে লাফিয়ে ওকে খোঁজা? আমি এক মুহূর্তে বুঝতে পারলাম না। এখান থেকে লাফালে কেউ বাঁচে? পরীক্ষিতের এতক্ষণে কী হয়েছে কে জানে। এর নাম বন্ধুত্ব, অবিনাশের মতো ও-রকম অকপট দুঃসাহসী আমি আগে কখনও দেখিনি। আমি আর গায়ত্রী দু'জনে ওর হাত চেপে ধরলাম প্রাণপণে। অবিনাশ হ্যাঁচকা টান মারতে মারতে বলল, ছাড়ুন না, আমাব কিছু হবে না। দেখি ওকে বাঁচানো যায় কি না। শেষ পর্যন্ত চা-ওয়ালা বিষ্টু ওকে জোর করে পাঁজাকোলা করে নামিয়ে এনে বলল, পাগল হয়েছেন আপনি মশাই, চলুন ব্রিজের নিচে যাই। আমি এক ফাঁকে তাকিয়ে দেখলাম, ব্রিজের নিচে অন্ধকার, ভাঙা ভাঙা চাঁদের আলো, আর কিছু নেই। পরীক্ষিৎকে দেখা যাচ্ছে না। আমাদের সামনে সকলের আগে ছুটে গেল অবিনাশ, জামা-কাপড় খুলে সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আমি এ-সব উত্তেজনা সইতে পারি না, এমন ছুটোছুটি চিৎকার। পরীক্ষিৎ মরে গেছে, এ-কথা ভেবে আমার বুকের মধ্যে দ্রিম দ্রিম করে শব্দ হচ্ছিল। আমি জলে ঝাঁপিয়ে পড়িনি, পাশে দাঁড়িয়েছিলাম, তার কারণ আমি সাঁতার জানি না। ওরা কি কেউ ভাবল, আমি শীতের ভয়ে জলে নামলাম না? বা প্রাণের ভয়ে? আমি সাঁতার জানি না, এ-কথা গায়ত্রীও হয়তো জানে না। ওর সামনে কখনও নদীতে বা পুকুরে স্নান করেছি বলে মনে পড়ে না। আমি ছেলেবেলায় একবার জলে ডুবে গিয়েছিলাম, সেই স্মৃতি আমি কখনও ভুলি না। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, পরীক্ষিৎ জলের নিচের নীল অন্ধকারে কী যেন খুঁজছে। বাতাস — এইমাত্র ওর বুক থেকে যে শেষ বাতাস ও বার করে দিয়েছে সেটুকু আবার ফিরিয়ে আনা যায় কি না প্রাণপণে খুঁজছে। ওর জন্য বুক ভর্তি বাতাস নিয়ে অবিনাশ গেছে, পরীক্ষিতের মুখের মধ্যে ফুঁ দিয়ে অবিনাশ বাতাস ঢুকিয়ে দেবে। আমিও বুক ভর্তি বাতাস নিয়ে পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি, আমি জলে নেমে পড়ার সাহস পেলাম না।

পরীক্ষিৎ মরার ছেলে নয়, এক সময় ও দেশবন্ধু পাকে ছেলেদের সাঁতার শেখাত। যখন খুব পয়সার দরকার, পরীক্ষিৎ তখন দেশবন্ধু পার্কের পুকুরের ছোট দ্বীপটায় মাথায় একটা তোয়ালে বেঁধে

দাঁড়িয়ে চেঁচাত — কে কে সাঁতার শিখবে, দু'আনা, দু'আনা, ছুটে এসো ছেলেরা, দু'আনা দু'আনা। সাত দিনে পুকুর পার করা শিখিয়ে দেব, দু'আনা, সাতদিনে পুকুর পার করা শিখিয়ে দেব, দু'আনা, দু'আনা। তখন পুকুরটা এ-রকম বাঁধানো ছিল না, ভাঙাচোরা। গরমের দিনে ছেলেরা বিকেলে এসে দাপাদাপি করত, মন্দ আয় হত না পরীক্ষিতের। দিনে বারো-চোদ্দো আনা। মাঝে মাঝে এক ডুবে পুকুরের মধ্য থেকে মাটি তোলার খেলা দেখাত। সুতরাং, জলে ডুবে মরা পরীক্ষিতের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু আচমকা অত উঁচু থেকে পড়ে যাওয়া, তাছাড়া এ-সব পাহাড়ি নদীতে আগাগোড়া পাথর ছড়ানো, মাথায় আঘাত লাগলেই আর বাঁচবার আশা নেই।

অবিনাশ জলে ঝাঁপিয়ে খানিকটা খোঁজাখুঁজি করতেই আমি চেঁচিয়ে বললাম, ওই যে, ওই যে। ব্রিজের একটা থাম ধরে পরীক্ষিৎ জলে ভেসে ছিল, অন্ধকার মুখে একটাও শব্দ নেই। চা-ওয়ালা বিষ্টু আর অবিনাশ ওকে ধরে নিয়ে এল পাড়ে। রক্তে জল ভেসে যাচ্ছে, পরীক্ষিতের তখনও জ্ঞান ছিল, বলল, আর বেশিক্ষণ থাকতে পারতুম না, মাথায় খুব লেগেছে। হাসপাতালে পৌঁছুবার আগেই ও অজ্ঞান হয়ে পড়ল, ভয়ঙ্করভাবে ওর মাথা ফেটে গেছে। অবিনাশ ওর মাথাটা চেপে ধরে আছে, চুঁইয়ে চুঁইয়ে তবু পড়ছে রক্ত। ডাক্তারের সামনে গিয়ে যখন অবিনাশ হাতটা তুলল, ওর দুই হাতের পাঞ্জা টকটকে লাল। আঙুল বিস্ফারিত করে অবিনাশ ওর ডান হাতের লাল পাঞ্জা আমার চোখের সামনে তুলে ধরল। মুখে কোনও বিকার নেই। আমার মাথা ঝিম ঝিম করে উঠেছিল।

খাওয়া শেষ করে একটা পাইপ ধরিয়ে জানলার পাশে বসলাম। পাইপ খাওয়া নতুন শিখেছি, বেশ চমৎকার লাগে একা একা। গায়ত্রী টুকিটাকি কাজ শেষ করছে। অনেক দিন কিছু লিখিনি। লেখার কথা ভাবলেই বুকের মধ্যে কী-রকম যেন একটা শব্দ হয়। সিনেমার থিম মিউজিকের মতো। বেশ তো ঘুরছি ফিরছি, গায়ত্রীকে আদর করছি, বন্ধু-বান্ধবের কথা ভাবছি, নদী দেখলেই পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছি — তবু মনে হয় কত দিন একটাও কবিতা লিখিনি, অমনি বুকের মধ্যে ওই থিম মিউজিকটা ফিরে আসে। সুরটা দুঃখের নয়, রাগের, যে যে জিনিসকে ভাল লেগেছিল, তাদের উপর অসম্ভব রাগ হয়। মনে হয়, তোমাদের ভাল লেগেছিল? তোমাদের তবে কবিতায় আনতে পারলাম না কেন? কেন আমার ভাষা গরিব হয়ে যায়? মনে হয় হেরে গেলুম। কার কাছে? ঈশ্বরের কাছে। এই গাছপালা, পাহাড়, নদী, আকাশ যে-ঈশ্বরের ভাষা, তার কাছে। তখন মনে হয়, গাছের ছাল ছাড়িয়ে দেখি, ফুলের সমস্ত পাপড়ি খুলে ফেলি। গায়ত্রীর সঙ্গে রাতের কাণ্ড করি আমি আলো জেলে, ওর সমস্ত কাপড়-জামা খুলেও ওই স্ত্রী-শরীরের দিকে তাকাতে আমার ইচ্ছে করে না, ইচ্ছে করে ওর ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে নিই, বুকটা ফাঁক করে দেখি, কেন ওই বুকে মুখ রাখতে আমার ভাল লেগেছিল।

কেন, কেন, কেন-এর উত্তর খুঁজতেই সময় কেটে যায়। কেন এটা সুন্দর, কেন ওটা কুৎসিত এ প্রশ্ন নয়, কেন এটা আমার ভাল লাগল, কেন ওটা আমার ভাল লাগেনি এই অসঙ্গত প্রশ্ন। ভাল লাগে, তবে বিশেষ কিছুই আজকাল নতুন লাগে না। সবই মনে হয় আগে দেখেছি। যে-কোনও দৃশ্য, যে-কোনও মানুষ দেখলেই মনে হয়, আগে ওদের দেখেছি। যদি কখনও বিলেত-আমেরিকায় যাই, তাহলেও আমার নিশ্চিত ধারণা, সেখানকার সব কিছু দেখেই আমার ধারণা হবে, এ-সব আমি দেখেছি অনেক আগে। বহু আগেই এ-সব আমার দেখা। তবে কী যারা অ্যাটম বোম বানাচ্ছে — তারা কবিদের চেয়েও বড় প্রজাতি? তারা ঈশ্বরের সৃষ্টিকে ধ্বংস করার চ্যালেঞ্জ নিয়েছে, ওরাও সৃষ্টি করছে — ধ্বংসের দৃশ্য, দৃশ্য হিসেবে তা-ও নতুন, স্নায়ু আর মাথার ধূসর কম্পনে মানুষ অনেক ধারণা, রসের স্বাদ পেয়েছে। কিন্তু অ্যাটম বোমওয়ালারা একটা নতুন রসের সন্ধান দিয়েছে, সামগ্রিক মৃত্যুচিন্তা। এত দিন মানুষ শুধু নিজের মৃত্যু বা প্রিয়জনের মৃত্যুর কথা ভেবেছে, সাহিত্যেও ওই সব

মৃত্যুর কথা। কিন্তু একটা মহাদেশ বা সমস্ত মানুষ জাতটার জন্য মৃত্যুভয় আমি একা একা ভোগ করছি এখন। সাহিত্য এর ধাক্কা সামলাতে পারছে না। প্রথম অ্যাটম বোমা ফাটার পরীক্ষার সময় ওপেনহাইমার বিড় বিড় করে ভগবদ্‌গীতা আউড়েছিল। আমি তো গীতা পড়ে ভাল বুঝতে পারিনি।

পরীক্ষিতের কবিতার বইটা উলটে-পালটে দেখছিলাম আর একবার। অন্ধের মতো, নির্বোধের মতো লিখেছে, তাই ওর প্রত্যেকটির লাইন এমন জোরালো, এমন বিস্ফোরণের মতো। ওর শব্দ সম্বন্ধে কোনওই জ্ঞান নেই। শব্দ নিয়ে ভাবে না, তাই ওর প্রতিটি শব্দ অব্যর্থ। ওর চোখ ওর মাথার চারপাশে ঘোরে, যে-কোনও একটা জিনিস ওকে হঠাৎ আকর্ষণ করে। আকর্ষণ? না, পরীক্ষিৎ আকর্ষণ কথাটা ব্যবহার করত না। ও বলত, ডাক দেয়। ওর ভাব খুব কম। মেয়েরাও ওকে ডাকে, ফুলও ডাকে, ভালবাসাও ডাকে। অবিনাশ লিখত, হ্যাঁচকা টান মেরে। ভালবাসার হ্যাঁচকা টানে ঢুকে গেলাম গর্তে, মৃত্যু বলে ভেবেছিলাম, কিন্তু পরিবর্তে, পেলাম আধঘণ্টা ক্লান্তি। অবিনাশের সেই বিখ্যাত পদ্য যা কলেজের ছেলেরা এক সময় খুব আওড়াত। পরীক্ষিৎকে চ্যালেঞ্জ করে অবিনাশ এক সময় গুটি আষ্টেক কবিতা লিখেছিল, প্রত্যেকটি বিখ্যাত হয়েছিল। তারপর হঠাৎ কবিতা লেখা ছেড়ে দিল। গল্পও লিখেছিল গোটা কয়েক, তা নিয়ে হই হই কাণ্ড। কী বিকট, কী অশ্লীল, সেইসব লেখা, এই রব উঠল সাহিত্যের বাজারে। অবিনাশ বলেছিল তখন, একটা উপন্যাস লিখে দেশটা কাঁপিয়ে দেব, বারোটা বাজিয়ে দেব সাহিত্যের। বোধহয় দু-তিন পাতা লিখেছিলও, তারপর হঠাৎ এক দিন সক্কালবেলা পরীক্ষিৎকে গিয়ে বলল, ভাই, মাফ্ কর, ও-সব আমার দ্বারা হবে না, বড় ঝামেলা। আমি শান্তিতে পুরোপুরি রকম বাঁচতে চাই। ক'দিন ধরে উপন্যাসের কথা ভাবতে ভাবতে এমন মজে গেছি যে, কাল সন্ধেবেলায় রাস্তায় একটা সুন্দরী মেয়ে দেখে আমার উত্তেজনা হল না, এ কী? নিজের জীবনটা নষ্ট করে গল্পের নায়ক-নায়িকাকে বাঁচিয়ে তোলা আমার দ্বারা হবে না। নিজের জীবনের এমন চমৎকার সময়গুলো নষ্ট করে, খামোকা গল্প-উপন্যাস লিখে লাভ কী? আমি ভাই ভালভাবে খেয়ে-পরে বাঁচতে চাই। সাহিত্য-ফাহিত্য করে যত বোকার দল। পরীক্ষিৎ বলেছিল, মেরে তোর দাঁত খুলে নেব। জানোয়ার নাকি তুই যে, খালি খাব আর —।

অবিনাশ জানে, নির্বোধ ছাড়া কেউ অমরত্বের কথা ভাবে না। যত দিন বাঁচা সম্ভব, যে-রকম ইচ্ছে বাঁচব, লিখে বা না লিখে। পরীক্ষিৎকে চিনতে ভুল হয় না ওই রকম মদ খাওয়া, পাগলামি, হই হই — পৃথিবীর বহু কবির জীবনীতে এ-সব দেখা গেছে। পরীক্ষিৎকে দেখলেই মনে পড়ে আমার হফম্যানের সেই গল্পের নায়কের কথা, যে নিজের ছায়াটাকে বিক্রি করে দিয়েছিল। পরীক্ষিৎ সাহিত্য করার জন্য ওর ছায়াটা বিক্রি করে দিয়েছে। কিন্তু অবিনাশকে চেনা যায় না। তবে আত্মাটা বিশাল অবিনাশের, বিমলেন্দু ছাড়া ও-রকম ক্ষমতাবান লেখক আমাদের মধ্যে কেউ নেই, আমার মনে হয়। বিমলেন্দু না তাপস? পরীক্ষিৎরা বলে, তাপসই সত্যিকারের জাত লেখক, বিমলটা কমার্শিয়াল। আমার তাপসের লেখা ভাল লাগে না। ও আমার ছেলেবেলার বন্ধু কিন্তু ওর ওই অদ্ভুত নিষ্ঠুরতা, কবিত্বহীনতা আমার সহ্য হয় না। তাপসকে আমি বিশ্বাস করি, ও লেখে, না কলম দিয়ে থুতু ছেটায়, আমি বুঝতে পারি না। মানুষ হিসেবেও তাপস অবিশ্বাসযোগ্য।

বিমলেন্দুকে ওরা পছন্দ করে না, কারণ ও ছন্নছাড়া, ওর মুখ দিয়ে শিল্প সম্বন্ধে কোনও কথা বেরোয় না। আসলে বিমলেন্দু সব চেয়ে নতুন কথা লেখে। এ-কথা আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছি, সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে ও-সব মদ খাওয়া কিংবা হই-হুল্লোড়ের কোনও সম্পর্ক নেই। মানুষের মধ্যেও যেমন একদল মদ খায় না, একদল খেতে ভালবাসে, লেখকদের মধ্যেও তাই। আলাদা আর কোনও জাত-বিচার নেই। আমিও তো মদ-টদ খেতে ভালবাসি না, বিমলেন্দু তো একেবারেই খায় না। ওর

সঙ্গে আমার আলাপ অদ্ভুত ভাবে। ও তখন অরুণোদয় কাগজে সহ-সম্পাদকের চাকরি করে। হস্টেলে থাকি, আমি তখন কবিতা লিখতাম না। ওর কাগজে একটা গল্প পাঠিয়েছিলাম, গল্পটা এক জন মুমূর্ষু কবিকে নিয়ে। সেই গল্পের মধ্যে সেই কবির রচনা হিসেবে কয়েক লাইন কবিতাও ছিল। হঠাৎ এক দিন বিমলেন্দু দেখা করতে এল হস্টেলে, জিজ্ঞেস করল, অনিমেষ মিত্র কার নাম? আমরা তখন কমন রুমে টেবিল টেনিস খেলছিলাম। পরীক্ষিৎ বলল ফিসফিস করে, ওই ভদ্রলোক বিমলেন্দু মুখার্জি। পরীক্ষিৎ তখন বিমলেন্দুকে খুব ঈর্ষা করে।

কবি বিমলেন্দু মুখার্জি আমাকে খুঁজছেন? আমি প্রায় শিউরে উঠেছিলাম। বিমলেন্দু তখন থেকেই বেশ নাম করা। তাড়াতাড়ি আমার ঘরে ডেকে নিয়ে গেলাম। ধুতির সঙ্গে ফুলশার্ট পরা, ফর্সা, শান্ত ধরনের চেহারা, কিন্তু গলার আওয়াজ শুনলে মনে হয়, খুব আত্মবিশ্বাস আছে। বিমলেন্দুকে প্রথম দিন দেখেই আমার ভাল লেগেছিল। ও মেয়ে হলে বলা যেত, লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। পরীক্ষিতের দিকে একবার আড়চোখে তাকাল বিমলেন্দু। বেশি ভূমিকা করল না। পকেট থেকে সিগারেট বার করে টানতে টানতে বলল, আপনি 'অরুণোদয়ে' যে-গল্পটা পাঠিয়েছেন, সেটা ভাল হয়নি।

আমি অবাক। গল্প ভাল হলেও পাত্তা পাওয়া যায় না, আর খারাপ গল্পের জন্য সম্পাদক বাড়ি বয়ে এসেছে সমালোচনা করতে? আমি আমতা আমতা করতে লাগলাম। পরীক্ষিৎ এক কোণে দাঁড়িয়ে আয়নায় চুল আঁচড়াবার ভান করছিল। হঠাৎ বলল, আমি পরীক্ষিৎ ব্যানার্জি বলছি, গল্পটা ভালই, আমি ওটা পড়েছি।

মোটেই না, ওটা যাচ্ছেতাই হয়েছে, বিমলেন্দু বলল, ওটা গল্পই হয়নি, গপ্প।

পরীক্ষিৎ প্রায় মারমুখী হয়ে এগিয়ে এল।

তবে, ওর মধ্যে যে ছোট্ট কবিতাটা আছে, সেটা আমি আলাদা কবিতা হিসাবে ছাপাতে চাই। বিমলেন্দু বলল, কবিতাটা চমৎকার হয়েছে, এত ভাল কবিতা পরীক্ষিৎ ব্যানার্জি ছাড়া অন্য কারুর লেখা ইদানীং পড়িনি।

বুঝলাম, আসলে পরীক্ষিতের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য এসেছিল বিমলেন্দু। আমাকে ছেড়ে ও তখন পরীক্ষিতের সঙ্গেই কথা বলতে লাগল। তবু বিমলেন্দুকে সেই প্রথম দিনই আমার ভাল লেগেছিল।

শনিবার। আজ হাটে হরিণের মাংস উঠেছিল হঠাৎ, রণছোড়কে দিয়ে খানিকটা বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। তারপর অনেকক্ষণ ধরে বাজারের সব দোকান ঘুরে জাফরান কিনতে ইচ্ছা হল। নেই। মধ্যপ্রদেশের এই শহরগুলিতে জাফরান মেলে না। ঘি আর রসুন হাজার দিলেও জাফরান ছাড়া হরিণের মাংস জমে না। গায়ত্রী আবার হরিণের মাংস রান্না করতে জানে কি না, কে জানে! ওর বাবা ছিলেন কাশীর সংস্কৃত অধ্যাপক। কী জানি, হরিণের মাংস খেতেন কি না। আমার বাবা রাকা মাইনসে অনেক দিন ছিলেন, হরিণের মাংস খেতে বড় ভালবাসতেন। হাজারিবাগ গেলেই কিনে আনতেন। লালচে রঙের পচানো হরিণের মাংসের গরম ঝোল রাত্রে বসে খেতাম ছেলেবেলায়, স্পষ্ট মনে পড়ে।

হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারির হৃদয়কে ছিঁড়ে — জীবনানন্দের এই লাইনটা হঠাৎ অকারণেই মনে পড়ল। হরিণের মাংস খাব ভাবতে ভাবতে এ কী একটা উলটো রকমের কবিতার লাইন মনে পড়ল। বিষম গোলমেলে এই লাইনটা তারপর আধঘণ্টা আমার মাথা জুড়ে রইল। আমি হরিণটাকে খাব, না হরিণটা আমাকে খাবে? আমি হরিণের মাংস খাব আর হরিণটা আমাকে খাবে? আমি হরিণের মাংস খাব আর হরিণটা খাবে আমার হৃদয়। কী স্পষ্ট সেই ছবি। আমি রান্নার তারিফ করতে করতে আরামে চিবিয়ে চুষে হরিণের মাংস খাচ্ছি, আর হরিণটা খুব গোপনে আমার হৃৎপিণ্ডটা

ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। যদিও আমি শিকারী নই, তবু ভেবে আমার বুক শিউরে উঠল। অসম্ভব। দরকার নেই আমার হরিণ। হরিণ! কথাটা ভেবে একটু হাসিও পাচ্ছে যদিও। এ-সব ভাবলে তো কোনও মাংসই খাওয়া যায় না। যখন মুরগির মাংস খাই, তখন মরার আগে সেই মুরগিও কী আমাদের হৃদয়ের একটা অংশ খেয়ে যায় না? এসব ভেবে কি আমি গান্ধীবাদী নিরামিষাশী হয়ে যাব নাকি? তা নয়, কবিতার মধ্যে আছে বলেই এ ব্যাপারটা এত মর্মান্তিক লাগছে। শিল্পের সত্য বড় ভয়াবহ। আজ অন্তত হরিণের মাংস খেতে পারব না। খালি একটা হরিণের জ্যান্ত চেহারা আর ছলছলে চোখের কথা মনে পড়ছে। হে ঈশ্বর, আজ যদি গায়ত্রী রাগ করে বলে, হরিণ-টরিণের মাংস আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না, তবে খুব ভাল হয়। আমিও তাহলে একটু রাগ করে রঘুনন্দনের বউকে অনায়াসে ওটা দিয়ে দিতে পারি। হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারির হৃদয়কে ছিঁড়ে...। রঘুনন্দনের বউয়ের হৃদয় নেই। ও যখন বাসন মাজে উঠোনে বসে, ওর সম্পূর্ণ বুক আলগা থাকে। ঘুরতে ফিরতে আমার চোখে পড়ে, ওর কোনও হুঁশ নেই। বুকের নিচে যে-স্ত্রীলোকের হৃদয় থাকে, সে কখনও অপর পুরুষের সামনে অবহেলা ভরে নিজের বুক খুলে রাখে না। স্ত্রীলোকর হৃদয় গোপন রাখার জন্যই বুক গোপন রাখতে হয়। আসলে ও নিজের বুকের ওই দুই চূড়ার মানে জানে না। ভাবে বুঝি কাচ্চা-বাচ্চার জন্য দু'খানা দুধ জমাবার ঘটি। গায়ত্রীরও একটা খারাপ অভ্যেস আছে, রাত্রে শোবার আগে বডিস পরে দুই বগলে স্নো মাখে। মুখে, গালে, বুকে মাখতে পারে, কিন্তু বগলে কেন? গোড়ার দিকে খাটে শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানতে টানতে ওগুলো দেখতে আমার খুব লোভীর মতো ভাল লাগত, মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরতাম। এখন চোখ জিনিসটাকে মনে হয় শরীর থেকে আলাদা। শরীর এক জিনিস চায়, চোখ তা চায় না। গায়ত্রীর শরীর আমার শরীরকে চুম্বকের মতো টানে, অথচ চোখ তখনও চায় অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে, অথচ —।

না, আলো নিভিও না।

হ্যাঁ, এখন ওঠো, কাল আবার ভোরে উঠতে হবে না?

না, আর একটু বসি, তুমি শোও।

কিছু তো লিখছ না, শুধু শুধু তো বসে আছ। তার চে —।

না, লেখা নয়, আমার বসে থাকতেই ভাল লাগে এ-রকম। আজ আমার খুব মন খারাপ লাগছে।

কেন?

গায়ত্রী আমার কাছে এসে দাঁড়াল। এবার ও কাঁধে হাত রাখবে আর তার পরেই কান ধরে টানতে আরম্ভ করবে। এই ওর এক অদ্ভুত আদর। কান টানা। আমি যে ওর পূজনীয় পতিদেবতা, ওর খেয়াল থাকে না। দুই কান ধরে এত জোরে টানে যে, আমার কান জ্বালা করে। আমি রাগ করে ওর নাকটা ধরে টেনে দিই। কিন্তু ওর ফর্সা মুখে নাকটা এত লাল হয়ে ওঠে যে, আমার মায়া হয়।

গায়ত্রী আমাকে একা রেখে দরজাটা ভেজিয়ে চলে গেল। আজ আমার মন খারাপ লাগছে এ-কথাটা হঠাৎ বললাম গায়ত্রীকে, কিছু না ভেবে। নিজের স্ত্রীর কাছে, আজ আমার শরীর খারাপ লাগছে, বলার চেয়ে, মন খারাপ লাগছে, এ-কথাটা বলা অত্যন্ত নিরাপদ। শরীর খারাপ লাগছে, শুনলেই — কী-রকম লাগছে, কোথায় শরীরের উপসর্গ কী কী, ওষুধ এ-রকম হাজার কথা। কিন্তু মন খারাপ লাগছে বললে অন্তত সভ্য স্ত্রীলোকেরা আর সে সম্পর্কে বেশি প্রশ্ন করে না। আসলে আমার শরীর খারাপ লাগছে না মন খারাপ লাগছে, আমি জানি না। এ সম্পর্কে তাপসের থিয়োরি ভারি চমৎকার। তাপস বলে, শরীর খারাপ আর মন খারাপ, এর সীমারেখাটা কোথায় এ-কথা ক'জন বোঝে? আমার তো সন্ধের দিকে যদি বিষম মন খারাপ লাগে, যদি মনে হয় হেরে গেছি, পৃথিবীতে

আমি একা — তাহলেই বুঝতে পারি, দুপুর থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। তখন দু'খানা কচুরি, খানিকটা তরকারি ফাউ আর চার পয়সার দই খেলেই বিষম চাঙ্গা লাগে। আবার মনে হয়, বিশ্ববিজয়ী। নিজেকে যখন ব্যর্থ প্রেমিক মনে হবে, তখন বুঝবি জুতোর পেরেক উঠেছে, হাঁটবার সময় পায়ে ফুটছে, কিন্তু টের পাচ্ছিস না। জীবনে কিছুই করা হল না — এই ধরনের উটকো মন খারাপ হলে বুঝবি, নিশ্চিত হজমের গণ্ডগোল হয়েছে। তাপসের এ কথাগুলো যে সম্পূর্ণ আজগুবি নয়, তা আমি মানি। তবু এ ধরনের গদ্যময় কথা পুরো মানতেও ইচ্ছে করে না। অবিনাশের কতগুলো নিজস্ব কথা আছে। অবিনাশের একটা প্রিয় কথা হল, প্রায়ই বলে রেগে গেলে, যাঃ শালা, শ্মশানের পাশে বসে ব্যবসা কর! এ-কথাটার মানে আমি বুঝতে পারিনি বহু দিন। এখনও হয়তো অবিনাশ কী-ভাবে বলে, আমি জানি না। তবে বছর পাঁচেক আগে আমরা দলবল মিলে শ্মশানে বেড়াতে যেতাম। পাঁচ রকম লোককে দেখতেও ভাল লাগে, তাছাড়া বড় কারণ এই, যখন মদ খাবার জন্য জায়গার অভাব হত, তখন বোতল কিনে নিয়ে শ্মশানে চলে যেতুম। ওখানে, আশ্চর্য্য, কোনও বাধানিষেধ নেই। গঙ্গার পাড়ে বা শ্মশান-বন্ধুদের ঘরে বসে খেতুম, কেউ দেখলেও গ্রাহ্য করত না, এমন স্বাভাবিক।

গগনেন্দ্র, পরীক্ষিৎ, শেখর, অরুণ ওরা আবার সাধুদের দলে বসে গাঁজা খেত। বাঃ, বিনে পয়সায় কী ফাসক্লাস নেশা, এই বলে গগনেন্দ্র ট্রপিক্যালের প্যান্টপরা অবস্থাতেই ধুলোর ওপর বসে পড়ত। অয়েল পেইন্টিং? চলবে? চলুক না এক রাউন্ড। এই বলে গগনেন্দ্র তেলেভাজাওয়ালাকে ডেকে মাঠসুদ্ধ লোককে খাওয়াত। অম্লানটা ছেলেমানুষ, মাঝে মাঝে কাঁদত গোপনে। একটা মড়া পোড়ানো শেষ হয়ে গেছে, মৃতের জ্যেষ্ঠ সন্তান একটা মাটির খুরিতে করে শেষ অস্থিটুকু কাদামাটি চাপা দিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিতে যাচ্ছে। আমি চুপি চুপি অম্লানকে বললাম, আচ্ছা মানুষের সব পুড়ে যায়, ওটা কি পোড়ে না রে? কপাল না নাভি? ওটা কি স্টোন দিয়ে তৈরি? অম্লান বলল, শোন —। তারপর আর কিছু বলে না। আমি দেখলাম অম্লানের চোখে জল চিক চিক করছে। বলল, আমার বাবাকে পোড়াবার পর ওটা পাইনি, জানিস।

কোনটা?

ওই যে ওই অস্থি। আমি তখন অন্য পাশে বসে ছিলাম, হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে। ডোমটা বাঁশ দিয়ে অস্থি খোঁজাখুঁজি করছে। কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না। তখন রাত্ তিনটে। চিতা প্রায় নিভে এসেছে, এখানে সেখানে একটু আগুন। ডোমটা খুঁজছে তো খুঁজছেই। বলল, অস্থি-র আগুন দেখলেই চেনা যায়, অস্থি-র ওপরে লাল রঙের আগুন জ্বলে, একটু ঠাহর করলেই দেখতে পাবেন। আমার তখন, জানিস অনিমেষ, বিষম পায়খানা পেয়েছিল, থাকতে পারছিলাম না। ও-রকম মারাত্মক পায়খানা আমার সারা জীবনে পায়নি। আমি ভাবছিলাম, কোনও রকমে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে স্নান করার সঙ্গে সঙ্গে ও-কাজটা সেরে নেব, কারণ ও-রকম সময়, বাবার শেষচিহ্নটা খোঁজা হচ্ছে আর আমি বলব, আমার পায়খানা পেয়েছে! ভেবে দেখ, এ অসম্ভব। কিন্তু ডোমটা বহু খুঁজেও অস্থিটা পাচ্ছে না, অথচ অস্থি পুড়ে যেতেও পারে না। আমি আর থাকতে না পেরে, এই যে পেয়েছি, বলেই এক টুকরো কাঠকয়লা তুলে মাটি চাপা দিয়ে ছুটে গঙ্গায় চলে গেলাম। অনিমেষ জানিস, আমার বাবার আসল অস্থি বোধহয় শেষ পর্যন্ত কুকুর-বেড়াল খেয়েছে। এই বলে অম্লান হঠাৎ রুমাল বার করে চোখ মুছতে লাগল। ওর এই গল্পটার সঙ্গে কান্নার কী সম্পর্ক আছে ভেবে আমি তো হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। হায়, হায়, আমি যে আগাগোড়াই গল্পটা হাসির গল্প ভেবে মুখখানা হাসি-হাসি করে রেখেছিলাম। পায়খানা পাবার গল্প আবার কান্নার হয় নাকি? সেই দিনই অবশ্য বুঝতে পেরেছি, অম্লান কমার্শিয়াল সাকসেসফুল লেখক হবে। কারণ, ও এখনও জানে যে, শ্মশানে এলে দুঃখিত হতে হয়। অম্লান ইতিমধ্যেই পাঁচখানা উপন্যাসের প্রণেতা।

অবিনাশ এক দিন একটা অদ্ভুত কাজ করেছিল। শ্মশানে। সে-দিনও আমরা একটা গাঁজার দলে বসে গিয়েছিলাম। পরীক্ষিৎ আর শেখর হু-স্ হুস্ করে লম্বা টান মেরে বুকের মধ্যে ধোঁয়া আটকে রাখছে। তারপর পাঁচ মিনিট বাদে দুই নাকের ফুটো দিয়ে মোষের শিঙয়ের মতো সেই ধোঁয়া বার করেছে। আমি দু-একবার টেনেই কাশতে লাগলাম। আমি রাউন্ড থেকে সরে বসলাম। অবিনাশও এ-সবে নেশা পায় না। ও একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ আমাকে আর তাপসকে ডেকে বলল, চল, একটু ঘরে আসি। খানিকটা হেঁটে পাটগুদামের পাশ দিয়ে একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, বাংলা আছে?

বাংলা পান?

না, ছিপি-আটা।

সাড়ে তিন টাকা পাঁইট লাগবে।

এক নম্বর তো? তিনটে ভাঁড় দিও।

আমি অল্প অল্প নিচ্ছিলাম, বাংলা আমার সহ্য হয় না, অবিনাশ ঢক ঢক করে খেতে লাগল, তাপস খুব গম্ভীর। তাপসের বিখ্যাত অন্য মনস্কতা। মাঝে মাঝে ওর হয়, তখন ও উৎকট রকমের চুপ করে থাকে। হিউমার শুনলে হাসে না, তখন বোধহয় কোনও লেখার কথা ভাবে। অবিনাশ জিজ্ঞেস করল, তোর নভেলটা শেষ হয়েছে তাপস? তাপস ঘাড় নেড়ে জানাল, না। অবিনাশ অপর দিকে ফিরে বলল, ও-সব গাঁজা-ফাঁজা টানতে আমার ভাল লাগে না, বঝলেন? ওই পরীক্ষিৎরা টানছে কেন জানেন? কবিতার মশলা খুঁজছে। গাঁজায় নাকি নানা রকমের ইমেজ দেখা যায়। এই ভিখিরির মতো ইমেজ খোঁজা কেন?

আপনার এ-কথা বলা মানায় না, অবিনাশ। আমি বললাম।

কেন?

আপনি তো লেখেন না। আপনার ইমেজের দরকার কী?

ওঃ! অবিনাশ একটু বিব্রত হল। অরুণও তো লেখে না। জীবনে কখনও লেখেনি। ও খায় কেন? আসলে স্বপ্ন দেখার নেশা, দুঃস্বপ্ন দেখার নেশা, স্মৃতি নিয়ে নড়াচাড়া করার নেশা থাকে অনেকের।

আপনার নেই?

না, আমি আর ও-সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে থাকতে চাই না।

আমি হেসে উঠলাম। এ বাসনা আপনার কত দিনের?

আমি তো সরল জীবনই কাটাচ্ছি। কী রে তাপস?

হয়তো। তাপস বলল।

একটা লম্বা চুমুকে বাকিটা শেষ করে অবিনাশ বলল, আমি কলকাতার বাইরে একটা চাকরি খুঁজছি। তাছাড়া আমি যে লিখি না, তা নয়, আমি একটা বড় গল্প লিখেছি।

তাপস সচকিত হয়ে বলল, কবে?

আজ, একটু আগে। গঙ্গার পাড়ে রেলিঙে ভর করে দাঁড়িয়ে। সম্পূর্ণ গল্প, প্রায় পঞ্চাশ পাতার হবে। আশ্চর্য হু-হু করে যেন ট্রেনের মতো গল্পটা আমার চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। এই দেখাটাই তো যথেষ্ট। লিখে আর কী লাভ? পাছে ভুলে যাই, তাই মদ খেয়ে মনের মধ্যে গেঁথে নিলাম।

ভাগ শালা, চালাকির আর জায়গা পাসনি!

বিশ্বাস কর, পুরো গল্পটা কয়েক নিমেষে দেখতে পেলাম।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা শ্মশানের পারে চলে এলাম। আবার সিগারেট আছে? নেই! অবিনাশ একটা দোকানে গিয়ে বলল, দেখি এক প্যাকেট সাদা বিড়ি!

লোকটা সিগারেট দিতে দিতে অকারণে জিজ্ঞেস করল, আপনাদের মড়া চিতায় চেপেছে?

কী?

আপনাদের মড়া চিতায় চেপেছে?

আমাদের মড়া? অবিনাশ গাঁ-গাঁ করে হেসে উঠল। আমাদের মড়া কোথায় রে, অ্যাঁ?

বুঝলাম অবিনাশের নেশা হয়েছে। অবিনাশ বলল, চল, আমাদের মড়া খুঁজে আসি।

আমরা শ্মশানের মধ্যে ঢুকলাম। চারটে চিতা জ্বলছে সমানে ধক ধক করে। অবিনাশ খুশি মনে বলল, আজ বাজার ভাল। গগন থাকলে বলত, আজ অনেক লোক পড়েছে। লোক না টোক। জয় মা কালী বল, লোকে বলে বলবে পাগল হল।

আমরা শ্মশানবন্ধুদের জন্য পাথর বাঁধানো ঘরে ঢুকলাম। একদল লোক সদ্য পোড়ানো শেষ করে আলকাতরা দিয়ে মৃতের নাম লিখছিল দেওয়ালে —

বাবু শিবপ্রসাদ সাঁতরা

বয়স ৭২। মৃত্যু : সাতুই জানুয়ারি

রিটায়ার্ড চৌকিদার

গ্রাম : ঘোলা। পো : ইত্যাদি।

অবিনাশ ওদের পাশে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে ওদের লেখা দেখল। তারপর শেষ হলে, কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, দাদা, একটু আলকাতরা দেবেন, আমাদের মড়ার নামটাও লিখব।

নিশ্চয়, নিশ্চয় লিন না। এক জন মুরুব্বি সহানুভূতির সঙ্গে দিল। অবিনাশ গোটা গোটা অক্ষরে লিখল, সাদা পাথরের দেয়ালে —

বাবু অবিনাশ মিত্র। নিবাস — জানা নাই।

জন্মকাল — জানা নাই। বয়স — জানা নাই

মৃত্যু তারিখ — জানা নাই।

তাপস বলল, আরও লেখ, বাপের নাম জানা নাই।

আমি মুখ ফিরিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। অবিনাশকে এত সেন্টিমেন্টাল হতে আমি আগে দেখিনি।

শ্মশানের কথা মনে পড়লেই সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ে।

সেই ইটালিয়ান ধরনের সুন্দরী পাগলিটার কথা। রোগা, তরুণী, রেনেসাঁস নাক, নীল চোখ। একটা হাফ শায়া আর লাল সাটিনের ব্লাউজ পরে নিবন্ত চিতার পাশে বসে আগুন পোহাত। মেয়েটা এতই রোগা যে, ওর শরীরে রস কতখানি আছে বোঝা যায় না, সেই জন্যেই বোধহয় রাতের বাঘ-ভাল্লুকেরা ওর দিকে তেমন নজর দেয়নি। কিন্তু অমন রূপসী আমি খুব কম দেখেছি অথবা শ্মশানে, নিভন্ত চিতার পাশে ছাড়া কোথাও বসতে দেখিনি। কোনও দিন শুনিনি ওর মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ বার করতে। গগনেন্দ্র বড় ভালবাসত মেয়েটাকে। সোয়েটারের দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে গগনেন্দ্র সোজা তাকিয়ে থাকত মেয়েটার দিকে। আর বিড় বিড় করে বলত, হে শ্মশানের ঈশ্বর, ওই মেয়েটাকে অন্তত এক ঘণ্টার জন্য আমাকে দাও। তাপস পাশে দাঁড়িয়ে হাসত, তখন গগনেন্দ্র বলত, যান না, দেখুন, অন্তত একবার, যত টাকা খরচ হোক।

নিভন্ত চিতার আশেপাশেও লোক থাকত। গেঁজেল, রিকশাওয়ালা, সাধু হয়ে যাওয়া সিফিলিসের রোগী, রাতকানা ভিখিরি। তাপস গিয়ে মেয়েটার পাশ ঘেঁষে বসে গাঁজার টান মারতে লাগল। আমরা

দূর থেকে লক্ষ্য করতাম। মেয়েটার ভ্রূক্ষেপ নেই। দুই হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে মেয়েটা কাঠি দিয়ে ছাই নাড়ছে। এমন সময় হুড়মুড় করে বৃষ্টি এসে গেল। শীতকালের মারাত্মক অকালবৃষ্টি, আমরা তখনই ছুটে বসবার ঘরগুলোয় ঢুকে পড়লাম, সব চেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ঝানু গাঁজাখোররা, যারা এক ফোঁটা জল শরীরে সহ্য করতে পারে না। মেয়েটা চুপ করে ভিজতে লাগল। কী অদ্ভুত ওর চুপ করে বসে থাকা। সেই রকম হাঁটু মুড়ে থুতনি ভর দিয়ে কাঠি দিয়ে ছাই খুঁটতে লাগল, লাল সাটিনের ব্লাউজ আর হাফ শায়া, সেই মেয়েটা, নীল ঝকঝকে চোখ, এখনও চোখ বুজলে স্পষ্ট দেখতে পাই। তাপস বলল, না, পারলাম না, মাপ করুন, মেয়েটার অসম্ভব দাম্ভিকতাকে ছুঁতে পারলাম না। আমার বন্ধুদের অনেক রকম এলেম ছিল, কিন্তু একটা পাগল মেয়েকে অ্যাপ্রোচ করার ভাষা কারোর জানা ছিল না। গগনেন্দ্র বলল, কে কে মল্লিকার কাছে যাবেন চলুন, আমি এই মেয়েটার মুখ মনে করে মল্লিকার কাছে যাব।

আমি কলকাতা ছেড়েছি চার বছর। জানি না, ওরা এখনও শ্মশানে বেড়াতে যায় কি না। গগনেন্দ্র চাকরি করে বম্বেতে, অরুণ বিলেতে গেছে। আমি ক্লান্ত হয়ে জব্বলপুরে রাত্রে বসে আছি। আমার মন খারাপ লাগছে। মন খারাপ না শরীর খারাপ, জানি না। গায়ত্রী বোধহয় খুব সুন্দর দেখতে। অন্তত আমার তো মনে হয়। অবশ্য বউয়ের রূপ সম্বন্ধে স্বামীদের মন্তব্য গ্রাহ্য হয় না। পরীক্ষিৎ আমাকে বলেছিল, বউ বেশি সুন্দরী হওয়া ভাল নয়। পাগল পরীক্ষিৎটা কি আমাকে ছেলেমানুষ ভাবে, যে বউয়ের রূপে ভুলে থাকব? বা কেরানিবাবুদের মতো, বউয়ের দিকে কে কুনজর দিল সেই নিয়ে। আচ্ছা, গায়ত্রী বোধহয় কখনও ভালবাসা পায়নি, তাই আমাকে এতটা অবলম্বন করতে চায়। ও আমাকে সব সময় আচ্ছন্ন করে রাখতে চায়। ওর শরীরে খিদে একটু বেশি, নবীন যুবতীর কামুকতা যে এমন ভয়ঙ্কর আমার জানা ছিল না, আমার বন্ধুদের মতো মেয়েদের সম্পর্কে আমার বেশি অভিজ্ঞতা ছিল না। তবু মনে হয়, গায়ত্রী বোধহয় আমাকে পেয়ে খুশিই হয়েছে। একটা মেয়েকে খুশি করা কম নয়, বহু কবিতা লেখার চেয়ে বড়।

শ্মশানের পাগলিটার চেয়েও বোধহয় গায়ত্রী রূপসী। সেই মেয়েটাকে এই বিছানায় মানাত না। গায়ত্রীকে এই খাটে কী চমৎকার মানিয়েছে, ছেলেবেলায় পড়া রূপকথার বইয়ের ছবির মতো। আমি ওর কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিতে গিয়েও হাত তুলে নিলাম। তুমি আর একটু ঘুমোও গায়ত্রী। আমি ইতিমধ্যে দাড়িটা কামিয়ে নিই। কাল ভোরবেলা বেরুতে হবে, তখন দাড়ি কামানো যাবে না। তাছাড়া, রাত্রে দাড়ি কামাতে ভালই লাগে। একটু গরম জল পেলে ভাল হত। যাক। আমি সেফটি রেজার, ব্রাশ, সাবান খুঁজতে লাগলাম।

এ কী গায়ত্রী, তুমি উঠে এলে কেন?

আমি তো জেগেই ছিলাম।

না, তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও, পরে তোমাকে জাগাব।

যাঃ, দাঁড়াও, আমি গরম জল করে আনি।

গায়ত্রী আমার গালে ওর গালটা ঘষে দিয়ে বলল, কী খোঁচা খোঁচা দাড়ি, বাবাঃ।

অবিনাশের চিঠিটা রাখলাম, দাড়ি কামিয়ে সাবান মুছবার জন্য। এখন রাত ঠিক বারোটা, মাইকা মাইনস-এর সাইরেন বেজে উঠল। একটা মুরগিও ডেকে উঠল প্রচণ্ড আওয়াজে। মুরগিরা কি রাত্রে ডাকে? কখনও শুনিনি বা লক্ষ্য করিনি। ভোরবেলা দেখেছি, একটা উঁচু জায়গা বেছে নিয়ে সূর্যকে ডাকে। পৃথিবীর লোককে সূর্য ওঠার খবর জানাবার ভার মুরগিগুলোর ওপর কে দিয়েছে, কী জানি!

যে-মুরগিটা এইমাত্র জেগে উঠল সেটা বোধহয় চাঁদের খবর জানাতে চায়। ওই মুরগিটা বোধহয় মুরগি সমাজের মধ্যে বিদ্রোহী আধুনিক, সূর্যের বদলে চাঁদ কিংবা অন্ধকার ঘোষণা করতে চায়। ভেবেই আমার হাসি পেল। ওই মুরগিটা বেছে নিয়ে কাল রোস্ট খেলে কেমন হয়?

এ কী, এর মধ্যে গরম জল হয়ে গেল?

দাঁড়াও, তুমি চুপ করে বোসো, আমি তোমার দাড়ি কামিয়ে দিই।

তা হয় না, পাগল নাকি?

বাঃ, কেন হবে না?

সেফটি রেজার দিয়ে অপরে কামাতে পারে না। পারবে না, পারবে না, আমার উঁচু-নিচু গাল কেটে যাবে। তোমাদের অমন নরম তুলতুলে গাল হলে কাটা যেত অনায়াসে। তুমি বরং গালে সাবান মাখিয়ে দাও।

রাত্তিরবেলা গরম জলে ব্রাশ ডুবিয়ে গালে সাবান মাখতে সত্যিই বেশ আরাম লাগে। গায়ত্রী আমার দু'পায়ের ফাঁকের মধ্যে দাঁড়িয়ে খুব যত্ন করে সাবান ঘষতে লাগল। আমি চেয়ারে বসে এক হাতে ওর কোমর ধরে। 'এই অসভ্যতা করবে না!' বলেই গায়ত্রী আমার চোখে সাবান লাগিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে আমাকে দু'হাতে চোখ ঢাকতে হল। গায়ত্রী হেসে দূরে সরে গেল। আমি ওকে উঠে ধরতে গিয়ে পারলাম না। দাড়ি কামাতে গিয়ে আমার থুতনিটা খানিকটা কেটে গেল।

অন্তত বারো বছর ধরে তো দাড়ি কামাচ্ছ, এখনও শিখলে না, আনাড়ি! গায়ত্রী হাসতে হাসতে বলল।

তোমাদের তো এটা শিখতে হয় না, জানবে কী করে কী বিরক্তিকর কাজ।

আমি সেফটি রেজার দিয়ে কাটতে জানি! তোমার হয়ে গেলে আমাকে দিও, আমার একটু লাগবে।

তুমি কী করবে?

আমার দরকার আছে।

ওঃ, আচ্ছা, তোমারটা আমি কেটে দিচ্ছি।

না, আমিই পারব।

হাতের নিচের চুল কাটবে তো? বাঁ-হাতেরটা তুমি পারলেও, ডান হাতের নিচে পারবে কী করে?

খুব পারব, বাঁ-হাত দিয়ে।

না, এসো না লক্ষ্মী, দেখো আমি কী সুন্দর করে দিচ্ছি।

গায়ত্রীকে ধরে এনে দাঁড় করালাম। ও ভিনাস ডি মেলোর ভঙ্গিতে দু'হাত উঁচু করে দাঁড়াল। আমি সাবান মাখিয়ে খুব যত্ন করে সাবধানে ওকে কামিয়ে দিলাম।

লাগছে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

হুঁ, খুব দুষ্টুমি করে গায়ত্রী।

আমার শেখরের কথা মনে পড়ল। শেখর হস্টেলে থাকতে সাবান খেত। নতুন চকচকে সাবানের কেক দেখলে শেখর লোভীর মতো এক কামড়ে আধখানা খেয়ে ফেলত কচ কচ করে, আমরা অবাক হয়ে দেখতাম। শেখরের মতো অভ্যেস যদি থাকত, তবে আমি গায়ত্রীর বগলের সাবান ধুয়ে না দিয়ে চেটে নিতাম। তার বদলে তোয়ালে দিয়ে মুছে দিয়ে আমি ওর বুকে মুখ গুঁজলাম।

গায়ত্রী, আমার বিষম ইচ্ছে করে শিশুর মতো স্তন্যপান করতে। তোমার বুকে দুধ নেই কেন?

বাঃ, তুমি যে বিয়ের পর প্রথম প্রথম বলতে, আমার বুকে অমৃত আছে। আমরা দু'জনে হো-হো করে হেসে উঠলাম।

তুমি বুঝি তখন আমার কথা বিশ্বাস করতে না? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

তুমিই বুঝি বিশ্বাস করে বলতে? গায়ত্রী বলল, ও-সব বিয়ের পর কিছু দিন বলতে হয়, শুনতেও ভাল লাগে।

না সত্যিই, বুকের দুধ খেতে আমার বিষম ইচ্ছে করে।

আচ্ছা, আমার একটা ছেলে হোক, তখন খেও।

কবে তোমার ছেলে হবে?

বাঃ, তার আমি কী জানি! সেটা কি আমার হাত! ও-সব আজেবাজে ব্যবহার করতে কেন?

ও-সব জানি না, কবে তোমার একটা ছেলে হবে বলো না?

বাঃ রে, সেটা তো তুমিই জানো।

সন্তান বুঝি বাবার, মায়ের নয়?

বাবা না দিলে মায়ের কী করে হবে?

ও-সব বৈজ্ঞানিক ধাপ্পা। তোমার পেটের মধ্যে জন্মাবে, তোমার রক্ত শুষে বড় হবে, তোমার শরীর ফুঁড়ে বেরুবে, আর তার জন্য দায়ী হব আমি। সারা দিন গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াব কি বিদেশে থাকব — ও-সব বাজে কথা, সন্তান আসলে মেয়েদেবই হয়। তুমি আমাকে একটা ছেলে দাও গায়ত্রী। গায়ত্রী আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি তোমাকে একটা ছেলে দেব?

হ্যাঁ।

আচ্ছা দেব, আর আট মাস বাদে।

তার মানে? আমি গায়ত্রীকে ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম।

শত্তুর আমার পেটে এসে গেছে।

সত্যি, তুমি জানো?

হ্যাঁ, জানি, মেয়েদেব ও-সব জানতে ভুল হয় না।

গায়ত্রী, গায়ত্রী, গায়ত্রী! আমি ওকে দু'হাতে তুলে একটা ঘুরপাক খেলাম।

আঃ, ছাড়ো ছাড়ো —।

না না না, তুমি সত্যি বলছ? বুঝতে তোমার ভুল হয়নি তো? আমাকে ঠকাচ্ছ না?

না গো, ঠকাচ্ছি না, সত্যিই।

গায়ত্রী! উঃ, গায়ত্রী, আমার এত আনন্দ হচ্ছে —।

ছাড়ো, লাগছে। ছেলের জন্য তোমার এত কাঙালপনা কেন?

এত দিনে আমি পূর্ণ মানুষ হলাম। আমি গৃহস্থ, আমি পদস্থ চাকুরে, আমি সন্তানের পিতা। আমি কোথা থেকে জীবন শুরু করেছিলাম তুমি জানো? না, জানো না। আমার বাবা নেই, মা নেই, একটাও আত্মীয়ের মুখ আজ মনে পড়ে না। তেরো বছর বয়স থেকেই আমি একা। বাবার এক বড়লোক বন্ধু দয়া করে আমাকে মানুষ করেছেন। কলেজে যখন থার্ড ইয়ারে পড়তাম, সেই সময় হঠাৎ তিনিও মারা গেলেন। তখন থেকে বিজ্ঞাপনের এজেন্ট সেজে, প্রুফ দেখে, তিনবেলা টুইশনি করে হস্টেলে থেকেছি। এই জন্যই তাপস পরীক্ষিৎদের মতো বাউণ্ডুলে হয়ে যাইনি। আমার ঘর-সংসার ছিল না, তাই ঘর-সংসার পাতবার বিষম লোভ ছিল আমার। কবে এক দিন সুস্থ, সাধারণ, দায়িত্বশীল মানুষ হব, সেই ছিল আমার বাসনা। ভাগ্যিস আমি তোমাকে পেয়েছিলাম।

হয়েছে, হয়েছে, এখন শোবে চলো। আমার ঘুম পেয়েছে সত্যি।
চলো, এখন থেকে খুব সাবধানে থেকো। কিন্তু।
যদি বাচ্চা হবার সময় আমি মরে যাই?
পাগল নাকি? তোমার বয়েস তেইশ, এই তো বাচ্চা হবার ঠিক সময়।
খুব যন্ত্রণা হবে তখন, না?
তা হবে, যত যন্ত্রণা পাবে আমার শিশুর প্রতি তত ভালবাসা হবে।
সন্তান কিন্তু সম্পূর্ণ আমার, তুমি বলেছ।
হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমার। আমার সব কিছুই তো তোমার।
আবার পাগলামি করছ? তুমি না আধুনিক লেখক। আধুনিকরা এ-সব বলে নাকি?
ওঃ, হো-হো, তুমিও এ-সব জেনে গেছ!
চলো, শুয়ে পড়ি, আর না। দাঁড়াও, জানলা বন্ধ করে দিয়ে আসি।
কেন, জানলা খোলা থাক না! ঠাণ্ডা লাগবে?
ঠাণ্ডা না। চাঁদের আলো আমার চোখে পড়লে ঘুম আসে না।
ওঃ, আচ্ছা অন্ধকার করে দাও।

গায়ত্রী সব অন্ধকার করে দিল। এতক্ষণ বুঝতে পারিনি, আমার কপালের দু'পাশের শিরা দপ দপ করছে। এবং হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারির হৃদয়কে ছিঁড়ে — এই লাইনটাও মাঝে মাঝে মনে পড়ছিল। মাথা ধরার সঙ্গে এই লাইনটির কোনও যোগ আছে কি না জানি না। অথবা এই দুটোই আলাদা ভাবে আমাকে আক্রমণ করেছে, গায়ত্রীর সঙ্গে এই আনন্দের সময়ে। আঃ, গায়ত্রী, তোমাকে আমি বিষম ভালবাসি।

তা বুঝি আমি জানি না? গায়ত্রী হাসির শব্দ করল।
অন্ধকারে ওর হাসি দেখা গেল না।

তাপস

সকালটা শুরু করলাম একটা মারাত্মক ভুল দিয়ে। রোদ্দুরকে পাশে রেখে শুয়েছিলাম, যতক্ষণ শুয়ে থাকা চলে। ক্রমশ রোদ্দুরগুলি খুব স্বাধীন হয়ে সারা বিছানায় ছড়িয়ে পড়ল। তখন পায়ের ধাক্কায় অতি কষ্টে জানালাটা বন্ধ করতেই রামসদয়বাবু সহৃদয় গলায় আপত্তি জানালেন, সকালবেলা যতক্ষণ শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হয় শুয়ে থাকুন তাপসবাবু, কিন্তু সকালের রোদ ও হাওয়া লাগানো উচিত। এর উত্তরে আমি বললাম, আপনার কাছে একটা খুচরো টাকা হবে? কাল সন্ধে থেকে আমি দশ টাকার নোটটা ভাঙাতে পারছি না।

রামসদয় কাঁচি দিয়ে গোঁফ ছাঁটছিলেন ও আসন্ন বাথরুমের প্রস্তুতির জন্য পেটে থাপ্পড় মারছিলেন। পরের আওয়াজটা কেমন হয়, সেই অনুযায়ী তাঁর মেজাজ নির্ভর করে। মনে হচ্ছে, আজ মেজাজটা ভাল আছে। অত্যন্ত বিব্রত মুখে জানালেন, ইস তাই তো, আমার কাছেও যে দশ টাকার নোট সব। চাকরটাকে দিন না, ভাঙিয়ে দেবে। আমি জানি রামসদয় মিথ্যে বলে না, ওর কাছে সত্যিই দশ টাকার নোট। হয়তো অনেকগুলোই দশ টাকার নোট থাকা সম্ভব। কেন চালাকি করতে গেলাম, পুরো একটা দশ টাকার নোট চাইলেই চমৎকার হত। আর কি শুধরে নেবার সময় আছে? এখন কি ওর হাত জড়িয়ে ধরে বলব, বুঝতেই তো পারছেন দাদা কথার কথা, পুরো দশটাই দিন। রামসদয় বাথরুমে ঢুকে পড়লেন, ওঁর প্রসন্ন মুখ দেখে বুঝলাম বেগ এসে গেছে। আজ রামসদয়ের মন ভাল ছিল, আজ

দশ টাকা না চাওয়াটা চূড়ান্ত বোকামি হয়ে গেল। লোক ভাল রামসদয়, একমাত্র টাক ঢাকবার জন্য চুলগুলো সামনের দিকে টেনে আঁচড়ায়, এ ছাড়া ওর কোনও দোষ নেই। নিশ্চিত দিত। তার ওপর যদি বলতে পারতাম, কাল মায়ের চিঠি পেয়েছি (দীর্ঘশ্বাস) কিংবা বন্ধুর অসুখ, কুড়ি কী তিরিশ হয়ে যেতে পারত। ওঃ! সকালেই মোটা হরি শুনিয়ে গেছে, ঠাকুরের অসুখ, আজ সবাইকেই বাইরে খেতে হবে। তার মানে সারা দিন আজ কুহেলিকা। দুপুরবেলাটা শুয়ে শুয়ে কাটাব ভেবেছিলাম। ইচ্ছে হল, মোটা হরির মুণ্ডুটা চিবিয়ে খাই।

স্ট্রিম লন্ড্রিতে কাচানো এক পেয়ার শার্ট-প্যান্ট ছিল, এইটুকুই যা সৌভাগ্য। পকেটের মধ্যে পয়সা না থাকলে জামা-কাপড় নোংরা থাকা মানায় না। তাহলে সত্যিই ভিখিরি মনে হয়। রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। সকাল ন'টা। সকালের চা-ও দেয়নি, এমন রাগ হচ্ছে যে, ইচ্ছে করছে, নাঃ, সকালবেলাতেই মুখ খারাপ করব না। মুখে এখনও টুথপেস্টের বিচ্ছিরি স্বাদ লেগে আছে। পকেটে একটা নিঃসঙ্গ দশ নয়া পয়সা। এই দশ নয়া পয়সা নিয়ে পড়েছি মহা মুশকিলে। কাল সন্ধে থেকে ভাবছি। এটাকে কোনও বাজেটে ফেলা যায় না। চায়ের কাপ দু'আনা। কলুটোলার মোড়ে ছ'পয়সায় পাওয়া যায়। কিন্তু এতদূর হেঁটে গিয়ে চা খেলে, সঙ্গে একটা টোস্ট না হলে —। সিগারেট কেনা যায়, কিন্তু সকালেই চা ছাড়া শুধু সিগারেট! চমৎকার হত, যদি এই দশ নয়া পয়সায় একটা পোচ, দুটো টোস্ট, এক কাপ ভাল চা ও সঙ্গে দুটো সিগারেট পাওয়া যেত। এইগুলো আমার বিষম দরকার এখন। এর একটাও হবে না। ইচ্ছে হল, পয়সাটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলি। কিংবা কোনও ভিখিরিকে দিয়ে দিই। হঠাৎ একটা মুচিকে দেখে জুতো পালিশ করিয়ে নিলাম দশ নয়াটা দিয়ে। ময়লা জুতোটা মানাচ্ছিল না। এবার শরীর ও মন বেশ ঝরঝরে হয়ে গেল। এখন অনায়াসে বিমলেন্দুর কাছে যাওয়া যায়। বিমলেন্দু সকালে কমার্স কলেজে পড়াচ্ছে। আর বিমলেন্দুর কাছেই যখন যাব, তখন ট্রামে যাওয়া যাক।

ট্রামটায় ভিড় ছিল না, জানলার কাছে বসার জায়গা পেয়ে গেলাম। কন্ডাকটরকে দেখে মাঝ পথে নেমে পড়া আমি মোটেই পছন্দ করি না। বসবার জায়গা পেয়ে বসে পড়া উচিত। সম্ভব হলে একটা বই খুলে পড়া। আমার কাছে বই ছিল না। কন্ডাকটবকে খুব ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগলাম। খুব পছন্দসই লোকটি, বেশ অলস স্বভাবের, কারণ প্যান্টের সব ক'টা বোতাম আটকায়নি। নিশ্চয়ই কানে কম শোনে, কারণ লোকটার মুখে চোখে একটা এলোমেলো বোকামি আছে। অনেকটা ভবকেষ্টর মতো। ভবকেষ্টর মুখে অমন নিষ্পাপ বোকামির ছায়া কেন, তত দিনেও বুঝতে পারিনি, যত দিন না জানতে পেরেছি ও বদ্ধ কালা। ভবকেষ্টর বউ মালতী ওর ইয়ার ব্যান্ডের কাজ করে, সেই জন্য মালতীর মুখেও বোকামির স্বর্গীয় আলোছায়া খেলে। অনেকক্ষণ পর কন্ডাকটর আমার কাছে এল। আমি বাঁ-দিকের ঘাড়টা আলতো ভাবে বেঁকিয়ে অন্য মনস্ক ভাবে নরম গলায় বললাম, 'দিমানচ্ছি।' লোকটা চলে গেল। যাক, একবারেই সাকসেসফুল! এই অর্ধসত্যগুলোতে আমি খুব উপকার পাই। ঘাড় হেলানো দেখে লোকটা নিশ্চিত হয়েছিল, আমার উচ্চারণ শুনে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে চলে গেল। দিচ্ছি ও মান্থলি এই দু'টি শব্দের সন্ধি করে আমি এই শব্দটি সৃষ্টি করেছি। এবং বার বার উচ্চারণ করে রপ্ত করেছি ধাঁধখানি। দিচ্ছি ও মান্থলি, দিমানচ্ছি। কোনও ত্রুটি নেই। সেই সঙ্গে আছে ঘাড় হেলানো। লোকটার কান যদি ভাল হত তাহলে ও মুশকিলে পড়ত। বুঝতেই পারত না আমার কাছে কী আছে — মান্থলি, না টিকিট কাটব। ও কী জিজ্ঞেস করত, দেখান? না দিন? দেখান বললে, ধমকে উঠতাম, দেখাব কী, দিচ্ছি বললাম তো! যদি লোকটা লজ্জার মাথা খেয়ে বলত, দিন। তাহলে বলতাম, দশ টাকার খুচরো আছে ভাই? তখন যদি বলত, না, দশ টাকার খুচরো নেই, আমি আর বাক্যব্যয় না করে চুপ করে বসে থাকতাম। যদি মরীয়া হয়ে লোকটা দৈবাৎ বলেই ফেলত, হ্যাঁ দিন, ভাঙিয়ে দিচ্ছি, তবে

ব্যঙ্গের সুরে জিজ্ঞেস করতাম, এই ট্রাম বেলগাছিয়া যাচ্ছে নিশ্চয়ই? না, গ্যালিফ? ওঃ গ্যালিফ, তাই বলো — এইটুকুই জানিয়ে লাফিয়ে উঠে ব্যস্তভাবে নেমে যেতাম। আমি টিকিট ফাঁকি দিচ্ছি না এ বিষয়ে দৃঢ় ধারণা করার মতো মুখ! বাপ-মা আমার জন্য টাকা-পয়সা, ভাড়াবাড়ি কিছুই রেখে যায়নি, শুধু দিয়ে গেছে ভদ্রলোকের মতো সুন্দর মুখখানি। এটাও মন্দ ক্যাপিটাল নয়, এতেও খুব অনেকটা কাজ হয়।

বিমলেন্দু ক্লাসে পড়াচ্ছিল। আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে চোখাচোখি করলাম। তারপর কলেজ ক্যান্টিনে গিয়ে ডবল টোস্ট, পোচ আর চায়ের অর্ডার করে বসলাম। চা শেষ হবার পর বিমলেন্দু এল হন্তদন্ত হয়ে, হাতে কয়েকখানা বই, টাইপ করা নোট। কী রে কী ব্যাপার, আমার যে আজ বিষম চাপ, পর পর তিনটে ক্লাস।

গুলি মেরে দে।

না ভাই, আজ পারব না, আজ ছেড়ে দে।

দ্যাখ বিমল, আমি না হয় বিএ পাশ! আমার কাছে প্রফেসারি দেখাসনি।

আস্তে বল, ছেলেরা শুনতে পাবে।

ক্লাসের পর কী করবি?

ড. মহালনবিশের বাড়ি যেতে হবে একবার।

কেন, তার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে?

ধ্যাৎ, ড. মহালনবিশ আমার রিসার্চ গাইড। আজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। তাছাড়া ওর কোনও মেয়ে নেই। বিয়েই করেননি।

আজ সব ছেড়ে দে। আজ সারা দিন আমার কিছুই করার নেই। চল দু'জনে মিলে একটা পার্টি অর্গানাইজ করি। অনেক দিন এক সঙ্গে বসা হয়নি।

আজ হবে না রে। আমার আজ উপায় নেই। তোরাই বেশ আছিস তাপস। চাকরি-বাকরি করতে হয় না, ইচ্ছেমতো দিন কাটাতে পারিস। আমাকে সব মিলে পাঁচটা চাকরি করতে হয়। আমার গলায় দড়ি বাঁধা, দড়ির বাইরে যেতে পারি না।

আচ্ছা, পাঁচটা টাকা ধার দে।

নেই। খুচরো পয়সা সম্বল।

পাঁচটা চাকরি করছিস, আর পাঁচটা টাকা ধার দিতে পারবি না? একমুঠো খোল মানিক!

সত্যি পারি না।

কত আছে?

বিমলেন্দু পকেট থেকে খুচরো পয়সা বার করে গুনল। চোদ্দো আনা। আমি ওর থেকে সাত আনা নিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, তোর ধারের সিগারেটের দোকান আছে?

আছে। চল।

আমাকে দু'প্যাকেট সিগারেট কিনে দে। আজ মেস বন্ধ। দুপুরে কোথায় খাব ঠিক নেই।

তুই আমার বাড়িতে আয়। দুপুরে আমার সঙ্গে খাবি।

দেখি।

ঘণ্টা পড়তে বিমলেন্দুকে ছেড়ে দিলাম। তারপর হঠাৎ আবার ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, তুই রিসার্চ করছিস, আগে তো শুনিনি। ডক্টরেট হয়ে তোর কি মুকুট হবে? ছি ছি।

ডক্টরেট হলে মুকুট হবে না, কিন্তু মাইনে বাড়বে। বিমলেন্দু শুকনো মুখে জানাল। আমি ওর মুখের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করলাম, সত্যি সত্যি ওর গলায় দড়ির দাগ দেখা যায় কি না!

শীত নেই, বেশ ঝরঝরে রোদ, ভিড় শুরু হয়েছে। রাস্তার দুই বিপরীত মুখেই জনস্রোত, দু'দিকেই কেন লোক ছুটে যায় বুঝতে পারি না। চার দিকেই পরের বাড়ি জলের রেটে নিলাম হচ্ছে, কী করে ওরা টের পায় কে জানে। আমি কোনও দিন টের পেলাম না। পেলেই-বা কী। পকেটে নেই কানাকড়ি, দরজা খোলো বিদ্যেধরী। কোথায় যাই এখন? আশ্চর্য, কোনও জায়গা মনে পড়ে না। বন্ধু-বান্ধবদের খোঁজ করা যেতে পারে। কী বিষম যাচ্ছেতাই জীবন। এক-এক সময় আমার মনে হয়, প্রতি দিন একই বন্ধু-বান্ধবের মুখ। আর কী সব মুখ, আহা! হাওড়া স্টেশনে যে-সব নিরুদ্দিষ্ট আসামির ছবি আছে, সব ক'টা এসে এখানে জুটেছে। হয় এর সঙ্গে দেখা, নয় ওর সঙ্গে আড্ডা, হই-হল্লা উত্তেজনা, ভাল লাগে না, সত্যিই খুব ক্লান্ত লাগে। প্রতি দিন একই রকম কাটছে, এ-কথা ভাবলে বেঁচে থাকার আর কোনও পয়েন্ট থাকে না। মনে হল, বিমলেন্দু বোধহয় একা একা জীবন কাটাচ্ছে। আজকাল বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ওকে প্রায় দেখাই যায় না, চারটে চাকরি, রিসার্চ, খবরের কাগজে লেখা, সেই সঙ্গে কবিতা — যেন এ-সবের মধ্যে ও কী এক গভীর ষড়যন্ত্র করে চলেছে। সব সময় অনুত্তেজিত ওর মুখ, কিছুটা বিমর্ষ। কী জানি আমাকে দেখে ও খুশি হয়েছিল, না বিরক্ত। মনে হয়, কিছু দিন পর হেমকান্তির সঙ্গে বিমলেন্দুর কোনও তফাৎ খুঁজে পাব না।

মায়ের মৃত্যুর পর এক মাস অশৌচ করল হেমকান্তি, নেড়া মাথায় রোজ হবিষ্যি খেত। তারপর থেকে এখনও প্রায় মাথা কামাচ্ছে, মাছ-মাংস ছেড়েছে। এই রকমই না কি সারা জীবন চালাবে! ওই রকম ফর্সা, লম্বা চেহারা, মুণ্ডিত মাথা, হেমকান্তি যখন আমাদের মধ্যে এসে বসে, মনে হয় যেন অতীতের কোনও মর্মর মূর্তি। ও বোধহয় জানে না যে, মাথা কামিয়ে ফেলার পর ওকে বিষম অহঙ্কারী দেখাচ্ছে। সে-দিন যখন মায়ার দিকে হাত তুলে চায়ের কাপটা সরিয়ে দিল, অস্ফুট গলায় বলল, 'আমি চা খাই না আর' — মায়া চকিতে কাপটা নিয়ে সরে গেল। আমার মনে হল, এ দৃশ্যটা আমি এর আগে কোথাও দেখেছি। কোনও ফিল্মে বা রূপকথায় বা উপন্যাসে, বা স্বপ্নে, যেন কোনও অহঙ্কারী রাজপুত্র, বা নবীন সন্ন্যাসী, ফিরিয়ে দিচ্ছে কোনও উপযাচিকাকে। যদিও জানি, হেমকান্তির ও-রকম কোনও সাহসই নেই, আব মায়াও হেমকান্তিকে মোটেই পছন্দ করে না। মায়াকে আমারও যেন কেমন লাগে, ওই কচি মেয়েটাকে আমি বড় ভয় করি। নইলে আমার সময় কাটাবার সমস্যা? অনায়াসেই মায়ার কাছে গিয়ে চমৎকার বসতে পারতাম, বলতাম, মায়ার তোমার হাত দেখি। ওর করতল দু'হাতে ধরে গন্ধ শুঁকতাম, সমস্ত শবীরে চাপ দিতাম, ওর শরীর উষ্ণ হলে অনায়াসে জানানো যেত, মায়া তোমার জন্য আমাব মরে যেতে ইচ্ছে হয়। আমি ওর সঙ্গী বিছানায় শুতাম না, ওকে নিয়ে বেড়াতে যেতাম কিংবা কানে কানে কথা বলতাম কিংবা চোখের দুটো পাতা আঙুলে তুলে ফুঁ দিতাম, আমি ওর কৈশোরের রহস্য নিয়ে খেলা করতাম। কিন্তু মায়া আমাকে তা দেবে না, আমি গেলে চা দেবে, ইয়ার্কি করবে, তারপর এক সময় বলবে, দিদিকে ডেকে দিচ্ছি, গল্প করুন। দিদি যদি না থাকে বাড়িতে, তাহলে বলবে, আসুন দাবা খেলি। খানিকটা বাদে নিশ্চিত জানিয়ে দেবে, এবার বাড়ি যান। বাঃ। আমি যদি ওর হাত চেপে ধরি, অন্য রকম ভাবে ও হেসে উঠবে খিল খিল করে। যদি বালি, মায়া আমি তোমার কাছেই থাকতে চাই, তাহলে ও হাসবে, বলবে, থাকুন না। যদি জোর করে চুমু খেতে যাই, ও হেসে মুখ সরিয়ে নেবে কিন্তু ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠবে না। ওর সঙ্গে জোর করা যাবে না। মায়ার সমস্ত হাসিই অভিমানের, আমার মনে হয়। বরং ছায়া ভাল, ছায়া দুঃখিত কিন্তু বোকা। লোভী

কিন্তু ঘুমন্ত। ছায়াকে হয়তো আমি খানিকটা পছন্দ করি ঠিকই, কী জানি! অবিনাশের মতো হাড়হারামজাদা ছেলেই মায়াকে ট্যাক্‌ল করতে পারে।

এখন আমি কোথায় যাই! কোনও মেয়ের সঙ্গেই প্রেম-টেমের সম্পর্ক নেই যে, হঠাৎ যেতে পারি। প্রথম কলেজ-জীবনে ও-সব চুকে গেছে। বাসন্তীর সঙ্গে কী গভীর ভালবাসার সম্পর্ক ছিল, আর একটু হলেই ওকে বিয়ে করে ফেলতাম আর কী! সে-দিন বাসন্তীর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হল, নতুন বরের সঙ্গে চলেছে, খুশিতে মোটা হয়ে গেছে মেয়েটা, কিন্তু আশ্চর্য, আমার মধ্যে কোনও রকম ঈর্ষা কিংবা দুঃখ নেই, কিংবা উদাসীনতাও জাগল না। খুবই সাধারণ ভাবে মাথা ঝাঁকালাম, কী খবর, কেমন, ভাল, এই সব অনায়াসে বলাবলি করে চলে গেলাম। বাসন্তীও আমাকে মনে রাখেনি। মেয়েরা কেউ আমাকে মনে রাখে না। যে-কোনও মেয়ের সঙ্গে আলাপ হবার পরই তার চোখে তাকিয়েছি, বলেছি, চলো, রেস্টুরেন্টের কেবিনে বা হোটেল রুমে। চলো, ট্রেনের নিরালা ফার্স্ট ক্লাস কামরায়। ব্লাউজে সেফটিপিন গেঁথো না, আমার আঙুলে ফুটে যায়, আর আঙুল বিষম স্পর্শকাতর এবং দামি, সেফটিপিন ফোটাবার জন্য নয়। কেউ বেশি দিন টেঁকেনি। দু-এক জন শেষ পর্যন্ত এগিয়েছে, অনেকে গোড়া থেকেই কেটেছে। কেউ কেউ, বিয়ে করো বলে এমন বায়নাক্কা তুলেছে, ওফ! এক-এক জনকে সামলাতে কম ঝক্কি পোহাতে হয়েছে আমার! কত চোখের জল — টেলিফোনে চোখের জল, চিঠিতে চোখের জল। অথচ কেউই আমাকে কোনও অভিজ্ঞতা দেয়নি। উপন্যাসটা লিখলাম, সবাই বলল, খুব কর্কশ এবং নিষ্ঠুর হয়েছে। ভেবেছিলাম উনিশশো ষাট থেকে তেষট্টি সাল পর্যন্ত নিজে যা যা করেছি, সেই সবই লিখব। তাই লিখেছি অনেস্টলি, যা যা মনে পড়েছে। কোনও নরম মুখ মনে পড়েনি, চোখের জল মনে পড়েনি, ভালবাসা শব্দটাই মনে পড়েনি। জীবনে কখনও আমি ভালবাসা পাইনি বোধহয়। অথচ ভালবাসার জন্য ব্যগ্র হয়েছিলাম। স্ত্রীলোকদের কাছে তো কম অভিযান করিনি, কিছুই পাইনি, লোভ ছাড়া, অথবা হয়তো আমার বোধশক্তি নেই, যা পেয়েছি এখনও তা উপলব্ধি করতে পারছি না। পরীক্ষিৎ তা পেরেছে, মেয়েদের সামান্য স্পর্শও ওকে কবিতায় ভরিয়ে তোলে, ওর কবিতা ভালবাসার কথায় মুখর। আমি কিছুই পাইনি, লোভ ছাড়া। লোভ আমাকে বহু দূর নিয়ে গেছে, ভালবাসার চেয়েও বড় আসনে, ইচ্ছে করছে এখনই কোনও স্ত্রীলোকের কাছে গিয়ে শুই। এই লোভ আমার মধ্যে এনেছে অ্যাকশন, আমাকে তাড়িয়ে চলেছে। এই জন্য আমার শরীরে অসুখ নেই, আমার প্রত্যেকটি স্নায়ু সতেজ, ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম। আমি শিশিরের পতন শব্দ পর্যন্ত শুনতে পাই।

ট্রাম লাইনের পাশে বহুক্ষণ কাটল। রোদ্দুর বেশ চচ্চড় করছে। কোন দিকে যাব, এখনও দিক ঠিক করতে পারিনি। মেসে ফিরে গিয়ে শুয়ে থাকা যেত। কিন্তু দুপুরে একটা খাওয়ার ব্যাপাব আছে। কিন্তু না খেয়ে শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠ দেখা কবিত্বময় না। আমার ঠিক পোষায় না। যত রাজ্যের কুচিন্তা আসে মাথায়, ইচ্ছে হয়, কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করি, অথবা পিছন দিকের জানালার খড়খড়ি তুলে পাশের বাড়ির বাথরুমে উঁকি মারি। এ বয়সে আর ও-সব চলে না। আশ্চর্য, সকলেই দিব্যি চাকরি-বাকরি করছে — আমি ছাড়া। এমনকী পরীক্ষিৎও খবরের কাগজের প্রুফ দেখে! স্কুলের মাস্টারিটা না ছাড়লেই হত, আরও কিছু দিন দাঁত কামড়ে লেগে থাকা উচিত ছিল। আসলে ওই স্কুলের হেডমাস্টারটার কান মুলে দেবার আন্তরিক ইচ্ছেটা আমি কিছুতেই চাপতে পারিনি। একেবারে জোচ্চরের ঘুঘু লোকটা। ও শালার উচিত, শ্মশানের পাশে গিয়ে ব্যবসা করা।

অনেকক্ষণ দাঁড়াবার পর খেয়াল হল, কেন দাঁড়িয়ে আছি। যদি ট্রামে বা বাসে যেতে যেতে কেউ আমাকে দেখে নেমে পড়ে, বস্তুত আমি সেই প্রতীক্ষা করছিলাম। আমি কারুর কাছে যাবার বদলে

যদি কেউ আমার কাছে আসে। কেউ আসে না। মেয়ে — কলেজ ছুটি হবার পর এই যে অসংখ্য লাল-নীল-হলুদেরা, এরা কেউ আমাকে চেনে না। কেউ আমার কাছে এসে বলবে না, আপনি কি তাপসবাবু? নিশ্চয়ই আপনি! আপনার ঊনত্রিশ দাঁতের লোকটা উপন্যাস তো আমাদের ক্লাসের সব মেয়েরা পড়েছে। বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে আপনার ছবি দেখেছি। এ-সব ভাবতে বেড়ে লাগে। কত লোকের উপন্যাস আরম্ভ হয় এ-রকম ভাবে! আমার বেলা শালা কিছু হল না! কোনও মেয়েই আমার বই পড়েনি। কোথাও কোনও মেয়ের সঙ্গে আলাপ হবার পর যদি শোনে, আমি এক জন লেখক, তখন সেই সব মেয়েরা আমসিপানা মুখ করে জিজ্ঞেস করে, আপনি লেখেন? তাই তো, আমি কী লিখি। কচুপোড়া লিখি, তাছাড়া আর কী!

কোথায় যাব? অম্লান! দো-তলার ছোট গুমোট ঘর, পাশের হোটেলের অ্যাকাউন্টে খাওয়া, হো-হো করে হাসবে অম্লান, নার্ভাস গলায় নিজের কবিতা মুখস্থ বলবে, আর চুটিয়ে পরনিন্দা-পরচর্চা করে যাব। এখন বাড়িতে থাকলে হয়। হে ঈশ্বর, অম্লানের যেন টাইফয়েড কিংবা পক্স, অন্তত মামস হয়ে থাকে। যাতে বিছানায় শুয়ে থাকবে। নইলে ওকে বাড়িতে পাওয়া এ সময়, ঈশ্বর, তোমারও অসাধ্য। অম্লানের ঘরে বহু রাত কাটিয়েছি। যে-কোনও প্রোগ্রামে বেশি রাত হয়ে গেলেই অম্লানের বাড়িতে বারোটার পর — পরীক্ষিতের আবার বাস বন্ধ হয়ে যায়, দু'জনে কতবার এসেছি এখানে। ওর বাড়ির দরজার ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে খিল খোলা যায়। ঢুকে গেছি ভিতরে। ঘুম থেকে উঠে এসে অম্লান একটুও না চমকে আমাদের ঘরে ডেকেছে, হাসি-হাসি মুখ করে বলেছে, রাত্তিরে তো ঘুমোতে দেবে না জানি, বেলেল্লা করবে, সকালবেলা চা, ডবল ওমলেট সাঁটাবে, সিগারেট ধ্বংস করবে, তারপর গাড়িভাড়াও চাইবে নিশ্চয়ই। ওঃ, পদ্য লেখা শুরু করে কি অন্যায়ই করেছি! তোদের মতো বন্ধু জুটিয়েছি, ভিখিরিরও অধম। তা জগাই, মাধাই, আর একটি কোথায় — কাঙাল হরিদাস?

পরীক্ষিৎ হাসতে হাসতে বলেছে, সে আবার কে রে?

কেন, শেখর? তিন জন না হলে তো তোমাদের চলে না। অবিনাশ তো শুনেছি কেটে গেছে, সে নাকি আজকাল ভাল ছেলে! হ্যাঁ রে, তোদের যে প্রতিভা আছে, ঠিক জানিস তো? নাকি এ-রকম বাওয়া হয়ে শিল্পী সেজে (অম্লান উচ্চারণ করে 'Silপি') জীবনটা নষ্ট করবি। শেষ পর্যন্ত কিছু হবে না? আমি কিন্তু তোদের প্রতিভার এখনও কিছু টের পাইনি।

সারা ঘরে ছড়ানো বই ও পুরনো তিন বছরের খবরের কাগজ, মাটির খুরিতে চুরুটের ছাই, জীবনে একবারও না-কাচা বেড শিট, খাটের শিয়রের বই-এর র‍্যাক থেকে শবের গন্ধ আসে। অম্লান আমাদের ঠাট্টা করে। অম্লানের ঠাট্টা শুনে পরীক্ষিৎ গম্ভীর হয়ে যায়। আমি হাসতে হাসতে বলি, অম্লান, আমি শিল্পীও সাজিনি, জীবনটাও নষ্ট করছি না। শিল্পীরা কী-রকম সাজে, কী-ভাবে জীবন নষ্ট করে কে জানে।

অম্লান বাড়িতে নেই।

তিন জায়গায় ব্যর্থ হয়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে এলাম। অম্লানের ঘরে তালা বন্ধ। অবিনাশের বাড়িতে গিয়ে শুনলাম অনিমেষ আর গায়ত্রী কলকাতায় এসেছে, আছে ছায়াদের বাড়িতে, অবিনাশ সেখানে। গগনকেও যদি অন্তত পাওয়া যেত। গগনকে পেলেই সব চেয়ে ভাল হত, ও নিশ্চিত আমার কথায় অফিস কাটতে রাজি হত। ওর কাছে সব সময় টাকা থাকে, ওর মতো ডেসপ্যারেট কেউ নেই, একটা কিছু ঘটে যেত। গগনকে গিয়ে ডাকলে বাড়ির দরজায় নেমে আসে গগন, কপালে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে আমার বিনীত প্রস্তাব শোনে, কিছুক্ষণ কী ভাবে, তখন ওর মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না। বোঝাই যায় না, ও আমার কথা শুনছে, না অন্য কথা ভাবছে। রাজি হবে কি না সন্দেহ, তারপর

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে গগন বলে, চুপ, একমিনিট দাঁড়া, আসছি। ঠিক এক মিনিট বাদে গায়ে জামা দিয়ে বেরিয়ে আসে গগন, বাড়ি থেকে কুড়ি পা পর্যন্ত গম্ভীর মুখে আসে, তারপর এক টানে মুখোশটা খুলে বলে, মাইরি, চমৎকার দিনটা আজ, চুটিয়ে ফুর্তি করার মতো। চল, কোথায় যাবি বল।

গগন অফিসের কাজে এলাহাবাদে গেছে। খুব বেঁচে গেছি। মায়ার সঙ্গে প্রেম করার অছিলায় ওদের বাড়ি আজ যাইনি, ওখানে অত লোক দেখলে খুব খারাপ লাগত। তিনটে মেয়ে এক বাড়িতে — ছায়া, মায়া, গায়ত্রী। অনিমেষের মাসতুতো বোন গীতাও কি আর আসেনি! ওখানে গেলেই ভজরঙ গজরঙ করে সময় কাটাতে হত। এক সঙ্গে অত মেয়ে আমার সহ্য হয় না, বড্ড বাজে রসিকতা শুনে হাসতে হয়। আজ আমার সে-রকম মেজাজই নেই। অবিনাশটা ওখানে কী করছে, কে জানে!

অনেক দিন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আসিনি। সুন্দর নরম ঘাসে ভরে আছে এই দুপুরবেলা। ঘাস দেখে গোরুর মতো আনন্দ হচ্ছে আমার। কৃষ্ণচূড়া ফুল খসে খসে পড়েছে। ১৫ এপ্রিল সব গাছগুলো সম্পূর্ণ লাল হয়ে যায়, বহু বছর লক্ষ্য করেছি। ও-পাশের ওই হলদে ফুলগুলি নাকি রাধাচূড়া, একটি মেয়ে আমাকে বলেছিল। এক সময় এই ঘাসের উপর বহুক্ষণ শুয়ে কাটাতাম। ছায়া আসত, ছায়াকে টোপ ফেলে অন্য দু-একটা মেয়েকেও টেনে আনা যেত। এক দিন মনে আছে, পুরো দু'ঘণ্টা ভিজেছিলাম এখানে বসে, ছায়ার সঙ্গে বাসন্তী আর নীলা বলে দু'টি মেয়ে এসেছিল। প্রচণ্ড বৃষ্টি, সবাই দৌড়ে দৌড়ে পালাল, আমরা বৃষ্টির মধ্যেই বসে রইলাম। দূরের বারান্দা থেকে সবাই আমাদের দেখতে লাগল। কেয়ারটেকার এসে বলল, আপনারা করছেন কী, নিউমোনিয়ায় মরবেন যে! আমরা অগ্রাহ্য করে তবু বসেছিলাম। মেয়ে দুটো হাসছিল খিল খিল করে। ভিজে ব্লাউজ-ব্রেসিয়ার ফুঁড়ে বুকের গোল স্পষ্ট হয়ে উঠল ওদের, আমি ওদের অশ্লীল গল্প শোনাতে লাগলাম। ক্রমশ আধোশোয়া প্রত্যেকটি মেয়ের বুকে ও পিছনে চারটি বাটির মতো গোল দেখে উত্তেজিত হয়ে আমি নীলা বলে মেয়েটির পিছনে আস্তে আস্তে পা দিয়ে টোকা মেরেছিলাম, তারপর, বৃষ্টি শেষে নীলা কী-রকম চমৎকার আমার সঙ্গে একা বাড়ি ফিরতে রাজি হয়ে গেল। সেই নীলা এখন সর্বেশ্বরকে বিয়ে করে মেয়ে-কলেজের অধ্যাপিকা হয়েছে। এক দিন দেখা হবার পর বলল, লেক টাউনে জমি কিনেছে, শিগগিরই বাড়ি তুলবে। একটিমাত্র ছেলে হয়েছে, তার কী নাম রাখবে — সে-জন্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখেছিল। বেশ সুখে আছে নীলা, এই তো জীবন, এই তো সুখ, সেই বৃষ্টি-ভেজা মাঠে আবার কেউ ফিরে আসে না। আজকাল আর ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আমাদের কেউ আসে না। সবাই পুরো সাহিত্যিক বা অধ্যাপক বা চাকরিতে ঢুকেছে। আমিই শুধু বোকা রয়ে গেলাম।

খুব খিদে পেয়েছে আমার। সত্যিকারের খিদে, বিমলেন্দুর সাত-আনা গাড়িভাড়াতেই হাওয়া। সিগারেটও ফুরিয়ে এল। দুপুরে যে-কোনও ভাবেই হোক, পুরো পেট খেতেই হবে, কোনও চালাকি নয়। না খেয়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারব না; আমার সুখের শরীর, খিদে একেবারে সহ্য হয় না। তাছাড়া দুপুরে আর সবাই খাবে, আমি একা কেন না খেয়ে থাকব? ইয়ার্কি নাকি? আজ বড় ইচ্ছে করছে মাংসের ঝোল দিয়ে লুচি খেতে। লুচির বদলে ভাত হলেও আমার বিশেষ আপত্তি নেই, কিন্তু মাংস আমার চাই-ই।

লাইব্রেরির দরজায় কার্ড চায়। কোথায় পাব? বহু দিন ও-সব চুকে গেছে। অনেক রকম বোঝাবার চেষ্টা করলাম, ঘাড় মোটা নেপালি হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। লোকটার হাত জড়িয়ে ধরে বললাম, দে ভাই, একটু ঢুকতে দে, বড় খিদে পেয়েছে! তবুও লোকটা শোনে না। তখন আমি বললাম,

লাইবিরিমে হামারা লিখা একটা কেতাব হ্যায়, জানতা? হামসে কার্ড চাও, মাৎ, দু'দশ বরষ বাদ দিয়া পর হামারা ফটো ঝুলেগা, সমঝা? লোকটা বলল, নেই সাব, কার্ড দেখাইয়ে। তখন আমাকে নিজের ব্যবস্থা করতে হল। এই সব সরকারি বোকামির প্রতিষেধক আমি জানি। গেট থেকে কয়েক পা পিছিয়ে এলাম, বারান্দায়, যেখানে দু'পাশে ফুলের টব। এ-দিক ও-দিক তাকালাম, আকাশের দিকে, নেপালিটা আমাকে লক্ষ্য করছে। হঠাৎ আমি গণ্ডারের মতো খানিকটা মোশান নিয়ে প্রবল বেগে দৌড়ে নেপালিটাকে ভেদ করে গেট দিয়ে ঢুকে গেলাম। লোকটা আরে আরে বলে পেছনে পেছনে ছুটল। আমি তিন জনকে ধাক্কা মেরে, একটা মেয়েকে ধাক্কা বাঁচাতে গিয়ে পিছলে পড়তে অন্য একটা মেয়ের হাত থেকে সাতখানা বই ফেলে দিয়ে ক্যাটালগ কেবিনখানাকে বোঁ বোঁ করে তিনটে পাক দিয়ে — যতক্ষণে নেপালিটা আমাকে ছুঁয়ে ফেলল, ততক্ষণে আমি লেন্ডিং সেকশানের কাউন্টারে একটা লোকের হাত চেপে ধরেছি ও বলেছি, অশোক, অশোক, দেখ, এ কী উৎপাত। তোর সঙ্গে দেখা করতে আসব, তবু কার্ড চাইছে! গোলমালে অনেক লোক পড়া থামিয়েছে ও মজাখোর লোকেরা ভিড় জমিয়েছে আমার চারপাশে, নেপালিটা হাত ধরে টানবার চেষ্টা ছাড়েনি। দীর্ঘ সবল কালো অশোক শান্ত চোখ তুলে বলল, কী, কার্ড আনেননি? ছেড়ে দেও দারোয়ান, হামারা চেনা আদমি হ্যায়। আমি অশোকের ব্যবহারে থমকে গেলাম। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চোখ বড় বড় করে তাকালাম অশোকের দিকে। 'আপনি' বলে কথা বলছে আমার সঙ্গে, মাস দু'তিন আগেও তো ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। অশোক বলল, কোনও বই দরকার থাকে যদি, একটু ঘুরে-টুরে দেখুন, আমি একটু ব্যস্ত এখন।

আমি তবু রাগ করলাম না, গোঁ মেরে দাঁড়িয়ে থেকে বললাম, তোর সঙ্গে একটু দরকার আছে, অশোক। এক মিনিট আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কাউন্টারের দরজা খুলে বলল, ভেতরে আসুন।

অশোকের কাছে খেতে চাইব ভেবেছিলাম, কিন্তু ওব অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা ব্যবহারে কী-রকম ভ্যাবাচাকা মেরে গেলাম। কী ব্যাপার, অশোক আমার সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করতে চাইছে? আমি বললাম, তোর কী ব্যাপার, তুই কেমন আছিস? আমি ওর কাঁধে চাপড় মারলাম।

ভালই! বিশেষ কিছু বলবেন? সেই রকম ঠাণ্ডা গলা অশোকের।

না বিশেষ কিছু না। এমনিই —।

তাহলে —। এই বলে অশোক এমন ভাবে থেমে গেল যে, এখন যাও বলতে হল না। আমি আচ্ছা চলি বলে পিছন ফিরলাম। অশোক আমার কাছে এসে গলার আওয়াজ নিচু করে বলল, ওঃ, আপনাদের জানানো হয়নি, মাস খানেক আগে আমি বিয়ে করেছি। আচ্ছা পরে দেখা হবে। আমি স্তম্ভিত ভাবে অশোকের দিকে ফিরে তাকালাম। জিজ্ঞেস করলাম, বিয়ে করেছিস মানে? আমাদের খবর দিলি না? কী ব্যাপার তোর? অশোক আলগা ভাবে বলল, খুব ব্যস্ত ছিলাম, বেশি লোককে বলা হয়নি। বেশি লোক আর আমি? অশোক আর একটিও কথা না বলে কাজে মন দিয়েছে। আমি বেরিয়ে এলাম। এ-রকম আশ্চর্য আমি বহু দিন হইনি। এ কী রহস্য! খুব স্পষ্ট মনে পড়ছে, অশোকের সঙ্গে জীবনে কখনও খারাপ ব্যবহার করিনি। টাকা ধার নিয়ে মেরে দিইনি। বেশ চমৎকার বন্ধুত্ব ছিল এক সময়। এক মেসে এক সঙ্গে দু'বছর কাটিয়েছি। হঠাৎ অশোক আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচয় অস্বীকার করতে চাইছে। কেন? কী জানি! বিয়ে করেছে, নেমন্তন্ন করেনি। এর কোনও রকম কারণই মনে পড়ে না। খানিকটা গিয়ে অশোকের দিকে ফিরে তাকালাম। মহাত্মা গান্ধীর ছবির নিচে অশোক মুখ নিচু করে কাজ করছে, এ-দিকে চেয়েও দেখছে না, সারা দিনে এই প্রথম আমার বিষম মন খারাপ লাগল। খালি পেট ও মন খারাপ এই দুটো এক সঙ্গে থাকা খুব বিচ্ছিরি। অশোকের কাছে খেতে চাইব ভেবেছিলাম, তা-ও হল না, অথচ অশোক আমার মন খারাপ করে দিল। মানুষ এত নিষ্ঠুর।

হলঘরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে হেঁটে গেলাম আস্তে আস্তে। নিওন আলোর নিচে ঝুঁকেপড়া মুখগুলি ভাল করে খুঁজে খুঁজে দেখলাম। না, আমার কেউ চেনা নেই। আমাকেও কেউ চেনে না। এক সময় প্রায় আদ্দেক লোক চেনা থাকত। শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে টেবিলে, দু'পাশের ঝুঁকে-পড়া পড়ুয়াদের দেখে হঠাৎ যেন মনে হল, লঙ্গরখানায় ভিখিরিরা খেতে বসেছে। লাইব্রেরি কোনও দিন আমার এত খারাপ লাগেনি। মহাপুরুষের উক্তি চারদিকে কোলাহল করে। অসহ্য কোলাহল।

উর্দু অ্যালকভে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক চিরঞ্জীব রায়চৌধুরী বসে আছেন। বুঝলাম, আর একখানা থান-ইট বাজারে ছাড়বার মতলব। আজকাল আবার নভেলের মধ্যে দু'খানা ইংরেজি কোটেশান-ফোটেশান থাকলে লোকে খুব আধুনিক মনে করে, চিবঞ্জীব রায়চৌধুরীরাও এ-সব জেনে গেছেন। তাই বুঝি ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে? তাছাড়া বিনা পয়সায় পাখার হাওয়া। আমি চিরঞ্জীব রায়চৌধুরীর কাছে গিয়ে বললাম, কেমন আছেন! নতুন উপন্যাস বুঝি?

এই যে, কেমন আছ তপেশ? তারপর — (হাত দিয়ে যে-বইটা থেকে টুকছিলেন তার নাম আড়াল করে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার বইটা পড়েছি, সবটা পড়েছি, বুঝলে, বেশ ভালই হয়েছে। প্রথম তো, খুবই ভাল হয়েছে। তোমার হাত আছে তপেশ, লিখে যাও, বুঝলে।

আমি গোল গোল চোখে মোলায়েম গলায় বললাম, আপনি কষ্ট করে সবটা পড়লেন?

হ্যাঁ নিশ্চয়ই, বলো কী, তরুণ লেখকদের লেখা না পড়লে কি আর সাহিত্যের পালস বোঝা যায়? ভদ্রলোক হাঃ হাঃ করে হাসলেন। এই নিয়ে সাতাশ বার এই অশ্লীলকে আমি বলেছি যে, আমার নাম তপেশ নয়, তাপস। নামটাই উচ্চারণ করতে শেখেনি, ও আমার বই পড়েছে? আমার বই পড়লে ও এই রকম নিশ্চিন্তে বসে লিখতে পারত কিংবা বোকার মতো হাসত? তাহলে এত দিনে ওর অম্বলেব অসুখ হত না? বস্তুত লোকটার ব্যবহারে আমি এমন অসম্ভব চটে গেলাম যে, ওকে কী শাস্তি দেব মনে মনে ভাবতে লাগলাম। এই মুহূর্তে ওর নাক মূলে দেব না পকেট মারব এই নিয়ে দ্বিধা করলাম খানিকক্ষণ। পকেটে একটা পাঁচ পয়সা নিয়ে হেড-টেল করতে লাগলাম। হেড নাক মলা, টেল পকেটমারা। ওর সঙ্গে অন্যান্য কথা বলতে বলতে পয়সাটা বার করে দেখলাম। টেল। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এবার কী নিয়ে লিখছেন, স্যার? এক সময় উনি আমার অধ্যাপক ছিলেন।

এবার খুব বড় থিম ধরেছি ভাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ — সব মিলিয়ে বিরাট প্ল্যান। এব মধ্যে একটি নায়ক আর তিনটি নায়িকার জীবন-দর্শন। হাজার পাতার বই হবে অন্তত, স্মল পাইকা।

নায়ক কীসে মরছে এবার? ট্রেনের নিচে সুইসাইড?

না, হে, প্রত্যেক বার এক রকম হয় না। বন্যায় ভেসে যাবে।

ওফ্, আমি অভিভূত গলায় বললাম, কতটা লিখলেন?

সাত দিনে প্রায় ওয়ান-ফিফ্থ লিখে ফেলেছি। এখন যুদ্ধের ব্যাপারে মুসোলিনির একটা স্পিচ ঢোকাব।

আপনাকে খুব টায়ার্ড দেখাচ্ছে। চলুন, চা খেয়ে আসি।

চলো যাই, হ্যাঁ, অনেকক্ষণ বসে আছি। খাটতে হয় হে, ফাঁকি দিয়ে সাহিত্য হয় না। বিনা পরিশ্রমে ইতিহাসে আসন পাওয়া যায় না।

আপনার আগের বইটা কত এডিশন হল, তেরো না চোদ্দ?

একুশ চলছে। বম্বে থেকে কিনেছে শোনোনি? তেলেগু ভাষায় অনুবাদ বেরুচ্ছে এ মাসে।

ক্যান্টিনে খুব ভিড় ছিল, আমি ওঁকে চিড়িয়াখানার ভেতরের দোকানে নিয়ে এলাম। ঢুকেই আমি পাঁচ-সাত রকমের ঢালা অর্ডার দিয়ে দিলাম। কী, ও কী, ভদ্রলোক হ্যাঁ হ্যাঁ করে উঠলেন, অত খাবার কে খাবে? তুমি খেয়ে আসোনি নাকি?

আমি বিগলিত ভাবে বললাম, আপত্তি করবেন না আজ, অনেকদিন বাদে আপনাকে পেয়েছি। আজ আমি আপনাকে খাওয়াব। আপনি আমার বইটা পড়েছেন কষ্ট করে —

না, না, তা কী হয়, কী খাবে খাও না, পয়সার জন্য কী! আমি বয়োজ্যেষ্ঠ, তুমি পয়সা দেবে কেন? আমার আবার অম্বলের — খানিকক্ষণ চুপচাপ প্লেট সাবাড় করার পর বললাম, আপনি তবু আমার বইটা পড়েছেন, ওমুক-ওমুক বিখ্যাত লেখকেরা তো উলটেও দেখেননি। সব শালা বিখ্যাত সাহিত্যিক।

প্রসন্ন মুখে চিরঞ্জীববাবু বললেন, তোমার আবার রাগলে ভাষাজ্ঞান থাকে না। বুঝলে, অনেকে বোঝেন না যে ইয়ং ব্লাডই হল সাহিত্যের — হঠাৎ চিরঞ্জীব রায়চৌধুরীর মুখের রেখা কোমল হয়ে এল। একটু আলতো ভাবে বললেন, পয়সার লোভটা বড় সাংঘাতিক, সবাই লোভ সামলাতে পারে না। আমিও যে ঠিক পেরেছি, তা বলতে পারি না। টাকার লোভে অনেক সময় হেলাফেলা করে বাজে লেখা লিখেছি। কিন্তু কি জানো, এখনও আমার মাঝে মাঝেই মনে পড়ে তোমাদের বয়সটা, যখন সাহিত্যই ছিল ধ্যান-জ্ঞান, সাহিত্যের জন্য সাধনা করেছি। বুঝলে টাকা-পয়সা কিছু না।

আমি অবাক হয়ে বললাম, সে কী, টাকা-পয়সা কিছু না তো আপনি লেখেন কেন? আমি তো দু-চারটে টাকা পাবার আশাতেই লিখি। নইলে আর লেখার কী দরকার?

যাঃ এটা তোমার বানানো কথা। তোমাদের এই বয়সে টাকা-পয়সা কিছু না, সাহিত্যই হচ্ছে —।

চিকেন-স্টু-টা কিন্তু চমৎকার করেছে, একটু খেয়ে দেখুন। আমি বললাম হাত মুছে কফিতে চুমুক দিতে দিতে। তিনি বললেন, সিগারেট আছে তোমার কাছে? ছিল। কী যেন ভেবে তবু বললাম, না তো। তিনি পকেট থেকে লাল দু'টাকার নোট বার করে বেয়ারাকে ডাকতে যেতেই আমি বললাম, দিন, আমি নিয়ে আসছি। কী সিগারেট?

গোল্ডফ্লেক।

বসুন, এসে আপনার উপন্যাসের প্লটটা শুনব।

দোকান থেকে বেরিয়েই একটি অত্যন্ত সুন্দরী কিশোরী মেয়েকে দেখতে পেলাম। সাদা ফ্রক-পরা, রাজহংসীর মতো। মেয়েটার পেছন পেছন খানিকটা গেলাম। তিন-চার জন মহিলা, দু'টি বাচ্চা, দু'জন পুরুষের একটি দলের মধ্যে ওই মেয়েটি। মেয়েটি কী কারণে যেন অভিমান করেছে, মুখখানি তাই ঈষৎ থমথমে। ওই অভিমানের জন্যই ওর মুখখানা কী অপরূপ হয়ে উঠেছে। মেয়েটিকে মনে হয় ওই দলটা থেকে একেবারে আলাদা। বস্তুত সারা পৃথিবীর থেকেই ওকে আলাদা মনে হয়। মেয়েটি চুম্বকের মতো আমায় টানল। মেয়েটা গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। আমিও বাইরে এলাম। বেরিয়েই দেখলাম, একটা বিরাট স্টেশন ওয়াগন, মেয়েটি দলবলের সঙ্গে সেটাতে উঠছে। মেয়েটির সঙ্গে একবারও আমার চোখাচোখি হয়নি। ও আমাকে দেখেনি। আমিও ইহজীবনে ওকে আর দেখব না। গাড়িটা চলে যেতেই আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তারপর চোখে পড়ল সামনেই একটা থ্রি বি বাস। এই বাস এমনই দুর্লভ যে, দেখামাত্র আর অন্য কোনও কথা আমার মনে হল না। বাসটা স্টার্ট দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমি দৌড়ে উঠে পড়লাম। এবার দু'টাকার নোটটা ভাঙিয়ে টিকিট কাটতে কোনও অসুবিধে হয় না, ফেরত খুচরোটা পকেটে রাখবার পর নিজেকে বেশ ধনী মনে হয়। একটা পাঁচ নয়া ছুঁড়ে সার্কুলার রোডের বুড়ি পাগলিটাকে দিলাম।

এবার? রোদ্দুর ও ছায়ার মধ্যে দিয়ে বাস ছুটে যায়। লোকজন ওঠে ও নামে। আমি কোথায় নামব জানি না। এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত টিকিট কেটেছি। এবার কোথায় যাব? এখনও দীর্ঘ সময় পড়ে আছে। আবার কি গোড়া থেকে খোঁজা শুরু করব? ন্যাশনাল লাইব্রেরিতেই তো বিকেলটা কাটাতে পারতাম। কোনও রকমে ইংরেজিটা পড়তে পারি, অনিমেষ বা বিমলেন্দুর মতো না হলেও এক

কালে তো কিছু ইংরেজি বইও পড়েছি। সিলিনের বইটা আদ্দেক পড়েছিলাম পাঁচ মাস আগে, সেটা শেষ করা যেত। কিংবা রিকুইজিশান স্লিপের গোছার উলটো পিঠে একটা ছোট গল্পও মক্‌শ করতে পারতাম, লিখলে দু-চারটে টাকাও কি আর পাওয়া যেত না, টাকার জন্য এরকম উঞ্ছবৃত্তি না করে! কিন্তু পড়তে বা লিখতে কিছুই ভাল লাগে না। যেন একটা বাঁশের খাঁচায় বন্দি আছি, দাঁত দিয়ে কেটে খাঁচা ভেঙে সহজেই বেরুতে পারি, বেরুতে ইচ্ছে করছে না বলেই আটকা রয়েছি। হঠাৎ এ-কথাটা কেন মনে হল? খাঁচা-ফাঁচা আসলে বাজে হ্যাক। কিন্তু এ তো মহা মুশকিল, এখন কোথায় যাই? মহাশূন্যে রকেটে যারা যায়, পৌঁছুতে পারুক বা নাই পারুক, তারাও জানে, তারা কোথায় যাবে। আমি জানিনি। মৃত্যুর পর শরীরের পঞ্চভূত জানে, তারা কোথায় যাবে। আমি জানি না। খুনি আসামিও জানে সে কোথায় যাবে, আমি — নাঃ, এ-রকম ভাবে দিন কাটে না। এবার যার কাছে যাব, দেখা না পেলে আমি ভয়ঙ্কর চটে যাব তার ওপর, প্রতিশোধ নেব, দরকার হলে তার নামে থানায় ডায়েরি করে আসব। বাকি আছে শেখর। দেখি শেখরকে। কিছু পয়সাকড়ি পেলে পুরী কিংবা কাশীতে ঘুরে এলে বোধহয় ভাল লাগত। চিরঞ্জীববাবুর সঙ্গে পরে যখন আবার দেখা হবে, প্রথমেই পায়ের ধুলো নিয়ে এমন ভুলিয়ে দেব!

শেখর বাড়িতেই। কারণ, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দরজায় টোকা মেরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর বিনা শব্দে দরজা খুলে গেল। খালি গায়ে শেখর, একটা ধুতি জড়িয়ে পরা, আমার দিকে ভুরু তুলে বলল, কী ব্যাপার, তুই?

একটু থতমত খেয়ে বললাম, এমনি এলাম।

হঠাৎ এ সময়?

আমি কি ভুল শুনছি, আমি বুঝতে পারলাম না। নাকি কোনও বিদেশে এসেছি, যেখানে কারুকে চিনি না? নাকি রিপ ভ্যানের মতো দীর্ঘকাল ঘুমিয়ে উঠে দেখছি হঠাৎ সব বদলে গেছে? নচেৎ, শেখর! শেখর বলছে, হঠাৎ এ সময়? যেন আমাকে চেনেই না, সেই শেখর, যে আমাকে — আমি যাকে — যে আমাদের, আমরা যাকে —। সেই শেখর যে সিনেমা দেখতে গিয়ে অবধারিত গণ্ডগোল বাধাবে, ও দাদা টাক চুলকুনো থামান, ও ডান দিকের মশাই, প্রেমালাপটা একটু আস্তে, কিংবা এই যে সিনেমাটা পিছনের দিকে নয়, সামনের দিকে — এইসব দিয়ে প্রত্যেক দিন ঝগড়া বাধাবে আর আমরা ওকে বাঁচাব, আর যে-শেখর মদ খেয়ে রাস্তায় শুয়ে পড়লে আমরা ওকে লরিচাপা থেকে বাঁচাতে যাই, যে-শেখর কবিতার জন্য বাড়ি পুড়িয়ে দিতে পারে, ছ'বছর ধরে যে কবিতার পত্রিকা বার করে বাপের টাকা ওড়াচ্ছে, পরশু দিনও যে-শেখরের সঙ্গে আমি তিন ঘণ্টা কাটিয়েছি। হঠাৎ কেন জানি না, আমার চোখে জল এসে গেল। সত্যিকারের কান্নার চোখ, আমি চোখ নিচু করলাম। অশোক প্রথম আঘাত দিয়েছিল, তারপর শেখর।

শেখর মুখ কালো করে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, দাঁড়া, আমি আসছি, সিগারেট কিনতে বেরুব। শেখর আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে গেল! আমাকে ভেতরে যেতে বলল না। না বলুক, কিন্তু দরজাটা ভেজানো, আমি কি চলে যাব? কেন এবং কোথায় যাব? আমি শেখরের ওপর যথেষ্ট রেগে যেতেও পারছি না, তার বদলে আমার মন ভেঙে আসছে। শেখর চটি গলিয়ে চট করে ফিরে এল। কোনও কথা না বলে কিছুক্ষণ হাঁটলাম। তারপর সদর পেরিয়ে আসার পর ও বোমার মতো ফেটে পড়ল : ইডিয়েট, রাস্কেল, অশ্লীল অশ্লীল, তোকে না অত করে বললাম সে-দিন! দুপুরবেলা ভেতরে থেকে দরজা বন্ধ দেখলে খবরদার আমাকে ডাকবি না।

কেন রে? আমি সম্পূর্ণ আকাশ থেকে নরকে পড়লাম।

ফের — মি, করছিস?

সত্যি, আমি কিছুই জানি না, বিশ্বাস কর।

বিশ্বাস করব, আমাকে ডোবাবার মতলব!

না না, সত্যি শেখর, বিশ্বাস কর, আমার কিছুই মনে নেই। শেখর বুঝতে পারেনি, কিন্তু আমার গলা কান্নায় বন্ধ হয়ে আসছিল।

সে-দিন বলিনি তোকে যে দুপুরবেলা একটা বিরাট বড়লোকের মেয়েকে প্রাইভেট পড়াচ্ছি? মাসে আড়াইশো দেবে, তাছাড়া গেঁথে ফেলতে পারলে —।

একদম মনে ছিল না, সত্যিই।

মনে ছিল না? কে-ন ছি-ল না? যদি দেখে কতগুলো লোফার ছ্যাবড়া সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব — শেখর এই কথাটা হেসে বলেছিল। আমি শেখরকে মোটে ঈর্ষা করলাম না। বরং খানিকটা যেন করুণা হল, বললাম, যাঃ, আমাকে মোটেই লোফার কিংবা ছ্যাবড়া সাহিত্যিকের মতো দেখতে নয়। প্রায় তোর মতোই ভাল চেহারা আমার।

এখন কেটে পড় ভাই। আমাকে চান্স দে।

আমি অন্য দিকে মুখটা ফিবিয়ে চোখ মুছে নিলাম। শেখরকে ছাড়তে কিছুতেই ইচ্ছে হচ্ছিল না। শেখর আমার শেষ আশ্রয়। একটা মেয়ের জন্য শেখর এমন চমৎকার দুপুরটা নষ্ট করছে। আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে? আমি বললাম, শেখর। শেখর মুখ তুলে বলল, কী? আমি পুনরায় বললাম, শেখর —। শেখর বলল, কী ন্যাকামি করছিস! আমি বললাম, শেখর, সকালে থেকে খুব খারাপ লাগছে, মানে বিচ্ছিরি লাগছে, আর কী! খুব কবিতা পড়তে ইচ্ছে করছে, তাই তোর কাছে এলাম।

শেখর এতেও গলল না। বলল, কবিতা পড়ার ইচ্ছে? এই দুপুরবেলা? ন্যাকামির একটা সীমা আছে। তা তোব ইচ্ছে হয়েছে, তুই গঙ্গাব পাডে বসে দখিন হাওয়া খেতে খেতে কবিতা পড় গিয়ে। আমার এখন সময় নেই, তাই।

বিশ্বাস কর, আজ হঠাৎ খুব বিলকের কবিতা পড়তে ইচ্ছে করছে। তোর রিলকের কালেকশানটা দে। পার্কে বসে পডব।

কবিতা পড়বি, তা-ও আবার বিলকের কবিতা? শখ কম নয় তো!

তুই তো জানিস, আমি রিলকের কবিতা কত ভালবাসি। আমি রিলকের মূল্য বুঝি।

তুই কবিতা কিছুই বুঝিস না। বরং জাঁ জেনের 'আওয়ার লেডি অব দি ফ্লাওয়ার্স' পড়, তোর কাজে লাগবে।

না, আমি রিলকে চাই।

শেখর দাঁড়িয়ে রইল খানিকটা চুপ করে। সিগারেট টানল। বলল, আচ্ছা দাঁড়া, এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সন্ধের পর দেখা করব। আমি বললাম, কাপড়টা ফেরতা দিয়ে পরে নে শেখর। জমিদারের মেয়ের সামনে অমন ভাবে বসতে নেই।

চামড়ায় বাঁধনো রিলকের কালেকশানটা পেয়ে আমি বুকে চেপে ধরে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। যেন মহামূল্যবান সম্পদ আমার বুকে। এতক্ষণে আমার অনিশ্চিত নিঃসঙ্গতাব বোঝা কাটবে নিশ্চিত। আ, রিলকে, তোমাকে আমি কত ভালবাসি। সারা পৃথিবীর লোক তোমার ভক্ত, এখনও তরুণরা তোমার লেখা কিনে পড়ে। কত সাধনায় তোমাকে পেয়েছি, অথচ এক মিনিটে।

আমি জানি, তুমি কত বড় কবি, যদিও জীবনে এক লাইনও পড়িনি। পৃথিবীময় তোমার ভক্ত, তাই তোমার প্রতি আমার ভালবাসা এত প্রগাঢ়। তুমি রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড়, কারণ শতবার্ষিকীতে

রবীন্দ্রনাথের সুলভ গ্রন্থাবলী বেরিয়েছে, কিন্তু তোমার কোনও পেপারব্যাক এডিশন নেই, তুমি কি বাংলাদেশের কথা জানতে? বাংলাদেশেও এখন তোমার প্রতি ভক্তির ঢেউ বইছে। তোমার গোলাপের কাঁটায় বেঁধা বুকের রক্তের কবিতা। বইটার একটা পাতা ওলটাতেও আমার ভয় করল, যেন আমার চোখ আটকে যাবে। আমি সোজা বাসে চেপে এলাম কলেজ স্ট্রিটে ফুটপাতের পুরনো বইয়ের দোকানে। এসে বললাম, এই নাও, ভাল মাল এনেছি।

লোকটা লুঙ্গি তুলে উরু চুলকোচ্ছিল। বইটা হাতে নিয়ে পাতা ওলটাতে ওলটাতে আড়চোখে আমার দিকে চেয়ে বললে, আজকাল তেমন চলে না এ বই।

ও-সব ফিকির ছাড়ো মিঞা, রিলকে চলে না তুমি আমাকে বোঝাবে?

না, একটু মারকেট পড়ে গেছে। সে-দিন যে মারি স্টোপস এনেছিলেন —।

ভাগ! সোনালি চশমা পরা মেয়েরা, লম্বাচুল বাবুরা কিংবা হাওয়াই কোর্তা-পরা ছোকরারা এ বই লুফে নেবে।

না, সত্যি বলছি, আজকাল —।

যাঃ যাঃ, কালও আমি এখানে দাঁড়িয়ে শুনে গেছি একজোড়া ছোকরা-ছুকরি খোঁজ করে গেল। ব্রান্ড নিউ মাল, দেখো।

লোকটা একটু হেসে বলল, লেকিন নাম লেখা আছে, তুলতে হবে।

ও তো একটু ক্লোরিন ঘষার মামলা। ঝুট-ঝামেলা করো না, কত দেবে বলো?

অনেক দর-কষাকষির পর আট টাকা পাওয়া গেল। সারা দিনে এইটাই সব চেয়ে বড় সাকসেস। আর কিছু চাই না। পরশু পর্যন্ত নিশ্চিন্ত। এখন একটু কফি খাওয়া যেতে পারে। এখন কারুর দেখা না পেলেও আমার আর একা লাগবে না। পকেটে আট টাকা আছে সঙ্গী! চিরঞ্জীবের টাকাটা দিয়েই কফি-টফি খাওয়া যাবে। ওই টাকায় এক প্যাকেট গোল্ডফ্লেক কিনলাম, কেন না উনি গোল্ডফ্লেক কিনতে বলেছিলেন। প্রায় বছর পাঁচেক বাদে আমি নিজের হাতে নিজের টাকায় গোল্ডফ্লেক কিনলাম। এত দাম বেড়ে গেছে জানতাম না। কারা খায় এ-সব!

কফি হাউসের জানালার পাশের টেবিলে একা পরীক্ষিৎ বসে ছিল। বিশাল লম্বা শরীরটা নিয়ে ঝুঁকে আছে পরীক্ষিৎ। একটা দু-বুক পকেটওয়ালা খাঁকির জামা পরেছে। পরীক্ষিৎ আমার চেয়ে প্রায় আধফুট লম্বা, স্পষ্ট, সত্যজিৎ রায়ের মতো চোয়াল, ওর শরীরটা আমি ঈর্ষা করি। আমি পাশে দাঁড়াতেই ও মুখ তুলল। পরীক্ষিতের চোখ দুটো অসম্ভব লাল। বলল, সারা দিন কোথায় ছিলি? তোর মেসে গিয়েছিলাম দুপুরে।

আমি যে সারা দিন যে-কোনও বন্ধুকে হন্যে হয়ে খুঁজেছি সে-কথা ওকে জানালাম না। বললাম, অনিমেষ আর গায়ত্রী এসেছে, শুনেছিস?

শুনেছি।

দেখা হয়নি তোর সঙ্গে?

হু! ওরা ফিল্ম দেখতে গেল।

অবিনাশও?

না, অবিনাশ ওখানে নেই। ছিল, ছায়ার সঙ্গে কী যেন ঝগড়া করে চলে গেছে।

কীসের ঝগড়া?

কে জানে। ওর মতলব বোঝা আমার কম্ম নয়।

তোকে এ-রকম দেখাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ?

কাল জ্বর হয়েছিল রাত্রে। কুচ্ছিৎ স্বপ্ন দেখেছি। মাথার ঠিক মাঝখানে খুব ব্যথা হচ্ছে আজ। তোর কাছে টাকাকড়ি আছে কিছু?

কেন, ওষুধ কিনবি?

হ্যাঁ! অনেক দিন, দিন সাতেক খাইনি। একটা পয়সা নেই হাতে। দিন সাতেক অফিস-টফিস যাচ্ছি না।

চল যাই। বাংলা-টাংলা হতে পারে, অল্প আছে। কিংবা কলাবাগানেও যেতে পারি। আমারও খুব ইচ্ছে করছে সারা দিন।

পরীক্ষিৎ হাত দিয়ে কপালটা টিপছিল। সত্যি খুব ব্যথা হচ্ছে বুঝতে পারলাম। ব্যথাটা কী রকম রে? ডাক্তার দেখাবি নাকি?

একটা অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, জানিস তাপস। বছর খানেক আগে যে-অনিমেষের ওখানে ব্রিজ থেকে পড়ে মাথা ফেটেছিল, এত দিন পর আবার ঠিক সেইখানে ব্যথা হচ্ছে।

সেলাই গণ্ডগোল হয়েছিল নাকি? অনেক সময় ও-থেকে বিচ্ছিরি জিনিস হয়।

পরীক্ষিৎ আমার দিকে রক্তবর্ণ চোখ তুলে তাকিয়ে অসহায় গলায় বলল, আমি অবিনাশকে খুঁজছি। ওর কাছে একটা কথা জিজ্ঞেস না করলে, আমার ব্যথা কমবে না, আমি জানি।

অবিনাশ কী করবে?

এত দিন পর, জানিস, আমার মনে হচ্ছে, আমি কি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম, না অবিনাশ আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল?

যাস শালা, তোর কি মাথা খারাপ! তুই এক-একবার এক-এক রকম বলিস।

কিন্তু অ্যাদ্দিন বাদে, এ-কথাটা আমার মনেই বা হল কেন? আর, মনে হওয়ার পর থেকেই মাথার যন্ত্রণাটা শুরু হয়েছে।

কিন্তু অবিনাশ যদি তোকে ফেলে দিয়ে থাকে, তবে অবিনাশই আবার বাঁচিয়েছে — এ-কথাটাও জেনে রাখিস। আমি ছিলাম সেখানে।

একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস? অবিনাশ আমাকে কী-রকম এড়িয়ে এড়িয়ে পালাচ্ছে? বহু দিন ওর সঙ্গে ভাল করে কথাই হল না। দেখা হলেও ভিড়ের মধ্যে চালাকি করে অন্য কথায় চলে যায়।

অবিনাশ তো বলছে, ও সরল, স্বাভাবিক জীবন কাটাতে চায়। লেখা-ফেখার ইচ্ছে নেই। বিয়ে করে দীর্ঘ সুখী জীবন কাটাবে।

কিন্তু যে-রকমভাবে দিন কাটাচ্ছে, সেটা কী?

ওটা একেবারে দাগি আসামি। সরলতা মানে যে ওর কাছে কী, তা বোঝা অসাধ্য। মায়াকে নিয়ে কী কাণ্ড করেছে, কে জানে!

মায়াকে নিয়ে।

তুই জানিস না, মায়াকে নিয়ে পুরী বেড়াতে যাবে ঠিক করেছিল। মায়া হঠাৎ হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত গিয়েও ফিরে আসে। তার পরেও অবশ্য মায়া ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মায়াকে নিয়ে সম্ভবত ও একটা গভীর গণ্ডগোল পাকাবে। (এ গল্পটা সম্পূর্ণ বানিয়ে বললাম পরীক্ষিতের কাছে। কেন বানালাম, কী জানি। সম্পূর্ণ অজান্তে অবিনাশ ও মায়া সম্বন্ধে এই কাহিনি আমার মুখ থেকে গড়গড় করে বেরিয়ে এল।)

না, গণ্ডগোল মায়াকে নিয়ে না, অন্য এক জনের সঙ্গে। পরীক্ষিৎ বলল।

কে?

তোকে বলে লাভ নেই, তুই কোনও জিনিস ভাল করে ভেবে দেখতে চাস না। তোর কাছে জীবন মানে এই মুহূর্তে বসে থাকা, কাল কিংবা ভবিষ্যতে কী করবি, তোর কোনও ধারণাই নেই।

চল, উঠি।

অবিনাশকে তুই-ই বেশি পাত্তা দিয়েছিলি। ওকে হিরো বানিয়েছিস। ওর মধ্যে কী আছে? শুধুই স্টান্টবাজি। ওর সঙ্গে আমার আলাদা বোঝাপড়া আছে। কেন আমার মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, জানতে হবে।

জানতে হবে — এই কথাটা পরীক্ষিৎ সন্ত-পুরুষের মতো শান্ত গলায় বলল, যেন ওর মধ্যে দিব্যজ্ঞানের তৃষ্ণা। আমি বললাম, চল, কোনও ডাক্তারের কাছেই যাই। আমার কাছে গোটা আষ্টেক টাকা আছে।

থাক, কাল কি পরশু যাব। আজ চল কিছু খাই। ভাল লাগছে না। তবে ওই আট টাকাই খরচ করতে পারবি তো? আমার কাছে কিছু নেই কিন্তু।

চল, অন্য কেউ আসবার আগেই উঠে পড়ি।

পরীক্ষিৎ ক্ষেপে গিয়েছিল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সব টাকা চেটেপুটে শেষ করে দিল। খালাসিটোলা বন্ধ হয়ে যেতে পরীক্ষিৎ বলল, চল, টালিগঞ্জে শশাঙ্কর কাছে যাই।

বেরিয়ে পরীক্ষিৎ তীরের মতো ছুটে রাস্তা পার হয়ে গেল, আবার লাফাতে লাফাতে ফিরে এসে বলল, আমার শরীর জ্বলছে, তাপস।

পরীক্ষিতের মাথার চুল খাড়া হয়ে গেছে, চোখ দু'টি ছল ছল, সারা মুখে শুধু প্রহরীর তলোয়ারের মতো নাকটা জেগে আছে। বুঝলাম, ওকে শয়তান ভর করেছে। বললাম, শশাঙ্কর কাছে কেন?

শশাঙ্কর এক বন্ধুর দোকান আছে। মাঝে মাঝে ব্যবস্থা করে খাওয়ায়। চল না, আঃ, চল না, কেন দেরি করছিস?

শশাঙ্ক নিরীহ চেহারার একটি বদমাইসির ডিপো। কাতর মুখভঙ্গি করে দুনিয়ার যত খারাপ খারাপ কথা বলে। ভালই লেখে, কিন্তু ওর নভেল আজ পর্যন্ত পড়ে শেষ করতে পারিনি। পরীক্ষিৎ বিকট মোটা গলায় শশাঙ্ককে ডেকে নামাল। স্পষ্ট বোঝা গেল, শশাঙ্ক লিখছিল। কারণ, ওর বিব্রত ও বোকামিভরা মুখখানা দেখেই মনে হল ওর সমস্ত বুদ্ধি এই মুহূর্তে ও ওর গল্পের নায়ককে ধার দিয়েছে।

অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে শশাঙ্ককে জড়িয়ে ধরে পরীক্ষিৎ বলল, তুই কেমন আছিস, শশাঙ্ক, কত দিন তোকে দেখিনি, হঠাৎ বড় দেখতে ইচ্ছে করল তোকে। এবং এই কথা বলার পর হুড় হুড় করে বমি করে দিল ওর গায়ে। পরীক্ষিৎকে শশাঙ্কর হাতে সঁপে দিয়ে আমি একা বেরিয়ে এলাম।

যত দূর সম্ভব মনে করে করে তেরোই এপ্রিল ১৯৬১-র কথা লিখছি। কিন্তু কী বাদ গেল? হ্যাঁ, ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে চিরঞ্জীব রায়চৌধুরীর সঙ্গে বেরিয়ে আসবার সময় আমি অশোকের দিকে বিস্মিত ভাবে আর একবার তাকিয়েছিলাম। চোখাচোখি হল, হঠাৎ মনে হল, অশোক কাঁদছে। হা ঈশ্বর, আজ পর্যন্ত অশোকের রহস্য জানা হল না। তারপর থেকে অশোকের সঙ্গে আজ পর্যন্ত আর দেখা হয়নি। অশোক যে-মেয়েটিকে বিয়ে করেছে, তাকে আমি কস্মিনকালেও চিনতাম না। সুতরাং সে-দিক থেকেও কোনও গণ্ডগোলের কারণ নেই। অশোক, তোর কাছে কবে কী অপরাধ করেছি, মনে পড়ে না, তবু কোনও এক দিন আমাকে ক্ষমা করিস।

তেরোই এপ্রিলের কথাই-বা কেন নিলাম, জানি না। কোনও নতুনত্ব নেই, তবু সে-দিন বাড়ি ফেরার পথে যে অনুভব হয়েছিল, সেই জন্যই দিনটা মনে আছে। মনে আছে মন্থর পায়ে মেসে

ফিরছিলাম। মেসে কেন ফিরব, এর কোনও উত্তর জানা ছিল না। যেমন মেস থেকে বেরুবার সময় কোথায় যাচ্ছি জানতাম না। যেন পাশাপাশি দুটো ট্রেন ভয়ঙ্কর বেগে ছুটে চলেছে, যে-কোনও একটার জানালা থেকে সম্পূর্ণ গতিহীনতা কোটি কোটি মাইল দূরে যে-নক্ষত্রের আলো এখনও পৃথিবীতে পৌঁছায়নি, বা যে-নক্ষত্রের মৃত্যুসংবাদ এখনও পৃথিবীতে আসেনি, এখনও পরীর চোখের মতো জ্বলছে — যেন আমিও সেই রকম। আমি যে পৃথিবীতে আছি, কেউ জানে না। আমার মৃত্যুর পর জানা যাবে, আমি পৃথিবীতে একা হেঁটে গিয়েছিলাম। আমি এক গাছের তলায় দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করার সময় সেই গাছটাকে প্রণাম করেছিলাম। আমি একা অন্ধকারে, কেউ শ্রোতা নেই জেনেও আপন মনে একটা গান গেয়েছিলাম। আমার চটি ছিঁড়ে যেতে আমি চটিজোড়া কোলে নিয়ে খালিপায়ে মাটির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলেছিলাম, আমি জানি, সব দৃশ্যই অদৃশ্য জগতের উলটো পিঠ। মনে পড়েছিল, আমি প্রত্যেক দিন মাথার বালিশ ছাড়া বিছানায় শুই।

মেসে ফেরার কথা মনে পড়লেই রামসদয়ের কথা মনে পড়ে। আমার রুমমেট রামসদয়। বড় ভাল লোকটা, কিন্তু এমন অপমান করেছিল এক দিন। এক দিন অনেক রাত্রে ফিরেছি, রামসদয় জেগে ছিল। আমাদের ঘরের পাশেই বাথরুম। বাথরুমে মুখ ধুতে গেছি। সে-দিন আমার এমন কিছু নেশা ছিল না, শরীর সুস্থ ছিল, কিন্তু বাথরুমে ঢুকে আমি চিৎকার করে ভয়ে পিছন ফিরতে গিয়ে পড়ে গেলাম। আমি দেখলাম, বাথরুমে একটা মানুষের মুণ্ডু ঝোলানো রয়েছে, শরীরহীন একটা মুণ্ডু, অভিব্যক্তিহীন, ভাবলেশহীন চোখ। মুখখানা ও-রকম নিস্পৃহ বলেই বীভৎস। রামসদয় ছুটে এসে ঢোকার আগেই আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, ভয়ে আর মুখ ফেরাইনি, জিজ্ঞেস কবলাম, ওখানে কী, কী, কীসের মুখ ওটা? আমি এত স্পষ্ট দেখেছিলাম যে, সন্দেহ করিনি।

রামসদয় আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলেছিলেন, ওঃ এই, চলুন, শোবেন চলুন।

কার মুখ?

কিছু না, আমার দোষেই —।

আমি ফিরে তাকালাম, তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কেমন লজ্জা হল। রামসদয় দাড়ি কামাবার জন্য বড় আয়নাটা এনে ঝুলিয়েছিল, বদমাস টেকোটা আর আয়নাটা ঘরে নেয়নি। মাঝ রাতে মাতালকে ভয় দেখাবার জন্য বাথরুমে ফাঁদ পেতেছে। রামসদয় আমার হাত ধরে নিয়ে এল ঘরে, বিছানার চাদরটা ঝেড়ে আমাকে শুইয়ে দিল। আমি সাহিত্যিক বলে লোকটা আমাকে একটু খাতির করে। আলো নিভিয়ে দিই? রামসদয় জিজ্ঞেস করল, তারপর অল্প একটু হেসে বলল, শেষকালে নিজের মুখ দেখেই ভয় পেলেন?

শেষ কথাটাই মারাত্মক। দু'গালে পাঁচটা থাপ্পড়ের মতো। লজ্জায় কিংবা ভয়ে অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারিনি। নিজের মুখ দেখে ভয় পেয়েছিলাম। আমার নিজের মুখ সব চেয়ে চেনা। ঊনত্রিশ বছর ধরে যে মুখ দেখেছি। দাড়ি কামাবার সময় বা কতবার পানের দোকানের আয়নায় বা ট্যাকসির কাচে। গ্রুপ ফটোতে, লোকে যেমন বলে মেয়েদের চোখের মণিতে আমি এ মুখচ্ছবি আমি কতবার দেখেছি। তবু চিনতে পারলাম না। ভয় পেলাম, যদিও চোখে এমন কিছু রঙ ছিল না। এই রকম ছেঁদো দার্শনিক হা-হুতাশ কিছুক্ষণ করে আমার ভয় দেখানো মুখখানা বালিশে চেপে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর মাস দুয়েক কোনও স্বপ্ন দেখিনি পর্যন্ত।

নাঃ, এবার শেষ করা যাক। আর ভাল লাগছে না। তারপর কী হল সেই রাতে, পরীক্ষিৎকে ছেড়ে আসার পর? ওঃ সেই রাত, সেই —। একা একা অনেকখানি হেঁটে এসেছিলাম, চৌরঙ্গীতে বড় রাস্তা ছেড়ে হেঁটে এলাম মাঠ দিয়ে। একবার পকেটে হাত দিলাম, সিগারেট নেই, কিছুই নেই, শুধু মাত্র

একটি পাঁচ পয়সার ঢেলা পড়ে আছে। আবার সেই জঞ্জাল, কাল সকালে আবার ওই নিয়ে দুশ্চিন্তা। হাসি পেল, বুড়ো আঙুল ও মধ্যমার ওপর পয়সাটা বসিয়ে জোরে একটা টুসকি মেরে বললাম, যাও সখা, বল তারে, সে যেন ভোলে না মোরে। পয়সাটা ডানা মেলে অন্ধকারে উড়ে গেল। পরক্ষণে নিজের বোকামিতে নিজের আঙুল কামড়ালাম। পাঁচটা নয় পয়সা ওড়াব, এমন অবস্থা আছে নাকি আমার? সেটাকে খুঁজতে লাগলাম। জ্বালতে জ্বালতে এগোচ্ছি, খালি পা কাদায় বসে যাচ্ছে, কবে বৃষ্টি হল কী জানি!

পয়সা খুঁজতে খুঁজতে অনেক দূর চলে এসেছিলাম। হঠাৎ একটা পুকুর। বেশ বড় জলাশয়, চারদিকে মেহেদি গাছের বেড়া দেওয়া। পরিষ্কার জায়গাটা, অল্প জ্যোৎস্নায় ঝক ঝক করছে পরিষ্কার জল। এখানে এ-রকম পুকুর ছিল, কোনও দিন তা জানতাম না। চারদিক বাঁধানো, কোথাও এক ছিটে কাদা নেই, পুকুরের চার কোণে পাঁচটা গাছ, কোথা থেকে হাওয়া এসে ওদের পাতা দোলাচ্ছে। আহা, এমন সুন্দর জায়গা কলকাতায় আছে! কোনও দিন জানতে পারিনি। এমন পরিচ্ছন্ন পুষ্করিণী যেন বহুবার স্বপ্নে দেখেছি। হাত-পা এবং জামা-প্যান্ট, পয়সা খুঁজতে গিয়ে জল কাদায় মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল, ইচ্ছে হল, এই পুকুরে ভাল করে ধুয়ে নিই। এমনকী, এই পুকুরে স্নানও করা যেতে পারে, একা একা অন্ধকারে সাঁতার কাটতে খুব ভাল লাগবে। এগুতে গিয়ে অদৃশ্য কোনও কিছুতে জোর ধাক্কা খেলাম। বেশ শক্ত কোনও-কিছুতে মাথা ঠুকে গেল। কী? তাকিয়ে দেখলাম কিছু নেই। আশ্চর্য, তবে কি হাওয়ায় ধাক্কা লাগল! ভয় হল, মানুষের মৃত্যুকালে হাওয়া পর্যন্ত কঠিন হয়ে যায় শুনেছি। আবার সামনে হাত বাড়ালাম। দুই হাত, কোনও কঠিন অদৃশ্য দেওয়ালে ধাক্কা লাগল। নেশায় কি চুর হয়ে আছি নাকি? মাথা ঠাণ্ডা করে দাঁড়ালাম। আবার হাত বাড়ালাম। সেই অদৃশ্য কঠিন বাধা। এবার বুঝতে পারলাম, কাচ বা মাইকা বা শক্ত প্লাস্টিক বা ট্রান্সপারেন্ট কঠিন কিছু দিয়ে জায়গাটা ঘেরা। কী অসম্ভব কাণ্ড! একটু পাশে সরে যেতেই একটা নোটিশ চোখে পড়ল।

রিজার্ভড পন্ড

প্রোহফকিন্স ইনস্টিটিউট কর্তৃক সংরক্ষিত পুষ্করিণী

এই পুষ্করিণীর পাড়ে বা একশো গজের মধ্যে কাহারো বসা বা বিশ্রাম করা নিষেধ। বিষ প্রতিষেধক গবেষণার্থে এখানে জলজ সর্পের চাষ করা হয়। সাবধান! যদিচ এই সর্পগুলি বিষহীন, কিন্তু ইহাদের সন্ধানে দূর-দূরান্ত হইতে বিষধর সর্প আসিতে পারে। সম্ভব হইলে এই পথ পার হইবার সময় নিশ্বাস বন্ধ করিয়া যাইবেন। জনসাধারণের সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

অনুমত্যানুসারে

পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কোনও মাতাল বা গেঁজেলের দলবলের কাণ্ড এ-সব। বাংলাদেশে কী সাপের অভাব যে চাষ করতে হবে? এই রকম এত বড় একটা পুকুর-সাইজের কাচের জার বসিয়ে রেখেছে এখানে। কলকাতা শহরে প্রত্যেক দিন কেন অসংখ্য লোক সাপের কামড়ে মারা যাচ্ছে, এবার বুঝলাম। খবরের কাগজে প্রত্যেক দিনই কলকাতায় সর্পাঘাতে মৃত্যুর খবর থাকে। তার মানে দূর-দূরান্ত থেকে এখানে সাপ আসে। কিংবা এমনও হতে পারে, পুরোটাই ধাপ্পা। পুকুরটাকে সুন্দর রাখবার জন্য এ-রকম একটা বাজে নোটিশ লটকেছে। আমি কাচের দেয়ালে দেয়ালে হাত দিয়ে পুকুরটার চারপাশে ঘুরে এলাম। কোথা দিয়েও ভেতরে যাওয়া যায় না, বেহুলার বাসরঘরের চেয়েও শক্ত। চার কোণে পাঁচটা গাছ হাওয়ায় দুলছে। সমান করে ছাঁটা বুক-সমান মেহেদির বেড়া। মার্বেল পাথরে বাঁধানো পাড়। পরিষ্কার জল। ঢেউহীন। মেঘ ভেঙে মাঝে মাঝে চাঁদের আলো। ওখানে অসংখ্য সাপ ও সাপিনি খেলা করছে। ভেতরে ঢোকার অসম্ভব ইচ্ছে হতে লাগল আমার। কাচের

দেয়ালে গালটা ছোঁয়ালাম। সাপের গায়ের মতো ঠাণ্ডা। চুপ করে দাঁড়িয়ে আমি জ্যোৎস্না ও সাপের খেলা দেখতে লাগলাম। অজান্তেই। অজান্তেই একবার যেন বিড় বিড় করে বললাম, দূর-দূরান্ত থেকে আর তো কেউ আসেনি। শুধু আমি একাই এসেছি। কাল অন্য সবাইকে ডেকে এনে দেখতে হবে, এ-কথাও মনে পড়ল।

হেমকান্তি

প্রিয় বিমলেন্দুবাবু,

আপনাকে এই চিঠি লিখছি অনেক ভেবে, ভাবনার পর ক্লান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত, কারণ আর হয়তো আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে না। আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। দেরাদুনে আমার এক আত্মীয় আছেন, প্রথম কিছু দিন তাঁর ওখানে থাকব, তারপর আরও দূরে সরে গিয়ে, ইচ্ছে আছে পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে কোথাও বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব। না, আমার ঈশ্বর-দর্শন হয়নি, ঈশ্বরকে জানার তৃষ্ণা জাগেনি, সাধু-সন্ন্যাসী হতে চাই না, তবু কোথাও আত্মপরিচয়হীন হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে হল। এ ছাড়া আমার অন্য কোনও উপায় নেই। চেনা লোকদের থেকে দূরে, একটা অন্য রকমের, সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে থাকা যায় কিনা দেখি। আমার যদি বেশি অর্থ বা কিছু উদ্দীপনা থাকত তাহলে আমি হয়তো ইতালি কিংবা কোনও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিতে চলে যেতাম, সেখানেও হয়তো অন্য মানুষ হওয়া যেত, কিন্তু তার চেয়ে হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চল সহজ মনে হল। এখানে আমার বেঁচে থাকার কোনও স্বাদ পাচ্ছি না, আমার মৃত্যুও খুব মূল্যবান নয়।

জানি না, আপনি আমার এ চিঠি পড়ে বিরক্ত হবেন কি না, কিন্তু এ চিঠি আমাকে লিখতে হবে, কারণ, আপনাদের বিরুদ্ধে আমার কতগুলি অভিযোগ এই প্রথম আমি জানাতে চাই। আমি আপনাদের মধ্যে গিয়েছিলাম বেঁচে ওঠার জন্য, আপনারা লেখক, আপনারা জীবন সৃষ্টি করছেন, আমি ভেবেছিলাম আপনারা আমার মধ্যেও জীবন এনে দিতে পারবেন। বেঁচে থাকার জন্য আমার খুব বেশি দাবি ছিল না, আমার দরকার ছিল, শুধু খানিকটা বিদ্যুতের মতো ঝলক, ঘুমন্ত মানুষের কানের কাছে 'ডাকাত ডাকাত' বলে চেঁচিয়ে উঠলে সে যেমন আচমকা ছিটকে ওঠে, আমিও সে-রকম চেয়েছিলাম, আমি আপনাদের মুখের কাছে কান পেতে রাখতাম, কিন্তু আমি জেগে উঠতে পারলুম না তবুও। আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব কি না জানি না, কিন্তু আমার একটা নতুন মানুষ হওয়া খুব দরকার, খুবই দরকার ছিল, নইলে সাধারণ সুস্থ মানুষের মধ্যে আমার আর থাকা চলে না।

আমি একবার আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম, তখন আমার বয়েস উনিশ, আপনাদের সঙ্গে পরিচয়ের আগে, তখন যদি মৃত্যু হত, তাহলেই বোধহয় ছিল ভাল, আমার মনে হয় তাহলে দ্বিতীয় বার বেঁচে থাকা আমার পক্ষে এতটা সমস্যা হত না। আত্মহত্যার কথা শুনলেই তার কারণটা শুনতে ইচ্ছে হয়, জানি না আপনারও হয় কি না, অবশ্য সে-কারণ শুনলে আপনারা এখন হাসবেন, আপনারা আধুনিক লেখক। আমি একটি মেয়েকে ভালবাসতাম, মনে হত তাকে না পেলে আমি বাঁচব না। আমি রাত্রে জ্যোৎস্নায় বসে তাকে চিঠি লিখতাম। অনেক দিন, মনে আছে, মেয়েটি পাশে বসে আছে আর আমি তাকে চিঠি লিখছি। তার জন্মদিনে এক শিশি আতর কিনে দিয়েছিলাম। মেয়েটির সঙ্গে দেখা হত প্রত্যেক দু'বেলা, যত না কথা বলতাম, তার চেয়ে চিঠি লিখতাম বেশি, চিঠি লিখে ওর ব্লাউজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতাম, বলতাম, তোমাকে ও চিঠি পড়তে হবে না, বুকের সঙ্গে লেগে থাক, আমার চিঠির ভাষা তাহলেই তোমার হৃদয়ে পৌঁছে যাবে। আঠারো-উনিশ বছরের কোন ছেলে না বিশ্বাস করে যে বুক মানেই হৃদয়। আর হৃদয়ে পৌঁছে যাওয়া মানেই হৃদয়ে গেঁথে যাওয়া। আমি কখনও মেয়েটিকে

শরীর দিয়ে ছুঁতে চাইনি, আমি ভাবতাম, আঙুল ছোঁয়ালেই বুঝি ফুলের পরাগের মতো ওর গা থেকে রঙ উঠে আসবে। শুধু ক'দিন ওর দু'পা জড়িয়ে ধরেছিলাম, ও কী, ও কী, ও কী, বলে বালিকাটি চেঁচিয়ে উঠলেও ছাড়িনি। ওর পায়ে আমার মুখ ঘষেছি, বার বার ইচ্ছে হয়েছে, আমার চোখে যদি অনেক জল থাকত আমি চোখের জল দিয়ে ওর পা ধুয়ে দিতাম। আপনি ভয় পাবেন না বিমলেন্দুবাবু, আপনাকে মারি করেলির লেখার মতো কোনও প্রেমের কাহিনি শোনাতে বসিনি। কারণ আজ আমি মেয়েটির নামই ভুলে গেছি, রেণু, রিনা বা রানি, যে-কোনও একটা হতে পারে। চোখ বুজলে মেয়েটির মুখও মনে পড়ে না। সে ছিল আমার সমবয়সি, হঠাৎ ওর বিয়ে ঠিক হল, মেয়েটি আপত্তি করল না। ছেলেটি ওদের বাড়ি আসত, বেশ ভাল ছেলেটি, আমারও ওকে খুব ভাল লাগত, মেয়েটিকে খুব খুশি মনে হল। আমাকে শেষ চিঠিতে লিখেছিল, তুমি মন খারাপ করো না, ভাল করে পড়াশুনো করো। তুমি এখনও কত ছেলেমানুষ, আমাকে মনে রাখবে তো?

এইসব। ভেবে দেখুন, এরই জন্য আমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম। এ তো প্রতি দিন পৃথিবীতে দু'বেলা ঘটছে। আসলে সাঁতার না জেনেও আমি বন্ধুদের সঙ্গে একবার পুরীর সমুদ্রে অনেক দূর গিয়েছিলাম। আমার আত্মহত্যার চেষ্টাও অনেকটা সেই রকম। জানি না, আপনারও ছেলেবেলায় এ-রকম কোনও অভিজ্ঞতা আছে কি না। মেয়েটার বিয়ে হবার পর কিছু দিন আমার কিছু মনে হয়নি, একটু ছোট দুঃখ ছাড়া। তারপর একটা পূর্ণিমা কেটে গেল, একটা অমাবস্যা, আবার পূর্ণিমা। চাঁদের আলোয় চিঠি লেখার কথাও মনে পড়েনি। হঠাৎ এক দিন দুপুরবেলা আমার সারা শরীরে যেন আগুন জ্বলে উঠল, যেন প্রত্যেকটি লোমকূপ দিয়ে তাপ বেরুতে লাগল, আমার স্নায়ুমণ্ডলী ও শিরাগুলি দপ দপ করতে লাগল অসম্ভব অভিমানে। জীবনে সেই প্রথম ও মাত্র একবার বুঝতে পারলাম, কাকে বলে প্যাশান। ইচ্ছে হল, একটা ছুরি হাতে নিয়ে খোলা রাস্তা দিয়ে তক্ষুনি ছুটে যাই। প্রেমের ব্যর্থতা মানুষকে বড় অহঙ্কারী করে, তখন কেউ কেউ বিরাট শিল্প সৃষ্টি করতে পারে বা শিল্পকে ভাঙতে, অর্থাৎ মানুষ খুন, বা নিজেকে ভাঙে। আমি শেষেরটা বেছে নিলাম। দুপুরবেলা বাড়িতে শুধু মা আর আমি, আমার দিদি তখন হাসপাতালে। ছাদের ঘরে পা-জামাটার নিচের দিকটা কেরোসিনে ভিজিয়ে আগুন জ্বেলে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, একটা শুকনো গাছের মতো আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়ে যাব। কিন্তু সত্যিকারের অবস্থা তেমন সহজ নয়। সেই থেকেই আমি রিয়েলিটি অত্যন্ত ঘৃণা করি।

প্রথম আগুনের আঁচ গায়ে লাগতেই আমার মনে হল, না না না, অসম্ভব অসম্ভব। কিন্তু আগুন নেভানো সহজ নয়। দেশলাইয়ের কাঠির খোঁচায় আগুন যে-কেউ জ্বালতে পারে আজ, প্রমিথিউসের আত্মদানে, কিন্তু নেভানো শিখতে হয়। আমি হাতচাপা দিয়ে আগুন নেভাবার চেষ্টা করলাম, হাত ঝলসে গেল, আমি ছুটতে লাগলাম, উদভ্রান্ত, মনে হল দু'এক মিনিটের মধ্যেই আমার জীবন-মৃত্যু নির্ভর করছে। কিন্তু আমার বেছে নেবার সময় নেই, আমি ছুটে নিচে নেমে এলাম। আগুন আমাকে তাড়া করে এল, বস্তুত আগুন আমার সঙ্গেই ছিল। দোতলার বারান্দায়।

থাক, ও-সব আর লিখতে বা মনে করতে আমার ভাল লাগে না। তাছাড়া আমি লেখকও নই। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমি বেঁচে গেলাম খুবই আশ্চর্য ভাবে, সেই বেঁচে ওঠার মতো বিস্ময় আর কিছু নেই আমার কাছে। সেই বেঁচে ওঠা আমাকে চিরকালের মতো হতভম্ব করে দিল।

আকস্মিক ভাবে বেঁচে ওঠার প্রচণ্ড ধাক্কা আমাকে কিছু দিন ভাল রেখেছিল। মন দিয়েছিলাম পড়াশুনোয়। বেশ ছিলাম সাধারণ মানুষ। হাসির কথায় হাসতাম, কখনও ক্রুদ্ধ হয়েছি, কত সময় সাধারণ দুঃখ পেয়েছি। তারপর চার-পাঁচ বছর বাদে আমার প্রেত আমার কাছে ফিরে এল। এসে কৈফিয়ৎ দাবি করল। আমি বুঝতে পারলাম, এ জীবনটা আমার অতিরিক্ত, এটা ঠিক আমার নয়।

মানুষ একটাই জীবন পায়, যেমন ইচ্ছে সেটাকে খরচ করে, কিন্তু আমি পেয়েছি দুটো, একটা আমি নিজের হাতে নষ্ট করতে গিয়েছিলাম, নিশ্চিত নষ্ট হয়েছিল, ও দো-তলার বারান্দা থেকে যখন আমি লাফ দিয়েছিলাম, তখন তো নিশ্চিত মৃত্যুর দিকেই গিয়েছিলাম। আমাকে কখনও খালি গায়ে দেখেননি। দেখলে শিউরে উঠতেন। আমার দু'পা, বুক-পিঠ জুড়ে কালো কালো দাগ। ও-রকম ভাবে পুড়লে কেউ বাঁচে না। আমি কী করে বেঁচে উঠলাম কে জানে! তাছাড়া আমার মুখে আঁচ লাগেনি বলে আমাকে দেখেও কিছু বোঝা যায় না। অর্থাৎ আমি একবার মরে গেছি। পরে যেটা পেলাম, আমার বাকি জীবন, এটার ওপর আমার আর কোনও অধিকার নেই, এমনকী আমি একে নষ্টও করতে পারি না। যেন আমাকে অন্য লোকের জীবন ধার দেওয়া হয়েছে। এই জীবন নিয়ে আমি কী করে বাঁচব যদি এর ওপর নিজের মতো করে মায়া না পড়ে, যদি পরের জামা পরার মতো সর্ব সময় সাবধানে থাকতে হয়। বেঁচে থাকার মায়া পাবার জন্য আমি চারদিকে ছুটে গিয়েছিলাম। আমি রাজনীতিতে গিয়েছিলাম, ফিরে আসতে হল। রাজনৈতিক নেতাদের হওয়া উচিত কবিদের মতো, তার বদলে কবিরাই আমাদের দেশে পলিটিকস শিখছে! আমি খেলাধূলায় গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম, খেলাধূলার মধ্যে তার শরীর ছাড়া কোনও কথা নেই, ওরা অমরত্ব জানে না, ওরা জানে শুধু শারীরিক বেঁচে থাকা। আমি সাঁতার এমনকী ঘুঁযোঘুষি শিখতেও গিয়েছিলাম। আমার হল না, কেননা আমার শরীর কেটে রক্তপাত হলেও আমার ব্যথা লাগত না, মনে পড়ে যেত, এ শরীর নয়, আমার শরীরের সমস্ত ব্যথা আমি আগুন লাগিয়ে এক দিন ভোগ করেছি। গান-বাজনা করতে গিয়েও মন বসাতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত এলাম সাহিত্যে। নিজে কিছু লিখতে শুরু করার আগেই আপনাদের মতো লেখকদের মধ্যে এসে পড়লাম। ভেবেছিলাম, শেষ পর্যন্ত বোধহয় আপনাদের মধ্যে এসে আমি বেঁচে যাব, আমার নতুন জীবনের প্রতি মমতা আসবে।

কিন্তু আপনারাও আমাকে নিরাশ করলেন বিমলেন্দুবাবু, আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। আপনাদের প্রত্যেকের জীবন বিষম স্বার্থপর, জীবনের যে-কোনও সুযোগ-সুবিধে সম্পর্কেই আপনারা অত্যন্ত সজাগ, কিন্তু আপনাদের রচনা মিথ্যাভাষী। আপনাদের লেখার মধ্যে ঔদাসীন্য, নির্জনতা, এ-সব ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে আপনারা কেউ সে-রকম নন। আপনারা কে কতক্ষণ একা থাকেন, জানি না, সব সময় দেখি হই-হুল্লোড়, বান্ধবসভা আপনারা প্রত্যেকে নিজের নিজের ব্যক্তিগত উপলব্ধির কখন সময় পান? নাকি সেই জন্যই সব অনুভবের কথা বানানো?

মৃত্যু, ধ্বংস, নীতিহীনতা — এই হয়ে উঠেছে আপনাদের বিষয়। তাপসবাবুকে দেখেছি, কপালে একটা ব্রন উঠলে কত ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, সাতবার ডাক্তারের কাছে ছুটে যান অথচ তাঁর উপন্যাসের নায়করা উদাসীন, ক্যানসার বা সিফিলিসের রোগী। আপনিও বিমলবাবু, আপনার কবিতায় মেয়ে-পুরুষরা অত আত্মহত্যা করে কেন? অথচ আপনি জীবনে হয়তো সামান্য আত্মত্যাগও করেননি কখনও। আমি মৃত্যুর শেষ পর্যন্ত ঘুরে এসেছি, আমি জানি মৃত্যু কী-রকম, তাই আমি জীবন্ত মানুষ দেখতে চাই। আপনি মৃত্যু সম্বন্ধে কিছুই না জেনে মানুষকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছেন। কবিতা হল এক ধরনের প্রার্থনা, আপনার কবিতায় কীসের প্রার্থনা? মৃত্যুর মধ্যে কোনও বৈচিত্র্য নেই, অনেকটা একঘেয়ে।

মৃত্যু, তিন রকম, ভেবে দেখতে গেলে। আত্মহত্যা, দুর্ঘটনা বা আততায়ী, অথবা বিছানায় শুয়ে নানা জনের চোখের জল, দীর্ঘশ্বাসের নিচে। যাবার সময় কেউ কেউ বলে, 'মা চললাম।' এমন নিশ্চিন্ত সেই বলা যে, শেষতম যাত্রার আগে যেন সে কিছুই নিতে ভুলে যায়নি, চন্দনের টিপ পর্যন্ত না। আবার কেউ কেউ বাকরুদ্ধ চোখে প্রবল ভাবে চেয়ে থাকে, চোখ দিয়ে দু'হাত বাড়াতে চায়, যেন

তার শেষ অস্তিত্ব চিৎকাব করে, 'যেতে দিও না, আমাকে বাঁচাও, — আমি এই মাটির ঘরে বা রাজপ্রাসাদে, করমচার ঝোপের পাশে, জ্যোৎস্নায় আরও কিছুদিন থেকে যেতে চাই, যেতে দিও না, কোথায় যাব জানি না, এখানে চেনা জিনিসগুলো কিছুই চেনা হয়নি, যেতে দিও না। এই। কিন্তু জীবন বহু রকম, অসংখ্য, অসংখ্য, আপনি কখনও বলতে পারবেন না, মানুষ এইভাবে বাঁচে। কেননা, প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিগত বেঁচে থাকা সম্পূর্ণ রকম তার নিজের। মাস্তুলের মাথায় বালক ঘুমোয়, সম্রাট অনিদ্রারোগী, খনির নিচে মাটি চাপা পড়ার তেরো দিন পর বেঁচে ফিরে এল মানুষ, প্রবল পিতৃশোকের মধ্যেও সিগারেট না পেলে মন চঞ্চল হয় কারুর, জানি না মহাশূন্যের রকেটে মানুষগুলো সত্যিই কী ভাবে। আমি এসেছিলাম বাঁচতে বিমলেন্দুবাবু, আপনাদের কাছে জীবনের একটা নতুন মুখচ্ছবি পেতে, দেখলাম, আপনারাও ভ্রষ্ট এবং জীর্ণ, পোকায় ধরা মৃত্যুবিলাসী। পরীক্ষিৎ লোভী, তাপস নিজেকে ঠকায়, অবিনাশ নিজেকে চেনে না, আপনিও মিথ্যে আত্মবিশ্বাসী।

ক্রমে আমার বুকের ভিতরের মৃত্যু আবার জেগে উঠল। এইভাবে মায়া-মমতাহীন ভাবে, পরের জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার মতো কেউ বাঁচতে পারে? আমি আমার শরীরে মড়ার গন্ধ পেতে লাগলাম। লোকজনের মধ্যে বসতে আমার ভয়, আমি সবার আড়ালে নিজের হাতটা তুলে নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকি। কেউ টের পায় না, কিন্তু আমি গন্ধ পাই, পচা গন্ধ, বুঝতে পারি আমার শরীর পচে যাচ্ছে। একটা আত্মাহীন, মায়াহীন, ভালবাসাহীন শরীর কখনও বেঁচে থাকতে পারে না।

কয়েক দিন আগে একটু জিনিস লক্ষ্য করে আমি শিউরে উঠলুম, সম্প্রতি আমার শরীরে কয়েকটা নতুন তিল উঠেছিল, ঠিক কালো নয়, লালচে বাদামি রঙের। জায়গাগুলো একটু একটু উসখুস করত। একটা তিল খুঁটতে গিয়ে একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করলাম। তিলটা জীবন্ত। বুঝতে পারলেন, তিলটা জীবন্ত? একটু খুঁটতেই সরে গেল। অবাক হয়ে আর একবার আঙুল ছোঁয়াতে সেটা আর একটু সরে গেল। লক্ষ্য করলাম, ওটা তিল নয়, একটা পোকা, আমার শরীর থেকে জন্মেছে, ক্ষুদে অক্টোপাসের মতো, প্রবলভাবে চামড়া আঁকড়ে আছে — সবগুলো তিলই এই। আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম। বুঝতে পারলাম, আর নয়। আমার শাস্তি শেষ হয়েছে। জানি, আপনি কী বলবেন বা ডাক্তার কী বলতে পারে এ ব্যাপারটা শুনে, ও কিছু নয়, এক ধরনের চর্মরোগ, কোনও একটা পাউডার লাগালেই সেরে যাবে। জানি সেরে যায়, অন্য লোকের সারে, কিন্তু আমার নয়। আমার এগুলো, পচা মাংসে যে-পোকা পড়ে — তাই। আর এখানে নয়, আমি বুঝতে পারলাম। আমি বাঁচতে এসেছিলাম, আপনারা আমাকে দূরে ঠেলে দিলেন। জানি না আমার কোথায় স্থান হবে।

আপনাদের হেমকান্তি

মায়া,

তোমাকে চিঠি লিখতে গিয়ে আমার হাত কাঁপছে, জানি না এ চিঠি তোমাকে কোনও রকম আঘাত দেবে কি না, কারণ আমি এটুকু অন্তত জানি নিশ্চিত যে, আমি নিজেকে কিছুতেই সম্পূর্ণ বোঝাতে পারব না। তোমাকে কোনও আঘাত দিতে চাই না। মায়া, আমি তোমাকে ভালবাসতে চাই অন্য কোনও কথা মাথায় এসে জটিল হবার আগেই তোমাকে এ-কথা জানালাম।

তোমাদের বাড়িতে যাবার তৃতীয় দিনে তুমি আমার সামনে এসে বলেছিলে, আপনার ওটা কীসের বোতাম, চন্দনের? বলে তুমি আমার বুকে হাত দিয়ে বোতাম দেখছিলে। সে প্রায় এক বছর আগে, তখনও তুমি অনেকটা শিশু ছিলে, এমন পূর্ণ যুবতী হওনি, তাই ওই অকপট হাত রেখেছিলে আমার বুকে, আমার বুকের মধ্যে যে হৃৎস্পন্দনের কোনও শব্দ নেই, তা-ও তুমি টের পাওনি। আমি মাথা

নিচু করে নিঃশব্দে ছিলাম। তুমি বললে, আপনি বাইরে কার ওপর রাগ করে এসে এখানে গম্ভীর? একটু পরে তুমি দিদিকে বলেছিলে, ওই ফর্সা লোকটা খুব অহংকারী। আসলে আমি মাথা নিচু করে তোমার পায়ের দিকে দেখছিলাম, কী সুন্দর ঝকঝকে দু'টি পা, যেন তুমি আমার স্মৃতির ওপর পা দিয়ে দাঁড়িয়েছিলে, রঙ লাগাওনি অথচ প্রত্যেকটি নখে লাল আভা, গোড়ালি একটুও ফাটা নয়, একছিটে ময়লা নেই কোথাও। কত দিন পর আমার বুকে একটি মেয়ের হাত, এ-কথাও মনে পড়েনি। তখন কোনও কথার উত্তর দেবার আমার সময় ছিল না। সেই পায়ের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়েছিল, এই মেয়েটিকে যদি আমি ভালবাসতে পারি, তবে হয়তো আমি বেঁচে উঠতে পারি আর একবার। কিন্তু তবু যে কেন আমি শেষ পর্যন্ত মাথা নিচু করে রইলাম জানি না। ভালবাসার অনিচ্ছা, না বেঁচে থাকার অনিচ্ছা, কী জানি।

এক দিন হঠাৎ তোমাদের ঘরে ঢুকে দেখেছিলাম, অবিনাশ তোমার হাত ধরে টানছেন, আর তুমি বলছ, ছাড়ুন, ছাড়ুন! আমাকে দেখেই অবিনাশবাবু হাত ছেড়ে দিয়ে যেন কী একটা হাসির কথা বললেন। তোমরা দু'জনে হো-হো করে হেসে উঠলে। এমন হতে পারে, তোমার হাতের মুঠোয় কোনও জিনিস লুকোনো ছিল, অবিনাশবাবু কেড়ে নেবার চেষ্টা করছিলেন, বা হাত ধরে তোমাকে টেনে নিতে চাইছিলেন ওর বুকে। আমাকে দেখে থেমে গেলেন এবং একটু বিব্রত বা দুঃখিত না হয়ে পরবর্তী হাসির কথাগুলি বলেছিলেন। আসলে দুঃখিত হয়েছিলাম আমি, মৃত্যুর চেয়ে বড় দুঃখ। আমার খুব ভাল লেগেছিল, ওই রকম প্রবল ভাবে টানাটানি ও হাস্য। আমাকে দেখে থেমে যেতেই আমি বিমূঢ় ও লজ্জিত হয়েছিলাম, ফিরে যাবার জন্য এক-পা তুলেও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, আবার শুরু হোক, না হয় আমিই তোমার হাত ধরে টানি, প্রবল ভাবে বুকের ওপর নিয়ে আসি, তোমার হালকা শরীরটা শূন্যে তুলে লুফে নিই, তোমার ঠোঁট থেকে হাসি চলে আসুক আমার ঠোঁটে, কিংবা অবিনাশের, হাওয়ার হুড়োহুড়ির মধ্যে আমরা তিন জন — অনেকক্ষণ বাদে লক্ষ করলাম, আমি আমার হাত দুটো পকেট থেকেই বার করিনি, ঘরের মাঝখানে বিকট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছি চুপ করে। ইচ্ছে হল, তখুনি ছুটে পালিয়ে যাই, তার বদলে তোমার দিদির হাত ধরে সরবতের গ্লাস নিলাম।

আর এক দিনের কথা মনে পড়ে,দোলের দিন। দল বেঁধে সবাই তোমাদের বাড়ি গিয়েছিল, গগনবাবু আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে-দিনও অবিনাশবাবুকে দেখে চমৎকৃত হয়েছিলাম। সবাই ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি করছে, রঙের স্রোত আর আবিরের ধুলো চারদিকে, কিন্তু আমি যোগ দিতে পারিনি, এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিলাম অস্পৃশ্যের মতো। সবাই সে-দিন আমাকে গঞ্জনা দিয়েছিল, আমাকে জোর করে ফেলে দিয়েছিল মাটিতে। তবু পারিনি, তবু পারিনি ওদের মতো খোলা হতে, লাল রঙকে ব্যবহার করতে। এক ফোঁটা আবির বুঝি দিয়েছিলাম সকলকে, সেই প্রথম আমি তোমার কপাল ছুঁয়েছিলাম। কত ব্যর্থ সেই ছোঁয়া। অবিনাশবাবু তোমার সারা মুখ ভরিয়ে অবলীলায় তোমার ব্লাউজের মধ্য দিয়ে পিঠে হাত ঢুকিয়ে দিলেন, সকলের সামনে তোমার জামার মধ্যে পিঠে অবিনাশের হাত ঘুরতে লাগল, কোনও দ্বিধা নেই। আড়ষ্টতা নেই। আ, আমার এত আনন্দ হয়েছিল। মানুষকে বেপরোয়া, স্বাধীন, গ্লানিমুক্ত দেখলে আমি তার আত্মা থেকে ফুলের মতো গোপন সৌরভ পাই। আমারও ও-রকম হতে ইচ্ছে হয়, মনে মনে বলি, ঈশ্বর, ঈশ্বর, আমাকে আর একবার বাঁচার সুযোগ দাও, আমাকে ও-রকম স্বাভাবিক, জীবন্ত করো। হয় না, আমি পারি না। কেন পারি না মায়া, তা তোমাকে আর এখন বলা যাবে না।

কিছু দিন আগে তোমাদের বাড়িতে সিনেমার টিকিট নিয়ে একটা লটারি হয়েছিল তোমার সঙ্গে কে যাবে তাই নিয়ে। আমার সে-দিন খুব মাথা ধরেছিল, খুব মন খারাপও লাগছিল, হঠাৎ আমার ইচ্ছে হল আমি যাই তোমার সঙ্গে। তাহলে আমার সব রোগ সেরে যাবে, আমি অন্ধকারে তোমার পাশে বসে তোমার যোগ্য হয়ে উঠব। কে যেন একবার আমার নামও বলল, আমি ব্যগ্রভাবে মুখ তুলে তাকালাম, নিঃশব্দে যেতে চাই, যেতে চাই বললাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সবাই চলে গেল অন্য নামে, আমার প্রার্থীপদ বাতিল হয়ে গেল। যেন আমি উপস্থিত নেই, শুধু একটা নাম মাত্র, এক জন উত্থাপন করল, অপরে বাতিল করে দিল। মায়া, সে-দিন রাত্রেই আমার মা মারা গিয়েছিলেন। আজও আমি জানি না, তোমার সঙ্গে সিনেমা দেখে, তোমাকে আমার সব কথা বলার পর বাড়ি ফিরে যদি দেখতাম মা মারা গেছেন, তাহলে সেইটাই ভাল হত কিনা। তোমার সঙ্গে যেতে না পারার দুঃখ, মায়ের মৃত্যুর আঘাতও অনেকটা ম্লান করে দিয়েছিল সে-দিন রাতের জন্য। আমার মধ্যে শোক বা অনুতাপও জেগে উঠতে পারল না।

তোমাকে আজ এ চিঠি লিখছি, কারণ আজ আমি এ শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আর কোনও দিন ফিরব না, এই জেনে। আমার পক্ষে আব স্বাভাবিক মানুষ হওয়া সম্ভব নয়, যেন বুঝতে পারছি। এত দিনেও যখন পাবলাম না। কোথাও দাঁড়াতে পাবলাম না, কোথাও দাগ রইল না, ভালবাসাব কথা জানাতে পারিনি, এক লাইন কবিতা লেখা হল না, কিছুই হল না। একটি ব্যর্থতা তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তোমাকে ভালবাসতে চেয়েছিলাম এ-কথা তোমাকে আজ জানাবার মধ্যে কোনও আকাঙক্ষা লুকিয়ে নেই। আমার জানাবার উদ্দেশ্য, তোমাকে আমি ভালবাসতে পারিনি। বড় অদ্ভুত এই ব্যর্থতা। আমাকে কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি ভালবাসতে। আমারই নিজের প্রবল ইচ্ছে হয়েছিল, তোমাকে ভালবাসার। ভালবাসার ইচ্ছে জেগেছিল শুধু, ভালবাসা জাগেনি। মনে মনে হাজার কথা বলেছি তোমাকে লক্ষ্য কবে, এমনকী ভেবেছি, তোমাকে মুখে বলার সুযোগ না পেলেও একটা চিঠি লেখা অনায়াসেই চলত, আজ যেমন লিখছি। তুমি যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে, সেই হত আমার পরম প্রাপ্তি, সেই আঘাত যদি আমাকে কোনও উত্তেজনা দিত! কিন্তু আমি মিথ্যে কথা লিখতে পারি না, 'তোমাকে আমি ভালবাসি' এ-কথা লেখা অসম্ভব আমার পক্ষে, আসলে, তোমাকে আমি ভালবাসতে চেয়েছি — এইটাই সত্যি এবং তার চেয়েও মর্মান্তিক সত্যি, তোমাকে আমি ভালবাসতে পারিনি। এ-কথা কি কাউকে জানানো যা? কিন্তু আজ লিখতে হল, কারণ আজ চলে যাচ্ছি আমি, জীবনে আব হয়তো দেখা হবে না, কারুকে কারুকে কোনও কোনও কথা অপমান করে, তবে আমার ওপর ক্রুদ্ধ হওয়াই উচিত তোমার। তুমি আমাকে মনে বেখো বা সামান্য ভালবাসো — এ দাবি আমার নেই। তবু তোমার কাছ থেকে কিছু একটা সামান্য পেতে খুব ইচ্ছে করছে। অন্তত বাগ বা ঘৃণা।

দিদিকে আমার নমস্কাব জানিও।

হেমকান্তি রায়চৌধুরী

পরীক্ষিৎ

সাত মাইল রাস্তা হেঁটে এলাম এই রাত্রে। লাস্ট বাস চলে গিয়েছিল, পকেটে পয়সা ছিল না। ফিরে এসেই লিখতে ইচ্ছে হল। একটা কথাও হারাতে ইচ্ছে করে না। এতক্ষণ যা যা মনে পড়ল, সবই টুকে রাখতে চাই। নইলে হারিয়ে যাবে। অতিকষ্টে শেখরকে কাটানো গেছে। গড়িয়াহাটার মোড়ের আগে আর কিছুতে যেতে চায় না। সাহিত্য আন্দোলন, কবিতার ফর্ম এইসব নিয়ে বক বক শুরু করেছে, রাতদুপুর...অশ্লীল...ফলানো। তারপর বলে যে আমার বাড়িতে আসবে। আমি গেলাম

ওর বাড়িতে থাকতে, তার বদলে ও চায় আমার বাড়ি। এক দিন ওর বাড়ি আমি থেকেছি, এক দিন আমার বাড়িতে ও থাকবেই। এ কি কম্যুনিজম নাকি? আমি ওর বাড়ি থাকব বেশ করব। আমি ওর বাড়িতে থাকি, ধন্য হয়ে যায়, পরে জীবনীতে লিখবে কিন্তু —। আমার বাড়িতে জায়গা নেই।

আজ ভবকেষ্ট মিত্তিরের কাগজের অফিসে গিয়েছিলাম, শুনলাম আমার নাটকটা এ-মাস থেকে ধরবে না, আগে শেখরের উপন্যাস। শুনে গা জ্বলে গেল। শেখরের কি টাকার অভাব? ওর কী দরকার উপন্যাস লেখার — তাছাড়া যখন শুনেছে আমি ওখানে লেখা দেব। একশোটা টাকা পেলে আমার কত কাজে লাগত। ভবকেষ্টর চ্যালা রামকেষ্ট আবার বলে, আপনি বিমলেন্দুবাবুর উপন্যাস একটা জোগাড় করে দিতে পারেন? যেন বিমলেন্দু একটা বিরাট কেষ্ট-বিষ্টু। ট্র্যাস লেখে! রাগে আমার মুখে থুতু এসে গিয়েছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল থুতু লোকটার মুখে মাখিয়ে দিই। তার বদলে হাসি এনে বললাম, ঠিক আছে, আমি এনে দেব, আপনাদের আর যেতে হবে না ওর কাছে। বিমলেন্দুকে এক দিন কথায় কথায় বলে দিলেই হবে যে, ভবকেষ্ট তোর খুব নিন্দে করছিল, তোর 'কাছের মেঘ' গল্পটা কাফ্‌কা থেকে টোকা। হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চারা ফোকটে নাম কিনছে। শিল্পের জন্য সর্বস্ব পর করলাম আমি, আর ওরা মজা লুটল। আমি দিন-রাত মানিনি, ভয়-ভাবনা মায়া-মমতা মানিনি, জীবনটাকে ছুঁড়ে দিয়েছি শূন্যে। আর ছাপার অযোগ্যরা রাত্রে বাড়ি ফেরা ঠিক রেখে, পরের দিনের গাড়িভাড়া বাঁচিয়ে, মা-বোনের কাছে মান ঠিক রেখে, থানা-পুলিশ সামলে শিল্পী সেজেছে। শালারা আমার সঙ্গে ঘুরে —।

নাঃ, বড় বেশি রাগ এসে যাচ্ছে। আজ নেশাটা পুরো হয়নি, আর হাফ নেশা হলেই শরীরে বিষম রাগ এসে যায়, ইচ্ছে হয় সব অশ্লীলকে ডুবিয়ে ছাড়ি। ওদের নিয়ম, সাবধানের বারোটা বাজাই। সে-দিন অবিনাশ হঠাৎ ছুটে রাস্তা পার হতে গেল। দু'দিক থেকে দুটো গাড়ি, প্রচণ্ড ব্রেক কষার শব্দ। আমি মনে মনে চোখ বুজে খুশি হলাম। নিশ্চয়ই ওটা গেছে। ঈশ্বর, তুমি ধন্যবাদার্হ, ওর একটা কিছু শাস্তি পাওনা ছিল, প্রাণে যেন না মরে, হাত-পা খোঁড়া হয়ে যাক। ভিড় ঠেলে গেলাম, হা হরি, একটা নিরীহ কুকুর চাপা পড়েছে, অবিনাশ অক্ষত। কুকুরটার জন্য এমন আন্তরিক দুঃখ হল আমার যে, অবিনাশকে চাপা দিতে পারেনি বলে গাড়ির ড্রাইভারের নাকে ঘুষি মারলাম। বেঁচে থাকার আশ্চর্য ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে ওটা। তবে ওকে আমি শিক্ষা দিয়ে দেব। বুঝিয়ে দেব শিল্পের সঙ্গে শত্রুতা কী সাংঘাতিক জিনিস। অনিমেষের সঙ্গেও। সুযোগ পাচ্ছি না।

সে-দিন হাসপাতালে গিয়েছিলাম। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে তাপস, শেখর, অম্লান, বিশ্বদেব, অনিমেষ, ছায়া, মায়া, কায়া সব। অবিনাশের চোখ জ্বল জ্বল করছিল। পেচ্ছাপখানার পাশে এসে ওকে বললাম, কী রে, কার মুখ দেখতে এসেছিস? জবাব দিল না। এক পাটি দাঁতের ওপর আর এক পাটি দাঁত ঘষে গেল, চোয়াল নড়া দেখে বুঝলাম। আবার বললাম, অমন ছটফট করছিস কেন? উত্তর নেই। কাঁধে হাত দিয়ে বললাম, অবিনাশ —। অত্যন্ত বিনীত গলায় বলল, পরীক্ষিৎ, তুই এখন অন্য কারুর সঙ্গে কথা বল। কোনও কারণে রাগ হলে আমি চুপ করে থাকতে চাই। আমি চেয়েছিলাম ওকে রাগিয়ে দিতে। রেগে গেলেই ও দু'একটা বোকামি করে, নইলে এমনিতে ভয়ানক সাহেনশা ছেলে। মুখখানা টক টক করছে অনিমেষের। অনিমেষ এক পাশে দাঁড়িয়ে নখ খুঁটছিল, নার্স এসে বলল, কংগ্রাচুলেশন। আপনার ছেলে হয়েছে।

ছেলে। অনিমেষের চেয়ে বেশি চেঁচিয়ে উঠল শেখর আর ছায়া। যেন বাপের জন্মে কোনও ছেলে হওয়ার কথা শোনেনি। অনিমেষ সামনে এসে বলল, ওরা ভাল আছে তো? দু'জনেই —।

দু'জন না, তিন জন! নার্সটা মুচকি হাসল। বেশ গোলগাল চেহারা, লেবুর মতো দুটো গাল, তবু মনে হল পেছনে প্যাড বেঁধেছে। নইলে অতটা উঁচু আর শেপলি। ইচ্ছে হল, একটা টোকা মেরে —।

তিন জন? তার মানে?

হ্যাঁ, তিন জন। সারা মুখে নীলকালি মাখার মতো হাসল নার্স। এবার লক্ষ্য করলাম, ওর বেশ গোঁফ আছে। একটু না, বেশ নীলের চেকনাই। পা দুটো যখন অত সাদা, তখন নিশ্চয়ই পায়ের লোম কামায়, সেই সময় কি গোঁফও চেঁছে নেয় নাকি মাঝে মাঝে? অধিকাংশ মহিলা সাহিত্যিকই গোঁফ কামায় শুনেছি। নিজে যাচাই করে দেখিনি অবশ্য।

তিন জন কে? অনিমেষ কেবিনের দিকে যেতে গেল। নার্স মিষ্টি হেসে বলল, ঠিক যেন কোনও অশ্লীল কথা শেখাচ্ছে, আপনার যমজ হয়েছে। খুব ভাল ওয়েট, সাড়ে পাঁচ পাউন্ড করে, সবাই ভাল আছে। আসুন আমার সঙ্গে, বেশি কথা বলবেন না। আমাদের সব্বাইকে মিষ্টি খাওয়াতে হবে কিন্তু।

যমজ? শুনে আমরা সবাই সশব্দে বিস্মিত হয়ে গেলাম। সত্যিকারের যমজ? বহু দিন বাদে একটা খাঁটি আশ্চর্য ঘটনা শুনলাম। আমাদের চেনাশুনো কারুর কখনও যমজ সন্তান হয়েছে শুনিনি। স্কুলে আমাদের ক্লাসে প্রশান্ত আর সুশান্ত নামে দুই ভাই পড়ত। অনিমেষ একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছে। মুখখানা ফ্যাকাশে। নার্সের হাতটা খপ করে চেপে ধরে বলল, আপনি ঠিক বলছেন, আমারই? কেবিন নাম্বার থ্রি? কখন?

নার্সটি যেন ভারি মজা পেয়েছে। কচি খুকির মতো চোখ ঘুরিয়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ আপনারই, আপনার স্ত্রী নাম গায়ত্রী তো? আপনাদের আগে বলা হয়নি, প্রথম বেবি হবার ঠিক এগারো মিনিট পরেই আরেকটি। কী ভাগ্য আপনার! দু'টিই ছেলে, মেয়ে নয়।

অনিমেষ তখনও নার্সের হাত ধরে আছে, জিজ্ঞেস করল, দু'জনেই —।

হ্যাঁ, বলছি তো দু'টিই ছেলে।

না, তা নয়, দু'জনেই —।

হ্যাঁ হ্যাঁ, দু'জনেই বেঁচে আছে। খুব নর্মাল ডেলিভারি।

অবিনাশ জিজ্ঞেস করল, আর ছেলে দু'টির মা কেমন আছে? গায়ত্রী?

খুব ভাল। জ্ঞানও ফিরে এসেছে। গিয়ে দেখুন না, হাসছে! অবিনাশ অনিমেষের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, কংগ্রাচুলসোন! করিডর দিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে বলল, তোমরা খবর শুনেছ? যমজ হয়েছে।

শিশুর মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না, দুটো রক্ত-মাংসের পুতুল। ওদের চোখ, নাক, কান ও লিঙ্গ আছে, হাসি ও কান্না আছে, পেশির শক্তিতে হাত ও পা ছুঁড়তে পারে। দুঃখ আছে, অর্থাৎ খিদে পেলে বা পিঁপড়েয় কামড়ালে কাঁদতে জানে। সুখবোধও আছে, অর্থাৎ মায়ের বুক পাওয়া। শুধু নেই স্বাতন্ত্র্য। ওরা আলাদা নয়। দুটোকেই আমার এ-রকম মনে হয়েছিল, হয়তো যমজ বলে ওরা এক রকম দেখতেই হবে। কিন্তু ওরা অন্য শিশুর চেয়েও আলাদা নয়, বস্তুত দুনিয়ার সমস্ত সদ্যোজাত বাচ্চাই আমার কাছে এক। ওরা একই রকম ভাবে চেয়ে থাকে। চৈতন্যের কোন প্রদেশ থেকে আসে ওরা, কী সরল ও দুরভেদ্য চেয়ে থাকা। কোথাকার এক বেঁচে থাকার প্রবল দাবি নিয়ে এসেছে, দু'জনের বুকের ওপর আড়াআড়ি রাখা গায়ত্রীর হাত, দুটো মায়ার পিণ্ড। ওঃ, বিপুল প্রতীক্ষা ও ধৈর্য নিয়ে আসতে হয় পৃথিবীতে। কত কী শিখতে হবে — হাঁটা চলা, শব্দব্রহ্ম থেকে বাক্যবন্ধ, খাবার চুরি, স্বর ও ব্যঞ্জন, পোশাক পরা, আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে এই অভিমানী জ্ঞান, ঘুড়ি বা লাট্টু, ছোঁক

ছোঁক, ফ্রক ও হাফপ্যান্টের নিচের রহস্য, নিজেকে লুকোবার জন্য শূন্যতাবোধ, রক্তের ডাক ও কর্মবন্ধন, তারপর আরেক জনকে নিয়ে বিছানায় শুয়ে এই রকম আর একটা মাংসের পুতুল তৈরি করা। পরা-বিদ্যা বুঝি বলে একেই। অথবা চক্র দিয়ে আরম্ভ কী যেন একটা সংস্কৃত শ্লোক, পরে দেখে নেব। অথবা সূক্ষ্মতা বুঝি এই। নাঃ, জীবচক্র জিনিসটা আমার পছন্দ হয় না। আমার পৃথিবীতে আমি কোনও উত্তরাধিকারী রেখে যাব না।

আমি নবজাতকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে গায়ত্রীর ক্লান্ত খুশি ছুঁয়ে অনিমেষকে দেখলাম। যেন ওর ঈশ্বরদর্শন হয়েছে, এমন মুখ। খুব ইচ্ছে হল ওকে একটা ধাক্কা দিই। ওকে বলি, অনিমেষ —। মানুষের অতটা খুশি আমার সহ্য হয় না। না হয় যমজ ছেলেই হয়েছে। এমন কী দৃশ্য আছে পৃথিবীতে যা মানুষকে সত্যিকারের খুশি করতে পারবে? চোখ না বুজলে মুখ জাগে না। আমি বলতে চাইছিলাম, অনিমেষ, চোখ বুজে নিজের মুখ দ্যাখ। ওই সন্তান তোর কেউ নয়।

বন্ধুবান্ধব-ফান্ধব আমার মোটেই ভাল লাগে না। অর্থাৎ আমার কোনও বন্ধু নেই। যে আমাকে খাওয়াবে সে আমার বন্ধু। যে আমাকে রাত্রে থাকতে দেবে সে আমার বন্ধু। কোনও কাগজের জন্য যদি কেউ লেখা চেয়ে টাকা দেয়, বা যখন তখন সিগারেট পাওয়া যাবে বা ট্রামে-বাসে ভাড়া দেবে তাহলে বন্ধু বলা যায়। আর কিছু আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। এক-একটা আছে, ভিখিরির মতো বসে থাকে আর সাহিত্য-ফাহিত্য নিয়ে কথা বলতে চায়। আমিও তো ভিখিরি। ভিখির সঙ্গে ভিখিরির বন্ধুত্ব করে কী লাভ! মোটেই পছন্দ করি না। অনেকে আমার বন্ধুত্ব করে ধার শোধ চায়, যেমন আজ শেখর। কিন্তু সব চেয়ে বড় বদমাশ অবিনাশ, কারণ ও আর আমার বন্ধুত্ব চায় না। ওর কথা ভাবলেই গা জ্বলে যায়।

অতক্ষণ অন্ধকার দিয়ে হেঁটে এলাম, ওঃ কী অন্ধকার, হেঁটে এলাম না সাঁতরে এলাম। শরীর ডুবে গেল, গা-হাত-পা দেখা যায় না। চোখে-নাকে-অন্ধকার ঢুকে যাচ্ছিল, খানিকটা অন্ধকার হড়াৎ করে খেয়ে ফেললাম ভুলে। কিছুক্ষণ পরে দাঁড়িয়ে এক জায়গায় বমি করার মতো অন্ধকার বার করে দিলাম পেট থেকে, নাক ঝেড়ে সিকনির মতো অন্ধকার পরিষ্কার করলাম। তা-ও শালারা যেতে চায় না। খানিকটা বাদে রাস্তা ভুল হয়ে গেল। কাদার মতো থকথকে অন্ধকার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঘেন্নায় শরীর গুলোচ্ছিল।

এক দিন কল্যাণের সঙ্গে এমন ঘোর অমাবস্যায় হেঁটেছিলাম, বহরমপুরে। কল্যাণ একটা চুরুট খাচ্ছিল। মাঝে মাঝে সেই চুরুটের ম্লান লাল আলো। সে-দিন আর কী হয়েছিল মনে নেই, শুধু মনে পড়ে আমাদের বহুক্ষণ পাশাপাশি অন্ধকারে হাঁটা। ও, সে-দিন আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। আহা, এত দিন মনে পড়েনি কেন? আমরা দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার পাড়ে চলে এলাম গির্জার পাশ দিয়ে। আমরা দু'জনে কোনও কথা বলিনি, এমন ভাবে হাঁটছিলাম যেন বহুক্ষণ আরও ওই রকম ভাবে হাঁটতে থাকব। কিছুক্ষণ আগে কল্যাণ গান গাইছিল চেঁচিয়ে, জোরালো ও সুরেলা গলা ওর অমন সিড়িঙ্গে চেহারায়। গান অসম্ভব ভাল লাগছিল, সেই সঙ্গে বিরক্ত হয়েছিলামও। কারণ, ও গান গাইছিল আপন মনে, আমাকে গানের সঙ্গী করেনি। তারপর হঠাৎ চুপ করে উৎকট ভাবে গম্ভীর হয়ে গেল। নদীর পাড়ে এসেও আমরা হাঁটা থামাইনি। মনে হল আমরা নদীর ওপর দিয়েও হেঁটে যাব। ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে জলের কাছে এলাম, আমার দেখতে ইচ্ছে হল কল্যাণ কী করে। ও আস্তে আস্তে জলে নেমে যাচ্ছে, আমি দেখতে লাগলাম, প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলল, যখন বুক জলে, তখন ফিস ফিস করে আমি ডাকলাম, কল্যাণ! কল্যাণ পিছন ফিরে তাকিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল, এসেও কোনও কথা বলল না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ বলল, শ্যামা কথাটার মানে কী রে? কালো? তন্বী শ্যামা শিখরীদশনা...কালিদাসের নায়িকা কি কালো ছিল?

আমি বললাম, না। শ্যামা মানে যে-স্ত্রীলোকের শরীর শীতকালে গরম এবং গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা থাকে। হঠাৎ —।

কিছু না, ও বলল। আবার খানিকক্ষণ চুপ। পরে বলল, ও-পারে একটা লোক দেখতে পাচ্ছিস?

না।

ওই যে দ্যাখ, লাল আলোর একটা ছিটে। হ্যারিকেন হাতে মাঠের মধ্য দিয়ে লোকটা হাঁটছে। আমার কী মনে হল জানিস, আমিই এই নদীটা পেরিয়ে গিয়ে ও-পারে মাঠে হাঁটছি। তোকে বললাম, একটু দাঁড়া। কী-রকম যেন স্বপ্নের মতো এক মুহূর্তে দেখতে পেলাম।

ও-পারে তো কবরখানা, তোর ওখানে রাতে যেতে ইচ্ছে করছে?

না। শুধু নদীর ও-পারে যে-কোনও জায়গায়।

হঠাৎ আমার মনে হল, কল্যাণ কি রাতদুপুরে আমাকে একা পেয়ে কবিত্বে টেক্কা দিচ্ছে? ওর কথায় খানিকটা যেন সত্যিই গভীরতর সুর। বললাম, কী করে পার হবি? আমার তো মনে হচ্ছে এটা অন্ধকার, কাদায় থিক থিক নরকের নদীর মতো বিশ্রী।

কল্যাণ আমরা দিকে গূঢ় সন্দেহের চোখে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, যাঃ, এ তো গঙ্গা। পুণ্যসলিলা।

কিন্তু যাই হোক, তোর কি মনে হয় না এটা একটা অদ্ভুত জীবন্ত জিনিস যা কোনও দিন পার হওয়া যাবে না? (কল্যাণ কোনও দিন পারবে এ-রকম কথা বলতে?)

আমি ঠিক পার হতে চাই না। আমি ডুবে থাকতে চাই।

কীসে ডুবে থাকতে? নদীতে?

হ্যাঁ, সব নদীতে নয়, এখন, এইমাত্র মনে হচ্ছে। আমার ইচ্ছে হচ্ছে ডুবে মরি। মরব? তুই সাক্ষী থাকবি?

থাকব। তার আগে তোর নীল স্যুটটা আমাকে দিয়ে যা। তোব ওটা আমার খুব পছন্দ মাইরি।

তুই জানিস না, পরীক্ষিৎ — কল্যাণ কোট খুলতে খুলতে বলল, শরীরে বড় মৃত্যুভয় ঢুকেছে আমার। মনে হচ্ছে বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। খুবই লজ্জা লাগে। কিছুই হল না, জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা লেখা লেখা খেলা করে কাটালাম। যখন চুল পাকবে, দাঁত থাকবে না, চোখের ছানি কাটাতে হবে, তখন হয়তো লেখার জন্য কিছু টাকাকড়ি পাব, খবরের কাগজের লোকেরা যাকে বলে সম্মান দক্ষিণা। তোর লজ্জা করে না? এই কি জীবন নাকি? এর চেয়ে নিজের হাতে — তুই দাঁড়া, পরীক্ষিৎ আমি যাই।

কোথায়?

জলে। নদীর বিছানায় ঘুমোই। কোনও ক্ষোভ থাকবে না।

আমিও তাই ভেবেছিলাম। সেই জন্যই তো আমিও গিয়েছিলাম আত্মহত্যা করতে।

কবে? তুই আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলি? তোর মতো —।

কেন, জব্বলপুরে? ব্রিজ থেকে নদীতে লাফিয়ে পড়েছিলাম, তোর মনে নেই?

তুই লাফিয়েছিলি? তুই তো হঠাৎ পড়ে গেলি।

নাঃ। এক মুহূর্তে আমার মৃত্যু খেলে গিয়েছিল, হার্ট ক্রেনের মতো। নিচে নদীতে অন্ধকার স্রোত দেখে হঠাৎ মনে হয়েছিল, 'যাই' বলে সাড়া দিই। স্রোত, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। মাঝখান থেকে অবিনাশ এসে —।

দেখলাম কল্যাণ পেছন ফিরে উঠতে শুরু করেছে, আমার পুরো কথা না শুনে। সিঁড়ির ওপর গিয়ে মূর্তিটার নিচে দাঁড়াল। বিশাল মর্মর মূর্তিটা — যেন মূর্তিটা, কোনও তুলনা মনে আসছে না, শুধু মূর্তিটাই চোখে ভাসছে, বিশেষত ওই অন্ধকারে তলোয়ারের উপর হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়ানো। মনে পড়ছে মূর্তিটার নিচে কল্যাণকে কী সাধারণ ও অকিঞ্চিৎকর লেগেছিল। ভেবেছিলাম, মানুষ কি একটা মূর্তির চেয়ে নগণ্য বা কম জীবন্ত? পরে ভাবনাটা সংশোধন করে নিয়েছি। মানুষ না, শুধু কল্যাণ। ওই বাস্টার্ড। ওকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। খালি বড় বড় কথা।

শনিবার, ২৯ এপ্রিল।

কাল সারা রাত মাথায় ব্যথা হয়েছে। মাথার যন্ত্রণা কিংবা মাথাধরা নয়। মাথার পিছনে চার ইঞ্চি জায়গা জুড়ে সমতল ধরনের ব্যথা। শুয়েছিলাম, হঠাৎ মাঝ রাত্রে মনে হল ভূমিকম্প হচ্ছে, খাট ও ঝোলানো আলোটা দুলছে। শুনতে পেলাম দূর থেকে শত শত শাঁখের আওয়াজ। প্রবল ভয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মেঝেতে পা রাখতে পারছিলাম না, 'মা মা' বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। মা যে বাড়িতে নেই মনে পড়েনি, শুধু মনে হয়েছে মাকে ডেকে বাইরে কোনও খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে বাঁচতে হবে। বাড়ির সামনে খোলা জায়গা নেই, পুরো গলিটা পেরিয়ে রাস্তার ওপরে ঘুঁটে দেবার মাঠ, গলিটা পেরুব কী করে? 'মা মা' বলে ডেকে দেয়াল ধরে ধরে পাশের ঘরে এলাম। দিদি ওর বাচ্চাদের নিয়ে সুখে ঘুমোচ্ছে, এখনও টের পায়নি। দিদিকে ডাকতে গিয়েও মনে হল, থাক না, ওরা নিশ্চিন্তে ঘুমোক, দেয়াল চাপার পড়ে মরে তো মরুক, বিধবা হয়ে দিদি বেশিদিন বেঁচে কী করবে? পরক্ষণেই মনে পড়ল, একবার আমার ডান হাত ভেঙে যেতে দিদি আমাকে অনেক দিন নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছে, তৎক্ষণাৎ দিদিকে ডেকে বাঁচাবার কথা মনে হল। সেই সময় শিয়রের কাছে জানলাটা খোলা, ছায়া দুলছে না, আলো দুলছে না। বুঝতে পারলাম, দিদির ঘরে ভূমিকম্প নেই। থেমে গেছে, না ভূমিকম্প আরম্ভই হয়নি? আমি স্বপ্নে ভয় পেয়েছিলাম? নাকি পৃথিবীতে এইমাত্র কয়েক সেকেন্ডের একটা বিষম ভূমিকম্প হয়ে গেল যা শুধু একা আমার শরীর কাঁপিয়েছে! আবার মাথার যন্ত্রণা শুরু হল।

সেই সময় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, রাত দুটো কি সাড়ে তিনটে, বাবাকে দেখতে পেলাম।

কোর্ট থেকে ফেরার সময় যে-রকম পোশাক পরতেন, ঠিক সেই পোশাকে, কালো সিল্কের কোট, কালো টাই, ধবধবে সাদা স্টিফকলার ও জামার হাতা। চোখে প্যাশান। জিজ্ঞেস করলাম, বাবা আপনি হঠাৎ? কী-মনে করে?

তোমাদের দেখতে এলাম। তাছাড়া আমার নস্যির কৌটোটা ফেলে গিয়েছিলাম। বাবা খুব ধীর ও পরিষ্কার গলায় বললেন।

আপনাকে আবার দেখব, আশাই করিনি, আপনি তো —।

তুমি কেমন আছ পরীক্ষিৎ, একটু রোগা হয়ে গেছ।

কিন্তু আপনার চেহারা একই রকম আছে। কী করে ফিরলেন?

আমার সোনার হাতঘড়িটা বিক্রি করে দিয়েছ শুনলাম।

আপনি কী করে ফিরলেন? মরে যাবার সাত বছর পরে —।

ঘড়িটা আমার খুব প্রিয় ছিল, আমার বাবা ওটা দিয়েছিলেন আমাকে। তিনি বলেছিলেন, এই ঘড়ি তোমাকে দিলাম। এটা কখনও বন্ধ হয় না। এটা তুমি তোমার সন্তানকে দিও। কিন্তু সেই সময়কে তুমি রাখলে না, পরীক্ষিৎ।

মৃত্যুর পরও কি ফিরে আসা যায়? আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।

আমার মেডেলগুলো সব অশ্বিনীর কাছে বন্ধক দিয়েছ। ওগুলো কী ছাড়াবে?

ছাড়াতাম। কিন্তু স্যাকরা বেচে দিয়েছে বলল।

মিথ্যা কথা বোলো না আর এখন। আসলে তোমার —।

আপনি মৃত্যুর কথা বলুন।

ছাড়াবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। তুমি নিজে লেখাপড়া করলে না। এমন কিছু করতে পারবে না যাতে ও-রকম মেডেল পাবে। সেই জন্য তোমার বাবার মেডেল তোমার সহ্য হচ্ছিল না। কিন্তু তোমার মা ওগুলো খুব ভালবাসতেন। তাঁকে এখনও বলোনি —।

সাত বছর আগে আপনাকে আমি পুড়িয়ে এসেছি শ্মশানে। সে-দিন খুব বৃষ্টি ছিল। আপনাকে বয়ে নিয়ে যেতে অনেক লোক এসেছিল, কিন্তু আমার এমন কাঁধে ব্যথা হয়েছিল যে এক সপ্তাহ ব্যথা ছিল। আপনি জানেন না, জেনে রাখুন, আপনার প্রিয় বন্ধু সতীশবাবু শ্মশানে যাননি। বুলিমাসির বর আপনার টাকা ফেরত দেননি। কিন্তু আপনি কী করে মৃত্যুর পর আবার ফিরলেন, সেই কথা বলুন।

আমার ফটোর কাচটা ফেটে গেছে। ওটাকে সারিয়ে অন্য কোথাও রাখাই তোমার উচিত।

মৃত্যুর দেশ থেকে যদি ফিরে আসা যায়, তবে আমি আপনার সঙ্গে যাব। ফিরে এসে আমি সেই অ্যাডভেঞ্চারের কথা লিখলে পৃথিবীতে হই-হই পড়ে যাবে।

ও-রকম জানলার পাশে মাথা দিয়ে শুয়ো না। ওতে বুকে সর্দি বসে যায়।

আপনি মৃত্যুর কথা বলুন! মরার পর আপনি একটুও বদলাননি তো? কেমন করে —।

আমার বড় শীত করে রে খোকন, আমাকে একটা কম্বল দিতে পারিস?

না। আমাদের আর একটা একস্ট্রা কম্বল নেই। আপনারটা দিদির ছেলে গায়ে দিচ্ছে।

কিন্তু আমার যে বড় শীত করে। চিতায় যাবার পর আর আগুন দেখিনি। আমাব প্রথম ব' ; বাৎসরিক কাজটাও করিসনি!

তখন জামাইবাবুর অসুখ ছিল। ভেবেছিলাম, জামাইবাবুর শ্রাদ্ধ আর আপনার বাৎসরিক এক সঙ্গে করব।

মরার আগের দিন তোকে —।

আপনি মরার পরের —।

একটা কথা —।

কথা।

বলতে চেয়েছিলাম। তুই আসিসনি, আমাব —।

বলুন, আমি তাই শুনতে চাই।

আমার ওখানে বড় শীত করে পরীক্ষিৎ। তোর কথা ভেবেও আমার শীত করে।

শেখর

সকালবেলা সারা শরীর ব্যথা করে প্রত্যেক দিন। অধিকাংশ দিনই রাত্রে আলো নেভাতে মনে থাকে না। দিনেরবেলা আলোটা নেভাতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে তাকাই। কী করুণ মূর্তি এই আলোর। আমাদের তিন-পুরুষের বাড়িতে এখনও কিছু কিছু ঝাড়লণ্ঠন আছে, সেগুলো নষ্ট করিনি। ভেতরে বাল্ব বসিয়ে জ্বালি। রাত্তিরবেলা খুব জমজমাট দেখায়। প্রাচীন রাজপুরুষের মতো। কিন্তু দিনেরবেলা কী মলিন রুগ্ন চেহারা আলোটার। আমি দিনের বেলাতেই এটাকে দেখতে ভালবাসি। রাত্তিরের অত

প্রখরতা সহ্য হয় না। সুইচ টি'পে আলোটা একবার নেভাই ও জ্বালি। আলোটা নেভালেই রোদ্দুর চোখে পড়ে বিশেষ ভাবে। রোদ্দুর দেখলেই মনে হয় দূরে চলে গেছি, ধানবাদের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি অথবা কুচবিহারে অথবা ছেলেবেলায় খুলনায় যেমন হাঁটতাম শশাঙ্কর সঙ্গে। সকালে উঠলেই শরীর ব্যথা করে। এ বেশ মজা, রাত্তিরে কোনও দিন ঘুম আসতে চায় না, প্রতি দিন স্লিপিং পিল খেতে হয়, তবু ঘুম আসে না। দেয়ালে ছবি দেখি, ছবি তৈরি করি, ছবি নষ্ট করি। শেষরাত্রে ঘুমের মতো আচ্ছন্নতা। সকালে গা ব্যথা। সেই ব্যথা সারাবার জন্য আবার ট্যাবলেট খাই। শুনেছি, বেশি ট্যাবলেট খেলে রাত্রে ঘুম হয় না। ঘুম হয় না বলে রাত্রে ট্যাবলেট খাই, সেই জন্য সকালে গা ব্যথা। আবার গা-ব্যথা সারাবার জন্য ট্যাবলেট খাই, সেই জন্য আবার রাত্রে ঘুম হয না। সকালে যার সঙ্গে দেখা হয়, আমার বিরস মুখ দেখে শারীরিক ব্যাপারে প্রশ্ন করে। আমার সেই গা ব্যথার কারণ বলি। ওই ট্যাবলেটটা খাস না কেন ? খুব ভাল কাজ দেয়, শরীর একেবারে ঝরঝরে করে দেবে। এই বলে একটা ট্যাবলেটের নাম করে। রাত্রে যার সঙ্গেই দেখা হয়, কথায় কথায় বলি, রাত্রে একদম ঘুম হচ্ছে না ভাই। সঙ্গে সঙ্গে কেউ না কেউ বলে, অমুক ওষুধটা খেয়ে দ্যাখ। মন্ত্রের মতো অ্যাকসান, দশটা ভেড়া গোনার আগেই ঘুমিয়ে পড়বি। প্রত্যেকেই কিছু না-কিছু ওষুধ জানে। সবগুলিই কার্যকরী। কিন্তু সবগুলোই আংশিক। সকলেই আংশিক ওষুধ নিয়ে আছে।

তিনফর্মা প্রুফ জমে গেছে, কখন দেখব জানি না। একেবারে সময় পাই না। মাথার মধ্যে অনেকগুলো সরু সরু রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। সেই সব ক'টা রাস্তার ট্র্যাফিক আমাকে একা সামলাতে হয়। সবুজ, লাল, হলুদ আলো জ্বলে, আমি টের পাই। মাথার মধ্যে একটা জাঁদরেল পুলিশ অফিসার সব সময় ব্যাটন হাতে রাগে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারই আশেপাশে আর একটা রোগা উদ্‌ভ্রান্ত লোক, ছেঁড়া জামা, তিন দিন দাড়ি কামায়নি। সেই লোকটা বলছে, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। এই ক্ষমতাপ্রার্থী নিবীহ লোকটি ও ক্রুদ্ধ পুলিশ অফিসার ঘুবছে আমার মাথার মধ্যে, নানা রাস্তা দিয়ে ছুটছে, কখনও হাঁটু মুড়ে বসছে, লুকোচ্ছে। এবা কী নাটক তৈবি করছে জানি না। এবা আমাবই মাথার মধ্যে, তবু এদের চিনি না আমি। কখনও-বা পুলিশ অফিসারের মতো লোকটা গর্জন করে বলছে, না, ক্ষমা করব না, ক্ষমা নেই। এই বলে পাছে ক্ষমা করে ফেলে এ জন্য ছুটে পালাচ্ছে, আর নিরীহ করুণ লোকটা ক্ষমা করুন, ক্ষমা করতেই হবে বলে তাড়া করছে তাকে। সেই অদ্ভুত দৌড়-প্রতিযোগিতা মাথায় নিয়ে আমি বসে থাকি টেবিলের সামনে। গাযে ব্যথা, প্রুফ যেমন তেমন পড়ে থাকে, ডানাভাঙা পাখির মতো উলটানো আদ্দেক শেষ-করা বই, ড্রয়াবে আদ্দেক শেষ-করা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। ওই পাগলাটে দৌড়ের জন্য মাথায়ও ব্যথা হয়।

এ ছাড়া আছে মাধবী। সপ্তাহে তিন দিন মাধবী আসে আমার বাড়িতে দুপুরবেলা। এখন কলেজ বন্ধ বলে সন্ধেবেলাটা শুধু শুধু ছাত্রী পড়িয়ে নষ্ট করতে চাই না। তাই ওকে দুপুরেই আসতে বলেছি। শুধু দুপুরবেলাটুকু ও থাকে, কিন্তু আমাকে ব্যাপৃত রাখে সারা দিন। যদি দেখা হয়, সমস্ত দিনটা মাধবীর কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না। অতি কষ্টে তবু বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে দুপুরবেলাটা ছিনিয়ে নিয়েছি। আমার বাড়িতে যে যখন ইচ্ছে আসে, আমি থাকি বা না থাকি আমার ঘরে এসে আড্ডা মারে। মাকে ডেকে চায়ের হুকুম করে। বন্ধুরা বসে থাকবে বলে আমাকে সব সময় তাড়াতাড়ি ফিরতে হয় বাড়িতে। বলতে গেলে আমার স্বাধীন সময় কিছুই নেই। প্রত্যেকে আলাদা ভাবে আড্ডা মারতে আসে আমার সঙ্গে, কিন্তু আমার কোনও নির্বাচনের অধিকার নেই। কারণ আড্ডার জায়গা আমার বাড়ি। অনেকে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আমার বাড়িতে। কেউ হয়তো এসে বলল, ওমুক এসেছে ? বললাম, না। সে বসে রইল, বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগল। খানিকটা বাদে

ওমুক এসে বলল, আরে তুই কতক্ষণ এসেছিস? আমি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। খানিকটা বাদে তারা নিজেদের কথা সেরে তারপর আমার সঙ্গে দু-একটা মুখরাখা কথা বলে আচ্ছা চলি, বিদায় নেয়। অতি কষ্টে সবাইকে নোটিশ দিয়ে বলেছি, দুপুরবেলা কেউ আসবে না। দুপুরবেলা আমি একা থাকতে চাই। দুপুরবেলা মাধবী আসে ইতিহাস পড়তে।

টেবিলের ও-পাশে বসে যখন আমি ওকে মিউজিয়ামের পাথর বিষয়ে বই-পড়া বক্তৃতা শোনাই, তখন চুপ করে বসে থাকে মাধবী, একটাও শব্দ করে না। খানিকটা বাদে লক্ষ্য করি, ও একটাও কথা শুনছে না আমার, শুধুই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি থেমে যাই, জিজ্ঞেস করি, কী দেখছ?

ওটা কার ছবি?

তখন বুঝতে পারি, ও আমাকে দেখছে না, দেখছে আমার পিছনের দেয়াল। বলি, সালভাদোর দালি, ছবিটার নাম জ্বলন্ত জিরাফ।

ওঃ। আচ্ছা, তারপর বলুন।

কখনও কখনও শুধুই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তখনও জিজ্ঞেস করি, কী দেখছ?

আপনাকে।

এ-রকম পরিষ্কার ভাবে কোনও মেয়ে কথা বলে না। অধ্যাপকের দিকে তাকিয়ে কোনও ছাত্রী বলে না, আমি আপনাকে দেখছি। শুনে আমি একটু থতমত খেয়ে যাই। কিন্তু ছাত্রীদের এ-সব ব্যবহারের প্রশ্রয় দিতে নেই। তাহলে চাকরি রাখা যাবে না। সেই জন্য আমি খানিকটা নির্বিকার ভাবেই বলি, আমাকে কী দেখার আছে? এমন কিছু দর্শনীয় নই। নিয়নডার্থাল স্কাল আমার, লক্ষ্য করছ?

তা নয়। আপনাকে আমার এক জন চেনা লোকের মতো দেখতে। খুব মিল আছে। সত্যি আপনি অনেকটা অবনীভূষণের মতো দেখতে।

এ-কথা মাধবী আরও কয়েক বার বলেছে। কে অবনীভূষণ, আমি জিজ্ঞেস করিনি কখনও। মাধবীর সঙ্গে তার কী সম্পর্ক, সে কোথায় এখন, বেঁচে আছে কি না, কিছুই জানিনা। যেন ওর সঙ্গে আমার একটা লুকোচুরি খেলা চলছে এই নিয়ে। আমি কিছুতে জিজ্ঞেস করব না, মাধবী জিজ্ঞেস না করলে বলবে না। দু'জন মানুষ কখনও এক রকম দেখতে হয় না। অবনীভূষণকে আমার মতো দেখতে, অর্থাৎ তার মুখ বা চোয়াল আমার মতো, অথবা তার চোখ, অথবা আমার মতো কোনও ভঙ্গি। কোথাও আমার মতো আর এক জন লোক আছে, এই দুশ্চিন্তা আমাকে বিষম বিব্রত করে। লোকটি সম্বন্ধে খুবই কৌতূহল হয়, ঈর্ষা নয়, সে যদি মাধবীর প্রেমিকও হয়, তবুও না। আমি নিজের চিন্তা ভুলে গিয়ে আমারই মতো অন্য একটা লোক, অবনীভূষণ, তার চিন্তায় বিভোর হয়ে যাই। ক্রমশ, এই ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, অবনীভূষণ নিশ্চিতই মাধবীর প্রেমিক, মাধবী যে-ভাবে নামটা উচ্চারণ করে। লোকটা হয় এ-দেশে নেই এখন, বা মারা গেছে। মাধবীর মতো ধনীর দুহিতার সঙ্গে যখন প্রেম তখন সে-ও নিশ্চয়ই খুব উঁচু বংশের ছেলে। মাধবীর সঙ্গে টেনিস খেলতে খেলতে কিংবা গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক রোড দিয়ে ষাট মাইল স্পিডে গাড়ি চালাতে চালাতে কী করে আমারই মতো চেহারার এক জন লোক মাধবীকে প্রণয় জানাত। কী ভাষা ব্যবহার করত, ভাবতে ভাবতে আমিও এক দিন মাধবীর প্রেমিক হয়ে পড়ি। এর আগে, কত মেয়ের সঙ্গেই তো চেনাশুনা, জানা, আরও অনেক কিছু হল, কিন্তু কখনও কোনও মেয়ের সম্পর্কে আমি এত বেশি ভাবিনি, বিশেষত ছাত্রীদের সম্পর্কে তো নয়ই। ছাত্রীদের ব্যাপারে আমি কখনও মাথা ঘামাইনি, আগে অনেক সুযোগ এসেছিল, মাধবীর চেয়ে অনেক সুন্দরী মেয়ে — তবুও না। কিন্তু হঠাৎ মাধবী আমার হৃদয়ের তিন ভাগের এক ভাগ দখল করে ফেলেছে। সত্যি, আমি এ-ক'দিনে অনেক বদলে গেছি। আমার চিন্তা ও

স্বভাবের অনেক বদল হয়েছে। আর, চিন্তার দিক দিয়ে বদলে গেছি বলেই কি আমার চেহারাও বদলে গেছে? কোথাকার কোন এক অবনীভূষণের মতো দেখতে হয়েছে আমাকে? রাত্তিরবেলা, বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি অবনীভূষণ হয়ে যাই, হয়ে গিয়ে মাধবীর কথা ভাবি। মাধবীর জন্য বিষম মন কেমন করে, নিজেকে অবনীভূষণ ভেবে।

মাধবীর ধরন-ধারণ ঠিক ছাত্রীর মতো নয়, অনেকটা প্রভুপত্নীর মতো। বড়লোকের মেয়ে বলেই বোধহয় একটু দেমাকি স্বভাব। আগে এ জন্য ওকে পছন্দ করতাম না। এখন ওর এই অভিজাত ভঙ্গি ও আমার খুব ভাল লাগে। আমার সিগারেটের ছাই ঝাড়ার ধরন দেখে এক দিন মাধবী বলল, অবনীভূষণও ঠিক এই রকম ভাবে ছাই ঝাড়ত। বস্তুত, আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। কারণ আঙুলে টুসকি মেরে আমিও আগে কখনওই ছাই ঝাড়িনি, আজকেই প্রথম। কী করে এ স্বভাব আমার হল! তবে কি আমি সত্যিই ক্রমশ অবনীভূষণ হয়ে যাচ্ছি? প্রসঙ্গ পালটাবার জন্য আমি বললাম, আমি এ-রকম টুসকি মারার কায়দা শিখেছি আমার বন্ধু পরীক্ষিতের কাছ থেকে। তুমি তাকে চেনো?

নাম শুনেছি। লেখেন তো? আপনার বন্ধুদের মধ্যে আমি শুধু অবিনাশ মিত্রকে চিনি, এক দিন আলাপ হয়েছিল। খুব চমৎকার লোক।

অবিনাশ কী বিশ্বসুদ্ধু মেয়েকে চেনে? অবিনাশের সঙ্গে কবে কোথায় আলাপ হয়েছিল জিজ্ঞেস করতেও ভয় হল। কী জানি অবিনাশ এর হৃদয়ও রক্তাক্ত করেছে কি না। না করেনি। যে-রকম আলতো ভাবে মাধবী চায়ের কাপে চামচ নাড়ছে, তাতে বুঝতে পারা যায়। এ-রকম কোমলতা কোনও আহত নারীর থাকে না। আগে মাধবীকে খুব একটা রূপসী মনে হত না, কিছুটা স্থূল, শরীর থেকে অন্তত দশ পাউন্ড ওজন কমালে ফিগার সুন্দর হবে ভাবতাম, নাকটাও একটু চাপা। ক্রমশ মনে হচ্ছে ও-রকম গ্রীবার লাবণ্য আমি আগে কোনও মেয়ের দেখিনি, ও-রকম স্নিগ্ধ অথচ চুম্বকের হাসি। অর্থাৎ মাধবীর প্রতি আমি মায়ায় আবদ্ধ হয়ে গেছি, যাকে বলে ভালবাসা। মনে হয়, মাধবীর দুই বাহু পেলে এ-জীবনে উদ্ধার পেয়ে যাব। হঠাৎ আজকাল এ-রকম উদ্ধার পাবার ইচ্ছেই-বা কেন মনে জাগছে?

এ ছাড়া আর একটাও দৃশ্য আমাকে খুব বিরক্ত করছে আজ কয়েক দিন। ঢালু অন্ধকার রাস্তা, দু'পাশে গাছের সারি, একটা মোটরগাড়ি হেডলাইট জ্বেলে স্পিডে নেমে আসছে। কোনও কিছু লিখতে গেলেই প্রথমে এ দৃশ্যটা চোখে ভাসে। অথচ এমনকী গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য এটা, কোথায় দেখেছি তা-ও মনে পড়ে না। অন্ধকার ঢালু রাস্তায় মোটরগাড়ি দু'পাশের গাছের সারির মধ্য দিয়ে তীব্র আলো জ্বেলে নেমে আসছে। কোথাকার অন্ধকার, কোন ঢালু রাস্তা, কে গাড়ির চালক, কিছুই জানি না। অথচ দৃশ্যটা তাড়িয়ে দিতেও ইচ্ছে করে না, আপনা থেকে কেন এল জানতে ইচ্ছে হয়।

সামনে এক তাড়া প্রুফ ছড়ানো। আমি মাথার মধ্যে পুলিশ ও ক্ষমাপ্রার্থী, মাধবী, অবনীভূষণ, অন্ধকার ঢালুপথে গাড়ির দৃশ্য নিয়ে চুপ করে বসে আছি। এই সময় পরীক্ষিৎ ও অনিমেষ এল। অনিমেষ কাল ফিরে যাবে এক ছেলে ও গায়ত্রীকে নিয়ে। আর একটা ছেলে বাঁচেনি। সিগারেটের ছাইয়ের সঙ্গে প্রচুর কথা উড়ে গেল। অনিমেষ শান্ত গলায় থেমে থেকে পুরনো দিনের কথা বলল। বলল, ছেলেটাকে শ্মশানে পোড়াতে গিয়ে পুরনো কথা সব মনে পড়ল আবার। বোধহয় বছর চারেক পর শ্মশানে গেলাম।

আগে তো প্রতি দিন সন্ধেবেলা ওখানেই আমাদের আড্ডা ছিল। এত দিন পর শ্মশানে গিয়ে অনিমেষের মনটা একটু ভারি হয়ে গেছে মনে হল। ছেলে মরার জন্য ওর কি খুব দুঃখ হয়েছে। ছেলে

মরার পর দুঃখ হওয়াই তো স্বাভাবিক। কিন্তু যমজ এক ছেলে বেঁচে আছে, এক জন মরেছে, সুতরাং এক জনের জন্য আনন্দ, আরেক জনের জন্য দুঃখ, কিন্তু কোনটা বেশি? যাই হোক, অনিমেষকে কিছুটা অন্য কথা বলে ভোলানো দরকার। আমি বললাম, তোমার মনে পড়ে অনিমেষ, শ্মশানের পাশে আমাদের রাত্রে শুয়ে থাকা? বগলে ব্র্যান্ডির বোতল, ইট বাঁধানো ঢালু গঙ্গার পাড়ে? কে যেন গান গাইতে গাইতে পড়ে গেল — পরীক্ষিৎ না অরুণাংশু? ওঃ, গগন, মনে আছে।

কেন, সেবার সেই দুর্গাপুজোর সময়ে মনে নেই?

মনে পড়তেই হাসি পেয়ে গেল। অরুণাংশু দুটো হুইস্কির পাঁইট পকেটে নিয়ে ঘুরছে, কোথাও বসে খাবার জায়গা নেই। আমি বললাম, চল, গঙ্গার পাড়ে যাই। দুর্গাপুজোর অষ্টমীর দিন, কিন্তু গঙ্গার পাড় ভিড়ে ভর্তি। অন্ধকারে জোড়ায় জোড়ায় ছেলে-মেয়ে বসে আছে। আমরা কোথাও আর জায়গা পাই না, ওদের বিরক্ত করতেও ইচ্ছে করে না। শেষ পর্যন্ত বটগাছের নিচে এক সাধুর আশ্রমের কাছে আমরাও সাধু সেজে বসে গেলাম গোল হয়ে। দু'এক চুমুক দেবার পর মনে হল খানিকটা জল দরকার। সাধুটাকে বললাম। সে বলল, গঙ্গাজীমে ইতনা পানি হ্যায়, পি লেও। তাই নিতাম, কিন্তু তাপসটা খানিকটা শৌখিন, ও কিছুতে গঙ্গার জল মেশাবে না। তখন অরুণাংশু একটা চাঅলাকে ডেকে চা না কিনে খালি ছটা ভাঁড় কিনল। শুধু ভাঁড় দিয়ে কী করব দেখার জন্য কৌতূহলী চাঅলা খানিকটা দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ অরুণাংশু জমিদারি কায়দায় তাকে হুকুম করল, এই চাঅলা, তোমার কলসীটা রেখে এক বালতি পরিষ্কার জল নিয়ে এসো তো। লোকটা ইতস্তত করতে অরুণাংশু বিষম ধমক দিল, যা-ও! দেখছ কী হাঁ করে? পরীক্ষিৎ গাঁজার খোঁজে ঝুলিতে হাত দিয়ে —।

কী রে পরীক্ষিৎ, তোর মনে পড়ে?

পরীক্ষিৎ চুপ করে বসে ছিল। শুকনো হাসি হেসে বলল, হুঁ।

আমি বললাম, কী রে, তোর শরীর খারাপ নাকি?

না, কিছুটা। ভাবছি অনিমেষের সঙ্গেই বাইরে চলে যাব। কয়েক দিন ঘুরে এলে ভাল লাগবে। তোর এখানে অবিনাশ আসে?

না, অনেক দিন আসেনি।

আমার সঙ্গে কাল দেখা হয়েছিল, অনিমেষ বলল, কাল রাইটার্স বিল্ডিং-এ ওর অফিসে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে বেরিয়ে এল। দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে বহু দূর গিয়েছিলাম, প্রায় খিদিরপুর পর্যন্ত। অনেক কথা বলল অবিনাশ।

নিশ্চয়ই ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা? পরীক্ষিৎ বলল।

না। খুবই আন্তরিক। অনেক বদলে গেছে অবিনাশ। অনেক সরল হয়েছে।

না, সরল না, সরলতার ভান!

তাতেই-বা ক্ষতি কী? ভান করতে কেউ যদি সত্যিই সরল হয়, তা-ও কম নয়। নিষ্ঠুরতার ভান করার চেয়ে তা অনেক ভাল।

ও কি বুঝেছে যে, ও সারা জীবন যত পাপ করেছে তার ফল ভোগ করতে হবে?

পাপ কথাটা অত সহজে উচ্চারণ করিস না পরীক্ষিৎ। কোনও মানুষ যদি নিজেকে সত্যিকারের পাপী মনে করে, তবে তার পক্ষে আর বেঁচে থাকাই মুশকিল।

হঠাৎ অবিনাশকে নিয়ে এত কথা কেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আমার অবিনাশকে দরকার। পরীক্ষিৎ বলল, ওর সঙ্গে আমার কয়েকটা অ্যাকাউন্ট মেটাতে হবে।

অনিমেষ পরীক্ষিতের দিকে তেরছা ভাবে তাকায়। তারপর আচমকা প্রশ্ন করে, তুই কেমন আছিস রে পরীক্ষিৎ?

পরীক্ষিৎ প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারে না। চোখ ছোট করে জিজ্ঞেস করে, কেন হঠাৎ এ-কথা?

কী-রকম যেন মনে হচ্ছে, তুই কিছু দিন ধরে মনের মধ্যে কোনও কষ্ট নিয়ে আছিস।

কষ্ট? না, মনের মধ্যে কোনও কষ্ট নেই। তবে মাথায় যন্ত্রণা হয় মাঝে মাঝে। সেই যে তোর ওখানে মাথায় লেগেছিল।

ওঃ, সেই অ্যাকসিডেন্টের কথা ভাবলেও এখন ভয় হয়! ও-রকম ভাবে ব্রিজ থেকে পড়ে গেলে কেউ —।

ও মোটেই অ্যাকসিডেন্ট নয়। আমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম।

আত্মহত্যা? যাঃ! বেশ তো রেলিং-এর ওপর বসে বসে গান গাইছিলি। যাঃ ও ভাবে কেউ আত্মহত্যা করে? কেন, আত্মহত্যা করবি কেন?

এখন তো করতে চাই না। সে-দিন চেয়েছিলাম।

কেন?

আজ আর কারণটা মনে নেই। তবে সে-দিন মনে হয়েছিল, আর এক মুহূর্তও আমি বাঁচতে চাই না।

আমি চুপ করে অনিমেষ আর পরীক্ষিতের কথা শুনছিলাম। পরীক্ষিতের কথা শুনে আমার হাসি পেল। বললাম, তুই আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলি? কিন্তু অবিনাশ যে অন্য কথা বলে।

কী বলে অবিনাশ?

অবিনাশ তো বলে, ও-ই নাকি হঠাৎ *ঠেলে ফেলে* দিয়েছিল তোকে?

অনিমেষ চমকে উঠে বলল, অবিনাশ *ঠেলে* ফেলে দেবে? হাঃ, আমি বিশ্বাস করি না। তাছাড়া অবিনাশ তো তখন কাছাকাছি ছিলই না। ও তো সিগারেট কিনতে গিয়েছিল।

তোমার মনে নেই। সিগারেট তো কিনতে গিয়েছিল তাপস। অবিনাশ নাকি —।

পরীক্ষিৎ গম্ভীর ভাবে বলল, অবিনাশ বলে নাকি এই কথা? অবিনাশ আমাকে *ঠেলে* ফেলে দিয়েছিল? কেন? সে এ-কথা বলেছে?

জানি না। তোর আর অবিনাশের মধ্যে কী যে ব্যাপার আছে! যাক গে, তোর মাথায় এখন ব্যথা করে, তুই ডাক্তারের কাছে যা না।

যাব। কিছু টাকা ধার দিবি?

ওই তো! কিছু একটা ভাল কথা বললেই অমনি টাকা। দরকার নেই তোর ডাক্তারের কাছে যাবার।

দে না। ক'টা টাকা ধার দে না। বড়লোকের মেয়েকে পড়াচ্ছিস, তোর অনেক টাকা।

ধার বলিস কেন? কোনও দিন টাকা ফেরত দিয়েছিস? ভিক্ষে চাইতে পারিস না?

ঠিক এই সময় অবিনাশ ঢুকল আমার ঘরে। শান্ত মুখমণ্ডল। অবিনাশকে দেখে প্রথমেই আমার মনে হল, ওর কাছে অবনীভূষণের কথাটা জিজ্ঞেস করতে হবে। ও যখন মাধবীকে চেনে তখন হয়তো অবনীভূষণকেও।

অবিনাশকে দেখেই পরীক্ষিৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলল, তোকে আমি এক মাস ধরে খুঁজছি।

অবিনাশ ওর বিশাল চেহারাটা নিয়ে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইল। পরিষ্কার দাড়ি কামানো, ওর কপালের কাছে কাটা দাগটা জ্বল জ্বল করছে। অবিনাশকে আমি পছন্দ করি ওর স্পষ্ট চোখ দুটোর

জন্য। কত রকম বদমাইশি করে অবিনাশ, কিন্তু ওর চোখে কোনও গ্লানি থাকে না। চৌরঙ্গীতে চারটে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানের সঙ্গে যখন মারামারি করেছিল, তখনও ওর চোখ যে-রকম। কোনও মেয়ের সঙ্গে যখন সর্বনাশের ভূমিকা করে তখনও চোখ এক রকম।

পরীক্ষিৎ ও অবিনাশ দরজার আড়ালে গিয়ে কিছু বলাবলি করতে লাগল। আমি ও অনিমেষ চুপ। পরীক্ষিৎ আস্তে আস্তে কী বলল, শোনা গেল না। অবিনাশ শান্তভাবে বলল, না! পরীক্ষিৎ আবার অস্ফুট গলায় কিছু বলল, অবিনাশ পুনরায় শান্ত গলায়, না। পরীক্ষিৎ ক্রুদ্ধভাবে চেঁচিয়ে বলল, আমি তোর সর্বনাশ করে দেব। অবিনাশ বলল, আমি তো সর্বস্বান্ত, আমার আবার সর্বনাশ কী হবে?

অনিমেষের সঙ্গে চোখাচোখি করে আমি বললাম, ও দুটো কী করছে? অনিমেষ উত্তর না দিয়ে শুধু হাসল। আমার কাছে পুরো ব্যাপারটাই দুর্বোধ্য লাগছে। মনে পড়ল, কয়েক দিন আগে হেমকান্তির অসুখ দেখতে গিয়েছিলাম। হেমকান্তি হয়তো বাঁচবে না। সে-দিনও, ঘরের মধ্যে গায়ত্রী হঠাৎ অবিনাশকে দেখে থমকে গেল। কঠিন গলায় বলল, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল। অবিনাশ আলতো ভাবে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, বলো, কিন্তু যত ভয়ঙ্কর কথাই হোক, রাগ করে বলতে পারবে না, হাসতে হাসতে বলো। গায়ত্রী আমার দিকে তাকাল। কী অস্বাভাবিক জ্বল জ্বলে তখন গায়ত্রীর চোখ। কোনও কারণে ও খুবই রেগে আছে। অবনিাশ আমাকে বলেছিল, তুই একটু বাইরে যা।

ওদের কী এমন কথা ছিল, যা আমার সামনে বলা যায় না? বন্ধুরা সবাই ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে। এখন সবারই আপন কথা বাড়ছে।

খানিকটা বাদে অনিমেষ উঠে গেল ওদের কাছে। একটু পরে তিন জনেই ফিরে এল ঘরে। অবিনাশের চোখ আগের মতোই অবিচলিত, পরীক্ষিতের মুখ ও চোখ লাল, অনিমেষের চোখ হলুদ। হলুদ চোখ — এ-কথার কী মানে হয় জানি না, কিন্তু পরীক্ষিতের চোখ লাল দেখার পর অনিমেষের চোখ স্বাভাবিক ভাবেই হলুদ মনে হল। দুর্বোধ্যতার রঙ হলুদ। ফুলের মধ্যে যেগুলির রঙ হলুদ, সেগুলোই অপদার্থ। দুর্বোধ্যতা ফুলের মানায় না।

অবিনাশ ঠাণ্ডাভাবে পরীক্ষিতের কাঁধে হাত দিয়ে ডাকল, পরীক্ষিৎ —। সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষিৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে চটাং করে এক থাপ্পড় কষাল অবিনাশের গালে। অনিমেষ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, আমি হাততালি দেবার জন্য তৈরি হলাম। দু'জনেই বেশ তেজি, মারামারি হলে জমবে ভাল। থাপ্পড় খেয়ে অবিনাশের মুখ নীল হয়ে গেল। তারপর অবিনাশ একটু হাসল। বলল, এটা হয়তো আমার পাওনা ছিল। কিন্তু তোর জন্য আমার দুঃখ হয় পরীক্ষিৎ।

বা — তোর শাস্তি, ইত্যাদি কিছু বলে পরীক্ষিৎ আর একটা থাপ্পড় মারার জন্য রেডি হতেই আমি ওকে ধরলাম। কী পাগলামি করছিস? তোদের ব্যাপারটা কী?

কিছু না। তুই এর মধ্যে থাকিস না শেখর।

কেন আমি থাকব না?

বলছি, তুই এর মধ্যে থাকিস না। তুই সব ব্যাপার জানিস না।

আচ্ছা থাকব না, কিন্তু উলটে অবিনাশ একখানা ঝাড়লে তোর দাঁত ক'খানা আস্ত থাকবে?

ওকে ছেড়ে দে, শেখর, অবিনাশ বলল। যদি মারতে চায় মারুক। সব আঘাতেরই যে প্রতি-আঘাত দিতে নেই, আমি এখন এই কথা শিখছি। রাগ আর ঈর্ষাই হল পরীক্ষিতের ধর্ম। রাগ আর ঈর্ষা থেকেই পরীক্ষিৎ ওর বিখ্যাত লেখাগুলো লেখে। তাছাড়া ও বাঁচতে পারে না। ওকে থামিয়ে লাভ কী?

পরীক্ষিৎকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। রেগে গেলেই পরীক্ষিৎকে সুন্দর দেখায়, তখন ওকে মনে হয় অসহায়। ওর দর্প ও অহঙ্কার কোথায় লুকোয়, করুণ মুখখানি ফুটে ওঠে। কী নিয়ে রাগারাগি তা আমি বুঝতে না পারলেও পরীক্ষিতের জন্য আমার দুঃখ হয়। যে-পরীক্ষিৎ সব সময় বন্ধুত্ব কিংবা সঙ্ঘবদ্ধতার কথা বলে, হঠাৎ অবিনাশের ওপর ওর এত ক্রোধ কেন, কী জানি।

কাল তোর সঙ্গে যখন আবার দেখা হবে পরীক্ষিৎ, আমি সব ভুলে যাব। অবিনাশ আবার বলল, তুই সব কাজ করিস অত্যন্ত ভেবে-চিন্তে, আগে থেকে পরিকল্পনা করে। কিন্তু আমার সব ব্যবহার উদ্দেশ্যহীন, সেই জন্যেই অনুতাপহীন।

এই ভাবেই জীবনটা চালাবি?

জীবন মানে তো পঞ্চাশ কি ষাট-সত্তর বছর এই পৃথিবীতে কাটিয়ে যাওয়া? যার যে-রকম ইচ্ছে, সে সেই রকম কাটিয়ে যাবে। যতই চেষ্টা করিস — সত্তর, আশি, বড়জোর একশো বছর বাদে চলে যেতেই হবে, আর ফেরা হবে না। পাপপুণ্য যাই হোক, চামড়া শিথিল হবেই, চোখে ছানি পড়বেই, যৌনশক্তিও হরণ করে নেবে সময়। সুতরাং এই ক'টা বছর আমি প্রতি মুহূর্তের ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে চাই। কেউ জুয়া খেলে সময় কাটায়, কেউ কবিতা লিখে — কোনটা ভাল বা বড় কেউ জানে না, যার যেটাতে নিশ্বাস নেওয়ার সুবিধে। কিন্তু সাহিত্য কিংবা শিল্পের জন্য আত্মত্যাগ কিংবা নিজেকে কষ্ট দেওয়া সম্পূর্ণ বোকাদের কাণ্ড। জীবনটা নষ্ট করে অমরত্বের লোভ — মাইরি, ভাবলে হাসি চাপতে পারি না। তিরিশ বছর কেটে গেছে, আরও তিরিশ কী চল্লিশ বছরের ভিসা আছে এখানে থাকায়। তারপর চলে যেতেই হবে, আর ফেরা যাবে না। মৃত্যুর পর তোর বইয়ের আর ক'টা এডিশান হল, কিংবা ইউনিভার্সিটিতে থিসিস লেখা হল — আর ফিরে এসে দেখতে পারবি না। একটাই জীবন, সেটাতে আমি প্রতি মুহূর্তে বাঁচতে চাই।

পরীক্ষিৎ স্তম্ভিত ভাবে তাকিয়ে ছিল অবিনাশের দিকে। এই দীর্ঘ বক্তৃতা ও এতক্ষণ ধরে কী করে শুনল, কে জানে! অবিনাশও এ-রকম ঠাণ্ডাভাবে তো কোনও কথা বলে না। ওদের কিছু হয়েছে বোধহয়। অনিমেষ খুব আস্তে আস্তে বলল, কথাটা আপনি এমন ভাবে বললেন যেন খুবই নতুন এবং নিজস্ব। তা কিন্তু নয়।

কিন্তু আমার জীবনটা আমার নিজস্ব। সেটা আমার মত অনুযায়ীই চলবে আশা করি। অবশ্য, যদি না হঠাৎ জেলে আটকে রাখে। আমি স্বাধীন ভাবে বাঁচতে চাই।

অনিমেষ একটু হাসল। তারপর বলল, জেলে আটকে রাখবে কেন? অবিনাশবাবু, আপনাকে আমার খুব ভাল লাগে। আমি যদি আপনার মতো হতে পারতাম।

আমার মতো মানে? আমার মতো কী? আমি তো কিছুই হয়নি। লেখা-ফেখা ছেড়ে দিয়েছি। বিশেষ কোনও কাজকম্মও করি না। আমার মতো আবার হবার কী আছে?

তবু আপনার এই যে হালকা ভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা, আমার বড় ভাল লাগে। যখন যা ইচ্ছে তাই করা, জীবন সম্পর্কে আপনার কোনও ভয় নেই, ভয় নেই বলেই আপনার মুখখানা খুব সুন্দর। যখন যে-কোনও মেয়েকে দেখলেই আপনার ছুঁতে ইচ্ছে করে, ভোগ করতে ইচ্ছে করে, আপনি চেষ্টাও করেন তৎক্ষণাৎ কিছু না ভেবে। জানেন, আমি এগুলো একদম পারি না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমারও এ-রকম ইচ্ছে। কিন্তু পারি না।

অবিনাশ হাসতে হাসতে বলল, আসুন, আপনার সঙ্গে আমার জীবনটা বদলা-বদলি করি।

অনিমেষ ব্যগ্রভাবে বলল, করবেন? সত্যি যদি করা যেত। আমি হঠাৎ বিয়ে করে জড়িয়ে গেলাম। মফঃস্বলে চাকরি। একদম ভাল লাগে না। ইচ্ছে করে কলকাতায় থেকে আপনার কাছে ট্রেনিং নিই।

পরীক্ষিৎ বলল, মেয়ে পটানো ছাড়া ও আর কী বিষয়ে ট্রেনিং দিতে পারবে?

অনিমেষ বলল, সেটাই-বা মন্দ কী। একটা কিছু পাবার চেষ্টা তো বটে। আচ্ছা অবিনাশবাবু, কোনও মেয়েকে পাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলে কেমন লাগে? আমার এ অভিজ্ঞতাও নেই। আমার প্রথম যে-মেয়েটির সঙ্গে পরিচয়, তাকেই বিয়ে করেছি। ও ব্যাপারটা বুঝতেই পারলাম না।

কিছু একটা যেন বলা দরকার, এই জন্যই আমি বললাম, এখনও সময় যায়নি। আফশোসের কিছু নেই। কথাটা বলার পরই আমি অন্য মনস্ক হয়ে পড়লাম আবার।

অনিমেষ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কীসের সময় যায়নি?

আমি অনিমেষের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ও কী প্রশ্ন করছে বুঝতে পারলাম না।

অনিমেষ রোগা তীক্ষ্ণ মুখ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখের চাহনিতে প্রশ্ন। কীসের সময় যায়নি? আমিও ওকে জিজ্ঞেস করলাম, কীসের সময় যায়নি?

বাঃ, তুমিই তো আমাকে এ-কথা জিজ্ঞেস করলে?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, সময় গেছে কী যায়নি? তোমাকে? কেন? কী মুশকিল!

অবিনাশ হা-হা করে হেসে উঠল। বলল, কী রে শেখর, তুই ঘুমোচ্ছিস নাকি?

কেন, ঘুমোব কেন?

তুই আগের কথা কিছু শুনিসনি বুঝি?

আগের কথা তো তোরা কিছুই বলিসনি আমাকে। যেটুকু বলেছিস, সেটুকু শুনব না কেন? কিন্তু ও আমাকে জিজ্ঞেস করছে কেন, কীসের সময় যায়নি? সময় আবার কীসের কী? সময় কি তোর কিংবা আমার, আলু-পটলের কিংবা মানুষের? এ-রকম হয় নাকি? আমি বলেছি, এখনও সময় যায়নি, তার আবার কীসের কী? সময় যায়নি, সময় যায়নি, ব্যাস ফুরিয়ে গেল! আমার কি চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে? সুতরাং সময় যায়নি —।

অবিনাশ উদাস ভাবে বলল, শেখরের মেজাজটা আজ খারাপ হয়েছে। চল কেটে পড়ি।

সত্যিই হয়তো আমি ওদের কথা মন দিয়ে শুনছিলাম না। চোখের সামনে প্রুফ, মাথার মধ্যে ক্ষমাপ্রার্থী আর পুলিশের লুকোচুরি, ঘরের মধ্যে তিন বন্ধুর বকবকানি — এ-সব কিছুতেই আমার মন লাগছে না, এক একবার বিদ্যুতের মতো মনে ছায়া ফেলে যাচ্ছি। এক মাথা কোঁকড়া চুলসুদ্ধ মাধবীর মুখ, সেই মুখও বেশিক্ষণ থাকছে না। তার পরই মনে হচ্ছে, আমি যেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, কী সুন্দর ভাবে আমার চুল আঁচড়নো, বোধহয় ক্রিম মেখেছি। আমার মুখের চামড়া এমন চকচকে, আমার গায়ে একটা হালকা সিল্কের শার্ট, আমি জামার হাতায় বোতাম পরাচ্ছি। এ কে? আমি না অবনীভূষণ? আপনাকে অবনীভূষণের মতো দেখতে? ওঃ! ড্যাম ইট! হু দা হেল ওয়াজ অবনীভূষণ? আমি কেন অবনীভূষণের মতো দেখতে হব? অথবা, আমাকে দেখে কেন অবনীভূষণের কথা মনে পড়বে? আমার নিজেরই বার বার মনে পড়ছে অবনীভূষণের কথা। নিজের কথা ভাবতে পারছি না, অবনীভূষণের কথা মনে পড়ছে আমার। ড্যাম ইট! আমাকে ভুলতে হবে এ সব। আমার রাত্রে ঘুম চাই। আমাকে ভুলতে হবেই এ সব কথা, অর্থাৎ আমার নিজের মুখও আমাকে ভুলতে হবে। মাধবী-ফাধবী সকলের কথা আমায় ভুলতে হবে। গগনেন্দ্র একটা নেশার কথা বলেছিল, কালো রঙের সন্দেশ, সন্দেশের মধ্যে কী যেন মেশানো থাকে, দুটো সন্দেশ খেলেই পাঁচ ছ'ঘন্টার মতো আর কিছু মনে থাকে না। গগন খেয়ে দেখেছে, একবার গেলে হয় গগনের কাছে। পরীক্ষিৎ অবিনাশরা এখন বিদায় হলেই বাঁচি।

ওরা এখনও সেই প্রেম-ফ্রেম নিয়েই কথা বলে যাচ্ছে। এখনও বড্ড ছেলেমানুষ রয়ে গেল! যার যা ইচ্ছে কর না গিয়ে, তাই নিয়ে অত আলোচনা করার কী আছে? অনিমেষটা মহা ন্যাকার মতো তখনও অবিনাশকে জিজ্ঞেস করছে, বলুন না, কোনও মেয়ে প্রত্যাখ্যান করলে বুকের মধ্যে কী-রকম লাগে?

পরীক্ষিৎ বলল, অবিনাশ এ পর্যন্ত কোনও মেয়ের কাছে হার মানেনি। একবার যার ওপর চোখ ফেলেছে, তার আর নিস্তার নেই, শালা এমন শয়তান।

অনিমেষ বলল, যাঃ, তা কখনও হতে পারে না। এত মেয়ের সঙ্গে রোজ কাণ্ড কারখানা চললে একবার না একবার আঘাত পেতেই হবে। সব মেয়েই কি অমনি রাজি হয়ে যায়?

পরীক্ষিৎ বলল, তুই অবিনাশকে চিনিস না। ওকে কোনও ভদ্দরলোকের বাড়িতে ঢুকতেই দেওয়া উচিত নয়। ও যে-বাড়িতেই যাবে, সে-বাড়িতে যে-কোনও মেয়ে থাকলেই...সম্পর্ক যাই হোক না।

অনিমেষ মাথায় চুলের মধ্যে আঙুলগুলো ঢুকিয়ে চিরুনির মতো চালিয়ে বলল, আমি কিন্তু জানি, অন্তত একটি জায়গায় অবিনাশ হেরে গিয়েছিল। একটি মেয়ে অবিনাশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হয়নি।

অবিনাশ চুপ করে সিগারেট টানছিল, এবার মুখ তুলে তাকাল। আমার অধৈর্য লাগছিল, এরা গেলে বাঁচি! তবু আমি অনিমেষকে বললাম, অবিনাশ কোথায় ব্যর্থ হয়েছে, তা তুমি জানলে কী করে?

অনিমেষ বলল, হ্যাঁ জানি। অন্তত একটি মেয়ের কাছেও যে অবিনাশ ব্যর্থ হয়েছে, আমি সে-কথা জানি।

অবিনাশ এবার বলল, এ-সব কী হচ্ছে কী? একটা কেন, আমি বহু মেয়ের কাছেই ব্যর্থ হয়েছি। বলতে গেলে আমি সব মেয়ের কাছেই ব্যর্থ হয়েছি। কারুর কাছেই আমি কিছু পাইনি। মেয়েদের দেবার কিছু নেই। সব গুজব।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, অবিনাশ, তুই মেয়েদের কাছে কী চেয়েছিস রে, যে ব্যর্থ হয়েছিস?

অবিনাশ বলল, কী চেয়েছি, তা জানি না। তবে প্রত্যেক বারই মনে হয়েছে, চেয়েছিলাম নাক, পেলাম তার বদলে নরুণ।

তার মানে? ঠিক ঠিক মেয়ের সঙ্গে তোর এখনও দেখা হয়নি।

তুই যদি তেমন মেয়ের দেখা পেয়ে থাকিস, তাহলেই ভাল। যাকগে ও-সব কথা, অনিমেষবাবু, আপনি যা জানতে চাইছিলেন, তার উত্তরে শুনে রাখুন, অনেক মেয়ের কাছেই নেহাৎ শারীরিক সম্পর্ক পাতাতে গিয়েই আমি ব্যর্থ হয়েছি। পরীক্ষিৎ যা বলছে তা বাজে কথা, আসলে বেশির ভাগ মেয়েই আমাকে পছন্দ করে না। কেউ কেউ একবারের বেশি দু'বার পছন্দ করে না।

পরীক্ষিৎ উঠে দাঁড়াল, সোজা এগিয়ে এল অবিনাশের সামনে, তারপর রুক্ষ গলায় বলল, হারামজাদা। সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষিৎ অবিনাশের ঠিক মুখের ওপর একটা প্রবল ঘুঁষি চালাল, অবিনাশের নাকের পাশ দিয়ে গড়িয়ে এল রক্ত। অবিনাশ উঠে দাঁড়াবার আগেই আমি আর অনিমেষ ওদের মাঝখানে দাঁড়ালাম।

অবিনাশ রুমাল দিয়ে মুখ মুছল, আমাকে বলল, আমার হাত ছেড়ে দে। আমি পরীক্ষিৎকে কিছু বলব না। ওর ওপর আমার রাগ হচ্ছে না। রাস্তার একটা লোকও এ-রকম করলে এতক্ষণে তার মাথা ফাটিয়ে দিতাম, কিন্তু পরীক্ষিৎটা নেহাত বোকা বলেই ওর ওপর আমার রাগ হচ্ছে না।

পরীক্ষিৎ তখনও গজরাচ্ছিল, আমার খুবই অস্বাভাবিক লাগছিল পরীক্ষিতের ব্যবহার। এ-রকম শিশুর মতো রাগ দেখাচ্ছে কেন? কী করেছে ওর অবিনাশ? আমি জিজ্ঞেস করলাম, পরীক্ষিৎ, তুই এমন পাগলের মতো রাগ করছিস কেন?

পরীক্ষিৎ গর্জন করে উঠল, জোচ্চোর মিথ্যুকটাকে এক দিন আমি শেষ করে দেব বলে দিচ্ছি।

কী মিথ্যে কথা বলেছে অবিনাশ?

ও কেন বলেছে, ও আমাকে ব্রিজ থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল! কী ওর মতলব?

সত্যি ও ধাক্কা দিয়ে ফেলেনি? কী রে অবিনাশ?

অবিনাশ তখনও মুখ মুছছিল, কোনও উত্তর না দিয়ে হাসল। পরীক্ষিৎ বলল, মোটেই ও ধাক্কা দেয়নি, ও আমার কাছেই ছিল না। আমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম!

অনিমেষ বলল, আত্মহত্যার ব্যাপারটা খুব রোমান্টিক, না? আমার কিন্তু স্পষ্ট ধারণা ওটা একটা দুর্ঘটনা।

আমি অবাক ও বিরক্ত হয়ে বললাম, এ-সব কী হচ্ছে কী গাড়লের কাণ্ড? আত্মহত্যা, ঠেলে ফেলা, দুর্ঘটনা — যাই হোক না, ব্যাপারটা তো হয়ে গেছে এক বছর আগে। তাই নিয়ে এখন মারামারি করার কী আছে? পরীক্ষিৎ, তোকে যখন অবিনাশ ঠেলে ফেলে দেয়নি জানিস, তবু তুই কেন অবিনাশের ওপর রাগ করছিস? তাহলে তো ওর কোনও দোষই নেই।

ও বলছে কেন, ও আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে? ও মিথ্যে কথা বলছে কেন? ওর কিছু একটা মতলব আছে এ ব্যাপারে। আমি সেটা জানতে চাই।

অনিমেষ বলল, দু'একটা মিথ্যে কথা বলার অধিকার সবারই আছে। অবিনাশই-বা কেন মাঝে মাঝে দু'একটা মিথ্যে কথা বলবে না? এতে রাগের কী আছে?

অবিনাশ আবার হাসল। এবার সরাসরি পরীক্ষিৎকে বলল, পরীক্ষিৎ, আমি কি দুটো-একটা মিথ্যে কথাও বলতে পারব না এমন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম নাকি তোর কাছে? তুই মাঝে মাঝে দু'একটা মাত্র সত্যি কথা বলতে পারিস, আমিই-বা তাহলে ঠেলে ফেলার মিথ্যে কথাটা বলতে পারব না কেন? মুশকিল হচ্ছে, তোর সত্যি কথাও সবাই মিথ্যে বলে মনে করে। আসলে তুই কী বলতে চাইছিস, আমি জানি। বলেই ফেল না! তুই তো বলতে চাইছিস, অনিমেষের ওখানে গিয়ে আমি ওব বউ গায়ত্রীর সঙ্গেও কিছু একটা করেছি।

আমি চমকে উঠলাম। অবিনাশের মুখ ভাবলেশহীন। এই কথাটা আমি অন্য কোথাও শুনলে হেসে উঠতাম কিংবা একটা অশ্লীল ইয়ার্কি করতাম। কিন্তু যেহেতু নিজের বাড়িতে বসে আছি এবং নিজের বাড়িতে সকলেই কিছু না-কিছু সংরক্ষণশীল, তাই আমি বললাম, ছি, ছি, এ-সব কী বলছিস অবিনাশ? তোর মুখে কিছুই আটকায় না?

অবিনাশ অবিচলিত ভাবে বলল, কেন, এতে দোষের কী আছে? মুখের কথা তো। গায়ত্রী তো আর শুনছে না?

অনিমেষও বিচলিত হয়নি। সে বলল, আপনি কী করে জানলেন, পরীক্ষিৎ এ-কথাটাই বলতে চাইছে?

অবিনাশ বলল, পরীক্ষিতের ব্যবহারে তাই স্পষ্ট বোঝায়। অনেক দিন থেকেই ও এ-রকম একটা কথা বলতে চাইছে।

অনিমেষ বেশ সহাস্য মুখে বলল, এ-সব কথা নিয়ে বন্ধু-বান্ধবরা আলোচনা করে নাকি? মনে করুন, যদি ব্যাপারটা সত্যিও হয়, তাহলেই-বা পরীক্ষিৎ সেটা বলার জন্য ব্যাকুল হবে কেন? আমি

বুঝতে পারছি না, আপনারই-বা এত মিথ্যে কথা বলার চেষ্টা কেন, আর পরীক্ষিতেরই-বা সত্য প্রকাশ করার এত ব্যাকুলতা কীসের?

অবিনাশ বলল, সেইটাই তো আমিও বুঝতে পারছি না। আমি মিথ্যে কথা বলি এমনিই, শখ করে, কিন্তু পরীক্ষিতের তো সত্য কথা বলার সখ কোনও দিন ছিল না।

পরীক্ষিৎ এবার গম্ভীর ভাবে বলল, না, ও-কথা আমি বলতে চাইনি মোটেই। ও-সব কথা আমি কখনও ভাবিইনি। এইটাও অবিনাশের আর একটা ধাপ্পা। হঠাৎ কেন এ-কথা বলল, কে জানে।

আমি আর থাকতে পারলাম না। আমি চেঁচিয়ে বললাম, গেট আউট, সব্বাই এক্ষুনি গেট আউট। আমার আর সহ্য হচ্ছে না। আমার মাথা ধরেছে তখন থেকে, আর তোরা এখানে বসে ইয়ার্কি মারছিস। বিদায় হ এখন, ওফ!

অবিনাশ বলল, দাঁড়া না, পরীক্ষিতের সমস্যাটার একটা মীমাংসা হয়ে যাক। পরীক্ষিৎ কী চায় সেটা দেখাই যাক না। আমি যতই সরল ভাবে বাঁচতে চাইছি, পরীক্ষিৎ ততই আমাকে জড়াতে চাইছে কেন, কে জানে।

আমি বললাম, মীমাংসা করতে হয়, ময়দানে যাও। আমার ঘরে বসে ও-সব ধাঁধা-মার্কা কথাবার্তা চলবে ন। আমি মরছি নিজের জ্বালায়।

ওরা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ওদের কথা ভুলে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে এল মাধবী এবং অবনীভূষণের ব্যাপার। এগুলোও ভুলতে হবে। আমি উঠে জামাটা গায় দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম গগনেন্দ্র খোঁজ করতে।

সে-দিন সন্ধেবেলা খুব বৃষ্টি, অনেক দিন পর বৃষ্টিতে ভিজে বেশ ভাল লাগছে, মাথার মধ্যেটা পরিষ্কার, মনে হচ্ছে মাথা ধরাটাও সেরে গেছে। আর, এমন ঝরঝরে লাগছে শরীর। এই শরীর নিয়ে সন্ধেবেলা আমি কী করব? একটা কিছু করার দরকার। আর যাই করি, কোনও বন্ধু-বান্ধবের ছায়াও মাড়াতে চাই না আজ। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গ দু'এক দিন ধরে অসহ্য লাগছে। ছায়াদির বাড়িতেও যাওয়া যাবে না, ওখানে গেলেও কারুর না-কারুর সঙ্গে তো দেখা হবেই। বারীনদার ওখানে গিয়ে তাস খেলারও সেই অসুবিধে, ওখানে তো অবিনাশ থাকবেই।

শরীরটা ছটফট করছে। কিছুক্ষণ বৃষ্টির মধ্যেই ছপ ছপ করে হাঁটলাম। চৌরঙ্গির রাস্তাটা কী সুন্দর দেখাচ্ছে। ঘণ্টা খানেক ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, তাই পথে এক জনও পথচারী নেই। আমি ছাড়া গাড়িগুলো ছুটে যাচ্ছে শুধু, আর কালো পিচঢালা রাস্তা। এই রাস্তায় আমি একা, আমার সর্বাঙ্গ ভিজে, আমি চুপচাপ করে হাঁটছি। আঃ, এত ভাল লাগছে, একাকিত্ব এত সুন্দর, এমন উপভোগ্য আগে কখনও ভাবিনি। মিথ্যে মিথ্যে কী বিশ্রী হুল্লোড়ে সময় কাটিয়েছি। এক একটা রাত অবিনাশ, তাপস, গগনেন্দ্র, পরীক্ষিতের সঙ্গ — মল্লিকা কিংবা রমলার ঘরে, ও-সব কথা আর ভাবতেও ভাল লাগে না।

মাধবীকে একটা টেলিফোন করা যেতে পারে না? মাধবীকে কোনও দিন টেলিফোন করিনি, সন্ধেবেলায় মাধবীকে কেমন দেখতে লাগে তা-ও তো দেখিনি। ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে শুধু দুপুরবেলা। মাধবীর সঙ্গে অরুণা আর চিত্রলেখা নামে আরও দু'টি মেয়ে পড়তে আসত আমার কাছে। যত দিন ওরা তিন জন ছিল তত দিন ওরা শুধু ছাত্রীই ছিল, কোনও দিন ওদের মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়েও দেখিনি, এমনকী কোনও মাসে টাকা দিতে দেরি করলে ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছি পর্যন্ত। তারপর চিত্রলেখার হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল, অরুণার বাবা বদলি হলেন দিল্লিতে, তখন মাধবী একা, সেই একা মাধবীর দিকেই আমি প্রথম চোখ তুলে তাকালাম। মাধবী একা একা আমার কাছে আসেই-বা কেন? অমন বড়লোকের মেয়ে, ইচ্ছে করলে বাড়িতেই তিনটে প্রফেসার রাখতে পারে,

তবু দুপুরবেলা একা, আমার মতো ছোকরা মাস্টারের কাছে আসে কেন? তার কারণ কী, আমাকে অবনীভূষণের মতো দেখতে, সেই জন্য?

আঃ, আবার অবনীভূষণ! না, আমি অবনীভূষণের কথা কিছুতেই ভাবতে চাই না।

পার্ক স্ট্রিটের একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে সোজা কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, একটা টেলিফোন করতে দেবে?

ম্যানেজারটা চিৎকার করে বলল, করছেন কী, করছেন কী! সারা গা দিয়ে জল পড়ছে, আমার কার্পেটটা ভিজিয়ে দিলেন যে।

দোকানে বেশি ভিড় নেই, সত্যি কার্পেটটা অনেকখানি ভিজে গেছে। আমি একটু অপ্রতিভ ভাবে বললাম, হ্যাঁ, খুব ভিজে গেছি। একটা জরুরি টেলিফোন —।

টেলিফোন পরে করবেন। আগে গা মুছে ফেলুন। বেয়ারা, সাবকো একটা টাওয়েল দো।

বেয়ারা একটা ধপধপে টাওয়লে নিয়ে এল। আমি কৃতজ্ঞতায় একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লাম। পার্ক স্ট্রিটের রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার বাংলা কথা বলবে তাই-ই আশা করিনি, তার ওপর এমন সহৃদয়তা। অনায়াসে আমাকে বার করে দিতে পারত। কিছু দিন আগে এই দোকানেই তো অবিনাশ এক দিন মাড়োয়াড়ি দলের সঙ্গে হাতাহাতি করেছিল। আমিও দলে ছিলাম। ম্যানেজার আমাকে চিনতে পারেনি। আমি ওকে প্রকৃত ধন্যবাদ জানিয়ে এক কাপ কফির অর্ডার দিয়ে টেলিফোন ডিরেক্টারিটা নিলাম। যাঃ চলে, মাধবীর তো বাবা মারা গেছেন জানি, তাহলে টেলিফোনটা কার নামে? মাধবীর নামে নিশ্চয়ই নয়। ওর মা কিংবা বাবার নামে যদি হয় — জানার উপায় নেই। তবে ওদের বাড়ির ঠিকানা জানি। ইনফরমেশনের ডায়াল ঘুরিয়ে মাধবীদের বাড়ির ঠিকানা বলে টেলিফোন নম্বর জানতে খুব অসুবিধে হল না।

মাধবীদের নম্বর ঘোরালাম। ও-দিকে এক জন পুরুষ কণ্ঠ। বলুন?

আমি কোনও দ্বিধা না করে বললাম, মাধবীকে ডেকে দিন।

লোকটি যদি জানতে চাইত কে টেলিফোন করছে, তাহলে কী বলব আমি ভেবেই রেখেছিলাম। কিন্তু তা জিজ্ঞেস করল না, বলল, ধরুন। তারপর ধরেই রইলাম। বহুক্ষণ, কেউ আর আসে না। কোনও সাড়া শব্দ নেই। ছেড়ে দেব কি না ভাবছিলাম, তখন মাধবীর গলা পেলাম, হ্যালো? কে?

মাধবী, আমি মাস্টারমশাই কথা বলছি।

মাধবী একটুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর আচমকা জিজ্ঞেস করল, কোন মাস্টারমশাই?

তোমার ক'জন মাস্টারমশাই আছেন?

উপস্থিত তিন জন, ছেলেবেলা থেকে হিসেব করলে দশ-বারো জন হবেন নিশ্চয়ই।

তুমি আমাকে চিনতে পারছ না?

উঁহু।

আমি তো গলার আওয়াজ শুনেই তোমাকে চিনতে পেরেছি।

কিন্তু আপনার সঙ্গে তো আমি কখনও টেলিফোনে কথা বলিনি, তাই চিনতে পারছি না।

মাধবী, তুমি কী করছিলে?

সাজগোজ করছিলাম। এক্ষুনি সিনেমা দেখতে বেরুব।

কার সঙ্গে?

তা আপনাকে বলব কেন?

ও —।

আমি একটুক্ষণ চুপ করে রইলাম। আর কোনও কথা কি বলার আছে? মাধবীই প্রশ্ন করল, কোনও দরকারি কাজের কথা ছিল?

হ্যাঁ। মাধবী, অবনীভূষণ কে?

এই জন্য আপনি ফোন করছেন? আচ্ছা পাগল তো!

মাধবী হাসল। জলের মধ্যে কুলকুচো করার মতো টেলিফোনে সেই হাসির আওয়াজ। আমি তবু বললাম, হ্যাঁ, এ-কথাটা জানা আমার খুবই দরকার। অবনীভূষণকে আমি একবার চোখে দেখতে চাই। সে কোথায় আছে?

এক্ষুনি তা শুনতে হবে? কেন? কাল দুপুরে যাব, তখন বলব। এখন ছেড়ে দিচ্ছি, অ্যাঁ?

কেন, ছেড়ে দেবে কেন? আরও কথা আছে।

টেলিফোনে আপনি মোটেই কথা বলতে পারেন না ভাল করে। আপনার গলা কী-রকম যেন অন্য রকম শোনাচ্ছে। বরং আপনি যখন চুপ করে চেয়ে বসে থাকেন, তখন —।

তখন কী?

কিছু না।

মাধবী লাইন কেটে দিল। আমার দীর্ঘশ্বাস পড়ল না, আঘাত পেলাম না কোনও। খানিকটা অবাক লাগল। আমি যখন চুপ করে বসে থাকি, তখন কী হয়? তখন কী আমাকে অবনীভূষণের মতো দেখায়? সেই জন্যই কি আমার চুপ করে বসে থাকতেই আজকাল বেশি ভাল লাগে? আঃ, অবিনাশের কাছে অবনীভূষণের কথাটা জিজ্ঞেস করা হল না আজও।

কফিটা খেয়ে বেরুলাম। তখনও বৃষ্টি পড়ছে। গাড়ি বারান্দার নিচে একটা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে দাঁড়িয়ে। মেয়েটা চোখের পাতায় বোধহয় সবুজ রঙ মেখেছে। তাই ওব চোখের দিকে আমি দু'বার তাকালাম। মেয়েটিও আমার চোখের দিকে সোজা তাকাল। আমি তো আর চোখে রঙ মাখিনি, তবে আমাব দিকে ও তাকাচ্ছে কেন? সেইটাই জানার জন্য আমি ওর দিকে আবার তাকালাম। মেয়েটি এবার আমার দিকে একটু এগিয়ে এল, একটা ঝলমলে সোনালি রঙের গাউন পরেছে। চুলের রঙও কিছুটা সোনালি ওর, কিন্তু চেহারা রোগাটে। মেয়েটি বলল, হ্যালো মিস্টার!

আমি বললাম, কী?

স্যাডার স্ট্রিটটা কোন দিকে বলতে পারো?

আমি একটু হাসলাম। উত্তর দিলাম, এই বৃষ্টিতে পার্ক স্ট্রিটে এসে একা দাঁড়িয়ে আছ, আর স্যাডার স্ট্রিট চেনো না?

মেয়েটি আমার সঙ্গে হাঁটছিল, সে-ও হেসে বলল, আমি চিনি। দেখছিলাম তুমি চেনো কি না।

স্যাডার স্ট্রিটে তোমার ঘর আছে?

না, হোটেল রুম, দশ টাকা প্রতি ঘণ্টা।

আর তোমার?

তিরিশ টাকা, যদি এক ঘণ্টা থাকো।

তিরিশ আর দশ চল্লিশ, এক ঘণ্টা তোমার সাহচর্যের জন্য? বড় বেশি নয় কি?

ডোন্ট বি মিন।

তোমার শরীরের জন্য চল্লিশ টাকা, আর আমারও তো শরীর আছে, তার কোনও দাম নেই? তার জন্য তোমারও কিছু দেওয়া উচিত। তুমি আমাকে কত দেবে বলো?

আই উইস, আই কুড। কিন্তু তুমি তো জানো —

শুধু শুধু সময় নষ্ট করলে। আমার কাছে তোমার কোনও সুবিধে হবে না।

কেন? তোমার কাছে টাকা কম আছে? কত আছে?

টাকার জন্য নয়। আমার ভাল লাগে না।

ইয়ং ম্যান, আজ এই রকম লাভলি ওয়েদার, ডোণ্ডায়ু নিড আ কমপ্যানিয়ন?

কিন্তু তোমার কমপ্যানি আমার ভাল লাগবে না।

কেন, আমি কি দেখতে খারাপ?

না, তা নয়। তোমাদের আর আমার ভাল লাগে না। আই অ্যাম ইন লাভ।

ইন লাভ? উইথ আ বেঙ্গলি গার্ল? ডাজ সি লাভ য়ু টু?

ঠিক জানি না। আচ্ছা, আমার কী করা উচিত বলো তো? আমি একটি মেয়েকে ভালবাসি, কিন্তু সে আমাকে ভালবাসে কি না জানি না। এখন আমি কী করব?

মেয়েটি হাঁটতে হাঁটতে আমার সঙ্গে চৌরঙ্গির মোড় পর্যন্ত এসেছে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে খুবই চিন্তিত ভঙ্গি করে বলল, দেয়ার আর সেভরাল ওয়েজ। আচ্ছা, মেয়েটি তোমাকে চেনে তো? তার বাড়ি কি খুব কনজারভেটিভ?

না। মেয়েটি আমাকে চেনে।

মেয়েটি খুব সুন্দর দেখতে? সুইটলুকিং?

প্রায়।

আচ্ছা, ওকে এক দিন আলাদা তোমার সঙ্গে ডিনারে নেমন্তন্ন করো না।

আমি হঠাৎ হাসতে লাগলাম। বেশ জোরে হাসি বেরিয়ে গেল। মেয়েটি একটু আহত ভাবে বলল, হোয়াটস ফানি ইন ইট?

তোমার সঙ্গে আমার ভালবাসার কথা আলোচনা করছি। এটা ফানি নয়?

কেন, আমরা স্ট্রিট গার্ল বলে কি ভালবাসা সম্পর্কে কিছু জানি না? জানো, আমিও —।

প্লিজ, আমাকে ও-সব গল্প শুনিও না। আমি ওগুলো সব জানি।

তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না? আমিও —।

বিশ্বাস করছি, কিন্তু গল্পটা শুনতে চাই না। ও-সব গল্প এক রকম।

মেয়েটি আহত, অপমানিত মুখে চুপ করে যায়। আমার সঙ্গে একটু বৃষ্টিতে ভিজে ওর মুখের চেহারা আরও করুণ হয়ে এসেছে। তখন আর কোনও লোকের সঙ্গে দেখা হবার আশা নেই। মেয়েটি শেষ চেষ্টা হিসেবে বলে, চলো না, কাছেই তো আমার হোটেল, একটুক্ষণ গিয়ে বসবে। আর কিছু না, জাস্ট লাইক ফ্রেন্ডস। সেখানে আমরা তোমার প্রব্লেম নিয়ে আলোচনা করব? প্লিজ।

আমার কোনও প্রব্লেম নেই। তোমাকে মিথ্যে কথা বলছিলাম। আসলে আমি জানি, আমি যে-মেয়েটিকে ভালবাসি, সে অন্য একটি ছেলেকে ভালবাসে।

স্যাড। কিন্তু এ নিয়ে তোমার বেশি দিন দুঃখ করার কোনও মানে হয় না।

নাঃ বেশি দিন করব না।

তোমার নাম জানতে পারি? আমার নাম মার্থা হে, এম সি হোটেলে থাকি।

আমার নাম অবনীভূষণ রায়। আমার দুঃখ কেটে গেলে তোমার সঙ্গে এসে দেখা করব।

পরদিন দুপুরে মাধবী এল না, এরপর এক সপ্তাহের মধ্যে আর এল না, কোনও খবরও পাঠাল না। মাধবী না আসায় এক হিসেবে আমি খুশিই হয়েছি। হঠাৎ বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম কাল

সন্ধে থেকে, মাধবীর সামনেও হয়তো উত্তেজনা প্রকাশ করে ফেলতাম। হয়তো মাধবীকে বলে ফেলতাম, তোমাকে আমি ভালবাসি। ও-কথা বললে খুবই খারাপ হত, ও-কথা বলা যায় না, মাধবীকে এখনও বলা যায় না। আসলে মাধীবকে আমি ভালবাসি কি না সত্যিই তো জানি না। মাধবীর সামনে শুধু একা বসে থাকতে ইচ্ছে হয়। এর নাম কি ভালবাসা? না, এখনই ভালবাসার কথা বলা যায় না। তার আগে, অবনীভূষণের সমস্যা আমাকে দূর করতে হবে।

মাধবী আসেনি, কিন্তু আমি জানি মাধবীর সঙ্গে আমার আবার দেখা হবেই। আমি যা চাই, তা চিরকালই পেয়ে থাকি। যা পাব না কখনও, তা আমি আগে থেকেই জানতে পারি। তা পেতেও চাই না আমি। চেয়ে ব্যর্থ হওয়া আমার স্বভাব নয়। সূর্যকে যে আমার ঘরের মধ্যে বন্দি করে রাখিনি, তার কারণ, আমি কখনও তা চাইনি বলে। যে-দিন আমি চাইব, সে-দিন শালা সূর্যকেও আমার ঘরে আসতে হবে। আপাতত, আমি মাধবীকে চাই কি না ভাবিনি, ওর ভালবাসা চাই কি না ভাবিনি, আমি ওকে দেখতে চাই। জানি ওর সঙ্গে দেখা হবেই। অবনীভূষণকেও ঠিক আমি দেখতে চাই কি না জানি না, হঠাৎ অবনীভূষণকে দেখলে আমার কী অবস্থা হবে তা-ও বুঝতে পারছি না। আমার মুখোমুখি যদি আমারই মতো দেখতে আরেক জন মানুষ দাঁড়ায়, তবে সে-দৃশ্য তো ভয়াবহ। হয়তো ওকে আমার মতো দেখতে নয়, কোনও একটা ভঙ্গি বা মুখের রেখা, কিংবা অভ্যেসের মিল আছে, আর কিছু না। অবনীভূষণ বেঁচে আছে কি না, তা-ও জানতে হবে। অবিনাশের কাছে কিছুই জানা গেল না। এর মধ্যে অবিনাশের সঙ্গে এক দিন দেখা হল। কী ভয়ঙ্কর চেহারা সে-দিন অবিনাশের। কোথাকার কোন পার্টি থেকে ফিরছিল, সঙ্গে দু'জন অচেনা লোক ওর দু'হাত ধরে আছে, ধর্মতলায় অবিনাশের সঙ্গে আমার রাত সাড়ে দশটায় দেখা। অবিনাশ তখনও বদ্ধ মাতাল। চোখ দুটো টকটকে লাল, মাথার চুল হাতের মুঠোয়, অসম্ভব করুণ মুখখানা। যেন নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর। অবিনাশ আঃ আঃ করে আওয়াজ করছিল আর্তনাদের মতো, অথচ তখন ওর বেশ জ্ঞান আছে। আমাকে দেখে অবিনাশ জড়িয়ে ধরল, বলল, শেখর, আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে। আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে রে।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, বেশি খেয়ে ফেলেছিস?

ও বলল, না না, বেশি খাইনি। আমার বুকের মধ্যে কষ্ট হচ্ছে।

কীসের কষ্ট?

তা জানি না। আঃ, আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে যে। বেশি মদ খেয়েছি তো, তাই কষ্টের কথা বলতে পারছি, অন্য সময় তো বলতে পারি না!

কেন, কষ্ট হচ্ছে কেন?

তাই তো জানি না। দ্যাখ শেখর, আমি বার বার জীবনে ফিরে যাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না। সেই জন্যই কি আমার কষ্ট হচ্ছে? কী জানি! চল, তুই একটু খাবি!

না!

তুই আজকাল আর খেতে চাস না কেন রে?

আমার আর ভাল লাগে না।

তোর তো কোনও কষ্ট নেই, তুই আর খাবি না কেন?

তুই কি কষ্টের জন্য মদ খাস নাকি? দেবদাস হচ্ছিস?

উঁহুঁ, ও-সব মেয়েছেলের জন্য কষ্ট নয়, অন্য রকম, ওঃ!

অবিনাশকে এ-রকম কাতর কখনও দেখিনি। অবিনাশ আরও মদ খাবার জন্য পেড়াপিড়ি করে। আমি ওর হাত ছাড়িয়ে চলে যাব ঠিক করেই, হঠাৎ সেই কথাটা মনে পড়। জিজ্ঞেস করলাম, তুই মাধবী সান্যালকে চিনিস?

অবিনাশ বলল, কে মাধবী? তোর কাছে যে-মেয়েটা পড়তে আসে। হ্যাঁ, খুব ফাইন মেয়ে, একটু মোটার ধাঁচ, কিন্তু বুক দুটো কী চমৎকার।

ও-সব বাজে কথা রাখ। তুই ওর বন্ধু অবনীভূষণ বলে কারুকে চিনিস?

অবনীভূষণ? টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরিতে আবার এ-রকম নাম হয় নাকি? কেন? তাকে চিনে কী হবে?

না, এমনিই। মাধবী প্রায়ই বলে, আমি নাকি অবনীভূষণের মতো দেখতে।

তাই বলে নাকি? আশ্চর্য তো! সত্যিই তো, তোকে অবিকল অবনীভূষণের মতই তো দেখতে! মাইরি শেখর, বিশ্বাস কর, অবিকল, হুবহু অবনীভূষণের মতোই তোকে — হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ!

মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে অবিনাশ গলা ফাটিয়ে মাতালের হাসি হাসতে থাকে। আমি ওর হাত ছাড়িয়ে সোজা চলে এসেছিলাম সে-দিন।

ক'দিন থেকেই ছায়াদির অসুখ শুনছিলাম, অনেক দিন ওদের বাড়িতে যাইনি। কলেজের ছুটিও ফুরিয়ে এল, আর ছুটি নেওয়া যাবে না। কলেজটা ছাড়তে হবে এবার, সকালবেলা গিয়ে পড়ানো আমার দ্বারা আর সম্ভব হবে না। কোনও দিন রাত্রে ভাল ঘুম হয় না, সকালবেলা দশটার মধ্যেই ঘুম থেকে উঠে তাড়াহুড়ো করে কলেজে ছুটতে একেবারেই ইচ্ছে করে না।

সকালে চা খেয়েই একবার ছায়াদির বাড়িতে ঘুরে এলাম। গায়ত্রী বারান্দায় রোদ্দুরে বসে ছেলেকে অলিভ অয়েল মাখাচ্ছিল। অনিমেষরা তাহলে এখনও যায়নি। একটা হলদে রঙের শাড়ি পরে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে গায়ত্রী ছেলেকে তেল মাখাচ্ছে। বেশ দেখাচ্ছে ওকে, মহিমাময়ী মাতৃমূর্তি। গায়ত্রী আমাকে দেখে বলল, অনেক দিন আপনাকে দেখিনি। একটু রোগা হয়ে গেছেন!

আমি বললাম, আপনি তো অনেক রোগা হয়ে গেছেন! গায়ত্রী লজ্জিত ভাবে হাসল। অয়েল ক্লথের ওপর শুয়ে ছেলেটা খল খল করে হাসছিল। সে-দিকে তাকিয়ে আমি আলগা ভাবে বললাম, ভারি সুন্দর দেখতে হয়েছে আপনার ছেলেকে! গায়ত্রী এবারও হেসে ছেলেকে বুকে তুলে নিল। কথাটা আমি এমনিই বলতে হয় বলেই বলেছি। ওইটুকু একটা বাচ্চা, নাক চোখ কিছুই ভাল করে ফোটেনি, ওকে আবার দেখতে সুন্দর আর কুৎসিত কী? যখন বড় হবে, পৃথিবীতে নিজের জায়গা করে নিতে পারবে, তখনই বুঝব, বাছা মুখের ওপর সুন্দরকে রাখতে পারে, না মুখখানা ভূতের মতো বানিয়ে তুলবে। ছেলেকে বুকে তোলার গায়ত্রীকে একেবারে ছবির মাতৃমূর্তির মতো সুন্দর দেখাচ্ছে। হঠাৎ মনে হল, মা হবার পরেও সেই মেয়ের সঙ্গে পুরুষরা এক বিছানায় শোয় কী করে? দেখলেই তো ভক্তি আসে, তখন আর ও-সব ব্যাপার —। যাকগে, এ তো আর আমার সমস্যা নয়। গায়ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, অনিমেষ কোথায়? ও বলল, অনিমেষ একটু বেরিয়েছে।

সাদা চাদর ঢাকা দিয়ে ছায়াদি শুয়ে ছিল। ছায়াদির মুখের ভাব এমন, যেন কোনও গুরুতর অসুখ হয়েছে। আসলে ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়তো। শীর্ণ হেসে হাত বাড়িয়ে ছায়াদি বলল, এসো শেখর, বসো। না না, বিছানায় বোসো না, ওই চেয়ারটা টেনে নাও।

কেন, বিছানায় বসব না কেন?

এ-সব অসুখ বড় ছোঁয়াচে।

আমি একটু হেসে বিছানাতেই ছায়াদির পায়ের দিকে বসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আজ, ছায়াদি?

অপ্রত্যাশিত ভাবে ছায়াদি উত্তর দিল, ভাল আছি। খুব ভাল আছি এখন। খুব ভাল লাগছে।

জ্বর ছেড়ে গেছে?

না, সকালেই আবার জ্বর এসেছে। সেই জন্যই ভাল লাগছে। অসুখ হলেই আমার ভাল লাগে। অন্য সময় কী-রকম যেন ঠিক বুঝতে পারি না।

চাদরের বাইরে ছায়াদির পা বেরিয়ে ছিল। আমি একটা হাত ছায়াদির পায়ে বোলাতে লাগলাম। বরফের মতো ঠাণ্ডা পা। জ্বর-টর কিছু নেই। তবু ছায়াদি কেন বলল, একটু আগেই ওর জ্বর এসেছে? কেন যে লোকে অকারণে মিথ্যে কথা বলে! আমি হাতটা সরিয়ে নিলাম।

ছায়াদি হঠাৎ হাসতে লাগল। বলল, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যাকে খুঁজছ, সে নেই।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কে নেই? কাকে খুঁজছি আমি?

ছায়াদি সেই রকমই মুখ টিপে হেসে বলল, মায়া পরশু দিন মামার বাড়িতে গেছে।

আমি মায়াকে খুঁজব কেন?

সবাই তো আজকাল এ বাড়িতে এসে মায়াকেই খোঁজে। আমি বুড়ি হয়ে গেছি, আমাকে দেখতে বিচ্ছিরি, আমার সঙ্গে আর কে কথা বলতে চায় বলো! মায়া কিন্তু তোমাদের কাউকে পাত্তা দিতে চায় না। লেখক-টেখকদের সে একদম পছন্দ করে না।

শুনে সত্যিই দুঃখিত হলাম।

আমার অসুখ শুনেই তবু যা হোক এলে। তাই তো বললাম, অসুখ হলেই আমি ভাল থাকি। তাপস তো অসুখ শুনেও এক দিনও এল না।

কী ব্যাপার, তাপসের নামে যেন গলাটা ছল ছল কবে উঠল?

মোটেই না। তাপসকে আমি মোটেই গ্রাহ্য করি না। সে-ও অবশ্য আমরা কথা কখনও ভাবে না।

বিমলেন্দু আসে?

রোজ। সে তোমাদেব মতো অমন দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলে নয়।

ছায়াদির মুখে তাপসের নাম শুনেই মনে পড়ল, অনেক দিন আমারও তাপসের সঙ্গে দেখা হয়নি। আজ দেখা করলে মন্দ হয় না। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, ছায়াদি, আমি তাপসের কাছেই যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে দেখা করতে বলব নাকি?

না না।

তাপসের মেসে দেখি, তাপস জামা কাপড় নিয়ে হুলুস্থুলু কাণ্ড বাধিয়েছে। ওর রুমমেট রামহরিবাবুর একটা প্যান্ট গলিয়ে ও কিছুতেই সেটা ম্যানেজ কবতে পারছে না। বামহবিবাবুর কোমর বিষম মোটা, আর তাপসের কোমর না খেয়ে খেয়ে মেয়েদের মতো সরু। বামহরিবাবুর প্যান্ট ওর লাগে কখনও? যে-জামাটা তাপস গায়ে দিয়েছে, সেটারও পুট নেমে এসেছে প্রায় কোমর পর্যন্ত। তাপসের বিব্রত মুখের দিকে তাকিয়ে আমি হেসে ফেললাম। বলালম কী ব্যাপাব? কোথায় জয়যাত্রায় যাচ্ছিস?

বিরক্ত মুখে তাপস বলল, রেডিয়োতে একটা চাকরির ইন্টারভিউ পেয়েছি। চিঠিটা আজই সকালবেলা এসেছে, আজই সাড়ে বারোটায় ইন্টারভিউ। এর কোনও মানে হয়? একটাও ফর্সা জামা কাপড় নেই আমার।

রামহরিবাবু এমন কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছেন, যেন ওঁর জামাপ্যান্ট তাপসের গায়ে না-লাগলে তাঁরই দোষ। আহা, লোকটি বড় ভাল। আমি তাপসকে বললাম, যাঃ, ওই রকম হাস্যকর পোশাক পরে কেউ ইন্টারভিউতে যায়? নিজের যা আছে, তাই-ই পরে যা।

নিজের কী আছে? কচু আছে? এক পেয়ার লন্ড্রিতে দিয়েছি, আর ওই তো যেটা কাল পরেছিলাম।

সেটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। খাটের পাশে ওর প্যান্টটা তালগোল পাকানো অবস্থায় পড়ে আছে, সেটা ভর্তি যে দাগ, তা মাংসের ঝোলের কিংবা বমির। বললাম, জামা কাপড় লন্ড্রিতে পাঠাস কেন? বাড়িতে কাচতে পারিস না?

তাপস খেঁকিয়ে উঠল, যাঃ, যাঃ ফোঁপর দালালি করতে হবে না।

তা বলে ওই পাঁচটা সেফটিপিন লাগানো প্যান্ট পরে ইন্টারভিউ দিতে যাবি।

তাহলে কী করব?

যাবার দরকার কি ইন্টারভিউ দিতে? ও-চাকরি তো পাবিই না। আজ ইন্টারভিউ, আজই সকালে যদি চিঠি আসে তার মানে বুঝিস না? ও-চাকরি তোর হবে না।

হবে না মানে? চালাকি বার করে দেব। তোরা শালারা প্রফেসারি-ট্রফেসারি জুটিয়ে খুব হেরফের দেখাচ্ছিস। এবার দ্যাখ, আমিও রেডিয়োর চাকরি পাচ্ছি, একবার রেডিয়োর মাইকটা হাতে আসুক, সারা দেশে বিপ্লব ডেকে আনব। আমার যা কিছু কথা আছে রেডিয়োতে এক দিন ঘোষণা করে দেব।

আমার পরনের প্যান্টটা কিছুটা পরিষ্কার ছিল, সেইটাই তাপসকে আমি খুলে দিলাম। তাপসের মোটামুটি লেগে গেল। বাধ্য হয়ে তাপসের বমি মাখানো প্যান্টটা আমাকে পরতে হল। গা ঘিন ঘিন করছে আমার।

তাপস ব্যস্ত হয়ে পাগলের মতো ছোটাছুটি করছে ঘরের মধ্যে। আর বেশি সময় নেই, ঠিক পৌঁছুতে পারবে কি না সন্দেহ।

তাপসের খুবই দেরি হয়ে গেছে, ঠিক সময় পৌঁছুতে গেলে ওর বোধহয় ট্যাক্সি করে যাওয়া দরকার। কিন্তু সে-কথা ওকে বলতে আমার সাহস হল না। তাহলে নিশ্চয়ই আমার কাছেই ট্যাক্সি ভাড়া চাইবে। একেবারে জাত ভিখিরি তো, টাকা চাইতে একটুও লজ্জা নেই। নেহাৎ বাধ্য হয়েই ওকে আমার জামাটা খুলে দিতে হল। ওর বিকট ময়লা, বমির দাগধরা জামা-প্যান্ট পরে এখন আমার মনে হচ্ছে, তাপসের এখানে আজ না এলেই কত ভাল হত। কেন যে মরতে এখানে এলাম।

তাপসকে জিজ্ঞেস করলাম, তোর খাওয়া হয়ে গেছে তো?

জুতোর ফিতে বাঁধছিল তাপস, বলল, না,

তাহলে এখন আব তো সময় নেই।

দুপুরে কিছু খেয়ে নেব।

তাহলে আজ আর কিছু খাওয়া হল না তোর। এ-সব ইন্টারভিউ-এর ব্যাপার তো জানিস না। ঘণ্টা চার-পাঁচ বাইরে ঠায় বসিয়ে রাখবে।

তাহলে খাব না! একেবারে চাকরিটা পাবার পর খাব। তখন দেখিস কী-রকম খাই। জানিস শালা, আমারও খুব শখ তোদের মতো সকালে চায়ের সঙ্গে রোজ ডিম আর মাখন টোস্ট খাওয়ার। আমারও ইচ্ছে করে মাঝে মাজে ভাতের বদলে স্যান্ডউইচ খেতে। দ্যাখ না, একবার চাকরিটা পাই।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, এখন চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

একটুও কৃতজ্ঞতো বোধ নেই তাপসের। আমার জামা-প্যান্ট পরার পর ওর চেহারাটা মোটামুটি ভদ্রই দেখাচ্ছিল। চুল আঁচড়ানো শেষ করার পর অকস্মাৎ ও আমার দিকে তাকিয়ে অসভ্যের মতো হ্যা-হ্যা করে হাসতে লাগল। বলল, তোকে কী বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে, শেখর!

আমি রেগে গিয়ে বললাম, তা তো দেখাবেই, ভিখিরির পোশাক পরলে তাই দেখাবে না?

সত্যি মাইরি, তোর মতো শৌখিন ছেলে, সব সময় ফিটফাট থাকিস, তোকে এ-রকম পোশাকে কখনও দেখিনি। একেবারে অন্য রকম দেখাচ্ছে।

আমার আবার নতুন করে গা ঘিন ঘিন করতে লাগল। বিরক্ত হয়ে বললাম, তোদের যা কাণ্ড। তুই তো ইন্টারভিউতে যাচ্ছিস, আমি এখন কী করে বাড়ি যাই?

তুই এখানে বসে থাক না। আমি ফিরে এলে —।

তোর এই বিচ্ছিরি ঘরে আমি ততক্ষণ বসে থাকব?

তাহলে ট্যাক্সি করে বাড়ি চলে যা।

কী অনায়াস ভাবে তাপস বলল। ও যাচ্ছে ইন্টারভিউ দিতে, তার জন্য আমাকে ট্যাক্সি ভাড়া খরচ করতে হবে? একটুও ওর লজ্জা নেই পর্যন্ত। তাপসের সঙ্গে আমিও বেরিয়ে এলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একটু কৈফিয়তের সুরে তাপস বলল, জামাটা তো কাল নষ্ট হল পরীক্ষিতের জন্য, এমন গায় বমি করে দিল কাল!

কোথায়? রোজ রোজ এত —।

কে জানে কোথায়? আমার সঙ্গে রাস্তায় দেখা, তখন লটপট করছে।

থাক, ও-সব আর আমি শুনতে চাই না।

শোনারও কিছু নেই। সেই তো একঘেয়ে ব্যাপার। কত নম্বর বাসে উঠব বলতো? তিন নম্বর, তিন নম্বরই অনেকটা কাছাকাছি যাবে।

ওই সময় ট্যাক্সি পাওয়াও অসম্ভব। সুতরাং তাপসকে ট্যাক্সি চড়ে যেতে বললেও কোনও লাভ হত না, এমনকী আমি ভাড়া দিয়ে দিলেও না। ওর সঙ্গে বাস স্টপে এসে দাঁড়ালাম। মনে হল রাস্তার সব লোক যেন আমার পোশাকের দিকে তাকাচ্ছে আর অবাক হয়ে যাচ্ছে। বাসে ওঠার আগে তাপস বলে গেল, তুই আমার জামা-প্যান্টটা কাচিয়ে রাখিস। আমি তোর এগুলো এখন তিন-চার দিন পরব।

তাপসের বাস চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা খালি ট্যাক্সি চোখ পড়ল। আমি ট্যাক্সিটা ডাকলাম। একবার মনে হল, বাসের পরের স্টপে তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি ছুটিয়ে গিয়ে তাপসকে ডেকে নামানো যায়, তারপর ওকে রেডিয়ো স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসাই আমার উচিত। কিন্তু সে-ইচ্ছেও বদলে গেল। ভাবলাম, এত বেশি বন্ধুত্ব দেখাবার কোনও দরকার নেই। জামা-প্যান্ট খুলে দিয়েছি তাই যথেষ্ট, আর কী চাই? এখন বন্ধু-বান্ধবদের থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতেই আমার মন চাইছে।

ট্যাক্সি নিয়ে সোজা বাড়িতেই চলে এলাম। আমার বাড়ির সামনে একটা সাদা রঙের গাড়ি। গাড়িটা দেখেই বুকটা কেঁপে উঠল। এ আমার চেনা গাড়ি। বাইরের ঘরের মাধবী বসে আছে। হালকা গোলাপি রঙের শাড়ি পরা, মাথার চুল সব খোলা, পিঠ ভর্তি ওর কোঁকড়া চুল। মাধবীকে দেখে হঠাৎ আমার বুক অভিমানে ভরে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এ ক'দিন আসোনি কেন?

আমাকে দেখেই মাধবী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। আমার সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে গেল। চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময় ও প্রশ্ন, কিন্তু সে-সব কিছু বলল, না। বলল, হ্যাঁ, আসা হয়নি।

বনেদি ঘরের মেয়ে তো, মনে এলেও সব কথা মুখে বলে না। পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে এ ধরনের প্রশ্ন তো করবেই না। সকালের দিকেই আমার এ ধরনের পোশাক দেখলে, যে-কারুরই মনে হবে, আমি সারা রাত বাড়ির বাইরে কোথাও বেলেল্লা সেরে এখন ফিরছি। কিন্তু মাধবীর সামনে চায়ের কাপ ও খাবারের প্লেট, অর্থাৎ বাড়ির কেউ নিশ্চয়ই ওর সঙ্গে দেখা করে বলেছে যে আমি সকালেই বেরিয়েছি। কিন্তু এই রকম পোশাক পরে তো আমি বেরুতে পারি না, এবং এই সাত সকালেই কি আমি বেরিয়ে মদ গিলে বমি টমি সেরে ফেলেছি? কিংবা অন্য কোনও অসুখে বমি — যে কারুরই এ সম্পর্কে কৌতূহল হয়। যে-কেউ আমাকে দেখলে বলত, কী ব্যাপার? জামায় ও কী? কিন্তু মাধবী তা বলবে না কিছুতেই, মাধবী বার বার আমার পোশাকের দিকে তাকাল, নির্লিপ্ত গলায় বলল, হ্যাঁ, আসা হয়নি।

আমি ফের বললাম, তুমি এ ক'দিন আসোনি কেন?

মাধবী বলল, আসিনি। আমি আর আসতেও পারব না।

শুনে আমার বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। মাধবী আর আসবে না? কেন? ওর বিয়ে হয়ে যাবে? কার সঙ্গে, সেই অবনীভূষণের সঙ্গে? না। তা হতেই পারে না। কিন্তু আমি কোনও প্রশ্ন করতে পারলাম না। মাধবীকে তো আমি এ পর্যন্ত অন্য কোনও কথাই বলিনি, যা বলেছি সবই আমার মনে মনে। অবনীভূষণ কে? এ-কথাও মাধবীকে এ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করতে পারিনি। অধ্যাপক-ছাত্রী ছাড়া অন্য কোনও সম্পর্ক তো মাধবীর সঙ্গে আমার হয়নি।

কণ্ঠস্বর যেন বিচলিত না হয় — এই জন্য আমি সিগারেট ধরিয়ে মুখের ভঙ্গি যথাসম্ভব নির্বিকার রেখে বললাম, এ-কথাই বলতে তুমি এসেছিলে?

হ্যাঁ।

তুমি পড়াশুনো ছেড়ে দিচ্ছ?

না।

সংক্ষিপ্ত এক অক্ষরের উত্তর। মাধবী যেন চাইছে, আমি ওকে খোলাখুলি প্রশ্ন করি। নইলে ও কিছুই বলবে না। কিন্তু এ-কথাও বুঝতে পারলাম, মাধবী পড়াশুনা ছাড়বে না, কিন্তু আমার বাড়িতে এসে আর পড়বে না। এর একটাই মানে হয়, প্রাইভেট টিউটর হিসাবে আমাকে বরখাস্ত করছে। বরখাস্ত করছে কোনও কারণ না দেখিয়ে, এক কথায়। এরপর আর আমার কোনও কথা বলা চলে না। এরপর, অন্য যে-কোনও কথা বলার মানেই হল, আমি চাকরি হারাবার জন্য দুঃখিত হয়েছি। মাধবী আমাকে আড়াইশো টাকা মাইনে দিত, সোজা কথা নয়। এখন যদি বলি, মাধবী, তোমাকে না দেখলে আমার খুব কষ্ট হবে, তাহলে সে-কথার সবাই মানে করবে, প্রতি মাসে আড়াইশো টাকা হারাবার কষ্ট। যদি ওকে এখন প্রেম জানাতে চাই, তাহলে সেটারও মানে হবে ও যেন আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত না করে, সেই চেষ্টা করছি। কেন মাধবীকে আগে থাকতেই ভালবাসার কথা বলে রাখিনি? এখন আর উপায় নেই। সুতরাং মাধবীকে আমি বিদায় দেবার ভঙ্গি করে বললাম, আচ্ছা, মন দিয়ে পড়াশুনো কোরো। সন তারিখ তোমার প্রায়ই ভুল হয়, ওটা লক্ষ্য রেখো।

মাধবী তবু না গিয়ে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপব বলল, আমি এখানে আসতে পারব না। আপনি বাড়িতে এসে পড়াতে পারবেন?

এখানে প্রশ্ন করা উচিত, কাদের বাড়িতে? ওর যদি বিয়ে হয এবং তখনও পড়তে চায, তখন কোন বাড়িতে? বিয়ের পরও কি ও নিজের বাড়িতেই থাকবে — না, অন্য বাড়িতে? কিন্তু আমি ওকে কোনও প্রশ্ন করব না ঠিক করেছি, কিছু জানাব না, তাহলেই তার অন্য মানে হবে। সুতরাং আমি বললাম, না, অন্য কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমাদের বাড়িতে আসতে পারবেন না? সপ্তাহে অন্তত দু'দিন?

না।

কেন?

এমনিই। আমার ভাল লাগবে কি না বুঝতে পারছি না।

হ্যাঁ, আপনার ভাল লাগবে। আসবেন?

এবার মাধবী ওর নির্লিপ্ততার আবরণ একটু সরিয়েছে। একটু যেন জোর দিয়ে কথা বলতে চাইছে। তবু আমি বললাম, আচ্ছা, ভেবে দেখি। পবে তোমাকে জানাব।

মাধবী দরজার কাছে পৌঁছেছিল, ওকে বিদায় দেবার জন্য আমি এগিয়ে এলাম। এবং একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে, আগের মুহূর্তেও ভাবিনি, মুখ ফসকে আমার মুখ দিয়ে একটা প্রশ্ন বেরিয়ে গেল, মাধবী, অবনীভূষণ কে?

মাধবী ফিরে দাঁড়াল। এক মুখ হাসিতে ওর মুখটা ঝলমলে হয়ে উঠল। হাসতে হাসতেই বলল, অবনীভূষণের কথা আপনাকে পেয়ে বসেছে দেখছি। এত ভাবছেন কেন?

অবনীভূষণ কে?

কেউ না, এক জন মানুষ। অবনীভূষণ সেনগুপ্ত। আপনাকে দেখে তার কথা মনে পড়েছিল আমার। আপনি অনেকটা তার মতো।

আজ, এই পোশাকেও কি আমাকে অবনীভূষণের মতো দেখাচ্ছে?

হ্যাঁ। আজও আপনাকে প্রথম দেখেই তার কথা মনে পড়েছিল।

মনে পড়েছিল মানে? সে এখন কোথায়?

সে-কথা আজ বলব না।

আজ নয়, তবে আর কবে বলবে!

আবার যখন দেখা হবে। আবার কবে দেখা হবে তা তো আপনার ওপরেই নির্ভর করছে। আজ যাই।

মাধবী আর একটু বসো। তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলব।

আজ নয়। আজ বাড়ি থেকে অনেকক্ষণ বেরিয়েছি। মাকে বলে এসেছি তাড়াতাড়ি ফিরব। এখন যাই।

তুমি আমার বাড়িতে আর আসবে না কেন?

সে-কথাও আজ বলব না। যদি আমার বাড়িতে আসেন — আজ হঠাৎ এত প্রশ্ন করছেন কেন?

না, আর প্রশ্ন করব না। তুমি যাও।

মাধবী গিয়ে গাড়িতে উঠল। আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার বুক থেকে পাষাণভার নেমে গেছে। এ-কথা তো অবধারিত যে, মাধবীর সঙ্গে আবার আমার দেখা হবেই। হবেই, কেননা, আমি মন থেকে তাই-ই চেয়েছি। দেখা হলে মাধবীকে আর কোনও প্রশ্ন করব না, কোনও কথা জানাবও না।

মাধবী আমাকে যে-দিন বলেছে, আমাকে অবনীভূষণের মতো দেখতে, সে-দিন থেকেই আমি বদলাতে শুরু করেছি। আমি অন্য রকম হয়ে যাচ্ছি। সত্যি সত্যি অবনীভূষণের মতন কি না, তা অবশ্য জানি না। তাকে তো আমি চিনিই না। কিন্তু এ-কথাও ঠিক, আমি এখন শেখরও ঠিক নই। কে তবে আমি!

ফিরে এসে চটপট স্নান সেরে, আমার সব চেয়ে শৌখিন পোশাক পরে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালাম। মাধবী এতক্ষণে বাড়ি পৌঁছে গেছে। স্নান সেরে মাধবীও কী আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে? অবনীভূষণ কি বেঁচে আছে? যদি বেঁচে থাকে, তবে ও কি এখন মাধবীদের বাড়িতে? ছোকরা কী-রকম, খুব চালিয়াৎ কি না কে জানে! ব্যাকব্রাশ-করা চুল, পরিচ্ছন্ন চেহারার অবনীভূষণ মাধবীদের বাড়ির দো-তলার ব্যালকনিতে বসে ইয়ার্কি করছে — এই ছবিটা মনে এল। কী ধরনের রসিকতা ও করে, ঠিক ভেবে পেলাম না। আকাশ থেকে এক ঝলক আলাদা রোদ মাধবীর জন্য এসে ওর পায়ে লুটোচ্ছে। মাধবীর পায়ে হরিণের চামড়ার চটি। অবনীভূষণ নিশ্চিত সিল্কের পাঞ্জাবি ও পায়জামা পরে আছে। মুখে সিগারেট না পাইপ? এমনও হতে পারে, অবনীভূষণ সত্যিই বেঁচে নেই। ও বেঁচে আছে না মরে গেছে, কিছুতে বুঝতে পারি না। যদি বেঁচে থাকে তবে, আপনাকে অবনীভূষণের মতো দেখতে, এ-কথা বলেই মাধবী চুপ করে যায় কেন? আমার কাছে সম্পূর্ণ অজানা একটি লোকের নাম বলে, তার পরিচয় না বলার কী কারণ থাকতে পারে — দুঃখের স্মৃতি ছাড়া! যদি বেঁচে

থাকে, তবে সে কোথায় ? এক দিন মাধবীর গা শুঁকে দেখতে হবে, ওর গায়ে অবনীভূষণের গন্ধ আছে কিনা। না না, বেঁচে থাকো, তুমি বেঁচে থাকো অবনীভূষণ, আমি চাই তুমি বেঁচে থাকো। জীবিত লোককে পরাজিত করা সোজা। যদি মরে গিয়ে থাকে, তবে মাধবীর বুক থেকে ওর দাগ কোনও দিন উঠবে না।

সারা শরীর আবার ব্যথা ব্যথা করছে। সারা দিন ঘর থেকে বেরোলাম না। বিকেলেও তিন জন বন্ধু এল, প্রত্যেকের নিজস্ব ধরনের অনেক কথা বলে গেল। যাবার সময় আমাকে ডেকে নিয়ে গেল না। বাড়িতে একা পড়ে রইলাম। নিজে থেকে কোথাও যেতে ইচ্ছে হল না। ক্রমশ একা হয়ে যাচ্ছি। ভালই, যত আমি একা হব, তত আমি মাধবীর কাছাকাছি যাব। অনেক হুল্লোড় করেছি, এখন স্নেহছায়া চাই। ইচ্ছে করে মাধবীর চোখের সামনে পা ছড়িয়ে বসে থাকি। মাধবীর দৃষ্টি ঝরনার জলের মতো। মনে পড়ে, অনেক দিন আগে সাঁওতাল পরগনায় একটা ছোট্ট ঝিরঝিরে ঝরনার সামনে অনেকক্ষণ একা বসে ছিলাম। বসে ছিলাম রাখাল বালকের মতো। হাতে বাঁশি ছিল না, পরনে কর্ডের প্যান্ট ও মুখে চুরুট ছিল, তবু রাখাল বালকের মতো, এ-কথায় কোনও ভুল নেই। প্রায় তিন ঘণ্টা বসে ছিলাম, চুপ করে, নিজের সঙ্গেও কথা বলিনি, এক লাইন গান গাইনি। আমার স্মরণকালে সেই একমাত্র চুপ করে বসে থাকা। মাধবীর সামনে ওই রকম চুপ করে বসে থাকতে ইচ্ছে হয়। চুপ করে বসে থাকলে, এক দিন না এক দিন আমাকে ঠিক আমারই মতো দেখাবে।।

নবজাতক

॥ ১ ॥

এক নিদারুণ রৌদ্রতপ্ত দিনে বাঁকুড়া জেলার দু'টি গ্রামের মধ্যবর্তী প্রান্তরে একটি অশ্বত্থ গাছের নিচে জেগে উঠলেন বোধিসত্ত্ব। তখন ঠিক মধ্যাহ্ন। তিনি চোখ মেলে প্রথম দেখলেন সেই বিশাল ও দুর্ধর্ষ গাছটিকে এবং তার ওপরের আকাশ। প্রথমেই তাঁর মনে হল, এই বিশ্বে আর কিছু নেই, শুধু সীমাহীন আকাশের নিচে এই এক প্রবল প্রতাপান্বিত মহীরুহ — যার শাখা-প্রশাখা, ঝুলন্ত শিকড় আর পাতলা সবুজ রঙের অসংখ্য পাতায় বেঁচে থাকার এক প্রমত্ত শক্তির প্রকাশ সব সময় ঝলসাচ্ছে। আর তার নিচে শয়ান এক জন মানুষ। তিনি।

যদিও বাতাসে অদৃশ্য আগুনের হলকা ছুটোছুটি করছে, আকাশ এমন ঝাঁঝালো যে সে-দিকে চোখ রাখা যায় না, তবু তিনি একটি তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললেন। তিনি দেখতে লাগলেন অশ্বত্থ পাতার খেলা। ডালপালার মধ্য দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে হাওয়া, একদল পাতা নাচানাচি করছে খুব, আর একদল পাতা চুপ করে দেখছে। এর মধ্যে উড়ে এসে বসল দু'টি কাক। সদাব্যস্ত ভঙ্গিতে এ-দিক ও-দিক মাথা ঘুরিয়ে তারা ডাকল, কা, কা —।

ঈষৎ হেসে বোধিসত্ত্বও উচ্চারণ করলেন, কা, কা!

এইভাবে স্বাগত সম্ভাষণের প্রতি-উত্তর দিয়ে তিনি পাশ ফিরলেন। তিনি দেখলেন ফসল-কাটা এক নিঃস্ব প্রান্তর। দূরে কয়েকটি ছোট ছোট টিলা। একটি কালো রঙের চওড়া পথ চলে গেছে সেই প্রান্তর চিরে। একটু পরেই দূর থেকে কিছু একটা ছুটে আসতে লাগল সেই পথ ধরে, তার সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল শব্দ। সেটি একটি বাঁকুড়া-দুর্গাপুর গমনাগমনকারী বাস। যথারীতি সেটির ভিতর থেকে কিছু মানুষ উপচে বাইরে এসে ঝুলছে। ছাদের ওপরেও উঁচু হয়ে বসে আছে কিছু মানুষ। শব্দ ছড়াতে ছড়াতে বাসটা চলে গেল।

বোধিসত্ত্ব মোটর বাস আগে দেখেননি। যন্ত্রযান সম্পর্কে তাঁর কোনও পূর্ব সংস্কার নেই। কিন্তু তিনি সহজে বিস্মিত হন না। খানিকটা হালকা কৌতূহলের সঙ্গে তিনি তাকিয়ে রইলেন সেই অপসৃয়মাণ বাসটির দিকে। তারপর চোখ ফিরিয়ে দেখলেন নিজেকে।

তাঁর শরীরে এক টুকরোও বস্ত্র নেই। তিনি নিজেকে আবিষ্কার করলেন এক জন দীর্ঘকায়, সবল, তরুণ পুরুষ হিসেবে। তিনি ভাবলেন, আমি কে? আমি কোথা থেকে এসেছি? এটা কোন দেশ? কোন কাল?

তিনি এর উত্তর জানেন না। তবু বিস্মিত হলেন না। গাছতলায় একা শুয়ে থাকার আনন্দ উপভোগ করে ক্ষীণভাবে হাসলেন।

অন্য দিকে পাশ ফিরে তিনি দেখলেন অদূরে ছোট ছোট শালগাছের একটি পাতলা জঙ্গল। এবং জঙ্গলটি ঢেউয়ের মতো উঁচু হয়ে গেছে একটা টিলার ওপরে।

অল্প পরে জঙ্গল থেকে ছুটে বেরিয়ে এল একটি কুকুর। তার পেছন পেছন তিনজন মানুষ। এর মধ্যে দুজন লোকের পরনে শুধু মালকোঁচা-মারা ধুতি, খালি গা। বাকি লোকটি পরে আছে খাঁকি প্যান্ট ও সাদা গেঞ্জি, পিঠে ঝুলছে একটা বন্দুক, মাথায় শোলার টুপি। এ-রকম বেশবাস বোধিসত্ত্বের কাছে অপরিচিত। তবু শুধু মানুষের মুখ দেখেই তিনি খুশি হয়ে উঠলেন। মৃদু আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রইলেন ওদের দিকে।

এই দলটির গতিমুখ ছিল অন্য দিকে, কিন্তু কুকুরটি তাঁকে দেখতে পেয়ে দিক বদলে ছুটে এল। কুকুরটি প্রায় ব্যাঘ্র আকৃতির! সে হাড়-হিম-করা গ্রাউ গ্রাউ শব্দে ডাকতে ডাকতে ছুটে এসে হিংস্র ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগের মুহূর্তে বোধিসত্ত্ব অবিকল তার ডাকের অনুকরণে ডাকলেন গ্রাউ গ্রাউ!

কুকুরটি থমকে গেল। তখন বোধিসত্ত্ব নিচু গলায় কুকুরের ভাষায় তাকে আরও কিছু বললেন, সে কান ঝুলিয়ে, ল্যাজ নিচু করে বোধিসত্ত্বের পা চেটে দিতে লাগল বার বার।

অন্য দু'জনের সঙ্গে সেই খাকি পোশাক-পরা লোকটিও চলে এল এ-দিকে। লোকটি পা ফাঁক করে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। চোখ দু'টি চঞ্চল। তার ডাকসাইটে কুকুরের ব্যবহারে সে বিস্মিত। ঘামে সারা শরীর জ্যাবজেবে। শোলার টুপিটা খুলে মাথার টাকে হাত বুলোতে বুলোতে সে জিজ্ঞেস করল, এই! তুই কে রে? আরে রাম রাম, একেবারে দিগম্বর অবস্থা!

বোধিসত্ত্ব চুপ করে রইলেন।

এই, তুই কে? চুপ করে আছিস কেন?

ধুতি-পরা এক জন বলল, সাহেব, এ কোনও পাগল-ছাগল হবে নিশ্চয়!

পাগল! কিন্তু চেহারাখানা তো জলদস্যুর মতো।

এই গরমে বাঁকড়োয় প্রত্যেক বছর কিছু লোক পাগল হয়!

কিন্তু এখানে এই ব্যাটা নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে, বুনো হাতি বেরিয়েছে, এ-দিকে যদি চলে আসে? এই ওঠ, অন্য কোথাও যা, হাতি এসে পড়লে মারা পড়বি। রানিবাঁধে একটা লোককে মেরেছে।

বোধিসত্ত্ব নিষ্পলক ভাবে লোকটির চোখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দ হয়ে রইলেন।

ধুতি-পরা দ্বিতীয় লোকটি বলল, সাহেব, চলুন! আবার ও বেলা আসতে হবে। ও থাক। পাগল সহজে মরে না।

লোকটি বলল, হুঁ!

গাছপালার আড়ালে একটি জিপ দাঁড় করানো ছিল, বোধিসত্ত্ব সেটা আগে লক্ষ্য করেননি। ওরা সেই জিপ গাড়িতে উঠে চলে গেল। যানটির শব্দ শুনে বোধিসত্ত্বের একটি পাখির কথা মনে পড়ল। শালিক পাখি, যারা এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় যাবার সময় শব্দ করে।

তিনি লোকগুলির ভাষা বুঝতে পারেননি। ওদের উচ্চারিত শব্দগুলি সম্পর্কে তিনি গাঢ়ভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। একটু পরে তাঁর মনে হল, মাগধী প্রাকৃতের সঙ্গে এই ভাষার যেন কিছু মিল আছে। পূর্ব মাগধী। তবে স্বরবর্ণের উচ্চারণ বেশ হ্রস্ব। এদের কথার মধ্যে কিছুটা ব্যস্ততা রয়েছে জানি।

আরও কিছুক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে রইলেন তিনি। তারপর এক সময় তাঁর পেটের মধ্যে দপ করে জ্বলে উঠল একটা আগুনের শিখা। এর নাম দ্বিপ্রহরের ক্ষুধা। সেই ক্ষুধার একটি স্পষ্ট সর্বজনবোধ্য ভাষা আছে। ক্ষুধা বোধিসত্ত্বকে ডেকে বলল, ওঠো, আর শুয়ে থেকো না। বুনো হাতির চেয়েও আমি অনেক বেশি ভয়াবহ। মনুষ্যজন্ম পেয়েছ, এবার প্রতি দিন আমার ঋণ শোধ করো!

বোধিসত্ত্ব উঠে বসলেন। খিদে পাওয়ার ফলে তিনি নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে জীবন্ত বোধ করলেন। এবার তিনি সত্যিই পৃথিবীতে এসেছেন।

প্রথমে তিনি ঢুকলেন কাছের জঙ্গলে। একটুখানি ঘোরাঘুরি করার পরই বুঝলেন, এখানে ফলবান বৃক্ষ একটিও নেই। তবু তিনি খাদ্যের জন্য চিন্তিত হলেন না। তিনি জানেন, মানুষের জন্য খাদ্য আছে পৃথিবীতে। খুব মায়ার সঙ্গে তিনি হাত বুলোতে লাগলেন নিজের মুখে, চোখে, বুকে। কালের সীমানায় বাঁধা এই শরীর, তবু তা কত প্রিয়!

বন ছেড়ে রাজপথের ওপরে এসে দাঁড়ালেন তিনি। কোন দিকে যাবেন?

তিনি এই দেশ ও কালের পরিচয় জানেন না, তাঁর কাছে দিক-নির্ণয়েরও কোনও মানদণ্ড থাকতে পারে না। অজানা অঞ্চলে সব দিকই সমান। তিনি আকাশের সূর্য ও নিজের ছায়া দেখে পূর্ব-পশ্চিম

বুঝলেন। এখন সূর্য ক্রমশ পশ্চিমে হেলবে, সুতরাং পশ্চিমমুখী যাত্রায় মুখের ওপর রোদ লাগবে সর্বক্ষণ। এই বিবেচনায় তিনি পূর্বদিকেই যাবেন ঠিক করলেন। এবং সে-দিকে পা বাড়াবার আগে প্রণাম করলেন তাঁর আশ্রয়দাতা অশ্বত্থ বৃক্ষটিকে।

বোধিসত্ত্ব হাঁটতে লাগলেন পথের রাজার মতো, পথের ঠিক মাঝখান দিয়ে। মাঝে মাঝে কয়েকটি বাস, লরি বা ট্যাক্সি যাতায়াত করল এ-দিক ও-দিক থেকে। তাঁকে পথ থেকে সরাবার জন্য সেগুলো তীব্র কর্কশ শব্দে হর্ন বাজাল বহুবার, বোধিসত্ত্ব ভ্রূক্ষেপও করলেন না। তিনি আপন মনে হাঁটছেন। গাড়ির চালকরা কুৎসিত গালাগালি দিল, অশ্লীল ইয়ার্কি করল, তবু পাগল ভেবে তাকে সম্মান দিয়ে তাদের যেতে হল পথের পাশ দিয়ে নেমে।

এই যানগুলিকে দেখে বোধিসত্ত্ব খুব একটা বিচলিত হননি। তিনি অপাঙ্গে দেখে নিয়েছেন যে, এই সব ক'টি গাড়ির নিচেই চাকা বসানো। দু'টি চাকার বদলে কোনওটির চারটি চাকা, কোনওটির ছ'টি। পশু বা মানুষের বদলে এই চক্রযানগুলিকে কোনও যন্ত্রে টানছে। বোধিসত্ত্বকে বিস্মিত করার জন্য মানুষের মেধাকে আরও অনেক বিস্তৃত করতে হবে। এই নতুন যুগ কি ভূমির ওপর দিয়ে চক্রহীন কোনও যান চালাতে পেরেছে?

গৌতম বুদ্ধেরও জন্মের তিন হাজার বছর আগে সুমের দেশে মানুষ গাছের গুঁড়িকে গোল গোল করে কেটে হাতে-টানা যানের তলায় লাগিয়ে দেয়। সেই দিন থেকে মানুষের তৈরি যান গড়াতে শুরু করেছে। এরও দু'হাজার বছর পর কান্দাহার সীমান্তে এক জন মানুষ, আরও হালকা, অনেকগুলো দাঁড়া লাগানো চক্র আবিষ্কার করে। তারপর আর নতুনত্ব কেউ দেখাতে পারেনি। এই চাকাগুলি কাঠের বদলে ধাতুর বা অন্য কিছুর তৈরি — এই যা।

কিছুক্ষণ পরে তিনি লোকালয়ের কাছাকাছি এসে পৌঁছলেন। পথিকরা তাঁর দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। কিন্তু মুশকিল বাধল শিশুদের নিয়ে। ঝাঁক-ঝাঁক বাচ্চা বিভিন্ন ঘর থেকে পিল পিল করে বেরিয়ে এসে ছুটতে লাগল তাঁর পেছনে পেছনে। সেই সঙ্গে যোগ হল কুকুরের ঘেউ ঘেউ। শিশুদের মধ্যে যেগুলি এঁচোড়ে পাকা, তারা ঢিল ছুঁড়তে লাগল বোধিসত্ত্বের দিকে। বয়স্করা তা দেখে হাসছে, বাধা দিচ্ছে না। বোধিসত্ত্ব প্রশান্ত মনে এ-সব উৎপাত সহ্য করছিলেন, কিন্তু একটি ঢিল কপালে এসে আঘাত করে রক্তপাত ঘটাল। তিনি এক আঙুলের ডগায় কপাল ছুঁয়ে তারপর সেই আঙুলটা চোখের সামনে এনে নিজের রক্ত দর্শন করলেন। তখন তিনি বুঝলেন, এই অচেনা যুগে ও জনপদে অন্নের চেয়ে বস্ত্রের প্রয়োজন আগে।

তিনি মুখ ঘুরিয়ে জনপদ ছেড়ে ফাঁকা প্রান্তরের মধ্য দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। জঠরের মধ্যে বুভুক্ষার জ্বালা বেশ তীব্র হয়ে উঠেছে, কিন্তু আগে সংগ্রহ করতে হবে কটিদেশের জন্য এক টুকরো বস্ত্র। তিনি জানেন, বস্ত্র সংগ্রহ করতে বিশেষ অসুবিধা হবার কথা নয়। যদি এ-দেশে বেদান্ত আজও প্রচলিত থাকে, যদি মনুসংহিতা নামে ভুলে-ভরা ও পরস্পর-বিরোধী বাক্য-সম্বলিত গ্রন্থটি আজও সুযোগ-সন্ধানী পুরোহিতশ্রেণী মান্য করে চলে, যদি আজও এখানকার মানুষের পরলোকে বিশ্বাস থাকে, তাহলে একজন উলঙ্গ মানুষের জন্য বস্ত্রের অভাব হবে না।

প্রথমে চাই একটি নদী। প্রান্তরের ওপর যে-কোনও দিকে কয়েক ক্রোশ হেঁটে গেলে একটা না-একটা নদী পাওয়া যাবেই। কিছু দিন আগে ধান কাটা হয়ে গেছে, কিন্তু ধানগাছের গোড়াগুলি এখনও রয়ে গেছে জমিতে। সে-দিকে তাকিয়ে ফসলের ঘনত্ব পরীক্ষা করে বোধিসত্ত্ব বুঝে নিলেন যে, নদী খুব দূরে নয়।

অচিরেই বোধিসত্ত্ব পৌঁছলেন কংসাবতী নদীর কিনারে। এই প্রখর গ্রীষ্মে নদীটি ক্ষীণকায়া। তিনি নদীর মাঝখানে নেমে গিয়ে অঞ্জলি ভরে জল তুলে প্রথমে আচমন ও পরে গণ্ডূষ পান করলেন। তিনি সেই জলের স্বচ্ছ কমনীয়তার দিকে তাকিয়ে রইলেন এক দৃষ্টে। জলের দর্পণে তাঁর মুখের ছায়া। দাড়িগোঁফের জঙ্গলের মধ্যে দু'টি চোখ ও একটি উচ্চ নাক। এই মুখ তাঁর অচেনা। তিনি নিজেকেই প্রশ্ন করলেন, আমি কে? আমি কোথা থেকে এসেছি?

নদীটি খুব শীর্ণা হলেও সামান্য স্রোত আছে। কিছুক্ষণ সেই জলে অবগাহন করে শরীর জুড়িয়ে নেবার পর বোধিসত্ত্ব লক্ষ্য করলেন যে, স্রোতে দু'একটি পোড়া কাঠের টুকরো ভেসে আসছে। তখন তিনি উঠে এসে নদীপ্রান্ত ধরে স্রোতের বিপরীত দিক ধরে হাঁটতে লাগলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর পাওয়া গেল নদীর ধারে একটি শিবমন্দির, এবং শ্মশান। বোধিসত্ত্ব সেখানে থামলেন। এখানে নদী খানিকটা চওড়া, ঘাটে কয়েক ধাপ পাথরের বাঁধানো সিঁড়ি। একটি প্রাচীন বটগাছের নিচে একটি ছোট খড়ের চালার ঘর, যার কোনও দেয়াল নেই। সেই ঘরে রয়েছে স্তূপাকার কাঠ ও একটি খাটিয়া পাতা। শ্মশানটি জনশূন্য।

শিবমন্দিরটি দেখেও বোধিসত্ত্ব সেটির মধ্যে প্রবেশ করার কোনও আগ্রহ বোধ করলেন না। তিনি শ্মশানটি ঘুরে দেখলেন। এ-রকম স্থান তাঁর পরিচিত। কিন্তু এখানে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, কে জানে।

ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে তিনি বসলেন পা ডুবিয়ে নদীর জলে। তিনি মনে মনে ফিরে যেতে চাইলেন কয়েক শতাব্দী পরিভ্রমণে। কিন্তু মন কিছুতেই স্থির হচ্ছে না। জঠরের মধ্যে আগুনের শিখাটি সব মনোযোগ কেড়ে নিচ্ছে। যেন সেই শিখাটি বলছে, আর কিছু নয়, শুধু আমার স্তব করো।

নদীর ও-পারে হলুদ সর্ষের খেত। বাতাসে সেখানে চোখ-ধাঁধানো হলুদের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। বোধিসত্ত্ব এই শস্যটি চিনতে পারলেন না। তবু মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন সে-দিকে। ও-পারে দু'একটি মানুষজনও দেখা যায়। খানিকটা দূরে রয়েছে কয়েকটি সারবদ্ধ কুটির। উলঙ্গ অবস্থায় ও-দিকে যাওয়া যাচ্ছে না। তিনি নিথর হয়ে বসেই রইলেন সেখানে।

পশ্চিমের আকাশ লাল করে বেলা ঢলে আসবার পর একদল লোক এল শ্মশানে। কাঁধের খাটিয়াটা নামিয়ে রেখে শ্মশানবন্ধুরা গামছা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে লাগল। আর দীর্ঘ কণ্ঠস্বরে কাঁদতে লাগল এক পুরুষ ও এক রমণী। সেই কান্না শুনে বোধিসত্ত্ব একটু মুচকি হাসলেন। এটা যে যুগ বা কালই হোক, মানুষের ক্রন্দন শব্দের কোনও পরিবর্তন হয়নি। এ পৃথিবীতে জন্ম অনিশ্চিত, কিন্তু মৃত্যু একেবারে ধ্রুব। তবু মানুষ মৃত্যু দেখে কাঁদে।

কান্নার রোল ক্রমে স্তিমিত হয়ে এল, কাঠ নিয়ে সাজানো হল চিতা। তখন এক সময় বোধিসত্ত্ব নদীতীর ছেড়ে এগিয়ে গেলেন ওদের দিকে। পিছন দিকের গাঢ় লাল রঙের আকাশের পটভূমিকায় তিনি এক জন দীর্ঘকায় মানুষ, মাথা ও মুখে চুল-দাড়ি-গোঁফের এক জঙ্গল। লোহার কপাটের মতো বুক, বলশালী দুই বাহু, মেদ-বর্জিত কোমর, কালো চুলের মধ্যে সুস্পষ্ট পরিদৃশ্যমান সুদীর্ঘ লিঙ্গ, রোমহীন মসৃণ উরু এবং সুষম অঙ্গুলিবিশিষ্ট পদতল। তাঁর চোখ দু'টি সঙ্কোচশূণ্য, প্রশান্ত। তাঁর গায়ের রঙ এত পরিষ্কার যে, মনে হয় উজ্জ্বল হলুদ রঙের।

মৃত লোকটি ব্যতীত বাকি সকলে সচমকে তাকাল তাঁর দিকে। যেন তারা স্বয়ং মহাকালকে দেখছে। অস্ত সূর্যের রশ্মি এসে পড়েছে এঁর মাথায়। ইনি দাঁড়িয়ে আছেন, সকলের চোখ থেকে দিগন্তকে আড়াল করে।

মৃত ব্যক্তিটি এক জন ভূতপূর্ব স্কুল শিক্ষক। তিনি আবার কখনও কখনও গ্রামের যাত্রা বা পালাগানে অংশগ্রহণ করতেন। গলায় উড়নি জড়িয়ে বাঁ-হাত দিয়ে এক কান চেপে ধরে, ডান হাতটা বাড়িয়ে তিনি চমৎকার বিবেকের গান গেয়েছেন বহুবার। এখন সেই প্রাক্তন শিক্ষক ও গায়কের মুখটি হাঁ করা, চক্ষু দু'টি বোজা, বুকের খাঁচার ভিতর থেকে পাখিটা হঠাৎ উড়ে গেছে। মৃতের স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে তাঁর শরীরের জামা-কাপড় ছাড়িয়ে নতুন পোশাক পরাচ্ছিল। হাত দু'টি অতর্কিতে থেমে আছে মৃতের স্পন্দনহীন বুকের ওপর। এই মৃতের সামনে ওই উলঙ্গ প্রকাণ্ড লোকটি কী প্রবল ভাবে জীবন্ত!

বোধিসত্ত্ব দু'টি হাত যুক্ত করে সুমিষ্ট স্বরে বললেন, বসন!

কেউ তাঁর কথা বুঝল না। তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর উচ্চারণ অন্য যুগের, কিন্তু সকলেই বুঝতে পারল তাঁর প্রয়োজন। তৎক্ষণাৎ মৃতের পরিত্যক্ত বস্ত্রগুলি ছুঁড়ে দেওয়া হল তাঁর দিকে। বোধিসত্ত্ব সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে কৃতজ্ঞতার ভঙ্গিতে ছোঁয়ালেন কপালে, তারপর ফিরে গেলেন নদীর দিকে।

নদীর জলে বস্ত্রগুলি খুব ভাল করে ধুতে লাগলেন তিনি। যেন মৃত ব্যক্তির শরীরের গন্ধ দূর হয়ে যায়। তারপর নিজেও স্নান করে উঠে সেই সিক্ত বসন পরিধান করলেন। ধুতি, পাঞ্জাবি ও উড়নি। ধুতিটাকে কয়েক পাট করে জড়ালেন কোমরে। পাঞ্জাবিটি গলিয়ে দিলেন মাথা দিয়ে। তাঁর গায়ে বেশ আঁট হল। উড়নিটি নিয়ে তিনি কী করবেন, একটুক্ষণ চিন্তা করলেন। কোনও রকম স্থির সিদ্ধান্ত না নিয়ে প্রায় অন্য মনস্ক ভাবেই তিনি সেই উড়নি কোমরে জড়িয়ে ফাঁস বাঁধলেন বাঁ-দিকে। আর কিছু নয়, শুধু এই বাঁ-দিকে ফাঁস বাঁধার জন্যই তিনি সারা শরীরে একবার কেঁপে উঠলেন। যেন তার কিছু মনে পড়বার কথা। কিন্তু মনে পড়ল না।

পোশাক পরিধান করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আকৃতিতে একটা পরিবর্তন এসে গেল। আর পথের উন্মাদ নয়, এক দীপ্তকান্তি যুবা। মাথার ভিজে চুল ও ভিজে দাড়ি চিপড়ে তিনি জল ফেলতে লাগলেন। কয়েক জন শ্মশানবন্ধু নদীর জলে হাত-মুখ ধুতে এসে বিচিত্র বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। বোধিসত্ত্ব তাদের দিকে মনোযোগ না দিয়ে উঠে এলেন ওপরে।

ততক্ষণে মৃতকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে চিতার ওপরে। একটি তেরো-চোদ্দো বছরের বালককে কুশাসনে বসিয়ে মন্ত্র পড়াচ্ছে এক জন সিড়িঙ্গে চেহারার লোক। বালকটির মুখ বাঘের তাড়া খাওয়া হরিণের মতো। বোধিসত্ত্ব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তাহলে মানুষের শেষকৃত্যের জন্য এখনও ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়। জীবদেহের অনিত্যতা বিষয়ে শ্লোক উচ্চারণ করে, ব্রাহ্মণ, তুমি দক্ষিণা পাবে! তাতে তোমার দেহের প্রয়োজন মিটবে।

শোক-সন্তপ্তদের মধ্যে কয়েক জন নানা রকম প্রশ্ন করল বোধিসত্ত্বকে। তিনি নিঃশব্দ রইলেন। বার বার দেখতে লাগলেন বালকটিকে। খুব সম্ভবত এ মৃতের জ্যেষ্ঠপুত্র। আজ থেকে এই বালক প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেল। বালকটি হঠাৎ মন্ত্র ভুলে তাকাল বোধিসত্ত্বের দিকে। তার পিতার পোশাকধারী এই লোকটির দিকে সে কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত ভাবে চেয়ে রইল। তার রোরুদ্যমানা মা-ও এখন স্তব্ধ।

বোধিসত্ত্ব আবার অনুভব করলেন খিদের জ্বালা। আর দেরি না করে তিনি শ্মশান ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন।

॥ ২॥

পর পর তিন দিন বোধিসত্ত্ব মাটি কাটার কাজ করলেন। ক্ষীণতোয়া কংসাবতী বর্ষার সময় উত্তাল হয়ে ওঠে, তখন দু'কূল ভাসিয়ে যায়। তাই যেখানে কংসাবতীর সঙ্গে কুমারী নদী এসে মিশেছে,

সেখানে বাঁধ বেঁধে একটি জলাধার বানাবার কাজ শুরু হয়েছে। অর্থাৎ, কন্ট্রাকটারদের মোচ্ছব। দিকশূন্য ভাবে ঘুরতে ঘুরতে বোধিসত্ত্ব সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এর আগের দিন ডিনামাইট চার্জের সময় দু'জন নিহত এবং সতেরো জন মজুর আহত হয়। প্রকৃতি শূন্যতা পছন্দ করে না। তাই বোধিসত্ত্বের সবল শরীর দেখে এক জন ঠিকাদার তাঁর হাত ধরে টেনে কাজে লাগিয়ে দিল তৎক্ষণাৎ!

দিন শেষে সাড়ে চার টাকা মজুরি। বড় বড় কাগজে টিপসই দিয়ে নিতে হয়। কাছেই এক ঝোপড়িতে পাওয়া যায় ছাতু ও লঙ্কা, অথবা রুটি ও ট্যাঁড়শের ঘ্যাঁট। এর পর মুক্তাঙ্গনে নিদ্রা।

এখানে বোধিসত্ত্বের নাম কুঁয়ার সিং। কেন তাঁর এই বিচিত্র নাম হল, তা তিনি নিজেই জানেন না। ঠিকাদার তাঁর নাম জিজ্ঞেস করেছিল, বোধিসত্ত্ব নিশ্চুপ ছিলেন। তিনি জানেন না, তিনি কে, নামের তো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু মাটি কাটা কুলির নাম নিয়ে কিছু যায় আসে না, অতি ব্যস্ততায় ঠিকাদার নিজেই এই নতুন রিক্রুটের নামকরণ করে দিয়েছিল।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে বোধিসত্ত্ব বার বার তাঁর এই নবলব্ধ নামটি উচ্চারণ করে কৌতুক পান। কুঁয়ার সিং! নামটির মধ্যে কেমন যেন একটা যুদ্ধপ্রবণ নিষ্ঠুরতা রয়েছে। ঠিকাদার কেন ভাবল, এই নাম তাঁকে মানায়? এ-রকম নামের চরিত্র অনুযায়ী কি তাঁকে নিজেকে গড়ে নিতে হবে!

উঁচু বাঁধের কাছে সারি সারি তাঁবু, ওখানে বাবুরা থাকেন। কুলিরা নদীর কাছাকাছি ঢালাও প্রান্তরে। অনেক রাত জেগে তারা গান গায়। কেউ কেউ সঙ্গে ঢোল ও করতাল এনেছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই সুরে চিৎকার করে তারা দেহের অবসাদ কাটায়। এখানে অনেক স্ত্রীলোকও রয়েছে, তাদের কলস্বর চিরে দেয় রাত্রির বাতাস। তাদের মধ্যে দু'তিন জন নাচে। দূরে, লণ্ঠনের ধোঁয়াটে আলোয় মনে হয় প্রেতনৃত্যের মতো।

ভোরের একটু পর থেকেই বাঁকুড়ার আকাশে সূর্য দারুণ ক্রুদ্ধ। নামে মাটি কাটা মজুর হলেও, আসলে পাথর কাটতে হয়। গেরুয়া রঙের মাটির পাতলা স্তরের নিচেই কঠিন পাথর। প্রতিরোধের পাথর। গাঁইতির আঘাতে ফুলকি দিয়ে ওঠে আগুন। ধরিত্রীকে বিদীর্ণ করতে করতে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে বোধিসত্ত্বের চোখ। ভূমির পরতে পরতে এক রূপ! এক একটি পাথর ভাঙার পর তার ভেতরটা যেন শিশুর করতলের মতো কোমল রক্তাভ। যেন অযুত বর্ষ ধরে সেখানে সুপ্ত ছিল এক স্তব্ধতা, বোধিসত্ত্ব সেটাকে এই মাত্র ভেঙে দিলেন। তাঁর পাপবোধ হয়। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি কপালের ঘাম মুছলেন।

এ কুঁয়ার সিং! কুঁয়ার সিং!

যেন চারদিক থেকে শত শত কণ্ঠস্বরে তাঁর নাম ডাক আসছে। তিনি বিভ্রান্ত হয়ে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। কই, কেউ না তো। হাজার হাজার মজুর তালে তালে গাঁইতি চালিয়ে যাচ্ছে। তার থেকে শব্দ উঠছে একটা। সেই শব্দই কি কুঁয়ার সিং বলে ধ্বনিত হল?

তিনি মাথা নিচু করতেই আবার সেই ডাক উঠল। তিনি দেখলেন, মাটি থেকে একটা ভাপ উঠছে, বাতাস পাতলা হয়ে এসেছে, নদীর জলে যেন একটা রেশমের চাদর বিছানো। বোধিসত্ত্বের চোখে জল এসে গেল। তিনি ভাবলেন, তিনি এখানকার কেউ নন।

এবার খুব কাছ থেকেই খুব নরম গলায় ডাক এল, এ কুঁয়ার সিং!

তিনি দেখলেন, ফুল-ছাপ শাড়িপরা এক কামিনী। তার মাথায় মাটি-ভর্তি ঝুড়ি। বোধিসত্ত্ব ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালেন মেয়েটির দিকে। এই মেয়েটি কি আগে এখানে ছিল? অনেক স্ত্রীলোকই মাথায় ঝুড়িতে মাটি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাঁধের দিকে, কিন্তু ঠিক এই মেয়েটিকে তিনি দেখেছেন কি আগে? নাকি হঠাৎ আবির্ভূতা হল বাতাস থেকে!

পাতলা নরম ছিপছিপে মেয়েটি সাহসিনীর মতো সহাস্য মুখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

বোধিসত্ত্ব প্রসন্ন নয়ন তুলতেই মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করল, তোমার ঘর কোথায়, কুঁয়ার সিং?

বোধিসত্ত্ব উত্তর না দিয়ে আকাশের দিকে আঙুল দেখালেন।

মেয়েটি এই উত্তরটিকে খুব সহজ ভাবে গ্রহণ করে বলল, তুমি বালিয়া জেলার বিষুণগঞ্জ গ্রামের সাহেবরামকে চিনতে?

বোধিসত্ত্ব মাথা নাড়লেন।

মেয়েটি বলল, সে আমার মরদ। তার শরীরে তাগদ খুব। সে এক নাগাড়ে কুঁয়া থেকে হাজার বালতি জল তুললেও থকে যেত না। সে তার মা-বাবাকে বড় ভক্তি করে। সে তার বুড়িয়া মাইয়াকে কাঁধে করে দশ মিল দূরের হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। তুমি সেই সাহেবরামকে চিনতে না?

বোধিসত্ত্ব আবার মাথা নাড়লেন।

মেয়েটি মুখের হাসি মুছে ফেলল। উদাস-করা গলায় বলল, আমি ভেবেছিলাম তুমি তাকে চিনবে। সে আর নেই। উ তো মর গ্যয়া। আগের বছর ওর হৈজা হল, আর তিন দিনে মরে গেল। উ শালা আমাকে রেখে ভাগল। কুঁয়ার সিং, এ দুনিয়ায় কত ফালটু আদমি আছে, তারা মরে না, আর সাহেবরামের মতো এমন মরদের বাচ্চা মরদ কেন মরে যায়?

কোথাও ছায়া নেই, ইচ্ছে হয় নিজের ছায়াতেই আশ্রয় নিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে। মাটি বইতে বইতে ক্লান্ত হয়ে এই যুবতী মেয়েটি হঠাৎ পুরনো শোকে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। তার দুঃখের কথা সে কারুকে বলতে চায়। মেয়েটির শরীরের গড়ন ভারি সুন্দর। কিন্তু সে-সম্পর্কে বোধিসত্ত্বের কোনও বিকার হল না। তিনি শান্তভাবে মেয়েটি চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মেয়েটি দু'কদম কাছে এগিয়ে এসে বলল, এই গরম চলে যাবে, তারপর বরসাত আসবে, এই নদী পানিতে বিলকুল ভরে যাবে, তারপর আসবে পূজা কা টাইম, তারপর আসবে শীত, কিন্তু আমার মরদ আর আসবে না। কুঁয়ার সিং, তুমিও তো মরদ।

এতক্ষণ যেন সব শব্দ থেমে ছিল, আবার বোধিসত্ত্ব শুনতে পেলেন রুক্ষ পাথরের ওপর শত শত গাঁইতির আওয়াজে একটাই ধ্বনি উঠছে, কুঁয়ার সিং, কুঁয়ার সিং! যেন মেদিনীর গর্ভ থেকে উঠছে এই আর্তনাদ। এতগুলো মানুষের হাতের লোহার অস্ত্র ভেঙে দিচ্ছে অযুত বছরের স্তব্ধতা।

এই সময় কিছু দূর থেকে আর এক জন মজুর ডাকল, এ লছমিয়া, লছমিয়া!

এই ফুল-ছাপওয়ালা শাড়িপরা মেয়েটিকে ডাকা হচ্ছে, কিন্তু সে সাড়া দিল না।

লোকটি আরও দু'বার ডেকে সাড়া না পেয়ে দৌড়ে এল এ-দিকে। লোকটি বেশ সুঠাম ও লম্বা, কিন্তু এইটুকু দৌড়ে এসেই সে হাঁপাতে হাঁপাতে দু'বার কাশল, স্পষ্টত ক্ষয়কাশ। সে বোধিসত্ত্বের দিকে রুক্ষভাবে তাকিয়ে বলল, এখানে কোন নৌটাঙ্কি হচ্ছে?

তারপর মেয়েটিকে বলল, কাজে বেশি পয়সা না রসের খেলায় বেশি পয়সা?

মেয়েটি বলল, চুপ রহ, কমজোরি বেহুদা —।

লোকটি বোধিসত্ত্বের কাছে এগিয়ে এসে বলল, তুমি নতুন আদমি, দু'দিন এসেই তুমি আমার জেনানার দিকে চোখ দিয়েছ?

বোধিসত্ত্ব মৃদুভাবে হাসলেন শুধু।

লোকটি বোধিসত্ত্বের কাঁধ খামচে ধরে হিংস্রভাবে ঝাঁকানি দিল।

মেয়েটি ছুটে এসে লোকটিকে ধাক্কা দিয়ে বলল, ছাড়, ছাড় ওকে! কে তোকে বলেছে, আমি তোর জেনানা? আমি কারুর নই। আমি সাহেবরামের। এই নতুন মানুষটিকে ঠিক সাহেবরামের মতো দেখতে।

বোধিসত্ত্ব আবার শুনতে পেলেন অন্তরীক্ষ জুড়ে এক ব্যাকুল ধ্বনি উঠছে — কুঁয়ার সিং! কুঁয়ার সিং!

বোধিসত্ত্ব হাতের গাঁইতিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মেয়েটিকে প্রণাম জানালেন। তার পরই পেছন ফিরে হাঁটতে লাগলেন হন হন করে।

উঁচু বাঁধের দিকে উঠতে উঠতে তাঁর মনে পড়ল একটি নাম। বুধকুমার। তিনি চোখের সামনে দেখতে পেলেন বুধকুমারকে। এক উদ্যানে পাথরের আসনে বুধকুমার আর তাঁর অসামান্য রূপবতী স্ত্রী বসেছিলেন। তারা দু'জনেই বিলাসময় সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়েছে। দু'জনে ধ্যানমগ্ন। এমন সময় সেখানে এলেন কাশীর রাজা ব্রহ্মদত্ত। রাজা জিজ্ঞেস করলেন বুধকুমারকে, এই রমণী তোমার কে?

বোধিসত্ত্ব যেন চলচ্ছবির মতো এই দৃশ্য দেখতে লাগলেন। বুধকুমারকে তাঁর খুব চেনা লাগল।

বুধকুমার বললেন, ও আমার কেউ না। আমরা দু'জনে এক সঙ্গে সাধনা করি। সংসার জীবনে ও আমার স্ত্রী ছিল বটে।

রাজা বললেন, ওকে যদি আমি জোর করে ধরে নিয়ে যাই আমার ভোগের জন্য, তাহলে তুমি কী করবে?

বুধকুমার জলদগম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, যদি একবার জাগে, তবে সাবা জীবনের মতো ও আমাকে ছাড়বে না। না, আমি তাই জাগাব না। ধুলোর ঝড়কে যেমন বৃষ্টি চাপা দিয়ে দেয়, সেই রকম মাথাচাড়া দেবার আগেই আমি তাকে দমন করব।

রাজা বুঝতে পারলেন না, তিনি প্রতিবাদ ও কান্না সত্ত্বেও সেই রূপসীকে সবলে হরণ করলেন। বুধকুমার একবার মাত্র সে-দিকে তাকিয়ে মুখ ফিবিয়ে বসে বইলেন স্তব্ধভাবে।

বাঁধের ওপর উঠতে গিয়ে একবার হোঁচট খেয়ে পড়লেন বোধিসত্ত্ব। কিন্তু কিছু একটা স্মৃতি ফিরে আসায় তিনি বেশ তৃপ্তি বোধ করলেন। তিনি কুঁয়ার সিং নন, তিনি বুধকুমার। যা একবার জাগলে সারা জীবনের মতো আর ছাড়ে না, তাকে না জাগানোই ভাল। তার নাম ক্রোধ। অক্রোধী বুধকুমারেব কাছে শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করতে হয়েছিল রাজাকে।

বাঁধটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখানে একটা টুলের ওপর বসে আছেন ঠিকাদারবাবু। এক জন লোক তার মাথার ওপর ছাতা ধরে আছে। তিনি কৌটো থেকে পান মুখে দিচ্ছেন আর গোল গোল চোখ ঘুরিয়ে চারপাশ দেখছেন। তাঁর মুখখানি অবিকল পান্তুয়ার মতো।

বোধিসত্ত্বর হাঁটার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় সেটা না-ফেরার যাত্রা। তাঁকে দেখেই ঠিকাদাববাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, এই, এই, এই তুই কোথায় যাচ্ছিস? অ্যাঁ? এখনও টিফিন টাইম হয়নি।

বোধিসত্ত্ব থামলেন না।

ঠিকাদারবাবু চিড়বিড়িয়ে উঠে বললেন, উত্তরই দিচ্ছে না, ব্যাটা লাটসাহেব!

এক জন অনুচরকে তিনি আদেশ দিলেন, এই ওকে ধর তো!

দু'জন অনুচর গিয়ে বোধিসত্ত্বের হাত চেপে ধরল। তিনি বাধা না দিয়ে ফিরে এলেন।

কাজ ফেলে পালাচ্ছিস কোথায় রে ব্যাটা? টাট্টি পেয়েছে? সে-কথা মুখ ফুটে বলতে পারিস না? এই! আরে, এ ব্যাটা ভূতটা উত্তর দেয় না কেন? তোর ব্যাপার কী, তুই আর কাজ করবি না?

মাগধীর অপভ্রংশ এই ভাষাটি বোধিসত্ত্ব এর মধ্যেই অনেকখানি আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন। তিনি শান্তভাবে বললেন, না।

বোধিসত্ত্ব প্রত্যাশা করেছিলেন এবার তাঁকে চাবুক মারা হবে। অবাধ্য শ্রমিকের এ-রকমই শাস্তির প্রথার কথা তিনি স্মরণ করতে পারেন। কিন্তু মানুষ অনেক দূরে চলে এসেছে। এখন শ্রমিকের পাশাপাশি মাথা তুলে থাকে বড় বড় যন্ত্র, মানুষের তৈরি গর্জনকারী পেটিকা পাহাড় ফাটিয়ে দেয়, চাবুক এখন পরিত্যক্ত। •

ঠিকাদারবাবু বললেন, ব্যাটাদের কাজ দিলেও কাজ করবে না। মাথায় একেবারে গোবর! কেন, কাজ করবি না কেন? যা। চেহারাখানা তো আছে ষাঁড়ের মতো।

বোধিসত্ত্ব আবার বললেন, না।

ঠিকাদারবাবু একটা ধাতুমুদ্রা ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, তবে এই নে, যা ভাগ। হাফ রোজও কাজ হয়নি, আর কত পাবি!

মুদ্রাটি তুলে নিয়ে বোধিসত্ত্ব চলে যাচ্ছিলেন, ঠিকাদারবাবু আবার বললেন, আরে যাচ্ছিস কোথায়? এখানে টিপছাপ দিয়ে যা। ওপরওয়ালাদের আমার হিসেব দেখাতে হবে না?

পুরো রোজের অঙ্ক বসানো ঘরে বোধিসত্ত্বের টিপসই দেওয়ানো হল। তিনি কালি-লাগা বুড়ো আঙুলটি দেখতে দেখতে ভাবলেন, এ যেন দাগী হয়ে যাওয়া। তিনি কোনও অন্যায় করেছিলেন, তার শাস্তির চিহ্ন। একবার তিনি ইচ্ছে করলেন, ধাতুমুদ্রাটি ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। পরক্ষণেই মনে পড়ল, ভোগবাসনা পূর্ণ না হলে কখনও অর্থ ত্যাগ করতে নেই। তাতে অতৃপ্তির মূল্য আরও বেশি হয়ে ওঠে। তিনি এই নতুন যুগের ভোগবাসনার কথা কিছুই জানেন না।

॥ ৩॥

বোধিসত্ত্ব এর পরবর্তী কাজটি পেলেন কিছুটা উন্নত ধরনের।

ন্যাশনাল হাইওয়ের পাশে তিনি এক দুপুরবেলা চোখ বুজে শুয়ে ছিলেন। একটি কৃষ্ণচূড়া গাছ সেখানে বিরাট ছায়া বিস্তার করে আছে। অজস্র লাল ফুলের মধ্যে এসে বসেছে এক ঝাঁক টিয়া। টিয়াগুলির কোলাহল শুনে তিনি খুব মজা পাচ্ছিলেন। ওদের ভাষা তিনি খুব ভাল বোঝেন। তিনি নিজেই পাখিজন্ম নিয়েছিলেন, মনে পড়ে গেছে, টিয়াগুলি অতি ব্যাকুল ভাবে বলাবলি করছে যে তাদের ঝাঁক থেকে একটি পাখি নিরুদ্দেশ। সে কি ধরা পড়ল কোনও ব্যাধের হাতে? অথবা সে কি একা চলে গেল পাহাড়ের দিকে।

বোধিসত্ত্বের ইচ্ছে হল তিনি হঠাৎ টিয়া হয়ে ওদের ঝাঁকে মিশে যান। ওদের কাছে গিয়ে বলবেন, এই তো আমি এসেছি।

কিন্তু তিনি নিজের ইচ্ছে মতো শরীর বদল করতে পারেন না। তাঁর কোনও অলৌকিক শক্তি নেই। তিনি জন্ম-মৃত্যুর অধীন। তাঁকে এই মানব-জন্ম সম্পূর্ণ করে যেতে হবে। কী এই জীবনের সার্থকতা? সত্যের অনুসন্ধান? সত্য কী? সত্য কি এক না বহু?

বোধিসত্ত্ব শুয়ে শুয়ে এই রকম সাত-পাঁচ ভাবছেন, এমন সময় একটি সাদা রঙের সুদৃশ্য স্টেশন ওয়াগন্ থামল তাঁকে ছাড়িয়ে একটু দূরে। গাড়িটা আবার পিছিয়ে এসে একেবারে তাঁর পাশে দাঁড়াল। যেহেতু বোধিসত্ত্ব সহজে বিস্মিত বা চমকিত হন না, তাই তিনি চোখ মেললেন না, কোনও কৌতূহলই দেখালেন না।

গাড়িটিতে রয়েছে কয়েক জন দেশি ও বিদেশি মানুষ। এই বিদেশিরা এসেছে হল্যান্ড, ডেনমার্ক ও সুইডেন থেকে। সচ্ছল, উদারহৃদয় পুরুষ-রমণী, এরা চায় দরিদ্রের সেবা করতে। পৃথিবী থেকে গরিবরা দ্রুত কমে যাচ্ছে, সহজে আর গরিব খুঁজে পাওয়া যায় না, যত গরিব এখন শুধু ভারতীয়

উপমহাদেশে। তাই দরিদ্র সেবার আত্মপ্রসাদ পেতে হলে শ্বেতাঙ্গদের আসতে হয় এত দূরে, এই গরম ও ঘামের বিশ্রি আবহাওয়ার দেশে।

দাতার মস্তক থাকে উঁচু, গ্রহীতাকে কুঁজো হয়ে আসতে হয়, এটাই নিয়ম। এবং দাতার আশপাশে কয়েক জন তৈলাক্ত মুখওয়ালা মানুষ থাকে।

গাড়ির সামনের সিটে জানালার পাশে অত্যন্ত লম্বা-চওড়া যে-মানুষটি বসে আছেন, তাঁর নাম নোয়েল এন্ডারসেন। তাঁর মুখে ডাচ চুরুট। তিনি রাস্তার দিকে বাম হাত বাড়িয়ে ইংরেজিতে বললেন, এই মানুষটিকে দেখো।

গাড়ির ভেতরে বসা সাত জন নারী-পুরুষ, এদের মধ্যে দু'জন বাঙালি, মুখ বাড়িয়ে বোধিসত্ত্বকে দেখল।

নোয়েল এন্ডারসেন বললেন, দ্বিপ্রহরে এই লোকটি নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে। এ দৃশ্য পাশ্চাত্যে অকল্পনীয় নয় কি? প্যারিসের ক্লোসার বা মার্কিন দেশের বামরাও দুপুরে কিছু না-কিছু করে। কিন্তু এর কোনও কাজের চিন্তা নেই। শুকেনু, এই লোকটি কি ভিখারি?

এক জন বাঙালি অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বলল, চেহারা দেখে তো তা মনে হয় না।

মাথায় রঙিন তালপাতার টুপি-পরা এক জন মধ্যবয়স্কা মেমসাহেব বললেন, ভিখারিদেরও স্বাস্থ্য ভাল হতে পারে। ম্যালনিউট্রিশানেও মানুষ অনেক সময় মোটা হয়।

আর এক জন সামরিক অফিসারের মতো চেহারার সাহেব বলল, ইন্ডিয়াতে এসে প্রথম যে-জিনিসটি দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি, সেটা হল এখানকার কাক। এত কাক আর কোন দেশে আছে? এবং এখানকার সব কাকই বেশ স্বাস্থ্যবান। এদের দেখলেই বোঝা যায়, এ দেশটি কত নোংরা। কারণ কাক নোংরা খেয়ে বাঁচে।

মধ্যবয়স্কা মেমসাহেবটি বললেন, যে-সব পাখি নোংরা খেয়ে বাঁচে, ইন্ডিয়ার শহরগুলিতে সেই সব পাখির সংখ্যা খুব বেশি। এবং সেই জন্যই রাস্তায় এত কুকুর এবং গোরু। যত দিন রাস্তাগুলো নোংরা থাকবে, তত দিন এরাও থাকবে।

আলোচনা অন্য দিকে ঘুরে যাচ্ছে বলে নোয়েল এন্ডারসেন হাত তুলে সবাইকে চুপ করিয়ে দিলেন। বোঝা যায়, তিনিই দলের নেতা। তিনি বললেন, শুকেনু, এই লোকটির মধ্যে আমি ঘুমন্ত ভারতবর্ষকে দেখতে পাচ্ছি। কাজ করার শক্তি আছে কিন্তু সেই শক্তিকে কাজে না লাগিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।

বাঙালিদের মধ্যে এক জনের নাম সুখেন্দু। সে কিঞ্চিৎ রসিকতা করার চেষ্টায় ঝকমকে ইংরেজিতে বলল, মিস্টার এন্ডারসেন, আমরা ভারতীয়রা দার্শনিক জাত তো। তাই কাজ না করে দর্শন চিন্তায় সময় কাটাতে ভালবাসি।

নোয়েল এন্ডারসেন বললেন, পৃথিবীর কোনও দার্শনিক মানুষকে কাজ করতে নিষেধ করেননি। ভগবদ্‌গীতায় কর্মের প্রশস্তি আছে। লর্ড শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, প্রত্যেককেই নিজ নিজ কাজ করে যেতে হবে।

সুখেন্দু একটু কুঁকড়ে গেল। সাহেবদের মুখে ভগবদ্‌গীতার কথা শুনলে তাদের কী-রকম যেন পুরুত-পুরুত মনে হয়।

নোয়েল এন্ডারসেন গাড়ির দরজা খুলে নিচে নেমে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে সুখেন্দু ও বিমলেন্দু নামে দুই বাঙালি নেমে এল। এবং টুপি-পরা মেমসাহেব।

নোয়েল এন্ডারসেন জিজ্ঞেস করলেন, শুকেনু, আমি এই লোকটির সঙ্গে কথা বলতে পারি?

সুখেন্দু বলল, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই!

তক্ষুনি সে বোধিসত্ত্বের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। এই, ওঠো, ওঠো। এই এখানে ঘুমোচ্ছ কেন?

বোধিসত্ত্ব চোখ মেলে এই বিচিত্র মানব-সমন্বয়ের দিকে তাকালেন।

সুখেন্দু বলল, ওঠো, সাহেব তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

বোধিসত্ত্বের চোখে চোখ পড়তেই নোয়েল এন্ডারসেন হাত তুলে তাঁকে নমস্কার করলেন। বোধিসত্ত্ব প্রতি নমস্কার ফিরিয়ে দিলেন।

নোয়েল এন্ডারসেন সুখেন্দুকে বললেন, তুমি ওকে বলো, আমরা ওর ঘুম ভাঙাবার জন্য দুঃখিত।

সুখেন্দু এই বাক্যের অনুবাদ অবান্তর মনে করে স্বরচিত প্রশ্ন করল, এই দুপুরবেলা এখানে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছ কেন? তোমার বাড়ি কোথায়?

বোধিসত্ত্ব আকাশের দিকে আঙুল দেখালেন।

তুমি কি চাষবাসেব কাজ করো? তোমার নিজের জমি আছে? না তুমি বর্গাদার?

বোধিসত্ত্ব পরিষ্কার গলায় বললেন, আমি কিছুই করি না।

নোয়েল এন্ডারসেন জিজ্ঞেস করলেন, শুকেনু, এই লোকটি কী বলছে?

সুখেন্দু গলায় খানিকটা তুচ্ছতা ফুটিয়ে বলল, এ বলছে, এ কোনও কাজ করে না, এবং তার জন্য লজ্জিতও নয়।

একে যদি আমরা কোনও কাজ দিই, তাহলে কি এ করতে রাজি হবে?

মি. এন্ডারসেন, একে আমরা কোন কাজে দেব?

আমাদের সেবা প্রতিষ্ঠানে একে গ্রহণ করা যেতে পারে। এর বুদ্ধি ও শিক্ষা কতটুকু তা আমরা বিবেচনা করে দেখব। যদি কিছুই না থাকে, তবে শাবীবিক পরিশ্রম অন্তত করতে পারবে।

মি. এন্ডারসেন, আমাদেব কর্মীর সংখ্যা এখনই যথেষ্টরও বেশি। এর পর আরও এক জন —।

তবুও আরও এক জন লোককে নেওয়া যেতে পারে। এক জন সুস্থসবল লোকের কোনও কাজ নেই, এ দেখলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। জানো শুকেনু, কাজের কখনও কোনও অভাব হয় না। এই ইন্ডিযাতে যেটির অভাব, তা হচ্ছে কাজের অনুপ্রেরণা। আমি দেখতে চাই, এই লোকটিকে কাজে লাগানো যায় কি না। তুমি একে জিজ্ঞেস করো।

সুখেন্দু বোধিসত্ত্বের দিকে ফিরে বলল, এই, তুই কাজ করবি? সাহেব তোকে কাজ দিতে চাইছেন।

বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞেস করলেন, কী কাজ?

নোয়েল এন্ডারসেন বললেন, মানব সেবার কাজ।

সুখেন্দু বলল, খাওয়া-থাকা পাবি, কিছু হাতখরচও পাবি। রাজি থাকিস তো এক্ষুনি চল আমাদের সঙ্গে।

তালপাতার টুপি-পরা মেমসাহেবটি ইতিমধ্যে বোধিসত্ত্বের তিনখানি ছবি তুলেছেন, এবার তিনি কৃষ্ণচূড়া গাছের গুঁড়িতে একটি কৌতূহলী কাঠবেড়ালি দেখতে পেয়ে ক্যামেরা ঘুরিয়েছেন সে-দিকে।

সহজে বিস্মিত হন না যে বোধিসত্ত্ব, তিনিও এবার প্রায় বিস্মিত হলেন। তিনি মনে মনে বললেন, সাবাস নতুন যুগের মানুষ! এক-এক নতুন কীর্তি তোমাদের। এ-রকম কথা আগে কোথাও কখনও শোনা যায়নি। সেবা-প্রবৃত্তি মানুষের ব্যক্তিগত। কিন্তু এক জন এসে আর এক জনকে সেবাকার্যের জন্য প্ররোচিত করছে এবং সে-জন্য পয়সাও দিতে চাইছে, এ ব্যাপারটি সত্যিই অভিনব।

তিনি বিশেষ কৌতূহলী হয়ে বললেন, নিশ্চয়ই চাই। আমি ধন্য হব।

সাহেবটি একটুক্ষণ বোধিসত্ত্বের মুখের দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে রইলেন। তিনি বুঝতে চান, এই লোকটির মাথায় বুদ্ধিসুদ্ধি আছে কি না।

নোয়েল এন্ডারসেন সুখেন্দুকে বললেন, ওকে জিজ্ঞেস করো এক-একটা গাছে যদি সাতটা করে পাখি বসে, তাহলে তিনটি গাছে মোট পাখির সংখ্যা কত হয়?

এই প্রশ্ন শুনে মৃদু হেসে বোধিসত্ত্ব সুখেন্দুকে বললেন, আপনি তার আগে এই মহাপ্রাণ বিদেশিকে জিজ্ঞেস করুন, এক জন নারীর গর্ভে যখন সন্তান থাকে তখন সেই নারীর কি একটা আত্মা না দু'টি আত্মা? সংখ্যাতত্ত্ব এইভাবে শুরু হয়।

সুখেন্দুর দুই ভুরুর মাঝে গভীর ভাঁজ পড়ল। সে তীব্র দৃষ্টিতে কয়েক পলক তাকিয়ে রইল বোধিসত্ত্বের দিকে।

বিমলেন্দু নামে অপর যে-বাঙালিটি এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল পাশে, সে-ও এই প্রশ্ন শুনে হাসল। কারণ তার নিজের স্ত্রী গর্ভিণী। সে মৃদুস্বরে নোয়েল এন্ডারসেনকে বলল, লোকটি বুদ্ধিমান। পরে আমরা একে আরও যাচাই করব। এখন চলুন, যাওয়া যাক।

গাড়ির মধ্যে বোধিসত্ত্বকে বসতে দেওয়া হল তালপাতার টুপি-পরা মেমটির পাশে। মেমটির ফ্রক উরু পর্যন্ত উঠে আছে। তার কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত অতি সূক্ষ্ম চামড়া রঙের মোজায় ঢাকা আছে, তা সহজে অন্যদের নজরে পড়ে না।

বোধিসত্ত্ব আড়ষ্ট ভাবে বসে রইলেন। নারী সম্পর্কে তাঁর বহু জন্মের পূর্ব সংস্কার আছে, সেটা তিনি সহজে কাটিয়ে উঠতে পারবেন না। তাঁর মনে হল, এই পিঙ্গলবর্ণা নারীর নিশ্বাস তাঁর গায়ে লাগছে, যা বাইরের বাতাসের চেয়েও বেশি উষ্ণ।

সুখেন্দু বলল, তুমি এ-রকম ঝোপে। মতো দাড়ি-গোঁফ রেখেছ কেন, তুমি কি সাধুগিরি-টিরি করো নাকি?

বোধিসত্ত্ব বলল, না।

তাহলে আমাদের ওখানে গিয়ে দাড়ি কামিয়ে ফেলো। রাত্তিরবেলা বাচ্চা ছেলেরা তোমাদের দেখলে ভয় পেয়ে যাবে।

বোধিসত্ত্ব বললেন, আচ্ছা।

মেমটি একটি সিগারেট ধরাল। তারপর গ্রীবা বক্র করে বলল, এ লোকটির ধোতি পরার স্টাইলটা অন্য রকম। আগে দেখিনি।

বোধিসত্ত্ব ধুতিটা পাট করে কোমরে জড়িয়েছেন। কাছাকোঁচা নেই। উড়নিটা কোমরবন্ধের মতো, বাঁ-দিকে গিঁট।

সুখেন্দু বলল, হুঁ, আমিও দেখিনি। আমাদের গ্রামে-ট্রামে যে কত রকম ব্যাপার আছে, আমরাও জানি না।

বোধিসত্ত্ব এই কথোপকথনের মর্ম বুঝলেন। প্রাক্তন স্কুল শিক্ষকের উড়নিটি তিনি কেন যে একবারও কাঁধে ঝুলিয়ে না রেখে, বাঁ-দিকে গিঁট দিয়ে কোমরে বেঁধে রাখেন, তা তিনি নিজেও জানেন না।

তার উলটো দিকের আসনে বসে আছে একটি অল্পবয়সি বিদেশিনি মেয়ে। তার শরীরে উজ্জ্বল লাল পোশাক। সে একটিও কথা না বলে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বোধিসত্ত্বের দিকে। কয়েক বার চোখাচোখি হতেও সে দৃষ্টি ফেরাল না। বোধিসত্ত্বই মুখ নিচু করে রইলেন।

গাড়ি এসে থামল বাঁকুড়া শহরের কাছাকাছি একটি গ্রামে। ভারতবর্ষের আর যে-কোনও গ্রামেরই মতো এটি। শুধু বৈশিষ্ট্য এই, এর মধ্যে গোটা সাতেক অতি সুদৃশ্য বাড়ি আছে। বাড়িগুলো কাঠের ও

করুগেটের চাল। দেয়ালের রঙ অতি ঠাণ্ডা নীল আর ছাদের রঙ হলুদ। গ্রামের মধ্যে এটি একটি আলাদা কলোনি, যেখানে প্রায়ই বহু দূর থেকে এসে সাহেব-মেমরা থাকেন। এই সাহেব-মেমরা উচ্ছৃঙ্খল বৈচিত্র্যপ্রেমী ঠিক নন। একটি মহৎ উদ্দেশ্যে এঁরা ওয়েলফেয়ার নামে একটি সংস্থা বানিয়ে সেই সংস্থার পক্ষ থেকে এই পুরো গ্রামটিকে পোষ্য নিয়েছেন। অনন্ত কালের মধ্য থেকে মাত্র তিনটি বছর সময় ধার দিয়েছে সরকার বাহাদুর। তার মধ্যে এই ডুমুরগাছিকে বানিয়ে তুলতে হবে এক আদর্শ গ্রাম।

গাড়ি থেকে মানুষ ছাড়াও প্রচুর জিনিসপত্র নামল। শক্ত মোটা পিস বোর্ডের প্যাকিং। সেগুলো দড়ি দিয়ে বাঁধা, সেই দড়িগুলোও কী সুন্দর! শিশু সাপের মতো চকচকে। এক গাদা কালো কালো ছেলে মেয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে সেই গাড়ির সামনে, তারা মুগ্ধ চোখে সেই দড়িগুলোই দেখছে।

এই গ্রীষ্মেও নোয়েল এন্ডারসেনের পরনে একটি জোব্বা, গাঢ় নীল রঙের। সেটা ঠিক রবি ঠাকুরের পোশাকের মতো নয়, পাদ্রিদের মতোও না। কেননা নীল রঙের, বরং মনে হয় একটি বর্ষাতি, আসলে পোশাকটি তাঁর নিজস্ব পরিকল্পিত। এতে আছে ছ'টি পকেট।

নোয়েল এন্ডারসেন প্রথমে সেই কালো কালো শিশুদের দিকে হাত জোড় করে বললেন, নামাসকার, নামাসকার।

ছেলে-মেয়েরা এক সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, নমস্কার সাহেব, নমস্কার।

নোয়েল এন্ডারসেন হাত দু'টি পকেটে ঢুকিয়ে বার করে আনলেন অনেক টফি চকোলেট। অমনি ছেলে মেয়েরা সেগুলি কাড়াকাড়ি করে নেবার জন্য ছুটে এল। সাহেব সস্নেহে বললেন, নাও। ওয়ান বাই ওয়ান। গেট ইন আ কিউ —।

সুখেন্দু ও বিমলেন্দু বাচ্চাগুলোকে ধমকে ধমকে লাইনে দাঁড় করাল। সাহেব তখন প্রত্যেককে তিনটে করে টফি দিতে লাগলেন, এবং সেই সঙ্গে কারুর গাল টিপে, কারুর চুল নেড়ে খুনসুটি করলেন।

নোয়েল শব্দটির অর্থ বড় দিন। যেন এই সাহেব এক দাড়িহীন সান্টাক্লস। তাঁর সহাস্য মুখখানিতে শিশুর সরলতা মাখানো। তালপাতা টুপি-পরা মেমসাহেব অনর্গল ছবি তুলে যাচ্ছেন।

বোধিসত্ত্ব এক পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। কেন যেন এই দৃশ্যটি তার খুব পরিচিত মনে হল। বহুবার বহুরূপে এই দৃশ্য দেখেছেন। মনশ্চক্ষে সাহেবটির চেহারা বদলে গেল, তার জায়গায় এল অন্য কেউ। কিন্তু বাচ্চা ছেলে মেয়েদের চেহারা বিশেষ বদলাল না।

ডুমুরগাছি গ্রামের এই কলোনিটিকে কোনও আশ্রম বলা চলে না।

এর নাম হল ওয়েলফেয়ার, এর ইউনিট নাম্বার ফাইভ। এখানে নারী-পুরুষ মিলিয়ে মোট উনিশ জন স্থায়ী কর্মী আছে। সকলেই বেরিয়ে এসেছে পিতৃসংস্থায় প্রতিনিধিদের স্বাগত জানাতে। পরিচ্ছন্ন চেহারার তরুণ-তরুণী সব, এদের মধ্যে বৃদ্ধ মাত্র এক জন। এখানে বোধিসত্ত্ব হলেন কুড়ি নম্বর।

সুখেন্দু এক জন তরুণ কর্মীকে ডেকে বোধিসত্ত্বকে দেখিয়ে নিম্ন স্বরে বলল, এই লোকটি এখানে থাকবে। বড় সাহেবের খেয়াল জেগেছে, ওকে দিয়ে কিছু কাজ করাবে। কী কাজ ও পারবে জানি না। যাই হোক, সে পরে হবে, ওকে একটা থাকার জায়গা দাও।

তরুণ কর্মীটি বলল, বাবাঃ, চেহারা দেখলে ভয় করে। পাগল-টাগল নয় তো? রাস্তা থেকে তুলে আনলেন?

হ্যাঁ-অ্যাঁ। এই লোকটা বোধহয় পাগল নয়, পাগল আমাদের এই এন্ডারসেন।

এর সঙ্গে তো বিছানা-টিছানা জামাকাপড় কিছুই নেই। একেবারে ঝাড়া হাত-পায়ে এসেছে দেখছি।

যাই হোক, ব্যবস্থা তো করতেই হবে। সাহেবদের খেয়াল যখন। গোস্বামী চলে গেছে, ওর ঘরটা খালি আছে না? সেখানেই আপাতত ও থাকুক। স্টোর থেকে একটা কম্বল আর গোটা দুয়েক ধুতি দিয়ে দিয়ো। পরে আমি কাগজপত্রে সই করে দেব।

তরুণ কর্মীটি বোধিসত্ত্বের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, এসো আমার সঙ্গে। লোকটি গোড়া থেকেই বোধিসত্ত্বকে অপছন্দ করেছে, মুখে তার চিহ্ন স্পষ্ট। প্রথম পরিচয়ে নবাগতের প্রতি বিরাগ পোষণ করা মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। অচেনা মানুষকে মানুষ বিশ্বাস করে না। অথচ এই তরুণ কর্মীটি যার নাম বিকাশ, এক দিন সে-ই, এই ইউনিট নাম্বার ফাইভে, বোধিসত্ত্বের সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ হবে।

প্রত্যেকটি ঘরই একটি আলাদা আলাদা বাড়ি। লাইনের একেবারে শেষের ঘরটির দরজা খুলল বিকাশ। ভেতরে ঢুকে জানলা খুলল। ঘরের মধ্যে একটি তক্তপোশ ও একটি করে টেবল-চেয়ার। বিকাশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই সব ঘর ভদ্রলোকদের থাকবার জন্য, রাস্তার ভিখিরির জন্য নয়। তার ঘরে একটি অতিরিক্ত চেয়ার দরকার, পরে নিয়ে যেতে হবে এ ঘরেরটা। এ লোকটা চেয়ার নিয়ে কী করবে?

বিকাশ তখনও জানে না যে কয়েক দিন পরে সে নিজেই এই ঘরে এসে অধিকাংশ সময় কাটাবে। চেয়ার দরকার হবে তার নিজেরই বসবার জন্য।

ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে সে বলল, কাজ করতে এসেছ, সঙ্গে জিনিসপত্র তো কিছুই আনোনি। কম্বল-টম্বল আমি দিয়ে যাচ্ছি একটু পরে। আর শোনো, গাড়িটা যেখানে এসে থামল, তার সামনে একটা বড় হলঘর দেখছ তো? সেটাই ডাইনিং হল। ঠিক সাতটার সময় ঘণ্টা বাজবে, তখন ওখানে খেতে যেতে হবে। বুঝেছ?

বোধিসত্ত্ব ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালেন।

বিকাশ বেরিয়ে যাবার পর বোধিসত্ত্ব ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন ঘরখানি। নতুন কাঠের সুগন্ধ এখনও রয়ে গেছে। টেবিলের সামনে দেয়ালে ঝুলছে একটা আয়না। নদীর জলের চেয়ে এই আয়নায় প্রতিবিম্ব অনেক বেশি স্পষ্ট। সেই জন্য আরও বেশি অচেনা। নিজেকে একটি সম্পূর্ণ অচেনা মানুষ হিসেবে দেখলেন তিনি। এবং একটি অচেনা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। শরীরের মতো এই ঘরটাও এখন তাঁর নিজস্ব। গাছতলা থেকে উঠে এসে আজ থেকে তিনি গৃহস্থ হলেন।

এতক্ষণের মধ্যে ওরা কেউ তাঁর নাম জিজ্ঞেস করেনি। রাস্তার ভিখারি কিংবা উন্মাদের নাম জানার প্রয়োজন বোধ করে না কেউ।

তিনি কি কুঁয়ার সিং, না বুধকুমার? কিন্তু সেই মুহূর্তে বোধিসত্ত্বের চোখের সামনে ভেসে উঠল অন্য একটি দৃশ্য।

॥ ৪ ॥

বোধিসত্ত্ব চুল ছেঁটেছেন, দাড়ি-গোঁফ নির্মূল করে ফেলেছেন। তাঁর পরিধানে এখন পরিচ্ছন্ন ধুতি ও সাবান-কাচা পাঞ্জাবি। অবশ্য হলুদ রঙের উত্তরীয়টি কোমরে বেঁধে রাখার অভ্যেস তিনি ছাড়েননি।

তাঁর এই রূপ পরিবর্তনের ফলে তিনি তুই বা তুমি থেকে আপনিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন অবিলম্বে। তাঁর একটি নামও আছে। তিনি নিজের অনেকগুলি নাম ঠিক করেছিলেন, কিন্তু শেষে ভাবলেন যে, পৃথিবীতে এসে তাঁর প্রথম পাওয়া নামটিই রক্ষা করা উচিত। সুতরাং মাটি কাটার ঠিকাদার প্রদত্ত

কুঁয়ার সিং নামটিকেই তিনি একটু বাঙালি করে বললেন, কুমার সিংহ। এখানকার অনেকেই তাঁকে কুমারবাবু বা কুমারদা বলে ডাকে।

ইউনিট নাম্বার ফাইভের কার্যবিধি বহু রকমের। এখানে আছেন তিন জন কৃষি-বিশেষজ্ঞ, যাঁরা মাঠে চাষিদের সঙ্গে জলকাদার মধ্যে নেমে চাষিদের শিক্ষা দিচ্ছেন আধুনিক কৃষি-পদ্ধতি। একটি প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করে সেখানে দেওয়া হচ্ছে হাতে-কলমে কাজভিত্তিক শিক্ষা। সেখানকার ছাত্ররা লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম হাতের কাজ তো শিখছেই, তাছাড়া কোন ধরনের ব্যবসা করতে গেলে কী কী ধরনের অভিজ্ঞতা লাগে, সে-সম্পর্কেও জ্ঞান সঞ্চয়ন করছে। এক জন ডাক্তার প্রতি বাড়ি ঘুরে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি শেখাচ্ছেন বাড়ির মেয়েদের। এ ছাড়া গ্রামের তাঁতি, জোলা, জেলে, গোয়ালা প্রভৃতি সকলকেই আনা হয়েছে এই পরিকল্পনার আওতায়। গ্রামের বারোশো অধিবাসীর মধ্যে এক জনও বাদ যায়নি। এদের শুধু নানা রকম সাহায্য দেওয়াই উদ্দেশ্য নয়, আসল উদ্দেশ্য এদের স্বাবলম্বী হতে শেখানো। কারণ তিন বছর তো মাত্র সময়। তারপর ইউনিট নাম্বার ফাইভ এখান থেকে সব কিছু গুটিয়ে চলে যাবে। কাজ শুরু হয়েছে মাত্র সাত মাস আগে।

সকালে ইউনিট থেকে গ্রামের লোককে দুধ বিলি করা হয়। হল্যান্ড থেকে সরাসরি আসে অতি উৎকৃষ্ট ধরনের দুধ। পেছনের পুকুরঘাটে সেই খালি দুধের ব্যারেলগুলো স্তূপাকার হয়ে আছে। অচিন্ত্য গোস্বামী নামে এক জন কর্মী এখানকার কাজ ছেড়ে অন্য জায়গায় চাকরি নিয়ে চলে যাওয়ায় বোধিসত্ত্বকে দেওয়া হয়েছে তার দুধ বিলির কাজ।

এ কাজটি মোটেই সহজ নয়।

গ্রামের লোক অতি কূট-কৌশলী হয়। নিজেদের মঙ্গল ছাড়া আর যাবতীয় কিছুই তারা খুব ভাল বোঝে। হল্যান্ডের বিখ্যাত দুধ পান করেও তিন মাসের মধ্যে গ্রামের কোনও লোকের স্বাস্থ্যের পরিবর্তন না হওয়ায় ইউনিট নাম্বার ফাইভের কর্মীরা সন্দিহান হয়ে ওঠে। কয়েক দিন গোপনে খোঁজ নেবার পর জানা যায়, দুধ নেবার পরই গ্রামের ছেলে-মেয়েরা মাঠের রাস্তা ধরে শর্টকাটে দৌড়ে চলে যায় বাঁকুড়া শহরে। সেখানকার বিভিন্ন চায়ের দোকানে এবং অনেক গৃহস্থ বাড়িতে উচ্চমূল্যে সেই দুধ সরবরাহ করা হচ্ছে নিয়মিত।

এর প্রতিকারের জন্য একটা ব্যবস্থা করা হল। সুইডেন থেকে নোয়েল এন্ডারসেনই পরামর্শটি লিখে পাঠিয়েছিলেন। তিনি জানালেন যে, শুধু দুধ আর দেওয়া হবে না, এবার থেকে দুধের সঙ্গে ফ্যারেক্স মিশিয়ে দেওয়া হবে সমান সমান পরিমাণে। ফ্যারেক্সের ডোনেশান তিনিই জোগাড় করে দিয়েছিলেন। ফ্যারেক্সে মেশানো দুধে চা হয় না। এর স্বাদ অন্য রকম বলে গৃহস্থ বাড়িও এ দুধ কিনতে চাইবে না। কিন্তু গ্রামের লোকের পক্ষে এই মিশ্রিত দুধ আরও বেশি স্বাস্থ্যকর।

গ্রামের লোকদের বিচিত্র কৌতুক বোধ আছে। তারা এই নতুন পানীয়ের নাম দিয়েছে আলুনি দুধ। আগে তারা ভোরবেলা এসে লাইনে দাঁড়াত দারুণ ব্যগ্র ভঙ্গিতে, শরীর সব সময় দুলছে, কখন দুধটা পেলেই ছুট দেবে। এখন তাদের আগ্রহ অনেক কম। এখনও আসে ঠিকই, কিন্তু আসে হেলতে-দুলতে, লাইনে দাঁড়িয়ে ঘটি বাজিয়ে এক জন কেউ চেঁচিয়ে বলে, ও সাহেবদাদা, তোমার আলুনি দুধ গোলা হল? অমনি একটি হাসির ধুম পড়ে যায়। যে-দুধ বিক্রি হয় না, সে-দুধকে তারা বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। আগে কারুর ঘটি থেকে দুধ চলকে পড়লে আপশোসের শেষ থাকত না, এখন তারা হাতের দুধভর্তি ঘটিটা নিয়ে যায় দোলাতে দোলাতে। যেন সাহেবদের দেওয়া দুধ গ্রহণ করে তারা সাহেবদের ও তাদের কর্মচারীদেরই ধন্য করে দিচ্ছে। সত্যি, কৃতজ্ঞতাবোধটা যেন ক্রমশ উঠে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে।

সাত মাস আগে এই গ্রামের জনসংখ্যা ছিল বারোশো। এর মধ্যেই সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে তেরোশো চব্বিশে। এটা ঠিক জন্মহার বৃদ্ধির ব্যাপার নয়। অন্য অন্য গ্রাম থেকে লোক চলে আসছে এ গ্রামে। এ সম্পর্কে ওয়েলফেয়ার-এর ইউনিট নাম্বার ফাইভের একটি কঠোর নীতি আছে। তাবা শুধু একটি গ্রামকেই উন্নত করতে এসেছে, সমস্ত ভারতবর্ষ উদ্ধার করা তাদের দায়িত্ব নয়। তারা কয়েক স্কোয়ার মাইলের মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষের ওপর পরীক্ষা চালাতে এসেছে, এই সংখ্যার তারতম্য হলে তাদের পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। সুতরাং বাইরের থেকে অন্য লোকদের অনুপ্রবেশ রোধ করা হচ্ছে যথাসাধ্য। কিন্তু প্রতি দিনই কয়েক জন আসে এবং তারা হলফ করে বলে, তারা এ গাঁয়েরই লোক, কিছু দিনের জন্য বাইরে গিয়েছিল। গাঁয়েরও কিছু লোক তাদের আত্মীয় বলে দাবি করে। তবে যারা কোনও বাড়িতে আশ্রয় জোগাড় করতে পারে না, তাদের অবাঞ্ছিত বেড়ালছানার মতো গ্রামের সীমানার বাইরে পার করে দিয়ে আসা হয়।

সুতরাং এ গ্রামের জেলে যখন বিনামূল্যে সুদৃঢ় ও সুদৃশ্য নাইলনের জাল পায়, তখন পাশের গ্রামের জেলেরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। এ গ্রামের জমিতে সব সময় ফট ফট ফট ফট করে চলে খাঁটি বিলিতি পাম্প, কোনও সময়েই জলের কষ্ট নেই। পাশের গ্রামের জমিতে তখন খরা। বস্তুত ডুমুরগাছি গ্রামের সঙ্গে পাশের হিরাকুঁচ গ্রামেব কোনও আপাত তফাত নেই, কিন্তু অকস্মাৎ ডুমুরগাছি গ্রামটি যেন বড়লোকের রক্ষিতা হয়ে ভাগ্য ফিবিয়ে ফেলেছে। উপমাটি অন্যভাবে দেওয়া যায়। হঠাৎ এক জন লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ পায়, তার ঠিক পরের নম্বরের কুপনধারী কিছুই পায় না।

দুধ গোলার ব্যাপারে সাহায্য করে পূর্ণিমাদি আর অনন্ত। কোনও বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবাবেব গৃহিণী হলেই মানাত পূর্ণিমাদিকে, কিন্তু তিনি অল্প বযসেই বিধবা। নিঃসন্তান এই স্ত্রীলোকটি নিছক বেঁচে থাকার জন্য নানা ঘাটের জল খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত চুঁচড়োর এক অনাথ আশ্রমেব কেরানি হয়েছিলেন। সেখান থেকে এসেছেন এই চাকরিতে তিন বছরের কড়ারে। এখানে এসে তিনি প্রকৃত একটি সংসার পেয়েছেন। বছর পঁয়তিরিশের মতো বয়েস, ভারি স্বাস্থ্য, মুখখানি পূর্ণিমাব চাঁদের মতোই গোল, সবার সঙ্গে বকে বকে কথা বলতে ভালবাসেন, কিন্তু সবাই জানে, তাঁর অন্তরটি স্নেহে পূর্ণ। জীবনে তিনি অনেক দুঃখ পেয়েছেন, কিন্তু মনের মধ্যে তিক্ত, কটু, কষা রস জমেনি।

বিরাট বিরাট ডেকচিতে দুধ ও ফ্যারেকসের মধ্যে গরম জল মিশিয়ে পূর্ণিমাদি দুধ গোলা সম্পূর্ণ করেন। অ্যালুমিনিয়ামের হাতায় সেই দুধ তুলে কয়েক বার ঢালাঢালি করে তিনি নিশ্চিন্ত হন। তারপর তিনি বোধিসত্ত্বকে বলেন, শোনো, তুমি তো নতুন এসেছে, প্রত্যেককে তিন হাতা করে দেবে, আর কার্ডে দাগ কেটে দেবে। কার্ড না থাকলে দিয়ো না কিন্তু, রোজই অনেকগুলো ভেজাল ঢুকে পড়ে।

অনন্তর সঙ্গে ধরাধরি করে বোধিসত্ত্ব বড় ডেকচিগুলো নিয়ে এলেন বড় হলঘরটির বারান্দায়। গনগনে রোদের নিচে তখন লম্বা লাইন পড়েছে। তিনি গিয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লাইন থেকে এক জন চেঁচিয়ে উঠল, আলুনি এসে গেছে। আলুনি এসে গেছে।

প্রত্যেকের হাতে খোপে খোপে তারিখ দেওয়া কার্ড। লাল পেনসিল দিয়ে তিনি একটা খোপে দাগ দিয়ে প্রত্যেককে তিন হাতা করে দুধ ঢেলে দিচ্ছেন। বার বার নিচু হয়ে হাতায় করে দুধ তুলতে হয় বলে আধ ঘণ্টার মধ্যে বোধিসত্ত্বের পিঠ ব্যথা হয়ে এল। তখনও লাইনে অনেক লোক বাকি। তিনি পিঠের ব্যথাটি অগ্রাহ্য করলেন। মনে মনে বললেন, আমি দান করছি। সব খাদ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই দুধ। এই দুধ দানের পুণ্যফল কার? আমার? কিন্তু দানের এই বস্তুটি আমার নয়। বরং এর বিনিময়ে আমি পেয়েছি গ্রাসাচ্ছাদন।

তিনি আবার ভাবলেন, এই বিনিময় ব্যবস্থা মেনে নেবার জন্য আমার আত্মা কি বিশুদ্ধতর হবে, না মলিনতর হবে? দেখা যাক কিছু দিন সময় নিয়ে।

গ্রামে প্রতিটি পরিবারকে দুধ বিতরণ করতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা লাগে। তখনও শেষ ডেকচিতে প্রায় অর্ধেক দুধ রয়ে গেছে। কিছু শিশু ও বৃদ্ধ অপরাধীর মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে খানিকটা দূরে। এদের কার্ড নেই, কিন্তু প্রত্যেকের হাতেই একটি করে পাত্র আছে, এরা হিরাকুঁচ গ্রামের দুর্ভাগা।

পূর্ণিমাদি চলে গিয়েছিলেন রান্নাঘরে তদারকিতে। শেষের দিকে ফিরে এসে তিনি ডেকচিতে উঁকি দিয়ে বললেন, ও মা, এখনও এতখানি রয়ে গেছে? তুমি কম কম দাওনি তো?

বোধিসত্ত্ব অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়লেন। যে-জিনিস তাঁর নিজের নয়, সেই জিনিস দান করতে গিয়েও কি তিনি কৃপণতা করেছেন? তিনি তো প্রত্যেক বার হাতা পুরোপুরি ভরেই তুলতে চেয়েছিলেন। হাত কি কেঁপে গিয়েছিল?

অনন্ত বলল, আজ বোধহয় সবাই আসেনি। তিন ঘর যে-বামুন আছে তারা তো এমনিতেই আসে না।

পূর্ণিমাদি ঠোঁট উলটে বললেন, হুঁ, বামুন না ছাই!

অনন্ত বলল, পূর্ণিমাদি, বামুনদের ওপর আপনার এত রাগ কেন? আগেও দেখেছি।

পূর্ণিমাদি বললেন, খাঁটি বামুন কোথায়, আমাকে একটাও দেখাতে পারো? আমি তো এ পর্যন্ত দেখিনি। সবাই ভড়ং করে আর শাস্তরের নাম নিয়ে মিথ্যে কথা বলে।

বোধিসত্ত্ব পূর্ণিমাদির কাছ থেকে এ-রকম কথা শুনবেন আশা করেননি। তিনি পূর্ণিমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

পূর্ণিমাদি আবার বললেন, কুমারভাই, তুমি আবার বামুন-টামুন নও তো!

বোধিসত্ত্ব হেসে বললেন, না।

কী জানি বাবা! তোমাকে দেখে কিন্তু সাধু মনে হয়। তুমি আগে সাধু ছিলে?

না!

তুমি আগে কোথায় ছিলে?

পথে।

তার আগে?

পূর্ণিমাদি, আপনি আগে কোথায় ছিলেন?

চুঁচড়োর অনাথ আশ্রমে।

তার আগে?

বুঝেছি, তুমি আমার কথার উত্তর দেবে না। সাধুরাই তাদের আগের জীবনের কথা বলতে চায় না।

উত্তর দেব না নয়। উত্তর জানি না।

বুঝেছি, বুঝেছি! এবার হাঁড়ি-কড়া সব তুলে ফেলো। বেলা হয়ে গেছে!

দূরে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, বোধিসত্ত্ব হাতছানি দিয়ে তাদের ডাকলে পূর্ণিমাদি আঁতকে উঠে বললেন, ও কী করছ?

বোধিসত্ত্ব বললেন, এই দুধ ওদের দিয়ে দি।

পূর্ণিমাদি বললেন, না না, তাহলে কী গণ্ডগোল হবে তুমি জানো না! আজ যদি পাঁচ জনকে দাও, কাল তাহলে পঞ্চাশ জন আসবে। পরদিন পাঁচশো জন। একবার যদি রটে যায় যে, এখানে বিনা কার্ডে দুধ পাওয়া যায়... নোয়েল সাহেব এতে ভীষণ রাগ করবেন।

বোধিসত্ত্ব বললেন, তাহলে ওদের মধ্যে থেকে শুধু এক জনকে আমি তিন হাতা দুধ দেব।

পূর্ণিমাদি অবাক হয়ে বললেন, কেন?

ওদের মধ্যে এক জনের অন্তত এই দুধ পাবার কথা।

পাবার কথা? কে বলল, কে কথা দিয়েছে?

আপনি, আমি, অনন্ত, এখানকার সকলেই কি এ-রকম কথা দিইনি?

পূর্ণিমাদি অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। বোধিসত্ত্ব একেবারে সামনে যে দশ-এগারো বছরের রোগা ময়লা মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল, তার দোমড়ানো টিনের বাটিতে দুধ ঢেলে দিলেন। তারপর হাতাটি অনন্তর হাতে তুলে দিয়ে উঠোন পেরিয়ে চলে গেলেন নিজের ঘরের দিকে।

পূর্ণিমাদি বললেন, কথা দিয়েছি? আমরা কখন কথা দিলাম রে, অনন্ত? এর মানে কী?

যথাসময়ে এই ঘটনাটি নোয়েল এন্ডারসেনের কানে গেল।

নোয়েল এন্ডারসেন ভোরবেলা উঠেই একটি অতি ছোট হাফ প্যান্ট ও লাল রঙের গেঞ্জি পরে গ্রামের গৃহস্থদের গোয়ালঘরগুলি পরিদর্শনে যান। তিনি গো-পালন ও গো-চিকিৎসার ব্যাপারে প্রায় এক জন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ। এই গ্রামে লোকদের বছরের পর বছর বিনামূল্যে দুধ খাইয়ে যাবার বাসনা তাঁর নেই। দুধের ব্যাপারে গ্রামবাসীদের স্বয়ম্ভর হবার পরিকল্পনা করেছেন তিনি। সেই জন্য আমস্টারডাম নগরী থেকে বাছাই করা সুবৃহৎ ষাঁড়ের বীর্য বিমানে উড়িয়ে আনা হচ্ছে এখানে। তারপর এই বাংলার হাড়-জিরজিরে দুঃখিনী ছলো ছলো আঁখি গোরুগুলিকে সেই বীর্যের সাহায্যে নিয়োগ প্রথায় গর্ভবতী করা হবে। এক সময় তারা জন্ম দেবে মোটা মোটা বাছুরের। তারপর সেই দো-আঁশলা গোরুর পাল দুধের বন্যা বইয়ে দেবে।

এ ব্যাপারে নেয়েল এন্ডারসেনের উৎসাহ অসীম। তিনি কোনও চাষির দুর্গন্ধ গোয়াল ঘরে ঢুকে নিজের হাতে খ্যাংরাঝাঁটা নিয়ে সেখানকার নোংরা পরিষ্কার করতে করতে বলেন, শেম, শেম! তোমরা গরুকে মা বলো, থ্রি হান্ড্রেড থার্টি মিলিয়ন দেবতা থাকে এই গোরুর পেটে, সেই গোরুকে তোমরা এমন অযত্নে এমন ময়লার মধ্যে রাখো?

বাষট্টি বছর বয়সেও নোয়েল এন্ডারসেনের চেহারাটি যুবা-পুরুষের মতো। তাঁর থেকে দশ বছরের ছোট এক বৃদ্ধ চাষি শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে অবাক হয়ে দেখে এই পাগল সাহেবকে।

ন'টা সাড়ে ন'টার সময় নিজের প্রকোষ্ঠে ফিরে নোয়েল এন্ডারসেন শশা, কলা ও বাতাবি লেবুর রস দিয়ে সাত্ত্বিক ধরনের ব্রেকফাস্ট সারলেন। তিনি নিঃসন্তান ও বিপত্নীক। ভারতে তিনি এই নিয়ে এলেন এগারো বার। সুইডেনে তাঁর জানাশুনো, কয়েক জন ভারত থেকে অনাথ শিশু নিয়ে গিয়ে নিজেদের পরিবারে রেখে পুত্রবৎ লালন করছেন। কিন্তু নোয়েল এন্ডারসেন উদ্যোগ করে দত্তক নিয়েছেন গোটা একটা ভারতীয় গ্রামকে।

মধ্যবয়স্কা মেমটির নাম ইনগ্রিড হ্যামেলিন। পড়ন্ত যৌবনেও তিনি শরীরের বাঁধুনি রেখেছেন যথাসাধ্য আঁটসাঁট করে। দশ বছর আগে ইনি এঁর দ্বিতীয় স্বামীকে পরিত্যাগ করেছেন, আজও তৃতীয় স্বামী পছন্দ হয়নি। প্রথম স্বামীর মৃত্যুতে ইনি প্রাসাদ সমেত বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। দ্বিতীয় স্বামীটি সেই সম্পত্তির প্রতি অতিরিক্ত লোভ দেখাবার জন্যই বিতাড়িত হল। এখন কোনও পুরুষ শ্রীমতী ইনগ্রিডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলেই তিনি মনে করেন, পুরুষটির অন্য উদ্দেশ্য আছে। পুরুষটি তাঁকে চায় না, চায় সম্পত্তি। পুরুষ জাতি সম্পর্কেই সন্দিহান হয়ে উঠেছেন তিনি। মনের মধ্যে রয়ে গেছে ভালবাসার জন্য হাহাকার, কিন্তু ভালবাসার সামনে অবরোধ তুলে আছে পার্থিব বিষয়। তাই তিনি ঠিক করেছেন এ-সব বিলিয়ে দিয়ে যাবেন দীন দরিদ্রের মধ্যে। ওয়েলফেয়ার সংস্থার মোটা চাঁদা আসে তাঁর কাছ থেকে।

অন্য একটি মেয়ের নাম রোজানা। সে যুবতী এবং ভাষাতত্ত্বের ছাত্রী। সেবার কাজে সে এখনও মন-প্রাণ ঢালেনি, সে এসেছে নিছক কৌতূহলে। দলে অন্য একটি যুবক আছে, তার নাম কিম রজার্স, সে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে ওয়েলফেয়ার-এর অন্য একটি ইউনিট দেখাশুনা করে।

নোয়েল এন্ডারসেন ব্রেকফাস্ট সেরে এদের সকলকে নিয়ে এবং সুখেন্দু ও বিমলকে ডেকে কিছুক্ষণ ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করলেন। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমরা পথ থেকে যে-লোকটিকে কুড়িয়ে এনেছি, সে কী-রকম কাজ করছে?

সুখেন্দু বলল, সম্ভবত লোকটি পাগল। সে কাজ করতে পারে ঠিকই, কিন্তু তার কথাবার্তা উলটো-পালটা।

ইনগ্রিড হ্যামেলিন জিজ্ঞেস করলেন, কী-রকম?

সুখেন্দু লোক-পরম্পরায় শোনা সকালের ঘটনাটি বিবৃত করল এবং বলল, সে কয়েক দিন হল এখানে এসেছে। অথচ তবু সে বলল যে, সকলকে দুধ দেবার পরও নাকি আরও একজনকে দুধ দেবার কথা দেওয়া আছে।

সুখেন্দুর চৌকশ ইংরিজি অনুবাদে বিষয়টি বিদেশিদের কাছে আরও দুর্বোধ্য ঠেকল। নোয়েল এন্ডারসেন বলল, লোকটিকে ডাকো।

বোধিসত্ত্ব এসে দরজার কাছে দাঁড়ালেন। তাঁর ছায়া পড়ল ঘরের সব ক'টি মানুষের মুখের ওপর। সকলেই বসে ছিল ছোট ছোট মোড়ায়। নোয়েল এন্ডারসেন নিজের মোড়াটি ছেড়ে দিয়ে বিছানায় উঠে গিয়ে বললেন, বসুন!

বোধিসত্ত্ব সকলকে প্রণাম করে বসলেন। নোয়েল অ্যাণ্ডাবসেন সুখেন্দুর দিকে চেয়ে বললেন, তুমি ওকে জিজ্ঞেস করো, আমাদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হবার আগে কুমার সিংহ কোথায় ছিল, কী ছিল ওর জীবিকা।

বোধিসত্ত্ব দ্বিধাহীন কণ্ঠে উত্তর দিলেন, আমি কোথা থেকে এসেছি, তা আমার স্মরণ নেই। আমি কে, তা আমি জানি না।

ঘরের সকলেই সচকিত হয়ে উঠল। সুখেন্দু মন্তব্য করল, বলেছিলাম কিনা, এর মাথায় বেশ গোলমাল আছে।

ইনগ্রিড বললেন, এটা অ্যামনেশিয়া হতে পারে। ওর চোখের দৃষ্টি তো সুস্থ মানুষের মতো। ওকে জিজ্ঞেস করুন তো, ওর কিছু অন্তত মনে পড়ে কি না। কিছু ছোটখাটো ঘটনা?

বোধিসত্ত্ব একবার ভাবলেন বলবেন যে, হ্যাঁ, আমার মাঝে মাঝেই একট একটা ঘটনা মনে পড়ছে, এক একটা দৃশ্য দেখছি। তবে সেগুলির কোনওটাই আমার এ জন্মের নয়।

কিন্তু তিনি এ-কথা এখন প্রকাশ না করাই মনস্থ করে চুপ করে রইলেন।

সুখেন্দু বলল, বোঝাই যাচ্ছে এর কিছুই মনে পড়ে না। দেখুন, ও দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে।

নোয়েল এন্ডারসেন বললেন, এক হিসেবে তো ভালই। নতুন করে এঁর জীবন শুরু হচ্ছে। কুমার সিংহ, আপনি একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নতুন জীবন শুরু করুন।

বোধিসত্ত্ব হঠাৎ তীব্রভাবে বললেন, নতুন জীবন আর পুরনো জীবন কী? প্রত্যেক মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য এক।

আপনার মতে কী সেই উদ্দেশ্য?

সত্যের অনুসন্ধান।

হ্যাঁ ঠিক। ঈশ্বরের কাছে পৌঁছনো।

বোধিসত্ত্ব আরও তীক্ষ্ম স্বরে বললেন, ঈশ্বর কে?

মাই গড! আপনি জানেন না, ঈশ্বর কে? ঈশ্বরের দয়ায় আপনি নিশ্বাস ফেলছেন। এই পৃথিবীর ধূলিকণা থেকে মহাকাশ পর্যন্ত যা কিছু, সবই নিয়ন্ত্রণ করছেন ঈশ্বর। আমরা সবাই তাঁর সন্তান।

বোধিসত্ত্ব ওষ্ঠে ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়ে বললেন, মানুষ এখনও ডুবে আছে অজ্ঞতার অন্ধকারে। এ জগতের কোনও সৃষ্টিকর্তা বা নিয়ন্ত্রণকর্তা নেই। মানুষের জীবন তারই নিজস্ব। তার প্রতিটি কাজের জন্য একমাত্র সে নিজেই দায়ী। তার জীবনের সব চেয়ে বড় ভুল ঈশ্বর নামে এক আজগুবি অস্তিত্বের ওপর নির্ভরতা। প্রতিটি মানুষই তার নিজের প্রভু। তাছাড়া আর কেউ নেই।

এই কথাগুলি বলে বোধিসত্ত্ব নিজেই বেশ খানিকটা লজ্জিত হয়ে পড়লেন। এ-রকম কথা তিনি এখানে এই সময়ে বলতে চাননি। তিনি এঁদের কথা শুনতে আগ্রহী। তিনি চান এই নতুন যুগটিকে জানতে।

এক মিনিট ঘরের সবাই নিস্তব্ধ হয়ে রইল। শুধু রোজানা নামের তরুণী মেয়েটি এই স্তব্ধতা ভেঙে হেসে উঠল উচ্ছল ভাবে। সকলে দ্বিতীয় বার চমকে গিয়ে তাকাল ওর দিকে। রোজানা বলল, ইনি যা বললেন, তা এমন কিছু নতুন কথা নয়। কিন্তু ভারতে এসে এমন কথা শুনব, আশা করিনি। এ এক নিয়তি-নির্ভর জাতি, তাই এখানে এত দারিদ্র।

বিমলেন্দু বলল, মাপ করবেন, আমি একটা কথা বলতে চাই। আপনারা ভারতে এসে শুধু দারিদ্রটাই দেখেন, মানসিক সম্পদটা আপনাদের চোখে পড়ে না।

রোজানা বলল, আমিও আপনার কাছে মাপ চেয়ে নিয়ে বলছি, এ পর্যন্ত সে-রকম কোনও মানসিক সম্পদ সত্যিই আমার চোখে পড়েনি। আপনার প্রাচীন ঐতিহ্যের গর্ব করেন, সেটা ঠিক আছে। কিন্তু আধুনিক কালে কোথায় সে-চিন্তায় ঐশ্বর্য? আধুনিক ভারতীয়দের লেখা বেশ কিছু সমাজতত্ত্ব ও দর্শনের বই আমি পড়ে দেখেছি। খুবই অগভীর সেগুলো। যুক্তির বদলে ভাবালুতায় পূর্ণ। যে-সব নেতারা আপনাদের দেশ শাসন করেন, তাঁরা প্রকাশ্যে যে সব ভাষণ দেন, তা ঠিক শিশুর মতো। শিশুরা যেমন কল্পনাপ্রবণ ও মিথ্যেবাদী হয়। তাঁরা যা উচ্চারণ করেন, তা বিশ্বাস করেন না। তাহলে কোথায় গেল সেই মানসিক সম্পদ?

ইনগ্রিড বললেন, রোজানা, লক্ষ্মীটি, আমরা এখানে রাজনীতি আলোচনা করব না।

বিমলেন্দু বলল, আপনাদের দেশের নেতারাই-বা কী এমন ভাল ভাল কথা বলেন? সবাই ক্ষমতায় থাকার জন্য নিজের সুবিধে মতো কথা বলে।

রোজানা বলল, আমাদের নেতারা দার্শনিক নয়। তারা মানুষের জীবন বা নৈতিক উন্নতি সম্পর্কে কোনও কথা বলার অধিকার গ্রহণ করে না। তারা দেশের লোকের জন্য রুটি, মাংস, দুধ, বিদ্যুৎ ও অস্ত্রশস্ত্রের কথা বলে। এগুলির ঠিক মতো ব্যবস্থা না করতে পারলে তাদের লাথি মেরে নামিয়ে দেওয়া হয় চেয়ার থেকে।

সুখেন্দু কথাটা ঘোরাবার জন্য বলল, আসল কথাটা কি জানেন, আপনাদের দেশে লোকেরা যেমন কাজ করতে পারে, তেমনি প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর। সেই জন্যই আপনাদের দেশে গরিব নেই। কিন্তু আমাদের দেশে জনসংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে, সেই পরিমাণে খাবার নেই, প্রাকৃতিক সম্পদ নেই, জমি নেই। লোকে কাজ করতে চাইলেও কাজ পায় না।

রোজানা বলল, ভারতীয়দের আর একটা স্বভাব, কিছু না জেনে বা অর্ধেক জেনে কোনও বিষয়ে জ্ঞানীর মতো কথা বলা। এমনকী তারা নিজের দেশ সম্পর্কেও জানে না। আপনি এইমাত্র যা বললেন, তা ঠিক নয়।

ইনগ্রিড বললেন, রোজানা, প্লিজ।

বিমলেন্দু মনে মনে বলল, দুর শালি! এ-দেশে এসে তোরা ডলার ছড়াচ্ছিস বলে যা খুশি তাই বলে যাবি? বুক কাটা ব্লাউজ পরে এমন ঘুরিস যেন আশেপাশে যারা আছে, তারা মানুষই না! ভারি তো একটা পুঁচকে দেশ থেকে এসেছিস, ইন্ডিয়াকে চিনতে হলে তোদের সাত জন্ম লাগবে।

নোয়েল এন্ডারসেন গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, রোজানা, এক মিনিট। আমি শুকেনুকে কয়েকটা তথ্য মনে করিয়ে দিতে চাই।

সুখেন্দু তাড়াতাড়ি বলল, ব্রিটিশরা এ-দেশটাকে ছিবড়ে করে দিয়ে গেছে।

নোয়েল এন্ডারসেন হাত তুলে বললেন, প্লিজ, আমাকে বলতে দাও। পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশি চাষযোগ্য উর্বর জমি আছে ভারতবর্ষে। এর লোকসংখ্যা ষাট কোটি হলেও জনবসতির ঘনত্ব জার্মানি, হল্যান্ড, জাপান, ব্রিটেনের চেয়ে কম। চিনের থেকে ভারতের জনসংখ্যা কুড়ি কোটি কম, কিন্তু চিনের তুলনায় এখানে দশ কোটি একর জমি বিনা চাষে ফেলে রাখা হয়েছে। যদিও ভারত ও আমেরিকার জমির উৎপাদন ক্ষমতা সমান এবং ভারত সরকারই এ-কথা স্বীকার করেছেন। 'আ হান্ড্রেড নিউ গেইনস' নামক রিপোর্টে আছে যে, ভারতের পক্ষে স্বয়ম্ভর হওয়া যে-কোনও দিন সম্ভব।

সুখেন্দু একটু থতমত খেয়ে গেল।

বিমলেন্দু মনে মনে বলল, সাহেবরা লক্ষ-কোটির হিসেবগুলো পটাপট মুখস্থ বলে দেয় এমন ভাবে যে, মনে হয় সত্যি। কে জানে, এই কথাগুলো সত্যি কি না।

সে রসিকতার লোভে বলল, জানো সাহেব, মিথ্যে তিন রকম আছে — লাই, ড্যাম লাই আর স্ট্যাটিসটিকস!

কেউ এই রসিকতা উপভোগ করল না।

এই সব কথাবার্তা হচ্ছিল ইংরেজিতে। লো-জার্মান সম্ভূতা এই ভাষাটি সম্পর্কে বোধিসত্ত্বের কোনও অভিজ্ঞতা নেই, তাই তিনি বুঝতে পারলেন না। তিনি চুপ করে রইলেন।

ইনগ্রিড বললেন, তোমরা রাজনীতি আর চাষবাস নিয়ে কী সব বলতে শুরু করলে? এই গ্রাম্য লোকটি একটি অদ্ভুত কথা বলেছে! ঈশ্বরকে অস্বীকার করলেই নাকি মানুষের মঙ্গল? নোয়েল, তুমি এই লোকটিকে আরও প্রশ্ন করো!

নোয়েল এন্ডারসেন কপালে ও বুকে ক্রুশচিহ্ন এঁকে বললেন, ঈশ্বর এমনই করুণাময় যে, তিনি নিজ পুত্রকেও অবিশ্বাসী কিংবা বিরোধী হতে প্রশ্রয় দেন। কিন্তু ধর্মহীন জীবন পশুর জীবন। ধর্মাচরণ করে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার চেষ্টাই মানব-জীবনের একমাত্র সাধনা। এই সাধনার একটি পথ মানুষের সেবা। সব ধর্মেই সেবার কথা আছে।

রোজানা বলল, নোয়েল, তুমি ভুলে যাচ্ছ, এমন ধর্মও আছে, যাতে ঈশ্বরের স্থান নেই।

নোয়েল বললেন, জানি, জানি, তুমি বৌদ্ধধর্মের কথা বলছ তো। কিন্তু আমি মনে করি, ওটা নৈরাশ্যবাদীদের ধর্ম। ওই ধর্মে, মানুষের জন্মকেই একটি দুঃখের অভিজ্ঞতা বলা হয়েছে। আমি যেটুকু পড়েছি বা জেনেছি, তাতে আমি দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি, রোজানা, ওই ধর্ম আমার চায়ের কাপ নয়। ধর্মাবলম্বীরা শুধু নিজের মুক্তি চায়, দীন-দুঃখীর সেবার কথা বলে না।

ইনগ্রিড বললেন, যাই বলো আর তাই বলো, গৌতম বুদ্ধ ছিলেন সত্যি এক মহামানব। আমি তাঁকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করি। কোথাও তাঁর মূর্তি দেখলে শ্রদ্ধায় আমার মাথা নুয়ে আসে।

নোয়েল বললেন, নিশ্চয়ই গৌতম বুদ্ধ পরম শ্রদ্ধেয়। অবশ্য পৃথিবীর সব মানুষ তাঁর কথা ঠিকঠাক মেনে চললে এত দিনে পৃথিবী থেকে মানুষজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। সকলেই যদি নির্বাণ লাভ করত...।

রোজানা বলল, নোয়েল, তুমি বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি জানো না, তোমার জ্ঞান ভাসা ভাসা।

নোয়েল একটু আহত ভাবে হেসে বললেন, তোমার এত অল্প বয়সে তুমি এত বেশি জানলে কী করে রোজানা?

কারণ গোরুর চিকিৎসায় আমাকে সময় ব্যয় করতে হয়নি, আমি বেশি বই পড়েছি।

সুখেন্দু বলল, এ-কথা ঠিক, খ্রিস্টান ধর্মেই মানুষের সেবা করার কথা বেশি আছে। তারা সারা পৃথিবীতে সেবা প্রতিষ্ঠান চালায়।

নোয়েল বললেন, সব ধর্মেই সেবার কথা আছে। হিন্দু ধর্মে আছে, ইসলামে আছে। কিন্তু খ্রিস্টানরা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে সেবার কথা ভাবে। এক জন খ্রিস্টান সাধু অখ্রিস্টানকেও বুকে তুলে নেয়।

বিমলেন্দু মনে মনে বলল, হুঃ! তারপর সেই বোকাসোকা গরিব লোকগুলোকে ভুলিয়ে ভুলিয়ে খ্রিস্টান করে ফেলে! হিন্দু ধর্ম কত উদার, জানিস শালা? হিন্দুরা কখনও অন্য ধর্মের লোকদের ডেকে ডেকে হিন্দু বানায় না! আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলে তোদের সব ক'টা খ্রিস্টান মিশনারিকে ঝেঁটিয়ে তাড়াতাম।

রোজানা বলল, খ্রিস্টানরা বিশ্বব্যাপী উদারতা দেখায়, তার কারণ তাদের টাকা বেশি আছে।

সুখেন্দু বলল, আজকাল আরব শেখদের তুলনায় আমেরিকার কোটিপতিরাও গরিব। কিন্তু দ্যাখো না, আমাদের পাশের রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশকে আবার মুসলমান রাষ্ট্র বানিয়ে তারপর আরব শেখরা সেখানে টাকা ঢালছে। মুসলমান ছাড়া অন্য কারুকে সাহায্য করতে তাদের বয়ে গেছে।

রোজানা বলল, তোমরা হিন্দুরাও কোনও মুসলমান দেশকে কখনও সাহায্য করতে গেছ, এমন কথা ইতিহাসে নেই। যাই হোক, আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি, সেবার ব্যাপারটা আর কিছুই না, শুধু কিছু মানুষের আত্মম্ভরিতায় সুড়সুড়ি দেওয়া। খ্রিস্টানরা এত মিশন বানায়, কারণ তারা মনে করে, তারা অন্যদের থেকে উন্নত। ধর্মবিশ্বাসে তারা শ্রেষ্ঠ। যে-কোনও সৎ খ্রিস্টানই আত্মপ্রতারক!

ইনগ্রিড বললেন, রোজানা তুমি ক্যাজুইস্টদের মতো কথা বলছ। শুধু তর্ক করার জন্যই তর্ক। শুধু কুযুক্তি!

রোজানা বলল, যদি আমার কথা শুনতে খারাপ লাগে, তাহলে আমি চুপ করে যাই।

নোয়েল প্রশ্রয় দিয়ে বললেন, না না, তুমি বলো। সামান্য ঘরোয়া আলোচনায় কোনও ধর্মেরই কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না! খ্রিস্টানদের তুমি আত্মপ্রতারক কেন বললে? আমি নিজেকে এক জন খাঁটি খ্রিস্টান বলে মনে করি। আমি কি আত্মপ্রতারক?

রোজানা জোর দিয়ে বলল, নিশ্চয়! তুমি এই শতাব্দীর যা কিছু সুখ ও আরাম ভোগ করছ, তা সবই বাইবেল-বিরোধী। আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মই বাইবেল-বিরোধী বিশ্বাস থেকে। দেয়ারফোর টেক নো থট, সেয়িং, হোয়াট শ্যাল উই ইট? অর, হোয়াট শ্যাল উই ড্রিংক? অর, হোয়ার ইউদাল শ্যাল উই বি ক্লোথড?... ফর ইয়োর হেভেনলি ফাদার নোয়েথ দ্যাট ঈ হ্যাভ অব অল দিজ থিংস...সেন্ট ম্যাথু, চ্যাপ্টার সিকস্। নোয়েল, তুমি অস্বীকার করতে পারো যে, যিশুর এই বাণীটি প্রত্যাখ্যান করার জন্যই পশ্চিমী সভ্যতার এত সমৃদ্ধি! আমার চাই, আমরা চাই, আরও চাই — এই শব্দই তো শোনা যাচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে!

নোয়েল বললেন, রোজানা ডার্লিং, তুমিও বোধহয় যিশুর ওই বাণীটির সঠিক অর্থ বোঝোনি। যদি তুমি সঠিক ধর্মপথে থেকে ঈশ্বরের আরাধনা করো, তাহলে তোমার যা পার্থিব প্রয়োজন, তা ঠিকই মিটে যায়। ঈশ্বর জানেন, তোমার প্রয়োজন কী কী।

রোজানা আবার হেসে উঠল।

ইনগ্রিড বললেন, ধর্মপথে থাকলে ঈশ্বরের কাছ থেকে সবই পাওয়া যায়।

রোজানা বলল, যেমন তুমি পেয়েছ? অতুল সম্পত্তি! এটা কার ধর্মপথে থাকার জন্য, তোমার না তোমার প্রথম স্বামীর?

নোয়েল বললেন, শোনো, থামো ইনগ্রিড, আমি ওকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। তুমি যে গৌতম বুদ্ধের কথা বলছিলে, আমি পড়েছি, গৌতম বুদ্ধ এক জঙ্গলের মধ্যে বসে তপস্যা করছিলেন দিনের পর দিন। তিনি নিজের খাওয়ার চিন্তা করেননি, কিন্তু ঈশ্বরই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখলেন, সেই বনের মধ্যেও সুজাতা নামক একটি মেয়ে তাঁকে সুন্দর খাদ্য এনে দিল।

রোজানা বলল, প্রথম কথা, গৌতম বুদ্ধ ঈশ্বরের জন্য ধ্যান করেননি। তিনি নিরীশ্বর ছিলেন। তিনি ধ্যানে বসেছিলেন পরম জ্ঞান লাভের জন্য। দ্বিতীয় কথা, সুজাতা নামের মেয়েটির কাছ থেকে খাবার গ্রহণ করার জন্য গৌতম বুদ্ধ নিন্দিত হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে যে আর পাঁচজন ব্যক্তি ধ্যানে বসেছিলেন, তারা বুদ্ধকে যোগভ্রষ্ট এবং অসংযমী মনে করে সেই জায়গা ছেড়ে চলে যায়!

গৌতম বুদ্ধ অসংযমী? এই তথ্য তুমি কোথায় পেলে?

এটা খুবই জানা একটি সংবাদ। বহু নির্ভরযোগ্য বইতে আছে। এখানে উপস্থিত ভারতীয়দের জিজ্ঞেস করে দেখো, তাঁরা নিশ্চয়ই জানবেন!

সুখেন্দু ও বিমলেন্দু মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। সুখেন্দু মান বাঁচাবার জন্য বিড় বিড় করে বলল, হ্যাঁ, আছে বোধহয়!

রোজানা বলল, সেটা অবশ্য বুদ্ধের ব্যর্থতার কোনও প্রমাণ নয়। সিদ্ধি লাভ করার পর তিনি সেই পাঁচ জন শিষ্যকে খুঁজে বার কবলেন বেনারসের কাছে। সেই পাঁচ জন তখনও বুদ্ধকে দেখে অবজ্ঞা করছিল। বুদ্ধ তাঁদের কাছেই প্রথম প্রচার করলেন তাঁর নতুন ধর্ম। তিনি বলেছিলেন, যেমন ভোগ-বিলাসও ঠিক পথ নয়, তেমনি কিছু কিছু সাধুর মতো অতিরিক্ত আত্মনির্যাতনও মুক্তিপথে বাধা হয়। ক্ষত্রিয়দের প্রতিনিধি গৌতম ব্রাহ্মণ ধর্মের চেয়ে একটি সরল পথ বার করতে চেয়েছিলেন। একটি মধ্যপথ। সে যাই হোক, তোমার উপমাটি মাঠে মারা গেল।

চতুর্থ যে-বিদেশিটি এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি, দেয়ালে ঠেস দিয়ে চুপচাপ সিগারেট টেনে যাচ্ছিল, সে এবার বলল, একটু গরম কফি পান করলে বেশ হত!

বিমলেন্দু সঙ্গে সঙ্গে অতি উৎসাহ দেখিয়ে লাফিয়ে উঠে বলল, আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি স্যার!

সে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ইনগ্রিড বোধিসত্ত্বের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমরা এই লোকটিকে এতক্ষণ শুধু শুধু বসিয়ে রেখেছি। এ আমাদের কথা কিছুই বুঝছে না। কিন্তু কথা হচ্ছে নোয়েল, যে-লোকে ঈশ্বর বিশ্বাস করে না, তাকে কি আমরা এখানে সেবার কাজে রাখতে পারি? যদি নিজের অন্তরের গরজ না থাকে।

বোধিসত্ত্ব আবার মুখ খুললেন। ইনগ্রিডের দিকে তাকিয়েই তিনি বললেন, ঈশ্বর বা ধর্ম নিয়ে আলোচনায় সময় নষ্ট করে শুধু তারা, যাদের বুদ্ধি অপরিণত। যারা স্বভাবতই পরনির্ভর। বুদ্ধিমান মানুষ নিজের বিবেক অনুযায়ী পথ ঠিক করে নেয়। নিজের বিবেককে যুক্তি দিয়ে পরিচ্ছন্ন করার কাজেই সময়ের সব চেয়ে সার্থক ব্যবহার হয়।

সুখেন্দু একটু বিরক্ত ভাবেই কথাগুলি অনুবাদ করল।

ইনগ্রিড কিছু উত্তর দেবার আগেই রোজানা বলল, উনি একশো ভাগ ঠিক কথা বলেছেন। বহু শতাব্দী আগে, যখন সমাজ-ব্যবস্থা ছিল অতি সরল, যখন মানুষ নিজের ছোট গণ্ডির বাইরে পৃথিবী সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানেননি, তখন কয়েক জন, ভাল ধরনের লোক তাঁদের কাছাকাছি লোকদের জন্য কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। আজকের এই জটিল পৃথিবীতে সেই পুরনো আমলের কথাগুলোকেই ধর্ম বলে মান্য করা ছেলেমানুষি ছাড়া কিছুই না।

নোয়েল বললেন, তাহলে কি এই যুগে মানুষ ধর্মহীন হয়ে থাকবে? তাহলে মানুষে মানুষে বন্ধন থাকবে কীসের? অথবা এই যুগের জন্য নতুন কোনও ধর্মের প্রয়োজন।

সেটা ভেবে দেখা যেতে পারে। আমি এই লোকটির সঙ্গে আরও কথা বলতে চাই। মনে হয়, এই লোকটির চিন্তা পরিষ্কার। এক-এক সময় মানুষ নিজের কাছেই হেরে যায়। বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সামনে কোনও পথ দেখতে পায় না, তার বিবেকও তাকে কিছু নির্দেশ দিতে পারে না। সেই সময়কার নৈরাশ্য সে কাটিয়ে উঠবে কী করে? কোন সত্যকে আঁকড়ে ধরবে? এই উত্তর আমিও জানি না। এই লোকটি কি জানে।

রোজানা উঠে এসে বোধিসত্ত্বের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, হে কুমার সিংহ, আপনি কি আমাকে ঈশ্বর নিরপেক্ষ, ধর্ম-নিরপেক্ষ কোনও পরম সত্যের সন্ধান দিতে পারেন? কিংবা তার দরকার নেই। এমনিই আমি আপনার সঙ্গে বিরলে কিছু কথা বলতে চাই।

বোধিসত্ত্ব বললেন, হে কুমারী, তোমার মুখে বুদ্ধির দীপ্তি ও সততার ঔজ্জ্বল্য আছে। কিন্তু মনে হয়, তোমার অনুসন্ধান এবং আমার অনুসন্ধান আলাদা।

কেউ কারুর কথা এক বর্ণও বুঝতে পারলেন না।

ইনগ্রিড বললেন, আমি এই লোকটিকে পছন্দ করছি না।

নোয়েল ঝুঁকে পড়ে ইনগ্রিডের কাঁধে হাত রেখে বললেন, প্লিজ ইনগ্রিড, এই লোকটিকে আরও কয়েক দিন সুযোগ দেওয়া উচিত।

এই সময়ে বিমলেন্দু হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এল। তার হাতে কফি নেই, সে হাঁফাচ্ছে। সে একটু দম নিয়ে বলল, একটা সাংঘাতিক ব্যাপার হয়েছে। পূর্ণিমাদিকে সাপে কামড়েছে!

॥ ৫ ॥

সাপটি ছিল রান্নাঘরের পেছনে। সেখানে পূর্ণিমাদি কয়েক মাস আগে নিজের হাতে পাঁচটি কাঁচা লঙ্কাগাছ লাগিয়েছিলেন। এক দিন সেই গাছে সাদা সাদা ছোট ছোট ফুল ফুটল। তারপর ফল হল সেই ফুল থেকে। আশ্চর্য, ফুল ফুটেছিল সাদা রঙের, অথচ তার থেকে লঙ্কা হল কালো মিশমিশে। পূর্ণিমাদি যখন তখন সেই লঙ্কাগুলোকে আদর করতে যান। অনেকে ফুলগাছ ভালবাসে, কিন্তু পূর্ণিমাদির এই লঙ্কাগাছ-প্রীতি দেখে ঠাট্টা করত অনেকে। কতই-বা দাম কাঁচা লঙ্কার।

রান্নাঘরে উনুনে ছোলার ডাল চাপিয়ে পূর্ণিমাদি দৌড়ে এসেছিলেন দুটো কাঁচা লঙ্কা ছিঁড়ে নিয়ে যেতে। দৌড়ে এসেছিলেন বলেই দেখতে পাননি সাপটি লঙ্কাগাছের ঝিরঝিরে ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিল। পূর্ণিমাদি সেটার গায়ের ওপর পা দিয়ে ফেললেন। সাপটি প্রথমে পালাবার চেষ্টা করল, তারপর আবার কী ভেবে মুখ ঘুরিয়ে কামড়াল।

সেই অবস্থাতেও পূর্ণিমাদি একটা ইট তুলে সাপটাকে মারতে গেলেন। তার ব্যথাবোধের চেয়েও প্রতিশোধ-স্পৃহা প্রবল হল। তিনি ভাবলেন, তিনি তো আর বাঁচবেনই না। কিন্তু এই সাপটা যেন আর কারুকে না কামড়ায়। সাপটা তাঁর সাধের লঙ্কা গাছ পেঁচিয়ে রইল, ইট গায়ে লাগল না।

পূর্ণিমাদি রান্নাঘরে ফিরে এসে আস্তে আস্তে বসে পড়লেন মাটিতে, অনন্তকে ডেকে বললেন, অনন্ত, আমি গেলাম। আমার জিনিসপত্র আমার ভাইপোর কাছে পাঠিয়ে দিস। একবার বিকাশকে ডাকবি?

সবাই যখন ছুটে এল, তখন পূর্ণিমাদিকে ধরাধরি করে বারান্দায় এনে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। অনন্ত বুদ্ধি করে একটা গামছা দিয়ে বাঁধন দিয়েছে পায়ে। এর মধ্যেই নেশাগ্রস্তের মতো চোখ ঢুলু ঢুলু হয়ে এসেছে পূর্ণিমাদির, কিন্তু তিনি এতক্ষণের মধ্যে একবারও যন্ত্রণার শব্দ করেননি। বিকাশ এসেই ভয়ার্ত চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিল, একবার পূর্ণিমাদির মাথাটা কোলে নিয়ে বসল, পরক্ষণেই আবার মাথাটা নামিয়ে ছুটে গিয়ে স্টোর্স থেকে বিলিতি দড়ি নিয়ে এল। পূর্ণিমাদির হাঁটুর তলা থেকে উরু পর্যন্ত বাঁধন দিল চার জায়গায়।

সাহেবদের মধ্যে কিন্তু কোনও উত্তেজনা নেই। তারা সব কিছুর জন্য তৈরি থাকে। এই সাপ, বাঘ আর সন্ন্যাসীতে ভরা নোংরা জলকাদার দেশে তারা কি তৈরি না হয়ে আসবে? এর মধ্যে রজার্সের মাথা সব চেয়ে ঠাণ্ডা, সে বিশেষ কথা বলে না। সে হাঁটু গেড়ে বসে প্রথমে পূর্ণিমাদির পায়ের ক্ষতটা পবীক্ষা করে দেখল। তারপর দু'বার মাথা নাড়ল। অর্থাৎ, সাপটা সত্যি বিষাক্ত। সে হাত বাড়িয়ে দিল নোয়েল এন্ডারসেনের দিকে। নোয়েলের কাছে ওষুধের বাক্স।

ছুরি দিয়ে প্রথমে ক্ষতস্থানটা চিরে দিয়ে সেখানে ছড়িয়ে দিল একটা পাউডার। তারপর দিল ইঞ্জেকশান। এবার সে দাঁড়িয়ে দড়িব বাঁধনগুলো খুলতে লাগল। বিকাশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, এক্ষুনি বাঁধন খুলে দেবেন! চব্বিশ ঘণ্টা রাখতে হয় না?

রজার্স নিজের কাজ না থামিয়ে বলল, দবকার নেই।

উঠে দাঁড়িয়ে সে নোয়েল এন্ডাবসেনকে বলল, শি উইল বি ওকে!

সুখেন্দু জিজ্ঞেস করল, হাসপাতালে পাঠাবেন না?

রজার্স বলল, কোনও প্রয়োজন নেই।

সুখেন্দু কিন্তু এত বড় দায়িত্ব নিতে চায় না। মফঃস্বলের শহবগুলির মধ্যে বাঁকুড়া শহর এক দিক থেকে ভাগ্যবান, কারণ এখানে একটি মেডিক্যাল কলেজ আছে। অনেক ডাক্তার।

সে আবার বলল, এখানে খুব ভাল হাসপাতাল আছে। আমরা শুধু শুধু ঝুঁকি নেব কেন?

রজার্স কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ঠিক আছে, তাহলে পাঠাও। আমি যে-ইঞ্জেকশানটা দিয়েছি, তার নাম লিখে দিচ্ছি, ডাক্তারদের দেখিও।

বোধিসত্ত্ব এক পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। তিনি এক দৃষ্টিতে পূর্ণিমাদির মুখের দিকে চেয়ে আছেন। সেই মুখে মৃত্যুর ছায়া। বহুকালের সংস্কার অনুযায়ী পূর্ণিমাদি ধরেই নিয়েছেন যে, সাপে কামড়ালে মানুষকে মরতে হয়। সুতরাং মৃত্যুকে মনে মনে মেনে নিয়েছে, কোনও ওষুধ কি তাকে বাঁচাতে পারবে? এই হাসিখুশি সরল নারীটির জন্য বোধিসত্ত্ব খুব দুঃখ বোধ করলেন। কেন একে হঠাৎ সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে হবে? পূর্ণিমাদির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। ঠিক চন্দনের ফোঁটার মতো। বোধিসত্ত্ব শিউরে উঠলেন যেন।

পূর্ণিমাদিকে একটা স্ট্রেচারে তুলতে যেতেই তিনি মৃদু গলায় বললেন, না, আমি হাসপাতালে যাব না। আমাকে এখানেই শান্তিতে মরতে দাও।

সুখেন্দু বলল, আপনার কিচ্ছু ভয় নেই পূর্ণিমাদি। ওই সাপটাব বিষ নেই।

পূর্ণিমাদি বলল, আমি সাপ চিনি।

নোয়েল এন্ডারসেন তাকালেন রজার্সের দিকে। রজার্স গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, একশো ভাগ নিশ্চিত উনি বেঁচে যাবেন।

সুখেন্দুরা জোর করে পূর্ণিমাদিকে স্ট্রেচারে তুলল। পূর্ণিমাদি ছটফট করছেন। এখন সারা মুখে ঘামের ফোঁটা। স্ট্রেচারটা গাড়িতে তুলেই বিকাশ পূর্ণিমাদির পায়ে আবার বাঁধন দিতে গেল। এটাও তার সংস্কার যে সাপে-কাটা মানুষকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে হয়। রজার্স দৌড়ে গিয়ে বলল, প্লিজ! বেঁধো না! ও-রকম ভাবে বাঁধলে ওষুধটা রক্তে ছড়াবে কী করে?

ড্রাইভার উঠে বসেছে, গাড়ি এক্ষুনি ছাড়বে, বিকাশ পূর্ণিমাদির মাথা কোলে নিয়ে বসেছে। সেই সময় বোধিসত্ত্ব গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে পূর্ণিমাদিকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বাঁচার ইচ্ছে করে না?

এবার পূর্ণিমাদি একেবারে হাউ হাউ কেঁদে উঠলেন। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, ওগো, আমার সাধ আহ্লাদ কিছুই মিটল না। আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? আমাকে কেন যমে ধরল? আমি কী পাপ করেছি? বিকাশ, বিকাশ, আমার কপালে এই ছিল?

বোধিসত্ত্বের চোখে জল এসে গেল। সাধ আহ্লাদ এই শব্দ দু'টি কত সুন্দর। মৃত্যুপথযাত্রিনীর মুখে এই শব্দ মর্মান্তিকতম। বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, এমন কোনও অলৌকিক উপায় নেই, যাতে এই মেয়েটিকে বাঁচানো যায়! তিনি জানেন না! তিনি অসহায়!

বিমলেন্দু এসে বলল, আপনি সরুন, গাড়ি ছাড়বে!

বোধিসত্ত্ব গাড়ি থেকে হাত সরিয়ে নিলেন। গাড়িটা হুস করে বেরিয়ে গেল। তখন তিনি দেখলেন, রোজানা তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তিনি কাছে এগিয়ে যেতেই রোজানা বলল, আপনি কাঁদছেন কেন? ওই মহিলাটি তো বেঁচে যাবেন।

বোধিসত্ত্ব ওর ভাষা বুঝলেন না। তবু চোখ মুছলেন।

নোয়েল এন্ডারসেন বললেন, মাত্র দু'চার দিন আগেও যাকে চিনত না, তাব জন্যও কেউ কাঁদতে পারে! আশ্চর্য না? এই লোকটি বিচিত্র।

রোজানা বলল, আমার ইচ্ছে হয়, আমিও কারুর জন্য কাঁদি। কিন্তু আমাব অশ্রু নেই।

কয়েক জন উৎসাহী লোক এর মধ্যে সাপটাকে খুঁজে বার করে মেরেছে। একটা লাঠিব ডগায় সেটাকে ঝুলিয়ে নিয়ে এল ওদের সামনে। ইউনিটের আবও তিনটি মেয়ে সেই মবা সাপ দেখেই ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। নোয়েল এন্ডারসেন বললেন, কোয়াইট বিগ। এ-রকম সাপ নিশ্চয় আরও আছে।

সুখেন্দু বলল, কাল রাত্তিরে বৃষ্টি হয়েছিল তো, এই সাপটা আজ বেরিযেছিল। বর্ষা নামবার পর এ-দিকে প্রচুর সাপ দেখা যাবে।

রজার্স নিঃশব্দে চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়তে লাগল। অর্থাৎ ইউনিট নাম্বার ফাইভ-এর কার্যসূচিতে আর একটা জিনিস বাড়ল। ডুমুরগাছি গ্রামটিকে সাপমুক্ত করতে হবে।

সে-দিন বিকেলবেলা বোধিসত্ত্ব গেলেন বাঁকুড়া শহরের দিকে। তাঁর খালি পা। বিমলেন্দু সেই জন্য বলেছিল, মশাই, খালি পায়ে রাস্তায় ঘুরবেন না। আপনার কাছে তো কিছুই নেই। বড়সাহেবকে বলে কিছু টাকা অ্যাডভান্স নিন। তারপর এক জোড়া চটি জুতো অন্তত কিনুন।

বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, খালি পায়ে ঘুরলে পায়ে কাঁটা ফুটে যাবার কথা বুঝি বলেছে বিমলেন্দু। তা ফুটলই-বা কাঁটা। হাজার হাজার বছর ধরে কোটি কোটি মানুষ পায়ে হেঁটে ঘুরেছে এ দেশে।

বিমলেন্দুর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ইউনিটের ডাক্তার তপন চক্রবর্তী। সে বলল, খালি পায়ে হাঁটলে পা দিয়ে হুক ওয়ার্ম ঢুকে যাবে। এখানকার লোকদের বলে বলে কিছুতেই বোঝানো যায় না যে, মাঠেঘাটে পায়খানা করবে না। নিজেরাই রোগ ছড়াচ্ছে।

এই কথাটাই ভাবতে ভাবতে চললেন বোধিসত্ত্ব। জুতোটা তাহলে বিলাসিতার অঙ্গ নয়? সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনের বাহুল্য দেখা দিচ্ছে। এবং প্রত্যেকটির জন্য একটা যুক্তি তৈরি হয়েছে। চোখ থাকলে পথের কাঁটা বাঁচিয়ে হাঁটা যায়। কিন্তু পায়ের তলা দিয়ে ঢুকে যাবে অতি সূক্ষ্ম পোকা! একটা অদৃশ্য জীবজগৎ আছে, যা মাটিতে বাতাসে ছড়িয়ে থেকে মানুষকে সব সময় মারবার চেষ্টা করছে। যাঁরা ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন তারা কি ভাবে এই বীজানুপুঞ্জও ঈশ্বরের সৃষ্টি?

বড় রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বোধিসত্ত্ব এক সময় বাঁকুড়া শহরে পৌঁছে গেলেন। একটি চুপসে-যাওয়া নদীর ওপর দিয়ে সেতু। তারপর অজস্র দোকানপাট, বহু বড় বড় বাড়ি, অনেক মানুষ। মানুষের ভিড়ের ফাঁকে ফাঁকে চলে যাচ্ছে নানা রকমের গাড়ি।

কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করাব পর বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, এই নগরীরই কোথাও পূর্ণিমাদি রয়েছেন। এখনও বেঁচে আছেন কি? বিকাশ সারা দিনে আর ফিরে যায়নি। বোধিসত্ত্ব একবার ভাবলেন, পূর্ণিমাদির খোঁজ করবেন। সাধ-আহ্লাদ শব্দ দুটি তাঁর বার বার মনে পড়তে লাগল, কিন্তু বোধিসত্ত্ব যেন একটু ভয় পেলেন মনে মনে। তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি হতে চান না।

ঘুরতে ঘুরতে একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় রোডের ওপর একটা বড় গাছের নিচে বসে আছে একটি লোক। লোকটির একটা পা কাটা। সামনে একটা ময়লা ন্যাকড়া পাতা, তার ওপর দু'চারটে খুচরো পয়সা। লোকটি সামনে একটি হাত বাড়িয়ে রেখে চোখ বুজে ঝিমোচ্ছে। বোধিসত্ত্ব স্তম্ভিত ভাবে দেখতে লাগলেন লোকটিকে। এই লোকটি তাঁর দারুণ চেনা। এই লোকটির বয়েস অন্তত দু'তিন হাজার বছর। যুগের পর যুগ উধাও হয়ে গেছে, ঘটে গেছে কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, কত মানুষ এসেছে, ফের নিশ্চিহ্ন হয়েছে, কত আকাঙক্ষা, দীর্ঘশ্বাস মিশেছে হাওয়ায়, গ্রাম ভেঙে তৈরি হয়েছে শহর। কুঁড়েঘরের জায়গায় গজিয়ে উঠেছে প্রাসাদ, মানুষ বানিয়েছে নিজের থেকেও হাজার হাজার গুণ শক্তিশালী যন্ত্র, তবু তার মাঝখানে তিন হাজার বছরের ওই পুরনো মানুষটি বসে আছে ভিক্ষের জন্য হাত পেতে। যুগ-যুগান্তরে সে একটুও বদলায়নি। এই সুন্দর প্রশস্ত রাস্তাটির দু'দিকে বড় বড় বাড়ি, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে কত মানুষ, সবাই জানে সব কিছু বদলায়, শুধু ওই মানুষটি একই রকম রয়ে গেছে। ওর এ কী মোহনিদ্রা! কাছেই একটি খুব বড় অট্টালিকা তৈরি হচ্ছে, ঘট ঘট করে শব্দ হচ্ছে একটি বেখাপ্পা চেহারার সিমেন্ট মিক্সার যন্ত্রে। এই লোকটা যেন সেই শব্দও শুনতে পায় না, ও জানে না মাথার ওপর দিয়ে পার হয়ে গেছে কত কাল। ও ছিল কৌশাম্বীতে, বারাণসীতে, পাটলিপুত্রে, ঠিক এই রকম পথের ওপরে এক গাছতলায়, সামনের দিকে বাড়ানো হাত।

বোধিসত্ত্ব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ওই লোকটির একটি পা কাটা। নিশ্চযই ওরও সাধ-আহ্লাদ আছে।

ও দাদা শুনুন!

বোধিসত্ত্ব পেছন ফিরে দেখলেন, এক জন বেঁটে খাঁকি পোশাক-পরা লোক ডাকছে তাঁকে। লোকটি কাছে এগিয়ে এসে বললেন, দাদা, একটু হাত লাগাবেন এসে?

বোধিসত্ত্ব বুঝতেই পারলেন না, লোকটি কী বলতে চায়।

আসলে কাছেই একটা সাদা অ্যাম্বাসাডর গাড়ি থেমে আছে। এই লোকটি সেই গাড়ির ড্রাইভার। গাড়িটি ঠেলতে হবে। লোকটার ইঙ্গিতে বোধিসত্ত্ব গাড়িটার কাছে এলেন। গাড়ির মধ্যে স্থিরভাবে বসে আছে এক নারী। তাকে দেখে একটু চমকে উঠলেন বোধিসত্ত্ব, এ তো ঠিক অবিকল সেই মাটি-

কাটা কামিন লছমিয়া। সেই চোখ, সেই রকম নাক, যে-রকম বিষণ্ণ উদাস ভাবে সে তার মরদ হারানোর গল্প বলেছিল, নারীটি ঠিক সেই দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। অবশ্য এর রঙ অনেক পরিষ্কার, শাড়ি মূল্যবান, আঙুলে দীপ্তি পাচ্ছে মণিবসানো আংটি। তবু একে দেখলে লছমিয়ার কথাই মনে পড়ে। বোধিসত্ত্ব মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আরও অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেলেন।

ড্রাইভার এক হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে ঠেলতে লাগল সামনে থেকে। বোধিসত্ত্ব হাত লাগালেন পেছনে। গাড়িটা জীবন্ত হল না, ঠেলা খেয়ে গড়াতেই লাগল। সেইভাবে গাড়িটাকে নিয়ে বোধিসত্ত্ব সেই গাছতলার ভিক্ষুকটিকে পেরিয়ে গেলেন। তার মনে হল, এই দৃশ্যাবলীর মধ্যে একটা বিশেষ মানে আছে। রাস্তার পাশে বসে আছে ওই পা-কাটা মানুষটি, আর এই অক্ষম গাড়ির মধ্যে এক মহিলা।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর, ড্রাইভারটি ক্লান্ত হয়ে থামল। কপালের ঘাম মুছে সে বলল, নাঃ! এ এখন চলবে না। মিস্তিরি ডাকতে হবে, মাইজি!

মহিলাটি বলল, কতক্ষণ লাগবে?

সে তো বলতে পারছি না। মিস্তিরি এসে দেখবে, কোথায় ফেঁসে গেল কে জানে।

আমি এতক্ষণ বসে থাকব নাকি?

ড্রাইভার গাড়ির বনেট তুলে ফেলেছে। মহিলাটি বেরিয়ে এসে বোধিসত্ত্বের দিকে চেয়ে বলল, এই একটা রিকশা ডেকে দাও তো।

বোধিসত্ত্বকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করার একমাত্র কারণ, তাঁর পায়ে জুতো নেই। মুখখানাও ঠিক বাঙালিদের মতো নয়। তিনি মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে আছেন অপলক ভাবে। খালি পায়ের লোকেরা গাড়ি চড়া মেয়েদের দিকে এ-রকম ভাবে তাকায় না।

মহিলা একটু ভুরু তুলে রীতিমতো আদেশের সুরে বললেন, একটা রিকশা ডেকে দাও না!

বোধিসত্ত্বকে ডাকতে হল না, তখুনি একটা ফাঁকা সাইকেল রিকশা ঘণ্টা বাজিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। শাড়ির প্রান্ত সামান্য উঁচু করে মহিলাটি রিকশায় উঠে ঘাড় সোজা করে বসল। তারপর রিকশা চলতে শুরু করার পর শেষ মুহূর্তে একবার কৃপার দৃষ্টি দিল বোধিসত্ত্বের দিকে।

বোধিসত্ত্ব হাঁটতে লাগলেন বিপরীত দিকে। তিনি ওই মহিলাটির কথা ভাবছেন। এই প্রথম তিনি একটি নারীর কাছ থেকে আদেশ শুনলেন। কিন্তু ওই মেয়েটি একটি অপরিচিত মানুষকেও আদেশ করে কেন? সে কি শুধু রূপ আছে বলে? ও কি ধরে নিয়েছে সকলেই ওর রূপের জন্য লোলুপ? অথবা এর মধ্যেও আরও কিছু গভীর রহস্য আছে?

সেই দিন রাত্রে বিকাশ বোধিসত্ত্বের ঘরে এসে বলল, দাদা আপনার সঙ্গে দুটো কথা আছে।

রাত্রি ন'টা পর্যন্ত শেষ সংবাদ, পূর্ণিমাদি তখনও নিশ্বাস ফেলছেন। ডাক্তারেরা বলেছে, চব্বিশ ঘণ্টা না কাটলে কিছুই বলা যায় না।

বিকাশ চেয়ারের ওপর বসে বলল, হাসপাতালে প্রলাপের ঘোরে পূর্ণিমাদি বার বার আপনার নাম করছিলেন। ওঁর ধারণা আপনি এক জন সাধু পুরুষ। আপনি কি সত্যি সাধু?

বোধিসত্ত্ব বললেন, না।

কিন্তু আপনার হাবভাবের মধ্যে একটা সাধু সাধু ভাব আছে। আমিও লক্ষ করেছি।

সাধু কাকে বলে?

এই যারা সাধনা-টাধনা করে। সংসারে থাকে না। মানুষের মঙ্গল চায়। আজকাল অবশ্য অনেক ভণ্ড সাধুও আছে।

আমি কোনও সাধনা করি না। আমি কী চাই, তা এখনও জানি না।

সে কি ছাই আমরাই জানি? বঙ্কিমবাবুকে শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করেছিলেন, জীবনের উদ্দেশ্য কী? বঙ্কিমবাবু বলেছিলেন, আহার, নিদ্রা, মৈথুন। সোজা বাংলা কথা। আমরাও তো তাই করেই কাটাচ্ছি। তবে কোনও কোনও মানুষ বোধহয় আরও বেশি কিছু চায়। যাই হোক, যা বলতে এসেছিলাম। পূর্ণিমাদির ধারণা, উনি পাপ করেছেন, তাই এই শাস্তি পেলেন। আমি কতবার বোঝালাম, উনি কোনও পাপ করেননি। উনি তবু অবুঝ। উনি যদি মরেও যান, তাহলেও মৃত্যুর আগে এ-রকম একটা খারাপ ধারণা করে যাবেন, এটা ভাবতেই আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আপনি একবার গিয়ে বুঝিয়ে বলবেন যে, উনি সত্যি কোনও পাপ করেননি।

কিন্তু আমি তো পাপ-পূণ্য বিষয়ে কিছু জানি না।

উনি বোধহয় আপনার কথা শুনবেন।

কিন্তু আমি ওঁকে কী বলব? পাপের প্রশ্নই-বা উঠছে কেন?

আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলছি। পূর্ণিমাদি বয়েসে আমার চেয়ে দু'বছরের বড়। এখানকার বড় [illegible] ওঁকে পূর্ণিমাদি বলে, আমিও বলি। কিন্তু আমি ওকে ভালবাসি। দিদির মতো নয়, অন্য রকম

বোধিসত্ত্ব ভালবাসা শব্দটিকে কামনা অর্থে নিলেন। ভারতীয় ঐতিহ্যের যে টুকরো টুকরো স্মৃতি তাঁর মনে পড়ে, তার মধ্যে ভালবাসার কোনও স্থান নেই। সন্ত মহাপুরুষেরা মানুষকে ভালবাসতে বলেছেন। কিন্তু পুরুষকে বলেননি নারীকে ভালবাসতে। পুরুষ নারীকে হয় কামনা করবে অথবা কামনা ত্যাগ করে নারীবিমুখ হবে।

বিকাশ বলল, প্রথম প্রথম কিছু আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত পূর্ণিমাদিও আমাকে ভালবেসে ফেলেছিলেন। আপনি জানেন বোধহয়, উনি বিধবা?

বোধিসত্ত্ব ঘাড় নাড়লেন।

জীবনে উনি অনেক দুঃখকষ্ট পেয়েছেন। আমিও পেয়েছি। আমি বিয়ে করেছিলাম খুব অল্প বয়েসে। দু'টি ছেলে-মেয়ে আছে। বিয়ে করেছিলাম নিজে পছন্দ করে, প্রেম করে। কিন্তু সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল। আমার বউ এখন পাগল। বছরে আট ন'মাস তাকে রাখতে হয় নার্সিং হোমে, বাকি সময়টা বাড়িতে এসে থাকে, তা-ও ঠিক সুস্থ নয়। এক দিন আমাকে জ্বলন্ত স্টোভ ছুঁড়ে মেরেছিল। ডাক্তাররা বলেছে, ও কোনও দিনই আর পুরোপুরি সারবে না। বরং এই পাগলামির ঝোঁকটা আরও বাড়তে পারে। ছেলে-মেয়ে দুটোকে হস্টেলে রাখতে বাধ্য হয়েছি। আমার স্ত্রী গোপাকে এখানেও নিয়ে এসেছিলাম একবার, পনেরো দিনের বেশি রাখা গেল না। প্রথম প্রথম ভাল ছিল, হঠাৎ এমন গোলমাল শুরু করে দিল, এখানকার সবাই দেখেছে তাকে, পূর্ণিমাদিও দেখেছেন। আচ্ছা, পূর্ণিমাদিকে আপনার কেমন মনে হয়?

বোধিসত্ত্ব এ-কথার কী উত্তর দেবেন? এক জন মানুষ সম্পর্কে ধারণা গড়ে উঠতে কত দিন লাগে? তবু প্রথম দর্শনেই যা মনে হয়, সেই ভিত্তিতে তিনি বললেন, শরীরে দয়া আছে।

বিকাশ বলল, ঠিক তাই। মুখে সবাইকে চোপা করলে কী হবে? ওর মনটা খুব নরম। আমার স্ত্রীকে দেখে উনি খুব কষ্ট পেয়েছিলেন? আমাকে বলেছিলেন, আহা, এত ভাল মেয়েটা, সে আর ভাল হবে না? ওর ছেলে মেয়েরা পাবে না মায়ের স্নেহ!

বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞেস করলেন, মানুষ কেন পাগল হয়?

আরে দাদা, বড় ডাক্তাররাই এখন সে-কথার উত্তর দিতে পারে না। আমার দিক থেকে কোনও ত্রুটি ছিল না। আমি তো গোপার জন্য আমার যথাসাধ্য করেছি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ওদের ফ্যামিলিতে ওর এক মামা পাগল ছিলেন। এইটুকু হিস্ট্রি। সেই মামাকে গোপা চোখেও দেখেনি, অথবা তার জন্যই বিয়ের পাঁচ বছর বাদেই ছেলে-মেয়ের সংসার থাকলেও গোপাকে পাগল হয়ে যেতে হবে? এটা কীসের শাস্তি। এক-এক সময় যখন গোপা ভাল থাকে, আমার হাত চেপে ধরে বলে, ওগো, আমি কেন পাগল হলাম? আমার কান্না এসে যায়, বুঝলেন!

বিকাশের চোখ ছল ছল করে উঠল। বোধিসত্ত্ব মুখটা ফিরিয়ে নিলেন।

বিকাশ নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, গোপাকে তো আমি কোনও দিন ফেলতে পারব না! সারা জীবন তার খরচ টেনে যেতে হবে আমাকে, তা আমি যাব ঠিকই। কিন্তু আমার জীবনে কি আর কিছু থাকবে না? পূর্ণিমাদি জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন, আমিও পেয়েছি। দুঃখের জন্য আমরা কাছাকাছি এসেছিলাম। পূর্ণিমাদি বিধবা, আমার স্ত্রী থাকতেও স্ত্রী নেই। কিন্তু আমরা বিয়ে করতে পারব না। এ সমাজ সে-অধিকার আমাদের দেবে না। তবু যদি আমাদের ঘনিষ্ঠতা হয়, সেটা কি দোষের? আপনি বলুন, দোষের?

বোধিসত্ত্ব একটু অসহায় বোধ করলেন। তিনি তো বিচারক নন। তিনি এখানে কী মতামত দেবেন?

বিকাশ বলল, আপনি কাল সকালে চলুন আমার সঙ্গে। পূর্ণিমাদিকে একবার বুঝিয়ে বলুন। আপনি সাধু হোন আর না-ই হোন, উনি যখন আপনাকে সাধু বলে মনে করেছেন, তখন আপনার কথা মানবেন।

বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞেস করলেন, আমি কী বলব?

এই যে-সব কথা আপনাকে বুঝিয়ে বললাম, এতে কি আপনার মনে হয় আমরা কোনও অন্যায় করেছি? কারুকে ভালবাসাটা অন্যায়? এই যে এখানে রেখা, স্নিগ্ধা, দেবযানী — এই আরও তিনটি মেয়ে রয়েছে, এর মধ্যে দেবযানীকে সবাই সুন্দর বলে। কিন্তু ওদের কাছে তো আমি কখনও ছোঁক ছোঁক করতে যাইনি। আমি পূর্ণিমাদিকেই ভালবাসি, আমার চেয়ে বয়সে বড় হলেও। আর একটা কথা বলছি, আপনার কাছে কিছু লুকোব না, কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে। এত দিনের মধ্যে মাত্র এক দিন আমরা এক সঙ্গে শুয়েছিলাম। তা-ও সেটা হঠাৎ হয়ে গিয়েছিল, আমরা আগে থেকে কেউ কিছু ঠিক করিনি, যেন ঠিক চুম্বকের মতো, সে-দিন পূর্ণিমাদি অনেকক্ষণ কেঁদেছিলেন। আমিও কেঁদেছিলাম গোপার কথা ভেবে, কিন্তু বলুন তো, এটা কি পাপ? আপনি ঠিক করে বলুন।

বোধিসত্ত্বের মনে পড়ল একটা কথা। যে-সব নারী মাতৃরক্ষিত, পিতৃরক্ষিত, মাতৃপিতৃরক্ষিত, ভ্রাতৃরক্ষিত, ভগিনীরক্ষিত, আত্মীয়রক্ষিত, সস্বামীক, বাগ্‌দত্তা এবং যার সঙ্গে মিলন শাস্তিযোগ্য, এই রকম মেয়েদের সঙ্গে সহবাস করা অন্যায়। বাকি রইল কে? নিজের স্ত্রী এবং বেশ্যা। কিন্তু এই বিধান তিনি উচ্চারণ করতে পারলেন না। শ্রাবস্তীর জেতবনে ঘোষিত হয়েছিল এই বিধান। তবু তাঁর খটকা লাগল। বিকাশের মুখের দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন। এই কি পাপীর মুখ?

কী দাদা, চুপ করে রইলেন কেন, বলুন!

আমি জানি না।

বিকাশ এবার ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, আপনি জানেন না? আপনাকে সব খুলে বললাম। তবু আপনি বুঝতে পারছেন না? এক জন অসহায় স্ত্রীলোক মরার আগে ভেবে যাবে, সে পাপ করেছিল? যদি এই চিন্তার জন্যই সে মরে, তাহলে আমি সারা জীবনে শান্তি পাব? পূর্ণিমাদি বিয়ের ঠিক দেড় বছর পর বিধবা হয়েছিলেন, তাঁর জীবনে আর কোনও সাধ-আহ্লাদ থাকবে না? এই আপনাদের

সাধু-ফাদুদের বিধান? আমি যদি গোপাকে ত্যাগ করি, তার কোনও চিকিৎসা হবে না, তাকে দেখবার কেউ থাকবে না। আর তা যদি না করি, তাহলে আমি সারা জীবন শুধু আমার পাগল বউয়ের সেবা করে যাব? বলুন, জবাব দিন!

বোধিসত্ত্বের সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, আমি সাধু নই।

না-ই হলেন সাধু! মানুষ তো। এক জন সাধারণ মানুষের বিচার-বুদ্ধিতে কী বলে, সেটুকু অন্তত বলতে পারবেন না!

আমাকে একটু চিন্তার সময় দিন। আজ রাতটা ভেবে দেখি।

দেখুন ভেবে! কাল সকালে আপনাকে নিয়ে যাব!

বোধিসত্ত্বের দিকে একটু রুষ্ট দৃষ্টি নিয়ে বেরিয়ে গেল বিকাশ।

তিনি চুপ করে বসে রইলেন। তাঁর একটু একটু করে মনে পড়ে যাচ্ছে শাস্ত্রের কথা। সব শাস্ত্র মানুষকে বলেছে সংযমী হতে। শাস্ত্র যাঁরা রচনা করেছেন, তাঁরা কি জানতেন যে, অনাত্মীয় নারী-পুরুষ নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে অন্য কোথাও পাশাপাশি থেকে কাজ করবে? কাছাকাছি কোয়ার্টার, এখানে যারা থাকে, তারা কিছু দিন আগেও কেউ কারুকে চিনত না। কুমারী মেয়েরাও এখানে কাজ করে। এই মেয়েরা মাতা-পিতা, ভাই-বোন, আত্মীয়দের দ্বারা রক্ষিত নয়, এরা বেশ্যাও নয়, এরা স্বাবলম্বী। এদের বিবাহের সুযোগ হয়নি কিংবা অন্য কোনও অসুবিধা আছে। স্বাবলম্বী মেয়েদের যৌনজীবন সম্পর্কে শাস্ত্রকাররা কিছুই লিখে যাননি। বিকাশ একটা কথা বলেছিল, ঠিক যেন চুম্বকের মতো...।

কাল সকালে বিকাশ তাঁকে নিয়ে যাবে পূর্ণিমার কাছে। সেখানে তিনি কী বলবেন? সত্যি মিথ্যে যাই হোক, মৃত্যুপথযাত্রিণীকে যদি তিনি বলেন, না, আপনি কোনও পাপ করেননি, সেটা দোষের? তিনি সে-কথাই বলবেন।

বোধিসত্ত্ব অনেকক্ষণ বসেছিলেন স্থির হয়ে। তিনি খেয়াল করেননি, কখন বৃষ্টি নেমেছে। জানলা দিয়ে ঢুকেছে জলকণা-মিশ্রিত হাওয়া। বেশ খানিকটা বিছানা ভিজে যাওয়ায় তিনি উঠে এলেন জানলা বন্ধ করার জন্য। সেই সময় দড়াম করে কোথাও বজ্রপাত হল। তার পরও সারা আকাশ চিরে প্রচণ্ড একটা শব্দ ঘুরতে লাগল। সেই শব্দের মধ্যে কেউ যেন ডেকে উঠল, মৈত্রেয়! মৈত্রেয়!

বোধিসত্ত্ব চমকে উঠলেন। বিদ্যুৎ ঝলকের দিকে তাকিয়ে তিনি শুনলেন যেন এক দৈববাণী।

মেঘের গর্জনের মধ্যে স্বর মিশিয়ে কেউ বলল, মৈত্রেয়, মৈত্রেয়, আপনি তোষিত স্বর্গ ছেড়ে নেমে এসেছেন এই উদভ্রান্ত পৃথিবীতে। আপনি লুপ্ত সত্যের পুনরুদ্ধার করবেন। সত্যের প্রতিষ্ঠা করবেন। আমরা প্রতীক্ষায় আছি।

বোধিসত্ত্ব কিছুই বুঝতে পারলেন না। কে কার উদ্দেশে বলছে এই সব কথা। কে মৈত্রেয়? কোথায় তোষিত স্বর্গ? লুপ্ত সত্যের পুনরুদ্ধার করবেন কে? সত্য কী? সকালবেলা সাহেবদের সামনে তিনি হঠাৎ বলে ফেলেছিলেন যে, মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য সত্যের অনুসন্ধান। কিন্তু তিনি নিজেই তো জানেন না, প্রকৃত সত্য কাকে বলে।

যিনি লুপ্ত সত্য উদ্ধার করতে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হলে বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞেস করতেন, পূর্ণিমাদি পাপী কি না?

॥ ৬॥

ভোরবেলা পূর্ণিমাদির মৃত্যু সংবাদ এল। খবর শুনে বিকাশ নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে রইল, অন্যদের ডাকাডাকিতেও বেরুল না কিছুক্ষণ। বিকাশের সঙ্গে পূর্ণিমাদির সম্পর্কের ব্যাপারটা এখানকার সবাই মোটামুটি জানে।

সকলে ডাইনিং হলের সামনের চত্বরটায় এসে দাঁড়িয়েছে। কথা বলছে ফিস ফিস করে। সব চেয়ে বেশি বিমর্ষ হয়ে গেছে কিম রজার্স। সাপে কামড়াবার পর এত তাড়াতাড়ি ওষুধ আর ইঞ্জেকশান দেওয়া হল, এতে তো কারুর মরবার কথা নয়। কোনও সাহেবের বাচ্চা হলে কিছুতেই মরত না। ভারতীয়রা বুঝি এমনিতেই মৃত্যুপ্রবণ। নোয়েল এন্ডারসেন পরবর্তী ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করছেন সুখেন্দুর সঙ্গে। পূর্ণিমাদির কোনও আত্মীয় স্বজনকে কী-ভাবে খবর দেওয়া যাবে, সেটাই হল এক সমস্যা। তাঁর সে-রকম কোনও আত্মীয়ের ঠিকানা কারুর জানা নেই।

পূর্ণিমাদির দেহ নিয়ে আসবার জন্য যখন এখানকার গাড়ি তৈরি হল, এখন সেই শব্দ শুনে বেরিয়ে এল বিকাশ। তার মুখমণ্ডল শান্ত। সে বলল, আমিও যাব।

বোধিসত্ত্ব ভিড়ের আড়ালে লুকিয়ে রইলেন। তিনি বিকাশের সামনে যেতে ভয় পাচ্ছেন। তার চোখের দিকে চোখ ফেলতেও পারছেন না।

কিন্তু বিকাশই এ-দিক ও-দিক খুঁজে বোধিসত্ত্বকে দেখে জিজ্ঞেস করল, আপনি যাবেন না আমার সঙ্গে?

বোধিসত্ত্ব কোনও রকম প্রতিবাদ না করে গাড়িতে উঠে পড়লেন। বিকাশ স্পষ্ট ধারালো চোখে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। বোধিসত্ত্ব বিকাশের হাত চেপে ধরে ফিস ফিস করে বললেন, উনি পাপ করেননি।

ফেরার পথে পূর্ণিমাদির শরীরটি শোওয়ানো হল গাড়ির মধ্যে। বিকাশ পাশে পূর্ণিমাদির শরীর ছুঁয়ে রইল। বোধিসত্ত্ব সেখানে বসতে পারলেন না, তিনি চলে গেলেন ড্রাইভারের পাশে।

পূর্ণিমাদির মুখের দিকে তিনি একবার মাত্র তাকিয়েছিলেন। কী প্রফুল্ল, কী জীবন্ত সেই মুখ। অথচ রাত্রে-ফোটা ফুল যেমন দিনেরবেলা একটু একটু করে শুকিয়ে যায়, এই মুখ সেই রকম বিবর্ণ হয়ে যাবে। পূর্ণিমাদি যাবার সময় যে সাধ-আহ্লাদ শব্দ দু'টি উচ্চারণ করেছিলেন, সে কথা মনে পড়ল বোধিসত্ত্বের। তাঁর বুক মুচড়ে কান্না এল।

পূর্ণিমাদির শব এনে শোওয়ানো হল যেখানে, তখন সেখানে দুধ নেবার জন্য গ্রামবাসীদের লম্বা লাইন পড়েছে। স্বয়ং নোয়েল এন্ডারসেন অনন্তকে সঙ্গে নিয়ে দুধ গুলছেন। কোনও কাজই থেমে থাকবে না। তিনি একবার উঠে এসে মৃত্যুর সামনে দাঁড়ালেন নতমস্তকে। বিড় বিড় করে বললেন, ইনি ছিলেন এক জন মহান মহিলা। ঈশ্বর এঁকে নিজের কাছে আশ্রয় দেবেন।

ইনগ্রিডের মাথায় আজ টুপি নেই। অঞ্জলি ভরে এনেছেন শিউলি ফুল। সেই ফুল ছড়িয়ে দিলেন পূর্ণিমাদির শরীরে। তিনিও উচ্চারণ করলেন বাইবেলের দু'টি লাইন। রোজানা দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে, তার দৃষ্টি উদাস। যারা দুধ নিতে এসেছে, তারাও অনেকে দৌড়ে গিয়ে শিউলিতলা থেকে ফুল কুড়িয়ে নিয়ে এল। ইউনিটের লোকেরাও একে একে এসে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে গেল, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল কয়েকটি মেয়ে।

বোধিসত্ত্ব নোয়েল এন্ডারসেনের পাশে গিয়ে দুধের হাতাটা তুলে নিলেন। কাল ঠিক এই সময় এখানে দাঁড়িয়েছিলেন পূর্ণিমাদি। এখনও বাতাসে যেন ভেসে বেড়াচ্ছে তাঁর নিশ্বাস।

সব চেয়ে চমকপ্রদ [illegible] ফিরে এল কিম রজার্স। তার হাতের লোহার রডে ঝুলছে তিনটে মরা সাপ। ভোরবেলা দুঃসংবাদ শুনেই সে কোথায় যেন বেরিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ সাপ মারার ইচ্ছে হলেই তো আর সাপ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবু সে কোন পরমাশ্চর্য উপায়ে খুঁজে খুঁজে তিনটে সাপ মেরে এনেছে, কে জানে। ঠিক ফুলের মতো সে সাপগুলোকে রাখল পূর্ণিমাদির পায়ের কাছে। একটি কথাও উচ্চারণ করল না।

নোয়েল এন্ডারসেন বললেন, এইবার মৃতদেহটি সরিয়ে নিয়ে যাও। এখন দুধ দেওয়া হবে।

পূর্ণিমা সরকারের সঙ্গে এ পৃথিবীর সম্পর্ক এখানেই শেষ হয়ে গেল।

সন্ধের পর রোজ এখানে একটি আসর বসে।

নোয়েল এন্ডারসেন বেডেন পাওয়েলের শিষ্য। ক্যাম্পজীবনে সারা দিনের কাজকর্মের পর একটুখানি সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন। তাই প্রতি সন্ধ্যায় এখানে ক্যাম্প ফায়ার হয়। কয়েকটা চ্যালাকাঠে আগুন জ্বেলে মাঝখানে রেখে ইউনিটের কুড়ি জন গোল হয়ে বসে। আজ উনিশ জন।

প্রতি সন্ধ্যায় এদের মধ্য থেকে পালা করে পাঁচজনকে কিছু একটা করতে হয়। যে যা পারে। গান, কবিতা, আবৃত্তি, কোনও কৌতুক চুটকি বা গল্প। যে কিছুই পারে না, তাকেও উঠে দাঁড়িয়ে পাঁচ মিনিট কিছু না-কিছু বলতেই হবে। এমনকী নোয়েল এন্ডারসেনও বেসুরো গলায় গান গেয়ে ওঠেন।

সে-দিন যাবা উঠলেন, সকলেই বলল, পূর্ণিমাদির কথা। টুকরো টুকরো স্মৃতি। দেবযানী গাইল একটি গান — আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু। নোয়েল এন্ডারসেন হঠাৎ বোধিসত্ত্বকে অনুরোধ করলেন কিছু বলবার জন্য।

বোধিসত্ত্ব প্রথমে কয়েক বার আপত্তি জানালেন। কিন্তু তা কেউ মানলেন না। গান না জানলেও এখানে গাওয়া যায়, গল্প বলতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেললেও সেটা একটা মজার ব্যাপার।

বোধিসত্ত্ব উঠে দাঁড়ালেন। সকলের চোখ তাঁর দিকে। কাঠের আগুনের শিখায় তাঁর গৌরবর্ণ মুখখানি লালচে দেখায়। তিনি কী বলবেন, চিন্তা করতে লাগলেন। পূর্ণিমাদি সম্পর্কে অন্যরা যা বলেছে, তার বাইরে তাঁর কিছু বলার নেই।

তিনি একটুক্ষণ চুপ করে দূরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ তার চোখে একটা দৃশ্য ভেসে উঠল। তিনি বলে উঠলেন, এক জন মানুষ যাচ্ছে...সে একা...বড় বিপদসঙ্কুল পথ, এক সময় পথ হারিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে... ঘোর অন্ধকার বন, অনেক রকম হিংস্র জন্তু রয়েছে সেখানে, পথিকের থামবার উপায় নেই, ফিরে যাবারও উপায় নেই। কেননা সে এসেছে খুব দুঃখময় জায়গা থেকে। যেখানে রয়েছে রোগ, মহামারী, নানা রকম অন্যায়, চোর-ডাকাতের ভয়, পথিককে সামনে যেতেই হবে...অতিকষ্টে সেই বিপদ-ভরা বন পার হয়ে পথিক এসে পৌঁছল এক নদীর পারে। নদীর ও-পারে বিন্দু বিন্দু আলো জ্বলছে। পথিকের মনে হল, নদীর ও পারে [illegible]। ও-দিকে কোনও ভয় নেই। পথিকের একমাত্র উপায়, সেই নদী পার হয়ে ও-পারে সেই ভয়শূন্য স্থানে পৌঁছনো। কিন্তু নদীটিতে নিদারুণ স্রোত। এখানে কোনও খেয়াঘাট নেই, [illegible] নেই কোনও নৌকো। কেউ তাকে সাহায্য করবে না। বরং যে-কোনও মুহূর্তে আক্রান্ত হবার ভয়। তখন পথিক গাছের ডালপালা সংগ্রহ করল, খুঁজে আনল কিছু শক্ত লতা, তারপর তৈরি করল [illegible]। তারপর সেই ভেলায় চড়ে সেই বিপজ্জনক নদী পার হয়ে এল কোনওক্রমে ..।

এ-পারে এসে, সুখের দীর্ঘশ্বাস ফেলার পরই পথিকের মনে হল, [illegible] ওই ভেলাটি। এখন তাকে নদীর পাড়ে ছেড়ে যেতে হবে [illegible] দিকে। কিন্তু ওইরকম উপকারী ভেলাটিকে সে কি রেখে যাবে সেখানেই [illegible]?

এই পর্যন্ত বলে বোধিসত্ত্ব চুপ করলেন।

সুখেন্দু ফিস ফিস করে সব কথাগুলো মোটামুটি অনুবাদ করে শুনিয়ে যাচ্ছিল বিদেশি চার জনকে।

নোয়েল এন্ডারসেন বললেন, বাঃ! এটি একটি [illegible] প্রশ্ন। যে ভেলাটি তার জীবন বাঁচিয়েছে, সেটা কি সে ফেলে যেতে পারবে? তার মায়া হবে নিশ্চয়ই।

ইনগ্রিড বললেন, কিন্তু মাটির ওপর দিয়ে যাবার সময় একটা ভেলা কাঁধে করে যাওয়া হবে অতি নির্বোধের কাজ।

সুখেন্দু বলল, যদি আবার লাগে? যদি আবার ওই রকম একটা নদী আসে?

নোয়েল এন্ডারসেন বললেন, বোঝাই যাচ্ছে, এটা একটা রূপক। পথিক দুঃখের স্থান থেকে সুখের স্থানে পৌঁছে গেছে। তার আর ভেলার প্রয়োজন হবে না। সুতরাং আমার মনে হয়, পথিকের উচিত হবে ভেলাটিকে সেই নদীর ধারেই বেঁধে রাখা, যাতে অন্য লোকের কাজে লাগে। অন্য কেউ এ-পারে আসতে চাইলে ভেলাটি ব্যবহার করতে পারবে। পথিক এইভাবে অনেক উপকার করবে।

রোজানা হেসে বলল, নোয়েল, তোমার কথামতো এটি যদি রূপক হয়, তাহলে এ-পারের লোকদের তো ভেলাটা কোনও কাজেই লাগবে না! সুখের জায়গা ছেড়ে কে দুঃখেব জায়গায় যাবে? ভেলা তো লাগবে দুঃখের জায়গা থেকে সুখে আসবার জন্য। এ-পারে ভেলাটা থাকাই বরং খারাপ, যদি কেউ ভুল করে ওই ভেলায় চেপে যায়।

এ-পার থেকে কেউ ওই ভেলা নিয়ে গিয়ে ও-পার থেকে আর কারুকে উদ্ধার করে আনতে পারে।

রূপক অনুযায়ী, ভেলাটি শুধু এক জনের জন্যই হওয়া উচিত।

ও আই সি। তাহলে, কুমার সিংহ, আপনিই আপনার ধাঁধাটির জবাব দিন।

বোধিসত্ত্ব বললেন, আমি একটু ভুল বলেছিলাম।

কয়েক জন হেসে উঠলেন।

বোধিসত্ত্ব বিমর্ষ ভাবে বললেন, আমি ধাঁধা জিজ্ঞেস করিনি। যে-পথিক ভেলা নিয়ে ও-পারে পৌঁছে গেছে, সে ভেলাটি নিয়ে কী করবে সেটা তার সমস্যা। খুব বড় সমস্যা নয়। কিন্তু আমার হঠাৎ মনে পড়ল, আমি বা এখানকার যে কেউ যদি একা কখনও সেই রকম নদীতীরে উপস্থিত হই, যখন আর পেছনে ফেরা যাবে না, তখন একলা কি সেই ভেলাটি তৈরি করে নিতে পারব? পারব কি সেই নদী পার হতে? সে-জন্য কি আমরা প্রস্তুত হচ্ছি?

স্বল্পভাষী কিম রজার্স ঝুঁকে পড়ে সুখেন্দুকে বলল, ওকে বলে দাও, ইংরাজিতে একটা কথা আছে, নদীটা কী করে পার হব, সেটা সেখানে উপস্থিত হবার পর ভাবব।

রোজানা বলল, ঠিক বলেছ, কিম। এই রকম বেপরোয়া গোঁয়ার ভাবনার জন্যই পশ্চিম জগৎ এত পার্থিব উন্নতি করেছে। আর এই লোকগুলি আগে থেকেই ভাবে পারলৌকিক মুক্তির কথা। তা-ও একা একা। সেই জন্যই এরা একই সঙ্গে জ্ঞানী এবং নির্বোধ।

সে-দিন গভীর রাত্রে বোধিসত্ত্ব ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর কিছুতেই ঘুম আসছিল না। একটু চোখ বুঝলেই তিনি দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখছেন। কোনওটাই এ-কালের নয়। প্রতিটি দৃশ্যেরই যা পরিণতি, কোনওটাই তাঁর মনঃপূত হচ্ছে না। যেন এগুলো স্বপ্ন, বোধিসত্ত্ব তাঁর স্বপ্নকেও বদলাতে চাইছেন। এর চেয়ে জেগে থাকা ভাল।

তাঁদের এলাকা ছাড়িয়ে বোধিসত্ত্ব হাঁটতে লাগলেন গ্রামের মধ্য দিয়ে। ঘুমন্ত গ্রামটিকে এখন জীবনহীন মনে হয়। অথচ এরই মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে লক্ষ লক্ষ প্রাণের।

গ্রাম ছাড়িয়ে তিনি এলেন মাঠের মধ্যে। শুক্লপক্ষ হলেও আকাশে ভাঙা ভাঙা মেঘ। কখনও একটু জ্যোৎস্না বেরিয়ে পড়ে। আকাশের দিকে তাকালে মনে হয় ওখানে অবিরাম এক খেলা চলছে। আকাশের অসীম বিশালত্বের জন্য সব কিছুই মনে হয় অতিপ্রাকৃত।

হাঁটতে হাঁটতে বোধিসত্ত্বের দু-একবার মনে পড়ল সাপের কথা। মাঝে মাঝে ভয় জাগছে, তিনি সেটাকে দমন করছেন। শুধু সাপ কেন, তিনি খালি পায়ে হাঁটছেন, পায়ের তলা দিয়ে নাকি অতি সূক্ষ্ম বীজাণু ঢুকে যায়। মানুষের বেঁচে থাকার কত রকম বাধা!

তবু এই ভাঙা ভাঙা জ্যোৎস্না ও বিশাল একাকিত্বের মধ্যে কোথায় যেন একটা হালকা বাঁশির শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছে। এই বাঁশির কোনও বাদক নেই। মধ্যরাত্রির আকাশ নিঃসঙ্গ পথিককে এই মধুর শব্দ উপহার দেয়।

সেই ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিগন্ত-ঘেরা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে বোধিসত্ত্ব ঠিক করলেন, এই জীবনকে তিনি আরও অনেক দূর পর্যন্ত দেখবেন। এই জীবন-যাপনের মধ্যে কোন সত্য আছে, তা না জানলে চলবে কেন?

॥ ৭॥

বোধিসত্ত্ব একটি দু'কামরার ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন বরানগরে। প্রত্যেক দিন তিনি ভিড়ের বাসে চেপে কটন স্ট্রিটে একটি বিল্ডিং কন্ট্রাক্টরের ফার্মে হিসাবরক্ষকের কাজ করতে যান। এই কাজটি তাঁকে জোগাড় করে দিয়েছে বিকাশ। বোধিসত্ত্বের দুর্ধর্ষ অঙ্ক জ্ঞান দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কঠিনতম গণিতের সমস্যা তিনি কয়েক লহমায় সমাধান করে দেন।

এর জন্য অবশ্য বোধিসত্ত্বের কোনও আলাদা কৃতিত্ব নেই। তিনি সব কিছুই বলেন স্মৃতি থেকে।

ওয়েলফেয়ারের ইউনিট নাম্বার ফাইভে তিনি মাস চারেক ছিলেন। শেষে প্রায় তাঁর কারণেই সেখানে একটি দাঙ্গা বেধে যায় এক দিন। অনাবৃষ্টির জন্য এবার বাঁকুড়ায় ফসল কিছুই হয়নি। কংসাবতী প্রজেক্টের কাজ চলছে তো চলছেই, সেখান থেকে কবে যে সেচের জল আসবে তার কোনও ঠিক নেই। এমনিতেই বাঁকুড়া খরা-পীড়িত এলাকা, এবার অতি খরায় চারদিকে হাহাকার পড়ে গেল। এর মধ্যে একমাত্র সৌভাগ্যবান ডুমুরগাছি গ্রাম। এখানে আছে ডিপ টিউবওয়েল আর দশখানি ডিজেল পাম্প। আশেপাশের গ্রামের রোদে দগ্ধ জমির মাঝখানে ডুমুরগাছি যেন একটা সবুজ দ্বীপ। এ ছাড়া ওয়েলফেয়ার-এর কেন্দ্রীয় অফিস থেকে এসেছে একশো টন গম, যা থাকবে মজুত ভাণ্ডারে। ওয়েলফেয়ার-এর পোষ্য এই গ্রামটি যেন কোনওক্রমেই আদর্শ জীনযাত্রার মান থেকে বিচ্যুতি না হয়।

ফলে ওয়েলফেয়ার ইউনিট নাম্বার ফাইভের বিতরণ কেন্দ্রের কাছে ভিড় করে থাকে কাঙালিরা। তারা অন্য গ্রামের লোক। দিন দিন এদের সংখ্যা বাড়ছে। এদের সামলাবার জন্য, দৈনিক এক-একটি কনস্টেবলকে বত্রিশ টাকা ভাড়ায় বারো জন কনস্টেবলকে আনানো হয়েছিল বাঁকুড়া শহর থেকে।

হঠাৎ বোধিসত্ত্ব এক দিন স্টোরের দরজা হাট করে খুলে দিয়ে সেই কাঙালিদের ডেকে এনে বললেন, এসো, তোমরা এসো।

লোকগুলো হুড়মুড় করে ছুটে এসে বোধিসত্ত্বকে মাটিতে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে লুটপাট শুরু করে দিল।

বিকাশ এসে ব্যাকুল ভাবে বলল, এ কী করলেন দাদা? আপনার মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে? এ-ভাবে ক'জনকে আপনি বাঁচাতে পারবেন?

বোধিসত্ত্ব আস্তে আস্তে উত্তর দিয়েছিলেন, জানি না। আমার হঠাৎ এ রকম মনে হল।

বিকাশ বলেছিল, সর্বনাশ হয়ে যাবে! আমাদের হিসেব বানচাল হয়ে যাবে!

বোধিসত্ত্ব বলেছিলেন, আমাদের হিসেব কি সঠিক? অন্য অনেক মানুষের মৃত্যুকে উপেক্ষা করে কিছু লোককে বাঁচানো?

ইউনিট নাম্বার ফাইভের স্থানীয় পরিচালক সুখেন্দু বসু এই কারণে কুমার সিংহকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হলেন। সাহেবরা কেউ তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং বোধিসত্ত্বের হয়ে কোনও রকম আপিল করা চলল না। তার ফলে বোধিসত্ত্বের আবার নবজন্ম হল।

বোধিসত্ত্বের এখনকার অফিসটি একটি অত্যন্ত পুরনো বাড়ির ছ'তলার ওপর। এক কালে যুদ্ধের সময় মাঠের মধ্যে সৈন্যদের তাঁবু থাকত খুব ঘেঁষাঘেঁষি করে, এই বাড়িটিতেও সে-রকম ঘেঁষাঘেঁষি করে অসংখ্য অফিস। একটা ঝরঝরে লিফট চলে ঘ্যাড় ঘ্যাড় করে, তার ভেতরে যে লিফটম্যান, সে সব সময় ঝিমোয়। দেয়ালের কোণে কোণে পানের পিকের দাগ।

কুড়ি বাই পনেরো ফিটের একটি ঘরে এই অফিস, এরই মধ্যে বসে এগারো জন নারী-পুরুষ কর্মচারী। এ ছাড়া বাথরুম সাইজের একটি ঘরে বসেন মালিক। ইনি বাঙালি। কিন্তু যদিও এঁর পদবি ছিল রায়, কিন্তু কিছুকাল আগে এফিডেবিট করে সেটি রাও করে নিয়েছেন। যাতে এর অবাঙালি গ্রাহকরাও স্বচ্ছন্দ বোধ করতে পারে। প্রতি দিন দুপুরে বিয়ার পান করে ইনি একটি নোয়াপাতি ভুঁড়ি বানিয়েছেন এবং কথাবার্তার মাঝে মাঝে 'আরে ভাই ইস মে কেয়া হ্যায', এই ধরনের হিন্দি উৎপ্রেক্ষা ছিটিয়ে দেন। ইনি বিকাশের আপন মামা। জীবনে অতি সার্থক।

ঘরের এক কোণে একটি টেবিলে বোধিসত্ত্বের আসন। তাঁর কাছে নানা রকম বিল আর ভাউচার আসে, তিনি জাবেদা খাতায় সব কিছু টুকে হিসেব রাখেন। এই ভূমিকায় তিনি একদম বেমানান। সাধারণত নিকেলের চশমা-পরা কোলকুঁজো বুড়োরাই এই ধরনের অফিস অ্যাকাউন্টান্ট হন। কিন্তু সেই তুলনায় বোধিসত্ত্ব এক জন সবল, সুপুরুষ চেহারার যুবক। অবশ্য তিনি ধুতি আর পাঞ্জাবি পরেন, যা তাঁর বয়সের যুবকরা কেউ পরে না। পেশাদার অ্যাকাউন্ট্যান্টদের সঙ্গে তাঁর একটাই মিল আছে, তিনি কম কথা বলেন।

এগারো জনের মধ্যে দু'জন মেয়ে। এর মধ্যে এক জনের নাম মিসেস সেন। সে যেহেতু মালিকের পি.এ., তাই কেউ তার প্রথম নাম ধরে ডাকে না। এর শরীরটি বড় বিচিত্র, রোগা রোগা হাত-পা, মুখখানি অস্পষ্ট, পেনসিলে আঁকা ছবির মতো চোখ-নাক, কিন্তু এর দুই বুক আর নিতম্ব বেখাপ্পা রকমের পৃথুলা। হাঁটাচলার সময় ওই সব স্থান কাঁপে। মিসেস সেন বড়ই ছটফটে, বেশিক্ষণ সুস্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না চেয়ারে। ঘন ঘন মালিকের ঘরে যায়, যখন তখন একটা দেয়াল আলমারি খোলে এবং অন্য কর্মচারীদের টেবিলের সামনে এসে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে অর্ধেক নগ্ন স্তন দেখিয়ে কথা বলে। সকলেই জানে, এই মিসেস সেন মালিকের সন্ধ্যা-সঙ্গিনী, এর মধ্যে কোনও লুকোছাপা নেই, কোনও লজ্জার ব্যাপার নেই। মিসেস সেন স্বামীহীনা, দু'টি বাচ্চা আছে। এর হাসিখুশি স্বভাবের জন্যই অফিসের অন্য কর্মীরা এর নৈতিক চরিত্র নিয়ে কোনও কটাক্ষ করে না।

বোধিসত্ত্ব মাঝে মাঝে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন এই মেয়েটির দিকে। বিকাশ আর পূর্ণিমা তাদের ভেতরকার যে-সম্পর্কটির জন্য দ্বিধাকম্পিত বা লজ্জিত ছিল, এখানে বিকাশের মামা আর মিসেস সেন সেই ব্যাপারটাই সগৌরবে চালিয়ে যাচ্ছেন। কোনও গ্লানি নেই। পূর্ণিমাদির মতো মিসেস সেনকেও যদি হঠাৎ এক দিন সাপে কামড়ায়, তাহলে কি উনিও পাপের ভয় পাবেন? বোধহয় না। তাছাড়া কলকাতা শহরে কোনও সাপ নেই, এখানকার ভয়ও অন্য রকম।

অনান্য কর্মচারীদের মধ্যে কয়েক জন ড্রাফটসম্যান আর কয়েক জনের কাজ টেন্ডার ধরার জন্য দৌড়োদৌড়ি ও চিঠিপত্র লেখালেখি। এদের মধ্যে একটি আছে, তার নাম প্রীতি সান্যাল। সে আবার

স্তব্ধতার প্রতিমূর্তি। দশটার সময় এসে সেই যে নিজের চেয়ারে বসে, পাঁচটার মধ্যে ওঠে মাত্র একবার, বাথরুমে যাবার জন্য। তার সঙ্গে থাকে টিফিনের কৌটো এবং লাইব্রেরির উপন্যাস। যখন কাজ থাকে না, তখন বই খুলে রাখে টেবিলের ওপর। তার পাশে যে-লোকটি বসে তার নাম ধনঞ্জয়, সে প্রায়ই আড়চোখে তাকিয়ে থাকে প্রীতি সান্যালের দিকে।

কাটা দরজা ঠেলে নামিয়ে রেখে ধনঞ্জয় বলে ওঠে, এই এসে গেছে শেখ আবদুল্লা। দে, চা দে!

ঘাড় ঘুরিয়ে সে বোধিসত্ত্বের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, দাদা, চা খাবেন?

বোধিসত্ত্ব সম্মতি জানালেন। এই ক'দিনেই তিনি জেনে গেছেন, এখানে একটি অলিখিত নিয়ম আছে। সারা দিনে তিনবার চা নিয়ে আসে আবদুল্লা নামের ছেলেটি। এই গোটা বাড়িটার বিভিন্ন অফিসে সে চা দেয়। এই অফিসটিতে এক জন কেউ এক-একবার সকলকে চা খাওয়ায়। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ভাবে নিজের চায়ের দাম না দিয়ে এক-একবার এক-এক জন সকলের দাম দিয়ে দেয়। ব্যাপারটা দেখায় ভাল।

চায়ের সময় কিছুক্ষণ কর্ম-বিরতি।

ধনঞ্জন বলল, আজ অফিসে আসবার সময় যা একটা কাণ্ড দেখলাম। লেক মার্কেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছি মিনিবাস ধরব বলে, হঠাৎ একটা ছেলে ছুটে বেরিয়ে এল বাজারের মধ্য থেকে, এই আমাদের শেখ আবদুল্লার বয়সিই হবে ছেলেটা, তার পেছন পেছন ধর ধর চিৎকার করে তাড়া করে এল কয়েকটা লোক। ছেলেটা চুরি করে পালাচ্ছিল নিশ্চয়ই, লোকগুলো তাকে ঠিক ধরে ফেলল। ধরতে পারত না, ফুটপাথে যে-ফলওয়ালারা বসে, তাদের মধ্যে এক জন ল্যাং মেরে ফেলে দিল ছেলেটাকে। তারপর শুরু হল মার, কত লোক যে এইটুকু একটা ছেলেকে মারার জন্য ছুটে গেল, দু'তিন জনের হাতে ইঁট।

মিসেস সেন বলল, থাক থাক, ধনঞ্জয়বাবু আর বলবেন না! আজকাল যা তা কাণ্ড হয়! মেরে ফেলল ছেলেটাকে?

ধনঞ্জন বলল, শুনুন না, একটা মজা আছে। ছেলেটাকে বোধহয় মেরেই ফেলত। কিন্তু আমাদের লেক মার্কেট এরিয়ায় একটা বিখ্যাত ষাঁড় আছে জানেন তো? ইয়া তাগড়া চেহারা! পাহাড়ের মতো। সেই ষাঁড়টা কী বুঝল কে জানে, ক্ষেপে গিয়ে সেই ভিড়ের মধ্যে...।

কয়েক জন হেসে উঠল। ধনঞ্জন হাসতে হাসতে বলল, না দেখলে বিশ্বাস করবেন না, একটা ষাঁড় এসে ওলোট পালোট করে দিল সব কিছু। যারা ছেলেটাকে পেটাচ্ছিল, তারা হুড়মুড় করে দৌড় দিল, আর ছেলেটাও সেই ফাঁকে হাওয়া, একদম ট্রাম লাইন পেরিয়ে কালীঘাটের দিকে।

দরজার পাশের টেবিল থেকে রাজেনবাবু বললেন, ধর্মের ষাঁড় তাহলে একটা ধর্মের কাজ করেছে। ছেলেটাকে প্রাণে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ছেলেটার ভাগ্য বলতে হবে। কাগজে দেখেছেন, কারনানি ম্যানসনে একটা বাচ্চা ছেলে গাড়ির ওয়াইপার চুরি করছিল, ক'জন লোক তাকে ধরে এমন মেরেছে যে ছেলেটা মরেই গেছে, পুলিশ কেস হচ্ছে। ভেবে দেখুন, সামান্য ওয়াইপার, কতই-বা দাম, পাঁচ-সাত টাকা, সেই জন্য গাড়ির মালিকরা একটা ছেলেকে মেরেই ফেলল? প্রাণের এই তো দাম আজকাল!

রাজেনবাবুর পাশের টেবিল থেকে ছোকরা তরুণ বলল, যাই বলুন দাদা, ছিঁচকে চোরদের ওপর এক-এক সময় বড্ড রাগ হয়। আমাদের পাড়ার বস্তির ছেলেরা রাস্তার হাইড্র্যান্টের ঢাকনাগুলো পর্যন্ত চুরি করে নিয়ে যায়। পুরনো লোহার দরে বেচে। ভেবে দেখুন কাণ্ডটা, যদি অসাবধানে কারুর এই হাইড্র্যান্টে পা পড়ে যায়, আর প্রাণে বাঁচবে? আমি রাত্তিরবেলা বাড়ি ফিরি, প্রায়ই লোডশেডিং থাকে, হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে হাঁটতে হয়। এক দিন দেখি আমার মা নিজে একটা টর্চ নিয়ে বাড়ির

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। সে-দিন বাড়ি ফিরতে আমার রাত এগারোটা হয়েছিল। আমাদের সদর দরজার কাছেই রাস্তার নর্দমার ঢাকনাটা চোরে নিয়ে গেছে। ওই চোরটাকে যদি আমি ধরতে পারতাম, তাহলে তার মাথাটা তক্ষুণি ফাটিয়ে দিতাম না!

বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, কলকাতা শহরে সাপ নেই, তবু পথ চলবার বিপদ কিছু কম নয়!

অরুণের পাশে বসে দীপঙ্কর। সে সিগারেট টানতে টানতে গম্ভীর ভাবে বলল, আপনার বাড়ির পাশে বস্তি থাকে কেন, সে-কথা ভেবে দেখেছেন? যে সমাজ বস্তি আর বড় বাড়ি পাশাপাশি থাকতে দেয়, সেখানে তো এ-রকম ঘটনা ঘটবেই! না খেয়ে মরার চেয়ে বরং তারা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে মার খেয়ে মরবে। সে-ও অনেক ভাল।

রাজেনবাবু বললেন, আরে মশাই, বস্তি উঠে গেলে ঝি-চাকররা থাকবে কোথায়? তারাও যদি আপনার-আমার মতো ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকে, তাহলে তখন কি তারা পরের বাড়িতে এসে বাসন মাজতে চাইবে, না রাস্তার নোংরা সাফ করতে রাজি হবে?

দীপঙ্কর বলল, কেন, সোসালিস্ট দেশগুলোতে বুঝি কেউ নর্দমা পরিষ্কার করে না কিংবা রাস্তা সাফ করে না? পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে ওই সব দেশের বড় লক্ষণ। কিন্তু সেখানে কেউ বস্তিতে থাকে না।

ধনঞ্জন বলল, যাই বলো ভাই দীপঙ্কর, সকলেই যে-দেশে সমান সুযোগ পায়, সেখানে কেউ কেন স্বেচ্ছায় মেথর হতে যাবে, সে-ব্যাপারটা আমি বুঝি না।

অরুণ বলল, আমাদের বস্তিটা সি.এম.ডি.এ.-এর প্ল্যানের মধ্যে পড়েছিল। বস্তি উন্নয়ন হবে, কত বড় বড় লোকজন এল। বস্তির মধ্যে পাকা রাস্তা, স্যানিটারি বাথরুম, দশটা ঘর অন্তর-অন্তর টিউবওয়েল, কত কী শুনেছিলাম। এখন দেখি কয়েকটা ভাঙা টিউবওয়েল কাত হয়ে পড়ে আছে, এখনও বস্তির বাচ্চারা রাস্তার ওপর বসে হাগে। কন্ট্রাক্টররা সব চুরি করে মেরে দিয়েছে।

দীপঙ্কর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, তারা ধরা পড়ে না, মারও খায় না।

এই যে চুঁচড়োর ও-পারে এত বড় ডাকাতিটা হয়ে গেল, ডাকাতরা সবার চোখের সামনে দিয়ে পালাল।

এ আর কী! দিল্লিতে স্টেট ব্যাঙ্ক না রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে যে কয়েক মিনিটে ষাট লাখ টাকা গাপ হয়ে গেল, নাগরওয়ালা কেস মনে আছে? কেউ ধরা পড়ল সে ব্যাপারে?

চ্যাঁ চ্যাঁ করে ঘণ্টা বাজল মালিকের ঘর থেকে। দু'বার আওয়াজ মানে মিসেস সেনের ডাক। এক রকম জমাট আলোচনা ছেড়ে চলে যেতে হল মিসেস সেনকে। প্রীতি সান্যালের চোখ উপন্যাসের পাতায় নিবদ্ধ।

এবার দীপঙ্কর গলা নিচু করে কথা শুরু করল। মালিকের ঘরটি বাতানুকূল। এ-ঘরের শব্দ ও-ঘরে যায় না। তবু মালিকের প্রতি সম্মানের জন্য এই ফিসফিসানি।

দীপঙ্কর বলল, অত দূরে যাবার দরকার কী? আমাদের এই অফিসে চুরির কারবার চলছে না? লাখ লাখ টাকা দু'নম্বরি হয়ে যাচ্ছে।

সবাই কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরব। এই মৌনতা যেন সম্মতির লক্ষণ।

দীপঙ্কর আবার বলল, এই কুমারবাবুকেই জিজ্ঞেস করুন না, ওঁর তো সব জানবার কথা।

বোধিসত্ত্ব একটু চকিত হয়ে উঠলেন। তিনি তো কিছু জানেন না।

দীপঙ্কর বলল, ক্যামাক স্ট্রিটে আমরা যে-ব্যাঙ্কের বাড়িটা বানালাম, তার অন্য আইটেমের কথা ছেড়ে দিন, শুধু প্লেন গ্রিলের কথাই ধরুন। প্লেন গ্রিলের স্কোয়ারফুট কত করে ধরা হয়েছে? বলুন, আপনি তো জানেন।

বোধিসত্ত্ব বললেন, বাইশ টাকা।

তবে? বাজারে খোঁজ নিয়ে দেখুন, ওই গ্রিলের স্কোয়ারফুট তেরো টাকার এক পয়সা বেশি নয়। তাহলে হিসেব করুন অত বড় বাড়িতে চল্লিশ হাজার স্কোয়ারফুট গ্রিলে কত টাকা চুরি হল? ভাবছেন পার্টি জানে না আসল রেট? ঠিক জানে। ওদের এস্টাব্লিশমেন্ট ডিপার্টমেন্টের দু'জন অফিসার এর থেকে পনেরো পার্সেন্ট করে পকেটে ভরে নিয়েছে। এখানে তো সর্বক্ষণই এই চুরির খেলা চলছে। নতুন এসেছেন তো, ক'দিন বাদেই সব বুঝে যাবেন।

বোধিসত্ত্ব নিরীহ মুখ করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার যখন জানেন, এই অফিসে চুরি হয়, তবুও আপনারা এখানে কাজ করছেন কেন?

ধনঞ্জন রাগত মুখে নীরব হয়ে রইল। অরুণ বলল, কী করব দাদা, পেট। সবই পেটের জন্য। চেষ্টা করলেও তো অন্য কোথাও চাকরি পাব না। আর, সব জায়গাতেই তো এই একই অবস্থা!

ক্যাঁচ করে শব্দ হল, মালিকের ঘর থেকে দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলেন মিসেস সেন। দুই স্তনের ঠির মাঝখান দিয়ে সরু করে পাকানো আঁচলটা সুবিন্যস্ত করে সে জিজ্ঞেস করল, তারপর কী হল?

এবার আবার কাজ। এই আবদুল্লা, চায়ের পয়সা নিয়ে যা!

বোধিসত্ত্বের মনে হল, এই ঘরটি যেন একটি মঞ্চ। এখানকার কুশীলবরা যে-যার ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছে। তিনি নিজেও।

আর এক দিনের সংলাপের নমুনা —

শুক্রবার বিকেলে রাজেনবাবু বললেন, ভাই, কাল আমার আসতে একটু দেরি হবে। ধনঞ্জন, লক্ষ্মী ভাইটি, তিলজলা প্রোজেক্টের এস্টিমেটটা খানিকটা তৈরি করে রেখো। আমি বারোটার মধ্যে এসে পড়ব আশা করছি।

কোথায় যাবেন?

আরে ভাই, এক ঝামেলা। কানপুর থেকে আমার এক পিসি এসেছেন। তিনি যাবেন কালীঘাটে মায়ের পুজো দিতে। অনেক দিন থেকে মানত করে রেখেছেন। আমাকেই নিয়ে যেতে হবে সঙ্গে।

মিসেস সেন বলল, ইস, আগে জানলে আমিও যেতাম আপনার সঙ্গে। অনেক দিন যাইনি। কিন্তু কাল যে আমাকে দশটার সময় আসতেই হবে, মি. রাও বলে রেখেছেন।

অরুণ বলল, রাজেনদা, কাল শনিবার, কাল আপনি যাচ্ছেন?

কালকের দিনটা ভাল। পিসিমা পাঁজি দেখেছেন।

কাল তো তাহলে আপনি আর অফিসে আসতেই পারবেন না! শনিবার কী ভিড় হয় জানেন না!

ওই ঠেলেঠুলে ঢুকে পড়ব কোনও রকমে।

অসম্ভব! আমাদের পাড়া, আমি ভাল রকম জানি। শনিবার দিন মানুষের মাথা ছাড়া কিছু দেখা যায় না। বারোটা কেন, কাল আপনি তিনটের আগে কিছুতেই পারবেন না অফিসে আসতে।

আরে ভাই, যেতেই হবে, পিসিমা ধরেছেন। আমিও একবার পেন্নাম ঠুকে আসব।

সাউথে তিরুপতির মন্দিরে একটা নতুন সিস্টেম করেছে। জানেন তো, ওখানে কী সাংঘাতিক ভিড় হয়। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পাঁচ-ছ'ঘণ্টার আগে দর্শন হয় না। কিন্তু এখন পঁচিশ টাকা টিকিটের একটা আলাদা লাইন হয়েছে। সেই লাইনে দাঁড়ালে দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে দর্শন হয়ে যায়। খুব কাছ থেকে, ভাল ভাবে।

ধনঞ্জয় হো হো করে হেসে উঠল।

অরুণ তার দিকে ফিরে একটু তোষামুদে গলায় বলল, আজকাল সব ঠাকুর-দেবতাই তো ক্যাপিটালিস্ট। এক-একটি মন্দিরের কত ইনকাম আপনি জানেন?

মিসেস সেন বলল, তিরুপতির মন্দিরে বহু লোককে ফ্রি খাবার দেওয়া হয়, আপনি জানেন?

প্রীতি সান্যাল উপন্যাসের পাতা ওলটাল।

ধনঞ্জয় বলল, শুনুন, একটা মজার ঘটনা বলি। আমাদের বাড়িওয়ালা আর গিন্নি, দু'জনেরই বাতের অসুখ। গিন্নিরই বেশি। কবিরাজি, হোমিওপ্যাথি, টোটকা — নানা রকম চিকিৎসাই হয়ে গেছে। বাত কি কখনও সারে? গত মাসে ওরা চলে গেলেন বাঙ্গালোরের কাছে সাঁইবাবার আশ্রমে। ক'দিন হল ফিরে এসেছেন। গিন্নির বাত সেবে গেছে, আর...।

এই তো, আপনারা বিশ্বাস করেন না।

শুনুন না, গিন্নির সেরেছে, কিন্তু কত্তার সারেনি। তাই নিয়ে কত্তা-গিন্নিতে খুব রাগারাগি, কত্তা এত খরচাপত্তর করে গেলেন অত দূরে, অথচ তাঁর নিজের কিছুই হল না।

তার মানে কত্তাটি অবিশ্বাসী! মনের মধ্যে বিশ্বাস না থাকলে —।

আরে, সবটা বলতে দিন না আমাকে। ওখানে জানেন তো, ভক্তরা সবাই বসে থাকে, বাবা মাঝে মাঝে বেরিয়ে দর্শন দেন, সকলের সঙ্গে তিনি কথা বলেন না। হঠাৎ হঠাৎ এক-এক জনকে বেছে নিয়ে তিনি কাছে ডাকেন, সেই রকমই এক দিন গিন্নিকে ডাকলেন। তার পরেও কয়েক দিন কত্তা গিয়ে বসে রইলেন, তাঁর আর ডাক পড়ল না। বাবার দেওয়া ওষুধ খেয়ে গিন্নিব সেরে গেল, কিন্তু সেই একই ওষুধ খেয়েও কিন্তু কত্তার সারল না। রোগ কিন্তু একই। আর গিন্নিরও যে সেরেছে বলছেন, তা-ও কত দিনের জন্য কে জানে! বাতের ব্যথা কখন হয়, কখন কম থাকে, তার কোনও ঠিক আছে? মেয়েদের হাজার রকম বাতিক।

ধনঞ্জয়বাবু, আপনার সব কিছুতে অবিশ্বাস।

শুনুন, আসল কথাটা এখনও বলিনি। গিন্নির বাতের ব্যথা যদি সেরে যায় তো ভালই। আমরা ঠিক মতো জল পাব। বাতের ব্যথার জন্য প্রায়ই তিনি পাম্প চালাতে ভুলে যান। আমাদের বাড়িওয়ালা গিন্নি ফিরে আসার পর থেকে সব সময় বাঙ্গালোরের সাঁইবাবার গল্প করছেন। নিজেব চোখে তিনি দেখেছেন অলৌকিক কাণ্ড। তিনি এমন রোমহর্ষক গল্প-শুরু করেছেন যে, আমার মা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন সেই সব শুনে। মা-ও একবার যেতে চান সেখানে, আমার মায়ের বহু পুরনো হাঁপানি। সে এক বিপদ হয়েছে আমাদের বাড়িতে। মাকে যত বোঝাচ্ছি —।

আপনার মাকে বলুন, হাঁপানির খুব ভাল ওষুধ দেন সোদপুরের পাগলাবাবা। শতকরা একশো জনের সারে। অত দূরে যাবার দরকার কী, বাঙালিদের মধ্যেও অনেক বড় বড় সাধক রয়েছেন।

ধনঞ্জয়বাবু, আপনার আসল কথাটা কী?

বাঙ্গালোরের বাবা আমাদের বাড়িওয়ালা গিন্নিকে একটা জিনিস উপহার দিয়েছেন। খালি হাতটা হাওয়ার মধ্যে মুঠো করলেন, অমনি সেই জিনিসটা এসে গেল। বাড়িওয়ালা গিন্নির নিজের চোখে দেখা, সুতরাং অবিশ্বাস করার উপায় নেই। আমাদের পি. সি. সরকারের ছেলে হাওয়া থেকে ডজন খানেক পায়রা ধরে ফেলতে পারে। সে যাক গে! জিনিসটা আমি দেখেছি। ঝিনুকের তৈরি একটা লকেট। বেশ সুন্দর। সেটা সব সময় শরীরে ধারণ করে থাকতে হবে। ওতে শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, কোনও অসুখ-বিসুখ হবে না। বেশ, ভাল কথা। কিন্তু সেই দিনই, ওই বাবা বোম্বের এক জন নাম-করা ফিলিম স্টারকে, ভরতকুমার না ভারতভূষণ কী যেন নাম, ওদের নাম-টাম ঠিক আমার মনে থাকে না, তাকে দিয়েছেন একটা সোনার লকেট! এখন কথা হচ্ছে, কোনও সাধক মহাপুরুষ যদি

অলৌকিক উপায়ে হাওয়া থেকে যে-কোনও জিনিস তৈরিই করতে পারেন, তাহলে বড়লোক ভক্তকে কেন দেন দামি জিনিস, আর গরিবকে দেন সস্তা জিনিস? বরং উলটোটাই হওয়া উচিত নয়? বোম্বের ফিলিম স্টারের তুলনায় আমার বাড়িওয়ালা গিন্নি সাধারণ লোক, তাই পেল ঝিনুকের লকেট। আর গরিবরা পায় শুধু ছাই!

অন্য কেউ কিছু বলবার আগেই মিসেস সেন বললেন, এটাও বুঝলেন না, এর উত্তর তো খুব সহজ! গরিবকে যদি সোনার লকেট দেন, সে হয়তো কোনও দিন লোভের মাথায় কিংবা অভাবের জ্বালায় সেটা বিক্রি করে ফেলতে পারে! সাধু মহাত্মার দেওয়া জিনিস কি বিক্রি করার জন্য? বোম্বাইয়ের ফিল্মস্টার কোনওদিন সোনার লকেট বিক্রি করতে যাবে না। উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এই।

বোধিসত্ত্ব চুপ করে শুনছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, না!

মিসেস সেন জিজ্ঞেস করলেন, কী বললেন কুমারবাবু?

বোধিসত্ত্ব পেনসিল দিয়ে কাগজে দাগ কাটতে কাটতে বললেন, আমি তো অঙ্ক কষি। আপনার কথাটা অঙ্কে ঠিক মিলল না।

কেন?

বোধিসত্ত্ব ধীর কণ্ঠে বললেন, যদি বিক্রি করে দেবার সম্ভাবনাটাই একমাত্র কারণ হয়, তাহলে সকলকেই ঝিনুকের লকেট দেওয়া উচিত। গরিব ও বড়লোক, কেউই ঝিনুকের লকেট বিক্রি করতে যাবে না কখনও। এমনকী হরিতকীর লকেট দিলেও একই কাজ হবার কথা।

ধনঞ্জয় টেবিল চাপড়ে উঠে বলল, ঠিক বলেছেন! আসল কথা হল বড়লোক বা ফিল্মস্টাররা তো সোনার লকেট ছাড়া অন্য কিছু পরবে না। ঝিনুক বা হরীতকী হেলাফেলা করে ফেলে রাখবে! পুরো জিনিসটাই ধাপ্পা।

মিসেস সেন বলল, ধনঞ্জয়বাবু, আপনার পার্টির অনেক লোককেও আমি পুজো দিতে দেখেছি!

রাজেনবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আবার এর মধ্যে পলিটিক্স টেনে আনা কেন? তাহলে ভাই ধনঞ্জয়, কালকে এস্টিমেটটা একটু দেখে রেখো।

অরুণ বলল, রাজেনদা, আপনি এক কাজ করুন। আপনি কাল ন'টা নাগাদ আমার বাড়িতে চলে আসুন আপনার পিসিমাকে নিয়ে। কালীঘাট মন্দিরের সেবাইতদের মধ্যে কয়েক জনের সঙ্গে আমার চেনা আছে। আমার নিজের পাড়া। আমি তাদের বলে দেব, আপনাকে ভেতর দিয়ে নিয়ে যাবে, ভাল করে পুজো-টুজো করিয়ে দেব।

মিসেস সেন বলল, অরুণবাবু, আমাকে এক দিন নিয়ে যাবেন?

বলবেন। যে-কোনও দিন!

অফিসের পর যাওয়া যায় না?

কেন যাবে না?

তাহলে এক দিন এখান থেকেই এক সঙ্গে বেরুব, রাও সাহেবকেও বলব, উনি যদি রাজি হন, তাহলে ওঁর গাড়িটা পাওয়া যাবে, একেবারে মায়ের গা ছুঁইয়ে দিতে হবে কিন্তু, আমি কোনও দিন বেশি কাছে যাইনি।

সেবাইতদের বলে দিলে কোনও অসুবিধেই হবে না।

ধনঞ্জয় বলল,আমরা টেন্ডার লাগাবার জন্য যেমন দালাল ধরি, তেমনি কালী ঠাকুরের কাছে যাবার জন্যও ব্যাকডোর পলিসি আছে। দালাল ধরে গেলে কালী ঠাকুরের কাছ থেকে বেশি পুণ্য পাওয়া যাবে।

এবার মিসেস সেন মালিকের পি.এ. সুলভ গম্ভীর ভঙ্গি করে বলল, দেখুন ধনঞ্জয়বাবু, ঠাকুর-দেবতা নিয়ে এ-রকম বিশ্রীভাবে কথা বলা আমি ঠিক পছন্দ করি না।

আর কথা নয়, এবার কাজ। এই আবদুল, চায়ের পয়সা নিয়ে যা!

॥ ৮॥

বোধিসত্ত্বের বাড়িটি একটি সরু গলির মধ্যে। কাঁচা রাস্তা। জল কাদা বাঁচিয়ে একটা লোহার কড়াইয়ের কারখানার পাশ দিয়ে এসে একটা সাদা রঙের তিন তলা বাড়ি। বোধিসত্ত্ব থাকেন একেবারে ওপরে। গোটা বাড়িতে মোট পাঁচটি ভাড়াটে পরিবার, তবে তিন তলায় বোধিসত্ত্ব একা। তিন তলার আর সবই ভাল, শুধু বাথরুমের কলে কখনও জল আসে না। স্নান করার জন্য বোধিসত্ত্বকে যেতে হয় এক তলার বারোয়ারি বাথরুমে।

সন্ধের পর বাড়ি ফিরে বোধিসত্ত্ব একেবার স্নান সেরে নেন। অফিস থেকে বাসে চেপে অনেকখানি রাস্তা আসতে হয়। গরমে, ঘামে শরীরটা বড় অপবিত্র হয়ে যায়। প্রায় কোনও দিনই বসবার জায়গা পাওয়া যায় না, বাসের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বোধিসত্ত্বর সব চেয়ে খারাপ লাগে মানুষের স্পর্শ। লোকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গায়ের ওপর। কারুর ঘর্মাক্ত হাত লেগে যায়। এক-এক সময় অসহ্য বোধ হয়। তার পরই তিনি ভাবেন, এত লোক যদি এই জিনিসটা মেনে নিতে পারে, তিনিই-বা পারবেন না কেন?

এই সমস্যার তিনি একটা সমাধান করে নিয়েছেন। অফিস থেকে ফেরার সময় পুরো পথটা তিনি হেঁটে আসেন। খালি পায় নয় অবশ্য, এখন তিনি রবারের চটি পরতে শিখেছেন।

স্নান সেরে নিয়ে বোধিসত্ত্ব বেরিয়ে পড়েন আবার। টবিন রোডের ওপর একটি হোটেলে তিনি খাবার খান। তারপর হাঁটতে শুরু করেন যে-দিকে খুশি। এক-এক দিন চলে যান দক্ষিণেশ্বর বা দমদম পর্যন্ত।

পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে একটা ব্যাপারই বোধিসত্ত্বর কাছে প্রকট হয়ে ওঠে। তিনি বুঝতে পারেন, এই শহরের মূল সুর হচ্ছে ঝগড়া। একটু দিনও যায় না, যে-দিন তিনি কোনও ঝগড়ার দৃশ্য দেখেন না। ট্রামে-বাসে যখন-তখন ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। যে-কোনও রাস্তার মোড়ে হঠাৎ একটা ঝগড়ার বিস্ফোরণ হয়। কোনও দোকানের সামনে আচমকাই দু'জন লোক জোরে জোরে কথা বলা শুরু করে, অমনি আশপাশ থেকে কিছু লোক ছুটে এসে সেখানে ভিড় জমায়।

বোধিসত্ত্ব লক্ষ্য করে দেখেন, ঝগড়ার সময় মুখোমুখি দুই পক্ষের মুখ লালচে হয়ে আসে, ফুলে ওঠে গলার শিরা, চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে, কণ্ঠস্বর উঠে যায় সপ্তমে। কখনও হাত দুটো হয়ে যায় মুষ্টিবদ্ধ, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ঝগড়াকারী একটু একটু দোলে, একবার সামনে একবার পিছনে, যেন দু'টি বিপরীত শক্তি তাকে টানছে দু'দিক থেকে। এদের কাছে কিন্তু কোনও অস্ত্র থাকে না। এই নগরীতে অস্ত্রের দোকান নেই বললেই চলে। এটাও একটা বিস্ময়কর ব্যাপার।

সাধারণত রোগা লোকরাই বেশি ঝগড়াপ্রবণ। তাদেরই কণ্ঠস্বর বেশি জোরালো, তাদেরই মুখ বেশি হিংস্র হয়ে ওঠে। এরা পৃথিবীতে অপেক্ষাকৃত কম জায়গা নিয়ে আছে বলেই কি এদের রাগ বেশি? এক দিন তিনি দেখেছিলেন, ট্রামের কামরায় এক জন খুব রোগা পাতলা লোক, এমন গর্জন করছিল, যেন তার গলা থেকে বেরিয়ে আসছিল আগুনের হলকা, আর তাতেই বাকি সব যাত্রী কোণঠাসা।

কী নিয়ে যে ঝগড়াটা বাঁধে, বোধিসত্ত্ব অনেক সময়ই বুঝতে পারেন না। তিনি এমনও দেখেছেন যে, ভিড়ের মধ্যে এক জন লোক বলল, একটু সরে দাঁড়ান না। আর এক জন বলল, আপনি সরতে পারছেন না! প্রথম জন বলল, আপনার চোখ নেই, দেখতে পাচ্ছেন না, আমি কীভাবে...। অন্য জন বলল, আমার নাহয় চোখ নেই, আপনার মাথায় ঘিলু আছে তো? তাহলে বুঝতে পারতেন যে আমি...। ব্যাস, এর পরও ক্রমশ কণ্ঠস্বর চড়তে লাগল।

যে-বাড়িতে তিনি থাকেন, সেখানেও তিনি ঝগড়া শুনতে পান নিয়মিত। এক তলা ও দো-তলার চার ভাড়াটে পরিবারের মধ্যে তিনটি দল আছে বলে মনে হয়। সবাই সবার সঙ্গে ঝগড়া করে না, প্রায় সময়ই এক জনের বিরুদ্ধে দু'টি পক্ষ থাকে। তবে কখন যে কে কার বিরুদ্ধে যায়, তা তিনি বুঝতে পারেন না। মোটামুটি চারটি পরিবারের সম্পর্কেই কিছু খবর তিনি পেয়ে গেছেন ওই ঝগড়ার সূত্র থেকেই। এক জন শিক্ষক, সঙ্গে তাঁর বেকার ভাই। এক জন কেরানি, তিন ছেলে মেয়ে। এক জন দোকানদার, এঁর স্ত্রী নিঃসন্তান, এক শ্যালিকা এখানে থেকে কলেজে পড়ে। অন্য পরিবারটি একটু বিচিত্র, ভদ্রমহিলা যান চাকরি করতে, স্বামীটি সারা দিন থাকেন বাড়িতে এবং গান করেন সব সময়। এঁদের দুই ছেলে-মেয়েই থাকে মামার বাড়িতে। এই গায়কের চাকরিরতা স্ত্রীর জিহ্বাই সব চেয়ে বেশি খরসান।

ঝগড়ার উপলক্ষ জল, আলো, সিঁড়ি। কে কার নাম আড়ালে কী বলেছে। কিংবা হয়তো এর কোনওটাই আসল কারণ নয়। এরা প্রত্যেকেই নিজের ওপরে সব সময় বিরক্ত হয়ে আছে। এই দুর্লভ মানব-জীবন, তবু কেন এত অনর্থক ভাবে বেঁচে থাকা!

এই নগরীতে আছে মুষ্টিমেয় ধনী, কিছু ধনীদের উচ্ছিষ্টভোজী মধ্যবিত্ত আর অসংখ্য গরিব। এখানে আছে পুলিশ। তারা ধনীদের দারোয়ানগিরি করে, মধ্যবিত্তদের গ্রাহ্যই করে না, গরিবদের বেয়াদপির শাস্তি দেয়।

এই নগরীতে আছে মন্দির, গির্জা। তার মধ্যে গির্জাগুলিই দেখতে বেশি সুন্দর এবং পরিচ্ছন্নতার আদর্শ। এরা সচ্ছল লোকদের পাপ-পুণ্যের ইজারা নিয়ে আছে। আর যে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় শোয়, তাদের কোনও পাপ-পুণ্য নেই। যারা ভীরু, যারা দুর্বল, যারা অপরাধী, তারা যায় ধর্মস্থানে আর যারা সবল ও স্বাধিকারপ্রমত্ত তারা যায় কারাগারে।

পথে পথে টো-টো করে ঘোরবার জন্য বোধিসত্ত্ব কয়েক বার সশস্ত্র ঝগড়ার সম্মুখীন হয়েছেন। হঠাৎ লোকে চতুর্দিকে ছুটতে শুরু করে। বাঁশ বা লোহার রড নিয়ে তাড়া করে যায় একদল লোক। অথবা পানের দোকান থেকে সোডার বোতল উড়তে থাকে হাওয়ায়, অথবা বিকট শব্দে দু-একটি পটকা ফাটে। বোধিসত্ত্ব সেই সময় চুপ করে থেমে থাকেন। প্রায় শিশুরই মতো, তাঁর মৃত্যুভয় জাগেনি এখনও। ব্যক্তিগত বিপদের আশঙ্কা তাঁর মনে আসে না। এ পর্যন্ত তাঁর গায়ে অবশ্য কোনও আঘাতও লাগেনি। তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন, এক জন লোককে তিন-চার জন মিলে মারধোর করছে। এক জন অসহায় প্রৌঢ়কে ধাক্কা মেরে ফেলে চলে যায় যুবকের দল। অল্প বয়সি একটি মেয়েকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায় দুরন্ত গাড়ি। রেল লাইনের পাশে কারা ধরাধরি করে এনে ফেলে যায় একটি মৃতদেহ।

বোধিসত্ত্ব শুধু চুপ করে দেখেন, আর কিছু না।

এক দিন তাঁর মনে খটকা লাগল। এ পর্যন্ত তিনি সব কিছুরই দর্শক, তিনি নিজে কোনও কিছুতেই অংশগ্রহণ করেননি। কিন্তু এ তো সম্পূর্ণ জীবন নয়। পাগলা হাতি দেখে সবাই পালায়। কেউ কেউ দুয়ার এঁটে চিন্তা করে, হাতি কেন পাগল হয়। কিংবা অন্যের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে, কী-ভাবে পৃথিবী থেকে হাতির পাগলামি রোগ চিরতরে নির্মূল করা যাবে। কিন্তু কারুকে না-কারুকে তো এগিয়ে এসে বাস্তবে পাগলা হাতিটিকে রুখবারও চেষ্টা করতে হবে।

তিনি এক দিন এগিয়ে গেলেন।

ঘুঘুডাঙা রেল লাইনের পাশে চার জন লোক মিলে এক জন লোককে ছুরি মারছিল। রাত তখন পৌনে বারোটা। এই ধরনের মারামারির খবর দু'তিন বাদে ছাপা হয় সংবাদপত্রে। এই খবর পড়ে ভদ্রলোকেরা খুশি হয়। গুণ্ডারা মারামারি করে মরছে, মরুক, ভালই তো। এইভাবে যত জন গুণ্ডা কমে! আসলে কিন্তু কমে না! এক একটি গুণ্ডার রক্ত থেকে অন্তত তিন জন গুণ্ডা জন্মায়। নিহত গুণ্ডার ভাই, দাদা, মামা, কাকা বা বন্ধুদের মধ্যে কেউ প্রতিশোধ নেবার জন্য গুণ্ডা হয়ে ওঠে। তারাও ছুরি সংগ্রহ করে। পাঁচ হাজার বছর ধরে এইভাবে গুণ্ডার সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

সবে মাত্র একবার ছুরি মারা হয়েছে, এমন সময় অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে বোধিসত্ত্ব ছুরিকাধারীর হাত চেপে ধরলেন। ধীর শান্ত গলায় বললেন, ওকে মেরো না, ও তোমার শত্রু নয়!

ওরা প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেল। বাকি তিন জন চট করে পিছিয়ে গেল খানিকটা। বোধিসত্ত্বের দীর্ঘ শরীর। গৌরবর্ণ মুখ ও শান্ত কণ্ঠস্বরের জন্য ওরা ব্যাপারটি ঠিক ধরতে পারল না। বরং প্রথম আততায়ী ভয়ই পেয়ে গেল খানিকটা। সে নিজের হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল।

বোধিসত্ত্ব আবার বলল, ওকে মারছ কেন? ও তো তোমাদের শত্রু নয়!

বাকি তিন জন এর মধ্যে দেখে নিয়েছে যে, এই উটকো লোকটির হাতে কোনও অস্ত্র নেই। এবার তারা খানিকটা এগিয়ে এসে বলল, তুই কে রে শালা?

এক জন একটু সতর্ক ভাবে বলল, এ শালা প্লেন ড্রেসে আর. পি. এফ. নয় তো?

বোধিসত্ত্ব বললেন, আমি তোমাদেরই মতো এক জন মানুষ। কেন শুধু শুধু মারছ একে?

নির্বোধ আদর্শবাদীর মতো শোনাল বোধিসত্ত্বর এই কথা। যেন অতি কাঁচা কোনও নাটকের নায়ক। বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদ, শ্রীচৈতন্য বোধহয় এই ভাষাতেই কথা বলতেন। কিংবা তাঁবা এই পরিবেশে আসতেন না।

এ-রকম কথা শুনেও ওদের মধ্যে এক জন কৈফিয়তের সুরে বলল, ও কী করেছে জানো? এই হারামি আমাদের বখরা একলা ঝেড়ে দিয়েছে। একবার না, তিন-তিনবার। নিমকহারাম, শয়তানের বাচ্চা।

বোধিসত্ত্ব বললেন, ওর এবং তোমাদের সকলের শত্রু এক!

যার হাতে ছুরি ছিল, সে এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে। বাকি এক জনও ছুরি বার করে বলল, ধুর শালা! জ্ঞান দিতে এসেছিস? তোর জ্ঞানের ইয়ে মারি!

দু'জনে এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল বোধিসত্ত্বের ওপরে। তিনি বলশালী, কিন্তু মারামারির নিয়ম জানেন না। বাধা দেবার চেষ্টা করেও পারলেন না, প্রথম ছুরিটা লাগল ঘাড়ে, দ্বিতীয়টা উরুতে।

হয়তো বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদ, শ্রীচৈতন্যের মতো আরও অনেক আদর্শবাদী এই রকম পরিবেশ এসে ওই রূপ ভাবগর্ভ কথা বলতে গিয়ে বিপদে পড়েছেন। কিন্তু তাঁরা শেষ পর্যন্ত বেঁচে যেতে পারেননি কিংবা উপযুক্ত শিষ্য বা জীবনী-লেখক পাননি বলে বিখ্যাত হতে পারেননি।

সেই সময় খানিক দূরে কয়েক বার ঘন ঘন হুইসল বেজে না উঠলে বোধিসত্ত্বের ইহলীলা সেখানেই শেষ হত। কিন্তু গুণ্ডা চার জন আর ঝুঁকি না নিয়ে পালাল।

হুইসল-এর শব্দ তাদেরই তাড়া করে গেল, এ-দিকে এল না। বোধিসত্ত্ব একটুক্ষণ পড়ে রইলেন রেল লাইনের ধারের খোয়ার ওপর। কিন্তু তাঁর আঘাত খুব গুরুতর নয়। তিনি উঠে বসলেন আস্তে আস্তে। আহত জায়গা দু'টি থেকে রক্ত বেরুচ্ছে ভলকে ভলকে। তবু তাঁর হাঁটার শক্তি আছে।

যে-লোকটিকে ওবা প্রথম ছুরি মেরেছিল, সে পড়ে আছে উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে। ছুরি লেগেছে তার পেটে। বোধিসত্ত্ব লোকটিকে দু'হাত দিয়ে তুলে নিলেন। লোকটি গোঙাচ্ছে। এখানে পড়ে থাকলে সে ট্রেনে কাটা পড়েই মারা যেত।

খানিকক্ষণ লোকটিকে বয়ে এনে একটু বিশ্রাম নেবার জন্য বোধিসত্ত্ব তাকে একবার মাটিতে নামালেন। সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠল, দাদা, আমাকে পুলিশে দেবেন না। আপনার পায়ে পড়ছি দাদা।

যে-আক্রান্ত, সে-ও পুলিশের ভয় পায়? বোধিসত্ত্ব ওকে পুলিশের কাছে নিয়ে যাবেনই-বা কেন?

কিন্তু তিনি ওকে কোনও সান্ত্বনা দেবার সুযোগই পেলেন না। ছুরির ঘায়ে লোকটার পেট হাঁ হয়ে আছে। সেই অবস্থাতেই উঠে দাঁড়িয়ে পেটটা চেপে ধবে সে ছুটে পালাল। খুব সম্ভব অন্ধকারের মধ্যে সে আর কোথাও মুখ থুবড়ে পড়বে এবং মরবে।

বোধিসত্ত্ব খানিকটা খোঁজাখুঁজি করলেন, কিন্তু তাকে আর পেলেন না। সে যেন মিলিয়ে গেছে। একটা কালভার্টের ওপর বসে পড়লেন তিনি। তাঁর শরীরও রক্তাক্ত ও অবসন্ন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল অঙ্গুলিমালের কথা।

মহাদস্যু অঙ্গুলিমাল এমন নিষ্ঠুর দয়ামায়াহীন নরঘাতী ছিল যে, কোশল দেশের রাজা পর্যন্ত তার ভয়ে তটস্থ ছিল। যাকে কাছে পায়, তাকেই হত্যা করে সে নিহতদের হাতের আঙুল কেটে মালা করে গলায় ধারণ করত। ভগবান বুদ্ধ একাকি গেলেন সেই দস্যু-কান্তারে। যে-পথে পঞ্চাশ লোকও এক সঙ্গে যেতে ভয় পায়, সেই পথে তিনি একা। অঙ্গুলিমাল অস্ত্র নিয়ে ছুলে এল সেই নিরীহ শ্রমণকে হত্যা করতে। কিন্তু সে পারেনি।

অঙ্গুলিমাল ছুটতে গিয়েও দেখল, সে একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে, আর ভগবান বুদ্ধ হেঁটে চলেছেন। এত চেষ্টা করেও অঙ্গুলিমাল এগোতে পারছেন না। সে চিৎকার করে বলল, হে শ্রমণ, তুমি স্থির হও।

ভগবান বুদ্ধ উত্তর দিলেন, আমি স্থির আছি, তুমি স্থির হও।

অঙ্গুলিমাল বলল, মিথ্যুক! তুমি শ্রমণ হয়েও মিথ্যে কথা বলছ? আমি চলতে পারছি না, আর তুমি হাঁটছ, অথচ বলছ তুমিই স্থির, আমি অস্থির।

গৌতম বললেন, আমি সর্ব জীবের প্রতি দণ্ড ত্যাগ কবে সর্বকালের জন্য স্থির হয়েছি। তুমি অসংযত, তাই তুমি অস্থির।

সেই অঙ্গুলিমাল দস্যু প্রব্রজ্যা নিয়ে এই জীবনেই অর্হৎ হয়ে গেলেন।

বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, আমি ওদের যে-কথাগুলি বললাম, ওরা কেউ কারুর শত্রু নয়, ওদের সকলেরই শত্রু এক, সে-কথা কি সত্য নয়? সেই সত্য কেন ওদের মধ্যে প্রবিষ্ট হল না? কিংবা তিনি নিজে যথেষ্ট স্থির হতে পারেননি বলেই রোধ করা গেল না ওদের গতি?

অঙ্গুলিমালের কাহিনির এই গতি রোধ করার ব্যাপারটা চিন্তা করেই তিনি অনেকক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে বসে রহলেন।

দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় তিনি অনেকটা সার্থক হলেন। ব্যাপারটা ঘটল তাঁর বাড়িতে।

এক তলায় বারোয়ারি বাথরুমে একটি ছোট চৌবাচ্চা। এ বাড়িতে জলের অভাব লেগেই আছে। যে-যখন বাথরুমে ঢুকে পড়তে পারে সে-ই চৌবাচ্চার জল ইচ্ছেমতো খরচ করে যায়। এ ছাড়া উঠোনের রকে আছে আলাদা আলাদা বালতি। যে-যার জল ধরে রাখে। আবার কেউ কেউ কখনও গোপনে ব্যবহার করে ফেলে।

সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে তিনি দেখলেন, দু'পক্ষে তুমুল ঝগড়া চলছে। উপলক্ষ, এক বালতি জল।

তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলেন ঝগড়া। জলের প্রসঙ্গে একটুক্ষণের মধ্যেই উবে বাষ্প হয়ে গিয়ে নানা প্রসঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল। স্কুল-শিক্ষকের স্ত্রী দিল গায়কের স্ত্রীর চরিত্রে অপবাদ। গায়কের স্ত্রী স্কুল-শিক্ষকের ভাইকে বলল মাতাল।

বোধিসত্ত্ব দু'টি বালতি নিয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গেলেন। লোহার কড়াইয়ের কারখানার সামনে একটি টিউবওয়েল আছে। তিনি সেখান থেকে দু'বালতি জল ভরে এনে বিবদমান দুই পক্ষের সামনে বালতি দু'টি রেখে হাসি মুখে বললেন, এই নিন।

সকলেই হঠাৎ থেমে গেল।

শিক্ষকের স্ত্রী বলল, এ কী, আপনি জল আনতে গেলেন কেন?

গায়কের স্ত্রী বলল, আপনাকে আমার বালতিতে হাত দিতে কে বলেছে?

বোধিসত্ত্ব বললেন, আসলে প্রয়োজন তো জলের!

হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে কে আনতে বলেছে?

তিনি আবার বললেন, এক জন কেউ আনলেই হল। আসল প্রয়োজন তো জলের।

গায়কের স্ত্রী জিভে ধার দিয়ে বলল, ঠিক আছে, বুঝলাম। কিন্তু আপনি রোজ রোজ জল এনে দেবেন?

বোধিসত্ত্ব বললেন, নিশ্চয়ই। আপনি আদেশ করলে আমি রোজ জল এনে দেব।

শিক্ষকের স্ত্রী হঠাৎ তার দেওরকে বকুনি দিয়ে বললেন, ছি ছি, ভদ্রলোক নিজে জল টেনে আনলেন, কেন, তুমি নিজে আনতে পারো না দু-বালতি জল!

শিক্ষকের স্ত্রী এবং গায়কের স্ত্রী পরস্পরের দিকে আর একবার অগ্নিবর্ষী চোখে তাকাল। কিন্তু আর মুখ খুলল না। এখন নীরব প্রশ্ন, কে আগে বাথরুমে যাবে। শিক্ষকের স্ত্রী হার স্বীকার করে ফিরে গেল নিজের ঘরে।

বোধিসত্ত্ব একবার ভেবেছিলেন যে, ওদেরও বলবেন, আপনার ঝগড়া করছেন কেন, আপনারা কেউই কারুর শত্রু নন তো, দু'জনেরই শত্রু আসলে এক।

কিন্তু ঠিক উপযুক্ত সময় আসেনি ভেবে তিনি আর কিছু বললেন না। উঠে এলেন সিঁড়ি দিয়ে।

দো-তলার বারান্দায় লুঙ্গি পরে দাঁড়িয়েছিল দোকানদারটি, সে বোধিসত্ত্বের দিকে মুচকি হেসে বলল, আপনি তো মশাই বেশ মজার লোক। থামিয়ে দিলেন? বেশ জমে উঠেছিল ব্যাপারটা! মেয়েছেলেদের মুখে খিস্তি শুনতে আমার দারুণ লাগে!

ঘরের ভেতর থেকে তার স্ত্রী বলল, অ্যাই, কী হচ্ছে? নিজের তো কোনও মুরোদ নেই।

বোধিসত্ত্ব উঠে এলেন ছাদে।

এক-এক দিন গভীর রাত্রে তিনি ছাদের আলসে ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। লোহার কড়াইয়ের কারখানায় রাত্রিবেলাও কাজ হয়। এখান থেকে দেখা যায় ওদের ফার্নেসের লকলকে আগুনের শিখা। এখন বাতাসে শীতের ছোঁওয়া, তাই দূর থেকেও ওই আগুন দেখতে ভাল লাগে। বাকি চারদিক অন্ধকার, হঠাৎ কোথাও শোনা যায় একটি শিশুর কান্না। পুলিশ সেপাইয়ের হাঁটার মন্থর লৌহ শব্দ। এক-এক দিন বেশি রাত্রে এক তলার গায়কটি গান গেয়ে ওঠেন 'মৈয়া মোরী মৈ, নহিঁ মাখন খাঁয়ো।' লোকটির গলা বড় দুঃখীর মতো। একটু পরেই পাশের ঘর থেকে কেউ বলে ওঠে, আস্তে! রাত্তিরে একটু ঘুমোনোও যাবে না।

এই নিয়ে জীবন। এই জীবনের গায়ে একটা আলগা মায়া লেগে আছে। বোধিসত্ত্ব এই মায়াটিকে দণ্ডিত করতে পারছেন না, বরং ক্রমেই যেন তিনি এতে বেশি জড়িয়ে পড়ছেন।

ঠিক ধ্যানীর মতো নয়, অনেকটা কবির মতোই মাঝে মাঝে তিনি সন্ধের পর বসে থাকেন গঙ্গার ধারে। প্রবহমান নদীর দৃশ্যের মধ্যে একটা চিরন্তনতা আছে। এই জায়গাটিতে বসে থাকতে তাঁর ভাল লাগে। তাঁর মনটা শূন্য হয়ে যায়। তিনি কিছু চিন্তা করেন না, শুধু স্থির ভাবে চেয়ে থাকেন।

বেশি রাত করে বাড়ি ফিরলে আজকাল শিক্ষকের বেকার ভাইটি খুব আপত্তি করতে শুরু করেছে। সদর দরজার ঠিক পাশেই তার ঘর। দেরি করে কেউ ফিরলে তাকেই দরজা খুলতে হয়। আবার দরজা বন্ধ না রাখলে চোর ঢুকে পড়ার ভয়। এক দিন সে বোধিসত্ত্বকে বলেছিল, ও মশাই, এ বাড়িতে আপনার কেউ চাকর আছে যে, রাত একটায় দরজা খুলে দেবে?

বোধিসত্ত্ব বিনীত ভাবে বলেছিলেন, আপনি দরজা খুলে দেন, সে-জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

বেকার ভাই সব সময় রেগে থাকে। রাগের যে কোনও কারণ নেই, তা-ও নয়। সে আরও কর্কশ ভাবে বলেছিল, ও-সব ছেঁদো কথা ছাড়ুন। কৃতজ্ঞ! আপনি রাত একটায় ফুর্তি মেরে আসবেন, আর আমি ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলব?

বোধিসত্ত্ব বলেছিলেন, আপনার এ উপকারের বিনিময়ে আমি কিছু করতে চাই।

যেমন?

আমি আপনার জামাকাপড় কেচে দেব।

মাইরি?

আমি প্রত্যেক দিন আপনার জামাকাপড় কেচে দেব!

ও-সব ন্যাকা কথা মেয়েছেলেদের কাছে বলবেন। আমার কাছে ও-সব মাজাকি করতে আসবেন না। সাড়ে এগারোটার পর এক মিনিট হয়ে গেলে আমি আর দরজা খুলে রাখব না বলে রাখছি।

বোধিসত্ত্ব ওই ছেলেটিকে বশ করতে পারেননি। এরপর তাঁর কখনও রাত্রে গঙ্গার ধারে এসে বসবার ইচ্ছে হলে তিনি আর সারা রাত বাড়িই ফেরেন না।

সেই রকম এক রাত্রে গঙ্গার ধারে বসে ছিলেন, কত রাত তার ঠিক নেই, হঠাৎ এক সময় তিনি দেখলেন একটি মেয়ে একা এসে দাঁড়াল জলের কিনারায়। তার শরীরে একটা কালো রঙের শাড়ি। একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সে হঠাৎ এক ঝটকায় খুলে ফেলল শাড়িটা। বোধিসত্ত্ব চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

তার পরই একটা আওয়াজে তিনি মুখ ফেরালেন আবার। মেয়েটি সেখানে নেই, সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তিনি আর এক মুহূর্তও দ্বিধা করলেন না, তিনিও লাফ দিলেন জলে।

মেয়েটিকে ধরে ফেলতে তাঁর দেরি হল না। কিন্তু ডুবন্ত অবস্থায় মেয়েটি সাঁড়াশির মতো দুই হাতে তাঁর গলা টিপে ধরার চেষ্টা করল। বোধিসত্ত্ব তার হাত দু'টি মুচড়ে ধরে কোনওক্রমে সাঁতারে নিয়ে এলেন পাড়ে। গঙ্গায় এই সময় বেশ স্রোত, কাজটি তাঁর পক্ষেও বিশেষ সোজা হল না। ওপরে উঠে মেয়েটিকে শুইয়ে দিয়ে তিনি হাঁপাতে লাগলেন।

মেয়েটি বেশি জল খায়নি। জ্ঞানও হারিয়ে ফেলেনি। একটুক্ষণ সে নিস্তব্ধ হয়ে শুয়ে রইল, তারপর উঠে বসে সে হঠাৎ বোধিসত্ত্বের গালে এক চড় মেরে বলল, তুমি আমাকে কেন বাঁচালে? কেন?

বোধিসত্ত্ব কোনও উত্তর দিলেন না। মেয়েটি যেন পাগলের মতো হয়ে গেল। সে বোধিসত্ত্বের দুই গালে চড় মারতে লাগল অনবরত। তাঁর চোখের ওপর লাগছে, নাকে লাগছে। মার এড়াবার জন্য তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

আকাশে হেমন্ত রাতের জ্যোৎস্না। সেই আলোয় মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি চমকে উঠলেন। একে তিনি আগে কোথায় দেখেছেন। মুখখানা বেশ চেনা। বাঁকুড়া শহরে একটি অচল গাড়ি থেকে নেমে যে-মেয়েটি তাঁকে হুকুমের সুরে বলেছিল, এই, একটা রিকশা ডেকে দাও, এ কি সেই মেয়ে? অথবা কংসাবতী প্রকল্পের লছমিয়া নামের যে-মেয়েটি বলেছিল, কুঁয়ার সিং, এই গরমের পর বরসাত আসবে, তারপর আসবে পূজা কা টাইম, তারপর শীত, তবু আমার মরদ আসবে না — এ কি সেই লছমিয়া? অথবা, একে তিনি আরও আগে দেখেছেন, অনেক আগে অনেক বার?

মেয়েটির উদ্যত ডান হাতের দিকে তাকিয়ে তিনি নিজের বাঁ-হাত বাড়িয়ে দিলেন।

সেই মুহূর্তে বোধিসত্ত্ব ঠিক করলেন, তিনি সংসারধর্মে প্রবেশ করবেন!

॥ ৯ ॥

তোমার ঘাড়ের কাছে এটা কীসের দাগ?

বোধিসত্ত্ব বললেন, এক জন ছুরি মেরেছিল।

কৃষ্ণা শিউরে উঠে বলল, কে?

আমারই মতো আর এক জন মানুষ।

তুমি কি কারুর সঙ্গে মারামারি করতে গিয়েছিলে নাকি?

সেই উদ্দেশ্যেই যাইনি। তবে হঠাৎ ও-রকম একটা ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল।

তোমরা উরুতে কীসের দাগ?

ওই একই দিনের ঘটনা!

বাবা রে, খুব সাংঘাতিক ভাবে মেরেছিল তো। তোমার পিঠে, ঠিক কোমরের কাছে শিরদাঁড়ার ওপরে, এই দাগটা কীসের?

বোধিসত্ত্ব চমকে উঠে বললেন, কোথায়? আর কোনও দাগ নেই তো!

কৃষ্ণা তাঁর পিঠের শিরদাঁড়ার ওপর আঙুল রেখে বলল, এই তো, অনেকটা জরুলের মতো, আবার জরুল না-ও হতে পারে, হয়তো ছোটবেলা জোরে ধাক্কা লেগেছিল, অনেকটা পদ্মফুলের মতো হয়ে আছে।

এ-রকম কোনও দাগের কথা তো আমি জানি না!

বাঃ, তোমার শরীরে একটা দাগ রয়েছে, তুমি তা জানো না?

মানুষ তো নিজের পিঠ দেখতে পায় না।

কিন্তু আগে কেউ তোমাকে এ-কথা বলেনি?

না। সে-রকম বলবার মতো কেউ ছিল না।

তোমার মা-বাবা! আচ্ছা, আগে তুমি কোথায় ছিলে? তোমার বাড়ির অন্য লোকেরা কোথায় থাকে?

সে-সব কিছুই আমি জানি না। বোধহয় সে-রকম কেউ নেই আমার!

তার মানে তুমি আমাকে বলতে চাও না।

তাহলে তুমি বলো, কেন তুমি গঙ্গায় ডুবে মরতে গিয়েছিলে?

বলব, কোনও এক দিন বলব, এখনও বলার সময় আসেনি। সে-কথা জানার জন্য তুমি কি কৌতূহলে ছটফট করছ?

না, আমার সে-রকম কৌতূহল নেই।

তুমি কি আমাকে অবিশ্বাস করো?

কেন অবিশ্বাস করব?

কৃষ্ণা সামনের দিকে ঘুরে এসে বোধিসত্ত্বের কণ্ঠলগ্না হল। বোধিসত্ত্ব দু'হাত দিয়ে কৃষ্ণার মুখখানা ধরে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, তুমি কী সুন্দর!

কৃষ্ণা বলল, তুমি এই কথাটা এত বার বার বলো কেন! আমি তো জানি, আমি তেমন সুন্দরী নই! তবু তুমি যখন এই কথাটা বলো, তখন সুন্দর কথাটাই আশ্চর্য সুন্দর হয়ে ওঠে।

বোধিসত্ত্ব মুখ নিচু করে তাঁর চোখ দু'টি রাখলেন কৃষ্ণার চোখের ওপর। যখন আর কেউ কারুকে দেখতে পায় না। তবু সেই অন্ধকারের মধ্যেও তিনি খুঁজতে লাগলেন রূপ।

গত চার মাস ধরে তিনি কৃষ্ণার শরীরের ঘাম বা নখের ধুলোর মতো তার মধ্যে লীন হয়ে আছেন। তিনি এই সুস্বাস্থ্যবতী যুবতীর সুঠাম স্তনে চোখ ঘষেছেন পাগলের মতো। তিনি এর যোনিতে যোনি-কীট হয়ে থেকেছেন। কৃষ্ণার নগ্ন মূর্তির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তিনি দেখেছেন পাহাড়, সমুদ্র থেকে জেগে-ওঠা ডুবো পাহাড়। এর নিতম্বে দুই সুমেরু পর্বত। এব কোমরের খাঁজে, নিম্ন নাভিতে সাগরের ঢেউ। আলুলায়িত চুলে বনকুসুমের গন্ধ, উরুতে অবিরাম ভূমিকম্প। তিনি ওকে দাঁত দিয়ে কামড়েছেন, জিভ দিয়ে চেটেছেন, পৌরুষ দিয়ে বিঁধেছেন। তিনি উন্মত্ত হয়ে, নিজের শরীরের চেয়েও প্রকাণ্ড হয়ে আথালি-পাথালি খেলা খেলেছেন ওকে নিয়ে। তিনি ওর সারা শরীরে বার বার ঘষেছেন নিজের চোখ, তবু তার বুকের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলে রূপদাহ।

কৃষ্ণা এক-এক সময় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, তুমি এমন পাগলের মতো করো, আমার ভয় করে। আমার সত্যিই ভয় কবে। আমার মনে হয়, আমি খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাব।

বোধিসত্ত্ব সহাস্যে বললেন, তোমার কী ফুরিয়ে যাবে কৃষ্ণা? এই রূপ তোমার নয়। তুমি এই রূপের নও। রূপ তোমার আত্মা নয়।

কৃষ্ণা বলে, তোমার এই সব কথা শুনলেও আমার ভয় করে।

বোধিসত্ত্ব বলেন, এটা জেনে ফেলার ভয়। সব কিছু জানতে আমারও ভয় করে এখন। এ-কথা আমি অস্বীকার করতে পারি না।

তাহলে আমাকে ভয় দেখাও কেন?

কৃষ্ণা, তোমাকে আমি সব কিছু দিতে চাই। এমনকী ভয় পর্যন্ত!

শীত ফুরিয়েছে, বছর ফুরিয়েছে, আবার পৃথিবী তেতে উঠেছে। এক-এক দিন সন্ধেবেলা ঝড় ওঠে। ঘর থেকে বেরিয়ে ওরা দু'জনে এসে বসে ছাদে। কলকাতার আকাশ মড় মড় করে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। হুঙ্কার দিয়ে ছোটাছুটি করে একশোটা দৈত্য। তারপর বড় বড় ফোঁটায় আসে বৃষ্টি। ওরা বৃষ্টিতে ভিজতে থাকে। তখন মনে হয়, পৃথিবীতে ওরা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই।

বোধিসত্ত্ব কৃষ্ণাকে ছুঁয়ে থাকেন। বজ্রের শব্দে তিনি যেন শুনতে পান কার কণ্ঠস্বর। খুব দুর্বোধ্য তার ভাষা। কারা যেন এক অপরিচিত নাম ধরে তাঁকে ডাকে। বোধিসত্ত্ব সেই আকাশবাণী শুনতে চান না।

এই বৃষ্টির মধ্যেও কৃষ্ণার শরীর উষ্ণ, তার বুকে হাত রেখে বোধিসত্ত্ব ভাবেন, সবাই জানে, এই সুখ ক্ষণস্থায়ী। তবু এই সুখ ছেড়ে আর কোন বড় সুখের সন্ধানে তাঁর যাবার কথা ছিল?

বিদ্যুতের ঝিলিকের সঙ্গে সারা আকাশ গড় গড় করে ওঠে। আবার তাঁর মনে হয়, আকাশ যেন কথা বলছে। বোধিসত্ত্ব সেই ভাষা বোঝার চেষ্টা করলেন, তিনি তাকিয়ে রইলেন কৃষ্ণার মুখের দিকে।

কৃষ্ণা বলল, এই সময় কী ইচ্ছে করছে জানো?

বোধিসত্ত্ব উৎসুক ভাবে তাকালেন।

কৃষ্ণা বলল, আমরা অনেক দূরে চলে যাব, কোনও একটা গ্রামের নদীর ধারে, সেখানে খুব ছোট্ট চায়ের দোকান থাকে না? সেই রকম একটা দোকানে বসে থাকব, গেলাসে করে চা দেবে, গুঁড়ো চা, ওপরে দুধের সর ভাসে, খুব খারাপ খেতে হয় সেই চা, তবু সেই চা-ই আমরা মজা করে খাব আর নদীর ওপরে বৃষ্টি পড়া দেখব। দোকানের ছেলেটাকে বলব মুড়ি মেখে দিতে। সে কলাই-করা থালায় একগাদা মুড়ি, ভেজাল সরষের তেল দিয়ে মেখে এনে দেবে, সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা। তার কী অপূর্ব স্বাদ। মাছধরা নৌকোগুলো এসে ভিড়বে নদীর ধারে, তুমি সেই বৃষ্টির মধ্যেই ছুটে গিয়ে কিনে নিয়ে আসবে এক কিলো জ্যান্ত চিংড়ি মাছ, সেই দোকানেই ভাজা হবে, মুড়ির সঙ্গে টাটকা চিংড়ি মাছ ভাজা, দারুণ। তারপর রাত্রে কোনও গৃহস্থের বাড়ি গিয়ে বলব, আমাদের একটু থাকতে দেবেন।

বোধিসত্ত্ব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলো!

কৃষ্ণা অবাক হয়ে বলল, এখন? পাগল নাকি!

কেন? এখনই বেরিয়ে পড়ব আমরা!

তা কি হয়? এই সব কথা ভাবতেই ভাল লাগে, সত্যি সত্যি কি যাওয়া যায়?

কেন যাবে না? যে-কোনও ট্রেনে উঠে আমরা যে-কোনও জায়গায় নেমে পড়ব! যেখানে নদী থাকবে।

এই সন্ধেবেলা বেরিয়ে কোথায় যাব? যেতে হয় সকালবেলা!

সন্ধেবেলা গেলেই বা ক্ষতি কী? চলো, চলো।

কাল সকালে ঠিকে ঝি আসবে, তাকে কিছু বলা হয়নি। পরশুই এক তলায় চুরি হয়ে গেছে, আমাদের ঘর খালি রেখে গেলে যদি সব চুরি হয়ে যায়?

আমাদের কী আছে যে চুরি হবে?

ক'দিন আগেই স্টিলের নতুন থালাবাসন কিনেছি!

এত মায়া?

আর এক দিন যাব, ঠিক যাব। আজ নয়।

বোধিসত্ত্ব একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ঠিক আছে, আজ নদীর ধারে বসে বৃষ্টি দেখা না-ই বা হল। কিন্তু এখানেও বৃষ্টি পড়ছে। তোমার তেলমাখা মুড়ি আর চিংড়ি মাছ ভাজা খেতে ইচ্ছে হয়েছে। সেগুলো আমি নিয়ে আসছি।

কৃষ্ণা বোধিসত্ত্বের হাত টেনে ধরে বলল, না না, এই বৃষ্টির মধ্যে তোমাকে যেতে হবে না, লক্ষ্মীটি!

বোধিসত্ত্ব বললেন, আমারও ইচ্ছে করছে!

কৃষ্ণা বলল, ঠিক আছে, যেতে হবে না, মুড়ি বাড়িতেই আছে।

তাহলে চিংড়ি মাছ নিয়ে আসি। হয়তো জ্যান্ত হবে না। কিংবা গঙ্গার ধারে গিয়ে দেখি যদি পাই।

তারপর মুচকি হেসে তিনি চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু ভেজাল সরষের তেল কোথায় পাওয়া যায়?

কৃষ্ণাও হাসতে হাসতে বলল, যে-কোনও দোকানে!

বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়ে বোধিসত্ত্ব বেরিয়ে পড়লেন। তাঁদের বাড়ির সামনের গলিতে জল জমে গেছে, তার মধ্য দিয়ে তিনি হাঁটতে লাগলেন ছপছপিয়ে।

এক-এক দিন মাঝরাত্রে বোধিসত্ত্ব ঘুম ভেঙে উঠে পড়েন ধড়মড় করে। কেন ঘুম ভেঙে যায় তিনি বুঝতে পারেন না। আগে অনবরত পথে পথে ঘুরতেন। এখন শুধু অফিস যাওয়া-আসা ছাড়া আর কোথাও বেরোন না। সময় বাঁচাবার জন্য তিনি যাতায়াত করেন বাসে বাদুড়-ঝোলা হয়ে।

কখনও কখনও হঠাৎ তাঁর মনে হয়, পথ বুঝি তাঁকে ডাকছে। উদ্দেশ্যহীন ভাবে পথে পথে ঘোরার একটা নেশা আছে। এক একদিন তিনি মাঝ রাতে উঠে জামাও পরেছিলেন একটু পথে ঘুরে আসবেন বলে। কিন্তু আবার নিবৃত্ত হয়েছেন। কৃষ্ণা হঠাৎ জেগে উঠে তাকে দেখতে না পেলে ভয় পাবে। তাছাড়া তিনি কোনও কারণে যদি আর ফিরতে না পারেন?

তিনি এক দৃষ্টে চেয়ে থাকেন কৃষ্ণার মুখের দিকে। ঘুমন্ত মানুষের মুখে একটা ধ্যানের প্রশান্তি থাকে। কড়াই কারখানার ফার্নেসের শিখা এসে পড়ে জানলা দিয়ে। সেই অল্প আলোয় তিনি দেখেন এই যৌবনবতী নারীকে। দেখে দেখে আর ফুরোয় না। রূপে বাসস্থান চক্ষু। এই চোখ রূপে রত। এই চোখ আর কিছুতে ফেরে না অন্য দিকে। অথচ এই রূপ কি শুধুই বাইরে? কৃষ্ণার ভিতরের পরিচয় তিনি কিছুই জানেন না। যেমন জানেন না নিজের।

কখনও কখনও কৃষ্ণার ঘুম ভেঙে যায়। সে প্রথমে আধোঘুমে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে। তারপর তাড়াতাড়ি উঠে বসে বলে, এ কী, তুমি এখনও জেগে আছ?

বোধিসত্ত্ব বলেন, জেগে ছিলাম না, তোমারই মতো হঠাৎই জেগে উঠলাম।

আমাকে ডাকোনি কেন?

ডাকিনি, তোমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে ভাল লাগছিল।

তোমার গায়ে জামা? তুমি কোথাও যাচ্ছিলে?

বোধিসত্ত্ব একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, না। কোথাও যাব না। একবার শুধু ভেবেছিলাম পথে ঘুরে আসব।

কৃষ্ণা বোধিসত্ত্বর দু'হাত জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল গলায় বলল, তুমি আমাকে এ-রকম ভয় দেখাও কেন বলো তো?

বোধিসত্ত্ব তার মাথায় হাত রেখে কোমল গলায় বললেন, তোমার কীসের ভয় কৃষ্ণা?

আমার ভয় হয়, তুমি হঠাৎ কোনও দিন আমাকে ছেড়ে চলে যাবে!

বোধিসত্ত্ব হাসলেন, ক্ষীণভাবে।

তুমি কথা দাও, আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না?

কোথায় যাব?

তা জানি না। তবু মাঝে মাঝে তোমার মুখ দেখে কী-রকম যেন মনে হয়। ভয় হয়, তোমাকে যেমন হঠাৎ পেয়েছি, তেমনি হঠাৎ তুমি এক দিন চলে যাবে।

কোথায় যাব, কেন যাব, সে-কথা যদি জানতাম, তাহলে যাওয়ার প্রশ্ন উঠত। কিন্তু তা তো আমি জানি না!

তুমি সব সময় আমার মুখের দিকে চেয়ে কী দেখো?

তোমাকেই দেখি।

কিন্তু আমার মনে হয় তুমি আমাকে ছাড়িয়ে আরও কিছু দেখছ।

নাঃ, তত দূর আমার দৃষ্টি যায় না।

এবার থেকে যখন জেগে উঠবে, তখন আমাকে ডেকে তুলবে। আমিও তোমার সঙ্গে জাগব। সব রাত্তিরেই ঘুমিয়েই-বা কী হবে?

তুমি ভয় পেয়ো না, এর পর থেকে মাঝরাত্রে আমি জেগে উঠলেও গায়ে জামা পরব না।

কৃষ্ণা বোধিসত্ত্বের বুকে হেলান দিয়ে আবেশে চোখ বুজল। বোধিসত্ত্বের একখানি হাত নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, তুমি যখন ঘুমিয়ে থাকো, তখন এক-এক দিন আমিও তোমাকে দেখি। তুমি আমাকে সুন্দর বলো, কিন্তু আসল সুন্দর তো তুমি! তোমার মতো এমন মানুষকে পাওয়া ক'জন মেয়ের ভাগ্যে থাকে। প্রায়ই আমি ভাবি, ভাগ্যিস সে-দিন আমি গঙ্গায় ডুবতে গিয়েছিলাম, তাই তোমাকে পেলাম। ভগবান আমাকে উপহার দিয়েছে তোমার মতো এক জন মানুষকে।

ভগবান দিয়েছেন?

তাছাড়া আর কে? ওই সময় গঙ্গার ধারে তো কেউ না-ও বসে থাকতে পারত? কিংবা অন্য কোনও মানুষ থাকতে পারত। এটা ভগবানের দান নয়?

ভগবান যদি আমাকে দান করে থাকেন, তবে আমার তো তাঁকে চেনার কথা। কিন্তু আমি তো তাঁকে চিনি না।

কৃষ্ণা তীক্ষ্মভাবে বোধিসত্ত্বের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক পলক। তারপর বলল, তুমি না চেনো, তাতে কোনও ক্ষতি নেই। আমিও আগে ঈশ্বর মানতাম না, সেই স্কুল পড়ার সময় সরস্বতী পুজোয় অঞ্জলি দিয়েছি, তারপর আর ঠাকুর-ফাকুর পুজো করিনি কক্ষনও। আমাদের বাড়িতে —।

তোমাদের বাড়িতে?

ও, এই বলে তুমি আমাদের বাড়ির খবর জেনে নিতে চাও? না, সে-সব এখন বলব না। শোনো, যা বলছিলাম, ঘুমের মধ্যে এক-এক সময় যখন তোমার মুখটা দেখি, তখন মনে হয়, তোর মনেব মধ্যে খুব — খুব একটা দুঃখ আছে। কিছু একটা দুঃখ তুমি পুষে রেখেছ।

না তো! আমার কোনও দুঃখ নেই। আমি সুখী।

ঠিক বলছ?

তুমি জানো না আমি সুখী?

জানি। তবু তোমার মুখ দেখলে এক-এক সময় অন্য রকম মনে হয়। তখনই আমার ভয় করে। আমি জানি, পুরুষ মানুষের একটা বাইরের জীবন দরকার। তুমি সব সময় আমার কাছে থাকো। মাঝে মাঝে বাইরে বেরোলেও তো পারো! বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিশতে পারো। তোমার কোনও বন্ধু-টন্ধুকে বাড়িতে ডেকে আনতেও পারো! হয়তো সব সময় আমাকে তোমার ভাল লাগে না!

সে-রকম কথা আমার কখনও মনে হয়নি।

তুমি যদি আমাকে ছেড়ে চলে যাও, তাহলে আমি আবার ঠিক গঙ্গায় ডুবে মরব।

কৃষ্ণা, আমি তো তোমার কাছেই আছি।

বোধিসত্ত্বকে হারাবার চিন্তাতেই কৃষ্ণার সারা শরীরটা একবার কেঁপে উঠল। এই দুর্বোধ্য মানুষটিকে আরও দৃঢ় বন্ধনে বাঁধবার জন্য সে তক্ষুনি আঁচল সরিয়ে, ব্লাউজের বোতাম খুলে ফেলল। তারপর মা যেমন শিশুকে ডাকে, সেই রকম নিজের স্তন দেখিয়ে বলল, এসো।

এক দিন মাঝ রাত্রে কৃষ্ণা নিজেই ডেকে তুলল বোধিসত্ত্বকে। আনন্দব্যাকুল স্বরে বলল, এই, দ্যাখো, দ্যাখো!

সে বোধিসত্ত্বের একখানা হাত টেনে নিজের শায়া খোলা তলপেটের ওপরে চেপে ধরল।

বোধিসত্ত্ব প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলেন না। কৃষ্ণা বলল, টের পাচ্ছ না? নড়ছে! ভীষণ নড়ছে আজ দুষ্টুটা।

বোধিসত্ত্ব অনুভব করলেন কৃষ্ণার পেটের মধ্যে একটা স্পন্দন। একটি নতুন প্রাণ আসছে পৃথিবীতে। সে নিজের অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে। তিনি হাত সরিয়ে নিচু হয়ে সেখানে কান পাতলেন। হ্যাঁ, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কৃষ্ণার গর্ভে রয়েছে দ্বিতীয় একটি আত্মা।

আনন্দের চোটে কৃষ্ণা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। বোধিসত্ত্ব তার চোখের জল মুছিয়ে দিলেন। তার নিজের মধ্যে এক বিচিত্র অনুভূতি, যা ঠিক আনন্দ বা উৎকণ্ঠা নয়। বহু কাল ধরে মানব-জীবনের যে ধারা বহে আসছে, তিনি এবার থেকে তার অন্তর্গত হয়ে গেলেন। তিনি এর থেকে আর আলাদা হয়ে যেতে পারবেন না, তাঁর রক্তের ধারা বয়ে নিয়ে যাবে অন্য এক জন।

কৃষ্ণা বলল, তুমি আগে কোনও দিন টের পাওনি, না?

না।

তুমি কিছু লক্ষ্যও করোনি? আমার কোনও পরিবর্তনও তুমি দেখোনি?

বোধিসত্ত্ব হেসে বললেন, না, বুঝতে পারিনি।

আমি ইচ্ছে করেই এত দিন তোমাকে কিছু বলিনি। প্রায় পাঁচ মাস —।

কেন বলোনি?

কী জানি, আমার একটু একটু ভয় করত। যদি তুমি পছন্দ না করো, যদি তুমি রেগে যাও।

কথা বলতে বলতে কৃষ্ণার মুখখানা শুকিয়ে গেল। মুখে ফুটে উঠল খানিকটা অস্বাভাবিক ম্লান ছায়া।

বোধিসত্ত্ব তার চিবুকে হাত রেখে বললেন, আমাকে কেন ভয় পাবে কৃষ্ণা? আমি তো তোমার সব কিছু নিয়ে সম্পূর্ণ হয়ে আছি।

কৃষ্ণা বোধিসত্ত্বের বুকে মুখ ডুবিয়ে তবু কাঁদতে লাগল।

দিনের পর দিন কেটে যায়। কৃষ্ণার মা হবার দিন যত ঘনিয়ে এল, ততই বোধিসত্ত্ব লক্ষ্য করলেন কৃষ্ণা মাঝে মাঝে একা চুপ করে বিষণ্ণ ভাবে বসে থেকে কী যেন চিন্তা করে। এমনকী, কথা বলতে বলতেও অন্য মনস্ক হয়ে যায়। বোধিসত্ত্ব কৃষ্ণার চরিত্রের সঙ্গে এটা ঠিক মানতে পারেন না। সে স্বভাবতই উচ্ছল, সামান্য জিনিস থেকেও আনন্দ খুঁজে পায়। হ্যাঁ, এই সময় মেয়েরা একটু মৃদুভাষিণী, অলসগামিনী হয় বটে, কিন্তু মুখে যে-খুশির আভা লেগে থাকে, সেটা নেই কেন? মেয়েরা সকলেই মা হতে চায়, প্রকৃতি মেয়েদের মধ্যে এই ফাঁদ পেতে রেখেছে, আর তাদের শাবীরিক যন্ত্রণার মধ্যেও মিশিয়ে রেখেছে গৌরব-বোধ।

নিচতলার ভাড়াটেরা প্রথম দিকে এই দম্পতিকে সুনজরে দেখত না। কারণ এরা অমিশুক। উচ্চ বৃক্ষচূড়ের কপোত-কপোতীর মতোই এরা ছাদের ঘরে নিজেদেব নিয়েই মত্ত থাকত। কৃষ্ণা গর্ভিণী হবার পর ইদানীং ভাড়াটে বউরা ওপরে আসে। কৃষ্ণাকে নানা রকম উপদেশ দেয়। এটাও প্রাকৃতিক নিয়ম। এক নারী থেকে আর এক নারীতে জ্ঞান সঞ্চারিত হয়ে যায়। গায়কের স্ত্রীটি এ বাড়ির মধ্যে সব চেয়ে দজ্জাল, ঝগড়ায় যার জুড়ি নেই, সেই কিন্তু সব চেয়ে নরম ব্যবহার করে কৃষ্ণার সঙ্গে। কোনও মানুষের যে কোনখানে সঠিক পরিচয়, তা বোঝা শক্ত।

বাড়ির মেয়েরা যখন কৃষ্ণার কাছে আসে, তখন বোধিসত্ত্ব পাশের ঘরে চলে যান। তবু মাঝে মাঝে ওদের টুকরো কথাবার্তা শুনে বুঝেছেন, এ-দেশের মেয়েরা প্রথম সন্তানের আগে বাপের বাড়ি যায়। নিজের মায়ের কাছ থেকেই বেশির ভাগ স্ত্রী-আচার শেখে। কৃষ্ণা এড়িয়ে যায় সে-প্রসঙ্গ।

বোধিসত্ত্ব হঠাৎ এক দিন জিজ্ঞেস করলেন, তুমি দীর্ঘশ্বাস ফেলছ কেন, কৃষ্ণা?

কৃষ্ণা অপ্রস্তুত ভাবে বলল, কই, না তো!

বোধিসত্ত্ব হেসে বললেন, হ্যাঁ, তুমি বিরাট একটি শ্বাস ফেলেছ, আমার হাতে এসে লেগেছে সেই গরম হাওয়া। এই দেখো, আমার হাতের রোম সরে গেছে।

কৃষ্ণা চুপ করে রইল।

মানুষ সাধারণত দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুঃখ বা দুশ্চিন্তায়। এর মধ্যে কোনটি হয়েছে তোমার?

কোনওটাই না। সত্যি নয়!

তোমার কি মনে পড়ছে তোমার বাড়ির কথা? মায়ের জন্য মন কেমন করছে? আজ পর্যন্ত তোমার বাড়ির কথা কিছু বলোনি। আমার মনে হয়, তোমার বাড়ির কারুকে একটা খবর দেওয়া উচিত।

আমার বাড়ি নেই, আমার মা-বাবা কেউ নেই!

তা কি হয়? কেউ না-কেউ নিশ্চয়ই থাকবে। গঙ্গার ধারে যে-দিন তুমি এসেছিলে, সে-দিন নিশ্চয়ই কোনও বাড়ি থেকেই এসেছিলে?

তোমার তাহলে কেউ নেই কেন? তুমিও তো তোমার মা-বাবা, ঘরবাড়ির কথা কিছুই বলোনি আমাকে।

আমার সত্যিই মনে নেই কৃষ্ণা। নিশ্চয়ই আমার ছিল কেউ। মানুষ অযোনিসম্ভূত হয় না। নিশ্চয়ই কোথাও কোনও নারীর গর্ভেই আমি জন্মেছি। তার বুকের দুধ খেয়ে বেঁচেছি, নিশ্চয়ই কারুর না-কারুর স্নেহে আমি লালিত হয়েছি শৈশবে, কৈশোরে। গোরুর বাচ্চা পেট থেকে পড়েই লাফায়, কিন্তু মানবশিশুর স্বাবলম্বী হতে অনেক সময় লাগে। রাস্তার ভিখারি-শিশুও পায় ভিখারি-মায়ের স্নেহ। নিশ্চয়ই আমারও কেউ ছিল, কিন্তু আমার কিছু মনে পড়ে না।

এ-রকম কখনও হয়?

হয়েছে তো দেখছি! বোধহয় আমি তোমাদের মতো বাঙালিও ছিলাম না। কারণ এক গাছতলায় যখন আমার জ্ঞান হয় তখন আমি বুঝতাম না তোমাদের ভাষা। কিন্তু আমি জড়ভরতও ছিলাম না, আমার অনেক কিছু মনে পড়ত শুধু নিজের পূর্ব পরিচয় ছাড়া। সে-কথা থাক। কিন্তু তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে।

মনে থাকলেও আমি সেখানে ফিরে যাব না!

কিন্তু এ সময় একটা খবর দেওয়া উচিত বোধহয়। ওঁরা যদি কোনও কারণে রেগে থাকেন, আমি ক্ষমা চাইব। আমি নিশ্চয়ই ক্ষমা ভিক্ষা করে নিতে পারব।

না, তার দরকার নেই। সে-সব চুকেবুকে গেছে।

তবু তোমার মুখে ভয়ের ছায়া দেখি কেন? তুমি কি সন্তান চাওনি?

চাইনি? আমি রোজ স্বপ্ন দেখি, আমার একটি ছেলে হয়েছে, ঠিক তোমার মতো মুখ-চোখ। এক দিন সে এই ঘরে ছোট ছোট পায়ে ঘুরে বেড়াবে। আমি ভয় পাই তোমার জন্য, আমি যে-ক'দিন হাসপাতালে থাকব, তোমাকে কে দেখবে? তোমার তো নিজের জিনিস সম্বন্ধে কিছুই খেয়াল থাকে না!

যা পাগল, এটা আবার একটা ভয়ের ব্যাপার নাকি? আমি আগে একলা থাকতাম না?

আমার এমন হয়েছে, আমি যেন এক দিনও তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

আমি সব সময় তোমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকব।

সব সময়?

যত দিন না মৃত্যু আসে। জন্ম, যৌবনের পর জরা আর মৃত্যু তো আসবেই!

কৃষ্ণা বোধিসত্ত্বের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে ওঠে, থাক, থাক, মৃত্যুর কথা বোলো না এখন। মৃত্যুর কথা শুনতে চাই না।

কৃষ্ণার প্রসব-বেদনা উঠল অনেক রাতে। এ সম্পর্কে গায়ক-পত্নী পরামর্শ দিয়ে রেখেছিল যে, আগে থেকে এক জন কোনও ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে কথাবার্তা বলে রাখতে। এই ব্যাপারে সাহায্য করছে স্কুল-শিক্ষকের বেকার ভাই। পাড়ার এক ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে তার চেনা আছে।

নিচ থেকে সেই ছেলেটি হেঁকে বলল, ও কুমারদা, ট্যাক্সি এসে গেছে!

বোধিসত্ত্ব কৃষ্ণাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি হেঁটে নামতে পারবে, না তোমাকে তুলে নেব?

কৃষ্ণার মুখখানা তখন ব্যথায় নীল। যন্ত্রণার চোটে সে মাঝে মাঝে কামড়ে ধরছে নিজের ডান বাহু। আস্তে আস্তে সে উঠে দাঁড়াল, বলল, পারব!

দু'পা এসে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে চেপে ধরল বোধিসত্ত্বের হাত। চেষ্টা করে অনেকখানি দম নিয়ে সে বলল, তোমাকে একটা কথা বলব, বলতেই হবে, তুমি আমাকে যাই ভাবো না কেন, তোমার কাছে আসবার আগে আমি কুমারী ছিলাম না!

বোধিসত্ত্ব চুপ করে রইলেন। কৃষ্ণা আবার বলল, শুনতে পেয়েছ কথাটা? তোমার কাছে আসবার আগে আমি কুমারী ছিলাম না!

বোধিসত্ত্ব বললেন, আমি তো সে-রকম কিছু দাবি করিনি। চলো।

কৃষ্ণা বলল, আরও কয়েকটা কথা বলতেই হবে, ভেবেছিলাম বলব না, আগের বার আমি আমার পেটের সন্তানকে মেরে ফেলেছি!

বোধিসত্ত্ব তার মায়াময় হাত কৃষ্ণার মাথায় রেখে বললেন, ও-সব কথা পরে নিশ্চয়ই শুনব। এখন চলো।

কৃষ্ণা তবু গেল না। হঠাৎ যেন ব্যথাটা চলে গেছে, শান্ত মুখে বলল, আমি তোমাকে ঠকিয়েছি, যদি সিজারিয়ান হয়, ডাক্তারকে আগেকার কথা বলতেই হবে, তাই তোমাকে বললাম। আমার নিজের মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে...আমি তাকে বিয়ে করতে রাজি ছিলাম, কিন্তু সে ভয় পেল, আমার বাড়ির কেউই রাজি হল না, আমার বাবা ডাক্তার, বাবাই ব্যবস্থা করে আট মাসের সময় নষ্ট করে দিল। তার দশদিন পরেই...আমি থাকতে পারতাম না। সব সময় শুনতাম একটা বাচ্চার কান্না, সেই জন্যই চেয়েছিলাম আত্মহত্যা করতে!

বোধিসত্ত্ব স্থিরভাবে চেয়ে রইলেন কৃষ্ণার মুখের দিকে।

কৃষ্ণা বলল, এবার তুমি আমাকে ঘৃণা করবে তো?

না।

আমার বাড়ির লোক চেয়েছিল ওই কথা লুকিয়ে অন্য জায়গায় আমার বিয়ে দিতে। কিন্তু আমি লুকোতে পারতাম না, ঠিক বলে ফেলতাম। তোমাকে এত দিন বলিনি, কারণ তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ, আমার নতুন জন্ম হয়েছে, আর আগেকার কিছু নেই।

তোমার আগেকার কিছু সত্যিই তো নেই!

আমাকে ঘেন্না করে তুমি এবার ছেড়ে চলে যাবে। তুমি কত ভাল, তোমাকে আমি ঠকিয়েছি। তোমার মতো মানুষ পাওয়া কত বড় ভাগ্য, কিন্তু আমি যে —।

কৃষ্ণা, আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখো। এই কি অবিশ্বাসীর মুখ?

এবার ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল কৃষ্ণা। অসহায় শিশুর মতো মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, ওগো, আমার আর কেউ নেই, আমি আর কোথায় যাব? আমার বড় শখ ছিল, একটা বাচ্চা ঘরের মধ্যে ছুটে ছুটে বেড়াবে, তুমি তাকে আদর করবে।

কৃষ্ণা, কৃষ্ণা!

তুমি এই ক'দিনের মধ্যে কোথাও চলে যাবে না, কথা দাও। আমার গা ছুঁয়ে বলো! বলো, বলো, বলো!

এই তো তোমার গা ছুঁয়ে আছি আমি। কৃষ্ণা, আমি কোথাও যাব না।

ওগো, এমন আনন্দ আমি জীবনে কখনও পাইনি। তোমাকে নিয়ে...তুমি আমাকে এতখানি ভালবাসা দিয়েছ, আমার সন্তান, আমার সংসার...ওগো, আমাকে ছেড়ে যেয়ো না, ক্ষমা ঘেন্না করে আমাকে কাছে রেখো, ছেড়ে যেয়ো না, ছেড়ে যেয়ো না, ছেড়ে যেয়ো না।

বোধিসত্ত্বকে শপথ ভঙ্গ করতে হল না। সন্তানের জন্ম দেবার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই কৃষ্ণা শেষ নিশ্বাস ফেলল। তার ছেলেটি পরের দেড় দিন যেন ঘোর যোগনিদ্রার মধ্যে রইল, কাঁদল না, হাসল না, এ পৃথিবীর দিকে একবার চোখ মেলে তাকাল না পর্যন্ত। তারপর, তার মা যেখানে গেছে, সে-ও চলে গেল সেখানে।

॥ ১০॥

কয়েক মাস ধরে বহু জায়গায় ঘুরলেন বোধিসত্ত্ব। বাড়িঘর, চাকরি-বাকরি সব ছেড়ে দিয়েছেন। ঘুরতে ঘুরতে এক দিন দেখলেন, তাঁর জামা শতচ্ছিন্ন, পকেটে একটা পয়সা নেই, মাথার চুল এসে নেমেছে ঘাড় পর্যন্ত, মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। আর শরীরের মধ্যে জ্বলছে এক বাষ্পময় আগুন। সেই আগুনের শিখা তাঁকে ডেকে বলল, ওহে পরিব্রাজক, অনেক কিছু তো দেখলে, এবার আবার আমাকে দেখো, নইলে তোমাকে আমি ভস্মসাৎ করব।

বোধিসত্ত্ব প্রায় তিন দিন ধরে কিছু খাননি, শরীরটা দারুণ অবসন্ন, আর চলতে পারছেন না। তিনি বসে পড়লেন একটা মাঠের ধারে। কাছাকাছি কোনও বাড়ি-ঘর নেই, একটা ডোবার পাশে চরে বেড়াচ্ছে তিনটে গোরু, আর একটা শিরীষ গাছের ছায়ায় শুয়ে আছে বাচ্চা রাখাল।

বোধিসত্ত্ব একবার ভাবলেন, ওই বাচ্চাটার কাছেই কিছু খাবার চাইবেন। কিন্তু ছেলেটি খাবার এনে দেবে কোথা থেকে? আশেপাশের এমন কোনও গাছপালা নেই যার থেকে কিছু খাদ্য পাওয়া যায়। যত দূর পর্যন্ত দেখা যায়, জমিতে ফলে রয়েছে ধান। ওই ধান এক দিন হাজার হাজার লোককে খাদ্য দেবে। কিন্তু আপাতত এক জন ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে ওর কোনও মূল্য নেই।

একটু বাদে রাস্তা দিয়ে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে যেতে লাগল একটা বলদের গাড়ি। সেটা গুড়ের কলসিতে ভরা।

চোখের সামনে খাদ্য দেখে বোধিসত্ত্বর খিদে আরও চনমনিয়ে উঠল, তিনি আর থাকতে পারলেন না। ছুটে গেলেন গাড়িটার সামনে। বৃদ্ধ গাড়োয়ান চোখ বুজে ঢুলছে, ষাঁড় দু'টি চলছে অলস মনে।

তিনি লোকটিকে ডেকে বললেন, ভাই, আমাকে একটু গুড় খেতে দেবে?

লোকটি চোখ মেলে বলল, হবে নে! হবে নে!

গাড়িটার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি বলতে লাগলেন, দাও ভাই, একটু দাও!

গাড়োয়ানের পিছনে এক জন বলিষ্ঠকায় প্রৌঢ় লোক বসে ছিল। সে বলল, এই গুড় খুচরো বিক্কিরি নেই।

বোধিসত্ত্ব বললেন, আমি কিনতে চাইছি না। কেনার মতো পয়সাও নেই আমার। আমাকে এমনিই একটু দান করো!

গাড়োয়ানটি বলল, আরে, মলো যা! ছোট ছেলেপিলেরা এসে গুড় চায়, সে বুঝি এক কথা। আর এ দামড়াটা বলে কী?

গাড়োয়ানের পিছনের লোকটি বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞেস করল, তুমি জোয়ান মরদ। তুমি গুড় ভেঙে খেতে চাচ্ছ কেন?

বোধিসত্ত্ব বললেন, আমার অসম্ভব খিদে পেয়েছে। আমাকে দান করো, সামান্য একটু।

গাড়োয়ান হেঁকে বলল, আরে যা যা যা, পাগল!

পিছনের লোকটি বলল, আহা, দাও লোকটারে একটুখানি!

গাড়িটি থামল। দয়ালু লোকটি দু'খাবলা আখের গুড় তুলে দিল বোধিসত্ত্বের হাতে। বোধিসত্ত্ব হ্যাংলা মানুষের মতো গপ গপ করে তা গিলে ফেললেন। তাবপর একটি তৃপ্তির হাসি দিয়ে বললেন, আমাকে বাঁচালে। আমার যে-উপকার তোমরা করলে, তার বিনিময়ে আমি কিছু করতে চাই।

গাড়োয়ানটি বলল, ঢের হয়েছে! এবার হঠো সামনে থেকে।

অন্য লোকটি হেসে বলল, ঠিক আছে যাও, ওই সামনের পুকুর থেকে হাত ধুয়ে নাও গে!

বোধিসত্ত্ব দৌড়ে গিয়ে ডোবাটায় হাত ধুয়ে কয়েক আঁজলা জল পান করলেন। ততক্ষণে গাড়িটি আবার চলতে শুরু করেছে। তিনি ফিরে এসে সেটাব পাশে ছুটতে ছুটতে বললেন, তোমরা আমাকে ঋণী করে গেলে, আমি কী করে তা শোধ দেব?

গাড়োযানটি বলল, আরে, এ যে বড় নাছোড়বান্দা দেখছি' তুমি তো বললে তোমার কাছে পয়সা নেই। ও একছিটে গুড় আমি এমনিই দিয়েছি!

বোধিসত্ত্ব বললেন, পয়সা ছাড়া আর কোনও ভাবে উপকার শোধ দেওয়া যায় না!

অন্য লোকটি বলল, এ তো বেশ মজাদার মানুষ। ভদ্দোর লোক বলে মনে হয়। বোধহয় ভাল বংশের ছেলে ছিল, মাথা বিগড়ে গেছে। ও কত্তা, তুমি কোথা থেকে আসছ, কোথায় যাবে?

বোধিসত্ত্ব বললেন, আমি কোনও জায়গা থেকে আসিনি, আমি কোথায় যাব জানি না! আমি এখন এইখানে আছি, এইটুকুই জানি।

পিছনেব লোকটি গাড়োয়ানকে গাড়ি থামাতে অনুবোধ করে বোধিসত্ত্বকে বলল, এসো, উঠে এসো। চলো আমাদের সঙ্গে।

বোধিসত্ত্ব সেই গাড়িতে চড়ে বসলেন।

গাড়োয়ানটির নাম এককড়ি দাস আর অন্য লোকটি দীনু মণ্ডল। এরা যাচ্ছে ঝিকড়দার হাটে। দীনু মণ্ডল একটা বিড়ির কৌটো বাব করে বলল, নাও। বোধিসত্ত্ব নিলেন একটা বিড়ি। দীনু মণ্ডল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, ভাইডি, তুমি যে এমন পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছ, কোথায় যাবে, তা-ও জানো না, রাত্রে থাকবে কোথায়, খাওয়া জুটবে কোথায়?

এই ক'মাস বোধিসত্ত্ব এ-সব কথা একবারও চিন্তা করেননি। কিন্তু আজ বুঝতে পারলেন, এইবার থেকে ভাবতে হবে। একটু আগে খিদের চোটে তাঁর মাথা ঘুরছিল। পেটের ভেতরের আগুনের শিখাটি সহজে তার দাবি ছাড়বে না। তিনি কিছুই উত্তর দিতে পারলেন না।

দীনু মণ্ডল বলল, ভগবান শরীর দিয়েছেন, স্বাস্থ্য দিয়েছেন, তা কি মিছি মিছি নষ্ট করা উচিত? তোমার বাড়িঘর কোথায়? মা-বাবা কেউ নেই?

বোধিসত্ত্ব বললেন, না, আমার কেউ নেই।

তাহলে অনেকটা নিশ্চিন্দি। একলা মানুষের খোরাকি কোনওক্রমে ঠিক জুটে যায়। আজকালকার দিনে বুড়ো বাপ-মা থাকলেও ঝামেলা। আর ঘরে বউ আর গণ্ডাখানেক এণ্ডিগেণ্ডি থাকলে সেগুলোকে খাওয়াতেই তো মুখের রক্ত উঠে যায়।

বলদ-গাড়ির চালক এককড়ি দাস বলল, এখন ধান রোওয়ার মরশুম, এখন মাঠে গিয়ে জন খাটলেও চার টাকা, সাড়ে চার টাকা পেয়ে যাবে।

দীনু মণ্ডল বলল, চলো আমাদের সঙ্গে। একটু কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

ঝিকড়দার হাট তেমন কিছু জমজমাট ব্যাপার নয়। এখানে সেখানে কুমড়ো আর মিষ্টি আলু ডাঁই করা। কেনার লোকের তুলনায় বিক্রির দ্রব্য কম। মাছ আর গুড়ের জন্য সব জায়গায় মাছি ভ্যান ভ্যান করছে। ওদের দু'জনের সঙ্গে হাত লাগিয়ে বোধিসত্ত্ব গুড়ের হাঁড়িগুলো নামিয়ে ফেললেন। ওই গুড়ের মালিক এককড়ি দাস, দীনু মণ্ডল সঙ্গে এসেছে, ফেরার পথে সে তার জমির জন্য পটাস সার কিনে নিয়ে যাবে।

গুড় বিক্রি হয়ে গেল ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই। তারপর এককড়ি দাস ওদের দু'জনকে আধ কেনেস্তারা তাড়ি খাওয়াল। ফেরার পথে বড় এক ঠোঙা মুড়ি আর তেলেভাজা নিয়ে তিন জনে মিলে খেতে লাগল এক জায়গা থেকে। এককড়ি দাস বিরাট হেঁড়ে গলায় গান ধরলে :

করছি পরের কারণ, সদাই রোদন
আপন কাঁদন তো কাঁদ না
টোকাহীন হলে নাড়ি যুড়ি করি
খুঁজবে দড়ি পাট বিছানা...

উৎসাহের চোটে সে মাঝে মাঝে বোধিসত্ত্বের পিঠে ঢোল বাজাতে লাগল, আর বলতে লাগল, গাও, তোমরাও গাও। করছি পরের কারণ, সদাই রোদন...।

ওরা বাড়ি এসে পৌঁছল ঘুরঘুট্টি রাতে। বোধিসত্ত্ব আশ্রয় পেলেন দীনু মণ্ডলের বাড়ির শূন্য গোয়াল ঘরে। তার হালের বলদটি মারা গেছে দু'সপ্তাহ আগে।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে বোধিসত্ত্ব শুনতে পেলেন জলের কল কল ধ্বনি। কাছেই কোথাও নদী আছে! কিছু খড় পেতে রচনা করা হয়েছে তার শয্যা। প্রায় তিন দিন পবে পেটে কিছু খাদ্য পড়ায় এবং স্বল্প তাড়ির নেশায় অচিরেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন নিশ্চিন্ত ভাবে।

তাঁর ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে এলেন। প্রথম সূর্যের আলোয় নিজেকে তাঁর বেশ পরিশুদ্ধ মনে হল।

দীনু মণ্ডলের বাড়িটি অতি যৎকিঞ্চিৎ ধরনের হলেও তার মধ্যে একটি সৌন্দর্য আছে। একটি ছোট উঠোনের এক পাশে একটি বড় ঘর, অন্য পাশেরটি রান্নাঘর, আর দু'দিকে গোয়াল ঘর ও একটি বড় জামরুল গাছ। উঠোনটি তকতকে করে নিকোনো। জামরুল গাছের সাদা ফুল ঝরে পড়েছে উঠোনে। রান্নাঘরের ঢালু চালে লক লক করছে কয়েকটি স্বাস্থ্যবান কুমড়ো ডগা। একটা কুমড়ো পেকে পাটকিলে রঙের হয়ে আছে। রান্নাঘরের পাশ দিয়ে, পিছনের গাছপালার ফাঁকে খানিক দূরে দেখা যায় একটি নদী।

রান্নাঘরের দেয়াল গোবর ছড়া দিয়ে নিকিয়ে দিচ্ছিল এক জন ঘোমটামাথায় বউ। সে পিছনে ফিরে দেখল বোধিসত্ত্বকে। এক দৃষ্টে চেয়ে রইল কয়েক পলক। বউটির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু মুখে দারিদ্রের বা বয়েসের আঁকিবুকি পড়েনি।

বোধিসত্ত্বকে দেখে সে লজ্জা পেল না বা দৌড়ে পালাল না। বরং ফিক করে হেসে ফেলে বলল, তুমি কী-রকম মানুষ গো? সারা রাত ওই গোয়াল ঘরে শুয়ে রইলে? তোমাকে ডাঁশে-মশায় ঘুমোতে দিয়েছে একটুও?

বোধিসত্ত্ব ঘাড় হেলালেন।

বউটি আবার বলল, কাল রাতে আমি ভাবলাম, এ বাড়ির মানুষটি বুঝি ঝিকড়দার হাট থেকে একটা হেলে বলদ কিনে আনল। সকালে উঠে দেখি, ও মা, বলদ কোথায়, এ যে এক জন মানুষ! তোমার নাম কী?

কুমার সিংহ!

এ তো বাবুদের মতো নাম। তুমি এখানে কোথা থেকে এলে? কেন এলে?

যদি চলে যেতে বলেন, চলে যাব।

ও মা, সক্কালবেলা কেউ কারুর বাড়ি থেকে কোনও মানুষকে তাড়িয়ে দেয়? সে-কথা আমি বলেছি? তবে কোথাও খুন-ডাকাতি করে পালিয়ে আসোনি তো? আমরা গরিব লোক, এর মধ্যে যদি আবার পুলিশের হুজ্জোতে পড়ি।

না, আমি সে-রকম কিছু করিনি।

দশ দিন আগে ওই ঘরে আমাদের বুধু মরেছে, তারপব ঘবটা ভাল করে সাফ হয়নি পর্যন্ত। ওই ঘরে মানুষ থাকে? আমাদের বাড়ির লোকটির যেমন আক্কেল। বাতেরবেলা আমাকে একবার ডেকে বলবে তো!

তারপর বউটি হঠাৎ চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কেঁদে উঠে বলল, হঠাৎ গো-মড়ক লাগল। এ গাঁযেব সতেবোটা গোরু সাফ হয়ে গেল। আমাদের বুধু ..আদর করলে মুখ তুলে চাইত।

দীনু মণ্ডল এই সময় বেবিয়ে এসে বলল, এ কী, সকাল বেলাতেই মড়াকান্না শুরু করলে কেন? একটা নতুন মানুষ এসেছে বাড়িতে।

বোধিসত্ত্বকে ডেকে বলল, এসো ভাইডি, এখানে এসে বসো। এক গাল মুড়ি খেয়েই মাঠে যাব। চাষের কাজ জানো কিছু?

বোধিসত্ত্ব বললেন, শিখে নেব।

দীনু বলল, গা-গতরে খাটতে পারলেই শিখে যাবে। প্রথমে তোমাকে আগাছা নিড়ুনোর কাজ দেব, সহজ কাজ।

দীনু মণ্ডলের পরিবারটি বেশি বড় নয়। এক মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। এখন রয়েছে তিন ছেলে মেয়ে। এর মধ্যে ছেলেটিই ছোট। স্বামী-স্ত্রীর আফশোস শুধু এই, প্রথম সন্তান যদি ছেলে হত, তাহলে সে এত দিন বাপের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধ মিলিয়ে কাজে লেগে পড়তে পারত।

দীনুর নিজস্ব জমি মাত্র আড়াই বিঘে। শুধু এটুকু জমিতে চাষ করে তার সম্বৎসরের খাদ্য জোটে না, তাই আরও কিছু জমিতে সে ভাগ-চাষ করে। হাপাহাপি ভাগ। চাষের খরচা আর পরিশ্রম সব তার। ফসলের অর্ধেক নিয়ে যাবে জমির মালিক। সব জমিই নদীর কিনারায়। সব সময় একটা ভয়, কখন নদী একটা রাক্ষসে জিভ বাড়িয়ে জমি গ্রাস করে নিয়ে যাবে। নদী এখানে বেশ চওড়া, কারণ কাছে সমুদ্র।

আগের বারের ফসল মোটামুটি ভাল হয়েছিল, তাই দীনু মণ্ডলের বাড়িতে বেশ শান্তি আছে। দু'বেলা ভাত হয়। সকলে আনন্দ করে খায়। বোধিসত্ত্ব কয়েক দিনেই লক্ষ্য করলেন, এদের জীবনযাত্রার প্রয়োজন কত সামান্য। পায়ের জুতো, গায়ের জামার কোনও বাহুল্য নেই। ঘরের ফুটো চাল দিয়ে

বৃষ্টির জল পড়লেও এরা তাকে খুব স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়। শুধু দু'বেলা দু'টি খেতে পাওয়া, তাতেই যত কিছু আনন্দ। বাড়ির ছোট ছেলেটি বঁড়শিতে এক দিন একটা মাঝারি আকারের কাতলা মাছ ধরে নিয়ে এল নদী থেকে, বাড়িতে একটা উৎসব পড়ে গেল সে-দিন। এক মাস বাদে সে-দিন আট আনার সরষের তেল কিনে আনা হল মুদির দোকান থেকে। রান্নাঘরে ছেলে মেয়েরা মাকে ঘিরে গোল হয়ে বসে রইল উদগ্রীব মুখে। কখন মাছ রান্না হবে। তার আগে তারা মাছের ঝোলের বাষ্প ও গন্ধ টেনে নিচ্ছে নিশ্বাসের সঙ্গে। আর শব্দ করছে, আঃ!

বোধিসত্ত্ব কিছু দিন শহরে কাটিয়ে এসেছেন বলেই দেখেছেন সভ্যতার আর একটি দিক। এখানে এসে তিনি উপলব্ধি করলেন, আধুনিক সভ্যতার যেগুলি স্তম্ভ, যেমন, বিমান, রাইটার্স বিল্ডিংস, খবরের কাগজ, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, রেডিয়ো, ইন্দিরা, জয়প্রকাশ, ফরেন এক্সচেঞ্জ, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, আইসক্রিম, বিদ্যুৎ, মেডিকেল কলেজ — এ-সবের সঙ্গে এদের কোনও সম্পর্কই নেই। এরা আকাশের নিচে নদীর ধারের জমিতে বছরের পর বছর বেঁচে আছে শুধু বেঁচে থাকার জন্য। এদের নিয়তি মানব-সভ্যতার রান্নাঘরে নিয়মিত সরবরাহ বজায় রেখে খাওয়া।

বাইরের মানুষ হলেও এই পরিবারটি বোধিসত্ত্বকে বেশ ভালভাবেই গ্রহণ করেছে। দীনু মণ্ডলের স্ত্রীর কোনও এক সময়ে নিশ্চয়ই একটা নিজস্ব নাম ছিল, কিন্তু এখন তার নাম মঙ্গলার মা। মঙ্গলা বিয়ের পর চলে গেছে তমলুকের পাশের এক গাঁয়ে। মঙ্গলার মা বোধিসত্ত্বকে ছেলে ছেলে বলে ডাকেন। অ ছেলে, রান্নাঘরের খুঁটির দড়িটা একটু বেঁধে দাও তো! অ ছেলে, হ্যারিকেনের চিমনি পরিষ্কার করতে জানো? দেখি তো কেমন পারো! এইভাবে কথা বলে সে বোধিসত্ত্বের সঙ্গে। এই মানুষটিকে পেয়ে সে তার নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রের অভাবটা যেন মিটিয়ে নিচ্ছে। গোড়ার দিকে দু-একবার সে অবশ্য বলেছে, তুমি বামুন নও তো? কী জানি বাবা! বামুনকে দিয়ে এ-সব ছোট কাজ করালে আমার পাপ হবে।

বোধিসত্ত্ব হেসে বলেছেন, না, আমি বামুন নই।

সারা দিন বোধিসত্ত্ব দীনু মণ্ডলের সঙ্গে মাঠে গিয়ে কাজ করেন। রোদ-বৃষ্টি সব মাথার ওপর দিয়ে যায়। দুপুরবেলা মঙ্গলার পরের বোন সুহাসিনী পান্তা নিয়ে আসে, খেজুর গাছেব ছায়ায় বসে খাওয়া সেরে নেয় দু'জনে। সন্ধের পর বাড়ি ফিরে বোধিসত্ত্ব ছেলে-মেয়ে তিনটির সঙ্গে গল্প কবেন, এক-এক দিন তাদের মুখে মুখে অঙ্ক শেখান।

নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক দিন বোধিসত্ত্ব চলে গিয়েছিলেন সমুদ্র পর্যন্ত। খুব বেশি দূরে না, ক্রোশ তিনেকের পথ। সমুদ্রের সামনে তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন অনেকক্ষণ। কোনও সমুদ্রই অকূল নয়। এ সমুদ্রের পরপারেও আছে অন্য দেশ, অন্য মানুষ, অন্য সমাজ। তবু এখানে দাঁড়ালে এক অপার অসীমের অনুভূতি হয়। মানুষের জীবন যত ক্ষুদ্রই হোক, তবু সে অসীমকে জানতে চেয়েছে।

পথে এক জায়গায় তিনি দেখেছিলেন ছোট্ট একটি চায়ের দোকান। সামনেই নদী। সেই নদীর বুকে দুলছে কয়েকটি মাছধরার নৌকো। দৃশ্যটি দেখেই বোধিসত্ত্বের শরীরে একটা ঝাঁকুনি লেগেছিল। কৃষ্ণা ঠিক এমনই একটি চায়ের দোকানের কথা বলেছিল, যেখানে সে বোধিসত্ত্বের পাশে বসে দেখবে নদীর ওপরে বৃষ্টি পড়া। কোথায় চলে গেল কৃষ্ণা? তার অতৃপ্ত ইচ্ছেটা কি ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানকার বাতাসে?

বোধিসত্ত্বের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তিনি বুঝতে পারলেন, এর নাম মায়া। মানুষ মরে গেলে আর কিছুই থাকে না, শুধু একটুখানি মায়া থেকে যায়। সেই মায়াই শোক হয়ে কারুকে কারুকে কাঁদায়।

দু'মাসের মধ্যেই বোধিসত্ত্ব এখানে রীতিমতো পুরনো হয়ে গেলেন, যেন তিনি এই চাষি পরিবারেরই এক জন। জন্ম থেকেই রয়েছেন এখানে।

তিনি যে আলাদা রকমের মানুষ সেটা আবার হঠাৎ বোঝা গেল এক দিন। সে-দিনও বোধিসত্ত্ব মাঠে কাজ করছিলেন। নতুন ধানের বীজতলা করা হচ্ছে। চারপাশের জমির সব চাষিরাই ব্যস্ত। এই রকম সময় আলের ওপর দিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে এলেন দু'জন সুসজ্জিত চেহারার বাবু। তাঁরা এসে দাঁড়ালেন, যে-জমিতে পটলের চাষ দেওয়া হয়েছে, সেই পটল খেতের পাশে।

বোধিসত্ত্ব তাকিয়ে রইলেন ওই দিকে। জিজ্ঞেস করলেন, ওরা কে?

দীনু বলল, তুমি এই যে-জমিতে বসে কাজ করতেছ, এটা হল ওই বাবুদের জমি। ওনাদের এক লপ্তে চল্লিশ বিঘে জমি আছে এখানে। তার মধ্যে মোট সাত বিঘে আমি চষি।

ওই মাঠের মধ্যে ওই বাবু দু'টির উপস্থিতি কেমন যেন বেমানান। ওদের ফর্সা ধুতি-পাঞ্জাবি, পায়ে জুতো, চোখে রোদ-চশমা — এ-সবই যেন অনেক দূরের জিনিস।

এক জন লোক পকেট থেকে একটা গোটানো প্লাস্টিকের থলি বার করল। তারপর জমিতে নেমে পটাপট করে ছিঁড়তে লাগল কয়েকটা পটল। সেই জমির চাষিটি দৌড়ে এসে বাবুদের ভাল পটল বেছে দেবার জন্য সাহায্য করতে লাগল।

এক জন বাবু আরেক জনকে বলল, এ-সব টাটকা জিনিস, এব স্বাদই আলাদা।

ক্রমে বেড়াতে বেড়াতে সেই লোক দু'টি এ-দিকে চলে এল। দীনুকে বলল, ও মণ্ডল, এবার তো বৃষ্টির শুরুটা ভালই হয়েছে, এবার ফসল ভালই হবে, কি বলো?

দীনু উঠে দাঁড়িযে বিগলিত ভাবে হেসে বলল, হ্যাঁ বাবু, মনে তো কবি!

এবার কত হবে? বিঘেয় বিশ মণ হবে?

তা কী করে বলি এখন? ভগবানের যদি দয়া হয —।

গেল বছর অজু শেখ ফলিয়েছিল আঠারো মণ, আর তুমি আমাকে হিসেব দিলে সাড়ে তেরো মণের!

আর বাবু সবই যেত, যেমন পোকা লেগেছিল, বাঁচিযেছি অতি কষ্টে।

অজু শেখের ধানে পোকা লাগল না! যত পোকা তোমার ধানে। দেখো বাপু, ঠকিয়ো না, ধর্মে সইবে না!

এই মাঠের মধ্যে ধর্ম কথাটা উচ্চারিত হতে শুনে বোধিসত্ত্ব কৌতুক বোধ করলেন। এটা কোন ধর্ম? বাপ-ঠাকুরদা জমি রেখে গেছে বলে, সেই মালিকানার সুবাদে এই ফর্সা জামাকাপড় পরা মানুষ নিয়ে যাবে জমির অর্ধেক ফসল। আর যে-মানুষটি বীজ ধান কিনবে, সার কিনবে, ঠা-ঠা রোদ্দুরে মাসের পর মাস খেটে ফসল ফলাবে, পোকা-মাকড় তাড়াবে সে পাবে অর্ধেক। এর পরেও ছাতা মাথায় দিয়ে এসে এক জন বাবু তাকে শোনাবে ধর্মের কথা!

এক জন লোক বোধিসত্ত্বকে লক্ষ্য করে দীনুকে জিজ্ঞেস করল, এই লোকটা কে? আগে তো একে কখনও দেখিনি!

দীনু বলল, বাবু, ও আমার সঙ্গে কাজ কবে।

ও এল কোথা থেকে? চাষির ঘরে এ-রকম ফর্সা মানুষ তো দেখা যায় না।

অন্য বাবুটি নিচু গলায় বলল, বেজম্মা হতে পারে। ওর মা বোধহয় কোনও ভদ্দরলোকের বাড়িতে কাজ করত।

প্রথম বাবুটি বলল, না ভাই, ভয় করে। যদি কোনও নকশাল-ফকশাল এসে ঢোকে এই এলাকায়। এই, এ-দিকে এসো তো!

বোধিসত্ত্ব উঠে দাঁড়িয়ে হাতের মাটি ঝেড়ে এগিয়ে গেলেন। তাঁর পরনে একটা খাটো ধুতি, খালি গা।

তোমার নাম কী?

কুমার।

তুমি এখানে কদ্দিন এসেছ?

তিন মাস হবে বোধহয়।

আগে কোথায় ছিলে? আগের জায়গা ছেড়ে এখানে কেন এসেছ? তোমাকে দেখে তো চাষি মনে হয় না!

এক জন লোক আরেক জনের দিকে ফিরে বলল, না ভাই, ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না। একটা অচেনা লোক গাঁয়ের মধ্যে এসে যদি লুকিয়ে থাকে, বুঝতে হবে নিশ্চয়ই কোনও গণ্ডগোল আছে।

দীনু দৌড়ে এসে বোধিসত্ত্বকে আড়াল করে বলল, না বাবু, এ আমার এক দূর সম্পর্কের ভাই হয়। মানুষটা ভাল, মাথার একটু গোলমাল আছে। কিন্তু কাজকর্ম ঠিক করে।

দেখো বাপু! ঠিক ভাই হয় তো? অচেনা লোককে গাঁয়ে ঢুকিয়ো না। দিনকাল ভাল নয়।

লোক দু'টি বোধিসত্ত্বের দিকে সন্দেহজনক ভাবে তাকাতে তাকাতে চলে গেল।

দীনু বলল, হু! যত সব হুজুগে কথা। এই বাবুটি সব সময়ই চ্যাটাং চ্যাটাং করে কথা বলেন। এঁয়ার বাবা ছিলেন ভাল মানুষ, দেবতুল্য লোক।

বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, এটাও একটা মজা যে, সব সময়েই আগের লোকটি বা আগের জিনিসটি ভাল থাকে।

কিছুক্ষণ মুখ বুজে কাজ করলেন বোধিসত্ত্ব। ভূমি যেন এক দর্পণ, তার মধ্যে তিনি দেখতে পাচ্ছেন অনেক কিছু। হঠাৎ এক সময় বললেন, দীনুদা, একটা গল্প শুনবে?

দীনু বলল, কও দেখি শুনি।

বোধিসত্ত্ব বললেন, অনেক দিন আগে, অনেক দূরেব এক নগরে যেত এক ফেরিওয়ালা। সে তার জিনিসপত্র চাপিয়ে নিয়ে যেত এক গাধার পিঠে। নগরে গিয়ে পথের ওপর জিনিস সাজিয়ে বসবার পর গাধাটাকে নিয়ে হত এক ঝঞ্ঝাট। সেটা এক জায়গায বাঁধা থাকতে চায় না, আবার এ-দিক ও-দিক ঘুরে বেড়ালে ছোট ছোট ছেলেরা তার গায়ে ঢিল মারে। তখন সেই ফেরিওয়ালা এক বুদ্ধি বার করল।

কী বুদ্ধি?

ফেরিওয়ালা করল কী, একটা সিংহের চামড়া জোগাড় করে ফেলল। শহরে পৌঁছে জিনিসপত্র নামিয়ে নেবার পর গাধাটাকে শহরের বাইরের গ্রামে ছেড়ে দিত ওই সিংহের চামড়াটা পরিয়ে। তখন গাধাটা সিংহের চামড়া পরে ঘুরে বেড়াত নিশ্চিন্তে। সবাই তাকে দেখে ভয়ে পালাত।

দীনু হো হো করে হেসে বলল, বা রে, বা! ফেরিওয়ালর তো খুব বুদ্ধি। সাবাস! তুমি ভাল গল্প বলেছ, ভাইডি।

বোধিসত্ত্ব বললেন, গল্প এখনও শেষ হয়নি। গাধাটা গ্রামের মাঠে ঘোরে। চাষিরা সবাই তাকে দেখে ভয়ে পালায়। চাষবাস সব বন্ধ হয়ে গেল। চাষিদের ক্রমে না খেতে পেয়ে মরার উপক্রম। তখন এক দিন আমি বললাম —।

তুমি ছিলে সেখানে? তুমি নিজে দেখেছ এটা?

বোধিসত্ত্ব গল্পটা একটু ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, সেখানকার চাষিদের মধ্যে একজন বলল এক দিন, এটা যদি সিংহ হয়, তবে সিংহের মতো ডাকে না কেন? তখন সেই চাষিটি এক দিন সাহস করে কাছে গিয়ে দেখল। সেই সিংহ ঠিক গাধার মতো মাঠের আগাছা খাচ্ছে। তখন সে অন্য চাষিদের ডেকে বলল, ভাইসব, এটা সিংহ নয়, এটা একটা গাধা। তখন সবাই মিলে এসে তাড়া করতেই গাধাটা দৌড়ে পালাল, আর কোনও দিন সে মাঠ আসত না।

দীনু বলল, বাঃ, বেশ গল্প। মজাদার গল্প। তুমি তো অনেক ভাল ভাল গল্প জানো!

বোধিসত্ত্ব বললেন, দীনুদা, এই যে বাবুরা এসেছিল একটু আগে, এদের গায়েও সিংহের চামড়া জড়ানো। এরা আসলে সিংহ নয়। সবাই মিলে তাড়া করলেই এরা পালাবে।

দীনু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কী বললে তুমি? বাবুরা সিংহের জামা গায়ে দিয়েছে? হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ! এ যে বড় আজব কথা।

তখন বোধিসত্ত্বকে ব্যাপারটি আরও বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়ে দিতে হল। তিনি বললেন, দীনুদা, আমি নিজে আগে জমিতে কাজ করিনি বলে ব্যাপারটা বুঝিনি। ওই চশমাপরা বাবুরা যখন নিজেদের ব্যাগে পটল ভরে তুলে নিয়ে গেল, তখন আমার চোখ খুলে গেল। এক জন গায়ের রক্ত জল করে জমিতে ফসল ফলাবে আর অন্য জন বিনি মাগনায় সেই ফসলের ভাগ নিয়ে যাবে, এ হতে পারে না!

দীনু বলল, উরি সর্বনাশ? তুমি কী মতলবে গাঁয়ে এসেচ ঠিক করে বলো তো ভাইডি! ওই বাবুরা যে বলল, তুমি কি সত্যিই নকশাল নাকি গো?

বোধিসত্ত্ব বললেন, নকশাল কাদের বলে আমি জানি না। আমি কেউ নই। কিন্তু আমি যা বললাম, সেটা ঠিক কি না বলো!

দীনু মুখ ঘুরিয়ে তাকাল বোধিসত্ত্বের দিকে। তার মুখে একটা দুঃখের ছায়া পড়ল। খুব আস্তে আস্তে বলল, ভাইডি, ও-সব কথা বোলো না। ও-রকম কথা অনেক শুনেছি। আমাদের কপালে যা আছে, তাই হবে। এই দ্যাখো না, মেজো মেয়েটার বিয়ে দেওয়ার সময় আবার বেচতে হবে জমি!

বোধিসত্ত্ব তবু ভাবলেন, এক দিন মাঠের সব চাষিদের ডেকে এই গল্পটা শোনালে কেমন হয়। সবাই কি বলবে, কপাল? সবাই মেয়ের বিয়ের জন্য জমি বিক্রি করবে? সুহাসিনীর দিকে এর পরে যখনই তিনি তাকান, তাঁর মনে পড়ে, এই মেয়েটার দাম দেড় বিঘে জমি।

সুহাসিনীর ডাক নাম সুষি, তার বয়েস চোদ্দো কিংবা পনেরো। তার জন্য চতুর্দিকে পাত্র খোঁজা হচ্ছে। আট হাজার টাকা পণের কম কোনও সুপাত্র দেওয়া সম্ভব নয়। তার সঙ্গে আরও খরচাপাতি আছে। দীনুর দো-ফসলা জমি, তবু তার দাম ছ'হাজার টাকায় বিঘের বেশি ওঠেনি। জমির দরাদরি পাত্রপক্ষের সঙ্গে দরাদরি একই সঙ্গে চালাতে হচ্ছে তাকে।

এক দিন বোধিসত্ত্ব শুনতে পেয়েছিলেন, দীনু আর মঙ্গলাব মা তাঁর সম্পর্কেই আলোচনা করছে।

মঙ্গলার মা বলল, হ্যাঁ গো, আমাদের এই কুমারেব সঙ্গেই সুষির বিয়ে দাও না কেন? তাহলে আর জমি বেচতে হবে না, ছেলেটিও বেশ ঠাণ্ডা, কাজ-কর্মের।

দীনু ধমক দিয়ে বলেছিল, কী মাথা খারাপের মতো কথা কও! ওর কোন জাত তার কিছু ঠিক আছে? হুট করে বিয়ে দিলেই হয়?

মঙ্গলার মা বলল, আমরা কৈবর্ত, আমাদের চেয়ে আর কি নিচু জাত হবে?

দীনু বলল, নিচু জাত না হয়ে বামুন-কায়েত হলেই-বা কি সুরাহা হবে? সমাজে পাঁচ জন ছ্যা-ছ্যা করবে না? তাছাড়া ও কবে আছে, কবে চলে যায়, তার ঠিক কী?

বোধিসত্ত্ব আর বেশি শোনেননি, তিনি চলে গিয়েছিলেন। তাঁর মুখে মৃদু হাস্য। সংসার-ধর্ম তাঁর দেখা হয়ে গেছে, তিনি আর ওর মধ্যে প্রবেশ করবেন না। তিনি এখন চান মাটি ও মানুষের নিবিড় সম্পর্ক। এই দিকটা সম্পর্কে তাঁর কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না।

হাঁটতে হাঁটতে অনেকখানি এসে তাঁর খেয়াল হয়েছিল, তিনি প্রায় দেড় বিঘে জমিই পেরিয়ে এসেছেন। সুষির বিয়ের দাম এতখানি জমি। দীনুর নিজস্ব আড়াই বিঘের মধ্যে দেড় বিঘে বিক্রি করে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। নইলে সমাজের নিন্দে হবে!

এক দিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, আমি যেখানে যাই, সেখানেই কি দুর্ভাগ্য নিয়ে আসি?

এই চাষি পরিবারটিকে ঘিরেও ঘনিয়ে আসছে একটা মহা বিপদের সম্ভাবনা। তিন দিন ধরে অজস্র ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। সেই সঙ্গে অবিরাম ঝোড়ো হাওয়া। সমুদ্রের জল ফুলে ফেঁপে উঠছে, নদীতে ছলাৎ ছলাৎ করছে লকলকে ঢেউ। মাঝে মাঝে ঝুপঝাপ শব্দে পাড় ভেঙে পড়ছে। নদী এখন বইছে দীনুর নিজের জমির ধার ঘেঁষে।

বিপদ এখন তিন রকম। নদীর ভাঙনে দীনুর সমস্ত জমি এমনকী বাড়িটা পর্যন্ত চলে যেতে পারে এবার। সমুদ্রের জল ঢুকে পড়তে পারে যে-কোনও সময়। একবার সেই নোনা জল ঢুকলে দু'বছরের মতো চাষ বন্ধ। অথবা অতি বৃষ্টিতে জমিতে বেশি জল দাঁড়িয়ে যেতে পারে। সব জমিতে এখন ধান। ধানের চারার বয়েস মাত্র সওয়া এক মাস, সেই কচি কচি চারা বেশি জল সহ্য করতে পারবে না। ডুবো জল হলেই পচে যাবে।

বোধিসত্ত্বর মনে হল, এখন এই চাষি পরিবারটির জমি, বাড়ি এবং ধান বাঁচাবার চেয়ে আর কোনও বড় কাজ নেই। কিন্তু কোন উপায়ে বাঁচানো যাবে? হঠাৎ এখন থেকে সব আনন্দ উবে সকলের বুকের মধ্যে গুর গুর করছে ভয়। নদী এগিয়ে আসছে, সমুদ্র এগিয়ে আসছে, আকাশ ভেঙে জল পড়ছে। এর কোনওটাকেই রোখবার সাধ্য নেই কারুর। কত রকম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বীজাণু থেকে শুরু করে হাজার রকম পোকামাকড়, এমনকী প্রকৃতি পর্যন্ত যেন সব সময় ষড়যন্ত্রে মেতে আছে মানুষের বিরুদ্ধে। মানুষের জীবনে এক অনন্ত যুদ্ধ। জীবন-ভোর অসংখ্য দুঃখ। তবু তো এ দুঃখ থেকে সরে যেতে ইচ্ছে করে না।

চড়াৎ করে একটা বিদ্যুতের ঝলকে বিশ্বচরাচর যেন ঝলসে গেল। তারপর গর্জন উঠল সারা আকাশে। সেই মেঘের ধ্বনির মধ্যে শোনা গেল এক কণ্ঠস্বর।

বোধিসত্ত্ব তাড়াতাড়ি উঠে এসে দরজার কাছে দাঁড়ালেন। অন্ধকার আকাশ থেকে এক অদৃশ্য কণ্ঠস্বর বলে উঠল, হে মৈত্রেয়, আপনি কোথায় আবদ্ধ হয়ে রয়েছেন? হে বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়, আপনি তুষিত স্বর্গ ছেড়ে এই মাটির পৃথিবীতে এসেছেন লুপ্ত সত্য পুনরুদ্ধারের জন্য। আমরা প্রতীক্ষা করে আছি। আপনি সত্যের প্রকাশ করুন।

বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, আসলে হয়তো কেউ বলছে না, তিনি নিজেই এর উদ্ভাবন করছেন। তাঁর নিজের চিন্তাই প্রতিফলিত হচ্ছে আকাশের মেঘগর্জনে?

তিনি ফিস ফিস করে বলে উঠলেন, না, আমি নই! আর কেউ আসবে, সে উদ্ধার করবে সত্যের। আমি এখনও বুঝলাম না প্রকৃত সত্য কী। আমি এত ঘুরলাম, এত দেখলাম, তবু কোনও মহত্তর সত্যের সন্ধান পেলাম না। মানুষের জীবনের একটা সত্য — সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকা। তার চেয়ে বড় সত্য আছে? অন্য কেউ এসে সেই সত্যকে খুঁজে দিয়ে যাক।

তিনি আবার নিজেকে শুনিয়ে বললেন, এত যুদ্ধ, এত দুঃখ, তবু মনুষ্য-জন্মকে আমার প্রিয় লাগল। আমি নিবৃত্তি মার্গ দেখাতে পারব না মানুষকে। আমি মানুষকে তার নিজস্ব এক জীবনে সুখী দেখতে চাই।

ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে বোধিসত্ত্ব দেখলেন বৃষ্টি একেবারে কমে গেছে, কাঁচা সোনার মতো রোদ এসে পড়েছে তাঁর ঘরে। তিনি আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। চার দিন পর এই প্রথম রোদ। আজ সারা দিন যদি রোদ থাকে, তবে রাতে নামুক না আবার বৃষ্টি। দিনে রোদ, রাতে জল — এটাই সব চেয়ে ভাল, ধান গাছের সুস্বাস্থ্যের জন্য।

তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বাইরে। দীনুরা কেউ এখনও ওঠেনি। বোধহয় কাল অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিল। তিনি ওদের ডাকলেন না, একা ছুটতে লাগলেন মাঠের দিকে। তিনি নিজের হাতে ধানের চারা রুয়েছেন, ওদের প্রতি তাঁর যেন বাৎসল্য জন্মে গেছে।

তিনি এসে দাঁড়ালেন একেবারে জমির মধ্যে। যথেষ্ট জল জমে আছে জমির মধ্যে। কিছু চারা নেতিয়ে পড়েছে জলে, কিছু কিছু এখনও মাত্র এক ইঞ্চি মাথা উঁচু করে আছে। আজ সারা দিন যদি রোদ থাকে, তাহলেই টেনে যাবে অনেকটা জল। নদীর জল কানায় কানায় এসে পৌঁচেছে। সমুদ্র আর একটা ঠিলা মারলেই আর রক্ষে নেই। আজ যদি বৃষ্টি না হয়, ঝড় থেমে থাকে, তবে শান্ত হবে সমুদ্র, সংযত হবে নদীর ঢেউ।

সেই মোহময় তরুণ সবুজ রঙের খেতের মধ্যে ঘুরতে লাগলেন বোধিসত্ত্ব। যত্ন করে, খুব নরম হাতে তুলে দিতে লাগলেন নুয়ে পড়া চারাগুলো। তীক্ষ্ম চোখে দেখতে লাগলেন কোনও গাছে পোকা লেগেছে কি না, এক জায়গায় আল ভেঙে গিয়েছিল, তিনি কাদামাটি ঘেঁটে সে জায়গা আটকে দিলেন।

বোধিসত্ত্ব বুঝতে পারলেন, কেন জমির সঙ্গে এত মায়া লেগে আছে। এই সব জমি যেন নারীরই মতো, পুরুষের কাছ থেকে অনবরত আদরযত্ন চায়। তার বিনিময়ে জমি প্রসব করে ফসল। চাষিরাই জমির আসল স্বামী বা প্রেমিক। আর দূর থেকে এসে যে-সব বাবু এই ফসলের ভাগ চায়, তারা ব্যভিচারী।

বোধিসত্ত্ব আনন্দিত চঞ্চল হয়ে ভাবলেন, এবার চাষিদের ডেকে তিনি এই সরল অঙ্কগুলো বোঝাবেন। অঙ্ক মিলিয়ে দিতে হবে, তাহলে তারা ঠিক বুঝবে। দীনু যতখানি জমি চাষ করে, তার সবটা ফসলই যদি সে নিজে পেত তাহলে তাকে মেয়ের বিয়ের জন্য জমি বিক্রি করতে হত না। এটা খুব সরল অঙ্ক। সুহাসিনীর বিয়ে হোক, সে সুখে থাকুক, কিন্তু সে-জন্য সে তার বাবা-মাকে নীরস করে দিয়ে যাবে কেন? আহা, বেচারা সুহাসিনী নিজেও এটা বোঝে না। তাকেও এই সরল অঙ্ক বোঝাতে হবে।

তিনি দাঁড়ালেন এসে একেবারে নদীর ধারে। একটা বটগাছের তলা থেকে খসে গেছে অর্ধেক মাটি। শিকড়গুলো ঝুলে আছে জলের ওপর। যেন কোনও দৈত্যের আঙুল। আর কয়েকটা ঢেউয়ের ঝাপটা লাগলেই গাছটা ঢলে পড়বে নদীতে। এত বড় একটা প্রাণবন্ত গাছ। এই গাছের ওপরেই দীনু মণ্ডলের জমি।

একটু বাদেই নদীর জল কালো হয়ে এল। সর সর শব্দ হল গাছের পাতায়। বোধিসত্ত্ব চমকে ওপরের দিকে তাকালেন। তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। হঠাৎ যেন বন্ধ হয়ে গেল নিশ্বাস। একটা বিশাল কালো মেঘ উড়ে আসছে পশ্চিমের আকাশ থেকে। সেই সঙ্গে জোরে জোরে বইছে হাওয়া। এই মেঘ দেখলে সন্দেহ থাকে না, এরা প্রবল বর্ষণ নিয়ে আসে।

মেঘটা কাছে এসে গেল। বাতাস তখন ঝড়ের রূপ নিয়েছে। বোধিসত্ত্ব টের পেলেন, মেঘটা হু-হু করে নেমে আসছে নিচে, বিশাল কালো রূপ নিয়ে তাকে ভয় দেখাতে চাইছে। তারপর এক সঙ্গে শত শত কামান দেগে উঠল। এবারও মনে হল, সেই মেঘগর্জনের কোনও ভাষা আছে।

এখন এই আকাশ, এই মেঘকে মনে হয় জীবন্ত। পৃথিবীর ওপর ভয়াল ছায়া মেলে সবসুদ্ধু নেমে আসছে নিচে। মানুষকে বলতে চাইছে, দেখো, তোমরা কত অসহায়।

মেঘের হুঙ্কারে বোধিসত্ত্ব স্পষ্ট শুনতে পেলেন এক ডাক। আজ আর মৈত্রেয় নয়, আজ মেঘ তাকে ডাকছে, কুমার সিং! কুমার সিং! এখনও ফেরো!

বোধিসত্ত্ব বুঝতে পারলেন না, তিনি কোথায় ফিরবেন। মেঘ কেন তাঁকে ডাকে? ফেরা মানে কি পালিয়ে যাওয়া?

তিনি বলে উঠলেন, আমি গ্রাহ্য করি না!

বৃষ্টির ঠিক আগের মুহূর্তে জমি থেকে ফর ফর করে উড়ে গেল অসংখ্য পোকা। এরাও আকাশেব ষড়যন্ত্রে যোগ দেয় যেন।

বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, মানুষের সঙ্গে লড়াই করা যায়, সিংহ চর্মাবৃত গর্দভের চামড়া খুলে আসল রূপটা দেখিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে কী করে লড়বেন? প্রকৃতি কোন প্রতিশোধের বাসনায় মানুষকে কষ্ট দিতে আসে? এই ভয়ঙ্কর মেঘ ও ঝড় যেন সমস্ত ফসল নষ্ট করে জমি ভাসিয়ে দিতে আসছে — কেন? কেন? সর্বস্বান্ত চাষিরা এর পরও মাথায় হাত দিয়ে বলবে, সবই ভগবানের ইচ্ছে। তারা প্রকৃতি চেনে না।

মেঘের গর্জন শুনে অনেক চাষিই ঘুম ভেঙে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল, আকাশ চিরে বজ্রপাত হতেই তারা ভয় পেয়ে দৌড়ে ফিরে গেল। বজ্রপাতের সময় ফাঁকা মাঠে কেউ থাকে না।

কিন্তু বোধিসত্ত্ব ফিরে গেলেন না। তুমুল বৃষ্টির মধ্যে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন সোজা হয়ে।

মেঘ আবার ডেকে উঠে বলল, কুমার সিং! কুমার সিং! এখনও ফিরে এসো।

বোধিসত্ত্ব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। সেই মেঘের উদ্দেশে তিনি বললেন, তুমি যতই ভয় দেখাও, আমি অমর মানুষ! তুমি যতই বর্ষণ করো, যতই ঝড় ওঠাও, তুমি সমুদ্রকে উত্তাল করো, নদীকে টেনে আনো কূলের ওপর, তবু আমরা মরব না। অথবা আমি মরব, আর-এক জন কেউ আসবে। তোমাদের বিরুদ্ধে, মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই করে মানুষ তার বেঁচে থাকাটা সার্থক করে যাবে।

বোধিসত্ত্ব তাঁর ডান হাতের মুষ্টি তুলে ধরলেন আকাশের দিকে।।

সমুদ্রতীরে

॥ এক ॥

জানলা দিয়ে একবার বাইরে তাকিয়ে মনে হল, এখন আর ঘরে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। বিকেল শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আকাশের আলো মিলিয়ে যায়নি।

আজ সারা দুপুর বইয়ের পাতায় ডুবে ছিলাম। এক-এক দিন পড়াশোনায় খুব মনে বসে যায়, এক-এক দিন কিছুটা অস্থির ভাব থাকে। আজ খুব বেশি হাওয়া ছিল না, গরমও ছিল না। বই পড়তে পড়তে আজ একবারও খেয়াল হয়নি যে কাছেই একটা সমুদ্র আছে।

বেরুবার আগে জানলা দুটো মনে করে বন্ধ করে দিতে হয়, নইলে হাওয়ায় সব উড়িয়ে নিয়ে যায়। টেবিলের ওপর গোটা চারেক কলা পড়ে আছে, খোসার ওপর কালচে কালচে ছোপ পড়েছে। এগুলো ফেলে দেওয়াই ভাল। আমি কলা তেমন একটা ভালবাসি না, তবু কিনেছিলাম অসম্ভব সস্তা বলে। ছ'খানা মর্তমান কলার দাম মাত্র এক টাকা।

কলাগুলো হাতে নিয়ে বেরুতে গিয়ে আমি একটু হাসলাম। মানুষ একা একা নিজের কাছেও মিথ্যে বলে! শুধু সস্তা বলেই কি আধ ডজন কলা কিনেছিলাম? না, তা ঠিক নয়।

কিশোর কলা বিক্রেতাটি এসে বসেছিল বিচের ওপর। সমুদ্রের ঢেউয়ের আওয়াজকেও ছাড়িয়ে সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করছিল, কেলা, কেলা, কেলা! আস্তে আস্তে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেল তাকে কেন্দ্র করে। আমি তখনও যাইনি, বসেছিলাম তটরেখার একেবারে ধার ঘেঁষে। চমৎকার রোদ-ঝকঝকে সকাল। খুব জোর হাওয়া তখন। এ-রকম প্রবল হাওয়ায় মেয়েরা শাড়ি সামলাতে খুব বিব্রত হয়ে পড়ে, দেখতে বেশ লাগে।

সেই মেয়েটি, তার নাম চন্দ্রা, সে-ও দাঁড়িয়েছিল কলাওয়ালার সামনে। তার সবুজ রঙের শাড়ির আঁচলটা উড়ছিল পত পত করে। সকালবেলার পক্ষে বড় বেশি উজ্জ্বল রঙ তার শাড়ির। তবে ওরা ওই রকমই বেশি রঙচঙে, ঝলমলে পোশাক পরে, সকালবেলাতেও প্রসাধন না করে বাইরে বেরোয় না।

চন্দ্রা এক হাতে ধরেছিল উড়ন্ত আঁচল, অন্য হাতে এক থোকা কলা। 'থোকা' কথাটা বোধহয় ঠিক হল না, ফুলের থোকা হয়, কলার কি হয়? সবুজ শাড়ি পরা চন্দ্রার হাতে সেই নিখুঁত হলুদ রঙের কলাগুলো ফুলের মতোই দেখাচ্ছিল। রঙের সেই সমন্বয় আমার পছন্দ হল। সেই দৃশ্যটার কাছাকাছি যাওয়ার জন্যই আমার কলা কেনার কথা মনে হয়েছিল। আমি চন্দ্রার একেবারে পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

চন্দ্রার সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা।

বাইরে এসে কলাগুলো ফেলতে গিয়েও মনে হল, এখনও ঠিক পচেনি, শুধু শুধু নষ্ট না করে খেয়ে নিলেও তো হয়। একটা খোসা ছাড়িয়ে খানিকটা মুখে দিয়েই ফেলে দিলাম থুঃ থুঃ করে। পচে যায়নি বটে কিন্তু বেশি মজে গেছে, তলতলে ভাব, এই স্বাদটা আমার ঘোরতর অপছন্দ। নাঃ, খাওয়া যাবে না।

অনেক সময় কাছাকাছি ভিখিরিরা ঘুর ঘুর করে। তাদের কারুকে দিয়ে দেওয়া যেত। এখন কেউ নেই।

চন্দ্রাকে আমি বলেছিলাম, আমার জন্য কয়েকটা বেছে দাও তো।

চন্দ্রা নিজের হাতে এই কলাগুলো তুলে দিয়েছিল। আমি তার হাতের আঙুল ও স্বর্ণাভ মুখখানা দেখছিলাম।

তিন দিনেই কলাগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। ছুঁড়ে ফেলে দিলাম বালির ওপর। তারপর আবার এগিয়ে গিয়ে সেগুলো তুলে একটুখানি ডান দিকে যেতে হল। সে-দিন ঠিক এই জায়গায় বসেছিল কলাওয়ালাটি। বালির ওপর কারুর পায়ের ছাপ থাকে না, কিন্তু চন্দ্রা কোথায় দাঁড়িয়েছিল, তা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সেখানেই ফিরিয়ে দিলাম কলাগুলো।

॥ দুই॥

সমুদ্রে সূর্যাস্ত আমার দেখতে ভাল লাগে না। বড় বেশি জমকালো। ক্যালেন্ডারের ছবির মতো। বরং সূর্য ডুবে যাবার পর যে কিছুক্ষণ মধুর-বিষণ্ণ আলো, তখনকার আকাশের দিকে চোখ চলে যায়। এই আলোটা গায়ে মাখলেও বেশ আরাম বোধ হয়।

এরপর অন্ধকার হয়ে গেলে ঢেউয়ের ফণাগুলো জ্বলবে। গোপালপুরে আমি যতবার এসেছি, রাত্তিরের দিকে ঢেউয়ের মাথায় ফসফরাস জ্বলতে দেখেছি। মাইকেলের সেই লাইনটা মনে পড়ে যায়, 'কী সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, প্রচেতঃ...।' মাইকেলের আসল লাইনটা ছিল সমুদ্রের প্রতি বিদ্রূপের, এখানে সেটা প্রশস্তি হয়ে যায়।

চটি খুলে রেখে আমি জলে পা দিলাম। ঢেউ এসে পায়ের ওপর ঝাপটা মারে, আবার সরে যায়। এই সময় নিজেকে বেশ রাজা রাজা মনে হয়। এত বড় সমুদ্র, সে আমার পায়ে এসে লুটোচ্ছে। আমার পাদবন্দনা করে যাচ্ছে।

এক জন ভদ্রলোক এই অসময়ে জাঙিয়া পরে স্নানে নামছেন। আমার পাশ দিয়ে খানিকটা জলের মধ্যে এগিয়ে গিয়েও আবার ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আর কিছু শুনলেন?

আমি দু'দিকে ঘাড় নাড়লাম।

এখন আর এখানে দাঁড়াবার কোনও মানে হয় না। এক জন মাঝবয়সি পুরুষের স্নানেব দৃশ্য কে দেখতে চায়?

সাদা ফেনা মাড়িয়ে মাড়িয়ে আমি হাঁটতে লাগলাম ডান দিকে। কিছু কিছু মানুষজন বসে আছে বালির ওপর। অনেকেরই মুখ চেনা। আকাশ শুষে নিচ্ছে শেষ আলো, মুখগুলো অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

হঠাৎ খেয়াল হল, আমি পাম বিচ হোটেলের দিকে যাচ্ছি কেন? উলটো দিকে জেলেদের বস্তির দিকে গেলে ভাল হত। কিন্তু এ-দিকে চলে এসেছি অনেকটা।

পাজামার ওপর পাঞ্জাবি গলিয়ে বেরিয়ে পড়েছি, পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম, টাকা-পয়সার খামটা রয়েছে। আমার মানি ব্যাগ বা যাকে পার্স বলে, তা ব্যবহার করার অভ্যেস আজও হল না। পাম বিচ হোটেলে গিয়ে চা খাওয়া যেতে পারে, ওরা চিকেন প্যাটিসও খুব ভাল বানায়। কিন্তু ওখানে গেলে সিনেমার লোকজনদের সঙ্গে দেখা হবেই, তাদের সঙ্গে গল্প করতে হবে।

কিংবা তাদের সঙ্গে গল্প করার লোভেই কি আমি এ-দিকে চলে এসেছি? কৌতূহল আমাকে টেনে এনেছে?

আমি গোপালপুর পৌঁছবার পব দিন তিনেক জায়গাটা বেশ নিরিবিলি ছিল। এখানে কোনও তীর্থস্থান নেই, কখনও খুব বেশি ভিড় হয় না, সেটাই গোপালপুরের বৈশিষ্ট্য।

এখানে এসে আমি কখনও হোটেলে উঠি না। অনেক কটেজ ভাড়া পাওয়া যায়। খুব ছেলেবেলায় যখন প্রথমবার আসি, তখন প্রচুর অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান দেখেছি। আমার শৈশবের চোখে তারা ছিল সাহেব-মেম। বুড়ো-বুড়ি অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা এখানে বাড়ি বানিয়ে শেষ জীবন কাটাত, একখানা-দু'খানা ঘর ভাড়া দিত। এখন তারা আর নেই।

অনেক বাড়ির ধ্বংসস্তূপ চোখে পড়ে। দেয়াল ভাঙা, জানালা-দরজা নেই। কোস্ট লাইন খানিকটা এগিয়ে এসেছে, জোয়ারের সময় প্রথম সারির অনেক বাড়িতে ছলাত ছলাত করে ঢেউ ধাক্কা মারে।

আমি একটা পুরো বাড়িই ভাড়া নিয়েছি, কারণ একা থাকাই আমার উদ্দেশ্য। যখন ইচ্ছে হবে না, কারুর সঙ্গে কথা বলব না, কোনও মানুষের মুখও দেখব না। রান্নাবান্নারও ঝামেলা রাখিনি। বেশ কাছেই একটা গেস্ট হাউস রয়েছে। গোটা ছয়েক পরিবার থাকার মতো, সেখানে বললেই চা থেকে সব কিছু পাঠিয়ে দেয়। একটি তেলেঙ্গি স্ত্রীলোক দু'বার আমার ঘর ঝাঁট দিয়ে, খাবার জল তুলে দিয়ে যায়। তার স্বামীই বাড়িটির কেয়ারটেকার। স্বামীটি মাছ ধরার নৌকো নিয়ে চলে যায় সমুদ্রের অনেকখানি গভীরে।

তিন দিন পর সিনেমার বিরাট দলটি এসে উঠল পাম বিচ হোটেলে। তাদের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই, হোটেলটাও বেশ দূরে, তবু বেশ বিরক্ত বোধ করেছিলাম আমি। তারা যে খুব একটা হই-হট্টগোল করে, তা-ও না। কিন্তু এই ছিমছাম নিরিবিলি জায়গায় এক সঙ্গে অনেক লোক এসে পড়েছে, যখন তখন গাড়ি হাঁকিয়ে তারা ঘোরাঘুরি করছে। এটাই যেন অসহ্য বোধ হয়।

সিনেমার শুটিঙের মতো বিরক্তিকর জিনিস আমি কখনও দেখতে যাই না। মনে আছে, একবার থাকতে গিয়েছিলাম চিল্কার এক গেস্ট হাউসে। খুবই সুন্দর পরিবেশ। কিন্তু হঠাৎ পরদিন সেখানে শুরু হল একটা তামিল ফিলমের শুটিং। একটা গান বাজানো হচ্ছে, যুবতীটি বার বার নাচতে শুরু করছে, আর পরিচালক হেঁকে উঠছে, কাট, কাট! একই গান, একই নাচ, শুরু হচ্ছে আর থামছে, এই রকম চলল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সেই দিনই বিকেলে আমি পালিয়েছিলাম চিল্কা থেকে।

এখানেও এক দিন শুটিং হচ্ছিল আমার বাড়ির খুব কাছেই। আমার দেখতে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। এরা অবশ্য মাইকে গান-টান কিছু বাজাচ্ছে না, জলের ধারে প্রেমালাপের দৃশ্য, তারপর স্নান। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আমি একবার শুটিং পার্টিটা দেখেই জানালা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারপর আর কিছুতেই লেখাপড়ায় মন বসে না। জানলা বন্ধ, তবু যেন আমি দেখতে পাচ্ছি ক্যামেরা, লোকজন, নায়ক-নায়িকা। সে এক মহা জ্বালা।

পরদিন আমি দুপুরে স্নান করতে নেমেছি, তখনই আবার কাছাকাছি এসে উপস্থিত হল সিনেমার দলবল।

সে-দিন আবার জলের মধ্যে মারামারির দৃশ্য। ওরা অন্য লোকজনদের সরিয়ে দিচ্ছে। আমি বেশ রেগে গিয়ে রোঁয়া ফোলাচ্ছি। আমাকে একবার সরে যেতে বলুক না, দেখিয়ে দেব মজা। আমি স্নান করতে এসেছি, আমার যখন ইচ্ছে উঠব। এই সমুদ্রটা সিনেমার লোকদের বাবার সম্পত্তি নয়। ওরা ফাঁকা জায়গায় যাক না!

কিন্তু ঘটনাটা সম্পূর্ণ অন্য রকম হয়ে গেল।

সাদা টুপি পরা এক জন লোক আমার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, আরে, সুনীলবাবু না? কবে এসেছেন আপনি?

সঙ্গে সঙ্গে রাগের বদলে আমাকে পেয়ে বসল একরাশ লজ্জা। এখন মেয়েদের সামনে দিয়ে আমাকে খালি গায়ে উঠতে হবে।

॥ তিন ॥

পাম বিচ হোটেলের আলো দেখা যাচ্ছে, ওখানে যাব কি না এখনও মনস্থির করতে পারছি না। এক-এক সময় মানুষের সংসর্গের জন্য মন আনচান করে, তবু মানুষের কাছাকাছি যেতে ইচ্ছে করে না। মুখটা ফেরাতেই চমকে উঠলাম। শুধু চমক নয়, বুকটা ধক করে উঠল। ঠিক ভয়ের অনুভূতি।

একটা ডিঙি নৌকোর গলুইয়ের কাছে বসে আছে একটি মেয়ে। কালো রঙের শাড়ি পরা। কিংবা শাড়ির রঙ গাঢ় নীলও হতে পারে। মুখটা জলের দিকে, আমি দেখতে পাচ্ছি না।

প্রথমে মনে হয়েছিল চন্দ্রা, এবং সেই জনাই ভয় পেয়েছিলাম। অথবা চন্দ্রা হতেই পারে না। চন্দ্রা যদি ফিরে আসে কোনওক্রমে, তাহলে কি আমি ভয় পাব?

অবিকল চন্দ্রার মতো ভঙ্গিমায় এখানে এখন কে বসে থাকতে পারে? এই দৃশ্যটার মধ্যে বেশ অস্বাভাবিকতা আছে। প্রায় অলৌকিকের কাছাকাছি। এই সব ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই, তবু বুক তো কেঁপে উঠল একবার।

আমি এতখানি রাস্তা হেঁটে আসছি, নৌকোগুলোতে আগেই দেখেছি, কেউ ছিল না। মেয়েটি হঠাৎ কী করে এল? ঠিক আছে, ধরা যাক, ওর নীল রঙের শাড়ি অন্ধকারে মিশে গেছে বলে ওকে আমি আগে দেখতে পাইনি। তাহলেও সন্ধের পর কোনও মেয়ে তো এখানে এমন ভাবে একা বসে থাকে না। স্থানীয় মেয়ে নয়, কোনও জেলের বউ নয়, মেয়েটির দু'হাঁটু জড়িয়ে বসে থাকার ভঙ্গির মধ্যেই একটা শহুরে ছাপ আছে।

তীব্র কৌতূহল আমাকে টেনে রেখেছে, জায়গাটা ছেড়ে নড়তে পারছি না। হাওয়া বাঁচিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম।

নৌকোগুলোর তলায় জলের ছলাত ছলাত শব্দ হচ্ছে, জল বাড়ছে। শুরু হয়েছে জোয়ার। যে নৌকোগুলি অর্ধেক বালির ওপর ওঠানো থাকে, জোয়ারের সময় সেগুলোই অনেকখানি জলের মধ্যে চলে যায়। মেয়েটি কি তা জানে না?

তিন দিন আগে সন্ধের সময় চন্দ্রাও এ-রকমভাবে বসে ছিল একটা নৌকোয।

কাছাকাছি আর কোনও মানুষজনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, একটি মেয়েকে দেখে আমি থমকে গিয়ে সিগারেট টানছি, এটা বেশ বিসদৃশ ব্যাপার।

তবু আমার মনে হল মেয়েটিকে সাবধান করে দেওয়া উচিত। আমি একটু গলা খাঁকারি দিয়ে এগুতেই মেয়েটি নেমে পড়ল নৌকো থেকে। আমার উপস্থিতি সে টের পেয়েছে কি না বোঝা গেল না, একবারও তাকাল না পেছন ফিরে, সোজা হাঁটতে লাগল জলের ধার ঘেঁষে।

এরপর আব মেয়েটিকে অনুসরণ করা যায় না।

তবু আমি তাকিয়ে রইলাম সেই অপস্রিয়মাণ নাবীর দিকে। মেঘলা আকাশ, চাঁদ দেখা যাচ্ছে না, তবু আকাশের কিছুটা নিজস্ব আলো আছে। এক সময় মেয়েটি কি জলে নামতে শুরু করল না অন্ধকারে মিলিয়ে গেল? স্পষ্ট মনে হল, মেয়েটি সমুদ্রে নেমে যাচ্ছে, হাঁটু জল ছাড়িয়ে বুকজলে, তারপর ডুব দিল, আর উঠল না।

আমি সে-দিকে ছুটে যাবার জন্য উদ্যত হয়েও থেমে গেলাম। এ-সব কী ছেলেমানুষি করছি আমি? একটা মেয়ে সত্যি সত্যি জলের মধ্যে নেমে মিলিয়ে যেতে পারে? জলকন্যা? ভূত? যতই অবিশ্বাস করি, তবু ভেতরে ভেতরে কিছু সংস্কার রয়েই গেছে। ও-সব কিছু না! ও-দিকটায় খানিকটা কুয়াশা জমেছে। মেয়েটি কুয়াশার আড়ালে চলে গেল। তাছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

নিজের এ-রকম দুর্বলতায় নিজের ওপর চটে গেলাম খুব। এই অবস্থায় আর কারুর সঙ্গে আড্ডা দিতে যাওয়া যায় না। অন্যদের কাছেও আমার দুর্বলতা ধরা পড়ে যেতে পারে।

॥ চার ॥

রবীন ঘোষ যে এক জন পুলিশ অফিসার, সে-কথা তিনি আমার কাছে একবারও গোপন করেননি। যদিও অন্য আর কেউই বোধহয় তা জানে না। ভদ্রলোক এখানে সপরিবারে ছুটি কাটাতে এসেছে। ওর [illegible] কিছু একটা অসুখ আছে। যদিও ওঁর স্ত্রী প্রতিমা বেশ বিদুষী ও পরিচ্ছন্ন চেহারার মহিলা, কথাবার্তায় কোনও আড়ষ্টতা নেই, অসুস্থ বলেও বোঝা যায় না। ওঁদের সঙ্গে দশ বছরেব মেয়েও এসেছে, বড় ছেলে হস্টেলে থাকে।

রবীন ঘোষ ইংরিজি সাহিত্যের খুব ভক্ত। দুর্গাপুরে কোনও একটি সভায় [illegible] দেখেছিলেন, সামান্য পরিচয়ও হয়েছিল, আমার অবশ্য সে-কথা একেবারেই মনে নেই। আমি পুরুষদের [illegible] রাখতে পারি না। এখানে ওঁরা উঠেছেন পাশের গেস্ট হাউসে, এক দিন নিজে থেকেই আলাপ করেছিলেন আমার সঙ্গে।

প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এখানে আপনি কিছু লিখতে এসেছেন বুঝি? নতুন উপন্যাস?

আমি উত্তর না দিয়ে হেসেছিলাম। লোককে [illegible] শক্ত। লেখার জন্য আমাকে কলকাতার বাইরে যেতে হয় না। নির্জনতাও খুজতে হয় না। নিজের বাড়িতে [illegible] অফিসে না [illegible] গোলমাল, হইচই, লোকজনের আসা-যাওয়া, দরজার বেল, টেলিফোনের যখন তখন ঝঙ্কার, [illegible] সঙ্গে কথা কাটাকাটি, বাজার করা, নাটকের রিহার্সাল দেওয়া, এর মধ্যেও দিব্যি লেখা এগিয়ে চলে। কিন্তু কখনও কখনও আমার না-লেখা নিজস্ব সময় দরকার। লেখার থেকে পুরোপুরি ছুটি নেবার জন্যই নির্জনতা খুঁজি। যখন এই রকম বাইরে চলে আসি একা, সঙ্গে কাগজ-কলমও রাখি না। কেউ বিশ্বাস করবে না যে আমি এক জন লেখক বটে, কিন্তু আমার কোনও কলম নেই।

গেস্ট হাউসে আমার খাবারেব কথা বলতে গেলে রবীন ঘোষ আমাকে ধরে ফেললেন।

উনি অবশ্যই একেবারেই জোর করেন না, কথা বলেন খুব মৃদু গলায়। বললেন, আসুন, ওপরে গিয়ে একটু বসা যাক। পরে এক সময় খেয়ে নিলেই হবে।

গেস্ট হাউসটি দো-তলা। রবীনবাবুরা একটা সুন্দর সুইট পেয়েছেন। শোবার ঘরের সংলগ্ন একটা বেশ চওড়া বারান্দা, সেখানে বসলে সমুদ্রের সম্পূর্ণ বিস্তার দেখা যায়।

প্রতিমা আগে থেকেই সেখানে একটা বেতের চেয়ারে বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে গুন গুন করে গান গাইছিলেন।

এ-সব ক্ষেত্রে ভদ্রতা করে বলতে হয়, থামলেন কেন? আপনার তো বেশ ভাল গলা। গানটা করুন।

প্রতিমা তবু গান থামিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হেসে বললেন, কিছু কিছু গান থাকে একলা গাইবার। ও আপনাকে নিশ্চয়ই গল্প করার জন্য টেনে এনেছে, বউয়ের গান শোনাবার জন্য নয়।

আমি আর জোর করলাম লা। সত্যিই তো কিছু কিছু গান মানুষ শুধু নিজেকে শোনাবার জন্যই গায়।

রবীনবাবু আমাকে ডেকে আনায় খুশিই হয়েছি। আমি মানুষের সঙ্গ চাইছিলাম, কিন্তু নিজে থেকে কারুর কাছে যেতে পারি না, এটা আমার স্বভাবদোষ। কেউ ডাকলে মনে হয়, এই ডাকের প্রতীক্ষাতেই ছিলাম।

ওঁদের মেয়েটি বসবার ঘরে খুব মন দিয়ে পড়াশুনো করছে।

আমরা বারান্দায় বসার পর প্রতিমা একটা ছোট টেবল এনে রাখলেন, তারপর নিয়ে এলেন গেলাস, জলের জাগ ও হুইস্কির বোতল।

রবীনবাবু বললেন, নিচে ওদের বললে সোডা পাওয়া যেতে পারে।

প্রতিমা আমার দিকে তাকাতেই আমি বললাম, আমার সোডার দরকার নেই।

প্রতিমা তিনটি গেলাসে হুইস্কি ঢাললেন।

আগেই এক দিন লক্ষ্য করেছি যে ওঁকে মদ খাওয়াবার জন্য পিড়াপিড়ি করতে হয় না, উনি নিজেই নিজেরটা নিয়ে নেন। কিন্তু একবারই। মদ্যপান বিষয়ে ওঁর কোনও সংস্কার নেই, অথচ নেশাও করতে চান না।

দূরের অন্ধকার সমুদ্রের ঢেউগুলো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কারণ তাদের মাথায় দুলছে ফসফরাসের মালা। বেশ দেখায়। এ-দিকে জাহাজ চলাচল করে কদাচিৎ। এক দিন শুধু একটা আলো-ঝলমল জাহাজ দেখা গিয়েছিল এর মধ্যে। রাত্তিরবেলা জাহাজ দেখার জন্য আমি ছেলেমানুষের মতো উৎসুক হয়ে থাকি।

রবীনবাবু বললেন, ওরা আজ থেকে আবার শুটিং শুরু করেছে, জানেন তো?

কথাটা আমার একটা আঘাতের মতো লাগে। আবার শুটিং শুরু হয়ে গেছে? পরিচালক সন্তোষ মজুমদারের সঙ্গে আমার সকালেই একবার দেখা হয়েছিল, উনি তখন কিছু বলেননি।

রবীনবাবু বললেন, এখন ওরা হোটেলের মধ্যেই কিছু কিছু শট নেবে। পরশু থেকে আবার আউটডোর।

রবীন ঘোষ আর্ট ফিল্মের ভক্ত। পৃথিবীর নানা দেশের ভাল ভাল ফিল্মের খবরাখবর রাখেন। সেই জন্যই শুটিঙের ব্যাপারে ওঁর খুব উৎসাহ। যদিও সন্তোষ মজুমদার যে ফিলমের শুটিঙের জন্য গোপালপুরে এসেছেন, সেটা একটা রদ্দি গল্প। ওঁদের ধারণা, এই সব ছবি কমার্শিয়াল হিট করবে, আবার এই সব ছবিই রিলিজ করার পর দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই উঠে যায়। সন্তোষ মজুমদার আমার একটা গল্প নিয়ে ফিল্ম করতে চেয়েছিলেন, প্রথমেই বলেছিলেন, আমি দাদা প্রাইজ-ফ্রাইজ পাওয়ার জন্য কিংবা ফরেনে যাবার জন্য সিনেমা তুলি না, আমি চাই দর্শকদের খুশি করতে। বেশ কয়েক দিন আমার বাড়িতে যাওয়া-আসা করেছিলেন উনি, আমার কয়েকটি সকালের কাজ নষ্ট করলেন, এক হাজার টাকা অ্যাডভান্স দেওয়ালেন এক বাচ্চা প্রোডিউসারকে দিয়ে, তারপব হঠাৎ এক দিন সবাই অদৃশ্য, সে-ফিল্মের মহরতও হল না। সিনেমা জগতে এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। সন্তোষ মজুমদার মানুষটিকে অবশ্য আমার খারাপ লাগে না, বেশ খোলামেলা, হাসিখুশি ধরনের, নিজের বোকামি কিংবা মূর্খতা চাপা দেবারও কোনও চেষ্টা নেই।

প্রতিমা বললেন, আমরা ভেবেছিলাম, ওরা বুঝি দলবল নিয়ে ফিরে যাবে। কিন্তু সিনেমা তোলা তো অনেক টাকার ব্যাপার, শুটিং বন্ধ করে দিলে প্রচুর ক্ষতি হয়ে যাবে। টাকার হিসেব করলে মানুষের সেন্টিমেন্টের কোনও দাম নেই।

রবীনবাবু বললেন, চন্দ্রার বডি এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুলিশ অবশ্য ম্যাড্রাস থেকে আরও দু'জন ডুবুরি আনাচ্ছে। তবে এর মধ্যে তিনটে জোয়ার-ভাঁটা হয়ে গেছে, এরপর বডি রিকভার করার আশা খুব কম।

প্রতিমা ধমক দিয়ে বললেন, অ্যাই! তুমি আবার পুলিশি ভাষায় কথা বলছ? তোমাকে এখানে ডিউটিতে পাঠানো হয়নি। তোমাকে বলেছি না, তুমি ওই নিয়ে একদম মাথা ঘামাবে না। এটা স্বর্গ নয়, তুমিও ঢেঁকি নও।

রবীনবাবু হেসে ফেলে বললেন, ডিউটি না করলেও সাধারণ কৌতূহল থাকবে না? এ-রকম একটা ঘটনা ঘটে গেল...এই যে সুনীলবাবু, ওঁরও কি কৌতূহল নেই? আচ্ছা সুনীলবাবু আপনি ঠিক করে বলুন তো, আপনার মতে, এটা খুন না আত্মহত্যা?

আমি বললাম, কী জানি, আমি এখনও কিছুই বুঝতে পারছি না।

রবীনবাবু বললেন, তবু মনে মনে একটা কিছু ধারণা তো তৈরি হয়। সেটাই বলুন না। আপনার মতামতের একটা মূল্য আছে।

আমি বললাম, কেন? আমার মতামতের আবার কীসের মূল্য?

রবীনবাবু বললেন, আপনি মানুষের চরিত্র স্টাডি করেন তো। সামারসেট মম তাঁর আত্মজীবনীতে কী লিখেছেন জানেন? লেখক, স্কুল মাস্টার আর ডিটেকটিভ, এদের মধ্যে একটা মিল আছে। এরা মানুষের চরিত্র ভাল বোঝে।

প্রতিমা বললেন, এখানে এক জন মাস্টারও রয়েছে।

রবীনবাবু বললেন, ও হ্যাঁ, তাই তো!

তখনই আমি জানলাম যে প্রতিমা একটি কলেজের অধ্যাপিকা। তিনি দর্শন পড়ান।

রবীনবাবু বললেন, তাহলে আমরা তিন জনে মিলে এই ঘটনা কিংবা দুর্ঘটনার একটা বিশ্লেষণ করতে পারি। পুলিশ হিসেবে এই তদন্তে আমার কোনও ভূমিকা নেই, কিন্তু এক জন সাধারণ মানুষ হিসেবে কৌতূহল তো থাকবেই। আচ্ছা সুনীলবাবু, আপনিই আগে বলুন, আপনার ইনটুইশন কী বলছে, এটা খুন না আত্মহত্যা?

আমি মাটির দিকে চেয়ে রইলাম। চন্দ্রাকে আমি ভাল করে চিনিই না। গোপালপুর আসবার আগে তার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না, কোনও ফিল্মেও তার অভিনয় দেখিনি। সন্তোষ মজুমদার আমার সঙ্গে চন্দ্রার পরিচয় করিয়ে দিলেন, সে-দিন পাম বিচ হোটেলে ফিল্ম ইউনিটের সঙ্গে আমাকে খেতে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। চন্দ্রা তখন বসে ছিল আমার ঠিক পাশে। চন্দ্রা এই ফিল্মের নায়িকা নয়, নায়কের ছোট বোন, এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নয়, তবে কাহিনির ভিলেন একবার তাকে কিডন্যাপ করবে, তারপর নায়ক এসে বীরত্ব দেখাবে। এই ফিল্মের নায়িকার চেয়ে কিন্তু চন্দ্রা অনেক বেশি রূপসী।

আমার পাশে বসেছিল বলেই চন্দ্রার সঙ্গে আমার ভাব জমে গিয়েছিল তাড়াতাড়ি। সে বই-টই পড়ে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এমএ পাশ করেছে। তাছাড়া সে হাসতে জানে, সমস্ত মজার কথায় সে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

যাদের রসবোধ আছে, যারা জীবনের উপভোগটাকে বেশি মূল্য দেয়, তারা কি আত্মহত্যা করে?

আমি বললাম, চন্দ্রার মতো মেয়ে আত্মহত্যা করবে, এটা আমার কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। সবেমাত্র তার ফিল্ম কেরিয়ার শুরু হয়েছে, সামনে ভবিষ্যৎ পড়ে আছে।

রবীনবাবু বললেন, বয়সটা তো অল্প, এই বয়সের মেয়েরা খুব ইমোশনাল আর ইমপালসিভ হয়, হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কিছু একটা করে ফেলতে চায়। এর মধ্যে আবার ব্যর্থ প্রেমের অ্যাঙ্গেল আছে কি না, তা অবশ্য জানা যায়নি এখনও।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, না না, ব্যর্থ প্রেম-ট্রেম...ফিল্মের মেয়েরা কি সে-সবের কোনও গুরুত্ব দেয়? চন্দ্রার ব্যবহারে আমি সে-রকম কোনও ছায়া দেখিনি। নাঃ, আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না। চন্দ্রা এমন প্রাণ খুলে হাসে, ঠিক ব্রুড করার টাইপই নয়।

প্রতিমা বললেন, আপনি চন্দ্রা সম্পর্কে পাস্ট টেন্স ব্যবহার করছেন না। আপনি এখন চন্দ্রার মৃত্যুটা মেনে নিতে পারেননি, তাই না?

আমি অন্ধকার সমুদ্রের দিকে তাকালাম। সন্ধেবেলা নৌকোর ওপর বসে থাকা নীল শাড়ি পরা রহস্যময়ীর কথা কিছুতেই এঁদের সামনে বলব না ঠিক করে ফেলেছি।

চন্দ্রার জলে-ডোবা শরীর কেউ এখনও দেখিনি। অমন সুন্দর একটি যৌবনবন্ত শরীর শেষ পর্যন্ত মাছেদের খাদ্য হল?

রবীনবাবু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ন্যাটালি উডের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই? ন্যাটালি উডের ঘটনাটা জানেন?

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই প্রতিমা বললেন, ন্যাটালি আবার কী? মেয়েটির নাম নেটালি উড। ওয়েস্ট সাইড স্টোরির নায়িকা ছিল।

রবীনবাবু ঈষৎ ক্ষুণ্ণভাবে বললেন, আবার তুমি মাস্টারি শুরু করলে? আমিও যেমন এখানে পুলিশ অফিসার নই, তুমিও মাস্টারনি সাজতে পারবে না। বাঙালিরা ন্যাটালিই বলে। উচ্চারণের ব্যাপারে এত খুঁতখুঁতে হবার কী আছে? বিদেশিরা আমাদের নামের উচ্চারণ ভুল করে না?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, নেটালি উড... সে-ও জলে ডুবে মারা গিয়েছিল না?

এক জন পুলিশ অফিসার হিসেবে রবীনবাবুর চলচ্চিত্র জগত সম্পর্কে জ্ঞান সত্যি বিস্ময়কর। তিনি হলিউডের চিত্রতারকাদের জীবনীর খুঁটিনাটিরও খবর রাখেন।

তিনি বললেন, লস এঞ্জেলস শহরে প্যাসিফিক মহাসাগর জেটি ঘাটে অনেক অল্পবয়সি ছেলে-মেয়ে সার্ফিং করে, পালতোলা নৌকোও বাঁধা থাকে, অনেক লোকেরই প্রাইভেট বোট থাকে জানেন নিশ্চয়ই, আপনি তো ও-দেশে গেছেন, তাই না? আমি যাইনি অবশ্য, কিন্তু এত ছবি দেখেছি, তা ন্যাটালি...ওঃ, ন্যাটালি না, নেটালি উড এক দিন শুটিঙের রিসেস-এর সময় কারুকে কিছু না জানিয়ে...ওর কী-রকম সুন্দর চেহারা ছিল মনে আছে? কিছুতেই যেন বয়েস বাড়ত না, রবার্ট রেডফোর্ডের সঙ্গে একটা ছবিতে নামল, তখনও ও নায়িকা, কী যেন নাম ছবিটার?

প্রতিমা বললেন, 'দিস প্রপার্টি ইজ কনডেম্‌ন্‌ড', টেনেসি উইলিয়ামের কাহিনি, পরিচালক সিডনি পোলাক।

আমি মুগ্ধভাবে প্রতিমার দিকে তাকালাম। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেউ কারুর চেয়ে কম নয়!

রবীনবাবু বললেন, নেটালি উডের মনে কোনও ক্ষোভ থাকার কথা নয়, রূপ-খ্যাতি-অর্থ সবই আছে, তবু এক দিন শুটিঙের ফাঁকে সে চলে এল সমুদ্রের ধারে, চড়ে বসল একটা নৌকোয়, ভাসতে ভাসতে চলে গেল অনেক দূরে, গভীর সমুদ্রে, আর ফিরে এল না। অ্যাকসিডেন্ট হলেও হতে পারে, কিন্তু প্রায় সবাই আত্মহত্যা বলেই মেনে নিয়েছে।

প্রতিমা বললেন, নেটালি ড্রাগ অ্যাডিক্ট ছিল, সেই সঙ্গে বিয়ার খেত খুব। অনেকের ধারণা, সে নৌকায় মাতাল অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে, নৌকোটা বহু দূরে চলে যায়, আর ফিরতে পারেনি।

রবীনবাবু বললেন, চন্দ্রা ড্রাগ অ্যাডিক্ট ছিল কি না, সেটা খুঁটিয়ে দেখা দরকার। আজকাল ফিল্ম লাইনের অনেকে, শোনা যায় স্মিতা পাতিলও...।

আমি বললাম, না, চন্দ্রার ড্রাগের নেশা ছিল না।

রবীনবাবু ঝট করে মুখ তুলে তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, আপনি কী করে জানলেন? এখানে আসবার আগে আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়নি বলেছিলেন।

আমি বললাম, সেটা ঠিক, তবু ওই যে আপনি বললেন, মানব চরিত্র বোঝার ক্ষমতা? চন্দ্রার সঙ্গে দু'এক দিন মিশেই, যে-কোনও মানুষের সঙ্গে খানিকটা মিশেই এ-সব বুঝতে পারি। চন্দ্রার টাইপটা ও-রকম ছিল না।

রবীনবাবু বললেন, উধাও হয়ে যাবার আগের দিন চন্দ্রা আপনার বাড়িতে এসেছিল। একা এসেছিল। আপনার কাছে নিশ্চয়ই সে অনেক কথা বলেছে।

প্রতিমা বললেন, আবার তুমি ও-ভাবে... ঠিক পুলিশি জেরার মতো কথা বলছ?

রবীনবাবু লজ্জা পেয়ে হেসে বললেন, আই অ্যাম সরি। অভ্যেস সহজে কাটানো যায় না। তাহলে সুনীলবাবু, আপনি বলছেন চন্দ্রা আত্মহত্যা করেনি?

আমি আস্তে আস্তে দু-দিকে মাথা নাড়ালাম। যদিও আত্মহত্যার চেয়ে খুন অনেক বেশি জঘন্য ব্যাপার।

প্রতিমা বললেন, চন্দ্রার অবশ্য ফাসট্রেশানের অনেক কারণ থাকতে পারে।

রবীনবাবু সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। তবু জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তা জানলে কী করে? তুমি কি চন্দ্রার সঙ্গে এক দিনও কথা বলেছ?

প্রতিমা বললেন, না, বলিনি। দূর থেকে দেখেছি। তবে পত্র পত্রিকা পড়ে আমি এই সব মেয়ের কেরিয়ার ফলো করি। একটি অল্পবয়সি মেয়ে মেল ডমিনেটেড ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে কী করে আস্তে আস্তে ওপরে ওঠে, কী-ভাবে সেই মেয়েটিকে অন্যরা ব্যবহার করে, সেগুলো নোট করা আমার অভ্যেস। চন্দ্রার দু'তিনটে ইন্টারভিউ আমি পড়েছি সস্তা সিনেমার কাগজে। ওর অনেক অভিযোগ। এ পর্যন্ত চন্দ্রা মোট আট-দশটা ফিল্মে অভিনয় করেছে, সবই ছোট ইনসিগনিফিকেন্ট রোল। কেউ এ পর্যন্ত ওকে ভাল সুযোগ দেয়নি। শিক্ষিত ভাল পরিবারের মেয়ে, ওর নিজস্ব রুচিবোধ ছিল, প্রোডিউসার-ডিরেক্টরদের অন্যায় আবদার মেনে নেয়নি বলেই বোধহয় ও ভাল রোল পায়নি। তাছাড়া বেচারা সত্যজিৎ-মৃণাল-গৌতমের মতো কোনও বড় পরিচালকের নজরেও পড়েনি।

রবীনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তুমি চন্দ্রার অভিনয় কোন ফিল্মে দেখেছ? দেখোনি নিশ্চয়ই!

প্রতিমা বললেন, না, বাবা রক্ষে করো। এই সব বাংলা ন্যাকা ন্যাকা ছবি আমার একেবারেই সহ্য হয় না।

রবীনবাবু বললেন, আমিও আগে দেখিনি, তবে এই ছবির শুটিঙে আমি কয়েক জায়গায় উপস্থিত ছিলাম। চন্দ্রা দেখতে যে-রকম ভাল, চেহারায় যত চাকচিক্য, সেই তুলনায় অভিনয় প্রায় কিছুই জানত না, কেমন যেন কাঠপুতুলের মতো। সেই জন্যই পরিচালকরা ওকে ইমপর্টান্ট রোল দিতে চায় না, ওর শরীরটাকেই বেশি করে দেখায়। এই ছবিতে সন্তোষ মজুমদারও তো ওর এক-একটা সিন পাঁচ-ছ'বার করে টেক করতে হত বলে খুব বিরক্ত হয়ে যেতেন মাঝে মাঝে। শুনেছি উনি চন্দ্রার রোল খানিকটা ছেঁটে আরও ছোট করে দেবেন ভাবছিলেন।

প্রতিমা বললেন, এতে চন্দ্রার মন ভেঙে যেতে তো পারেই।

রবীনবাবু বললেন, ফিল্ম লাইনে এ-রকম স্ট্রাগল করতে হয় অনেককেই। হঠাৎ একটা ব্রেক আসে। এইটুকু ফ্রাসট্রেশানের জন্য কেউ আত্মহত্যা করে না।

ওঁদের মেয়ে টিনা পড়াশুনো শেষ করে উঠে এসে বলল, মা, তোমরা খেতে যাবে না? আমার কিন্তু খিদে পেয়েছে।

রবীনবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার খেতে যাব। তুই নিচে ডাইনিং রুমে গিয়ে অর্ডার দে তো আগে। এই সুনীল আঙ্কেলও আজ আমাদের সঙ্গে যাবেন।

প্রতিমা বললেন, তোমরা তাড়াতাড়ি শেষ করে নাও!

তারপর তিনি উঠে রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলেন সমুদ্রের দিকে।

আস্তে আস্তে আপন মনে বললেন, যদি আত্মহত্যা করতেই হয় তাহলে নেটালি উডের মতোই। কী সুন্দর, আস্তে আস্তে একটা নৌকোয় ভেসে যাওয়া, দূরে, গভীর সমুদ্রে, চারপাশে আর কেউ নেই, কেউ আমাকে দেখতে পাবে না, যেন প্রকৃতির মধ্যে হারিয়ে যাওয়া।

॥ পাঁচ ॥

চন্দ্রা আমার সঙ্গে নিজে থেকেই একবাব দেখা করতে এসেছিল ঠিকই।

চন্দ্রার ব্যবহারে ফিল্ম অ্যাকট্রেসসুলভ কোনও ভাব ছিল না। যেন এমনিই এক জন উজ্জ্বল তরুণী, কিংবা বিশ্ববিদ্যালযের ছাত্রী।

যে-দিন ঘটনাটা ঘটল, তার আগের দিনই বিকেলের দিকে হঠাৎ চন্দ্রা উপস্থিত হয়েছিল আমার বাড়িতে। সে-দিন প্রায় সারা দিন ধরেই বেলাভূমিব এখানে-সেখানে শুটিং চলছিল বলে আমি আব বাইরে বেরুইনি, এমনকী স্নান করতেও যাইনি।

চন্দ্রা এসে বলল, আমি কোনও দিন কোনও লেখকের ঘর দেখিনি, একবার আপনার লেখাব টেবিলটা দেখব। আপনি এখন কী লিখছেন?

এই বাড়িখানায় তিনটে ঘর, তার মধ্যে একটা তালা দেওয়া, সেখানে মালিকের জিনিসপত্র আছে। আর দু'টি ঘরেই খাট-বিছানা পাতা, অর্থাৎ বেডরুম। একটা বড় ঘেরা বারান্দাই বসার জায়গা। আমি পুরো বাড়িটা ভাড়া নিলেও একখানা মাত্র ঘর ব্যবহার করি। কোনও ঘরেই কোনও লেখার টেবিল নেই।

কিছু লেখা তো দূরের কথা, আমার কাছে যে একটা সাদা পৃষ্ঠাও নেই, তা চন্দ্রা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না।

খাটে ওপর অনেক বইপত্র ছড়ানো। চন্দ্রা বইগুলো তুলে তুলে দেখছিল। আমার একটা বিচিত্র স্বভাব আছে। আমি একটানা একখানা বই পড়ে শেষ করার বদলে, একই সঙ্গে চার-পাঁচখানা বই একটু একটু পড়ি। সব বই-ই সেইভাবে ওলটানো। সেই সব বই দেখে চন্দ্রা প্রথমে ভুরু তুলল, তারপর হাসতে হাসতে বলল, আপনি এইগুলো পড়ছেন?

যদুনাথ সরকারের অ্যানেকডোটস অব আওরঙ্গজেব, বৈষ্ণব পদাবলী, বশীর আল হেলালের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, রাজশেখর বসুর মহাভারত, নীরদ সি চৌধুরির দাই হ্যান্ড গ্রেট অ্যানার্ক, ইনিড স্টার্কির বদলেয়ারের জীবনী এই সব বইয়ের পরস্পরের মধ্যে কোনও মিল নেই। আমিও তো কোনও কাজের জন্য পড়ছি না, পড়ার জন্যই পড়া, আসবার সময় হাতের কাছে এগুলোই পেয়েছি। কেউ দেখে ফেললে লজ্জা লাগে।

বিকেলের পর চন্দ্রার আর শুটিং নেই, তাই সে চলে এসেছিল, বেশ হাসিখুশির মুডে ছিল, কোনও রকম ফ্রাসট্রেশানের চিহ্নই আমার চোখে পড়েনি।

চন্দ্রা আমার কাছে কোনও গোপন কথা কিংবা তার জীবনী শোনাতেও আসেনি, কোনও ফিল্মের প্রসঙ্গই তোলেনি। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সে তার বন্ধুদের সঙ্গে কী-ভাবে কাড়াকাড়ি করে বই পড়ত সেই গল্প শোনাচ্ছিল।

চন্দ্রা আমার বাড়িতে একা এসেছিল বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ একা থাকেনি। মিনিট পনেরো পরেই ওদের ফিল্ম ইউনিটের আর দু'টি ছেলে-মেয়ে চন্দ্রাকে খুঁজতে চলে এল। ওরা সেই রাতেই একবার বেরহামপুরে কী সব কেনাকাটা করতে যাবে। পল্লব আর সুনেত্রা ওরা স্বামী-স্ত্রী। পল্লব অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যামেরাম্যান আর সুনেত্রা আছে প্রোডাকশানে, কনটিনিউটি নোট করাই তার প্রধান কাজ।

পল্লব আর সুনেত্রা আমার সঙ্গে গল্প করার ব্যাপারে উৎসাহী ছিল না, এরা প্রায় জোর করেই ধরে নিয়ে গিয়েছিল চন্দ্রাকে।

এই পল্লবই পরের সন্ধেবেলা চন্দ্রাকে জীবিত অবস্থায় শেষ দেখে।

সমুদ্রের ধারে একটা ডিঙি নৌকোয় একা বসেছিল চন্দ্রা। আকাশে তখন ফ্যাকাশে জ্যো. চন্দ্রার পা দুটো ঝোলানো ছিল জলের মধ্যে। পল্লব তাকে জিজ্ঞেস কবেছিল, এই তুই এখানে বসে আছিস যে?

চন্দ্রা বলেছিল, এমনিই।

পল্লবের হাতে তখন একটা মদের বোতল, পাম বিচ হোটেলের পেছন দিকে একটা নিরিবিলি জায়গায় তাদের আসর বসবে। চন্দ্রাকে বলেছিল, তুই ওখানে চলে আয় না!

চন্দ্রা বলেছিল, তুই যা। তোরা গিয়ে বোস। আমি একটু পরে জয়েন করব।

পল্লবের জন্য অন্যরা অপেক্ষা করছিল, সে আর দাঁড়ায়নি।

চন্দ্রাকে জোর করে সেই নৌকো থেকে নামানো কিংবা কোনও বিপদের সম্ভাবনার কথা তার মাথাতেই আসেনি। ওড়িশা পুলিশ এখনও প্রত্যেক দিন পল্লবকে জেরায় জেরায় নাজেহাল করছে।

চন্দ্রার অদৃশ্য হয়ে যাবার কথা মাঝরাত্তিরের আগে কারুর খেয়ালই হয়নি।

রাত্তিরেও কিছু কিছু শুটিং ছিল। ইউনিটের সবাই খেতে বসেছিল রাত সাড়ে-বারোটায়। তখন দু-এক জন জিজ্ঞেস করেছিল, চন্দ্রা কোথায়?

চন্দ্রা না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে সুনেত্রা তার ঘরেও খুঁজে দেখতে গিয়েছিল। না পেয়ে ঠোঁট উলটেছে। ইউনিটের অন্য অনেকে মুচকি হেসেছে। একটি যুবতী মেয়ের গতিবিধি সম্পর্কে অনেকেরই মাথায় রসালো চিন্তা আসে। চন্দ্রার বয়সি অভিনেত্রীদের সঙ্গে অনেক সময় তাদের মা কিংবা ভাই-বোন কেউ আসে পাহারা দেবার জন্য। চন্দ্রা সঙ্গে সে-রকম কেউ নেই। সুতরাং সকলে ধরেই নিয়েছিল, চন্দ্রা হোটেল ছেড়ে গোপালপুরের অন্য কোনও বাড়িতে রাত কাটাতে গেছে। পল্লব-সুনেত্রার মাথায় আমার নামটাও ঝিলিক দিয়েছিল নিশ্চিত।

পরদিন সকাল ন'টায় সন্তোষ মজুমদার এসেছিলেন আমার কাছে। তারও দু'ঘণ্টা বাদে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। চন্দ্রার ঘরে তার ব্যবহারের জিনিসপত্র, এমনকী সোনার গয়না ও টাকাকড়িও পড়ে আছে, এ-সব ছেড়ে চন্দ্রা নিশ্চিত একা একা কোথাও চলে যাবে না।

পল্লবের পর চন্দ্রাকে আর কেউ দেখেনি, অন্তত আর কেউ সে-রকম কিছু স্বীকার করেনি, সুতরাং চন্দ্রা সমুদ্রে ভেসে গেছে, এটাই হল একমাত্র থিয়োরি।

দরজা বন্ধ করে আমি শুয়ে পড়লাম। এখন সমুদ্রের শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। সমুদ্রের শব্দ আমার কখনও একঘেয়ে লাগে না। আসলে গাড়ি, ট্রেন, কলকারখানা, এই সব মেকানিক্যাল

শব্দে মানুষ এখনও অভ্যস্ত হয়নি, এখনও কানে পীড়া দেয়, কিন্তু প্রকৃতির নিজস্ব শব্দ আমাদের রক্তের মধ্যে মিশে আছে।

আমার একা থাকার অভ্যেস আছে। ছেলেবেলায় আমি ইচ্ছে করে ভূতের বাড়িতে রাত কাটাতে গেছি। জঙ্গলের মধ্যে ডাকবাংলোয় দিনের পর দিন থেকেছি একা। গোপালপুরেও তো বেশ কয়েকটা দিন হয়ে গেল। এক-এক রাতে ঘুম আসতে চায় না। তাতেও আমার কোনও অসুবিধে নেই। একটা পুরো রাত না ঘুমোলেও মানুষের কিছু যায়-আসে না। এক রাত না ঘুমোলে পরের রাতে শরীর ঠিক ঘুম আদায় করে নেবে।

ঘুম না এলে, ছটফট করার বদলে আমি বই পড়ি। একটু কঠিন ধরনের বই হলেই সুবিধে। এক সময় চোখ টেনে আসবেই।

জানালায় একটা শব্দ হতেই আমি বিছানা থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। বুকের মধ্যে জয়ঢাকের মতো দমাস দমাস শব্দ হচ্ছে।

নিজের ওপর অসম্ভব রাগ।

এটা কী ব্যাপার, আমি ভয় পাচ্ছি কেন শুধু শুধু! আমার ঠিক পায়ের কাছে জানালাটার একটা কপাট আলগা। মাঝে মাঝে যে এ-রকম বন্ধ হয়ে যায়, তা তো আমি জানিই। জানলাটা পুরো বন্ধ করে দিলে হাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। ফ্যানের হাওয়ার বদলে সমুদ্রের হাওয়া খাবার জন্যই তো এখানে আসা।

আজ সেই জানালার আওয়াজে এমন বুক কাঁপার কী আছে?

আজ সমুদ্রের ধারে সন্ধেবেলা নৌকোর ওপর বসা সেই রহস্যময় তরুণীটির কথা কিছুতেই ভোলা যাচ্ছে না। হয়তো কিছু রহস্য নেই, এমনিই একটি সাধাবণ মেয়ে। বাঁধা নৌকোর ওপর উঠে একটুখানি বসা তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। চন্দ্রার সঙ্গে যে মিলে গেছে, সেটাও কাকতালীয় হতে পারে।

কিন্তু মেয়েটি কে? ফিল্ম ইউনিটের কেউ না, ওদের সবাইকেই মোটামুটি চিনে গেছি। তাছাড়া মেয়েটি পাম বিচ হোটেলের দিকেও গেল না। অন্য কোনও টুরিস্ট হতে পারে। কিন্তু ওই বয়েসি কোনও মেয়ে কি একা আসে? চন্দ্রার ঘটনা কিছুই শোনেনি!

আমার যে মনে হয়েছিল, ওই নীল শাড়ি পরা মেয়েটি সমুদ্রের জলে নেমে মিলিয়ে গেল, এ-কথা আমার বন্ধু-বান্ধবেরা শুনলে হাসবে। অথচ মনে হয়েছিল, তা-ও ঠিক। এবং এখন এ-ও জানি, ও-রকম কিছু হতেই পারে না।

আবার জানলাটা বন্ধ হল, আবার আমার বুক কাঁপল। এ তো দেখছি মহা জ্বালা! আমার বুকের মধ্যে কোথাও খানিকটা ভয় জমে আছে। এটা তাড়ানো দরকার।

প্রথমে মনে হল, উঠে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দেওয়াই ভাল।

জানলার ধারে এসে আমি সন্তর্পণে বাইরে তাকালাম। কেন যে মনে হচ্ছে, ঠিক বাইরেই কারুকে দেখতে পাব।

দুর ছাই, মানুষের আত্মা-ফাত্মা কিছু নেই, চন্দ্রা আর কোনও দিনই ফিরে আসবে না। চন্দ্রা সঙ্গে আমার কোনও ঘনিষ্ঠতা ছিল না। চন্দ্রা বেঁচে থাকলে তার সঙ্গে আমার হয়তো কখনও আর দেখা হত না। চন্দ্রা অমন ভাবে সমুদ্রে চলে গেছে বলেই সে প্রায় সর্বক্ষণ আমার মন জুড়ে আছে। শুধু আমার নয়, আরও অনেকের।

বেশ জোর হাওয়া দিচ্ছে, ঢেউয়ের শব্দও খুব বেশি। বেলাভূমি একেবারে শুনশান। জানলা বন্ধ করার বদলে আমি দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লাম পায়ে চটি গলিয়ে।

ভয় কাটাতে হলে এখন এই রাত্রির নির্জনতায় কিছুক্ষণ বাইরে ঘুরে আসা দরকার।

॥ ছয় ॥

রবীনবাবুর কথাই ঠিক, এরা পুরোদমে আ⁄ র শুটিং শুরু করে দিয়েছে। সকাল থেকেই শুনতে পাচ্ছি বেশ হট্টগোল।

আমার বাড়ির বেশ কাছাকাছি একটা খড়ের ঘরের সেট বানিয়ে ফেলেছে এর মধ্যে। ওখানে ঘর দিয়ে কী হবে তা কে জানে! বালিব ওপর বসানো হয়েছে ট্রলি, এ-দিকে ও-দিকে অনেকগুলি রিফ্লেক্টর, আজ সারা দিনই শুটিং চলবে মনে হয়।

জানলা দিয়ে ওদের ব্যাপার-স্যাপার দেখেই ঠিক করলাম, আজ আর ও-দিকে যাবই না। চন্দ্রা নেই বলেই এই ফিল্মটার ব্যাপারে আমার কেমন যেন একটা বিদ্বেষ জন্মে গেছে। অনেক টাকা-পয়সার ব্যাপার, প্রায় পঞ্চাশ ভাগের কাজ আগেই হয়ে গেছে। এখন এ ফিল্ম শেষ না করে ওদের উপায় নেই, তা ঠিক, কিন্তু একটি মেয়ে এমনি এমনি হঠাৎ হারিয়ে গেল, তার চিহ্ন কোথাও থাকবে না?

চন্দ্রার ভূমিকাটা কী হবে? বাকিটা হয়তো বাদই দিয়ে দেবে। এই সব গাঁজাখুরি গল্পের তো কোনও মা-বাপ নেই, যে-কোনও চরিত্র যে-কোনও জায়গায় হারিয়ে যেতে পারে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি বৈষ্ণব পদাবলী পড়তে লাগলাম।

এগারোটা আন্দাজ মনে হল, এক কাপ চা পেলে মন্দ হয় না। আবার বাড়িতে চা-তৈরির ব্যবস্থাও নেই। সকালের চা-ব্রেকফাস্ট পাশের গেস্ট হাউস থেকেই দিয়ে যায়। দ্বিতীয় বার নিজে গিয়ে চাইতে হয়। তেলেঙ্গি মেয়েটি একটু আগে ঘর মুছছিল, সে চলে গেল নাকি? তাকে দিয়ে আনানো যেতে পারে চা।

মেয়েটি চলেই গেছে। আমাকেই উঠতে হল।

বাইরে বেরুতেই প্রতিমার সঙ্গে দেখা! আর এক জন অচেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হল, আমি সামান্য সৌজন্যের হাসি দিয়ে চলে গেলাম গেস্ট হাউসের দিকে।

এদের ডাইনিং রুমে পাঁচ-সাত জন নারী-পুরুষ বসে আছে, কেউ কেউ চায়ের বদলে বিয়ার খাচ্ছে। দু'জন মুখচেনা, কিন্তু এখন কারুর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। মুখখানা উৎকট গম্ভীর করে রাখলাম। একটু কান পাতলেই বোঝা যায়, অন্য সবাই চন্দ্রার বিষয়েই আলোচনা করছে।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম চা শেষ করে। ওদের কথাবার্তা শুনে বোঝা গেল, চন্দ্রার বাবা আর ছোট বোন এসে পৌঁছেছে গত কাল, চন্দ্রার মা নেই। চন্দ্রার বাবা নাকি কান্নাকাটি করছেন খুব। সঙ্গে সঙ্গে আমি ঠিক করে নিয়েছি, কিছুতেই চন্দ্রার বাবার সামনে পড়তে চাই না।

একটা ভাঙা বাড়ির সামনে প্রতিমা এখনও কথা বলছেন অচেনা ব্যক্তিটির সঙ্গে। এবারও আমার সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হল, কোনও কথা হল না, আমি ঢুকে গেলাম নিজের বাড়িতে।

মিনিট পাঁচেক পরেই প্রতিমা আমার দরজায় উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করলেন, আসতে পারি?

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে বললাম, আসুন, আসুন। রবীনবাবু কোথায়?

প্রতিমা বললেন, ও শুটিং দেখতে গেছে। আপনি গেলেন না?

আমি হেসে দু'দিকে ঘাড় নাড়লাম।

প্রতিমা একটা চেয়ারে বসে বললেন, আজ চড়া রোদ। এর মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে শুটিং দেখা, খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার। রবীন গেছে, আমার মনে হয়, আরও কিছু খবর-টবর জোগাড় করার আশায়। আসলে পুলিশ তো! ওর এখনও ধারণা, এটা আত্মহত্যা নয়, এর মধ্যে কিছু ফাউল প্লে আছে।

আমি বললাম, রবীনবাবু যদি মিস্ট্রি সলভ করতে পারেন তাহলে দারুণ ব্যাপার হয়। এখানকার পুলিশ তো কোনও খেই পাচ্ছে না।

প্রতিমা হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটে বললেন, অনেক দিন আগে 'জীবন যে-রকম' নামে একটা বাংলা ছবি হয়েছিল, তার কাহিনিটা আপনার লেখা?

আমি বেশ তীব্র চোখে প্রতিমার দিকে তাকালাম। এই প্রসঙ্গটা কেউ তুললেই আমার রাগ এসে যায়, এত কাল বাদেও।

আমি বললাম, আমি কখনও কোনও সিনেমার কাহিনি লিখি না। আমার লেখা গল্প-উপন্যাস থেকে মাঝে মাঝে কেউ ফিল্ম করেন। 'জীবন যে-রকম' আমার একটা উপন্যাস, সেটা অবলম্বন করে একটা বাংলা ছবি হয়েছিল। সে-ছবি আমি নিজে অবশ্য দেখিনি। অন্যদের মুখে শুনেছি। সে-ছবি দেখলে আমার উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের চেনাই যায় না।

প্রতিমা বললেন, আমি যে ভদ্রলোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম, ওকে আপনি চেনেন?

আমি বললাম, না!

প্রতিমা বললেন, আমি ইচ্ছে করেই তখন আপনাকে ডাকিনি। ওর নাম সুগত মজুমদার। একটি সিনেমা পত্রিকার রিপোর্টার। আপনাকে পেলে ছাড়ত না, অনেকক্ষণ ধরে ভ্যাজর ভ্যাজর করত। ওই ভদ্রলোকের বোন আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত, সেই সূত্রে চেনা। তবে আপনাকে এসে ধরবে ঠিকই।

আমি বললাম, আমি এবার কেটে পড়ব ভাবছি।

প্রতিমা বললেন, ওই সুগতই 'জীবন যে-রকমে'র প্রসঙ্গ তুলল। আপনার লেখা গল্প, তা আমার খেয়াল ছিল না। সেই ছবিরও শুটিঙের সময় জলে ডুবে কেয়া চক্রবর্তী...সেই সময় খুব তোলপাড় হয়েছিল ঘটনাটা নিয়ে। এখন আবার কেউ কেউ সেই প্রসঙ্গটা টানবেই। প্রায় একই রকম ব্যাপার তো!

আমি ঝাঁঝের সঙ্গে বললাম, কেয়া চক্রবর্তীর ঘটনাটা বাংলা সিনেমার একটা কলঙ্ক। আমাদের থিয়েটার জগতের কী বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল, বলুন তো! কেয়া বাংলা মঞ্চে ইদানীংকার সব চেয়ে প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী, শুধু তাই নয়, গ্রুপ থিয়েটারের জন্য সে ছিল ডেডিকেটেড। কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল পর্যন্ত। সেই কেয়াকে কত তুচ্ছ কারণে প্রাণ দিতে হল। একটা রাবিশ বাংলা সিনেমার জন্য।

প্রতিমা সামান্য হেসে বললেন, আপনারই লেখা কাহিনি, তবু আপনি রাবিশ বললেন?

আমার উপন্যাসটাকে কেটে, ছিঁড়ে ওলোট-পালোট করে যা খুশি করেছে। কাহিনির নায়ক-নায়িকা পর্যন্ত বদলে গেছে।

সিনেমার লোকরা ইচ্ছে মতো এ-রকম বদলাতে পারে, আপনারা কিছু বলেন না?

আমাদের কথা কি ওরা শোনে?

আপনারা আপত্তি করতে পারেন না?

মৌখিক আপত্তি গ্রাহ্যই করে না। অনেক সময় সিনেমার লোকেরা গল্পের রাইট কিনে সেই যে উধাও হয়, আর কোনও যোগাযোগই রাখে না লেখকের সঙ্গে। তাছাড়া কন্ট্রাক্ট ফর্মে এক জায়গায় লেখা থাকে যে চলচ্চিত্রে রূপ দেবার জন্য কিছু কিছু পরবির্তন-পরিবর্জন করা যাবে। ওরা সুযোগটা নেয়।

আমাদের ধারণা, লেখকরা টাকার জন্য আজে বাজে সিনেমার জন্যও কাহিনি বিক্রি করে দেন!

বাংলা সিনেমার জন্য কী সামান্য টাকা পাওয়া যায় তা তো আপনারা জানেন না। অনেক সময় চুক্তিতে যা লেখা থাকে, সেটাও পুরো পাওয়া যায় না।

কেয়ার ঠিক কী হয়েছিল? দুর্ঘটনা, না কেউ ঠেলে জলে ফেলে দিয়েছিল?

মামলা-টামলা হয়েছিল শুনেছি, শেষ পর্যন্ত কেউ শাস্তি পেয়েছিল কি না জানি না। সব চেয়ে দুঃখের কথা কি জানেন, ওই 'জীবন যে-রকমে' যে-ভূমিকায় কেয়াকে মরতে হল, সেই ভূমিকাটা আমার লেখাই নয়, উপন্যাসে ও-রকম চরিত্রই নেই। সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দেবার জন্য চিত্রনাট্যে একটি অন্ধ মেয়ে আমদানি করা হয়েছিল, গল্পের সঙ্গে তার বিশেষ যোগই নেই।

ওই রকম এলেবেলে ভূমিকা নিতে কেয়া রাজি হয়েছিল কেন?

গ্রুপ থিয়েটারের সেই সময়টা ছিল খুব স্ট্রাগলিং পিরিয়ড। ওরা অভিনয়ের জন্য ভাল হল পেত না। নান্দীকার গ্রুপকে বোধহয় সেই সময় রঙ্গনা থেকে উৎখাত করা হয়েছিল। সেই জন্যই কেয়া, অজিতেশ, রুদ্রপ্রসাদ এরা ঠিক করেছিল সিনেমাতে ছোটখাটো অভিনয় করে টাকা তুলে নিজস্ব একটা রঙ্গমঞ্চ বানাবে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অত বড় এক জন অভিনেতাকেও কত বাজে সিনেমায় অভিনয় করতে হয়েছে, মনে নেই?

কেয়া কি ইচ্ছে করে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল?

সেটা আমি কী করে জানব, বলুন! সুন্দরবনের দিককার নদীগুলো সাংঘাতিক, ওখানে কেউ স্নানই করতে নামে না, সেখানে ঝাঁপ দেবার কোনও মানে হয়? অন্য কতভাবে দেখানো যেত। জলে ঝাঁপ দিলেও জাল-টাল পেতে রাখার ব্যবস্থা করতে হয়।

কেয়া আত্মহত্যা করেছে, এ-রকম একটা কথাও উঠেছিল না?

অসম্ভব! কেয়াকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে চিনতাম। ও-রকম তেজী, বুদ্ধিমতী মেয়ে খুব কমই দেখেছি। সব সময় সে উৎসাহে টগবগ করত। সব চেয়ে দুঃখের কথা কি জানেন, দুর্ঘটনা হোক বা যাই-ই হোক, কত অকিঞ্চিৎকর একটা কারণে ও-রকম এক জন প্রতিভাময়ী মেয়েকে প্রাণ দিতে হল। কী নিদারুণ অপচয়! ছি ছি ছি ছি, কী বিরাট অন্যায়!

আপনি তখন খুব কষ্ট পেয়েছিলেন?

এখনও পাই। কেয়ার প্রসঙ্গ উঠলেই আমার মাথায় আগুন জ্বলে।

কেয়া আর চন্দ্রা, চন্দ্রা অবশ্য তেমন কিছু বড় অভিনেত্রী নয়, তবু তো একটা সম্ভাবনাপূর্ণ প্রাণ, সবেমাত্র শুরু হয়েছিল ওর যৌবন ও কেরিয়ার...। নেটালি উড অবশ্য পরিপূর্ণতায় পৌঁছেছিল, সিনেমা জগত থেকে তার আর বিশেষ কিছু পাবার ছিল না।

চন্দ্রা কি নেটালি উডের ঘটনাটা জানত?

চন্দ্রার সঙ্গে আমার পরিচয়ই হয়নি। তার মনের কথা আমি কী করে জানব বলুন! তবে, আমাদের চেয়ে যারা দশ-পনেরো বছরের ছোট, তারা হলিউডের ওই সব অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রায় চেনেই না বলতে গেলে, গ্রেগরি পেক-এর জন্য কি আর এখনকার মেয়েদের বুক কাঁপে? আমার দিদির

মেয়ে, তার একুশ বছর বয়েস, সে রোনালড কোলম্যান কিংবা ইনগ্রিড বার্গম্যানের নামই শোনেনি। ওদের ফিল্ম তো আজকাল পাওয়াই যায় না! অবশ্য ভি সি আর-এর দৌলতে এ-সব ফিল্ম আবার কিছু কিছু ফিরে আসছে, কিন্তু ওই সব স্টার সম্পর্কে তেমন কৌতূহল কিংবা উন্মাদনা তো আর হবে না! আমি এবার উঠি। মেয়েটা একলা রয়েছে।

আপনার মেয়ে খুব পড়ুয়া, সব সময় ওকে বই পড়তে দেখি।

হ্যাঁ, গল্পের বই পড়তেই বেশি ভালবাসে। ছোটবেলায় যারা সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার, অবন ঠাকুর পড়ে না, তাদের সম্পর্কে আমার যা মায়া হয়!

প্রতিমা উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

প্রতিমার স্বভাবে এমন একটা ব্যক্তিত্ব আছে, যাতে ওঁর সঙ্গে ঠিক যেন ঠাট্টা-ইয়ার্কি করা যায় না।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে উনি বললেন, আপনাকে একটা খবর দিই। এটা আমার স্বামীই খুঁজে বার করেছে। সুনেত্রার সঙ্গে চন্দ্রার এক দিন বেশ বিরাট ধরনের ঝগড়া হয়েছিল। এটা আপনি শুনেছেন?

আমি বললাম, না তো! ওদের দু'জনের তো বেশ ভাবই মনে হত!

প্রতিমা বললেন, এর আগের একটা ছবির শুটিং হয়েছিল এলাহাবাদে। তাতে চন্দ্রা ছিল, পল্লবও সেই ছবিতে ক্যামেরার কাজ করেছিল। সুনেত্রা সেবার এলাহাবাদ যায়নি। পল্লব প্রত্যেক দিনই বেশি ড্রিঙ্ক করে, খানিক বাদে তার ভাল-মন্দ জ্ঞান থাকে না। এলাহাবাদে সে নাকি চন্দ্রার সঙ্গে অ্যাফেয়ার করার চেষ্টা করেছিল। চন্দ্রা তখন জানত না পল্লব বিবাহিত। সেই ঘটনা সুনেত্রা এখানে এসে শুনেছে।

কে বলল?

ওদেরই ইউনিটের অন্য কেউ। এই সব কথা জানিয়ে দিয়ে এক ধরনের লোক খুব আনন্দ পায়। তার ফলে ব্যাপারটা আর একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে গেল না?

আমি চুপ করে রইলাম।

প্রতিমা আবার বললেন, পল্লবই চন্দ্রাকে শেষ দেখেছিল। তার সঙ্গে চন্দ্রার কী কথা হয়েছে, কেউ জানে না। চন্দ্রা সাঁতার জানত না। পল্লব নৌকোর দড়ি খুলে নৌকোটা সমুদ্রের মধ্যে যদি ঠেলে দিয়ে থাকে...সেটা অসম্ভব কিছু না।

আমি তবু চুপ করে রইলাম।

প্রতিমা দরজার বাইরে গিয়ে আবার বললেন, আমার পুলিশ স্বামীটির ধারণা, সেক্স অ্যাঙ্গেলটা খুব ইমপর্টান্ট। যে-সব মেয়ে খুন হয়, তাদের অধিকাংশেরই প্রাণ যায় পুরুষদের বিকৃত যৌন তাড়নায়।

প্রতিমার মুখে সেক্স কথাটা কেমন যেন বেমানান লাগে।

ঘটনাটা ক্রমশই যেন একটা রোমহর্ষক রহস্য কাহিনির দিকে যাচ্ছে। আমার হাসি পেল এই ভেবে যে, এই কাহিনিতে আমি নিজেও একটা ছোটখাটো চরিত্র।

॥ সাত ॥

দুপুরবেলা আকাশ কাঁপিয়ে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, খোলা জানলা দিয়ে বৃষ্টির ঝাপটা এসে জাগিয়ে দিল আমাকে। ধড়মড় করে উঠে জানলা বন্ধ করতে আমার ইচ্ছে হল না। ভিজুক না বিছানাটা। এমন কিছু ক্ষতি হবে না। শুয়ে শুয়ে দেখতে লাগলাম বিদ্যুতের লকলকে রেখা।

মিনিট পাঁচেকের বেশি অবশ্য শুয়ে থাকা যায় না। ভেতরের সাবধানী মনটা বলে ওঠে, বিছানা একেবারে জবজবে ভিজে গেলে রাত্তিরে শোবে কী করে? এর মধ্যেই চাদর-টাদর বেশ ভিজে গেছে।

একা থাকার এই মজা। কলকাতায় নিজের বাড়িতে কি এক মিনিটও এমন বৃষ্টির মধ্যে জানলা খুলে শুয়ে থাকতে পারতাম? স্বাতী এসে বকুনি দিত।

এখানে জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো ইচ্ছে মতো মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলতে পারি। চায়ের কাপে ছাই ঝাড়লে আপত্তি করার কেউ নেই। সদর দরজাটা বন্ধ থাকলে পা-জামার দড়ি একেবারে আলগা করে শুয়ে থাকা যায়। বাথরুম থেকে স্নান সেরে আমি সোজা উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে আসি। কয়েক দিনের জন্য এই একটা অন্য রকম জীবন।

উঠে গিয়ে দাঁড়ালাম জানালার সামনে।

ফিল্ম ইউনিটের লোকের ছোটাছুটি করছে। বৃষ্টি ও ঝড় এসে পড়েছে একেবারে জানান না দিয়ে। ক্যামেরার ওপর কম্বল চাপা দিয়ে কাঁধে করে দৌড়াচ্ছে পল্লব, বড় বড় রিফ্লেক্টরগুলো সরানো হচ্ছে তাড়াতাড়ি। খড়ের ঘরের যে-সেটটা ওরা বানিয়েছিল, সেটা হেলে পড়েছে ঝড়ের ধাক্কায়।

আজ আর শুটিং হবার আশা নেই।

এতে আমার আনন্দ হচ্ছে কেন? এক-এক দিন শুটিং বন্ধ হয়ে গেলেই অনেক টাকা ক্ষতি হয়ে যায়। অপরের ক্ষতি দেখে কেন আমার এই বিকৃত উল্লাস? না, এদের লাভ-লোকসানের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। তবু, বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে — এই রকম একটা ভাব আমার মনের মধ্যে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। লোকজনের ছুটোছুটি দেখতে মজাই লাগছে বেশ।

সমুদ্রের ওপর অজস্র রুমালের মতো উড়ছে বৃষ্টি।

এক সময় সমস্ত বেলাভূমি জনশূন্য হয়ে গেল। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আমার গেঞ্জি-পাজামা পরা সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে, আমি নিমগ্ন হয়ে দেখছি শূন্যতা। ঠিক শূন্যতা নয়, বৃষ্টি যেন জীবন্ত প্রাণী। এখন এই সমুদ্রকে নিয়ে বৃষ্টির খেলা করার সময়।

বেশ কিছুক্ষণ পর আবার একটি দৃশ্য দেখে আমার বুকটা ধক করে উঠল।

একটা লাল রঙের ছাতা মাথায় দিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছে একটি যুবতী।

সেই মুহূর্তে আমি এক লক্ষ টাকা বাজি ফেলে বলতে পারতাম, ওই নারীটি নিশ্চয়ই চন্দ্রা। ঠিক চন্দ্রার মতো হাঁটার ভঙ্গি, তার মুখখানা যদিও আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না, তবু চন্দ্রারই মতো, এই লাল ছাতা মাথায় দিয়ে আমি চন্দ্রাকে ঠিক এই রকমভাবে হাঁটতে দেখেছি।

তবে শুধু এক মুহূর্তের জন্যই আমার এ-রকম মনে হয়। পরের মুহূর্তেই আমি নিজেকে চোখ রাঙিয়ে বলি, দিনে-দুপুরে ভূত দেখছ নাকি, সুনীল?

এমনও তো হতে পারে, চন্দ্রাকে খুঁজে পাওয়া গেছে! সে ফিরে এসেছে কোনও জায়গা থেকে! তাহলে কি রবীনবাবু তখনি এসে সে-খবর আমাকে জানাতেন না?

মেয়েটি আমার চোখের আড়ালে চলে যেতেই আমি ছটফটিয়ে উঠলাম। প্রকৃত ব্যাপারটা আমাকে জানতেই হবে। আমার কি দৃষ্টিবিভ্রম হচ্ছে? চন্দ্রার মতো অন্য এক জনকে আমি দেখছি কেন?

ছুটে বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে।

আমার এই বাড়িটার পেছন দিকেই একটা দেওয়াল, সেখানে বালি জমতে জমতে অনেকটা উঁচু হয়ে গেছে। অনেকটা খাড়া মতো বালির স্তূপ। সেখান থেকেই একটা লাফ দিলাম আমি। কেউ তো দেখছে না, একটু ছেলেমানুষি করলেই-বা ক্ষতি কী?

লাল ছাতা মাথায় মেয়েটি একটু দূরে চলে গেছে, সে যাচ্ছে পাম বিচ হোটেলের দিকে। এখনও তাকে চন্দ্রাই মনে হচ্ছে আমার। যে যা-ই মনে করুক, একবার ওই মেয়েটির কাছে গিয়ে ওর মুখ দেখে, ওর সঙ্গে দু'একটা কথা বলতেই হবে।

ঝড় থেমে গেলেও বৃষ্টি পড়ছে সমানে। বিচে আর কেউ নেই। আমি ছাতা আনিনি, সারা গা এমনিতেই ভেজা। দৌড়ে না গেলে মেয়েটিকে ধরা যাবে না।

অন্য বাড়িগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। কোনও বারান্দাতেই কোনও মানুষ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু দিনেরবেলা অনেকেই জেগে আছে, জানলা দিয়ে কেউ কেউ আমাকে দৌড়তে দেখতে পেয়ে যেতে পারে। একটা মেয়ের পেছনে আমি ছুটছি? মন্দ কী, মেয়েদের পেছনে ছোটা মোটেই অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

একটু জোরে পা চালাতেই পাশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল এক জন লোক। মাথায় কালো ছাতা। চেঁচিয়ে ডাকল, ও সুনীলদা, একবার শুনুন!

সকালবেলা প্রতিমা এর সঙ্গেই কথা বলছিলেন। সিনেমার কাগজের লোক।

সে এসে আমার সামনেটা জুড়ে দাঁড়িয়ে বলল, আমায় চিনতে পারছেন, সুনীলদা? আমার নাম সুগত মজুমদার। সত্যজিৎ রায়ের 'ঘরে-বাইরে' ছবির প্রিভিউয়ের দিনে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আপনি আপনার পকেট থেকে আমাকে একটা সিগারেট দিয়েছিলেন। কোথায় যাচ্ছেন, পাম বিচে? চলুন, আমিও ওই দিকেই যাব, এক সঙ্গেই যাওয়া যাক।

ভিজে গায়ে, গেঞ্জি-পাজামা পরে আমি যাব পাম বিচ হোটেলে? কিন্তু আমি অন্য কোথায় যাচ্ছি, সে-কথাও কি বলা যায়?

সুগত আবার বলল, দাদা, আপনার একটা ছোট্ট ইন্টারভিউ নেব।

আমি চিবিয়ে বললাম, এই বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে হাঁটতেই ইন্টারভিউ হবে বুঝি?

সুগত বললো, না না, মানে, আপনি যখন সময় দেবেন। চলুন ওদের হোটেলে গিয়ে বসা যাক। আজ তো শুটিং প্যাক আপ হয়ে গেছে, ওখানে আড্ডা জমবে।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে বললাম, আমি ওদের হোটেলে যাচ্ছি না।

লাল ছাতা মাথায় মেয়েটি ক্রমশ চলে যাচ্ছে দূরে। একবার সে নিচু হয়ে বালি থেকে একটা কিছু কুড়াল। হয়তো ঝিনুক। দূর থেকেও ওকে ঠিক চন্দ্রা বলেই মনে হচ্ছে। আর একটু পরেই চোখের আড়ালে চলে যাবে। কিছুতেই কি ওর কাছে গিয়ে মুখখানা দেখা যাবে না? আগের দিন সন্ধেবেলা একেই কি দেখেছিলাম?

সুগতকে যে কী অজুহাত দেব, তা মনেই এল না। ওকে এড়িয়ে কী করে ছুটে যাই মেয়েটির কাছে? তাহলে সুগত নিশ্চয়ই মনে মনে একটা রসালো গল্প বানিয়ে নেবে। কাগজে একটা কিছু লিখে দিলেই হল। গোপালপুরে সমুদ্রের ধারে দুপুরবেলায় বৃষ্টির মধ্যে আমি একটি মেয়ের পেছনে ছুটোছুটি করছি।

সুগত জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা সুনীলদা, কেয়া চক্রবর্তীর যখন অ্যাকসিডেন্টটা হয়, তখন, মানে, 'জীবন যে-রকম'-এর শুটিঙের সেই দিনে আপনি কি সেখানে উপস্থিত ছিলেন?

আমি গর্জন করে বলে উঠলাম, না!

তারপর পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলাম নিজের বাড়ির দিকে।

॥ আট ॥

বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলাম পনেরো দিনের জন্য, আর ছ'দিন বাকি আছে। কিন্তু আমার আর এখানে মন টিকছে না। নির্জনতার সুখ উপভোগ করার আর কোনও আশা নেই। আগামীকালই তল্পি-তল্পা গুটিয়ে সরে পড়ব ঠিক করে ফেললাম।

চন্দ্রা উধাও রহস্য নিয়ে আমার আর মাথা ঘামাবার আগ্রহ নেই।

রবীনবাবু আর প্রতিমা অবশ্য এখনও নানা রকম থিয়োরি নিয়ে প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু একটা বেশ অসুবিধেতেও পড়েছেন রবীনবাবু।

এখানকার থানাটা ছোট। সাধারণ খুন-টুনের ব্যাপার হলে বিশেষ কেউ মাথা ঘামাত না। কিন্তু এক জন যুবতী অভিনেত্রীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কারণ অনেক কাগজেই ফলাও করে খবরটা ছাপা হয়েছে। ভুবনেশ্বর থেকে এসেছেন তিন জন পুলিশ অফিসার। এই রহস্যের কিনারা করার ভার ওড়িশার পুলিশ দফতরের। ওড়িশার অফিসারদের মধ্যে এক জনের সঙ্গে আমাদের আলাপও হয়েছে, তাঁর নাম অর্জুন মহাপাত্র। বেশ দক্ষ অফিসার বলে মনে হয়। ব্যবহারও খুব ভদ্র।

তবে অর্জুন মহাপাত্র ইংরেজিতে ছাড়া কথা বলেন না। আমরা ওড়িয়া ভাষা মোটামুটি বুঝতে পারি, আমাদের বাংলাও স্থানীয় লোক ঠিক বুঝে নেয়। অন্যদের সঙ্গে ওড়িয়া-বাংলা মিলিয়ে-মিশিয়ে আলোচনা চালাতে কোনও অসুবিধে হয় না, কিন্তু অর্জুন মহাপাত্র খুবই ইংরিজিওয়ালা!

অর্জুনবাবু এখানে রবীনবাবুর উপস্থিতি খুব একটা পছন্দ করেননি। তাঁর ধারণা, পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ ওড়িশার ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে। রবীনবাবু যে এখানে ছুটিতে এসেছেন, তাঁর অফিসিয়াল পজিশন নিয়ে তদন্ত করছেন না, এটা অর্জুন মহাপাত্র ঠিক বিশ্বাস করছেন না। তিনি মুখে অবশ্য বলছেন, অফ কোর্স আপনার মতো এক জন অভিজ্ঞ অফিসারের পরামর্শ ও সাহায্য পেলে আমরা খুশিই হব।

অর্জুন মহাপাত্র ছ'ফুটেরও বেশি লম্বা, চোখ দু'টি উজ্জ্বল এবং চঞ্চল। সকলের সঙ্গেই তিনি ভাল ব্যবহার করেন, অথচ সকলকেই তিনি সন্দেহ করেন বলে মনে হয়। টিপিক্যাল ডিটেকটিভ। আমার ওপরেও তাঁর কোনও সন্দেহ আছে কি না কে জানে!

চন্দ্রা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল আমার বাড়িতে, সে দিন ঠিক কী কী কথা হয়েছিল, তা নিয়ে তিনি আমাকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট জেরা করলেন, সঙ্গে একটা ছোট টেপ রেকর্ডার।

অর্জুন মহাপাত্রই বললেন যে, ম্যাড্রাস থেকে আরও দু'জন ডুবুরি এসেছে, তারা সন্ধেবেলাতেই জলে নেমে পড়েছে।

আমার জবানবন্দি শেষ হবার পর আমি অর্জুনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি ইচ্ছে করলে এখন গোপালপুর ছেড়ে চলে যেতে পারি? তাতে কোনও অসুবিধে আছে কি?

অর্জুনবাবু খুবই অবাক হয়ে বললেন, আপনি চলে যাবেন কি না, তা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন? অফ কোর্স। আপনাকে হ্যারাস করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আপনার সময় নষ্ট করার জন্য খুবই দুঃখিত। আপনাকে এত কথা জিজ্ঞেস করছিলাম, যদি সিচুয়েশানটা বুঝতে কিছু সাহায্য হয়। অফ কোর্স আপনি যে-কোনও সময় যেখানে খুশি যেতে পারেন।

অফ কোর্স অর্জুন মহাপাত্রের একটা মুদ্রাদোষ।

ফাইভ ফিফটি ফাইভ সিগারেটের প্যাকেট আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে তিনি আবার বললেন, যদি খুব অসুবিধে না হয়, আরও দু'একটা দিন থেকে যান না। মাঝে মাঝে আপনার সঙ্গে এসে গল্প করে যাব। এই ব্যাপারটা সল্‌ভ করতে আর দু'দিনের বেশি লাগবে না। অফ কোর্স আপনার যদি অন্য কোনও কাজ থাকে, তাহলে আটকাতে চাই না।

এটা ওঁর অনুরোধ না প্রচ্ছন্ন আদেশ, তা বোঝা গেল না।

আমি খানিকটা জেদের সঙ্গেই বললাম, নাঃ, কাল বিকেলেই আমি চলে যাব ঠিক করেছি। বেরহামপুর থেকে রাত্তিরের ট্রেন ধরব।

অর্জুন মহাপাত্র এবারে আরও ভদ্রতার সঙ্গে বললেন, তাহলে আমার গাড়ি আপনাকে বেরহামপুরের স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসবে। টিকিট কাটা আছে আপনার? নো প্রবলেম।

অর্জুন মহাপাত্র চলে যাবার মিনিট দশেক পর একটা গাড়ি এসে থামল আমার বাড়ির সামনে। সদর দরজা খোলা, ভেতরে ঢুকে এলেন সন্তোষ মজুমদার, তার সঙ্গে সুনেত্রা ও আরও দুই ব্যক্তি। সুনেত্রার মুখখানায় রাগ ও বিষণ্ণতা মাখা।

সন্তোষ মজুমদার বললেন, উঠুন স্যার, পায়ে জুতো গলিয়ে নিন, একবার আমাদের হোটেলে চলুন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন, কী ব্যাপার?

সন্তোষ মজুমদার বললেন, চলুন না। একা একা বসে থাকেন, আমাদের জন্য একটু সময় দিতে পারবেন না? আমরা কি এতই খারাপ লোক?

আরে নাঃ, যাঃ কী বলছেন! হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে এসেই আমাকে যেতে বলছেন, কেন আবার কিছু ঘটেছে!

নতুন কিছু ঘটেনি। তবে আমাদের ইউনিটের লোকজন ক্রমশ খেপে যাচ্ছে। সবাইকে আর সামলানো যাচ্ছে না। ওড়িশার পুলিশ আমাদের খুব হ্যারাস করছে।

তার মানে?

মহাপাত্র সাহেব অর্ডার দিয়েছেন যে, আমাদের ইউনিটের কোনও এক জন লোকও এখন গোপালপুরের বাইরে যেতে পারবে না। আচ্ছা ভাবুন তো, কী মুশকিলের ব্যাপার। ফিল্মের এত বড় ইউনিট, সবাই কি এক জায়গায় বেশি দিন পড়ে থাকে? অনবরত লোক যাতায়াত করে। যার দু'এক দিনের কাজ, সে-কাজ শেষ হলেই চলে যায়। আর যে-দিন কাজ, তার আগের দিন আনানো হয়, ঠিক কি না? সবাইকে এক মাস ধরে হোটেলে রেখে খাওয়ালে যে করপোরেশানের বাজেট হয়ে যাবে! তাছাড়া আমাদের প্রোডাকশানের জিনিসপত্তর আনবার জন্য দু'তিন জনকে প্রায় প্রত্যেক দিন কলকাতায় পাঠাতে হয়, সে-সবও বন্ধ।

আমি সন্তোষবাবুর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইলাম। এটা ওঁদের পক্ষে একটা সত্যিকারের সমস্যা বটে, কিন্তু এই সমস্যা সমাধানে আমার তো কোনও হাত নেই!

সন্তোষ মজুমদার আবার বললেন, দেখুন, আমাদের মধ্যে একটা অত্যন্ত স্যাড ব্যাপার ঘটে গেছে। চন্দ্রা ফিল্ম লাইনে নতুন এলেও সবাই ওকে পছন্দ করত। ভাল মেয়ে, যথার্থ ভাল মেয়ে, ট্যালেন্ট ছিল, রাইজ করতে পারত। তার এই রকম হল, সে-জন্য সবাই খুব জেনুইন দুঃখ পেয়েছে। কিন্তু কাজও তো করে যেতে হবে। আপনি তো জানেন স্যার, ফিল্ম প্রোডাকশান মানে একটা বৃহৎ যজ্ঞ। সময় নষ্ট করলেই হাজার হাজার টাকা ক্ষতি।

নিতান্ত কথার কথা হিসেবেই আমি বললাম, আজ তো সারা দিনই প্রায় বৃষ্টির জন্য শুটিং বন্ধ রইল।

সন্তোষ মজুমদার বললেন, সেই জন্যই আজ সারা রাত আবার শুটিং সিডিউল রেখেছি। হোটেলের কাছাকাছিই হবে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, নাইট ফর ডে কাজ হবে।

সন্তোষবাবু, আপনারা সারা রাত শুটিং করবেন, সেখানে আমি গিয়ে কী করব?

শুটিং দেখতে আপনাকে ডাকছি না। সে-সব শুরু হবে রাত দশটা থেকে। লাইটিং করতে, ট্রলি বসাতে অনেক সময় লেগে যাবে। তার আগে সাতটা থেকে ন'টা পর্যন্ত একটা গেট টুগেদারের ব্যবস্থা করেছি। সেখানে একবার আপনাকে আসতেই হবে যে! পুলিশদের বলেছি, আরও দু'চার জন গণমান্য লোক আসছেন, সেখানে অর্জুন মহাপাত্রর কাছে আমাদের সমস্যাটা তুলব। আপনাকে আর কিছু করতে হবে না, শুধু একটু মরাল সাপোর্ট দেবেন। সামান্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আছে, একবার চলুন।

অন্য দুই ভদ্রলোকের মধ্যে এক জন প্রোডাকশান ম্যানেজার ও অন্য জন সহ-পরিচালক, তাঁরাও এমন পিড়াপিড়ি করতে লাগলেন যে আর না বলা গেল না।

আমি বললাম, সাতটা বাজতে তো দেরি আছে, আমি যাচ্ছি আধ ঘণ্টা পরে।

সন্তোষবাবু বললেন, ঠিক আসবেন তো? গাড়ি পাঠাব?

আমি বললাম, না, হেঁটেই যাব। সারা দিন একটুও হাঁটা হয়নি সমুদ্রের ধারে।

হঠাৎ অত্যন্ত ক্ষুব্ধভাবে চেঁচিয়ে উঠে সন্তোষ মজুমদার বললেন, জানেন, আজ দুপুর থেকে পল্লবকে থানায় ডিটেইন করে রেখেছে? আমরা এই মাত্র তার সঙ্গে দেখা করতে গেসলাম, দেখা করতেই দিল না। এ কি মগের মুল্লুক?

আমি তাকালাম সুনেত্রার দিকে।

সুনেত্রা অদ্ভুত ঠাণ্ডা গলায় বলল, আপনার বন্ধু ববীনবাবুই ওর নামে লাগিয়েছে।

সন্তোষ মজুমদার বললেন, রবীনবাবু আর ওঁর স্ত্রীকেও গেট টুগেদারে ডেকেছি। তুই আবার ওঁদের সামনে কিছু বলে বসিস না।

সুনেত্রা বলল, যদি ওরা পল্লবকে না ছাড়ে, পল্লবের ঘাড়ে মিথ্যে দোষ চাপায়, তাহলে আমি অনেক কিছু ফাঁস করে দেব। ওই রবীনবাবুকে আমি ছাড়ব না। উনি চন্দ্রার পিছনে অনেক দিন ধরে ঘুর ঘুর করছেন।

॥ নয় ॥

সারা দিন বর্ষার পর বাতাস বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

সমুদ্রের ধারে কিছু মানুষ রয়েছে আজ। এক জায়গায় পাঁচ-ছ'জন যুবক-যুবতীর একটি দল গান গাইছে এক সঙ্গে। এরা নতুন এসেছে মনে হয়।

আমি হাঁটছি খুব আস্তে আস্তে। কাল চলে যাব ঠিক করে ফেলার পর আজ সমুদ্রকে নতুন করে ভাল লাগছে যেন। কাল সকালে অন্তত দু'তিন ঘণ্টা স্নান করতে হবে।

ঠিক চন্দ্রার মতো একটি নারীকে আমি দু'বার দেখেছি এই বেলাভূমিতে। সে কি আমার চোখের ভুল? দু'বারই যুবতীটি মিলিয়ে গেছে আমার চোখের সামনে থেকে। মিলিয়ে গেছে মানে অদৃশ্য হয়ে

যায়নি, মেয়েটি রক্তমাংসের জীবন্ত নিশ্চিত, কিন্তু আমি তার মুখ দেখতে পাইনি ভাল করে। চন্দ্রার সঙ্গে এমনই মিল যে আমি ভয় পেয়ে গেছি।

রবীনবাবু আর প্রতিমার সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়, কিন্তু এই ব্যাপারটা আমি খুলে বলতে পারিনি। ব্যাখ্যা করতে পারব না যে! প্রত্যেকেরই কিছু কিছু গোপন কথা থাকে।

সুনেত্রা বলে গেল, সে রবীনবাবু সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। রবীনবাবু যে চন্দ্রাকে আগে থেকে চিনতেন, সে-কথা আমাকে জানাননি। সম্ভবত প্রতিমাও জানেন না।

দূরে দেখা যাচ্ছে আলোকোজ্জ্বল হোটেলটি।

আজও এক জায়গায় বাঁধা আছে দু'তিনটে নৌকো। এখান থেকেই একটা নৌকোয় চন্দ্রা মিলিয়ে গেছে সমুদ্রে। তার পরেও আর একটা নৌকোয় আমি বসে থাকতে দেখেছিলাম চন্দ্রার মতো এক রহস্যময়ী নারীকে। এটাই আমাকে সব চেয়ে অস্বস্তিতে ফেলেছে।

দুপুরবেলা লাল ছাতা মাথায় যে-মেয়েটি হেঁটে গেল, তাকে কি শুধু আমি একাই দেখেছি? যাঃ, এটা হতেই পারে না। এ-সব আমি একেবারেই বিশ্বাস করি না, এ-রকম অভিজ্ঞতাও আমার আগে কখনও হয়নি।

দু'জন বয়স্ক ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে করতে যাচ্ছেন। এঁদের আগে দেখিনি। এঁরা বোধহয় চন্দ্রার অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কথা কিছুই জানেন না।

পুলিশ শেষ পর্যন্ত পল্লবকে অ্যারেস্ট করল? পল্লবের সঙ্গেই চন্দ্রার শেষ দেখা হয়েছিল, চন্দ্রার সঙ্গে পল্লবের আগে থেকেই কিছু একটা সম্পর্ক ছিল। সুতরাং পল্লবের ওপর প্রথম খানিকটা সন্দেহ পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু সাধারণত খুনের গল্পে দেখা যায়, প্রথমে যার ওপর সন্দেহ হয়, পাঠকবা যাকে খুনি বলে ধরে নেয়, সে আসলে নির্দোষ। ঘটনা হঠাৎ মোড় নেয় অন্য দিকে, আসল খুনি বেরিয়ে আসে।

এখানে পল্লবই যদি শেষ পর্যন্ত ভিলেন হয়, তাহলে ব্যাপারটা বড় সাদামাটা হয়ে যাবে।

রবীনবাবু চন্দ্রাকে আগে থেকে চিনতেন, সেটা তাঁর স্ত্রীর কাছেও গোপন করে গেছেন। সেই জন্যই কি চন্দ্রার কেসটা নিয়ে রবীনবাবু এতখানি ইনভল্‌ভড হয়ে পড়েছেন?

উলটো দিক থেকে হেঁটে আসছেন প্রতিমা আর তাঁব মেয়ে। প্রতিমার হাতে একটা টর্চ।

প্রতিমা দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, বৃষ্টির পর আজ আকাশটা কী সুন্দর হয়েছে দেখেছেন? আজ জ্যোৎস্নাও উঠেছে তাড়াতাড়ি।

আমি এতক্ষণ ভাল করে আকাশ দেখিনি, অন্য এলেবেলে বিষয় নিয়ে চিন্তা করছিলাম। একটু হেসে বললাম, কাল আমি চলে যাব, তাই আমার জন্য এত সুন্দর জ্যোৎস্না ফুটেছে।

প্রতিমা বললেন, কালই যাবেন কেন, আর দু'এক দিন থাকুন। অন্তত শনিবার পর্যন্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ, শনিবার পর্যন্ত থেকে যান।

কেন, শনিবার স্পেশাল কিছু আছে?

আমার মেয়ের জন্মদিন এখানেই সেলিব্রেট করব। আপনি থাকলে ভাল লাগবে।

আমি মেয়েটির দিকে ·কয়ে হেসে মাথা নেড়ে বললাম, যদি না থাকি, আগে থেকেই হ্যাপি বার্থ ডে জানিয়ে রাখছি।

মেয়েটির হাতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। এখানে কোথায় ফুলের দোকান, আমি দেখিনি। প্রতিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, ফুলগুলো কিনলেন?

প্রতিমা বললেন, না, কিনিনি। 'পেরলস' নামে যে-বাড়িটা আছে, সেখানে টবে অনেক রকম ফুল হয়েছে। ওই বাড়ির এক মহিলা নিজে থেকেই দিলেন। আচ্ছা, আজকে আকাশের জ্যোৎস্না আর এই রজনীগন্ধা, এই নিয়ে কোন গানটা মনে পড়ে বলুন তো?

কেউ জিজ্ঞেস করলে তক্ষুনি কোনও গান বা কবিতা আমার মনে পড়ে না। ধাঁধার উত্তর দিতে আমি সব সময় ফেল করি। টিভির ক্যুইজ প্রোগ্রামে অল্পবয়সি ছেলে-মেয়েরা যখন শক্ত শক্ত প্রশ্নের উত্তর চটাস চটাস করে উত্তর দেয়, তখন তাদের প্রতি আমার বেশ শ্রদ্ধা হয়।

আমি চুপ করে আছি দেখে প্রতিমা বললেন, পারছেন না? আপনাকে একটা ক্লু দিচ্ছি। গানটা 'উদয়ের পথে' ফিল্মে ছিল।

আমার চোখ কপালে উঠল। 'উদয়ের পথে' তো আমার প্রায় হামাগুড়ি বয়সের ছবি। সে-ছবি আমি দেখিনি, নাম শুনেছি মাত্র। প্রতিমাই-বা সেই সিনেমা দেখলেন কী করে!

ছোট মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠল।

প্রতিমা বললেন, ওকে আমি এইমাত্র শেখালাম। খুকু, দু'লাইন শুনিয়ে দে তো।

মেয়েটি গেয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে, উঠলে পড়ে আলো, ও রজনীগন্ধা তোমার গন্ধ সুধা ঢালো, চাঁদের হাসি...।

আমি বললাম, বাঃ, আপনার মেয়েরও তো বেশ ভাল গানের গলা।

প্রতিমা বললেন, আমাদের ওখানে একটু পরে চলে আসুন না। বারান্দায় বসে আড্ডা দেওয়া যাবে। ও কোথা থেকে একটা ভাল হুইস্কি জোগাড় করে এনেছে।

আমাকে যে পাম বিচ হোটেলে সিনেমা ইউনিট নেমন্তন্ন করেছে, সেটা বলতে গিয়েও চেপে গেলাম। বোঝাই যাচ্ছে, ওরা রবীন-প্রতিমাকে ডাকেনি। প্রতিমা অবশ্য নেমন্তন্ন পেলেও নিতেন না।

বললাম, দেখি, ওই দিকে এক জনের সঙ্গে দেকা করার কথা আছে।

প্রতিমা বললেন, হ্যাঁ, ঘুরে আসুন, একটু পরে আসুন। রবীনও কোথায় যেন বেরিয়েছে, খানিকক্ষণের মধ্যে ফিরবে নিশ্চয়ই।

প্রতিমা আবার এগিয়ে গেলেন মেয়েকে নিয়ে।

এই পরিবারটি বেশ চমৎকার। স্বামীটি ভদ্র, শিক্ষিত। প্রতিমাও বিদুষী এবং মোটামুটি সুন্দরীই বলা যায়। মেয়েটিও বেশ ভাল হয়েছে, পড়াশুনোর দিকে খুব ঝোঁক। ওঁদের ছেলেও বেশ ব্রাইট শুনেছি।

সবাই এঁদের একটি আদর্শ, সুখী পরিবারই মনে করবে। কিন্তু প্রতিমার কোনও একটা গুরুতর অসুখ আছে, বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। রবীনবাবু ফিল্মের অভিনেত্রীদের সঙ্গে গোপনে ঘোরাঘুরি করেন। এই সব গোপন ব্যাপারগুলো না জানলেই ভাল হত।

চন্দ্রা যে-দিন অদৃশ্য হয়ে যায়, সে-দিনও আকাশে জ্যোৎস্না ফিন্‌কি দিচ্ছিল। চন্দ্রার স্বভাবটিও ছিল খুব রোমান্টিক ধরনের, সাহিত্যবোধ ছিল, কবিতা পড়েছে অনেক, সেই সব টানেই ও দেখা করতে গিয়েছিল আমার সঙ্গে। চন্দ্রা ফিল্ম লাইনে না এসে লেখিকা হবার চেষ্টা করল না কেন? তাহলে ওকে আমরা হারাতাম না।

॥ দশ ॥

পাম বিচ হোটেলের ভেতর দিয়ে দু'টি লম্বা টানা বারান্দা। মাঝখানের চত্বরে শামিয়ানা খাটানো হয়েছে। এখানেই চেয়ার পেতে বসেছে অনেকে।

বারান্দায় দাঁড়িয়েই আমার প্রথমে মনে হল, চন্দ্রা থাকলে সে-ই ছুটে এসে আমাকে কোথাও বসাত। এই ইউনিটের লোকজনের মধ্যে একমাত্র চন্দ্রার সঙ্গেই আমার বেশি আলাপ পরিচয় হয়েছিল। অন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীর অনেকেই লেখকদের বিশেষ পাত্তাই দেয় না।

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অবশ্য বিশেষ দেখা যাচ্ছে না এখানে। অচেনা লোকজনই বেশি। সন্তোষ মজুমদারকেও দেখতে পাচ্ছি না, কেউ আমাকে অভ্যর্থনা করল না, আমার বেশ বোকা বোকা লাগতে লাগল। এখানে না এলেই ভাল হত। এখনই সরে পড়লে কেমন হয়?

আবার ধরা পড়ে গেলাম সুগত মজুমদারের হাতে। সে একটু দূর থেকে দু'হাত বাড়িয়ে এসে বলল, এই যে দাদা, আসুন, কোথায় বসবেন? ওই বারান্দার কোণটায় চলুন না, ওখানে দারুণ হাওয়া।

এখন সুগতকে আমার তেমন অপছন্দ হল না। আমাদের দু'জনেরই কলম নিয়ে কারবার, এই মিলটা তো আছে, সুতরাং আমরা দু'জনে পাশাপাশি বসতে পারি।

বারান্দার কোণে একটা চেয়ারে আমাকে বসিয়ে সুগত এক দৌড়ে গিয়ে আমার জন্য এক গেলাস হুইস্কি আনতে গেল। আমি চোখ বুলিয়ে দেখলাম, অর্জুন মহাপাত্র কিংবা এখানকার পুলিশের লোকজন কেউই এখনও আসেননি। তবে এক জন ভদ্রলোককে ঘিরে অনেকে খাতির করছে, তাঁর মুখের চাপা অহঙ্কারের ভাব দেখে মনে হয় কোনও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। কে যেন বলছিল, ওড়িশার হোম সেক্রেটারির গোপালপুরে বেড়াতে আসার কথা আছে।

সুগত ফিরে এসে বলল, দাদা, আর একটু বসুন। সিগারেট জোগাড় করে আনি। আমার প্যাকেটটা ভুলে ফেলে এসেছি।

আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, আমার কাছে যথেষ্ট সিগারেট আছে। বোসো। তবে তোমাকে একটা কথা আগেই বলে রাখছি সুগত, তুমি 'জীবন যে-রকম'-এর প্রসঙ্গ আমার কাছে একদম তুলবে না।

সুগত এক গাল হেসে বলল, দুপুরবেলা আপনি অত রেগে গেলেন, বুঝতে পারিনি, আপনি ওই ব্যাপারে এত টাচি। না না, ওই প্রসঙ্গ আর তুলব না। কেয়া চক্রবর্তীর তো অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল, আর এখানে চন্দ্রার কেসটা তো স্পষ্ট মার্ডার।

আমি ভুরু তুলে বললাম, তাই নাকি! স্পষ্ট?

সুগত মুখটা ঝুঁকিয়ে এনে বলল, চন্দ্রা সাঁতার জানত না। কেউ তাকে নৌকোসুদ্ধু জলে ঠেলে দিয়েছে।

নৌকো বাঁধা থাকে বালির অর্ধেকটা ওপরে।

জোয়ারের সময় জল বেড়ে যায়।

তা জানি। কিন্তু সমুদ্র তো হঠাৎ গভীর হয় না। অনেকখানি জায়গা জুড়ে হাঁটুজল, বুকজল থাকে, সাঁতার না জেনেও কেউ নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়ে বেঁচে যেতে পারে।

কেউ যদি আগেই চন্দ্রাকে গলা মুচড়ে মেরে তারপর নৌকো সুদ্ধু ঠেলে দেয়?

সেটা আগে প্রমাণ করতে হবে তো!

পুলিশ অলরেডি প্রুভ করে ফেলেছে।

তাই নাকি?

পল্লব দত্তকে পুলিশ অ্যারেস্ট করে ভুবনেশ্বরে পাঠিয়ে দিয়েছে জানেন না?

ওর নামে চার্জ এনেছে?

ইয়েস। মার্ডার চার্জ। আমি রিলায়েবল সোর্স থেকে জেনে এসেছি।

আমি সুগতর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সাংবাদিকদের অধিকাংশ খবরই বিশ্বাসযোগ্য হয় না। অনেক সাংবাদিক একেবারে স্পটে গিয়ে যে-সব খবর বার করে আনে, সেগুলো আসলে অর্ধেক গুজব। পল্লব খানিকটা ফুর্তিবাজ ধরনের, বেশি মদ খায়, নারীঘটিত দুর্বলতা থাকতে পারে, কিন্তু তাকে খুনি বলে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। মানুষ চিনতে কি আমার এত ভুল হয়?

সঙ্গে সঙ্গে সুনেত্রার রাগী মুখটা মনে পড়ল। সে রবীনবাবু সম্পর্কে এখন কুৎসা ছড়াবে। পল্লব দত্তের তো যা হবার তা হবেই, এখন রবীনবাবুর জীবনেও নেমে আসবে অশান্তি। প্রতিমা কী-ভাবে গ্রহণ করবেন তাঁর স্বামীর নামে ওই অভিযোগ?

আমার মনটা বেশ দমে গেল।

হোটেলের বাইরে ডান পাশটায় কিছু গাছপালার মধ্যে তীব্র আলো জ্বলছে, শোনা যাচ্ছে অনেকগুলি কণ্ঠস্বর। অন্যমনস্ক ভাবে সে-দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওখানে কী হচ্ছে?

সুগত বলল, ওখানে শুটিঙের জন্য সেট পড়েছে। আজ হোল নাইট শুটিং হবে। সন্তোষবাবু তো বললেন, তিন দিনের মধ্যে আউটডোরের কাজ শেষ করে ফেলবেন।

এত তাড়াতাড়ি?

এরপর স্টুডিয়োতে কিছু কাজ আছে। আজ রাত্তিরে আপনি থাকবেন নাকি শুটিঙে?

আমি দু'দিকে মাথা নাড়ালাম।

বাগানের দিক থেকে বারান্দায় উঠে এলেন সন্তোষ মজুমদার। আমাকে এখানে আসার জন্য অত ঝুলোঝুলি করেছিলেন বিকেলবেলা বাড়িতে গিয়ে, এখন আমাকে দেখতেই পেলেন না। চিন্তিত মুখে চলে গেলেন সামনের দিকে। পরিচালকদের অনেক কিছু সামলাতে হয়, তাদের মাথায় সব সময় দুশ্চিন্তার বোঝা।

সুগত বলল, এ ছবি সুপার হিট হবেই।

সে কী! তুমি আগে থেকেই কী করে বুঝলে?

ছবি যতই রদ্দি হোক, কত লাখ টাকার পাবলিসিটি পেয়ে গেল, বুঝছেন না? কলকাতার সমস্ত ডেইলি পেপারে ফার্স্ট পেজ রিপোর্ট বেরিয়েছে। চন্দ্রার লাস্ট ছবি বহু পাবলিক দেখতে আসবে। চন্দ্রা মার্ডারড হয়ে সন্তোষ মজুমদারের কিন্তু উপকারই করে গেল।

অনেক সাংবাদিক এই ধরনের সির্নিক্যাল কথা বলে স্মার্ট হবার চেষ্টা করে। আমি কোনও মন্তব্য করলাম না।

সুগত আবার বলল, বাংলা ফিল্মে নায়িকার খুব অভাব। চন্দ্রার অনেক স্কোপ ছিল। আর দু'এক বছরের মধ্যে ওর হিরোইন হবার খুব চান্স ছিল। চন্দ্রা এ পর্যন্ত ঠিক ভাল রোল পায়নি। বেচারাকে নেগলেকট্ করা হচ্ছিল। কেন জানেন? ফিল্ম লাইনের লোকজনদের সঙ্গে চন্দ্রা যে ঠিক মতো মিশতে পারত না। বেশি লেখাপড়া জানা মেয়ে, সেটাই ওর ডিসকোয়ালিফিকেশান। পল্লব-ফল্লবের মতো বাজে টাইপের লোকরা জ্বালাতন করত ওকে। আমি চন্দ্রার জন্য গৌতম ঘোষকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম, যদি নেকস্ট ছবিতে নেয়।

হোটেলের প্রবেশপথে শোনা গেল অনেকগুলো পায়ের শব্দ। এক সঙ্গে সাত-আট জনের একটি দল ঢুকল। প্রথমে চোখে পড়ে দীর্ঘকায় অর্জুন মহাপাত্রকে। সঙ্গে ইউনিফর্ম পরা আরও দু'জন অফিসার। তাঁদের পাশে রবীনবাবু এবং তাঁর পেছনে পল্লব দত্ত।

হ্যাঁ, কোনও ভুল নেই, পল্লবকে সঙ্গে করে এনেছেন ওঁরা। সুগতর খবর ভুল। এর মধ্যে পল্লবকে ভুবনেশ্বর নিয়ে যাওয়া, আবার সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

পল্লবের হাতে হাতকড়াও নেই, কেউ তাকে ধরেও রাখেনি। বরং তার মুখখানিতে ক্লান্তির ছাপ থাকলেও তাতে খানিকটা খুশির ভাবও ঝিলিক দিচ্ছে।

আমি সুগতকে বললাম, ওই তো পল্লব ফিরে এসেছে।

সুগত চোখ বড় বড় করে, ফিরে এসেছে? বলেই এক লাফ দিয়ে চলে গেল সে-দিকে। কী জানি, আগের খবরটা এর আগেই সে তার পত্রিকায় পাঠিয়ে দিয়েছে কি না!

আমি দূর থেকে দেখতে লাগলাম, অর্জুন মহাপাত্র প্রথমে বড় সরকারি কর্মচারীটির কানের কাছে মুখ নিয়ে কী যেন বললেন, অনেকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ওঁদের। একটু পরে ওঁরা দু'জন শুধু সন্তোষ মজুমদারকে নিয়ে চলে গেলেন আড়ালে।

বোঝাই যাচ্ছে যে ওখানে কোনও জরুরি কথাবার্তা চলছে।

উলটো দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সুনেত্রা। সে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে পল্লবের দিকে। কিন্তু নিজে থেকে এগিয়ে আসছে না। অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পল্লব একবার সুনেত্রার দিকে হাত তুলল।

মিনিট পাঁচেক বাদে রবীনবাবু আমাকে দেখতে পেয়ে আমার পাশে এসে বসলেন। এক জন বেয়ারা ট্রে-তে ড্রিঙ্কস সাজিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, রবীনবাবু এক গেলাস বিয়ার তুলে নিয়ে এক চুমুকেই শেষ করলেন অর্ধেকটা।

তারপর খানিকটা হাঁপ ছেড়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, নতুন ডেভেলপমেন্ট কী হয়েছে, আপনি আন্দাজ করতে পেরেছেন?

আমি দু'দিকে মাথা নেড়ে বললাম, না। পল্লবকে ছেড়ে দিয়েছে দেখছি।

শুধু ছেড়ে দেয়নি। পল্লবের ওপর থেকে সব সন্দেহও চলে গেছে। হি ইজ অ্যাবসলিউটলি অ্যাবাভ বোর্ড।

কী করে সেটা প্রমাণ হল?

চন্দ্রার সঙ্গে পল্লবের দেখা হবার পরেও আর এক জন চন্দ্রাকে জীবিত অবস্থায় দেখেছে।

সত্যি? সেটা এত দিন জানা যায়নি? কে দেখেছে?

রবীনবাবু চেয়ারটা আরও কাছে টেনে এনে বললেন, সেই লোকটিকে আমি খুঁজে বার করেছি। কিন্তু সেই ক্রেডিটটা আমি নিতে চাই না। ওড়িশা পুলিশের ওপর এই কেসের দায়িত্ব, তারাই সল্‌ভ করেছে, এটাই সবাই জানবে। আমি শুধু লোকটাকে নিয়ে অর্জুন মহাপাত্রের সামনে দাঁড় করিয়ে বলেছিলাম, এবার আপনি জেরা করুন, ইট্‌স ইয়োর বেবি।

লোকটি কে?

পল্লবকেই এখানকার পুলিশ মার্ডারার বলে ধরে নিচ্ছে দেখে আমার খটকা লেগেছিল। চন্দ্রার সঙ্গে পল্লবের ঝগড়াঝাটি হলেও ঝট করে সে তাকে খুন করবে কেন? খুনের মোটিভ আরও অনেক গভীর হয় সাধারণত। সেই জন্যই আমার মনে হল সামথিং মাস্ট বি ডান। পল্লব নিজেই স্বীকার করেছে যে, চন্দ্রাকে সে নৌকোর ওপর বসে থাকতে দেখেছিল।

সে নিজে স্বীকার না করলে হয়তো এ-কথাটা কেউ জানতেই পারত না।

মোস্ট প্রোবাবলি তাই হত। ফিল্ম ইউনিটের প্রত্যেককে, বিভিন্ন হোটেলের বোর্ডারদের, আপনাকে এবং আমাকেও পুলিশ এর পর জেরা করেছে যে আর কেউ সেই রাত্রে চন্দ্রাকে দেখেছিল কি না। কেউ দেখেনি কিংবা স্বীকার করেনি, তাই তো?

এ পর্যন্ত তাই ছিল।

আমরা পুলিশরা অত্যন্ত দায়সারা ভাবে কাজ করি। আরও অনেককে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। একটা নৌকোয় চন্দ্রা উধাও হয়েছে, নৌকো নিয়ে যাদের কাজ-কারবার।

নৌকোর মালিক কিছুই জানে না বলেছে। নৌকোটা ভাড়া দেওয়া হত, সেই নৌকোটাও তো এখনও উদ্ধার হয়নি।

পল্লবকে ওরা অ্যারেস্ট করছে দেখে আমার মনে হল, আর একটা খোঁজ করা দরকার। এখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে একটা জেলেদের বস্তি আছে, চলে গেলাম সেখানে।

অত দূরের লোক এখানকার ঘটনা কী করে জানবে? সন্ধের পর জেলেরা তো কেউ এ-দিকে আসে না।

অনেক সময় ইমপ্রোববল জায়গা থেকেও মূল্যবান খবর পাওয়া যায়। আমি জেলেদের বস্তিতে গিয়ে অন্তত পঞ্চাশ-ষাট জনকে ইন্টারোগেট করেছি। নিজের দায়িত্বে। এর মধ্যে এদের ভাষা খানিকটা শিখে নিয়েছি। সেটা কাজে লেগে গেল। ওই জেলেরা তেলেগু আর ওড়িয়া মিশিয়ে একটা বিচিত্র ভাষা বলে। চেষ্টা করলে বোঝা যায়।

সেখানে এক জনকে পেলেন?

জানেন বোধহয় যে, এই জেলেরা খুব ভোরে, সূর্যোদয়ের আগেই সমুদ্রে ভেসে পড়ে। অনেক দূরে চলে যায়। ফেরে সন্ধের সময়। কারুর কারুর ফিরতে রাত হয়ে যায়। আমি ওদের বস্তিতে গিয়ে দেখলাম, অধিকাংশ পুরুষমানুষই জাল আর নৌকো নিয়ে বেরিয়ে গেছে। রয়েছে শুধু মেয়েরা আর বাচ্চারা, আর কিছু বৃদ্ধ। অনেকগুলো বাড়ি ঘোরার পর এক বাড়িতে এক জনকে পাওয়া গেল, সে-ও প্রায় বৃদ্ধই, তবে কাজের ক্ষমতা আছে, এখনও মাছ ধরতে যায়। কিন্তু আজ সে যায়নি, তার খুব জ্বর। তার গায়ে হাত দিয়ে দেখি, অন্তত আড়াই-তিন ডিগ্রি জ্বর হবেই। একেই বলে লাকি ব্রেক। লোকটার যদি আজ জ্বর না হত, তাহলে আমার সব পরিশ্রম ব্যর্থ হত!

আমি আর উৎকণ্ঠা চেপে রাখতে পারছি না। রবীনবাবু সবিস্তারে কাহিনিটি বলতে শুরু করেছেন, আসব কথাটা এখনও জানা যাচ্ছে না। আমি ওঁর হাত চেপে জিজ্ঞেস করলাম, সেই লোকটা কী দেখেছে?

রবীনবাবু আমার চোখে চোখ রেখে বললেন, এই লোকটি সেই রাতে মাছ ধরে একটু দেরি করে ফিরছিল। ওর সঙ্গে আর এক জনও ছিল। দ্বিতীয় লোকটির দেখা আমি পাইনি, সে আজ সমুদ্রে গেছে। এরা ফেরবার সময় দেখেছে, পরিষ্কার চাঁদের আলো ছিল, তটরেখা থেকে বেশ খানিকটা দূরে সমুদ্রে একটা নৌকো ভাসছে, তাতে বসে আছে একটি মেয়ে, সে দাঁড় নিয়ে বাইছে আর গুন গুন করে গান গাইছে। একটু দূরে গেলে আর ঢেউয়ের শব্দ শোনা যায় না, তাই ওরা গানটাও স্পষ্ট শুনেছে।

আমি অবিশ্বাস ও উত্তেজনার সঙ্গে প্রায় চেঁচিয়ে বললাম, ওরা চন্দ্রাকে দেখতে পেয়েছিল? তবু তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেনি কেন?

রবীনবাবু বললেন, সে-চিন্তাও ওদের মাথায় আসেনি। ওদের নৌকোটা চন্দ্রার নৌকোর খুব কাছ দিয়ে এসেছে, ইন ফ্যাক্ট আমি চন্দ্রার একটা ছবি দেখাতে লোকটি মোটামুটি চিনতেও পারল। সে

বলল, সব ভদ্রলোকদের মেয়েদের একই রকম দেখতে লাগে, নৌকোর মেয়েছেলেটির এই রকমই চেহারা। পাশ দিয়ে আসবার সময় চন্দ্রা ওদের কাছে কোনও সাহায্য চায়নি, সুতরাং ওরা আর মাথা ঘামাবে কেন? এ-রকম কেউ কেউ তো নৌকো নিয়ে বেড়াতে যায়!

এ-কথা ওরা এত দিন পুলিশকে জানায়নি কেন?

জানায়নি, তার কারণ ওদের কেউ জিজ্ঞেস করেনি। ওরা আগ বাড়িয়ে বলতে আসবে কেন? ওদের এই দেখার যে কোনও গুরুত্ব আছে, তা-ও ওরা জানে না। তাছাড়া এই সব গরিব লোক এমনিতেই পুলিশকে ভয় পায়, নিজের থেকে পুলিশের কাছে এসে এরা কক্ষনও কিছু বলে না।

চন্দ্রাকে ওরা জীবিত দেখেছে। চন্দ্রার হাতে দাঁড় ছিল, অর্থাৎ চন্দ্রা ইচ্ছে করে নৌকো নিয়ে গেছে!

এগ্‌জাক্টলি! এই বৃদ্ধ জেলেটিই তার অকাট্য প্রমাণ দিয়েছে।

চন্দ্রা সাঁতার জানত না, সে ও-ভাবে ঝুঁকি নিয়ে গেল কেন?

সে খুব রোম্যান্টিক মেয়ে, সাহসও ছিল যথেষ্ট। তাছাড়া খুব রাগ কিংবা অভিমান হলে তার কোনও কাণ্ডজ্ঞান থাকত না। জেদের বশে সে এমন অনেক কিছু করে ফেলতে পারত! গোপালপুরের সমুদ্র এমনিতে ঠাণ্ডা, পুরীর মতো এখানে বড় বড় ঢেউ ওঠে না, ব্রেকার নেই, তাই দেখলে ভয় লাগে না। অনেক দূর পর্যন্ত এমনিতেই যাওয়া যায়। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ স্রোতের টান আসে। এই সমুদ্রে বেশি সাহস দেখাতে গিয়ে এর আগেও দু-চার জন ডুবে গেছে। কোনও কারণে হয়তো চন্দ্রার প্রচণ্ড অভিমান হয়েছিল, তাই সে একা একা —।

আমি চুপ করে মাথা নিচু করে রইলাম। সিগারেটটা বিস্বাদ লাগছে। রবীনবাবু আমার চেয়ে বেশি চিনতেন চন্দ্রাকে, তিনি ওর চরিত্র ভাল বুঝবেন।

আরও একটা চিন্তা আমার মাথায় এসে গেল। রবীনবাবু জেলেদের বস্তিতে গিয়ে অত পরিশ্রম করলেন কেন? নিতান্ত কৌতূহল? পল্লব ধরা পড়ার পরই তিনি বেশি উদ্যমী হয়ে উঠলেন। তাঁর নিজেরও কিছু স্বার্থ ছিল এতে। সুনেত্রা কি রবীনবাবুকেও শাসিয়ে গেছে সামনাসামনি?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার সঙ্গে এর মধ্যে সুনেত্রার দেখা হয়েছিল?

রবীনবাবু বেশ অবাক হয়ে বললেন, সুনেত্রা? না তো! হঠাৎ এ-কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

আমি একটু থতমত খেয়ে গেলাম। এই প্রশ্নটা আমার করা উচিত হয়নি। সামলে নেবার জন্য একটু মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে আমি বললাম, সুনেত্রারও দৃঢ় ধারণা ছিল, চন্দ্রা ইচ্ছে করেই নৌকো নিয়ে ভেসে গেছে। এর আগেও চন্দ্রা এ-রকম হঠকারী কাজ দু-একবার করতে গিয়ে কোনও ক্রমে বেঁচে গেছে। আজ বিকেলেই সুনেত্রা এই কথা বলে গেছে আমাকে।

রবীনবাবু বললেন, না, সুনেত্রার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। এটা আমারই নিজস্ব হান্‌চ কিংবা ইনটিউশন বলতে পারেন। আজ দুপুরেই হঠাৎ আমার ধারণা হল, জেলেদের বস্তিতে গেলে একটা কিছু পাবই!

লোকটি কোনও কারণে মিথ্যে বলছে না?

শুধু শুধু মিথ্যে কথা বলবে কেন? এরা এমনিতেই মিথ্যে খুব কম বলে, কিছু একটা বানিয়ে গল্প বলার ক্ষমতাই নেই। মাছ ধরা আর দু'বেলা পেট ভরে খাওয়া ছাড়া আর কোনও চিন্তাই এদের মাথায় আসে না। এই বুড়োটির নাম ধরণীধর, খুবই নিরীহ ধরনের মানুষ। থানায় গিয়ে অর্জুন মহাপাত্রদের সামনে সে একই কথা বলেছে। এর সঙ্গে যে, লোকটি ছিল, সে ফিরে আসবার পর আলাদা ভাবে তাকে জিজ্ঞেস করেও ঠিক এক ঘটনা পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে আর কোনও সন্দেহের অবকাশই নেই।

দূরে দেখা গেল অর্জুন মহাপাত্র, সন্তোষ মজুমদার ও অন্য ব্যক্তিটি কী সব পরামর্শ করে ফিরে এলেন। সন্তোষ মজুমদারের মুখে বেশ একটা উৎফুল্ল ভাব।

অর্জুন মহাপাত্র একটা উঁচু জায়গায় উঠে দাঁড়ালেন খুব স্মার্ট ভঙ্গিতে। তারপর হাততালি দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, সাইলেন্স! সাইলেন্স!

সব গুঞ্জন থেমে গেল, সকলে ফিরে তাকাল সেই সুঠাম, সুপ্রতিভ পুলিশ অফিসারটির দিকে।

অর্জুন মহাপাত্র বললেন, প্লিজ গিভ মি পেশেন্ট হিয়ারিং ফর আ ফিউ মিনিটস। লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলমেন, ইউ হ্যাভ অ্যান ইমপর্টান্ট অ্যানাউন্সমেন্ট টু মেক...।

॥ এগারো ॥

অনেক দিন আগে আমি একটা ফাঁকা বাড়িতে রাত কাটিয়েছিলাম। তখন আমার ছাত্রজীবন চলছে। সব কিছুই যুক্তি দিয়ে বিচার করি। রাজনীতি থেকে প্রেম-ভালবাসা, সব কিছুর মধ্যেই যুক্তি খুঁজি। যাবতীয় সংস্কারকে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিই।

বাড়ির সবাই দেওঘর বেড়াতে গিয়েছিলেন, আমি একা ছিলাম বাড়ি পাহারা দেবার জন্য। সামনেই আমার পরীক্ষা ছিল।

আমার নিজস্ব ঘরটি ছিল এক তলায়, রাস্তার পাশে। চোর-ডাকাত সম্পর্কে আমার মনে একটু একটু ভয়ের ভাব ছিল, ভূত-টুতের ভয় কখনও পাইনি। বিছানার পাশে একটা ভোজালি রাখতাম তখন।

এক দিন অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশুনো করে ঘুমিয়ে পড়েছি, হঠাৎ একটা শব্দ পেয়ে ঘুম ভেঙে গেল। তখন কত রাত তা জানি না, ঘর অন্ধকার, আমার ডান পাশের জানলার একটা পাল্লা খোলা, একটা পাল্লা ভ্যাজানো। সেখান থেকে শব্দ হচ্ছে, ঠক ঠক ঠক। কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে ঠিক তিনবার ওই রকম শব্দ।

ঝিম ঝিম করছে রাত, রাস্তায় আর কোনও শব্দ নেই, তখন যে-কোনও শব্দই বেশ জোর মনে হয়। তবে হাওয়ার শব্দ নয়, কেউ ওই শব্দটা করছে বিশেষ কারণে।

প্রথমেই মনে হল, চোর!

কিন্তু চোর এমন শব্দ করে আমাকে জাগাবার চেষ্টা করবে কেন? কিংবা সে দেখতে চাইছে, আমি জেগে আছি কি না!

ছিঁচকে চোর হলে ধমক দিয়ে ভাগিয়ে দেওয়াই উচিত। একটুক্ষণ অপেক্ষা করে আমি তীব্র গলায় বললাম, কে? কে ওখানে?

শব্দটা কিন্তু থামল না। কেউ সাড়া দিল না। আবার স্পষ্ট শোনা গেল, ঠক ঠক ঠক। ঠক ঠক ঠক!

জানলার খোলা পাল্লাটা দিয়ে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ আমার সারা গায়ে শিহরণ হল। কীসের এই ডাক?

আমি নিজের চক্ষু রগড়ে ভাল করে ঘুমকে তাড়ালাম ও ভয় ভাঙালাম। আমি আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না। ভূত-প্রেত নিয়ে চমৎকার গল্প হয়, কিন্তু বাস্তবে ও-সব কিছু নেই। মৃত্যুর পর মানুষ আবার শরীর ধারণ করে আঙুল ঠোকার মতো ঠক ঠক শব্দ করতে পারে না। অসম্ভব!

উঠে গিয়ে তক্ষুনি জানলার ধারে গিয়ে দেখার বদলে আমি শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে লাগলাম, শব্দটা কীসের হতে পারে? আমার যুক্তিবাদী মন কিছুতেই হেরে যেতে রাজি নয়।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ল, টিকটিকি!

এবার উঠে গিয়ে বন্ধ পাল্লাটা খুলে ফেললাম এক টানে। যা ভেবেছি, ঠিক তাই। একটা বেশ গাবদা গোছের টিকটিকি একটা বড়সড় মথ কামড়ে ধরেছে। মথটা তখনও মরেনি, ডানা ঝাপটাচ্ছে। টিকটিকিটা মাথা ঠুকে ঠুকে মথটাকে মারবার চেষ্টা করছে। তাতেই অবিকল আঙুল ঠোকার শব্দ।

সে-রাতে আমি অদ্ভুত একটা আনন্দ পেয়েছিলাম। কত লোক রাত্তিরবেলা কলাগাছ কিংবা বেলগাছ দেখে ভয় পায়। কত লোক নিশুতি রাতে অলৌকিক পায়ের শব্দ শোনে। আসলে এ-সবই সামান্য ব্যাপার। একটু চিন্তা করলেই সহজ সমাধান পাওয়া যায়।

কিন্তু এক-এক সময় যুক্তিবোধ আমাকে ছেড়ে যায়। যুক্তি প্রয়োগ করার আগেই চোখ এবং কানকে চমকপ্রদ ভাবে বিশ্বাস করে বসি। হয়তো কোনও কোনও জায়গায়, যুক্তির বদলে বিশ্বাস করে নেবার জন্য মনটা আগে থেকেই তৈরি হয়ে থাকে।

ঠিক সেই রকমই একটা ঘটনা আচমকা ঘটে গেল এই পাম বিচ হোটেলে, এত লোকজনের মাঝখানে। আমার বুক কাঁপিয়ে দিল শুধু না, আমার কণ্ঠরোধ হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

অর্জুন মহাপাত্রের ঘোষণার পর উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে বেশ একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

চন্দ্রার মৃত্যু এখন পুরনো হয়ে গেছে। তার জন্য শোক করার অবকাশ এখানে কারুর নেই। চন্দ্রার বাবা ও বোনের কথা অবশ্য আলাদা, কিন্তু তারা এখানে আসেননি। অন্য সবাই একটা চাপা আশঙ্কা ও অস্বস্তিতে ভুগছিল। পল্লবকে অ্যারেস্ট করেছিল পুলিশ, সেই সূত্র ধরে আরও কাকে কাকে হয়রানি করবে তার ঠিক নেই। সকলের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে শুটিঙের ক্ষতি করা হচ্ছিল। এই সব কিছুর জন্যই দায়ী চন্দ্রা। চন্দ্রার বাবাও পুলিশের কাছে নানা অভিযোগ করেছিলেন ফিল্ম ইউনিটের নামে। মামলা করার ভয় দেখিয়েছেন।

এখন সব কিছু চুকে বুকে গেছে। চন্দ্রা নিজেই বোকার মতো একা একা সমুদ্রে নৌকো বাইতে গিয়েছিল। তার ফলে সে ডুবে মরেছে। এতে অন্য কারুর দায়িত্ব নেই। সবাই এখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। এই ক'দিন একটা থমথমে আবহাওয়া ছিল, এখন এখানে বইছে মুক্তির হাওয়া। বেশ কোলাহলের মধ্যে পানাহার চলছে।

এরই মধ্যে আরও একটা খবর পাওয়া গেল যে, ডুবুরিরা উদ্ধার করেছে নৌকোটা। সেটা একটা ডুবো পাথরের খাঁজে আটকে ছিল। চন্দ্রার বডি অবশ্য পাওয়া যায়নি, তবে ডুবুরিরা আশা রাখে, তারা কালকের মধ্যে পেয়ে যাবে ঠিক।

আমি অবশ্য মনে মনে চাইছিলাম, চন্দ্রার শরীরটা যেন পাওয়া না যায়। তার পচা-গলা-বীভৎস দেহটা দেখে আর কী লাভ হবে? বরং তা হাঙর ও মাছেদের খাদ্য হোক।

সারা দুপুর-বিকেল রবীনবাবু অনেক পরিশ্রম করেছেন বলে বেশ খানিকটা বিয়ার পান করে ফেললেন। তাঁর মুখটা লালচে হয়ে গেছে। তিনি অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার, কিছু দিন আগেও এক জেলার এস পি ছিলেন, এখন স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডি আই জি, অপরাধ ও খুন-জখম সম্পর্কে তাঁর যথেষ্টই অভিজ্ঞতা থাকার কথা। তবু তিনি চন্দ্রার মতো এক জন অল্পখ্যাত অভিনেত্রীর ব্যাপার নিয়ে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন মনে হচ্ছে।

সুগত এসে আবার যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে। সে নানা রকম বক বক করে যাচ্ছে, সব সময়ই একটা না-একটা কিছু পিলে চমকানো খবর তার বানানো চাই-ই। যেমন এইমাত্র সে জানাল যে,

সন্তোষ মজুমদারের এই ফিল্মটির গল্প আলফ্রেড হিচককের একটা সিনেমা থেকে হুবহু টোকা। চন্দ্রা যে-ভূমিকাটা করছিল, সেটা অরিজিন্যাল ছবিতে ছিল অড্রি হেপবার্নের।

রবীনবাবু আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। হলিউডের সব ছবিই তাঁর নখদর্পণে। অড্রি হেপবার্ন যে হিচককের কোনও ছবিতেই অভিনয় করেনি, সেটা রবীনবাবুর চোখ দেখেই বোঝা গেল।

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এবার আমি বাড়ি যাই। প্রতিমাকে কিছু বলে আসিনি। লেটেস্ট ডেভেলাপমেন্ট শুনলে সে চমকে যাবে, খুশিই হবে।

খুশি শব্দটা আমার কানে লাগল। এখানে এই শব্দটা কি মানায়?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন, খুশি হবেন কেন!

রবীনবাবু বুদ্ধিমান ব্যক্তি। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরে বললেন, না, মানে চন্দ্রার এ-রকম পরিণতি খুবই স্যাড। তবে মিস্ট্রিটা সলভ্‌ড হয়ে গেল, এটা সকলের পক্ষেই একটা গ্রেট রিলিফ, তাই না?

সুগত বলল, সব কিছুই সলভ্‌ড হয়ে গেছে, কী করে বললেন? চন্দ্রা যদি সুইসাইড করেও থাকে, তাহলেও সুইসাইডে ইনস্টিগেট করাও একটা ক্রাইম। কেউ যদি চন্দ্রার মনে খুব জোর আঘাত দিয়ে থাকে, তার ফলে যদি চন্দ্রা আত্মহত্যা করতে চায়, তাহলে যে আঘাত দিয়েছে, সে দায়ী হবে না? তরুণী বধূরা নিজেরাই গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগালে শাশুড়ি আর দেওরকে ধরা হয় কেন?

রবীনবাবু বললেন, এখন আর এ-সব কথা শুনতে ভাল লাগছে না। আমি এবার যাই।

আমিও রবীনবাবুর সঙ্গে উঠে পড়তে চেয়েছিলাম, কিন্তু সুগত আমার হাত চেপে ধরল জোর করে। ঈষৎ নেশাগ্রস্ত গলায় বলল, আপনার জন্য তো এখানে বাড়িতে আপনার বউ অপেক্ষা করে বসে নেই, আপনার এত তাড়া কীসের?

মাতালদের সঙ্গে জোরাজুরি করা মুশকিল, আমাকে আর একটু বসতেই হল।

এরপর সুগত একে একে পাঁচ জনের নামে ছড়াতে লাগল সন্দেহের বীজ। তারা প্রত্যেকেই চন্দ্রার মৃত্যুর জন্য অভিযুক্ত হতে পারে, তারা প্রত্যেকেই কোনও না-কোনও সময়ে চন্দ্রাব সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে। এই ছবির অন্যতম প্রোডিউসার নাকি সরাসরি বলে দিয়েছিল, চন্দ্রা একবার অন্তত তার শয্যাসঙ্গিনী না হলে চন্দ্রার বড় রোল পাবার কোনও আশা নেই। সন্তোষ মজুমদারও চন্দ্রাকে বলেছিল, তুই একবার মাত্র প্রোডিউসারের ভাগ্নের সঙ্গে শুবি, তাতে এত আপত্তি কীসের? এতে কি তোর শবীরে কোনও দাগ পড়বে?

সিনেমার কাগজে অভিনেত্রীদের নিয়ে এ-রকম গালগল্প প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই থাকে। আমি মন দিয়ে সুগতর কথা শুনছিলামই না। তাকিয়ে ছিলাম সমুদ্রের দিকে।

সুগত নিজের বুক চাপড়ে বলল, চন্দ্রাকে সব সময় কে বাঁচাত জানেন? এই আমি! এই শালা সুগত মজুমদার। চন্দ্রা আমাকে খুব বিশ্বাস করত। যে-কোনও বিপদ-আপদে ছুটে আসত আমার কাছে, তা জানেন? এবারই আমার পৌঁছোতে দেরি হয়ে গেল...।

মাতালদের নিয়ে এই এক মুশকিল, যত নেশা বাড়ে, ততই তারা আমি আমি শুরু করে। পৃথিবীর সব কিছুই যেন সেই আমিকে কেন্দ্র করে ঘোরে!

আমি বাথরুমে যাবার নাম করে উঠে পড়ার চিন্তা করছি, এমন সময় সেই কাণ্ডটি ঘটল।

বারান্দার শেষ প্রান্তে একটা খালি চেয়ার পড়ে ছিল। অনেকক্ষণ থেকেই সেটা খালি দেখছি। হঠাৎ চোখের একটি পলক ফেলতেই দেখলাম, সেখানে একটি নারীমূর্তি বসে আছে। এক মুহূর্ত আগেও চেয়ারটা খালি ছিল, কী করে সেখানে এক জন এসে বসে পড়ল?

চন্দ্রা! এবার আমি তার মুখও দেখতে পাচ্ছি। সেই চেহারা, সেই চোখ। না, কোনও ভুল নেই।

আমার শরীর অসাড় হয়ে গেল, আমার গলার কাছে যেন দম আটকে এল। চন্দ্রা যদি রক্তমাংসের শরীর নিয়ে ফিরে আসে, তাহলে আমার আনন্দে চিৎকার করে ওঠার কথা। কিন্তু আমার কণ্ঠ দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না!

আমার যুক্তিবোধ নিঃস্ব হয়ে গেছে। আমি নিজের চোখে চন্দ্রাকে দেখছি, ভয় পাচ্ছি, অথচ পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না।

সুগত অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে, সে লক্ষ্য করছে না কিছুই। আমি স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছি চন্দ্রার দিকে। তার সমস্ত চুল খোলা, আগে সব সময় এ-রকম খোলা চুলেই তাকে দেখেছি, তার গাঢ় নীল রঙের শাড়িটাও যেন আমার চেনা।

এক সময় আমি অতি কষ্টে সুগতকে একটা ঠ্যালা মেরে ফ্যাসফেসে গলায় বললাম, সুগত, ও কে?

সুগত অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, কার কথা বলছেন?

এবার আমার সর্বাঙ্গে ঝাঁকুনি লাগল। শুধু আমিই একা দেখব, আর কেউ দেখতে পাবে না?

আমি বলালম, ওই যে, চেয়ারে বসে আছে, দেখো, দেখো।

সুগত এবার বারান্দার প্রান্ত দেখে হেসে উঠে বলল, ওকে চেনেন না? ও তো বিশাখা! আপনার সঙ্গে আলাপ নেই?

আমি নিজে স্পষ্ট দেখছি চন্দ্রাকে, আর সুগত বলছে ওর নাম বিশাখা! এ আবার কী-রকম ধাঁধা? আমার চোখে কি এত ভুল হতে পারে?

সুগত চেঁচিয়ে ডাকল, এই বিশাখা, বিশাখা, একবার এ-দিকে এসো তো।

মেয়েটি ডাক শুনে মুখ ফেরাল, উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে এল আমাদের দিকে। তখনও আমি চন্দ্রাকেই দেখছি। আমার বুক ধড়াস ধড়াস করছে! আশেপাশের সব কিছুই যেন অলীক। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

মেয়েটি কাছে আসবার পর সুগত একটা চেয়ার টেনে বলল, বোসো। বিশাখা তুমি সুনীলদাকে চেনো না?

মেয়েটি পাতলা করে হেসে বলল, হ্যাঁ, খুব ভালই চিনি।

আমার সঙ্গে প্রথম আলাপের সময় চন্দ্রা ঠিক এই কথাই বলেছিল।

সুগত আবার বলল, সুনীলদা, বিশাখাকে কলকাতা থেকে আনানো হয়েছে। ও চন্দ্রার ভূমিকায় বাকি অংশটার শুটিং চালিয়ে দেবে। বিশাখা খুব ভাল অ্যাকট্রেস! তবে বড্ড মুডি। এক-এক সময় আমাদের চিনতেই পারে না। এই বিশাখা, তুমি এরই মধ্যে মেক আপ নিয়ে বসে আছ, এক্ষুনি শুটিং শুরু হবে নাকি?

মেয়েটি বলল, একটু বাদেই। আমাকে দিয়েই প্রথম শট নেবে।

তক্ষুনি সব কিছু জলের মতো সরল হয়ে গেল। চন্দ্রার বদলে তার অসমাপ্ত ভূমিকাটুকু চালিয়ে দেবার জন্য বেছে বেছে অন্য একটি অভিনেত্রীকে নিয়ে আসা হয়েছে। মোটামুটি চন্দ্রার সঙ্গে চেহারার মিল আছে, শরীরের গড়ন, মুখের ভাব অনেকটা এক রকম। সিনেমায় এ-রকম ডাবলের ব্যবহার তো প্রায়ই হয়। ভাল করে মেক আপ দিলে ধরতে পারা শক্ত।

এ-ও সেই টিকটিকির ব্যাপার। কিন্তু আমি আগেই বুঝতে পারিনি কেন? আমার মন প্রস্তুত ছিল না। এমনি এক মুহূর্তের মধ্যে চেয়ারে এসে ওর বসাটাও আমার মনে হয়েছিল অস্বাভাবিক, অলৌকিক! খালি চেয়ারে হঠাৎ একটি মেয়ে এসে বসতে পারে না?

জ্বর ছেড়ে যাবার মতো আমার শরীরে ঘাম ফুটে উঠছে বিন্দু বিন্দু। এই মেয়েটিকেই আমি বৃষ্টির মধ্যে লাল ছাত' মাথায় হেঁটে যেতে দেখেছিলাম। একেই দেখেছিলাম, সন্ধের আবছা আলোয় একটা নৌকোর ওপর বসে থাকতে।

চন্দ্রা একটা নৌকো নিয়ে হারিয়ে গেছে, তা কি বিশাখা জানে না? তবু সে সন্ধেবেলা একা একটা নৌকোয় বসে ছিল কেন? বেশি বেশি সাহস দেখাতে?

মুখখানা পেইন্ট করা, ভুরু দু'টি গভীর ভাবে আঁকা, গালে লালচে আভা, বিশাখা আমার দিকে চেয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। আমি অস্বস্তি কাটাতে পারছি না। নিজের কাছেই নিজের পরাজয়ে খুব ক্লান্তি বোধ হচ্ছে।

বিশাখা জিজ্ঞেস করল, এই গল্পটা বুঝি আপনার লেখা? জানতাম না তো!

আমি আস্তে আস্তে বললাম, না, আমার লেখা নয়।

সুগত বলল, অরিজিন্যাল গল্পটা কার লেখা, ভগবান জানেন! বাংলা স্টোরিটা হিচককের ফিল্ম দেখে মেরে তিন জনে বানিয়েছে। নাম থাকবে সন্তোষ মজুমদারের। আজকাল পরিচালকরা একই সঙ্গে কাহিনি, চিত্রনাট্য, সঙ্গীত, রূপসজ্জা, পাবলিসিটি, সব কিছুর ক্রেডিট নেয়। সব্বাই সত্যজিৎ রায়ের এঁটো কলাপাতা! হে-হে-হে-হে!

বিশাখা বলল, ডায়ালগগুলো কে লিখেছে? আমারটা একটু বদলানো দরকার। আমি ঠিক মুড আনতে পারছি না। আচ্ছা সুনীলদা, আমার একটা ডায়ালগ শুনবেন? 'দুঃখী মানুষদের সব সময় দুর্বল ভেবো না। দুঃখীদের অভিমান তোমাব মতো অত্যাচারীদের এক সময় পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে!' এখানে অভিমান কথাটা কি ঠিক খাটে? ক্রোধ হওয়া উচিত না? আর যদি অভিমান রাখতেই হয়, তাহলে পুড়িয়ে ছারখারের বদলে বন্যার মতো ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে বললে ভাল শোনায় না?

একটু আগেই আমার একটা বিরাট ভুল ভেঙেছে, আমি এখন স্বাভাবিক হতে পারিনি, এই সব ব্যাপারে মতামত দেবার ইচ্ছেও হল না আমার। শুকনো গলায় বললাম, আগেরটাও চলে যেতে পারে!

বিশাখা তবু ছেলেমানুষি সুরে বলল, না, আপনি ঠিক করে বলুন, অভিমান, না ক্রোধ, কোনটা এখানে ঠিক হবে?

তুমি আমাকে চিনলে কী করে, বিশাখা?

বাঃ, আপনাকে দেখেছি তো কতবার! কবি সম্মেলনে আপনার কবিতা পাঠ শুনেছি। আমিও অনেক জায়গায় কবিতা আবৃত্তি করি। এক দিন শিশির মঞ্চের একটা অনুষ্ঠানে আপনার সঙ্গে আমারও ছিল। কিন্তু আপনি গোড়ার দিকে নিজেরটা পাঠ করেই চলে গেলেন, আমাদেরগুলো শুনলেন না। সে-দিন আমার খুব রাগ হয়েছিল!

সুগত বলল, অভিমান না রাগ?

বিশাখা বলল, সুনীলদার সঙ্গে কি আমার পরিচয় ছিল যে অভিমান হবে? যখন তখন মানুষের রাগই হয়। অভিমান অনেক গভীর।

সুগত বলল, মেয়েদের কোনটা রাগ আর কোনটা অভিমান বোঝা মুশকিল। আমার ওপর যেন কক্ষন অভিমান কোরো না! তোমার নাম সন্তোষবাবুর কাছে কে সাজেস্ট করেছে জানো? এই আমি! চন্দ্রার বদলে ওরা কাকে নেবে, কাকে নেবে ভাবছিল, আমি সন্তোষবাবুকে বললাম, বিশাখাকে নিন। খুব ট্যালেন্টেড অ্যাকট্রেস, গলাখানা ভাল, মেকআপ দিলে চেহারাটাও উতরে যাবে।

বিশাখা বলল, এই, উতরে যাবে মানে?

সুগত বলল, আই মিন, চন্দ্রার সঙ্গে অনেকটা মিলে যাবে। আমার কথা শুনেই তো ওরা ডিসিশান নিল। এরা আমার মতামতের মূল্য দেয়, বুঝলে?

সুগত আবার আমি, আমি শুরু করেছে। এবার উঠতেই হয়।

বিশাখার দিকে তাকিয়ে বললাম, এক দিন তোমার আবৃত্তি নিশ্চয়ই শুনব। আজ চলি।

বিশাখা দারুণ অবাক হবার ভঙ্গি করে বলল, চলে যাচ্ছেন? শুটিং দেখবেন না?

হেসে বললাম, না, শুটিং দেখা আর হবে না। আমার একটা অন্য কাজ আছে।

বিশাখা অনুনয়ের সুরে বলল, একটুক্ষণ থাকুন, প্লিজ একটু দেখে যান।

সুগত ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, জোর করে ধরে রাখো। কিস্যু কাজ নেই, সুনীলদা কেটে পড়ার তালে আছে। এখন গিয়ে রবীনবাবুর সঙ্গে আড্ডা মারবে।

বিশাখা সচকিত ভাবে জিজ্ঞেস করল, রবীনবাবু মানে যিনি একটু আগে এখানে বসেছিলেন? পুলিশের ডি আই জি?

তুমি তাকেও চেনো নাকি?

খানিকটা রহস্যের ভঙ্গিতে ঠোঁট মুচড়ে হেসে বিশাখা বলল, হ্যাঁ, ভালই চিনি। উনি অবশ্য এখানে আমাকে একবার দেখেও না চেনার ভান কবলেন।

রবীনবাবু পুলিশ অফিসার হলেও ফিল্ম সম্পর্কে খুব উৎসাহী। বাংলা ফিল্মের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তিনি চন্দ্রা আর বিশাখাকে আগে থেকেই চেনেন।

আমার দিকে ঘুরে বিশাখা বলল, আপনি কিন্তু আজ পালাতে পারবেন না, একটুখানি থাকতেই হবে।

কিছুতেই এড়ানো গেল না, আমাকে বসে যেতেই হল।

অর্জুন মহাপাত্র সদলবলে চলে গেলেন একটু আগেই। অন্যান্য অতিথিরাও বিদায় নিচ্ছেন। সন্তোষ মজুমদার আমাদের সঙ্গে এসে বসলেন একটু। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, আজ থেকে আবার নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারব। ওয়েদারটাও কী-রকম ফাইন হয়ে গেছে দেখুন। আজ বোধহয় বৃষ্টি হবে না।

একটু বাদে এক জন এসে খবর দিল, লাইটিং রেডি। এখুনি শুটিং শুরু হবে।

রাত প্রায় সাড়ে ন'টা। এখনও শুটিং দেখার জন্য বেশ কিছু মানুষ ভিড় করেছে। তাদের সরিয়ে রাখা হয়েছে একটা দড়ির রেখার বাইরে। আমাকে একটা চেয়ার পেতে দেওয়া হল তার উলটো দিকে।

বিশাখাকে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে একটা গাছের সঙ্গে। শুধু শায়া আর ব্লাউজ পরা। শাড়িটা খসে পড়ে আছে পায়ের কাছে। শুধু শায়া-ব্লাউজ পরা অনেক মেয়েকেই দেখা যায় ফিল্মে, কিন্তু শাড়িটা খুলে পায়ের কাছে রেখে দেওয়ায় একটা অতিরিক্ত সাজেশান এসেছে। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ভিলেন,

হাতে তার একটা চাবুক। তাকে বড্ড বেশি ভিলেন দেখাতে। মনে হয় গত শতাব্দীর কোনও ডাকাতের সর্দার। বিশাখা হচ্ছে নায়িকার বোন, ভিলেন তাকে ধরে এনে নায়ককে ব্ল্যাকমেইল করবে। এই দৃশ্যেই কোনও এক সময় বীরের মতো উপস্থিত হবে নায়ক। তারপর ফাইটিং সিন।

যদি আলফ্রেড হিচককের কোনও ছবি থেকে গল্পটা মারা হয়েও থাকে, তবু যারা বাংলায় তার রূপান্তর ঘটিয়েছে, তাদের উর্বর মস্তিষ্কের প্রশংসা করতেই হয়। এ-রকম একটা রগরগে দৃশ্য কল্পনা করা হিচককের অসাধ্য ছিল!

চন্দ্রার এটাই ছিল টপ সিন, সে আর সুযোগ পেল না।

চন্দ্রার মতোই বিশাখাও পড়াশুনো করা মেয়ে মনে হল। সাহিত্যরুচি আছে। সংলাপের ভুল শব্দ ব্যবহার নিয়ে সে খুঁত খুঁত করে। অথচ এই সব মেয়েরই কী সব বিশ্রী, কুরুচিপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়!

সন্তোষ মজুমদার মাথায় একটা সাদা রঙের টুপি পরেছেন। এটা বিদেশি পরিচালকদের অনুকরণ। তিনি ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছেন চারদিকে। দু-তিনবার ক্যামেরায় লুক থ্রু করলেন। এক জনকে ডেকে বলে দিলেন বিশাখার মেক আপটা সামান্য বদলে দিতে। খোলা চুল পিঠ থেকে সরিয়ে আনা হল বুকের ওপর।

এদের কৃতিত্ব আছে, বিশাখাকে এখন অবিকল চন্দ্রার মতো দেখাচ্ছে।

এক সময় সন্তোষ মজুমদার একটা সাদা রঙের চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়ালেন। নাটকীয় ভঙ্গিতে ডান হাত উঁচু করে চিৎকার করে বললেন, টেকিং! সাইলেন্স! সাইলেন্স! স্টার্ট সাউন্ড!

উত্তর এল, রানিং!

সন্তোষ মজুমদার আবার সজোরে বললেন, ক্যামেরা!

এক জন ক্ল্যাপস্টিক দিয়ে বলে গেল, সিন ফর্টি নাইন, টেক ওয়ান!

ক্যামেরা প্যান করে এসে ফোকাস করল বিশাখার মুখের ওপর। বিশাখা ক্লান্ত চোখ মেলে আস্তে আস্তে তাকাল সামনে। তারপর মুহূর্তের পর মুহূর্ত চুপ। সন্তোষ মজুমদার ঠোঁট নাড়ছেন, অর্থাৎ তিনি ডায়ালগ শুরু করতে বলছেন।

বিশাখা কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে লাগল, আমি তোমাদের চিনেছি। আমি তোমাদের সবাইকে চিনেছি। আমার দরজা বন্ধ ছিল —।

সন্তোষ মজুমদার প্রায় আর্তনাদের মতো বলে উঠলেন, কাট! কাট!

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল ক্যামেরা। সন্তোষ মজুমদার চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে নেমে এসে বললেন, কী হল? এটা কোন সিনের ডায়ালগ? এখানে তো এই ডায়ালগ ছিল না।

এক জন সহকারী পরিচালক চিত্রনাট্যের ফাইল নিয়ে ছুটে এল। ফর ফর করে পাতা উলটে সে বলল, এ ডায়ালগ অনেক আগের সিনের, চন্দ্রাই করে গেছে। বিশাখাকে আমি এই সিনের ডায়ালগ দিয়েছি, কতক্ষণ ধরে মুখস্থ করলাম।

বিশাখা শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

সন্তোষ মজুমদার তাকে এক ধমক দিতেই সে বলল, ভুল বলেছি?

সহকারী পরিচালকটি বলল, ভুল মানে? একেবারে উলটো-পালটা ডাবিঙের সময় লিপ মিলবে না!

বিশাখা এবার লজ্জায় জিভ কেটে বলল, ও মা, কী করে ভুল হল? আমার কক্ষনও মুখস্থ ভুল হয় না।

চিত্রনাট্য দেখে আবার সংলাপ ঝালিয়ে নিল বিশাখা।

সবাই ফিরে গেল যে যার জায়গায়। ভিলেন একবার শপাং করল চাবুকটা। সন্তোষ মজুমদার আবার চেয়ারে উঠে হাত তুলে বললেন, সবাই রেডি? টেক নাম্বার টু। স্টার্ট সাউন্ড!

ক্যামেরা ঘুরে এসে বিশাখার মুখের সামনে স্থির হয়েছে, বিশাখা ভিলেনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল। তারপর বলল, আমি...আমি...আমি...আমি...আমি...

রীতিমতো তোতলাচ্ছে বিশাখা, আমি শব্দটা ছাড়া আর কিছুই বলতে পারছে না। সন্তোষ মজুমদারের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। শুধু শুধু ফিল্মের ফুটেজ খেয়ে যাচ্ছে। তিনি এক সময় গর্জন করে উঠলেন, কাট! কাট!

এবার তিনি চেয়ার ছেড়ে বিশাখার থুতনিতে একটা খোঁচা মেরে বললেন, এটা কি ইয়ার্কি হচ্ছে? ভ্যালুয়েবল টাইম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

বিশাখা তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

সহকারী পরিচালক আবার ছুটে এসে বলল, আমি কোথায় পেলে? আরম্ভটাই ভুল করলে। আরম্ভটা হবে, দুঃখী মানুষদের দুর্বল মনে কোরো না...।

বিশাখা বলল, কী যে হল, কিছুই বুঝতে পারছি না। কিছুতেই মনে আসছে না।

সন্তোষ মজুমদার রাগে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলেন।

আমি ভেবেছিলাম, বিশাখা হয়তো সংলাপ একটু আধটু বদলে দেবে, অভিমানের জায়গায় ক্রোধ চালিয়ে দেবে। কিন্তু সে কোনও কথাই বলতে পারছে না, এটি সত্যি আশ্চর্য ব্যাপার। খুব নভিস অভিনেত্রীরাও এ-রকম করে না। বিশাখাকে তো বেশ সপ্রতিভই মনে হয়েছিল।

বিশাখা সলজ্জ ভাবে একবার আমার দিকে তাকাল।

সন্তোষ মজুমদার আর একটা চেয়ার টেনে আমার পাশে এসে বললেন, নিন, একটা সিগারেট খান। আপনি এই প্রথম শুটিং দেখতে এলেন, অথচ কী-রকম ধ্যাড়াচ্ছে বলুন তো। এটা একটা ভাইটাল সিন!

পাশ থেকে এক জন হোমরা-চোমরা ধরনের লোক ফিস ফিস করে বললেন, মেয়েটার ডায়লগ অফ করে দিন না!

সন্তোষ মজুমদার বললেন, দাঁড়ান না, আর একটু দেখতে দিন না। শুধু একতরফা ভিলেন কথা বলে গেলে আর চাবুক হাঁকড়ালে জমে কখনও? মেয়েদের গলার আওয়াজেই একটা অন্য রকম আপিল থাকে।

হোমরা-চোমরা ব্যক্তিটি ঠোঁট ওলটালেন। তারপর বিড় বিড় করে বললেন, আর তিন দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে। একেই তো উটকো ঝঞ্ঝাটে অনেকটা সময় চলে গেল।

সন্তোষ মজুমদার আর কিছু না বলে সিগারেট টানতে লাগলেন।

সহকারী পরিচালকটি পাখি পড়াবার মতো করে বিশাখাকে সংলাপ মুখস্থ করাচ্ছে। বিশাখা খুব মনসংযোগ করে, চোখ বুজে দু'বার করে উচ্চারণ করছে প্রতিটি বাক্য। দূরের দর্শকরা অধীর হয়ে উঠেছে খানিকটা। শুটিং একেবারে জমলোই না এখনও পর্যন্ত। ভিলেনের তর্জন-গর্জন দেখলে তারা মজা পেত খানিকটা। কিন্তু সে বেচারা শুধু একটু চাবুক নাড়ানো ছাড়া আর কোনও সুযোগই পায়নি।

অবশ্য অধিকাংশ শুটিংই এ-রকম। একই শট দু-তিনবার এন জি হয়, বার বার একই জিনিস দেখতে হয়। তবে, এ-রকম পার্ট ভুলে যাওয়া সত্যিই অভিনব।

এখনও আকাশে বেশ জ্যোৎস্না আছে. ছেঁড়া ছেঁড়া ভুলেন্ট মেঘ আনাগোনা করছে চাঁদের ওপর দিয়ে।

সন্তোষ মজুমদার খানিকটা ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, সিনটা ডিফিকাল্ট, তা ঠিকই। মেয়ে চরিত্রটা তো ভ্যাম্প নয়, ভদ্রঘরের মেয়ে। তার শাড়ি খুলে ফেলা হয়েছে বটে, কিন্তু কথা বলবে কান্না কোন্না গলায়। চন্দ্রা এই জায়গাটা একেবারেই পারছিল না। সে যে-দিন ডিসঅ্যাপিয়ার করে, সে-দিন দুপুরেও এই সিনটা দু-একবার চেষ্টা করা হয়েছিল। চন্দ্রার ঠিক এক্সপ্রেশান ফুটছিল না বলে প্রোডিউসাররা চেয়েছিল, সিনটায় চন্দ্রার ডায়ালগ সব বাদ দিয়ে দিতে। ওর শুধু বডিটা ইউজ করা হবে। কিন্তু এই মেয়েটা, বিশাখা, এ ভাল অভিনয় করে। এর না পারার কোনও কারণ নেই। এই বিশাখা স্মার্ট মেয়ে, সাঁতার আর অন্যান্য দু-একটা স্পোর্টসে মেডেল পেয়েছে, আবৃত্তি ভাল করে। চন্দ্রার চেয়েও অনেক সুপিরিয়ার অ্যাকট্রেস, আমি সিওর ছিলাম ও ভাল করবে।

এতক্ষণ বাদে আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে চন্দ্রার বদলে আগেই বিশাখাকে নেননি কেন?

সন্তোষ মজুমদার অদ্ভুত ভাবে হাসলেন। তারপর বললেন, ফিল্ম লাইনের সব ব্যাপার আপনি বুঝবেন না। কাস্টিঙের সময় অনেক কিছু কনসিডার করতে হয়। চন্দ্রা এখনও ঠিক প্রফেশনাল নয়, গ্রাহ মিন, ছিল না। আর বিশাখা একটা স্টেজে নিয়মিত অভিনয় করে। শনি-রবিবার ডেট দিতে পারে না। ঠিক এই সময় অবশ্য ওদের নাটকটা বন্ধ আছে, আমরা লাকি...।

একটু থেমে সন্তোষ মজুমদার আবার বললেন, বিশাখা যে এ-রকম ভাবে সময় নষ্ট করবে, তা আমি কল্পনাই করতে পারিনি।

সহকারী পরিচালকটি বলে উঠল, এবার ঠিক আছে সন্তোষদা! আরম্ভ করুন।

সন্তোষ মজুমদার আবার চলে গেলেন ক্যামেরার কাছে। লাইটিঙের সামান্য পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়ে চেঁচালেন, টেকিং! স্টার্ট সাউন্ড! ক্যামেরা!

আগের মতো আবার শুরু হল। ভিলেনটি একবারের বদলে তিনবার শপাং শপাং করল চাবুক। ক্যামেরা বিশাখার মুখের ক্লোজ আপ ধরে আছে।

চোখ খুলে তাকাল বিশাখা, ভিলেনের বদলে পরিচালকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখ দুটি যেন বেশি উজ্জ্বল। বেশ কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল, তা-ও সে কোনও শব্দ উচ্চারণ করছে না।

সন্তোষ মজুমদার অস্থির ভাবে বলে উঠলেন, কী হল বিশাখা, ডায়ালগ দাও! ডায়ালগ! সুজিতের দিকে তাকাও।

বিশাখা তবু চেয়ে রইল পরিচালকের দিকে। তার দৃষ্টিতে কোনও ভাষা নেই।

সন্তোষ মজুমদার আবার আদেশ দিলেন, বিশাখা, ডায়ালগ! ডায়ালগ! বিশাখা তবু চুপ।

সন্তোষ মজুমদার বিরাট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, দুর ছাই! এ যে কলাগাছের অধম! কাট! লাইটস অফ!

তীব্র আলোগুলো হঠাৎ নিভে যেতেই বিশাখা ভেঙে পড়ল কান্নার ঝাপটায়। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলতে লাগল, আমি পারছি না! আমি পারছি না! কিছুতেই আমার মনে আসছে না!

॥ বারো ॥

পরদিন বিকেলে আমার ফিরে যাওয়া হল না।

কারণটা এমনই অকিঞ্চিৎকর যে কাউকে বোঝানো যাবে না।

সকালবেলা সুগত এসে বলল, সুনীলদা, আপনি আজই কলকাতায় ব্যাক করছেন? চলুন, এক সঙ্গে যাওয়া যাবে। আমারও আর এখানে পড়ে থাকার কোন মানে হয় না। চন্দ্রার ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে গেল। মি. অর্জুন মহাপাত্রও আজ যাচ্ছেন, ওঁর গাড়িতে আপনি গেলেও আমিও বেরহামপুর পর্যন্ত লিফ্‌ট নেব। কলকাতায় আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।

অর্জুন মহাপাত্রের গাড়িতে আমি যাব না, সেটা আগেই ঠিক করেছিলাম। কিন্তু সুগতকে এড়ানো যায় কী করে? ট্রেনের সারাটা রাস্তা সুগতের সাহচর্যে কাটানো আমার কাছে তেমন আকর্ষণীয় মনে হল না। একটু বেশি কথা বললেও সুগত ছেলেটি খারাপ নয়। কিন্তু ট্রেনে আমি চুপচাপ বই পড়তে ভালবাসি, সুগত সে-সুযোগ আমাকে দেবে না।

সুতরাং ওকে বললাম, আজ আর ফেরা হবে না ভাই। আমার শরীরটা ঠিক ভাল লাগছে না। জ্বর জ্বর লাগছে, আর একটা দিন দেখে যাই।

সুগত চলে গেল। আমাকেও মিথ্যে কথার ফলভোগ করতে হল। অনেক সময় মিথ্যে অজুহাতটা হঠাৎ সত্যি হয়ে যায়। দুপুরের দিকে আমার সত্যি সত্যি জ্বর এল। সেই সঙ্গে পাতলা সর্দি।

টকাটক করে দু'পেগ ব্র্যান্ডি মেরে দিয়ে শুয়ে রইলাম বিছানায়। এটাই সর্দি জ্বরের আমার নিজস্ব ওষুধ। এর পরে দুপুরটা টানা ঘুম দিতে পারলে জ্বর-টর ছেড়ে যেতে বাধ্য।

কিন্তু ঘুম এল না। এ-বই সে-বইয়ের পাতা ওলটাই, কোনওটাতেই মন বসে না। বিকেলের দিকে রবীনবাবু দেখা করতে এলে আমি খুশিই হলাম বেশ। কারুর সঙ্গে একটু কথা বলতেই মন চাইছিল।

রবীনবাবু এসেই বললেন, এদের শুটিং তো একেবারে গড়বড় হবার জোগাড়। শুনেছেন কিছু?

আমি অবাক হয়ে বললাম, না তো! আবার কী গণ্ডগোল হল?

রবীনবাবু বললেন, প্রথম কথা, বিশাখা এমন সব উলটো-পালটা কাণ্ড করছে, যা একেবারে অবিশ্বাস্য! সে কান্নার জায়গায় হাসছে, হাসির জায়গায় কাঁদছে। মাঝে মাঝে এমন সব ডায়ালগ দিচ্ছে, যা শুনলে পিলে চমকে যায়! এই ছবিতে তা একেবারেই বেমানান। সবই যেন অভিমানের কথা!

আমি বললাম, বিশাখা বোধহয় এই ফিল্মের রোলটা সিরিয়াসলি নেয়নি। একেই তো এলেবেলে পার্ট, তা-ও অন্যের ডাবল। ওর কেন উৎসাহ থাকবে বলুন!

রবীনবাবু বললেন, তা নয়, তা নয়। যত ছোটই পার্ট হোক, তবু তা সিরিয়াসলি নিতে হয়। বিশাখা যেন নিজেই বুঝতে পারছে না, কেন তার এত ভুল হচ্ছে! আরও কী কী হচ্ছে শুনুন! সুনেত্রা হঠাৎ আছাড় খেয়ে পা মচকেছে। সন্তোষবাবুর গলা বসে গেছে ঠাণ্ডায়, এমনই বসে গেছে যে চিঁ চিঁ করে কী যে বলছেন, বোঝাই যাচ্ছে না। এরা এন এফ ডি সি থেকে নতুন ক্যামেরা নিয়ে এসেছে, খুব চমৎকার কাজ হচ্ছিল, কিন্তু তার লেন্সে ফাঙ্গাস দেখা দিয়েছে, ছবি ক্লিয়ার আসছে না। হঠাৎ যেন শনির দৃষ্টি পড়েছে এই ইউনিটটার ওপর। সন্তোষবাবু নাকি প্যাক আপ করে কালই ফিরে যাবেন ভাবছেন। এ যাত্রায় আর শুটিং কমপ্লিট হবে না।

এ সংবাদ শুনে আমার কোনও দুঃখ হল না। এই ফিল্মের শুটিং নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই।

রবীনবাবু বললেন, আমার স্ত্রীর ধারণা, এই ফিল্মে দলটির ওপর চন্দ্রার অভিশাপ লেগেছে।

আমি সামান্য হেসে বললাম, অভিশাপ আবার কী? প্রতিমা এই সব বিশ্বাস করেন বুঝি? ওঁর কথাবার্তা শুনে আগে তো মনে হয়নি।

প্রতিমার কতকগুলো অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা আছে। প্রতিমার মতে, কোনও মানুষের অকালমৃত্যুর একটা সাইকিক এফেক্ট আশেপাশের কিছু মানুষের ওপর পড়েই। সেটাকেই অনেকে বলে, এক জনের আত্মা আর এক জনের ওপর ভর করে। আত্মায় বিশ্বাস না করলেও এ-রকম কিছু কিছু ব্যাপার সত্যিই ঘটে। চন্দ্রা এই ফি-্মটা কমপ্লিট করতে পারল না, তার জায়গায় এসেছে বিশাখা। কিন্তু চন্দ্রার অতৃপ্তিই তাকে পদে পদে বাধা দিচ্ছে। নইলে বিশাখার মতো মেয়ে এ-রকম ভুল করবে কেন? এ সম্পর্কে আপনার কী মত?

বুল শিট! মৃত মানুষের অতৃপ্তি হাওয়ায় উড়ে বেড়ায় না। পৃথিবীতে কত মানুষ মরছে, তাদের জায়গায় অন্য মানুষ রিপ্লেসড হচ্ছে, প্রফেশনাল জগতে এ-রকম অনবরত চলছে। মনে করুন, একটা পত্রিকায় আমার ধারাবাহিক উপন্যাস চলছে, সেটা শেষ হবার আগেই যদি আমি মারা যাই, পত্রিকার সম্পাদক চুপ করে বসে থাকবেন? পরের সংখ্যা থেকেই নতুন এক জনের উপন্যাস শুরু হবে। পরে যে লিখবে, তার কি কোনও গিলটি ফিলিং হবে? নাকি, আমার অতৃপ্ত আত্মা তাকে ভয় দেখাবে?

তাহলে বিশাখা এ-রকম ফেইল করছে কেন?

বিশাখা সিম্পলি নার্ভাস। সে পারছে না।

আপনি বিশাখাকে আগে দেখেননি। চন্দ্রার তুলনায় বিশাখা অনেক টাফ, প্র্যাকটিক্যাল। সে নিয়মিত স্টেজে অভিনয় করে। তার এ-রকম নার্ভাসনেস বিশ্বাসই করা যায় না।

বিশাখা মিসকাস্টিং হয়েছে। এই প্যানপেনে ভূমিকা, বাজে সংলাপ তার মুখ দিয়ে ঠিক মতো বেরুচ্ছে না।

ইউনিটের অন্য লোকজনদেরও এ-রকম দুর্ঘটনা ঘটছে কেন বলুন? সবই কাকতালীয়।

দেখুন, কারুর সর্দিতে গলা বসে যাওয়া কিংবা ক্যামেরার লেন্সে ফাঙ্গাস পড়ার জন্যও যদি কোনও মৃত আত্মাকে দায়ী করা হয়, তাহলে আমার বলবার কিছু নেই।

আপনি যাই বলুন, কাল সন্ধের পর এখানকার বাতাসে আমি যেন মাঝে মাঝেই চন্দ্রার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পাই। আমি নিজে এ-সব ঠিক বিশ্বাস করি না, তবু এ-রকম একটা ফিলিং হচ্ছে ঠিকই। মেয়েটা এমন ভাবে জীবনটা নষ্ট করল। কতটা দুঃখ তার বুকে জমে ছিল...।

আমি চুপ করে সিগারেট টানতে লাগলাম। জ্বরের মুখে সিগারেটের ধোঁয়া বিস্বাদ লাগছে। তবু অভ্যেসবশে টেনে যাচ্ছি।

একটু থেকে থেকে রবীনবাবু আবার বললেন, চন্দ্রার প্রবলেমটা কী ছিল জানেন? বলা যায়, আইডেনটিটি ক্রাইসিস। চন্দ্রার ট্যালেন্ট ছিল, কিন্তু ও ঠিক নিজের ক্ষেত্রটা বেছে নিতে পারেনি। পড়াশুনোয় ভাল ছিল, অধ্যাপনার লাইনে গেলে নাম করতে পারত। গানের গলাও ছিল বেশ সুরেলা, ঠিকমতো চর্চা করলে গায়িকাও হতে পারত নিশ্চয়ই। একটু চেষ্টা করলেই বিদেশে চলে যেতে পারত অনায়াসে। কিন্তু ওর রূপের জন্যই, ওকে যেন জোর করে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল সিনেমা লাইনে। এই সব মেয়ে, যে-কোনও লাইনেই টপে যেতে না পারলে খুব কষ্ট পায়। যোগ্যতা আছে, অথচ যেতে পারছে না।

আমি বললাম, পড়াশুনোয় ভাল, গানের গলা আছে, চেহারাও সুন্দর, এই সব গুণগুলো থাকলে তো অভিনয়েও সাকসেসফুল হতে পারে। সেটা পারল না কেন চন্দ্রা? ঠিকমতো সুযোগ পায়নি বলে?

রবীনবাবু বললেন, ঠিক তা নয়। ফিল্ম লাইনে ও নিজেকে অ্যাডজাস্ট কবতে পারেনি। ফিল্মের জগতটা এখন মেল ডমিনেটেড, এটা তো মানবেন? চন্দ্রা কোনও পুরুষকেই সহ্য করতে পারত না।

আমি বেশ বিস্ময়ের দৃষ্টি দিতেই রবীনবাবু বললেন, তার মানে কিন্তু এই নয় যে, চন্দ্রার খুব বেশি মরাল স্ক্রুপুলস ছিল। আধুনিক মেয়ে একা একা অনেক জায়গায় ঘুরছে, শুটিং-এর সময়েও তো অভিভাবকদের কক্ষনও সঙ্গে আনত না। এমনিতে পুরুষদের সঙ্গে মিশত, হাসি-ঠাট্টা করত, সে-সব ঠিক ছিল, কিন্তু কেউ একটু ঘনিষ্ঠতা করলেই গুটিয়ে নিত নিজেকে। ফিল্মেও ওর প্রেমের অভিনয় এই জন্যই কাঠ কাঠ মনে হত। আবেগ নেই, নিষ্প্রাণ। চন্দ্রা এক-এক সময় বলেও ফেলত, কোনও পুরুষই তাব যোগ্য নয়। সে যাদের দেখেছে, তারা কেউই যথার্থ পুরুষ নয়।

আমি হেসে বললাম, অর্থাৎ তার জীবনের প্রিন্স চার্মিংকে সে খুঁজে পায়নি।

রবীনবাবু বললেন, অনেকটা তাই। তাব এই সূক্ষ্ম অবজ্ঞা সিনেমা লাইনের পুরুষেরা ঠিক বুঝে যেত, তারা অপমানিত বোধ করত, সেই জন্য তাবা চন্দ্রাকেও বেশি ওপরে উঠতে দিতে চায়নি।

আপনি চন্দ্রাকে খুব ভালভাবে স্টাডি করেছেন, তাই না?

হ্যাঁ।

আমরা দু'জনের দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলাম এক ধরনের সম্মতিতে। একে বলা যায় জেন্টলম্যানস এগ্রিমেন্ট। চন্দ্রার সঙ্গে রবীনবাবুর কত দিনের পরিচয় এবং কতখানি ঘনিষ্ঠতা, সে-বিষয়ে আর প্রশ্ন তোলা চলবে না।

রবীনবাবু চলে যাবার একটু পরেই প্রতিমা এলেন ওঁর খোঁজ নিতে। স্বামীটি এখানে নেই শুনে উনি চলে যাবার জন্য উদ্যত হয়েও ফিরে তাকালেন। মেয়েরা এ-সব ঠিক বুঝতে পারে।

রবীনবাবুকে আমার জ্বরেব কথা বলিনি, উনিও কিছু জিজ্ঞেস করেননি। কিন্তু ভুরু তুলে বললেন, আপনার শরীর খারাপ নাকি? চোখ দুটো ছল ছল করছে।

কাছে এসে কপালে হাত দিয়ে বললেন, বেশ জ্বর দেখছি। ডাক্তার দেখিয়েছেন?

আমি বললাম, এক দিনের জ্বরে কেউ ডাক্তার দেখায় নাকি? ও কিছু না!

কিছু ওষুধ খেয়েছেন? খাননি নিশ্চয়ই। আমি ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, আমাব কাছে সব সময় থাকে।

আমার নিজস্ব ওষুধের কথা উল্লেখ না করে বললাম, আমি যখন তখন অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খাই না। আমার ঠিক বিশ্বাস নেই। কিছু লাগবে না।

রবীনবাবুর কিন্তু খুব অসুখের বাতিক। আপনি এই কথা বলছেন, আর রবীনের একটু জ্বর হলেই পাঁচ-সাতটা ওষুধ খেয়ে নেয়।

আমার বিনা ওষুধেই সেরে যায়।

শুয়ে থাকুন তাহলে, বিশ্রাম নিন। আপনার রাত্তিরের খাবারটা এখানে পাঠিয়ে দিতে বলব?

আমি উত্তর না দিয়ে প্রতিমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। অসুখের কথা যখন উঠছেই, তখন এই সুযোগে আমার একটা কৌতূহল মিটিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

আপনার কিছু একটা অসুখ আছে শুনেছি? কী অসুখ?

প্রতিমা সহজে হাসেন না। এখন তাঁর সারা মুখখানাই হাসিতে ভরে গেল। তিনি বললেন, যদি বলি আমার অসুখটা হচ্ছে পাগলামি, তাহলে বিশ্বাস করবেন?

সব মানুষই তো একটু একটু পাগল।

কিন্তু আমি এক-এক সময় সীমানা ছাড়িয়ে যাই। কিছুতেই যুক্তি দিয়ে নিজেকে বোঝাতে পারি না। খিটখিটে হয়ে যাই, সন্দেহ বাতিক দেখা দেয়। রবীনকে তখন জ্বালাতন করি। এখানে আসবার আগে দু'মাস আমাকে নার্সিংহোমে থাকতে হয়েছিল।

আপনাকে তো আমার পারফেক্টলি নর্মাল বলে মনে হয়।

একটু বেশি নর্মাল। কথাবার্তার মধ্যে সব সময় ব্যালান্স থাকে।

সেটাই বোধহয় খারাপ। এক-এক সময় ব্যালান্স নষ্ট হয়ে যায়। মনে হয় জীবনটাই অর্থহীন। ঠিক দু'রকম ফিলিং হয়, জানেন। মনে হয়, আমার যা যা প্রাপ্য তা পাইনি। রবীন আমাকে ঠকাচ্ছে। আমার ছেলে মেয়েরাও আমাকে ভালবাসার অভিনয় করে। আমার মনে হয়, পৃথিবীর অনেকের চেয়েই আমি বেশি পেয়েছি। সেই জন্য অনেকে আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে। আমার সুখ কেউ কেড়ে নিতে চাইছে। তখন ইচ্ছে হয়, খুব ইচ্ছে হয় —।

হঠাৎ থেকে গিয়ে তিনি জানলা দিয়ে চেয়ে রইলেন সমুদ্রের দিকে।

আমি বললাম, মাঝে মাঝে প্রত্যেক মানুষের মনেই এ-রকম নানা রকম প্রশ্ন আসে। অদ্ভুত ফিলিং হয়। অকারণে দারুণ নৈরাশ্য বুকে চেপে ধরে, আবার এ-সব কেটেও যায়। তাই না?

আমার কথাব উত্তর না দিয়ে প্রতিমা আপন মনে বললেন, ওই যে চন্দ্রা বলে মেয়েটি, ইচ্ছে করে সমুদ্রে ভেসে গেল, কতখানি অভিমান নিয়ে আত্মহত্যা করল, এক-এক সময় মনে হয়, ওর দীর্ঘশ্বাস, ওর অভিশাপ আমারও গায়ে লাগছে। আমার চামড়া ঝলসে দিচ্ছে। দেখুন, দেখুন, আমার চামড়ায় কী-রকম ফোস্কা পড়েছে, আজই!

আমি আর কোনও কথা খুঁজে পেলাম না।

প্রথম পরিচয়ের সময় এই দম্পতিটিকে আমাব বেশ আদর্শ মনে হয়েছিল। এখন দেখছি, এঁরা দু'জনেই আমার অভিজ্ঞতার বাইবের মানুষ। প্রতিমা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। অনেক লেখাপড়া শিখেছেন অথচ উনি বিশ্বাস করেন, ওঁর চামড়ায় ফোস্কা পড়েছে কোনও অশরীরীব দীর্ঘশ্বাসে। এটা কি ওঁর পাগলামি, না উনি আগে থেকেই জানতেন যে, চন্দ্রার সঙ্গে ওঁব স্বামীব বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল?

রবীনবাবুও যেন কিছু একটা অপরাধবোধে ভুগছেন। উনিও বাতাসে চন্দ্রার দীর্ঘশ্বাসেব শব্দ শুনছেন। এটা পাগলামি নয়, স্রেফ সংস্কার। বাতাসে কারুর দীর্ঘশ্বাস একমাত্র কবিতার মধ্যেই ভেসে বেড়াতে পারে।

চন্দ্রার মৃত্যুর পরদিন সন্ধ্যায় নৌকোয় পা ঝুলিযে বসা একটি মেয়েকে আমি দেখেছিলাম। মেয়েটি এক সময় কুয়াশায় মিলিয়ে গেল। প্রথমে আমি একটু ভয় পেয়েছিলাম, তা ঠিক। আমার বদলে যদি রবীনবাবু দেখতেন ওই দৃশ্য?

চন্দ্রার জায়গায় বিশাখা এসেছে, দু'জনের চেহারায় মিল আছে। কিন্তু সে-দিন কি ওই নৌকোয় বিশাখা বসেছিল? দুপুরবেলা বৃষ্টির মধ্যে লাল ছাতা মাথায় দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল বিশাখা? এ-সব কথা বিশাখাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি।

না, বিশাখা নয, আমি জানি, সে কে!

॥ তেরো ॥

রাত এখন ক'টা? আমার ঘুম ভেঙে গেল কেন? কে যেন আমাকে ডাকছে।

আমার যে জ্বর হয়েছিল, তা মনেই পড়ল না। শরীরে কোনও অস্বস্তি বেদনার অনুভূতি নেই। তবু আমি জেগে উঠলাম হঠাৎ। ঠিক আগের মুহূর্তেই কেউ যেন আমার নাম ধরে ডেকেছে, এখন কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

বিছানা ছেড়ে উঠে একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার সেই ডাক শোনার চেষ্টা করলাম। সব দিক চুপচাপ। তবু স্পষ্ট অনুভূতি হচ্ছে, কেউ ডেকেছে, কেউ আমাকে জাগাতে চেয়েছে। কিংবা আমি নিজেই নিজেকে ডেকেছি?

জানলার কাছে এসে দাঁড়ালাম। চাঁদ দেখা যাচ্ছে না, তবে অল্প জ্যোৎস্না আছে। বাতাসের গন্ধে মনে হয়, এখন মধ্যরাতের কম নয়। বেলাভূমি সম্পূর্ণ বিজন, আজও ঢেউয়ের মাথায় দেখা যাচ্ছে ফসফরাসের মালা।

জামাটা গলিয়ে নিয়ে বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। বালির বাঁধটা দিয়ে স্লিপ খাবার মতো গড়িয়ে নামলাম নিচে। এবার ডান দিকে, না বাঁ-দিকে যাব?

ডান দিকে। কোনাকুনি জলের দিকে। আজ বাতাস খুব কম, তাই ঢেউয়ের শব্দ তেমন শোনা যাচ্ছে না। আলো জ্বলছে না রাস্তার ধারের একটা বাড়িতেও। অনেকেই দরজা-জানলা সব খোলা রেখে ঘুমোয়। চুরি-ডাকাতির ভয় গোপালপুরে প্রায় নেই বললেই চলে।

আকাশে মেঘ নেই, অনেক তারা। গত দু'দিন এই সমুদ্রে একটা জাহাজও দেখা যায়নি। আজকের রাতটা ভারি সুন্দর। সুন্দরের একটা প্রগাঢ় আলিঙ্গন আমি অনুভব করছি সর্বাঙ্গে।

জলের ধার ঘেঁষে বসে আছে একটি রমণীমূর্তি। তার নীল শাড়ির রঙ মিশে গেছে রাত্রিতে। আঁচল উড়ছে। পিঠের ওপর খোলা চুল। আমার পায়ের কিংবা নিশ্বাসের শব্দ শুনেও সে মুখ ফেরাল না।

তাকে দেখে আমি একটুও চমকালাম না, কিংবা অবাক হলাম না। আমি জানতাম, সে এখানে থাকবে। সে-ই তো আমাকে ডেকেছে।

একটু দূরত্ব রেখে আমিও বসলাম ভিজে বালির ওপর। আর একটা সিগারেট ধরালাম। দেশলাইয়ের আগুন একটু যেন ছ্যাঁকা দিল রাত্রির গায়ে।

নারীটি একবার তাকাল আমার দিকে। জ্যোৎস্নায় ঝক ঝক করছে তার চোখ।

আমি মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছ, কেয়া?

আমি বললাম, তোমার হাসিটি ঠিক আগের মতোই আছে। আমি জানতাম, তুমি ঠিক ফিরে আসবে।

আপনি জানতেন? কী করে জানলেন?

আমি জানতাম। কারণ আমি যে খুব তীব্রভাবে চেয়েছি। আমি চেয়েছি, তুমি ফিরে এসো। তুমি ফিরে এসো। আমার সেই চাওয়াটাই তোমাকে তৈরি করেছে। তুমি অলীক, তুমি মায়া, তবু তুমি এখন বাস্তব।

নারীমূর্তিটি আবার খুব ছেলেমানুষের মতো হাসতে লাগল।

আমিও হেসে বললাম, সে-দিন তুমি নৌকোয় একা একা পা ঝুলিয়ে বসেছিলে, আমি তখন তোমাকে চিনতে পারিনি। সত্যি কথা বলছি, একটু ভয় পেয়েছিলাম। সেই জন্যই তুমি আমাকে

অবজ্ঞা করে চলে গেলে, তাই না? মানুষ কী-রকম বোকা হয় দেখো। নিজেই কল্পনা দিয়ে একটা মূর্তি গড়ে, আবার নিজেই সে তাকে চিনতে পারে না।

আপনি আমাকে তৈরি করেছেন? ভারি মজা তো।

মানুষের যখন কোনও প্রিয়জনের মৃত্যু হয়, মানুষ মনে মনে তার কথাই ভাবে, খুব গভীর ভাবে ভাবতে ভাবতে তাকে সশরীরে দেখতে পায় এক-এক সময়। কিন্তু তখন সেই প্রিয়জনকে দেখেই আবার মানুষ ভয় পায়। আমারও যে এই দুর্বলতা হয়েছে, তা আমি নিজেই এত দিন টের পাইনি।

আপনি বুঝি কেয়ার কথা খুব ভাবেন? খুব দুঃখ পেয়েছিলেন?

মাঝখানে অনেক দিন ভুলে ছিলাম, তা ঠিক। চন্দ্রাকে প্রথম দেখেও বুঝতে পারিনি, তার সঙ্গে কেয়ার এতখানি মিল। চেহারার মিল, হাঁটার ভঙ্গি, হাসি, অনেকটাই কেয়ার মতো। চন্দ্রা যখন জলের তলায় চলে গেল, তার পরেই এই মিলগুলো চোখে পড়ল। তারপর থেকে, আমি মনে মনে শুধু তোমার কথাই ভেবেছি, কেয়া। বৃষ্টির মধ্যে দুপুরবেলা লাল ছাতা মাথায় দিয়ে তুমিই [illegible]লে, তাই না? তখনও চন্দ্রার হঠাৎ ফিরে আসার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তুমিও যে ফিরে আসতে পা[illegible] সেটা আমার মাথায় ঢোকেনি।

ওগো লেখকমশাই, আপনি যে বললেন, আমি অলীক, মায়া। আমার হাতটা ছুঁ[illegible] তো। আমি রক্তমাংসের মানুষ।

নারীটি তার একটি হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে, আমি একটু ঝুঁকে ছুঁলাম। সেই হাত জীবন্ত রক্তস্রোতে উষ্ণ।

তাতে একটুও বিচলিত না হয়ে আমি বললাম, শুধু অলীকে কি সাধ মেটে? আমি তো চেয়েছি, তুমি রক্তমাংসেও ফিরে আসবে।

মেয়েটি সুর করে বলে উঠল, 'এই শান্ত স্তব্ধ ক্ষণে, অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে, জয়হীন চেষ্টার সঙ্গীত, আশাহীন কর্মের উদ্যম, হেরিতেছি শান্তিময় শূন্য পরিণাম...।' আঃ, কী ভাল লাগে জলের ধারে একা বসে থাকতে।

তুমি কি কেয়া নও? তুমি চন্দ্রা?

এই যে বললেন, আপনি আমাকে তৈরি করেছেন? আপনি কাকে তৈরি করেছেন, তা নিজেই জানেন না?

চন্দ্রার কথা ভাবতে গিয়ে কেয়ার কথা মনে পড়ে গেল। চন্দ্রা ফিরে আসুক, তা-ও আমি চেয়েছি। নিশ্চয়ই চেয়েছি। চন্দ্রার মতো মেয়েই-বা কেন হারিয়ে যাবে? কেয়া, তোমার কী হয়েছিল? তুমি কি ইচ্ছে করে সুন্দরবনের নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলে?

ও-সব কথা এখন ছাড়ুন তো। সমুদ্রকে দেখুন। সমুদ্রকে আপনার জীবন্ত মনে হয় না?

জীবন্ত তো বটেই। কে বলেছে, সমুদ্র জীবন্ত নয়। আকাশও জীবন্ত।

আমি আকাশ নিয়ে অত মাথা ঘামাই না। সমুদ্রকে আমার কি মনে হয় জানেন? ঠিক যেন এক বিশাল পুরুষ। জলে যখন নামি, বড় বড় ঢেউয়ের ঝাপটা যখন গায়ে লাগে, ঠিক যেন মনে হয় এক দুর্দান্ত প্রেমিক, অমন স্পর্শ আর কোনও প্রেমিক দিতে পারে না। সেই জন্যই একবার স্নানে নামলে আমার আর ইচ্ছেই করে না জল ছেড়ে উঠতে।

তুমি মানুষের চেয়েও জলকে এত ভালবাসো?

কোনও মানুষ তো তেমন করে ভালবাসল না!

এ-কথাতেও বিষাদের সুর নেই, নারীটি সব কথাই বলছে হাসতে হাসতে। আমি যে-হাতখানা ধরে আছি, সেই হাতে এখনও খেলা করছে প্রাণচাঞ্চল্য। কিছুক্ষণের জন্য আমি দিশাহারা হয়ে গেলাম।

সেই রমণীর পায়ে এসে লাগছে ঢেউ। শাড়ি ও শায়া একটুখানি তুলে সে দু'পায়ের পাতা দিয়ে চাপড় মারছে জলে। সাদা ফেনা যেন রুপোর মলের মতো অলঙ্কার হয়ে যাচ্ছে।

সে আপন মনে বললো, রাত্তিরবেলা, আর কোনও শব্দ নেই, দিগন্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে সমুদ্র, এই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়, কে কীসে সার্থক হল কিংবা না হল, তাতে কিছুই আসে যায় না।

আমি বললাম, তাহলে জলের গভীরে ডুবে যাবারও কোনও মানে হয় না। এটা জীবন নিয়ে বড্ড বেশি বিলাসিতা। একটি মেয়ে সমুদ্রে একা একা নৌকোয় দাঁড় বাইতে বাইতে গান করছে আপন মনে, এটা দৃশ্য হিসেবে সুন্দর। কিন্তু তারপর একেবারে হারিয়ে যাওয়াটা অসুন্দর। ক্ষমার অযোগ্য। চলন্ত স্টিমার থেকে নদীতে ঝাঁপ দেওয়াটাও।

আমার কথা অগ্রাহ্য করে সে বলল, মানুষের আলিঙ্গনের মধ্যেও ভেজাল থাকে, কিন্তু একা একা জলের সঙ্গে খেলা করা, আঃ, কী আরাম!

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, আমি এখন জলে নেমে স্নান করব।

চমকে উঠে বললাম, এত রাতে?

রাত্তিরেই তো ভাল। দিন আর রাত্তিরের মধ্যে মেয়েরা রাত্তিরটাই বেশি পছন্দ করে, জানেন না? আপনিও স্নান করবেন? আসুন না।

আমি? না।

কেন? ভয় পাচ্ছেন!

ভয়ের কী আছে? আমি সাঁতার মোটামুটি ভালই জানি।

কিন্তু সমুদ্র তো তোমার প্রেমিক, আমার কেউ না!

মাথা দুলিয়ে হাসতে হাসতে সে বলল, আপনি রেগে যাচ্ছেন সমুদ্রের ওপর? নাকি হিংসে হচ্ছে! তাহলে আপনি ফিরে যান।

আমি আর অপেক্ষা করলাম না। উঠে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করলাম বাড়ির দিকে। আমি নিজে যাকে তৈরি করেছি, তারও মুখের কথাগুলো আমার বসানো নয়। কাল্পনিক মূর্তিরও একটা আলাদা সত্তা থাকে। সে ইচ্ছেমতো চলে। সে আমাকে আঘাত দিতেও পারে। সে বলল, আমি সমুদ্রকে ঈর্ষা করি।

বাড়ির কাছাকাছি চলে এসে আমার যেন ঘোর ভাঙল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

একটা খটকা লেগেছে। এতক্ষণ কার সঙ্গে কথা বললাম আমি? কেয়া, না চন্দ্রা? কিংবা, যে-উষ্ণ হাতখানি আমি ধরেছিলাম, সেই হাতখানি বিশাখার?

নাঃ, এখন আবার ফিরে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।।

মুক্তপুরুষ

॥ ১ ॥

রাত্তির পৌনে দশটার সময় আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম মানিকতলার মোড়ে। আমার কপালে বেশ জ্বর এসেছে।

এক-এক দিন সবই ভুল হয়ে যায়। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় ছোটখাটো বাধা এসে পড়ে, অযথা দেরি হয়। হুড়োহুড়ি করতে গিয়ে পকেটে রুমাল কিংবা ঠিকঠাক পয়সা নিতে মনে থাকে না। ন' নম্বর বাসে গেলেই সব চেয়ে সুবিধে, কিন্তু ন'নম্বর বাস সে-দিন কিছুতেই আসবে না। ট্রামের কন্ডাক্টর অনেক লোকের মধ্যে বেছে বেছে ঠিক আমাকেই বিনা কারণে অপমান করে। যার সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্য এত ব্যস্ততা, তার সঙ্গে দেখা হয় না। অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু উদাসীন ভাব দেখায়। রাস্তায় এক জন চেনা মানুষ চট করে মুখ ফিরিয়ে চলে যায় অন্য দিকে।

এক-একটা দিন এই রকম ভুলভাবে কাটে।

শুধু জ্বর নয়, আমার মাথার মধ্যে দপ দপ করছে ব্যথা। চোখে ঘোর ঘোর লাগছে। ইচ্ছে করছে এই রাস্তার ওপরেই শুয়ে পড়ি। বাতাস বইছে বেশ। কিন্তু সে-বাতাস এমন গরম যেন তার আঁচে ঝলসে যাচ্ছে আমার গা।

হঠাৎ আমি মনে মনে বলে উঠলাম, সাত্যকি বসুমল্লিক। নামটা মনে পড়ছিল না...হুঁ। তোমাকে আমি দেখে নেব এক দিন।

একটা দো-তলা বাস আসছে। নিশ্চয়ই এটা আমার নয়। আমার জন্য আজ কিছু ঠিকঠাক আসবে না। তবু দু'পা এগিয়ে গেলাম। বাসটা একদম খালি, দরজায় দাঁড়িয়ে এক জন হাত নেড়ে বলছে, যাবে না, যাবে না।

যে যাবে না যাবে না বলে, সে-ও কিন্তু কোথাও যায়।

আমার মনে হল, বাসের দরজার ওই লোকটা ঠিক আমার দিকেই আঙুল তুলে বলছে, নেব না! তোমাকে নেব না!

এই যদি আমার বদলে সাত্যকি বসুমল্লিক এখানে থাকত, তাহলে ওই লোকটাই হাত জোড় করে বিগলিত গলায় বলত, আসুন স্যার, উঠে আসুন!

এই অবস্থাতেও আমার একটু হাসি পেল। সাত্যকি বসুমল্লিকের মতো মানুষ এই রকম রাত্তিরে দো-তলা বাসে চাপতে যাবেই-বা কেন?

বিড় বিড় করে বললাম, ওহে নীললোহিতচন্দর, এখন কী করবে? মনে তো হচ্ছে, ট্রাম-বাসের কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। আজ তো হবেই, জানা কথা। এখন বাড়ি ফিরবে কী করে? নাকি আজ ফুটপাথেই শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দেবে?

পাশেই এক জন লোক দাঁড়িয়ে, সে আমার দিকে বেশ একটা খটকাপূর্ণ দৃষ্টি দিল। আমার স্বগতোক্তিটা বেশ জোরেই হয়ে গেছে? যাক, আমি গ্রাহ্য করি না।

সাত্যকি বসুমল্লিক এমনই যথার্থ ধরনের মানুষ যে, আমার ধারণা, কোনও দিন স্নান করার সময় তাঁর হাত থেকে সাবান মাটিতে পড়ে যায় না। রাস্তায় কোনও দিন সাত্যকি বসুমল্লিকের চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে যায়নি। পাজামা পরার সময় যদি দেখা যায় এক দিকের দড়ি অনেকখানি ভিতরে ঢুকে আছে, তাহলে বেশির ভাগ মানুষকেই কিছুক্ষণের জন্য ব্যক্তিত্বহারা হতে হয়। সাত্যকি বসুমল্লিক কখনও সেই রকম অবস্থায় পড়েননি। এক জন নিখুঁত ঝকঝকে মানুষ। সদ্য মহাভারত পড়ার জন্য আমার আরও মনে হয়, সাত্যকি নামের লোকদের বাল্যস্মৃতি থাকে না।

আমি হঠাৎ আমার বাসস্টপ-প্রতিবেশির দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি সাত্যকি বসুমল্লিককে চেনেন?

লোকটি বুঝতে না পেরে বলল, কী বলছেন? আমাকে বলছেন?

আজ কি ট্রাম-বাসের কোনও গোলমাল হয়েছে?

কী জানি!

লোকটি আমার পাশ ছেড়ে একটু দূরে চলে গেল। আমাকে বোধহয় নেশাখোর-টোর ভেবেছে। আমার এখন জ্বরের নেশা।

সারা দিন যে কোথায় কোথায় ঘুরেছি, কী করেছি, কিছুই মনে পড়ছে না। কিন্তু সাত্যকি বসুমল্লিকের কথা এত মনে পড়ছে কেন এখন? ফর্সা দোহারা চেহারা, খাঁটি আর্যবংশভূত নাক। ভুরু দু'টি যেন কাজল দিয়ে আঁকা।

সাত্যকি বসুমল্লিক যে-বৃত্তের মানুষ তার থেকে আমার বৃত্ত অনেক দূরে। আমাদের মধ্যে কোনও যোগসূত্র স্থাপিত হবার কথা নয়। তবু একটা উল্কা যেমন চলে আসে কোনও গ্রহের কাছে, সেই রকম একটা কিছু হয়েছিল। দেখা হয়েছিল নেতারহাটে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বাংলোতে গত মাসে।

প্রবাসে এক ধরনের ঝটিতি ঘনিষ্ঠতা হয়। তবু সে রকম কিছুও হবার কথা ছিল না, এক বাংলোতে কত রকম মানুষ যাবে, তাছাড়া আমি একটু একচোরা টাইপের। কিন্তু একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। আমি তখন ছিলাম সেখানে একলা একখানা ঘর নিয়ে। কেন গিয়েছিলাম নেতারহাটে? কেনই বা যাব না, নেতারহাট কি কারুর বাবার সম্পত্তি।

বিকেল থেকেই ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, তারই মধ্যে সন্ধের মুখে একটা স্টেশন ওয়াগন নিয়ে সাত্যকি বসুমল্লিক সেখানে এসে পৌঁছলেন। সঙ্গে চার পাঁচ জন নারী পুরুষ শিশু। ওঁদের দু'টি ঘর চাই। সে-রকম বুকিং-ও ওঁদের ছিল। তা তো থাকবেই, এই সব লোকেরা তো ঝুঁকি নেয় না কখনও। আমি আজ পর্যন্ত আগে থেকে বাংলো বুক করে কোথাও যাইনি। এমনি গিয়ে হাজির হই, তারপর চৌকিদারকে বলেকয়ে একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যায়। ঘর না পাওয়া গেলে বারান্দায় শুয়ে থাকতেই বা আপত্তি কী?

এই অবস্থায় সাত্যকি বসুমল্লিক তাঁর ব্যক্তিত্ব দেখিয়ে আমায় ঘর থেকে বার করে দিতে পারতেন। সেটাই স্বাভাবিক ছিল, তাহলে আমি ব্যাপারটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করতাম। আর কিছু না পারি, চার পাঁচখানা বিদ্রূপের দৃষ্টি তো ছুঁড়ে দিতে পারতাম লোকটার দিকে। কিন্তু অ্যারিস্টোক্র্যাসির যত দোষই থাক, এক ধরনের ভদ্রতা তাদের শৌখিন তামাকপাতার মতো প্রতিটি ব্যবহারের গায়ে মুড়ে রাখে। অত্যন্ত পম্পাস গলায় তিনি বলেছিলেন, না না, এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে ভদ্রলোক যাবেন কোথায়? আমরাই কষ্ট করে থাকব। তবে উনি যদি অনুমতি করেন, ওঁর ঘরে তো দুটো খাট আছে, তার একটাতে আমাদের দু'জন শুতে পারে।

শুধু তাই নয়, পরের দিনও সাত্যকি বসুমল্লিক আমাকে স্থান ত্যাগ করতে দিলেন না। আবার সেই কৃত্রিম উদার গলায় বললেন, আরে, আপনি চলে যাবেন কেন? আমরা এসে পড়ে আপনার কোনও অসুবিধে ঘটালাম? আপনি থেকে গেলে আমরা খুবই খুশি হব, গল্প-টল্প করা যাবে।

তিন দিন ছিলেন এক সঙ্গে। মাঝে মাঝে কথা হয়েছে, আমি সাত্যকি বসুমল্লিকের ব্যবহারে সামান্যতম খুঁতও পাইনি। তবুও অদৃশ্য ভাবে উনি যে সব সময় আমার পিঠ চাপড়ে দিচ্ছেন, সেটা ঠিকই টের পেতাম। ওঁর সঙ্গের মহিলারা কেউ একটাও কথা বলেননি আমার সঙ্গে। মেয়েরা এক নজরেই বুঝে যায়, কে হেলাফেলার যোগ্য।

সাত্যকি বসুমল্লিক বার বার বলেছিলেন কলকাতায় ফিরে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। ঠিক আমার মতো এক জন ছেলেকেই নাকি উনি খুঁজছিলেন। তিনটি কোম্পানির ডিরেক্টর হলেও উনি ঠিকানা দিয়েছিলেন বাড়ির। রেইনি পার্কে বসুমল্লিক হাউস। গত বুধবার ছিল অ্যাপয়েন্টমেন্ট। বলাই বাহুল্য, আমি যাইনি। কেউ কেউ উপকার করার প্রস্তাব দিয়ে আনন্দ পেতে চায়। আমি উপকার প্রত্যাখ্যান করে আনন্দ পাই।

যদি কোনও দিন রেইনি পার্কের বসুমল্লিক হাউসে আগুন লেগে যায়, আমি সেই আগুনের আঁচে একটা কচি ভুট্টা পুড়িয়ে খাব।

এ-সব বাজে কথা! পলাতক মানুষের গাঢ় সন্ধ্যার প্রলাপ-স্বপ্ন।

কিন্তু মানিকতলার মোড়ে বাসস্টপের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি শুধু শুধু সাত্যকি বসুমল্লিকের কথা ভেবে মরছি কেন? আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে না? লোকটির চেহারা যতবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে, ততই রাগ বাড়ছে। অথচ লোকটি আমার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে এক বিন্দু খারাপ ব্যবহার করেনি। তাহলেও সাত্যকি বসুমল্লিককে যদি এখন কাছাকাছি পেতাম, ওর মসৃণ গালে একখানা চড় কষিয়ে দিতাম!

নাঃ ট্রাম-বাসের নিশ্চয়ই কিছু বড় রকমের অসদ্ভাব হয়েছে আজ। হয়তো শিয়ালদা বা শ্যামবাজারে গুলি চলেছে। একটা ট্যাক্সি এসে থামতেই হুড়মুড় করে অনেক লোক ছুটে গেল সে-দিকে। ওই রকম ভিড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করে ট্যাক্সি চড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া আমার পকেটে আছে শুধু কিছু খুচরো পয়সা, সব মিলিয়ে এক টাকা চল্লিশ, অনেক বার গুনে দেখেছি। এখন মওকা বুঝে শেয়ারের ট্যাক্সিতেও তিন-চার টাকা চাইবে। মানুষ বিপদে পড়লে মানুষই তার বেশি সুযোগ নেয়।

এরপর টেম্পো আসবে, ভ্যান, লরি, ঠ্যালাগাড়ি করেও মানুষ ফিরবে। অনেক লোক জমে গেছে। যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে, সে কী করে বাড়ি যাবে?

আমি উবু হয়ে বসে ফুটপাথের ধার ঘেঁষে বমি করলাম। আমার কাছের লোকেরা দূরে সরে গেল। কেউ একটা প্রশ্নও করল না আমাকে। এখন মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। জ্বর খুব ভাল জিনিস, কিন্তু জ্বরের সঙ্গে বমি খুব খারাপ অসুখ না? কলেরা? আমার বরাবর ধারণা ছিল, প্রকৃত ভদ্রলোকের কখনও কলেরা হয় না। আজ কি কারুর সঙ্গে অভদ্রতা করেছি? সে-রকম কিছু মনে পড়ল না। শুধু সাত্যকি বসুমল্লিককে বিনা দোষে থাপ্পড় কষাতে চেয়েছিলাম, তা-ও মনে মনে।

উলটো দিকের ফুটপাথে একটা টিউবওয়েল আছে। ধীরেসুস্থে সে-দিকে হেঁটে গিয়ে মুখ ধুয়ে নিলাম। এক-এক সময় বড় অন্যায় আবদার করতে ইচ্ছে করে। যেমন, এখন আমার ইচ্ছে হচ্ছে, কেউ যদি আমার জন্য টিউবওয়েল পাম্প করে দিত। এক হাতে পাম্প করে আর এক হাতে মুখ ধুতে বড্ড কষ্ট হচ্ছে। এলিয়ে পড়তে চাইছে শরীরটা। এ কী হল আমার!

কলকাতার রাস্তা যারা নোংরা করে, আমি আজ তাদের মধ্যে এক জন। এরপর ফুটপাথে শুয়ে থাকার তো আমার ন্যায্য অধিকার আছে। কিন্তু তার আগে ওষুধ খেতে হবে। জ্বরের সঙ্গে বমি, এবার আবার বেশ পেটব্যথা করছে। না না, এখন ইয়ার্কির সময় নয়, বেশ গুরুতর ব্যাপার, পট করে মরে যাবার কোনও মানে হয় না।

ঝড়ের মতো একটা বাস এসে থামল। হই হই রই রই করে উঠল একদল মানুষ। তাদের সঙ্গে আমিও বাসের দরজার দিকে ছুটতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে হল, এটা তো উলটো দিকে যাবে। এটাই তো স্বাভাবিক, আজ আমার জন্য কোনও কিছুই ঠিকঠাক হবে না। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবার জন্যই এই বাসটা এসেছে।

কিন্তু এটা সত্যিই কি উলটো দিক? মানিকতলা মোড়ের কোন দিকে আমি দাঁড়িয়ে আছি? কোন দিকে শ্যামবাজার, কোন দিকে শেয়ালদা? সব গুলিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার আলো এত কম কেন? মানিকতলা বাজারটা কোথায় গেল?

মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে!

আমার দিকভুল হচ্ছে, এটা বিকারের লক্ষণ। আর এই অবস্থায় বাড়ি ফেরার চেষ্টা করে লাভ নেই। কাছাকাছি চেনাশুনো কারুর বাড়িতে... কে থাকে কাছাকাছি? কারবালা ট্যাঙ্ক লেনে দিলীপ দত্ত, হ্যাঁ, দিলীপের কাছে গেলে... কিন্তু কী যেন, কী যেন... ওঃ। ঠিক তো, দিলীপরা এখন আর কারবালা ট্যাঙ্ক লেনে থাকে না, সল্টলেকে বাড়ি করেছে। বিবেকান্দ রোডে ডাক্তার সলিল পাঁজা... এক দিন নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম... তিনি আমাকে চিনতে পারবেন? মাত্র এক দিন দেখা... তাছাড়া এই অবস্থায়...। রামদুলাল সরকার স্ট্রিটে আমার এক মাস্টারমশাই, ...খুব ভাল লোক, কিন্তু রামদুলাল সরকার স্ট্রিট বেশ দূরে, অতটা কি হেঁটে যেতে পারব?

হঠাৎ মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি কি একটা গাধা, আমহার্স্টস্ট্রিটের মুখেই তো নিলয়দার বাড়ি, সেটা এতক্ষণ মনে পড়েনি? নিলয়দা প্রায়ই কলকাতায় থাকে না অবশ্য, কিন্তু রূপাবউদিও আমার সঙ্গে যথেষ্ট ভাল ব্যবহার করে। আগে ঠিক করে নেওয়া যাক, আমহার্স্ট স্ট্রিটটা কোন দিকে?

কয়েক পা হাঁটার পরেই আমি দৌড়োতে শুরু করলাম। সমস্ত অনুভূতিবোধ এমন তীব্র হয়ে গেছে যে নিলয়দার বাড়ি চিনতে একটুও অসুবিধে হল না। এক তলাতেই বসবার ঘর। আলো জ্বলছে। একটু ঠেলতেই দরজাটা খুলে গেল, কেউ নেই ভেতরে, কেমন যেন খাঁ-খাঁ করছে ঘরটা।

ভেতর দিকে একটা ছোট উঠোন, তার দু'পাশে বারান্দা। সেই দু'দিকের বারান্দায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে নিলয়দা আর রূপাবউদি, উত্তেজিত ভাবে কিছু কথা বলছিল বোধহয়, আমি উঁকি মারতেই চিত্রার্পিত। আমাকে দেখার পরও বেশ কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল, ওরা কোনও কথা বলল না।

গরজ আমারই বেশি। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম, নিলয়দা, আমি হঠাৎ এসে পড়লাম একটু...।

অপ্রত্যাশিত রূঢ়তার সঙ্গে নিলয়দা বলল, তা তো দেখতেই পাচ্ছি!

অপ্রত্যাশিত হলেও খুব একটা আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আজ তো সারা দিন এই রকমই চলছে। একটা সম্পূর্ণ ভুল দিন। কিন্তু আমি যে আর পারছি না।

নিলয়দা আমার খুব শরীর খারাপ লাগছে, খুব জ্বর রাস্তায় বমি করলাম, বাড়ি ফিরতে পারিনি, তাই তোমার এখানে চলে এলাম। তোমার চেনা কোনও ডাক্তার আছে?

মঞ্চাভিনেতার মতো অত্যন্ত জোরে হা-হা শব্দে হেসে উঠল নিলয়দা। তারপর বলল, এ-দিকে আমি একটা পাগলকে নিয়ে কী করব তার ঠিক নেই, তার ওপর আর এক জন অসুস্থ রুগী এসে হাজির হলেন। আমার ভাগ্যটাই এই রকম, দেখলে তো রূপা! হা-হা-হা!

এখন হাস্য পরিহাসে যোগ দেবার মতো অবস্থা আমার নেই। আমি কাতরভাবে বললাম, এক তলার বাথরুমটা কোন দিকে বউদি?

বউদি আঙুলটা তুললেই আমি খ্যাপা মোষের মতো সোজা ঢুকে গেলাম।

॥ ২॥

বিকেলবেলা লায়নস্ রেঞ্জে ফুটপাথের দোকান থেকে টোস্ট আর ঘুগনি খেয়েছিলাম। ঘুগনির স্বাদটা তখনই যেন কেমন কেমন লেগেছিল, কিমাটা ইঁদুরের মাংসের ছাঁটের মতো, যদিও ইঁদুরের

মাংস আমি কখনও খাইনি, কিন্তু ওই রকম হবার কথা। সেই ঘুগনি খেয়েই আমার ফুড পয়জ্‌নিং।

সারা রাত ভাল করে ঘুমোতে পারলাম না, সকালবেলা আমার অবস্থা রীতিমতো কাহিল। গলার আওয়াজ চিঁ-চিঁ হয়ে গেছে।

ডাক্তার ডাকা হয়নি, নিলয়দা নিজেই দিয়েছে ওষুধ। রূপাবউদির বাবা ছিলেন এক জন নামকরা ডাক্তার, সেই সুবাদে রূপাবউদিরও ওষুধপত্র সম্পর্কে জোর দিয়ে কথা বলার অধিকার আছে। যাই হোক, ন'টার সময় চায়ের কাপে সভয়ে চুমুক দিতে দেখলাম চা-টা বেশ ভালই লাগছে। তাহলে এ-যাত্রা আর বোধহয় আমার মরে যাবার চান্স নেই।

তখন ফিরে এল অভিমানবোধ। কাল রাত্তিরে নিলয়দা আমাকে দেখে কিংবা অসুখের কথা শুনে প্রথমে ও-রকম হেসে উঠলেন কেন? নিলয়দা আমাকে দেখে বিরক্ত হয়েছিল? অথচ নিলয়দার সঙ্গে আমার সে-রকম সম্পর্ক নয়। নিলয়দার সঙ্গে কতবার কত জায়গায় বেড়াতে গেছি, একবার একটা ছোট্ট খাটিয়াতে দু'জনে ঠাসাঠাসি করে শুয়ে কাটিয়েছি সারা রাত।

অবশ্য রাত্তিরে যত্ন করেছে নিলয়দা আর রূপাবউদি। একবার ঘরের মধ্যেই বমি করে ফেলেছিলাম, নিলয়দা আমার মুখ মুছিয়ে দিয়েছিল। এটা নিলযদার ছেলে পাপুন-এর ঘর। দেয়ালে একটা বেশ বড় করে ব্রুস লি'র পোস্টার ছবি। আর একটা ছবি কার চিনতে পারলাম না।

রূপাবউদি এসে জিজ্ঞেস করল, এখন কেমন লাগছে? উঠতে পারবে? পাপুন স্কুলে যাবে, ওর বই-টই নেবে, অবশ্য তোমার অসুবিধে হলে এখানেই শুযে থাকো।

আমি মিন মিন করে বললাম, না না, বউদি, আমি এবারে বাড়ি যাব। বাড়িতে কোনও খবর দেওয়া হযনি।

এক তলায় কে যেন বিকট গলায় চিৎকার করে উঠল, অত সোজা নয়। আমাকে বোঝানো অত সোজা নয়। আমার তিনটে চোখ আছে।

আমি চমকে উঠলাম। নিলয়দার গলার আওযাজ তো নয়। নিলয়দা খুব নম্র গলায় কথা বলেন। তাহলে কে চেঁচাচ্ছে? আমি বউদির চোখের দিকে তাকালাম।

বউদি ও-দিকে মন না দিয়ে বলল, বাড়িতে খবর দাওনি, তাই তো, তোমার মা খুব চিন্তা করছেন নিশ্চয়ই।

আমি আস্তে আস্তে উঠে বসে বললাম, মা এখানে নেই। আর কেউ বিশেষ চিন্তা করবে না। ভাববে, আমি বাইরে কোথাও চলে গেছি।

রূপাবউদি, তোমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি কাল রাত্তিরে।

রূপাবউদি বিচিত্র ভাবে একটু হেসে বলল, আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি খুব মদ খেয়েছ। তারপরে বুঝলাম... বেশ খানিকটা চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলে। অত বমি করেছ বলেই বেঁচে গেলে।

নিলয়দা কি বেরিয়ে গেছেন?

না। সিংহের খাঁচায় ঢুকে এখন সার্কাসের খেলা দেখাচ্ছে। তুমি তাহলে উঠে পড়ো, আমি বিছানা তুলব।

তোমারও তো আপিস আছে, বউদি?

আছে তো, কিন্তু যাব কী করে? বাড়িতে এই সব কাণ্ড!

আমি পরে আছি প্যান্ট আর গেঞ্জি। জামাটা কখন কে খুলে দিয়েছে, খেয়াল নেই।

উঠে দাঁড়িয়ে আমি বললাম, আমার একটা জরুরি কাজ আছে, মনে ছিল না। এক্ষুনি যেতে হবে! বউদি, আমার জামাটা?

সেটা খুব নোংরা হয়ে গেছে। ও পরে বাড়ি যেতে পারবে না। তুমি বরং নিচে গিয়ে বসো একটু, তোমার দাদার একটা জামা দিচ্ছি।

নিচ থেকে আবার সেই চিৎকার শুনতে পেলাম, অত সোজা নয়, আমার তিনটে চোখ আছে। আমি কে তুমি জানো? হায়, মাধুরী।

এবারে আমি জিজ্ঞেস করলাম, নিচে কে চেচাচ্ছে, বউদি?

ওই যে বললাম, সিংহের খাঁচা? সেই সিংহ! তোমার নিলয়দার নতুন খেয়াল। এবারেও ও আমাকে মারবে।

রূপাবউদির মুখে এ-রকম হেঁয়ালি ধরনের কথাবার্তা আমি আগে কখনও শুনিনি। রূপাবউদি বরং বেশ খটখটে ধরনের মহিলা, মানুষটা খারাপ নয়। কিন্তু কথাবার্তা বলে সোজাসুজি চাঁছাছোলা ভাষায়। রূপাবউদি প্রায় আমার সমান লম্বা, সেই জন্য একটা অতিরিক্ত ব্যক্তিত্ব আছে।

আমার চটিটা নিশ্চয়ই নিচে পড়ে আছে। খালি পায়ে সিঁড়ির রেলিং ধরে নামতে লাগলাম। মাথাটা বেশ টন টন করছে এখনও। এক দিনের অসুখে অতটা কাবু হইনি কখনও আগে।

বারান্দার কোণে একটা ঘরের দরজা বন্ধ। তার পাশের জানলায় দাঁড়িয়ে পাপুন উঁকি মারছে ঘরের মধ্যে।

আমার পায়ের শব্দ শুনে পাপুন মুখ ফিরিয়ে ঝকঝকে একটা কৌতুকের হাসি দিল। তারপর জানলা থেকে নেমে এসে বলল, জানো নীলুকাকা, পাগলটা কিছুতেই খাচ্ছে না।

কোন পাগলটা?

বাবা যাকে রাস্তা থেকে ধরে এনেছে!

এইবার আমার মনে পড়ল, কাল রাত্তিরে নিলয়দা পাগল সম্পর্কে কী যেন বলেছিল।

রাস্তা থেকে একটা পাগল ধরে আনা নিলয়দার পক্ষে আশ্চর্য কিছু না। নিলয়দার এ-রকমই সব অদ্ভুত খেয়াল।

গত বছর শীতকালে নিলয়দার সঙ্গে আমি কাঁকড়াঝোড় জঙ্গলে একটানা দশ দিন ধরে ঘুরেছি। একটা বুড়ো নেকড়ে বাঘের সন্ধানে। একটা ইংরেজি কাগজে খবর ছাপা হয়েছিল যে, কাঁকড়াঝোড় জঙ্গলে নাকি একটি নেকড়ে বাঘের দেখা পাওয়া গেছে। বাঘটি খুব বুড়ো, মাঝে মাঝে লোকালয়ের কাছাকাছি চলে আসে। দু'দিন বাদেই অবশ্য প্রতিবাদ ছাপা হয়েছিল সেই খবরের। এক জন লিখেছিল যে, নেকড়ে বাঘ বা উল্‌ফ বা Canis Lupus নাকি উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে অনেক দিন। পশ্চিমবাংলায় নেকড়ে বাঘ এখন কারুর পক্ষে দেখতে পাওয়া অসম্ভব।

তবু প্রথম খবরটি পড়েই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল নিলয়দা। আমাকে বলেছিল, নীলু, যাবি নাকি? চল না, বাঘটাকে খুঁজে আসি, যদি দেখা পেয়ে যাই, ছবি তুলে আনব। একটা দারুণ ব্যাপার হবে।

কোনও জঙ্গলে একটা নেকড়ে বাঘ আছে কি নেই, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। নেকড়ে বাঘ লুপ্ত হতে হতে একটা যদি এখনও থেকেই যায়, তাহলেই-বা তাকে অযথা বিরক্ত করার কী দরকার? বরং তার কাছাকাছি না যাওয়াই ভাল। একদম একলা হয়ে পড়ায় সেই নেকড়েটার মেজাজ বেশ খারাপ থাকাই স্বাভাবিক।

কিন্তু জঙ্গলে বেড়াতে যাওয়ার যে-কোনও একটা উপলক্ষ পেলেই আমি নেচে উঠি। নিলয়দাকে আমি তাল দিয়ে বলেছিলাম, চলুন, চলুন, অন্য কেউ যাবার আগে আমরা গিয়ে নেকড়েটাকে ধরে ফেলি।

রূপাবউদি ঠাট্টা করে বলেছিলেন, ধরতে পারলে কলকাতায় নিয়ে এসো। আমাদের বাড়িতে পুষব। নেকড়ে বাঘকে তো প্রায় অ্যালসেশিয়ানের মতোই দেখতে।

সেই সূত্র ধরেই রূপাবউদি এবারে সিংহ ধরে আনার কথা বলছেন!

কাঁকড়াঝোড় জঙ্গলে আমরা শেষ পর্যন্ত নেকড়ে বাঘটার দেখা পাইনি বটে, কিন্তু ঘোরাঘুরি করতে হয়েছিল খুব। জঙ্গলের আদিবাসী, ফরেস্ট গার্ড, বিট অফিসার, বাংলোর চৌকিদার অনেকেই নাকি নেকড়েটাকে দেখেছে। বিট অফিসার বলেছিল যে, এক দিন সন্ধেবেলা সে জিপে করে ফিরছিল গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। জিপের পেছনে পেছনে একটা ধূসর রঙের প্রাণীকে সে অনেকক্ষণ দৌড়ে আসতে দেখেছিল, সেই প্রাণীটা নেকড়ে না হয়ে যায় না। জঙ্গলের সেই জায়গাটায় আমরা পর পর দু'দিন ভোর থেকে সন্ধে পর্যন্ত কাটিয়েছি। নিলয়দার দারুণ উৎসাহ, আমাকে চোখ বড় বড় করে বলেছিল, একদম একলা একটা নেকড়ে, কোনও বন্ধু নেই, সঙ্গিনী নেই, সে কী করে বেঁচে আছে বল তো? মনে কর, পৃথিবীর মানুষের কোনও জাতির আব সবাই মরে গেল, শুধু এক জন বেঁচে রইল।

পাপুন বলল, জানো নীলুকাকু, ওই পাগলটা না মাকে কামড়ে দিতে এসেছিল!

আমি দ্রুত বসবার ঘরের দিকে চলে এলাম। জঙ্গলের বাঘ-ভাল্লুকের চেয়েও আমি পাগলদের বেশি ভয় পাই। হয়তো ছেলেবেলায় কোনও দুঃসহ অভিজ্ঞতা আমার মনের মধ্যে ছাপ ফেলে গেছে। পাগলদের চোখের দিকে তাকালেই আমার গা ছম ছম করে।

দুর্বল শরীরে কোনও অ্যাডভেঞ্চারের স্পৃহা জাগে না। নিলয়দা কোন শখে রাস্তা থেকে একটা পাগলকে ধরে এনেছে কে জানে! এখন আমার কেটে পড়া দরকার। নিলয়দার কাছ থেকে বিদায় নেবারও প্রয়োজন নেই।

পাপুন জিজ্ঞেস করল, তুমি কী খুঁজছ?

আমি বললাম, চটিটা খুঁজে পাচ্ছি না। এইখানেই কোথাও আছে। পাপুন, লক্ষ্মীছেলে, ওপরে গিয়ে মা'র কাছ থেকে একটা জামা চেয়ে আনবে?

তোমার জামা কী হল?

আমার জামাটা, ইয়ে, ভিজে গেছে। তোমার বাবার একটা জামা চেয়ে নিয়ে এসো।

তোমাব জামাটা ভিজল কী করে?

ছোট ছেলে মেয়েদের কৌতূহল প্রবৃত্তি থাকা ভাল। যত বেশি কৌতূহলী হবে, তত জ্ঞান বাড়বে। কিন্তু এই মুহূর্তে পাপুনের জ্ঞান বৃদ্ধি করার কোনও ইচ্ছে আমার নেই।

একটু কড়া গলায় বললাম, বাথরুমে পড়ে গিয়েছিল। তুমি যাও পাপুন, মা'র কাছ থেকে চট করে একটা জামা নিয়ে এসো!

পাপুন ফিক করে হেসে ফেলে বলল, বাবার একটা জামা ওই পাগলটাকে দিয়েছে। তুমিও আর একটা জামা নেবে?

পাপুনকে অন্য দিন আমার কত ভাল লাগে। মাথার রেশমি-নরম চুলে হাত বুলিয়ে আদর করি। এখন পাপুনের সঙ্গে আর আমার কথা বলতেই ইচ্ছে করল না।

মুখের মধ্যে জল জল ভাব হচ্ছে। আবার বমি আসবে নাকি? আমি প্রাণপণে একটা বমি-প্রতিরোধ শক্তি তৈরি করে খুঁজতে লাগলাম চটি জোড়া।

পাপুন বলল, তোমার চটি কোথায় আছে, আমি জা-নি! বলব না, ব-ল-ব না!

গেঞ্জি গায়ে খালি পায়ে বেরিয়ে গেলেই-বা ক্ষতি কী আছে? এ-দেশে শতকরা ঊনসত্তর জন লোক পায়ে কখনও জুতো পরে না আর শতকরা তিয়াত্তর জন লোক কোনও দিন একটা গেঞ্জি পর্যন্ত গায়ে দেয়নি। আমার খুচরো পয়সাগুলোও শার্টের পকেটেই ছিল, রূপাবউদি তা কোথায় রেখেছে কে জানে! পকেটে একটা রুমাল ছাড়া আর কিছু নেই।

তবুও বেরিয়ে পড়বই ঠিক করতেই বাইরে দরজার সামনে এক রমণীমূর্তির আবির্ভাব হল। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়স, বেশ উদ্ধত-যৌবনা, গায়ের শাড়িখানা যেন মাকড়সার জাল দিয়ে তৈরি। আমি চিনি এই মেয়েটিকে, রূপাবউদির ছোট বোন, এ বাড়িতেই দেখেছি এক দিন, এর নাম স্বর্ণ।

মেয়েটিরও আমাকে চেনা উচিত, কিন্তু সে-রকম কোনও ভাবই দেখাল না। বরং থমকে গিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেন মুখখানা শুকিয়ে যেতে লাগল ওর। আমাকে দেখে ভয় পেয়েছে?

কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, এই পাপুন, দিদি কোথায়?

আমার মেজাজ খুবই খারাপ হয়ে গেছে, আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না। আমি দরজার দিকে এগোতেই স্বর্ণ 'ও মাগো' বলে চিৎকার করে উঠে অদ্ভুত কায়দায় একটা দৌড় লাগাল, একবার আমার বাঁ-পাশ, একবার আমার ডান পাশ ঘুরে উলটো দিকে চলে গিয়ে পাপুনকে জড়িয়ে ধরল।

এ-রকম অবস্থায় চলে যাওয়া যায় না। আমি মুখ ঘুরিয়ে আহত ভাবে স্বর্ণর দিকে তাকালাম।

পাপুন খিল খিল করে হেসে উঠে বলল, ও পাগল নয়! ও পাগল নয়! কী মজা! ছোটমাসি. ও তো নীলুকাকু! পাগলটা ভেতরে আছে!

এই কথা শুনেই স্বর্ণ আধুনিকা-সুলভ দাম্ভিক ভাবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ময়না পাখির মতো তীক্ষ্ণ-সুমিষ্ট স্বরে বলল, আপনি খালি গায়ে কেন? তাই আমি বুঝতে পারিনি। মাথার চুল উস্কোখুস্কো, চোখ দুটো কেমন কেমন।

এই সময় রূপাবউদি একটা জামা নিয়ে উপস্থিত হল। আমাকে বাইরের দরজার কাছে দেখে বলল, এ কী, কোথায় যাচ্ছ? জামা এনেছি। পাপুন বলল, মা, জানো তো, ছোটমাসি না, হি-হি-হি!

স্বর্ণ জিজ্ঞেস করল, দিদি, নিলয়দা নাকি রাস্তা থেকে একটা পাগল ধরে নিয়ে এসেছে?

তুই কোথা থেকে শুনলি?

আমাকে জয়নন্দন বলল। ও দেখেছে, কাল বিকেলবেলা নিলয়দা একটা পাগলকে ধরে... রাস্তার লোকেরা পাগলটাকে মারছিল।

তোর বন্ধু জয়নন্দন তো আচ্ছা ছেলে! সে দেখেছে, তবু তোর নিলয়দাকে সাহায্য করতে আসেনি?

ভেতর থেকে জলদগম্ভীর স্বরে সেই পাগল চেঁচিয়ে উঠল, আমাকে কেউ চেনে না, আমিও কারুকে চিনি না। এই হল সোজা কথা।

হায়, মাধুরী!

গলার আওয়াজ শুনে মোটেই পাগল বলে মনে হয় না। যেন কেউ যাত্রার পার্ট করছে।

আমি রূপাবউদির কাছ থেকে জামাটা নিয়ে পরে ফেললাম। নিলয়দার হাওয়াই শার্ট আমার গায়ে বেশ ফিট করে। স্বর্ণ এসে পড়ে যে-কাণ্ডটি করল, সেই উত্তেজনায় আমার বমি বমি ভাবটা কেটে গেছে। একে বলে প্রাকৃতিক চিকিৎসা। এখন চটি জোড়া ও খুচরো পয়সাগুলো পেলে আমি অনায়াসে চলে যেতে পারি।

বউদি, পাপুন আমার চটি লুকিয়ে রেখেছে, ওকে বার করে দিতে বলুন। আর আমার পকেটে কিছু পয়সা ছিল।

পয়সা ছিল? তা তো আমি জানি না। দেখো তো, বাথরুমে জামাটা রয়েছে। ক'টাকা ছিল? সব ভিজে গেছে নিশ্চয়ই।

বাথরুমের দিকে পা বাড়াতেই পাগলেব ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল নিলয়দা। এক হাতে একটা বাটি, অন্য হাতে একটা বালতি। সেগুলো নামিয়ে রেখে দরজাটা বন্ধ করে হুড়কো টেনে দিল। তারপর বলল, নীলু, বডি ফিট হয়ে গেছে? কাল রাত্তিরে খুব ঝামেলা করেছিলি, উফ্। শোন, তোর সঙ্গে আমার কাজের কথা আছে।

বাথরুমে আমি চটি আর জামাটা পেয়ে গেলাম। জামাটা বমিতে মাখামাখি। ও জামা কেউ কাচবে না, ফেলেই দিতে হবে। নিজের বমিতেও হাত দিতে ঘেন্না লাগে, তবু পয়সা বলে কথা, কোনওক্রমে সেই জামার বুকপকেট থেকে পয়সাগুলো বার করে ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে নিলাম।

বাইরে এসে বললাম, নিলয়দা, আমার বাড়িতে কোনও খবর দেওয়া হয়নি।

নিলয়দা বললেন, তোদেব পাশের ফ্ল্যাটে একটা ফোন আছে না? আমার ফোনটা খারাপ, আমি অফিসে গিয়ে তোদের পাশের ফ্ল্যাটে ফোনে খবর দিয়ে দিচ্ছি।

শরীরটা এখনও পুরো ঠিক হযনি, মাথা ঘুরছে, বাড়ি গিয়ে —।

এখানে শুয়ে থাক। বিশ্রাম নে। তোকে আমার আজকে খুব দরকার।

তুমি একটা পাগল ধরে এনেছ?

চুপ! শুনতে পাবে, পাগলকে কখনও পাগল বলতে নেই, ওরা ওই কথাটা ঠিক বুঝতে পারে।

আমাকে কী করতে হবে, নিলয়দা?

তুই আজকের দিনটা বাড়িতে থেকে ওকে পাহারা দিবি। অফিসে জরুরি কাজ আছে, আমার আজ না গেলেই নয়। কাল থেকে ছুটি নেব!

আমি পাগল পাহারা দেব?

আবার? বললাম না, ওই কথাটা উচ্চারণ করবি না! এখন থেকে বলবি 'রাস্তার ভদ্রলোক'। উঃ, কাল রাত্তিরে কী ঝকমাবি গেছে। এক দিকে ওকে সামলানো, তারপর আবার তুই এসে বমি-টমি শুরু কবলি। সারা রাত ঘুমোতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত তোকে আর ওকে, দু'জনকেই ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিলাম।

খুব দুঃখিত, নিলয়দা। তোমাকে আর বউদিকে খুব কষ্ট দিয়েছি, হঠাৎ এমন শরীরটা খারাপ হল। রাস্তার একটা দোকানের ঘুগনি খেয়ে —।

রাস্তার দোকানে ঘুগনি খুব টেস্টফুল হয়। আমারও মাঝে মাঝে খেতে ইচ্ছে করে।

নিলয়দা, বলছিলাম কী, আজকের দিনটা যদি বাড়িতে ফিরে রেস্ট নিতে পারি —।

শোন, ব্যাপারটা তোকে বুঝিয়ে বলছি।

বসবার ঘরে স্বর্ণ উচ্চহাস্য করে উঠল। রূপাবউদি বলল, তুই হাসছিস? আমার এই বাঁ-হাতের সব ক'টা আঙুল কামড়ে ধরেছিল।

দুই বোন বেরিয়ে এল উঠোনে।

রূপাবউদি বলল, আমার রান্নার লোকটা ছুটি নিয়েছে। এক হাতে সামলাতে হচ্ছে সব কাজ, এর মধ্যে আবার বাড়িতে একটা বদ্ধ পাগল এনে হাজির করেছে!

নিলয়দা বলল, ছিঃ রূপা! ওই রকম চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পাগল পাগল বলছ কেন? এক জন মানুষ, সে অসুস্থ!

রূপাবউদি বেশ কড়া গলায় ধমকে দিয়ে বলল, পাগলকে পাগল বলব না কি ছাগল বলব? তা-ও আবার ভায়োলেন্ট পাগল, আমাকে কামড়ে দিতে আসে!

বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে চিৎকার ভেসে এল, আমি সব জানি, আমি সব বুঝি! আমার তিনটে চোখ!

রূপাবউদি তর্জনী তুলে বলল, ওকে তুমি এক্ষুনি বিদায় করে দাও! যথেষ্ট হয়েছে।

নিলয়দা বলল, শোনো রূপা, ও ঠিক তোমাকে কামড়ে দিতে চায়নি, মানে একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল, অসুস্থ তো! এই যে নীলু কাল তোমার গায়ে বমি করে দিল, স্বাভাবিক অবস্থায় কি আর করত?

সীতার মতো আমার বলতে ইচ্ছে হল, মা ধরণী, দ্বিধা হও! কাল রাত্তিরে আমি এমন কাণ্ডও করেছি! রূপাবউদির সামনে আর কক্ষনও মুখ তুলে কথা বলা যাবে না।

কিন্তু রূপাবউদি তক্ষুনি আমার গ্লানি কাটিয়ে দিল। বলল, নীলু আমাদের চেনা, তাব এক দিন হঠাৎ অসুখ করেছে, সে-কথা আলাদা। আর একটা রাস্তার লোক, চিনি না, শুনি না, আমাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই —।

বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে ঠিক যেন এরই উত্তর ভেসে এল, আমাকেও কেউ চেনে না, আমিও কারুকে চিনি না। এই হল সোজা কথা! হায়, মাধুরী! কেউ কিছুই জানল না!

স্বর্ণ ফিস ফিস করে চোখের ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, নিলয়দা, একটু দেখব? কামড়ে দেবে?

পাপুন বলল, এসো না, এসো, আমি জানলা দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি!

নিলয়দা বলল, না না স্বর্ণ, জানলার কাছে যেও না। ও মেয়েদের সহ্য করতে পারে না!

তারপর আমাকে বলল, তুই একটু দেখ তো, নীলু! তোর চেনা কিংবা কোথাও আগে দেখেছিস কি না! আমার কিন্তু মুখটা খুব চেনা চেনা লাগে।

আমি খুব সন্তর্পণে জানলার কাছে গিয়ে উঁকি দিলাম। আমার পেছনে এসে দাঁড়ালো স্বর্ণ।

ঘরের মধ্যে খাটের ওপরে হাঁটু গেড়ে বসে আছে এক জন লোক। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা, পঁয়তিরিশেক বয়স। পরনে একটা অতি নোংরা খাঁকি প্যান্ট, আর একটা পরিষ্কার পাঞ্জাবি, সেটা নিশ্চয়ই নিলয়দার। লোকটির মুখে খোঁচা দাড়ি, মাথার চুলে জট। লোকটি এক সময় বেশ সুপুরুষ ছিল। গালে, কপালে, অনেকগুলো ক্ষততে স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো।

আমাদের দিকে পেছন ফিবে বসেছিল লোকটি। হঠাৎ এক সময়ে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। আমাকে নয়, স্বর্ণকে দেখতে পেয়েই যেন চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে উঠল তার। হুঙ্কার দিয়ে বলল, অত সোজা নয়, আমার তিনটে চোখ আছে।

সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড়িয়ে সরে এলাম আমরা। না, এই লোকটিকে আমি আগে কোনও দিন দেখিনি!

॥ ৩॥

স্বর্ণ মেয়েটি কিন্তু বেশ কাজের। পাপুনের স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছিল বলে চটপট করে তৈরি করে দিল তাকে। রান্নার লোকটি অনুপস্থিত বলে রূপাবউদি দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, স্বর্ণ বলল, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। নিলয়দা আর দেরি করতে পারছেন না, তাঁকে এক্ষুণি অফিসে যেতে হবে, সেখানেই দুপুরে কিছু খেয়ে নেবেন বলেছিলেন, স্বর্ণ বলল, দশ মিনিট বসুন না! একটু কিছু খেয়ে যাবেন, লুচি ভেজে দিচ্ছি! দিদি, তুই আলুভাজা কর, আমি ময়দা মেখে দিচ্ছি!

খেতে বসে নিলয়দা বলল, রূপা আজ অফিসে যাচ্ছ না তাহলে? তোমার তো ছুটি পাওনা আছে। নীলু রইল বাড়িতে, চিন্তার কিছু নেই।

রূপাবউদি বলল, পাগলটা যদি ঘর থেকে বেরুতে চায়, নীলু একা কী করবে? ও গায়ের জোরে পারবে?

একটা পাগলের সঙ্গে গায়ের জোরের প্রতিযোগিতায় নামতে হবে, এটা ভেবেই আমি শিউরে উঠলাম। নিলয়দা আমাকে এ কী-রকম প্যাঁচে ফেলে দিল! কাল রাত্তিরে আমার বিপদের সময় নিলয়দা সাহায্য করেছে, আমার মুখ থেকে বমি মুছে দিয়েছে, সুতরাং এখন আমি অকৃতজ্ঞের মতো পালিয়ে যেতেও পারি না।

স্বর্ণ জিজ্ঞেস করল, নিলয়দা, তোমার হঠাৎ পাগল পোষার শখ হল কেন?

নিলয়দা বলল, ওকে একটু সারিয়ে সুরিয়ে তোর সঙ্গে বিয়ে দেব। তুই যেমন পাগলি, তোর সঙ্গে মানাবে!

না নিলয়দা, সিরিয়াসলি, তুমি রাস্তা থেকে পাগল ধরে আনলে কেন?

আমি বললাম, আমারও সেটা জানতে ইচ্ছে করছে। নিলয়দা, তুমি কিছু এক্সপেরিমেন্ট করতে চাও?

নিলয়দা মুখ তুলে অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, এক্সপেরিমেন্ট মানে? একটা লোককে রাস্তার ছেলেরা পিটিয়ে মেরে ফেলছিল, আমি চোখের সামনে সেটা দেখব? তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করব না?

রাস্তার ছেলেরা ওকে মারছিল কেন?

তা আমি জানি না। আজকাল তো যেখানে সেখানে একদল লোক মিলে এক জন দু'জন লোককে পিটিয়ে মেরে ফেলে। কাগজে পড়ো না? চোর, ডাকাত কিংবা ছেলেধরা বলে সন্দেহ হল, অমনি ব্যাস, কোনও কথা শোনার আগেই সবাই মারতে শুরু করল। এই লোকটি নাকি রাস্তার কোনও এক জন ভদ্রমহিলাকে তাড়া করেছিল। সত্যি-মিথ্যে জানি না।

তুমি গিয়ে আটকালে?

আর একটু দেরি হলে নির্ঘাৎ মেরেই ফেলত। রামমোহন লাইব্রেরির সামনে, তখন সন্ধে ছ'টা, রাস্তায় কত লোকজন, বাস-ট্রাম যাচ্ছে, তার মধ্যে এক দঙ্গল ছেলে মিলে একটি পাগলকে পিটিয়ে মেরে ফেলছে, কেউ আটকাচ্ছে না। অনেকে দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। একেবারে লিঞ্চিং-এর দৃশ্য, এই টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরিতেও! আমি গিয়ে বাধা দিতেই সবাই হই হই করে উঠল। যেন আমাকেও মেরে বসবে আর কা!

রূপাবউদি বলল, মারতেও পারত। এই সব ব্যাপারে যে বাধা দিতে যায়, তাকেও লোকেরা ছাড়ে না।

নিলয়দা বলল, কয়েক জন আমাকে ধাক্কাধাক্কি করেছিল। বলে যে, ছেড়ে দিন, ওকে শেষ করে দেব! শালা, মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলেছে। মেয়েদের কিছু ব্যাপার হলেই পাড়ার সব ছেলেরা একেবারে বীরপুরুষ হয়ে ওঠে। তা-ও আবার কী, একটা মেয়ে না খেতে পেয়ে ভিক্ষে করুক, তার কোলের ছেলেটা ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদুক, কেউ ফিরেও তাকাবে না। কিন্তু ভিখিরি মেয়েটার আঁচল ধরে যদি কেউ টান দেয়, অমনি পাড়ার নীতি-রক্ষকরা হই হই করে উঠবে।

স্বর্ণ বলল, এ তো জানিই। সব জায়গাতেই এই অবস্থা। কিন্তু... তা বলে তুমি একটা পাগলকে বাড়িতে নিয়ে আসবে? দিদি কী করে সামলাবে?

খাওয়া বন্ধ রেখে আহত ভাবে নিলয়দা বলল, তোমরা বলতে চাও, একটা লোককে সবাই মেরে ফেলছে, চোখের সামনে তা দেখেও আমি লোকটাকে সেখানে ফেলে রেখে চলে আসব? যারা এ-রকম করে, তারা কি মানুষ?

অনেক সরল প্রশ্নেরই কোনও উত্তর হয় না। এ-দেশে এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে। লক্ষ মানুষ এ-সব দেখেও কোনও প্রতিবাদ করে না। আমি নিজেও তাদের মধ্যে এক জন। এই সব লক্ষ লক্ষ

লোককে মানুষ না বলে কী বলব? যারা মারে তারাও মানুষ, যারা দূর থেকে দেখে তারাও মানুষ, যে মরে সে-ও মানুষ!

হঠাৎ নিলয়দা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, একটু সামলে নিয়ে বলল, ওই ছেলেগুলো আমাকে বলল, আপনি যে ওকে গার্ড দিচ্ছেন, আপনি ওর দায়িত্ব নেবেন? ও যদি আবার মেয়েছেলেদের তাড়া করে। আমি বললাম, দেখো, ও লোকটা তো অসুস্থ, ও তো সজ্ঞানে কিছু করে না। তা-ও ছেলেগুলো আমাকে তেড়ে তেড়ে বলতে লাগল, আপনি ওর দায়িত্ব নেবেন? বড্ড যে বড়ফট্টাই করছেন! তখন আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি ওর দায়িত্ব নেব। আমি ওকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি!

লোকটা আসতে রাজি হল তোমার সঙ্গে?

দেখো, পাগলেরও কিছুটা কিছুটা জ্ঞান তো থাকে! লোকটা মার খেয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল, আর কয়েকটা লাঠির ঘা খেলে আর উঠতেই পারত না। আমি ওকে তুলে দাঁড় করিয়ে বললাম, চলুন, আপনি আমার সঙ্গে চলুন। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত জড়িয়ে ধরে এমন ব্যাকুল ভাবে আমার মুখের দিকে তাকাল, সেই চাউনিতে কী যে ছিল তোমাদের কী করে বোঝাব? আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। মানুষের ও-রকম চরম অসহায় দৃষ্টি আমি কখনও দেখিনি! ওকে নিয়ে একটা রিকশায় উঠলাম। ও সারাক্ষণ আমার হাতটা চেপে ধরে রইল।

ও নিজের নাম-টাম কিছু বলতে পারে না?

ও নিজে থেকে মাঝে মাঝে কথা বলে ওঠে। কিন্তু কোনও প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় না। কথা শুনলে মনে হয়, লেখাপড়া জানত। কালকে বাড়িতে আসার পর প্রথম ঘণ্টা দু'এক কিন্তু বেশ শান্ত ছিল। তাই না রূপা?

রূপাবউদি বলল, আমার এই হাতটা ধরে টপ করে মুখে পুরে দিল। যদি আঙুলগুলো কামড়ে ছিঁড়ে নিত?

নিলয়দা বলল, সেই একটা আনফরচুনেট ব্যাপার। ওর গায়ের অনেকগুলো ইনজুরি হয়েছিল, রক্ত পড়ছিল, সব ধুয়ে-টুয়ে পরিষ্কার করে দিলাম। রূপাও আমাকে সাহায্য করছিল, হঠাৎ এক সময় রূপাকে কামড়ে দিতে গেল! তার পরেও দু'বার দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে গেছে। আমার মনে হয় মেয়েদের ব্যাপারে ওর কিছু গণ্ডগোল আছে। পাপুনকে কিন্তু কিছু বলেনি!

স্বর্ণ জিজ্ঞেস করল, এখন ওকে নিয়ে কী করবে?

নিলয়দা টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সেটা চিন্তা করে দেখছি। আজকের দিনটা যাক। নীলু রইল, তোমাদের কোনও ভয় নেই!

আমি বললাম, ইয়ে, মানে, নিলয়দা, বউদিরা বোধহয় আমার সম্পর্কে খুব একটা ভরসা পাচ্ছে না। ধরো যদি লোকটা দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে চায়, তখন কী করব?

দরজা তো বাইরে থেকে বন্ধ আছে।

যদি বেরুতে চায়? দরজা ধাক্কাধাক্কি করে? দরজা তো ভেঙে ফেলতেও পারে?

আরে না, সে-রকম ভায়োলেন্ট পাগল নয়। ধমক দিলে কথা শোনে। আমার তো মনে হয়, ও তোমার কথাও শুনবে।

নিলয়দা, আমার ব্যক্তিত্বের ওপর তোমার অগাধ বিশ্বাস থাকতে পারে, কিন্তু আমার নিজেরই সে-রকম বিশ্বাস নেই। ধরো ওর যদি বাথরুম পায়, কিংবা রাস্তায় বেরিয়ে যেতে চায়।

সকালবেলা আমি ওকে বাথরুম দেখিয়ে দিয়েছি। ও নিজেই বাথরুমে গেছে। সেটুকু সেন্স আছে।

রূপাবউদি বলল, আমি আর কোনও দিন ওই নিচের বাথরুমে ঢুকছি না।

নিলয়দা বলল, জমাদার এসে পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে। আচ্ছা, একটা পরীক্ষা করা যাক। আমি থাকতে থাকতেই নীলু, তুই একবার ওর ঘরে গিয়ে ঢোক, ওর সঙ্গে দু'একটা কথা বলে আয়। দেখ কী করে!

আমি? ওর ঘরে ঢুকব?

তুই একটা জলের জাগ রেখে আয় ওর ঘরে। ওর তো জলতেষ্টা পেতে পারে। আমি পাঁউরুটি আর জ্যাম রেখে এসেছি ওর ঘরে, খিদে পেলে তাই খাবে। চল না, ভয় কী, আমি তো আছি!

স্বর্ণ খুব মজা পেয়ে আমার দিকে ঠোঁট টিপে হাসছে। নিলয়দা যখন ধরেছে, তখন যেতেই হবে, তর্ক করে লাভ নেই। শরীরটা যদি ভাল থাকতো, অনেক বেশি সাহস দেখাতে পারতাম।

একটা প্লাস্টিকের জাগে জল নিয়ে আমি পাগলের ঘরের হুড়কোটা খুললাম। লোকটি খাটের ওপর হাঁটু গেড়ে ঠিক একই ভঙ্গিতে বসে আছে। আমি ঘরের মধ্যে ঢোকার পর সে ফিরেও তাকাল না। দেয়াল-ঘেঁষা একটা ছোট টেবিলের ওপর খাবার রয়েছে। আমি জাগটা সেখানে নামিয়ে রাখলাম।

তারপর বললাম, এই যে, খাবার জল রইল।

আমার গলা কাঁপেনি বটে, কিন্তু বুকের মধ্যে এমন টিপ টিপ করছে যে, সে-শব্দ যেন নিজেই শুনতে পাচ্ছি। পাগকে এত ভয় পাবার কী আছে? প্রত্যেক মানুষেরই ব্যবহার সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা করে নিই, পাগল সম্পর্কে সেই ধারণাটা করা যায় না বলেই ভয়?

আমার কথা শুনেও লোকটি ফিরে তাকাল না।

নিলয়দা এবারে ঘরের মধ্যে ঢুকে বলল, এই যে, শুনছেন? এর নাম হচ্ছে নীলু। আমার ছোট ভাইয়ের মতো, এ আপনার দেখাশুনো করবে। কোনও দরকার হলে একে ডাকবেন।

লোকটি তবু ফিরে তাকাল না। সে এক মনে দেয়াল দেখছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিলয়দা হাসিমুখে বলল, দেখলি? ভয়ের কিছু নেই, এমনিতে খুব শান্ত। আসলে কী জানিস, একবার যাদেব একটু মাথার গোলমাল হয়, অন্যলোক তাদের এত ডিসটার্ব করে যে তাতে তাদের আরও মাথা খারাপ হয়ে যায়।

ঘবের দবজাটা বন্ধ করে দিযে নিলয়দা বলল, ঠিক আছে। আমি চললাম। পাঁচটা পঁয়তাল্লিশের মধ্যেই ফিবে আসব। নীলু, তোর বাড়িতে খবর দিয়ে দেব।

বাড়িতে এখন এক পাগল আর দুই যুবতী, মাঝখানে আমি। অবস্থাটা মোটেই সুখকর নয়। স্বর্ণ যে প্রথমে এ বাড়িতে এসে আমাকেই পাগল ভেবেছিল, সে-জন্য মনে একটা জ্বালা ধরে আছে। ওর দিকে ভাল করে তাকাতেই ইচ্ছে করছে না। পৃথিবীতে একমাত্র নিলয়দা ছাড়া আর কারুর অনুরোধেই পাগল-পাহারা দেবার কাজ নিতে রাজি হতাম না আমি।

বসবার ঘরে এসে রূপাবউদি বলল, এবারে একটু ভাল করে চা খাওয়া যাক। আমি জল বসিয়ে দিয়ে আসছি। দুপুরে আর খাওয়া-দাওয়া নিয়ে বেশি ঝঞ্ঝাট করার দবকার নেই। বেশি করে ময়দা মাখা আছে, লুচি আর ডিম ভাজা খেয়ে নিলেই হবে।

একটু থেমে গিয়ে রূপাবউদি বলল, কিন্তু নীলু, তুমি কী খাবে? তোমার কি লুচি সহ্য হবে!

আমি আজকের দিনটা উপোস দেব।

সেটা কিন্তু খারাপ নয়। আজ স্টমাককে রেস্ট দেওয়াই উচিত। বিকেলের দিকে যদি খিদে পায়, তখন চিঁড়ে ভিজিয়ে দেব!

রূপাবউদি ঘর ছেড়ে চলে যেতেই আমি খবরের কাগজ টেনে নিলাম। টেবিলের ওপর পড়ে থাকা পত্রপত্রিকাগুলো গুছোচ্ছে স্বর্ণ। ঘরের মধ্যে শুধু একটি ছেলে আর একটি মেয়ে উপস্থিত থাকলে ছেলেটিকেই প্রথম কথা শুরু করতে হয়। আমার সে-রকম কোনও উৎসাহ নেই।

কিন্তু স্বর্ণ এ-সব নিয়ম মানে না। সে একটু পরেই জিজ্ঞেস করল, আপনার বুঝি লুচি সহ্য হয় না? এ-রকম আমি কক্ষনও শুনিনি।

আমি শুধু মুখ তুলে তাকালাম একবার। কোনও উত্তর দিলাম না।

আপনি কাল আমার দিদির গায়ে বমি করে দিয়েছিলেন কেন? খুব মদ খেয়ে এসেছিলেন?

এবারে আমাকে একটা কড়া চাহনি দিতেই হল। তারপর বললাম, আমি ড্রিঙ্ক করলেও কোনও দিন বমি করি না। কাল আমার ফুড পয়জনিং হয়েছিল, আর খুব জ্বর, জ্ঞান ছিল না।

ফুড পয়জনিং হলে বুঝি নিজের বাড়ি না ফিরে বমি করার জন্য অন্য লোকের বাড়িতে যেতে হয়?

আমার কাল বাড়ি ফেরার উপায় ছিল না। আপনি বোধহয় নিলয়দার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক তা জানেন না।

ফট করে আলো জ্বলে ওঠার মতো স্বর্ণর মুখটা ঝলমলে হাসিতে ভরে গেল। মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে হাসতে হাসতে স্বর্ণ বলল, আপনার ভাগ্যিস গোঁফ নেই, থাকলে গোঁফগুলো এখন সব খাড়া খাড়া হয়ে উঠত! বাবাঃ! কী রাগ, রেগে গেছেন! ছেলেদের রাগাতে আমার খুব ভাল লাগে। ছেলেরা ভাবে মেয়েরা সব সময় মিষ্টি মিষ্টি নরম নরম কথা বলবে! একুট অন্য রকম বললেই তাদের রাগ হয়ে যায়।

এবারে আমি একটা অবজ্ঞার হাসি দিলাম। স্বর্ণর সঙ্গে আমি ছেলেখেলা করতে চাই না।

পাশের ঘরের পাগলটি আবার যেন কী বলে উঠল। বোঝা গেল না ঠিক।

স্বর্ণ একটা চেয়ার টেনে ঠিক আমার মুখোমুখি বসল। আমি সোজা ওর চোখের দিকে তাকালাম। এমএসসি পাশ করার পর অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিকস বা ওই ধরনের কোনও বিষয় নিয়ে রিসার্চ করছে স্বর্ণ। শুনেছি ভাল সাঁতারও কাটে। মুখে একটু কঠোর ভাব থাকলেও শরীরের গড়নটি বেশ সুন্দর, রূপাবউদির মতোই লম্বা। এই ধরনের মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টাই আমি করি না। বিদেশি বাতাস এদের উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। আর দু'চার বছরের মধ্যে বিলেত বা আমেরিকার কোনও বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তারের ঘরণী হয়ে স্বর্ণ অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিকস ভুলে যাবে। ছেলেপুলে মানুষ করায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে। চোখের দিকে তাকিয়ে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি স্বর্ণর ভবিষ্যৎ জীবন।

স্বর্ণ জিজ্ঞেস করল, আপনি কোন ইয়ারে পাশ করেছেন?

কী পাশ করার কথা বলছেন? আমি কিছুই পাশ করিনি।

আপনি ইউনিভার্সিটিতে পড়েননি?

না।

কিন্তু আপনাকে আমি কলেজস্ট্রিট কফি হাউসে দেখেছি।

ফেল করা ছাত্রদের কি ওখানে যাওয়ার কোনও নিষেধ আছে?

স্বর্ণ এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। নারী-সুলভ কোনও সঙ্কোচ নেই। একবারে চোখ দু'টি একটু কুঁচকে গেল। তারপর অনেকটা আপন মনে বলল, আমি আপনাকে স্টাডি করার চেষ্টা করছি, কিন্তু ঠিক ধরতে পারছি না। আপনি বেশ এলিউসিভ ক্যারেকটার।

ধন্যবাদ।

কীসের জন্য?

আমার সম্পর্কে আপনি এতটা আগ্রহ প্রকাশ করছেন বলে। কোনও সুন্দরী মেয়ে আমাকে স্টাডি করতে চাইছে, এ-রকম সৌভাগ্য আমার ঘটে না।

নিলয়দা আপনাকে দুপুরটা এখানে থাকতে বলল, আপনি থেকে গেলেন। কাল রাত্তিরে বাড়ি ফেরেননি। আপনি বুঝি প্রায়ই এ-রকম যেখানে সেখানে থেকে যান?

সবাই থাকতে দেয় না, কেউ কেউ তাড়িয়েও দেয়।

নিলয়দাকে আপনি কত দিন ধরে চেনেন?

এই চার-পাঁচ বছর।

নিলয়দা একটা পাগল ধরে এনেছে, আপনি জানেন, নিলয়দা নিজেও একটা পাগল?

রূপাবউদি চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকে বললেন, কী হয়েছে? ঝগড়া করছিস নাকি?

স্বর্ণ বলল, না, আমি বলছিলাম যে নিলয়দা নিজেও একটা পাগল।

ঠিক বলেছিস! মাঝে মাঝে যা কাণ্ড করে... শোনো নীলু, তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে। এই পাগলটাকে নিয়ে কী করা যায়, তা আমাদেরই ঠিক করতে হবে, তোমার নিলয়দার কথা শুনলে চলবে না।

স্বর্ণ বলল, নিলয়দা ওকে নিয়ে কী করবে, আমি জানি। নিলয়দা ওর চিকিৎসা করবে, ডাক্তার ডেকে নয়, নিজে নিজে!

রূপাবউদি বলল, সে ওর যা ইচ্ছে হয় করুক। কিন্তু ওকে এ বাড়িতে রাখা চলবে না। সব সময়ে নিজের বাড়িতে ভয়ে ভয়ে থাকব নাকি আমি? ওকে কোনও একটা পাগলা গারদে ভর্তি করার ব্যবস্থা করো।

রাঁচিতে পাঠিয়ে দিলেই হয়!

কলকাতাতেও কী একটা উন্মাদ আশ্রম আছে না? রাস্তার লোকেরা একটা পাগলকে মারছিল, সে-জন্য পুলিশে খবর দিলেই তো হয়? পুলিশ যা ব্যবস্থা করার করবে। বাড়িতে নিয়ে আসার কোনও মানে হয়!

এবারে আমি খানিকটা সন্দেহ জানিয়ে বললাম, বউদি, পুলিশে কি পাগল ধরে? তাহলে রাস্তায় প্রায়ই পাগল ঘুরে বেড়াতে দেখি কেন?

রূপাবউদি বলল, এটা তো পুলিশেরই কাজ!

পাশের ঘরের দরজায় দুম দুম করে ধাক্কা পড়তেই আমরা সবাই নিস্তব্ধ হয়ে গেলাম। ধাক্কার শব্দ থামল না।

আমাকে উঠতেই হল। পাগলটা দরজায় জোরে জোরে লাথি মারছে।

আমি কাছে গিয়ে কড়া গলায় ধমকে বললাম, কী হয়েছে? এত জোরে ধাক্কা দিচ্ছেন কেন?

পাগলটি সরাসরি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, কোনও দরজা আমাকে চায় না, আমিও কোনও দরজা চাই না! সোজা কথা!

দরজা খুলে দেব?

কোন শালা ষাঁড়ের ল্যাজ মুচড়ে দিয়েছিল, অ্যাঁ? কোন শালা!

এত জোরে সে লাথি মারছে দরজায় যে, এই আওয়াজে এবার পাড়া-প্রতিবেশিরা ছুটে আসবে। আমি হুড়কোটা খুলে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে রূপাবউদির ভয় পেয়ে বসার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

পাগলটি বেরিয়ে এসে দাঁড়াল উঠোনের মাঝখানে। তার মাথার এক পাশের চুলে রক্ত চাপ বেঁধে আছে। পাঞ্জাবির পিঠের কাছেও লেগে আছে রক্তের ছাপ। নিলয়দা না আটকালে একে কাল রাস্তার

লোকে মেরেই ফেলত, কোনও সন্দেহ নেই। আজকাল কেউই দু'চার ঘা থাপ্পড় দিয়ে কারুকে ছাড়ে না।

পাগলটি অস্থির পায়ে উঠোনের এ-দিক ও-দিক ঘোরাঘুরি করতে লাগল। কী যেন খুঁজছে। তারপর হঠাৎ চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে চেয়ে রইল আকাশের দিকে।

আমার মনে হল, ওর তো রাস্তায় শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখা অভ্যেস, তাই অনেকক্ষণ আকাশ না দেখে ও বোধহয় অস্বস্তি বোধ করছিল।

শুয়ে শুয়ে ও বলতে লাগল, আমিও ষাঁড়ের ল্যাজ মুচড়ে দিইনি, তুমিও ষাঁড়ের ল্যাজ মুচড়ে দাওনি, তাহলে কে দিল? শুধু শুধু ষাঁড়টা খেপে গেল? অ্যাঁ, এই তো অবস্থা! আমি যদি সব সত্যি কথা বলে দিই, তুমি যদি সব সত্যি কথা বলে দাও, তবে চন্দ্র-সূর্য পর্যন্ত লজ্জা পেয়ে যাবে! কিন্তু তুমিও লজ্জা পাবে না, আমিও লজ্জা পাব না। মানুষ লজ্জা পায় না। অ্যাঁ? এই তো অবস্থা!

লোকটির গলার আওয়াজ গমগমে, উচ্চারণও স্পষ্ট। এখন পাগল বলে মনেই হয় না। এই সব কথাগুলো কি কোনও নাটক বা যাত্রার সংলাপ? আমার ভয় ভয় ভাবটা কিছুতেই কাটছে না। নেহাৎ দু'জন মহিলা উপস্থিত আছে বলে আমাকে সাহসী হতেই হবে। কাছে এগিয়ে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নাম কী?

লোকটি বড় বড় চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি প্রথমে নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বললাম, আমার নাম নীলু!

তারপর ওর বুকের দিকে আঙুল নির্দেশ করে বললাম, আপনার নাম কী?

লোকটি বলল, কুত্তার বাচ্চা! আমাকে লাঠি দিয়ে মারছিল।

আপনাকে মারছিল? কেন? কী হয়েছিল?

আমাকে কেউ চেনে না, আমিও কারুকে চিনি না, ব্যাস! সোজা কথা। লোকটি আবার ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াতেই আমি সরে গিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালাম।

লোকটি আবার বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল। মাঝে মাঝে দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে দেয়ালটাকে ঠেলবার চেষ্টা করে, তার লম্বা লম্বা আঙুলগুলো দেয়ালের গায়ে যেন চেপে বসে যাবে। এক জায়গার দেয়াল ছেড়ে আবার অন্য জায়গার দেয়ালের কাছে যায়। এক জন মানুষ দেয়াল ঠেলে সরাবার চেষ্টা করছে, এই দৃশ্য দেখলে গা ছম ছম করে। এর মধ্যে যেন পৌরাণিক আভাস আছে। লোকটিকে এখন অন্ধ মনে হয়।

একবার সে বসবার ঘরের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল। ভেতরে একটা হুড়োহুড়ির শব্দ পেলাম। বউদিরা নিশ্চয়ই কোনও ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে লক্ষ্য রাখছিল।

লোকটি কিন্তু দরজাটা ধাক্কাল না। দরজার গায়ে গাল ঠেকিয়ে আঁ আঁ করে একটা কাতর শব্দ করতে লাগল, আমার দিকে তার চোখ। ওর ভেতরে একটা কিছু প্রবল কষ্ট হচ্ছে যেন। কিন্তু ভাষা দিয়ে তো ওর মনের কথা জানার উপায় নেই।

হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে সদর দরজার কলিং বেলটা বেজে উঠল ঝন ঝন করে। দু'বার বেলটা বাজল। আমি দৌড়ে গিয়ে খুলে দিলাম দরজাটা। দু'জন অচেনা মহিলা দাঁড়িয়ে, এক জন মিহি গলায় বলল, আমরা মার্কেটিং রিসার্চের ব্যাপারে এসেছি, আপনারা কী টুথপেস্ট ব্যবহার করেন —।

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, বেলের আওয়াজ শুনে পাগলটিও চমকে উঠেছিল, সে-ও এই দিকে এসেছে, আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই পাগলটা মেয়েদের দেখলেই হিংস্র হয়ে ওঠে, আমার দরজা খোলাই ভুল হয়েছে।

আমি বললাম, এখন সময় নেই, পরে আসবেন!

অন্য মহিলাটি আরও মিহি গলায় বলল, দেখুন আমরা মাত্র সাত মিনিট সময় নেব, আমাদের একটা কোয়েশ্চেনেয়ার আছে।

বললাম তো এখন সময় নেই!

দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলাম ওদের মুখের ওপর। ওরা বোধহয় আমাকেই পাগল ভাবল।

পাগলটির নিশ্বাসের আঁচ যেন লাগল আমার গায়ে। আমি শিউরে উঠে সরে গেলাম। পাগলটি সত্যিই আমার গা ঘেঁষে এসেছে, আমি তাড়াতাড়ি চলে এলাম উঠোনের দিকে। এক জন মানুষের সান্নিধ্যে কখনও এ-রকম ঘিনঘিনে ভাব হয়নি। লোকটির গায়ে একটা উৎকট গন্ধও আছে বটে।

সদর দরজার ছিটকিনিটা বন্ধ করা হয়নি। পাগলটা যদি বাইরে বেরিয়ে যায়? যায় তো যাবে, আমার বাধা দেবার কোনও মানে হয় না। কারুর ব্যক্তিস্বাধীনতায় আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না। ও এখানে থাকবে না যাবে, তা ও নিজেই ঠিক করুক।

কিন্তু ও গেল না। হয়তো সব দরজাই ও বন্ধ মনে করে। দরজাটার গায়ে একটা কিল মেরে ও ফিরে এল উঠোনে। ফিস ফিস করে বলল, ষাঁড়ের ল্যাজ কে মুচড়ে দিয়েছে? তুমিও দাওনি, আমিও দিইনি! এই তো ব্যাপার। হায় মাধুরী!

তারপর আমার দিকে একটা ঘোলাটে দৃষ্টি দিয়ে আফিংখাওয়ানো জন্তু যেমন ভাবে আবার খাঁচার মধ্যে ফিরে যায়, সেইভাবে ঢুকে গেল নিজের ঘরে। নিজেই দরজাটা বন্ধ করল। আমি হুড়কো টেনে দিলাম। আমি রীতিমতো ঘেমে গেছি। নিলয়দা বড্ড কঠিন দায়িত্ব দিয়ে গেছে আমার ওপরে। এরই মধ্যে আমি অবসন্ন বোধ করছি। এই পাগল এ-রকম ভাবে কতবার ঘর থেকে বেরুবে কে জানে!

বসবার ঘরের দরজাটা আবার খুলে গেল। গনগনে রাগী মুখে রূপাবউদি বলল, তুমিই বলো, এ-ভাবে বাড়িতে থাকা যায়?

স্বর্ণ বলল, আমার কিন্তু লোকটাকে ভাল করে দেখতে ইচ্ছে করে। কী-রকম পাগল? কোনও আশা নেই?

রূপাবউদি বলল, থাক, আর দেখতে হবে না। চল আমরা ওপরে যাই। ওপরের সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি। নীলু, তুমি নিচে থাকো।

আমি বসবার ঘরের সোফায় গা এলিয়ে দিলাম।

আস্তে আস্তে খিদে পাচ্ছে। কাল বিকেলের পর কিছুই খাইনি, বমি করেছি প্রচুর। খিদেটাই স্বাস্থ্যের লক্ষণ। রূপাবউদি দুপুর খেতে দেবেন না বলেছেন। দেখা যাক।

সাত্যকি বসুমল্লিকের কথা মনে পড়ে গেল আবার। তিনি এখন কী করছেন? এখন এগারোটা-সাড়ে এগারোটা বাজে। সাত্যকি বসুমল্লিকের মতো বনেদী পরিবারেব লোকেরা আগে এই রকম সময়ে ঘুম থেকে উঠত। কিন্তু সে-সব দিন আর নেই, তাছাড়া ইনি কর্মিষ্ঠ পুরুষ, ভাবভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায়। সাত্যকি বসুমল্লিকের তিন-চারটে ব্যবসা, তারই কোনও একটা অফিসে তিনি এখন বসে আছেন নিশ্চয়ই। মস্ত বড় একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল। যার যত বড় টেবিল তার তত বেশি ব্যক্তিত্ব। তুচ্ছ একটা কাঠের টেবিল, কিন্তু তার এ-পাশে আর ও-পাশে বসবার মধ্যেই অনেক কিছুই বদলে যায়। আমাদের স্কুলে অঙ্কের টিচার ছিলেন অম্বিকাবাবু, তাঁর মেজাজের কাছে আমরা কাঁচুমাচু হয়ে থাকতাম। তিনিই আবার হেড মাস্টারের টেবিলের উলটো দিকে বসলে মিন মিন করে কথা বলতেন। অম্বিকাবাবুর ছেলে নকশাল হয়েছিল, সেই কারণে তাঁকে একবার যেতে হয়েছিল থানায়, সেখানে দারোগার টেবিলের উলটো দিকে বসে তিনি একেবারে কেঁচো হয়ে গিয়েছিলেন। অথচ কত হবু-দারোগা কিংবা হবু-জজ-ম্যাজিসট্রেট অম্বিকাবাবুর দাঁতখিচুনি খেয়ে গেছে!

সাত্যকি বসুমল্লিকের নিখুঁত ভাবে দাড়ি কামানো ফর্সা মুখে নীলচে আভা। টেবিলের ওপর তিনখানা টেলিফোন। একটা কালো, একটা সাদা, একটা গোলাপি। সবুজ টেলিফোন হয়, হলদেও হয়, টুকটুকে লালও হয়। তাহলে সাত্যকি বসুমল্লিকের ঠিক কী কী রঙের টেলিফোন আছে, এটা যেন জানা আমার বিষম দরকার। অফিসে নিশ্চয়ই ধুতি-পাঞ্জাবি পরে যান না। স্যুট না ক্যাজুয়াল? কোনও দিন এই ধরনের মানুষের মাথার চুল কপালে এসে পড়ে না। উনি ধূমপান করেন না, আমি লক্ষ্য করেছি, ভিজিটারদের সঙ্গে কথা বলার সময় হাতের কলমটা কামড়ে ধরাও ওঁর পক্ষে অসম্ভব।

নেতারহাট বাংলোতে হঠাৎ দেখা হয়েছিল, তবু উনি বলেছিলেন, ঠিক আমার মতো একটি ছেলেকেই উনি খুঁজছেন, আমাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছিলেন ওঁর সঙ্গে কলকাতায় দেখা করবার জন্য। আমি ওঁর কাছে চাকরি চাইনি, কোনও রকম দৈন্য প্রকাশ করিনি, তবু আমাকে এ-রকম প্রস্তাব দেবার মানে কী? একে স্পর্ধা বলে না? কলেজ জীবনে আমরা এই ধরনের লোকদের বলতাম অমায়িক খচ্চর!

আমি এখন পাগলের পাহারাদার হয়ে বসে আছি, আর সাত্যকি বসুমল্লিক হাসি মুখে একদল মানুষের ওপর দয়ালু-প্রভুত্ব করে যাচ্ছেন। আমি ওঁর সঙ্গে জায়গা বদলাবদলি করতে চাই না, কিন্তু কোনও এক দিন সাত্যকি বসুমল্লিককে রাস্তার কোনও পাগলের মুখোমুখি দেখতে চাই। সাত্যকি বসুমল্লিক পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলে আমি বলব, তুমি নিলয়দার পা ধোয়া জল খাও।

পাগলটা আবার কী যেন চেঁচিয়ে উঠল। আমার উঠতে ইচ্ছে করল না। দরজায় তো লাথি মারেনি।

পাগলটার নামটা পর্যন্ত জানা গেল না। এক জন মানুষকে আমি দেখাশুনো করছি, অথচ তার নাম জানি না, এর কোনও মানে হয়? খানিকক্ষণ ধরে আমি ভাবতে লাগলাম, ওর কী একটা নাম দেওয়া যায়। প্রথমে মনে এল দিগম্বর। তারপর ভাবলাম, এক জন লম্বা-চওড়া, মোটামুটি সুশ্রী মানুষের ওপর এ-রকম একটা বিদঘুটে নাম চাপিয়ে দেওয়া কি উচিত? না, এটা অন্যায়। তারপর মনে পড়ল, ভোলানাথ। হ্যাঁ, এই নামটাই ওকে মানাবে।

॥ ৪ ॥

নিলয়দা ভোলানাথের ছবি তুলে দু'টি খবরের কাগজে সেই ছবি ছাপিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। এর মধ্যে দিন চারেক কেটে গেছে আমি আর ওদিক ঘেঁষিনি। খবর পেয়েছি নিলয়দা ভোলানাথকে এখনও বাড়ি থেকে সরায়নি, সুতরাং নিলয়দার স্ত্রী ও শ্যালিকা, এই দুই তলোয়ারের মতো জিভওয়ালা নারী যে প্রতি মুহূর্তে নিলয়দাকে কচুকাটা করছে, তা বোঝাই যায়। ওর মধ্যে আমি সাধ করে কেন যেতে যাব। তাছাড়া আমার কি নিজস্ব ব্যাপার-স্যাপার নেই?

নিলয়দা ছুটি নিয়েছে অফিস থেকে। বাড়ির টেলিফোন খারাপ, সুতরাং আমাকে ডাকাডাকিও করতে পারছে না। আমিও পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। পাগলটির থেকেও এখন স্বর্ণকেই আমার বেশি ভয়। সে আবার আমার চরিত্র স্টাডি করতে চায়!

দূরে দূরে থেকেও আমি নিলয়দাকে খানিকটা সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলাম। কলকাতার মধ্যে কিংবা কাছাকাছি কোথাও পাগলদের রাখবার ব্যবস্থা আছে কি না তা জানবার জন্য আমি গিয়েছিলাম পার্থদার কাছে। পার্থদা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টের খুব বড় অফিসার, উনি সব হাসপাতালের খবর নিশ্চয়ই জানবেন। পার্থদা আমাকে নিয়ে গেলেন ড. এ আর দত্তগুপ্তর কাছে। ড. দত্তগুপ্ত হলেন ডিএইচএস, অর্থাৎ ডাইরেক্টর অফ হেল্‌থ সার্ভিসেস। ইনি আবার নাম করা নিউরোলজিস্ট।

ড. দত্তগুপ্তকে আমি সব কথা খুলে বললাম। শুনে-টুনে তিনি যা দু'খানা মতামত দিলেন, তা শুনে আমার চক্ষু চড়কগাছ। আর মনটা একেবারে সেঁধিয়ে গেল পাতালে।

ড. দত্তগুপ্ত বললেন, পাগলকে বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া সহজ, কিন্তু তাকে বাড়ি থেকে তাড়ানো অতি কঠিন। দয়া-মায়া এ-সব হল অতি পুরনো ইনস্‌টিংক্ট, এমনকী বিকৃত মস্তিষ্ক মানুষের মনেও এর স্পর্শ একবার লাগলে সহজে মুছে যায় না। রাস্তার যে-পাগল মার খায়, সে যদি হঠাৎ এক জন মানুষের কাছ থেকে দয়া পায়, তবে তাকে আর সে কিছুতেই ছাড়তে চাইবে না। ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেও ফিরে আসবে। এমনকী কোনও নার্সিং হোম বা পাগলা গারদে ভর্তি করে দিলেও সেখান থেকে পালিয়ে ঠিক চলে আসবে রাস্তা চিনে। নিজের ইচ্ছেতে যদি ও চলে না যায়, তাহলে ওকে বিদায় করার সম্ভাবনা খুবই কম।

দ্বিতীয়ত, ওকে রাখা হবে কোথায়? সরকারের অধীনে যে দু'একটা মানসিক চিকিৎসার হাসপাতাল আছে, সেখানে বিন্দুমাত্র ঠাঁই নেই। দেশের সমস্ত বে-ওয়ারিশ পাগলের চিকিৎসার ভার যদি সরকারকে নিতে হয়, তাহলে পশ্চিমবাংলাতেই অন্তত একশোটা আরও এ-রকম হাসপাতাল খোলা দরকার। নানা রকম টেনশান বেড়েছে বলে দেশে পাগলের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে তাদের চিকিৎসা করবার কোনও সুযোগ নেই।

তাছাড়া, ড. দত্তগুপ্ত বললেন, ধরুন যদি কোনও হাসপাতালে জায়গা করা যায়, তাহলেও ওই পাগলটিকে ভর্তি করার দায়িত্ব কে নেবে? অতি নিকট আত্মীয় ছাড়া কোনও মানুষকে কেউ পাগল বলে হাসপাতালে ভর্তি করতে পারে না। এটাই আইন। পয়সা খরচ করে যদি রাঁচিতেও পাঠাতে চান, তাহলেও সার্টিফাই করতে হবে যে, রোগী আপনার কে হয়! মিথ্যে পরিচয় দিলে জেল হয়ে যাবে! কেন বুঝলেন তো? মনে করুন, কারুর ওপরে আপনার রাগ আছে। আপনি তাকে পাগল সাজিয়ে জোরজার করে কোনও পাগলা গারদে ভর্তি করে দিতে তো পারেন!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে কি কোনও উপায় নেই?

ড. দত্তগুপ্ত বললেন, গভর্নমেন্টের ভ্যাগরান্সি কন্ট্রোল বলে একটা ডিপার্টমেন্ট আছে। পাগলটাকে কোনও রকমে রাস্তায় বার করে দিন। ভ্যাগরান্সি কন্ট্রোলের লোকদের আগে থেকেই খবর দিয়ে রাখবেন, তারা যদি ধরে নিয়ে গিয়ে কিছু ব্যবস্থা করতে পারে।

ড. দত্তগুপ্ত আমাকে পাঠালেন ভ্যাগরান্সি কন্ট্রোল অফিসার ইনচার্জ সি.আর দাশের কাছে। সি.আর দাশ কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশ নয়। ইনি হলেন ছবিরানি দাশ।

আমার মনে হয়েছিল ডিএইচএস ড. দত্তগুপ্ত যেন আমার আগ্রহের প্রতি তেমন কোনও গুরুত্ব দেননি। নিলয়দার কাহিনি শুনে তাঁর মনে হয়েছিল, এটা এক জন লোকের উদ্ভট খেয়াল, এখন সে বুঝুক ঠ্যালা! এক জন অসহায় উন্মাদকে কী করে বাঁচানো যায়, সে-সম্পর্কে তাঁর কোনও মাথাব্যথা নেই। তিনি অনেক বড় বড় সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত।

শ্রীমতী সি আর দাশের কাছে এসে সেই প্রমাণই পেলাম। ভদ্রমহিলা এই বিভাগে এক জনের বদলিতে কাজ করছেন, যে-কোনও দিন ট্রান্সফার অর্ডারের অপেক্ষায় আছেন। সব শুনে তিনি ভুরু তুলে বললেন, অ্যাঁ? ডিএইচএস আপনাকে পাঠিয়েছেন আমার কাছে? তিনি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করেছেন আপনার সঙ্গে। ভ্যাগরান্সি কন্ট্রোল ব্যাপারটা কী জানেন? এটা খোলা হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে, শহরের রাস্তায় ভবঘুরে ছেলে-মেয়ে দেখলে তাদের আটকে রাখবার জন্য। এখন এই দফতরটা কেন আছে কেউ জানে না। কলকাতার রাস্তায় এখন পঞ্চাশ-ষাট হাজার মানুষ রাত্তিরে ঘুমোয়, তাদের ক'জনকে আমরা ধরে আনব? অ্যাঁ? বলুন আপনি? আমরা এক জনকেও ধরি না। আমাদের যা

বাজেট, ডিপার্টমেন্টের সব ক'জন কর্মচারীর মাইনে দিতেই কুলোয় না। সুতরাং ডিপার্টমেন্ট আছে, কিন্তু প্রায় কোনও কাজই নেই। হাওড়ার আন্দুল রোডে একটা নতুন ভ্যাগরান্ট হোম তৈরি হবার কথা, কবে সেটা শেষ হবে জানি না। এখন একটা পুরনো লঝঝরে বাড়িতে কিছু ছেলেকে আটকে রাখা হয়েছে। তাদেরই খাওয়া জোটে না, এর পরেও আমরা রাস্তার পাগল ধরে আনব?

আমি বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে রাস্তার পাগল ধরার কোনও ডিপার্টমেন্ট নেই?

ছবিরানি দাশ এক জন মধ্যবয়স্কা মহিলা। মুখে ক্লান্তি ও তিক্ততার ছাপ। বিদ্রূপের সঙ্গে বললেন, কে জানে! আপনি জানেন কি, ব্রিটিশ আমলের গোড়ার দিকে কলকাতার রাস্তায় কেউ ভিক্ষে করলে তাকে ফাইন দিতে হত কিংবা তার জেল হত। খুঁজে দেখুন গিয়ে, এই ভিখিরির শহর কলকাতায় এখনও হয়তো সরকারের কোনও ভিখিরদমন ডিপার্টমেন্ট আছে। আপনি বরং কলকাতা করপোরেশানে গিয়ে খোঁজ করুন, রাস্তার পাগলা কুকুর ধরা যেমন ওদের কাজ, সেই রকম রাস্তার পাগলও...।

আমি অবশ্য আর করপোরেশন অফিসে যাইনি।

নিলয়দার কথা ভেবে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে রইল, কিন্তু ওদের বাড়িতে গিয়ে যে প্রত্যক্ষ ভাবে নিলয়দাকে কিছু সাহায্য করব, সে-সাহস হল না।

পৃথিবীর আহ্নিক গতি অনুযায়ী এক-একটা দিন কেটে যেতে লাগল, আকাশের রঙ বদলাল, অন্যান্য বছরের তুলনায় একটু আগেই চলে এল বর্ষা। আমার বান্ধবী রানির সঙ্গে আমার মন কষাকষি মিটে গেল। গঙ্গায় এক দিন নৌকো করে বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ পড়লাম ঝড়ের মুখে, নৌকো প্রায় উলটে যায় আর কী, আর তাই নিয়ে এমন মজা হল যে বেশ কয়েক দিন সাত্যকি বসুমল্লিকের কথাও আমার মনে পড়েনি।

তবু এরই মধ্যে এক দিন ভুল করে চলে গেলাম কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে। কারুর আহ্বানে নয়, কারুর খোঁজে নয়, এমনিই।

কফি হাউসে আমাদের নিজস্ব দু'তিনটে টেবিল থাকে, বন্ধু-বান্ধবরা সেখানেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। তার বাইরে অন্যান্য টেবিলে কী হয় না হয় আমরা লক্ষ্য করি না। তিনতলার জানলার পাশে একটা টেবিলে যে স্বর্ণ আর তার বন্ধু-বান্ধবীরা নিয়মিত আড্ডা দেয় তা আমি জানতাম না। আমরা বসি দো-তলায়।

তিন তলা থেকে স্বর্ণ আমাকে দেখতে পেয়ে দো-তলায় নেমে এসে আমার টেবিলের কাছে দাঁড়াল। প্রায় মহারানির ভঙ্গিতে আদেশের সুরে বলল, একটু উঠে আসুন, আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

অনুগত ক্রীতদাসের মতো আমি উঠে দাঁড়ালাম। যারা স্বর্ণকে চেনে না, তারা স্বর্ণর শুধু দেহশ্রী দেখে মুগ্ধ হবেই। আমরা বন্ধুরা সবাই হঠাৎ কথা থামিয়ে স্বর্ণকে দেখতে লাগল। ওরা নিশ্চয়ই আমার সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করছে। হায় রে!

স্বর্ণ আমাকে নিয়ে এল দরজার কাছে। আমার চোখে চোখ রেখে ভর্ৎসনার সুরে বলল, আপনাকে খানিকটা দেখে আমার যা মনে হয়েছিল, তাতে আমি ভাবতে পারিনি আপনি এতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন হবেন!

ইয়ার্কি করার সুযোগ পেলে আমি ছাড়ি না। স্বর্ণর ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে আমি বললাম, তা হলেই বোঝা যাচ্ছে, মনুষ্য চরিত্র সম্পর্কে আপনার জ্ঞান খুবই কম।

আপনি সেই যে সে-দিন বিকেলবেলা পালিয়ে এলেন...।

বলে কয়ে বিদায় নিয়ে আসাকে বুঝি পালিয়ে আসা বলে.

আপনি আবার আসব বলেছিলেন।

হ্যাঁ, আবার আসব বলেছিলাম, কিন্তু ঠিক কবে, কখন যাব তা বলিনি!

আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে স্বর্ণর মুখখানা হঠাৎ বিষাদে ছেয়ে গেল। মাটির দিকে চোখ নামিয়ে সে বলল, আপনাদের সেই পাগলকে নিলয়দা এখনও বাড়িতে রেখে দিয়েছে। এর মধ্যে কী কী হয়ে গেছে আপনি জানেন?

'আপনাদের' বলতে স্বর্ণ পাগল ভোলানাথের অভিভাবকদের দলে আমাকেও ফেলে দিয়েছে। নেহাৎ শরীর খারাপ হয়েছিল বলে আমি সে-দিন নিলয়দার বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলাম। নইলে ওই পাগলের ব্যাপারে কি কোনও দায়িত্ব আছে?

কিন্তু স্বর্ণকে আর খোঁচা না দিয়ে আমি কিছুটা সিরিয়াস হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে এর মধ্যে?

স্বর্ণ বলল, আপনি যে চলে এলেন, সে-দিনই সন্ধেবেলা ওই পাগলটা আমার হাতের আঙুল কামড়ে ধরেছিল। আমি ওকে সেবা করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু ও আমাকে...।

হঠাৎ থেমে গিয়ে স্বর্ণ দেয়ালের দিকে মুখ ফেরাল। না, প্রকাশ্য জায়গায় কেঁদে ফেলার মতো মেয়ে নয় স্বর্ণ। তবে মুখখানি শ্রাবণের মেঘ।

পাগলটা আপনাকে কামড়ে দিল? আপনি ওর কাছে গেলেন কেন? আমি যতক্ষণ ছিলাম, পাহারা দিয়েছি।

নিলয়দা বলল, মেয়েদের ওপর ওর অত রাগ, নিশ্চয়ই কোনও মেয়ে ওর সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে। তোমরা ভয় পেয়ে দূরে সরে না গিয়ে ওর সঙ্গে একটু ভাল ব্যবহার করো। সেই জন্য আমি ওকে খাবার দিতে গেলাম... দিদিকে যেমন ভাবে কামড়ে দিয়েছিল, আমাকেও ঠিক সেইভাবে, এই হাতখানা টেনে মুখের মধ্যে ভরে দিল! উঃ, ভাবলেও এখনও আমার...।

তারপর কী করে ছাড়ানো হল!

দিদি ওর মাথায় একটা গেলাস দিয়ে ঠুকে ঠুকে মারতে মারতে তারপর... এই দেখুন, দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল।

স্বর্ণ তার বাঁ-হাতটা এগিয়ে দিল আমার দিকে। ওর হাতটা ধরে পরীক্ষা করা উচিত কি না সে-সম্পর্কে আমি মনস্থির করতে পারলাম না। সত্যিই স্বর্ণর স্বর্ণাভ আঙুলে একটা ছোট ক্ষত রয়েছে।

একটু সময় নিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, নিলয়দা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, কোনও উত্তর আসেনি?

না! কে ওর খোঁজ নিতে আসবে? ও তো মানুষ নেই, একটা হিংস্র পশু হয়ে গেছে।

দশ-বারো দিন হয়ে গেল।

দিদি পাপুনকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে চলে এসেছে। এই ক'দিনের মধ্যে নিলয়দা একবারও দিদির সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। ও-বাড়িতে রান্নার লোক আজও ফেরেনি, ঠিকে ঝি পাগলের ভয়ে কাজ ছেড়ে দিয়েছে। নিলয়দা একা রান্না করে খায়, আর সর্বক্ষণ ওই পাগলকে নিয়ে মেতে আছে।

সত্যি নিলয়দা বড্ড বাড়াবাড়ি করছে।

দিদি ডিভোর্সের কথা ভাবছে। পাপুন বাবাকে দেখার জন্য কান্নাকাটি করে। দিদি ওকে কিছুতেই ওবাড়িতে যেতে দেবে না।

ব্যাপারটা যে এতখানি গড়িয়েছে, তা আমি জানতাম না।

রাস্তার একটা পাগলকে যতখানি সাধ্য সাহায্য করা উচিত, তা না হয় মানলাম, কিন্তু আমার দিদি আর পাপুনের জীবনটা যে নষ্ট হতে চলেছে, সেটা বুঝি কিছু নয়? নিলয়দা যা করছেন, সেটাও তো একটা চূড়ান্ত পাগলামি। আপনারা তাতে বাধা দেবেন না?

আচ্ছা, আমি নিলয়দার সঙ্গে দেখা করতে যাব। ওকে বুঝিয়ে বলব!

কখন যাবেন?

কাল, কালকে বিকেলের দিকে!

দপ করে জ্বলে উঠে স্বর্ণ বলল, কাল বিকেলে! এই সব কথা শোনার পরও আপনি এখন আড্ডা দিতে যাবেন? আপনার মনুষ্যত্ব বলে কিছু নেই? শুনুন, একটা কথা আপনাদের জানিয়ে রাখছি। আমার দাদার রিভলবার আছে। আমি ঠিক এবার গিয়ে ওই পাগলটাকে গুলি করে ফেলব! ওর বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই।

আমি আজই, এক্ষুনি যাচ্ছি!

সত্যি যাবেন?

হ্যাঁ, বললাম তো, এক্ষুনি!

চলুন, আমি যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।

আপনি যাবেন? না না, তার কোনও দরকার নেই। বিশ্বাস করুন, আমি সত্যিই এক্ষুনি যাব।

আমি আপনার সঙ্গে গেলে কোনও আপত্তি আছে?

না, মানে, যদি আবার আপনার কোনও বিপদ হয়!

আমি ভয় পাই না। নিলয়দাকে আমি কয়েকটা কথা বলব!

তাহলে আপনি নিচে নামুন, আমি সিগারেটের প্যাকেটটা ফেলে এসেছি, নিয়ে আসছি।

টেবিলে ফিরে এসেই আমি বন্ধুদের সকলের সামনে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বললাম, টাকা দে, টাকা দে, যার যার কাছে স্পেয়ারেবল এক টাকা দু'টাকা আছে, শিগগির দে!

দু'তিনজন স্বেচ্ছায় হাসতে হাসতে দিয়ে দিল, দু'এক জন একটু গাঁইগুঁই করছিল, কিন্তু আমি ওদের বেশি সময় দিলাম না, দশ-বারোটা টাকা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে, টেবিলেব ওপর থেকে অন্য এক জনের সিগারেটের প্যাকেট তুলে দৌড় দিলাম সিঁড়ির দিকে।

কে যে কখন কী-ভাবে ঠকে তা অনেক সময় তারা নিজেরাই জানে না। বন্ধুরা ভাবল, আমি একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে মজা করতে যাচ্ছি বলে ওরা চাঁদা দিয়েছে। এই নিয়ে এখন খানিকটা রঙ্গ -রসিকতা চলবে। ওরা যদি জানত, আমি কী বিপদসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে চলেছি...।

অতিশয় কৃতিত্ব দেখিয়ে আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা ট্যাক্সি ধরে ফেললাম। একটুখানি যাবার পরেই শুরু হল দুর্দান্ত বৃষ্টি। জানলার কাচ তুলে দিতে হল। বৃষ্টির তোড়ে কাচঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। আমি স্বর্ণর মুখের দিকে তাকাতেই সে বলল, আমার দাদা এক জন ডাক্তার নিয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেছেন, ওই পাগলটা চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে। অনেক দিন ধরে টানা শক থেরাপি করলে কিছুটা উন্নতি হতে পারে, সে-ও খুব খরচসাধ্য ব্যাপার।

বৃষ্টিব মধ্যে কাচ তোলা ট্যাক্সির রোমান্টিক পরিবেশে স্বর্ণ আমাকে শুধু পাগল, ডাক্তার, চিকিৎসা ইত্যাদিব কথা বলে যেতে লাগল। আমিও শুনে গেলাম মুখ শুকনো করে।

নিলয়দার বাড়িতে এসে পৌঁছোবার আগেই বৃষ্টি ধরে এল। বর্গির মতো বৃষ্টি। কলিং বেলে হাত দেওয়ার সময় আমার হাত কাঁপছিল। নিলয়দার সঙ্গে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো এক জিনিস আর বাড়ির মধ্যে একটা হিংস্র পাগলেব সঙ্গে সময় কাটানো...।

দরজা খুলে দিল নিলয়দা। তার ডান হাতে পাঞ্জাজোড়া একটা ব্যান্ডেজ। এক মুখ হেসে নিলয়দা বললেন, আরে নীলু, আয় আয়, তোর আর পাত্তাই নেই! আমি ভাবলাম অসুখে ভুগছিস, খবর নিতে পারিনি এর মধ্যে।

স্বর্ণ দাঁড়িয়ে ছিল একটু দূরে। নিলয়দা ওকে দেখতে পাননি। আমি বললাম, স্বর্ণ এসেছে।

নিলয়দা বলল, স্বর্ণ? কোথায়? স্বর্ণ, আমি তোমার ওপর খুব রেগে গেছি। এর মধ্যে একবারও আসোনি? তোমার দিদিরই-বা কী ব্যাপার বলো তো, সেই যে রাগ করে চলে গেল, তারপর আর একবারও আমার খবর নিল না? এ কী-রকম রাগ? আমি মরলাম কি বাঁচলাম, সে খবরও নেবে না?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, নিলয়দা, তোমার হাতে কী হয়েছে?

ও, এটা? রাঁধতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলেছি! আরে, আমাব কি রান্নার অভ্যেস আছে? তবে বিশেষ কিছু হয়নি।

আমি আড় চোখে স্বর্ণর দিকে তাকালাম। আমাদের দু'জনেরই ধারণা হয়েছিল, পাগলটা নিলয়দাকেও কামড়ে দিয়েছে। কী জানি, নিলয়দা সত্যি কথা বলছে কি না!

স্বর্ণ বলল, নিলয়দা, তুমিও তো আমাদের খবর নাওনি একবারও?

আরে, আমি তো ব্যস্ত ছিলাম। তাছাড়া খালি বাড়ি ছেড়ে যাই কী করে? এসো, ভেতরে এসো, তোমাদের আজ দারুণ সারপ্রাইজ দেব!

স্বর্ণ ব্যগ্রভাবে বলল, সে চলে গেছে?

না, যাবে কেন? যাকে দেখবে, সে একেবারে অন্য মানুষ। বেশি কিছু লাগে না, বুঝলে, একটু সহানুভূতি, একটু সেবা, একটু স্নেহের কথা...।

আমরা এগিয়ে এলাম উঠোনের দিকে। তারপরের দৃশ্য দেখে আমার চক্ষুস্থির।

পাগলের ঘরের দরজা খোলা। বারান্দায় একটা চেয়ারে সে বসে আছে, পরিষ্কার পা-জামা আর গেঞ্জি পরা, কোলের ওপর একটা বই।

স্বর্ণ আমার একটা হাত চেপে ধরল। এই প্রথম আমি তার স্পর্শ পেলাম, সঙ্গে সঙ্গে খুবই সাহসী হয়ে উঠলাম আমি। পাগলটা যদি স্বর্ণকে আবার কামড়ে দিতে আসে, আমিও ওর ঘাড় ভেঙে দেব। স্বর্ণর কাছে স্টিলের ছাতা আছে, ওটাই ব্যবহার করতে হবে।

নিলয়দা দারুণ উৎফুল্ল ভাবে বলল, জানিস নীলু, তুই যে ওকে ভোলানাথ নাম দিয়েছিলি, সেই নামে ডাকলে ও দিব্যি সাড়া দেয়। মানুষ চিনতে পারে। দেখবি? এই যে ভোলানাথ, দেখো কারা এসেছে। নীলুকে চিনতে পারছ তো? নীলু, সেই যে দেখেছিলে, অনেক দিন পরে আবার এল!

ভোলানাথ জ্বল জ্বলে চোখে, ঠোঁট বাঁকিয়ে এক ধরনের হাসি দিয়ে বলল, এই যে নীলুবাবু, অনেক দিন আসেননি? কেমন আছেন, হাঃ হাঃ হাঃ। কেমন আছেন? অ্যাঃ? হাঃ হাঃ হাঃ!

ভোলানাথের গলার আওয়াজ ছিল ভরাট, গমগমে। এখন সেই আওয়াজ যেন জল মিশিয়ে কেউ পাতলা করে দিয়েছে। হাসিটাও অদ্ভুত রকমের নিষ্প্রাণ।

গর্বিত ভাবে নিলয়দা বলল, দেখলি তো? একদম নর্মাল! ভোলানাথ, স্বর্ণকে চিনতে পারছ তো, স্বর্ণ? আমার শ্যালিকা, ওকে নমস্কাব করো।

স্বর্ণকে দেখে যেন খুবই লজ্জা পেয়ে গেল ভোলানাথ, মুখটা নিচু করে মেয়েলি গলায় বলল, নমস্কার।

দেখলি? দেখলি? ডাক্তাররা কিছু পারেনি, কোনও ডাক্তার ভরসা দেয়নি, শুধু আমার নিজের চেষ্টায় — স্বর্ণ, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো!

আমি আরও চেয়ার আনছি। আমরা বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখছিলাম।

আরও দু'টি চেয়ার এনে নিলয়দা জিজ্ঞেস করল, নীলু, তোর কাছে সিগারেট আছে? দে তো! ভোলানাথ, তুমি সিগারেট খাবে?

ভোলানাথ বলল, সিগারেট? অ্যাঁ? হ্যাঁ, সিগারেট! খাব! সিগারেট খাব। পান খাব।

এখন তো পান নেই। শুধু সিগারেটই খাও।

একটা সিগারেট নিলয়দা ভোলানাথের ঠোঁটে গুঁজে দিয়ে অতি সম্মানিত অতিথির মতো তিনটি দেশলাই কাঠি জ্বেলে সেটা ধরিয়ে দিল। তারপর বলল, ভোলানাথ বই-ও পড়তে পারে। শুনবি? ভোলানাথ এঁদের একটু বই পড়ে শোনাও তো।

ভোলানাথের ঠোঁটে সেই অদ্ভুত হাসিটা লেগেই আছে। সে বইটা দু'হাতে ধরে বলল, হ্যাঁ, পড়ব। বই পড়ব। হাঃ হাঃ হাঃ! আমি বই পড়তে জানি। হাঃ হাঃ হাঃ। এই যে রামায়ণ, আমি পড়ব, 'রাম বলিলেন, পম্পা সরোবরের কী আশ্চর্য শোভা, দেখো লক্ষ্মণ, এই যে বিশাল বনরাজি, যেন একের সঙ্গে একটা, বৃষ্টি পড়িতেছে, টুপ টাপ টাপুর টাপুর, টুপ টাপ, পাঁচুবাবু ছাতা মাথায় দিয়ে চলে যাচ্ছেন। পাঁচুবাবুর একটা বাছুর আছে, সীতা সেই বাছুরটা ধরতে যাচ্ছে, যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, আর বাছুরটা কাদার মধ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটেছে, দেখো লক্ষ্মণ, পম্পা সরোবরের তীরে এখন সেই বাছুরটা —।

আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে পারছি না। স্বর্ণ আঁচলে মুখ চাপা দিয়েছে, ফুলে ফুলে উঠছে তার শরীর।

নিলয়দা মুগ্ধভাবে তাকিয়ে আছে ভোলানাথের দিকে। ভোলানাথ হঠাৎ থেমে যেতেই সে বলল, হবে, হবে, আস্তে আস্তে। আজ তো অনেকটা ঠিক বলেছে, প্রথম সেন্টেন্স দুটো —।

বইটা সশব্দে বন্ধ করে মাটিতে ফেলে দিল ভোলানাথ। তারপর উঠে দাঁড়াল। সিগারেটটা ডান হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে গাঁজার মতো টানতে টানতে, ঈষৎ টলতে টলতে সে চলে গেল বাথরুমের দিকে।

এবারে আমি স্বস্তির সঙ্গে আমার সিগারেটে টান দিলাম।

নিলয়দা আমার পিঠে একটা চাঁটি দিয়ে বলল, কী রে, মিরাকুলাস ইম্প্রুভমেন্ট না? বল?

আমি ফ্যাকাসে ভাবে বললাম, হ্যাঁ, অনেকটা উন্নতি হয়েছে।

ও এখন নিজে নিজে পোশাক বদলাতে পারে, খিদে পেলে খাবার চায়। বই পড়া অভ্যেস করছে। আমার ধারণা কি জানিস, কেউ ওর মনে দারুণ কোনও আঘাত দিয়েছে, সেই জন্য মাথাটা একেবারে বিগড়ে গিয়েছিল। বাই নেচার ও কিন্তু ভায়োলেন্ট নয় একেবারেই। পরশু দিন কী হয়েছে শুনবি?

বাথরুমের মধ্যে দু'বার প্রচণ্ড জোরে গলা খাঁকারির আওয়াজ শোনা গেল। আমরা চমকে উঠলাম।

নিলয়দা বললেন, ও কিছু না ও। একটু বেশি গয়ের ওঠে। পরশু দিন কী হল শোন। আমি রান্না করছিলাম, বেরিয়ে এসে দেখি ভোলানাথ বাড়ির বাইরে চলে গেছে। আমি তো তক্ষুনি খুঁজতে বেরোলাম। ও অনেকটা ভাল হয়ে গেছে, এখন যদি রাস্তার লোক আবার মারধোর করে, তবে সব নষ্ট হয়ে যাবে। আমার মনের মধ্যে যে কী হচ্ছিল, তোদের কী করে বোঝাব। এক ঘণ্টা হেঁটে হেঁটে গোটা তল্লাটটা খুঁজে এলাম। তারপর ক্লান্ত হয়ে যখন ফিরেছি তখন দেখি যে বাইরের দরজার পাশে ভোলানাথ বসে আছে। ঠিক বাড়ি চিনে ফিরে এসেছে। কতটা মায়া পড়ে গেছে তাহলে বোঝ।

আমার মনে পড়ে গেল ড. দত্তগুপ্তর কথা। উনিও এই রকমই হবে বলেছিলেন। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করলাম।

স্বর্ণ জিজ্ঞেস করল, নিলয়দা, তুমি কি ওকে এখানেই রাখবে ঠিক করেছ?

একটু ইতস্তত করে নিলয়দা বলল, এখানে না রেখে ওকে কোথায় পাঠাব? কোনও হাসপাতালে তো নিতে চাইছে না। অনেক খোঁজখবর করলাম। হাসপাতালে ভর্তি করতে হলে নিকট আত্মীয়ের সই লাগে। মহা মুশকিল! তাছাড়া, আমি নিজে ওকে নিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করছি। আমি নিজেই যদি ওকে পুরোপুরি সারিয়ে তুলতে পারি, তাহলে কী বিরাট একটা কাজ হবে বলো? অনেকটা এগিয়ে আমি এখন থেমে যেতে চাই না।

স্বর্ণ আবার বলল, নিলয়দা, তুমি আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখেছ? চোখের নিচে কালি, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গেছে, তুমি কতটা রোগা হয়ে গেছে জানো? তুমি ভাল করে ঘুমোও না নিশ্চয়ই।

এবারে আমিও তাকিয়ে দেখলাম, এই দু'সপ্তাহে নিলয়দা চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে, ওকে বেশ রুগ্ন দেখাচ্ছে। মেয়েরাই এটা লক্ষ্য করে আগে।

নিলয়দা একটু ক্লান্ত ভাবে হেসে বললেন, হ্যাঁ, আমার শরীরটা বেশ খারাপ লাগছে ক'দিন। নিজের হাতে রেঁধে খাওয়া কি আমার পোষায়? এ-রকম ভাবে কত দিন চালাতে পারব! তোমার দিদিকে বলো, এত রাগ কীসের, আজই চলে আসুক। পাপুনের পড়াশুনোর ক্ষতি হচ্ছে।

দিদি বলে দিয়েছে, ওই লোকটা থাকলে দিদি কিছুতেই আর এ বাড়িতে আসবে না। তুমি তো জানো, দিদির জেদ কী-রকম?

কিন্তু রূপা না এলে আমার চলবে কী করে? রূপাকে ছাড়া কি আমি জীবন কাটাতে পারি? সত্যি কথা বলছি তোমাকে স্বর্ণ, আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে। রূপা আর পাপুনের কথা চিন্তা করেই রাত্তিরে আমার ঘুম আসে না।

প্রচণ্ড জোরে মেঘ ডেকে উঠল। আবার বৃষ্টি আসছে। তার আগেই উঠে পড়া উচিত। নিলয়দা একেবারে অবুঝের মতো কথা বলছে। রূপাবউদির দিকটা নিশ্চয়ই চিন্তা করা উচিত।

আমি বললাম, নিলয়দা, তুমি অফিস ছুটি নিয়ে ক'দিন এ-ভাবে চালাবে! এই সব চিকিৎসা তো দু'এক মাসের ব্যাপার নয়। বউদিই-বা কত দিন বাইবে থাকবে?

তুই ঠিকই বলেছিস রে নীলু, সে-কথাটাও ভাবতে হবে!

স্বর্ণ বলল, এক কাজ করো না, ওই লোকটাকে মাদার টেরিজার কাছে পাঠিয়ে দাও! মাদার টেরিজা তো নানা রকম অসুস্থ লোকদের আশ্রয় দেন!

হঠাৎ রেগে গেল নিলয়দা। গলা চড়িয়ে বলল, মাদার টেরেসার কাছে পাঠাব? কেন? কথাটা বলতে তোমার লজ্জা করল না? কলকাতা শহরের যত অসহায় রুগীদের দায়িত্ব মাদার টেরেসা একলা নেবেন, আর আমাদের কোনও দায়িত্ব নেই? মাদার টেরেসার ঘাড়ে সবাইকে চাপিয়ে দিয়ে আমরা হাত ধুয়ে ফেলে মজা দেখব?

স্বর্ণ বলল, তা বলছি না। মাদার টেরেজার একটা বড় প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে ভাল ব্যবস্থা হতে পারে। তুমি একলার চেষ্টায় কতটা পারবে! মনে কবো বাস্তায় তুমি আর এক দিন দেখলে আর একটা পাগলকে লোকে মারছে, তাকেও তুমি বাড়িতে নিয়ে আসবে?

দেখো স্বর্ণ, আলোচনার মধ্যে সব চেয়ে কুযুক্তি হল হাইপথেটিক্যাল একটা উদাহরণ দেওয়া!

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে বাথরুমের দিকে তাকালাম। ভোলানাথ এত দেরি করছে কেন?

ঠিক তখুনি জোরে দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল ভোলানাথ। তার গায়ে শুধু গেঞ্জি, পাজামাটা সে আর পরেনি। তার সেই মূর্তি দেখে আমরা তিন জনেই কয়েক মুহূর্ত চুপ। পর্যায়ক্রমে তিন জনের দিকে তাকিয়ে সে বলল, আমি তোমাকে চিনি না, তুমি আমাকে চেনো না। কেউ কারুকে চেনে না। এই হল সোজা কথা, ব্যাস।

নিলয়দা ত্বরিতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, স্বর্ণ, তুমি বাড়ি চলে যাও। নীলু স্বর্ণকে নিয়ে যা, একটু বাড়ি পৌঁছে দে, যা, দেরি করিস না।

ভোলানাথের দিকে চোখ রেখে আমরা এক পা এক পা করে এগোতে লাগলাম সদর দরজার দিকে। আমি আর নিলয়দা স্বর্ণকে আড়াল করে আছি। ভোলানাথ কটমট করে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু এগিয়ে এল না। মাথাটা একটু একটু করে দোলাচ্ছে। হঠাৎ যে-কোনও মুহূর্তে যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

সদর দরজার বাইরে পৌঁছে যাবার পর স্বর্ণ শুধু আর্ত গলায় 'নিলয়দা' বলেই থেমে গেল।

নিলয়দা স্বর্ণ একটা হাত চেপে ধরে ব্যাকুল ভাবে বলল, স্বর্ণ, প্লিজ, তোমরা আমাকে আর দু'তিন দিন সময় দাও! ও ভাল হয়ে যাবে, নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে। যদি না হয়, তবে অন্য ব্যবস্থা করব কথা দিচ্ছি। তার আগে আর একটু সময় দাও আমাকে, আর তিন-চার দিন!

॥ ৫ ॥

এরপর প্রত্যেক দিন আমি নিলয়দার কাছে গিয়ে দু'তিন ঘণ্টা করে সময় কাটাচ্ছি। চতুর্থ দিনে নিলয়দা জিজ্ঞেস করল, এবার কী-রকম বুঝছিস, নীলু? সবাই যাদের নর্মাল ভাবে, সেই রকম অনেক লোকের মধ্যেও তো এ-রকম একটু আধটু অস্বাভাবিক ব্যাপার থাকেই। থাকে না?

আমি বললাম, তা ঠিক।

অনেক আর্টিস্ট কিংবা কবিও তো আধপাগলা হয়!

ভোলানাথ সত্যিই অনেকটা বদলে গেছে। এখন ওকে আর ভয় পাবার কিছু নেই।

ও তো এখন একটা শিশু! একটু ধমক দিলেই কাঁদে। ওই যে মাঝে মাঝে 'মাধুরী' 'মাধুরী' বলে ওঠে না? আমার মনে হয় 'মাধুরী' নামের কোনও মেয়ের জন্যই ওর এই রকম অবস্থা হয়েছে। সেই মাধুরীকে যদি পাওয়া যেত! কাগজে তো বিজ্ঞাপন দিলাম, কেউ সাড়া দিল না।

বসবার ঘরের সোফাতেই কাৎ হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে ভোলানাথ। এখন তাকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখা হয় না। সে যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে। ভোলানাথের একটা গুণ আছে অন্তত, সে কোনও জিনিসপত্র ভাঙে না।

এই ক'দিন ভোলানাথ একেবারে গুম হয়ে আছে। কথা প্রায় বলেই না। নিলয়দা ওকে বেশিক্ষণ ধরে কিছু বোঝবার চেষ্টা করলে ও ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে। অত বড় একটা জোয়ান পুরুষমানুষের কান্না দেখলে যেন কেমন কেমন লাগে। আমি কোথায় যেন পড়েছিলাম, পাগলদের সব সময় চোখ শুকনো থাকে, কান্না জিনিসটা তো তীব্র অনুভূতির ব্যাপার। তবে কি ভোলানাথ সুস্থ হয়েই গেল?

নিলয়দা এক জন নামকরা সিকিয়াট্রিস্টকে ডেকে এনেছিলেন দু'দিন। তাঁর নাম ড. জগন্নাথ ভড়। ভদ্রলোক বেশ সহানুভূতিশীল, দ্বিতীয় দিন তিনি নিলয়দার কাছ থেকে টাকা নিতে চাননি। ড. ভড় বলেছেন যে, এই ধরনের পাগলরা মাঝে মাঝে দু'চার দিনের জন্য খানিকটা স্বাভাবিক হলেও আবার হঠাৎ এই রোগ রিলাপ্স করে। দীর্ঘস্থায়ী ট্রিটমেন্টে কোনও ফল পাওয়া যেতে পারে। নিলয়দার পক্ষে বাড়িতে রেখে এ-ভাবে ওর চিকিৎসা চালিয়ে যাবার কোনও মানেই হয় না।

ড. ভড় দু'টি পরামর্শ দিলেন। পুরুলিয়ার কোনও এক সেবা কেন্দ্রে এক জন ডেনিশ চিকিৎসক আছেন। তিনি এই ধরনের রোগের চিকিৎসার জন্য জগৎবিখ্যাত। এখন প্র্যাকটিস ছেড়ে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে পুরুলিয়ার গরিবদের জন্য কাজ করছেন। তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

আর একটি হল, পুলিশের ওপরমহলে যদি জানাশুনো থাকে তবে সে-রকম এক জনকে ধরে পুলিশের হাতে ভোলানাথকে তুলে দেওয়াই সব চেয়ে ভাল। কোনও কোনও জেলখানায় পাগলদের রাখার ব্যবস্থা আছে। পুলিশের ওপরমহলে আমাদের কোনও চেনাশুনো নেই। সে-কথা শুনে ড. ভড় বলেছিলেন যে, এক জন ডিআইজি তাঁর বিশেষ বন্ধু। তিনি নিজেই সেই ডিআইজি-কে অনুরোধ করে দু'এক দিনের মধ্যেই ওকে সরাবার ব্যবস্থা করে দেবেন।

পুলিশের কোনও লোক এখনও আসেনি। নিলয়দা পুরুলিয়ার সেই ডেনিশ ডাক্তারের কাছে চিঠি লিখেছেন। তার অবশ্য উত্তর আসবার সময় হয়নি, কিন্তু আজ চতুর্থ দিন।

এর মধ্যে এক দিন আমাকে এখানে বসিয়ে রেখে নিলয়দা রূপাবউদির সঙ্গে দেখা করে এসেছে। ওদের অনেকটা মিটমাট হয়ে গেছে, কিন্তু রূপাবউদি জেদ থেকে টলেনি, এই পাগল যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ সে এ বাড়িতে ফিরবে না। আর নিলয়দা যে তিন চার দিন সময় চেয়েছিল স্বর্ণর কাছে, সেই কথা তাকে রাখতে হবে।

নিলয়দা বলল, তুই একটা কাজ করতে পারবি, নীলু? তুই রূপাদের বাড়ি চলে যা। রূপাকে একটু বুঝিয়ে বল যে, ভোলানাথ সত্যিই প্রায় ভাল হয়ে গেছে। কাল আমি ওকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছিলাম, হেঁটে হেঁটে ঘুরে এলাম গিরিশ পার্ক পর্যন্ত, একবারও একটুও গণ্ডগোল করেনি!

নিলয়দা, এ-সব কথা রূপাবউদিকে বলে কোনও লাভ হবে না। তার থেকে আমি যা বলেছিলাম, সেটাই করো।

আমার আর দু'দিন অফিস ছুটি আছে। এ দু'দিন রেখে যদি আর একটু চেষ্টা করতে পারি...।

রূপাবউদির কাছ থেকে তুমি চার দিন সময় চেয়ে নিয়েছিলে —।

ড. ভড় যে বলেছিলেন তাঁর কোনও এক ডিআইজি বন্ধুকে বলে পুলিশ পাঠাবেন।

পাঠালেন না, তা তো দেখাই যাচ্ছে। নিলয়দা অনেক রকম ভাবে তো চেষ্টা করা হল। এখন দু'চার দিন রূপাবউদিকে শান্ত করাই তোমার পক্ষে বেশি দরকার। ভোলানাথকে আমি নিয়ে যাচ্ছি, ও সেখানে ভালই থাকবে।

নিলয়দা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, চল তা হলে, আর দেরি করে লাভ নেই!

ভোলানাথকে জাগিয়ে নিলয়দা বলল, চলো ভোলানাথ, আমরা এক জায়গায় যাব। জামাটা পরে নাও!

অত্যন্ত বাধ্য ছেলের মতো ভোলনাথ পাশের ঘরে গিয়ে জামা পরে এল।

নিলয়দা ওপর থেকে নিয়ে এল একটা ছোট সুটকেস। নিজেরই আর দুটো পাজামা আর পাঞ্জাবি আর গেঞ্জি-টেঞ্জি ভরে এনেছে। বাথরুম থেকে নিয়ে এল তোয়ালে আর সাবান। সব গুছিয়ে টুছিয়ে বলল, রাস্তা থেকে টুথপেস্ট আর টুথব্রাশ কিনে নিতে হবে।

ভোলানাথকে বলল, আমার এই চটি পরে নাও, আর চুলটা একটু আঁচড়ে এসো তো!

ভোলানাথ চটি পরল না, এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল নিলয়দার দিকে।

নিলয়দা আবার মিষ্টি করে বলল, পরে নাও চটি! বাইরে বেরুবার সময় একটু সেজেগুজে বেরুতে হয়। আমি তোমার চুল আঁচড়ে দিচ্ছি, শিখে নাও, এইভাবে রোজ চুল আঁচড়াবে।

ভোলানাথ যদিও নিলয়দার চেয়ে বয়েসে বড়, তবু নিলয়দা এমন যত্ন করে তার চুল আঁচড়ে দিলেন যেন নিজের ছেলে পাপুনকে বাইবে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য সাজিয়ে দিচ্ছেন।

ট্যাক্সি নিয়ে আমরা চলে এলাম কালীঘাট। মলয়া বোর্ডিং হাউসের মালিক হরিবাবুর সঙ্গে আমার আগেই কথা বলা ছিল। ঘরটাও আমি সকালে এসে দেখে গেছি। তিন তলার এক কোণে ছোট সিঙ্গল সিটেড রুম। ভাড়া দৈনিক হিসেবে আঠারো টাকা। মাসিক হিসেবে সাড়ে তিনশো।

হরিবাবুর কাছে আমি সত্য গোপন করিনি। আমি তাকে আগেই জানিয়ে দিয়েছি যে, যাকে এখানে আমরা রাখব, তার একটু মাথার গোলমাল আছে। তবে নিরীহ পাগল, কারও কোনও ক্ষতি করবে না, বোর্ডিং হাউসে মেয়েরা আসে না, বাইরে নোটিশ দেওয়া আছে যে, বোর্ডাররা কেউ নিজেদের ঘরে কোনও আত্মীয়াকেও নিয়ে যেতে পারবে না, সেই জন্যই আমি ও-কথা বলেছি। হরিবাবু রাজি হয়েছেন। হেসে আমাকে বলেছিলেন, আরে ভাই হোটেলের ব্যবসা খুলেছি, যত পাগলদের নিয়েই তো আমার কারবার। টাকাটা অ্যাডভান্স দিয়ে যাবেন।

হরিবাবু সমেত আমরা উঠে এলাম তিন তলায়। হরিবাবু ভোলানাথকে বেশ কয়েক বার দেখে নিয়ে আমার দিকে চোখ বুজে একটা ভুরুর ইঙ্গিত করলেন। অর্থাৎ চলে যাবে!

নিলয়দা বলল, আপনি কারুকে দিয়ে ওর ঘরে খাবার পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারবেন? ও ঘরেই থাকবে, বাইরে বেরুতে বিশেষ পছন্দ করে না।

আমি বললাম, যদি বাইরে বেরুতে চায়, তাহলে বাধা দেবার দরকার নেই।

হবিবাবু বললেন, সে-সব আমি দেখব। আপনারা ছেড়ে দিন না আমার ওপর। কোনও চিন্তা করবেন না। সব ঠিকঠাক থাক্‌বে।

হরিবাবুর কাছ থেকে এ-রকম সহযোগিতার আশ্বাস পেয়ে নিলয়দা বেশ নিশ্চিন্ত হল। এতক্ষণ ওর মুখখানা বিষণ্ণ ছিল, এবারে হাসি ফুটল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ঘরটা একটু ছোট হলেও বেশ খোলামেলা।

হরিবাবু বললেন, দক্ষিণ খোলা, সেই জন্য এ-ঘরের রেট বেশি। কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে বেশি নিইনি!

নিচ থেকে কেউ হরিবাবুকে ডাকতেই তিনি যাবার জন্য উদ্যত হয়ে আমাকে বললে, তাহলে সব ঠিক আছে? যদি বেগড়বাঁই করে, ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দেব। এ-সব কেসে যত ঘুম পাড়িয়ে রাখবেন, ততই উবগার!

ভোলানাথ এ পর্যন্ত একটিও কথা বলেনি। তবে, পর্যায়ক্রমে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে সব কথা শুনছে। নিলয়দা তাকে কাঁধে হাত দিয়ে বলল, ভোলানাথ, তোমাকে কয়েকটা দিন এখানে থাকতে হবে, বুঝলে? তারপর আমরা পুরুলিয়ায় বেড়াতে যাব। কেমন?

ভোলনাথ নিঃশব্দে চেয়ে রইল শুধু। যেন সে কথা বলতে ভুলে গেছে।

আমি বললাম, চলো, তোমাকে বাথরুমটা দেখিয়ে দিই। খুব সুবিধে অছে, পাশেই বাথরুম। যদি হাওয়া খাওয়ার ইচ্ছে হয় ছাদে ঘুরে বেড়াতে পারো। কাল সকালেই তো আমরা আসছি। যদি কিছু দরকার হয় তো বলবে!

ভোলানাথ কোনও কথা বলবে না ঠিক করেছে। আমার সঙ্গে উঠে গিয়ে বাথরুম দেখল, ছাদে ঘুরে এল কিন্তু মুখে টুঁ শব্দটি নেই।

নিলয়দা ওর বিছানাটা ঝেড়ে-ঝুড়ে পরিষ্কার করে দিল। সুটকেস খুলে পাজামা-পাঞ্জাবি বার করে ঝুলিয়ে দিল আলনায়। ঘরটা দেখে আমারই লোভ হল বেশ। এ-রকম একটা ছোট্ট ঘরে একলা থাকতে পারলে আমি বর্তে যেতাম।

বিদায় নেবার সময় নিলয়দা বলল, তাহলে যাই? লক্ষ্মী হয়ে থাকবে কিন্তু? অ্যাঁ? কয়েক দিন পরেই আমরা পুরুলিয়া বেড়াতে যাব।

ভোলানাথের দু'চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। তা দেখে নিলয়দাও কেঁদে ফেলতে যাচ্ছিল, আমি ওর হাত ধরে তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে এলাম ঘরের বাইরে।

বাস স্টপে দাঁড়িয়ে নিলয়দা বলল, ও আমার ওপর অভিমান করেছে।

আমি বললাম, যদি ওর অভিমান হয়, যদি ও সব বুঝতে পারে, তবে তার চেয়ে আনন্দের কথা তো আর নেই!

ও তো সুস্থই হয়ে গেছে রে।

আমার মনে হয়, নিলয়দা, ওকে এবারে মনে আঘাত দিয়ে দিয়ে কিছু কথা বলা উচিত আমাদের। ও যদি কাঁদে, চোখের জলের চেয়ে ভাল চিকিৎসা আর নেই। বাস এসে গেছে, তুমি উঠে পড়ো।

তুই আমার সঙ্গে যাবি না? চল, ট্যাক্সি নিচ্ছি, রূপাদের তুলে নিই, তারপর বসে বাড়িতে আড্ডা দেওয়া যাবে।

না নিলয়দা, রূপাবউদির সঙ্গে অনেক দিন বাদে তুমি এক সঙ্গে থাকবে, এই সময় স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে তৃতীয় ব্যক্তির থাকা উচিত নয়। এখন তোমাদের নিজস্ব অনেক কথা আছে।

আসলে কি জানিস, রূপা যদি আমার বেশি বকুনি দেয়, সেই ভয় পাচ্ছি। তবু, তুই থাকলে — অবশ্য তোকেও রূপা বকতে ছাড়ে না।

আজ তুমি একলাই রূপাবউদির বকুনি খাও!

নিলয়দা ঘাড় ঘুড়িয়ে মলয়া বোর্ডিং হাউসের দিকে তাকাল। এখান থেকে ভোলানাথের ঘরটা দেখা যায় না। তবে ছাদের পাঁচিল ধরে কে যেন দাঁড়িয়ে অছে, ভোলনাথ হতেও পারে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, নিলয়দা, তুমি সাত্যকি বসুমল্লিক বলে কারুকে চেনো?

না তো! সে কে? কী করে?

খুব বড়লোক।

খুব বড়লোক? আর কিছু, মানে কীসে তিনি বিখ্যাত?

সে-রকম কিছু জানি না।

শুধু এক জন বড়লোক, তাকে আমি চিনতে যাব কেন? হঠাৎ এর কথা তুই জিজ্ঞেস করলি যে?

আমার মনে হয়, ওই সাত্যকি বসুমল্লিক একটা বদ্ধ পাগল, কিন্তু সে-কথা কেউ জানে না, সুস্থ সেজে বহু লোকের মাথার পর কেবল ছড়ি ঘোরাচ্ছে!

॥ ৬॥

শিয়ালদার কাছে প্রচুর সস্তার হোটেল-বোর্ডিং থাকলেও অনেক ভেবেচিন্তেই ভোলানাথকে সেখানে রাখা হয়নি। শিয়ালদা থেকে নিলয়দার বাড়ি বেশি দূর নয়। কালীঘাট থেকে ভোলানাথের পক্ষে রাস্তা চিনে-নিলয়দার বাড়ি যাওয়া শক্ত হবে। স্বর্ণর কথা শুনে আমি বুঝেছিলাম, এখন কিছু দিন ভোলানাথকে দূরে সরিয়ে রাখা বিশেষ দরকার। নইলে নিলয়দার দাম্পত্যজীবন নষ্ট হয়ে যাবে একেবারে।

মলয়া বোর্ডিং আমার বাড়ি থেকে কাছেই, সেই জন্য আমি নিলয়দাকে বলেছিলাম। সকালে এসে আমিই খোঁজখবর নেব, নিলয়দাকে আসতে হবে না।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখলাম বৃষ্টি হচ্ছে। আমি বৃষ্টি-প্রেমিক। মনটা ভাল হয়ে গেল। চোখ-মুখ না ধুয়েই জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। বৃষ্টির সময় প্রত্যেকটা বাড়িকেই ঠিক

গাছের মতো গম্ভীর দেখায়। তবে গাছের সঙ্গে তফাৎ হচ্ছে এই, প্রত্যেকটি বাড়িরই একটা গল্প আছে।

আমার খবরের কাগজ পড়ার নেশা নেই, অন্য দিন যাও-বা একটু উলটে-পালটে দেখা আজ আর ছুঁলামই না। মায়ের কাছে আবদার করে দ্বিতীয় কাপ চা আদায় করে ফিরে এলাম বিছানায়। বৃষ্টি থামবার লক্ষণ নেই।

এখন শুয়ে শুয়ে একটা কবিতার বই পড়লে কেমন হয়?

কিন্তু মনে মনে দায়িত্বটা খচ্ খচ্ করছে। সত্যি কথা বলতে কি, এই রকম একটা সকাল এক জন পাগলের সঙ্গে কাটাতে আমরা একটুও ইচ্ছে করছে না। না গেল কী হয়? বৃষ্টি যদি আর বাড়ে, রাস্তায় জল জমে ট্রাফিক বন্ধ হয়ে যায়, তবুও যেতে হবে? যা ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে, তাতে ভোলানাথ ভালই থাকবে।

কিন্তু আমি তো আর সাত্যকি বসুমল্লিক হয়ে জন্মাইনি যে ইচ্ছেমতো যে-কোনও সকাল বিছানায় গড়িয়ে কাটিয়ে দিতে পারব! একটু বাদেই মা এসে জিজ্ঞেস করল, কী রে তুই এখনো শুয়ে আছিস যে, বাজারে যাবি না?

বাড়ির বেকার ছেলে হিসেবে বাজার করার ভারটা আমারই ওপর। ইদানীং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে আমাদের বাড়িতে এক দিন অন্তর বাজার হয়। তাতে আমার খানিকটা ক্ষতিই হয়েছে, কারণ বাজারের পয়সা থেকেই আমার হাত-খরচ তুলতে হয়।

বাথরুমে ঢুকতে যাচ্ছি, দাদা বলল, দাঁড়া, আগে আমি যাব।

তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দাদা কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলো, এই নীলু, তুই আমার ব্লেড নিয়েছিস?

আমি সরাসরি উত্তর না দিয়ে বললাম, তোমার ব্লেড? কবে?

আমার একটাই মাত্র ব্লেড ছিল, তুই না নিলে আর কে নেবে? সকালে দাড়ি কামাতে গিয়ে দেখি আমার ব্লেড নেই, এমন বিরক্ত লাগে!

গলা একটু নরম করে দাদা আবার বলল, না বলে নিস কেন? চাইলেই পারিস? চাইলে কি আমি দিই না?

দাদা বিদেশি ব্লেড ব্যবহার করে। এই ব্লেডের ব্যাপারে দাদা খুব কৃপণ।

আমি ব্লেড চাইলে দাদা একটা আধুলি দিয়ে বলে, তোর ব্লেড কিনে নিস! নিজেরটা কিছুতেই দেবে না। কেন, আমার বুঝি কখনও বিদেশি ব্লেডে মসৃণ ভাবে দাড়ি কামাতে ইচ্ছে হতে পারে না?

ছাতা আর থলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। দাদার কথায় মনটা খিঁচড়ে গেছে, আজ বাজারের পয়সা বেশি করে সরাতে হবে। সাত্যকি বসুমল্লিক বলেছিলেন, আমরা মতো একটা ছেলেকেই তিনি খুঁজছেন। কী কাজ তিনি দিতে চেয়েছিলেন আমাকে?

হঠাৎ মনে হল, আমি যদি পাগল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম, আর নিলয়দার মতো এক জন লোক আমাকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মলয়া বোর্ডিং হাউজের তিন তলার ছোট ঘরটায় রেখে দিত, তাহলে অপূর্ব আনন্দে আমি দিন কাটাতে পারতাম। সারা দিন বই পড়তাম শুয়ে শুয়ে, মাঝে মাঝে বেসুরো গান গাইতাম, আপন মনে হাসতাম কিংবা কাঁদতাম, এর থেকে আর বেশি কী চাই!

কিন্তু নলয়দার মতো লোক একটাই হয়। ভোলানাথ যে সুযোগ পেয়েছে, সে-সুযোগ আর কেউ পাবে না।

সঙ্গে সঙ্গেই আমার চোখ গেল রাস্তার মাঝখানে। ট্রামলাইনের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে এক পাগলি। একে আমি আগেও মাঝে মাঝে দেখেছি। মোটাসোটা চেহারা, মাঝবয়সী। কোমরে একটা ছেঁড়া গামছা জড়ানো, কিন্তু তাতে কিছুই লজ্জা নিবারণ হয়নি, উলঙ্গই বলা চলে কিন্তু। তার শরীরের চর্বির পরতে পরতে জমে আছে ময়লা, মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা, কেউ বোধহয় তাকে জোর করে একবার ন্যাড়া করে দিয়েছিল। পাগলি একটু অদ্ভুত ভাবে বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে একটা অ্যালুমিনিয়ামের সান্‌কি, সেটা সে এমন ভাবে উঁচিয়ে ধরে আছে, যেন যে-কোনও মুহূর্তে কারুর দিকে ছুঁড়ে মারবে।

আগে রাস্তা-ঘাটে পাগল-টাগল দেখলেই আমি অনেক দূরে সরে যেতাম। আজ একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম পাগলিকে। এরা কোথা থেকে আসে, কোথায় যায়? কে এদের ছেড়ে দেয় শহরের রাজপথে?

বৃষ্টির তেজ কমে এসেছে, রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে অনেক মানষ, অফিসযাত্রীদের ভিড় শুরু হয়ে গেছে। গাড়ি, ট্যাক্সি, রিক্সা, ট্রাম, বাস সব ভর্তি। এই যে এত মানুষ যাচ্ছে, এরা নিশ্চয়ই ভারতীয় ঐতিহ্য, বাংলার সংস্কৃতি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, অপসংস্কৃতি, গণতান্ত্রিক অধিকার, শ্রেণীহীন সমাজ, মানবতা, বিশ্বমানবতা, বিশ্বশান্তি, নারী-পুরুষের সমান অধিকার ইত্যাদি নিয়ে কিছু না-কিছু চিন্তা করে। কিন্তু সকালবেলা প্রকাশ্য রাস্তায় প্রায় উলঙ্গ এক জন রমণীকে দেখে, কেউ কোনও ভ্রূক্ষেপও করছে না।

আমিও এই পাগলিব জন্য কিছুই করতে পাবব না। কিন্তু আমি যদি নিলয়দাকে সাহায্য না করি, তাহলে মানুষ হিসেবে আমি খুবই ছোট হয়ে যাব। তাড়াতাড়ি বাজারটা সেরেই আমি ছুটলাম কালীঘাটের দিকে।

আগে এক তলার অফিস ঘরে ঢুকে হরিবাবুর কাছে খোঁজ নেব ভেবেছিলাম, কিন্তু তিনি নেই। সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম ওপরে।

ভোলানাথের ঘরের দরজাটার এক পাল্লা খোলা, জানালার ধারে বাইরের দিকে চেয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঘরের মধ্যে ঢুকে এলেও সে মুখ ফেরাল না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছ, ভোলনাথ? রাত্তিরে কোনও অসুবিধে হয়নি তো?

ভোলানাথ আমার চেযে বয়েসে অনেক বড় হলেও আমি তাকে তুমি বলতে শুরু করেছি। পাগল মানেই তো শিশু।

ভোলানাথ মুখ ফিবিয়ে আমার আপাদমস্তক দেখল। তারপব জল-মেশানো পাতলা গলায় বললে, মেঘ করলে আমার কষ্ট হয, মাথায় ব্যথা করে, খুব ব্যথা করে! আকাশে এত মেঘ!

যে-কেউ এখন শুনলে ভাববে ভোলানাথ সুস্থ লোকের মতো কথা বলছে। গত চার দিন সে একটাও কথা বলেনি। তবু ভোলানাথের এই স্বাভাবিকতাতেও আমার একটু গা ছম ছম করে।

খাট ছাড়া ঘরে একটি মাত্র চেয়ার আছে। তাতে বসে আমি বললাম, বৃষ্টি শুরু হয়েছে তো, মেঘ এবারে কেটে যাবে।

ভোলানাথ আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললো, সিগাবেট?

.আমি একটা সিগারেট আর দেশলাই এগিয়ে দিলাম ওর দিকে। নিলয়দার মতো ওর সিগারেট জ্বালিয়ে দিলাম না। দেখা গেল ভোলানাথ ইচ্ছে করলে দিব্যি নিজের সিগারেট ধরাতে পারে। পোড়া কাঠিটা তার হাত থেকে মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল, সেটা তুলে নিয়ে সে ফেলে দিল জানলা দিয়ে।

তোমার খাওয়া-দাওয়ার কোনও অসুবিধে হয়নি তো? রাত্তিরে খেয়েছ ভাল করে? সকালে চা দিয়েছে?

ভোলানাথ সোজাসুজি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, একটা বাড়ি আগুনে পুড়ে গেল, কেউ দেখেনি, তবু পুড়ে গেল, সেই বাড়ির মানুষ যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল, তবু কেউ কারুকে কিছু বলে না। প্রত্যেকেই মনে মনে অন্যকে দোষ দেয়। আমি বললাম, আগুন-লাগা বাড়িতে থাকতে নেই, কেউ শুনল না।

আমি সচকিত হয়ে বললাম, আগুন লেগেছিল? কার বাড়িতে? তোমার বাড়িতে?

অনেক বাড়িতে আগুন লাগে, কেউ দেখে না।

তোমার বাড়ি কোথায় ছিল, ভোলানাথ?

হাত পোড়ে না, পা পোড়ে না, তবু আগুন জ্বলতেই থাকে! জ্বলতেই থাকে।

আমি আগেও এটা লক্ষ্য করেছি যে, ভোলানাথ যখন অনেকটা স্বাভাবিক ভাবে কথা বলে, তখনও সে কোনও প্রশ্নের উত্তর দেয় না। নিজের কথাটাই শুধু বলে। তবু আমার মনে হল, ভোলানাথ যেন স্মৃতিচারণ করতে শুরু করেছে। মানুষের স্মৃতি যে কত দামি তা কোনও পাগলের সংস্পর্শে এলেই ভাল করে বোঝা যায়। স্মৃতির অভাবেই তো ওদের এত কষ্ট।

কোনক্রমে যদি ওর পূর্ব পরিচয় কিংবা বাড়ি-টাড়ির সন্ধান পাওয়া যায় সেই জন্য আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, ভোলানাথ, তোমার বাড়ি কোথায় ছিল? মনে পড়ছে? আগুন লেগেছিল সেই বাড়িতে? কে কে ছিল তোমার?

ভোলানাথ বলল, বাদলা পোকা। বাদলা পোকা!

কী বলছ?

বাদলা পাকা যেমন আগুনে ঝাঁপ দেয়, অনেক মানুষও ইচ্ছে করে আগুনে ঝাঁপ দেয়। নিজেরা কিন্তু কিছুই জানে না। কী যে পুড়ে যাচ্ছে তা-ও জানে না! হাঃ হাঃ হাঃ!

আমি চুপ করে গেলাম। এ তো অন্য রকম আগুনের কথা বলছে। পাগল হবার আগে ভোলানাথ বোধহয় খুব একটা সাধারণ মানুষ ছিল না। এক ধরনের উপলব্ধি না থাকলে তো মানুষ এ-রকম কথা বলতে পারে না।

হাতের সিগারেটটা চোখের সামনে ধরে ভোলানাথ আবার বলল, এই যে সিগারেটটা নিজে নিজে পুড়ছে, মানুষও এই ভাবে নিজে নিজে পোড়ে। কিন্তু বোঝা যায় না। বাইরে থেকে দেখো, সব ঠিক আছে, চেহারা ঠিক আছে, বুকের লোম ঠিক আছে, ধুৎ!

জ্বলন্ত সিগারেটটা সে প্রচণ্ড জোরে ছুঁড়ে ফেলল মাটিতে। তারপর আমার দিকে চেয়ে লাজুকের মতো হাসল।

আমি জুতো দিয়ে ওর সিগারেটের আগুনটা নিভিয়ে দিলাম। এক জন মানুষ আমার সামনে বসে সুস্থ লোকের মতো কথা বলে যাচ্ছে, অথচ আমার কোনও প্রশ্নের সে উত্তর দেবে না। আমার সঙ্গে কোনও রকম মানসিক সংযোগ হবে না। এটা যে কত কষ্টকর তা যার অভিজ্ঞতা নেই সে বুঝবে না। পাগলের সঙ্গে কথা বলতে গেলে বোধহয় স্পেশাল কিছু ট্রেনিং লাগে। আমার তা নেই, সুতরাং আমি চুপ করে থাকাই ঠিক করলাম।

ভোলানাথ বললে, নদী নেই একটাও! কোথায় নদী? মানুষ নদীতে স্নান করে, পুকুরে স্নান করে, পাতকুয়োয়, না, পাতকুয়োয় না খালে, আর সমুদ্রে, আর নদীতেও স্নান করে, খুব স্নান করে, ডুব দিয়ে দিয়ে স্নান করে, নাক টিপে জলের মধ্যে ডুব দেয়, কিনারা ছেড়ে মাঝখানে চলে যায়, সব সময় বুকটা জ্বলে যাচ্ছে কিনা! জুড়োতে হবে তো! তারপর ধরো তোমার...ইয়ে...ধরো তালগাছ! তালগাছ লম্বা হয় বলে কি তুমিও তার সমান লম্বা হতে পারবে? পারবে না! তবু শুধুমুদু যাওয়া কেন? তারপর

ধরো ঘড়ি। এই ইয়ে তোমার ঘড়ি প্রত্যেক ঘণ্টায় বাজে বলে তুমিও ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাজবে? অ্যাঁ? ঘড়িতে দম দিতে হয় বলে তুমিও নিজে দম দিচ্ছ, মোচড় মোচড় করে দম দিচ্ছ। আরে বাবা, দম দিলেই কি সব জিনিস বাজে? অত সহজ নয়, অ্যাঁ? তারপর ধরো, সিঁড়ি! ওদের বাড়ির সিঁড়িটা ভেঙে গেল বলে তুমিও তোমার নিজের বাড়ির সিঁড়ি ইচ্ছে করে ভেঙে ফেলবে? অ্যাঁ?

আমি আর না থাকতে পেরে বলে উঠলাম, কার বাড়ি ভোলানাথ? কোন বাড়ির সিঁড়ি ভেঙে গেছে?

ভোলানাথ চেঁচিয়ে উঠলো, কে?

দরজা ঠেলে ঢুকল নিলয়দা। আমার ওপর ভরসা করতে পারেনি। সকালেই চলে এসেছে। আমাকে দেখে একটু লজ্জা পেয়ে বলল, সকাল থেকেই এত বৃষ্টি, ভাবলাম তুই আসতে পারবি না! সাউথে এতটা নয় দেখছি, নর্থে তো সাঙঘাতিক বৃষ্টি হচ্ছে! কেমন আছ, ভোলানাথ!

ভোলানাথ বলল, হ্যাঁ, বৃষ্টি হলে মেঘ কেটে যায়! মেঘ ভাল না বৃষ্টি ভাল।

নিলয়দার হাতে এক প্যাকেট সন্দেশ। বেশ উৎফুল্ল গলায় বলল, কোনও গণ্ডাগোল হয়নি, সব ঠিকঠাকই তো আছে, না রে নীলু? আমি রাত্তিরে একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখলাম।

প্যাকেটটা খুলে ভোলানাথের দিকে এগিয়ে সস্নেহে নিলয়দা বলল, খাও। আমাকে প্রায়ই ট্যুরে যেতে হয়। হোটেলে কী যে খাবার দেয়, আমি তে: জানি! নীলু নে, তুই-ও নে!

ভোলানাথ এক সঙ্গে দুটো সন্দেশ নিয়ে মুখে ভরে দিল। তার ঠোঁট মাখামাখি হয়ে গেল সন্দেশের গুঁড়োয়। নিলয়দা পকেট থেকে রুমাল বার করে বলল, আরে, ও-ভাবে খায় না, একটা একটা করে খেতে হয়।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, নিলয়দা, তুমি যখন এসে গেছ, আমি তাহলে চলি! সব পারফেক্টলি নর্মান। ভোলানাথ এতক্ষণ আমাকে অনেক ভাল ভাল কথা শোনাচ্ছিল। একটা টেপ রেকর্ডার থাকলে বেশ হত!

রাস্তায় বেরিয়ে আমি উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটতে লাগলাম। ঝুরু ঝুরু বৃষ্টি পড়েই চলেছে। কিন্তু জলে জমেনি। এখন কোথাও গেলে হয়। কিন্তু কোথায় যাব, কার কাছে যাব? রানিদের বাড়িতে এই সময় যাওয়া যায় না। শুক্কুরবার সকাল দশটায় অন্য বন্ধুদেরও ব্যস্ত থাকে। এখন কফি হাউসে কেউ আসবে না।

হঠাৎ আমার মনে হল, অনেক দিন সমুদ্রের ধারে যাইনি। গত এক বছরে কোথায় কোথায় গেছি? নেতারহাট, আগরতলা, দুবরাজপুর, মগমা, বাঁকুড়া থেকে মুকুটমণিপুর, কিন্তু সমুদ্রের দিকে তো যাওয়া হয়নি।

সমুদ্রের পাশে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখা... এক্ষুনি যাওয়া যায় না? ময়দান থেকে বাসে দিঘা যাওয়া যায় তিন ঘণ্টায়। কিংবা ফ্রেজারগঞ্জ হয়ে বকখালি, সেখান থেকে জেলে ডিঙি নিয়ে...। যদি আর এক জন কারুকে সঙ্গী হিসেবে পাওয়া যেত!

রাজপথে অন্য সকলেই এখন নানা রকম কাজে ব্যস্ত হয়ে চলেছে, কোথায় যেন লোহার দামে সোনা নিলাম হয়ে যাচ্ছে, সেই দিকে ছুটছে সবাই।

শুধু আমারই কোনও উদ্দেশ্য নেই। ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমি হাঁটছি, আমার যেন শরীর নেই, শুধু একটা আত্মা, আমাকে কেউ চিনতে পারছে না, একটা লোকও আমার সঙ্গে ডেকে কথা বলছে না।

কালীঘাট ব্রিজ পেরিয়ে আমি যেতে লাগলাম জেলখানার পাশ দিয়ে। এ-দিকে কেন, কোন কারণ নেই। জেলখানার উঁচু দেয়াল আগে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখিনি। বেশ পুরু ব্যবস্থা। এই মুহূর্তে যদি কয়েকটা কয়েদি পাঁচিল ডিঙিয়ে পালাবার চেষ্টা করত, বেজে উঠত পাগলা ঘণ্টা, দুমদাম গুলির শব্দ, বেশ একটা সিনেমা-সিনেমা ব্যাপার, দারুণ হত তাহলে। আমি পলাতকদের বলতাম, চলো, চলো, আমি তোমাদের সমুদ্রের দিকে নিয়ে যাচ্ছি।

জেলখানার দেয়ালের ধার ঘেঁষে ঘেঁষেই আমি ঘুরে গেলাম বেকার রোডে। এই রাস্তা ধরে সোজা ময়দানে পড়া যায়। ময়দানে গিয়ে একটা গাছের নিচেও শুয়ে থাকা যায় কিছুক্ষণ, যতক্ষণ না খিদে পায় খুব।

ন্যাশানাল লাইব্রেরির ছোট গেটটার সামনে দিয়ে যেতে যেতে মনে হল, ঢুকব নাকি? অনেক দিন যাইনি। কিন্তু আমার কার্ড নেই। পরীক্ষা পাশেরও গরজ নেই, বিদ্বান হবারও শখ নেই, তাহলে যাব কেন? অবশ্য এই গেটটা দিয়ে ঢুকে চিড়িয়াখানার দিকের বড় গেট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়, তাতে শর্ট কাট হবে।

ভেতরে ঢোকার পর মনে হল, আমার নিয়তিই যেন আমাকে এখানে টেনে এনেছে। আশ্চর্য ব্যাপার, স্বর্ণর সঙ্গে সম্প্রতি পরিচয় হবার আগে ওকে তো আমি কোথাও দেখিনি। ওর মতো মেয়েকে দেখলে নিশ্চয়ই মনে থাকত। অথচ এখন কফিহাউসে, রাস্তায় প্রায়ই স্বর্ণর সঙ্গে দেখা হয়ে যাচ্ছে। আজও কি আকস্মিক দেখা? স্বর্ণ যে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে নিয়মিত আসে, সেটা কি আমি জানতাম? অবচেতনে কোথাও ছিল, সেই জন্যই আমি এ-দিকে এসেছি?

স্বর্ণর মাথায় একটা টুকটুকে লাল রঙের ছাতা, আর একটি লম্বা চেহারার যুবক তার পাশাপাশি হাঁটছে, তার মাথা কিন্তু ছাতার বাইরে। ওরা লাইব্রেরির সিঁড়িব দিকে না গিয়ে যাচ্ছে বড় গেটের দিকে।

স্বর্ণকে দেখে আমার বুকটা ধক্ করে উঠল কেন? ভয়ে? হায় নীললোহিত, তোমাব এই অবস্থা, সুন্দরী মেয়েদের দেখেও তুমি ভয় পাচ্ছ! ভয় ছাড়া আর কী, প্রেম তো নয়। স্বর্ণ দেখা হলেই বকুনির সুরে কথা বলে। স্বর্ণর পাশে যে হাঁটছে, তার নাম জয়দীপ না জয়নন্দন কী যেন, একটা ওয়াটারপ্রুফ কোম্পানির মালিকের ছেলে, এটুকু আমি জানি। আমার কফি হাউসের বন্ধুরা স্বর্ণ সম্পর্কে অনেক খবর রাখে। প্রত্যেক বছরেই আড্ডাধারীরা একটি কোনও নিয়মিত তরুণীকে মিস কফি হাউস আখ্যা দেয় মনে মনে। এ বছর স্বর্ণ সেই মুকুট পেয়েছে।

আমি উলটো দিকে ফিরে আবার ছোট গেট দিয়েই বেরিয়ে গেলাম। স্বর্ণর চোখে পড়তে চাই না। ফট্ করে হয়তো জেরা করে বসবে, আমি ন্যাশনাল লাইব্রেরির কাছে ঘুর ঘুর করছি কেন? আমি রিসার্চ স্কলার নই, অমুক নই, তমুক নই। মূল বাস্তা দিয়ে ঘুরে এসে আমি চিড়িয়াখানাব গেটেব সামনে দাঁড়ালাম। সিগারেট কিনতে হবে। অবশ্য চিড়িয়াখানার ভেরতটায় একবার ঘুরে আসা যায়।

সিগারেট ধবিয়ে মুখ ফিবিয়েই দেখলাম, স্বর্ণ প্রায ছুটতে ছুটতে আসছে, একা। ছাতাটা গুটিয়ে নিয়েছে, কাঁধে একটা বইযের ঝোলা। একটা থ্রি বি বাস দাঁড়িয়ে, স্বর্ণ সেটাই ধবতে চায়, কিন্তু এসে পৌঁছোবার আগেই বাসটা ছেড়ে গেল। এই বর্ষার দিনেও স্বর্ণর মুখটা রাগে গনগনে হয়ে আছে। দূরে, বড় গেটের মাঝখানে বিবেকানন্দর ভঙ্গিতে বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে তার প্রেমিক।

আমি দেওয়ালের সঙ্গে একেবারে মিশে রইলাম। দেখাই যাক না নাটকটা কোন দিকে গড়ায়। স্বর্ণ এ-দিক ও-দিক মুখ ঘুরিয়ে ট্যাক্সি খুঁজছে।

জয়দীপ বা জয়নন্দন কিন্তু দূরেই দাঁড়িয়ে রইল। আচ্ছা বোকা ছেলে তো! মেয়েরা রেগে গেলে দূরে থাকতে নেই, কাছে এসে তাদের আরও রাগিয়ে দিতে হয়, তা-ও জানে না!

যাত্রী-বোঝাই একটা ট্যাক্সি এসে থামতেই স্বর্ণ ছুটে গেল সে-দিকে। যাত্রীরা সবাই নেবে যাবার পর স্বর্ণ উঠতে যেতেই, ড্রাইভার বলল, যাবে না, এ গাড়ি আর যাবে না! স্বর্ণ দরজা খুলে তবু জোর করে উঠে পড়বার চেষ্টা করছে, ড্রাইভারের অ্যাসিস্ট্যান্ট হাত বাড়িয়ে বাধা দিচ্ছে তাকে। আজকাল ট্যাক্সিচালকদের একটুও শিভাল্‌রি নেই!

স্বর্ণ ট্যাক্সির দরজার হাতল শক্ত করে ধরে আছে, কিছুতেই ছাড়বে না। এবারে ট্যাক্সিওয়ালা ওকে অপমান করবে। এই অবস্থা দেখেও নির্বিকারে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। তার প্রেমিক এখনও দাঁড়িয়ে দেখছে। ব্যাপারটা ঠিক যেন একটা ত্রিভুজের মতো। ট্যাক্সির কাছে স্বর্ণ, খানিকটা দূরে এক কোণে আমি, আর এক কোণে তার প্রেমিক। ওই ইডিয়টটা এখনও চুপ করে আছে কেন?

ট্যাক্সিচালক জোরে কর্কশ গলায় কিছু একটা কথা বলতেই আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, কী ব্যাপার, যেতে চাইছে না? ট্যাক্সিওয়ালাদের জব্দ করার সব চেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে ট্যাক্সিতে না চড়া!

ড্রাইভার বলল, ওনাকে বলছি, গাড়ি খারাপ আছে, গ্যারেজে যেতে হবে!

আমি তাকে পোকা-মাকড়ের মতো অগ্রাহ্য করে স্বর্ণকে আবার বললাম, কাছেই একবালপুরের মোড়ে মিনিবাসের স্ট্যান্ড আছে, চলুন আমি আপনাকে সেই পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছি।

স্বর্ণ গাড়ির হাতল ছেড়ে দিল। তারপর টানা টানা সুন্দর চোখ দু'টিতে অগ্নিবর্ষণ করে সে জিজ্ঞেস করল, আপনি, এই সময়... এখানে কী করছেন?

জানতাম, এ মেয়ে প্রথমে এই কথাই বলবে। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ঢোকার যোগ্যতা আমার না থাকতে পারে, কিন্তু শখ করে আমি কি চিড়িয়াখানাতেও যেতে পারি না?

আমি বললাম, নতুন একটা সিংহ এসেছে চিড়িয়াখানায়, দেখতে যাবেন?

নাঃ! আপনি ট্যাক্সিটাকে ছেড়ে দিলেন কেন, আমি ঠিক উঠতাম।

পর পর দু'জনের সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই!

স্বর্ণ এর উত্তরে কিছু বলবার আগেই আমি বড় গেটের দিকে হাতছানি দিয়ে ওর প্রেমিককে কলাম। ওয়াটারপ্রুফ কোম্পানির মালিকের ছেলেটি তো খুব গোঁয়ার দেখছি, হন হন করে চলে যাচ্ছে লাইব্রেরির দিকে।

স্বর্ণ আমাকে ধমক দিয়ে বলল, ওকে ডাকছেন কেন? আপনি... আপনাকে কে এখানে মাথা গলাতে বলেছে! আপনি যেখানে যাচ্ছিলেন, সেখানে যান!

আমি তো কোথাও যাচ্ছি না!

এই যে বললেন, সিংহ দেখতে যাবেন!

একলা একলা কেউ সিংহ দেখতে যায়? আসলে কি জানেন, একটু আগে আমাব খুব ইচ্ছে হচ্ছিল সমুদ্রের ধারে যাওয়ার, তার বদলে চিড়িয়াখানায় চলে এলাম!

স্বর্ণ সোজাসুজি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ কয়েক মুহূর্ত সময় নিল। তারপর নীরস গলায় বললো, দেখুন, আপনার এ-সব ন্যাকামির কথাবার্তা শুনতে আমার একটুও ভাল লাগছে না। প্লিজ, লিভ মি অ্যালোন! আমাকে বিরক্ত করার কোনও অধিকার নেই আপনার।

এ-রকম কথা শুনে আমার অপমানিত বোধ করা উচিত ছিল, কিন্তু বোঝাই তো যাচ্ছে, এ-সব স্বর্ণর অতিরিক্ত রাগের কথা! রাগ হলে এক-এক জনের আর কোনও জ্ঞান থাকে না, মুখের ভাষাও খুব খারাপ হয়ে যায়। স্বর্ণকে বিরক্ত করাও আমার অভিপ্রায় নয়, কিন্তু এক ক্রুদ্ধ সুন্দরী যুবতীকে কলকাতার ট্যাক্সিচালকদের হাতে সমর্পণ করাও তো যায় না!

আমি বললাম, ওই যে একটা মিনিবাস আসছে, খুব বেশি ভিড় নেই।

না, আমি ট্যাক্সিতেই যাব!

ঠিক আছে। আপনার ট্যাক্সিতে আমাকে একটু লিফ্‌ট দেবেন?

স্বর্ণ রীতিমতো চেঁচিয়ে বলে উঠল, আই হেইট ইউ! আই হেইট ইউ অল! আপনারা সবাই সমান! আপনারা সবাই স্বার্থপর! শুধু নিজেদের জেদটাই আপনারা বজায় রাখতে চান!

অন্যের হয়ে গালাগালি খেতে আমার খারাপ লাগে না, কিন্তু স্বর্ণর চোখ দু'টি বড় বেশি উজ্জ্বল, বেশ অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। সমস্ত পুরুষ জাতির প্রতি ঘৃণা। এ লক্ষণ তো ভাল নয়। উইমেন্‌স লিব-এর সমর্থক নিশ্চয়ই স্বর্ণ, তাহলেও এত ঘৃণা কীসের! যারা মেল শোভেনিস্ট তারা কিন্তু মেয়েদের প্রতি ভালবাসা জানাবার ব্যাপারে অকৃপণ।

এই সময় ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি নেমে গেল। স্বর্ণ ছাতাটা খুলে ফেলল ফটাস করে। আমি চিড়িয়াখানার গেটের দিকে দৌড়ে যাব ভেবেছিলাম, পরক্ষণেই মত বদলে ফেলে স্বর্ণর কাছ ঘেঁষে চলে এলাম ছাতার তলায়। স্বর্ণ সঙ্গে সঙ্গে সরে গলে কয়েক পা। মুখ ফিরিয়ে বলল, ঘেন্না করি! আপনাদের সবাইকে আমি ঘেন্না করি!

ঝট করে আমার মনে হল, স্বর্ণর মাথাতেও পাগলামির লক্ষণ নেই তো? কয়েক দিন আগেও আমার সঙ্গে বেশ স্বাভাবিক ব্যবহার করেছে। কিংবা রাগে-দুঃখে স্বর্ণ এখনই পাগল হয়ে যাচ্ছে। এই সময় আমার কী করা উচিত? ওয়াটারপ্রুফের বাড়ির ছেলেটি কী বলেছে স্বর্ণকে? কাপুরুষ! একটা মেয়েকে রাগিয়ে দিয়ে তার পরে পালিয়ে যায়!

আর একটা ট্যাক্সি এসে থামতেই আমি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার সামনে। এই ড্রাইভার এক কথাতেই যেতে রাজি। আমি স্বর্ণর কাছে এসে খুব মিনতি ভরা গলায় বললাম, প্লিজ, আসুন, আমিও আপনাদের বাড়ির দিকে যাব।

উত্তর না দিয়ে স্বর্ণ চলে এল ট্যাক্সির কাছে। ছাতাটা না গুটিয়েই সে উঠতে যাচ্ছিল, আমি ওর হাত থেকে নিয়ে সেটা বন্ধ করে ফেললাম। তারপর মাঝখানে অনেকটা জায়গা ফাঁক রেখে দু'জানলার পাশে বসলাম দু'জনে।

ট্যাক্সিটা চলতে শুরু করার পর পেছনের কাচ দিয়ে দেখলাম ওয়াটারপ্রুফের বাচ্চা আবার গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছে আর ভিজছে বৃষ্টিতে। ভিজুক!

খালটা পার হবার পর আমি খুব কোমল গলায় জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে, স্বর্ণ? হঠাৎ এত রেগে গেলেন?

কোনও উত্তর নেই।

আমি কি আপনার কাছে কোনও অন্যায় করেছি?

স্বর্ণ মুখ ফেরাল রাস্তার দিকে! আমি তবুও ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আমি, আমি আপনার সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠেছি বলে কি আপনি খুবই অপছন্দ করছেন? আমি নেমে যেতে পারি এখানে।

এবার স্বর্ণ কান্নায় ভেঙে পড়ল। বাইরে প্রবল বৃষ্টি, কিন্তু স্বর্ণর কান্না একেবারে পাহাড়ি ঢলের মতো। দু'হাতে মুখ ঢেকে সে তার হৃদয়টাকে যেন সহস্র টুকরো করে ফেলছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে তার শরীর। ট্যাক্সি ড্রাইভার অবাক ভাবে পেছন ফিরে দেখতে লাগল।

আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলাম এবার। স্বর্ণর মতো তেজি মেয়ে যে এ-রকম অসহায় ভাবে কখনও কাঁদতে পারে, তা আমি কখনও ভাবিনি। স্বর্ণর গায়ে হাত দিয়ে তাকে সান্ত্বনা জানাবার সাহস আমার নেই। কারুর কান্না দেখে এ-রকম খুশি আমি হইনি আগে কোনও দিন। আমি একটা সিগারেট ধরালাম।

॥ ৭॥

পুরুলিয়ার সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে চিঠির উত্তর এসেছে। সেই ডেনিশ ডাক্তারটির মৃত্যু হয়েছে এক মাস আগে। সেখানে পাগলের চিকিৎসা করার কোনও ব্যবস্থা নেই, সুতরাং আমাদের আর পুরুলিয়া যাওয়ার কোনও মানে হয় না। অবশ্য যাওয়ার কোনও প্রয়োজনও হবে না মনে হচ্ছে। ভোলানাথের উন্নতি ও পরিবর্তন সত্যিই বিস্ময়কর।

একটা সপ্তাহ কেটে গেছে, ভোলানাথ কোনও গণ্ডগোল করেনি। সারা দিন সে নিজের ঘরেই বসে থাকে, খাবার এলে চেটেপুটে খায়, নিজে নিজে স্নান করে, এমনকী নিজের জামা-কাপড় পর্যন্ত কাচতে শুরু করেছে। চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার। বেশ বড় বড় দাড়ি হয়েছে ভোলানাথের, এখন তাকে অনেকটা সাধু সাধু দেখায়। সে কথাবার্তাও বলে প্রায় সাধুদের মতো। কিংবা দার্শনিকদের মতো, যদিও এমন কিছু দার্শনিকতা নেই তার মধ্যে।

নিলয়দা তো ভোলানাথকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত। যেন এটা তার নিজেরই বিশাল জয়। স্বর্ণ এক দিন আমাকে বলেছিল, উপকারেরও একটা নেশা আছে, নিলয়দা সেই নেশায় মেতে আছে। ভোলানাথ নামে পাগলটিকে বাঁচাবার চেষ্টার মধ্যে নিলয়দার একটা গোপন অহঙ্কারও রয়ে গেছে। স্বর্ণ অতি বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে ধরেছে ঠিকই। এ-রকম হয়। তবে অহঙ্কার কিংবা নেশার জন্যও যদি কেউ অন্য মানুষের কিছু সাহায্য করে, সেটাও তো কম নয়।

আমি চিন্তিত অন্য কারণে। ভোলানাথকে কত দিন রাখা হবে ওই বোর্ডিং হাউসে? এর খরচ কে দেবে? নিলয়দা চাকরি ভালই করেন, কিন্তু সে-রকম কিছু অবস্থাপন্ন নন। বাড়ির ট্যাক্সি নিয়ে কী একটা ঝামেলা হবার পর বকেয়া পঁয়তিরিশ হাজার টাকা ইনস্টলমেণ্টে শোধ দিতে হচ্ছে। হোটেলে একটা উটকো মানুষ পুষতে গেলে মাসে অন্তত ছ'শো সাতশো টাকা লাগবেই। রূপাবউদি মাসের পর মাস এটা সহ্য করবেন কেন?

দ্বিতীয় কথা হল, ধরা যাক, ভোলানাথ একেবারে সুস্থ হয়ে গেল! তারপর কী হবে? এখনও সে তার নাম কিংবা পূর্ব পরিচয় মনে করতে পারছে না, কিংবা মনে পড়লেও বলছে না। পুরো সুস্থ হলে তা তো জানা যাবেই। হয়তো তার স্ত্রী আছে, ছেলে-মেয়ে আছে কোথাও, কত বছর আগে তাদের ফেলে চলে এসেছে কে জানে! আবার ভোলানাথ সেখানে ফিরে গিয়ে তাদের দায়িত্ব নেবে? নিতে পারবে? যদি ফিরে যেতে না চায়? অতীত একেবারে মুছে ফেলে সম্পূর্ণ নতুন জীবন শুরু করা সম্ভব? আমি এ-সব প্রশ্নের উত্তর জানি না।

রবিবার সকালে আমি যাইনি, নিলয়দা এগারোটা আন্দাজ আমার বাড়িতে এসে দারুণ উত্তেজনার সঙ্গে বললেন, জানিস, ভোলানাথ গান গাইতে পারে। চমৎকার গলা! আজ আমাকে দু'খানা গান শোনালো, নিখুঁত একেবারে, একটাও কথা ভুল করেনি!

আমিও এর মধ্যে ভোলানাথকে দু'এক দিন গুন গুন করতে শুনেছি। শ্যামাসঙ্গীত ধরনের গান। সে-রকম একটা কিছু উঁচুদরের গলা বলে মনে হয়নি।

নিলয়দা বললেন, ও এক জন শিল্পী!

আমি নিলয়দাকে নিরুদ্যম করতে চাইলাম না। কৃত্রিম উৎসাহ দেখিয়ে বললাম, সত্যি ভাল গান গায়। ইস্, একটা প্রতিভা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

তুই ভেবে দেখ নীলু, এক জন গায়ক, তার একটু মাথার গোলমাল আছে বলে রাস্তার লোকেরা তাকে মেরে ফেলবে? বড় বড় ডাক্তার দেখালাম, সবাই বললেন, ও চিকিৎসার অতীত। অথচ আমি নিজের চেষ্টায়, তুইও সাহায্য করেছিস অনেক, ওকে ভাল করে তুললাম তো।

নিলয়দা, সত্যি, তুমি যা করেছ, তার তুলনা নেই।

নিলয়দার মুখে লজ্জা লজ্জা হাসি ফুটে উঠল। বললেন, আমার যেটুকু সাধ্য... এ-রকম তো সকলেরই করা উচিত... তোর সাহায্য না পেলে আমি আরও অনেক অসুবিধেয় পড়তাম। তুই আজ বিকেলে আয়, ভোলানাথের গান শোনাব। হরিবাবু শুনেছে। হরিবাবু কি বলল জানিস? বলল, আপনারা একে পাগল বলেছিলেন কেন মশাই? এর তো সব ঠিকঠাক আছে, এর চেয়ে ঢের বেশি পাগলকে আমি অফিস-টফিসে চাকরি করতে দেখেছি। এবার ওকে একটা কাজে লাগিয়ে দিন! হরিবাবুর কথাটা আমার মনে লেগেছে। ভোলানাথকে শুধু সুস্থ করে তুললেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হবে না, ওকে আবার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়ে দিতে হবে। ওর জন্য কাজ জোগাড় করতে হবে।

ভোলানাথ কী কাজ করবে?

আমি কি ভাবছি জানিস, ভোলানাথকে দিয়ে একটা গানের ফাংশান করব! রেডিও, টিভি, খবরের কাগজের লোকদের ডেকে শোনাব। তুই আজ বিকেলে আয়, তখন বসে প্ল্যান করা যাবে।

নিলয়দা, আজ বিকেলে আমি যেতে পারছি না।

তুই আজ আসবি না?

না, আমার একটা কাজ আছে।

কী কাজ?

যেতে হবে এক জায়গায়।

নিলয়দাকে এগিয়ে দিতে এলাম বড় রাস্তা পর্যন্ত। শেষের দিকটায় বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলাম। আজ বিকেলবেলা স্বর্ণর সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, কিন্তু সে-কথা নিলয়দাকে জানানো উচিত কি না বুঝতে পারলাম না। স্বর্ণ আমার সঙ্গে একলা দেখা করতে চেয়েছে এক জায়গায়, নিলয়দা সে-কথা শুনলে ভাবতেন কি যে আমি তার শ্যালিকার সঙ্গে লুকিয়ে প্রেম করছি? কিন্তু ব্যাপারটা সে রকম কিছুই নয়।

কান্নায় দূরত্ব মুছে যায়। মেয়েরা যার সামনে একবার বুক ভাসিয়ে কাঁদে, তাকে আর সহজে ছাড়তে চায় না। জয়নন্দনের সঙ্গে কী নিয়ে ঝগড়া হয়েছে, সে-কথা স্বর্ণ আমাকে এখনও বলেনি, কিন্তু সেই ছেলেটি সাঙঘাতিক কোনও কঠিন কথা নিশ্চয়ই বলেছে ওকে। সেই দিন থেকে স্বর্ণর জীবনটাই নাকি পালটে গেছে। আমি সে-দিন ওইভাবে সাহায্য না করলে ও নাকি পাগলই হয়ে যেত! এখন স্বর্ণ আমাকে ওর কাছাকাছি পেতে চায়, আমাকে অনেক কথা বলতে চায়।

কিন্তু এটা প্রেম নয়। আমার কাছে এসে স্বর্ণ তো সব সময় জয়নন্দনের কথাই বলে। জয়নন্দনকে কেন ওর পছন্দ হয়েছিল, জননন্দন যে এতটা খারাপ মানুষ, ও বুঝতে পারেনি ইত্যাদি। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি, স্বর্ণর মন এখনও জয়নন্দনের কাছেই বাঁধা দেওয়া আছে, তার কাছেই ফিরে যাবে। মাঝখানে কিছু দিন মান-অভিমানের পালা চলছে। এ-রকম ভাবে অপরের প্রেমের প্রক্সি দিতে আমার একটুও ভাল লাগে না। এক দিন আমে-দুধে আবার মিশে যাবে, আমি আঁটির মতো বাইরে পড়ে থাকব।

অথচ একটি যুবতী কন্যা নিরালায় দেখা করতে চাইলে তা প্রত্যাখ্যানই-বা করা যায় কী-ভাবে? আমি তো আর বলতে পারি না, আমি কাজে ব্যস্ত! আমার ব্যস্ততার কথা শুনলেই সবাই হাসে।

সাড়ে পাঁচটার সময় রেডিও স্টেশনের সামনে দেখা করবার কথা, আমারই পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে গেল। নির্ধারিত জায়গায় পুরুষদেরই আগে পৌঁছনো উচিত, মেয়েদের দাঁড় করিয়ে রাখা অন্যায়। কিন্তু স্বর্ণ রাগ করল না। আমি কাঁচুমাচু হয়ে ক্ষমা চাইতেই ও হেসে ফেলে বলল, আমারই তো দোষ, আমার উচিত ছিল দশ মিনিট দেরি করে আসা। তুমি সাঁতার জানো?

প্রশ্নটা একটু অপ্রত্যাশিত। আমি বিস্ময় গোপন করে বললাম, হ্যাঁ, জানি। অনেক দিন অভ্যেস নেই অবশ্য। কেন বলো তো?

সাঁতার জানো, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই নৌকোয় উঠতে ভয় পাবে না! জয় খুব জলকে ভয় পায়। ওর জন্য আমার কোনও দিন নৌকোয় বেড়ানো হয়নি।

সাঁতার শিখতে আর ক'দিন লাগে? শিখে নিলেই পারে।

ও সাঁতার শিখুক না-শিখুক, তাতে এখন আর কিছু যায় আসে না। আমি জয়ের চেহারাটাও ভুলে গেছি। তুমি যদি সে-দিন ট্যাক্সিতে না উঠতে, তাহলে আমি কোনও দিন পুরুষ জাতটাকেই ক্ষমা করতে পারতাম না! আজ যে-শাড়িটা পরেছি, আমাকে মানিয়েছে?

তোমাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে। যে-কোনও রঙই তোমাকে মানায়, তবু এই আকাশি নীল রঙটা যেন আরও সুন্দর।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর তুমি বললে, জয়ের একটা গুণ আছে, ও রঙটা খুব ভাল বোঝে। এটা আকাশি নীল নয়, এটা টারকয়েজ ব্লু!

হ্যাঁ, আমি রঙটা ভাল বুঝি না। নৌকোয় বেড়াবে, চলো তাহলে আউট্রাম ঘাটের দিকে যাই।

নীল রঙ কত রকম হয় জানো?

স্বর্ণ, আমি শুধু জানি মানুষের দুঃখের রঙ নীল।

তুমি দুঃখের কী জানো? তোমার তো সব সময় ইয়ার্কি ইয়ার্কি ভাব।

হাঃ হাঃ হাঃ।

হাসছ কেন, এটা কি হাসির কথা? জয়েরও এই এক দোষ, যখন তখন, কোনও মানে নেই, তবু হেসে ওঠে। এক দিন হয়েছে কী —

চলো, স্বর্ণ, রাস্তাটা পার হয়ে যাই।

আমার হাত ধরতে হবে না। আমি কি কচি মেয়ে নাকি?

শুধু কচি মেয়েদেরই বুঝি হাত ধরতে হয়?

তুমি কি জয়কে চেনো? তোমার সঙ্গে আলাপ আছে?

ও-রকম খারাপ ছেলেদের সঙ্গে আমি আলাপ করি না। যারা মেয়েদের মনে আঘাত দেয়, বৃষ্টির মধ্যে বান্ধবীর সঙ্গে সামান্য ঝগড়া করে যারা একা ছেড়ে দেয় —।

স্বর্ণ আমার দিকে গাঢ়ভাবে তাকিয়ে বিষণ্ণ ভাবে বলল, নীলকমল, তুমি আমার সামনে আর জয়ের নাম উচ্চারণও করবে না। আমি ওকে আমার জীবন থেকে মুছে ফেলেছি।

আমার নাম নীলকমল নয়। অনেকে আমাকে নীলু বলে ডাকে।

আমি তোমাকে নীলকমল বলেই ডাকব। নীলু কী একটা বাজে নাম! ছেলেদের ছোট নাম আমার পছন্দ নয়।

তুমি তো জয়নন্দনকে ছোট করে জয় বলে ডাকো।

বললাম না, ওই নাম তুমি আমার সামনে কখনও উচ্চারণ করবে না।

স্বর্ণ, ফুচ্‌কা খাবে?

ফুচ্‌কা? তুমি আমাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এই সব খেতে বলছ?

হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে? ফুচ্‌কা, আলু চটপটি এগুলো চমৎকার জিনিস। গঙ্গার ধারে... এখানে তোমাকে কে দেখতে পাবে?

জয়ের বাবা রোজ এখানে ইভ্‌নিং ওয়াক করতে আসে। হ্যাঁ, ফুচ্‌কা খাব। দেখুক না, জয়ের বাবা দেখলে আমার বয়ে গেল! ওদের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।

তবু ফুচ্‌কা খেতে খেতে স্বর্ণ বার বার এ-দিক ও-দিক চেয়ে দেখতে লাগল, যেন কারুকে খুঁজছে। ও ফুচ্‌কা খেতেই জানে না। তেঁতুলজলটা ফেলে দিচ্ছে আগে, অথচ ওটাই তো আসল।

নৌকো খুঁজতে খুঁজতে আমরা গঙ্গার ধার ধরে হেঁটে এলাম অনেকটা। স্বর্ণ অনবরত জয়ের কথা বলে যেতে লাগল। জয়ের সঙ্গেও এ-দিকটায় প্রায়ই বেড়াতে আসত, তা বোঝা গেল। দো-তলা রেস্তোরাঁটার দিকে আঙুল তুলে বলল, ওই যে কোণের দিকে জানলার ধারের টেবিলটা, ওটা ছিল আমাদের জন্য বাঁধা, আমরা প্রত্যেক শনিবার ওখানে এসে বসতাম। জয় তো নৌকোয় চড়ে না, ওখানে বসে বসেই আমরা নৌকো দেখতাম। আগের মাসে সেই যে এক দিন দারুণ ঝড় উঠেছিল।

জয় কোনও জায়গা থেকে লুকিয়ে এখন আমাদের লক্ষ্য করছে না তো? তোমার সঙ্গে আমাকে দেখলে জয় নিশ্চয়ই খুব রেগে যাবে। সুতরাং, আমি বলছিলাম কী —।

নীলকমল, তোমাকে বলেছি না, তুমি আমার সামনে জয়ের নাম উচ্চারণ করবে না? চলো। নৌকোয় চাপব!

আমি আবার অকারণে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলাম। নিলয়দা যদি কোনও দিন জিজ্ঞেস করে যে তুই কেন আমার শ্যালিকাকে নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়েছিলি? তাহলে আমি বলব, তোমার শ্যালিকা পাগল হয়ে যাচ্ছিল, আমি তার চিকিৎসা করছিলাম।

বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হল। ফিরেই মায়ের কাছে শুনলাম, নিলয়দা এর মধ্যে দু'বার এসে আমার খোঁজ করে গেছে। খুব জরুরি দরকার, আজ রাত্তিরেই ফোন করতে বলেছে।

আমি মাকে জিজ্ঞেস করলাম, কী দরকার কিছু বলেনি?

মা বলল, না, কিছু বলল না, বসতেও চাইল না। খুব রেগে আছে মনে হল।

নিলয়দা এর মধ্যেই জেনে গেছে স্বর্ণর ব্যাপরাটা? গঙ্গায় আমাদের দু'জনকে কেউ নৌকোয় বেড়াতে দেখে সোজা নিলয়দাব কাছে গিয়ে রিপোর্ট করেছে? কিন্তু স্বর্ণর সঙ্গে যদি আমার সত্যিই একটু ভাব-ভালবাসা হত, তাতেই-বা নিলয়দা আপত্তি করবে কেন? আমি কি এতটাই অযোগ্য?

এত রাতে পাশের ফ্ল্যাট থেকে ফোন করা যায় না। সামনের মোড়ে একটা ওষুধের দোকান অনেকক্ষণ খোলা থাকে, সেখান থেকে ফোন করা যেতে পারে। জামাটা গলিয়ে আবার বেবিয়ে পড়লাম।

ওষুধের দোকান পর্যন্ত যেতে হল না, তার আগেই দেখলাম নিলয়দা হন হন করে হেঁটে আসছে। উদভ্রান্তের মতো চেহারা।

কাছে এসে আমার হাত চেপে ধরে ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞেস করল কোথায় ছিলি নীলু। তোকে আমি সারা কলকাতা খুঁজছি, কফি হাউসেও গিয়েছিলাম।

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে নিলয়দা?

সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেছে রে। সব নষ্ট হয়ে গেল! এত দিনের পরিশ্রম, এত চেষ্টা, ছি ছি ছি!

ভোলানাথের কিছু হয়েছে?

কী সুন্দর প্রোগ্রেস করছিল, আর কয়েকটা দিন, লোকে যদি একটু সাহায্য করত —।

কী হয়েছে, বলো না!

ও বেঁচে আছে না মরে গেছে, তাই জানি না।

অ্যাঁ? সে কী। মরে গেছে মানে? বোর্ডিং হাউস ছেড়ে চলে গেছে? পালিয়ে গেছে?

ওকে থানায় ধরে নিয়ে রেখেছে।

থানায়... আবার কারুকে মেরেছে?

সকালে তোকে বললাম তো, কী সুন্দর গান শোনাল? আমার সঙ্গে অনেক কথা বলল, চমৎকার ব্যবহার, কিছুই বোঝা যায়নি।

বিকেলে ওখানে গিয়ে দেখি হই হই কাণ্ড। আমি পৌঁছবার একটু আগেই ঘটনাটা ঘটে গেছে। ইস্, একটু আগে যদি যেতাম!

নিলয়দা একটা বাড়ির দেয়ালে হেলান দিয়ে মাথায় হাত দিল। যেন নিলয়দার একেবারে সর্বনাশ হয়ে গেছে। গুরুতর শোকগ্রস্ত মানুষ আমি বিশেষ দেখিনি, তবে এর চেয়ে বেশি আর কী হতে পারে। নিলয়দা একেবারে বিধ্বস্ত! এটা শোক, না পরাজয়?

আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, কাকে কামড়াল, এবার কোনো পুরুষকেই?

মাথা থেকে হাত নামিয়ে নিলয়দা বললেন, ওরা তো বলছে, তিন জনকে। এক তলার হোটেলে এক জন ঝি ছিল, সে ছাদে উঠেছিল কাপড় শুকোতে দিতে প্রথমে... ভোলানাথ তাকে কামড়ে দেয়, সেই ঝি কোনওক্রমে ছাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, ভোলানাথ তাকে তাড়া করে যায়, তারপর রাস্তার আর দু'টি মেয়েকে কামড়ে দিয়েছে। তার মধ্যে একটা মেয়ের বয়েস তেরো-চোদ্দ বছর, তবে কারুরই বেশি কিছু ক্ষতি হয়নি শুনলাম। রাস্তার লোকেরা তখন ভোলানাথকে মারতে মারতে মাটিতে শুইয়ে ফেলে! একেবারে মেরেই ফেলত, হরিবাবু দৌড়ে গিয়ে একটা পুলিশ ডেকে আনে। সেই পুলিশ তখন ওকে টানতে টানতে থানায় নিয়ে যায়। হরিবাবু বলল, ভোলানাথ যা মার খেয়েছে, তাতে ওর পক্ষে এখন বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্য।

কোন থানায় নিয়ে গেছে?

ভবানীপুর থানায়। সেখানে আমি গিয়েছিলাম। কিছুতেই জামিনে ছাড়তে রাজি হল না। ভোলানাথের সঙ্গে আমাকে একবার দেখা করতেও দিল না। সেই জন্যই তো সন্দেহ হচ্ছে... অবশ্য বলল যে কাল কোর্টে কেস উঠবে, সেই সময় দেখা করতে!

ভোলানাথের জন্য আমার একটু একটু কষ্ট হল, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি কষ্ট হল নিলয়দার জন্য। নিলয়দার মুখে একটু আলো নেই, চোখ দুটো ঘষা কাচ।

ভাঙা ভাঙা গলায় নিলয়দা বলল, এত চেষ্টা করলাম, কিছুই হল না। সব নষ্ট হয়ে গেল! সব ব্যর্থ হল!

॥ ৮ ॥

নখী, শৃঙ্গী, পুলিশ ও উকিলদের থেকে শত হস্ত দূরে থাকার উপদেশ দিয়েছেন শাস্ত্রকারগণ। এত দিন আমি শুধু গল্প-উপন্যাসেই কোর্টের বর্ণনা পড়েছি। এবারে সেখানে যেতে হল নিলয়দার সঙ্গে।

আমি আর নিলয়দা সাড়ে দশটার মধ্যেই ব্যাঙ্কশাল কোর্টে হাজির, কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেল আমাদের কেস উঠবে দুটোর পর। গেট দিয়ে ঢোকার মুখেই কয়েক জন দালাল আমাদের ছেঁকে ধরেছিল সস্তায় ভাল উকিল ঠিক করে দেবে বলে, কিন্তু আমরা কোনও উকিল নিইনি। দো-তলা তিন তলায় গম্ভীর মুখে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম দু'জনে। কোনও কোনও ঘরে কেস চলছে। কোনও কোনও ঘর খালি। ঘরগুলো বেশি বড় নয়। হিন্দি সিনেমার আদালত-দৃশ্যে যে-সব বিরাট বিরাট ঘর দেখানো হয়, সেগুলো বোধহয় হাইকোর্টের। এখানে যে-সব লোকজনদের দেখছি, প্রত্যেকেরই কী-রকম দাগি দাগি চেহারা। কে জানে, অন্যরাও আমাদের দেখে সেই রকম ভাবছে কিনা।

আমরা একটাও বাক্য বিনিময় করছি না। আসলে সকালবেলাতেই নিলয়দার সঙ্গে আমার একটু মন কষাকষি হয়ে গেছে। আমার দোষের মধ্যে এই যে, আমি বলেছিলাম, নিলয়দা, কোর্ট-ফোর্টে যাবার দরকার কী? ভোলানাথকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে, এখন ওকে নিয়ে কী করা উচিত তা পুলিশই বুঝবে, আমাদের তো আর কোনও দায়িত্ব নেই!

নিলয়দা আমার দিকে এমন ভাবে তাকিয়েছিল, যেন আমি একটা জঘন্য পাপী! এ-রকম খারাপ কথা সে জীবনে শোনেনি। দারুণ আহত ভাবে বলেছিল, আমরা কোর্টে যাব না? তুই... তুই কী বলছিল নীলু? আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ভোলানাথ এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে খুঁজবে... তার কোনও আত্মীয়-স্বজন, চেনা কারুকে দেখতে পাবে না, তখন তার মনের অবস্থা কী-রকম হবে বল তো?

ভোলানাথের মনের অবস্থা নিয়ে চর্চা করার সাধ্য আমার আর নেই। মেয়েদের দেখলেই একটা লোক কামড়াতে যাবে, এ কী ধরনের পাগলামি! ওর জন্য কি পৃথিবীটা নারী-বর্জিত করে দিতে হবে?

কিন্তু নিলয়দা, আমরা তো ওকে পুলিশের হাতেই তুলে দিতে চেয়েছিলাম?

সে তো অন্য কথা! পুলিশকে সব বুঝিয়ে বলতাম, তারপর পুলিশ যদি ওকে কোনও হাসপাতালে রাখার ব্যবস্থা করত, আমরা মাঝে মাঝে ওকে দেখতে যেতাম... কিন্তু এখন পুলিশ ওকে ক্রিমিনাল চার্জে অ্যারেস্ট করেছে, থানায় জেরা করার নামে আরও কত অত্যাচার করেছে কে জানে... জজেব কাছে মিথ্যে চার্জ দিয়ে দেবে, আমরা যদি কেস ডিফেন্ড না করি, জজ যদি ওব ফাঁসিব হুকুম দিয়ে দেন?

ফাঁসি? আজকাল কারুর ফাঁসি হয় নাকি? ফাঁসি তো উঠে গেছে।

ফাঁসি উঠে গেছে? কে বলল তোকে?

রিসেন্টলি কোনও ফাঁসির ঘটনা তুমি শুনেছ? কিংবা কাগজে পড়েছ?

হ্যাঁ, ইয়ে, অনেক তো হয়... এই তো ভুট্টোর ফাঁসি হল!

সে তো পাকিস্তানে! ইন্ডিয়াতে আর ফাঁসি হয় না!

হ্যাঁ, হয়! কাগজে পড়েছি... মনে পড়েছে, বিল্লা-রঙ্গা? ওদের কী হল?

ওদের ফাঁসি হয়েছে? কী জানি! কিন্তু ভোলানাথ তো খুন-টুন করেনি, মাত্র তিনটে মেয়েকে কামড়ে দিয়েছে!

যে তিন জন মেয়েকে কামড়েছে, মনে কর, তাদেব কারুর সেপটিক হয়ে গেল, তারপর তাতেই মরে গেল, সেটাও তো খুন!

বউদিকে আর স্বর্ণকেও তো কামড়ে দিয়েছিল, ওদের তো সেপটিক হয়নি!

কী বাজে কথা বলছিস, নীলু? ওদের হয়নি বলে অন্য কারুর হতে পারে না? ওদের আস্তে কামড়েছিল।

যাই বলো নিলয়দা, ফাঁসিটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। ওর যাবজ্জীবন জেল হতে পারে, সেইটাই সব চেয়ে ভাল হবে। জেলের মধ্যে হাসপাতাল থাকে, আমি অনেক বইতে পড়েছি, সেখানে ভোলানাথের চিকিৎসা হবে।

তার আগে ওকে পাগল বলে প্রমাণ করতে হবে না? আমরা যদি কেস ডিফেন্ড না করি, কে ওকে পাগল বলে বুঝবে? চোর-ডাকাত-খুনেদের সঙ্গে যদি ওকে রেখে দেয়, তারা ওকে জ্বালাতন করে মারবে। মানুষ হিসেবে ভোলানাথ যে অনেক উচ্চস্তরের।

কিন্তু নিলয়দা, জেলখানাই একমাত্র জায়গা, যেখানে কোনও মেয়ে থাকে না! একমাত্র জেলখানাতেই ভোলানাথ সুস্থ থাকবে!

জেলেও ফিমেল ওয়ার্ড থাকে। মেয়েরা বুঝি ক্রিমিনাল হয় না?

ফিমেল ওয়ার্ড নিশ্চয় আলাদা জায়গায়। জেলের মধ্যে কখনও ফ্রিমিক্সিং থাকতে পারে? তাহলে তো অনেকেই জেলে যেতে চাইত?

আমি তোর সঙ্গে তর্ক করতে চাই না, নীলু! তুই যেতে না চাস, ওয়েল অ্যান্ড গুড, আমাকে যেতেই হবে! আমি এত কষ্ট করলাম ওর জন্য, এখন ওকে মৃত্যুব মুখে ঠেলে দেব। আমি ওর কেস ডিফেন্ড করব?

তুমি ওকে ছাড়িয়ে আনতে চাও? ছাড়িয়ে এনে এবারে কোথায় রাখবে?

না, ছাড়িয়ে আনতে চাই না। জজ সাহেবকে বোঝাব যে ও ঠিক কী-রকম মানুষ। ওকে জেলেই রাখা হোক, কিন্তু ওর সঙ্গে যেন ভাল ব্যবহার করা হয়, ওকে গান গাইবার সুযোগ দেওয়া হয়।

কিন্তু ডিফেন্ড করা মানে কী? তার মানে তো ওর বিরুদ্ধে যা অভিযোগ তা খারিজ করা। ওকে নির্দোষ প্রমাণ করা।

ও তো নির্দোষই বলতে গেলে! সজ্ঞানে, বুঝে শুনে তো ও মেয়েদের কামড়াতে যায় না!

নির্দেষ প্রমাণ করলে জজ ওকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবেন!

না না, ওকে এক্ষুনি ছেড়ে দেওয়া হোক, তা আমরা চাই না? কোর্টে গিয়ে এক জন উকিল ঠিক করব।

উকিলকে বলব যে, আমরা মশাই আমাদের কেসে জিততে চাই না। আমাদের মক্কেল জেলেই থাকুক, সেটাই আমরা চাই। তবে কিনা, জেলের মধ্যে কে যেন বেশ আদর-যত্ন করা হয়। এ-কথা শুনলে উকিলবাবু আমাদেরই পাগল ভাববেন না?

আহা-হা, ব্যাপাবটা সে-রকম নয়!

নিলয়দা, আমার মতে, আমাদের এখন ক্লিন চেপে যাওয়াই ভাল। তুমি ভোলানাথের জন্য অনেক চেষ্টা কবেছ, দেখলে তো, তাতে কোনও লাভ হলো না। কোর্টে গেলেই তুমি আবার ওই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বে। তার চেয়ে বরং রূপাবউদি আর পাপুনকে নিয়ে পুরী কিংবা দার্জিলিং বেড়িয়ে এসো কয়েক দিন।

নিলু, আমি কোনও দায়িত্ব নিলে মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যাই না। ভোলানাথ এক জন মানুষ, কোনও জন্তু-জানোয়াব তো নয় যে যখন তখন ত্যাগ করা যায়! তুই আমি চেষ্টা করেও ওকে পুরোপুরি সাহয্য করতে পারিনি। এক-আধ জনের চেষ্টায় কিছু হয় না, রাষ্ট্রের উচিত ওর দায়িত্ব নেওয়া। অমাদের ওয়েলফেয়ার স্টেট না? সেই কথাই অমি আদালতকে বোঝাব!

নিলয়দা, তুমি যা বলছ, তা নিয়ে খবরের কাগজে প্রবন্ধ লেখো। কোর্টে যাবার দরকার কী?

তোকে যেতে হবে না, নীলু। আমি একলাই যাব!

সুতরাং আমাকে আসতেই হয়েছে। নিলয়দা অবশ্য এখনও আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলছে না, মুখখানা উদাসীন কবে আছে। ভোলানাথ জেল খাটবে, এই ব্যাপারটা কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছে না নিলয়দা।

দুটো পর্যন্ত সময় কাটাতে হবে, তাই আমরা একটা কোর্ট রুমে ঢুকে বসে পড়লাম। খাঁচার মতো একটা জায়গায় তিন জন মহিলা আর দু'জন লোককে ভরে রাখা হয়েছে, এক জন উকিল দাঁড়িয়ে একটানা কী সব বলে যাচ্ছে। মামলাটা যে কীসের তা আমরা বেশ কিছুক্ষণ বুঝতেই পারলাম না। কাগজের আইন-আদালতের বিবরণ পড়ে আমার ধারণা ছিল, কোর্ট রুম বুঝি সব সময় সরগরম থাকে! কিন্তু এখানে তো কোনও রকম কথা কাটাকাটি, উত্তেজনা কিছুই নেই। জজের মাথায় পরচুল

নেই। পাকানো গোঁফ নেই, নিছকই সাধারণ চেহারার এক জন মাঝবয়সী ভদ্রলোক! খানিক বাদে বুঝতে পারলাম, এটা একটা গৃহবধূ হত্যার মামলা। রূপালি রায় নামে এক জন শৌখিন অভিনেত্রীর আগুনে পুড়ে মৃত্যুর খবর কয়েক দিন আগেই পড়েছি। কিন্তু রোমাঞ্চকর কোনও তথ্যই জানা গেল না, উকিলবাবুটি শুধু একঘেয়ে ভাবে রূপালি রায়ের স্বামীর অ্যাকাউন্টের বিভিন্ন দিনের হিসেব পড়ে শোনাতে লাগলেন।

এক জন মহিলাকে দেখে বেশ চমকে উঠলাম। আমি জানতাম যে মেয়ে-উকিল শুধু হিন্দি সিনেমাতেই দেখা যায়, ওঁদের কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এখানে সামনের সারিতে কালো গাউন পরে এক জন মহিলা বসে আছেন, তিনি দাঁড়ানো উকিলটির হাতে মাঝে মাঝে দু'একটা কাগজপত্র তুলে দিচ্ছেন। ভদ্রমহিলা খুবই সুন্দরী। অনেক সিনেমার নায়িকাই ওঁর কাছে হার মেনে যাবে।

আমি নিলয়দাকে ফিস ফিস করে বললাম, ওই মেয়ে-উকিলটিকে দেখেছ? দারুণ না?

রমণীর রূপ চর্চা করার মতো মনের অবস্থা নয় এখন নিলয়দার। আমার দিকে একটা রূঢ় দৃষ্টি দিয়ে বলল, চল, এখানে আর ভাল লাগছে না।

আর একটু বসো না, যদি ওই মহিলা উঠে কিছু বলেন, সেটা শুনে যাই।

তুই বোস তাহলে! আমি বাইরে আছি।

অগত্যা আমাকেও উঠতে হল। বেরিয়ে এসে করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললাম, নিলয়দা, আমি যদি কখনও পুলিশের হাতে ধরা পড়ি, তুমি আমার জন্য ওই ভদ্রমহিলা-উকিলকে ঠিক কোরো!

নীলু, তোর এ-সব ইয়ার্কি এখন আমার ভাল লাগছে না!

নিলয়দা, তুমি দিন দিন বড় শুকনো সমাজসেবী হয়ে যাচ্ছ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন রসে-বশে থাকতে! সুন্দরী মহিলা দেখলেই আমার শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথাটা মনে পড়ে যায়!

আরও দু' তিনটি আদলত কক্ষে আমরা উঁকি দিয়ে দেখলাম। কোথাও মজার ব্যাপার কিছু নেই। মাত্র সাড়ে এগারোটা বাজে, দুটো বাজতে অনেক দেরি, সময় যেন আর কাটছেই না।

ব্যাঙ্কশাল কোর্ট থেকে বেরিয়ে আমরা লালদিঘিতে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর একটা দোকানে ঢুকে মোগলাই পরোটা আর মাংসর লাঞ্চ খেলাম। তারপর পৌনে দুটো বাজতে না-বাজতেই চলে এলুম ন'নম্বর কোর্ট রুমে।

খাঁচার মধ্যে। ছ'সাত জন আসামিকে ভরে রাখা হয়েছে। তাদের মধ্যে দেখতে পেলাম ভোলানাথকে। গায়ের জামাটি ছিন্নভিন্ন, মুখে ময়লা মাখা, কপালে ব্যান্ডেজ। একেবারে চেনাই যায় না!

ভোলানাথ নিলয়দাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, বাবা! বাবা!

পাশে দাঁড়ানো এক জন সেপাই বলল, চোপ! কথা বলার কানুন নেই!

ভোলানাথ লোহার গরাদের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে তবু বলল, বাবা! ও বাবা!

সেপাইটি একটা রুল দিয়ে গরাদের ওপর মেরে বলল, চোপ! চোপ!

এক জন আসামি ভোলানাথের হাত ধরে টেনে ঠেলে দিন ভেতরের দিকে।

নিলয়দা বিমূঢ় ভাবে তাকাল আমার দিকে। ভোলানাথের এ কী নতুন পরিবর্তন, হঠাৎ বাবা বলে ডাকছে! আগে তার মুখে কোনও রকম ডাকই শোনা যায়নি। নিলয়দা কিংবা আমার নাম সে মনে রাখতে পারে না।

হাকিম এখনও আসেননি। পাশের ছোট টেবিলে পেশকার বসে আছেন, তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে কাগজপত্র বুঝিয়ে দিচ্ছেন কোর্ট-ইনস্‌পেকটর। ছ'সাত জন উকিল বসে আছেন সামনের দিকে, আমরা দু'জন ছাড়া বাইরের লোক আর কেউ নেই।

এক জন উকিলবাবু পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের ল-ইয়ার কে? কী কেস?

নিলয়দা উত্তর দেবার আগেই আমি বললাম, আমাদের কোনও ল-ইয়ার নেই। আমরা এমনি দেখতে এসেছি।

ওই আসামি বাবা বলে কাকে ডাকল?

তা জানি না!

নিলয়দার চেয়ে ভোলানাথ বয়সে অন্তত সাত-আট বছর বড়। সে হঠাৎ নিলয়দাকে বাবা বলে ডাকতে গেল কেন কে জানে!

কোর্ট-ইনস্‌পেকটরের মুখখানা দেখলে বেশ সরল, ভালমানুষ মনে হয়। তিনি কাজের ফাঁকে ফাঁকে দু'একবার মুখ তুলে আমাদের দেখছেন। ভোলানাথ আর দু'বার বাবা বলে চেঁচিয়ে উঠল। আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা অজানা ভয়ের উত্তেজনার সঞ্চার হচ্ছে। খালি মনে হচ্ছে, এখান থেকে এক্ষুনি চলে গেলে ভাল হয়।

কোর্ট-ইনস্‌পেকটর হাতছানি দিয়ে নিলয়দাকে ডাকলেন। আমিও উঠে গেলাম নিলয়দার সঙ্গে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের কোন কেস?

নিলয়দা বললেন, ওই যে ভেতরে রয়েছে, কাল কালীঘাটে তিন জন মেয়েকে... মানে, অনেকটা ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার।

আমি জোর দিয়ে বললাম, তিন জন মেয়েকে কামড়ে দিয়েছে! একটি মেয়ের বয়েস তেরো-চোদ্দ বছর!

নিলয়দা বিরক্ত ভাবে তাকাল আমার দিকে। আমি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কোর্ট-ইনস্‌পেকটর একটা খাতা উলটে বললেন, হ্যাঁ, কালীঘাটে, মলয়া বোর্ডিং হাউসের সামনে... পেটি কেস! ও-পক্ষের কেউ ডায়েরি করেনি! আসামি আপনাদের কে হয়!

আমি বললাম, কেউ না!

আমাকে থামিয়ে দিয়ে নিলয়দা বলল, আমাদের বিশেষ পরিচিত। দেখুন, ও মানুষটি অতি ভাল, একটু মাথার গোলমাল আছে, বেশির ভাগ সময়ই ঠিক থাকে, মাঝে মাঝে হঠাৎ!

কী বললেন, মাথার গোলমাল আছে!

হ্যাঁ স্যার। তবে ওকে দেখাশুনো করার কেউ নেই তেমন... আপনাবা ওকে জেলেই রাখুন, জেলে যদি ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন —।

ঠিক আছে, বসুন গিয়ে।

নিলয়দা তবু অনুনয় করে বলল, একটু কনসিডার করবেন। সাধারণ পাগলের মতো ওকে ট্রিট করবেন না। আপনাকে স্পেশালি রিকোয়েস্ট করছি।

এই সময় হাকিম এসে ঢুকতেই সকলে উঠে দাঁড়ালেন। আমরা নিজেদের জায়গায় ফিরে এলাম। এরপর মিনিট পনেরো কিছুই হল না। পেশকারের সঙ্গে হাকিম কী সব কথা বলতে লাগলেন।

প্রথমে অন্য এক জন আসামির নামে হাঁক পড়ল। সওয়াল-জবাব কিছুই হল না। এক জন উকিল উঠে দাঁড়িয়ে এক মাস বাদের ডেট চাইলেন, হাকিম তা মঞ্জুর করে দিলেন। দ্বিতীয় আসামির ক্ষেত্রেও সাক্ষী আসেনি, তার উকিল মেডিক্যাল সার্টিফিকেট পড়ে শোনাতে যাচ্ছিলেন, হাকিম বললেন, ঠিক আছে। আপনি কবে তারিখ চান?

ভোলানাথের নামটি আমার দেওয়া, কিন্তু ও নিজে সে নাম বলতে পারে না। পুলিশ কী করে জানল? হরিবাবুর কাছ থেকে শুনেছে? পুলিশ আবার তার সঙ্গে একটা দাস বসিয়ে দিয়েছে। হাঁক পড়ল, ভোলানাথ দাস!

ভোলানাথকে খাঁচা থেকে বার করে এনে দাঁড় করানো হলো কাঠগড়ায়। কোর্ট-ইনস্পেকটর বিড় বিড় করে হাকিমকে কী যেন বোঝালেন। হাকিম খস খস করে সই করে দিলেন একটা কাগজে। কোর্ট-ইনস্পেকটর মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, খালাস! আপনাদের লোক নিয়ে যান।

ব্যাপারটা যেন চোখের নিমেষে ঘটে গেল। বিচারের এই নমুনা। আমি উত্তেজনা দমন করতে না পেরে উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বললাম, স্যার, আমরা ওর খালাস চাই না! ও পাগল! গভর্নমেন্টের উচিত ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

হাকিম মুখ তুলে ঠাণ্ডা চোখে তাকালেন আমার দিকে। কোর্ট-ইনস্পেকটর কঠিন মুখ করে বললেন, ডিসটার্ব করবেন না, বাইরে যান! এক জন উকিল আমাকে বললেন, কী করছেন, ভাই? কনটেম্প্ট অফ কোর্ট হয়ে যাবে! বাইরে চলে যান! খালাস পেয়ে গেছেন তো।

ভোলানাথকে ছেড়ে দিতেই সে ছুটে এসে নিলয়দাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে বলতে লাগল, বাবা বাবাগো, আমার খিদে পেয়েছে! আমাকে ওরা মেরেছে! বাবা, আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো!

রুল উঁচিয়ে সেপাই বলল, বাহার যাও! বাহার যাও! হল্লা মাৎ করো! যাও, নিকালো।

কারা যেন প্রায় ঠেলতে ঠেলতেই বার করে দিল আমাদের তিন জনকে। নিলয়দার চোখে জল চিকি চিক করছে। ভোলানাথ ঠিক একটা বাচ্চা ছেলের মতো নিলয়দাকে জড়িয়ে ধরে মাথা ঘষছে তার বুকে।

নিলয়দা ফ্যাকাসে গলায় বলল, কী হয়ে গেল বল তো, নীলু? ভাবতেই পারিনি যে এ-রকম হবে!

নিলয়দার ওপর আমার এমন রাগ হচ্ছে যে, ওর দিকে আমার আর তাকাতেই ইচ্ছে করছে না। নিলয়দারই তো সব দোষ! কোর্ট-ইনস্পেকটরের সঙ্গে ও-রকম ভাবে কথা বলতে গেল কেন? চেনা লোককে জেল খাটানোর জন্য কেউ কাকুতি মিনতি করে? সরকার একটা পাগল ক্রিমিনালের দায়িত্ব নিতে চায় না, সে-দায়িত্ব চাপিয়ে দিল নিলয়দার ঘাড়ে। এখন ভোলানাথকে আমরা কোথায় নিয়ে যাব?

কোর্টের বাইরে বেরিয়ে আমরা কেন যে ডান দিকে না গিয়ে বাঁ-দিকে হাঁটতে লাগলাম তা আমরা কেউই জানি না। ভোলানাথ নিলয়দার হাত জড়িয়ে ধরে অনবরত বক বক করে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ অসম্বন্ধ প্রলাপ। রাস্তার লোকেরা আমাদের এ-দিকে ফিরে ফিরে দেখছে।

এক জায়গায় ভোলানাথ থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে এ-এ-এ-এ আওয়াজ করতে লাগল। মুখটা ফাঁক, তার জিভটা বেরিয়ে এসেছে, চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। দু'টি মেয়ে রাস্তা পার হয়ে আসছে আমাদের দিকে, ভোলানাথের চোখ সেই দিকে।

আমি মেয়ে দু'টিকে আড়াল করে ভোলানাথের মুখোমুখি দাঁড়ালাম। অমার চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। ভোলনাথকে বুকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললাম, ফের যদি তুমি কোনও মেয়ের দিকে তাকাও, আমি তোমার সব কটা দাঁত ভেঙে দেব!

আগে পাগল দেখলেই আমি সাঙ্ঘাতিক ভয় পেতাম, অথচ আজ আমার এতখানি সাহস হল কী করে? মরীয়া হয়ে উঠলে বোধহয় সব মানুষই সাহসী হয়।

আমার শাসানি শুনে ভোলনাথ নিলয়দাকে চেপে ধরে বলল, বাবা, আমাকে মারবে! আমাকে মেরো না! আমার খিদে পেয়েছে!

এতক্ষণ নিলয়দার সঙ্গে কথা বলিনি, তবু এবার বলতেই হল, নিলয়দা এই ভাবে ওকে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। দুপুরবেলা ডালহৌসিতে অনেক মেয়ে।

নিলয়দা বলল, ওই তো একটা ট্যাক্সি আসছে। ওটা ধরা যাক। কিন্তু যে খিদে পেয়েছে বলছে?

নিলয়দা ভোলানাথকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল, আমি রাস্তার ধারে একটা লোক ভুট্টা পোড়াচ্ছিল, তার কাছ থেকে দুটো ভুট্টা কিনে আনলাম। ভোলানাথ সেই ভুট্টা দুটো নিয়ে ডাঁটা-ফাটাসুদ্ধ চিবিয়ে খেতে শুরু করে দিল।

ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবেন?

নিলয়দা আমার দিকে অসহায় ভাবে তাকাল। আমি কঠিন মুখ করে বললাম, গঙ্গার ধারে।

গতকাল সন্ধ্যায় যেখানে স্বর্ণর সঙ্গে নৌকোয় চেপেছিলাম, ঠিক সেই জায়গার কাছাকাছি আসতেই আমি ট্যাক্সি থামাতে বললাম। নিলয়দাকে বললাম, এখানে নামো। ট্যাক্সিওয়ালাকে বললাম, আপনি একটু অপেক্ষা করুন ভাই।

যেন আমিই বয়েসে বড়, নিলয়দা আমার কথা শুনতে বাধ্য। ছেলের মতো নেমে পড়ল। ভোলানাথও নামল। প্রথম ভুট্টাটা শেষ করে সে এখন দ্বিতীয়টা খাচ্ছে কচর কচর করে। গোটা একটা আস্ত ভুট্টা যদি কেউ খায়, তা কি তাকিয়ে দেখা যায়? আমি ওর দিকে চোখই ফেলছি না। ও কিন্তু নিলয়দার একটা হাত চেপে ধরে আছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, হোয়্যার ডু ইউ ইনটেন্ড টু টেক হিম নাউ, নিলয়দা?

কোথায় যাওয়া যায় বল তো! হরিবাবুর কাছে তো যাওয়া আর সম্ভব নয়। ও-পাড়াতেই ঢোকা যাবে না!

লেট মি টেল ইউ ফ্র্যাংকলি, নিলয়দা। আই থিঙ্ক উই শুড ড্রপ দিস লুনাটিক হিয়ার, অ্যান্ড রান অ্যাওয়ে! দেয়ার ইজ নো আদার অলটারনেটিভ!

আমার কথাগুলো যেন বুলেটের মতো নিলয়দার বুকে বিঁধল। বর্ণহীন হয়ে গেল মুখখানা। খাওয়া থামিয়ে ভোলানাথ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল এক দৃষ্টে। ও কি তাহলে ইংরিজি বোঝে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিলয়দা বলল, তুই ঠিকই বলেছিস। সেটাই করা উচিত, কিন্তু আমি তা পারব না।

কেন পারবে না? এই গঙ্গার ধারে কত সাধু-সন্ন্যাসী, যোগী, পাগল থাকে। এদের মধ্যে ওর জায়গা হয়ে যাবে।

ওর এখন যা অবস্থা, যে-কোনও মুহূর্তে ভায়োলেণ্ট হয়ে যেতে পারে। গঙ্গার ধারে অনেক ছেলে-মেয়ে বেড়াতে আসে। এখানে কোনও মেয়েকে অ্যাটাক করলে ও লিনচ্‌ড হয়ে যাবে। লোকে মেরে ওকে গঙ্গার জলে ফেলে দেবে! আমার হাতটা ও কী-ভাবে চেপে ধরে আছে দেখ, কী করে ছাড়িয়ে নেব? যদি জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে যাই, তারপর বাকি জীবনটা আমার কী-ভাবে কাটবে? এক দিনের জন্যও কি শান্তি পাব? সব সময় মনে হবে না যে আমি এক জন মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী?

নিলয়দার দু'চোখ দিয়ে নেমে এল জলের ফোঁটা। পকেট থেকে রুমাল বার করে নিলয়দা মুখটা ফিরিয়ে নিল।

আমি কয়েক পা সরে গিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। আমার চোখের সামনে একটা দৃশ্য ভেসে উঠল। স্বর্ণ আর জয় এখানে বেড়াতে এসেছে, হঠাৎ ভোলানাথ পেছন থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বর্ণর ওপর। জয় তখন কী করবে? ভয় পেয়ে পালাবে না বীরবিক্রমে ভোলানাথকে মারতে শুরু

করবে? আমহার্স্ট স্ট্রিটে গিয়ে স্বর্ণ নিলয়দাকে বলছে, নিলয়দা, তোমার সেই পোষা পাগলটিকে আমার হৃদয়েশ্বর আজ খুন করেছে। আজ থেকে দিদির আর কোনও চিন্তা নেই।

আজকের ঘটনা শুনে স্বর্ণ নিশ্চয়ই ভাববে, আমি আর নিলয়দা যুক্তি করে কোর্টে গিয়ে, ভাল উকিল লাগিয়ে ভোলানাথকে ছাড়িয়ে এনেছি। নিলয়দা গলা পরিষ্কার করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কোনও নার্সিং হোমে ওকে ভর্তি করা যায় না? মেণ্টাল পেসেণ্টদের জন্য নিশ্চয়ই নার্সিংহোম আছে।

কিন্তু নিকট আত্মীয় না হলে যে ভর্তি করানো যায় না?

আমি নিকট আত্মীয় বলে পরিচয় দেব। বলব, আমার দাদা। কেউ কি আমার নামে অভিযোগ করতে যাবে? কে অভিযোগ করবে?

নার্সিংহোমে ও কত দিন থাকবে?

যে-ক'টা দিন আমি চালাতে পারি।

নিলয়দা, এ বিষয়ে আমার কোনও মতামত নেই।

সে যাই হোক, এক্ষুনি তো ভর্তি করা যাচ্ছে না। সে-রকম নার্সিং হোম খুঁজে বার করতে হবে। আজকের দিনটা ওকে বাড়িতে রাখা ছাড়া আর তো কোনও উপায় দেখছি না।

কার বাড়িতে? তোমার বাড়িতে নিয়ে যাবে?

অতি দুঃখীর মতো হেসে নিলয়দা বলল, আর কার বাড়িতে জায়গা পাব, বল? চল, এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।

নিলয়দা, তুমি যাও। আমি এখন এখানেই একটু থাকব একলা একলা!

রূপার বকুনির ভয় পাচ্ছিস, না? সেই ভাল, তোর আর যাবার দরকার নেই। তুই কেন শুধু শুধু বকুনি খেতে যাবি! আমি একলাই ঠিক ম্যানেজ করে নেব!

নিলয়দার ওপর এর পরেও কি রাগ করে থাকা যায়? দুরু দুরু বুকে আমাকে যেতে হল সঙ্গে।

রূপাবউদি অফিসে গেছে, ফিরবে সাড়ে পাঁচটায়। পাপুন ফিরে এসেছে স্কুল থেকে। একটা আইসক্রিম চুষতে চুষতে আহ্লাদিত মুখে পাপুন বলল, পাগলটা আবার এসেছে? বেশ মজা হবে! মা আসুক না!

ভোলানাথ আজ খুবই অশান্ত। হা-হা করে হাসছে, কখন কেঁদে ফেলছে, ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে রাখলেও দুম দুম করে ধাক্কা দিচ্ছে দরজায়। আজ যদি একটু চুপচাপ ভদ্র হয়ে থাকত!

নিলয়দা বলল, নীলু, তুই ডাক্তার ভড়কে একটা ফোন কর। ইঞ্জেকশন দিয়ে একে ঘুম পাড়ানো দরকার। রূপা আসবার আগেই যদি ঘুম পাড়িয়ে ফেলা যায়।

ডাক্তার ভড়কে আমি ফোন করে পেলাম না। ওঁর চেম্বার থেকে জানাল যে, উনি সাতটার সময় সেখানে আসবেন, তার আগে তাঁকে পাবার কোনও উপায় নেই।

ভোলানাথ এত জোর দরজা ধাক্কা দিচ্ছে যে, খুলে না দিয়ে উপায় নেই। মাথার ব্যান্ডেজটা সে খুলে ফেলেছে, কপালের ওপর তার দগদগে ক্ষত। নিলয়দা বলল, ভোলানাথ, আজ গণ্ডগোল করো না। ভেতরে গিয়ে বসো, আমি তোমার কপালে ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছি!

ভোলানাথ গর্জন করে বলল, আমি ভাত খাব। আর দই খাব।

ঠিক সেই সময় ফিরে এল রূপাবউদি। সদর দরজা খোলা ছিল, উঠোনে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল, মুখখানা বদলে গেল চোখের নিমেষে। বেশ হাসিমুখে মেজাজেই বাড়িতে এসেছিল, সেই হাসিটা মুছে গিয়ে যা ফুটে উঠল, তা ভয় নয়, ঘৃণা। নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে অস্ফুট গলায় বলল, ওকে আবার নিয়ে এসেছ, তুমি যে কথা দিয়েছিলে...।

নিলয়দা ভোলানাথকে জোর করে ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর ব্যাকুল ভাবে বলল, শোনো রূপা, আমি বুঝিয়ে বলছি।

তীক্ষ্ণ গলায় রূপাবউদি চেঁচিয়ে উঠল, পাপুন, তুই চলে আয় আমার সঙ্গে!

রূপা, শোনো —।

রূপাবউদি আর পাপুনের অপেক্ষা করল না। পেছন ফিরেই দৌড়োতে শুরু করল।

আমি বললাম, নিলয়দা, তুমি যাও, বউদিকে ধরো।

অবসন্ন ভাবে নিলয়দা বলল, তুই যা নীলু, তোর কথা শুনবে। আমি আর পারছি না।

আমি বাইরে এসে দেখি রূপাবউদি বেশ জোরে ছুটছে। রাস্তার লোক হাঁ করে দেখছে তাকে। মেঘলা আকাশে ঘনিয়ে এসেছে অকালসন্ধ্যা। বিবেকানন্দ রোড দিয়ে একটা মিছিল যাচ্ছে, কালোয়ারদের দোকানে কীসের যেন চ্যাঁচামেচি, কয়েকটা বাচ্চা ছেলে মাঝরাস্তায় ছোটাছুটি করছে একটা ঘুড়ি ধরার জন্য, এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে আমি দৌড়োতে লাগলাম। রূপাবউদির যখন মেজাজ ভাল থাকে, তখন অনেক রকম মজা করে, কিন্তু রাগলে একেবারে গণ্ডারের মতো একমুখী। তখন আর কোনও কথা মনে থাকে না! শহরের রাস্তা দিয়ে কোনো ভদ্রমহিলা কি এ-রকম ছোটে?

পেছন থেকে ডেকে কোনও লাভ নেই, আমি একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। হাত জোড় করে বললাম, বউদি, শোনো —।

আমাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে রূপাবউদি ছুট দিল। এবারে আমি রূপাবউদির হাত চেপে ধরে বললাম, শোনো, কী করছ!

ছেড়ে দাও আমাকে! আমি ও-বাড়িতে আর কোনও দিন যাব না!

ঠিক আছে, আমি তোমাকে বাপের বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছি, এ-রকম ভাবে ছুটছ কেন?

আমাকে পৌঁছে দেবে... কেন? আমি নিজে যেতে পারি না! আমি বাপের বাড়িতে যাব না, আমার যেখানে ইচ্ছে চলে যাব। ছাড়ো আমাকে! ইতর কোথাকার! একটা পাগলা কুকুর, যে মেয়েদের দেখলেই কামড়ে দেয়, তাকে তোমরা বাড়িতে নিয়ে আসবে! কেন, আমি জানি! আমাদের অপমান করবার জন্য।

এবার ওকে ইচ্ছে করে আনা হয়নি।

ছাড়ো আমাকে!

কী করছ, রূপাবউদি? লোকে ভাববে, আমি তোমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।

ছাড়ো, নইলে আমি চ্যাঁচামেচি করব। আমি তোমাদের সবাইকে ঘেন্না করি।

এই সময় পাপুন এসে হাজির হয়ে বলল, মা!

রূপাবউদি বলল, চল পাপুন, আমরা চলে যাই!

এতক্ষণ রূপাবউদি রাগে ঠক ঠক করে কাঁপছিল, এবারে হঠাৎ খুব শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বলল, নীলু, আমাদের আটকাবার চেষ্টা কোরো না।

দু'চার জন কৌতূহলী লোক জমে গেছে আশেপাশে। এখন আর জোর করা যুক্তিযুক্ত নয়। আমি চুপ করে গেলাম। একটা রিকশা ডেকে রূপাবউদি পাপুনকে নিয়ে উঠে পড়ল। অফিস থেকে ফিরে ক্লান্ত অবস্থায়, এক কাপ চা-ও না খেয়ে রূপাবউদি চলে যাচ্ছে বাড়ি ছেড়ে, এই অপমান সে কোনও দিন ভুলবে?

ফিরে এসে দেখলাম, নিলয়দা দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঝাঁঝালো ভাবে বললাম, আমাকে পাঠাবার কোনও মানে হয়! তোমার নিজের যাওয়া উচিত ছিল, রূপাবউদি কোথায় চলে গেল কে জানে!

নিলয়দা হাত বাড়িয়ে ধীর গলায় বলল, একটা সিগারেট দে। আমি মন ঠিক করে ফেলেছি। কালকেই সব ব্যবস্থা করে ফেলব। ভোলানাথের জন্য আর কারুকে ভাবতে হবে না।

॥ ৯ ॥

হাওড়া পেরিয়ে আমাদের জিপটা বম্বে রোডে পড়ল প্রায় বেলা এগারোটায়। নিলয়দা নিজেই জিপ চালাচ্ছে। অনেক ভেবেচিন্তেই আমরা ড্রাইভার নিইনি।

কাল অনেক রাত পর্যন্ত নিলয়দা আর আমি এই পরিকল্পনাটা নিয়ে আলোচনা করেছি। আমাদের ইচ্ছে ছিল খুব ভোরবেলা বেরিয়ে পড়ব। কিন্তু জিপটা ভাড়া করার পর দেখা গেল গিয়ারে একটু গোলমাল আছে। এর চেয়ে ভাল জিপ পাওয়া গেল না, এটাকেই সারিয়ে, ট্রায়াল দিয়ে নিতে হল। নিলয়দা সকালে যতক্ষণ জিপটা নিয়ে ব্যস্ত ছিল, সেই সময় আমাকে একবার যেতে হয়েছিল স্বর্ণদের বাড়িতে।

রূপাবৌদি কাল রাত্তিরে ও-বাড়িতে আসেনি। তার জন্য অবশ্য দুচিন্তার কিছু নেই। রূপাবউদি ছেলেমানুষ নয়, পাপুনকে নিয়ে যখন গেছে, তখন কোথাও হারিয়ে যাবে না। পাছে এ-বাড়িতে ওর খোঁজ করতে আসি, সেই জন্য অন্য কোনও বন্ধু-টন্ধুর বাড়িতে চলে গেছে নিশ্চয়ই। সকালেও রাগ পড়েনি। আমি স্বর্ণকে বাড়ির চাবি দিয়ে বললাম, আমরা দু'দিনের জন্য কলকাতার বাইরে যাচ্ছি, পুরুলিয়ার একটা হাসপাতালে ভোলানাথকে রেখে আসব। রূপাবউদিকে বোলো, ভোলানাথ আর কোনও দিন ও-বাড়িতে আসবে না। নিলয়দা এই শেষবারের মতো রূপাবউদিকে ক্ষমা করতে বলেছে।

আমরা গাড়িতে যাব শুনে স্বর্ণ আবদার ধরল, তাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। তাকে বোঝানো মহা মুশকিল। বাঘ, ছাগল আর পানের একটা ধাঁধা আছে না, যাতে কিছুতেই ওদের এক সঙ্গে এক নৌকোয় নিয়ে যাওয়া যায় না? স্বর্ণকে দেখলে ভোলানাথের ক্ষেপে ওঠার ব্যাপার তো আছেই, তাছাড়া স্বর্ণ যদি আমার পাশে বসে অবিরল ওয়াটারপ্রুফের বাড়ির ছেলেটির কথা বলে যায়, তাহলে আমিই বোধহয় পাগল হয়ে যাব!

স্বর্ণর কাছ থেকে প্রায় পালিয়েই আসতে হয়েছে আমাকে।

নিলয়দার পাশে বসেছি আমি। পেছনের লম্বা সিটে কাত হয়ে শুয়ে আছে ভোলানাথ। মাঝ মাঝে আপন মনে কথা বলছে। কাল ও সর্বক্ষণ বাবা, বাবা করছিল। আজ আবার মাঝে মাঝেই মাধুরী বলে কারুর নাম উচ্চারণ করছে, যেন তাকে উদ্দেশ করেই জানাচ্ছে অনেক অভিযোগ। সে ওর যা ইচ্ছে বলুক, আর ওর ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। ওর নিয়তি নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

নিলয়দা বলল, কোলাঘাটে একটা ভাল হোটেল আছে। সেখানে আমরা লাঞ্চ খেয়ে নেব। ওখানে ইলিশ মাছ পাওয়া যেতে পারে।

আমি বললাম, কোলাঘাটে থামতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। সন্ধের আগেই আমাদের পৌঁছানো দরকার।

তা বলে দুপুরে কিছু খাব না?

টেনে চলো খড়গপুর। ওখানে রাস্তার পাশেই একটা বড় ধাবা আছে, সেখান থেকে কিছু খাবার তুলে নেব। দেড়টার মধ্যে তোমার খড়গপুর পৌঁছে যাওয়া উচিত।

ঠিক আছে, তাই চল। ফ্লাস্কটা বার কর, একটু চা খেয়ে নিই।

খানিক দূর যাবার পর নিলয়দা জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁ রে নীলু, শেষ পর্যন্ত আমরা ভুল করছি না তো?

না, নিলয়দা। কাল রাত্তিরে তো আমরা অনেক ভেবেচিন্তে দেখলাম। তুমি যা ঠিক করেছ, সেইটেই ওর পক্ষে বেস্ট! ওকে আর কে নেবে বলো, প্রকৃতি ছাড়া?

পুলিশ ওকে নেবে না। ওর আত্মীয়-স্বজন ওকে ত্যাগ করেছে। হাসপাতালে বে-ওয়ারিশ পাগল নেয় না! রাস্তায় ও কোনও গণ্ডগোল করলে লোকে ওকে পিটিয়ে মেরে ফেলতে চায়। তাহলে ও কোথায় যাবে? একমাত্র ওকে প্রকৃতির কোলেই ফিরিয়ে দেওয়া যায়। বুঝলি নীলু, এক দিন হয়তো আমাদের সবাইকে প্রকৃতির কাছে ফিরে যেতে হবে।

আমি তাতে রাজি আছি। কিন্তু তার আগে সমস্ত শহরগুলো ধ্বংস করে দেওয়া দরকার।

ও নিজের খাবার জোগাড় করতে পারবে?

কাল তুমি ওর ভুট্টা খাওয়া দেখলে না? আমরা শুধু দানাগুলো খেয়ে বাকি সবটা ফেলে দিই। ও সবটাই খেয়ে ফেলল কচ কচ করে খিদের মুখে। এখন পর্যন্ত ওর পেট খারাপ হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। খিদে পেলে মানুষ সব খেতে পারে। যারা অসুখ নিয়ে চিন্তা করে না, তাদের সব কিছুই হজম হয়ে যায়। আদিম জংলি মানুষরা যে-রকম ভাবে বাঁচত, ভোলানাথও সেই ভাবেই বাঁচার চেষ্টা করবে।

আগে জঙ্গলে অনেক রকম ফল-টল পাওয়া যেত, শিকার করার মতো অনেক জন্তু ছিল। এখন তো কিছুই বলতে গেলে নেই।

জানো নিলয়দা। আমি একবার লোধাদের একটা বিয়ে দেখেছিলাম। খুব ইন্টারেস্টিং। একটা লোধা জোয়ান ছেলে একটা বড় শালগাছের তলা থেকে ছুটতে আরম্ভ করে একটা টিলার মাথায় উঠে গেল। আবার সেখান থেকে ফিরে এসে মেয়েপক্ষের লোকদের বলল, এই যে ছুটে গেলাম, এই এতখানি জঙ্গল আমার! তার মানে কিন্তু ওই ছেলেটো যে অতখানি জঙ্গলের মালিক, তা নয়। সে বলতে চায় যে, জঙ্গলের ওই অতটা এলাকা হল তার শিকার আর ফল-মূল ইত্যাদি শিকার সংগ্রহ করার সীমানা। জঙ্গলের কোনও প্রাণী, এমনকী ইঁদুর-বাদুড়ও ওরা বাদ দেয় না, বেশ আরাম করে খায়। ইংরেজিতে যাকে বলে মাসরুম, আমরা বলি ব্যাঙের ছাতা, তাকে ওরা বলে ছাতু, ওদের খুব প্রিয় খাদ্য। কাজেই বুঝতে পারছ, জঙ্গল থেকে অনেক মানুষ এখনও তাদের খাদ্য সংগ্রহ করে বেঁচে আছে। তাদের স্বাস্থ্যও বেশ ভাল।

আমি সাঁওতালদের শালগাছের ফুল খেতে দেখেছি।

কুসুম ফল বলে এ-রকম ফল আছে জানো? অনেকে সেই ফলের নামই জানে না। যখনও দেখেওনি। এ-দিককার জঙ্গলে খুব পাওয়া যায়। সেই ফল খেয়ে অনেকে পেট ভরায়। গত বছর কাঁকড়াঝোড়ে এসে আমরা কত বুনো জাম গাছ দেখেছিলাম, মনে আছে?

সব চেয়ে বড় কথা, জঙ্গলে কোনও মেয়ে নেই। কয়েক মাস ও যদি একদম কোনও মেয়েকে দেখতে না পায়, তাহলে বোধহয় ও সুস্থ হয়েও যেতে পারে। ওইটাই তো ওর একমাত্র প্রবলেম।

নদীর ধারে শুয়ে থাকবে, চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে নীল আকাশ দেখবে, সবুজ বন ওর চোখ জুড়িয়ে দেবে, প্রকৃতির শুশ্রূষায় ও অনেক ভাল থাকবে।

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক যদি ওকে দেখতে পায়?

ও তো আর কাঠ চুরি করবে না, ওর ভয় কী? জঙ্গলের মধ্যে কোনও মানুষের থাকা তো বারণ নয়। সরকারের সে-রকম কোনও নিষেধাজ্ঞা আছে বলে শুনিনি।

এক মাস বাদে আমরা আর একবার এসে ওর খোঁজ নিয়ে যাব। কী বল?

না নিলয়দা, তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ, আমরা ওকে প্রকৃতির কাছে সঁপে দিয়ে যাব, তারপর আর ওর সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক থাকবে না।

নিলয়দা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ভোলানাথের দিকে। ও আমাদের কথা বুঝতে পারছে কি না কে জানে! অবশ্য ইঞ্জিনের শব্দে আমাদের আস্তে আস্তে কথা বলা ওর ঠিক শুনতে পাবার কথা নয়। ভোলানাথের চোখে-মুখে এখন আর একটুও হিংস্রতার ছাপ নেই। কেমন যেন ভাবের ঘোরে তন্ময় হয়ে আছে। কাল রাত্রে ড. ভড় এসে দুটো ইঞ্জেকশান দিয়ে যাওয়ায় ওর বেশ উপকার হয়েছে। ওষুধ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে ওর ক্ষতগুলোতে। আশ্চর্য অত মার খেয়েও... পাগল ছাড়া অত মার আর কেউ সহ্য করতে পারে না।

নিলয়দার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ভোলানাথ বলল, মাধুরী মরে গেছে, আমিও মরে গেছি। আর কেউ বেঁচে নেই। এটাই হল সত্যি কথা, তাই না?

নিলয়দা জিজ্ঞেস করল, ভোলানাথ, কে মাধুরী? সে কোথায় থাকে? তোমার কিছু মনে পড়ছে?

ভোলানাথ বলল, তুমি আমাকে চেনো না, আমি তোমাকে চিনি না। কেউ কারুকে চেনে না, এই হল সোজা কথা, ব্যাস!

ভোলানাথের মুখে এই কথা আমি এতবার শুনেছি যে এখন একঘেয়ে লাগে।

নিলয়দা কিন্তু আবেগের সঙ্গে বলল, সত্যিই ভোলনাথ, তোমাকে আমরা চিনতে পারলাম না শেষ পর্যন্ত।

রূপনারায়ণ নদীর ব্রিজ পার হবার সময় নিলয়দা বলল, কোলাঘাটে থামাব না? এখানে ভাল খাবার ছিল, ওকে শেষবার একটু ইলিশ মাছ খাইয়ে দিতাম।

আমি বললাম, অ্যাক্সিলারেটারে একটু জোরে চাপ দাও, নিলয়দা। সন্ধের আগে না পৌঁছতে পারলে আমরা মহা মুশকিলে পড়ে যাব।

জীপের স্পিড বাড়িয়ে খড়গপুরে আমরা পৌঁছে গেলাম দেড়টার মধ্যে। এবারে এখান থেকে কিছু খাবার নিয়ে নিতে হবে। বড় ধাবাটায় বেশ ভিড়। দু' তিনখানা গাড়ি থেমে আছে। তিন জন মহিলা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে হাস্য পরিহাস করছে, অবাঙালি, খুব সম্ভবত পাঞ্জাবি।

নারীকণ্ঠ শুনেই উৎকর্ণ হয়ে উঠল ভোলানাথ। বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, মাধুরী, ওখানে কী করছে? মাধুরীর কপালে রক্ত! মাধুরী! মাধুরী।

নিলয়দা বলল, মাধুরী বলে কাকে ডাকছে। ওদের মধ্যে কারুকে চিনতে পেরেছে?

আমি বললাম, অধরা মাধুরী আর ছন্দ বন্ধনে ধরা দেবে না। ওর কথায় কান দিও না, নিলয়দা। ওর অতীত খোঁড়ার চেষ্টা করে আর কোনও লাভ নেই। আমরা পরের ধাবায় যাব, তুমি গাড়ি স্টার্ট দাও!

ভোলানাথ জীপ থেকে লাফিয়ে বাইরে নামার উপক্রম করেছিল, জিপটা আবার চলতে শুরু করতেই ও ঝাঁকুনিতে বসে পড়ল।

পরের ধাবাটি ছোট, এখানে শুধু ট্রাক ড্রাইভাররা খাবার জন্য থামে। সম্পূর্ণ স্ত্রী-ভূমিকাবর্জিত। এখানে আমরা জীপ থেকে তিন জনেই নেমে একটা খাটিয়ায় বসলাম। গরম গরম মাংসের তরকা আর রুটি, সেই সঙ্গে পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা। অতি উপাদেয় খাদ্য।

আমি তরকাটাই বেশি খেলাম, রুটির ভক্ত নই বলে দু'খানা নিয়ে দেড়খানাতেই আহার সমাপ্ত করলাম। নিলয়দা খেল তিনখানা রুটি। ভোলানাথকে প্রথম যে তিনখানা রুটি দেওয়া হল তা সে

চোখের নিমেষে শেষ করে ফেলল, তরকা-পেঁয়াজ ছুঁলই না। আবার তিনখানা দেওয়া হল, তারও সেই অবস্থা। নিলয়দা পরিবেশনকারীকে চোখের ইঙ্গিতে জানাল, দিয়ে যাও।

ফাঁসির আসামির খাওয়ার কথা শুনেছিলাম। ভোলানাথ কি বুঝতে পেরেছে যে ও নির্বাসনে যাচ্ছে? আমি গুনছিলাম, ঠিক সাতশখানা রুটি ও উড়িয়ে দিল বিনা বাক্যব্যয়ে। তারপর সর্দারজি এসে বলল, আউর রোটি নেহি হ্যায়, পাকা দেঙ্গে জলদি?

আমি বললাম, থাক, যথেষ্ট হয়েছে! এরপর অশুস্থ হয়ে পড়বে। ওহে ভোলানাথ, এবারে উঠে পড়ো, যেতে হবে!

মুখের কথা সে শুনল না, তার হাত ধরে টানতে হল। তখন সে প্লেটটা সুদ্ধুই এগোতে লাগল গাড়ির দিকে। প্লেটটা তার হাত থেকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করতেই সে সেটা মুখের সামনে নিয়ে গিয়ে তরকা চাটতে লাগল জিভ দিয়ে। তার দাড়িতে লেগে গেল অনেকটা। তার মুখ দেখে মনে হয়, এখন তার একটুও পেট ভরেনি। মানুষের এ-রকম অস্বাভাবিক ক্ষুধা দেখলে গা ছম ছম করে।

বাহারাগোড়া থেকে ঝাড়গ্রামের দিকে ঘুরে যাবার মুখটাতেই জিপটা গণ্ডগোল শুরু করল। মাঝে মাঝেই স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ তো আমরা প্লেন রাস্তায় এসেছি, এর পরে জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ি রাস্তায় যদি গাড়ির গোলমাল হয়, তাহলে খুব বিপদে পড়ে যাব। বাহারাগোড়ার পাম্প থেকে আমরা পেট্রল ভরে নিয়েছি একটু আগে, আমি সেখানে ফিরে গিয়ে এক জন মিস্ত্রিকে ধরে আনলাম।

মিস্ত্রিটি সব প্লাগগুলো খুলে পরীক্ষা করে দেখছে, আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছি, একটা সাদা রঙের গাড়ি আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল ঝাড়গ্রামের দিকে। পেছনের সিটে জানলার পাশে বসে থাকা মানুষটিকে দেখে আমার শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল। সাত্যকি বসুমল্লিক। আমার চিনতে কোনও ভুল হয়নি। সেই অহঙ্কারী, সুন্দর মুখ, ঠোঁটের রেখায় অবজ্ঞা মেশানো ভদ্রতা। লোকটা এ-দিকে কোথায় যাচ্ছে? আমাকে দেখতে পায়নি। দেখলেও কি থামত? একটা ডাকবাংলোয় কয়েক দিনের জন্য বাধ্যতামূলক পরিচয়। সাত্যকি বসুমল্লিকের মতো মানুষ এইসব ঘটনা মনে রাখে না। কিন্তু ও কেন বলেছিল, আমার মতো একটা ছেলেকেই ও খুঁজছে। নিছক কথার কথা?

আমি এমনই উত্তেজিত বোধ করলাম যে, মনে হল, এই কথাটা এক্ষুনি কারুকে জানানো দরকার। কিন্তু কাকে বলব? নিলয়দাকে বললে কিছুই বুঝবে না। কলকাতা থেকে কত লোকই তো ঝাড়গ্রামে যায়, অনেকের বাড়ি আছে ঝাড়গ্রামে, সাত্যকি বসুমল্লিকেরও বাড়ি থাকাটা কিছুই অস্বাভাবিক নয়।

মিস্ত্রিটি বেশ ভাল, কিছুক্ষণের মধ্যেই চাঙ্গা করে দিল আমাদের জিপটা। এবং এই কাজের জন্য সে নিজেই মাত্র দশ টাকা চাইল। এই রকম কাজ আমার ভাল লাগে, দরাদরি করতে হয় না, দু'পক্ষই খুশি।

ঝাড়গ্রামে আমার অনেক চেনা লোক। যদিও নিলয়দা আর আমি মনে মনে যে-যুক্তি মেনে নিয়েছি তাতে কোনও খুঁত নেই, তবু আমরা ঠিক করেছি, যে-কাজটা আমরা করতে বেরিয়েছি, সেটা গোপনে সেরে নেওয়াই ভাল। ঝাড়গ্রামে আমার চেনা কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই মুশকিল, তারা নানা কথা জানতে চাইবে, দু'একজন হয়তো সঙ্গে যেতেও চাইবে। আমি মাথায় একটা রুমাল বেঁধে নিলয়দার সানগ্লাসটা পরে নিলাম, মুখটাও ফিরিয়ে রাখলাম ভেতরের দিকে। অবশ্য সাত্যকি বসুমল্লিকের সাদা গাড়িটা লক্ষ করার ইচ্ছে ছিল আমার, কিন্তু সেটা আর দেখা হলো না।

আমরা হাজারিবাগ, বেতলা, সিমলিপাল এই সব কাছাকাছি সব ক'টা জঙ্গলের কথাই পর্যালোচনা করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাঁকড়াঝোড় জঙ্গলটাই ঠিক করা হয়েছে। গতবারই এই জঙ্গলটা ঘুরে গেছি বলে এটার কথাই মনে পড়েছে সব চেয়ে আগে। তাছাড়া, এই জঙ্গলে বাঘ নেই, নেকড়ে যে

নেই তাতেও আমরা নিঃসন্দেহ হয়েছি, অন্য কোনও হিংস্র জানোয়ারই নেই। হাতি আছে বটে, হাতি প্রায়ই আসে, কিন্তু হাতি তো চট করে মানুষকে আক্রমণ করে না। শহরে ক্রুদ্ধ জনতার চেয়ে বুনো হাতির পাল অনেক বেশি ভদ্র।

নিলয়দার তুলনায় আমি এ অঞ্চলে অনেক বেশিবার এসেছি, রাস্তাঘাট আমিই বেশি চিনি। যদিও বেলপাহাড়ি ছাড়বার পর জঙ্গলের পথ বেশ জটিল, মাঝে মাঝে যেমন খাড়াই-উৎরাই আছে তেমনই এক-এক জায়গায় পথ এমনভাবে ভাগ হয়ে গেছে যে কোন দিকে যেতে হবে তা ধরা মুশকিল। এই অঞ্চলের ড্রাইভাররাই সঠিক পথ জানে।

দহিজুড়ির মোড়ে একটা ছোট ঝঞ্ঝাট হল। সেখানে আজ হাটবার, জিপটা চলেছে আস্তে আস্তে, হঠাৎ ভোলানাথ একজায়গায় একটা লাফ দিল। ও পালাতে চেয়েছিল না হাটের কোনও মেয়েকে কামড়াবার শখ হয়েছিল তা ঠিক বোঝা গেল না। লাফিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবার পর উঠে দাঁড়িয়ে চ্যাঁচাতে লাগল, মাধুরী মরে গেছে, আমি মরে গেছি, সবাই মরে গেছে। ওগো, আমরা সবাই মরে গেছি, তাই না?

নিলয়দা ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষতেই আমি বললাম, চুপ করে বসে থাকো, নিলয়দা, দেখো না কী হয়!

নিলয়দা বলল, হাটে অনেক মেয়ে, ও যদি কারুকে অ্যাটাক করে?

আমি আর কিছু বলবার আগেই ভোলানাথ জিপটার কাছে ফিরে এসে বলল, ওগো, আমরা সবাই মরে গেছি, তাই না? তোমরা গন্ধ পাচ্ছ না? সব মরা মানুষ!

আমি কঠোর ভাবে বললাম, ভোলানাথ, গাড়িতে উঠে এসো!

এই প্রথম ভোলানাথ আমার কথার সরাসরি উত্তর দিয়ে বলল, তুমি কে হে? ঠুঁটো জগন্নাথ? তোমার নাক নেই, চোখ নেই, কান নেই, তোমার কথা শুনব কেন?

এই সময় একটি মধ্যবয়সী আদিবাসী রমণী নিলয়দার পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, ও বাবু, আন্ডা নেবে?

ভোলানাথ সেই মেয়েটির কাছে দৌড়ে আসবার আগেই আমি নেমে পড়ে তার পথ রোধ করে দাঁড়ালাম, সে তবু এগোবার চেষ্টা করতেই আমি লাগলাম তার বুকে এক ধাক্কা।

ভোলানাথ আমার তুলনায় অনেক বলশালী, সে যদি উলটে আমায় আক্রমণ করত তাহলে আমরা কী দশা হত কে জানে! কিন্তু ভোলানাথ সে-রকম কিছু না করে কাঁদতে শুরু করে দিল। আমি তার কাঁধে হাত দিয়ে ঠাণ্ডাভাবে বললাম, ওঠো, গাড়িতে ওঠো! ভোলানাথ আর আপত্তি না করে সুড় সুড় করে উঠে এল।

বেলপাহাড়ি পৌঁছতেই সন্ধে হয়ে গেল আমাদের।

জঙ্গলের পথ আমি চিনি না। একবার ভাবলাম, এখানকার ডাকবাংলোতে রাতটা কাটিয়ে যাব কি না। পরের মুহূর্তেই মনে হল, আজ রাত্তিরের মধ্যেই যা হোক কিছু হেস্তনেস্ত হয়ে যাওয়া ভাল।

নিলয়দা জিজ্ঞেস করল, রাস্তা ভুল হয়ে যাবে না তো রে?

আমি বললাম, আস্তে আস্তে চালাও, আমাদের তো ভেতরের ফরেস্ট বাংলো পর্যন্ত যাবার দরকার নেই, একটা কোনও নিরিবিলি জায়গায় পৌঁছলেই হল।

অন্ধকার হয়ে এলেই জঙ্গলের চেহারা বদলে যায়। আকাশের আলো একেবারে মিলিয়ে যায়নি, কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা দেখা যায় না। হেডলাইটের আলোয় মনে হয় আমরা একটা সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। এখন এ-রকম সুড়ঙ্গ সোজা একটাই, ডান দিকে, বাঁ-দিকে কিছু নেই। নানা রকম

ঘরে-ফেরা পাখির ডাকে বেশ একটা ঐকতান শোনা যাচ্ছে। তার মধ্যে টিয়ার ডাকই অন্য পাখিদের ডাক ছাড়িয়ে যায়। এই বনে প্রত্যেক বারই অনেক টিয়া দেখেছি। দু'একটা পাখির ডাক চিনতে পারি না।

খানিকটা গেলেই একটা নদী পার হতে হবে মনে আছে। সেখানে রাস্তাটা অনেকখানি খাড়াই থেকে সোজা নদীতে নেমে যায়, ব্রিজ নেই, জলের ওপর দিয়েই পার হতে হয়। ওই জায়গাটা সাবাধানে পার হতে হয়। আমি সামনের দিকে ভাল করে নজর রাখছি, কখন সেই নদীটা এসে পড়ে।

আচমকা পেছন থেকে আমার পিঠে এক কিল মেবে ভোলানাথ বলে উঠল, শোধ!

আমি এমন চমকে গিয়েছিলাম যে, হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম। আত্মরক্ষার জন্য আমি তাড়াতাড়ি পেছন ফিরে দু'হাত উঁচু করলাম।

ভোলানাথ হো-হো করে হেসে উঠল। নিলয়দাও হেসে ফেলে বলল, তুই যে ওর বুকে ধাক্কা মেরেছিলি, ও তার শোধ নিল!

আমি হাসতে পারলাম না। পেছন থেকে পিঠে কিল মেরে ঠাট্টা করতে পারে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, ভোলানাথকে আমি এখন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না, আবার মারবে না তো?

ভোলানাথ একটানা হেসে যাচ্ছিল, হঠাৎ হাসি বন্ধ করে বলল, বেশ ভাল জায়গা, খুব ভাল জায়গা, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা!

নিলয়দা বলল, বাঃ, তোমার পছন্দ হয়েছে? আমরা এখানে থাকব।

ভোলানাথ বলল, কেউ থাকবে না, শুধু আমি থাকব। না না, আমিও থাকব না। শুধু জঙ্গলের মধ্যে জঙ্গল থাকবে। গাছের মধ্যে গাছ থাকবে। মাটির মধ্যে মাটি থাকবে। নিলয়দা আমার দিকে তাকাল। আমি কোনও মন্তব্য করলাম না।

নিলয়দা জিজ্ঞেস করল, কেন ভোলানাথ, তোমার এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না? এমন শান্ত জায়গা, কেউ এসে জ্বালাতন করবে না!

মাধুরী হারিয়ে গেছে, আমিও হারিয়ে গেছি। আর কেউ নেই। কে যে কখন হারিয়ে যায়, টেরও পায় না, হে-হে-হে!

হঠাৎ জিপটা গড়াতে লাগল নিচের দিকে। আমি আঁতকে উঠলাম, এই তো সেই নদীর খাদ! নিলয়দা যদি তক্ষুনি ব্রেক কষত তাহলে আমরা উলটে যেতাম নির্ঘাৎ, কিন্তু নিলয়দা স্টিয়ারিং শক্ত করে চেপে ধরে রইল অ্যাকসিলারেটর থেকে পা তুলে। আমরা হুড়মুড়িয়ে এসে পড়লাম নদীর জলে।

জল বেশি নয়, হাঁটুও ডুববে না, কিন্তু ছোট-বড় নানা রকম পাথর রয়েছে। চেনা ড্রাইভার এখান দিয়ে অবলীলাক্রমে নদী পার হয়ে যায় কিন্তু নিলয়দার হাতে ইঞ্জিন গোঁ গোঁ করতে লাগল, গাড়ি আর নড়ে না।

আমি বললাম, নেমে একটু ঠেলে দিচ্ছি। গাড়ি হালকা করা দরকার।

নিজে নেমে দাঁড়িয়ে ভোলানাথকে হুকুম করলাম, নামো।

ভোলানাথ এ-সব কথা বোঝে। দিব্যি নেমে পড়ল টপ করে। আমি জিপটাকে ঠেলতে লাগলাম, কিন্তু ও হাত লাগাল না, জলের মধ্যে পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেলা করতে লাগল।

খানিকটা ঠেলাঠেলির পর জিপটা গড়াতে শুরু করল, নদীর অন্য দিকের রাস্তাটা আরও বেশি খাড়াই। সেখান দিয়ে উঠতে নিলয়দা আর আমি গলদঘর্ম হয়ে গেলাম। ভোলানাথ নদীর জলে শুয়ে পড়ে গোটা গা ভিজিয়ে হা-হা-হা-হা করছে। ঠিক যেন একটা শিশু।

নিলয়দা ডাকল, ভোলানাথ, এসো, উঠে এসো!

জঙ্গলের নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে হ্যা-হ্যা করতে করতে ছুটে এল ভোলানাথ। দুপুরে ভরপেট খেয়েছে, ও বেশ মনের আনন্দেই আছে।

আর একটু এগোবার পর দুটো রাস্তা দেখতে পেলাম। একটা ডান দিকে, আর একটা সোজা। আমার যত দূর মনে পড়ছে, সোজ রাস্তাটা গেছে ফরেস্ট বাংলোর দিকে, বাংলোর কাছাকাছি একটা ছোট গ্রামে খুব জনবসতি আছে। সুতরাং ও-দিকে যাবার কোনও মানে হয় না। আমি বললাম, চলো ডান দিকে।

এরপর শুরু হয়ে গেল পথের নানা শাখা-প্রশাখা। প্রায়ই ডান দিকে বা বাঁ-দিকে একটা করে রাস্তা বেরিয়ে গেছে, ছোট ছোট রাস্তা, কোনওক্রমে একটা গাড়ি যেতে পারে। আমি আন্দাজে একবার ডান দিকে, একবার বাঁ-দিকে বলে যেতে লাগলাম। দু' পাশের গাছের ডালের ঝাপ্‌টা লাগতে লাগল গায়ে। কখনও হেড লাইটের আলোয় দেখা যাচ্ছে পথ জুড়ে রয়েছে একটা মাকড়সার জাল, মাঝখানে বসে আছে প্রায় টাকার সাইজের এক কালো মাকড়সা।

জঙ্গলের মধ্যে অচেনা রাস্তায় অন্ধকারের মধ্যে যাওয়ার একটা রোমাঞ্চ আছে। যদিও মনে মনে জানি, এই সব রাস্তা কোথাও না-কোথাও পৌঁছে দেবে ঠিকই, তবু মনে হয় যেন দিক ভুলে আমরা নিরুদ্দেশ যাচ্ছি। সব সমুদ্রেরই তল আছে, তবু যেমন সমুদ্রের ওপর ভাসতে ভাসতে অতল কথাটা মনে পড়ে।

এখন জঙ্গলে আমাদের গাড়ির শব্দ ছাড়া কোনও শব্দ নেই, কোথাও প্রাণের চিহ্ন নেই। বড় বড় গাছগুলো যেন আমাদের ওপর ঝুঁকে আসছে।

নিলয়দা বলল, এ কোথায় এলাম রে, নীলু? হঠাৎ হাতির পাল সামনে এসে যায়, কী করব? গাড়ি ফেরাবার তো জায়গা নেই।

আমি বললাম, গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে বসে থাকবে, হাতিরা কিচ্ছু বলবে না, আমার আগে এ-রকম অভিজ্ঞতা আছে।

আর কত দূরে যাব?

রাস্তাটা আবার ঢালু হয়ে এসেছে, দূরে চিক চিক করছে জল। সেই পর্যন্ত এসে আমি বললাম, এখানেই থামা যাক।

নদী নয়, এখানে রয়েছে একটা সরু ঝরনা, কিন্তু স্রোতের তেজ আছে। দু'পাশে অনেকখানি ফাঁকা। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গা। খানিকটা জ্যোৎস্না এসে পড়েছে সেখানে। নিলয়দা জিপটা ঘুরিয়ে রেখে হেডলাইট নিভিয়ে দিতেই চাঁদের আলোয় সেই ঝরনা তীরবর্তী স্থানটি বড় মোহময় দেখাল।

নিলয়দা নেমে এসে বলল, পিকনিকের পক্ষে চমৎকার জায়গা। এসো ভোলানাথ, তোমার খিদে পায়নি?

ভোলানাথ জিপে বসেই গুন গুন করে সুর ভাঁজছে। আমি বাঁদরকে কলার লোভ দেখাবার মতন একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করে বললাম, সিগারেট খাবে? এসো, এসো।

সিগারেটের লোভেই ভোলানাথ নেমে এল। আমি ওকে নিয়ে চলে এলুম ঝরনার কাছে। জ্যোৎস্নায় রুপোলি দেখাচ্ছে ঝরনাটাকে। যেন বনবিবি তার ওড়নাটা ফেলে গেছে এখানে। আরও মনে হয়, একটু আগেই হরিণেরা জল পান করতে এসেছিল, আমাদের শব্দ পেয়ে চলে গেছে।

ঝরনার ধার দিয়ে দিয়ে আমরা দু'জনে হাঁটতে লাগলাম ঢালুর দিকে। ফাঁকা জায়গাটা শেষ হয়ে আবার বড় বড় গাছ শুরু হল, সেখানেই একটা গাছের তলায় আমি বসে পড়লাম। কেন যেন আমার বুকের মধ্যে টিপ টিপ শব্দ হচ্ছে।

ভোলানাথ ঝরনার জলে পা ডুবিয়ে বলল, ঠাণ্ডা! খুব ঠাণ্ডা জল, একেবারে পোকা পেঁপের মতো।

ভোলানাথের উপমা শুনে আমি বিস্মিত হলাম। এ-রকম তাকে আগে বলতে শুনিনি। এমন যদি হত, আমরা তিন বন্ধু জঙ্গলের মধ্যে রাত্তির বেলা পিকনিক করতে এসেছি, তাহলে ব্যাপারটা কত আনন্দের হত। কিন্তু সে-রকম আর হবার নয়।

নিলয়দা দু'বগলে দুটো বেশ বড় পলিথিনের থলে বয়ে নিয়ে এল।

আমি হতবাক। নিলয়দা এ-সব কী এনেছে, এগুলো রেখেছিল কোথায়? নিশ্চয়ই সিটের নিচে।

নিলয়দা লাজুক ভাবে বলল, একটাতে আছে চিঁড়ে, আর এটাতে কাঁচা বাদাম। কয়েক দিন চলবে। প্রথম প্রথম খাবার খুঁজতে যেতে তো ইচ্ছে হবে না।

প্যান্টের দু'পকেট থেকে পাঁচ-ছ' প্যাকেট সিগারেট আর গোটা চারেক দেশলাই বার করে রাখল নিলয়দা। তারপর বলল, নীলু, তুই চায়ের ফ্লাস্ক আর বিস্কুটের টিনটা নিয়ে আয়।

আমাদের জিপটা বেশ ওপরে। আসলে একটা টিলার গা দিয়ে নেমে এসেছে ঝরনাটা। আমি দ্রুত এসে জিপটায় চড়ে একটুখানি বসে রইলাম। ভোলানাথের সঙ্গে নিলয়দার কিছু কথা থাকতে পারে, যা হয়তো আমার সঙ্গে বলতে লজ্জা পাবে। তাছাড়া আমার খানিকটা সময় কাটানো দরকার। পুরো একটা সিগারেট শেষ করাব আমি চায়ের ফ্লাস্ক ও বিস্কুটের টিন নিয়ে রওনা দিলাম ধীরে ধীরে। একটুখানি গিয়ে মনে পড়ল প্লাস্টিকের গেলাস তিনটে আনা হয়নি। আবার ফিরে এসে নিয়ে গেলাম সেগুলো।

ঝরনাটাকে খুব পছন্দ হয়েছে ভোলানাথের। সে সেখানেই পা ডুবিয়ে বসেছে একটা পাথরের ওপর। আমি গেলাসে চা ঢেলে দিলাম ওকে। ভোলানাথ বিড় বিড় করে বলল, মাধুরী নেই, আমি নেই, নেই নেই!

আমি বললাম, বিস্কুট আছে। খাও!

বিস্কুটের টিনটা ওর পাশেই বসিয়ে দিলাম, ও একটার পর একটা খেয়ে যেতে লাগল। বুঝলাম যে, শেষ না হলে ও থাকবে না।

নিলয়দা আমায় জিজ্ঞেস করল, নীলু, গাড়িতে টর্চ আছে, আনিসনি?

আমি বললাম, এই রে ভুলে গেছি। তুমি একটু নিয়ে আসবে? টর্চ নিয়ে আমরা জঙ্গলের ভেতরটা একটু ঢুকে দেখতাম।

নিলয়দা উঠে দাঁড়িয়ে দু'পা গিয়ে থমকে দাঁড়াল। কম্পিত গলায় বলল, ভোলানাথ, তুমি থাকো, আমি আসছি।

ভোলানাথ এক মনে বিস্কুট খেয়ে যেতে লাগল, নিলয়দার দিকে ফিরেও তাকাল না।

নিলয়দা আবার ডাকল, ভোলানাথ!

এবারেও ভোলানাথ গ্রাহ্য করল না তার ডাক। আমি তাড়া দিয়ে বললাম, যাও, টর্চটা নিয়ে এসো নিলয়দা!

এবার নিলয়দা চলে গেল জিপটার দিকে। আমি ঝরনার জলে গেলাসগুলো ধুয়ে ফেললাম। ফ্লাস্কে আর চা নেই, সেটাও ধোওয়া হল। দূরে তাকিয়ে দেখলাম, নিলয়দা অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। ঝরনার জলের চাপা কুলু কুলু শব্দ আর ভোলানাথের বিস্কুট চিবোনোর শব্দ। আকাশে অল্প অল্প মেঘ আছে। সেই জন্য মাঝে মাঝে জ্যোৎস্না মুছে যাচ্ছে। প্রতিটি মুহূর্তকে আমার মনে হচ্ছে অনন্তকাল।

এক সময় জিপ থেকে নিলয়দার গলা শুনতে পেলাম, কই রে নীলু, টর্চটা খুঁজে পাচ্ছি না। কোথায় রেখেছিস?

আমি চেঁচিয়ে বললাম, দেখো, বাঁ-দিকে গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে!

কই, সেখানে খুঁজে পাচ্ছি না তো?

আমি আসছি, দেখিয়ে দিচ্ছি!

ফ্লাস্কটা তুলে নিয়ে আমি বললাম, ভোলানাথ, বিস্কুট খাও, আমি টর্চটা খুঁজে দিয়ে আসছি।

ভোলানাথ বলল, আমিও থাকব না, তুমিও থাকবে না, কেউ থাকবে না।

আমি হন হন করে হেঁটে গেলাম টিলাটার দিকে। শেষের দিকে দৌড় দিয়ে এক লাফে এসে বসলাম জিপে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, চালাও! জিপটা ঘুরিয়েই রাখা ছিল। নিলয়দা সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট দিয়েই স্পিড তুলল। আমি মাথাটা বাইরে ঝুঁকিয়ে শোনবার ও দেখবার চেষ্টা করলাম কেউ চ্যাচাচ্ছে কিংবা ছুটে আসছে কিনা! না, সে-রকম কিছুই হল না!

আমাদের পরিকল্পনা একেবারে নিঁখুত ভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। প্রতিটি সংলাপও আগে থেকে মুখস্থ করা। ঠিকই ছিল যে, শেষ গন্তব্যে পৌঁছে আমরা ভোলানাথের সঙ্গে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় কাটাব না, শুধু একটুখানি চা খাব। বেশিক্ষণ থাকলেই মায়া কাটানো মুশকিল।

হয়তো এত নিখুঁত পরিকল্পনার দরকারই ছিল না, আমরা যা কবেছি, সে-ভাবে কোন সুস্থ মানুষকেও ঠকানো যেত। ভোলানাথের এত কিছু বোঝার ক্ষমতাই নেই। কিংবা যদি বুঝতেও পেরে থাকে, তাতেই-বা কী করা যাবে!

ডান দিকে বাঁ-দিকে যে-কোনও রাস্তা পেলেই তা দিযে চলে যাচ্ছে নিলয়দা। এর মধ্যে আমবা অনেকটা দূরে চলে এসেছি। এখন ইচ্ছে করলেও আর চট করে বাস্তা খুঁজে ভোলানাথের কাছে ফিবে যাওয়া যাবে না।

একটা বাঁকের মুখে এসে জোরে ঘোরাতে যেতেই স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। আব সঙ্গে সঙ্গে স্টিয়ারিং-এর ওপর মাথা দিয়ে হু-হু করে কেঁদে উঠল নিলয়দা।

আমি চুপ করে বসে রইলাম। এখন কোনও কথারই মূল্য নেই। কান্নাটা আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে ছিল না। নিলয়দা কাঁদছে অথচ আমার কান্না পাচ্ছে না কেন? নিলয়দার চেয়ে আমার হৃদয় কি কঠোর! মূল পরিকল্পনাটা তো নিলয়দারই। কাল সন্ধেবেলা নিলয়দা বলেছিল, গঙ্গার ধারে ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে দূরে কোনও জঙ্গলে ভোলানাথকে রেখে আসা অনেক ভাল। তাতে ও বাঁচার একটা সুযোগ পাবে, আমাদেরও বিবেক পরিষ্কার থাকবে। যে-মানুষকে সমাজ নেয় না, জঙ্গলই তো তার উপযুক্ত জায়গা।

নিলয়দা বেশ কেঁদে কেঁদে বুক খালি করে নিচ্ছে, নিলয়দাকে এখন হিংসে হচ্ছে আমার। আমি দারুণ পরিশ্রান্ত বোধ করছি, এক্ষুনি ইচ্ছে করছে চিত হয়ে শুয়ে পড়তে। কিন্তু আগে যে-কোনও উপায়ে এই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার।

মিনিট পাঁচেক বাদে নিলয়দার পিঠে হাত রেখে আস্তে আস্তে বললাম, এবারে চলো!

মুখ তুলে নিলয়দা আকুল ভাবে বলল, কী করলাম রে নীলু! এ কী করলাম! এক জন মানুষকে এ-ভাবে ফেলে যাওয়া যায়? আমি যখন শেষ বিদায় নিলাম, তখন ও অভিমান করে আমার সঙ্গে একটা কথাও বলল না! চল, ফিরে যাই!

আমি বললাম, নিলয়দা, তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে। কাল বলেছিলে, কিছুতেই এ প্রতিজ্ঞার নড়চড় হবে না! রূপাবউদির কথা ভাবো, পাপুনের কথা ভাবো।

নিলয়দা স্টিয়ারিঙের ওপর একটা কিল মেরে বলল, ধুত্তোরি তোর সংসারের নিকুচি করেছে।

পরের মুহূর্তেই সামলে নিয়ে শান্তভাবে বলল, নাঃ,! বাড়ি ফিরতে হবে।

আবার জিপটা চলতে শুরু করল। বেশ কিছুক্ষণ আমরা কেউ কোনও কথা বললাম না। কোন দিকে যে যাচ্ছি, তা কিছুই জানি না। এখন আর বাস্তা চেনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। জঙ্গলটা যেন এখন একটা গোলোকধাঁধা। এর মধ্যে যদি সারা রাত আমাদের ঘুরে বেড়াতে হয়? জঙ্গলের মধ্যে অচেনা রাস্তা, হঠাৎ কোথাও আমরা খাদে পড়ে যেতে পারি, কোনও জায়গায় রাস্তা ভাঙা থাকতে পারে। এই রাস্তায় সপ্তাহে একটা দুটো গাড়ি যায়, তা-ও রাত্তিরবেলা কেউ যায় না। থাক গে, যা হয় হোক!

আধ ঘণ্টার বেশি গাড়িটা বিভিন্ন বাঁকে ঘোরবার পর নিলয়দা জিজ্ঞেস করল, সেই নদীটা কোথায় রে নীলু? মনে হচ্ছে, বার বার যেন একই রাস্তায় ফিরে আসছে।

আমি নিষ্প্রাণ ভাবে বললাম, আমিও কিছু বুঝতে পারছি না, নিলয়দা!

নদীটা পার না হলে ফেরার রাস্তা পাব কী করে?

একটা রাস্তা ঘাটশিলার দিকে চলে গেছে আমি জানি, সেটা পেলেও তো হত!

এক কাজ কর, পেছনের সিটের তলায় আমি দেখেছি কয়েকটা পুরোনো খবরের কাগজ আছে, সেগুলো বার কর। এরপর কোনও মোড় ঘুরলেই সেখানে কয়েকটা কাগজ ছড়িয়ে দিবি। তারপর যদি সেখানে আবার ফিরে আসি, তাহলে কাগজগুলো দেখে বুঝতে পারব!

দুটো মোড়ে আমি এ-রকম খবরের কাগজ ছড়িয়ে দিলাম। তারপর তৃতীয় মোড়টায় বাঁক নিতেই একটা দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠলাম দু'জনেই। রাস্তাটা সোজা চলে গেছে। দু'তিনশো গজ দূরে রাস্তার মাঝখান দাঁড়িয়ে আছে এক জন মানুষ। কিংবা দাঁড়িয়ে নেই, দু'হাত তুলে ছুটে আসছে আমাদেরই দিকে। যে আসছে, সে আর্ত কেউ নয়, যেন এক মূর্তিমান প্রতিশোধ।

ও কে? ভোলানাথ? জঙ্গলের কোনও আদিবাসী, অথবা কোনও প্রেতাত্মা? অথবা আমাদের

আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম সেই মুহূর্তে। খ্যাপাটে গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম, নিলয়দা, জিপ ঘোরাও! ব্যাক করো! ও যেন আমাদের ধরতে না পারে। ও ধরতে পারলে আমাদের মেরে ফেলবে! শিগগির, নিলয়দা শিগগির!

আমার সেই উত্তেজনা নিলয়দার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে গেল। দারুণ ঝুঁকি নিয়ে নিলয়দা জিপটা চালিয়ে দিল ব্যাক গিয়ারে। একটা মোড় পেয়ে সেই দিকে বেঁকে গিয়ে জোর স্পিড তুলে দিল, তারপর আর একটা মোড় ঘুরতেই আমাদের গাড়ি গড়িয়ে পড়ে গেল নদীতে।

॥ ১০॥

কলকাতায় ফেরার দু' চার দিন পরেই নানা লোকের মুখ থেকে চাপা ভৎর্সনা শুনতে লাগলাম আমি আর নিলয়দা। কী করে যে লোকে সব কথা জেনে যায়! অনেকেরই ধারণা, যেমন ভাবে অবাঞ্ছিত বিড়াল বা কুকুরকে পার করে দেওয়া হয়, সেই রকম ভাবেই আমি আর নিলয়দা এক জন পাগলকে বাইরে কোথাও ছেড়ে দিয়ে এসেছি। জঙ্গলে বা কোথায় রেখে এসেছি তা অবশ্য কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারে না। আমরা এত গোপনীয়তা নেওয়া সত্ত্বেও এই গল্প ছড়াল কী করে? স্বর্ণ বলেছে? জিপগাড়ির মালিক?

আমরা ধারণা সাত্যকি বসুমল্লিকেরই অপকীর্তি এটা। কিন্তু বাহারাগোড়ার মোড়ে সাত্যকি বসুমল্লিক কি আমাদের দেখতে পেয়েছিল? দেখলেও জানবে কী করে, কে কে ছিল আমাদের জীপে। সাত্যকি বসুমল্লিক তার গাড়ি থামায়নি, একবার ভ্রূক্ষেপও করেনি। তাহলেও হয়তো সাত্যকি বসুমল্লিকের স্পাই আছে চতুর্দিকে ছড়ানো।

ফিরে আসার দু'দিন পরেই এক জন পুলিশ অফিসার এসেছিলেন নিলয়দার বাড়িতে। কোন এক ডিআইজি তাঁকে পাঠিয়েছেন, এক জন রাস্তার পাগলকে নাকি জেলে রাখার ব্যাপার আছে, অফিসারটি সেই পাগলকে অ্যারেস্ট করতে এসেছেন। নিলয়দা তাঁকে জানাল যে, তার আর দরকার নেই, পাগলটি সেখানে আর থাকে না। অফিসারটি যেন সে-কথা শুনে নিশ্চিন্ত নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, তবে তো আপদ চুকেই গেছে! ডিআইজি যদি খোঁজ করেন তো বলে দেবেন যে আমি এককোয়ারিতে এসেছিলাম।

কফি হাউসে আমার এক বন্ধুর এক বন্ধু অপ্রতিম আমাকে বলল, তোরা এটা কী করলি, নীলু? এক জন মানুষের দায়িত্ব নিয়েও পিছিয়ে গেলি? তাহলে প্রথমে সেই লোকটিকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে যেতে কে বলেছিল তোদের?

আমি বললাম, রাস্তার ছেলেরা এক জন মানুষকে পিটিয়ে মেরে ফেলছিল, তাকে সেই অবস্থা থেকে বাঁচানো অন্যায়? চোর-ডাকাত-ছেলেধরা সন্দেহ করে প্রায় প্রতি দিনই তো একটা দুটো লোককে ক্রুদ্ধ জনতা খুন করছে। যারা মরছে, তারা সত্যি সত্যি অপরাধী কি না, তা বিচার করে দেখার নেই। কিংবা ওদের থেকেও অনেক বড় বড় অপরাধীরা সসম্মানে ঘুরে বেড়ায়, সে-সম্পর্কে তোমরা নির্বিকার। এই সব বর্বরতার বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ করো না। হঠাৎ এই এক জন পাগলকে নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন?

অপ্রতিম এমন একটা উদার হাসি দিল, যেন আমার মতো এক জন নির্বোধের সঙ্গে সে দয়া করে কথা বলছে। চওড়া হাসিটা ঠোঁটে এঁকে রেখে সে বলল, সে তো মব ভায়োলেন্সের ব্যাপার। একটা দেশে এই রকম মব ভায়োলেন্স কেন শুরু হয়। সেই কারণটার গভীরে যাওয়া দরকার। পুরো ব্যবস্থাটাই না পালটালে যে এই সব জিনিস বাড়তেই থাকবে, এটা যে বোঝে না, তার সঙ্গে এ-সব বিষয়ে আলোচনাই করা যায় না।

আমি উঠে পড়তে যাচ্ছিলাম, অপ্রতিম তবু ডেকে বলল, লোকটাকে কুকুর-বেড়ালের মতো খেদিয়ে দেওয়ার আগে একবার আমায় বললেই পারতিস। বহরমপুরে একটা ভ্যাগরান্সি হোমে আমার চেনা একজন কাজ করে। সেখানে ভর্তি করে দিতুম।

আমি বললাম, রাস্তায় তো এখনও আরও অনেক পাগল ঘুরে বেড়ায়, তাদের জন্য কিছু করো না!

সত্যি, এখন যেন পথে-ঘাটে আমি অনেক বেশি পাগল দেখতে পাই। আগে এদের লক্ষ করতাম না। হাওড়া স্টেশনে, রাইটার্স বিল্ডিংসের দক্ষিণ কোণে, বিড়লা প্ল্যানেটারিয়ামের পাশে যখন তখন এক জন পাগল বা পাগলিকে বসে থাকতে দেখি। আমাদের বাজারের সামনের সেই পাগলীকে অবশ্য কয়েক দিন আর দেখিনি। তবে পনেরোই আগস্ট তাকেই কিংবা তারই মতো আর এক জনকে দেখলাম পার্ক স্ট্রিটে ঠিক রাত ন'টা পঁচিশ মিনিটে। একটা সিনেমা দেখে ফিরছিলাম, দাদা-বউদি সঙ্গে ছিল বলে ট্যাক্সি নেওয়া হয়েছিল। পনেরোই আগস্টেও লোডশেডিং, অন্ধকারের মধ্যে গাড়ির আলোয় চোখে পড়ল এক নগ্ন নারী মূর্তি, অদ্ভুত ভাবে বেঁকে দাঁড়িয়ে সে যেন পৃথিবী ও আকাশকে অবজ্ঞা

করছে। এর পরনে একটা গামছা পর্যন্ত নেই। এক মুহূর্তের জন্য মনে হল, এ বছর স্বাধীনতা দিবসে এই কি ভারতমাতার মূর্তির প্রতিষ্ঠা হল?

ট্যাক্সিটা এগিয়ে যাবার পর দেখলাম পরের মোড়ের মাথায় দু'জন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে গল্প করছে ছুটির দিনের মেজাজে। আমি ট্যাক্সিটা থামতে বলে নেমে গেলাম। সেপাই দু'জনের কাছে গিয়ে বললাম, দেখিয়ে, উধার এক পাগলি জেনানা খাড়ে হুয়ে হ্যায়, এক দম নাঙ্গা।

সেপাই দু'জন গল্প থামিয়ে অতিশয় অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে। এক জন বলল, হামলোগ কেয়া করে গা?

আমি বললাম, পার্ক স্ট্রিটমে কিতনা গাড়ি চলতা, বাহার সে সাহেব লোগ আতা, হিঁয়া পর এক নাঙ্গা জেনানা —।

অধিকতর অভিজ্ঞ সেপাইটি ডান হাতের পাঞ্জা নাড়িয়ে মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে বলল, যাইয়ে, যাইয়ে, আপ ঘর যাইয়ে!

আমি আবার ফিরে এলাম ট্যাক্সিতে। দাদা আমার বেশির ভাগ কীর্তি-কাহিনিই জানে না। হঠাৎ ট্যাক্সি থামিয়ে নেমে গেছি বলে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার? কোথায় গিয়েছিলি?

আমি বললাম, একটু আগে যে পাগলিটাকে দেখলে না, আমি এখানে দু'জন পুলিশকে দেখে বলতে গিয়েছিলাম যাতে ওরা কিছু ব্যবস্থা করে!

বউদি বললো, ছি ছি ছি, দেখলে এমন বিচ্ছিরি লাগে না!

দাদা বলল, কেন যে এদের কলকাতা থেকে বার করে দেয় না! পুলিশও হয়েছে এমন। তুই আবার এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে যাস কেন? কেউ কিছু বলতে গেলে তাকেই ঝঞ্ঝাটে পড়তে হয়।

তখন আমার মনে হল, নিলয়দা রাস্তা থেকে ভোলানাথকে তুলে না নিয়ে যদি কোনও পাগলীকে নিয়ে যেত, তাহলে নিশ্চয়ই তার সতেরো রকম ব্যাখ্যা হত!

স্বর্ণর সঙ্গে জয়ের ভাব হয়ে গেছে এর মধ্যে। এখন স্বর্ণ আমার দিকে অদ্ভুত তির্যক ভাবে তাকায়। প্রথম দিন স্বর্ণ আমাকে নানাভাবে জেরা করে জানতে চেয়েছিল, ভোলানাথকে আমরা সত্যিই পুরুলিয়ার হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এসেছি কি না! আমার সাক্ষ্য বোধহয় খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। স্বর্ণর ধারণা যে, নিলয়দা আর আমি ভোলানাথকে খুন করে কোথাও ফেলে দিয়ে এসে সমস্যার সমাধান করেছি। বাইরে নিয়ে গিয়ে হয় ওকে পাহাড়ের ওপর থেকে আচমকা নিচে ঠেলে ফেলে দিয়েছি, অথবা বিষ খাইয়ে কোনও নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছি। বলাই বাহুল্য, আসল খুনি আমিই, নিলয়দা এই সমাধানটা মেনে নিয়েছে মাত্র। খুনি মানেই ঘৃণ্য। জনতা যখন এক জন মানুষকে পিটিয়ে মারে, তখন ব্যক্তিগত ভাবে কারুর হাতে পাপ লাগে না। কিন্তু আমি পাপী। আমি যদি স্বর্ণকে মনে করিয়ে দিই যে, সে নিজেই এক দিন তার দাদার সার্ভিস রিভলবার দিয়ে বোলানাথকে খুন করতে চেয়েছিল, তাহলে নির্ঘাৎ স্বর্ণ হেসে বলবে, সে তো কথার কথা!

রূপাবউদি অবশ্য ব্যাপারটাকে এ-ভাবে নেয়নি। রূপাবউদিকে নিলয়দা সব কথা খুলে বলেছে। রূপাবউদির ধারণা, নিলয়দা মিথ্যে কথা বলতে অপারগ, সুতরাং সে বিশ্বাস করেছে নিলয়দার সব কথা। এক দিন রূপাবউদি আমাকে হাসতে হাসতে বলল, জানো নীলু, তোমাদের ওই ভোলানাথের পর্বটি বোধহয় এখনো শেষ হয়নি, আবার সে উপদ্রব করবে, আবার তার সঙ্গে তোমাদের দেখা হবে। জঙ্গলের মধ্যে পাথর দিয়ে ঠুকে ঠুকে ওর মাথাটা একেবারে গুঁড়ো করে দিয়ে এলে না কেন? আমি যদি থাকতাম তো তাই দিতাম। মেয়েদের যে অপমান করে, মেয়েদের যে সহ্য করতে পারে না, এই পৃথিবীতে তার বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই।

রূপাবউদি যে-দিন এই কথাগুলো বলল, সেই রাতেই আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম। এই স্বপ্নে রূপাবউদি নেই, নিলয়দা নেই, ভোলানাথও নেই। শুধু সাত্যকি বসুমল্লিক আর আমি। সাত্যকি বসুমল্লিক একটা সাদা রঙের ডিজেল জিপ চালিয়ে চলেছে, পাশে বসে আছি আমি। আমার হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা। সাত্যকি বসুমল্লিক মাঝে মাঝে আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে রহস্যময় ভাবে হাসছে। অন্ধকারে একটা গভীর জঙ্গলে ঢোকার পর এক জায়গায় সে গাড়ি থামিয়ে একটা লাথি মেরে আমাকে ফেলে দিল নিচে। তারপর গাড়িটা ঘুরিয়ে সে যখন আমার কাছে এল, তখন তার হাতে একটা বড় পাথর। উদার, অমায়িক ভাবে সে বলল, কেন আমাকে আমি খুঁজছিলাম জানো? কেন বলেছিলাম তোমার মতো এক জনকেই আমার খুব দরকার? এই জন্য। তুমি জেনে ফেলেছিলে আমি একটা গুপ্ত পাগল, সে-কথা তুমি সবাইকে জানিয়ে দিতে চেয়েছিলে, হাঃ হাঃ হাঃ! এখন এই পাথর দিয়ে ঠুকে ঠুকে তোমাকে শেষ করব। তোমার মাথার ঘিলু বেরিয়ে পড়বে, পিঁপড়ে আর পোকা মাকড়রা এসে চেটে চেটে খাবে, আমি তাই দেখব! মানুষের মাথার ঘিলু বার করে দিতে আমার খুব ভাল লাগে!

এই বীভৎস স্বপ্ন দেখে আমি জেগে উঠলাম মাঝরাত্রে। দুঃস্বপ্নটা এমনই বিশ্বাসযোগ্য যে আমি ধড়মড় করে উঠে বসে আমার মাথায় হাত দিয়ে দেখলাম, সত্যিই আমার ঘিলু গড়িয়ে পড়ছে কি না। সাত্যকি বসুমল্লিক যে মিষ্টি হেসে বলেছিল, আপনার মতো একটি ছেলেকেই আমার দরকার, তার মানে সে আমার মস্তিষ্ক বার করে নিতে চায়।

একটু বাদে আমি বিলক্ষণ চটে গেলাম। কেন আমি দেখলাম এ-রকম দুঃস্বপ্ন? অবচেতন নামে সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েডের একটা নিজস্ব তালুক আছে। সেখানে বসে বসে সেই দাড়িওয়ালা বুড়ো আমাকে নিয়ে ইঁদুর-বেড়াল খেলাতে চায়? এর উলটো স্বপ্নই তো আমার দেখা উচিত ছিল। আমি গাড়ি চালাব। সাত্যকি বসুমল্লিক হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পাশে পড়ে থাকবে। জঙ্গলের মধ্যে আমি এক সময় তাকে লাথি মেরে ফেলে দেব, তারপর একটা বড় পাথর নিয়ে —।

চোখ বুজে আমি এই দ্বিতীয় স্বপ্নটা দেখার চেষ্টা করলুম। কিন্তু কিছুতেই জমল না। যখনই চোখ খুলি, বুঝতে পারি আমি জেগে আছি, বায়ুর ঊর্ধ্বচাপে আমি কল্পনার ওপর জোর খাটাবার চেষ্টা করছি মাত্র। মাঝে মাঝে কফি হাউসের সেই অপ্রতিম এসে ফ্যাক ফ্যাক করে হাসছে আর বলছে, হয় গাঢ় স্বপ্নে অথবা কঠোর বাস্তবে সাত্যকি বসুমল্লিকের মুখোমুখি হতে হবে, বুঝলে নীলু, নিছক ইচ্ছাপূরণ কল্পনায় কোনওই কাজের কাজ হয় না!

বড় অসুখী অবস্থায় আমার সেই রাতটা কাটাল।

লোকে যাই বলুক, আমার ধারণা ভোলানাথ বেশ ভালই আছে। সাধুরা বলে, কামিনী-কাঞ্চন পুরোপুরি ত্যাগ করতে পেরেছে। লোকে ভোলানাথকে পাগল ভাবে, আসলে সে হয়তো রয়েছে ভাবের ঘোরে। ভোলানাথ মাঝে মাঝে যে-সব কথা বলে, অনায়াসেই সেগুলোকে গভীর তত্ত্ব বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। ভোলানাথের সে-রকম কয়েক জন ভক্ত থাকলে এই সব বাণীই প্রচার করে প্রচুর চ্যালা জুটিয়ে ফেলতে পারত। সাহেব মেমরা এসে তার পায়ে পড়ে কাঁদত। রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছিলেন, 'তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে', ভোলানাথও কি সেই মাধুরীর কথা বলে? সেই 'মাধুরী' হারিয়ে গেছে? এ তো বেশ নতুন রকমের চিন্তা। আমি বিদায় নেবার সময় ভোলানাথ ঝরনার জলে পা ডুবিয়ে রেখে খুব সহজ ভাবে বলেছিল, আমিও থাকব না, তুমিও থাকবে না। কেউ থাকবে না। বেদ-উপনিষদেও তো এই টাইপের কথাই থাকে।

কল্পনায় দেখতে পাই, সেই ঝরনাটার পাশে শুয়ে আছে ভোলানাথ, আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে সিগারেট টানছে। তার অতীত নেই, তার ভবিষ্যতের চিন্তা নেই। হয়তো সেই পলিথিনের ব্যাগ ভর্তি

চিড়ে আর বাদাম এর মধ্যেই ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু তার শরীরে রয়েছে অতি স্বাস্থ্যকর খিদে, যে-কোনও খাবার পেলেই তার শরীর সন্তুষ্ট হবে। গাছের পাতাই বা মন্দ কী। আমি ছেলেবেলায় তেঁতুল গাছের কচি কচি পাতা চিবিয়ে চিবিয়ে খেতুম, টক টক, বেশ সুন্দর খেতে।

যখনই কেউ অপমান করে, প্রয়োজনের জন্য কোথাও গিয়ে যখন ব্যর্থ হই, তখনই মনে হয়, ভোলানাথকে তো এ-সব কিছুই সহ্য করতে হয় না। ওর বদলে আমিই তো জঙ্গলে গেলে পারতাম। কিছুক্ষণ জঙ্গলের স্বপ্ন দেখতে দেখতে অবশ্য বুঝতে পারি, ভোলানাথের তুলনায় আমি অনেকটাই অযোগ্য। কাঞ্চন সম্পর্কে আমার আসক্তি নেই, কিন্তু কল্পনাতেও তো কামিনীদের ত্যাগ করতে পারি না। বিজন অরণ্যে এক ঝরনার পাশে আমি যখন নিজেকে শুইয়ে রাখি, তখন ঝরনার অন্য পারে আরও এক জন কেউ শুয়ে থাকে, তাকে ঠিক চিনতে পারি না, সে যেন অভিমানে ফিরিয়ে আছে মুখ, তার চুলের ওপর ঝরে পড়ছে ফুলের রেণু।

আমাদের সেই অভিযানের ঠিক সতেরো দিন পর আর একটা ঘটনা ঘটল।

পাপুনের জন্মদিন উপলক্ষে রূপাবউদি নেমন্তন্ন করেছে আমাকে। বেশি লোকজন নয়, নিজেদের মধ্যেই ব্যাপার, পাপুনের কিছু স্কুলের বন্ধু আর আমরা কয়েক জন। সন্ধেবেলা কেক-টেক কাটা হল, পাপুনের বন্ধুরা খেয়ে দেয়ে চলে গেল বাড়িতে, পাপুনও ঘুমিয়ে পড়ল, স্বর্ণ আর জয় এখন এসে পৌঁছোয়নি বলে আমরা অপেক্ষা করছি। ওরা একটা থিয়েটার দেখে আসবে। বসবার ঘরে বসে আড্ডা দিচ্ছি নিলয়দা, রূপাবউদি আর আমি। রূপাবউদির আজ মেজাজ খুব ভাল, ওর অফিসের এক জন সহকর্মীকে নিয়ে দারুণ মজার গল্প বলছিল, এই সময় কলিং বেল বেজে উঠল। স্বর্ণরা এসেছে ভেবে রূপাবৌদি চেঁচিয়ে বলল — জীবন, দরজাটা খুলে দে।

রান্নার ঠাকুর এসে বলল, এক জন ভদ্রমহিলা দাদাবাবুকে ডাকছেন।

নিলয়দা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কে?

জীবন বলল, চিনি না! সঙ্গে একটি আট-দশ বছরের ছেলে রয়েছে।

রাত সাড়ে ন'টা বাজে, এখন কোন অচেনা মহিলা এসেছে দেখা করতে?

নিলয়দা উঠতে যাচ্ছিল, রূপাবউদি জীবনকে বলল, এখানে ডেকে নিয়ে আয়।

মহিলাটিকে দেখেই আমার মনে পড়ে গেল ভোলানাথের কথা। আমার এ-রকম হয়, আমি বুঝতে পারি। কী করে পারি তা জানি না। সঙ্গের ছেলেটির মুখের সঙ্গে ভোলানাথের কোনও মিল নেই, কিন্তু এ যে ভোলানাথেরই সন্তান তাতেও কোনও সন্দেহ নেই। এত দিনে ভোলানাথের অতীত আমাদের কাছে সশরীরে উপস্থিত হয়েছে।

মহিলাটির বয়েস বছর তিরিশেক হবে, সাদামাটা চেহারা, তবে মুখে কোনও অলঙ্কার নেই, শুধু সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা।

প্রথমে এক-দেড় মিনিট মহিলাটি কোনও কথাই বলতে পারলেন না। মুখ নিচু করে রইলেন। ছেলেটি ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেয়ালের ছবিগুলো দেখছে।

নিলয়দা তৃতীয় বার জিজ্ঞেস করল, আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, কী ব্যাপার, বলুন?

মহিলাটি মাথা তুললেন, ঠোঁট কাঁপছে। আস্তে আস্তে বললেন, আমাদের পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে গেল... ট্রেন খুব লেট... অনেক অসুবিধে করলাম আপনাদের।

রূপাবউদি বলল, না না, অসুবিধে কিছু নেই, আপনি কী বলতে এসেছেন, বলুন?

মহিলাটি হাতব্যাগ খুলে তার মধ্য থেকে একটা পুরোনো কাগজের কাটিং বার করে বললেন, ইনি আমার স্বামী।

সব চেয়ে বেশি অবাক হল রূপাবউদি। আমি তো আগে থেকেই জানি, নিলয়দার দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, যেন তার নামে কেউ চুরির অপবাদ দিয়েছে এইমাত্র।

রূপাবউদি কাগজের কাটিংটা দেখে বলল, আপনার স্বামী? এই বিজ্ঞাপন তো আমরা দিয়েছিলাম এক মাস আগে, কিংবা তারও বেশি হবে। এত দিন আসেননি কেন?

মহিলা বললেন, আমরা অনেক দূরে থাকি, সেখানে খবরের কাগজ যায় না। আমরা থাকি চাসনালায়, ঝরিয়া থেকে অনেকটা যেতে হয়।

চাসনালা নামটা আমার চেনা। কয়েক বছর আগে সেখানকার খনিতে এক সাংঘাতিক দুর্ঘটনা হয়েছিল, মারা গিয়েছিল প্রায় চারশো শ্রমিক।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, চাসনালা কয়লাখনিতে থাকেন?

মহিলা বললেন, হ্যাঁ। আমরা তো কাগজ পড়ি না। গত কাল একটা চিঠি এলো আমার নামে, চিঠি মানে আর কিছু লেখা ছিল না, খামের মধ্যে। শুধু এই কাগজটা ছিল।

আপনাকে এত দিন বাদে কেউ এটা ডাকে পাঠিয়েছে? কে পাঠিয়েছে?

তা জানি না। এটা দেখেই আপনাদের কাছে চলে এসেছি। সকালের ট্রেন ধরতে পারিনি, কলকাতা শহর ভাল চিনি না, অনেক খুঁজতে হয়েছে এই ঠিকানা।

কয়েক মুহূর্ত নিলয়দা রূপাবউদির সঙ্গে নির্বাক ভাবে দৃষ্টি বিনিময় করলাম। নিলয়দা বিমর্ষ হয়ে গেছে একেবারে।

মহিলা আমাদের বিশেষ কারুর দিকে না তাকিয়ে মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, উনি কি ভাল আছেন? কাগজে ছবি বেরিয়েছে দেখে মনে হল, তাহলে নিশ্চয়ই ভাল হয়ে গেছেন।

আমাকে আর নিলয়দাকে চুপ করে থাকতে দেখে রূপাবউদিই বলল, না, উনি ভাল হননি এখনও। আপনারা ঝরিয়ায় থাকেন, উনি কলকাতায় এলেন কী করে?

তা তো জানি না। কলকাতায় যে এসেছেন, তা-ও জানতাম না। প্রায় দু' বছর ধরে ওঁর কোনও খোঁজ পাইনি। পুলিশে খবর দেয়া হয়েছিল। পুলিশ কিছু বলতে পারেনি।

এবারে আমি জিজ্ঞেস করলাম, উনি চাসনালাতেই থাকতেন? ওখানে কী করেন?

চাকরি করতেন।

ওঁর এই, ইয়ে... অসুখটা কবে থেকে হল?

চাসনালায় সেই যেবার জল ঢুকে গেল, অনেক লোক ভেতরে আটকা পড়েছিল, সেই সময় থেকেই।

আপনার স্বামী কি সেই সময় খনির মধ্যে আটকা পড়েছিলেন?

না। উনি তো কাজ করতেন অফিসে। টাইমকিপারের কাজ করতেন। অনেক ডেডবডি তোলা হয়েছিল ওপরে, আগুন জ্বেলে পোড়ানো হয়েছিল, তখন খুব খাটতে হয়েছিল তো, লেবারারদের বউরা কমপেনসেশান পেল, তারা সব লাইন দিয়ে দাঁড়াত, উনি তাদের নাম লিখে টিপ সই নিতেন। সেই সময়েই রোজ বাড়ি এসে বলতেন, আমার আর কাজ করতে ইচ্ছে করে না।

টপ টপ করে জলের ফোঁটা পড়তে লাগল মাটিতে। ভদ্রমহিলা চোখ মুছবার চেষ্টাও করলেন না। একই রকম গলায় বলে যেতে লাগলেন, অনেক লোক তখন টাকা চুরি করেছিল, ওই সব বিধবা মেয়েগুলোকে বিয়ে করবার জন্য অনেক লোক ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, আপনারা সে-সব জানেন বোধহয়? আমার স্বামী ভাল লোক ছিলেন, উনি এত সব সহ্য করতে পারলেন না, প্রথমে খুব মাথায় যন্ত্রণার কথা বলতেন। ঝরিয়া হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল।

নিলয়দা এতক্ষণ বাদে জিজ্ঞেস করল, ওঁর, মানে আপনার স্বামীর নাম কী?

মহিলা তাকালেন তাঁর ছেলের দিকে। ছেলেটি বলল, আমার বাবার নাম অনুতোষ বড়াল।

নাম শুনলেই একটা চেহারার ছবি চোখে ভেসে ওঠে। অনুতোষ শুনলে মনে হয়, রোগা, লম্বা, লাজুক মতো এক জন মানুষ, আমাদের ভোলানাথের সঙ্গে মেলে না একেবারেই। শ্মশানবাসী, ছাই ভস্মমাখা শিবের নামেই ওকে মানায়।

ভদ্রমহিলা হাতব্যাগ খুলে একটা ফটোগ্রাফ বার করলেন। সাত-আট জনের একটা গ্রুপ ছবি। তার মধ্যে ডান পাশের লোকটির দিকে আঙুল দেখালেন ভদ্রমহিলা। তখন বেশ রোগাই ছিল, তবে এই লোকটিই যে আমাদের ভোলানাথ, তাতে কোনও সন্দেহই নেই।

রূপাবউদি বলল, আপনি বড্ড দেরি করে ফেললেন, উনি তো এখন এখানে থাকেন না। আবার কোথায় চলে গেছেন!

তার পরেই রূপাবউদি ছেলেটির দিকে ফিরে বললেন, তোমার নাম কী?

ছেলেটি বললো, সুখময় বড়াল।

রূপাবউদি বলল, সুখময়, তোমাকে তো দেখে মনে হচ্ছে খাওয়া হয়নি। এসো, খেয়ে নেবে এসো।

ছেলেটি লজ্জা পেয়ে মায়ের দিকে তাকাচ্ছিল, রূপাবউদি তার হাত ধরে নিয়ে গেলেন ভেতরে।

ভদ্রমহিলা নীরবে কাঁদতে লাগলেন, আমি আর নিলয়দা চুপ করে বসে রইলাম। নিলয়দার মুখ দেখেই বোঝা যায়, ওর মনের মধ্যে একটা ঝড় বইছে। আমার মনের মধ্যেও কিছু একটা হচ্ছে। কিন্তু সেটা ঝড় কি না জানি না।

নিস্তব্ধতা ভাঙলাম আমিই। কারণ আমার পুরো কাহিনিটি জানতে ইচ্ছে করছিল। চাসনালা কোলিয়ারির টাইমবাবু, ভয়াবহ একটা দুর্ঘটনার পর মৃতদেহ আর বিধবা মেয়েদের দেখে পাগল হয়ে গেল, তখন তাকে ভর্তি করা হল ঝরিয়া হাসপাতালে, তারপর?

আমার প্রশ্ন শুনে মহিলা বললেন, হাসপাতালের লোকেরা ওঁকে মারত। সবাই ভাবে মারলেই বুঝি পাগল ভাল হয়। মার খেয়ে খেয়ে উনি দু'বার পালিয়েছিলেন। দু'বারই খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল অতিকষ্টে। তার পরের বার আর পাওয়া গেল না। আমি আর কত খুঁজব! আমার এক মামা ছাড়া কেউ নেই, ওঁরও বাবা নেই, ভাই-টাই নেই।

আপনি তার পরও চাসনালাতেই থেকে গেলেন?

কোম্পানি আমাকে একটা ওখানে চাকরি দিয়েছে, আমি আর কোথায় যাব?

রূপবউদি ফিরে এসে মহিলাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কলকাতায় থাকবেন কোথায়? কেউ আছে?

মহিলা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হ্যাঁ, ব্যারাকপুরে আমার মামা থাকেন। খোকাকে ডেকে দিন, এবার যাব।

এত রাত্রে ব্যারাকপুরে যাবেন? কী করে যাবেন?

সে কোনও অসুবিধে হবে না। শিয়ালদা থেকে ট্রেন যায়, আমি গেছি অনেক বার। বিয়ের আগে তো আমি ব্যারাকপুরেই থাকতুম।

আজ আর সেখানে যাবার দরকার নেই। আজ আমাদের এখানেই থাকুন। আজ আমার ছেলের জন্মদিন, আপনি এসে পড়েছেন, আজ আপনাকে যেতে দেব না।

নিলয়দা বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? মাধুরী কে? আপনার নাম কি মাধুরী?

ভদ্রমহিলা স্পষ্টতই কেঁপে উঠলেন। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল। নিলয়দার দিকে কয়েক মুহূর্ত সেই ভাবে তাকিয়ে থেকে বললেন, মাধুরী? জানি না তো? আমার নাম পূর্ণিমা। হঠাৎ এ-কথা জিজ্ঞেস করলেন?

ওই নামটা ওর মুখে অনেক বার শুনেছি।

আমি তো কখনও শুনিনি!

আমার মনে হল, ভদ্রমহিলা বোধহয় কিছু একটা গোপন করে যাচ্ছেন। মাধুরী নামটা কি সত্যিই উনি আগে শোনেননি? মাধুরী রক্ত-মাংসের কেউ নয়। কয়লা খনির এক টাইমবাবুর পক্ষে কি এতখানি বিমূর্ত কল্পনা সম্ভব? কিংবা যারা পাগল হয়, তারা সকলেই উচ্চমার্গের চিন্তা করে?

নিলয়দা বলল, মাথার গোলমাল হবার পর উনি আপনার ওপর কখনো, ইয়ে, মানে, রেগে মারতে-টারতে গিয়েছেন?

না, কক্ষনও না। উনি শান্ত মানুষ ছিলেন। কোনও দিন অফিস কামাই করতেন না। ঝড়-বৃষ্টি, অসুখ-বিসুখ হলেও অফিসে যাওয়া চাই-ই। সব সময় বলতেন, চাকরি গেলে তোমাদের অসুবিধে হবে।

বাইরে একটা গাড়ি দাঁড়াল। জয় আর স্বর্ণ এসে গেছে। রূপাবউদি বলল, এসো আগে খেয়ে নেওয়া যাক।

নিলয়দা বলল, খাবার গরম করতে বলো, এক্ষুনি আসছি। নীলু, একটু শোন তো।

আমরা দু'জনে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়ালাম। দু'জনে দুটো সিগারেট ধরাবার পর একটু সময় নিয়ে নিলয়দা জিজ্ঞেস করল, এবার কী হবে?

নিরুত্তর। এর আগে আর কখনও আমি পরামর্শদাতার ভূমিকা নিইনি। নিলয়দার মানসিক সঙ্কটটা আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি ওকে কোন বুদ্ধি দেব? আমার বুদ্ধির দৌড় শেষ।

নিলয়দা আবার বলল, ভদ্রমহিলা যখন জিজ্ঞেস করবেন যে, ওঁর স্বামী এখান থেকে কোথায় গেল, তখন কী উত্তর দেব?

আমি বললাম, রূপবউদি তো উত্তর দিয়েই দিয়েছে। সে এখান থেকে চলে গেছে। কথাটা মিথ্যেও নয়।

এখান থেকে চলে যায়নি, আমরা তাকে এক জায়গায় ছেড়ে দিয়ে এসেছি।

প্রায় একই কথা। সে নিজেই চলে যেতে পারত। পাগল মানুষ, যে-কোনও দিন সে আবার হারিয়ে যেতে পারত।

পারত, কিন্তু যায়নি। সে কোথায় আছে, আমরা জানি। সেটা গোপন করে যাওয়া অন্যায় নয়?

আমি প্রমাদ গুনলাম। অনুতোষ ওরফে ভোলানাথ ঠিক কোথায় আছে, তা কি সত্যি আমরা জানি? জঙ্গলের মধ্যে সেই জায়গাটা আমরা আবার খুঁজে বার করতে পারব? তাছাড়া তাকে জঙ্গলের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, সে-কথা স্বীকার করা কি ঠিক হবে? কুকুর-বেড়াল তো নয়, মানুষ। হয়তো আমরা ঘোরতর বে-আইনি কাজ করেছি। মানুষের না খেতে পেয়ে মরা বে-আইনি নয়, কিন্তু এক জন ক্ষুধার্ত মানুষ যদি অন্য কারুর কাছ থেকে জোর করে খাবার কেড়ে নেয় তবে তা বে-আইনি।

আমরা ঝোঁকের মাথায়, অনেকটা নিরুপায় হয়েই একটা কাজ করে ফেলেছি। এখন কি তার জন্য জেল খাটতে হবে? তা মন্দ কী। কিছু দিন জেলেই ঘুরে আসা যাক। সরকার ভোলানাথকে ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু ভোলানাথের প্রতি অবিচার করেছি বলে আমাদের জেলে দিতে নিশ্চয়ই সরকার দ্বিধা করবে না।

নিলয়দা বলল, তুই চুপ করে রইলি যে? ওকে ফিরিয়ে আনা এখন আমাদের ডিউটি।

ফিরিয়ে আনার পর? রাখবে কোথায়?

ভোলানাথ কোল ইন্ডিয়ার কর্মচারী ছিল, এখন বোধহয় ওর চাকরি আছে। কোল ইন্ডিয়া ওর চিকিৎসার দায়িত্ব নেবে! ভোলানাথকে নিয়ে কী করা উচিত, তা ওর স্ত্রী বুঝবে! ইচ্ছে করলে এখন আমরাই তো ওকে যে-কোনও হাসপাতালে ভর্তি করে দিতে পারি, ওর স্ত্রী ফর্মে সই করবে!

কেন যেন আমার মনটা ভারি ভারি লাগছে, নিলয়দার কথায় কোনও উৎসাহ বোধ করলাম না। কিছু একটা বড় রকমের ভুল হয়ে যাচ্ছে, আমরা ধরতে পারছি না?

রূপাবউদির ডাক শুনে আমরা ভেতরে এলাম। স্বর্ণ আর জয় পূর্ণিমা বড়ালকে ঘিরে দাঁড়িয়ে নানা প্রশ্ন করছে। রূপাবউদি বলল, আমি এঁকে বলেছি, তোমরা এঁর স্বামীর সঙ্গে ঝাড়গ্রাম বেড়াতে গিয়েছিলে, তারপর উনি সেখানেই থেকে গেছেন। তোমরা তাকে ফিরিয়ে এনে দেবে!

ভোলানাথের ছেলে সুখময় তার বড় বড় টলটলে চোখ মেলে একবার তার মায়ের দিকে, আর একবার রূপাবউদির দিকে তাকাচ্ছে। স্বামীবঞ্চিতা এক রমণী আর একটি শিশু, এদের দেখার পরই পালটে গেছে সকলের মনের ভাব।

পূর্ণিমা আর তার ছেলে পরদিনও রয়ে গেল নিলয়দার বাড়িতে। মাত্র তিন দিনের ছুটি নিয়ে এসেছেন বলে পূর্ণিমার পক্ষে আর থাকা সম্ভব নয়। নিলয়দা আর রূপাবউদি ওদের পৌঁছে দিয়ে এল হাওড়া স্টেশনে। রূপাবউদির সঙ্গে পূর্ণিমার এত ভাব হয়ে গেছে যে, রূপাবউদি কথা আদায় করে নিয়েছে, পূর্ণিমা এরপর কলকাতায় এলেই তাদের বাড়িতে উঠবে। নিলয়দাও কথা দিয়েছে, কয়েক দিনের মধ্যেই সে পূর্ণিমার স্বামীকে পৌঁছে দেবে চাসনালায়।

আমি কয়েক দিন আর যাইনিও বাড়িতে। শুক্রবার রাত্তিরে নিলয়দা এসে আমাকে ধরল। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। ড. ভড়ের সঙ্গে পরামর্শ করে এসেছে নিলয়দা। কোল ইন্ডিয়ার কর্মচারি হলে রাঁচির হাসপাতালে ভর্তি করতে কোনও অসুবিধেই হবে না। রাস্তার পাগল নয়, এখন ওর পরিচয় পাওয়া গেছে, মোটামুটি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়ে, এবার একটা ব্যবস্থা হবেই।

নিলয়দা বলল, কাল ভোরেই তো তাহলে রওনা হতে হয়। কাল শনিবার আছে, স্বর্ণ আর জয়ও সঙ্গে যাবে বলছে।

আমি কাচুমাচু ভাবে বললাম, নিলয়দা, কালকে যে আমার একটা চাকরির ইন্টাভিউ আছে। আমি তো যেতে পারছি না।

নিলয়দা বলল, শনিবার ইন্টারভিউ? কোন অফিসে?

আছে এক জায়গায়। এক জন লোক আমাকে দেখা করতে বলেছে, ঠিক আমার মতো এক জনকেই খুঁজছে নাকি।

তুই আমার কাছে মিথ্যে কথা বলছিস নীলু? তোকে বাদ দিয়ে আমারা যাব কী করে?

ঝাড়গ্রাম থেকে এক জন ড্রাইভার নিতে পারো। ওরা সব রাস্তা চেনে।

তুই যাবি না? এত দিন আমরা দু'জনে সব ব্যাপারে এক সঙ্গে ছিলাম, তুই কেন যেতে চাইছিস না বল তো?

আমার সত্যি কাজ আছে, নিলয়দা!

নিলয়দা বেশি পেড়াপেড়ি করে না কক্ষনও। বিষণ্ণ ভাবে বলল, তাহলে আর তোকে জোর করব না। আমি কালকেই বেরিয়ে পড়ছি, আর দেরি করা যায় না।

নিলয়দাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলাম, কিন্তু আর একটিও কথা হল না।

সারা রাত ঘুমোতে পারলাম না ভাল করে। ছটফট করলাম বিছানায়। কীসের অস্বস্তি তা বুঝতে পারছি না। ঘুমের অসুবিধে আমার হয় না সাধারণত। কোনও দুঃস্বপ্নও দেখছি না। একটু তন্দ্রা আসছে, আবার ভেঙে যাচ্ছে।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আমি এসে দাঁড়ালাম বারান্দায়। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস আজ অনুপস্থিত, রাত্তিরেও খুব গরম ছিল। মনে পড়ল, অনেক দিন সমুদ্রের ধারে যাইনি। এখন যে-কোনও সমুদ্রতীরে হাওয়ারা লুটোপুটি খাচ্ছে। এবার যেতে হবে।

দূর থেকে একটা জিপ গাড়ি এসে থামল আমাদের বাড়ির সামনে। স্বর্ণ, জয় আর নিলয়দা নামল গাড়ি থেকে, স্বর্ণ হাতছানি দিয়ে আমাকে হুকমের সুরে বলল, এই, নেমে এসো।

আমার খালি গা বলে আমি চট করে বারান্দা থেকে সরে এসে একটা জামা গলিয়ে নিয়ে নেমে এলাম। নিলয়দা বলল, আমি আসতে চাইনি রে, ওরা জোর করে এখানে টেনে আনল!

স্বর্ণ বলল, খালি পা কেন? চটি পরে এসো! পাজামার সঙ্গে শার্ট? বিচ্ছিরি দেখায়! একটা পাঞ্জাবি পরে আসবে।

আমি তো যাচ্ছি না।

যাচ্ছ না মানে? বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলে কেন? তৈরি হয়ে নিতে পারোনি?

জয় বলল, চলুন, চলুন বেশি দেরি করলে হাওড়ায় জ্যাম হবে।

বেশিবার না না করলে মনে হয় দাম বাড়াচ্ছি। স্বর্ণ কোনও কথাই শুনবে না। ঘুমন্ত মায়ের কানে বার্তাটি জানিয়ে ঠিক বারো মিনিটের মধ্যে আমি তৈরি হয়ে ফিরে এসে জিপে উঠলাম। আমি নিলয়দার পাশে, ওরা দুই প্রেমিক-প্রেমিকা পেছনে। জয়ের অনেক চেনাশুনো আছে, সে কাঁকড়াঝোড় বাংলোর রিজার্ভেশন করিয়ে ফেলেছে পর্যন্ত।

আগের বারের যাওয়ার এবারের যাওয়ায় অনেক তফাৎ। আমি কিছুতেই জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারিছ না, মনের মধ্যে। যেন মেঘ জমাট হয়ে আছে, কোনও তরঙ্গ উঠছে না। জয় আর স্বর্ণর ঠিক পিকনিকের মেজাজ। মাঝে মাঝে গান গেয়ে উঠছে দু'জনে। আমার প্রতি জয়ের ব্যবহার বেশ স্বচ্ছন্দ। ও কি জানে, স্বর্ণ আমার সঙ্গে এক দিন গঙ্গায় নৌকো চড়ে বেড়াতে গিয়েছিল?

প্ল্যান ছিল একটানা গাড়ি চালিয়ে ঝাড়গ্রামে এসে বিশ্রাম নেওয়া হবে। কিন্তু লোধাশুলিতে একটা চাকা পাঙ্কচার হল, চাকা বদলাতে সময় চলে গেল কিছুটা। ঝাড়গ্রামে এসে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম। তারপর আবার যাত্রা।

দহিজুড়িতে আজও হাট জমেছে। একটা মোষের গাড়ির পেছনে পড়ায় আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছে নিলয়দা, একটি আদিবাসী রমণী আমাদের পাশে এসে বলল, ও বাবু, আন্ডা নেবে?

নিলয়দা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

জয় বলল, একটা বিচ্ছিরি গন্ধ পাচ্ছ স্বর্ণ? এই সব হাট-ফাটের পাশ দিয়ে গেলেই এই রকম গন্ধ পাওয়া যায়। এরা পচাই আর তাড়ি-টাড়ি কী সব বিক্রি করে।

আমি অবাক হয়ে জয়ের দিকে তাকালাম। কোথায় বিচ্ছিরি গন্ধ? সতেজ তরিতরকারি, টাটকা বাতাস, এই গন্ধটা জয়ের খারাপ লাগল? মনে হচ্ছে যেন আজও একটা পাগলকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

বেলপাহাড়ি ছাড়িয়ে জঙ্গলে ঢোকার মুখে আমি একবার বলে উঠলাম, নিলয়দা।

মুখ ফিরিয়ে নিলয়দা বলল কী?

আমি ইতস্তত করে বললাম, কিছু না।

স্বর্ণ জিজ্ঞেস করল, এই জঙ্গলে ময়ূর আছে? আমরা একবার বেতলা ফরেস্টে গিয়ে অনেক ময়ূর দেখেছিলাম, তোমার মনে আছে নিলয়দা? তোমাদের বিয়ের ঠিক পরেই —।

নিলয়দা বলল, তুমি তখন কত ছোট ছিলে। এই জঙ্গলের কথা নীলু ভাল জানে। ওকে জিজ্ঞেস করো।

স্বর্ণ বলল, ও তো সারাক্ষণ গোমড়ামুখো হয়ে আছে। কথাই বলছে না। নীলকমল, তোমার কী হয়েছে বলো তো?

আমি ভদ্রতা করে হাসলাম। আমার সত্যিই কষ্ট হচ্ছে। একটা স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার কষ্ট। ঝরনার পাশে শুয়ে আছে একটি মানুষ, মাথার ওপরে আকাশ, তার গায়ে লাগছে নাম-না-জানা গাছের স্নেহ বাতাস, পাখিরা তার দিকে অবাক চোখে দেখে। তার কোনও অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই, খিদে পেলে সে খাদ্যের সন্ধানে যাবে অথবা যাবে না। কারুর তাড়না সহ্য করতে হবে না তাকে, সাত্যকি বসুমল্লিকের মতো কেউ দয়া দেখাতে আসবে না। তার সঙ্গী শুধু তার নিজের মন।

আমি এ-রকম পারিনি, কখনও পারব না। আর বেশি দিন চাকরি-বাকরি না পেলে আমায় শেষ পর্যন্ত সাত্যকি বসুমল্লিকের কাছেই যেতে হবে। গিয়ে বলব, এই যে এসেছি স্যার, মাথা পেতে দিচ্ছি, আপনি আমার ঘিলু বার করে নিন!

এক জন কেউ সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে পেরেছিল, তাকে আমরা ফিরিয়ে নিয়ে বন্দি করতে চাইছি। পাগলের চিকিৎসা মানে কী? একটা ছোট ঘরে আটকে রাখবে তাকে, হয়তো হাতে-পায়ে শিকল পরাবে, ইলেকট্রিক শক্ দেবে, সে একটু চ্যাঁচামেচি করলে ওয়ার্ডবয়রা এসে হাঁটু দিয়ে চেপে ধরবে তার বুক। কয়লাখনির এক টাইমবাবু তার বাঁধা ধরা সময়ের সব জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছিল, সে দেখেছিল অকারণ নির্বোধ মৃত্যু, সে দেখেছিল টিপ সই দিয়ে খেসারতের টাকা নিতে আসা স্ত্রীলোকদের হাত, এরই মধ্যে সে দেখেছিল লোভ ও রিরংসা, তাই সে তার পুরনো সব কিছু, এমনকী মনটাকেও বিসর্জন দিয়ে চলে এসেছিল। আবার তাকে আমরা সেইখানেই ফিরিয়ে দিতে চাইছি।

ওই সব আসুরিক চিকিৎসার পর ভোলানাথ যদি কোন দিন সুস্থ হয়ে ওঠে? আবার তাকে যেতে হবে তার অফিসের বড়বাবুর কাছে, সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে সে বলবে, এই যে, মাথা পেতে দিয়েছি, আমার ঘিলুটা বার করে নিন স্যার, আমাকে একটা যন্ত্র বানিয়ে ফেলুন।

অকস্মাৎ যেন ছায়াছবির মতো দেখতে পেলাম, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাইমবাবু বসে আছে অফিসে, কলে-কারখানায়। মাথা হেঁট করে সবাই ফিস ফিস করে বলছে, ঘিলু বার করে নিন, ঘিলু বার করে নিন, নইলে পাগল হয়ে যাব!

নদীটা পার হবার সময় আমাদের তিন জনকে নামতে হল গাড়ি থেকে। গাড়ি ঠেলার চেয়ে জল নিয়ে খেলা করাতেই জয় আর স্বর্ণর বেশি উৎসাহ। একবার আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়ে জয় তার জামা টামা ভিজিয়ে ফেলল। স্বর্ণর উচ্ছল হাসিতে কেঁপে উঠল বনভূমি।

নদীর ও-পারে উঠে নিলয়দা নিজেই বলল, এবারে ডান দিকে না?

দিনের আলোয় জঙ্গলে কোনও রোমাঞ্চ নেই। আজ এই জঙ্গলটাকে তেমন গভীরও মনে হচ্ছে না। নিস্তব্ধতারও কোনও প্রগাঢ় রূপ নেই। মেঘশূন্য আকাশে গনগনে রোদ। এই সব কিছুর মধ্যেও ভাল লাগাবার উপকরণ খুঁজে নেওয়া যায়, যদি মনটা সে-রকম উন্মুক্ত থাকে।

কয়েক বার রাস্তা ভুল করে আমার পেয়ে গেলাম সেই ঝরনাটা। ঝরনা কোথায়? এ তো একটা নালা! সেই রাত্রে কী অপরূপ মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন দেখছি বেশ ময়লা জল। জিপ থেকে নেমেই আমরা সবাই ছুটে গেলাম ঢালুর দিকে। ভোলানাথ সেখানে নেই।

পলিথিনের ব্যাগ দুটো পড়ে আছে গাছতলায়। একটা ব্যাগে কিছু বাদাম এখনও রয়ে গেছে। ব্যাগটা ফুটো ফুটো, বোধহয় পাখিরা ঠুকরে ঠুকরে বাদাম খাওয়ার চেষ্টা করেছে। দুটো সিগারেটের প্যাকেট পড়ে আছে না খোলা অবস্থায়। এক জায়গায় পাওয়া গেল বিস্কুটের টিনটা, এতেও কিছু বিস্কুট রয়ে গেছে। ভোলানাথের কোনও চিহ্ন নেই ধারেকাছে।

নিলয়দা চিৎকার করে ডাকল, ভো-লা-নাথ! ভো-লা-না-থ! অ-নু-তো-ষ!

যেন স্পষ্ট প্রতিধ্বনি হল, সেই ডাক ঘুরতে লাগল বনের মধে। আমার মনের মধ্যে বরফ গলছে, আমার মনে হচ্ছে ভোলানাথকে পাওয়া যাবে না।

খানিকটা খোঁজাখুঁজি করতেই সেই নালাটার এক জায়গায় দেখা গেল একটা জামা আটকে আছে পাথরে। এটা নিলয়দারই পাঞ্জাবি, ভোলানাথের গায়ে ছিল। জামা সে ইচ্ছে করে খুলে ফেলতেই পারে। জঙ্গলে জামার তো কোনও দরকার নেই।

রাস্তার পাগলেরও একটা ছোটখাটো সংসার থাকে। সে-ও কিছু কিছু জিনিস জমায়। ছেঁড়া কম্বল, ভাঙা বা তোবড়ানো থালা, বাটি, আধপোড়া সিগারেট। এখানে সে-রকম কোনও কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এই ক'দিনে অনেক বার বৃষ্টি হয়েছে। গাছের ডালপালা ভেঙে ভোলানাথ একটা ঝুপড়ি বানিয়ে নিতে পারত, সে-রকম কিছু চেষ্টাও সে করেনি।

দু'ঘণ্টা ধরে তন্নতন্ন করে খুঁজে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। বিকেল গাঢ় হয়ে আসছে, এর পর আর কিছুই দেখা যাবে না। স্বর্ণ বলল, চলো আমবা ডাকবাংলোতে যাই।

সন্ধে হতে না-হতেই একটা মস্ত চাঁদ উঠল আকাশে। ডাকবাংলোর পেছন দিকে একটা ছোট টিলা, সেখানে চেয়ার পেতে দিয়েছে আমাদের। যারা বেড়াতে আসে, তারা সবাই এখানে এসে বসে। এখান থেকে অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যায়। বাংলোর সামনে বেশ কিছু লোকজন জড়ো হয় সন্ধেবেলা, কাছেই আছে একটা মুদির দোকান। ফরেস্ট গার্ড আর চৌকিদারকে অনেক প্রশ্ন করেছে নিলয়দা। না, তারা কেউ জঙ্গলের মধ্যে কোনও নতুন মানুষকে দেখেনি। ফরেস্ট গার্ড জোর দিয়ে বলল, নতুন লোক এলে সে ঠিক জানতে পারত, সাইকেলে সে সারা বন টহল দিয়ে বেড়ায়।

নিলয়দা এখানে ওদের সঙ্গে কথা বলতেই ব্যস্ত। কাল সকালে আর একটা সার্চ-পার্টি বেরুবে। জয় আর স্বর্ণ হাত ধরাধরি করে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। আমি চুপচাপ একলা বসে রইলাম। চতুর্দিকে ঝিঁঝির ডাক, দূরে শোনা যাচ্ছে মাদলের শব্দ, শব্দটা সরে সরে যাচ্ছে, কোনও একটা দল মাদল বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে বনের পথ দিয়ে। এরই মাঝখানে যেন আমি আবার শুনতে পেলাম, নিলয়দার সেই ব্যাকুল ডাক, ভো-লা-না-থ! ভো-লা-না-থ! অ-নু-তো-ষ!

কেউ সেই ডাকে সাড়া দেবে না। অনুতোষ নামে কেউ নেই। ভোলানাথ নামেও কেউ নেই। জঙ্গলের মধ্যে যাকে আমরা রেখে গিয়েছিলাম, সে এক জন অন্য মানুষ। সে ইচ্ছে মতো চলে গেছে গভীর, গভীরতর বনে। সমুদ্র যেমন অতল সেই রকম সব অরণ্যই অসীম। ইচ্ছে করলেই হারিয়ে যাওয়া যায়।

শেষবার ভোলানাথ আমাকে বলেছিল, আমিও থাকব না, তুমিও থাকবে না, কেউ থাকবে না। উপনিষদের ঋষিদের মতো অতি সরল অমোঘ কথা। ভোলানাথ নেই, আমরাও থাকব না।

হঠাৎ যেন মনে হল, আজ থেকে কয়েক বছর বাদে, ঠিক এই জায়গাটাই, এই চেয়ারে আর এক জন মানুষ বসে আছে। অনেকটা আমারই মতো চেহারা, আমারই মতো হাতের মুঠোয় সিগারেট ধরে সে টানছে, কিন্তু সে আমি নয়। অন্য কেউ। আমি তখন কোথাও নেই। আর এক জন নিলয়দা আর এক জন ভোলানাথকে ব্যাকুল ভাবে ডাকবে। কিন্তু তাকেও পাবে না। সেই আর এক জন ভোলানাথ টাইমবাবু হতে অস্বীকার করে, জীবনের ধরাবাঁধা হিসেব অসমাপ্ত রেখে নিজের মনকে সঙ্গী করে কোথাও হারিয়ে যাবে॥

ফুলমণি-উপাখ্যান

॥ ১॥

দুপুরবেলার কাঁচা ভাত-ঘুমটা ভাঙিয়ে দিল চন্দনদা।

দিনটা চমৎকার। সকাল থেকেই রিমঝিম ঘন ঘন রে।

বাজারে ইলিশ মাছ সস্তা। এমন দিনে মাকে বলা যায়। বলা যায় খিচুড়ি, খিচুড়ি! পৃথিবীতে আর কোনও খাবার নেই, যার স্বাদ বৃষ্টির দিনে বেশি ভাল হয়ে যায়, খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজার মতো। খাওয়ার পর বাথরুমে না গিয়ে আমি আঁচালাম বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির জলে। সারা গায়ে বৃষ্টির গন্ধ হয়ে গেল।

এরপর একখানা বই বুকে নিয়ে ঘুম না দেওয়ার কোনও মানে হয় না। যত আকর্ষণীয় প্রেমের গল্প বা গোয়েন্দা গল্পই হোক, বিছানায় গা এলিয়ে দেবার পর দু'চার পাতার বেশি পড়া যায় না, চোখ জুড়িয়ে আসে। খিচুড়ির ঘুমের চরিত্রই আলাদা। এই ঘুম আসে খুব মৃদুভাবে। প্রথমে একটা নাচের ছন্দ শোনা যায়। মনে হয় যেন সুরলোকের নাচ-গানের আওয়াজ টের পাওয়া যাচ্ছে অবচেতনে। তারপর কোথা থেকে একটা নরম মখমলের চাদর উড়ে এসে ঢেকে দেয় শরীর। কেউ যেন কোমল আঙুল বুলিয়ে দেয় দু'চোখের পাতায়। ছোট ছোট স্বপ্ন ঝিলিক দেয়। তারপর বিছানা, খাট-ফাট সুদ্ধু সব কিছুই ভাসতে থাকে শূন্যে।

আহা, এই রকম দিনেও এত লোককে অফিসে, স্কুলে-কলেজে যেতে হয়। তারা কী দুঃখী! রাস্তায় গোড়ালি-ডোবা জলে ছপছপিয়ে যাও, তারপর বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকো। এরই মধ্যে কোনও গাড়ি বা ট্যাক্সি তোমার গায়ে কাদা ছিটিয়ে চলে যাবে। হঠাৎ মনে হবে, কোনও কাক এসে বুঝি মাথায় একটা ঠোক্কোর মারল, আসলে সেটা পাশের মানুষের ছাতার শিকের খোঁচা। বাইরে ফিনফিনে হাওয়া অথচ বাসের মধ্যে গরম আর ঘাম। অধিকাংশ অফিসেই জানলা দেখা যায় না, জানলা থাকলেও আকাশ দেখা যায় না, দিনেরবেলাতেও আলো জ্বলে। বেচারা চাকরিজীবীরা কী হতভাগ্য!

আমি বাল্যকালে কোনও পাপ করিনি। স্কুলে পড়ার সময় খামোকা ক্লাসের অন্য বন্ধুদের বঞ্চিত করে ফার্স্ট-সেকেন্ড হবার চেষ্টা করিনি কক্ষনও। কলেজে লেকচারাররা যখন শেলি-কীটসের কবিতা কাটা-ছেঁড়া করতেন, তখন দিব্যি আড্ডা মারতাম কফি হাউজে, অর্থনীতির কূটকচালি নিয়ে মাথা ঘামাইনি কোনও দিন, ইতিহাসের বই সামনে খুলে হাত মকসো করতাম প্রেমপত্র লেখায়। এই সব সুকৃতির ফলে চাকরির বাজারে আমার দাম কানাকড়ি, স্বেচ্ছায় দাসত্ব খোঁজার জন্য হন্যে হতে হয়নি আমাকে। আমি বেঁচে গেছি। শহরের রাস্তায় যখন মাইনে বাড়াবার মিছিল দেখি, আমার মজা লাগে। আমাকে ওই গড্ডলিকা প্রবাহে কোনও দিনও যোগ দিতে হবে না। আমার কিছু না-কিছু খুচরো পয়সা রোজ জুটে যায়, তাই-ই যথেষ্ট।

এমন চমৎকার, মোহময় একটা দিনে যারা চাকরি করছে করুক, আমি খিচুড়ি-ইলিশ মাছ দিয়ে আত্মাকে পরম সন্তুষ্ট করে, বিছানায় শুয়ে বৃষ্টি দেখতে দেখতে চলে গিয়েছিলাম ঘুমের দেশে।

আধ ঘণ্টাও ঘুমোইনি, এর মধ্যে মূর্তিমান উপদ্রবের মতো চন্দনদার আবির্ভাব। হাঁটু দিয়ে আমার পিঠে একটা গোঁত্তা মেরে জলদ-গম্ভীর স্বরে ধমক দিয়ে বলল, এই নীলু, ওঠ! ওঠ!

আমি চোখ মেলে প্রথমে চন্দনদাকে চিনতেই পারলাম না। এমনিতেই তার বেশ বড় সড় চেহারা, তার ওপরে আবার একটা খয়েরি রেইন কোট পরে আছে, মনে হয় যেন একটা দৈত্য।

আমি ভয় পাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করলাম, কে? কে?

চন্দনদা বলল, দুপুরবেলা ষাঁড়ের মতো ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছিস, তোর লজ্জা করে না? পুরুষ মানুষ কখনও দুপুরে ঘুমোয়?

দিবানিদ্রার ব্যাপারে নারী জাতিরই কেন একচেটিয়া অধিকার থাকবে, তা আমার বোধগম্য হয় না। কাঁচা ঘুম ভাঙলে মাথায় অনেক কিছু ঢোকেও না।

চন্দনদার গলার আওয়াজ ও ভাষা চিনতে পেরে আমি বললাম, খিচুড়ি খাবে? এখনও আছে অনেকটা!

চন্দনদা একটা চেয়ার টেনে বসে বলল, কী আবোল তাবোল বকছিস! আমি হঠাৎ এই অসময়ে খিচুড়ি খেতে যাব কেন?

দু'হাতে চোখ কচলে বাস্তব জগতে ফিরে এলাম।

চন্দনদাকে বেশ কয়েক মাস বাদে দেখলাম, ওঁদের বাড়িতেও আমি যাইনি অনেক দিন। এর আগে দু'একটা ঘটনার জন্য চন্দনদা আমার ওপর খানিকটা বিরূপ হয়েছিল। একবার মারবেও বলেছিল। কিন্তু সে-সব তো চুকেবুকে গেছে। এর মধ্যে আমি তো আর কোনও গণ্ডগোল করিনি, ওদের পারিবারিক ব্যাপারেও নাক গলাইনি, তাহলে হঠাৎ এই বৃষ্টির দিনের প্রাক-বিকেলে চন্দনদা আমাকে হাঁটুর গোঁত্তা লাগাতে এল কেন? অজান্তে কিছু দোষ করে ফেলেছি নাকি?

চন্দনদা গাল চুলকোতে চুলকোতে বলল, ছি ছি ছি, কোনও কাজকম্ম নেই, দুপুরে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিস। যুব শক্তির কী অপচয়! এই জন্যই তো দেশটা গোল্লায় যাচ্ছে। আর কিছু কাজ না থাকে তো রাস্তার গাছগুলোতে জল দিলেও তো পারিস। তাতে শহরটা সবুজ হবে!

এই বৃষ্টির মধ্যে রাস্তার গাছে পাগল ছাড়া কেউ জল দিতে যায়? গাছেরাই-বা কী ভাববে! চন্দনদাকে এ-কথা বলে লাভ নেই, যা মেজাজ দেখছি, আবার বকুনি খেতে হবে।

ভেতরের পকেট থেকে চন্দনদা একটা চুরুট বার করে ঠোঁটে গুঁজল, তারপর তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

আমি বললাম, দেশলাই দেব?

চোখ কটমট করে চন্দনদা বলল, আমার দেশলাই লাগে? উজবুক! জানিস না?

ও হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম। কয়েক বছর ধরে চন্দনদা ধূমপান ত্যাগ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সিগারেট বর্জন করেছে ঠিকই, কিন্তু মুখে একটা চুরুট না রাখলে চলে না। সন্ধের সময় সেটা ধরায়। প্রতি দিন একটা চুরুট খাওয়া চাই।

এবার রেইন কোটের পকেট থেকে বার করল একটা চৌকো প্যাকেট। দেখে মনে হয় মিষ্টির বাক্স। সেটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এই নে, ছোটপাহাড়ি থেকে তোদের জন্য সন্দেশ এনেছি।

এ আবার কী ব্যাপার! প্রথমে হাঁটুর গুঁতো, তারপর সন্দেশ? একেই বলে হট অ্যান্ড কোল্ড ট্রিটমেন্ট। চন্দনদার সব কিছুই অদ্ভুত।

প্যাকেটটা টেবিলের ওপর রাখতে যাচ্ছিলাম, চন্দনদা বলল, খুলে দেখলি না? খা একটা! এ-রকম সন্দেশ কলকাতায় পাবি না!

পরে খাব চন্দনদা।

না, এখনই খা। এত দূর থেকে আনলাম!

মুখে যার টাটকা ইলিশ মাছ ভাজার স্বাদ লেগে আছে, তাকে মিষ্টি খেতে বলা অত্যাচারের মতো নয়?

প্যাকেটের বাঁধন খুলে দেখা গেল তার মধ্যে চকোলেট রঙের দশ-বারোটা ছোট ছোট সন্দেশ রয়েছে। একটা তুলে মুখে দিতেই হল। পোড়া পোড়া ক্ষীরের স্বাদ। মন্দ না। আমি সন্দেশ-রসিক নই, তবু মনে হল, এটা অন্য ধরনের!

বললাম, চমৎকার! ছোটপাহাড়িতে এত ভাল মিষ্টি পাওয়া যায়!

তোর জন্য দু'রকম সন্দেশ এনেছি নীলু!

রক্ষে করো চন্দনদা, আমি আর খেতে পারব না। একটাই যথেষ্ট।

তোকে দুটো সন্দেশ খেতে বলিনি ইডিয়েট। বললাম না, দু'রকম। একটা হচ্ছে এই সন্দেশ মানে মিষ্টি। আর একটা সন্দেশ হচ্ছে খবর। খুবই সুখবর! তুই একটা চাকরি পেয়েছিস!

অ্যাঁ?

কথাটা কানে গেল না তোর? তুই একটা চাকরি পেয়েছি! চাকরি, চাকরি!

চাকরি?

অমন ভেটকি মাছের মতো তাকিয়ে রইলি কেন? অন্য যে-কোনও ছেলে এই খবর শুনে লাফিয়ে উঠত!

আমার এমন ক্ষতি করতে কে বলল তোমাকে চন্দনদা?

ক্ষতি? প্রিপস্টারাস! এমন অদ্ভুত কথা জীবনে শুনিনি! দেশে লক্ষ লক্ষ বেকার, কেউ কোনও চান্স পায় না, আর তোকে একটা প্লেটে করে সাজিয়ে...।

আমি তো বেকার নই। আমি কি অ্যাপ্লিকেশন করেছি কোথাও? যে চাকরি চায় অথচ পায় না, সে তো বেকার। আর যে চাকরি খোঁজেই না, চাকরির যার দরকার নেই, তাকে কি বেকার বলা যায়?

তুই বেকার নোস?

ডিক্‌শিনারি দেখো।

আমার সঙ্গে চ্যাংড়ামি হচ্ছে নীলু! ওঠ, জামা পর!

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। যারা ভাল ভাল চাকরি করে, কিংবা ব্যবসায় সার্থক, যারা কর্মবীর, তাদের কিছুতেই বোঝানো যায় না আমার যুক্তিটা। সবাইকেই কি চাকরি করতে হবে, কোনও না-কোনও কাজের জোয়াল ঘাড়ে নিতে হবে? তাহলে কদমতলায় বসে বাঁশি বাজাবে কে? কে ছবি আঁকবে? যাত্রাদলে নতুন ছেলে আসবে কী করে? এ-সবও যারা পারে না, স্রেফ বাউণ্ডুলেপনা করার জন্যও তো কিছু মানুষ দরকার। যে-জাতের মধ্যে বাউণ্ডুলে কিংবা ভবঘুরে নেই, সে-জাতের কখনও উন্নতি হতে পারে?

আমি হাত জোড় করে বললাম, আমাকে ছেড়ে দাও চন্দনদা। আমার এমন সর্বনাশ কোরো না।

চন্দনদা চোখ কপালে তুলে বলল, সর্বনাশ? দু'হাজার সাতশো টাকা মাইনে পাবি।

চুপ, চুপ, আস্তে। অত টাকার কথা মা শুনতে পেলে কান্নাকাটি করবে।

মাসিমাকে কষ্ট দিচ্ছিস। দাদার ঘাড়ে বসে খাচ্ছিস। তোর লজ্জা করে না? সবাই বলে, চেনাশুনো সকলেরই মোটামুটি হিল্লে হয়ে গেল, শুধু নীলুটাই গাছদামড়া হয়ে রইল। লাফাংগার মতো ঘুরে বেড়ায়, হ্যাংলার মতো লোকের বাড়িতে ঠিক খাওয়ার সময় গিয়ে হাজির হয়।

বাজে কথা। নেমন্তন্ন না করলে আমি কারুর বাড়িতে যাই না। এমনকী নেমন্তন্ন করলেও সব বাড়িতে যাই না।

তুই এক দিন ভরপেট খেঁয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েও লালুদার সঙ্গে টলি ক্লাবে গিয়ে গোগ্রাসে গিলিসনি?

সেটা অন্য কথা। লালুদা আমাকে জোর করে খাইয়েছে। লালুদা আমাকে দিয়ে একটা কাজ করাতে চাইছিল।

লালুদাই বলেছে, দরকার হলে তোকে ঘাড় ধরে চাকরির জায়গা নিতে হবে।

আমাকে ইন্টারভিউ দিতে হবে না?

তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

আমি এবার মুচকি হাসলাম। চন্দনদা গোঁয়ার লোক, কাকুতি-মিনতি করে ছাড়া পাওয়া যাবে না। ইন্টারভিউতে ফেল করা অতি সহজ। এমনকী যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়ে যাই... এর আগেও কেউ কেউ আমাকে দু'এক জায়গায় জোর করে কাজে ঢুকিয়েছে, সিঙ্গাপুর থেকে আমার এক মামা এসে তো উঠে পড়ে লেগেছিল। সব ক'টা চাকরি থেকেই আমি অবিলম্বে সগৌরবে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি। চাকরির মালিকদের আমাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত, আমিই একমাত্র, যে বরখাস্ত হলেও আন্দোলন করে না। নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরে আসে।

না-ধরানো চুরুটটা দু'বার টেনে চন্দনদা গলা নরম করে বলল, আচ্ছা নীলু, তুই কেন কাজ করতে চাস না বল তো? তোর ইচ্ছে করে না, নিজে রোজগার করবি, নিজের পায়ে দাঁড়াবি, লোকজনের মধ্যে মাথা উঁচু করে থাকবি?

মাথা উঁচু করেই তো আছি। তুমিই বলো, কার মাথা বেশি উঁচু, যে দান করে, না যে দান প্রত্যাখ্যান করে? এ-দেশে কত ভাল ভাল ছেলে মেয়ে রয়েছে পড়াশুনা শেষ করেও কোনও সুযোগ পায় না, তোমাদের মতো লোকেরা ভাবো, আহা বেচারারা...যুবশক্তির অপচয়...তাদের মধ্যে মাত্র কয়েক জনকে ডেকে, তোমরা ছিটেফোঁটা দায় বিলোও! যে-কোনও একটা চাকরি দিয়েই ভাবো তাদেব ধন্য করে দিলে! আমি সেই সব ছেলে-মেয়ের পক্ষ থেকে এক জ্বলন্ত প্রতিবাদ। আমি দয়া চাই না। আমি দয়া চাই না। সারা জীবন আমি এই ধ্বজা উড়িয়ে যাব।

তোমাকে সে-সুযোগ দেওয়া হবে না শয়তান। শুধু বাজে কথার ফুলঝুরি। আমরা সবাই খেটে খেটে মরব, আর তুই শুধু মজা করবি! ইয়ার্কি! কালকেই তোকে ছোটপাহাড়িতে যেতে হবে!

ছোটপাহাড়িতে কেন?

সেখানেই তো তোর কাজের ব্যবস্থা হয়েছে!

সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু বদলে গেল। অন্ধকার বাড়িতে পটাপট আলো জ্বলে ওঠার মতো খুশির ধাক্কা লাগল আমার সব ক'টা ইন্দ্রিয়তে। ছোটপাহাড়ি! সে যে অপূর্ব সুন্দর এক স্থান। সব দিকে গোল হয়ে ঘিরে আছে সবুজ মখমলে ঢাকা পাহাড়। মাঝখানটাতেও এত গাছপালা যে, তার ফাঁকে ফাঁকে কিছু বাড়ি-ঘর থাকলেও চোখে পড়ে না। মনে হয় এক সবুজের রাজ্য। দিনে দু'বার বাস যায়, তাছাড়া তেল-কালি-ধোঁয়ার কোনও উপদ্রব নেই। ছোটপাহাড়িতে একটা সরু পায়ে-চলা রাস্তার ধারে আমি যত বনতুলসীর ঝাড় দেখেছি, সে-রকম বুঝি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বিনা যত্নে, বিনা প্রয়োজনে এত অসংখ্য ফুল ফুটে আছে, এক-একটা ছোট ছোট ফুলের কত রকম রঙ! সেই সব ফুলের একটা স্নিগ্ধ টান আছে। ওই বনতুলসীর ঝাড়ের কাছে আবার যাবার জন্য আমি যে-কোনও মূল্য দিতে রাজি আছি।

ছোটপাহাড়িতে কী কাজ চন্দনদা?

সেই সব পরে বুঝিয়ে দেব। মোট কথা, তোকে যেতেই হবে।

যেতেই হবে, কী বলছ? ছোটপাহাড়িতে নিয়ে গিয়ে যদি তুমি আমাকে তোমার কোয়ার্টার ঝাঁট দিতে বলো, তোমার জন্য রান্না করে দিতে বলো, তোমার জুতো পালিশ করে দিতে বলো, সব রাজি আছি।

চন্দনদা এবার হকচকিয়ে গেল, আমার আকস্মিক মতি পরিবর্তনের কারণটা ধরতে পারল না। বুঝবে কী করে, চন্দনদা সেই বনতুলসীর জঙ্গলের দিকে বোধহয় কোনওদিন চেয়েও দেখেনি।

আমি তড়াক করে বিছানা থেকে নেমে বললাম, তুমি চা খাবে? এক্ষুনি চা আনছি। আর কী খাবে বলো, গরম গরম কচুরি? ডাব্‌ল ডিমের ওমলেট?

চন্দনদা বলল, এখন কিছু খাব না। বৃষ্টি অনেকটা কমেছে, চল তোকে বেরোতে হবে।

তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবি চাপিয়ে, টেবিলের ড্রয়ার থেকে আমার সঞ্চয় সাত টাকা আশি পয়সা পকেটে নিয়ে নেমে এলাম রাস্তায়। চন্দনদা কোম্পানির গাড়িতে এসেছে। চন্দনদাদের হেড অফিস কলকাতায়, মাঝে মাঝে চন্দনদাকে ছোটপাহাড়িতে গিয়েও থাকতে হয়।

খাঁকি পোশাক ও মাথায় টুপি পরা ড্রাইভার তাড়াতাড়ি চন্দনদাকে দেখে নেমে এসে গাড়ির দরজা খুলে দিল। আমি যখন চাকরি করব, তখন কি আমাকেও...। দু'হাজার সাতশো টাকার মাইনেতে কি গাড়ি দেয়?

চন্দনদাব বাড়ির সামনে একটা লাল রঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ লালুদা এসেছে, নীপা বউদির বয়ফ্রেন্ড। আজকাল চন্দনদাও লালুদাকে সহ্য করে নিয়েছে। লালুদার অবাধ যাওয়া-আসা আটকাবার কোনও উপায় নেই!

লালুদা ছাড়াও রয়েছে তপনদা। তপনদা কলকাতার বাড়িওয়ালাদের ঝামেলা সহ্য করতে না পেরে পাকাপাকি বম্বে চলে গিয়েছিল, কোনও কাজে আবার এসেছে বোধহয়। তিন জনে ভিসিআর-এ একটা ছবি দেখছিল নিবিষ্ট ভাবে, চন্দনদা ঘরে ঢুকেই বলল, এখন ও-সব বন্ধ করো।

লালুদা বলল, আর একটু দেখে নি, মেয়েটার ডেড বডি খুঁজে পাওয়া গেল কি না।

চন্দনদা বলল, এই জন্যই আমি বসবার ঘরে টিভি রাখা পছন্দ করি না। ইচ্ছে মতো কথা বলার উপায় নেই।

নীপা বউদি ভিসিআর অফ করে দিয়ে হাসি মুখে বলল, তুমি সিনেমা দেখতে ভালবাসো না বলে কি আর কেউ দেখতে পারবে না?

রান্না ঘরে টিভি লাগাও, ভিসিআর লাগাও, যত ইচ্ছে দেখো।

দেয়ালে গোপাল ঘোষের আঁকা একটা প্রকৃতি-দৃশ্যের ছবি। চন্দনদা ছবি ভালবাসে, প্রায়ই এ বাড়ির দেয়ালের ছবি বদলে যায়। ছবিটার কাছে গিয়ে চন্দনদা বলল, এঃ, ছবিটা বেঁকে রয়েছে। সেটুকুও তোমরা লক্ষ্য করো না?

নীপাবউদি বলল, জানলার পাশে কেউ ছবি রাখে? এ-দিকের দেয়ালটা আবার তোমার পছন্দ নয়।

নীপাবউদি আর চন্দনদার ঝগড়া বিখ্যাত। যে-কোনও ছুতোয় একবার শুরু হলে কখন যে থামবে তার ঠিক নেই। ওরা অবশ্য বলে, এটা ঝগড়া নয়, মতভেদ, তর্ক-বিতর্ক। কিন্তু সেই তর্ক-বিতর্কে আমাদের কান ঝালাপালা হয়ে যায়।

তপনদা আমার দিকে ভুরু নাচিয়ে বলল, কী রে নীলু, ধরা পড়ে গেলি শেষ পর্যন্ত?

এ বাড়িতে মুমু আমার একমাত্র বন্ধু। তার সাড়াশব্দ নেই। আমি নীপাবউদিকে জিজ্ঞেস করলাম, মুমু কোথায়?

নীপাবউদি বলল, সাঁতারের ক্লাসে গেছে। আজকাল খুব সাঁতারের ঝোঁক হয়েছে।

আমি চমৎকৃত হলাম। গানের ক্লাস, নাচের ক্লাস, ছবি আঁকার ক্লাস এ-সব শুনেছি। সাঁতারেরও ক্লাস? তা-ও এ-রকম বৃষ্টির দিনে। কোনও ঘরের মধ্যে হয় বোধহয়।

লালুদা আমার দিকে তাকিয়ে কান-এঁটো-করা হাসি দিয়ে বলল, আমরা সবাই তোমার জন্য খুব চিন্তিত ছিলাম নীলাদ্রি। আমাদের চেনাশুনো সকলেই কোনও না-কোনও কাজ করে, শুধু তুমিই

বেকার বসেছিলে। চন্দন তোমার জন্য একটা কাজ জোগাড় করে এনেছে, এটা খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু —।

লালুদা একটু থামতেই চন্দনদা ধমক দিয়ে বলল, এর মধ্যে আবার কিন্তু কী আছে?

লালুদা আমার দিকে আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে বলল, নীলকান্তর এত বড় বড় চুল মাথায়, এইভাবে কি চাকরিতে জয়েন করা চলে?

নীপাবউদি বলল, সত্যি, তুমি ক' মাস চুল কাটোনি!

লালুদা বলল, আহা বেকার ছেলে, পয়সা পাবে কোথায়? আমি সেলুনে নিয়ে গিয়ে ওর চুল কাটিয়ে আনছি!

চন্দনদা বলল, কোনও দরকার নেই। বড় চুল আছে তো কী হয়েছে!

লালুদা বলল, বড় চুল থাকলে ক্ষতি নেই বলছ? থাক তবে। কিন্তু —।

আবার কিন্তু?

আমি যত দিন দেখছি, নীলমণি শুধু পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে থাকে। ওর কি প্যান্ট-শার্ট আছে?

তপনদা মুচকি হেসে বলল, ভারতীয় সংবিধানে কোথাও লেখা আছে কি যে, পাজামা-পাঞ্জাবি পরে চাকরি করা যাবে না?

লালুদা বলল, সব কিছুর একটা ডেকোরাম আছে তো! বাড়িতে পাজামা পরা যায়, বেকার অবস্থায় বাইরে ঘোরাঘুরিও করলে ক্ষতি নেই, রাস্তায় ঘাটে পাঞ্জাবি-পাজামা পরা ছেলে-ছোকরা দেখলেই বুঝতে পারি বেকার। কিন্তু চাকরির জায়গায় ফিটফাট হয়ে না গেলে লোকে মানবে কেন?

চন্দনদা বলল, হ্যাঁ, প্যান্ট-শার্ট হলে ভাল হয়। কী রে, তোর প্যান্ট-শার্ট নেই?

লালুদা তাড়াতাড়ি বলল, আমি কিনে দেব। এক জোড়া করে প্যান্ট-শার্ট, শু-মোজা-টাই...এখনও নিউ মার্কেট খোলা আছে, চলো নীলরতন।

আমাকে নিয়ে একটা গিনিপিগের মতো যেন কাটাছেঁড়া চলছে। এবার মুখ খুলতেই হল। ভুরু তুলে বললাম, টাই-ও পরতে হবে? দু' হাজার সাতশো টাকা মাইনে তো আজকাল ব্যাঙ্কের বেয়ারা-দারোয়ানরাও পায়। তাই না নীপাবউদি? তারা কি টাই পরে?

চন্দনদা বলল, ওরে বাবা! এই যে সবাই বলে নীলু নাকি চাকরি করাটাই পছন্দ করে না। এখন দেখছি মাইনে নিয়ে দরাদরি শুরু করেছে!

আমি বললাম, দরাদরি না। ওই যে লালুদা বলল, ডেকোরামের কথা! সব অফিসেই দেখেছি বড়-সাহেব, মেজো-সাহেবরা টাই পরে। যদি খুদে কেরানি আর বেয়ারারাও টাই পরতে শুরু করে, তাহলে ওই সব সাহেবরা চটে যাবে না?

চন্দনদা বলল, টাই দরকার নেই। প্যান্ট-শার্ট হলেই চলবে!

লালুদা বলল, তাহলে চলো নীলকণ্ঠ, ওগুলো কিনে ফেলা যাক।

আমি বললাম, প্যান্ট-শার্ট আমার আছে।

জুতো-মোজা?

চটি আছে।

না না, ট্রাউজার্সের সঙ্গে চটি একেবারেই চলবে না। শু, ভাল শু।

সমস্ত পৃথিবীটা আপনার টলি ক্লাব নয় লালুদা, যে প্যান্টের সঙ্গে শু পরতেই হবে। তাছাড়া আপনি আমার নামটাই মনে রাখতে পারেন না, আপনি আমার জামা-কাপড় কিনে দেবেন কোন অধিকারে?

তোমার নাম মনে রাখতে পারি না? তোমার ওই যে কী বলে, কী বলে, নীলধ্বজ নয়!

নীপাবউদি বলল, ওর নাম নীললোহিত! শুধু নীলু বলেই তো ডাকতে পারেন।

লালুদা বলল, বড্ড খটোমটো নাম! নীললোহিত! এ নামের মানে কী?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, লালু মানে কী?

এই সময় দরজা ঠেলে একটা ঝড়ের মতো ঢুকল মুমু। এক হাতে দোলাচ্ছে একটা এয়ারলাইনসের ব্যাগ, অন্য হাতে আইসক্রিমের কোন। মাত্র কয়েক মাস দেখিনি, তার মধ্যে যেন অনেকটা বড় হয়ে গেছে মুমু। ওর যে মাত্র তেরো বছর বয়েস, তা মনেই হয় না। একটা আগুনরঙের ফ্রক পরা, মাথার চুল ভিজে হিলবিলে হয়ে আছে।

অন্য কারুর দিকে নজর না দিয়ে সোজা চলে এল আমার কাছে। চোখ পাকিয়ে বলল, অ্যাই ব্লু, অ্যাতো দিন আসোনি কেন? কোথায় ডুব মেরেছিলে?

আমি বললাম, জনতার মধ্যে নির্বাসনে!

মুমু বলল, তার মানে?

আমি বললাম, স্কুলে বাংলার মিসকে জিজ্ঞেস করে মানেটা জেনে নিও।

মুমু খপ করে আমার কান ধরে মুলে দিয়ে বলল, ইয়ার্কি হচ্ছে! পাজি। আনরিলায়েব্‌ল লায়ার!

নীপাবউদি হা-হা করে বলে উঠল, কী হচ্ছে মুমু! নীলু তোর চেয়ে কত বড়, তোর কাকা হয়, তার কান ধরছিস যে!

মুমু বলল, তুমি জানো না মা, আমাকে এ লিট্‌ল প্রিন্স-এর গল্পটা অর্ধেক বলে তারপর বলল, তোকে বইটা দিয়ে যাব, নিজে পড়িস, কালকেই দিয়ে যাব। তারপর থেকে হাওয়া! আর এ-দিকে আসার নাম নেই। মিথ্যুক একটা!

লালুদা বলল, আহা, বেকার ছেলে, বই কেনার পয়সা কোথায় পাবে! কী বই, নামটা লিখে দিস, আমি এনে দেব।

চন্দনদা মুমুকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, জানিস মুমু, তোর নীলুকাকা এবার খুব জব্দ হবে। ওকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। প্রথম চাকরি পাওয়ার কথাটা শুনে এমন ভাব করল, যেন ওকে হাতে-পায়ে শেকল বেঁধে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোথাও!

আমি মুমুর দিকে ভুরুর ইঙ্গিত করে বললাম, মুমু, আমি ছোটপাহাড়ি যাচ্ছি। সেই ছোটপাহাড়ি, তোর মনে আছে?

মুমু খিল খিল করে হেসে উঠল।

আজ তপনদা বিশেষ কোনও কথা বলেনি। মুড নেই। অন্য সময় তপনদা কথা শুরু করলে অন্য কেউ পাত্তা পায় না। আজ মৃদু মৃদু হেসে সব শুনে যাচ্ছে। এবার উঠে দাঁড়িয়ে আমার মাথায় দুটো চাঁটি মেরে গেয়ে উঠল, জয়যাত্রায় যাও গো... এক মাসের বেশি টিকে থেকো গো।

॥ ২॥

উন্নতি শব্দটার অনেক রকম মানে হতে পারে। এক জন স্কুল মাস্টারকে যদি থানার দারোগা করে দেওয়া হয় কিংবা এক জন সন্ন্যাসীকে ধরে এনে যদি বসিয়ে দেওয়া হয় রাইটার্স বিল্ডিংসের কোনও বড়বাবুর চেয়ারে, কিংবা একটা ফুলের বাগানে যদি তৈরি হয় দশতলা বাড়ি, এ-সবও উন্নতি নিশ্চয়ই, আবার ঠোঁট বেঁকাতেও হয়। একটা নিরিবিলি জংলা মতো জায়গা, দু'চারখানা মাত্র বাড়ি আর সরু পায়ে চলা পথ ছাড়া আর কিছুই নেই, আছে শুধু শান্তি ও সৌন্দর্য। সেই জায়গাটায় যদি শুরু হয়ে যায়

এক কর্মকাণ্ড, জঙ্গল সাফ করে তৈরি হয় কারখানা, হাসপাতাল, হোটেল, অফিসবাড়ি, তাহলে সেটাও খুব উন্নতির ব্যাপার, কত লোক চাকরি পাবে, কত মানুষের আশ্রয় জুটবে। খুবই আনন্দের কথা। তবু আগেকার জন্য দীর্ঘশ্বাসও থেকে যায়।

ছোটপাহাড়ি এখন বড় হতে চলেছে। কাছাকাছি এক জায়গায় পাওয়া গেছে লৌহ ধাতুপিণ্ড, তাই ছুটে আসছে ইস্পাত-বিশেষজ্ঞরা। এখানে এখন শহর হবে। বোধহয় এখন যেটা টাটানগর, সেটাও এক সময় ছোটপাহাড়ির মতোই ছিল। চন্দনদাদের কোম্পানিই এখানে অনেকগুলো ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট শুরু করে দিয়েছে, দারুণ উদ্যমে দ্রুত তৈরি হচ্ছে বড় বড় বাড়িঘর। সেই রকমই একটা নির্মীয়মাণ কারখানায় মিস্তিরি-মজুরদের কাজেব ওপর নজরদাবির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমাকে। অর্থাৎ কুলির সর্দার। কাজটা আমার বেশ পছন্দের।

ছোটপাহাড়ি জায়গাটা বাংলা আর বিহারের সীমানায়। একটা ছোট্ট নদীর এ-পাব আর ও-পার। এখানকার লোকরা হিন্দি-বাংলা দুটোই জানে। হিন্দি বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে নিখুঁত বাংলা বলে। সাঁওতালরাও নিজেদের মধ্যে কথা বলে নিজেদের ভাষায়, আবার বাংলা যখন বলে, তাতেও যথেষ্ট সাবলীল। সুতরাং এখানে ভাষার ব্যাপারে আমার কোনও অসুবিধে নেই।

পাহাড়গুলোর পায়ের কাছে যে বিস্তীর্ণ বনতুলসীর ঝোপ, সে-দিকে এখনও হাত পড়েনি নগর-নির্মাতাদের। আমি প্রতি দিন একবার সেখানে গিয়ে কিছুক্ষণ ঘুরি, বুক ভরে ঘ্রাণ নিই, চোখ ভরে ছবিটা রেখে দিই। ঠিক করে রেখেছি, বনতুলসীর ঝাড় কাটার কথা উঠলেই আমি এখান থেকে সরে পড়ব। ওদের প্রতি আমি অকৃতজ্ঞ হতে পারব না।

প্রথম দিন এসেই চন্দনদা বলেছিল, তুই আমার কোয়ার্টারে থাকতে পারিস নীলু, আবার নিজস্ব থাকার জায়গাও পেতে পারিস। আমার কোয়ার্টার যথেষ্ট বড়, তুই থাকলে কোনও অসুবিধে নেই, তবে স্বাবলম্বী হতে চাস যদি তাহলে আলাদা ব্যবস্থাও হতে পারে। তুই তো আবার দয়া-টয়া চাস না। প্রথম কয়েকটা দিন আমার এখানে খেয়ে নিবি, তারপর নিজেই রান্না-বান্নার ব্যবস্থা করবি।

বলাই বাহুল্য, সর্বক্ষণ চন্দনদার অভিভাবকত্বের তলায় থাকার চেয়ে আমার আলাদা থাকাই পছন্দ। আমার জন্য কোনও কোয়ার্টার এখনও তৈরি হয়নি, তবে বড় যে-গেস্ট হাউসটি আছে, তার একটি ঘর বরাদ্দ হল। এই গেস্ট হাউসটি যখন সবে মাত্র তৈরি হচ্ছিল, এক তলার একখানা বড় ঘর ছিল বাসযোগ্য, তখন আমি মুমুকে নিয়ে এসেছিলাম এখানে। রাত্তিরবেলা ঘরের মধ্যে সাপ ঢুকে পড়েছিল, সে কী কাণ্ড! সে-দিন দারুণ ভয় পেয়েছিলাম, আজ ভাবতে মজা লাগে।

তখন হরিলাল নামে যে চৌকিদারটি ছিল, সে এখনও আছে। আগের মতোই সে সন্ধের পর মহুয়ার নেশা করে বোম হয়ে থাকে, অতি সরল ও নির্মল মানুষ। আমাকে দেখেই যে সে চিনতে পারল, তাতে আমি একেবারে অভিভূত। আমার মতো এক জন সামান্য মানুষকে সে দু'বছর আগে মাত্র এক দিন থেকেই মনে রেখেছে।

আমার ঘরটা দো-তলার এক কোণে। এই বাড়িটার খুব কাছেই একটা পাহাড়, মনে হয় যেন হাত বাড়ালেই ছোঁওয়া যাবে। মাঝখানে অবশ্য একটা জঙ্গলও আছে। রাত্তিরে সেখানে শেয়াল ডাকে। শিগগিরই এই জঙ্গলটা কাটা হবে, তখন শেয়ালগুলো যাবে কোথায়?

এখানে খাবার ব্যবস্থা হয়নি এখনও। দু'তলায় রয়েছে দুটো রান্নাঘর, ব্যবহার করতে পারে অতিথিরা, কিংবা বাইরে হোটেলেও খেয়ে আসতে পারে। অতিথি প্রায় থাকেই না। সারা বাড়িটাই আমার এখন একার বলা যায়। সকালবেলায় চা, ডিম-টোস্ট কিংবা পুরি-ভুজি হরিলালই বানিয়ে দেয় আমার জন্য। চন্দনদা এক হাজার টাকা অ্যাডভান্সের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, এখন আমি ইচ্ছে করলে প্রত্যেক

দিন ডাবল ডিমের ওমলেট খেতে পারি। এখন আমি বড়লোক, সব সময় পকেটে খচমচ করে টাকা। এত টাকা নিয়ে মানুষ কী করে? ছোটপাহাড়িতে টাকা খরচ করার কোনও রাস্তাই নেই। না আছে সিনেমা থিয়েটার, না আছে ভাল রেস্তোরাঁ কিংবা ডিস্কো নাচের ব্যবস্থা।

আমাদের জন্য কিছু নেই, কিন্তু মজুর-কামিনদের জন্য অনেক কিছুই আছে। মহুয়ার দোকান, চুল্লুর ঠেক, জুয়ার আড্ডা। ওদের পয়সা খলখলিয়ে চলে যায়। রাত্তিরবেলা ওরা নাচে, গায়, ফূর্তি করে, আর সন্ধের পর থেকে আমাদের কিছুই করার থাকে না। সময় কাটাবার জন্যই আমি রাত্তিরে নিজে রান্না শুরু করেছি, দিনেরবেলা হোটেলে খেয়ে নিই।

সকাল ন'টা থেকে ছ'টা পর্যন্ত আমার আপিস। একটা সুবিধে এই যে, গেস্ট হাউসে দুটো বারোয়ারি সাইকেল আছে। এখানে তো আর ট্যাক্সি-বাস-রিক্সা পাওয়া যাবে না, অফিসারদের নিজস্ব গাড়ি বা জিপ আছে, আমার মতো ক্লাস থ্রি স্টাফদের সাইকেলই সম্বল। আমার কাজের জায়গাটা প্রায় দেড় মাইল দূরে, তৈরি হচ্ছে একটা লম্বাটে দো-তলা বাড়ি, সেটা হবে লেবরেটারি। গাঁথনি ও ছাদ ঢালাই হয়ে গেছে, এখন চলছে ভেতরের কাজ। এই সময়েই নাকি মিস্তিরি মজুরেরা কাজে ঢিলে দেয়, খুচখাচ করে সারা দিনে কী যে করে বোঝা যায় না।

সাইকেল চালিয়ে ঠিক ন'টার সময় আমি সেখানে হাজির হই। কাজটা খুব সোজা। প্রথমে একটা লম্বা খাতা দেখে মিস্তিরি-জোগাড়ে-কামিনদের নাম হাঁকি। ব্যাস, তারপর আর করার কিছু নেই, শুধু কয়েক বার এক তলা দো-তলায় চক্কর মারা ছাড়া। চন্দনদার স্পষ্ট নির্দেশ আছে, কুলি-মজুরদের কোনওক্রমেই বকাবকি করা চলবে না। বকলে ওদের মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে, তখন নানা উপায়ে তারা ফাঁকি মারার ফিকির খুঁজবে। বরং তাদের সঙ্গে গল্পগুজব করলে তাদের মন ভাল থাকে, কাজে বেশি উৎসাহ পায়। ঠিক সাড়ে বারোটায় বাজিয়ে দিতে হবে ঘণ্টা, এরপর থেকে দু'ঘণ্টা টিফিনের ছুটি।

এই দু'ঘণ্টা ছুটির ব্যাপারটায় মিস্তিরি-মজুরেরা নিজেরাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। পুরো দিনের মজুরি পেয়েও দু'ঘণ্টা ছুটি। এ-রকম তারা আগে কখন দেখেনি। কিন্তু চন্দনদার থিয়োরি হচ্ছে, অফিসের কেরানিবাবুরা যদি টিফিনের নামে দু'ঘণ্টা ঘুরে বেড়াতে পারে, তাহলে মিস্তিরি-মজুররা, যারা শারীরিক পরিশ্রম করে, তাদের টিফিনের ছুটির প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। একটানা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করলে কাজের গুণ নষ্ট হয়ে যায়। দু'ঘণ্টা টিফিনের মধ্যে আধ ঘণ্টা ওরা খাবার-দাবার খেয়ে নেবে, বাকি দেড় ঘণ্টা ঘুমোবে কিংবা গড়াবে। তারপর আবার ছ'টা পর্যন্ত কাজ।

এখন কাজ করছে সেই আঠারো জন নারী-পুরুষ। এরা আমাকে ছোটবাবু বলে ডাকতে শুরু করেছে। আমি ছোটপাহাড়ির ছোটবাবু। একমাত্র হেড মিস্তিরি ইরফান আলি গম্ভীর ধরনের মানুষ, যে আমাকে বাবু বলে না। তার হাতে একটা দামি ঘড়ি। আমি ঘড়িই পরি না, সেই জন্য সে নিজেকে আমার তুলনায় উচ্চশ্রেণির মানুষ মনে করে।

ছুটির পর আমি সাইকেল চালিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে যাই। এক-এক দিন ভোরবেলাতেও চলে আসি। ছোট্ট নদীটা পাথরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, ছলোচ্ছল শব্দ করে। আমি জলে পা ডুবিয়ে বসি। এই সময় নিজেকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাতি বলে মনে হয়। জলের ওপর ঝুঁকে পড়া গাছপালা আর নদীর সঙ্গে অনায়াসে কথা বলতে পারি।

আমার চাকরির এই সময়টাই সব চেয়ে উপভোগ্য। দূরগ্রামের আদিবাসীরা এ-দিক দিয়ে যাবার সময় এক ঝলক তাকায়, আমার প্রতি তারা কোনও কৌতূহল প্রকাশ করে না।

এখান থেকে কলকাতায় যেতে খানিকটা বাসে আর বাকিটা ট্রেনে, সাড়ে ছ'ঘণ্টার বেশি লাগে না। তবু মনে হয় যেন কলকাতা কয়েক লক্ষ মাইল দূরে। এখানে এখনও যান্ত্রিক শব্দের তেমন উৎপাত নেই, আর সন্ধের পর যে-নিস্তব্ধতা তা যেন সভ্যতার আগেকার কালের।

আমি কলকাতাকে খুবই ভালবাসি, কিন্তু একটানা বেশি দিন থাকতে পারি না। মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ না হলে প্রেম জমে না।

কলকাতায় থাকার সময় পাহাড়-নদী-জঙ্গলের জন্য মনটা হু-হু করে। আবার অনেক দিন কোনও নিরালা-নিরিবিলি জায়গায় কাটাবার পর আবার কলকাতা মন টানে। এক সঙ্গে দু'টি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা খুব বিপজ্জনক, কিন্তু প্রকৃতি ও নগরী, এই দু'জনের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে প্রেম চালিয়ে যাওয়া সত্যিকারের আনন্দের।

রাত্তিরবেলা দূর থেকে শোনা যায় মাদলের ধ্বনি। কোনও আদিবাসী গ্রামে উৎসব চলে। আমাদের কামিন-মজুররা সবাই স্থানীয়, অনেকে প্রত্যেক দিন নিজেদের গ্রামে ফিরে যায়, আবার অনেকে এখানেই ঝুপড়ি বানিয়েছে, সেখানেও তারা নাচ-গান করে প্রায়ই।

এক দিন রাত আটটার সময় চন্দনদার বাংলোর পাশ দিয়ে ফিরছি, দেখলাম অনেক আলো জ্বলছে, কয়েক জন লোকের গলার আওয়াজ, বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিন-চারটে গাড়ি। পার্টি চলছে, আমার নেমন্তন্ন হয়নি।

চন্দনদা প্রথম দিনই আমাকে আলাদা থাকার ইঙ্গিত কেন দিয়েছিলেন, তা এর মধ্যেই বুঝে গেছি। আমার স্বাধীনতার জন্য নয়, নিজের পদমর্যাদার কারণে। চন্দনদা ক্লাস ওয়ান অফিসার, এখানকার বড় সাহেব, তাঁর বাড়িতে আমার মতো এক জন ক্লাস থ্রি স্টাফের থাকাটা মানায় না। চন্দনদার বাড়িতে তাঁর কাছাকাছি তুল্য অফিসার এবং বড় বড় কন্ট্রাকটররা প্রায়ই আসবে, সেখানে আমার মতো এক জনকে ঘুর ঘুর করতে দেখলে তারা অবাক হবে, চন্দনদাও আমার পরিচয় দিতে লজ্জা পাবে। চাকরি না করে আমি যদি বেকার হতাম, তাহলে কোনও অসুবিধে ছিল না, চন্দনদা অনায়াসে বলতে পারত, এ আমার এক জন ভাই, ক' দিনের জন্য বেড়াতে এসেছে। কিন্তু ক্লাস থ্রি স্টাফ কখনও ক্লাস ওয়ান অফিসারের ভাই হতে পারে না।

আমার ঠিক ওপরের বস চন্দনদা নয়, মহিম সরকার। তিনি কনস্ট্রাকশান ইঞ্জিনিয়ার। আরও দুটো বড় বড় বাড়ি তৈরি হচ্ছে, মহিমবাবু সেখানেই ব্যস্ত থাকেন, আমার জায়গাটায় বিশেষ আসেন না। হঠাৎ কখনও একটা চক্কর দিয়ে যান। আমাকে তিনি এ বাড়িটার একটা নীল নক্সা গছিয়ে দিয়েছেন, লিনটেন, প্যারাপেট, প্লামবিং, ফ্লোর পালিশ এই সব বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, তা আমার মাথায় ঢোকেনি। বোঝার দরকারটাই-বা কী, ও-সব তো মহিমবাবুর কাজ। আমার ওপর দায়িত্ব মজুররা কাজের সময় ফাঁকি মারছে কি না সেটা দেখা, কী কাজ করবে তা ওরাই জানে।

চন্দনদা আমাকে নেমন্তন্ন করে না বটে, কিন্তু নিজে এক-এক দিন সন্ধেবেলা আমার গেস্ট হাউসে এসে হাজির হয়। রান্নাঘরে উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করে, কী করছিস রে, নীলু?

আমার মুখে চন্দনের ফোঁটার মতো ঘাম, গেঞ্জিটাও ভিজে গেছে। পাকা রাঁধুনির মতো গরম কড়াইতে তেল ঢেলে বললাম এই তো ডিমের ঝোল রাঁধছি। এরপর ভাত চড়াব।

চন্দনদা বলল, ডিমের ঝোল, বাঃ, বেশ ভাল জিনিস। ক'টা ডিম নিয়েছিস?

দুটো। তুমি একটা চেখে দেখবে নাকি?

কাল কী রেঁধেছিলি?

ডিম সেদ্ধ আর ডাল।

পরশু?

ডাল আর ডিমভাজা।

রোজ রোজ ডিম খাচ্ছিস, তোর পেট গরম হয়ে যাবে যে! এখানে মুরগি বেশ শস্তা, একেবারে ফ্রেস দিশি মুরগি, তুই মুরগিব ঝোল রাঁধতে জানিস না?

রাঁধতে বেশ ভালই পারি চন্দনদা, কিন্তু একটা গোটা মুরগি রাঁধলে খাবে কে? যত ছোটই হোক, পুরো একটা মুরগি খাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে ফ্রিজও নেই যে রেখে দেব।

বলিস কী, তোর সাতাশ বছর বয়স, একটা আস্ত মুরগি খেতে পারবি না! আমরা তো ওই বয়েসে দু' তিনটে মুরগি উড়িয়ে দিতে পারতাম।

তোমাদের ছেলেবেলায় নানা রকম অসম্ভব কাজ করতে পারতে, তা জানি। কিন্তু আমার পক্ষে দু-তিন পিসই যথেষ্ট। বাজারে তো কাটা-পোনার মতো কয়েক পিস মুরগির মাংস কিনতে পাওয়া যায় না।

তার মানে, যারা একা থাকে, তারা মুরগির মাংস রান্না করে খেতে পারবে না? যারা বিবাহিত, কাচ্চা-বাচ্চাওয়ালা সংসারী লোক, তারাই শুধু মুরগি খাবে? এ তো ভারি অন্যায়, অবিচার। তাহলে তুই কী করবি, একটা বিয়ে করে ফেলবি নাকি?

বিয়ে করার চেয়ে ডিমের ঝোল খাওয়া অনেক সহজ নয়?

সেটা অবশ্য মন্দ বলিসনি! তাহলে?

চন্দনদা যেন এক গভীর সমস্যা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল। আমি ডিমের ঝোল রেঁধে বেশি করে ভাত চাপালাম। আমার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পা দোলাতে দোলাতে চন্দনদা ঘুমিয়েই পড়ল এক সময়।

ডাইনিং রুমে দুটো প্লেট সাজিয়ে আমি ডেকে তুললাম চন্দনদাকে।

ঝোল দিয়ে ভাত মেখে এক গেরাস খেয়ে চন্দনদা বলল, তুই তো বেশ ভালই রান্না শিখেছিস নীলু। নীপার চেয়ে অনেক ভাল।

অর্ধেকটা খাবার পর হঠাৎ থেমে গিয়ে, আর্কিমিডিসের আবিষ্কারের ভঙ্গিতে চন্দনদা বলে উঠল, যাঃ, আর একটা উপায়ের কথা আমার এতক্ষণ মনেই পড়েনি। আমিই তো একটা মুরগি নিয়ে এলে পারি। তুই সেটা রান্না করবি। দু'জনে মিলে একটা মুরগি শেষ করতে তো অসুবিধে নেই। তুই ওয়ান ফোর্থ, আমি না হয় থ্রি ফোর্থ খাব! তুই দিনের পর দিন মুরগি না খেয়ে থাকবি, তা তো ঠিক নয়।

তোমাকে আনতে হবে না, আমিই তোমাকে এক দিন মুরগি রেঁধে খাওয়াব!

কেন, আমাকে আনতে হবে না কেন? তুই ক'পয়সা মাইনে পাস যে আমাকে খাওয়াবি? প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই অর্ধেকটা পাঠিয়ে দিবি মাসিমাকে। হরিলাল, হরিলাল!

ও কী, হরিলালকে ডাকছ কেন।

ওকে দিয়ে মুরগি আনাব।

এখন? আমাদের তো খাওয়া হয়ে গেল!

ধুৎ! মাছ-মাংস না থাকলে কি পুরো খাওয়া হয়? ডিম-টিমগুলো মনে হয় জলখাবার!

রক্ষে করো চন্দনদা। ভাত খাওয়া হয়ে গেছে, এখন আমি মুরগি রান্না করতেও পারব না, খেতেও পারব না। আর এক দিন হবে।

তোরা এত কম খাস বলে তোদের মনের জোরও কম। তাহলে কালই...ও হ্যাঁ, ভাল কথা, আর একটা খবর তোকে দেওয়া হয়নি। মুমু-নীপারা সবাই এখানে বেড়াতে আসতে চাইছে। এখন এত কাজের সময়।

কবে আসবে?

চব্বিশ তারিখ থেকে মুমুর কয়েক দিন ছুটি আছে। ওই লালুটাও বোধহয় আসবে ওদের সঙ্গে।

লালুদা আসবেই।

কেন, আসবেই কেন?

লালুদা এখানে এসে তোমার, আমার, নীপাবউদির নানা রকম উপকার করার সুযোগ ছাড়বে না। পরোপকার করা যে ওর নেশা!

ও পুরুষদের জন্য কিছু করে না। শুধু মেয়েদের।

আমার জন্য যে জামা-জুতো কিনে দিতে চাইছিল?

নীপা সামনে ছিল বলে। নীপাকে ওর টাকার গরম দেখাতে চাইছিল। যাই হোক, লালুটা যদি এসে পড়ে, ওকে আমার বাংলোতে রাখব না। এ গেস্ট হাউসে ব্যবস্থা করে দেব। তুই যেন তখন লালুকে রেঁধে খাওয়াতে যাসনি!

সে-প্রশ্নই ওঠে না। নীপাবউদি এলে আমি জোর করে প্রত্যেক দিন তোমার বাড়িতে খেতে যাব। তুমি না ডাকলেও যাব।

এই সময় দূরে দ্রিদিম দ্রিদিম করে মাদল বেজে উঠল।

খাওয়া থামিয়ে চুপ করে গেল চন্দনদা।

একটু বাদে বলল, এই আওয়াজটা শুনলে মনটা কেমন যেন হয়ে যায়। ছোটবেলায় আমরা দুমকায় থাকতাম, সেই সময়কার কথা মনে পড়ে।

আমি বললাম, যত রাত পর্যন্ত শোনা যায়, আমি জেগে থাকি!

চন্দনদা বলল, আমি যা কাজ করি, আমার পক্ষে রাত্তিরবেলা ওদের গান-বাজনার আসরে গিয়ে বসাটা আমার ঠিক মানায় না। তুই তো গেলেই পারিস, সন্ধেবেলা একা একা থাকিস!

এই কথাটা আমারও মনে হয়েছে। এক দিন অন্ধকারে ওই বাজনা লক্ষ্য কবে যেতে হবে।

আমার আন্ডারে যে আঠারো জন কাজ করে তাদের মধ্যে রাজমিস্তিরিরা মুসলমান, জলের পাইপ বসাবার কাজ যারা করে তারা ওড়িশার হিন্দু আর জোগাড়েরা সাঁওতাল। এরা এক সঙ্গে কাজ করে বটে, কিন্তু টিফিনের সময় আলাদা আলাদা বসে। তিনটে দলের তিন রকম খাবার। ঘুমোয় খানিকটা দূরত্ব রেখে।

এদের কারুর সঙ্গে আমার এখন তেমন ভাব হয়নি। ভাব জমাতে আমার দেরি লাগে। ওদের পাশ দিয়ে মাঝে মাঝে ঘুরে যাই, দুটো একটা কথা বলি, ওরাও দু-একটা উত্তর দেয়। রাজমিস্তিবি ও কলের মিস্তিরিরা এই ছোটপাহাড়িতেই ঝুপড়ি করে আছে, সাঁওতালরা নিজেদের গ্রামে ফিরে যায়। ওদের এক জনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমবা কোন গ্রামে থাকো? সে হাত তুলে দিগন্তের দিকে দেখিয়ে বলেছিল, সিই-ই খানে!

হয়তো ওদেরই গ্রামে মাদল বাজে। এখানে ওরা চুপচাপ কাজ করে যায় সারা দিন, সন্ধের পর গ্রামে যখন নাচ-গান করে, তখন ওদের চেহারা নিশ্চয়ই বদলে যায়।

সাঁওতালদের একটি মেয়ে ভারি অদ্ভুত। মেয়েটিকে আমি কখনও কথা বলতে শুনিনি। একটা শব্দও উচ্চারণ করে না। বোবা? সে সব সময় দূরে দূরে একা থাকে। টিফিনের সময় অন্যরা খাওয়ার পর যখন ঘুমোয়, তখনও সে শোয় না, খানিক দূরে হাঁটুতে থুতনিত ঠেকিয়ে বসে থাকে। খুবই রোগা চেহারা, মুখখানাও সুন্দর নয়। একটা শীর্ণ ভাব আছে বলেই চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে। সব সময় এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে দূরের দিকে।

বোবারা কানেও শুনতে পায় না। এই মেয়েটিকে অন্যরা ফুলমণি ফুলমণি বলে ডাকে, এ তখন মুখ ফেরায়। মিস্তিরি কখন ইট আনতে হবে, কখন বালি, তা বলে দিলে ও বোঝে। ওই রোগা চেহারা নিয়েও ফুলমণি মাথায় অনেকগুলো ইট নিয়ে উঠে যায় বাঁশের ভারা দিয়ে, সে-কাজে ওর গাফিলতি নেই। কিন্তু টিফিনের সময় অন্য তিনটি সাঁওতাল মেয়ে কল কল করে হাসে, এ-ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে, কখনও দু-এক লাইন গানও গেয়ে ওঠে, সে-দিকে ফুলমণি ভ্রূক্ষেপও করে না। সে চেয়ে থাকে অন্য দিকে। অনেক সময় সে মাটিতে আঙুল দিয়ে আঁকিবুকি কাটে।

অনবরত চক্কর দেবার কোনও মানে হয় না, তাই মিস্তিরি-মজুররা যখন কাজ করে তখন আমি একটা চেয়ারে বসে বই পড়ি। আমার উপস্থিতিটাই যথেষ্ট। এদের ফাঁকি দিতেও দেখিনি কখনও। বাইরে ফট ফট করছে রোদ, কিন্তু গরম নেই তেমন। চুন-সুরকির গন্ধও আমার খারাপ লাগে না। চাকরিটা আমি উপভোগ করছি বলা যায়।

এক দিন দুপুরবেলা মহিমবাবু এসে হাজির। বিকেলে দু'লরি সিমেন্ট আসবে, আমাকে বস্তাগুলো গুনে রাখতে হবে, এই নির্দেশ দিতে দিতে হঠাৎ থেমে গিয়ে তিনি বললেন, এ কী, আপনি বই পড়ছেন?

যেন বই পড়াটা একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! চাকরি করতে এসে দুপুরবেলা চোখের সামনে বই খুলে রাখা মহাপাপ!

মহিমবাবু এক দিন বিকেলে আমাকে চায়ের নেমন্তন্ন করেছিলেন। উনি গত দেড় বছর ধরে পাকাপাকি আছেন ছোটপাহাড়িতে। সস্ত্রীক, বাচ্চা-কাচ্চা নেই, ওঁদের কোয়ার্টারটা বেশ ভালই, আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শয়নকক্ষ, বাথরুম, রান্নাঘর পর্যন্ত দেখিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও ঘরেই একটাও বই বা পত্র পত্রিকা চোখে পড়েনি।

যারা নিজেরা বই পড়ে না, তারা অপরের বই পড়াটাও যেন শারীরিক ভাবে সহ্য করতে পারে না। মহিমবাবু এমন ভাবে আমার বইখানার দিকে তাকিয়ে রইলেন যেন ওঁর গা চুলকোচ্ছে।

প্রথম দু-এক দিনেই বুঝে গেছি যে, মহিমবাবু আমাকে পছন্দ করতে পারেননি। আমি পছন্দ বা অপছন্দ কোনওটারই যোগ্য নই। এখানে আমাকে উপরন্তু অপছন্দ করার কারণ, আমি বড়সাহেবের লোক। বড়সাহেব কলকাতা থেকে তাঁর এক আত্মীয়কে এনে চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। মহিমবাবুর কোনও শালা বা ভাইপো নিশ্চয়ই বেকার বসে আছে, তিনি তার কথা ভেবে বসেছিলেন। আমি মনে মনে বলি, অপেক্ষা করুন। মহিমবাবু, ধৈর্য হারাবেন না, আপনার শালা কিংবা ভাইপো ঠিকই চাকরি পাবে।

সে-দিন মহিমবাবুকে খাতির দেখাবার জন্য আমি বইটা নামিয়ে রেখেছিলাম। দু-দিন পর উনি আবার এলেন দেড়টার সময়। এখনও টিফিন টাইম শেষ হয়নি, এখন আমি যা খুশি করতে পারি।

ওঁকে দেখে মিষ্টি হাসি দিয়ে বললাম, কী ভালো? বই পড়তে লাগলাম আবার। জর্জ সিমেনোর রহস্য কাহিনি, অতি পাষণ্ড ছাড়া এই বই শেষ না করে কেউ উঠতে পারে না। চন্দনদার বাড়িতে এ-সব বইয়ের প্রচুর স্টক আছে।

মহিমবাবু ভুরু কুঁচকে উঠে গেলেন দো-তলায়।

খানিক বাদে আমার মনঃসংযোগ নষ্ট হল। ওপরে কীসের যেন একটা গোলমাল হচ্ছে।

মহিমবাবু চেঁচিয়ে ডাকলেন, মি. নীললোহিত, মি. নীললোহিত, একবার ওপরে আসুন তো!

ক্লাস থ্রি-স্টাফেরা যেমন টাই পরে না, তেমনি তারা মিস্টারও হয় না। আর নীললোহিত নামটার আগে মিস্টার কখনও মানায়? যাদের বাড়িতে একখানাও বই থাকে না, তাদের কাণ্ডজ্ঞান তো এ-রকম হবেই!

টিফিনের সময় ডাকাডাকি খুব অন্যায়। চন্দনদার নীতি-বিরোধী। মহিমবাবু কর্ম-প্রাণ পুরুষ। বিশ্রাম কাকে বলে জানেন না। কিংবা ওপরওয়ালাদের তিনি বেশি বেশি কাজ দেখাতে চান। এখানে তো ওপরওয়ালা কেউ নেই!

উঠে এলাম ওপরে। মহিমবাবু যদি দো-তলা থেকে ডাকার সময় মিস্টার যোগ না করে শুধু আমার নাম ধরে ডাকতেন, তাহলে ওকে বেকায়দায় ফেলার কোনও ইচ্ছে আমার জাগত না। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে আমার মনে হল, মহিমবাবুকে ছোট্ট একটি লেংগি মারা দরকার। সহকর্মীদের সঙ্গে লেংগি মারামারি না করলে আর চাকরির সুখ কী?

মহিমবাবু বললেন, দেখুন দেখুন, আপনি নজর রাখেন না, নাকের ডগায় বই নিয়ে বসে থাকেন, এ-দিকে এরা কী করে?

আমি নিরীহ ভাবে বললাম, কী করেছে?

মহিমবাবু বললেন, ডিউটি আওয়ার্সে ফাঁকি! ওয়েস্টেজ অফ মেটিরিয়ালস!

হেড মিস্তিরি ইরফান আলি দাঁড়িয়ে আছে মহিমবাবুর পাশে। তার হাতের ঘড়িটা দেখে নিয়ে আমি বললাম, ডিউটি আওয়ার্স তো এখনও শুরু হয়নি।

কোম্পানির জিনিস নষ্ট করছে, সেটা দেখছেন না?

কী নষ্ট করেছে?

দেয়ালটার দিকে তাকান একবার। ওপরে কি একবারও আসেন না?

মহিমবাবু নিজেই দেয়ালটা আড়াল করে আছেন, দেখব কী করে? এবার কাছে গিয়ে দেখলাম, দেয়ালে আঁকা রয়েছে একটা ছবি। দো-তলায় দেয়ালগুলো প্লাস্টার করা হয়েছে কয়েক দিন আগে, এখন হোয়াইট ওয়াশ করা হয়নি। দু-এক দিনের মধ্যে হবার কথা।

চুন গোলা দিয়ে কেউ একটা আঁকাবাঁকা ছবি এঁকেছে দেওয়ালে। একটা গাছ, একটা ছেলে, একটা কুকুর। কাঁচা হাতের কাজ। দু'দিন বাদে যে-দেওয়াল চুনকাম হবে, সেখানে একটা ছবি এঁকে রাখলে ক্ষতি কী, পরে তো মুছেই যাবে।

আমি বললাম, টিফিনের আগেই আমি একবার ওপরে ঘুরে গেছি। তখন ছিল না। টিফিনের মধ্যেই কেউ এঁকেছে।

আমার কথা গ্রাহ্য না করে মহিমবাবু গলা তুলে জিজ্ঞেস করলেন, কে এ কাজ করেছে? কৌন কিয়া?

ইরফান আলি নিজস্ব দলটার দায়িত্ব নিয়ে বলল, হামলোগ নেহি দেখা।

কলের মিস্তিরিরা বলল, আমরা কিছু দেখি নাই। আমরা বারান্দায় ছিলাম।

সাঁওতালরা কোনও উত্তর না দিয়ে কয়েক জন চুপ করে রইল, কয়েক জন মিচকি মিচকি হাসতে লাগল।

এবার এগিয়ে এল এক নিঃশব্দ প্রতিমা। ফুলমণি। তার হাতে একটা ভিজে ন্যাতা।

মহিমবাবু এবার তাঁর গলায় বিস্ময় আর রাগ এক সঙ্গে মিশিয়ে বললেন, তুম কিয়া? কাঁহে কিয়া? অ্যাঁ? কাঁহে কিয়া?

আমি ফুলমণিকে নতুন চোখে দেখলাম। এই বোবা মেয়েটা ছবি আঁকে? আগে ওকে মনে হত বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি।

যে-বাড়ি এখনও তৈরি হয়নি, রঙ করা হয়নি, তার দেয়ালে দু-চারটে ছবি-টবি থাকা তো দোষের কিছু না। আমার ছবি আঁকার ক্ষমতা থাকলে আমিই আঁকতাম। শুধু বালি, বালি রঙের দেয়াল দেখার কী আছে?

আমি ভেবেছিলাম, নারী জাতির প্রতি সম্ভ্রমবোধে মহিমবাবু গলার আওয়াজটা অন্তত একটু নরম করবেন। তা নয়, খুব রোগা এক অবলাকে দেখে তিনি আরও গর্জন করে বলতে লাগলেন, মুছে দেও, আভি মুছে দেও!

যদি একটি মুখরা মেয়ে হত, তাহলেও অন্য কথা ছিল। কিন্তু এক জন বোবা, তার প্রতি এ-রকম একতরফা বাক্য ব্যবহার আমার পছন্দ হল না।

আমি হাত তুলে বললাম, দাঁড়াও, ওটা মুছতে হবে না।

মহিমবাবু আমার ওপরওয়ালা। তিনি হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, অ্যাঁ? কী বললেন?

আমি এই বাড়িটার ইনচার্জ। আমার মতামত না দিয়ে মহিমবাবু এখানে কোনও হুকুম দিতে পারেন না। আমার গলায় যথোচিত গাম্ভীর্য এনে আমি অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললাম, যত দিন না চুনকাম হয়, তত দিন তোমরা যে-কোনও দেওয়ালে যা ইচ্ছে ছবি আঁকতে পারো। টিফিন টাইমে!

তারপর মহিমবাবুর দিকে তাকিয়ে খুব বিনীত ভাবে বললাম, এটাই চন্দনদার নির্দেশ। চন্দনদা খুব ছবি ভালবাসেন। উনি নিজে এক সময় দারুণ ছবি আঁকতেন, জানেন না?

॥ ৩॥

চন্দনদাকে নিয়ে আর পারা যায় না! সন্ধেবেলা যে-মুরগিটা নিয়ে এল, পালক ফালক ছাড়াবার পরও সেটার ওজন দেড় কিলোর কম নয়। এত বড় একটা মুরগি রান্নার জন্য তেল-মশলা-আলু-পেঁয়াজ জোগাড় করা কি সোজা কথা? তাছাড়া এত মাংস খাবে কে?

চন্দনদা বলল, তুই রান্না কর, দেখবি খাওয়ার লোকের অভাব হবে না। হরিলাল, শিবলাল, যাদবলাল, কত আছে! দুমকায় আমার দাদু কী বলতেন জানিস? বিরাশি বছর বয়স, তবু রোজ মাছ চাই, মাংস চাই, তিন রকম তরকারি চাই। সব সাজিয়ে দেওয়া হত, নিজে কিন্তু কিছুই খেতেন না। একটু একটু ছুঁয়ে উঠে পড়তেন। আর বলতেন, আমার টাকা আছে, আমি হুকুম করব সব রান্না হবে, তাতে আমার নাতি-নাতনিরা ভাল করে খেতে পাবে।

আমি বললাম, তা তো বুঝলাম। কিন্তু তোমার বাংলোতে বাবুর্চি আছে, তাকে দিয়ে না রাঁধিয়ে শুধু শুধু আমাকে খাটাচ্ছ কেন?

চন্দনদা বলল, আরে দুর দুর, বাবুর্চির হাতের রান্না খেয়ে খেয়ে জিভ পচে গেছে। তোর এখানে খেলে বেশ একটা পিকনিক পিকনিক ভাব হয়।

আমি মনে মনে বললাম, দেখাচ্ছি মজা! আজ ভাতের তলা ধরিয়ে দেব ডালে নুন দেব দু'বার, আর মাংসে এমন ঝাল দেব যে, কাল সকাল পর্যন্ত হু-হু করে জ্বলবে।

আমার বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে চন্দনদা বলল, এক-এক সময় মনে হয়, জীবনটা যদি গোড়া থেকে শুরু করা যেত। তোর মতো এই রকম একটা ঘরে থাকতাম, নিজে রান্না করে খেতাম, ইচ্ছে না হলে দু'দিন দাড়ি কামাতাম না! সন্ধের সময় নিজের বাংলোতে থাকি না কেন জানিস? বাড়িতে থাকলেই অন্য অফিসাররা চলে আসে, এসেই অফিসের গল্প শুরু করে। সব সময় অফিসের গল্প!

হঠাৎ আবার উঠে বসে বলল, হ্যাঁ, ভাল কথা। মহিমবাবু তোর নামে কী যেন বলছিল! তুই কী করেছিস?

এই রে। তুমিও তো অফিসের গল্প শুরু করলে!

না না, মহিমবাবু তোর নামে অভিযোগ করছিল। তুই নাকি ওয়ার্কারদের লাই দিচ্ছিস, তারা কাজে ফাঁকি দেয়।

এ-সব কথা কাল আলোচনা করলে হয় না?

তোর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে নাকি মহিমবাবুর?

চন্দনদা, তুমি এক সময় গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে ভর্তি হয়েছিলে না?

হ্যাঁ। কে বলল তোকে?

তোমার প্রাণের বন্ধু তপনদার কাছ থেকে শুনেছি। তুমি বহরমপুর থেকে কলকাতায় পড়তে এসেছিলে। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে চান্স পেয়েও ভর্তি হয়েছিলে আর্ট কলেজে। তোমার বাবা খবর পেয়ে এসে কান ধরে, তোমাকে টানতে টানতে শিবপুরে নিয়ে গিয়েছিল।

কান ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা তপনের বানানো, না তুই বানালি? আমার বাবার চোখরাঙানিটা আমি যথেষ্ট ভয় পেতাম। বাবা দুঁদে উকিল ছিলেন।

বাবার ভয়ে তুমি ছবি আঁকা ছেড়েই দিলে? ইঞ্জিনিয়ার হলে বুঝি আর শিল্পী হওয়া যায় না? অনেক ইঞ্জিনিয়ার তো কবিতা লেখেন। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত...।

আমার কাজটা যে বড্ড ঝামেলার। চাকরিতে জড়িয়ে পড়ার পর আর চর্চা রাখতে পারিনি।

নীপাবউদির কাছে তোমার আঁকা কয়েকটা ছবি আমি দেখেছি। নীপাবউদির ইচ্ছে সেগুলো বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখবে। কিন্তু তুমি...।

আরে দুর, দুর, সেগুলো খুব কাঁচা ছবি। লোকে দেখলে হাসবে!

নীপাবউদির একখানা স্কেচ তুমি বেশ ভালই এঁকেছ। দেখলে চেনা যায়।

আমি ঠিক পঁয়তিরিশ সেকেন্ডে মানুষের মুখ আঁকতে পারতাম। একটানে। কিন্তু, কিন্তু, তুই কথা ঘোরাচ্ছিস রে নীলু? মহিমবাবু তোর নামে নালিশটা করেছে, আমি এসেছি তার বিচার করতে।

মহিমবাবু তোমাকে আসল কথাটাই বলেননি।

আসল কথাটা কী শুনি?

আমার ওখানে যারা কাজ করে, তাদের মধ্যে একটা আদিবাসী মেয়ে দেওয়ালে একটা ছবি এঁকেছে, তাতে মহিমবাবুর আপত্তি। আমি ভাবলাম, ছবিটা তোমাকে একবার দেখাব।

ছবি এঁকেছে মানে কী? ফিগার ড্রয়িং আছে?

হ্যাঁ, একটা ছোট ছেলে, একটা কুকুর।

রিয়েলিস্টিক? নাকি বাচ্চারা যে-রকম আঁকে, কিংবা মধুবনী স্টাইলের।

রিয়েলিস্টিক, মানে, ছেলেটাকে ছেলে বলে চেনা যায়, কুকুরটা অবিকল কুকুর। ব্যস্তভাবে খাট থেকে নেমে চন্দনদা বলল, চল তো, চল তো, আমি এ পর্যন্ত কোনও আদিবাসীর আঁকা রিয়েলিস্টিক ছবি দেখিনি।

এখন এই রাত্তিরে যাবে নাকি? কাল সকালে।

চল দেখে আসি। এমন কিছু রাত হয়নি।

রান্নাবান্না?

সে-সব পরে হবে। জামাটা পরে নে।

জিপ এনেছে চন্দনদা, ড্রাইভারকে ছুটি দিয়েছে, নিজেই চালাবে। আজ অন্ধকার নেই, ফট ফট করছে জ্যোৎস্না। বাতাসে সেই জ্যোৎস্নার সুঘ্রাণ।

এখনও মাদল বাজেনি, আর কোনও শব্দ নেই, জিপের আওয়াজটাকেই মনে হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র আওয়াজ। আকাশ এত পরিষ্কার যে, ছায়াপথ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

লেবরেটরি বাড়িটায় এখনও বিদ্যুৎ আসেনি। একটা গুদাম ঘরে সিমেন্ট জমা থাকে, তার জন্য এক জন পাহারাদার থাকার কথা, কিন্তু তার পাত্তা পাওয়া গেল না।

চন্দনদার হাতে একটা তিন ব্যাটারির লম্বা টর্চ। আমরা উঠে এলাম দো-তলায়। দেয়ালটার ঠিক জায়গায় টর্চের আলো পড়তেই চন্দনদা বিস্ময়ে শিস দিয়ে উঠল।

চতুর্দিকে অন্ধকার, টর্চের জোরালো আলোয় ছবিটা স্পষ্ট দেখা গেল, দিনেরবেলার চেয়েও ভাল মনে হল।

চন্দনদা দু'পাশ থেকে ছবিটা দেখে বলল, তুই ঠিক বলছিস নীলু, এটা কোনও আদিবাসী মেয়ের আঁকা?

হ্যাঁ। মেয়েটা পিকিউলিয়ার। কানে শুনতে পায়, কথা বলে না।

এ যে পাকা হাতের কাজ। সামথিং ইউনিক। আদিবাসীরা রিয়েলিস্টিক ছবি, যাকে বলে ফটোগ্রাফিক রিয়েলিস্টিক, সে-রকম আঁকতে পারে বলে জানা নেই। এখানে দেখ, যে-ছেলেটাকে এঁকেছে, তার ফিগারটা পুরোপুরি প্রোপোরশানেট। তার মানে শরীরের সঙ্গে হাত-পা, মুখের সাইজ একেবারে ঠিক ঠিক। খানিকটা ট্রেইনিং না থাকলে তো এ-রকম আঁকা যায় না।

মেয়েটাকে দেখে মনে হয়, ও কিছু জানে না।

তা তো হতে পারে না। ভাল করে দেখ ছবিটা। গাছতলায় একটা ছেলে বসে আছে, এক জন রাখাল, হাতে একটা বাঁশি। সাধারণত এই ছবি আঁকা হলে সবাই বাঁশিটা মুখের কাছে দেয়। বাঁশি বাজাচ্ছে তাই বোঝায়। কিন্তু এখানে বাঁশিটা একটু দূরে ধরা, ছেলেটার মুখ দেখলে মনে হয়, সে এখনও বাঁশি বাজানো শুরু করেনি। বাঁশিটা হাতে নিয়ে কিছু একটা ভাবছে। তার মানে, শিল্পী এখানে ট্র্যাডিশানের চেয়ে একটু আলাদা হতে চেয়েছে। এটা বাঁশি হাতে কেষ্টঠাকুর নয়। আর একটা জিনিস দেখ, গাছ আর ছেলেটা ছবির বাঁ-দিকে, তাই ব্যালান্স করবার জন্য ডান দিকের কোণে কুকুরটাকে বসিয়েছে। এটা যে কেষ্টঠাকুর নয়, সাধারণ রাখালের ছবি, সেটাও বোঝানো হয়েছে ওই কুকুরটাকে দিয়ে। কেষ্টঠাকুরের সঙ্গে কুকুরের অনুষঙ্গ নেই, ময়ূর কিংবা হরিণ-টরিণ কিছু থাকত।

বাবাঃ, তুমি তো অনেক কিছু বলে ফেললে চন্দনদা। আমি এত সব বুঝি না।

ভাল করে দেখলেই বোঝা যায়। মহিমবাবুটা একটা পাঁচ নম্বুরি গাড়ল। এই রকম ছবি দিয়ে কেউ নালিশ করে? ক্যামেরাটা আনলাম না, এর একটা ছবি তুলে রাখা উচিত। কয়েক জনকে দেখাতাম।

কাল সকালে ক্যামেরা নিয়ে এসো।

কী দিয়ে এঁকেছে বল তো? সরু আর মোটা, দু'রকম রেখাই আছে। কুকুরটাকে মোটা আউট লাইনে এঁকে গায়ে ছোট ছোট লোমও দিয়েছে। দু'রকম তুলির কাজ?

না না, চন্দনদা। ও মেয়েটা তুলি-ফুলি কোথায় পাবে? ওর কাছে কিছু থাকে না। টিফিনের সময় কোনও কাঠি দিয়ে আপন খেয়ালে এঁকেছে।

আরও কিছুক্ষণ ধরে ছবিটা দেখার পর টর্চটা নিভিয়ে দিয়ে চন্দনদা বলল, তাহলে তো খুব মুশকিল হল রে নীলু। যে-মেয়ে এ-রকম ছবি আঁকে, সে এক জন খাঁটি শিল্পী, তাকে দিয়ে আমরা মাথায় ইট বওয়াবার কাজ করাব? এটা তো একটা সামাজিক অন্যায়।

আমি বললাম, বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না চন্দনদা! ছবি তো অনেকেই আঁকে। আমি তো দেখেছি, কলকাতার রাস্তায় অনেক সময় কেউ কেউ ফুটপাথের ওপর রঙিন চক দিয়ে বড় বড় ছবি এঁকে ভিক্ষে করে। তারাও তো শিল্পী।

চন্দনদা জোর দিয়ে বলল, না। সে-সব ছবি আমিও দেখেছি। সেগুলো ডাল। নিষ্প্রাণ। যে-সব ছবিতে একটা অন্তর্দৃষ্টি থাকে, সেগুলোই আসল ছবি হয়। আমি ছবি চিনি।

যারা বাউল গান করে, কী চমৎকার গলা। তারাও তো গায়ক। কিন্তু তাদের ট্রেনে ভিক্ষে করতে হয়।

তুলনা দিবি না, খবরদার তুলনা দিবি না। ভেরি ব্যাড লজিক। বাউলদের ঠিক মতো কদর হয় না বলে শিল্পীদেরও অনাদর করতে হবে? তাছাড়া আজকাল ছবি বাজার ভাল। মধুবনী পেইন্টিংসও তো সাধারণ গ্রামের মেয়ের আঁকে, ভাল দামে বিক্রি হয়। আমি ছবি চিনি, এটা একটা...।

একখানা ছবি দেখেই কি কোনও শিল্পীকে চেনা যায়!

এই এতক্ষণে একটা দামি কথা বলেছিস নীলু। না, শুধু একটা ছবি দেখলে কিছু বলা যায় না। এই ছবিটা কপি হতে পারে। অন্য কারুর ছবি দেখে যদি এঁকে থাকে, তাহলে অবশ্য কিছুই না। কপি করতে দক্ষতা লাগে বটে, সিনেমার বড় বড় হোর্ডিং যারা আঁকে তারাও এক ধরনের আঁকিয়ে, কিন্তু শিল্পী নয়। নিজের মাথটা থেকে একা নতুন বিষয়কে নতুন ভাবে আঁকা আলাদা ব্যাপার। কাল সকালে এসে আমি মেয়েটার সঙ্গে কথা বলব!

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে চন্দনদা আবার বলল, ছবিটা দেখে মনটা ভাল হয়ে গেল রে আমার!

পরদিন ন'টার সময় এসে আমি চমকে গেলাম। দো-তলার দেয়ালের ছবিটা কেউ মুছে ফেলেছে!

মিস্তিরি-মজুররা জমা হচ্ছে এসে এসে। সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম, কেউ কিছু জানে না। ফুলমণি অন্য দিনের মতোই নিস্তব্ধ। কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দেয় না। এক সময় ধৈর্য হারিয়ে আমি অন্য এক জন সাঁওতালকে জিজ্ঞেস করলাম, এই মেয়েটা কথা বলতে পারে না?

সে বলল, হ্যাঁ গো বাবু, পারে। কিন্তু বলে না।

খানিক বাদে চন্দনদা এসে খুব রাগারাগি করতে লাগল। ক্যামেরা এনেছে সঙ্গে। ফুলমণিকে জেরা করা হল অনেক, সে শুধু মাথা নাড়ে। তবু আমার সন্দেহ হল, ফুলমণিই ছবিটি মুছে ফেলেছে।

চন্দনদা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ঠিক আছে, টিফিনের সময় আমি আবার আসছি।

অন্য দিনের মতোই শুরু হয়ে গেল কাজ। তিন তলার গাঁথনি শুরু হয়েছে, এক তলা থেকে বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে ইঁট, বালি, সিমেন্ট। লক্ষ্য করলাম, ইরফান আলি যেন অন্য দিনের চেয়ে ফুলমণিকে বেশি খাটাচ্ছে। ছবিটা আঁকার জন্য ফুলমণি খানিকটা গুরুত্ব পেয়ে গেছে, সেটা ইরফান আলির পছন্দ হয়নি। যেখানে লাভ-লোকসানের প্রশ্ন নেই, সেখানেও মানুষের মনে এক ধরনের ঈর্ষা কাজ করে।

বাঁশের ভারা বেয়ে আমিও উঠে গেলাম দো-তলার ছাদে। সিঁড়ি এখনও তৈরি হয়নি। এক পাশে কাজ চলছে, আর এক পাশটা ফাঁকা। এ-রকম ন্যাড়া ছাদের প্রান্তে এসে নিচের দিকে তাকালে ভয় ভয় করে। খানিকটা দূরেই ছোট ছোট টিলা। বনতুলসীর ঝোপ-ঝাড়টাও দেখা যায় এখান থেকে। ছোট নদীটার ধারে বসে আছে কয়েকটা বক। গোটা চারেক কালো কালো মোষ, এখানে ওদের বলে কাঁড়া, হেঁটে পার হচ্ছে নদী।

মাঝে মাঝে ফুলমণির দিকে চোখ চলে যাচ্ছে আমার। সে মাথায় করে ইঁট আনছে ওপরে, আবার নেমে যাচ্ছে, কোনও দিকে তার দৃষ্টি নেই। এত রোগা মেয়েটা এক সঙ্গে বারো-চোদ্দটা ইঁট বয়ে আনছে কী করে? পড়ে না যায়! ইরফান আলি মাঝে মাঝে তাকে অকারণ তাড়া দিয়ে বলছে, ইতনা দের কাঁহে হোতা? জলদি করো, জলদি করো।

টিফিনের সময় হোটেল থেকে খেয়ে এসে আমি দেখলাম, চন্দনদা বসে আছে বারান্দায়। পাশে একটা বড় ব্যাগ।

আমাকে দেখে বলল, খেয়ে এসেছিস? গুড। ওদেরও খাওয়া হয়ে এল। এবার একটা এক্সপেরিমেন্ট করব।

ব্যাগটা থেকে চন্দনদা বার করল ফুলস্কেপ সাইজের অনেকগুলো কাগজ আর অনেকগুলো পেন্সিল, সেগুলোর এক দিকে লাল অন্য দিকে নীল শীস।

আঠেরো জন মিস্তিরি-মজুরদের সবাইকে ডেকে চন্দনদা একখানা করে সেই কাগজ ও পেন্সিল ধরিয়ে দিল। তারপর বলল, তোমরা সবাই আঁকো যার যা খুশি। যেমন ইচ্ছে আঁকো। তাড়াতাড়ির কিছু নেই।

বাচ্চাদের যেমন সিট অ্যান্ড ড্র প্রতিযোগিতা হয়, সেই রকম ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে গেল আঠেরো জন। তিনটি সাঁওতাল মেয়ে শুধু খিলখিলিয়ে হাসে। ফুলমণি সকলের থেকে অনেক দূরে একটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসল।

চন্দনদা বলল, এদের কাছাকাছি থাকা ঠিক নয়। তাতে ওরা লজ্জা পাবে।

গাড়ি থেকে একটা আইস বক্স আর গেলাস নামিয়ে চন্দনদা চলে এল একটা কোণের ঘরে। আইস বক্স থেকে বেরুল ঠাণ্ডা বিয়ারের বোতল। একটা বোতলের ছিপি খুলে চন্দনদা বলল, তোকে কিন্তু দিচ্ছি না নীলু। এখানে তুই আমার কর্মচারী। সাব অরডিনেট স্টাফ-এর সঙ্গে কাজের সময় বিয়ার খেলে আমার বদনাম হয়ে যাবে।

একটু পরেই এসে হাজির হলেন মহিমবাবু।

ঠোঁটের এক কোণে হেসে চন্দনদাকে বলল, স্যার, আপনি নাকি কুলি-কামিনদের দিয়ে ছবি আঁকাচ্ছেন?

চন্দনদা বলল, হ্যাঁ। আপনাকে কে খবর দিল?

মহিমবাবু বলল, খবর ঠিক ছড়িয়ে যায়।

চন্দনদা বলল, আপনি এসেছেন, ভাল করেছেন। বসুন, আপনিও দেখে যাবেন ছবিগুলো।

চেয়ার মাত্র একখানা। জানালা-দরজাও এখনও বসানো হয়নি। মহিমবাবুকে আমারই মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হল।

চন্দনদা মহিমবাবুকে জিজ্ঞেস করল, বিয়ার খাবেন? গেলাস অবশ্য একটাই, আপনাকে বোতল থেকে চুমুক দিতে হবে।

মহিমবাবু জিভ কেটে বললেন, আমার ও-সব চলে না। জীবনে কখনও ছুঁইনি।

তারপর আমার দিকে চেয়ে তিনি সমর্থন আশা করলেন।

চন্দনদা বলল, গুড। আপনি বিড়ি-সিগারেট খান না, মদ খান না, কাজে ফাঁকি দেন না, বউয়ের খুব বাধ্য, আপনার তো স্বর্গের টিকিট কাটা হয়েই আছে।

আমি সরে পড়লাম সে-ঘর থেকে। মহিমবাবু দাঁড়িয়ে থাকবেন, আমি শুধু শুধু সে-শাস্তি পেতে চাই কেন।

মিস্তিরি-মজুররা কেউ এক তলার বারান্দায়, কেউ দো-তলার সিঁড়িতে বসে ছবি আঁকায় নিমগ্ন। কেউ কেউ এখনও হেসে যাচ্ছে।

ওদের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে আমি নেমে গেলাম মাঠে। এ-দিকে সে-দিকে কয়েকটা গাছ পোঁতা হয়েছে মাত্র, পরে বাগান হবে। আজ থেকে তিন-চার বছর বাদে জমজমাট হয়ে যাবে এই জায়গাটা। কত লোক কাজ করবে, কত নোংরা জমা হবে, মানুষের রেষারেষিতে দূষিত হবে বাতাস। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বনতুলসীর জঙ্গল। বনতুলসীর প্রতি মায়া করে তো সভ্যতার অগ্রগতি থেমে থাকবে না।

এখানকার সীমানা-পাঁচিলের ও-ধারেও কিছু বনতুলসী ফুটে আছে। একটা পাতা ছিঁড়ে গন্ধ নিলাম। এই গন্ধটাই স্মৃতিতে থেকে যাবে।

খানিক বাদে একটা ঘণ্টা বাজার ঝন ঝন শব্দ হল। অর্থাৎ টিফিন টাইম শেষ। অন্য দিন ওই ঘণ্টা আমি বাজাই।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চন্দনদা বলল, এই নীলু, কাগজগুলো নিয়ে যায়।

পরীক্ষার হলের গার্ডের মতো ছাত্রদের কাছ থেকে উত্তরপত্র সংগ্রহ করার মতো আমি ওদের কাছ থেকে ছবিগুলো নিতে লাগলুম। নিতে নিতেই আমার চক্ষু চড়কগাছ। ওরা কি আমাদের সঙ্গে মস্করা করছে নাকি? ফুলমণির কাগজটা নিয়ে আমি কটমট করে তাকালাম তার দিকে। সে মুখ ফিরিয়ে আছে, তার মুখখানা বিষাদ মাখানো।

চন্দনদা বলল, দেখি দেখি!

একটার পর একটা সব কাগজ উলটে গিয়ে চন্দনদা হাহাকারের মতো বলে উঠল, এ কী? ওই মেয়েটার কোনটা?

কোনও কাগজেই কোনও ছবি নেই। যা আছে তা কহতব্য নয়।

ইরফান আলি এঁকেছে একটা বাড়ির নকশা। সোজা সোজা দাগে। আর কয়েক জন এঁকেছে কাঠি-কাঠি, হাত-পা-ওয়ালা আর গোল মুণ্ডু যে-সব মানুষ গুহাচিত্রে আঁকা হয়, সেই রকম কিছু। কেউ এঁকেছে পদ্মফুল, কেউ এঁকেছে পাঁচ ইঞ্চি আমগাছে দেড় ইঞ্চি সাইজের আম ঝুলছে। সাঁওতালরা কেউ কিছু আঁকেনি। সারা কাগজ ভরে কাটাকুটি করেছে। কেউ-বা পেন্সিলের চাপে কাগজ ছিঁড়ে ফেলেছে।

প্রত্যেকটা কাগজে আমি নম্বর লিখে দিয়েছিলাম। সুতবাং কে কোন কাগজ পেয়েছিল তা আমার আন্দাজ আছে। ফুলমণির কাগজটা এক নম্বর, যে শুধু গোল গোল দাগ দিয়েছে, আর কিছু না।

সেই কাগজটা চন্দনদা উলটেপালটে অনেক ভাবে দেখল। তারপর হতাশ ভাবে বলল, নাঃ কিচ্ছু না। এ কী হল রে নীলু?

মহিমবাবু কাগজগুলোকে নিয়ে দ্রুত চোখ বোলালেন। তারপর হ্যা হ্যা করে অট্টহাস্য করে উঠলেন। এরা যে কেউ কোনও ছবি আঁকতে পারেনি, সেটা যেন তাঁরই বিপুল জয়।

চন্দনদা বলল, সবাই ছবি আঁকতে পারে না ঠিকই, কেউ কেউ একটা সোজা দাগও টানতে পারে না। কিন্তু এত জনের মধ্যে এক জনও অন্তত... কাল দেয়ালে যে ছবিটা দেখলাম।

মহিমবাবু বললেন, বাজে, সব বাজে।

আমি বললাম, চন্দনদা, আমাদের বোধহয় গোড়াতেই একটা ভুল হয়ে গেছে।

চন্দনদা মুখ তুলে আমার দিকে সরু চোখে তাকাল।

আমি বললাম, আমরা ওদের কাগজ-পেন্সিল দিয়েছি। ওদের মধ্যে অনেকে জীবনে কখনও পেন্সিলই ধরেনি। কলম-পেন্সিল দিয়ে কী করে লিখতে হয়, সেটাও তো শেখা দরকার। হাতে-খড়ির সময় বাচ্চাদের কলম ধরতে শেখানো হয় না? এদের হাতে-খড়িই হয়নি, এরা আরও শিশু।

চন্দনদা বলল, এটা একটা পয়েন্ট বটে। এরা পেন্সিল ধরতে জানে না।

আমি বললাম, যারা জীবনে কখনও দেশলাই কাঠি জ্বালেনি, তাদের হাতে তুমি একটা দেশলাই দাও, জ্বালতে পারবে না। অথচ কাজটা খুব সোজা! মেয়েরা কত সহজে সূচ-সুতো দিয়ে সেলাই করে, কিন্তু তুমি আমি চেষ্টা করলে...।

মহিমবাবু বললেন, বাদ দিন, এবার ও-সব কথা বাদ দিন। মি. ঘোষাল, আমাদের চার নম্বর প্লটের ঢালাইটা কি কালই হবে? আকাশে মেঘ জমেছে। আজই তাহলে সব ব্যবস্থা করতে হয়।

চন্দনদা মহিমবাবুর মুখের দিকে খানিকটা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, আমার মাথায় আর একটা আইডিয়া এসেছে। আজ আর টিফিনের পরে কাজ করতে হবে না। ওদের হাফ-ডে ছুটি।

এমনি এমনি ছুটি দিয়ে দেবেন?

এমন এমনি নয়। ওদের দিয়ে আবার ছবি আঁকাব!

মি. ঘোষাল, কোম্পানি ওদের বিনা কাজে মাইনে দেবে?

কোম্পানির ব্যাপারটা আমি দেখব। বিনা কাজ মানে কী, ছবি আঁকাটা একটা কাজ নয়?

আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু সেটা কি কোম্পানির কাজ?

আলবাত! আমরা এখানে কারখানা বানাব, শহর বসাব, কিন্তু তাতে স্থানীয় লোকদের জীবনযাত্রার কোনও ক্ষতি যাতে না হয়, সেটা দেখাও আমাদের কোম্পানির দায়িত্ব। জীবনযাত্রা মানে শুধু খাওয়া-পরা আর চাকরি নয়। কালচারাল অ্যাকটিভিটিও তো আছে। কেউ যদি ভাল ছবি আঁকে কিংবা গান গায় কিংবা খেলাধুলোয় ভাল হয়, তাদেরও এনকারেজ করতে হবে। এখন কে কেমন ছবি আঁকে দেখছি, পরে গানের ব্যাপারটা দেখতে হবে। তারপর খেলাধুলোর প্রতিযোগিতা।

আমার দিকে চেয়ে চন্দনদা বলল, সবাইকে ডাক।

মিস্তিরি মজুররা এর মধ্যে আবার কাজে লেগে গেছে।

আমি বুঝতে পারি, আমার চাকরিটাই এখানে অবান্তর। এরা এখানে ফাঁকি দিতেই শেখেনি। কেউ দেরি করে আসে না, কত দূরের গ্রাম থেকে আসে, তবু ঠিক সময় আসে, ছুটির আগে কেউ পালাবার ছুতো খোঁজে না। মাইনেটা এদের কাছে নিমক, নিমক খেলে তা ঠিক ঠিক শোধ দিতে হবে। আমার কাজটাই বরং ফাঁকির।

কাজ ছেড়ে চলে আসবার জন্য সবাইকে ডাকতে, এরা বেশ অবাক হল।

চন্দনদা হাত তুলে সবাইকে চুপ করার ইঙ্গিত দিয়ে বক্তৃতার ঢঙে বলতে লাগল, শোনো, অন্য দিন তোমরা যা কাজ করো, আজ তোমাদের তা করতে হবে না। রোজ রোজ এক কাজ আর ভাল লাগে? আজ তোমরা সবাই ছবি আঁকো। যে যা পারো আঁকো। চেষ্টা করলে কিছু না-কিছু পারবেই। গামলায় চুন গুলে নাও, তারপর আঙুল দিয়ে কিংবা কাঠি বা বুরুশ দিয়ে যার যেমন খুশি দেয়ালে আঁকো। যার ছবি আমার পছন্দ হবে, তাকে আমি একশো টাকা প্রাইজ দেব।

ইরফান আলি অপ্রসন্ন ভাবে বলল, আজ তিন তলা গাঁথনি আরম্ভ করেছি, এক ধারটা শেষ হয়ে যেত।

চন্দনদা বলল, কাল হবে, কাল হবে। যাও, যাও, সবাই শুরু করো।

মিস্তিরি-মজুররা ছত্রভঙ্গ হবার পর চন্দনদা মহিমবাবুকে জিজ্ঞেস করল, আপনি আঁকতে পারেন?

মহিমবাবুর বিয়ার খাওয়ার প্রস্তাবে যে-রকম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সেই রকম ভাবেই প্রায় আঁৎকে উঠে বললেন, ছবি? আমি? না, না, না।

চন্দনদা বলল, তাহলে চলুন, আপনি আর আমি কাজ করতে যাই। চার নম্বর সাইটটা দেখে আসি। এরা আঁকুক। নীলু, তুই চেষ্টা করতে পারিস। এক যাত্রায় আর পৃথক ফল হবে কেন? তোর ছবি ফার্স্ট হলে তুই পাবি একশো টাকা।

চন্দনদার জিপ সশব্দে বেরিয়ে গেল।

এ-দিকে চুন গোলা শুরু হয়ে গেছে। ছবি আঁকতে পারুক বা না পারুক, চন্দনদার আদেশটাকেও এরা কাজ বলে ধরে নিয়েছে। হতে পারে এটা সাহেবের খেয়াল, কিন্তু এর জন্য তো মাইনে কাটা যাবে না।

ফুলমণি সম্পর্কেই আমার বেশি কৌতূহল। ওই বোবা মেয়েটা কালকের ছবিটা কেন মুছে দিল আজ সাত সকালে এসে? অত ভাল ছবি আঁকে, ও কি সত্যিই পেন্সিল ধরতে জানে না? কিংবা ও লজ্জা পেয়ে গেছে?

অন্যদের সঙ্গে ফুলমণিও চুন গুলছে।

আমি কিছুক্ষণ বই নিয়ে বসে রইলম ঘরটার মধ্যে। আধ ঘণ্টা বাদে অন্য দিনের মতোই বেরিয়ে পড়লাম কাজ পরিদর্শনে। ইরফান আলি ও আর দু'জন এক জায়গায় বসে বিড়ি ফুঁকছে। ইরফান আলি হেড মিস্তিরি, চুনের কাজে হাত দিতে বোধহয় তার সম্মানে বাধে।

অন্য অনেকে কিন্তু বিভিন্ন দেয়ালে ছবি আঁকতে শুরু করেছে। কাঠির পাতায় ন্যাকড়া জড়িয়ে তৈরি করেছে বুরুশ। কেউ কেউ আঁকছে শুধু আঙুলে।

ফুলমণি আঁকছে দো-তলার একটা দেয়ালে! সে খুব দ্রুত হাত চালাচ্ছে। ওই দেয়ালে যে রোদ পড়েছে, তার রঙটা যেন অন্য রকম। ওঃ হো, উলটো দিকটা উত্তর, সে-দিকটা খোলা। উত্তরের আলো ছবি আঁকার পক্ষে প্রকৃষ্ট, মেয়েটা তা জানল কী করে?

চুনে আঙুল ডুবিয়ে সে লম্বা লম্বা টান দিচ্ছে। কী আঁকছে বোঝাই যাচ্ছে না। মেয়েটার চোখ শুধু আঙুলের ডগায়।

দূর থেকে আমি তার টেকনিকটা লক্ষ্য করলাম। কখনও আঙুল চ্যাপ্টা করে টানছে মোটা মোটা রেখা, কখনও নখ দিয়ে ফুটিয়ে তুলছে সরু সরু রেখা। তার ডান হাতের একটা নখ বেশ বড়।

ওর মনঃসংযোগের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে আমি নেমে গেলাম নিচে। অন্য যে তিনটি সাঁওতাল মেয়ে সব সময় হাসাহাসি করে, তারাও এখন আঁকায় ব্যস্ত, এক জন তীর-ধনুক হাতে এক বীরপুরুষের রূপ ফুটিয়ে তুলেছে অনেকটা, মন্দ নয় তো ছবিটা।

একা একা একটা সিগারেট ধরিয়ে আমার মনে হল, চন্দনদাকেই একটা কিছু পুরস্কার দেওয়া উচিত। এমনিতে চন্দনদাকে আমার খুব একটা পছন্দ নয়। নানা রকম হুজুগ তুলে প্রায়ই নিজের সংসারে নানা রকম গোলমাল পাকায়। একবার তো নীপাবউদির সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছিল প্রায়। বাবা-মায়ের ঝগড়ায় তিতিবিরক্ত হয়ে ওদের মেয়ে মুমু আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল।

কিন্তু একটা কোম্পানির বড় সাহেব হয়ে, নিজের মিস্তিরি-মজুরদের দিয়ে কাজ করাবার বদলে ছবি আঁকাচ্ছে, এ-রকম কি ভূভারতে আর কোথাও পাওয়া যাবে? চন্দনদার হুজুগগুলোও আলাদা ধরনের।

হঠাৎ গোঁ গোঁ শব্দ করে একটা লরি এসে থামল গেটের সামনে। লরিভর্তি বালি।

অন্য দিন লরিতে সুরকি, বালি, ইঁট বা সিমেন্ট এলে ইরফান আলিই সব কিছু বুঝে নেয়। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় পাশে, মালিকদের প্রতিনিধি হিসেবে। আমাদের লোকেরাই ও-সব নামিয়ে নেয় লরি থেকে।

আজ তো সে-প্রশ্নই ওঠে না।

প্রথম কথা, আমাদের মিস্তিরি মজুররা এখন শিল্পী, তাদের শারীরিক পরিশ্রম করার কথা নয়। শিল্পীর আঙুল এখন বালিতে ডুবতেই পারে না।

দ্বিতীয় কথা, লরিওয়ালা তার লোকেদের যদি মালটা নামিয়ে দিতে চায়, তাতেও শব্দ হবে, শিল্পীদের ব্যাঘাত ঘটবে! অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা যামিনী রায় ছবি আঁকছেন। আর কাছেই কিছু লোক হুসহাস শব্দ করে লরি থেকে বালি নামাচ্ছে, এ দৃশ্য কি কল্পনা করা যায়? আমাদের এই নবীন শিল্পীরা কেউ যে অবনী ঠাকুর বা যামিনী রায় হচ্ছে না, তা কে বলতে পারে?

লরি ড্রাইভার নেমে দাঁড়িয়েছে, তাকে আমি বললাম, আজ মাল নামানো হচ্ছে না, ওয়াপস যাও, কাল আও।

বিকেলবেলা জায়গাটা এত নিস্তব্ধ দেখে লরিওয়ালা কিছুটা কৌতূহলী হয়েছে, আমার কথা শুনে আরও অবাক হল।

সে জিজ্ঞেস করল, কিঁউ।

আমি বললাম, মিস্তিরি লোক আভি ছবি আঁকতা হ্যায়। তসবির, তসবির, তসবির বানাতে হ্যায়।

সে বলল, কেয়া?

বিস্ময়ে লোকটির চোয়াল ঝুলে গেছে। কিছুই বুঝতে পারছে না। লোককে চমকে অবাক করে দেওয়াটা আমার প্রিয় খেয়াল। আমি ওকে আরও গুলিয়ে দেবার জন্য এক হাতের পাঞ্জায় পেন্সিল বুলোবার ভঙ্গি করে বললাম, ছবি, ছবি!

এই সময় ইরফান আলি ছুটতে ছুটতে এল। এক মুঠো বালি নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে বলল, কেইসান বালি লায়া? মোটা দানা। ঠিক হ্যায়, ওহি কোনাসে উতারো।

আমি বললাম, আজ বালি উতারোবে না। কাল আনবে।

ইরফান আলি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, আমি জোর করে বললাম, কাল, কাল। এক দিন পরে বালি এলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

ইরফান আলিকে জব্দ করে এবং হতভম্ব লরি ড্রাইভারকে ফিরিয়ে দিয়ে আমার বেশ তৃপ্তি হল। প্রতি দিন তো আর এ-রকম ঘটনা ঘটে না।

পাঁচটা বাজার একটু পরে আকাশে ঘনিয়ে এল মেঘ। আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে আলো। এরপর আর ছবি আঁকা যাবে না, ইলেকট্রিসিটিও নেই। ওদের মেয়াদ ছ'টা পর্যন্ত।

আকাশের অবস্থা দেখেই সাত তাড়াতাড়ি চন্দনদা চলে এল মহিমবাবুকে সঙ্গে নিয়ে। ব্যস্ত হয়ে বলল, যত দূর হয়েছে তাই-ই দেখা যাক। আর দেরি করা যাবে না।

শুরু হল এক তলার দেয়াল থেকে।

ইরফান আলি কিছুই আঁকেনি। অন্য দু'জন কলের মিস্তিরিও চুন ছোঁয়নি, হয়তো তাদের কোনও রকম সংস্কার আছে।

চন্দনদা ইরফান আলিকে জিজ্ঞেস করল, কী আলিসাহেব, আপনি কিছু আঁকলেন না?

ইরফান আলি চাপা বিদ্রূপের সুরে বলল, আমার একশো টাকার ইনাম দরকার নেই বড়বাবু। ওরা কেউ নিক।

আমি চন্দনদার হাতে মৃদু চাপ দিলাম। যারা কিছু আঁকেনি, তাদের কোনও চাপ না দেওয়াই ভাল।

এক তলার দেওয়ালগুলো দেখতে দেখতে এগোলাম আমরা। অন্যদের তুলনায় সাঁওতালদের আঁকাই চোখে পড়ার মতো। তারা প্রত্যেকেই কিছু না-কিছু এঁকেছে। সাঁওতালদের গ্রামে গিয়েও দেখেছি, তারা বাড়ির সামনে আল্পনা দেয়, মাটির দেয়ালে অনেক কিছু এঁকে রাখে। বাসন্তী নামে একটি মেয়ে, যে সব সময় ফিকফিকিয়ে হাসে আর উঁচু স্কেলে কথা বলে, সে এঁকেছে একটা সম্মিলিত নাচের দৃশ্য। সাত-আটটি নারী-পুরুষ কোমর ধরাধরি করে আছে।

চন্দনদা সেই ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বলল, বাঃ।

বাসন্তী হেসে উঠে জিজ্ঞেস করল, কেমন গো বাবু?

চন্দনদা আবার বলল, বাঃ!

আমি চন্দনদাকে ওপরে যাবার জন্য তাড়া দিতে লাগলাম।

'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি'। সবাই শিল্পী হয় না, এক জন দু'জনই হয়। কোনও সন্দেহ নেই, ফুলমণিই এখানে একমাত্র শিল্পী। অন্যরা দর্শনীয় কিছু কিছু এঁকেছে বটে। কিন্তু খাঁটি অর্থে ছবি বলতে যা বোঝায়, তা এই একখানাই।

ফুলমণি তখনও ছবিটা শেষ করছিল, আমাদের দেখে এক পাশে সরে গেল।

বড় দেয়াল জুড়ে ফুলমণি এঁকেছে একটা ল্যান্ডস্কেপ। পাহাড়ের তলা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ছোট নদী, সেই নদী দিয়ে পার হচ্ছে কয়েকটা মোষ, একা মোষের পিঠে বসে আছে রাখাল, তার মাথার ওপরে উড়ছে কয়েকটা বক। শুধু চুন নয়, খানিকটা কাঠকয়লাও ব্যবহার করা হয়েছে। চুনের ফ্যাটফেটে সাদা ভাবটার মধ্যে খানিকটা কালো মিশিয়ে গভীরতা আনা হয়েছে অনেকখানি।

চন্দনদা অভিভূত ভাবে একবার ছবিটার দিকে, আর একবার ফুলমণির দিকে তাকাতে লাগল। সত্যিই, বিশ্বাস করা যায় না যে, যে-মেয়েটা সারা দিন মাথায় ইট বয়ে জীবিকা অর্জন করে, সে কী করে এমন ছবি আঁকে। লেখাপড়া জানে না, দুনিয়াটা চেনে না। ছবির ইতিহাস সম্পর্কে কোনও ধাবণা নেই, অথচ আধুনিক ছবির ধারার সঙ্গে এ ছবির রীতিমতো মিল আছে। কোনও রকম শিক্ষা ছাড়া এ-রকম ছবি আঁকা যায়?

চন্দনদা ফুলমণির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ও মেঝেন, তোমাকে ছবি আঁকা কে শেখাল? তুমি অন্য কোনও ছবি দেখে এটা এঁকেছ?

ফুলমণি কোনও উত্তর দিল না।

আমি বললাম, চন্দনদা, ছাদ থেকে এই নদীটা দেখা যায়। আজ সকালেই আমি দেখেছি।

আমাকে মাথায় করে ইঁট বইতে হয় না, দেয়ালে গাঁথতে হয় না, আমি ছাদে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে দূরের দৃশ্যটা উপভোগ করেছিলাম। ফুলমণি সারাক্ষণ কাজে ব্যস্ত ছিল। তার মধ্যেই সে এই দৃশ্যটা দেখল কখন? শুধু দেখেনি, মনে গেঁথে নিয়েছে।

অন্যরা ভিড় করে এই ছবি দেখতে এসেছে। অনেকেই ছবি আঁকতে পারে না, ছবি দেখার চোখও থাকে না। ছবি দেখার অভ্যেস যাদের নেই, তারা রিয়েলিস্টিক ছবি দেখেও বিষয়বস্তু চিনতে পারে না।

আমি ছাদের দৃশ্যটা উল্লেখ করায় ওদের এক জন বলল, হ হ, লদী বটে!

অন্য এক জন বলল, কালা কালা উগুলান কী, খাঁসি লয়?

বাসন্তী, যে কিছুটা আঁকতে পারে, সে বলল, কানা নাকি তুই, খাঁসী কুথায়, ওগুলান কাঁড়া, বড় বড় শিং...।

চন্দনদা বলল, এই মোষগুলো দেখ, লাইনের কী জোর। একটাও স্ট্যাটিক নয়। প্রত্যেকটার ঘাড় ঘোরানো, পা তোলা আলাদা। কেউ কম জলে, কেউ বেশি জলে। যারা সাধারণ ছবি আঁকে, তারা মোষ আঁকতে গেলে আখাম্বা একটা মোষ এঁকে দেয়। এ ছবি অসাধারণ।

আমি বললাম, পাখিগুলো দেখো। সামান্য একটা করে প্যাচ দিয়েছে, কিন্তু ঠিক বোঝা যায়, ওগুলো কাক কিংবা চিল নয়, উড়ন্ত বক।

চন্দনদা আঙুল তুলে বলল, আমার সব চেয়ে ভাল লাগছে এই মোষটা।

এবার আমারও অবাক হবার পালা। চারটে মোষ ঠিক চেনা যাচ্ছে। কিন্তু চন্দনদা যেখানে আঙুল দেখাচ্ছে, সেখানে মোষ কোথায়? প্রথম মনে হয়েছিল, ছবির মধ্যে এমনি একটা ধ্যাবড়া পড়ে গেছে। ভাল করে দেখে মনে হল, জলে একটা কিছু ভেসে যাচ্ছে।

আমি বললাম, মোষ কই? ওটা, ওটা যেন জলে ভাসছে একটা তিনকোণা কিছু, অনেকটা যেন মনে হচ্ছে সাইকেলের সিট।

চন্দনদা বিরাট জোরে হা-হা করে হেসে উঠল।

তারপর বলল, তুই যে পিকাসোর ঠিক উলটো বললি! পিকাসোর সেই বিখ্যাত গল্পটা জানিস না?

কোনটা?

পিকাসোর বাড়িতে একবার চোর এসেছিল। খুটখাট শব্দে পিকাসোর ঘুম ভেঙে যায়। পিকাসো কে কে বলে চেঁচাতেই চোরটা বারান্দা দিয়ে লাফিয়ে পালাল। পিকাসো দৌড়ে বারান্দায় এসে এক ঝলক শুধু দেখতে পেলেন গলি দিয়ে সাইকেল চেপে চোরটা দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে! পরদিন সকালে পুলিশ এসে সব খোঁজ খবর নিতে নিতে পিকাসোকে জিজ্ঞেস করল, আপনি চোরটাকে কেমন দেখেছিলেন, একটু বর্ণনা করতে পারবেন? পিকাসো মুখে কিছু না বলে ছবি এঁকে দিলেন। কী আঁকলেন জানিস? একটা মোষের মাথা!

মহিমবাবু এতক্ষণ কোনও কথা বলেননি, এবার বললেন, অ্যাঁ?

চন্দনদা বলল, পিকাসো যা দেখেছিলেন, হুবহু তাই এঁকেছিলেন। এক রকম সাইকেল হয়, দু'দিকের হ্যান্ডেল উঁচু হয়ে থাকে। রেসিং সাইকেল যাকে বলে। সেই সাইকেলে বসে মাথা নিচু করে কেউ যদি খুব জোরে চালায়, দূর থেকে একটা শিংওয়ালা মোষের মাথাই মনে হবে। এখানে এই ছবিতে, মোষটা সারা শরীর ডুবিয়ে আছে জলে, শুধু মাথার ওপরটা দেখা যাচ্ছে। তাই তোর মনে হচ্ছে সাইকেলের সিট।

মহিমবাবু বললেন, পিকাসো, খুব বড় শিল্পী, না? নাম শুনেছি। দু'একখানা ছবিও দেখেছি। কিছু বোঝা যায় না মাথামুণ্ডু। না বোঝা গেলে সেটা কি করে ভাল ছবি হয় মশাই?

চন্দনদা মহিমবাবুর কাঁধে চাপড় মেরে বলল, মশাই, এ বিষয়েও পিকাসোর নিজেরই গল্প আছে। প্যারিসে একটা পার্টিতে একটি খুব সাজগোজ করা মহিলা এসে পিকাসোকে ধরেছিল। নাকি সুরে অনুযোগ করে বলেছিল, মি. পিকাসো, আপনার ছবি দেখে কিছুই বুঝতে পারি না। উলটো না সোজা, তা পর্যন্ত বোঝা যায় না। এ-রকম ছবি আঁকার কি কোনও মানে আছে? পিকাসো উত্তর দিলেন, ম্যাডাম, আপনি কখনও চিনে ভাষা শুনেছেন? তার একটি বর্ণও বোঝেন? তার মানে কি আপনার ধারণা, চিনে ভাষার কোনও মানে নেই? সমস্ত চাইনিজরা মিনিংলেস ভাষায় কথা বলে? শিখলেই চিনে ভাষার ঐশ্বর্য বোঝা যায়। ছবি দেখাও শিখতে হয়। না শিখে কথা বলতে আসে মূর্খরা।

চন্দনদা এবার আমার দিকে ফিরে বলল, নীলু, গাড়ি থেকে আমার ক্যামেরাটা নিয়ে আয়। এটা আবার কেউ মুছে ফেলার আগেই একটা ছবি তুলে রাখব। আর হ্যাঁ, আমি একশো টাকা পুরস্কার দেব বলেছিলাম। এই ছবি তার অনেক বেশি পাওয়ার যোগ্য। আমি দুশো টাকা দিচ্ছি।

পকেট থেকে পার্স বার করে চন্দনদা বলল, কোথায় ফুলমণি?

ভিড় ফাঁক হয়ে গেল, সবাই এ-দিক ও-দিক তাকাচ্ছে। ফুলমণি নেই। কয়েক জন ডাকাডাকি করতে লাগল ওর নাম ধরে। চন্দনদা পিকাসোর লম্বা গল্প ফাঁদার সময় ফুলমণি সরে পড়েছে।

আমি বারান্দায় গিয়ে দেখলাম, দূরে মাঠের মধ্য দিয়ে ছুটে ছুটে চলে যাচ্ছে ফুলমণি। শেষ বিকেলের ম্লান আলোয় তাকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন, কীসের মতো? কীসের মতো? কীসের মতো? নাঃ, আমার তো শিল্পীর চোখ নেই, কোনও উপমাও আমার মনে এল না।

॥ ৪ ॥

পরদিন কাজে এল না ফুলমণি।

চন্দনদার দুশো টাকা বাসন্তীর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে সাঁওতালদের অবিশ্বাস করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। বাসন্তী টাকাটা দিয়ে দিয়েছে, ফুলমণি নিতেও আপত্তি করেনি জানা গেল। চন্দনদার হাত থেকে নিতে ও লজ্জা পেয়েছিল। ওর এত লজ্জা আমি কখনও দেখিনি।

এরা পয়সা জমাতে জানে না। হাতে পয়সা থাকলে কাজ করতেও চায় না। ফুলমণির রোজ ছিল বাইশ টাকা, এক সঙ্গে দুশো টাকা পেয়েছে, এখন কত দিন কাজে আসবে না কে জানে! পর পর তিন দিন পাত্তা পাওয়া গেল না তার।

চন্দনদাই ছটফট করছে বেশি।

চন্দনদা অন্য রকম একটা প্ল্যান করে রেখেছিল। এখানে অনেক ট্রেসিং পেপার লাগে, সেগুলো পাঠানো হয় শক্ত কাগজে মোড়া প্যাকেটে। সেই শক্ত কাগজগুলো কেটে কেটে ঠিক মতো সাইজের করা হল। দু'তিন রকম রঙও জোগাড় করেছে চন্দনদা। সেগুলো আমাকে দিয়ে বলেছিল, তুই ফুলমণিকে এই কাগজের ওপর রঙ দিয়ে ছবি আঁকতে বলবি। আঙুল দিয়ে হোক বা যে-ভাবেই আঁকুক। দেয়ালে চুন দিয়ে আঁকা ছবি কিংবা তার ফটোগ্রাফেরও বিশেষ কোনও মূল্য নেই। কাগজের ওপর আঁকা কয়েকখানা ছবি কলকাতায় নিয়ে গিয়ে নাম করা দু'এক জন শিল্পীকে দেখানো যেতে পারে। তাদের মতামত শুনে বোঝা যাবে, সত্যিই মেয়েটার ছবি আঁকার ক্ষমতা কতখানি।

কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কোথায় ফুলমণি? সে নিজে থেকে না এলে তো তাকে জোর করে ধরে আনা যায় না!

আমার ঘরে এসে সন্ধেবেলা চন্দনদা খাটে শুয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করল, মেয়েটা আজও আসেনি?

আমি বললাম, নাঃ! ওর গ্রামের অন্য মেয়েদের জিজ্ঞেস করলেও কিছু বলতে পারে না। আদিবাসীরা কোনও প্রশ্নেরই সরাসরি উত্তর দেয় না। হয় হাসে, অথবা ঘুরিয়ে অন্য কথা বলে। আমি বাসন্তীকে জিজ্ঞেস করলাম, ফুলমণি কেন আসছে না। তার উত্তরে ও প্রথমে খিল খিল করে হাসল। তারপর বলল, আমি যদি এক রোজ না আসি, তুই আমার কথা জিগাস কি ছোটবাবু? বোলো? এরপর কি ফুলমণি সম্পর্কে আর কৌতূহল দেখানো যায়?

চন্দনদা বলল, দেখ নীলু, আমি ছবি আঁকা কনটিনিউ করিনি বটে, কিন্তু ছবি আমি মোটামুটি বুঝি! আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও মেয়েটা একটা জিনিয়াস। আজকাল ছবির বাজার দারুণ ভাল। একটু নাম-করা শিল্পীদের ছবি পনেরো, কুড়ি, তিরিশ, পঞ্চাশ হাজার টাকা দামে বিক্রি হয়। হুসেনের এক-একখানা ছবির দাম লাখ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। কিছু দিন আগে একটা গ্যালারিতে এক জন প্রায় নতুন শিল্পীর এক্জিবিশান দেখতে গেসলাম। এক-একটা ওয়াটার কালার ছবির দাম ধরেছে পাঁচ হাজার টাকা। আমার ধারণা, এই মেয়েটাও ছবি এঁকে যথেষ্ট রোজগার করতে পারে। একটা গ্রামের অশিক্ষিত গরিব মেয়ে বলে সুযোগ পাবে না, তার গুণের কদর হবে না, কেন?

একটা কথা জিজ্ঞেস করি, চন্দনদা। এইটাই আমার কাছে ধাঁধার মতো লাগে। সাধারণ গরিব মানুষ, যাদের খাওয়া-পরার চিন্তাতেই সারা দিন কেটে যায়, তাদের প্রায় কেউই ছবি-টবির ব্যাপার জানেই না, তবু হঠাৎ দু'এক জন ছবি আঁকতে চায় কেন?

তুই আদিম গুহামানবদের আঁকা ছবি দেখিসনি? তারা কি ছবির বিষয় কিছু জানত? তাদেরও শুধু খাবার জোগাড়ের চিন্তায় দিন কাটত। তখন স্ট্রাগল ফর একজিসটেন্স ছিল সাঙ্ঘাতিক। তবু তো তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছবি এঁকেছে।

অনেকে যে বলে, খুব বৃষ্টির মধ্যে যখন ওরা গুহা থেকে বেরুতে পারত না, তখনই ওরা সময় কাটাবার জন্য দেয়ালের গায়ে ছবি এঁকেছে।

সময় কাটাবার জন্য অধিকাংশ মানুষই পড়ে পড়ে ঘুমোয়। কিংবা অন্যের সঙ্গে খুনসুটি করে কিংবা সেক্স-এর তালে থাকে। মাত্র দু'এক জনেই ছবি আঁকে। এটাই একটা রহস্য। হাজার হাজার মানুষের মধ্যে হঠাৎ দু'এক জন গানের গলা পায়। দু'এক জন কিছু না শিখেও ছবি আঁকতে পারে, দু'এক জন কবি হয়। শিল্পের লাইনে উন্নতি করতে গেলে সবাইকেই শেষ পর্যন্ত শিখতে হয়, সাধনা করতে হয়। কিন্তু ভেতরে কিছু জিনিস না থাকলে তো হাজার ট্রেইনিঙে শিল্পী হওয়া যায় না। এক-এক জনের আবার এই ভেতরের জিনিসটা থাকলেও সুযোগের অভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আমাদের দেশে এখন শহরের লোকেরা যত সুযোগ পায়, গ্রামের লোকেরা তার কিছুই পায় না।

শহরের লোকেরা...ইদানীং সব বড়লোকের ছেলে-মেয়েরাই ছবি আঁকা শিখতে যায়, যেখানে সেখানে গানের স্কুল আর কবি, কবিদের তো স্কুলও লাগে না, হাজার হাজার কবি, সবাই ভাবে কবিতা লেখাটা খুব সহজ। রিটায়ার্ড জজ, ডকের মজুর, যাবতীয় স্কুলমাস্টার, যাবতীয় প্রেমিক দু'চার-লাইন লিখেই ভাবে, এই তো কবিতা হয়ে গেল। আজকাল তো আবার ছন্দ মিলেরও ব্যাপার নেই! তুইও কবিতা লেখার চেষ্টা করেছিস নাকি কখনও নীলু?

রক্ষে করো! দেখছ না আমার হাতের আঙুল, এই আঙুলে কখনও কবিতা বেরুতে পারে? আমি ভুলেও কখনও সে-চেষ্টা করিনি!

চন্দনদা উঠে বসে খানিকক্ষণ আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এই রকম মুখের ভাব দেখলেই বুঝতে পারি, চন্দনদার মাথায় আবার নতুন কোন প্ল্যান ঘুরছে।

চন্দনদা গাঢ় গলায় বলল, দেখ নীলু, ওই ফুলমণি মেয়েটার সত্যিকারের প্রতিভা আছে। সেটাকে নষ্ট হতে দেওয়াটা বিরাট অন্যায়। আমাদের কিছু দায়িত্ব নেই? তাহলে আমরা কীসের মানুষ?

আমি আমতা আমতা করে বললাম, কিন্তু মেয়েটা যদি নিজে না চায়।

ওকে বোঝাতে হবে! ওকে দিয়ে আরও আঁকাতে হবে। আমি ওকে গোল্লায় যেতে দিতে কিছুতেই রাজি নই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, মুশকিল এই, আমি নিজে কিছু করতে পারব না ওর জন্য। আমি কোনও দায়িত্ব নিতে পারব না।

কেন?

তার কারণ, ও একটা মেয়ে।

তাতে কী হয়েছে?

আরে মেয়ে বলেই তো ঝামেলা। ওর কোনও উপকার করতে গেলেই তোর বউদি খেপে যাবে। সেবারে রোহিণীকে নিয়ে কী কাণ্ড হল মনে নেই? নীপার ধারণা, কোনও মেয়েকে আমি যদি কিছু সাহায্য করতে যাই, তার মানেই আমি মেয়েটার প্রেমে পড়ে গেছি!

যাঃ, কী বলছ চন্দনদা! ফুলমণি সম্পর্কে এ প্রশ্নই ওঠে না। একটা রোগা হাড় জিরজিরে মেয়ে, সাত চড়ে রা কাড়ে না, কোনও কথাই বলে না, তার সঙ্গে আবার প্রেম হতে পারে নাকি!

তুই বুঝবি না, মেয়েদের কেকীসে কখন ঈর্ষা হয়! তুই আর মেয়েদের সম্পর্কে কতটুকু জানিস! ওই ফুলমণিটা যদি একটা ছেলে হত, আমি নিজের টাকা খরচ করে ওকে কোনও আর্টিস্টের কাছে কিছু দিন রেখে দিতাম, ওর ছবির প্রদর্শনী নিয়ে সারা ভারতে ঘুরতাম! কিন্তু ওর বেলায় তা পারব না, তোকেই ভার নিতে হবে। তোকে তো আর কেউ প্রেমে পড়ার বদনাম দেবে না, আর বদনাম দিলেই-বা তোর কী আসে যায়?

এই সময় হরিলাল হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরে এসে খবর দিল, কলকাতা থেকে একটা গাড়ি এসেছে, গাড়ি ভর্তি লোক, তারা চন্দনদাকে খুঁজছে।

আমরা ওপর থেকেই উঁকি মেরে দেখলাম, লালুদার লাল রঙের মারুতি গাড়ি। ভেতরে নীপাবউদি, মুমু আর ওদের বাড়ির রান্নার লোকটি।

লালুদার ওইটুকু গাড়ি থেকে এত জিনিস বেরুতে লাগল যে, মনে হল যেন ম্যাজিক। দু'তিন হাঁড়ি মিষ্টি, অনেক রকমের ফল, বাক্স বাক্স চিজ, বিস্কিট, মাখনের টিন, সার্ডিন মাছের টিন, পাঁউরুটি, জ্যাম, জেলি, আচার...।

এসেই লালুদা ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধিয়ে দিল।

দারুণ ভাবে শুরু হল রান্নাবান্নার তোড়জোড়। রাত আটটা বেজে গেছে, এ সময় এখনও কোনও দোকান খোলা থাকে না, গ্রামে লোক পাঠিয়ে আনা হল মুরগি। লালুদা নিজে মদ খায় না, সিগারেট খায় না। অথচ সঙ্গে এনেছে হুইস্কি-ব্র্যান্ডির বোতল, দামি দামি সিগারেটের প্যাকেট। চন্দনদার বাংলোয় আড্ডা চলল রাত পৌনে তিনটে পর্যন্ত।

পরদিন সকাল থেকেই আবার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। লালুদা যেখানে থাকে, সেখানে অন্যদের কথাও বলতে দেয় না, পয়সাও খরচ করতে দেয় না। গ্যাস বিক্রির টাকা যেন অফুরন্ত।

আমাকে ন'টার সময় ঠিক কাজে যেতে হয়। লালুদা সেখানেও উপস্থিত। বাড়ির কনস্ট্রাকশান বিষয়ে আমাকে কত না উপদেশ দিল তার ঠিক নেই। ওটা যে আমার কাজ নয়, তা বলারও সুযোগ পেলাম না। লালুদাকে মহিমবাবুর সঙ্গে ভিড়িয়ে দিতে পারলে হত। মহিমবাবু এ-দিকে আসেননি।

পাঁচ দিন হয়ে গেল, ফুলমণিরও দেখা নেই।

সন্ধেবেলা চন্দনদা আমাকে চুপি চুপি খানিকটা ভর্ৎসনা করে বলল, নীলু তুই মেয়েটার একটা খবর নিলি না? যদি অসুখ-বিসুখ হয়ে থাকে? ওই তো রোগা চেহারা, যদি মরে যায়। কাল রবিবার, কাল তুই ওদের গ্রামে যেতে পারিস না?

আমি চুপ করে রইলাম।

ওই রকম একটা ইচ্ছে আমারও হয়েছিল, কিন্তু ঠিক সাহস পাচ্ছি না। আদিবাসীদের গ্রামে এখন আর চট করে যাওয়া যায় না, ওরা সন্দেহ করে। অবস্থা অনেক বদলে গেছে। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ফাত্রি এখন আর চলে না। আমার মতো একটা ছোকরা গ্রামের মধ্যে ঢুকে একটা মেয়ের খোঁজ করলে ওর স্বামীটাই হয়তো আমাকে ধরে পেঁদিয়ে দেবে। আর যদি তীর-ধনুক দিয়ে...।

মাথায় অন্য একটা মতলব এসে গেল।

রাত্তিরে খাওয়ার টেবিলে যখন গল্প বেশ জমে উঠেছে, তখন আমি ফস করে বলে উঠলাম, মুমু কাল সকালে আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবি? একটা মস্ত বনতুলসীর ঝোপ আছে, সেটা পেরিয়ে একটা ছোট্ট পাহাড়ের পাশে ঝরনা।

মুমু বলল, হ্যাঁ যাব, হ্যাঁ যাব।

লালুদা অমনি বলল, কোথায় যাবে নীলমণি? আমি গাড়ি করে নিয়ে যাব। সবাই মিলে যাব।

আমি বললাম, না, গাড়িতে গেলে হবে না। সবাই মিলে গেলেও হবে না। একবার শুধু মুমু আর আমি এই ছোটপাহাড়ীতে এসেছিলাম। তখন যে-সব জায়গায় ঘুরেছি। এখন আমরা দু'জনে সেই সব জায়গা আর একবার দেখব।

লালুদা বলল, ও, সেই যেবার তুমি মুমুকে নিয়ে ইলোপ করেছিলে নীলকণ্ঠ?

নীপা বউদি হেসে ফেলল।

আমি বললাম, দু'বছর আগে মুমু আরও ছোট ছিল। ওর বয়েস তখন এগারো। এগারো বছরের মেয়েকে নিয়ে কেউ কখনও ইলোপ করে?

মুমুটা অতি দুষ্টু। মিচকি হেসে বলল, হ্যাঁ, ঠিকই তো। এই নীলুকাকা, তুমি সেবার কী সব মিথ্যে কথা বলে আমাকে নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলে তো!

লালুদা বলল, তারপর তুমি মুমুকে অযোধ্যা পাহাড়ে ছেড়ে দিয়ে হাওয়া হয়ে গেলে। নীলকমল, আমার সব মনে আছে।

চন্দনদা আমার দিকে তাকিয়ে সমর্থনের হাসি দিল।

মুমু আমার পাসপোর্ট। মুমুর মতো একটি কিশোরী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে কোনও আদিবাসীদের গ্রামে গেলে কেউ ভাববে না, আমি কোনও কুমতলবে এসেছি। ফুলমণির গ্রামের কয়েক জন আমাকে চেনে, ওরা আমার কাছে কাজ করে, ওদের মোটেই উগ্র-হিংস্র বলে মনে হয় না, তবু সাবধানের মার নেই। মুমুর মুখখানায় সদ্য কৈশোরের লাবণ্য মাখা, ওকে দেখলেই পছন্দ করে সবাই।

পরদিন ভোরবেলা, লালুদা জাগবার আগেই বেরিয়ে পড়লাম আমি আর মুমু।

রাত্তিরে বেশ জোর কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে! ভোরের বাতাস রীতিমতো শিরশিরে। বৃষ্টির জলে এখানে কাদা হয় না, মাটিতে সোঁদা সোঁদা ভাব। গাছপালাগুলো সব যেন স্নান করে ফিটফাট সেজে আছে।

মুমু বলল, আগের বার তো আমরা পাহাড়ের দিকে যাইনি!

আমি বললাম, তুই তো চন্দনদার ওপর রাগ করে, অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করে ঘুমিয়ে পড়লি এক সময়। তারপর তো সন্ধেবেলায় আমরা ফিরে গেলাম কলকাতায়। দুপুরটাতে আমি একা একা এ-দিকে ঘুরে গেছি। একটা খুব সুন্দর ছোট্ট নদী আছে।

মুমু বলল, অ্যাই ব্লু, আমার যখন আঠেরো বছর বয়স হবে, তখন তুমি আমাকে নিয়ে সত্যি ইলোপ করবে? বেশ মজা হবে তাহলে!

আমি বললাম, তুই যা সুন্দর হচ্ছিস দিন দিন, আঠেরো বছরে তোর এত বন্ধু জুটে যাবে যে তখন আমাকে প্রায় পাত্তাই দিবি না!

আঠেরো বছর বয়স হয়ে গেলে বুঝি অনেক বন্ধু হয়?

হ্যাঁ, তখনই তো জীবনের শুরু।

ইস, কবে যে আঠেরো বছর আসবে!

আর পাঁচ বছর বাদেই।

এই শোনো ব্লু, আঠেরো বছর বয়েসে যখন আমার অনেক বন্ধু হয়ে যাবে, তখন আমি যদি তোমাকে পাত্তা না দিই, তুমি কিন্তু তখনও আসবে আমার কাছে। তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না।

আহা-হা-হা, তুই অন্য বন্ধুদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবি, তবু আমি তোর কাছে আসব কেন রে?

হ্যাঁ, তোমাকে আসতেই হবে। আসতেই হবে। বলো আসবে?

সে আমি এখন কিছু বলতে পারছি না।

না, তুমি আসবে। প্রমিস করো। এক্ষুনি প্রমিস করো। না হলে আমি যাব না।

মুমু একটা সোনাঝুরি গাছের তলায় দাঁড়িয়ে পড়ল।

হালকা সোনালি রঙের সালোয়ার-কামিজ পরে এসেছে আজ, রঙটার সঙ্গে ভোরের রোদ্দুরের মিল আছে। মাথার চুল উড়ছে একটু একটু। চোখের কোণে এখনও যেন ঘুম লেগে আছে একটু একটু। ছেলেমানুষিতে ভরা মুখখানাতে রাগ রাগ ভাব।

মেয়েটা সত্যিই খুব রূপসী হবে। এর মধ্যেই লম্বা হয়েছে অনেকটা।

কাছে গিয়ে ওর কাঁধে হাত দিয়ে বললাম, পাগলী একটা! পাঁচ বছর আগেকার প্রতিজ্ঞার কি কোনও দাম আছে? পাঁচ বছরে কত কী বদলে যেতে পারে! পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আমি ঠিক এক বছরের ফিলোজফি নিয়ে বেঁচে থাকি।

মুমু আমার হাত ছাড়িয়ে সরে গিয়ে বলল, এক বছরের ফিলোজফি? মানে কী আগে বলো!

আমি বললাম, সেই গল্পটা জানিস না। এক জন বিদেশিকে এক রাজা মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দিল।

মৃত্যুদণ্ড...মানে ডেথ সেনটেন্স?

হ্যাঁ। মৃত্যুদণ্ড মানে ডেথ সেনটেন্স। আজকাল অনেক বাংলা কথার ইংরিজিতে মানে বলে দিতে হয়।...রাজা মৃত্যুদণ্ড দেবার পর সেই বিদেশি বলল, মহারাজ, আমাকে যদি বাঁচিয়ে রাখেন, তাহলে আপনার সব চেয়ে যে প্রিয় ঘোড়াটা, সেটাকে আমি আকাশ দিয়ে ওড়া শিখিয়ে দিতে পারি, আপনি সেটায় চেপে আকাশে ঘুরবেন। মহারাজ শুনে হকচকিয়ে গিয়েও বললেন, ঠিক আছে, তোমাকে আমি এক বছর সময় দিলাম। লোকটাকে জেলখানায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার পর অন্য এক জন কয়েদি বলল, তুমি কি পাগল নাকি? ওই কথা বললে! ঘোড়া কখনও আকাশে উড়তে পারে? বিদেশিটি বলল, শোনো, এই এক বছরের মধ্যে রাজা মরে যেতে পারেন, ঘোড়াটা মরে যেতে পারে, কিংবা এমন কিছু আবিষ্কার হতে পারে যাতে সত্যি সত্যি ঘোড়াকে আকাশে ওড়ানো যায়। এই সব কথা ভেবে ভেবে আরও অন্তত একটা বছর তো বেশ মজায় কাটানো যাবে!

মুমু খিল খিল করে হেসে বলল, আমি এর নাম দিলাম, নীললোহিত ফিলজফি!

এই রাগ, এই হাসি, এর নাম কৈশোর!

বনতুলসীর জঙ্গলটা পার হয়ে আমরা পৌঁছলাম নদীটার ধারে। এখন মোষেরা পার হচ্ছে না, বকেরাও নেই, তবু নদীটি ফুলমণির আঁকা ছবি হয়ে আছে।

আমি বললাম, তুই সাঁতার শিখেছিস, এখন তো জলে ভয় পাস না!

মুমু ঠোঁট উলটে বলল, মোটে একটুখানি জল, এর মধ্যে সাঁতার কাটা যাবে নাকি?

হেঁটেই পার হতে হবে, তবে এক-এক জায়গায় গভীর আছে। মোষ ডুবে যায়। কিন্তু তোর সালোয়ার-কামিজ যে ভিজে যাবে!

তুমি আগে বললে না কেন? এর তলায় সুইমিং সুট পরে আসতাম!

এক কাজ করা যেতে পারে। আমি হব সিন্দবাদ নাবিক আর তুই হবি বুড়ো, শক্ত করে আমার গলাটা ধরে থাকবি, আমি তোকে পিঠে নিয়ে পার করে দেব।

আমার বুড়ো হতে বয়ে গেছে। ভিজুক গে সালোয়ার!

যে-কোনও নদী পার হতে গেলেই আমার দিকশূন্যপুরের কথা মনে পড়ে। সেখানকার নদী অবশ্য বেশ বড়, খানিকটা সাঁতার দিতেই হয়। সেখানকার বালি সোনার দানার মতো। এ নদীতে বালি নেই, শুধু পাথর।

অল্প জল হলেও স্রোতের টান আছে বেশ।

ছুটির দিনে আমি পাজামা-পাঞ্জাবি পরে আছি। পাজামা ঊরু পর্যন্ত গুটিয়ে নিতেও অসুবিধে নেই। চটিগুলো আস্তে ছুঁড়ে দিলাম অন্য পাড়ে। জল বেশ ঠাণ্ডা। মুমু আমার হাত ধরে এগোতে লাগল।

এই সকালবেলা মুমুর হাত ধরে এক সঙ্গে নদী পার হবার মধ্যে যে ভাল লাগা, তা শুধু আজকের জন্য নয়, এক বছরের জন্যও নয়, তা চিরকালের।

মাঝখানটায় বেশ জল, মুমুর কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল, আমি ওকে জোর করে তুলে নিলাম বুকে। মুমু হাত-পা ছুঁড়ে আপত্তি জানাতে লাগল, আমি প্রায় দৌড়ে চলে এলাম এ পাড়ে।

পোশাকের ওপরের অংশটা না ভিজলেই হল। তলার দিকটা ভিজলে তেমন ক্ষতি নেই, গায়ে ঠাণ্ডা বসে না।

এতক্ষণ একটাও মানুষজন দেখিনি, এবার দেখা গেল দুটো বাচ্চা ছেলেকে। ওরা কী একটা দুর্বোধ্য গান গাইছে। এক লাইন এক জন, আর এক লাইন অন্য জন।

ওদের ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, এই, পিঁজরাল গাঁওটা কোন দিকে রে?

উত্তর না দিয়ে ছেলে দু'টি পাহাড়ের তলা দিয়ে এক দিকে ছুটে গেল অনেকখানি। একটা বড় শিমুল গাছের তলায় থেমে হাতছানি দিয়ে আমাদের ডাকল। কাছে যেতে এক জন বলল, এই নিচা দিয়ে চলে যাও। হুঁই দেখো পিঁজরাল গাঁও।

ওবা আগে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখান থেকেই নির্দেশ না দিয়ে যে এই পর্যন্ত ছুটে এল, সেটাই এ-দিককার মানুষের বিশেষত্ব। যদি বলতাম, আমাদের এই গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে চল তো, তা-ও যেত অম্লানবদনে। আমি ছেলে দুটোর মাথার চুলে হাত ডুবিয়ে আদর করে দিলাম।

মুমু জিজ্ঞেস করল, আমরা পাহাড়টার ওপরে উঠব না?

আগে চল পিঁজরাল গ্রামটা ঘুরে আসি।

সেখানে কী আছে?

সেখানে একটা মেয়ে আছে, ছবি আঁকে, তোর চেয়ে অনেক বড়, বোধহয় আমার বয়সী, তার সঙ্গে একটু দেখা করতে হবে!

ও, তুমি একটা অন্য মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ। সে-কথা আগে বলোনি!

চন্দনদা ঠিকই বলেছিল, মেয়েদের যে কখন, কেন ঈর্ষা জেগে ওঠে, তা বোঝা দুঃসাধ্য।

মুমু মুখ গোঁজ কবে বলল, আমি এখন এই পাহাড়টার টপে উঠব!

আমি হেসে বললাম, তাহলে তোকে একা উঠতে হবে ভাই। আমি আগে গ্রামটায় যাব।

তুমি পাহাড়ে যাবে না আমার সঙ্গে?

তুই আমার সঙ্গে গ্রামে যাবি না! কে কার সঙ্গে কখন কোথায় যাবে সেটা আগে ঠিক করা যাক।

ব্লু, তুমি একটা অতি পাজি, মিথ্যেবাদী, গুড ফর নাথিং, বেবুন, ব্লিস্টারিং বার্নাক্‌ল, থান্ডারিং টাইফুনস।

এই, আমাকে গালাগালি দিবি না বলছি মুমু। এখানে কেউ নেই, মেরে তোকে ঠাণ্ডা করে দেব।

ইস, মারো তো দেখি! দেখি তোমার গায়ে কত জোর। আমিও বুঝি মারতে জানি না?

আমি খপ করে মুমুর একটা হাত চেপে ধবে কটমট কবে ওর দিকে তাকালাম।

তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বললাম, চল, আগে গ্রামটা ঘুরে অ, চট করে। বেশি বেলা হলে চড়া রোদ উঠে যাবে। বিকেলে পাহাড়ে উঠব।

মুমু এবার দৌড়তে লাগল আমার সঙ্গে। এ-সবই আমাদের খেলা।

পিঁজরাল গ্রামে পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগল না। এখানকার সব লোকই এর মধ্যে জেগে গেছে। একটা গোয়ালে গরুর দুধ দোয়াবার চ্যাঁ চোঁ শব্দ হচ্ছে। সরু রাস্তা দিয়ে ছোটাছুটি করছে মুরগি।

এক জন কালো পাথরের তৈরি মূর্তির মতো লোক একটা ছোট মোষের বাচ্চাকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে, তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, ও মাঝি, ফুলমণি কোন বাড়িতে থাকে?

লোকটি একটুও অবাক হল না, কোনও রকম কৌতূহলও প্রকাশ করল না। খানিকটা এগিয়ে একটা মেঠো পথ দেখিয়ে বলল, হুই যে তালগাছ, তার পাশে।

আমার আগের অভিজ্ঞতায় জানি, সাঁওতালরা খুবই অতিথিপরায়ণ হয়, মানুষকে সহজেই বন্ধু ভাবে নেয়। কোনও কারণে ওরা খেপে গেলেই মুশকিল। বাইরের কিছু লোক নানা ধরনের বাঁদরামি করে ওদের খেপে যাবার কারণও ঘটিয়েছে।

তালগাছটা পর্যন্ত যাবার আগেই একটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল বাসন্তী।

সে হাসিমুখে বলল, আরে ছোটোবাবু, ফুলমণির খবর নিতে এসেছো বুঝি?

নিজের ওপর পুরো দায়িত্ব না দিয়ে আমি বললাম, বড়বাবু পাঠালেন। ও আর কাজ করবে কি না জানা দরকার। না হলে নতুন লোক নিতে হবে।

বাসন্তী মুমুর দিকে চেয়ে বলল, কী সোন্দর বিটিয়া। তোমার মেয়ে বুঝি?

মুমু লাজুক ভাবে আমার দিকে তাকাল।

আমি বললুম, আমাকে এত বুঢ়া ভাবিস বুঝি? আমার এত বড় মেয়ে থাকবে কী করে? এ তো বড়বাবুর মেয়ে।

বাসন্তীকে নিয়ে আমরা ঢুকলুম ফুলমণির বাড়ির আঙিনায়।

কোন সাঁওতালের বাড়িই আমি অপরিচ্ছন্ন দেখিনি। যত গরিবই হোক, ওরা ঘর-দোর-উঠোন ঝকঝকে তকতকে করে রাখে। মাটির বাড়ির দেওয়ালেও এক ময়লা দাগ থাকে না।

এ বাড়ির উঠোনে একটা খাটিয়ার ওপর বসে আছে এক বৃদ্ধ। মাথার চুল ধপধপে সাদা, চোখে একটা নিকেলের ফ্রেমের চশমা, তার কাচ এত মোটা যে বৃদ্ধটি প্রায় চোখে দেখতে পায়ই না বলা যেতে পারে। বৃদ্ধটির হাতে একটা হুঁকো।

আমাদের পায়ের শব্দ পেতেই বৃদ্ধটি মুখ ফিরিয়ে বললেন, কউন?

আমি বললাম, নমস্কার।

বৃদ্ধটি এবার চোখ কুঁচকে আমাদের দেখার চেষ্টা করে পরিষ্কার বললেন, আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

আমি বললাম, ছোটপাহাড়ি থেকে। এ বাড়ির ফুলমণি সেখানে কাজ করে। অনেক দিন যাচ্ছে না।

বাসন্তী বৃদ্ধের কাছে গিয়ে নিজেদের ভাষায় কী সব বোঝাল।

বৃদ্ধ দু'বার মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, হাঁ? বসুন, বসুন, এই বসবার জায়গা দে।

বাসন্তী একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে দুটো মাছিয়া নিয়ে এল। সে-দুটোতে আমি আর মুমু বসলাম একটা আতা গাছের নিচে।

বাড়ির পেছন দিক থেকে এবার এল ফুলমণি, তার দু'হাতে মাটি লাগা। আমাদের দেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

আমি বললাম, কী ফুলমণি, তুমি আর কাজে যাও না কেন?

ফুলমণি মৃদু গলায় বলল, যাব।

যাক, মেয়েটা তাহলে সত্যিই বোবা নয়। এই প্রথম ও আমার সঙ্গে সরাসরি কথা বলল। ওর গলার আওয়াজটা খসখসে ধরনের, ইংরিজিতে যাকে বলে হাস্‌কি ভয়েস।

বৃদ্ধ বললেন, ঘরের ছাদটা ফুটো হয়ে গেছে। সেই ছাদটা সারাচ্ছে ক'দিন ধরে। আমি তো কোনও কাজ করতে পারি না।

তারপর ব্যস্ত হয়ে বাসন্তীকে বললেন, আরে বাবুদের জন্য চা নিয়ে আয়।

আমি বললাম, না না, আমরা চা খাব না। আমরা এ-দিকে বেড়াতে এসেছিলাম, এক্ষুনি চলে যাব।

তাহলে লাড্ডু খান।

মুমু বলল, আমি এক গেলাস জল খাব।

ফুলমণি জল আনতে ভেতরে চলে গেল।

বাড়িটার মাটির দেওয়ালে নানা রকম ছবি আঁকা। রঙিন ছবি। কিন্তু এ ছবিগুলো এমন কিছু দর্শনীয় নয়। বিভিন্ন ঠাকুর-দেবতা, বজরংবলী। গোদা গোদা ধরনের। একেবারে অপটু হাতের কাজ নয়, তবে ফুলমরি আঁকা যে-ছবি দুটো আগে দেখেছি, তার সঙ্গে মেলে না।

আমি বৃদ্ধকে বললাম, ফুলমণি তো ভাল ছবি আঁকে। কোথায় শিখল?

বাসন্তী বলল, এগুলো ফুলমণির শ্বশুর এঁকেছে গো।

বৃদ্ধ বললেন, হাঁ, আমি ছবি আঁকতাম। আগে মেলায় মেলায় গিয়ে অনেক ছবি বিক্রি করেছি। এখন চক্ষে দেখি না। ভগবান চোখের রোশনি কমিযে দিয়েছে।

যাক। তাহলে একটা পটভূমি আছে। ফুলমণি একেবারে আকাশ থেকে পড়ে ছবি আঁকতে বসেনি। বাড়িতে একটা ছবির কালচার আছে। শ্বশুরের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছে, কিছু শিখেছে। ওর ভেতরে ছবি আঁকার বীজ ছিল, সেটা জল-মাটি পেয়েছে। অনেক সময় শিষ্য ছাড়িয়ে যায় গুরুকে। তাই দেয়ালের এই গোদা গোদা ছবির চেয়ে ফুলমণির ছবির অনেক তফাৎ।

বাসন্তীকে জিজ্ঞেস করলাম, ওর মরদ কোথায়?

বাসন্তী ডান হাতটা দু'বার ঘোরাল। অর্থাৎ নেই। কিন্তু বিয়ে হয়নি, না মরদ ওকে পরিত্যাগ করেছে, না মরে গেছে, তা ওই একটা ইঙ্গিত থেকে বুঝব কী করে? তবে শ্বশুর যখন আছে, তখন বিয়ে হয়েছিল নিশ্চয়ই।

ফুলমণি দুটো কাঁসার গেলাস, এক ঘটি জল ও একটা কলাই করা প্লেটে কয়েকটা তিলের নাড় নিয়ে এল। এরাও অতিথিকে শুধু জল দেয় না।

মুমু আমার দিকে বিপন্ন ভাবে তাকাল। অর্থাৎ সে নাড় খাবে না। লোরেটো স্কুলে পড়া মেয়ে তিলের নাড় খাবে, তিলের নাড় দের অত সৌভাগ্য আজও হয়নি।

আমিই একটা মুখে দিলাম। না, খেতে সত্যিই ভাল নয়। একবার একটা বাড়িতে তিলের নাড় গোপনে ছুঁড়ে ফেলে দিতে গিয়ে আমাকে খুব জব্দ হতে হয়েছিল। এখানে ও-সব চলবে না।

জলটা খুব ঠাণ্ডা আর সুস্বাদু।

বৃদ্ধ বললেন, আমার আঁকা আরও ছবি দেখবেন? এই, ভিতর থেকে নিয়ে আয় না। আমি কলকাতাতেও গেছি বাবু। যামিনীবাবু ছিলেন না এক জনা, যামিনীবাবু খুব বড় আর্টিস, তিনি আমার ছবি দেখেছিলেন। বাঁকুড়ায় তাঁর বাড়িতে ডেকেছিলেন।

ফুলমণি ভেতর থেকে অনেকগুলো বড় বড় কাগজ নিয়ে এল। তাতে রঙিন ছবি আঁকা। তুলি দিয়ে আঁকা হয়েছে। একটু মলিন হয়ে গেছে ছবিগুলো।

আমরা মাছিয়া-দুটো এগিয়ে নিয়ে গেলাম বৃদ্ধের খাটিয়ার কাছে।

বৃদ্ধা চশমা খুলে ঝুঁকে পড়ে বলল, এটা কোন ছবি রে?

বাসন্তী বলল, রাম-লছমন আর সীতাজি।

বৃদ্ধ বললেন, হাঁ, এটা ভাল। হনুমানজি সমুন্দর পার হচ্ছে, সেটা দেখা?

ডিসেম্বর মাসে এসপ্লানেড অঞ্চলে প্রচুর নতুন ক্যালেন্ডার দেখা যায়, তাতে এই ধরনের ছবি থাকে। কয়েকটা দেখার পরই একঘেয়ে লাগল। কিন্তু ভদ্রতা রক্ষার জন্য সবগুলো দেখতেই হবে। বৃদ্ধ দেখাচ্ছেনও খুব উৎসাহের সঙ্গে।

আমি একবার মুখ তুলে বাসন্তীকে জিজ্ঞেস করলাম, ফুলমণির এ-রকম কাগজে আঁকা ছবি নেই?

বাসন্তী ফুলমণিকে বলল, নিয়ে আয় না! আছে তো!

ফুলমণি প্রবল ভাবে মাথা নাড়ল।

বাসন্তী বলল, আমি আনছি।

ফুলমণি তার হাত চেপে ধরল। বাসন্তী তবু জোর করে তার হাত ছাড়িয়ে চলে গেল ভেতরে। নিয়ে এল পাঁচখানা ছবি।

প্রথম ছবিটাই সাঙ্ঘাতিক। অনেকখানি ফাঁকা মাঠ, তার মাঝখানে একটা বাচ্চা মেয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে। মাথার ওপর আকাশ। মেয়েটা ছাড়া আব কিছুই নেই বলে মাঠের মধ্যে মেয়েটার একাকিত্ব খুব দারুণ ভাবে ফুটেছে। আকাশের রঙ লাল, বৃষ্টির ফোঁটাগুলো লাল, আর মেয়েটার রঙ মেরুন। রঙের এমন সাহসী ব্যবহার কদাচিৎ দেখা যায়। ফুলমণি কি পল গগ্যাঁর ছবি দেখেছে নাকি?

বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোনটা? এটা কোনটা?

বাসন্তী বলল, সেই যে একটা ছোট মেয়ে গো। আমরা বলি, বড়কা মাঝির হারিয়ে যাওয়া মেয়ে।

বৃদ্ধ বললেন, হাঁ। আমার বহু তার ছবি ফিনিশ কবে না। অর্ধেক এঁকে রেখে দেয়। এই ছবিতে চার পাঁচখানা গাছ আঁকা উচিত ছিল কিনা বলুন! বৃষ্টিতে গাছের পাতা খসে পড়ছে, দু-একটা ছাগল-গরু থাকতে পারে, মেয়েটা মাঠে চরাতে নিয়ে গেছে।

আমার কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের একটা অংশ মনে পড়ল।

রাজা দুষ্মন্ত ছবি আঁকতে পারতেন। গর্ভবতী শকুন্তলাকে তিনি অন্যায় ভাবে তাড়িয়ে দিয়েছেন রাজসভা থেকে, তারপর ছ'বছর কেটে গেছে, হঠাৎ এক জেলের কাছ থেকে আংটিটা ফেরত পেয়ে রাজার সব মনে পড়ে গেছে। তখন রাজা দুষ্মন্ত বিরহে হা-হুতাশ করছেন আর শকুন্তলার ছবি এঁকে সেই ছবির সঙ্গে কথা বলছেন। রাজার বিদূষক মাধব্য রাজাকে সান্ত্বনা দিতে আসেন! মাধব্য দেখলেন রাজার আঁকা ছবিটি। দুই সখীর মাঝখানে, আমগাছে হেলান দিয়ে বসে আছে শকুন্তলা। ছবিটার খুব প্রশংসা করতে লাগলেন মাধব্য। তাই শুনে রাজা বললেন, ছবিটা এখন সম্পূর্ণ হয়নি। পেছনে আঁকা হয়নি, মালিনী-নদী, দূরে একটা পাহাড়ও থাকা দরকার। ওখানে হরিণের পাল ঘুরে বেড়ায়, একটা বড় গাছের ডালে ঋষিদের পরিধেয় বল্কল ঝোলে, একটা কৃষ্ণ মৃগ আর বাচ্চা হরিণ ওখানে খেলা করে, এই সবও ছবিটার মধ্যে দিতে হবে।

মাধব্য তখন মনে মনে বললেন, সর্বনাশ। এর পর লম্বা দাড়িওয়ালা বুড়ো বুড়ো ঋষিদের ভরিয়ে দিয়ে ইনি ছবিটা একেবারে নষ্ট করে ফেলবেন দেখছি।

মাধব্যের এই মন্তব্যেই বোঝা যায়, কালিদাস অতি উচ্চাঙ্গের আর্ট ক্রিটিক ছিলেন।

ফুলমণির এই ছবিটায় আর একটা দাগ টানলেই ছবিটি নষ্ট হয়ে যেত। ছবিটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে মাঠের মধ্যে একলা হারিয়ে যাওয়া মেয়েটির কান্নাও যেন শোনা যায়।

চন্দনদা ঠিকই ধরেছিলেন। ফুলমণি সত্যিকারের শিল্পী। ছাইচাপা আগুন। প্রত্যেকটা ছবিই ভাল, কল্পনা ও রঙের খেলায় অভিনব। পুরোপুরি বাস্তব বা ফটোগ্রাফিক করেও সে আঁকে না, ছবির বিষয়টা প্রধান হয় না, গল্প বলার চেষ্টা নেই। রেখা, রঙ ও আয়তন মিলে কিছুটা রহস্যময়তা এসে যায়।

এ-রকম ছবি বোঝার সাধ্য ওর শ্বশুরের নেই। অশিক্ষিত, গ্রাম্য পরিবারের এই বধূটির ক্ষমতা খানিকটা যেন অলৌকিকের পর্যায়ে পড়ে।

আমি ফুলমণির দিকে তাকালাম।

শীর্ণ চেহারায় এই অসুন্দর মেয়েটির মুখে এখন এমন একটা তীব্রতা ঝলমল করছে, যাতে একটা আলাদা রূপ ফুটে উঠেছে। অন্যদের থেকে এ মেয়েটি একেবারেই আলাদা।

মুমু ফিস ফিস করে বলল, নীলুকাকা, এই ছবিগুলো এক দিনের জন্য নিয়ে যেতে দেবে? বাবাকে দেখাতাম।

মুমু আমার ঠিক মনের কথাই বলল। আমি বৃদ্ধের উদ্দেশে জোরে বললাম, ছবিগুলো আমি নিয়ে যেতে পারি? পরে ফেরত দেব!

বৃদ্ধ বললেন, আগে এক জন বাবু এসেছিল। দু'বছর আগে। ক'খানা ছবি নিল। বলল, আবার আসবে। আর এল না।

ও, তাহলে ফুলমণির প্রতিভার আমরাই প্রথম আবিষ্কারক নই? আগেও কেউ দেখেছে। এবং সেই আগের কারণটি এদের কাছে অবিশ্বাসের কারণ ঘটিয়েছে। এই সব আগের লোকদের নিয়ে মহা জ্বালা হয়, আগের লোকদের জন্য পরের লোকদের ভুগতে হয়।

বললাম, আমি তো ছোটপাহাড়িতেই থাকি। ফুলমণি কাজ করতে যাবে, ওকে দিয়ে দেব।

বৃদ্ধ নিজের ছবিগুলো আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, ঠিক আছে, নিয়ে যান। কেউ যদি বিশ-পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনতে চায় বেচে দেবেন! যা দাম পাওয়া যায়। একশোটা টাকা পেলে একটা বকরি কিনব। বকরির দুধ খেলে আমার তাগৎ হয়।

দু'জনের আঁকা ছবিই গুছিয়ে নিয়ে একটু বাদে আমরা উঠে দাঁড়ালাম।

ফেরার পথে মুমু বলল, এই মেয়েটার যখন খুব মন খারাপ থাকে, তখন ও ছবি আঁকে, তাই না?

আমি চমকে গেলাম। মুমুর কাছ থেকে আমি এ-রকম কথা আশা করিনি। মুমু তো ছবি-টবির ধার ধারে না। ফুলমণিদের বাড়িতে ঢোকবার মুখে ও একবার বলেছিল, বড্ড গোবরের গন্ধ। এতক্ষণ ওকে বসিয়ে রেখে শাস্তিই দেওয়া হয়েছে।

আমি বললাম, তাই নাকি। কী করে তুই বুঝলি?

মুমু বলল, আমার মনে হল।

হয়তো মুমু ঠিকই বুঝেছে। এই মনে হওয়াগুলোর কোনও ব্যাখ্যা করা যায় না।

॥ ৫ ॥

নীপাবউদি বলল, এই সব ছবি, সত্যি একটা কামিন এঁকেছে?

চন্দনদা বলল, হ্যাঁ। নীলু ওর বাড়ি দেখে এসেছে। ওর শ্বশুরও ছবি আঁকে, সেগুলোও তো দেখলে।

নীপাবউদি বলল, এত ভাল যে আঁকতে পারে, তাকে দিয়ে তোমরা জনমজুরি করাচ্ছ? যার মাথায় রয়েছে এমন সব দারুণ ছবির আইডিয়া, তার মাথায় ইঁট বওয়াচ্ছ? চিনের কালচারাল রেভোলিউশানের পরেও তোমাদের শিক্ষা হল না?

চন্দনদা ছাত্রজীবনে নকশালপন্থী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল, সেই প্রসঙ্গে একটা খোঁচা দেওয়া হল।

চন্দনদা তর্কের মধ্যে না গিয়ে বলল, আমি কী করব বলো। এ ধরনের শিল্পীদের সাহায্য করা সরকারের কাজ। জীবিকার জন্য বেচারা ইঁট বওয়া ছাড়া আর কী করবে?

নীপাবউদি বলল, কেন, তোমাদের কোম্পানিও তো অনেক কিছু করে। পাহাড়ে চড়ার জন্য টাকা দেয়। আর এক জন শিল্পীকে দিতে পারে না?

মেয়েদের একটা পর্বত অভিযানের টিমকে স্পনসর করেছিল চন্দনদার কম্পানি। সেই দলের লিডার ছিল রোহিণী। সেই সময় ওই পর্বত অভিযান ও রোহিণীর সঙ্গে চন্দনদা একটু বেশি বেশি জড়িয়ে পড়েছিল। সেই ব্যাপারে আর একটি খোঁচা।

চন্দনদা আমার দিকে এমন ভাবে তাকাল, যার মানে হল, ফুলমণিকে এনে একবার তোর বউদির সামনে হাজির করাতে হবে। যাতে নীপা বোঝে যে, ফুলমণির সঙ্গে প্রেম করা সম্ভব নয়।

নীপাবউদি বৃষ্টিভেজা মেয়েটার ছবিটা তুলে ধরে বলল, এই ছবিটা আমার এত ভাল লাগছে, রেখে দিতে ইচ্ছে করছে। এটা যদি আমি কিনে নিই?

লালুদা এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল, যদিও চুপ করে থাকা তার স্বভাব নয়। এবারে ছবি বিষয়ে নীপাবউদির মতামত সবটা শুনে নিয়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, কেনো না, কেনো! কত দাম? সত্যিই অসাধারণ ছবি। এক্সেলেন্ট। মাস্টারপিস। কত দাম দিতে হবে, বলো না নীলমাধব! দুটোও তো কেনা যেতে পারে। এইটা আর ওইটা।

লালুদা অন্য হাতে হনুমানের সমুদ্র পার হবার ছবিটা তুলে ধরল।

নীপাবউদি বললো, ধ্যাৎ। ওটা তো ওর শ্বশুরের আঁকা, একেবারে বাজে। দুটো ছবির তফাৎ বোঝেন না?

লালুদা সঙ্গে সঙ্গে বলল, অফকোর্স তফাৎ আছে! খুবই তফাৎ। কোনও তুলনাই চলে না। বাচ্চা মেয়েটার ছবি, অপূর্ব, অপূর্ব! এটা কিনে ফেলা যাক। নীলাচল, কত দাম দিতে হবে? বেশি করে বলো, যাতে মেয়েটির সাহায্য হয়।

নীপাবউদি বলল, দাঁড়ান, দাঁড়ান, একবার মেয়েটিকে কিছু টাকা দিলে এমন কী সাহায্য হবে? ওর আত্মীয় স্বজনরা সেই টাকা খেয়ে ফেলবে। একটা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার, যাতে আজেবাজে কাজ ছেড়ে ও শুধু ছবি আঁকতে পারে। গভর্নমেন্টের কোনও স্কলারশিপ-টলারশিপ জোগাড় করা যায় না?

চন্দনদা বলল, এমনি এমনি কি হয়? একটা একজিবিশন করা দরকার, ক্রিটিকদের মতামত দরকার। সে-সব এখানে বসে কে করবে? কে ওর ব্যাপারে মাথা ঘামাবে?

হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়ায় চন্দনদা থেমে গেল। একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে হেসে নিয়ে বলল, একটা কাজ করা যেতে পারে। শিগগিরই আমি কলকাতায় যাব। শুক্কুরবার মহরমের ছুটি, শনিবারটা ম্যানেজ করলে পর পর তিন দিন, নীলু, তুইও আমার সঙ্গে কলকাতায় যেতে পারিস। ছবিগুলো নিয়ে চল। আমি তো সময় পাব না, তুই কয়েক জনকে দেখিয়ে আন।

সেই রকমই ব্যবস্থা হল। লালুদার ছোট গাড়িতে জায়গা হবে না। তাই এক সঙ্গেই বেরিয়ে চন্দনদা আর আমি এলাম ট্রেনে, অন্যরা গেল গাড়িতে।

কলকাতায় কোনও বড় আর্টিস্ট কিংবা ক্রিটিককে আমি চিনি না। মানে, আমি অনেককে চিনি, কিন্তু তাঁরা আমাকে চেনেন না। এ পর্যন্ত কখনও কোনও শিল্পীর বাড়িতে যাইনি।

শিল্পী শান্তনু চৌধুরীর বাড়িতে গিয়ে আমি হতাশ।

গলফ্ গ্রিনের একটা ফ্ল্যাটে থাকেন তিনি, চন্দনদাই নিয়ে গেল সেখানে। চন্দনদার সঙ্গে তাঁর আগে থেকেই পরিচয় ছিল। সারা ভারতেই তাঁর খ্যাতি, খুব ব্যস্ত মানুষ, তাই টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয়েছিল।

শিল্পীদের চেহারা ও চরিত্র সম্পর্কে আমাদের মনের মধ্যে একটা ছবি তৈরি হয়ে আছে। গল্প-উপন্যাসে, সিনেমার আসরে সেই রকম শিল্পীদেরই দেখি, তাঁরা বোহেমিয়ান, মাথায় বাবরি চুল, মুখে দাড়ির জঙ্গল, মদের নেশায় সব সময় চোখ লাল, পোশাক উদ্ভট, তাঁদের স্টুডিয়োতে সব কিছু এলোমেলো ভাবে ছড়ানো, মেয়েদের নিয়ে তাঁরা ছিনিমিনি খেলেন।

কোথায় কী! শান্তনু চৌধুরীর ফ্ল্যাটটা নিখুঁত ভাবে সাজানো, মাথায় অল্প টাক, দাড়ি কামানো, ধপধপে সাদা পাঞ্জাবি-পাজামা পরা, ফর্সা, গোলগাল চেহারায় তাঁকে মনে হয় এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক। বসবার ঘরটির দেয়ালে একটি মাত্র ছবি, দেলাক্রোয়া'র একটি ছবির বড় প্রিন্ট। এখনও যে দেলাক্রোয়া'র এ-রকম কোনও ভক্ত আছে, তা আমার জানা ছিল না।

বসবার ঘরে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার পর শিল্পী নিজেই এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁর স্টুডিওতে। উত্তর আর পূর্ব ধার খোলা একটা বড় ঘর, দেয়ালের গায়ে ঠেসান দেওয়া বেশ কয়েকটি ক্যানভাস, ইজেলে একটি অসমাপ্ত ছবি। আগেই শুনেছি, শান্তনু চৌধুরী প্রতি দিন নিয়ম করে আঁকেন, মাসে অন্তত দু'টি অয়েলের ছবি শেষ করেন। তাঁর এক-একটি ছবির দাম অন্তত পঞ্চাশ হাজার টাকা।

চন্দনদার সঙ্গে কথায় কথায় তিনি জানালেন যে, তার এই স্টুডিওতে আর কুলোচ্ছে না, এই গল্‌ফ গ্রিনেই তাঁর নিজস্ব একটা বাড়ি হচ্ছে, সম্পূর্ণ তিন তলা জুড়ে হবে স্টুডিও। চন্দনদাকে বাড়ির প্ল্যান দেখিয়ে অভিমত নিলেন, সিমেন্ট ও ইঁটের দাম কত যাচ্ছে তার খোঁজখবর জানালেন। তারপর আমরা তাঁর ছবিগুলো দেখলাম। ছবি তিনি খুবই ভাল আঁকেন, রঙের ব্যবহার অসামান্য, শিগগিরই তাঁর এই সব ছবির একটা বড় প্রদর্শনী হবে দিল্লিতে।

ইতিমধ্যে চা এসে গেছে।

চন্দনদা আমাকে বলল, নীলু, এবার বার কর।

শান্তনু চৌধুরী ঈষৎ চঞ্চল হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি ছবি আঁকো নাকি?

চন্দনদা বলল, না না, ও আঁকে না, ছোটপাহাড়িতে একটি আদিবাসী মেয়ে...।

ফুলমণির কাহিনিটা বলতে লাগল চন্দনদা, শান্তনু চৌধুরী অন্যমনস্ক ভাবে শুনতে শুনতে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, তাই নাকি? বাঃ ইন্টারেস্টিং। দেখি, দেখি, ছবিগুলো দেখি।

আমি ছবিগুলো মেলে ধরলাম।

শান্তনু চৌধুরী ছবিগুলোর দিকে দ্রুত চোখ বোলালেন, তাঁর মুখের কোনও ভাবান্তর হল না।

তিনি বললেন, বাঃ, বেশ ভাল, বেশ ভাল!

বৃষ্টিভেজা মেয়েটির ছবিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে চন্দনদা জিজ্ঞেস করল, এটা কী-রকম লাগছে?

শান্তনু চৌধুরী একই সুরে বললেন, বেশ ভাল, বেশ ভাল।

চন্দনদা জিজ্ঞেস করল, ছবিগুলোর বিশেষ কোনও গুণ আছে বলে আপনার মনে হয়?

শান্তনু চৌধুরী বললেন, বললাম তো, ভালই এঁকেছে। এক জন আদিবাসী মেয়ের পক্ষে, ভালই বলতে হবে।

তার পরই প্রসঙ্গ পালটে বললেন, আপনাদের কোম্পানি এবার কার ছবি দিয়ে ক্যালেন্ডার করছে?

চন্দনদা বলল, খুব সম্ভবত হেমেন মজুমদারের। ওঁর ফ্যামিলির সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। এ-সব তো আমি একা ঠিক করি না। আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টার।

শান্তনু চৌধুরী খুব চাপা বিদ্রূপের সুরে বললেন, ওঃ, হেমেন মজুমদার? আচ্ছা! বেশ বেশ।

এরপর তিনি আমাদের দিকে এমন ভাবে তাকালেন, যেটা স্পষ্ট উঠে যাওয়ার ইঙ্গিত।

বোঝাই গেল, ফুলমণির ছবিগুলোকে উনি কোনও গুরুত্বই দেননি। যেটুকু প্রশংসা করেছেন, তা নিছক ভদ্রতার। তবে কি ফুলমণির ছবি নিয়ে আমরা বাড়াবাড়ি করছি? আমাদের উচ্ছ্বাস সবটাই ভুল!

দরজার কাছ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে শান্তনু চৌধুরী বললেন, অনেক ইয়াং ছেলে মেয়ে আমাকে ছবি দেখাতে চায়, আমি সময় পাই না, সকলের জন্য সময় দিতে গেলে আমার নিজের কাজ...তবে যত দূর সম্ভব চেষ্টা করি সাহায্য করার।

আমাদের মুখে আর কথা নেই। ফুলমণি সামান্য মনোযোগেরও অযোগ্য।

বাইরে বেরিয়ে আমি খানিকটা রাগের সুরে বললাম, চন্দনদা, শান্তনু চৌধুরীর এত নাম, কিন্তু দেখলে শিল্পী বলে মনেই হয় না। মনে হয়, কোনও বড় অফিসার!

চন্দনদা বলল, তুই বুঝি ভেবেছিলি, সকালবেলাতেই মাতাল হয়ে একটা মেয়ের গলা জড়িয়ে বসে থাকবে? ও-সব নাইনটিন্‌থ সেঞ্চুরির ধারণা! তখন একটা বোহেমিয়ানিজম আর খ্যাপামির যুগ ছিল। এখন শিল্পীরাও সামাজিক মানুষ। মাতলামি আর বেলেল্লাপনা করলে সীরিয়াস কাজ করা যায় না এ যুগে। কী দারুণ কমপিটিশন! ছবি আঁকাও অন্য আর পাঁচটা কাজের মতো একটা কাজ!

এ-কথাটা আমার পছন্দ হল না। ছবি আঁকা, কবিতা লেখা, এ-সব কিছুতেই অন্য কাজের মতো নয়। তাহলে চেষ্টা করলেও সবাই পারে না কেন? যারা পড়াশুনোয় ফার্স্ট হয়, তারা কি এগুলো পারে? চন্দনদাই আগে উলটো কথা বলেছে।

আমরা গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, এই সময় এক জন কেউ বলল, এই চন্দন, এখানে কোথায় এসেছিলি?

এক জন প্রায় ছ'ফুট লম্বা, ছিপছিপে ভদ্রলোক, ব্রোঞ্জের মতো গায়ের রঙ, তীক্ষ্ণ নাক, কৌতূহলী চোখ, দাড়ি কামানো, কিন্তু মাথার চুল বড় বড়, প্যান্টের ওপর ফতুয়া জাতীয় একটা জামা পরা, হাতে একটা ছড়ি, তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে।

ভদ্রলোকের বয়েস চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের মধ্যে, ঋজু শরীর, হাতে ছড়ি নেবার কথা নয়, ওটা বোধহয় স্টাইল করার জন্য।

তিনি আবার বললেন, শান্তনুর কাছ থেকে ছবি কিনতে এসেছিলি বুঝি? কত টাকা খসল?

চন্দনদা আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, নীলু, এ হচ্ছে অনিন্দ্য দাস। আমরা স্কুলে এক সঙ্গে পড়েছি।

নাম শুনেই চিনতে পারলাম। ইনিও খুবই বিখ্যাত শিল্পী। কয়েক বছর আগে একটা ফরাসি কাগজে এঁর সম্পর্কে একটা বড় আর্টিকেল বেরিয়েছিল ছবি-টবি দিয়ে, তার অনুবাদ আবার ছাপা হয় বাংলা কাগজে। ফরাসি দেশের সার্টিফিকেট পাওয়ার পরেই এঁকে নিয়ে পড়ে যায় কলকাতায়।

চন্দনদা বলল, না রে, ছবি কিনতে আসিনি। শান্তনু চৌধুরীকে কয়েকটা ছবি দেখাতে এসেছিলাম।

তুই আবার ছবি আঁকছিস বুঝি? আবার ইচ্ছেটা চাগিয়েছে? টাকা তো কম রোজগার করিস না।

ধ্যাৎ, আমি কী আঁকব! এগুলো একটা আদিবাসী মেয়ের। আমাদের ভাল লেগেছিল, তাই শান্তনু চৌধুরীকে দেখিয়ে মতামত জানতে এসেছিলাম।

শালা, তুই আমাকে আগে দেখাসনি কেন? তুই কাকে বেশি দিন চিনিস, আমাকে, না শান্তনুকে? শান্তনু বড় আর্টিস্ট?

তোর কথাটা মনে পড়েনি, মানে, তুই তো মেইনলি স্কালপটর, তুই মূর্তি গড়িস।

স্কালপচার করি বলে ছবি বুঝি না? স্কালপটররা ছবি আঁকে না? তোদের রদ্যাঁ ছবি আঁকেনি? দেবীপ্রসাদ, রামকিঙ্কর ছবি আঁকেনি?

আমার দিকে ছড়িটা তুলে অনিন্দ্য দাস বললেন, এই ছেলে, হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কী, বার কর ছবিগুলো।

শান্তনু চৌধুরীর তুলনায় অনিন্দ্য দাসকে প্রায় প্রথম নজরেই আমার ভাল লেগে গেল। প্রাণবন্ত মানুষ, মিষ্টি মিষ্টি ভদ্রতার ধার ধারেন না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করে ছবি দেখাব! চন্দনদার গাড়ির বনেটের ওপর মেলে ধরলাম।

অনিন্দ্য দাস বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়েই পাঁচটা ছবি দেখলেন। তারপর মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, কে এঁকেছে?

চন্দনদা ফুলমণির বৃত্তান্ত সবিস্তার বলতে যেতেই অনিন্দ্য দাস তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সে কোথায়?

সে তো ছোটপাহাড়িতে থাকে।

তাকে নিয়ে আয়।

সেটা খুব মুশকিলের ব্যাপার। আচ্ছা অনিন্দ্য, বল তো, এই ছবিগুলো ঠিক কেমন? মেয়েটার সত্যিই কোনও ট্যালেন্ট আছে?

ধুস! বোগাস! এ-রকম ছবি যে-কেউ আঁকতে পারে। আর্টিস্টকে না দেখলে, তার সঙ্গে কথা না বললে কি ছবি বোঝা যায়? তার কতটা ভিশান আছে, তার ডেপ্‌থ কতটা, তার স্ট্রাগ্‌ল করার ক্ষমতা, এ-সব না বুঝলে শুধু ক'টা ছবি দেখে কী হবে?

আঁকার ক্ষমতা, নতুনত্ব আছে কি না, সেটুকু তো অন্তত —।

আবার বাজে কথা বলছিস, চন্দন! এ কি ইম্প্রেশানিস্টদের ছবি যে, প্রত্যেকটা ছবিরই আলাদা একটা প্রাণ আছে, আলাদা একটা সত্তা আছে? কে এঁকেছে তা বলে দেবার দরকার হয় না, প্রত্যেকটা ছবিই স্বয়ংসম্পূর্ণ।

আমি বললাম, সব ভাল ছবিই তো এ-রকম হয়। ছবি দেখে যা মনে হয়।

অনিন্দ্য দাস এক ধমক দিয়ে বললেন, আমার সঙ্গে তর্ক কোরো না ছোকরা, তর্ক কোরো না। যা বলছি শুনে যাও।

আমি তবু প্রতিবাদ করে বললাম, আর্টিস্টদের দেখে, কথা বললেও তো মনে হয় না।

অনিন্দ্য দাস ঠিক আমার মনের কথাটা বুঝতে পেরে এবার হে-হে করে হেসে ফেললেন। শান্তনু চৌধুরীর বাড়ির দিকে চোখের ইঙ্গিত করে বললেন, ছবি আঁকলেই কি শিল্পী হওয়া যায়? শান্তনু খুব নাম করেছে, ভালই আঁকে, নিশ্চয়ই ভাল আঁকে, কিন্তু সবই রঙের পোঁচ, বুঝলে, রঙের পোঁচ! ওর মধ্যে যে ফাঁকিবাজি আছে, তা আমরা বুঝি, তোমরা বুঝবে না। স্কালপচার করতে গেলে কব্জির জোর লাগে, আর লাগে এই দুটো এক সঙ্গে।

অনিন্দ্য দাস নিজের মাথায় আর বুকে দুটো টোকা দিলেন।

তারপর চন্দনদাকে বললেন, তুই বুঝি শান্তনুর ছবি দিয়ে তোদের কোম্পানির ক্যালেন্ডার করবি ভাবছিস? দে, যত ইচ্ছে তেল দে! কেন, স্কালপচার দিয়ে বুঝি ক্যালেন্ডার করা যায় না? শালা বাঙালিরা ভাস্কর্যের কিছুই বোঝে না। কেষ্টনগরের পুতুল দেখে দেখে চোখ পচে গেছে। কলকাতা শহরে যে-মূর্তিগুলো বসিয়েছে, ইচ্ছে করে লাথি মেরে সেগুলো সব ভেঙে দিই!

অনিন্দ্য দাস শান্তনু চৌধুরীর বাড়িতেই যাচ্ছেন। বোঝাই যাচ্ছে, উনি শান্তনু চৌধুরীকে একটুও পছন্দ করেন না। তবু দু'জনে নিশ্চয়ই এখন হেসে হেসে গল্প করবেন।

গাড়িতে উঠে চন্দনদা বিমর্ষ ভাবে বলল, কী হল রে নীলু। দু-দু'জন বিখ্যাত আর্টিস্ট এ ছবিগুলোকে তো পাত্তাই দিল না। আমরা তাহলে বোকার মতো নাচানাচি করেছি?

কোনও নিরপেক্ষ আর্ট ক্রিটিককে একবার দেখালে হয় না?

তুই যে অদ্ভুত কথা বললি রে নীলু! নিরপেক্ষ ক্রিটিক বলে পৃথিবীতে কোনও বস্তু আছে নাকি? সব ক্রিটিকই কোনও না-কোনও দিকে হেলে থাকে।

খবরের কাগজে যাঁরা সমালোচনা লেখেন।

তুই দেখবি, একই শিল্পীর ছবি, স্টেটসম্যান যাচ্ছেতাই বলে উড়িয়ে দিচ্ছে আর আনন্দবাজার তাকেই মাথায় তুলে নাচছে। আবার এর উলটোটাও হয়। ছবির জগতে যে-রকম গ্রুপিজম আছে, তা তোর-আমার বোঝার সাধ্য নেই।

তবু তো কিছু কিছু শিল্পীর সারা দেশেই নাম ছড়িয়ে যায়। তাঁদের ছবির কদর হয়।

সে হচ্ছে জনসাধারণের বিচার। জনসাধারণই তো আলটিমেট ক্রিটিক। কিন্তু ফুলমণির ছবি জনসাধারণের কাছে পৌঁছবার কোনও উপায় নেই। কষ্টে সৃষ্টে একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলেও কেউ আসবে না, ক্রিটিকরা পাত্তা দেবে না। আজকাল গণ্ডায় গণ্ডায় প্রদর্শনী হয় প্রতি সপ্তাহে। বিরাট করে পাবলিসিটি দিতে হবে, উদ্বোধনের দিন মস্ত পার্টি দিয়ে মদের ফোয়ারা বইয়ে দিতে হবে, তবে তো গণ্যমান্যরা আসবে!

তাহলে আর কিছু করা যাবে না?

নাঃ।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর চন্দনদা জিজ্ঞেস করল, তোর মন খারাপ লাগছে না নীলু?

হুঁ।

কেন মন খারাপ লাগছে জানিস? আমরা সবাই ভেতরে ভেতরে স্বার্থপর। ফুলমণির ছবির কিছু হল না, সে-জন্য আমরা যতটা না দুঃখিত, তার চেয়ে বেশি দুঃখিত এই জন্য যে, আমরা ওর উপকার করার জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছিলাম, সেটা ব্যর্থ হল! আমরা হেরে গেলাম। তাই না!

তা-ও বলা যেতে পারে।

মন খারাপ হলে আমার কাবাব আর পরোটা খেতে ইচ্ছে করে। খাবি?

কাবাব আর পরোটা খুব আনন্দের সময়েও খেতে আমার কোনও আপত্তি থাকে না!

তাহলে চল পার্ক সার্কাসের দিকে। ওখানে একটা ভাল রেস্তোরাঁয়।

হঠাৎ থেমে গিয়ে চন্দনদা গাড়ির ড্রাইভারকে বলল, এই, এই, গাড়ি ঘোরাও, চলো তো একবার আলিপুরের দিকে।

আমার বিস্ময় দেখে বলল, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল রে। সিরাজুল তারিক-এর বাড়ি গিয়ে একবার কাবাব খেয়েছিলাম, কী অপূর্ব তার স্বাদ, এখন জিভে লেগে আছে।

এখন হঠাৎ তাঁর বাড়িতে গেলেও কি তিনি কাবাব খাওয়াবেন নাকি?

তুই কী ইডিয়েট রে! নাম শুনে চিনতে পারলি না? সিরাজুল তারিক।

মানে, যিনি আর্টিস্ট?

তাছাড়া সিরাজুল তারিক আবার ক'জন আছে? আমার সঙ্গে এক দিন আলাপ হয়েছিল। বার বার তিনবার। ওঁর মতামতটাও নেওয়া যাক। উনিও যদি উড়িয়ে দেন, তাহলে ফুলমণির ছবি নিয়ে আমরা আর মাথাই ঘামাব না।

কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে গেলে কি উনি সময় দেবেন?

একটা জিনিস লক্ষ্য করলি তো। বড় কোম্পানির ক্যালেন্ডারে ছবি দেবার জন্য আর্টিস্টরা বেশ ব্যস্ত। অন্তত লাখ খানেক টাকা তো পাওয়াই যায়। সিরাজুল সাহেবকে প্রথমে সেই টোপটা দেব। তাহলে ঠিকই সময় পাবেন কথা বলার।

ঠিক আলিপুর নয়, খিদিরপুর ব্রিজের কাছাকাছি সিরাজুল তারিকের পুরনো আমলের দো-তলা বাড়ি। ইনি বাংলার প্রবীণ, বিখ্যাত শিল্পীদের অন্যতম। মতামতের দিক থেকে খানিকটা ট্র্যাডিশনাল। কিছু দিন আগে খবরের কাগজে ওঁর একটা সাক্ষাৎকার পড়েছিলাম। উনি অল্প বয়সে অয়েলের কাজ কিছু করেছেন, এখন আর অয়েল ছোঁন না। ওয়াটার কালার আর ওয়াশ-এর কাজই বেশি করেন। আজকালকার অনেক শিল্পীর মতো উনি অ্যাক্রিলিকের চকচকে রঙ একেবারে পছন্দ করেন না। অয়েল সম্পর্কে উনি একটা গল্পও বলেছেন। আমাদের দেশে তো আগে অয়েলের কাজ হত না। জাহাঙ্গির বাদশার দরবারে ইংরেজদের দূত হিসেবে গিয়েছিলেন স্যার টমাস রো। অনেক রকম উপহার-উপঢৌকন নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। জিনিসগুলো খুলে খুলে দেখাচ্ছেন। তার মধ্যে একটা অয়েল পেইন্টিং ছিল। সেটা দেখে জাহাঙ্গির বাদশা মুখ কুঁচকে বলেছিলেন, ওটা সরিয়ে নাও, বড্ড চকচক করছে।

ওয়াশ-এর ছবির মতোই সিরাজুল তারিক মানুষটি শান্ত, স্নিগ্ধ। চোখ দু'টি আশ্চর্য মায়াময়।

নিজেই তিনি দরজা খুলে দিয়ে আমাদের ভেতরে বসালেন। সরু পাজামা ও গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি পরা, মুখে ধপধপে সাদা দাড়ি, মাথার চুলও সাদা, তবে বেশ পাতলা হয়ে গেছে। গলায় ঝুলছে কালো সুতোয় বাঁধা চশমা। কথা বলেন খুব নরম গলায়। তাঁকে দেখলে ঋষি দরবেশদের কথা মনে পড়ে।

সিরাজুল ইসলামের সঙ্গে প্রখ্যাত শিল্পী এম এফ হুসেনের চেহারার খানিকটা মিল আছে। কিন্তু হুসেন ফাইভ স্টার হোটেলে উঠলেও রাস্তা দিয়ে খালি পায়ে হাঁটেন, খবরের কাগজের হেডলাইন দেখে সঙ্গে সঙ্গে ছবি এঁকে ফেলেন, এই সব গিমিক সিরাজুল সাহেবের চরিত্রে একেবারেই নেই। তাঁর ছবির বাজারদর বেশ ভাল। তবু তিনি আগেকার চালচলন পালটাননি, পুরনো বাড়িটা ছাড়েননি। নিরিবিলিতে থাকতে পছন্দ করেন।

চন্দনদার ক্যালেন্ডারের প্রস্তাবটাকে উনি আমলই দিলেন না। হেসে বললেন, না না। আমি ছবি দেব কী করে? আমি বছরে পাঁচ-সাতখানার বেশি ছবি আঁকি না। কেউ অর্ডার দিলে তাড়াতাড়ি এঁকে দিতেও পারি না। ছবি আঁকবো কী, ফাঁকা ক্যানভাসের সামনে বসে থাকতে থাকতেই দিন কেটে যায়। কত ছবি চোখে ভাসে। সেগুলো এঁকে ফেলার চেয়ে সেগুলো নিয়ে কল্পনায় খেলা করতেই বেশি ভালবাসি। আমার যে-ক'খানা ছবি বিক্রি হয় আপনাদের দয়ায়, তাতে বেশ চলে যায়।

চন্দনদা তখন বলল, আমি একটি মেয়ের আঁকা কয়েকটি ছবি এনেছি। অনুগ্রহ করে একটু দেখবেন?

সিরাজুল সাহেব আগ্রহের সঙ্গে বললেন, অবশ্যই। নিজের ছবি আঁকার চেয়েও ছবি দেখতেই আমি বেশি পছন্দ করি।

প্রায় পনেরো-কুড়ি মিনিট ধরে তিনি ছবিগুলো খুঁটিয়ে দেখলেন। একটাও কথা বললেন না। আকাশে মেঘ জমেছে, তিনি আলো জ্বেলে দিলেন ঘরের। ছবিগুলো নিয়ে একবার জানালার কাছে গেলেন, একবার আলোর নিচে ধরলেন, নিজের ইজেলে চাপিয়েও দেখলেন।

তারপর বিহ্বল চোখে চন্দনদার দিকে চেয়ে বললেন, এ আমাকে কী দেখালেন ঘোষালবাবু? এ ছবি কে এঁকেছেন?

চন্দনদা নার্ভাস গলায় বলল, এ ছবিগুলো কী ভাল? এর কোনও মূল্য আছে?

সিরাজুল সাহেব বললেন, ভাল মানে কী। আমার আজকের সকালটা ধন্য হয়ে গেল। অসাধারণ! তুলনা নেই। আর মূল্যের কথা বলছেন? এই প্রত্যেকটা ছবির জন্য আমি পাঁচ হাজার টাকা করে দিতে রাজি আছি। দেবেন আমাকে?

॥ ৬॥

এত দ্রুত যে ব্যাপারগুলো ঘটবে তা আমি ধারণাও করতে পারিনি।

সিরাজুল সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ হল আকস্মিক ভাবে। খুব ছোটখাটো ঘটনা থেকে কোনও মানুষের নিয়তিটাই বদলে যেতে পারে। চন্দনদার যদি হঠাৎ কাবাব-পরোটা খাবার কথা মনে না পড়ত, তাহলে সিরাজুল সাহেবের কাছে আসাই হত না। কিংবা, ফুলমণি যদি ছোট পাহাড়ির বদলে জামসেদপুরে ইঁট বওয়ার কাজ করতে যেত, তাহলে সে চন্দনদার নজরে পড়ত না, তার ছবি আঁকা নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাত না।

সিরাজুল সাহেব আমাদের ছাড়লেন না, দুপুরে তাঁর বাড়িতেই খেতে হল। কাবাব-পরোটা নয় অবশ্য, ডাল-ভাত-আলুসেদ্ধ ও ডিমভরা কই মাছের ঝোল। খুব সম্প্রতি তিনি সব রকম মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন।

ছবিগুলো সম্পর্কে তিনি উচ্ছ্বসিত।

আমাদের তিনি বোঝালেন ছবিগুলোর বিশেষত্ব কোথায়। যে-কোনও শিল্পীই তার কাছাকাছি পরিবেশ, মানুষজন ও প্রকৃতির যে-বাস্তবতা, তা ফুটিয়ে তুলতে বাধ্য। সমসাময়িক বাস্তবতা সব শিল্পের ভিত্তি। তবে নিছক বাস্তবতা নয় এবং নিছক সমসাময়িকতাও নয়। তার মধ্যে একটা বিশ্বজনীনতা ও চিরকালীনতার ছোঁয়া লাগলেই তা সার্থক শিল্প হয়। উদাহরণ দিয়ে তিনি বললেন, যেমন ধরুন, হ্যামলেট। এর কাহিনিটা আসলে কী? ডেনমার্কের একটা ছোট্ট রাজ্যের রাজপরিবারের ঘরোয়া কোন্দল। কিন্তু পৃথিবীর যে-কোনও প্রান্তের মানুষ ওর রস অনুভব করতে পারে। কিংবা ধরুন মোনালিসার মুখখানা। লিওনার্দো তো এক জন ইতালিয়ান মহিলার মুখ এঁকেছেন, তাঁর চোখের সামনে ছিল সমসাময়িক বাস্তবতা, তবু ওই মহিলার মুখের হাসি চিরকালীন হয়ে গেল।

আমি বললাম, সিরাজসাহেব, এক আদিবাসী মহিলার ছবি প্রসঙ্গে হ্যামলেট আর মোনালিসার প্রসঙ্গ টানা কি একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?

সিরাজসাহেব প্রশংসার ব্যাপারে কার্পণ্য বিশ্বাস করেন না। তিনি বললেন, কেন তুলনা করা যাবে না? আমরা সবাই তো আদিবাসী, তাই না? এখানে দেখুন, এই মহিলাটিকে কাছাকাছি যে-সব মানুষজন দেখেছে, গাছপালা, গোরু-মোষ, এই সবই এঁকেছে। ফোক ট্র্যাডিশনও আছে তার রেখার মধ্যে। যামিনী রায়ের মতো মোট মোটা দাগ। ড্রয়িংয়ে হাত পাকা, কিন্তু নিখুঁত ড্রয়িং করেনি, স্টাইলাইজড। এই যে তিনটে মোষ, এই মোষগুলো ছোটপাহাড়ি নয়, সারা পৃথিবীর। এ মেয়েটির অন্তর্দৃষ্টি আছে। এ বড় দুর্লভ, বুঝলেন, খুবই দুর্লভ।

আমি এবার ফস করে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, আপনি তো এত প্রশংসা করছেন, কিন্তু শান্তনু চৌধুরী আর অনিন্দ্য দাস একেবারে পাত্তাই দিলেন না কেন? তাঁরাও তো বড় শিল্পী, তাঁরা এ ছবিগুলোর মধ্যে কোনও গুণই দেখতে পেলেন না।

সিরাজসাহেব চুপ করে গেলেন।

তিনি এতই ভদ্র যে সমসাময়িক কোনও শিল্পী সম্পর্কে কোনও বিরূপ মন্তব্য করতে চান না।

চন্দনদা বলল, ওঁদের অ্যাটিচুডটা আমি বুঝতে পেরেছি। ওঁদেরও দোষ দেওয়া যায় না নীলু।

কোনও কোনও শিল্পী হয় খুব সেল্‌ফ সেনটারড। নিজের ছবি ছাড়া আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামায় না। নিজের সৃষ্টি নিয়েই মগ্ন থাকে। আবার কেউ কেউ গোটা শিল্পজগতে নতুন কিছু ঘটলেই তারা খুশি হয়ে ওঠে। আমি ঠিক বলছি না সিরাজসাহেব?

সিরাজসাহেব আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন।

এরপর তিনি আর একটি চমকপ্রদ কথা বললেন।

চন্দনদার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ছোটপাহাড়িতে কী করে যেতে হয়? আমি মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে চাই। আজই যাওয়া যায় না?

চন্দনদা বলল, আপনি যাবেন সেখানে?

হ্যাঁ। শুধু এই পাঁচখানা ছবি দেখলেই তো চলবে না। ও আরও কী কী ছবি এঁকেছে দেখতে হবে। ওর আঁকার পদ্ধতিটাও জানা দরকার। ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই!

ঠিক আছে, আপনি চলে যান না নীলুর সঙ্গে। আমি সব ব্যবস্থা কবে দিচ্ছি। আমার অফিসের দু-একটা কাজ, আমাকে থাকতে হবে কলকাতায়। নীলু তো আজই ফিরছে।

আমি যেতে চাই, তার আরও একটা বিশেষ কারণ আছে ঘোষালবাবু। সামনের সপ্তাহে অ্যাকাডেমিতে সারা বাংলা তরুণ শিল্পীদের একটা বড় প্রদর্শনী শুরু হচ্ছে। ছবি বাছাইয়ের ভার দেওয়া হয়েছে আমার ওপর। আমি এই মেয়েটিকে সুযোগ দিতে চাই। ওর একটা এক্সপোজার হবে। অন্য সব শিল্পীদের ছবির পাশে ওর ছবিও থাকবে, লোকে দেখবে। লোকেরাই ওর বিচার করুক।

এ তো অতি চমৎকার ব্যাপার। এমন সুযোগ তো আশাই করা যায় না! আমাদের আর কিছু বলতে হবে না। শিল্প-রসিকরাই ওর বিচার করবে।

মেয়েটিকে কলকাতায় আনা যাবে না? প্রদর্শনীতে অন্য শিল্পী সবাই থাকবে!

কেন আনা যাবে না? ওর ভাড়ার টাকা আমি দিয়ে দেব। থাকার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে!

এবার আমি বাধা দিয়ে বললাম, চন্দনদা, ফুলমণি কি আসতে চাইবে? এত লাজুক, কথাই বলতে চায় না, কোনও দিন নিজের জায়গা ছেড়ে বাইরে যায়নি!

সিরাজুল সাহেব বললেন, আমি বুঝিয়ে বলব। আমি তো যাচ্ছি।

চন্দনদা জোর দিয়ে বলল, তাকে আসতেই হবে, যদি সে সত্যিই শিল্পী হতে চায়। শুধু ঘরে বসে ছবি আঁকলেই তো চলে না। শিল্পীকে ছবির ফ্রেমিং পর্যন্ত শিখতে হয়। অন্য কে কী-রকম আঁকছে তা জানতে হয়। নিজের অভিজ্ঞতার জগতটাকে বাড়াতে হয়। এই সবই পার্ট অফ দ্য গেইম। ফুলমণি যদি আসতে না চায়, ছবিগুলো তাকে ফেরত দিয়ে আসবি। বাকি জীবন তাহলে সে ইট বওয়া কুলি হয়েই কাটাক। সিরাজুল তাবিকের মতো এত বড় এক জন শিল্পী নিজে তাব কাছে যেতে চাইছেন।

সিরাজুল সাহেব বললেন, আচ্ছা, আগে গিয়েই দেখা যাক না।

চন্দনদা রয়ে গেল কলকাতায়। সিরাজুল সাহেবকে নিয়ে আমি ছোটপাহাড়ি পৌঁছলাম পরদিন দুপুরবেলা। গেস্ট হাউসে একটা ঘরে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল। আমি বললাম, আপনি খেয়ে-দেয়ে এখন বিশ্রাম নিন। কাল সকালবেলা যাওয়া যাবে ফুলমণির গ্রামে।

কিন্তু বৃদ্ধের কী অদম্য উৎসাহ!

তিনি বললেন, ট্রেনে বসে বসে এসেছি, পরিশ্রম তো কিছু হয়নি। বিশ্রামের কী দরকার! চলুন, বিকেলেই দেখা করি আমাদের শিল্পীর সঙ্গে।

আজ ছুটির দিন নয়, ফুলমণি কাজে এসে থাকতে পারে। তার গ্রামে যাবার বদলে আগে একবার কনস্ট্রাকশন সাইটটা দেখা দরকার। অনেকটা হেঁটে যেতে হবে।

সিরাজুল সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে আমার সাইকেলে যদি ক্যারি করি, আপত্তি আছে?

উনি হেসে বললেন, আপত্তি কীসের। গেলেই তো হল।

এত বড় এক জন শিল্পীকে আমি আমার সাইকেলে চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, এটা যেন ভাবাই যায় না। শিল্পীরাও কত সাধারণ মানুষ হয়ে যেতে পারেন!

সিরাজুল সাহেবের এক-একখানা ছবির দাম পঁচিশ-তিরিশ হাজার টাকা। ঘরে বসে নিজের ছবি আঁকার বদলে ইনি এত দূর ছুটে এসেছেন এক অজ্ঞাত কুলশীল শিল্পীকে প্রমোট করার জন্য। একেই বলে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো!

আমাদের লেবরেটরি বাড়িটার গেটের সামনে নামলুম সাইকেল থেকে। পড়ন্ত বিকেলের আলো হলুদ হয়ে এসেছে। দূরের পাহাড়ের চূড়ার কাছে মুকুট হয়ে আছে সূর্য। একঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে সে-দিকে।

বাড়িটার বাইরের দেয়ালে বাঁশের ভারা বাঁধা। সেই ভারা বেয়ে মাথায় ইঁটের বোঝা নিয়ে উঠছে এক রোগা নারী। রোদ ঝলসাচ্ছে তার পিঠে।

সেই দিকে আঙুল তুলে বললাম, ওই দেখুন আমাদের শিল্পী।

সিরাজুল সাহেব অপলক ভাবে তাকিয়ে রইলেন সে-দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, কবে আমরা আমাদের দেশের মা-বোনেদের এই কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে পারব? মেয়েদের কি আমরা অন্য কাজ দিতে পারি না?

আমি বললাম, সিরাজুল সাহেব, মফস্সল শহরে মেথরানি মেয়েরা মাথায় করে গুয়ের পাত্র বয়ে নিয়ে যায়, দেখেননি? এর চেয়ে হীন কাজ কি আর কিছু আছে? কে জানে, সেই মেথরানিদের কেউ ছবি আঁকতে পারে কি না। কিংবা হয়তো আশা ভোঁসলের মতো গানের গলা আছে।

সিরাজুল সাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

তারপর বললেন, আমার মেয়ে, আমিনা, তার কথা আপনি শুনেছেন নীলুবাবু?

আমি বললাম, না।

দূরের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, সে ছিল আমার চোখের মণি, সে এক দিন...যাক, আর এক দিন বলব।

সিরাজুল সাহেব হঠাৎ বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছেন। ভেতরে এনে আমার ঘরের একমাত্র চেয়ারটিতে তাঁকে বসালাম।

হেড মিস্তিরি ইরফান আলি এসে আমাকে বলল, সাহেব, আমাদের পেমেন্ট এনেছেন না মহিমবাবু দেবেন?

এখানকার প্রত্যেক মজুরদের আলাদা ভাবে প্রতি দিন টাকা না দিয়ে এক সঙ্গে থোক টাকা দেওয়া হয় ইরফান আলিকে। সে অন্যদের কাজ অনুযায়ী মজুরি দেয়। এ-রকমই প্রথা। আমার ছুটি, মহিমবাবুই টাকা আনবেন।

সে-কথা বলতে ইরফান আলি খানিকটা অপ্রসন্ন ভাবে ঘড়ি দেখে বলল, উনি কখন আসবেন, ছুটির সময় হয়ে এল।

আমি বললাম, আপনি সাইকেল নিয়ে মহিমবাবুর কাছে চলে যান না।

এরপর আমি ফুলমণিকে ডাকিয়ে আনলাম এ-ঘরে।

একটা মলিন ছাপা শাড়ি পরে আছে ফুলমণি। সেটা অটুটও নয়। লাল ধুলো লেগে আছে এখানে ওখানে। মুখখানা ঘামে মাখা।

আমি বললাম, ফুলমণি, ইনি হচ্ছেন সিরাজুল তারিক সাহেব। খুব বড় শিল্পী। এঁর আঁকা ছবি দেশ-বিদেশে অনেক জায়গায় দেখানো হয়। তোমার ছবিগুলো এঁর ভাল লেগেছে। তাই তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন।

অন্য দিন ফুলমণি যাকে বলে সাত চড়ে রা কাড়ে না, আজ এক জন শিল্পীর কথা শুনে তার প্রতিক্রিয়া হল।

সে মাটিতে বসে পড়ে সিরাজুল সাহেবের দু'টি পায়ের পাতা স্পর্শ করল।

সিরাজুল সাহেব ব্যস্ত হয়ে বললেন, আরে, না না, ওঠো মা। ওঠো।

হাত ধরে তিনি ফুলমণিকে তুলতে তুলতে বললেন, ইস, এত রোগা কেন? গায়ের জোর না থাকলে ছবি আঁকবে কী করে? মাথায় অতগুলো ইঁট নিয়ে ওঠো, যদি পা পিছলে পড়ে যাও? ভাবলেই ভয় করে।

আমার মনে হল, আমার কর্তব্য শেষ হয়ে গেল এখানেই। ফুলমণিকে আমি সঁপে দিলাম সিরাজুল সাহেবের হাতে। এবার থেকে উনিই যা কিছু করার করবেন।

পরদিন ভোরে অবশ্য সিরাজুল সাহেবকে ফুলমণিদের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যেতে হল আমাকেই। আমি মহিমবাবুকে বলে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সিরাজুল সাহেব হেঁটেই যেতে চান। পায়ে হেঁটে নদী পেরুলেন।

এর মধ্যে ফুলমণি সম্পর্কে খানিকটা খোঁজখবর পাওয়া গেছে।

ফুলমণির স্বামী মারা গেছে দু'বছর আগে। এর মধ্যে ওর আবার বিয়ে হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ছিল, ওদের সমাজে এ-রকমই হয়। কিন্তু ফুলমণি বিয়ে না করে রয়ে গেছে শ্বশুরের কাছে। ওর শ্বশুর বৃদ্ধ ও পঙ্গু, তাকে দেখবার আর কেউ নেই। একটা চোদ্দ বছরের ভাতুয়া ছেলেকে ওরা বাড়িতে রেখেছে, ফুলমণি যখন কাজে যায়, তখন সেই ছেলেটি ওর শ্বশুরের দেখাশুনো করে। এই শ্বশুর ফুলমণির ছবি আঁকার গুরুও বটে।

প্রথম দেখে বৃদ্ধকে আমার স্বার্থপর ধরনের মনে হয়েছিল। অবশ্য অসহায়ও বটে। অসহায় ও দুর্বলেরা বেশি স্বার্থপর হয়ে ওঠে।

এবার আমরা যাবার পর গ্রামের অনেক লোক ভিড় করে দেখতে এল। ফুলমণি সম্পর্কে বাবুশ্রেণীর লোকেরা এত আগ্রহ দেখানোতে ফুলমণি এখানে বেশ আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। ফুলমণি ছবি আঁকে তা এরা জানে, কিন্তু সেই ছবি নিয়ে বাবুদের এত মাথাব্যথা কেন তা তারা বুঝতে পারে না। অনেকেই বাড়ির দেয়ালের গায়ে ছবি আঁকে, বৃষ্টির জলে তা এক সময় ধুয়ে যায়। ছবির আবার এর চেয়ে বেশি মূল্য আছে নাকি?

আমি এলেবেলে হলেও সিরাজুল সাহেবের চেহারা দেখলেই সম্ভ্রম জাগে। তিনি একটা ছেঁড়া জামা পরে থাকলেও বোঝা যাবে তিনি এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাছাড়া, আমি ছোটপাহাড়িতে চাকরি করি, আমার পক্ষে এ গ্রামে আসাটা খুব একটা আশ্চর্যের কিছু না, কিন্তু সিরাজুল সাহেবের মতো এক সম্ভ্রান্ত মানুষ কলকাতা থেকে এসেছেন ফুলমণির সঙ্গে দেখা করতে, এর মর্ম এখানকার মানুষ বুঝতে পারে না। অনেকগুলো কৌতূহলী, উৎসুক মুখ ঘিরে রইল আমাদের।

সিরাজুল খুব সহজেই ফুলমণির জড়তা কাটিয়ে দিয়েছেন। তিনি ফুলমণির অন্য ছবি দেখতে দেখতে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। ফুলমণি কী-ভাবে ছবি আঁকে, তা-ও সে ঘরের বারান্দায় বসে তখনই এঁকে দেখাল।

বৃদ্ধটি এত সব ব্যাপারে তেমন খুশি নয়। সে চায় তার ছবি সম্পর্কে কথা বলতে। তাকে বাদ দিয়ে তার পুত্রবধূর অসমাপ্ত ছবিগুলো নিয়ে এত মাতামাতি করা হচ্ছে কেন?

আমাকে একটা কায়দা করতে হল।

চন্দনদা আমাকে আলাদা ভাবে পাঁচশো টাকা দিয়ে বলেছিল, ফুলমণি যদি কলকাতায় আসতে রাজি হয়, তাহলে ওর শ্বশুরকে এই টাকাটা দিয়ে আসবি কয়েক দিনের সংসার খরচের জন্য।

আমি বৃদ্ধকে বললাম, আপনার ছবিগুলো কলকাতায় অনেকের খুব ভাল লেগেছে। সবাই জিজ্ঞেস করছিল আপনার কথা।

বৃদ্ধ ফোকলা দাঁতে হেসে বললেন, ভাল লেগেছে? ভাল লেগেছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ। আপনার সব ছবি বিক্রি হয়ে গেছে। চারশো টাকায়। এই নিন সেই টাকা। একশো টাকা আমি সরিয়ে রাখলাম, ওটা ফুলমণিকে হাতখরচ হিসেবে দিতে হবে। ফুলমণি যদি দিন সাতেকও বাইরে থাকে, তার মধ্যে এই বৃদ্ধের জন্য চারশো টাকাই যথেষ্ট।

বৃদ্ধ শিশুর মতো খুশি হয়ে বার বার বলতে লাগলেন, আমার ছবি... শহরের মানুষ দাম দিয়ে কিনেছে? আমি আরও ছবি আঁকব!

কিন্তু ফুলমণিকে নিয়ে যাবার প্রস্তাব শুনে বৃদ্ধের সেই খুশি অন্তর্হিত হয়ে গেল।

একটুক্ষণ মুখ গোমড়া করে বসে থাকার পর বললেন, না না, ও কী করে একা একা কলকাতায় যাবে? আমার তবিয়ৎ ঠিক থাকলে আমি যেতাম। ও যাবে না।

পেছনের দর্শকদের মধ্যে থেকে এক ছোকরা বলল, ফুলমণি কি গান গাইবে না নাচবে? ছবি দেখাবার জন্য ওকে যেতে হবে কেন? শুধু ছবিগুলো নিয়ে গেলেই হয়।

আরও কয়েক জন হ্যা হ্যা করে হেসে বলল, ফুলমণি গান গাইবে না, নাচবে?

মুখচোরা, হার জিড়জিড়ে ফুলমণির গান গাওয়া কিংবা মঞ্চের ওপর নাচের দৃশ্যটা এমনই অবিশ্বাস্য যে অনেকেই হাসি পায়।

ফুলমণির শ্বশুর জনসমর্থন পেয়ে উৎসাহিত হয়ে বললেন, ও চলে গেলে আমাকে দেখবে কে? আমি একা এই খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে মরব?

বাসন্তী এগিয়ে এল ভিড় ঠেলে। ফুলমণিব প্রতি তার সহানুভূতি হয়েছে সম্প্রতি। সম্ভবত ছবি এঁকে টাকা পাওয়ার ব্যাপারটা তাকে আকৃষ্ট করেছে।

বাসন্তী বলল, যাক না ফুলমণি। আবার তো ঘুবে আসবে। এই ক'দিন আমি তোমাকে দেখব।

এরপর ফুলমণির যাওয়ার পক্ষে ও বিপক্ষে নানা রকম কথা শুরু হয়ে গেল। আমি বসে রইলাম চুপ করে।

খানিক বাদে ফুলমণির শ্বশুর সিরাজুল তারিককে জিজ্ঞেস করলেন, আপনিই বলুন না, আপনি বুঝদার মানুষ, ফুলমণির কলকাতায় যাওয়ার কি প্রয়োজন আছে?

সিরাজুল সাহেব শান্তভাবে বললেন, আছে। গেলে ভাল হয়। ছবির প্রদর্শনী হলে অনেকে শিল্পীকে দেখতে চায়। ফুলমণিরও উপকার হবে, জানাশুনা হবে, অনেক লোকের সঙ্গেই, ও আরও অনেক ছবি দেখবে, শিখতে পারবে।

বৃদ্ধ বললেন, কলকাত্তা বড় খিটকেল জায়গা। আমি তো জানি।

সিরাজুল সাহেব বললেন, ফুলমণিকেই জিজ্ঞেস করা যাক না, ও যেতে চায় কি না। না চাইলে জোর করে তো কেউ নেবে না।

উঠোনে ফুলমণির শ্বশুরের খাটিয়া ঘিরে কথা হচ্ছে আমাদের। ফুলমণি বসে আছে ঘরের দাওয়ায়। সে ছবিগুলো সব গুছিয়ে রাখছে।

সবাই এবার সে-দিকে তাকাল।

বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, তুই যাবি?

ফুলমণি মাথা তুলল, নিচু গলায়, কিন্তু বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বললো, যাব!

শুনেই মনে হল সে অনেকক্ষণ আগেই মন ঠিক করে রেখেছে। অন্যদের মতামতের কোনও মূল্য নেই তার কাছে। ওই একটা শব্দ শুনেই ফুলমণির ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। মেয়েটা যতই লাজুক হোক, এই ছোট গণ্ডির বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে তার আকর্ষণ আছে, ছবির প্রদর্শনীতে সে উপস্থিত থাকতে চায়, তার মানে প্রকৃত শিল্পী হবার বীজ রয়েছে ওর মধ্যে।

বৃদ্ধ এবার আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, আপনারা তো ওকে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ও ফিরবে কী করে? কোনওদিন একলা কোথাও যায়নি, লোকের সঙ্গে কথা বলতে জানে না।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আমার সঙ্গে ফিরবে। আমি তো কলকাতায় থাকি না, এখানে চাকরি করি, দু'চারদিনের মধ্যেই আমাকে ফিরতে হবে।

এরপর আব আপত্তির কারণ রইল না।

কিন্তু বাধা এল অন্য দিক থেকে।

সন্ধেবেলা গেস্ট হাউসে এসে উপস্থিত হলেন মহিম সরকার। চোখ সরু করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মি. নীললোহিত, আপনি নাকি একটা কামিনকে কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ। কামিন মানে ওই ফুলমণি, যে খুব ভাল ছবি আঁকে।

মহিমবাবু বললেন, ছবি-ফবি আমি বুঝি না। আমি বুঝি কোম্পানির কাজ। এখানকার একটা ওয়ার্কার মেয়েকে আপনারা কাজ নষ্ট করে কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছেন, এটা কি ঠিক হচ্ছে? অন্য ওয়ার্কাররা কী ভাববে?

তারা কী ভাববে আমি কি করে জানব বলুন তো?

তারা চটে যাবে না? এক জনকে, একটা মেয়েকে বেশি বেশি খাতির করা হচ্ছে, এটা তারা সহ্য করবে কেন! আপনি এ কাজটা ভাল করছেন না।

আমি তো নিজের দায়িত্বে নিয়ে যাচ্ছি না মহিমবাবু। আমাকে চন্দনদা, আই মিন, মি. চন্দন ঘোষাল বলেছেন, এটা তাঁরই নির্দেশ।

মি. ঘোষালের পার্সোনাল ব্যাপার হলে আমি কিছু বলতে চাই না। কিন্তু কোম্পানির কাজ হ্যামপার হলে —

এটাও কোম্পানির কাজের মধ্যে পড়ে। কোম্পানি ঠিক করেছে, এখানে শুধু বাড়ি আর কারখানা বানালেই চলবে না। স্থানীয় লোকদের উন্নতির দিকটাও দেখতে হবে। অর্থনৈতিক আর সাংস্কৃতিক দুটো দিকই।

সেই ছুতোয় একটা ইয়াং মেয়েকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া।

দেখুন মহিমবাবু, ফুলমণি ইয়াং ঠিকই এবং মেয়েও বটে। কিন্তু আপনি যে সেন্সে বলছেন, সেটা এখানে খাটে না। ছবি আঁকতে পারাটাও ওর একমাত্র যোগ্যতা। এখানকার একটি মেয়ে যদি শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়, তাহলে এই জায়গাটারও তো সুনাম হবে।

আপনি ওকে নিয়ে যাচ্ছেন, আপনি সদ্য কাজে যোগ দিয়েছেন, এর মধ্যেই ছুটি নিয়েছেন দু'দিন, আবার কলকাতায় চলে যাচ্ছেন।

আবার ছুটি নেব। চাকরিতে ক্যাজুয়াল লিভ, আর্নড লিভ এ-সব পাওয়া যায় না?

আপনি কি পার্মানেন্ট স্টাফ যে ছুটি পাবেন? আপনার চাকরির মোট তিন সপ্তাহও হয়নি, হে হে হে, এর মধ্যে ছুটি!

দেখুন আমাকে চাকরিটা দিয়েছেন মি. চন্দন ঘোষাল। তিনিই আমার বস, তাই না? তিনি যে-কাজ দেবেন, আমাকে সেই কাজই করতে হবে।

সে আপনি যাই-ই বলুন মশাই, ব্যাপারটা ভাল হচ্ছে না। ঝাড়খণ্ডী আন্দোলন চলছে, এখানকার কোনও মেয়েকে বাইরে নিয়ে চলে যাওয়া এরা মোটেই ভাল চোখে দেখবে না, এই আমি বলে যাচ্ছি!

মহিম সরকার আমাকে মোটামুটি শাসানি দিয়েই চলে গেলেন।

চন্দনদা এসে পৌঁছল রাত্তিরের দিকে। মহিম সরকারের আপত্তির কথাটা জানাতে চন্দনদা পাত্তাই দিল না। বাঁ-হাতে মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করে বলল, দূর দূর, ও লোকটা একটা মাথা-মোটা! একটা সাঁওতাল মেয়ের আঁকা ছবি অন্য সব শিল্পীর সঙ্গে সমান মর্যাদায় একটা বড় প্রদর্শনীতে স্থান পাচ্ছে, এ-রকম আগে কখনও ঘটেছে? বিরাট ব্যাপার। এক জন গুণীর মর্যাদা দেওয়াটা কখনও অপরাধ হতে পারে? ঝাড়খণ্ডী নেতারা এটা ঠিক বুঝবে। ওদের সঙ্গে আমার ভাব আছে।

পরদিন সকালেই রওনা হলাম আমরা। বাসে যেতে হবে না, চন্দনদার জিপ আমাদের রেল স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। ফুলমণির ছবিগুলো ভালভাবে প্যাক করে নিয়েছেন সিরাজুল সাহেব। একটা পুঁটলিতে ভরে নিয়ে এসেছে ফুলমণি তার অন্য জিনিসপত্র। পায়ে রবারের চটি, পরনে একটা নীল পাড় সাদা শাড়ি।

গেস্ট হাউসের সামনে আমাদের বিদায় জানাতে এসেছে কয়েক জন। বাসন্তী আর ওদের গ্রামের কয়েকটি ছেলে। এবং মহিম সরকার। তিনি এখন দিব্যি হেসে হেসে গল্প করছেন চন্দনদার সঙ্গে। হঠাৎ এক সময় কাছে এসে ফুলমণির দিকে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুলে তিনি বললেন, ফুলমণি, তোর কিন্তু ফার্স্ট হওয়া চাই। তুই প্রাইজ নিয়ে ফিরে এলে আমি সবাইকে মিষ্টি খাওয়াব।

জিপে ওঠার আগে ফুলমণি একবার দূরের মাঠের দিকে ঘুরে তাকাল। আজকে আকাশ সজল মেঘে ঢাকা। পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে না। ডান পাশের জঙ্গলের ভেতর থেকে কয়েকটা মোষকে তাড়িয়ে নিয়ে এল একটা বাচ্চা রাখাল। একটা কুকুর অকারণে সেখানে চ্যাঁচাচ্ছে, উড়ে গেল একঝাঁক কোচ বক।

ফুলমণি যেন তার ছবির পটভূমিকাগুলি একবার দেখে নিল চোখ ভরে।

॥ ৭ ॥

প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে এলেন লেডি রাণু মুখার্জি।

এত দিন তাঁকে শুধু ছবিতেই দেখেছি। অসাধারণ রূপসী ছিলেন, এখন প্রচুর বয়স হয়ে গেলেও সেই রূপের আভা যায়নি। একা একা আর চলা-ফেরা করতে পারেন না, সব সময় তাঁর সঙ্গে এক জন সেবিকা থাকে, তবু নাকি তিনি আজও প্রত্যেকটি ছবির প্রদর্শনীতে আসেন। শিল্পের প্রতি এই ভালবাসা তাঁর বর্ণময় জীবনকে একটা আলাদা মর্যাদা দিয়েছে।

শিল্প জগতের এই প্রবাদ-প্রতিমাকে আমি মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম দূর থেকে।

সিরাজুল সাহেব এই প্রদর্শনীর শিল্পীদের সঙ্গে লেডি রাণুর আলাপ করিয়ে দিতে লাগলেন।

অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের তিনখানা ঘর জুড়ে চলছে এই প্রদর্শনী। মোট সতেরো জন শিল্পী, সকলেই যে বয়সে নবীন তা নয়। কেউ কেউ এসেছে বারাসত, বনগাঁ, ঝাড়গ্রাম, দুর্গাপুর

থেকে। তবে কলকাতার ছেলে-মেয়েদের সংখ্যাই খুব বেশি। সতেরো জনের মধ্যে এক জন শুধু অসুস্থ বলে আসতে পারেনি।

অন্য শিল্পীদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল ফুলমণিকে। আজও পায়ে সেই রবারের চটি, নীল-পাড় সাদা শাড়ি, বিশেষত্বের এই যে, আজ তার মাথার চুল ভালভাবে আঁচড়ানো, তাতে একগুচ্ছ সাদা ফুল গোঁজা।

ছোটপাহাড়ি থেকে এনে ফুলমণিকে আর কোথায় তুলব, চন্দনদার কথা মতো নিয়ে গিয়েছিলাম নীপাবউদির কাছে। নীপাবউদি বেশ আগ্রহ করেই ফুলমণিকে স্থান দিয়েছে। আজকাল সব মহিলার মধ্যেই একটু একটু উইমেন্‌স লিব-এর ছোঁয়া আছে, তাই এক জন নারী হয়ে অন্য একটি নারীকে সাহায্য করতে নীপাবউদির কোনও কার্পণ্য নেই।

মুশকিল হয়েছিল লালুদাকে নিয়ে। এই সর্বঘটে কাঁঠালি কলাটি যথারীতি সে-বাড়িতে উপস্থিত। ফুলমণি সম্পর্কে নীপাবউদির উৎসাহ দেখে লালুদার উৎসাহ চতুর্গুণ বেড়ে গেল। ফুলমণি দু'খানা মাত্র নীল-পাড় শাড়ি ছাড়া আর কিছুই আনেনি শুনে লালুদা লাফিয়ে উঠে বলল, সে কী, অত বড় আর্ট একজিবিশানে যাবে, লেডি রাণু আসবেন, সাজিয়ে-গুছিয়ে পাঠানো দরকার। তাহলে ওর জন্য এক জোড়া বেনারসি কিনে আনি? নীপাবউদি বলল, বেনারসি? কেন, ও কি বিয়ে করতে যাচ্ছে নাকি?

লালুদা বলল, তাহলে সিল্ক টাঙ্গাইল!

নীপা বউদি বলল, আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি! ও অত সেজেগুজে যাবে কেন? ওর যা স্বাভাবিক পোশাক, তা পরেই যাবে। তাতেই ওর আত্মসম্মান বাড়বে।

তাহলে এক সেট রুপোর গয়না কিনে আনা যাক। ওরা রুপোর গয়না খুব পরে আমি দেখেছি।

কোনও দরকার নেই। বেশি সাজগোজ করে ও যাবে কেন?

আহা, বুঝছ না নীপা। লোকের চোখে পড়া দরকার, বুঝলে না, আজকাল পাবলিসিটির যুগ।

ছবি ভাল লাগলেই লোকে ওকে চিনবে।

তাহলে অন্তত কয়েকটা ভাল সাবান।

নীপাবউদির ধমক খেয়ে লালুদা শেষ পর্যন্ত নিরস্ত হল বটে, কিন্তু কোনও অছিলাতেই টাকা খরচ করার সুযোগ না পেয়ে মর্মাহত হল খুব।

নীপাবউদি যে ফুলমণির পোশাক নিয়ে কোনও বাড়াবাড়ি করেনি, তাতে আমিও খুশি হয়েছি। এক সাঁওতাল গ্রামের মেয়ে কেন কলকাতার মেয়েদের মতো সাজতে যাবে। ওর নিজের পোশাকই তো ওর অহঙ্কার। ও যেমন, ঠিক তেমনই ওকে মানাবে।

এখন যে ফুলমণি অন্য শিল্পীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, তাতে ওকে একটুও বেমানান লাগছে না। পোশাক নয়, আসল তো মুখ। নিরক্ষর, গ্রাম্য মেয়ে হলেও ফুলমণি বোকা নয়। শিল্পীসুলভ একটা প্রত্যয়ের ছাপ আছে ওর মুখে। এখানকার অন্য ছবিগুলো দেখে ও নিশ্চয়ই বুঝেছে যে, ও নিজেও অন্যদের চেয়ে কম কিছু নয়।

সতেরো জনের মধ্যে ফুলমণি ছাড়াও আরও পাঁচটি মেয়ে আছে, তারাও কেউ উগ্র সাজগোজ করেনি। সহজ-অনাড়ম্বর পোশাক। ফ্যাশানেবল্ মহিলারা সচরাচর ভাল শিল্পী হয় না।

সিরাজুল তারিক অন্য শিল্পীদের সঙ্গে লেডি রাণুর পরিচয় করিয়ে দিতে দিতে ফুলমণির কাছে এসে বললেন, এই মেয়েটি, জানেন, কোথাও শেখেনি, একটা রিমোট গ্রামে থাকে, কিন্তু অসাধারণ ছবি এঁকেছে।

লেডি রাণু বললেন, তাই নাকি? তাহলে তো ওর ছবিই আগে দেখতে হয়।

প্রত্যেকেরই চারখানা করে ছবি টাঙানো হয়েছে। ফুলমণির ছবিগুলোর কাছে গিয়ে দেখতে দেখতে লেডি রাণু বলতে লাগলেন, বাঃ বেশ তো। সত্যি ভাল।

তারপর ফুলমণিকে জিজ্ঞেস করলেন, অনেক রকম লাইন দেখছি, তুমি কতগুলো তুলি ব্যবহার করো?

সিরাজুল সাহেব বললেন, ও তো তুলি দিয়ে আঁকে না।

ফুলমণি তার একটা হাত তুলে পাঞ্জাটা মেলে ধরল।

সিরাজুল সাহেব বললেন, ও শুধু আঙুলের ডগা আর নখ দিয়ে আঁকে। আমি নিজে দেখেছি আঁকতে। ফ্যানটাস্টিক!

লেডি রাণু খুবই অবাক হলেন। আরও অনেক প্রশংসা করে চলে গেলেন অন্য ছবির দিকে।

লোক কম হয়নি। প্রেস, চিত্র সমালোচক, ফটোগ্রাফার, শিল্পীদের আত্মীয়-স্বজন এবং কিছু দর্শক। নীপাবউদিরা আজ আসতে পারেনি, কাল আসবে বলেছে।

ফুলমণির ছবিগুলোর কাছে কিছু দর্শক দেখলেই আমি তাদের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াই, তাদের মন্তব্য শোনার চেষ্টা করি। সবাই যে একবাক্যে প্রশংসা করছে তা নয়। কেউ কেউ শুধু চোখ বুলিয়ে চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ খুঁটিয়ে দেখছে। কেউ বলছে, বাঃ, মন্দ নয়।

দু'জন নামকরা সমালোচক সিরাজুল সাহেবেব কাছে যেচে প্রশংসা করে গেলেন। আলাপ করলেন ফুলমণির সঙ্গে। ফুলমণি একটা-দুটো প্রশ্নের উত্তরও দিল। ওঁদেব মধ্যে এক জন শুধু প্রশংসাই করে গেলেন, আর এক জন রঙের ব্যবহার নিয়ে কয়েকটি পরামর্শ দিলেন ফুলমণিকে। দু'জনের ব্যবহারই বেশ আন্তরিক। চন্দনদা সমালোচকদের সম্পর্কে বড় কঠিন মন্তব্য করেছিল। এই তো এঁরা নিজে থেকেই এসেছেন। এখানে মদের ফোয়ারা নেই, খাওয়া-দাওয়ার এলাহি ব্যবস্থা নেই, শুধু চা আর দুটো করে সিঙাড়া।

কিছু কিছু খ্যাতিমান শিল্পীরা আসছেন, কয়েকজনকে চেনা যায়। এঁরা তরুণদের কাজ সম্পর্কে কৌতূহলী, এক-এক জনকে ঘিরে ছোটখাটো দল হয়ে যাচ্ছে। বিখ্যাত ব্যক্তিদের সদলবলে চলাই রীতি। আমি লক্ষ্য করলাম, এরা প্রায় সকলেই ছবিগুলোর দিকে ওপর ওপর চোখ বুলোলেন শুধু, তারপর ভক্তদের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। এঁদের পাকা চোখ, এক ঝলক দেখেই বুঝে নেন। কোনও কোনও তরুণ শিল্পী তার গুরুস্থানীয়কে জোর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নিজের ছবিগুলোর কাছে। এক-এক জন শিল্পী এতই ভদ্র এবং উদার যে, সবাইকে বিলিয়ে যাচ্ছেন প্রশংসা।

সিরাজুল তারিক সাহেব চলে গেলেন একটু আগে।

আমার ওপর নির্দেশ দিয়ে গেছেন, ফুলমণিকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত থেকে যেতে। আটটার সময় বন্ধ হবে। থাকতে আমার খারাপ লাগবে না। এতগুলি শিল্পীর এত রকমের ছবি, এত দিনের নিষ্ঠা, ভাবনা, রঙের পরীক্ষা, সব মিলিয়ে পরিবেশটা একেবারে অন্য রকম। যেন একটা চমৎকার উদ্যান।

কোনও বিখ্যাত শিল্পীকে ফুলমণি তার নিজের ছবির কাছে নিয়ে যাবে, সে-প্রশ্নই ওঠে না। সে দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে। আমিও কারুকে অনুরোধ করতে পারছি না, কেউ যদি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, আপনার এত উৎসাহ কেন মশাই? ওই মেয়েটা আপনার কে হয়?

আমি দূর থেকে অন্যদের প্রতিক্রিয়া দেখছি। কেউ কেউ ফুলমণির ছবির সামনে থামছে, কেউ থামছে না। তবে একটা ব্যাপার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, এ-পর্যন্ত এক জনও কেউ বলেনি যে, এ আদিবাসী মেয়েটির আঁকা ছবি নিম্নমানের, এই প্রদর্শনীর উপযুক্ত নয়। ফুলমণির ছবি দয়া করে রাখা

হয়নি, কিংবা চন্দনদা, সিরাজুল সাহেবের হুজুগে পক্ষপাতিত্ব নয়। অন্য শিল্পীদের সমান যোগ্যতা তার আছে।

আমাদের দেশে প্রদর্শনীর মাঝখানে ছবি কেউ কিনতে চাইলে 'সোল্ড' লিখে দেওয়া হয় না, শুধু একটা লাল টিপ দেওয়া হয়। ফুলমণির ছবি কেউ কেনে কিনা সে-সম্পর্কে আমার দারুণ কৌতূহল। সিরাজুল সাহেব অবশ্য বলেছিলেন, আমাদের দেশে সাধারণ বাঙালি দর্শকরা তো ছবি কেনে না, তাদের ভরসা নেই। ছবি কেনে গোয়েঙ্কা, ডালমিয়া, বিড়লা, রুশি, মোদিরা। তারা নতুনদের প্রদর্শনীতে চট করে আসে না, তাদের প্রতিনিধিদের ধরে আনতে হবে।

তবে এরই মধ্যে একটি মাত্র ছবিতে লাল টিপ পড়েছে। কৌশিক শূর নামে এক জনের আধাবিমূর্ত ছবি। কৌশিক শূরের বয়সে বড় জোর সাতাশ, মুখভর্তি দাড়ি, চোখ দু'টি স্বপ্নময়।

সাড়ে সাতটার সময় এলেন বিশ্বদেব রায়চৌধুরী, এঁর খ্যাতি ভারতজোড়া। দীর্ঘকায়, সুপুরুষ, সদা হাস্যময় মুখ। তাঁর কোনও এক ভাবশিষ্যের ছবি আছে এখানে, খুব সম্ভবত সেই জন্যই তিনি এসেছেন।

ঘুরতে ঘুরতে তিনি ফুলমণির দিকে তাকিয়ে থমকে গেলেন।

অ্যাকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের প্রদর্শনীতে মাথায় ফুল গোঁজা একটি সাঁওতাল মেয়েকে তো আর প্রতি দিন দেখা যায় না। কোনও চাষি, জেলে, মজুর, তাঁতি কোনও দিন এখানে আসে না। এ-সব ছবি তাদের জন্য নয়। শিল্প-সাহিত্য গোটা ব্যাপারটা থেকেই আমাদের দেশের শতকরা আশি জন বাদ।

বিশ্বদেব রায়চৌধুরীর বিস্ময় স্বাভাবিক।

কয়েক জন তরুণ শিল্পী ফুলমণিকে ওঁর কাছে নিয়ে গেল। আমি দূর থেকে দেখলাম, উনি ফুলমণির সঙ্গে আগ্রহ নিয়ে দু'চারটে কথা বললেন, ফুলমণির ছবিও দেখলেন।

তারপর তিনি অন্য দিকে মন দিতে আমি ফুলমণিকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, ওঁকে চিনতে পেরেছ? বিরাট শিল্পী। উনি কী বললেন তোমাকে?

ফুলমণি সরু করে হেসে, দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, উনার ভাল লাগে নাই।

কথাটা আমার বিশ্বাস হল না। বিশ্বদেব রায়চৌধুরীর যে-ধরনের মানুষ, খারাপ লাগলেও তো সে-কথা মুখে বলবেন না। তিনি এখন এত উঁচুতে উঠে গেছেন যে কারুকেই আর ছোট করার দরকার হয় না ওঁর।

পাশ থেকে আর একটি মেয়ে বলল, না না, উনি ছবিগুলোকে খারাপ বলেননি। প্রশংসাই করেছেন। শুধু বললেন, যে-কাগজে আঁকা হয়েছে, তাতে রঙ বেশি দিন থাকবে না। ভাল কাগজে কিংবা ক্যানভাস ব্যবহার করা উচিত।

আমি ভাবলাম, ভাল কাগজ কিংবা ক্যানভাস কেনার পয়সা ও পাবে কোথায়? সিরাজুল সাহেব ঝোঁকের মাথায় বলেছিলেন, ফুলমণির ছবির প্রত্যেকটির দাম পাঁচ হাজার টাকা। এখানে ছবির মেটেরিয়াল অনুযায়ী দাম ধরা হয়েছে। ফুলমণির একটা ছবির দাম সাতশো, অন্যগুলো এক হাজার, দেড় হাজার, দু'হাজার। বিক্রি হয় কি না সেইটাই পরীক্ষা। ধরা যাক সব ক'টাই বিক্রি হয়ে গেল। তারপর ফুলমণি কী করবে? ওই ক'টা টাকায় ওর কত দিন চলবে? ওর শ্বশুর বেশ কিছুটা নিয়ে নেবে, পাড়া-প্রতিবেশীরাও ভাগ বসাবে। বড় ভোজ হবে। ফুলমণি কি আবার ইট বওয়ার কাজে ফিরে যাবে?

অন্য আর পাঁচ জন শিল্পীর মতো ফুলমণি শুধু ছবি আঁকার সাধনা করে যাবে, এর কি কোনও উপায় নেই?

চন্দনদার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতে হবে।

সিগারেট টানার জন্য বাইরে এলাম, ফুলমণিও এল আমার সঙ্গে। অ্যাকাডেমির সামনের প্রাঙ্গণে সব সময়েই ভিড় থাকে, এখন অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেছে। বিদ্যুতের চমক বৃষ্টির খবর দিল। অনেকগুলো ফুলের গন্ধ আসছে এক সঙ্গে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ফুলমণি, কেমন লাগছে এখানে?

ফুলমণি হাসল।

কথা তো বলেই না প্রায়, ওই হাসিটুকুও যথেষ্ট।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, যদি কিছু ব্যবস্থা করা যায়, তুমি কলকাতায় থেকে যেতে পারবে? এখানে ইচ্ছে মতো ছবি আঁকবে।

আমার চোখের দিকে স্থির ভাবে তাকিয়ে ফুলমণি বলল, কী জানি!

আর কিছু বলার আগেই ভেতরে একটা গোলমাল শুনতে পেলাম। কে যেন রেগেমেগে চিৎকার করছে।

আর্ট এক্জিবিশানে সবাই মৃদু স্বরে কথা বলে। এখানে চিৎকার অস্বাভাবিক। ছুটে গেলাম হলের মধ্যে।

এখন দর্শক আর নেই বলতে গেলে। সবাই প্রায় শিল্পী বা তাদের বন্ধুবান্ধব। বিশ্বদেব রায়চৌধুরী দূরের এক কোণে ছবি দেখছেন, আর ফুলমণির ছবির সামনে এক জন মজবুত, দীর্ঘকায়, ইগল-নাসা পুরুষ, অনিন্দ্য দাস! হাতের বেতের ছড়ি।

ছড়িটা তুলে বললেন, কোথায় চন্দন ঘোষাল কোথায়? ডাক সেই শালাকে। আদিবাসী মেয়ের আঁকা ছবি? কোন কালচার? এথনিক? আমার সঙ্গে ফেরেব্বাজি! চন্দন ঘোষালকে আমি চিনি না? আমার সঙ্গে স্কুলে পড়ত। ছবি আঁকার খুব শখ ছিল। ছবির হ্রস্বি-দীর্ঘি জ্ঞান নেই, তবু আঁকবে। এই সব এঁকেছে, নিজের নামে ছবি ঝোলাবার মুরোদ নেই, এখন সাঁওতাল মেয়ের নামে চালাচ্ছে!

আমাকে দেখতে পেয়ে গলা চড়িয়ে অনিন্দ্য দাস জিজ্ঞেস করলেন, অ্যাই যে, এই ছেলে ই-দিকে আয়। চন্দন কোথায়?

আমি বললাম, তিনি আসেননি।

পালিয়ে থাকছে! সাহস নেই! ওর কি এত পয়সার খাঁকতি হয়েছে যে ছবির বাজারে ঢুকতে চায়? আদিবাসী আর্ট, শালা! মধুবনী পেইন্টিং এখন বালিগঞ্জে তৈরি হয়, আমি জানি না? কালিঘাটের পটের ভেজাল, আর্ট কলেজের ছাত্ররা এঁকে সাপ্লাই দিচ্ছে! চন্দন আসেনি কেন? তোরা যে বলছিলি... কোথায় সেই মাগিটা কোথায়? মাগিটাকে শো কর, দেখি সে কেমন আঁকে।

আমার মাথায় রাগ চড়ে গেল।

অনিন্দ্য দাস যত বড় শিল্পীই হোক না কেন, আমি তার ধমক খেতে যাব কোন দুঃখে?

আমি বললাম, আপনাকে আমি প্রমাণ দিতে যাব কেন? আপনার ইচ্ছে না হয় বিশ্বাস করবেন না! হাতের ছড়িটা আমার কাঁধে ঠেকিয়ে অনিন্দ্য দাস বললেন, আলবাত প্রমাণ দিতে হবে! আর্টের বাজারে জোচ্চুরি আমরা সহ্য করব না। ফল্‌স নামে ছবি বেচা, আমাদের সকলের বদনাম হবে!

বিশ্বদেব রায়চৌধুরী কাছে এগিয়ে এসে সস্নেহ ভর্ৎসনার সঙ্গে বললেন, কী হল অনিন্দ্য, এত রাগারাগি করছ কেন?

অনিন্দ্য দাস বললেন, আপনি চুপ করুন তো। আপনি কিছু জানেন না, কী সব নখরাবাজি চলছে চারদিকে। আমি মাগিটাকে দেখতে চাই, সে কেমন ছবি আঁকে। এটা কিছু অন্যায় বলিনি।

কথা বলতে বলতে অনিন্দ্য দাস একটুখানি দুলে যেতেই বোঝা গেল, তিনি বেশ খানিকটা মদ্যপান করে এসেছেন। তাঁর মাথায় কোনও যুক্তিবোধ কাজ করছে না।

বিশ্বদেব রায়চৌধুরী বুঝলেন এখানে আর কথা বলতে গেলে তাঁর মান থাকবে না। তিনি আস্তে আস্তে সরে পড়লেন।

অন্য এক জন কেউ বলল, মেয়েটি তো এখানেই ছিল। বোধহয় বাইরে গেছে।

কোথায়, কোথায়, বলতে বলতে অনিন্দ্য দাস দরজার দিকে এগোলেন। আমাকেও সঙ্গে যেতে হল।

ফুলমণি জলের ফোয়ারাটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টি পড়ছে দু'এক ফোঁটা।

ফুলমণিকে দেখে হা-হা শব্দে অট্টহাসি দিয়ে উঠলেন অনিন্দ্য দাস।

তারপর বললেন, এই মেয়ে! একে তো রেল লাইনের ধার থেকে ধরে এনেছে! একটা সাঁওতাল মেয়েকে এনে দাঁড় করালেই হল। ও ওর বাপের জন্মে তুলি ধরতে শিখেছে? আমি বাজি ফেলতে পারি!

ফুলমণির কাছে গিয়ে তিনি আবার বললেন, এই মেয়ে, তুই ছবি আঁকতে পারিস? সত্যি করে বল্!

ফুলমণি কোনও উত্তর দিল না, ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ফস করে পকেট থেকে একটা তুলি বার করে অনিন্দ্য দাস বললেন, এটা ধর তো! ছবি এঁকে দেখাতে হবে না, শুধু তুলিটা কেমন ভাবে ধরিস, সেটা দেখব।

আমি বললাম, ও তুলি দিয়ে আঁকে না।

তবে কি ইয়ের ইয়ে দিয়ে আঁকে!

ও শুধু আঙুল দিয়ে আঁকে।

আবার একখানা জোর হাসি দিলেন অনিন্দ্য দাস। আমাকে একটা খোঁচা মেরে বললেন, আঙুল দিয়ে...এ কি বাবা কপালে ফোঁটা কাটা? তোর কপালে মেয়েটা ফোঁটা দিয়েছে নাকি রে?

ফুলমণির একটা হাত চেপে ধরে তিনি বললেন, দেখি দেখি, আঙুলগুলো দেখি! এ যে সব ট্যাড়োশ!

ফুলমণি জোর করে হাতটা ছাড়িয়ে নিল।

অনিন্দ্য দাস বললেন, ইঃ, তেজ আছে! ক'পয়সা পেয়েছিস?

ফুলমণির গালে এক আঙুলের ঠোনা মেরে বললেন, মুখটা ফেরা তো। হুঁ, প্রোফাইলটা ইন্টারেস্টিং।

হঠাৎ আমার মনে হল, আমি একটা সাঁওতাল ছেলে। ঝাড়খণ্ডের সমর্থক। আমার গ্রামের একটি মেয়েকে অপমান করছে কলকাতার এক বাবু। আমার রক্ত গরম হয়ে গেল।

আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে অনিন্দ্য দাসের কলার চেপে ধরে বললাম, ছেড়ে দিন ওকে। অসভ্য কোথাকার।

অনিন্দ্য দাস আমাকে মারার জন্য ছড়ি তুললেন।

আর কয়েক জন মাঝখানে এসে পড়ে ঠেলে সরিয়ে দিল দু'জনকে।

কেউ এক জন আমাকে টানতে টানতে নিয়ে এল ভেতরে। জোর করে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। রাগে তখনও আমি হাঁপাচ্ছি। অনিন্দ্য দাসের কয়েকটা দাঁত ভেঙে দেওয়া উচিত ছিল।

যে-ছেলেটি আমাকে টেনে এনেছে, সে বলল, চুপ করে একটু বসুন। অনিন্দ্য দাস লোক খারাপ নন। যখন তখন মাথা গরম করেন। কিন্তু গ্রেট সোল। আপনার সঙ্গে যদি ভাব হয় একবার, দেখবেন আপনার জন্য সর্বস্ব দিয়ে দেবেন।

আমি বললাম, আমার দরকার নেই ভাব করার। যে ও-রকম মুখ খারাপ করে।

ওনার মুখটাই ও-রকম, মনটা পরিষ্কার!

ফুলমণিকে ও যদি আবার কিছু বলে?

না, ফুলমণি বাথরুমে গেছে।

পাশ থেকে আর এক জন বলল, অনিন্দ্যদা চলে গেলেন। কী বলতে বলতে গেলেন জানো, এখানকার সব ক'টা ছবি বোগাস! সব ফল্‌স।

ওই দু'জন খুব হাসতে লাগল।

এক জন বলল, কাল দেখবি অনিন্দ্যদা এসে খুব প্রশংসা করবে। আজ পেটে একটু বেশি পড়েছে।

কর্তৃপক্ষ-স্থানীয় এক জন ভদ্রলোক আমার সামনে এসে বললেন, আপনারা এখানে মারামারি শুরু করেছিলেন? ছি ছি ছি। এখানে কোনও দিন ও-সব হয় না।

আমি আহতভাবে বললাম, আপনি শুধু আমাকে বলছেন? আমি কি শুরু করেছি! অনিন্দ্যবাবু যা-তা বলতে শুরু করলেন।

অনিন্দ্যবাবু এক জন নামকরা আর্টিস্ট। তার মুখে মুখে আপনি কথা বলতে গেলেন কেন? আপনি কে?

আমি ছবি আঁকতে পারি না বটে, কিন্তু আমি এক জন ভদ্রলোক।

সিরাজুল সাহেবকে বলব।

যা খুশি বলবেন। আমি চলে যাচ্ছি, আর আসব না।

আটটা বেজে গেছে। বন্ধ করার সময়ও হয়ে গেছে। চলে এলাম বাইরে। ফুলমণি এখনও বাথরুম থেকে ফেরেনি।

এতক্ষণ পর্যন্ত এই পরিবেশটা সম্পর্কে যে ভাললাগা ছিল, এক জন লোক এসে তা নষ্ট করে দিল। এখানে চন্দনদার উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। অন্তত প্রথম দিনটা। কিন্তু চন্দনদা নিজে সব ব্যবস্থা করে দিলেও সামনে আসতে চাইছে না। নীপাবউদিকে বোঝাতে চায় যে, ফুলমণি সম্পর্কে যাবতীয় উৎসাহ শুধু আমার।

একে একে সবাই বেরিয়ে যাচ্ছে। ফুলমণি এতক্ষণ কী করছে বাথরুমে? সে-দিকে খানিকটা এগিয়ে গেলাম, কিন্তু মেয়েদের বাথরুমের মধ্যে ঢুকে তো দেখা যায় না।

বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে গজরাচ্ছে আকাশ।

আসল বৃষ্টি শুরু হয়নি, ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে বড় বড় ফোঁটা এসে গায়ে লাগছে। এই রকম সময়ে বেড়াতে মজা লাগে। ফুলমণি যদি চায়, এক্ষুনি বাড়ি না ফিরে ময়দানে খানিকক্ষণ ঘোরা যেতে পারে। কলকাতার ময়দানের একটা দারুণ রূপ আছে, সেটা দেখলে ওর ভাল লাগবে আশা করি। চৌরঙ্গির এক দিকে আলোকোজ্জ্বল বড় বড় বাড়ি, আর এক দিকে অন্ধকার।

আরও একটা সিগারেট শেষ হয়ে গেল, ফুলমণি তবু আসছে না কেন? এবারে বোধহয় গেট-ফেট বন্ধ করে দেবে! না, পেছন দিকের হলের নাটক এখনও ভাঙেনি।

বাথরুমের মধ্যে গিয়ে ফুলমণি অসুস্থ হয়ে পড়ল নাকি?

একটি যুবতী খটখটে জুতোর শব্দ তুলে বেরিয়ে আসছে বাথরুম থেকে। চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে তার সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কিছু মনে করবেন না। বাথরুমে কি আর কেউ আছে? আমার এক জন আত্মীয় ঢুকেছিলেন।

মেয়েটি সপ্রতিভ ভাবে বলল, না, আর কাউকে দেখলাম না তো।

তারপর সে নিজেই আর একবার উঁকি দিয়ে এসে বলল, না, কেউ নেই।

আমি বললাম, কেউ নেই? তাহলে...তাহলে আমি একবার নিজে দেখে আসতে পারি?

মেয়েটি বলল, হ্যাঁ, যান না। আমি দাঁড়াচ্ছি।

কপালে আমার এত ছিল, মেয়েদের বাথরুম পরিদর্শন করতে হবে। তা-ও কি না ফাঁকা। মেয়েদের বাথরুমের দেওয়ালে কিছু লেখা থাকে কি না, সে-বিষয়ে আমার কৌতূহল ছিল যথেষ্ট, কিন্তু এখন সে-সব দেখার সময় নয়।

নিঃসন্দেহে বলা যায় ভেতরে কেউ নেই।

যুবতীটি অপেক্ষা করছে, বলল, পেলেন না?

আমি দু'দিকে মাথা নাড়লাম।

কী-রকম দেখতে বলুন তো?

নীল-পাড় সাদা শাড়ি পরা, মাথায় ফুল গোঁজা, রোগা, আপনারই বয়সী হবে বোধহয়।

না, সে-রকম কারুকে দেখিনি। দেখুন বোধহয় বাইরে অপেক্ষা করছেন!

যুবতীটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি প্রায় দৌড়ে চলে এলাম গেটের বাইরে। সেখানে কেউ নেই। রাস্তার ও-পারে নিশ্চয়ই যাবে না।

ফিরে এসে অ্যাকাডেমির ঘরগুলো খুঁজলাম তন্নতন্ন করে।

যদি ভুল করে থিয়েটার হলের মধ্যে ঢুকে পড়ে, তাই অপেক্ষা করলাম নাটক শেষ হওয়া পর্যন্ত। পৌনে ন'টায় হুড় হুড় করে বেরিয়ে এল বহু নারী-পুরুষ, গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আমি পরীক্ষা করলাম প্রত্যেকটা মুখ। সবাই বেরিয়ে গেলে মঞ্চ এবং গ্রিনরুম দেখতেও বাকি রাখলাম না।

ফুলমণি কোথাও নেই।

আমার বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে। এ কী হল? আমাকে কিছু না বলে কোথায় যাবে ফুলমণি? অনিন্দ্য দাসের বিশ্রী ব্যবহারে রাগ করে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে? তাহলেই তো সর্বনাশ! ফুলমণি কলকাতার কিছুই চেনে না। এত গাড়ি-ঘোড়ার রাস্তা কী করে পার হতে হয় জানে না।

সামনের রাস্তার এ-দিক থেকে ও-দিক, ময়দানের খানিকটা অংশে খোঁজাখুঁজি করেও কোনও লাভ হলো না।

তাহলে কি নীপাবউদির বাড়িতে ফিরে গেছে? ঠিকানাও তো জানে না। আসবার সময় ট্যাক্সিতে এসেছি, সেই সব রাস্তা মনে রেখেছে? গ্রামের লোক শহরে এলে দিশেহারা হয়ে যায়, সমস্ত রাস্তাই তাদের এক রকম মনে হয়। তবে যদি ফুলমণির স্মৃতিশক্তি অসাধারণ হয়, বলা তো যায় না।

এ ছাড়া আর তো কিছু করবারও নেই। একটা ট্যাক্সি পেয়েই বললাম, খুব জলদি, সুইন-হো স্ট্রিট।

ঠিক তখনই আকাশ ফাটিয়ে বৃষ্টি নামল। চড়চড়াৎ শব্দে বিদ্যুৎ চিরে গেল কলকাতার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত।

নীপাবউদি আর লালুদা টিভিতে সিনেমা দেখছে।

বুকের ধড়ফড়ানি অতি কষ্টে সামলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ফুলমণি কী করছে? কখন ফিরল?

নীপাবউদি বলল, ফুলমণি! সে একা ফিরবে কী করে? তোমার সঙ্গে আসেনি?

আমি ধপাস করে বসে পড়লাম সোফায়। হাতের তালু ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। পায়ে জোর নেই।

সব শুনে লালুদা চক্ষু গোল গোল করে বলল, কেস সিরিয়াস! মেয়েটা যদি সত্যি সত্যি হারিয়ে যায়, আদিবাসী মেয়ে, আমাদের নামে অ্যাবডাকশান চার্জ আনতে পারে। ওহে নিলাম্বুজ, এটা কী করলে?

আমি কী করব বলুন। ও বাথরুমে গেল, তখনও কি আমি ওর পেছন পেছন যাব?

তা-ও যাওয়া উচিত ছিল।

নীপাবউদি বলল, তুমি হুট করে চলে এলে? ওখানেই আছে নিশ্চয়ই। যাবে কোথায়।

আমি সব জায়গায় দেখেছি। কেউ নেই। এখন আর লোকজনই নেই বলতে গেলে।

হয়তো কোনও গাছটাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে।

মুমু পাশের ঘরে পড়তে বসেছিল। উঠে এসে সব শুনছে। সে-ও বলল, নীলকাকা, তুমি ওকে হারিয়ে ফেললে? এখন কী হবে?

সবাই আমার নামে দোষ দিচ্ছে! আমি যেন চুরির দায়ে ধরা পড়েছি।

লালুদা বলল, এক্ষুনি তো একটা ব্যবস্থা করতে হয়। চলো বেরোই। থানায় একটা ডায়েরি করতে হবে। নীলমণিকে যদি অ্যারেস্ট করে, তার জন্য জামিনের ব্যবস্থা করতে হবে।

নীপাবউদি চমকে উঠে বলল, কেন, নীলুকে অ্যারেস্ট কববে কেন?

মুমু এক গাল হেসে বলল, বেশ হবে! নীলকাকাকে জেলে ভরে রাখলে খুব মজা হবে! আমরা দেখতে যাব!

রাত হয়ে গেছে, তাই মুমুর বায়না সত্ত্বেও তাকে সঙ্গে নেওয়া হল না, কাল তার স্কুল আছে। লালুদার সঙ্গে নীপাবউদি আর আমি বেরিয়ে পড়লাম। বৃষ্টি হঠাৎ থেমে গেছে।

একটা গাড়ি থাকলে কত সুবিধে। নীপাবউদির কথায় থানায় না গিয়ে আমরা আগে গেলাম অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের কাছে।

সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল, রেড রোড, রেস কোর্স এই সব চক্কর দিয়ে প্রায় পুরো ময়দানটাই ঘুরে দেখা হল। ফুচকা, আলুকাবলির দোকানগুলোও উঠে গেছে, দু'একটা থেমে থাকা গাড়িতে রয়েছে কয়েক জোড়া দুঃসাহসী প্রেমিক-প্রেমিকা, কিছু গোপন মদ্যপায়ী ও কিছু পুলিশ ছাড়া আর কেউ নেই।

লালুদা বলল, মেট্রো রেলের কাজের জন্য অনেক আদিবাসী ওয়ার্কার আনিয়েছে। তারা ময়দানের মধ্যে এক জায়গায় ঝুপড়ি বেঁধে আছে। আমার মনে হয়, মেয়েটা সেখানে চলে গেছে। হয়তো কোনও দেশোয়ালির সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে।

নীপাবউদি বলল, সেখানে আমরা যাব কী করে?

লালুদা বলল, দেখোই না!

সত্যি, লালুদা অসাধ্য সাধন করতে পারে।

টাটা সেন্টারের কাছাকাছি উলটো দিকে গাড়িটা থামাল লালুদা। এখানে মেট্রো রেলের অনেকগুলো গুদাম ঘর, শেড আছে। মাঝখান দিয়ে একটা সরু পথ, অন্ধকার। লালুদার গাড়িতে টর্চও থাকে, লোডশেডিংয়ের সময়ের জন্য। নীপাবউদিকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে লালুদা শুধু আমাকে নিয়ে ভেতরে যেতে চাইল, নীপাবউদি রাজি হল না। এত রাতে নীপাবউদির পক্ষে একা গাড়িতে বসে থাকা বিপজ্জনক।

ভেতরে ঢুকে দেখা গেল, এক জায়গায় রয়েছে অনেকগুলো ঝুপড়ি। কলকাতার একেবারে বুকের ওপর একটা আদিবাসী গ্রাম। এক জন গার্ড প্রথমে আমাদের বাধা দিয়েছিল, লালুদা তার হাতে একটা কুড়ি টাকার নোট গুঁজে দিতে সে-ই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল আমাদের।

কিছু লোক এক জায়গায় গোল হয়ে বসে আছে, মাঝখানে জ্বলছে একটা হ্যাজাক। সেখানে হাত ধরাধরি করে নাচছে দু'টি মেয়ে। অন্যরা হাততালি দিচ্ছে। তাদের পাশে পাশে দিশি মদের বোতল।

প্রথমে আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। যে-দু'জন নাচছে, তাদের মধ্যে এক জন ফুলমণি নয়? সেই রকম নীলপাড় শাড়ি, মাথায় ফুল গোঁজা।

ফুলমণি যদি আমাকে কিছু না বলে চলে এসে এখানে এসে নাচত, তাহলে আমি তাকে কোনও দিন ক্ষমা করতে পারতাম না। না, এ দু'টি মেয়ের এক জনও ফুলমণি নয়।

আমাদের দেখে নাচ থেমে গেল। ওরা মনে করল, আমরা পুলিশ। ওরা যদিও বে-আইনি কিছু করছে না, মদটা ওদের খাদ্যের মধ্যে পড়ে, আর নিজেরাই নাচ-গানে মেতে আছে। তবু বিনা কারণেও পুলিশের ঝামেলা করতে তো বাধা নেই!

ওদের সব বুঝিয়ে বলা হল। ছোটপাহাড়ি থেকে কেউ এসেছে? ফুলমণি নামে কোনও মেয়েকে চেনে?

এরা এসেছে বীরভূম থেকে। ছোটপাহাড়ি কোথায় তা এরা জানে না। এখানে ফুলমণি নামে কেউ নেই।

লালুদা অদম্য। গাড়িতে ফিরে এসে বলল, আমার মাথায় আর একটা আইডিয়া এসেছে। কী বলো তো?

লালুদার মাথার আইডিয়া আন্দাজ করার মতো প্রতিভা আমার নেই।

লালুদা বলল, কলকাতায় অনেক মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে। রাইট? সেখানে অনেক মিস্তিরি-মজুর কাজ করে, রাইট? মেয়েরা মাথায় করে ইঁট বয়ে নিয়ে যায়? সে-রকম কোনও বাড়িতে মজুরনিদের কাজ করতে দেখে ফুলমণির দেশের কথা মনে পড়ে গেছে। ফুলমণি অমনি তাদের কাছে ছুটে গেছে। কী যেতে পারে না! তুমি কী বলো, নীলধ্বজ?

নীলধ্বজ নামে কোনও ব্যক্তি নিশ্চয়ই এ বিষয়ে কিছু মতামত দিতে পারত, কিন্তু আমার মাথাটা একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে। কিছুই ভাবতে পারছি না।

লালুদা বলল, লেটস গো!

চৌরঙ্গির ওপরেই তৈরি হচ্ছে একটা এগারো তলা বাড়ি। গাড়ি চলে এল সেখানে। চার জন গার্ড মালপত্র পাহারা দিচ্ছে, কোনও মিস্তিরি-মজুর রাত্তিরে সেখানে থাকে না।

এরপর থিয়েটার রোড।

এখানে যে-বাড়িটা তৈরি হচ্ছে তার কন্ট্রাক্টর লালুদার চেনা।

দারোয়ানরা বসে বসে রুটি পাকাচ্ছে, লালুদা তাদের ঘরে উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করল, সুখেন্দুবাবু হ্যায়?

পাগল না হলে সুখেন্দুবাবু নামে কন্ট্রাক্টরের এত রাতে এখানে থাকার কথা নয়। কিন্তু ওই নামটা বলে দারোয়ানদের কাছে নিজের দর বাড়িয়ে নিল লালুদা। তারপর আসল কথাটা পাড়ল।

দারোয়ানদের মধ্যে এক জন বেশ রসিক। সে জানাল যে, ফুলমণি নামে কেউ নেই। আজ নতুন কোনও মেয়ে আসেনি। তবে, চারটি মুসলমান কামিন এখানে থাকে, তাদের কারুকে লাগবে?

নীপাবউদি বিরক্ত হয়ে বলল, দুর, এ-ভাবে খোঁজা যায় নাকি? এটা পাগলামি হচ্ছে।

লালুদা বলল, তবে তো থানায় যেতেই হয়, হাসপাতালগুলোতেও খোঁজ নিতে হবে।

যাওয়া হল ওয়াটগঞ্জ থানায়। ময়দান অঞ্চল ওই থানার এক্তিয়ারে।

এখানে নীপাবউদি গাড়িতেই বসে রইল। লালুদা ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে আমাকে বলল, কথাবার্তা যা বলার আমি বলব, বুঝলে নীলরতন। তুমি চুপ করে থাকবে। নইলে তোমাকে যদি ফস করে অ্যারেস্ট করে ফেলে। অবশ্য অ্যারেস্ট করলেও তোমাকে ছাড়াবার ক্ষমতা আমার আছে।

দারোগাবাবু পাতলা কাগজে তামাক ভরে সিগারেট বানাচ্ছেন।

লালুদা দরজার কাছ থেকেই সাড়ম্বরে বলল, নমস্কার। কী খবর, ভাল?

দারোগা প্রতিনমস্কার না দিয়ে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার?

টেবিলের ওপর হাত দিয়ে ঝুঁকে লালুদা বলল, একটি আদিবাসী মেয়ে, বুঝলেন, ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়েস হবে, সন্ধে থেকে হারিয়ে গেছে।

দারোগা ভুরু নাচিয়ে বলল, হারিয়ে গেছে, না পালিয়ে গেছে? কোথায় মাইফেল বসেছিল?

মাইফেল মানে? ও, না না, সে-সব কিছু না। ফুলমণিকে পাওয়া যাচ্ছে না।

ফুলমণি নামে আদিবাসী মেয়ে? কোনও আদিবাসী মেয়ে কক্ষনও হারায় না। সে-রকম কোনও রেকর্ড নেই আজ অবধি।

হ্যাঁ, হারিয়েছে। ফ্যাক্ট। ডায়েরি লিখুন।

মার্ডার-ফার্ডার করে আসেননি তো? রাত সাড়ে এগারোটায় হঠাৎ একটা আদিবাসী মেয়ে সম্পর্কে এত দরদ?

না না, সে ছবি আঁকে।

ছবি আঁকে! ও-ও-ও-ও। ছবি আঁকলে আর মার্ডার করা যায় না?

আপনি আমার কথা সিরিয়াসলি নিচ্ছেন না।

আপনার কথা কিছু বুঝতেই পারছি না মশাই।

জয়েন্ট পুলিশ কমিশনার আমার বন্ধু! আমার ফার্স্ট ফ্রেন্ড!

সে-কথা আগে বলেননি কেন? জয়েন্ট সি পি কিংবা সি পি কিংবা কোনও আই জি যদি আপনার বন্ধু হয় তাহলে আপনি মার্ডার-ফার্ডার যা খুশি কবতে পারেন। সে-সব বুঝবে লালবাজার। এখানে কেন?

আই ইনসিস্ট!

আপনি সরুন না মশাই। ওই ছেলেটিকে বসতে দিন।

দারোগা আমার দিকে ভুরুর ইঙ্গিত করে বলল, কী হয়েছে বলো তো ভাই! ঠিক দু'লাইনে বলবে, বেশি সময় নষ্ট করবে না।

আমি মুখস্থ কবিতার ভঙ্গিতে বললাম, ছোটপাহাড়ি থেকে একটি সাঁওতাল মেয়েকে নিয়ে আসা হয়েছিল, সে ভাল ছবি আঁকে। আজ তার ছবির প্রদর্শনী ছিল অ্যাকাডেমিতে। সন্ধের পর থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার পরনে...।

ব্যাস, ব্যাস, দু'লাইন হয়ে গেছে। মেয়েটার ছবি কোথায়?

ওর ছবি তো অ্যাকাডেমিতে টাঙানো হয়েছে।

ওই ছবির কথা বলছি না। ফটোগ্রাফ। মেয়েটির ফটোগ্রাফ।

তা তো তোলা হয়নি।

কেন হয়নি?

লালুদা বাধা দিয়ে বলল, সে কি আমাদের আত্মীয় যে তার ছবি তুলে রাখব?

দারোগা লালুদাকে ধমক দিয়ে বলল, আত্মীয় যদি না হয়, তাহলে সে হারিয়ে গেছে বলে আপনার এত মাথাব্যথা কেন?

তারপর দারোগা আমাকে বলল, চিন্তার কিছু নেই। বাড়ি যান। সে নিশ্চয়ই নিজের দেশে ফিরে গেছে। কলকাতা শহরের মতো একটা জঘন্য জায়গা তার ভাল লাগবে কেন? আমারই ভাল লাগে না। চান তো ডায়েরি লিখে নিচ্ছি। কোনও দরকার নেই যদিও।

থানা থেকে বেরিয়ে এসে লালুদা বলল, ও ব্যাটারা খুঁজবে না। পলিটিক্যাল লিডার ছাড়া আর কারুর কথা শোনেই না! লালবাজারে গিয়ে প্রেশার দিতে হবে!

বৃষ্টি থেমে গেলেও আকাশ এখন থমথমে, চমক দিচ্ছে বিদ্যুৎ। সিনেমার নাইট শো ভেঙেছে, তাই রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা বেড়ে গেল হঠাৎ। দো-তলা বাস ভর্তি মানুষ! সন্ধে থেকে কিছু খাইনি। খিদের কথা এতক্ষণ মনেও পড়েনি। এখন গরুর গাড়ির চাকার মতো ঘর্ঘর শব্দে জেগে উঠল খিদে।

লালুদা বলল, কলকাতা শহরে এত গাড়ি-ঘোড়া, ট্রাম-বাস, তার মধ্যে গ্রামের একটা অবলা মেয়ে...একটা বনের হরিণীকে এনে যদি কলকাতার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে কী অবস্থা হবে বল তো!

আমি থ। এত রাত্রে আচমকা কবিত্বশক্তি জেগে উঠলো লালুদার। ফুলমণি...বনের হরিণী!

॥ ৮॥

পরদিন সকাল এগারোটার মধ্যেও কোনও খবর পাওয়া গেল না। হাসপাতালগুলোতে খোঁজ নেওয়া হয়েছে, এমনকী এক পুলিশ বন্ধুকে ধরে মর্গেও ঘুরে এসেছে লালুদা। ফুলমণি যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সিরাজুল সাহেবের বাড়িতে যাওয়া হল।

অনিন্দ্য দাসের সঙ্গে আমার ঝগড়ার ঘটনাটা এর মধ্যেই তাঁর কানে এসেছে। দু'জন তরুণ শিল্পী বসে আছে তাঁর ঘরে। আমার কাছে সব বিবরণ শুনে তাঁর মুখে দুঃখের ছায়া পড়ল, কিন্তু কোনও মন্তব্য করলেন না।

একটু পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, নিজেকেই অপরাধী মনে হচ্ছে। কেন ওকে নিয়ে এলাম ওর গ্রাম থেকে। ওখানেই বেশ ছিল। শহরে কত খারাপ লোক আছে।

এক জন শিল্পী বলল, শুনেছি কিছু লোক কলকাতা থেকে মেয়ে ধরে ধরে বম্বেতে বিক্রি করে দিয়ে আসে। আরব দেশগুলোতে অনেক মেয়ে চালান হয়।

সিরাজুল সাহেব বললেন, ওর কাছে কি টাকা-পয়সা কিছু ছিল? এমন কি হতে পারে যে, আমাদের শিল্পীবন্ধুটির কথাবার্তায় ও অপমানিত বোধ করেছে তাই তক্ষুনি হাওড়ায় গিয়ে ট্রেনে চেপে তাতে ছোটপাহাড়িতে ফিরে গেছে?

ফুলমণিকে আমি একশো টাকা দিয়েছিলাম। কিন্তু ও কি নিজে নিজে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে?

সিরাজুল সাহেব বললেন, রাস্তার লোককে জিজ্ঞেস করে করে হাওড়া পৌঁছে যাওয়া খুবই সম্ভব। ফুলমণি কথা কম বলে বটে, কিন্তু বোকা তো সে নয়। বোকা মানুষেরা শিল্পী হতে পারে না।

এক জন শিল্পী বলল, যাই বলুন স্যার, আঙুল দিয়ে ছবি আঁকাটা ঠিক প্রপার আর্ট ফর্ম নয়। ওকে তুলি ধরতে শেখাতে হবে।

সিরাজুল সাহেব বললেন, ও-সব কথা এখন থাক। আগে মেয়েটির নিরাপত্তা...আচ্ছা, ছোটপাহাড়িতে টেলিফোন করে জানা যায় না?

আমি বললাম, ওখানে এখন টেলিফোন যায়নি। আমি ভাবছি, আজই আমি একবার চলে যাব।

সিরাজুল সাহেব বললেন, কাল আমার একটা খুব জরুরি মিটিং আছে বটে। তবু আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি। থাক কাজ। হ্যাঁ, চলুন আমি যাব।

এক জন শিল্পী বলল, সে কী স্যার? আজ বিকেলে আপনার...।

সিরাজুল সাহেব বললেন, তাতে কী হয়েছে! তোমরা ম্যানেজ করবে। আমি যাব, ক'টায় ট্রেন আছে নীলুবাবু?

তরুণ শিল্পীটি বলল, আজ সিরাজুল সাহেবের জন্মদিন। সন্ধেবেলা একটা অনুষ্ঠান আছে, অনেকে আসবে এ-বাড়িতে।

সিরাজুল সাহেব তবু কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বাধা দিয়ে আমি বললাম, আপনার যাওয়ার কী দরকার? আমি গিয়ে খবর নিয়ে আসছি। ফুলমণিকে ওখানে পাওয়া গেলে আপনাকে জানাব, আমি ফিরেই দেখা করব।

অন্য শিল্পীটি বলল, সব দোষ অনিন্দ্য দাসের। উনি যা খুশি কববেন। কিন্তু ওর মুখের ওপর কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না।

সিরাজুল সাহেব মিনতির সুরে বললেন, আমার বাড়িতে ও-সব কথা আলোচনা কোরো না, প্লিজ!

অর্থাৎ সিরাজুল সাহেব নিজে তো নিন্দে করবেনই না, অন্য কারুর মুখে নিন্দে শুনতেও চান না।

এত কাণ্ডের মধ্যেও আমার এই একটি পরম লাভ হল, সিরাজুল সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হল।

বড় মাপের মানুষ না হলে কি বড় শিল্পী হওয়া যায়? এই প্রশ্নটা অনেক দিন ধরে আমার মাথায় ঘুরছিল।

দরজা পর্যন্ত আমাকে পৌঁছে দিতে এসে সিরাজুল সাহেব মৃদু গলায় বললেন, আপনি একলা একলা যাবেন, যদি আপনার কিছু রাহাখরচ...।

আমি বললাম, আমি তো ওখানে চাকরি করি। আমাকে তো এমনিই যেতে হত। চন্দনদাকে খবরটা জানানো দরকার।

সিরাজুল সাহেব বললেন, তাড়াতাড়ি ঘুরে আসুন। ভাল খবর নিয়ে আসুন। উনি আমার হাত ধরলেন। আমি বললাম, দোয়া করবেন!

এখানকার খবরাখবরের ভার রইল লালুদার ওপর। লালুদা বলল, কোনও চিন্তা কোরো না। ফুলমণির খোঁজ পেলেই আমি তোমাকে কুরিয়ার সার্ভিসে জানিয়ে দেব। এমনকী নিজেও চলে যেতে পারি।

নীপাবউদি বলল, নীলু, তুমি তোমার চন্দনদাকে বিশেষ ব্যস্ত হতে বারণ করো। ফুলমণি যদি ছোটপাহাড়িতে না গিয়ে থাকে, এখানে তার সন্ধান পাওয়া যাবেই। মেয়েটা তো আর উধাও হয়ে যেতে পারে না।

লালুদা বলল, না না, চন্দনের এখন কলকাতায় আসার দরকার নেই। সে কত কাজে ব্যস্ত! আমরা এ-দিকটা ঠিক ম্যানেজ করে নেব। সন্ধেবেলা অ্যাকাডেমিতে আর্ট এক্জিবিশনেও আমি বসে থাকব।

যে-যার তালে আছে। চন্দনদা কলকাতায় না থাকলে লালুদার পক্ষে এ-বাড়িতে আড্ডা জমানোর বেশি সুবিধে হয়।

হাওড়ার বাসে চাপবার সময় আমার মনে হল, অনিন্দ্য দাসের বাড়ি দমদম। উনি বিয়ে-টিয়ে করেননি। একা থাকেন। ছোটপাহাড়ি যাবার আগে ওঁর নাকে একটা ঘুঁষি মেরে যাওয়া উচিত নয় কি! যত নষ্টের গোড়া!

কিন্তু দমদম একেবারে উলটো দিকে। সেখান থেকে ঘুরে হাওড়ায় যেতে হলে আর ছোটপাহাড়ির ট্রেন পাব না। সেই জন্যই অনিন্দ্য দাস আমার হাতের ঘুঁষি থেকে বেঁচে গেলেন। কিংবা আমি ওর লাঠির আঘাত থেকে বেঁচে গেলাম বোধহয়।

হাওড়া স্টেশনে শান্তনু চৌধুরীর সঙ্গে দেখা। উনি ললিতকলা অ্যাকাডেমির কোনও মিটিঙে যোগ দিতে মাদ্রাজ যাচ্ছেন। চন্দনদার পেছনে এক তল্পিবাহক হিসেবে উনি আমাকে একবার মাত্র দেখেছেন, আমাকে ওঁর চেনার কথা নয়। তবু উনি চিনতে পারলেন। ট্রেনটা এখনও আসেনি, আমরা অপেক্ষা করছি, উনি হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকলেন কাছে।

ছাই রঙের স্যুট ও টাই পরা, নিখুঁত পোশাক। মসৃণ মুখ। পাট করা চুল। উচ্চ-মধ্যবিত্তের পরিচয় ওঁর সর্ব অঙ্গে লেখা, কেউ আর্টিস্ট হিসেবে ভুল করবে না। অথচ ভাল ছবি আঁকেন।

শান্তনু চৌধুরী খানিকটা ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে বললেন, শুনুন, সে-দিন আপনার নামটা জিজ্ঞেস করা হয়নি। আপনি চন্দনের ভাই, তাই না?

কথা না বাড়িয়ে আমি মাথা নেড়ে দিলাম।

শান্তনু চৌধুরী বললেন, অনিন্দ্য নাকি এক কাণ্ড করেছে? আপনাকে আর ওই মেয়েটিকে নিয়ে...ঠিক কী হয়েছিল বলুন তো?

মানুষের চরিত্রে যতগুলো খারাপ দিক থাকে, তার মধ্যে সব চেয়ে নিকৃষ্ট হল অসাক্ষাতে কোনও বন্ধুর নিন্দে উপভোগ করা। শান্তনু চৌধুরীকে সবাই অনিন্দ্য দাসের খুব বন্ধু বলে জানে।

এ ব্যাপারটাতে আমি প্রশ্রয় দেব কেন? আমি উলটে বললাম, আপনি কী শুনেছেন?

শান্তনু চৌধুরী এক ঝলক হেসে বললেন, অনিন্দ্য নাকি ওই সাঁওতাল মেয়েটার কাপড় ধরে টেনেছে সবার সামনে?

এবার বোঝা গেল যে, শান্তনু চৌধুরী নিখুঁত ভদ্রতার প্রতিমূর্তি হলেও ওঁর ঝোঁক আদিরসের দিকে।

মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন।

শান্তনু চৌধুরী বললেন, আর একবার কী হয়েছিল জানেন? একটা পার্টিতে অনিন্দ্য এমন বেসামাল হয়ে গেল, ক্যালকাটা ক্লাবের মেম্বার মিস্টার নানপুরিয়ার বউকে, সে-মেয়েটি একবার মিস ইন্ডিয়া হয়েছিল, সবার সামনে অনিন্দ্য তাকে বলল, তোমার ওই ইয়ে দুটো, বুঝলেন না। ইয়ে, ওই দুটো কি ফল্‌স? লজ্জায় আমরা মুখ তুলতে পারি না। তারপর থেকে মিসেস নানপুরিয়ার দিকে তাকালেই আমরা ওঁর ইয়ে দুটোর দিকে, ফল্‌স না আসল।

ট্রেন ঢুকতেই একটা শোরগোল পড়ে গেল।

শান্তনু চৌধুরী এ. সি ফার্স্ট ক্লাসে যাবেন, তাঁকে আর দেখা গেল না।

আমার শরীর-মন কেমন যেন অসাড় হয়ে গেছে, ট্রেন চলতে শুরু করার পরেই আমি ঘুমে ঢুলতে লাগলাম।

এই দূরপাল্লার ট্রেনটা বালুঘাই স্টেশনে এক মিনিটের জন্য থামে। কেন অত ছোট স্টেশনে থামে তা কে জানে! আমার পক্ষে সুবিধেজনক।

একটাই মুশকিল, রেলস্টেশন থেকে ছোটপাহাড়ি যেতে বাস ছাড়া উপায় নেই। রাত আটটায় শেষ বাস ছেড়ে যায়। এই ট্রেনটা লেট করলেই চিত্তির!

ঠিক লেট হল দেড় ঘণ্টা।

আজকাল যেহেতু ছোটপাহাড়িতে নানা রকম কনস্ট্রাকশন চলছে, তাই মালপত্র নিয়ে অনেক ট্রাক যায়। ট্রাকগুলোর দিন-রাত্রি জ্ঞান নেই। চন্দনদা প্রথম দিনই আমাকে বলে দিয়েছিল, যদি কোনও দিন বালুঘাই স্টেশনে পৌঁছে বাস মিস্ করিস, তাহলে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে হাত দেখাবি, কোনও না কোনও ট্রাক তোকে পৌঁছে দেবে।

এত ছোট স্টেশনে দশ-পনেরো জনের বেশি যাত্রী ওঠানামা করে না।

অনেক আগেই আমার ঘুম ভেঙে গেছে, তবু ঘুম ঘুম চোখে ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে স্টেশনের বাইরে এসে আমি বড় রাস্তার দিকে এগোতে যাচ্ছি, এমন সময় কে যেন ডাকল, মি. নীললোহিত!

দৈববাণী নাকি? কিন্তু ঠাকুরদেবতারা কি আমাকে মিস্টার বলবে? কে জানে, আজকাল হয়তো ঠাকুরদেবতারা খুব হিন্দি ফিল্ম দেখে।

প্রায় যেন মাটি ফুঁড়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন মহিম সরকার। আমার হাত ধরে বললেন, আরে মশাই, আপনাকে ডাকছি, শুনতে পাচ্ছেন না? চলুন, আমার জিপ আছে। ওই যে ডান দিকে।

আমি বললাম, আপনি এখানে কেন?

আসলে আমার মাথা থেকে ঘুম কাটেনি। মহিম সরকারকে দেখে তো আমার খুশি হবারই কথা।

উনি ওঁর কোনও আত্মীয়কে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছেন। বেশ সহজে আমি লিফট পেয়ে গেলাম। তবু যেন আমার মনে হচ্ছে, হাইওয়েতে গিয়ে আমাকে হাত দেখিয়ে কোনও ট্রাক থামাতে হবে।

আমাকে টেনে তুলে মহিম সরকার ড্রাইভারের পাশের সিটে বসিয়ে দিলেন। জিপ চালাচ্ছেন উনি নিজে।

গাড়ি স্টার্ট দেবার পর মহিম সরকার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কী খবব বলুন। কলকাতায় সব ঠিকঠাক হল?

আমি বললাম, হ্যাঁ, খবর খুব ভাল, খুব ভাল। যে-জন্য গিয়েছিলাম, অত্যন্ত সাকসেসফুল। ছোটপাহাড়ির খবর কী?

ছোটপাহাড়ির খবর ঠিকই আছে। আপনার ওখানকার তেতলায় কনস্ট্রাকশন অনেকটা হয়ে গেছে। মি. নীললোহিত, ছাদ ঢালাইয়ের সময় কিন্তু আপনাকে উপস্থিত থাকতে হবে। জানেন তো, ঢালাই একবার থেমে গেলে কত ক্ষতি হয়?

থাকব। নিশ্চয়ই থাকব। ফুলমণি আবার কাজ করবে?

ফুলমণি?

আপনি এত চমকে যাচ্ছেন কেন? ফুলমণি, যে ভাল ছবি আঁকে। সে ফিরেছে নিশ্চয়ই?

তাকে তো আপনি সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন কলকাতায়।

হ্যাঁ, কিন্তু সে কি একলা ফিরতে পারে না?

তা তো আমি জানি না। কিন্তু নীললোহিত, আমি যত দূর জানি, সে ফেরেনি। সবাই জানে, আপনি তাকে কলকাতায় নিয়ে গেছেন। আপনিও আর ফিরবেন না, সে-ও ফিরবে না।

আরে মোলো যা! আমার ফেরার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? ফুলমণি আমার কে?

হঠাৎ যেন একটা ঝাঁকুনি খেয়ে আমি সজাগ হলাম। এ-সব আমি কী বলছি? লালুদা আর নীপাবউদি পই পই করে বলে দিয়েছিল, ফুলমণির হারিয়ে যাবার খবরটা যেন চন্দনদার আগে অন্য কারুকে জানানো না হয়। ঘুমের ঘোরে আমার গুলিয়ে গেছে সব কিছু।

মহিমবাবু আমার দিকে ত্যারছা চোখে তাকিয়ে আছেন।

কথা ঘোরাবার জন্য আমি বললাম, আমাকে মিস্টার মিস্টার বলেন কেন মহিমবাবু? আমি ক্লাস থ্রি স্টাফ, আপনার মতো তো অফিসার নই। আপনার থেকে আমি বয়সেও অনেক ছোট। আমাকে শুধু নাম ধরে ডাকবেন।

ও, এ-কথাটা প্রথম দিন বললেই পারতেন। আমি ভেবেছিলাম বড় সাহেবের ভাই।

সিগারেট খাবেন? এখানে বৃষ্টি হয়নি? কাল কলকাতায় কী তুমুল বৃষ্টি।

ফুলমণিকে কোথায় রেখে এলেন?

এ যে ভবী ভোলবার নয়। ঘুরেফিরে আবার সেই ফুলমণির কথা। কেন যে মহিমবাবুর জিপে উঠলাম!

ও তো কলকাতাতেই রয়ে গেছে। ওর একজিবিশান যত দিন চলবে...ওর ছবির খুব নাম হয়েছে, বুঝলেন।

তবে কেন জিজ্ঞেস কবলেন ফুলমণি ফিরেছে কি না?

ওটা এমনিই আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম।

হুঁ!

আমি বুঝব কী করে মহিমবাবু এর মধ্যে তাঁর শালা কিংবা ভাইপোর চাকরি মনে মনে পাকা করে ফেলেছেন। বাকি রাস্তা তিনি আমার সঙ্গে কোনও কথা বললেন না। আমি গল্প জমাবার চেষ্টা কবলেও হুঁ-হাঁ কবে সারলেন।

জঙ্গলটা পেবিযে ছোটপাহাড়িতে পৌঁছে বাজাবেব কাছটায় এসে মহিমবাবু বললেন, একটা মুশকিল হয়েছে, আমার জিপে ডিজেল খুব কম, আপনার গেস্ট হাউসে পৌঁছোতে গেলে...আমার গাড়ি সম্পূর্ণ উলটো দিকে...যদি ডিজেল একেবারে ফুরিয়ে যায়? আপনি এইটুকু হেঁটে যেতে পারবেন?

লোকটা মহা কিপ্যুস তো। দেড় ঘণ্টা জিপ চালিয়ে এল, আর দশ মিনিট চালালেই ডিজেল ফুরিয়ে যাবে? আসলে আমাকে অবজ্ঞা দেখাতে চায়।

তবু ওঁকে খাতির করে বললাম, না না, আমার বাড়ি বাঁ-দিকে, আপনি এখান থেকে ঘুরে চলে যান। আমি এইটুকু রাস্তা সচ্ছন্দে হেঁটে যেতে পারব। মালপত্র কিছু নেই, আপনি যে এতটা পৌঁছে দিলেন, তাতেই কত উপকার হল। ট্রাক ধরে এলে পয়সা লাগত!

গাড়ি থেকে নেমে বললাম, আচ্ছা। কাল দেখা হবে।

মহিমবাবু বললেন, নিশ্চয়ই!

ছোট্ট বাজার, অনেক আগেই আলো টালো নিবিয়ে সব ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেছে। বাজারের পেছনে একটা নতুন কুলি বস্তি, ক্ষীণ গান-বাজনার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে সেখানে।

আমার রাস্তা ডান দিকে, সম্পূর্ণ অন্ধকার।

এ-রকম অন্ধকার, এ-রকম নিস্তব্ধতা কলকাতায় দেখা যায় না। গাড়ি-টাড়ি তো দূরের কথা, একটাও মানুষ নেই পথে। দু'পাশে এখনও প্রচুর ফাঁকা মাঠ, দূরে দূরে বাড়ি, সে-সব বাড়ির লোকেরা ঘুমিয়ে পড়ে ন'টা-সাড়ে ন'টার মধ্যে। টিভি নেই তো, ভদ্রলোকেরা জেগে থাকবে কী করে?

গেস্ট হাউসে নয়, আগে যেতে হবে চন্দনদার বাড়িতে।

চন্দনদা কোনও কোনও দিন দেড়টা-দুটো পর্যন্ত জেগে পড়াশুনো করে, আবার কখনও ঘুমিয়ে পড়ে রাত দশটার মধ্যে। কোনও ঠিক নেই। আজ ঘুমিয়ে পড়লেও জাগাতেই হবে। ফুলমণির দায়িত্বটা আমি এবার চন্দনদার ওপর দিয়ে দিতে চাই, আমি আর পারছি না।

কাছেই পাহাড় ও জঙ্গল আছে বটে কিন্তু নির্জন রাস্তায় হঠাৎ হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ভয় নেই। তবে সাপ বেরোয় প্রায়ই। বিশেষত বৃষ্টির দিনে। সাপ তাড়াবার শ্রেষ্ঠ উপায় মাটিতে জোরে জোরে শব্দ করা। আমি চটি দিয়ে ধপাস ধপাস করে এগোতে লাগলাম।

নিজের পায়ের আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শুনতে পাওয়ার কথা নয়। হঠাৎ যেন আরও কয়েকটা পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল।

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, অন্ধকারের মধ্যেই চলন্ত অন্ধকার হয়ে গোটা কয়েক লোক ছুটে আসছে। ওরা কারা কে জানে, আমি সরে দাঁড়ালাম এক পাশে।

লোকগুলো কিন্তু আমারই কাছে এসে থেমে গেল এবং ঘিরে ফেলল। মিস্তিরি-কুলি শ্রেণির মানুষ, কয়েক জনের হাতে লাঠি।

একজন জিজ্ঞেস করল, এ বাবু, ফুলমণি কোথায়?

লোকগুলোকে ঠিক চিনতে পারছি না। ও-রকম রুক্ষ স্বরের প্রশ্ন আমার পছন্দ হল না। ফুলমণি, সে-কৈফিয়ৎ যদি দিতে হয় তার শ্বশুরকে দেব, এরা কারা!

জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কে?

সেই লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, ফুলমণি কোথায়?

সে কলকাতায় আছে।

তাকে আনলি না কেন?

তার কাজ এখনও শেষ হয়নি।

তুই নিয়ে গেছিস, তুই আনবি না?

সে এখন...।

আমার কথাটা শেষ করতে দিল না, এক জন আমার মাথার চুল ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। আর এক জন পিঠে মারল লাঠির বাড়ি।

আমি লাফিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করে বললাম, আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, আমার কোনও দোষ নেই, ফুলমণি।

ওরা আমাকে কোনও কথা বলতে দিতে চায় না। সবাই চালাল কিল-চড়-ঘুঁষি। এবার পালানো ছাড়া উপায় নেই। দৌড় মারবার চেষ্টা করতেই এক জন আমার পায়ে খুব জোরে একটা লাঠির ঘা কষাল। আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম, পাথুরে রাস্তায় কপালটা ঠুকে গেল, ছেঁচে গেল নাক।

এবার এক জন আমার মাথা ঘেঁষে কাঁধে যে-জিনিসটা দিয়ে মারল, সেটা লাঠি না লোহার রড? যাই-ই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না, মোট কথা আমার মাথা ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে বুঝতে পারছি। আরও মারছে আর কত মারবে!

সেই অবস্থায় আমার মনে পড়ল, ভাগ্যিস সিরাজুল তারিক সাহেব আমার সঙ্গে আসেননি। যদি তাঁকেও এরা...।

আমি গড়াবার চেষ্টা করেও পারছিলাম না। আর কিছু চিন্তাও করতে পারছি না কেন? চোখের মধ্যে যেন অনবরত বিদ্যুতের ঝিলিক দিচ্ছে। আমি কি অজ্ঞান হচ্ছি, না মরে যাচ্ছি? মৃত্যুর সময় বুঝি চোখে এ-রকম ঝিলিক খেলে? এরা আমাকে শেষ পর্যন্ত মেরে ফেলল? ছি ছি ছি ছি।

একেবারে শেষ মুহূর্তে আমি টের পেলাম বৃষ্টি নেমেছে।

আমার শেষ চিন্তাটা এই যে, ছোটপাহাড়িতে আমার চাকরির এই শেষ। এক মাসের মাইনেটাও পেলাম না? এরা আমাকে পুরো একটা মাসও চাকরি করতে দিল না। আজ মাসের উনতিরিশ তারিখ। মায়ের হাতে তুলে দিতে পারলাম না একটা টাকাও। আমি একটা অপদার্থ।

॥ ৯ ॥

চিরকাল এক জনের দোষে অন্য এক জন মার খায়।

হিরোসিমা-নাগাসাকিতে যে হাজার হাজার মানুষ অ্যাটম বোমার ঘা খেয়ে মরেছিল, তারা কি যুদ্ধ বাধাবার জন্য দায়ী ছিল? দাঙ্গার সময় মরে শুধু নিরীহ লোকেরা, যারা অস্ত্র ধরতেই জানে না। দুই গুণ্ডার দলের বোমা মারামারির সময় শিয়ালদার কাছে প্রাণ দিয়েছিল শুধু একটি স্কুলের মেয়ে।

আড়াই বছর আগে ছোটপাহাড়ি থেকে এক জন কন্ট্রাকটর নাকি একটি বেশ ডবকা আদিবাসী মেয়েকে ফুসলে নিয়ে গিয়েছিল। তা আমি জানব কী করে? সেই কারণে ছোটপাহাড়ির লোকেরা সন্দেহপ্রবণ হয়ে আছে। আমি কি ফুলমণিকে ফুসলে নিয়ে গেছি নাকি? আহা একে ফুসলানি বলে, আমি তার হাতও ধরিনি একবার, সব মিলিয়ে তার সঙ্গে আড়াইখানা বাক্য বিনিময় হয়েছে কি না সন্দেহ।

আড়াই বছর আগেকার সেই ঠিকাদার পালিয়ে গিয়ে দিব্যি মজা মারল, তাকে কেউ ধরতে ছুঁতে পারল না, তার বদলে মার খেয়ে মরলাম আমি!

না, ঠিক মরিনি অবশ্য। বেকারের জান খুব কড়া হয়। বেকাররা যদি পটাপট মরে যেত, তা হলে তো এ-দেশের অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যেত। বেকাররা মরে না, তারা রক্তবীজের মতো বাড়ে।

মাথা ও ঘাড়ের ঘা শুকিয়ে গেছে, ঝামেলা বাঁধিয়েছে বাঁ পাটা। ঢাউস একটা প্লাস্টারের পোশাক পরিয়ে আমায় বিছানায় শুইয়ে রেখেছে এক মাস। হাঁটুর মালাইচাকি আর গোড়ালি নাকি টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

মাকে বলা হয়েছে যে, আমি পাহাড়ে ট্রেকিং করতে গিয়ে এক খাদে পড়ে গিয়েছিলাম। দুর্ঘটনার চেয়ে মানুষের হাতে মার খাওয়া মায়েদের চোখে বেশি ভয়াবহ। কারণ যারা মেরেছে তারা আবার মারার চেষ্টা করতে পারে। আমি অবশ্য হালফিল আর ছোটপাহাড়িতে যাচ্ছি না।

নীপাবউদিরা প্রায়ই আমাকে দেখতে আসে। চন্দনদা দু'বার ঘুরে গেছে। প্রায় প্রতি দিন আসে লালুদা। লালুদা এলেই আমি মুখের ওপর চাদর টেনে, ঘাপটি মেরে ঘুমের ভান করে থাকি। লালুদার বাক্যস্রোত কি রোজ সহ্য করা যায়? অথচ একটা মানুষকে বাড়িতে আসতে বারণ করা যায়?

লালুদা আসে দুপুরের দিকে। নিজস্ব ব্যবসা, যখন তখন ছুটি। আমার সন্দেহ হচ্ছে লালুদা এই সুযোগে আমার বউদির সঙ্গে প্রেম করার চেষ্টা করবে। বউদি সকালের স্কুলে পড়াতে যায়, সারা দুপুর বাড়িতে থাকে। বিবাহিতা বউদের সঙ্গে প্রেম করা লালুদার দ্বিতীয় পেশা।

আমার বউদি দুটো মিষ্টি কথায় গলে যাবার মতো মেয়ে নয়। লালুদার কাঠালি কলা মার্কা ঠোঁট কোনও মেয়ের পছন্দ হবেই-বা কেন? কিন্তু লালুদার একটি মোক্ষম অস্ত্র আছে। পরোপকার। আমাদের বাথরুমের সিস্টার্ন থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়া আজ পর্যন্ত কেউ বন্ধ করতে পারেনি, তলায় গামলা পেতে রাখতে হয়, লালুদা কোথা থেকে এক জাদুকর মিস্ত্রি নিয়ে এসে সেটা সারিয়ে দিল। ঠিকে ঝি দেশে গিয়ে আর ফেরেনি, লালুদা এনে দিয়েছে এক আদর্শ কাজের মেয়ে, যে মাইনে কম নেয়, ফাঁকি মারে না। মা ও বউদির কাছে লালুদার ভাবমূর্তি বেশ উজ্জ্বল।

আমাকে প্রায়ই সান্ত্বনা দিয়ে লালুদা বলে, তোমার কোনও চিন্তা নেই নীলকণ্ঠ, তুমি সেরে উঠলেই তোমাকে আমি অন্য চাকরি জোগাড় করে দেব। ও-রকম ধাদ্ধাড়া গোবিন্দপুরেও যেতে হবে না।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলি। আবার চাকরি! আমার কপালে চাকরি সয় না।

মুমু এক দিন এসে বলল,"অ্যাই ব্লু, তুমি সব সময় শুয়ে থাকো কেন? লেজি বোন্‌স! শুধু শুয়ে থাকলে তুমি আরও লেজি হয়ে যাবে, আর কোনওদিন হাঁটতে পারবে না।

মুমু এলেই ঘরের মধ্যে টাটকা বাতাস খেলে যায়। জবা ফুলের মতো একটা লাল টকটকে ফ্রক পরে এসেছে মুমু। হাতে একটা চকোলেট বার। বাচ্চা ছেলেকে লোভ দেখাবার মতো করে বলল, তুমি যদি আজ হাঁটতে পারো, তোমাকে এই চকোলেট খাওয়াব।

আমার হাত ধরে টেনে বিছানা থেকে নামাল মুমু। তারপর সুর করে বলল, হাঁটি হাঁটি পা পা, খোকাবাবু আসছে সরে যা!

মুমুর কাঁধে ভর দিয়ে এক দিকের দেয়াল পর্যন্ত গেলাম। হাঁটুতে ব্যথা লাগছে বেশ, কিন্তু অসহ্য নয়।

মুমু বলল, রোজ একটু হাঁটতে হয়, না হলে জয়েন্টগুলো খারাপ হয়ে যায়।

তুই কোথা থেকে জানলি রে মুমু?

আমার একবার পা ভেঙেছিল না? প্রত্যেকেরই একবার করে পা ভাঙে।

তা ঠিক বলেছিস। যাদের একবারও পা ভাঙে না, তারা পায়ের মর্ম বোঝে না।

বুন্নু, সেবারে তুমি আমাকে দিকশূন্যপুরে নিয়ে যাবে বলে আমাকে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে রেখে এলে। আমার আর দিকশূন্যপুর দেখা হল না। একবার নিয়ে যাবে না?

তোর বয়সী মেয়েদের সেখানে যেতে নেই।

তাহলে তখন বলেছিলে কেন?

তখন তোকে ভোলাবার জন্য...তোর তখন খুব মন খারাপ ছিল।

কেন আমার বয়সীদের দিকশূন্যপুরে যেতে নেই?

ওখানে যারা যায়, তারা সব কিছু ছেড়ে ছুঁড়ে যায়, আর ফেরার কথা চিন্তা করে না। তোর এখনও পড়াশুনা বাকি, আরও অনেক কিছু বাকি।

তুমি যাও কেন? তুমি তো ফিরে আসো!

ওখানে বন্দনাদি বলে এক জন আমাকে খুব ভালবাসে। তাকে দেখতে যাই। ওখানে কেউ শুধু শুধু বেড়াতে গেলে অন্যরা পছন্দ করে না। শুধু আমার পারমিশান আছে। আমি দু'এক জনকে দিকশূন্যপুরে পৌঁছে দিয়েছি।

ওখানে কী আছে বলো না!

খুব সুন্দর জায়গা, যার যেমন ইচ্ছে সেইভাবে থাকতে পারে। প্রত্যেকেই নিজের জিনিসটা তৈরি করে নেয়, কোনও কিছুরই অভাব নেই। যার যেটা বেশি আছে, সে সেটা অন্যকে দেয়, এই রকম ভাবে বদলাবদলি হয়।

কারা ওখানে গিয়ে থাকে?

যারা খুব দুঃখী, যাদের কেউ ঠকিয়েছে, খুব আঘাত দিয়েছে, তারা যায়, ওখানে গিয়ে সব দুঃখ ভুলে যায়।

কোথায় জায়গাটা? কত দূরে?

সে এক নিরুদ্দেশের দেশ। ঠিকানা বলতে নেই!

মুমু অনেক দিন পর আমাকে দিকশূন্যপুরের কথা মনে পড়িয়ে দিল।

দিকশূন্যপুর আমাকে টানে। বন্দনাদি, রোহিলা, জয়দীপ, বসন্ত'রাও এদের দেখিনি কত দিন।

যে-দিন আমার পায়ের প্লাস্টার কাটা হল, সে-দিন বিকেলে এল চন্দনদা। মুখখানা গম্ভীর। একটা না-জ্বালা চুরুট মুখে দিয়ে বসে রইল চুপ করে।

আমি এক সময় বললাম, আর দু'দিন পরেই পুরোপুরি ফিট হয়ে যাব। মধ্যপ্রদেশে আমার এক বন্ধু চাকরি পেয়েছে, আমাকে নেমন্তন্ন করেছে, ওর ওখান থেকে ঘুরে আসব ভাবছি। বস্তারের জঙ্গল।

চন্দনদা বলল, হুঁ, বস্তারের জঙ্গল। তুই জঙ্গল খুব ভালবাসিস, তাই না নীলু! সুন্দরবনে গেছিস?

অনেক বার।

আমাকে একবার নিয়ে যাবি? আমি সুন্দরবন দেখিনি। আচ্ছা, না থাক।

থাক কেন? সুন্দরবন তো যে-কোনও দিন যাওয়া যায়। তোমার ছুটি থাকলে এই উইকএন্ডেই চলো।

নাঃ, এখন সুন্দরবন যাব না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে একবার জানলার ধারে গিয়ে বাইরে উঁকি দিল চন্দনদা। আমার টেবিলের ওপর বইগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল। তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, ফুলমণির খবর পাওয়া গেছে, শুনেছিস তো?

না তো! কোথায়?

লালু তোকে বলেনি?

লালুদা ঠিক দরকারের কথা ছাড়া অন্য সব কথা বলে। কোথায় আছে ফুলমণি! ছোটপাহাড়িতে ফিরে গেছে?

সেখানে ফেরেনি; ফুলমণি থাকে অনিন্দ্য দাসের সঙ্গে।

আমি দারুণ চমকে গেলাম এবার। অনিন্দ্য দাস? সেই দুর্মুখ শিল্পী? যিনি সেই রাতে ফুলমণিকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন?

চন্দনদা বলল, নাঃ, জোর-টোরের ব্যাপার নেই। প্রেমের ব্যাপার। যাতে যার মজে মন, কিবা হাঁড়ি কিবা ডোম!

অনিন্দ্যবাবু কখন ফুলমণির প্রেমে পড়লেন?

অনিন্দ্য তো প্রেমে পড়েনি, সে প্রেম-ট্রেমে বিশ্বাসই করে না। এ-ক্ষেত্রে অনিন্দ্যই হচ্ছে ডোম, তার প্রেমে পড়েছে ফুলমণি।

কী উলটো-পালটা বলছ চন্দনদা? ফুলমণি কারুর প্রেমে পড়তে পারে নাকি? মানে...অনিন্দ্যবাবুকে সে কতটুকু দেখেছে?

শোন, তুই কানু রায়কে চিনিস? কানু রায় ছবি আঁকে না। কিন্তু সে সব ছোট-বড় শিল্পীদের চেনে, আর্ট ওয়ার্লডে ঘোরাফেরা করে। সেই কানু রায় গিয়েছিল অনিন্দ্যর বাড়িতে। সে দেখে এসেছে, ওরা দু'জনে বেশ মজায় আছে, দু'জনেই ছবি আঁকছে। ফুলমণি নাকি তাকে বলেছে যে, অ্যাকাডেমির প্রদর্শনীতে সে যত শিল্পীকে দেখেছে, তাদের কারুকেই তার সত্যিকারে পুরুষ বলে মনে হয়নি। অনিন্দ্য তাকে বকাবকি করলেও তাকে দেখা মাত্র ফুলমণি মুগ্ধ হয়েছে। তার চোখে অনিন্দ্যই সত্যিকারে পুরুষ এবং শিল্পী। তাই অনিন্দ্য একটা ইঙ্গিত করা মাত্র ফুলমণি তার সঙ্গে চলে গেছে।

ফুলমণি এত কথা বলতে পারে?

এখন হয়তো তার মুখে কথা ফুটেছে!

অনিন্দ্যবাবু তো দমদমে থাকেন, তাই না?

দমদমে এ-রকম ভাবে একটা মেয়েকে নিয়ে থাকা চলত না। সুন্দরবনে অনিন্দ্যদের একটা লাট আছে। চাষবাস হয়, মাছের চাষ হয়, একটা বাড়িও তৈরি করেছে। সেখানে অনিন্দ্য প্রায়ই ছবি আঁকতে বা মূর্তি গড়তে যায়। ও এমনিতেই কারুকে গ্রাহ্য করে না, আর সেখানে তো সমাজ বলতে কিছু নেই।

ফুলমণি কারুকে কিছু না বলে অনিন্দ্য দাসের সঙ্গে চলে যাবে, এটা যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না চন্দনদা। যাই হোক, যদি সত্যি হয়, ফুলমণি তা হলে ভালই আছে। ওর জন্য ছোটপাহাড়িতে তোমাদের আর কোনও গোলমাল হয়নি তো?

নাঃ! তোকে মারধোর করার পর ওরা খানিকটা স্কেয়ার্ড হয়ে গেছে। আমরাও পুলিস প্রোটেকশান নিয়েছিলাম। আমি এখানে আসবার দু'দিন আগে শুনলাম, ফুলমণি তার শ্বশুরের নামে দুশো টাকা পাঠিয়েছে মানিঅর্ডার করে। তাতে লোকে বুঝে গেল যে, সে স্বেচ্ছায় অন্য কোনও জায়গায় রয়েছে। এরপর আর আপত্তির কিছু থাকতে পারে না। বুড়োটা বেশ মজাতেই আছে! এর মধ্যে আবার তাব কোন এক ভাইপো বউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে চলে এসেছে ওই বাড়িতে। তারা বুড়োকে খুব আদরযত্ন করে খাওয়াচ্ছে। তার মানে, বুড়ো চোখ বুজলেই বাড়িটা হাতিয়ে নেবে।

ফুলমণিকে নিয়ে তাহলে আর আমাদেব মাথা ঘামাতে হবে না? যাক বাঁচা গেল!

তুই অবশ্য ইচ্ছে করলে একবার দেখে আসতে পারিস নীলু, কানু রায়ের কথা কতটা সত্যি। আমি অবশ্য তোকে যেতে বলছি না। তোর কোনও দায়িত্ব নেই, তুই যথেষ্ট ভুগেছিস।

যেতে হলে আমরা দু'জনেই তো এক সঙ্গে .।

আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব না বে।

কেন?

নীপা দারুণ রেগে আছে। ফুলমণি অনিন্দ্যর কাছে আছে শুনেই বলল, তোমার বন্ধু একটা দুশ্চরিত্র। তোমরা পুরুষরা সবাই এ-রকম। ফুলমণির ছবি নিয়ে মাতামাতি করে তোমরা আসলে নিজেদের আর্ট-বোদ্ধা হিসেবে প্রমাণ করতে চাইছিলে, ওর জীবনটাব কোনও মূল্য দাওনি। ওর শেকড় ছিঁড়ে ওকে ছোটপাহাড়ি থেকে উপড়ে আনার কী দরকার ছিল? এখন যদি আমি যাই?

অনিন্দ্য দাস বুঝি আগেও এ-রকম করেছে?

ওকে ছোটবেলা থেকে চিনি তো। মেয়েদের মন ভোলাতে একেবারে ওস্তাদ। ওর টেকনিকটা কি জানিস, ও মেয়েদের সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে না, প্রেম জানায় না, প্রথমেই রুক্ষভাবে কথা বলে, এমনকী দুমদাম গালাগালি দেয়। আশ্চর্য! তাতেই অনেক মেয়ে মুগ্ধ হয়ে যায়। চেহারাটা তো রাফ, মেয়েরা মনে করে ও একেবারে রিয়েল মাচো, হি-ম্যান। কযেক বছর আগে হাইকোর্টের এক জজের মেয়ে, দারুণ সুন্দরী, ওর জন্য একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিল।

সে-মেয়েটি এখন কোথায়?

কে জানে!

তুমি না গেলে, আমিও যাব না চন্দনদা।

যাস না। আমি মোটেই যেতে বলছি না। অনিন্দ্যদের গ্রামটার নাম বোয়ালভাসি, ক্যানিং থেকে লঞ্চে যেতে হয় গোসাবা, সেখান থেকে মাইল চারেক দূরে গ্রাম। ও, তোকে আর এ-সব কথা বলছি কেন, তুই তো সুন্দরবনের সবই চিনিস।

চন্দনদা চলে যাবার পর বোয়ালভাসি নামটা আমার মাথায় ঘুরতে লাগল অনবরত। এক-একটা নাম, এক-একটা শব্দ হঠাৎ মনে গেঁথে যায় কেন যেন!

গোসাবার কাছে রাঙাবেলিয়া, সাতজেলিয়া, সজনেখালি এই সব গ্রাম আমি চিনি, গেছিও কয়েক বার। কিন্তু বোয়ালভাসির নাম আমি আগে শুনিনি। এক কালে এই সব অঞ্চল ছিল হ্যামিলটন সাহেবের জমিদারি, সাহেব চলে যাবার পর কিছু কিছু সমৃদ্ধ বাঙালি সেখানে ফার্মিং শুরু করেছিল।

রাস্তায় বেরুতে শুরু করার দু'তিন দিন বাদেই বুঝতে পারলাম, বোয়ালভাসি গ্রামটা আমাকে চুম্বকের মতো টানছে।

একটা অদম্য কৌতূহল, অনিন্দ্য দাসের মতো মানুষের সঙ্গে ফুলমণির কী করে জোড় মিলল, সেটা শুধু দেখে আসা।

তাহলে মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে যাবার আগে একবার সুন্দরবনটাই ঘুরে আসা যাক।

গোসাবা পৌঁছে একটা সাইকেল ভ্যান ধরলাম। নিজের দুটো পা ছাড়া এটাই এখানকার প্রধান যানবাহন। ভ্যান চালককে বললাম, বোয়ালভাসি যাব গো, দাসবাবুদের খামারে।

ভ্যানচালক বলল, সেখানে তো দুটো দাসবাবুর খামার। কোনটায় যাবেন?

বললাম, এক জন দাসবাবু, খুব লম্বা, ছবি টবি আঁকেন, তাকে চেনো?

সে বলল, অ। যে-বাবু মেয়েছেলে দাঁড় করিয়ে তার মূর্তি বানায়, সে তো? হ্যাঁ চিনি।

বোঝা গেল, অনিন্দ্য দাস সেখানেও বেশ খ্যাতি অর্জন করেছে।

ভ্যানচালক মাইল চারেক ইঁটের রাস্তায় চালিয়ে নিয়ে এসে একটা নদীর ধারে থেমে বলল, এবার খেয়া নৌকায় পার হয়ে যান। ওই যে দেখা যাচ্ছে ও-পারে দাসবাবুদের খামার।

খেয়ার নৌকোয় ওঠার পর আমার ভয় ভয় করতে লাগল।

অনিন্দ্য দাসের সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছিল। উনি এখন কী-রকম মেজাজে আছেন কে জানে। উনি যদি মনে করেন আমি অপমানের শোধ নিতে এসেছি! এখন আর ফিরে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। এখন বেলা তিনটে, আশা করি এখনই উনি মৌজ করে বসেননি!

খেয়াঘাট থেকে একটা সরু পথ গেছে দাসদের খামারের দিকে। খানিকটা ইঁটের দেওয়াল, খানিকটা কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘেরা। গেটটা খোলাই রয়েছে। তারপর মস্ত বড় একটা উঠোন, এক পাশে দুটো ধানের গোলা, অন্য পাশে একটা মস্ত বড় বাড়ি। প্রশস্ত বারান্দা, ওপরে টিনের চাল। উঠোনে হাঁস-মুরগী ঘুরে বেড়াচ্ছে, পাঁচটা ছাগলছানা লাফাচ্ছে এক ছাগ-মাতার পেছন পেছন, আর এই সব কিছুর মাঝখানে, গনগনে রোদে দাঁড়িয়ে একটা পাথরের চাঁইতে ছেনি চালাচ্ছেন অনিন্দ্য দাস। পরনে শুধু জিনসের ট্রাউজার্স, খালি গা, মাথায় টোকা।

আমার প্রথমেই আশ্চর্য লাগল পাথরটা দেখে।

সুন্দরবন জল-কাদার দেশ, এখানে এক টুকরো পাথর নেই, পাহাড় বহু দূরে। এখানে এত বড় পাথর এল কী করে?

আমার ধারণা ছিল, আজকালকার ভাস্কররা প্রথমে প্লাস্টার অফ প্যারিসের মূর্তি বানিয়ে তারপর ব্রোঞ্জ কাস্টিং করেন। এখনও পাথর কুঁদে কুঁদে মূর্তি বানানো হয়! অনিন্দ্য দাসের মতো দীর্ঘকায় বলশালী পুরুষ না হলে সম্ভবও না।

কোথা থেকে একটা কুকুর হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করে উঠতেই অনিন্দ্য দাস আমার দিকে ফিরে তাকালেন। চোখ কুঁচকে দেখলেন কয়েক মুহূর্ত।

তারপর বললেন, তুমি কে! তোমাকে আগে যেন কোথায় দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে।

আমি হাত তুলে বললাম, নমস্কার। হ্যাঁ, আপনি আমাকে আগে দেখেছেন। আমি চন্দন ঘোষালের ছোট ভাইয়ের মতো। আমি এ-দিকে সাতজেলিয়ায় এসেছিলাম এক জনের কাছে, শুনলাম আপনি এখানেই স্টুডিয়ো বানিয়েছেন, তাই আপনার কাজ দেখতে এসে পড়লাম। আপনাকে ডিস্টার্ব করলাম বোধহয়।

অনিন্দ্য দাস এক গাল হাসলেন। মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, না, তুমি সাতজেলিয়ায় আসোনি। তুমি শালা এখানে স্পায়িং করতে এসেছ। দেখতে এসেছ, ফুলমণিকে আমি খেয়ে ফেলিচি না আস্ত রেখিচি!

তারপর চেঁচিয়ে দু'জনকে ডাকলেন। প্রথমে বললেন, ফুলমণি, এ-দিকে এসো গো! দেখো, তোমার বাপের বাড়ির লোক এসছে!

আবার বললেন, নিরাপদ, একটা টুল নিয়ে আয়। কুটুমকে বসতে দে।

আগে এল এক জন বাঁটকুল ধরনের লোক। আমার কাছে একটা টুল পেতে দিল।

অনিন্দ্য দাস খাতির করে বললেন, বসো, বসো ছোকরা। তোমাদের ছবিউলি মেয়েটাকে আমি টেনে হিচড়েও আনিনি, এখেনে জোর করে ধরেও রাখিনি। সে এলেই জিজ্ঞেস করো, নিজের ইচ্ছেতে এসেছে কি না।

অনিন্দ্য দাসের কথা শুনব কী, আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে নেমে এল ফুলমণি। এ কোন ফুলমণি? তাকে যে চেনাই যায় না! সে একটা বাটিক প্রিন্টের শাড়ি পরে আছে, মাথার চুল খোলা, এই দেড় মাসেই তার স্বাস্থ্য ফিরেছে অনেক। শীর্ণ ভাবটা মোটেই নেই, মসৃণতা এসেছে চামড়ায়, চোখের দৃষ্টিতে গভীরতা। সে এখন তাকিয়ে থাকার মতো সুন্দর। আগে বোঝা যায়নি, তার মুখখানা বেশ ধারালো।

কী করে ফুলমণির এতটা পরিবর্তন হল? এক জন পুরুষের সঙ্গে উদ্দাম ভালবাসা, না পেট ভরে দু'বেলা খাওয়া, নাকি মনের ফুর্তি?

ফুলমণি আমাকে দেখে অবাক হয়েছে ঠিকই। কাছে এসে বলল, নমস্কার ছোটবাবু।

কানু রায় তো মিথ্যে বলেনি। ফুলমণির মুখে কথা ফুটেছে। আগে সে নিজের থেকে কোনও কথাই বলত না।

কিন্তু হঠাৎ একরাশ অভিমান ঢুকে গেল আমার গলার মধ্যে। ফুলমণির সঙ্গে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করল না। অ্যাকাডেমি থেকে অনিন্দ্য দাসের সঙ্গে চলে আসার আগে ও একবার আমাকে বলে আসাবও প্রয়োজন মনে করেনি? আমি ওব ছোটবাবু নই, কেউ নই।

অনিন্দ্য দাস বললেন, হাঁড়িয়া আনিসনি? নিয়ে আয়। তোর নিজের লোককে খাওয়া!

নিরাপদ নামে বাঁটকুল লোকটিই নিয়ে এল কাচের জগ ভর্তি হাঁড়িয়া আর কয়েকটা গেলাস।

অনিন্দ্য দাস এক চুমুকে এক গেলাস সাবাড় করে বলল, ফুলমণি ফার্স্টক্লাস হাঁড়িয়া বানায়। খেয়ে দেখো! সে-দিন, বুঝলে, অ্যাকাডেমিতে তুমি আমার সঙ্গে ঝঞ্ঝাট করছিলে, আমার বেশ রাগই হয়েছিল, ভাগ্যিস তোমাকে মেরে বসিনি! তোমার দোষ নেই, তুমি তো আমাকে চেনো না। আমি গেটের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, দেখি যে এই মেয়েটাও এসেছে। আমি ওকে বললাম, অ্যাই ছুঁড়ি, তুই এই সব বাবুদের মধ্যে কী কচ্ছিস? যদি সত্যি ছবি আঁকতে চাস, ছবি আঁকা শিখতে চাস, তো আয় আমার সঙ্গে। অমনি সুড়সুড় করে চলে এল।

আমি গেলাস হাতে নিয়ে চুপ করে তাকিয়ে রইলাম।

অনিন্দ্য দাস আবার বলল, ওকে এনে ভাল করিচি কি না বলো! চেহারার কেমন চেকনাই হয়েছে দেখেছ? বুলু দেখেছ, বুলু!

অনিন্দ্য দাস ফুলমণির নিম্ন শরীরে চাপড় মারলেন দু'বার।

আমার দিকে তাকিয়ে আধখানা ঠোঁটে হেসে বললেন, বুলু মানে জানো? ওদের ভাষায় উরুকে বলে বুলু! আরও অনেকগুলো সাঁওতালি কথা শিখেছি। এরা পাগলকে বলে কক্কা। এ বেটি প্রায়ই

আমাকে বলে কঙ্কা, কঙ্কা, প্রথমে বুঝতুম না। পাহাড়কে বলে বুরু। ঠোঁট হচ্ছে লুটি আর বুক হচ্ছে কোড়াম্। আঙুল হচ্ছে কাটুকা। বেশ, না? এই সব শব্দ বাংলা ভাষাতেও নিয়ে নেওয়া উচিত আর পড়হাও-কুঁড়ি মানে কী বলো তো? ছাত্রী! এই মেয়েটা আমার পড়হাও-কুঁড়ি! অবশ্য আমি ওকে ছবি আঁকতে দিই না এখনও।

এবার আমি একটু চমকে উঠলাম।

অনিন্দ্য দাস বললেন, কেন আঁকতে দিই না জানো? আরে বাবা, ছবিই বলো, আর যে-কোনও শিল্পই বলো, আগে ফর্মটা ভাল করে শিখে নিয়ে তারপর ফর্ম ভাঙতে হয়। না ভাঙলে নতুন কিছু গড়া যায় না। শিল্পের ফর্ম ভাঙতে গেলে জীবনটাকেও কিছু ভাঙচুর করতে হয়। চাকরি-বাকরি, রোজগার, রোজ রাত্তিরে ক'খানা হাতে গড়া রুটি আর তরকারি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়া, বছরের পর বছর এ-রকম জীবন কাটিয়ে শিল্প হয় না। ওকে ওর আগেকার জীবনের বাপের নাম ভুলিয়ে দিচ্ছি। সব উলটো-পালটা হয়ে যাক! আর একটা কথা। অশিক্ষিত পটুত্বের আমি ইয়ে মারি। ও-সব দিন চলে গেছে। শিখতে হয়, সব গোড়া থেকে শিখতে হয়। ভেতরে মালমশলা আছে বলে দু'চারখানা ছবি এঁকে ফেলল, কিন্তু তা দিয়ে শিল্প হয় না। দু'দিনে একঘেয়ে হয়ে যায়। ফোক আর্ট সব একই রকম। মহৎ শিল্পীর হাতে হাজার রকম খেলা। জীবনটাকে শিল্প করে না নিলে তা হয় না। ফুলমণিকে আমি বলেছি, এখন এক বছর শুধু সোজা সোজা দাগ টেনে যা। চোখ বুজে মানুষের মুখটা দেখতে শেখ।

শুধু ফুলমণিই বদলে যায়নি, অনিন্দ্য দাসকেও আমার আজ সম্পূর্ণ নতুন মানুষ মনে হল, লম্বা লম্বা লেকচার দিচ্ছেন বটে, তবু ওঁর কোনও কথাই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

হঠাৎ ফুলমণিকে কাছে ডেকে তিনি ওর কোমর জড়িয়ে ধরে বললেন, এ মেয়েটার প্রোফাইলটা দারুণ! প্রথম দেখেই মনে হয়েছিল মাগিটাকে পাথরে ধরতে হবে।

পরক্ষণেই ফুলমণিকে সরিয়ে দিয়ে বললেন, অ্যাই হারামজাদি, আর মোটাবি না বলে দিচ্ছি। যদি দেখি আরও মুটিয়েছিস, মেরে একেবারে পাট করে দেব!

ফুলমণিকে এখনও কোনওক্রমেই মোটা বলা যায় না। আমি অনেক আদিবাসী পল্লিতে ঘুরেছি। সাঁওতাল, ওরাওঁ, হো, মুণ্ডা, লোধাদের মধ্যে এ পর্যন্ত এক জনও স্থূলকায়া মহিলা দেখিনি।

অনিন্দ্য দাসের এই সব ভাষা শুনেও ফুলমণি মিটমিটিয়ে হাসছে।

আমি পাথরটার পেছন দিকে বসে আছি। অনিন্দ্য দাস ডাকতেই সামনের দিকে গিয়ে অবাক হলাম। ফুলমণির অনেকখানি প্রতিমূর্তি গড়া হয়ে গেছে। তার নগ্ন প্রতিমূর্তি।

আমি ভাস্কর্য কিছুই বুঝি না। তবে দেখেই মুগ্ধ হলাম। এর সঙ্গে দেবীপ্রসাদ, রামকিঙ্করের কোনও মিল নেই। হেনরি মূর বা রদ্যাঁর ধরনেরও নয়। অনেকটা যেন রিলিফের মতো। পাথরটা পাথরই থাকছে, তার মধ্য থেকে একটা বেশ চিনতে পারার মতো মূর্তি ফুটে বেরুচ্ছে।

অনিন্দ্য দাস বললেন, আমি আর্টকে কমার্সিয়াল করিনি। আমার মূর্তি বেচি না। শেষ হবার পর এটা কোথায় বসাব জানো, চমটা ব্লকে, নদীর মোহনার ধারে। সমুদ্র দিয়ে জাহাজ যাবে, নৌকোর মাঝিরা দেখবে। জঙ্গলের বাঘেরা এসে মূর্তিটাকে আদর করবে। কয়েকশো বছর বাদে লোকেরা ভাববে, সুন্দরবনের নরম মাটিতে একটা পাথরের মূর্তি গজিয়ে উঠল কী করে? নিশ্চয়ই আকাশ থেকে দেবতারা ফেলেছে! সেইভাবে আমি দেবতা হয়ে যাব। হা-হা-হা-হা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, পাথরটা আপনি আনলেন কী করে?

অনিন্দ্য দাস বললেন, বাজে প্রশ্ন। নৌকোয় আনিয়েছি। ঘাটশিলা থেকে। আর একটা মূর্তি দেখবে। এসো।

বাড়ির পেছন দিকে একটা বাগান। সেখানে একটা প্রমাণ সাইজের মূর্তি বসানো আছে। সেটাও ফুলমণির। কঠিন পাথরের মধ্যে ফুলমণির লাজুক ভাবটা কী আশ্চর্য ফুটেছে। অনিন্দ্য দাস সত্যিই শক্তিশালী শিল্পী।

অনিন্দ্য দাস বললেন, অ্যাই ফুলমণি, তুই এই মূর্তিটার পাশে দাঁড়া।

আমাকে বললেন, একবার দেখো, খুঁটিয়ে দেখো, ফুলমণির চেহারার সঙ্গে মূর্তিটায় কিন্তু মিল নেই। অথচ মিল আছে। এই অথচ মিলটাই আসল। ক'জন শালা এটা বোঝে?

বাঁটকুল লোকটি এবার এসে বলল, আপনারা এবার খাবেন না? বিকেল হয়ে গেল!

অনিন্দ্য দাস বললেন, কী রেঁধেছিস? নিয়ে আয় না শুয়ার। বক বক করছিস কেন?

নিরাপদ সঙ্গে সঙ্গে এক ডেকচি খিচুড়ি নিয়ে এল। কলাপাতায় বেড়ে দিয়ে গেল হাতে হাতে। বিকেল সাড়ে চারটের সময় এই ওদের দুপুরের খাবার। শুধু কলাপাতায় খানিকটা খিচুড়ি, ভেতরে অবশ্য আলু-টালু আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়া। অনিন্দ্য দাস খিচুড়ি খেতে খেতেই হাঁড়িয়ার গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন। ফুলমণিও হাঁড়িয়া খেয়ে যাচ্ছে সমানে।

আমি খানিকটা খিচুড়ি খেয়ে পাতাটা নামিয়ে রাখলাম।

অনিন্দ্য দাস ধমক দিয়ে বললেন, এই, এই, ও কী, আরও নাও। নিরাপদ, ওকে আরও খিচুড়ি দে। বেগুনভাজা কোথায়? হারামজাদা, আজ একটু মাছও জোগাড় করতে পারলি না? সবাই বলে সুন্দরবন মাছের দেশ, অথচ এখানেই মাছ পাওয়া যায় না। সব কলকাতায় চলে যায়।

আমি বললাম, না, আমি আর খাব না।

কেন খাবে না? ওইটুকু খেলে পেট ভরে? খাও, খাও।

না, আমাকে এবার যেতে হবে। এরপর আর ফেরার লঞ্চ পাব না।

ফিরবে কেন? কে মাথার দিব্যি দিয়েছে, চাঁদু? এখানে থেকে যাবে। উঠোনে খাটিয়া পেতে দেব রাত্তিরে। এই গরমে আমরা সবাই উঠোনে শুই। ভয় নেই, বাঘ আসবে না।

মাটি থেকে আমার ঝোলাটা তুলে নিয়ে বললাম, আমাকে ফিরতেই হবে আজ।

ফুলমণি ঈষৎ নেশাগ্রস্ত গলায় বলল, কেন যাবে? থাকো, থাকো।

এই প্রথম আমি ফুলমণির দিকে সরাসরি তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ফুলমণি তোমাকে নিয়ে এই যে-মূর্তিটা গড়েছে তোমার কেমন লেগেছে?

ফুলমণির মুখ হাসিতে ঝলমল করে উঠল।

অনিন্দ্য দাসের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, মূর্তি তো গড়ে নাই।

তারপর আকাশের দিকে আঙুল তুলে বলল, উ গড়াইছে।

ওরে বাবা, এত প্রেম!

হাতের কলাপাতায় খিচুড়ি নিয়েই ওরা আমাকে বিদায় দিতে এল গেট পর্যন্ত। ফুলমণি কঞ্চির বেড়ায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে, অনিন্দ্য দাস তাঁর এঁটো হাত ফুলমণির কাঁধে রাখলেন। আমাকে বললেন, এই ছেলে আবার আসিস। যখন খুশি চলে আসবি।

ওদের দু'জনের গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ভঙ্গিটা আমার চোখে লেগে রইল। আমি আর এখানে কখনও আসব না।

॥ ১০ ॥

ফুলমণির কাহিনি এখানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু গল্প-উপন্যাসে এ-রকম একটা সুখের মিলন হলেও সেটা হয় ইচ্ছাপূরণ। বাস্তব বড় নিষ্ঠুর। ফুলমণি আর অনিন্দ্য দাসের মতো দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর মানুষ কি সারা জীবন এক সঙ্গে কাটাতে পারে।

বোয়ালভাসিতে ওদের দু'জনের উদ্দাম জীবনের একটা টুকরো ছবি আমি দেখে এসেছি, তা আসলে এক ধরনের পিকনিক। ভারি চমৎকার, খুব লোভনীয়, কিন্তু পিকনিক একটানা কত দিন চলে?

ফুলমণির জীবনে আরও অনেক ঘটনা ঘটে গেছে, আমার সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ নেই অবশ্য, কিন্তু খবরগুলো আমার কানে এসেছে।

অনিন্দ্য দাস কোনও এক জায়গায় বাঁধা পড়ে থাকার মানুষ নন। সেই জন্য তিনি বিয়েই করেননি। মেয়েরা তাঁর মাথায় উত্তেজনা জোগায়, তাঁর কাজে গতি আনে। তিনি প্রেরণা-ট্রেরণায় বিশ্বাস করেন না। স্নায়বিক উত্তেজনা আর ফুর্তিই তাঁর কাছে প্রধান।

এ-কথাও শুনেছি, তিনি কোনও মেয়েকেই প্রতারণা করেন না। তাঁর বিবেক পরিষ্কার। যে-মেয়েকে তাঁর পছন্দ হয়, তাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেন, এই তুই আসবি আমার সঙ্গে? বোয়ালভাসির খামারে গিয়ে থাকবি? যে রাজি হয় না, তাকে তিনি জোর করেন না। তার দিকে আর ফিরেও তাকান না। আর যে মন্ত্রমুগ্ধের মতো রাজি হয়ে যায়, সে যায় নিজের দায়িত্বে, কোনও প্রতিশ্রুতি নেই, ভবিষ্যৎ নিয়ে গাঁটছড়া বাঁধার কোনও সম্ভাবনাও নেই।

ফুলমণির সঙ্গে অনিন্দ্য দাসের পিকনিক সাত মাসেই শেষ হয়ে গেছে।

ফুলমণির ছিপছিপে ধারালো শরীরটা ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু হিসেবে অনিন্দ্য দাসের পছন্দ হয়েছিল। ফুলমণিকে মডেল করে দুটো মূর্তি গড়েছেন তিনি। বিষয়বস্তু হিসেবে সে ফুরিয়ে গেছে। যে-বিষয়বস্তু একবার ব্যবহার করা হয়ে যায়, তার প্রতি শিল্পীদের আর কোনও আকর্ষণ থাকে না। এরপর ফুলমণি একটি সাধারণ নারী।

কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে এক দিন অনিন্দ্য দাসের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

আমি ছিলাম অন্য টেবিলে, উনি অনেক দূরে। চোখাচোখি হতেও আমি চেনার কোনও ভাব দেখাইনি, উনিই উঠে এলেন এক সময়।

খানিকটা অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, কী খবর নীলু? চন্দন এখন কোথায় থাকে? সেই ছোটপাহাড়িতে? ওর ওখানে একবার যাব। কী করে ছোটপাহাড়িতে যেতে হয় বলো তো? কোন স্টেশানে নামতে হয়? সেই মেয়েটার কোনও খবর জানো?

তার খবর তো আমার জানবার কথা নয়। আমি ছোটপাহাড়ীতে আর যাই না।

হ্যাঁ, এক দিন রাগ করে চলে গেল, আমি ভাবলাম আবার হয়তো আসবে একবার।

অন্য এক জন চেনা লোক অনিন্দ্য দাসের সঙ্গে কথা বলা শুরু করতেই তিনি আমাকে যেন ভুলে গেলেন! সেই লোকটির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন দরজার দিকে।

আমাকে দেখে ফুলমণির কথা একবার মনে পড়েছিল অনিন্দ্য দাসের। কিন্তু সেই মনে হওয়ার কোনও গভীরতা নেই। কয়েক মিনিটের জন্য স্মৃতির আন্দোলন। ছোটপাহাড়িতে তিনি সত্যি সত্যি ফুলমণিকে আর দেখতে যাবেন না, আমার কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত ছোটপাহাড়ি যাবার সন্ধানও নিলেন না।

সিরাজুল তারিক সাহেবও ফুলমণি সম্পর্কে সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। অনিন্দ্য দাসের সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটার পর থেকেই তিনি ফুলমণি সম্পর্কে আর একটি কথাও বলেননি কখনও। কলকাতার শিল্প জগতে ফুলমণির নামটা কয়েকটা দিনের জন্য উঠেই আবার মিলিয়ে গেছে, বুদবুদের মতো। প্রদর্শনীতে ফুলমণির একটি মাত্র ছবি বিক্রি হয়েছিল। দু'হাজার টাকায় কিনেছিলেন প্রখ্যাত এক জন শিল্পী। ছবিটাই তাঁর পছন্দ হয়েছিল। ছবির শিল্পী সম্পর্কে তিনি কোনও কৌতূহল দেখাননি।

ভবিষ্যতে অনিন্দ্য দাসের ভাস্কর্য প্রসঙ্গেও ফুলমণির নামটা কখনও উঠবে কি না সন্দেহ। অনিন্দ্য দাসের ভাষায় 'অথচ মিল আছে' ক'জনের নজরে পড়বে?

চন্দনদা যদি ফুলমণির ছবি নিয়ে ব্যবসা করতে চাইতেন, নীপাবউদির ঈর্ষাফির্সা অগ্রাহ্য করে ওর পেছনে টাকা ঢালতেন, ওকে ছবি আঁকার সব সুযোগ করে দিতেন, তাহলে ফুলমণির প্রতিষ্ঠা পাওয়ার আশা ছিল, ওর ছবিও বিক্রি হত। সেই রকম এক জন প্রফেশনাল প্রোমোটারের দরকার ছিল, নিছক শখের পরোপকারীরা বেশি দূর যেতে পারে না। অনিন্দ্য দাস একবার ছুঁয়ে দিয়েছেন বলে আমরা আর কেউ ফুলমণির দিকে তাকাইনি।

অনিন্দ্য দাস ছোটপাহাড়িতে গেলেও অবশ্য ফুলমণিব দেখা পেতেন না। চন্দনদার কাছে শুনেছি, ফুলমণি ছোটপাহাড়িতে ফিরলেও তার শ্বশুরের ভাইপো তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সে-লোকটি বাড়ি, জমিজমা দখল করে বসেছে, সে ও-বাড়ির একটা বিধবা বউকে ঠাঁই দেবে কেন? ফুলমণির নামে নানা বদনাম দেওয়া, এমনকী তাকে ডাইনি সাজানোও সে-লোকটির পক্ষে সহজ। একলা একটা মেয়ের তুলনায় এক জন বিবাহিত, সংসারী মানুষকে সব সমাজই বেশি বিশ্বাস করে।

ফুলমণি ছোটপাহাড়িতে নেই, সে আবার হারিয়ে গেছে।

এর পরেও কেটে গেছে এক বছর।

আমি আবার গা আলগা করে ঘুরে বেড়াই, কেউ আমাকে নিয়ে মাথা ঘামায় না। দাদা অবশ্য প্রায়ই রাগারাগি করে, কিন্তু আমার বউদির মতে, প্রতি এক হাজার মানুষের মধ্যে এক জন অন্তত বাউণ্ডুলে বা ভবঘুরে বা অভিযাত্রী থাকা উচিত, না হলে সে-সমাজটা বর্ণহীন হয়ে যায়। সেই সুবাদে আমি বাড়িতে দু'বেলা খেতে পাই।

মাঝে মাঝে অন্যের ফাই ফরমাস খেটে আমার কিছু কিছু রোজগারও হয়।

কেউ কেউ আমার হাত দিয়ে জরুরি কাগজপত্র পাটনা কিংবা ভুপালে পাঠায়। কারুর হয়তো বৃদ্ধা মা কিংবা অশক্ত ঠাকুর্দাকে কাশী কিংবা এলাহাবাদ পৌঁছে দেবার কোনও লোক নেই, তখন আমি আছি। ট্রেন ভাড়া ছাড়াও হাতখরচ মন্দ জোটে না।

লালুদার এক আত্মীয় থাকে ঝুমরি তিলাইয়ায়, তাকে একটা সম্পত্তির দলিল পৌঁছে দিতে হবে, সেই ভারটা পেয়ে গেলাম আমি। টাকা-পয়সার ব্যাপারে লালুদা উদার, আমাকে হাতখরচ দিয়েছে পাঁচশো টাকা।

একটা স্টেশানে ট্রেন পালটাতে হবে, বসে আছি প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে।

ট্রেনের পাত্তা নেই। একটা মালগাড়ি থেমে আছে অদূরে, সেটা না গেলে আর ট্রেন আসবে না। গোটা স্টেশানটায় ভ্যান ভ্যান করছে মাছি। কিছু বাসি কচুরি, তরকারি আর দরবেশ যা বিক্রি হচ্ছে, তা মানুষের অখাদ্য, মাছিরই খাদ্য।

রেললাইন থেকে পোড়া কয়লা কুড়োচ্ছে গোটা পাঁচেক নানা বয়সী মেয়ে। প্ল্যাটফর্মে ওদেরই কেউ একটা বাচ্চাকে শুইয়ে রেখেছে, চিৎ হয়ে বাচ্চাটা ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে।

অলস ভাবে তাকিয়ে ছিলাম, এক সময় চোখ আটকে গেল।

কোনও সন্দেহ নেই, ওই মেয়েগুলোর মধ্যে এক জন ফুলমণি। আবার সেই আগেকার মতো রোগা চেহারা, পরনের নীল পাড় সাদা শাড়িটা যেমন ময়লা, তেমনি ছেঁড়া, মাথার চুল জট পাকিয়ে গেছে। মাথায় ঝুড়ি ভরে কয়লা তুলে তুলে প্ল্যাটফর্মের অনেক দূরে একটা কোণে জড়ো করে রাখছে।

হোক না ফুলমণি, তাতে আমার কী আসে যায়? ছবি আঁকা ছেড়ে কেউ যদি কয়লাকুড়োনি হয়, আমি তার কী করব?

অন্য কোনও কাজ নেই, সঙ্গে একটা বইও নেই, তাই বসে বসে দেখতে লাগলাম মেয়েগুলোকে। একটি মেয়েরও স্বাস্থ্য ভাল নয়। কয়লা তুলে দু'বেলার অন্ন জোটে না বোধহয়।

ঝুড়ি খালি করে ফেরার সময় মেয়েরা কেউ না-কেউ বাচ্চাটাকে একটু আদর করে যাচ্ছে। ওটা কার বাচ্চা? ফুলমণির? খুবই স্বাভাবিক।

কাছেই নিশ্চয়ই ওদের ঝুপড়ি আছে। সেখানেই জীবন কেটে যাচ্ছে, এক-একটা রেল স্টেশনে অনেকগুলো পরগাছার জীবিকার সংস্থান হয়।

ফুলমণি যদি নিজে থেকে এসে আমার সঙ্গে কথা না বলত, তাহলে পরবর্তী চিন্তাটা আমার মাথাতেই আসত না।

অন্য মেয়েরা মাঝে মাঝে কল কল করে কথা বলে উঠছে, কিন্তু ফুলমণি আগের মতোই নীরব। ফুলমণি অন্যদের মতো নয়। ওর নীরবতা ওর অহঙ্কার।

আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে ফুলমণি একবার থমকে দাঁড়াল। নীরবতা ভেঙে বলল, ছোটবাবু।

কবে আমার চাকরি গেছে, আমি আর ছোটবাবু নই, কোনও বাবুই নই, তবু এই ডাক শুনে যেন আমি ধন্য হয়ে গেলাম।

আমি শুধু বললাম, ফুলমণি।

ব্যাস ওইটুকুই। আর কোনও বাক্য বিনিময় হল না। ফুলমণি আবার লাইনে নেমে গেল।

কী কথা বলব ওকে? ওর অতীত ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করে কী লাভ? কয়লা কুড়িয়ে যার দিন চলে, তার ছবি আঁকার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

প্ল্যাটফর্ম থেকে রেল লাইন বেশ নিচু। ঝুড়িভর্তি কয়লা নিয়ে ওপরে উঠতে মেয়েদের বেশ কষ্ট হচ্ছে। একবার ফুলমণি উঠতে গিয়ে তার কয়লার ঝুড়িটা উলটে গেল। তখনই আমার মাথায় এল সেই চিন্তাটা।

আমি উঠে গিয়ে হাত বাড়িয়ে ফুলমণিকে টেনে তুললাম ওপরে। জিজ্ঞেস করলাম, ফুলমণি আমার সঙ্গে যাবে?

কোথায়?

অনেক দূরে, পোড়া কয়লা কুড়োবার চেয়ে কোনও খারাপ কাজ সেখানে করতে হবে না।

ফুলমণি এ-দিক ও-দিক তাকাল। খালি ঝুড়িটা সরিয়ে নিল খানিকটা। তারপর বলব, যাব।

অনিন্দ্য দাসের আহ্বানে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়েছিল ফুলমণি। ঠিক সেই রকম ভাবেই রাজি হয়ে গেল আমার এক কথায়? ফুলমণি স্থাণু হতে চায় না। পরিবেশ বদলাতে চায় সব সময়। অনিন্দ্য দাস যেমন বলেছিল, ও জীবনকে ভাঙছে?

হাতের ধুলো ঝেড়ে ফুলমণি বাচ্চাটাকে একবার গাল টিপে দিল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ বাচ্চাটা তোমার?

ফুলমণি বলল, না, আমার বাচ্চাটা এইটুকুন হয়েই মরে গেছে।

আমি মনে মনে বললাম, এক দিক থেকে ভালই হয়েছে। বাচ্চা-কাচ্চা সঙ্গে থাকলে ঝামেলা হত।

স্টেশনের বাইরে বাস দাঁড়িয়ে আছে।

বাস পালটাতে হল তিনবার। ফুলমণি আর একবারও জিজ্ঞেস করল না, কোথায় যাচ্ছি।

সন্ধে হয়ে এসেছে। শেষবার বাস থেকে নেমে আমি জিজ্ঞেস করলাম, সাঁতার জানো?

ফুলমণি দু'বার মাথা ঝোঁকাল।

এবার খানিকটা জঙ্গলের পথ। দুপুর দু'বার আমরা শুধু ঝালমুড়ি খেয়েছি। ফুলমণির শরীর দুর্বল। খিদেয় নিশ্চয়ই আরও কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু মুখে তার কোনও চিহ্ন নেই। অনিশ্চিতের দিকে যাত্রা ওকে টানছে।

জঙ্গলের রাস্তাটা ছমছমে অন্ধকাব। কোনও একটা প্রাণী পাশ দিয়ে ছুটে যেতেই ফুলমণি থমকে গিয়ে আমার হাত চেপে ধরল।

এই প্রথম আমার হাত ধরল ফুলমণি। প্রথম ও শেষবার।

আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা পৌঁছলাম নদীটার কাছে। বেশ চওড়া নদী, স্রোত আছে, তবে খুব গভীর নয়। মাঝখানটায় শুধু সাঁতবে যেতে হবে।

ওপরে মিট মিট করে দু-চারটে আলো জ্বলছে। দূরে পাহাড়ের মাথায পাতা-পোড়া আগুন।

আমি ফুলমণির হাত ছাড়িযে নিয়ে বললাম, এই নদী পার হয়ে সোজা চলে যাও। ও-পারে দিকশূন্যপুর নামে একটা গাঁও আছে। সেখানে আছে বন্দনাদি। তার কাছে গিয়ে বলবে, নীলু তোমাকে পাঠিয়েছে। ব্যাস, তোমার আর কিছু চিন্তা করতে হবে না। তুমি খাবাব পাবে। থাকাব জাযগা পাবে। তোমার যা খুশি তাই করতে পারো। ইচ্ছে হলে ছবিও আঁকতে পারো। বসন্ত রাও, রোহিলা এরাও ছবি আঁকে। ওরা তোমাকে রঙ-তুলি দেবে।

ফুলমণি জিজ্ঞেস করল, তুমি যাবে না?

আমি বললাম, ওখানে সবাই একলা যায়। তোমাব কোনও ভয় নেই। দিকশূন্যপুরের বন্দনাদিকে আমার নাম করলেই হবে। আমি এখন গেলে ফিবতে পাবব না। আমি যে অন্য লোকের কাজ নিয়ে এসেছি।

হাঁটু পর্যন্ত জলে আমি গেলাম ওব সঙ্গে সঙ্গে, তারপব থেমে পড়ে বললাম, এবার তুমি একা যাও।

ফুলমণি নিষ্পলক ভাবে কয়েক মুহূর্ত তাকিযে রইল আমাব দিকে। তারপর জল ঠেলে এগিযে গেল। একটু পরে তাকে আর দেখা গেল না। শুধু শোনা যেতে লাগল জলেব শব্দ।

হাঁটুজলে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ।

যাও ফুলমণি দিকশূন্যপুরে। ওখানে কেউ তোমাকে ছোট করবে না। ওখানে ওরা যে সবাই সমান। কেউ তোমাকে আদিবাসী বলে আলাদা কবে দেখবে না। কারণ ওরা মনে করে সকলেই এই পৃথিবীর আদিবাসী। ওখানে কাজের কোনও অভাব নেই, কারণ কারুর লোভ নেই। ওরা নিজের জন্য কিছু রাখতে চায় না। অন্যকে দিয়ে আনন্দ পায়, সবাই অন্যকে দেয় বলে সবাব সব কিছু থাকে। ওখানে দুঃখ আছে, সব মানুষেরই দুঃখ থাকে, কিন্তু ওখানে অপমান নেই। দিকশূন্যপুরে কোনও নিয়ম নেই, মানুষের ইচ্ছেটাই নিয়ম॥

সরাইখানা

॥ ১ ॥

পথে নানা রকম বিপদের আশঙ্কা আছে বলে সুরপতি একটি বড় বণিকদলের সঙ্গ নিয়েছিল। সুরপতির সঙ্গে তার তরুণী পত্নী সুভদ্রা আর চার বছরের শিশুপুত্র ধ্রুবকুমার।

অনেক দস্যুও বণিকের ছদ্মবেশে পথে পথে ঘোরে, সেই জন্য ভয় ছিল সুরপতির। কিন্তু এই দলটি সম্পর্কে সে-সন্দেহের অবকাশ নেই। এই দলে রয়েছে প্রায় আঠাশ-তিরিশ জন লোক এবং অনেকগুলি ঘোড়া ও খচ্চরের পিঠ-বোঝাই মালপত্র। দলটির সামনে ও পিছনে রয়েছে অস্ত্রধারী প্রহরী। অনেক অনুরোধ করে সুরপতি এই দলের মধ্যে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। অবশ্য প্রহরীদের খরচ বাবদ তাকে দিতে হয়েছে দশটি সিক্কা টাকা।

সুরপতির সঙ্গে ধন-সম্পদ বিশেষ কিছুই নেই। সে বিষণ্ণ মনে দেশ ত্যাগ করছে। মাত্র কয়েক সপ্তাহের ভীষণ কালাজ্বরে তার পরিবারের আর সকলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তার বৃদ্ধা মা, বড় ভাই তার স্ত্রী-পুত্রাদি, সুরপতির চেয়েও বয়সে ছোট এক কাকা পর পর ওই অসুখে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল এক মাসের মধ্যে। সুরপতির শোক করারও সময় পায়নি।

বিপদ শুধু এক দিক দিয়ে আসে না। এই সময়েই আবার বাজারে আগুন লাগে। দু'পুরুষ ধরে সুরপতিদের অন্নের সংস্থান হত যে বস্ত্রের দোকানটি থেকে, সেটিও পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুন লাগার খবর পেয়ে সুরপতি বাড়িতে তিনিটি মুমূর্ষ আত্মীয়কে রেখে ছুটে গিয়েছিল, কিন্তু তখন বন্দরের সারি সারি দোকান দাউ দাউ করে জ্বলছে। নিয়তিতে টানা পতঙ্গের মতো সুরপতি ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েছিল, প্রতিবেশিরা তাকে জোর করে ধরে রাখে। তখন মাথা চাপড়ে হায় হায় করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। সকলেই বলাবলি করছিল, সপ্তগ্রাম বন্দরে অলক্ষ্মীর দৃষ্টি লেগেছে।

ভগ্নহৃদয় সুরপতি তারপর বিষয়-সম্পত্তির যেটুকু অবশিষ্ট ছিল সব বিক্রি করে দেশত্যাগ করেছে। বিষয়-সম্পত্তির দামও বিশেষ কিছু পায়নি, কারণ দেশজোড়া মন্দা চলছে, খরিদ্দার কেউ নেই। ভাগ্যান্বেষণে সুরপতি চলেছে দেশান্তরে।

কিন্তু সুরপতির বড় সম্পদ তার স্ত্রী। এমন রূপসী রমণী সচরাচর চোখে পড়ে না। সুভদ্রা বেশ দীর্ঘাঙ্গী, তার মাথার চুল পিঠ ছাপিয়ে নেমে আসে, বড় বড় অক্ষিপল্লব, অতি কোমল পেলব মুখ। সমস্ত শরীরখানাই যেন লাবণ্যমাখা। রাজেন্দ্রাণী হলেই তাকে মানাত, কিন্তু সে বাঁধা পড়েছে সুরপতির মতো এক ভাগ্যহীনের সঙ্গে।

সুভদ্রা শুধু রূপসীই নয়, তার মনটিও অতি কোমল। পৃথিবীতে যে কত পাপ, কত অন্যায় আছে, সে যেন তার খবরই রাখে না। সে সব কিছুই সুন্দর দেখে। সুভদ্রার জন্ম অতি গরিব বাড়িতে, অথচ সে অর্থসম্পদের কোনও মূল্যই বোঝেনি এ পর্যন্ত। সুরপতির যখন অবস্থা সচ্ছল ছিল, তখন সুভদ্রা দু'হাতে বিলিয়েছে। কোনও দীন-দুঃখী ফেরেনি তাদের বাড়ি থেকে। আবার এখন যে সুরপতি এমন দরিদ্র হয়ে গেছে, তাতেও তার কোনও রকম মালিন্য নেই। সব কিছুই সে হাসিমুখে সহ্য করতে পারে। ছেলেটিও হয়েছে ঠিক মায়ের মতো।

সুরপতির ভয় তার স্ত্রীকে নিয়ে। সুন্দরী রমণীকে নিয়ে পথ চলার বিপদ অনেক। তাছাড়া সুরপতির আর একটা দুর্বলতা আছে। স্ত্রীকে সে এতই ভালবাসে যে, অপর কোনও পুরুষ তার স্ত্রীর দিকে একটু তাকালেই সে সহ্য করতে পারে না। ক্রোধে তার শরীর জ্বলে যায়। যদিও সুভদ্রা সব সময় অবগুণ্ঠনে তার মুখ ঢেকে রাখে, তবু তারও অনিন্দ্যকান্তির দিকে মানুষের চোখ যাবেই।

বণিকদলের মধ্যে একটি তরুণ সুভদ্রার পুত্রকে আদর করার ছলে প্রায়ই সুভদ্রার কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করে। দু'দিন ধরেই সুরপতি লক্ষ্য করছে। যুবকটিকে তার পছন্দ হয় না। যুবকটির নাম ধনরাজ।

সে খুব সুপুরুষ না হলেও স্বভাবটি অতি উচ্ছল। সে বেশি কথা বলে, বেশি হাসে। তার চোখের তারা দু'টি চঞ্চল, কারুর দিকে দৃষ্টি স্থির রাখতে পারে না। এই প্রকারের মানুষ সাধারণত বিশ্বাসযোগ্য হয় না।

তবে একটি আশ্বাসের কথা এই যে, বণিকদলের দলপতি পূর্ণানন্দর ওপর ভরসা করা যায়। বিশাল তার চেহারা, মেজাজটিও খুব কড়া, কিন্তু মানুষটি ধার্মিক প্রকৃতির, দলের মধ্যে তিনি কঠোর শাসনের প্রবর্তন করে রেখেছেন। সুরপতির বিশ্বাস আছে যে, ধনরাজ যদি বেশি বাড়াবাড়ি করে তাহলে পূর্ণানন্দের কাছে নালিশ করলে সুবিচার পাওয়া যাবে।

সারা দিন ধরে পথ চলা, তারপর সন্ধ্যার পর বিশ্রাম।

এখন গ্রীষ্মকাল, তাই রাতের বাইরেই শুয়ে থাকা যায়। প্রান্তরের মধ্যে সকলেই কাছাকাছি শুয়ে থাকে, রক্ষীরা পালা করে প্রহরা দেয়। চারদিকে আগুন জ্বালা থাকে।

বণিকরা যাবে অনেক দূর। এক মাস, দেড় মাসের পথ পায়ে হেঁটে তারা চলে যায় এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে। আবার কয়েক মাস পর ফেরে। সুরপতিরা কোথায় যাবে তার ঠিক নেই। এর মধ্যেই তারা পার হয়ে এসেছে কয়েকটি নগর, কিন্তু সব জায়গাতেই দেখেছে কালা জ্বরের উপদ্রব। মানুষের মধ্যে হাহাকার। বঙ্গদেশে এখন সম্পূর্ণ অরাজকতা চলছে, নবাবি শাসন অতি শিথিল, মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারেরা, যাদের অর্থ সম্পদ এসেছে ডাকাতি থেকে। এর মধ্যে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে সাগরপার থেকে আসা শ্বেতাঙ্গ টুপিওয়ালারা, যারা নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বোঝে না। তার ওপর দুঃস্বপ্নের মতো যখন-তখন আসে বর্গির হাঙ্গামা, হ্রস্বকায় ঘোড়ায় চেপে দুর্ধর্ষ মারাঠারা প্রবল ঝড়ের মতো এসে এক-একটা জনপদ লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যায়। বঙ্গের কোথাও এখন আর শান্তি নেই, অনেকেই এ রাজ্য ছেড়ে পালাচ্ছে।

সুরপতি এমন কোনও নগরে বসতি নিতে চায়, যেখানে আছে সুখ। আছে সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। যেখানে বিদেশি নতুন মানুষও পেতে পারে কোনও রকম জীবিকা অর্জনের সুযোগ। জানে না, সে-রকম নগর কোনও দেশে আছে কি না!

এমন দিনের পর দিন পায়ে হাঁটার অভ্যেস নেই সুরপতির। তবু সে পুরুষ মানুষ। সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমার তো কখনওই হাঁটেনি। ধ্রুবকুমারকে পালা করে কোলে নিতে হয়। অবশ্য একটা সুবিধে এই, এই সার্থবাহের সকলেই ধ্রুবকুমারকে খুব ভালবেসে ফেলেছে। সকলেই তাকে নিয়ে কৌতুক করে, স্বেচ্ছায় তাকে কোলে নিয়ে যায়। সুভদ্রার কোমল পা দু'খানি নিশ্চয়ই এতখানি পথ চলায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে, কিন্তু একটি বারও সে টু শব্দটি করে না। বরং রাত্রিবেলা সে সুরপতির পায়ে তেল মালিশ করে দেয়।

একবারই মাত্র, কাল দুপুরে সুভদ্রা উঃ শব্দ করে বসে পড়েছিল পথের মাঝখানে। তার পায়ে একটা কাঁটা ফুটেছে। কী হয়েছে, কী হয়েছে বলে ধনরাজই আগে ছুটে গিয়েছিল। সুরপতি রুক্ষভাবে বলেছিল, আপনি সরুন! আমি দেখছি!

সুভদ্রা কিছুতেই পা দেখাবে না। স্বামীকে তার পা ছুঁতেও দেবে না। নিশ্চয়ই সে অতিরিক্ত ব্যথা পেয়েছে, কারণ চোখে টল টল করছে জল। সুরপতি জেদ করতে লাগল কাঁটাটা দেখবার জন্য। সুভদ্রা পা ঢেকে রেখেছে। শেষ পর্যন্ত ধনরাজই বাতি জ্বেলে তাতে একটা বড় আকারের চাবি নিয়ে গরম করে সুরপতিকে বলল, আপনি এটা ঠেসে ধরতে বলুন ক্ষতস্থানে।

সেই ভাবেই কাঁটাটা উঠল বটে কিন্তু সুরপতি খুব একটা খুশি হল না তাতে। সে ধনরাজের সাহায্য নিতে চায়নি। সেই সুযোগে পাষণ্ডটা সুভদ্রার অনেক কাছাকাছি এসেছিল এবং তার মুখ দেখার চেষ্টা করেছিল।

এই এক জ্বালা। মুখে কিছু বলা যায় না, সুরপতি ধনরাজকে কিছুতেই বলতে পারবে না, তুমি আমার পত্নীর দিকে তাকাচ্ছ কেন হে? সেটা হাস্যকর শোনাবে। অথচ ভেতরে ধিকি ধিকি করে জ্বলে রাগ। ছোকরাটিও অতি নির্লজ্জ, সুরপতি আকারে-ইঙ্গিতে তার অসূয়ার কথা জানায়, তবু ধনরাজ দূরে সরে যায় না। বরং বার বার গায়ে পড়ে উপকার করতে আসে।

আজ সকাল থেকে চলার গতি বৃদ্ধি করতে হয়েছে পূর্ণানন্দের আদেশে। আকাশে মেঘ জমেছে। দু'এক দিনের মধ্যেই বৃষ্টি নামতে পারে। বৃষ্টির সময় পথ চলা দায় হবে। রাত্রিবেলা আশ্রয় নিতে হবে কোনও চটিতে। তার খরচ আছে। তাছাড়া এক চটিতে এতগুলি মানুষের সংস্থান হবে কি না তা-ও একটা কথা।

দ্রুত পথ চলার আরও একটি কারণ আছে। এখানেই কুখ্যাত ডাকাত সর্দার বুধনাথের দলের খুব উপদ্রব ছিল এক সময়। হিংস্র পশুর চেয়েও নৃশংস এই বুধনাথ। যদিও শোনা গেছে যে, টুপিওয়ালা সাদা চামড়ার সাহেবদের সঙ্গে নাকি বুধনাথের দলের খুব একচোট লড়াই হয়ে গেছে কিছু দিন আগে, তাতে বুধনাথের দল পর্যুদস্ত হয়ে গেছে — তবু তার চ্যালা-চামুণ্ডারা কেউ থাকতে পারে। দিনের বেলাতেই জায়গাটা পার হয়ে যাওয়া ভাল।

এর মধ্যেই মাঝে মাঝে দু'একটি যাত্রীদলের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তার মধ্যে একটি দল যে দস্যুদের, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাদের ধরন-ধারণ, তাদের চোখের চাহনি সবই বক্র। দলের মধ্যে সকলেই সমর্থ জোয়ান, একটিও শিশু বা বৃদ্ধ নেই, সেটাও স্বাভাবিক মনে হয় না। মাঝে মাঝে দু'একটি লোক হঠাৎ পথের ধার থেকে উঠে এসে এই যাত্রীদলের সঙ্গে যোগ দিতে চায়। এগুলিও সন্দেহজনক। এরা সাধারণত দস্যুদের গুপ্তচর হয়। পূর্ণানন্দ কারুকেই স্থান দেননি। তিনি মানুষ চেনেন। অন্য যে-দলটিকে ডাকাত বলে সন্দেহ করা হয়েছিল, তাদের সম্পর্কে তিনিই সকলকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। সেই দলটির মতলব নিশ্চিত ভাল ছিল না। কিন্তু এদের এত বড় দল ও সশস্ত্র রক্ষী দেখে তারা নিরীহ সেজে পাশ কাটিয়ে গেছে।

দুপুরের মধ্যে ওরা বল্লারপুরের সেই কুখ্যাত মোড়টি পার হয়ে গেল। জায়গাটা খাঁ-খাঁ করছে, এ-দিক ও-দিক ছড়ানো রয়েছে কিছু শুকনো হাড়। ওগুলি ঘোড়ার হাড় বলেই মনে হয়। তাহলে এখানে নিশ্চিত কোনও যুদ্ধ হয়েছিল। টুপিওয়ালা সাদা চামড়ারা কোনও লড়াইতে চট করে হারে না। ওরাও দল বেঁধে ব্যবসা করতে আসে, কিন্তু প্রত্যেকের সঙ্গেই আগ্নেয়াস্ত্র থাকে। টুপিওয়ালাদের দেখে সাধারণ মানুষরা ভয় পায় না, যেমন ভয় পায় নবাবের সৈন্যদের দেখে।

বল্লারপুর ছোট্ট একটি জনপদ। একটি চটি ও কিছু দোকান আছে। এখানকার মানুষজনকে দেখলে মনে হয়, তাদের মধ্যে সে-রকম কোনও আতঙ্ক নেই। পথশ্রমে ক্লান্ত সুরপতির একবার মনে হল, আর বেশি দূর এগিয়ে কাজ নেই। এখানেই বসতি নিলে হয়। কাছেই একটি বেশ বড় আকারের নদী আছে। নদী-প্রান্তবর্তী জনপদের সমৃদ্ধি ক্রমেই বাড়ে।

পরামর্শের জন্য সুরপতি প্রস্তাবটা উত্থাপন করল পূর্ণানন্দের কাছে। পূর্ণানন্দ এক কথায় উড়িয়ে দিলেন। তিনি বহুদর্শী লোক, জীবনে বহু নগর জনপদ দেখেছেন।

তিনি বললেন, সুরপতি এখানে গৃহনির্মাণ করে থাকতে পারে বটে, কিন্তু এখানে জীবিকার্জনের কোনও আশা নাই। এত ছোট জায়গায় বাইরের কোনও নতুন লোক এসে সুবিধে করতে পারে না। প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়লে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা খড়্গহস্ত হবে। তারা নবাগতকে ছলে-বলে-কৌশলে দমিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। আবার হয়তো সুরপতির বিপণিতে আগুন লাগবে। নতুন ভাবে জীবন শুরু করতে হয় কোনও বড় জায়গায়। ছোট জায়গায় সংকীর্ণতা বেশি। তাছাড়া এতটুকু জায়গায়

তিনটি কালী মন্দির, অর্থাৎ এখানকার লোকেরা ঘোর শাক্ত, সুরপতির মতো বৈষ্ণব এখানে সহজে মানিয়ে নিতে পারবে না।

সুরপতি পূর্ণানন্দের কথাগুলো চিন্তা করে দেখল। এই পরামর্শ তার যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হল। ভাল করে ভেবেচিন্তেই স্থান নির্বাচন করতে হবে। বড় জায়গাতেই নতুন লোকের পক্ষে প্রতিষ্ঠা পাওয়া সুবিধে। আর কিছু দূর গেলেই অন্য রাজ্য, সেখানে বৃহৎ কোনও নগর থাকতে পারে।

বল্লারপুরে আহারাদি সেরে এবং কিছু রসদ সংগ্রহ করে দলটি আবার বেরিয়ে পড়েছিল। আবার পথ চলা।

এখন সন্ধে হয়ে এসেছে। এবার কোথাও রাত্রির মতো থাকতে হবে। কাছাকাছি কোনও সুবিধাজনক স্থান পাওয়া যাচ্ছে না। আগাগোড়া রুক্ষ মাঠ। একটা কোনও জলাশয় থাকা দরকার। এত লোকের হাত-মুখ প্রক্ষালনের জন্য কম জল লাগে না।

ধনরাজ এসে সুরপতির পাশাপাশি হাঁটছে। অদূরে ছেলেকে কোলে নিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে সুভদ্রা। সুভদ্রা হাঁটছে সামান্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। কিন্তু সে-দিকে সুরপতির নজর পড়লেই সে আবার সামলে নিচ্ছে নিজেকে। সে কিছুতেই স্বীকার করবে না যে, তার পায়ে কাঁটা ফোটার ব্যথা আছে। একটু আগে সুরপতি ছেলেকে নিজের কাছে নিতে চেয়েছিল, সুভদ্রা রাজি হয়নি। সুভদ্রা একবারও ক্লান্তির কোনও চিহ্ন দেখায় না।

ধনরাজ সুরপতিকে বলল, আপনি নতুন জায়গায় বসতি নিতে চাইছেন, আপনাকে আমি একটি উপযুক্ত জায়গার সন্ধান দিতে পারি।

সুরপতি বলল, কোথায়?

ধনরাজ অতি উৎসাহের সঙ্গে বলল, আপনি দারুকেশ্বর চলুন। সেখানকার জল অতি মিষ্টি, দূর দূর থেকে লোকে দারুকেশ্বরের জল পান করতে আসে। সেখানে জমি অতি উর্বরা, ফসলে কখনও কীট লাগে না। মানুষজন অতি শিষ্ট। দারুকেশ্বরে বিখ্যাত পণ্ডিতের টোল আছে, আপনার পুত্রটি সেখানে বিদ্যাশিক্ষা করতে পারবে।

দারুকেশ্বরে বাণিজ্যের হাল কী-রকম?

দারুকেশ্বরে মস্ত বড় হাট বসে। গঞ্জের হাট, নৌকোয় করে সব বণিক আসে অন্য রাজ্য থেকে। দারুকেশ্বরের রেশমি কাপড়ের খুব সুনাম আছে। ইংরাজ বণিকরাও ওই কাপড় বেশি দাম দিয়ে কেনে।

কাপড়ের কথা শুনে সুরপতি একটু বেশি আগ্রহী হল। কয়েক পুরুষ ধরে তাদের কাপড়েরই ব্যবসা। সে নিজেও ওইটাই ভাল বোঝে।

সে জিজ্ঞেস করল, ওখানকার তাঁতিরা কি দাদন নিয়ে খাটে? নাকি নিজেদেরই মূলধন?

অনেক তাঁতি আছে, কে কী-রকম ভাবে খাটে, তা আমি ঠিক বলতে পারি না।

কত দূর দারুকেশ্বর?

আর দু'দিনের মাত্র পথ। আমার নিজের বাড়ি সেখানে। আপনি যদি গৃহ নির্মাণ করতে চান, আমি নিজে সব ব্যবস্থা করে দেব।

সুরপতি একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল। দারুকেশ্বর জায়গাটার কথা শুনে তার বেশ পছন্দই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে এই যুবকের বাড়ি! সুরপতির আগ্রহ কমে গেল। সাহায্য করার ছুতোয় ধনরাজ সেখানে সুরপতির বাড়িতে প্রায়ই আনাগোনা করবে, আর সুভদ্রার দিকে লোভীর চোখে তাকাবে। তাঁতীদের দাদন দেবার জন্য সুরপতিকে মাঝে মাঝে যেতে হবে গ্রামান্তরে, তখন সুভদ্রা বাড়িতে একা থাকবে। সেই সুযোগ নিয়ে আসবে এই রূপচোর।

সুরপতি উদাস ভাবে বলল, দেখি।

ধনরাজ আরও সবিস্তারে দারুকেশ্বরের গুণপনা বর্ণনা করতে লাগল। এমন জায়গা যেন দুনিয়ায় নেই। সুরপতিকে সে সেখানে নিয়ে গিয়ে বসাবেই। সুরপতি অবশ্য ইতিমধ্যেই মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে যে, আর যেখানেই যাক দারুকেশ্বরে সে কখনওই যাবে না।

ধ্রুবকুমার তার মায়ের কোল থেকে নেমে পড়েছে। এবার ধনরাজ দৌড়ে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিল। তারপর খেলাচ্ছলে তাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিল আবার। ধ্রুবকুমার খল্ খল্ করে হেসে উঠল। এর মধ্যেই ধ্রুবকুমারের সঙ্গে ধনরাজের বেশ ভাব জমে গেছে। সে ধনরাজের কটিবন্ধে ঝোলানো তলোয়ারটা নিজের হাতে নিতে চায়।

সন্ধে গাঢ় হয়ে এসেছে। কাছেই একটি অরণ্য। সাধারণত অরণ্যের মধ্যে এরা রাত্রিবাস করতে চায় না। কিন্তু এই অরণ্যটি তেমন ঘন নয়। দূরে দূরে গাছ, মাঝখানে পরিষ্কার তকতকে ভূমি। এই সব জঙ্গলে সাধারণত হিংস্র প্রাণী থাকে না। তার চেয়েও বড় কথা, এই জঙ্গলের মধ্যে একটি স্বচ্ছ জলের ঝরনা আছে। এই জল পান করা যায় নিশ্চিন্তে। সব দেখে শুনে পূর্ণানন্দ এখানেই রাত্রিবাসের নির্দেশ দিলেন।

সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারকে নিয়ে সুরপতি একটা বড় পিপুলগাছের নিচে আশ্রয় নিল। কাঁধের বোঝা নামিয়ে রাখল এক পাশে। ঘোড়া ও খচ্চরের পিঠে বণিকদের যে মালপত্র রয়েছে তার মধ্যেও সুরপতি নিজেদের দু'টি পুঁটলি চাপিয়ে দিয়েছে। এখন সেগুলি নিয়ে এল।

দিনেরবেলা গুরুভোজন হয়েছে, রাত্রে বিশেষ কিছু না খেলেও চলে। সঙ্গে কিছু ক্ষীরের লাড্ডু আছে। তাছাড়া এক্ষুনি এক জায়গায় বেশ বড় করে আগুন জ্বালানো হবে, সেখান থেকে যে-যার ইচ্ছে মতো অন্নব্যঞ্জন তৈরি করে নিতে পারে। দলের মধ্যে আর কোনও নারীও নেই, শিশুও নেই। বণিকরা এই সময় রোজই ধ্রুবকুমারকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুব আদর-যত্ন করে। বোধহয় তাদেরও বাড়িতে ছেড়ে আসা শিশুপুত্রের কথা মনে পড়ে।

সুভদ্রা ঘোমটাটা এই সময় একটু তুলল। পরিশ্রমে তার ফরসা মুখখানি এখন রক্তাভ। তবু সে সুরপতির দিকে চেয়ে হাসল।

সুরপতি বলল, আজ সপ্তম দিন পার হল। আর তো হাঁটা যায় না। এবার সামনে যে নগরী পাব, সেখানেই থেকে যাব।

সুভদ্রা বলল, আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে!

সুরপতি ক্লান্তভাবে হেসে বলল, না। আমার কষ্টের জন্য নয়, আমি ভাবছি তোমাদের কথা। তোমার পায়ের সেই ক্ষত স্থানটা দেখি, যেখানে সেই কাঁটা ফুটেছিল?

সুভদ্রা তাড়াতাড়ি পা ঢেকে বলল, সেখানে আর ব্যথা বিষ নেই।

তবু আমি দেখব।

দেখার কিছু নেই। আপনার মুখ ধোওয়ার জন্য জল এনে দেব?

সে সব পরে হবে। আগে তোমার পা দেখাও আমাকে। এখানে কাছাকাছি কেউ নেই, এখানেও কি তোমার লজ্জা?

সুভদ্রা কিছুতেই দেখাতে চায় না, কিন্তু সুরপতি দারুণ জোরজুরি করতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত সুভদ্রা তার পায়ের পাতা স্বামীকে দেখাতে বাধ্য হল। তা-ও দূর থেকে।

সে-জায়গাটা দেখে শিউরে উঠল সুরপতি। পা-টা একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে। খানিকটা মাংস খুবলে গেছে। এই রকম পা নিয়ে হেঁটে আসছে সুভদ্রা, অথচ একবারও মুখ ফুটে কিছু বলবে না!

সুরপতি বলল, তুমি কী সুভদ্রা? তুমি কি মানুষ?

সুভদ্রা মৃদু গলায় বল, আপনি বেশি চিন্তিত হচ্ছেন। আমার তেমন ব্যথা বোধ হয় না।

সুরপতি চিন্তিত হয়ে পড়ল। বণিকদলেব মধ্যে বৈদ্য কেউ নেই। এ-রকম অবস্থা নিয়ে সুভদ্রার এক পা-ও চলা উচিত নয়। অথচ এই জঙ্গলে তারা একা একা থাকবেই-বা কী করে? থেকেও লাভ নেই, কোনও জনপদে নিয়ে গিয়ে সুভদ্রার চিকিৎসা কবানোর দরকার।

কাল যে করেই হোক সুভদ্রাকে একটা অশ্বপৃষ্ঠে চাপাতে হবে। যাতে যত অর্থব্যয় হয় হোক। সুভদ্রা অশ্বপৃষ্ঠে উঠতে চাইবে না, দারুণ আপত্তি করবে — সুরপতি জানে। কিন্তু দরকার হলে তাকে জোর করেও তুলে দিতে হবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুরপতি বলল, সুভদ্রা, আমারই ভাগ্যদোষে তুমি আর ধ্রুবকুমার এত কষ্ট পাচ্ছ। হা নিয়তি, তুমি আমাদের আর কোথায় নিয়ে যাবে?

সুভদ্রা ব্যাকুল হয়ে বলল, ও-কথা বলবেন না, ও-কথা বলবেন না! আমাদের তো কোনও কষ্ট নেই। বরং কী সুন্দর এই পদযাত্রা! কত নতুন নতুন দেশ দেখছি! সারা জীবনে এক জায়গায় থাকা তো কূপের ব্যাঙের মতো, তার চেয়ে কত সুন্দর এই জীবন!

সুরপতি বলল, তুমি জানো না সুভদ্রা, তোমার গায়ে যদি একটি আঁচড় লাগে, তবে তা আমারও বুকে বাজে। তোমার পায়ের ওই অবস্থা, অথচ আমি তা জানতেই পারিনি! আবার আমার চিন্তা হচ্ছে ধ্রুবকুমারের জন্য। ওইটুকু শিশু, তার কি দিনের পর দিন এই ধকল সহ্য হয়! এই রকম উন্মুক্ত আকাশের নিচে ঘুমোনো! যদি তার কোনও রকম গুরুতব পীড়া হয়। সে যে আমার চোখের মণি!

সুভদ্রা স্বামীর পায়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, দেখবেন আব দু'এক দিনের মধ্যেই নিশ্চয়ই আমরা কোনও পছন্দ মতো স্থান পৌঁছে যাব!

তাই যেন হয়।

সুরপতির মনে পড়ল, আসার পথে একটু আগেই সে কয়েকটা জবাফুলের গাছ দেখেছিল। জবাগাছের পাতার রসে ক্ষতস্থানের ব্যথা কমে।

সে লাফিয়ে উঠে বলল, রও, আমি আসছি!

পরিষ্কার জ্যোৎস্না উঠেছে। অরণ্যটিকে এখন মায়াময় মনে হয়। মানুষের কলগুঞ্জন আর ভারবাহী পশুগুলির জোরালো নিশ্বাসের শব্দ মিলে একটা ঐকতান তৈরি হয়েছে। এ পর্যন্ত কোনও হিংস্র জন্তুর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়নি। ভয়ের কিছু নেই।

চাঁদের আলোয় জবাগাছগুলি খুঁজে পেতে কোনও অসুবিধে হল না। বেশ কয়েকটি পাতা ছিঁড়ে হাতের তালুতে পিষে রস করতে করতে সুরপতি আবার ফিরে আসতে লাগল।

পিপুলগাছটির কাছাকাছি এসে দেখল ধনরাজ এগিয়ে যাচ্ছে সুভদ্রার দিকে। সুভদ্রাকে একা পেয়েছে বলেই ওই তস্করটা ওই দিকে ঝুঁকেছে। ক্রোধে সুরপতির আপাদমস্তক জ্বলে গেল। কাল প্রথমেই যে নগর পাবে, সেখানেই সে এদের সঙ্গ পরিত্যাগ করবে। ধনরাজকে সে আর সহ্য করতে পারছে না।

ধনরাজের কোলে শিশু ধ্রুবকুমার। সুরপতিকে দেখে সে বলল, ঘুমিয়ে পড়েছে এরই মধ্যে। আমাদের কাছে ও পেট ভরে খেয়ে নিয়েছে, সে-জন্য চিন্তা করবেন না।

ধনরাজ ধ্রুবকুমারকে সুরপতির কাছে না দিয়ে নামিয়ে দিল সুভদ্রার কোলে। সুভদ্রা ইতিমধ্যে ঘোমটা দিতে ভুলে গেছে। চাঁদের আলোয় মুখখানি এখন প্রস্ফুটিত কমলের মতো দেখায়। সেই মুখের দিকে ধনরাজ সতৃষ্ণ ভাবে তাকিয়ে রইল কয়েক পলক। তারপর আর কোনও কথা না বলে চলে গেল।

ধ্রুবকুমারকে কোলে নামিয়ে দেওয়ার ছলে পাপিষ্ঠটা নিশ্চয়ই সুভদ্রাকে ছুঁয়েছে। রাগে সুরপতি ফুঁসতে লাগল। সে এমনিতে শান্ত নিরীহ ধরনের মানুষ, লোকের সঙ্গে কলহ করতে তার প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু এখন ইচ্ছে হল, ছুটে গিয়ে ধনরাজের টুঁটি চেপে ধরে।

সুরপতি অতি কষ্টে রাগ দমন করল। তারপর মাটিতে বসে সুভদ্রার সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করে, প্রায় বলপ্রয়োগ করেই তার পায়ে থেঁতো করে লাগিয়ে দিল সেই জবাপাতা। তারপর একটা পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড নিয়ে বেঁধে দিল সেই পায়ে।

সুভদ্রার চোখে টল টল করছে জল। তার নির্মল মুখখানিতে ব্যথার চিহ্নমাত্র নেই। বরং চিক চিক করছে সুখ। ওই অশ্রুও সুখের।

ধ্রুবকুমারকে ভাল করে শুইয়ে দিয়ে ওরা স্বামী-স্ত্রীতে খুব সংক্ষেপে আহার করে নিল। চিড়ে, ক্ষীর এবং কলা তাদের সঙ্গেই থাকে। তা দিয়ে বেশ ভালভাবেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা মুখোমুখি বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর নিজেরাও শুয়ে পড়ল পুত্রকে মাঝখানে রেখে। অদূরে যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, তার আভা এসে পড়েছে ওদের মুখে। গাছের ঘন ডালপালার ফাঁকে একটু একটু আকাশ দেখা যায় মাথার ওপরে। মেঘ সরে গিয়ে জ্যোৎস্না উঠেছে বলে সবাই নিশ্চিন্ত।

খানিকক্ষণ দু'জনে মৃদু গলায় কথা বলে তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। স্বামী ও স্ত্রী — দু'জনেরই একটা করে হাত মধ্যবর্তী সন্তানের গায়ে। দু'দিক থেকে তারা ধ্রুবকুমারকে আগলে রেখেছে। মেঘভাঙা চন্দ্রালোক এসে পড়েছে তাদের মুখে।

সুরপতির ঘুম ভেঙে গেল কিছু একটা বিশ্রী শব্দে। ভারবাহী পশুগুলি হঠাৎ চ্যাচাতে শুরু করেছে। সে কনুইতে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দেখল, কারা যেন ঘোড়া আর খচ্চরগুলোর দড়ি খুলে দিয়ে দম্ দম্ করে তাদের লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে। সেগুলো দৌড়ে পালাচ্ছে এ-দিক ও-দিক। তার পরই বণিকদের মধ্যে আর্তনাদ পড়ে গেল।

সত্যি যে ডাকাত এসেছে তা বুঝতে একটুখানি সময় লাগল সুরপতির। কিন্তু অস্ত্রের ঝন ঝন আর মৃত্যুকাতর চিৎকার শুনে ঘোর ভাঙতে দেরি হল না। সে জায়গা বেছে নিয়েছিল মূল বণিকদলের থেকে একটু দূরে। সে দেখল, প্রায় তিরিশ জন দস্যু সব দিক থেকে তাদের ঘিরে ধরেছে। প্রহরীদের সঙ্গে যুদ্ধ চলছে তাদের, কিন্তু প্রহরীরা এক এক করে প্রাণ দিতে লাগল, বণিকরা চিৎকার করতে করতে পালাচ্ছে।

সুভদ্রাও জেগে উঠেছে। সুরপতি লাফিয়ে উঠে তার হাত ধরে টেনে বলল, পালাও। আমাদের এখনও দেখতে পায়নি।

মুদ্রাভরা পেটিকাটা সব সময় তার কোমরে বাঁধা থাকে, তাই সে অন্য কোনও জিনিসপত্র নেবার চেষ্টা করল না। ঘুমন্ত ধ্রবকুমারকে বুকে জড়িয়ে সে ছুটল।

বেশি দূর যেতে পারল না। সুভদ্রা বেশি জোর ছুটতে পারেনি। পারবেই-বা কী করে! ইতিমধ্যে তিন-চার জন দস্যু সুভদ্রাকে ঘিরে ফেলেছে। সুরপতি পেছনে তাকিয়ে শিউরে উঠে দেখল, একটি অতিকায় ভীম চেহারার দস্যু সুভদ্রার বুকের আঁচল ধরে টান দিয়েছে!

ধ্রুবকুমারকে সেইখানেই মাটিতে নামিয়ে রেখে সুরপতি আবার ফিরে এল। পাগলের মতো চিৎকার করতে লাগল, ছেড়ে দাও, ওর গায়ে হাত দেবে না!

নানা চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যে কেউ সুরপতির কথা শুনতে পেল না ঠিক মতো।

সর্দার বুধনাথ সিং-এর চেহারা প্রায় দৈত্যের মতো। যেমন সে লম্বা, তেমনি বিরাট তার মুখ। মুখ ভরতি দাড়ি গোঁফ, সেই জঙ্গলের মধ্যে জ্বল জ্বল করে তার দু'টি চোখ। অতিরিক্ত ভোগবিলাসের জন্য তার সারা গায়ে এখন চর্বি থল থল করছে। সে নিজে ধরে আছে সুভদ্রার হাত, অন্য দু'জন দস্যু সুভদ্রার বসন ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। সুভদ্রা চিৎকার করছে না, শুধু ছটফট করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে। সে ক্ষমতা তার নেই।

শয়তান! সুরপতি ছুটে গিয়ে বুধনাথের দাড়ি চেপে ধরল এক হাতে, অন্য হাতে ওর মুখে মারল একটা ঘুষি।

ছেড়ে দে, ছেড়ে দে ওকে!

বুধনাথ এক ঝটকা দিয়ে সুরপতিকে ঠেলে দিতে গেল। কিন্তু সুরপতি শক্ত করে তার দাড়ি চেপে ধরে আছে। তখন এক জন দস্যু লোহার ডাণ্ডা দিয়ে সুরপতির সেই হাতের ওপর মারল। সুরপতির হাত অবশ হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ বুধনাথ সুরপতির কোমর ধরে শূন্যে তুলে খেলনার মতো তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে।

সুরপতি গিয়ে পড়ল একটা পাথরের ওপর। সে স্পষ্ট বুঝতে পারল, তার মাথা ফেটে গেছে। রক্ত বেরুচ্ছে গল গল করে। কিন্তু সে এখন কিছুতেই জ্ঞান হারাতে চায় না।

বুধনাথ চেঁচিয়ে উঠল, এই আওরতকে আমার চাই।

এক জন বলল, সর্দার, একে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব?

বুধনাথ বলল, না না, আমি এক আওরাৎকে দু'বার চাই না। তোরা সরে যা, সরে যা!

আর এক জন বলল, সর্দার, তোমার হয়ে গেলে আমাকে দিয়ে দিও!

বুধনাথ হা-হা করে হেসে উঠল। সেই হাসির শব্দ সুরপতির কানে বাজল কামান গর্জনের মতো। সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল।

বুধনাথ ততক্ষণে সুভদ্রার অর্ধেক শরীর নগ্ন করে ফেলেছে। সুরপতির বিস্ফারিত চোখের ওপর স্থির দৃষ্টি ফেলল সুভদ্রা। তারপর এই প্রথম সে তীব্র গলায় চেঁচিয়ে উঠল, বিষ দাও! আমাকে বিষ দাও। এখনই!

সুভদ্রার গলায় একটা দারুণ আর্তি ছিল। সে স্বামীর কাছে অনুরোধ করছে, কোনওক্রমে তাকে বাঁচাতে। অন্তত বিষ দিয়ে বাঁচাতে।

সুরপতি দুর্বল বা কাপুরুষ নয়। কিন্তু সে নিরস্ত্র। এমনকী বিষও সঙ্গে নেই! একবার সে ভাবল ওদের বলবে, আমার যা টাকা-পয়সা আছে, সব নিয়ে তোমবা আমার স্ত্রীকে ছেড়ে দাও। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝল, এ প্রস্তাব দিয়ে কোনও লাভ নেই। তাহলে তারা টাকা-পয়সা তো নেবেই, তবু সুভদ্রাকে ছাড়বে না এবং তাকেও হত্যা করবে।

এই সময় কোথা থেকে তীরের মতো ছুঠে এল এক জন। তার হাতে খোলা তলোয়ার। সুরপতি দেখল, সেই লোকটা ধনরাজ।

ছেড়ে দে, ওকে ছেড়ে দে, কুক্কুর!

এই কথা বলতে বলতে সে বুধনাথের দিকে তলোয়ারের কোপ চালাল। ঠিক মতো লাগলে সেই কোপেই বুধনাথের মুণ্ডু খসে পড়ত ধড় থেকে। কিন্তু কোপটা লাগল বুধনাথের বাম বাহুতে। বাহুতে কবজ আঁটা আছে বলে তার তেমন লাগল না। বুধনাথ একটা পশুর মতো গর্জন করে নিজের তলোয়ার নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ধনরাজের দিকে। শুরু হল দু'জনের যুদ্ধ। সুরপতি আশা হল ধনরাজ ঠিক জিতবে। সে-ই রক্ষা করবে সুভদ্রার সম্মান।

কিন্তু দস্যুদলের কোনও নীতিবোধ নেই। ওদের দু'জনের যুদ্ধ চলার মধ্যেই আর এক জন দস্যু পেছন থেকে আক্রমণ করল ধনরাজকে। তার তলোয়ারের এক আঘাতে ধনরাজের মুণ্ডু শরীর থেকে ঝুলে পড়ল অনেকখানি। এক ঝলক রক্ত এসে লাগল সুরপতির গায়ে। তার বুকের মধ্যে হাহাকার উঠল। একটাও শব্দ উচ্চারণ না করে প্রাণ দিল ধনরাজ। তার শরীরটা ধপাস করে মাটিতে পড়ে কিছুক্ষণ ছটফট করে থেমে গেল।

সুরপতি ধনরাজের তলোয়ারটা কুড়িয়ে নিতে যাচ্ছিল, কিন্তু মুখ ঘুরিয়ে দেখল, সেখানে অন্তত সাত-আট জন দস্যু। সবাই সশস্ত্র। তারা সুরপতিকে লক্ষ্য করছে না, কিন্তু সুরপতি একবার রুখে দাঁড়ালেই তারা চারদিক থেকে ঘিরে তাকে কুচি কুচি করে কাটবে। সুরপতি এক মুহূর্ত দ্বিধা করল। মানুষের বেঁচে থাকার টান বড় প্রবল।

বুধনাথ ততক্ষণে আবার সুভদ্রাকে জাপটে ধরে শুইয়ে ফেলার চেষ্টা করছে।

বাবা! বাবা!

সুরপতি আবার চমকে উঠল। ধ্রুবকুমারের গলা। ধ্রুবকুমারকে সে একটু দূরে শুইয়ে রেখে এসেছিল। সে জেগে উঠেছে, গোলমাল শুনে এই দিকেই ছুটে আসছে।

সুরপতি সেই আহত অবস্থাতেও লাফিয়ে উঠল। সুভদ্রার দিকে আর না তাকিয়ে সে ছুটল উলটো দিকে। তার ছেলেকে বাঁচাতেই হবে। শুধু দস্যুদের হাত থেকেই নয়। ধ্রুবকুমার যেন কোন ক্রমেই তার মায়ের এই অপমানের দৃশ্য না দেখে। মাঝপথে ছেলেকে ছোঁ মেরে তুলে বুকে জড়িয়ে সুরপতি অন্ধের মতো ছুটল। মিলিয়ে গেল দূর বনের মধ্যে।

॥ ২॥

ছেলেকে বুকে জড়িয়ে কতক্ষণ ছুটেছিল জানে না। তার মাথা দিয়ে রক্ত ঝরছে, শরীর ক্রমশ অবসন্ন হয়ে আসছে, এক সময় সে ঝুপ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল। তারপর কী হয়েছে, তার মনে নেই।

যখন তার জ্ঞান ফিরল, তখন ভোর হয়ে গেছে। শরীর অত্যন্ত দুর্বল, তবু সে কোনও ক্রমে উঠে বসল। এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে খুঁজল ছেলেকে। প্রথমে দেখতে পেল না। তারপর চোখে পড়ল খানিকটা দূরে একটা শুকনো পাতার স্তূপের মধ্যে থেকে দু'টি কচি পা বেরিয়ে আছে। সুরপতি অজ্ঞান হয়ে পড়ার পরে কিছুক্ষণ ধ্রুবকুমার জ্যোৎস্নার আলোয় গাছের ডাল-পাতা নিয়ে খেলা করেছে। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছে এক সময়।

সুরপতি একটু একটু করে গত রাতের সব কথা মনে করার চেষ্টা করল। যেন পুরোটাই একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন। শেষ ছবিটা মনে পড়তেই তার মাথা ঝিম ঝিম করে উঠল, মনে হল আবার অজ্ঞান হয়ে পড়বে। ধনরাজ সুভদ্রাকে বাঁচাবার জন্য শুধু শুধু ছুটে এসে প্রাণ দিল। তার মুণ্ডুটা ঝুলে পড়েছিল, তার রক্ত এখন লেগে আছে সুরপতির গায়ে। সুভদ্রা কোথায়?

ছেলেকে তক্ষুনি না জাগিয়ে সুরপতি উবু হয়ে বসে আঁ আঁ করে কিছুক্ষণ কাঁদল। খানিকটা কেঁদে না নিলে তার শরীর হালকা হবে না, সে উঠে দাঁড়াতে পারবে না।

এক জোড়া কাঠবিড়ালি সামনের গাছটায় বারকয়েক ওঠা-নামা করছিল, তারা সুরপতির কান্না শুনে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। এক ঝাঁক ছাতারে পাখি গাছের ডালে বসে খুব গোলমাল করছিল, তারাও চুপ করে গেল ওই কান্নায়।

খানিকটা বাদে সুরপতি চুপ করল। বুকের মধ্যে দমবন্ধ ভাবটা একটু কেটেছে। হাত দিয়ে সে মাথার ক্ষতস্থানটা অনুভব করল। অনেকখানি খোদল মতো হয়ে আছে। জমাট বেঁধে আছে রক্ত।

পরনের কাপড় থেকে খানিকটা ছিঁড়ে সুরপতির মাথার ক্ষতস্থানে একটা ফেট্টি বাঁধল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। পা দুটো খুবই দুর্বল, তবু হাঁটতে পারবে কোনও ক্রমে।

শুকনো পাতা সরিয়ে সে ছেলেকে জাগাল।

চোখ মেলেই ধ্রুবকুমার জিজ্ঞেস করল, মা কোথায়?

সুরপতির চোখে জল এসে যাচ্ছিল। কোনও ক্রমে নিজেকে সামলাল। ধরা গলায় বলল, চলো বাবা, আমরা মাকে খুঁজতে যাই।

মা কোথায় গেছে?

মাকে ডাকাতরা ধরে নিয়ে গেছে।

কেন?

ডাকাতরা যে খুব পাজি হয়!

বাবা, তুমি ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করোনি?

করেছিলাম তো। কিন্তু তারা যে সংখ্যায় অনেক। আমি পারিনি।

আমি ডাকাতদের মারব!

ছেলের হাত ধরে সুরপতি টলতে টলতে হাঁটতে লাগল। পথ খুঁজে পাবার কোনও অসুবিধে নেই। তার মাথা থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়েছে মাটিতে, তাই দেখে পথ বেশ চেনা যায়।

এক সময় তারা কাল রাত্রির ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছল। যেন ছোটখাটো একটা যুদ্ধের দৃশ্য। বণিকরা অনেকেই পালিয়েছে, মরেছেও প্রায় সাত-আট জন। তাদের মধ্যে পূর্ণানন্দকে চেনা যায়। পূর্ণানন্দ মারা গেছেন বসে থাকা অবস্থায়। একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে তাঁর মৃতদেহটা সেই ভাবেই রয়েছে। পাশেই একটা ঘোড়ার মৃতদেহ বীভৎস ভাবে পা উলটিয়ে পড়ে আছে।

নিজের জায়গায় এসে সুরপতি দেখল ধনরাজের দেহটা। মুণ্ডুটা একপাশে ঝুলছে, বেরিয়ে আছে গলার নালি। এর মধ্যেই তার মুখের ওপর মাছি ভন ভন করছে।

ধনরাজকে দেখে সুরপতির চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। এই ধনরাজের ওপর সে কত রাগ করেছিল! ধনরাজ তো অনায়াসেই পালিয়ে বাঁচতে পারত। কিন্তু এই যুবা বয়েসে সে প্রাণ দিল এক জন প্রায় অচেনা নারীর প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টায়। এই মহৎপ্রাণের উদ্দেশে মনে মনে প্রণাম জানাল সুরপতি।

এই সব ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে ধ্রুবকুমার একেবারে থ হয়ে গেছে। তার মুখে দিয়ে আর কথা সরছে না।

কাল রাতে শেষ যেখানে সুভদ্রাকে দেখে গিয়েছিল সুরপতি, সুভদ্রা এখন সেখানে নেই। ডাকাতরা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে? তাহলে তক্ষুনি তক্ষুনি তার ওপর অত্যাচার করার চেষ্টা করছিল কেন?

বুধনাথ যে বলেছিল, এক আওরতকে সে দু'বার চায় না! কিন্তু তার দলের লোকরা চাইতে পারে। কোথায় গেল সুভদ্রা? সুভদ্রাকে খুঁজে পেতেই হবে। সুভদ্রাকে ছাড়া সুরপতি বাঁচবে না। শিশু ধ্রুবকুমারকেই-বা সে বাঁচাবে কী করে?

একটু খুঁজতেই সুভদ্রাকে পাওয়া গেল একটা ঝোপের পাশে। এক নজর দেখেই মনে হয় প্রাণ নেই। তার শরীরে একটুকরো বস্ত্র নেই, বিভিন্ন জায়গায় ছোপ ছোপ রক্ত, গাল ও বুকে নখ দিয়ে চেরার দাগ। যেন অনেকগুলো নরপশু তাকে আঁচড়ে খুবলে খেয়েছে। সুভদ্রাকে দেখে সুরপতির কান্না এল না, তার গলা শুকিয়ে গেল।

'মা!' বলে চিৎকার করে ধ্রুবকুমার ছুটে গেল সুভদ্রার দিকে। জননীকে নগ্ন অবস্থায় দেখে বালকের বিকার হয় না, তবু সুরপতি অল্প দূরে পড়ে থাকা সুভদ্রার শাড়িটা কুড়িয়ে এনে তার শরীরটা ঢেকে দিল।

সুভদ্রাকে একটু স্পর্শ করতেই সুরপতির মনে হল, তার দেহে এখন একটু একটু উত্তাপ আছে। তাড়াতাড়ি সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সুভদ্রার নাকের কাছে হাত রাখল। খুব ক্ষীণ নিশ্বাস টের পাওয়া যায়।

সুরপতি ব্যাকুল ভাবে ডেকে উঠল, সুভদ্রা, সুভদ্রা!

ধ্রুবকুমার ডাকল, মা! মা!

সুভদ্রা সাড়া দিতে পারে না।

সুরপতি তখন দৌড়ে গেল ঝরনার কাছে। নিজের গায়ের জামাটা খুলে জবজবে করে ভিজিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এল। সেই জামা চিপড়ে জল ছড়াল সুভদ্রার চোখে-মুখে।

সুভদ্রার তবু জ্ঞান এল না।

দস্যুরা পিতল-কাঁসার ভাণ্ডগুলো নেয়নি। সে-রকম কয়েকটা ছড়িয়ে আছে এ-দিক ও-দিকে। তার মধ্যে থেকে একটা বড় ভাণ্ড বেছে নিয়ে সুরপতি অনেকখানি জল নিয়ে এল আবার। সুভদ্রার ক্ষতস্থান মুছে দিতে লাগল। তার ঠোঁট ফাঁক করে ফোঁটা ফোঁটা জল দিতে লাগল মুখে। তবু সুভদ্রা চোখ মেলে না।

সুভদ্রার প্রাণ এখনও যে আছে তা নিশ্চিত, কিন্তু কোনও এক কঠিন আঘাতের ফলে তার জ্ঞান কিছুতেই ফিরে আসছে না। চিকিৎসার জন্য তাকে এখনই কোনও বৈদ্যের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু কী করে নিয়ে যাবে? সুরপতি অসহায়। তার নিজের শরীর দুর্বল। সামনে আর কতটা পথ পার হলে একটা নগর মিলবে তার ঠিক নেই। এখন উপায় কী?

দারুণ নৈরাশ্যের জন্যই সুরপতির মনে আরও কয়েকটা বিশ্রী কথা জাগল। সুভদ্রা তার কাছে বিষ চেয়েছিল, কোনও ক্রমে তাকে বিষ দিতে পারলেই বোধহয় অনেক ভাল ছিল। তাহলে এ গ্লানি তাকে সইতে হত না। এখন সুভদ্রাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও বোধহয় কোনও লাভ হবে না, পৌঁছবার আগেই মারা যাবে। তাছাড়া সুভদ্রাকে বাঁচিয়ে তুলেই-বা লাভ কী? দেখে মনে হয়, অন্তত চার-পাঁচটি পশু তার ওপর অত্যাচার করেছে। এরপর আর কোনও বর্ণহিন্দু নারীর সমাজে স্থান হয় না। সমাজ তাকে চাপ দেবে সুভদ্রাকে পরিত্যাগ করার জন্য।

তার বদলে আর এক কাজ করলে হয় না? সেটাই সব চেয়ে সহজ। জীবনের এতগুলি বিড়ম্বনা সুরপতি আর সহ্য করতে পারছে না। তার পক্ষেও এখন আত্মঘাতী হওয়া ভাল। সে নিজেও এখানে সুভদ্রার পাশাপাশি শুয়ে থেকে প্রাণ বিসর্জন দিক। একটা অস্ত্রের খোঁজে সুরপতি এ-দিক ও-দিক তাকাল।

ধনরাজের তলোয়ারটা তার পাশেই পড়ে ছিল। সেটা তুলে নিয়ে এল সুরপতি। এই অস্ত্রের এক কোপে সে সুভদ্রার প্রাণ এখনই শেষ করে দিক, তারপর নিজের গলাটাও কেটে ফেলবে।

সুভদ্রা চোখ বন্ধ করে আছে, কিন্তু ক্ষীণ নিশ্বাসে তার বুক সামান্য দুলছে, তাতেই প্রাণের লক্ষণ বোঝা যায়। এমন সোনার প্রতিমা, তার আর বেঁচে থাকার অধিকার রইল না। সুরপতি তলোয়ারটা উঁচু করে ধরল, তার হাত কাঁপছে, তার শরীর খুবই দুর্বল, তবু এক কোপে শেষ করে দিতে হবে। যেন আর জ্ঞান না ফেরে সুভদ্রার। তারপর নিজের গলাটাও এক কোপে...।

হঠাৎ ধ্রুবকুমারের দিকে তার চোখ পড়ল। তাহলে ধ্রুবকুমারের কী হবে? এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে একা একা ওই শিশুটি কোথায় যাবে?

পরক্ষণেই সুরপতির মন দারুণ অনুতাপে ভরে গেল। ছি ছি, এ-সব সে কী কথা ভাবছিল? তার প্রাণের চেয়েও প্রিয় এই সুভদ্রা, তাকে সে বাঁচাবার চেষ্টা করবে না? যতক্ষণ তার দেহে এক বিন্দু রক্ত আছে, ততক্ষণ সে সুভদ্রাকে মরতে দিতে পারে? একটা কুকুর যদি সুভদ্রাকে হঠাৎ কামড়াত, তাহলে কী সে সুভদ্রাকে পরিত্যাগ করার কথা চিন্তা করতে পারত? তাহলে ক'টা মানুষ-পশু তাকে কামড়েছে বলেই-বা কেন সে সুভদ্রাকে পরিত্যাগ করবে? আর সমাজ? সমাজ তাকে কী দিয়েছে? সে যখন বিপদে পড়েছিল, বিষয়-সম্পত্তি সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তখন কি এই সমাজ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তার দিকে? সমাজ কিছুই দেয় না, শুধু শাসন করার জন্য মুখিয়ে থাকে। সে আর কোনও দিন তার পুরনো সমাজে ফিরে যাবে না। সে বসতি নেবে নতুন এক দেশে, যেখানে কেউ তাকে চিনবে না, কেউ তাদের পূর্বপরিচয় জানবে না। সেখানে নতুন ভাবে জীবন শুরু হবে।

সুরপতি সুভদ্রাকে তুলে নিল নিজের কাঁধে। তাবপব বলল, বাছা ধ্রুব, তুই নিজে হেঁটে যেতে পারবি তো?

বিপদের সময় শিশুরাও অনেক কর্মক্ষম হয়ে যায়। গত কাল পর্যন্ত খানিক দূর হাঁটার পরই ধ্রুবকুমার কারুর না-কারুর কোলে চড়ত, আজ সে একবারও সে-কথা বলল না। দিব্যি হেঁটে যেতে লাগল সামনে সামনে।

সুরপতিই পারছে না। ঘুমন্ত বা অজ্ঞান মানুষের দেহ যেন বেশি ভারি হয়ে যায়। সুরপতির নিজের শরীরও খুব দুর্বল। চাপ লাগতেই তার মাথা দিয়ে আবার রক্ত বেরুচ্ছে। কয়েক পা গিয়েই সে হাঁপিয়ে পড়ছে খুব। সুভদ্রাকে নামিয়ে দিয়ে জোরে জোরে শ্বাস টানছে আর ব্যগ্রভাবে পরীক্ষা করে দেখছে, সুভদ্রার তখনও শ্বাস আছে কি না।

এই রকম ভাবেই কয়েক দণ্ড চলার পর দূরে একটা গ্রামের আভাস দেখা গেল। এতক্ষণে সুরপতি প্রায় ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল, গ্রামটা দেখতে পেয়ে আবার তার শরীরে রক্তসঞ্চার হল। গ্রাম মানেই বিশ্রাম, খাদ্য, সুভদ্রার জন্য চিকিৎসা।

গ্রামটি খুবই ছোট। কয়েক ঘর মাত্র কৈবর্তের বাস। কোনও চিকিৎসক এখানে নেই। তবে এক বৃদ্ধা জড়িবুটির টোটকা দেয় গ্রামবাসীদের। তাকে খুঁজে বার করা হল।

গ্রামের অনেক পুরুষ ডাকাতির খবর শুনে হই-হই করে ছুটে গেল বনের দিকে। এরা সবাই বুধনাথ সিংকে চেনে। তাকে চটাবার সাহস এদের নেই। এরা ছুটে গেল, মৃতদের যা কিছু জিনিসপত্র এখনও ছড়ানো ছেটানো রয়েছে, সেগুলো সংগ্রহ করতে। ডাকাতরা তো সব নেয় না।

এক কৈবর্তের বাড়ি থেকে দুধ, মুড়ি আর কলা সংগ্রহ করে সুরপতি ছেলেকে আগে খাওয়াল, নিজেও কিছু খেতে গেল, কিন্তু পারল না। কিছু মুখে দিলেই বমি হয়ে যাচ্ছে। মাথায় অসহ্য ব্যথা, মনে হচ্ছে সুরপতি যে-কোনও মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে যাবে। কিন্তু অসম্ভব মনের জোরে তাকে চোখ মেলে থাকতে হচ্ছে। এই সময় তার অসুস্থ হয়ে পড়লে চলবে না। বালক ধ্রুবকুমার তাহলে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়বে। সুরপতি ধ্রুবকুমারকে নিজের কোলের কাছে বসিয়ে রাখল। সুভদ্রার ওপর ততক্ষণ বৃদ্ধার চিকিৎসা চলছে।

বৃদ্ধা একটা কী যেন গাছের শিকড়ে তখন আগুন জ্বালিয়েছে। তার থেকে অত্যন্ত দুর্গন্ধময় ধোঁয়া বেরুচ্ছে। সেই জ্বলন্ত শিকড়টা সুভদ্রার নাকের কাছে ধরে বুড়ি বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়তে লাগল। অনেকক্ষণ সেই রকম চলল। তারপর ভার ভার জল এনে ঢালা হতে লাগল তার গায়ে। আবার সেই দুর্গন্ধ শিকড়ের ধোঁয়া। এই রকম চলল।

এক সময় সুভদ্রার শরীরে স্পন্দন দেখা দিল, তারপর আস্তে আস্তে চোখ মেলল।

আনন্দে বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল সুরপতির। তাহলে আর চিন্তা নেই। সুভদ্রা বেঁচে উঠেছে। তার প্রাণের পুত্তলি সুভদ্রা না বাঁচলে সে নিজেই-বা বেঁচে থাকত কী করে? গত রাত্রির দুঃস্বপ্ন এক সময় মিথ্যে হয়ে যাবে। আবার তারা সুখের সংসার পাতবে।

কিন্তু সুভদ্রা কোনও কথা বলল না।

সুরপতি বার বার ডাকতে লাগল, সুভদ্রা! সুভদ্রা!

ধ্রুবকুমার ডাকল, মা, মা!

সুভদ্রা কোনও সাড়া দিল না। সে শুধু এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে।

ধ্রুবকুমারকে বসিয়ে দেওয়া হল সুভদ্রার কোলে। তখন তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। কিন্তু কথা বলতে পারলো না। যেন তার বাক্যহরণ হয়ে গেছে।

আরও কিছুক্ষণ চিকিৎসা চলল, তাকে কথা বলাবার জন্য। কিছুতেই কিছু হল না। তাকে গরম দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করা হল। সুভদ্রা খেতে চায় না। জোর করে তার মুখে দুধ ঢেলে দিলেও মুখের কষ বেয়ে দুধ নেমে আসে। শুধু অবিরল ঝরছে তার চোখের জল।

বুড়ি দেয়াসিনী বলল, এর বেশি চিকিৎসা করার সাধ্য তার নেই। তবে আর কিছু পথ গেলেই অন্য রাজ্য। সেই রাজ্যে দারুকেশ্বর নামে এক বড় নগর আছে। সেই নগরের রাজবৈদ্য বাসবদত্ত একেবারে ধন্বন্তরি। তাঁর কাছে গেলে আর কোনও চিন্তা থাকবে না।

দারুকেশ্বর নামটা শুনে সুরপতির বুকের মধ্যে আবার শির শির করে উঠল। ধনরাজ চেয়েছিল তাদের ওই নগরে নিয়ে যেতে। তখন সুরপতি মনে মনে রাজি হয়নি। এখন তাকে ওই জায়গাতেই যেতে হবে, কিন্তু ধনরাজ থাকবে না। আহা!

দারুকেশ্বর পায়ে হেঁটে গেলে এখন দেড় দিনের পথ। তবে গোরুর গাড়িতে গেলে আরও একটু তাড়াতাড়ি হতে পারে।

সুরপতির কোমরে বাঁধা টাকার বটুয়াটা ঠিকই আছে। দস্যুরা সুভদ্রার মতো রত্নকে পেয়ে আর সুরপতির অন্য ধনরত্নের কথা চিন্তা করেনি। এই শেষ সম্বল চলে গেলে সুরপতির আর কিছুই করার থাকত না।

এক কৈবর্তের কাছ থেকে সুরপতি একটি গো-শকট ভাড়া করল। তাতে খড় বেছানো হল খুব পুরু করে। তারপর কিছু চিঁড়ে আর কলা রসদ হিসেবে নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ল।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়, তারপর সন্ধ্যা আসে। সুভদ্রা ঠায় বসে থাকে বাইরের দিকে চেয়ে। একটি শব্দ উচ্চারণ করে না। সুরপতি কিংবা ধ্রুবকুমার তাকে বার বার কিছু প্রশ্ন করতে গেলেই সে অমনি চোখের জল ফেলে। তখন সুরপতি বলে, থাক থাক।

সুভদ্রার অপরূপ কণ্ঠস্বর সুরপতির কানে সুধা বর্ষণ করত। সুভদ্রার সামনে বসে থেকেও সুরপতি তা শুনতে পাচ্ছে না বলে তার কষ্ট হচ্ছে খুবই। তবু সে মনকে বোঝাচ্ছে যে, সুভদ্রা কথা বলতে পারুক বা না-পারুক, তাতে কিছু যায় আসে না। সে যে বেঁচে আছে, এই তো যথেষ্ট!

মায়ের কাছ থেকে কথার উত্তর না পেয়ে অবুঝ ধ্রুবকুমার এক সময় ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। এখন সে ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। ওইটুকু ছেলের ওপর দিয়ে এই ক'দিনেই কত রকম চাপ যাচ্ছে। তার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বড্ড মায়া হয় সুরপতির। পৃথিবীতে কোনও শিশুর কষ্ট পাওয়ার মতো করুণ দৃশ্য আর নেই। সুরপতি ধ্রুবকুমারের মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আদর করে। তারপর ফিস ফিস করে বলে, সুভদ্রা, তোমার কথা বলার দরকার নেই। তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ তো? আমরা

দারুকেশ্বরেই থাকব, আর কোথাও যাব না। আমাদের নতুন বাড়ি হবে, আমাদের আবার সাজানো সংসার হবে।

সুভদ্রা মুখটাও ফেরায় না। বাইরের দিকে ও তাকিয়ে থাকে।

সুরপতি একবার সুভদ্রাকে ধরে দারুণ জোরে ঝাঁকুনি দিল। যদি তাতে সুভদ্রার ঘোর ভাঙে। কিন্তু তাতে ফল হল উলটো। সুভদ্রার চোখ দু'টি বিস্ফারিত হয়ে গেল, ঠোঁট দিয়ে ফেনা গড়াতে লাগল, তারপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল ধপ করে। ভয়ে বুক কেঁপে উঠল সুরপতির। এ আবার কী নতুন রকম সঙ্কট! তাড়াতাড়ি গো-শকট থামিয়ে সে পথের পাশের এক ইঁদারা থেকে জল এনে ঢালতে লাগল সুভদ্রার মাথায়। তবু সুভদ্রার জ্ঞান ফেরে না। তাহলে কি সুভদ্রা মরেই গেল? এ-কথা ভাবলেই সুরপতির মাথা ঝিম ঝিম করে। সেই বৃদ্ধা দেয়াসিনীর দেওয়া কয়েক টুকরো শিকড় ছিল সুরপতির কাছে। সেগুলি পুড়িয়ে তার কটু গন্ধময় ধোঁয়া সুভদ্রার নাকে দিতে লাগল সুরপতি। অনেকক্ষণ বাদে সুভদ্রার চোখের একটা পাতা পড়ল।

বেঁচে আছে, সুভদ্রা বেঁচে আছে! সুরপতি আনন্দে কেঁপে উঠল আবার। সুভদ্রার পিঠে হাত রেখে সুরপতি বলল, তুমি ঘুমোও। তোমাকে আর কথা বলাবার চেষ্টা করব না। তুমি শুধু বেঁচে থাকো, সেই আমার যথেষ্ট।

একটু পরে, সুভদ্রা ঘুমিয়ে পড়েছে, সুরপতি ঠায় বসে আছে। নিজের মাথার যন্ত্রণায় তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। এই যন্ত্রণার কথা সে কারুর কাছে বলতে পারবে না। সুভদ্রা এখনও জানে না যে, সুরপতি কতখানি আহত! একা একা এতখানি কষ্ট সহ্য করা যেন আরও শক্ত।

ধ্রুবকুমারের পাশে সুরপতিও ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ এক সময় তার ঘুম ভেঙে গেল। তার পায়ের ওপর যেন কার হাতের স্পর্শ। চোখ মেলে দেখল, ঠিক অন্যান্য রাতের মতো, সুভদ্রা তার পা টিপে দিচ্ছে। সুভদ্রার চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে তার পায়ে।

তাহলে তো সুভদ্রার বোধ আছে! তার স্মৃতিও আছে! সুরপতি ধড়মড় করে উঠে বসে আবেগের সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, সুভদ্রা! সুভদ্রা! তুমি যে আমার কতখানি, তা জানো না।

সুভদ্রাকে সে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।

দারুকেশ্বর তারা পৌঁছল মধ্যরাত্রির কাছাকাছি। নগরে ঠিক ঢোকার মুখেই একটা বেশ বড় সরাইখানা। তখন সেখানে বাতি জ্বলছে।

সুরপতি ঠিক করল, রাতের মতো সেখানেই আশ্রয় নেওয়া বিধেয় হবে। এত রাত্রে তো আর রাজবৈদ্যকে তোলা যাবে না। তাছাড়া সুভদ্রা তো এখন অনেকটা ভালই আছে। তার কথা বলার চিকিৎসা কাল করালেও হবে।

গোরুর গাড়ির চালককে সে সেখানেই থামতে বলল। তারপর নেমে হাঁক-ডাক করতে একটি মাঝবয়সী লম্বা মতো লোক বেরিয়ে এসে বলল, কী চাই? আমার এখানে জায়গা নেই। পথ দেখো।

সুরপতি চিন্তায় পড়ল। তাহলে কোথায় যাওয়া যায়?

সে জিজ্ঞাসা করল, মহাশয়, কাছাকাছি কি আর কোথাও কোনও চটি বা সরাইখানা আছে?

লোকটি বলল, দারুকেশ্বরের দু'প্রান্তে দু'টি সরাইখানা। অন্যটা এখান থেকে তিন ক্রোশ হবে। নগরের মধ্যে ধর্মশালা আছে দু'তিনটি। তবে এখন রাসের মেলা চলছে, ধর্মশালায় স্থান সঙ্কুলান হবে কি না সন্দেহ। লোকে তো বিনা পয়সার জায়গাতেই আগে যায়।

সুরপতি বলল, আমার সঙ্গে অসুস্থ স্ত্রী ও শিশুপুত্র রয়েছে। আপনার এখানে কি কোনও ক্রমেই আশ্রয় পাওয়া যাবে না?

সরাইখানার মালিকের দশাসই চেহারা। দুই কানে দু'টি কুণ্ডল। চোখ দু'টি রক্তবর্ণ। বোঝাই যায়, লোকটি সন্ধ্যাকাল থেকেই সুরাপান করছে। লোকটির মুখখানিতে কিন্তু ক্রুরতার চিন্তা নেই, বরং খানিকটা যেন শিশুসুলভ ভাব।

এত রাত্রেও সরাইখানার বিভিন্ন কক্ষ থেকে হাসি এবং গানের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তার সঙ্গে মিশে আছে স্ত্রীলোকের কণ্ঠ। জায়গাটা বোধহয় ভাল না। অন্য জায়গায় চলে গেলে হত। কিন্তু এত রাত্রে আর কোথায়ই-বা যাবে! নগরের অন্য প্রান্তে আর একটি সরাইখানা আছে, যদি সেখানে গিয়েও স্থান না পাওয়া যায়? সুরপতি নিজেই যে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না!

সে বিনীত ভাবে বলল, মহাশয়, যদি কিছু বেশি অর্থ দিলেও একটা কক্ষ পাওয়া যায়, অন্তত আজকের রাতটার মতো...।

বলভদ্র হুঙ্কার দিয়ে বলল, কী? আমার নাম বলভদ্র, আমাকে কেউ অর্থের প্রলোভন দেখায় না! সৈনিক পুরুষরা আমার সব ক'টা ঘর জুড়ে আছে, আপনি অন্যত্র চেষ্টা দেখুন।

সুরপতি বলল, আমি বড় বিপদে পড়েছি আমার স্ত্রী খুব অসুস্থ।

লোকটি কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে সুভদ্রার মুখের দিকে তাকাল। তার মুখে এখন অবগুণ্ঠন নেই। এক দৃষ্টে সুভদ্রাকে কিছুক্ষণ দেখে সে অস্ফুট ভাবে বলল, যেন সাক্ষাৎ দেবীপ্রতিমা!

তারপর সুরপতির দিকে ফিরে সে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল। হাসতেই থাকল। সুরপতি এ হাসির মর্ম বুঝল না।

লোকটি হাসি শেষ করে বলল, আরে বংশীলাল! তুমি আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না, যতই ছদ্মবেশ ধরো আর যাই করো!

সরাইখানার মালিক সুরপতির কানের কাছে মুখে এনে বলল, তুমি পালাও! এ দেশ ছেড়ে শীগগির পালাও! তোমার কুকীর্তির কথা সবাই জেনে ফেলেছে!

সুরপতি বলল, আপনি এ-সব কী বলছেন? আমি কোন কুকীর্তি করেছি? আমি শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত।

শ্রেষ্ঠী বিনয় পালের স্ত্রীর সঙ্গে তোমার গুপ্ত আশনাইয়ের কথা জানাজানি হয়ে গেলে প্রহরীরা তোমাকে ধরতে পারলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। আবার এ কার সুন্দর স্ত্রী হরণ করে এনেছ? বংশীলাল, ভাল কথা বলছি, শীগগির পালাও!

আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি বংশীলাল নই। শ্রেষ্ঠী বিনয় পালকে আমি চিনি না। আপনি আমার সম্পর্কে এ-রকম অসমীচীন কথা বলছেন কেন? আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী ও পুত্র।

তুমি বংশীলাল নও! আমি নিজের চোখকে অবিশ্বাস করব? তুমি ভেবেছ, তুমি মাথায় একটা ফেট্টি বেঁধেছ বলেই লোকে তোমাকে চিনতে পারবে না? এই রমণী তোমার স্ত্রী? বংশীলাল সাতজন্মে বিয়ে করেনি। বেশ তো, এই রমণী নিজের মুখে বলুক, তুমি এর স্বামী!

সুরপতি প্রমাদ গুনল। সুভদ্রা যে কথা বলতে পারছে না, সে-কথা কি সরাইখানার মালিক বিশ্বাস করবে? সুভদ্রা তো সব শুনতে পাচ্ছে, সে এই বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করবে না?

সে ব্যাকুল ভাবে বলল, সুভদ্রা, একটা কথা বলো! এই লোকটিকে বলে দাও, আমি বংশীলাল নই! আমি তোমার স্বামী!

সুভদ্রা নির্বাক।

সরাইখানার মালিক হা-হা করে হাসতে লাগল। তারপর বলল, এ-সব চালাকি আবার কবে থেকে শুরু করেছ? সন্তান সমেত এই রমণীকে বার করে এনে কার ঘরের সর্বনাশ করেছ? তুমি তো আগে গোপনেই কাজ সারতে, এখন একেবারে প্রকাশ্যে? ওহে বংশীলাল, তোমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, এই নগর থেকে ভাগো।

বংশীলাল কে?

তুমিই বংশীলাল, তুমি নিজেই জানো তুমি কে।

সুরপতি এগিয়ে গিয়ে সুভদ্রার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলতে লাগল, বলো বলো সুভদ্রা, একবার অন্তত বলো।

সেই গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল বালক ধ্রুবকুমারের। সুরপতির ও-রকম ব্যাকুল চিৎকার শুনে সে ভয় পেয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে সে সুরপতিকে জড়িয়ে ধরে ডাকল, বাবা, বাবা! মা'র কী হয়েছে? মা কথা বলছে না কেন?

বলভদ্র বলল, বাবাঃ! এই শিশুটিকেও বাবা ডাকতে শিখিয়েছ? তোমার আবার সন্তান হল কবে? তুমি তো বাপু ও-সব ঝামেলায় কখনও যাও না! তুমি তো ভ্রমরের মতো ফুলে ফুলে শুধু মধু খাও। বিবাহিতা নারীদের প্রতিই তোমার বেশি লোভ।

সুরপতি এবার কঠোর ভাবে বলল, সাবধান! আপনি সংযত হয়ে কথা বলুন! ঠিক আছে, আপনি আশ্রয় দেবেন না, আমরা চলে যাচ্ছি।

হাসি থামিয়ে সরাইখানার মালিক বক্রচোখে পর্যায়ক্রমে তাকাতে লাগল সুরপতিআর সুভদ্রার দিকে। তারপর সুরপতির কাঁধে চাপড় মেরে বলল, তুমি সত্যিই বংশীলাল নও। তাহলে আপনি কে?

আমার নাম সুরপতি, নিবাস ছিল সপ্তগ্রামে। স্ত্রী ও পুত্র নিয়ে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়েছিলাম, পথে দুর্বৃত্তের আক্রমণে আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

লোকটি বলল, আমার নাম বলভদ্র। বিপদগ্রস্ত মানুষকে আমি কখনও ফেরাই না।

সরাইখানার পিছনে একটি ছোট্ট ঘর, তৈজসপত্রে ঠাসা। সেগুলি বার করে নিয়ে সেখানেই স্থান দেওয়া হল সুরপতিদের। খড়ের ওপর কম্বল পেতে বানানো হল শয্যা। আপাতত তাই যথেষ্ট।

সুভদ্রা ও ধ্রুবকুমারকে সেই ঘরে বসিয়ে রেখে আবার বাইরে বেরিয়ে এল সুরপতি।

সরাইখানার মালিক বলভদ্র তখন বাইরের অলিন্দে বসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গান শুরু করেছে। হাতে একটি সুরাপাত্র।

সুরপতি তার পাশে দাঁড়িয়ে একটি গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর শেষ হতেই বিনীতি ভাবে বলল, আপনি আমাকে একটু সাহায্য করবেন? রাজবৈদ্য বাসবদত্তের গৃহে কোন দিক দিয়ে যেতে হবে, একটু দেখিয়ে দেবেন?

বলভদ্র বলল, কেন, সেখানে গিয়ে কী হবে?

আমার স্ত্রী অসুস্থ। ডাকাতের অত্যাচারে ভয় পেয়ে তার কণ্ঠরোধ হয়ে গেছে। শুনেছি বাসবদত্ত ধন্বন্তরি।

এত রাতের বাসবদত্তকে ডাকতে যাওয়া! হা-হা-হো-হো হি-হি।

কেন, তিনি আসবেন না? যদি যথেষ্ট দক্ষিণা দিই?

আপনি কিছুই জানেন না দেখছি। বাসবদত্ত এক জন বিখ্যাত সুরাপায়ী। সন্ধ্যার পর তাকে আর কেউ ডাকতে সাহস করে না। দেখুন গিয়ে তিনি হয়তো এখন উলঙ্গ হয়ে নৃত্য করছেন কিংবা মাটিতে গড়াগাড়ি দিয়ে গর্দভ-রাগিণীতে গলা সাধছেন।

কী সর্বনাশ! স্বয়ং রাজার যদি রাত্তিরবেলা কোনও ব্যাধি হয়, তাহলে কী হবে?

তিনি বিনা চিকিৎসায় মারা যাবেন, আর কী হবে!

তাহলে এ-রকম সুরাপায়ীকে রাজবৈদ্য রাখা হয়েছে কেন?

তার কারণ দিনেরবেলা স্বয়ং যমরাজও ওঁর কাছে আসতে সাহস পাবেন না। আমাদের এই দারুকেশ্বরে দিনেরবেলা একটাও লোক মরেনি কোনও দিন।

এমন কথা শুনিনি কক্ষনও।

দারুকেশ্বরে অনেক কিছুই নতুন দেখবেন। এক পাত্র সুরা পান করবেন নাকি?

না!

একটু চিন্তা করে সুরপতি আবার জিজ্ঞাসা করল, অন্য কোনও চিকিৎসক ডাকা যায় না?

সন্ধ্যার পর দারুকেশ্বরে কেউ চিকিৎসক ডাকে না। সবাই দারু পান করে। আপনি কিছুই জানেন না দেখছি। আপনাদের সপ্তগ্রামে কী নিয়ম?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুরপতি বলল, সপ্তগ্রামে দিনেরবেলাতেও মানুষ মরে।

কাল সকালে বাসবদত্তকে পাবেন। চিন্তা করছেন কেন, বাসবদত্তকে দেখলেই সব রোগ ভয় পেয়ে মানুষের শরীর ছেড়ে পালায়।

হাত মুখ ধুয়ে, সামান্য কিছু খাবার খেয়ে সুরপতি সুভদ্রার পাশে শুয়ে পড়ল। সুভদ্রাকে কথা বলাবার অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু সুভদ্রা যেন পাথর। তার শরীর তখন জ্বরতপ্ত, নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কোনও ব্যাধি হয়েছে সুভদ্রার। ওষ্ঠ ও অধরও খুব ফুলে আছে, সেটাই কি কথা না বলার কারণ? পশু, পশু, দস্যু বুধনাথ একটা পশু! কোনও দিন যদি হাতের কাছে পায়, সুরপতি তাকে নিশ্চয়ই হত্যা করবে।

বাকি রাত সুরপতির চোখে ঘুম এল না। সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারের ঘুমন্ত নিশ্বাসের শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে। সে নিজেও খুবই ক্লান্ত, সুভদ্রাকে অনেকখানি রাস্তা বহন করে আনতে হয়েছে বলে তার সারা শরীরে ব্যথা, কিন্তু মস্তিষ্কভরা দুশ্চিন্তার জন্য তার ঘুম আসছে না। অবিলম্বে অর্থ-উপার্জনের একটা পথ খুঁজে বার করতে হবে। সঙ্গে যা অর্থ আছে, শুধু বসে তা ব্যয় করলে বেশি দিন তো চলবে না। রাজবৈদ্য বাসবদত্ত চিকিৎসার জন্য কত অর্থ দাবি করবেন কে জানে!

সুভদ্রা সব কাজে সাহায্য করত সুরপতিকে। সে তার মধুর ব্যবহারে সুরপতিকে কখনও বেশি চিন্তিত হতে দিত না। সেই সুভদ্রা এখন অনড়। সে এখন কত কষ্ট পাচ্ছে, সেটা ভেবেই সুরপতির বেশি কষ্ট।

যাক, বেঁচে থাকাটাই বড় কথা। তবু যে সুভদ্রা এত বড় বিপদের পরেও বেঁচে আছে, এটাই যথেষ্ট।

সুভদ্রা শেষ কথা বলেছিল, আমাকে বিষ দাও, বিষ! তারপর থেকে আর সুভদ্রার কোনও কথা শোনেনি সুরপতি।

ভোর হবার পর, সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারের তখনও ঘুম ভাঙেনি, সুরপতি উঠে পড়ল। ওদের আর জাগাল না। নিজে প্রাতঃকৃত্য সেরে নিল তাড়াতাড়ি। পোশাক বদলাবার কোনও উপায় নেই, কারণ আর কিছু নেই সঙ্গে। তাই গত কালের অপরিচ্ছন্ন পোশাকটাই পরে নিল। আজই কিছু পোশাক-পরিচ্ছদ কিনতে হবে নিজের মাথার ক্ষতস্থানটায় একবার হাত বুলিয়ে নিল সুরপতি। মনে হচ্ছে যেন ব্যথা-বেদনা সব দূর হয়ে গেছে। কী করে এমন হল? ক্ষতস্থানটায় চাপ বেঁধে আছে রক্ত, কিন্তু বেদনা নেই কেন? আপনাআপনি সেরে গেল? যাই হোক, পরে এ নিয়ে চিন্তা করা যাবে। সুরপতি মাথার রক্তাক্ত ফেট্টিটা খুলে ফেলে দিল মাটিতে। তারপর টাকার পুঁটলিটা সাধানে কোমরে বেঁধে নিল, তারপর বেরিয়ে পড়ল।

॥ ৩॥

রাজবৈদ্য বাসবদত্তের গৃহটি প্রকাণ্ড। দ্বি-তলের যে-ঘরটিতে তিনি নিদ্রা যান, সে-ঘরে আটটি গবাক্ষ। শীতে গ্রীষ্মে সব সময় সব ক'টি গবাক্ষ খোলা থাকে। ঘরের মাঝখানে একটি পালঙ্কে তিনি একাকি শয়ন করেন, সকালবেলা তাঁর চোখেমুখে এসে রোদ পড়ে, তখন ঘুম ভাঙে।

বাসবদত্তের শরীরটিও বিরাট। যমরাজেরও ভয় পাবারই কথা। জ্বলন্ত ভাটার মতো দু'টি চোখ, সেই চোখে বাসবদত্ত যে-কোনও মানুষের দিকে তাকিয়ে তার অন্তঃস্থলটা পর্যন্ত যেন দেখতে পান।

বাসবদত্তের সেবার জন্য রাজার তরফ থেকেই পাঁচটি সর্বগুণসম্পন্না সুন্দরী নিযুক্ত আছে। তারা বাসবদত্তকে স্নান করানো থেকে শুরু করে রাত্রে তার সুরাপানের সময় উৎকট সব খেয়াল চরিতার্থ করা পর্যন্ত সব কিছুই নিপুণ ভাবে পালনের জন্য প্রস্তুত।

সে-দিন সকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বাসবদত্তের চোখে রৌদ্র এসে পড়েনি বলে তাঁর ঘুমও ভাঙল না। সেবিকারা দ্বারের পাশে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁকে ডাকার সাহস কারুর নেই।

এ-দিকে নিচের তলায় অপেক্ষা-কক্ষটি রোগীতে ভরে গেছে। কিন্তু কেউ একটিও শব্দ করছে না। এমনকি শিশুরা পর্যন্ত নীরব। সামান্য কোলাহল শুনলেই বাসবদত্ত সে-দিনের মতো চিকিৎসা বন্ধ করে দেন।

বাসবদত্তের আপনাআপনি ঘুম ভাঙল ঢের বেলায়।

চোখ মেলেই তিনি হাঁক দিলেন, জল! জল!

এক জন সেবিকা রুপোর করঙ্কে ভরতি সুগন্ধ জল নিয়ে ঘরে ঢুকল সঙ্গে সঙ্গে। বাসবদত্ত হাত বাড়ালেন না, মুখটা হাঁ করে রইলেন। মেয়েটি তাঁর শিয়রের পাশে বসে খুব সাবধানে জল ঢেলে দিল মুখের মধ্যে, যেন বাইরে এক ফোঁটাও না পড়ে। বাসবদত্ত ঢক ঢক করে সমস্ত জলটাই পান করলেন। এবার তিনি একটা হাত উঁচু করলেন। মেয়েটি বাসবদত্তের হাত ধরে টেনে তুলল প্রাণপণে। বাসবদত্ত তখনও চোখ খোলেননি। মুখে মৃদু মৃদু হাসি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আজ কে এসেছে আমায় তুলতে? স্পর্শ থেকে মনে হচ্ছে মেঘমালা। তাই না? তারপর উঠে বসে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, মেঘমালা, তোমার মুখখানি ম্লান কেন? আকাশে মেঘ করেছে বলে?

মেয়েটি হাসির চেষ্টা করে বলল, কই, না তো!

হ্যাঁ, চোখ মুখ ঠিক স্বাভাবিক নয়। কাছে এসো তো!

বাসবদত্ত মেয়েটির চোখের পাতা দুটো একটু টেনে দেখেই বললেন, তুমি যে বিছানায় শোও, দেখো গিয়ে সেই বিছানার চাদরে একটু একটু হলুদ দাগ হয়েছে কি না। হবেই। তোমার যকৃতের পীড়া আসন্ন।

এইভাবে শুরু হল বাসবদত্তের প্রথম চিকিৎসা।

উঠে তিনি চোখ মুখ প্রক্ষালন করে প্রাতঃকৃত্য সারলেন। তারপর ধ্যানে বসলেন। লোকে বলে, ওই ধ্যানের শক্তিতেই তিনি ধন্বন্তরি।

ও-দিকে নিচে শত শত রোগী অধীর ভাবে অপেক্ষা করছে। তার মধ্যে বসে আছে সুরপতি। বেলা অনেক বেড়ে যাচ্ছে। ঘুম থেকে উঠে ধ্রুবকুমার বাবাকে না দেখতে পেয়ে হয়তো কান্নাকাটি করবে, সুভদ্রা কোনও কথা বলবে না, সব মিলিয়ে একটা জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে, সে-দিকে তার খেয়াল নেই।

এক সময় বাসবদত্ত নিচে নামলেন। সকলে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল তাঁকে দেখে। বাসবদত্তের অঙ্গে ঝকঝকে লাল মখমলের পোশাক। মাথায় উষ্ণীষ। যেন তিনি চিকিৎসক নন, এক জন রাজা-মহারাজা।

তাঁর কণ্ঠস্বর মেঘমন্দ্র। এখানে রোগীদের মধ্যে কোনও অগ্রাধিকার নেই। বাসবদত্তের যাকে খুশি তাকেই আগে ডাকবেন।

সুরপতি একটু নিরাশ হয়ে গেল। এখানে রোগীরা সবাই নিজেরাই এসেছে। বাসবদত্ত রাজবৈদ্য, তিনি সম্ভবত রাজার বাড়ি ছাড়া আর কোনো রোগীর বাড়িতে যান না। সুভদ্রাকে নিয়ে আসা উচিত ছিল।

সুরপতি বিদেশি মানুষ, বাসবদত্তকে অনুনয়-বিনয় করে বুঝিয়ে বললে কি তাঁর দয়া হবে না? বাসবদত্তকে দেখলে বেশ দয়ালু বলে মনে হয়। কিন্তু সবেমাত্র তিনি এক জনের রোগ নির্ণয় করেছেন, এমন সময় ঘর্ঘর শব্দে রাজার রথ এসে থামল গৃহের সামনে। তার থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে রাজদূত দৌড়ে এসে ভেতরে ঢুকল, সসম্ভ্রম বাসবদত্তকে অভিবাদন করে বলল, রাজা আপনাকে এখুনি একবার স্মরণ করেছেন।

বাসবদত্ত হেসে বললেন, রাজার পিঠের ডান দিকে একটা ব্যথা উঠেছে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

জানতাম।

বাসবদত্ত উঠে দাঁড়িয়ে অপেক্ষমান রোগীদের মুখগুলো একবার দেখে নিলেন। একেবারে মুমূর্ষ কেউ আছে কি না সেটা দেখাই উদ্দেশ্য। তারপর সকলের উদ্দেশে বললেন, তোমরা একটু অপেক্ষা করো। আমি রাজাকে দেখে আসছি, আমার বেশি সময় লাগবে না। তোমরা কেউ যেও না।

এ-রকম নিয়ম আছে যে, সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বাসবদত্ত কোনও রোগীকেই ফেরান না।

বাসবদত্তকে দেখে সুরপতির বেশ শ্রদ্ধা ও ভরসা হল। তার দৃঢ় বিশ্বাস হল, ইনি সুভদ্রাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলতে পারবেন। সুতরাং সে অপেক্ষা করাই মনস্থ করল। এখান থেকে সরাইখানাটি বেশ দূরে, সেখানে গিয়ে আবার ফিরে আসতে অনেক সময় লাগবে। তার চেয়ে বরং যে-কোনও প্রকারেই হোক একেবারে বাসবদত্তকে সঙ্গে করে নিয়ে ফেরাই ভাল।

কক্ষের মধ্যে বসে না থেকে সুরপতি বাইরের পথে পায়চারি করতে লাগল। বাসবদত্তের গৃহের চারপাশে ঘেরা একটি বিশাল উদ্যান। তাতে অদ্ভুত অচেনা সব নানা রকমে লতাবিতান ও গাছপালা। উদ্যানের সব ক'টি দ্বারেই 'প্রবেশ নিষেধ' লেখা। হয়তো এই সব গাছপালা থেকেই বাসবদত্ত ওষুধ সংগ্রহ করেন।

গৃহের বিপরীত দিকে একটি প্রশস্ত প্রান্তর সবুজ তৃণে ঢাকা। তার ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সুরপতি অল্প দূরেই একটি নদী দেখতে পেল। নদীটির দু'তীরে বড় বড় গাছের সারি, শান্ত, নির্জন, বড় মনোরম জায়গাটি। সে-দিকে তাকিয়ে সুরপতির চোখ জুড়িয়ে গেল। ধনরাজ ঠিক কথাই বলেছিল, দারুকেশ্বর স্থানটি খুব সুন্দরই বটে। তবে সন্ধ্যার পর এখানকার সবাই প্রায় সুরাপানে উন্মত্ত হয়ে থাকে, এ বড় আশ্চর্য কথা।

একটা পাথরখণ্ডের ওপর বসে সুরপতি একটা গাছে হেলান দিল। এবং অল্পক্ষণের মধ্যে নিজের অজ্ঞাতসারেই ঘুমিয়ে পড়ল। গত কালের রাত্রি জাগরণ, দুশ্চিন্তা এবং মানসিক যন্ত্রণায় তার সমস্ত শরীরের শিরা-উপশিরাগুলি পর্যন্ত ক্লান্ত হয়েছিল, এই সময় ঘুমের মতো আরামদায়ক আর কিছু নেই। সুরপতি ডুবে গেল গভীর ঘুমে।

সে কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল জানে না, ঘুম ভাঙল একটা যন্ত্রণাবোধে। কে যেন তার চুলের মুঠি ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করছে।

সুরপতি চোখ মেলে দেখল চার-পাঁচ জন ষণ্ডামার্কা লোক ঘিরে ধরেছে তাকে। তাদের অঙ্গে প্রহরীর বেশ। এক জন তার চুলের মুঠি ধরে টানছে আর চেঁচিয়ে বলছে, এবার পেয়েছি পাপিষ্ঠটাকে। কম ঘুরিয়েছে আমাদের!

সুরপতি যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল, এ কী! এক জন লোক দুম করে তার চোখর ওপর ঘুষি মারল। আমাকে মারছে কেন? আমি বিদেশি।

বিদেশি! হারামজাদা বংশীলাল তুই আমাদের চোখে কম ধুলো দিয়েছিস?

কে বংশীলাল? শোনো শোনো, তোমরা আমাকে মেরো না।

ওরা সবাই মিলে সুরপতিকে ঘুষি আর চড়চাপড় মারতে লাগল। সুরপতি প্রাণপণে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে কাতর ভাবে বলতে লাগল, মেরো না, মেরে না, আমার একটা কথা শোনো — আমি বংশীলাল নই, আমার বউ-ছেলে আছে, আমাকে ছেড়ে দাও।

ওরা কোনও কথায় কান দিল না। মেরেই চলল। সেই অবস্থাতেও সুরপতির মনে হল, এরা যদি তাকে হত্যা করে, তাহলে সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারের কী হবে?

সুরপতি কোনও ক্রমে ওদের হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু বেশি দূর যেতে পারল না, ওরা ক্ষিপ্রবেগে ছুটে এসে ধরে ফেলল এবং এক ধাক্কায় তাকে মাটিতে ফেলে চেপে বসল তার বুকের ওপর। সুরপতি বুঝল, তার আর নিস্তার নেই।

সে বলল, আমার যা অর্থ আছে সব তোমরা নাও, আমাকে শুধু ছেড়ে দাও। আমার ছোট ছেলে আছে, স্ত্রী আছে, আমি ছাড়া তারা —।

এক জন তার লগুড় দিয়ে সুরপতির মাথায় এমন প্রচণ্ড আঘাত করল যে, সুরপতি জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল মাটিতে। এক দিন আগেই তার মাথায় বড় চোট লেগেছিল, এখন সেখান থেকেও রক্ত বেরুতে লাগল গল গল করে।

লোকগুলো সুরপতির কোমর থেকে অর্থের পুঁটুলিটা বার করে তৎক্ষণাৎ সব ক'টি সিক্কা টাকা ভাগ করে নিল নিজেদের মধ্যে। তারপর সুরপতির পা দুটো ধরে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে টেনে নিয়ে চলল।

গাছের ওপরে একটা কাঠবিড়ালি আর পাশের ঝোপে দুটো গিরগিটি দেখছিল এই দৃশ্য। কাঠবিড়ালিটা ভয় পেয়ে গাছের ডগায় উঠে গেল আর গিরগিটি দুটো বেরিয়ে এসে পাথরের ওপর পড়ে থাকা সুরপতির টাটকা রক্ত চাটতে লাগল লকলকে জিভে।

প্রহরীরা সুরপতির দেহটা টানতে টানতে ঘাসভরা প্রান্তরটা পার হয়ে এসে পথের ওপর দাঁড় করানো একটি শকটের মধ্যে ছুঁড়ে দিল। কয়েক জন পথচারী দেখল সেই দৃশ্য। কেউ কোনও মন্তব্য করল না। এ রাজ্যে এ-রকম প্রায়ই হয়। তস্কর দস্যুরা প্রহরীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে বেশি দিন পলাতক থাকতে পারবে না, ধরা পড়বেই। প্রহরীদের ওপর কেউ কথা বলতে পারবে না। এ রাজ্যের প্রহরীরা প্রকাশ্য রাজপথেই যখন তখন যার তার মুণ্ডু কেটে ফেলে।

প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে সুরপতির প্রাণ হয়তো তখুনি বেরিয়ে যেত। কিন্তু দৈবাৎ সেই সময়েই বাসবদত্ত ফিরলেন রাজপ্রাসাদ থেকে। এবং সুরপতির দিকে তাঁর চোখ পড়ল। অসাধারণ তাঁর স্মৃতিশক্তি। তিনি সুরপতিকে দেখেই চিনতে পারলেন। এবং প্রহরীদের তিনি ভয় পান না। প্রহরীরাও রাজপ্রাসাদের বাইরে একমাত্র বাসবদত্তকেই সম্ভ্রম করে।

তিনি প্রহরীদের জিজ্ঞেস করলেন, একে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? এ তো আমার রোগী, একটু আগে আমি একে দেখে গিয়েছি।

প্রহরীরা বলল, প্রভু, এই বংশীলাল এক জন বিখ্যাত তস্কর। নদীর ধারে লুকিয়েছিল। এ আমাদের বাধা দিতে এসেছিল বলেই আমরা একে প্রহার করেছি। এর নামে পরোয়ানা আছে, একে কারাগারে নিয়ে যাচ্ছি।

কিন্তু কারাগার পর্যন্ত এ পৌঁছবে না। তার আগেই শেষ হয়ে যাবে।

প্রভু, আমরা তো সে-কথা জানি না। আমরা দায়িত্ব পালন করছি মাত্র।

তোমাদের অপরাধীকে তোমরা নিয়ে যাবে, তা ঠিক কথা। কিন্তু আমার বাড়ি থেকে তো কোনও রোগীকে আমি বিনা চিকিৎসায় ফিরিয়ে দিই না। এই লোকটি আমার বাড়িতে চিকিৎসার জন্য এসেছিল। সুতরাং একটু অপেক্ষা করো। আমি এর চিকিৎসা সেরে নিই।

রাজবৈদ্য বাসবদত্তের মুখের ওপর কথা বলার সাহস কারুর নেই। বাসবদত্ত তাঁর দু'জন সহকারীকে ডেকে সুরপতির মাথার রক্ত মুছিয়ে দিলেন। খানিকটা মলম লাগিয়ে বেঁধে দিলেন ক্ষতস্থান। তারপর অজ্ঞান সুরপতির ঠোঁট জোর করে ফাঁক করিয়ে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন চারটি বিভিন্ন বটিকা।

বাসবদত্ত বললেন, এবার যাও। এরপর লোকটি বাঁচবে কি না সেটা ওর নিয়তি।

প্রহরীরা শকট চালিয়ে দিল। এবং অবিলম্বেই কারাগারে পৌঁছে সুরপতির অচৈতন্য শরীর একটি নির্জন কক্ষে নিক্ষেপ করল।

সুরপতির জ্ঞান ফিরল পরদিন সকালে। বাসবদত্তের চিকিৎসার গুণে তার শরীরের ব্যথা-বিষ অনেক কমে গেছে। সে ধড়মড় করে উঠে বসতে গেল। কিন্তু পারল না, শরীর অসম্ভব দুর্বল।

প্রায় অন্ধকার কারাগার, দেয়ালের একটা ঘুলঘুলি দিয়ে সামান্য আলো এসে পড়েছে। সুরপতি অনেকক্ষণ পর্যন্ত বুঝতেই পারল না সে কোথায় আছে এবং এখানে কী করেই-বা এল! তারপর ভাবল, সব জিনিসটাই বুঝি দুঃস্বপ্ন। সে নিশ্চয়ই এখনও বল্লারপুরের কাছে সেই জঙ্গলে একটা গাছের নিচে শুয়ে আছে। পাশে রয়েছে তার স্ত্রী ও পুত্র। অদূরে বণিকের দল। একটা নরম হাতের স্পর্শ লাগল তার মাথায়। সুরপতি চমকে উঠে বলল, কে?

একটি সুমিষ্ট নারীকণ্ঠ বলল, আপনি উঠবেন না, আপনি ঘুমোন। সুরপতি আরও চমকে উঠল। এ কার কণ্ঠস্বর? এ কি সুভদ্রা?

সে চিৎকার করতে গেল, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর বেরুল না। সে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল, তুমি — তুমি সুভদ্রা? তুমি কোথায়?

এই তো আমি।

সুভদ্রা, তুমি কথা বলতে পারছ? তোমার অসুখ সেরে গেছে?

আমার তো কিছু হয়নি।

ধ্রুবকুমার কোথায়?

এই তো, কাছেই রয়েছে।

সুরপতি একটা বিরাট নিশ্বাস ফেলল। আঃ কী শান্তি! সুভদ্রা তার সেবা করছে, ধ্রুবকুমার তার কাছেই আছে। এ চেয়ে আর বেশি কী চাই? সুরপতি নিশ্চিন্তে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

একটু বাদে সুরপতির ফের ঘুম ভাঙল। সে ডাকল, সুভদ্রা? সুভদ্রা তুমি কোথায়?

সুভদ্রা বলল, এই তো আমি।

সুরপতি হাত বাড়িয়ে সুভদ্রার নরম হাতটা স্পর্শ করল। তাই তো, সুভদ্রা তো সত্যিই এখানে রয়েছে। তা কী করে হয়? তার একটু একটু মনে পড়ছে, সে গিয়েছিল রাজবৈদ্য বাসবদত্তর কাছে,

তারপর কয়েক জন লোক তাকে খুব মারল, মেরে মেরে একেবারে অজ্ঞান করে ফেলল। তারপর — তারপর সে সুভদ্রার কাছে চলে এল কী করে? এ জায়গাটা কোথায়?

সে জিজ্ঞাসা করল, সুভদ্রা, আমরা কোথায় এসেছি?

সুভদ্রা বলল, আপনি কথা বলবেন না, আপনি ঘুমোন।

সুরপতি আর ভাবতে পারছে না। বেশি চিন্তা করলে তার মাথা ঝিম ঝিম করছে। এখনও বুঝি রক্ত পড়ছে মাথা দিয়ে। সে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, সুভদ্রা, ওরা আমাকে খুব মেরেছে, সাংঘাতিক মেরেছে, ওরা নিষ্ঠুর, আমি কোনও দোষ করিনি।

কাঁদতে কাঁদতেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

আবার এক সময় সে জেগে উঠল। এখন তার পাশে কেউ নেই। সে উঠে বসল অতিকষ্টে।

সে চিৎকার করে ডাকল, সুভদ্রা, সুভদ্রা!

কেউ সাড়া দিল না।

সে অন্ধকারের মধ্যে চতুর্দিকে হাতড়িয়ে দেখল। কেউ নেই। কঠিন পাথরের ভূমি। সুরপতি নিজের গায়ে জোরে চিমটি কাটল, তাতে যদি ঘুমের ঘোর ভাঙে।

একটু আগে যে সে সুভদ্রার সঙ্গে কথা বলছিল। সুভদ্রার হাতের স্পর্শ লেগেছিল তার মাথায়। সে তো স্বপ্ন নয়!

তাহলে এখনই সে স্বপ্ন দেখছে। সে চেষ্টা করেও জেগে উঠতে পারছে না। না না, তাকে জেগে উঠতেই হবে। সে সুভদ্রার স্বামী, ধ্রুবকুমারের পিতা, তার কি এত বেশিক্ষণ ঘুমিয়ে থাকলে চলে?

সে আরও জোরে চিমটি কাটল নিজের মুখে। খুব ব্যথা লাগল। এবার সে জেগে উঠেছে। এই তো সে বসে আছে। হাত বাড়ালে পাথর ছোঁওয়া যায়।

সে আবার ডাকল, সুভদ্রা, সুভদ্রা!

কেউ সাড়া দিল না।

সুভদ্রা গেল কোথায়? তাকে এখানে একা ফেলে?

সে ডাকল, ধ্রুব! বাছা ধ্রুবকুমার!

তা-ও কোনও সাড়াশব্দ নেই।

সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমার দু'জনেই তাকে ফেলে অন্য কোথাও চলে গেছে? তাকে এই রকম অসুস্থ অবস্থায় রেখে?

সুরপতি মাথায় হাত দিয়ে দেখল, চুলের মধ্যে চাপ বেঁধে আছে রক্ত।

না, ওদের খুঁজে বার করতেই হবে। এ-রকম ভাবে বসে থাকলে তো চলবে না।

সুরপতি উঠে দাঁড়িয়ে দুর্বল পায়ে একটু চলার চেষ্টা করতেই একটা কঠিন জিনিসে আঘাত লাগল। একটা দেয়াল। সুরপতি আবার অন্য দিকে ঘুরে চলার চেষ্টা করল, সে-দিকেও দেয়াল। নিরেট পাথরের। এটা কোন জায়গা? সুরপতি বেশি ভাবতে পারে না, তার মাথা অবশ হয়ে আসে। সে বসে পড়ল। একটু দূরে কীসের যেন শব্দ। একটু দূরে কারা যেন একটা শিকল নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। এখনও কি সে স্বপ্নের মধ্যে আছে?

এক সময় সে বুঝতে পারল, এটা স্বপ্ন নয়। অতি রূঢ় বাস্তব। সে একা একটি ঘরে বন্দি।

সে দরজায় দুম দুম করে আঘাত করতে করতে বলল, কে আছ? বাইরে কে আছ? দরজা খুলে দাও।

এক সময় ও-পাশ থেকে একটা গম্ভীর গলা শোনা গেল, এই চুপ!

দরজা খুলে দাও। আমার স্ত্রী, আমার ছেলে কোথায়? আমাকে না পেয়ে এতক্ষণ তারা কী করছে কে জানে!

চুপ করে থাকো।

সুরপতি তবু পাগলের মতো চিৎকার করতে লাগল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমকে ছেড়ে দাও।

বহুক্ষণ চিৎকারে সুরপতির কণ্ঠস্বর ভগ্ন হয়ে গেল। দ্বারের গায়ে হেলান দিয়ে সে বসে রইল। এখনও সে সব কিছু বিশ্বাস করতে পারছে না। কোনও মানুষের দুর্ভাগ্য কি এমন দলবদ্ধ হয়ে আসে? সপ্তগ্রামে তাদের বাড়ির মানুষজন এক এক করে মরে গেল। তাদের পুরুষানুক্রমিক ব্যবসা আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেল। বণিকদলের সঙ্গে দেশান্তরে যাচ্ছিল, সেখানেও পথের মধ্যে পড়ল দস্যুদলের হাতে। সুভদ্রার বাক্‌শক্তি নষ্ট হয়ে গেল, তারপর আবার তাকে বংশীলাল ভেবে অত্যাচার করল কয়েকটি লোক। এখন সে কারাগারে আবদ্ধ। সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমার কী করছে কে জানে! মাঝখানে স্বপ্নের মধ্যে সুভদ্রা ফিরে এসেছিল। স্নেহকোমল হাতে সেবা করেছিল তার। সেই স্বপ্নের কথা ভেবে সুরপতির কষ্ট আরও দ্বিগুণ হয়ে গেল।

সুরপতি আর চিন্তা করতে পারল না, জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল আবার।

তিন দিন পর সুরপতিকে নিয়ে আসা হল বিচারালয়ে। সুরপতির তখন অর্ধোন্মাদের মতো দশা। সে দ্বারপথ থেকেই চিৎকার করতে লাগল, আমি বংশীলাল নই, আমি বংশীলাল নই, ঈশ্বর জানেন, আমি বংশীলালকে সাত জন্মেও দেখিনি।

বিচারক বললেন, এক!

সুরপতি ছুটতে ছুটতে বিচারকের পায়ের কাছে এসে লুটিযে পড়ে বলল, ধর্মাবতার, আমি এক ভাগ্যহীন বিদেশি। এরা ভুল করে আমাকে ধরে এনেছে।

বিচারক বললেন, দুই!

সুরপতি বিলাপ করে বলল, আপনি আমার প্রতি দয়া করুন। আমার স্ত্রী-পুত্র না খেয়ে আছে।

বিচারক বললেন, তিন!

সুরপতি আবার কিছু বলতে যেতেই বিচারক হাত তুলে ইঙ্গিত করলেন। অমনি দু'টি ভূমিকায় রক্ষী দু'দিক থেকে এসে সুরপতিকে চেপে ধরল। সুরপতির হাত-পায়ে শৃঙ্খল পবিয়ে তার মুখটাও বেঁধে দেওয়া হল কালো কাপড়ে।

বিচারক বললেন, অযাচিত ভাবে এখানে কোনও কথা বলা যায় না। তুমি এ সভার নিয়ম তিনবার ভঙ্গ করেছ। তোমাকে আর কোনও কথা বলার সুযোগ দেওয়া হবে না।

সুরপতি মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগল।

পর পর দু'জন সাক্ষ্য দিল যে সুরপতিই বংশীলাল। এ সম্পর্কে কারুর মনে কোনও সন্দেহ নেই। সেই চোখ, সেই নাক, সেই কপাল।

বংশীলালের বিরুদ্ধে অভিযোগ চুরি, তঞ্চকতা ও নারীর সতীত্ব নাশের। এ পর্যন্ত সাতাশ জন বিবাহিতা রমণীর ধর্মনাশ সে করেছে, তা জানা যায়। আরও কত এ-রকম ঘটনা অজানা রয়ে গেছে, তা কে জানে! শ্রেষ্ঠী বিনয় প্লালের স্ত্রীর সতীত্বনাশ করার জন্য সেই রমণী মাত্র সাত দিন আগে আত্মঘাতিনী হয়েছে।

অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর। সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ পেয়ে বিচারক ফাঁসির আদেশ দিলেন। সে-দিন আরও অনেকগুলি আসামির বিচার করতে হবে, তাই তিনি আর বেশি সময় নষ্ট করলেন না।

রক্ষীরা সুরপতিকে ঠেলতে ঠেলতে আবার নিয়ে গেল কারাগারে। সুরপতি আর একটিও শব্দ উচ্চারণ করল না। সে বুঝতে পেরেছে, ভাগ্যলক্ষ্মী তাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছে। এখন মৃত্যুই তার নিয়তি। সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারকে সে আর ইহজীবনে কখনও চোখে দেখবে না।

দারুকেশ্বর কারাগারে তখন একত্রিশ জন ফাঁসির আসামি জমে আছে। প্রতি দিন তিন জনের বেশি ফাঁসি হয় না। এই রকমই প্রথা। তাই সুরপতিকে আরও দশ দিন জীবন্মৃত অবস্থায় কাটাতে হল। এই ক'দিন তার মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা ছিল, হয়তো খবর পেয়ে সুভদ্রা ছুটে আসবে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য। সুভদ্রা সকলের ভুল ভেঙে দেবে যে, সে বংশীলাল নয়, সে সপ্তগ্রামের শ্রেষ্ঠী সুরপতি। তার পরই মনে পড়েছিল, সুভদ্রা তো কথা বলতে পারে না। খবর পেলেও এ-সব কথা সে লোককে জানাবে কী করে? ধ্রুবকুমার তো আছে! বালক ধ্রুবকুমার যথেষ্ট বুদ্ধিমান, সে-ই লোকসমক্ষে পিতৃপরিচয় দিতে পারে!

কিন্তু কেউ এল না সুরপতির খোঁজ করতে।

এই কারাগারের ব্যবস্থা এমন নিশ্ছিদ্র যে, বাইরে কোনও খবর পাঠাবার কোনও উপায় নেই। ভয়াল চেহারার প্রহরীরা ডাণ্ডা হাতে নিয়ে ঘোরে। সুরপতি চিৎকার করে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেই তারা ডাণ্ডা তুলে মাথায় মারতে আসে।

দ্বিপ্রহরে শুধু এক জন শীর্ণকায় লোক আসে সুরপতিকে আহার্য দিয়ে যেতে। এক টুকরো পোড়া মাংস ও তিনখানি যবের রুটি। সেগুলি দলা পাকিয়ে গরাদের ফাঁক দিয়ে ছুঁড়ে দেয়। এক দিন সুরপতি সেই লোকটির হাত চেপে ধরে বলল, ভাই, ঈশ্বরের দোহাই, তুমি বলভদ্রের সরাইখানায় গিয়ে একটি বার খবর দাও। সেখানে আমার স্ত্রী ও পুত্র আছে। আমি বংশীলাল নই, আমি সুরপতি। আমি মরি তাতে ক্ষতি নেই, তবু ওরা যেন একবার খবর পায়। আর যদি আমি এখান থেকে কোনও ক্রমে ছাড়া পাই, তাহলে আগামী দশ বছর আমি যা উপার্জন করব, সবই তোমাকে দেব। ভাই দয়া করো, ঈশ্বরের দোহাই, এই সামান্য দয়া করো আমাকে।

লোকটি স্থিরভাবে চেয়েছিল সুরপতির দিকে। সুরপতির কথা শেষ হলে সে হাঁ করল। তার মুখের মধ্যে জিভ নেই। জিভটা সম্পূর্ণ কাটা। কথা বলার কোনও ক্ষমতাই লোকটির নেই। ভয় পেয়ে সুরপতি তার হাত ছেড়ে দিল।

এগারো দিনের দিন সুরপতিকে নিয়ে যাওয়া হল বধ্যভূমিতে। জল্লাদ ফাঁসির দড়িটি ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করে দেখছে। সুরপতির হাত বাঁধা কিন্তু চোখ-মুখ খোলা।

এক জন কারারক্ষী এসে তাকে প্রশ্ন করল, বন্দি, তোমার কোনও শেষ ইচ্ছা আছে?

সুরপতি মাথা নেড়ে বলল, না।

তোমার মৃতদেহ কি দাহ করা হবে না নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হবে?

সুরপতি একটুক্ষণ চিন্তা করে বলল, বলভদ্রের যে সরাইখানা আছে, তার সামনে আমার মৃতদেহটা ফেলে রেখে এসো।

এমন সময় দূর থেকে এক জন অশ্বারোহী তীরবেগে ছুটে এল। সুরপতিকে তখন বধ্যমঞ্চে তোলা হয়েছে, অশ্বারোহী চিৎকার করে বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও।

অশ্বারোহী এসে বলল, আজ সকালেই রাজার একটি পুত্রসন্তান হয়েছে, সেই উপলক্ষে রাজা এক জন ফাঁসির আসামির শাস্তি মকুব করতে চান। এ রাজ্যে সেটাই প্রথা।

সে-দিন সুরপতি ছাড়া আর কোনও ফাঁসির আসামি ছিল না। সুরপতি বুকের মধ্যে একটা আনন্দের গোল্লা লাফিয়ে উঠল। সে জল্লাদের হাত ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে আনন্দে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, আ-আ-হা-হা-আ-আ —।

সুরপতি ভাবল, নিয়তি তার ওপর তাহলে একেবারে বিরূপ নয়। ভাগ্যবলেই সে শেষ মুহূর্তে মুক্তি পেয়ে গেল। এখুনি সে ছুটে গিয়ে সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারকে দেখতে পাবে।

সেই বধ্যভূমির ওপর দাঁড়িয়ে সুরপতি উন্মাদের মতো নাচতে লাগল। তার দু'চোখ দিয়ে মুক্তির আনন্দের অশ্রু গড়াচ্ছে।

কিন্তু নিয়তি আসলে সুরপতিকে নিয়ে একটা খেলা খেলছে। সেই খেলা এখনও শেষ হয়নি।

অশ্বারোহী রাজার সনদ তুলে দিল কারারক্ষীর হাতে। সে সেটা পাঠ করে সুরপতির দিকে তাকিয়ে বলল, যাক, খুব জোর বেঁচে গেলে বংশীলাল, তোমার মৃত্যুদণ্ড মকুব করে দশ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

এ-কথা শুনে সুরপতির যতখানি নিরাশ হওয়ার কথা ছিল, ততখানি সে হল না। শুধু বেঁচে থাকারই যে একটা আনন্দ আছে, তা সে উপেক্ষা করতে পারল না।

এবার সুরপতিকে আনা হল অন্য একটি কারাগারে। কারাগারটি একটি পাহাড়ের পাদদেশে। এতে আছে সু-উচ্চ প্রাচীর ঘেরা একটি বিরাট চত্বর, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যাকালে বন্দিরা যথেচ্ছ ভ্রমণ করতে পারে। দ্বিপ্রহরে তাদের সকলকে সারিবদ্ধ হয়ে বসে পাথর ভাঙতে হয়। বড় বড় পাথরের চাঙড়কে তারা লৌহ হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো করে। দারুণ পরিশ্রমসাধ্য কাজ, মাথার ওপরে চড়া রোদ্দুরে শরীর থেকে গল গল করে স্বেদ বেরোয়, তবু এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেবার উপায় নেই, অমনি পিঠের ওপর এসে পড়বে কারারক্ষীর চাবুক।

রাত্রে তাদের শয়ন করতে হয় প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ছোট কুঠুরিতে। সেখানে আলো-বাতাসের সম্পূর্ণ প্রবেশ নিষেধ। সেই ঘরে আছে বিরাট বিরাট আকারের মূষিক। কোন ছিদ্রপথ দিয়ে তারা ঢোকে তা বোঝাই যায় না। মূষিকের অত্যাচারে রাত্রে ঘুমোয় কার সাধ্য। প্রায়ই কয়েদির গা থেকে ওই সব মূষিক মাংস খুবলে নিয়েছে — এমন দেখা যায়। এক জনের ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটাই মূষিকে কেটে নিয়েছিল।

সুরপতি সারা রাত ধরে তার হাতুড়িটা এ-দিক ও-দিক চালিয়ে মূষিক নিধনের চেষ্টা করে। পাথরভাঙা হাতুড়িটা প্রত্যেক কয়েদির সঙ্গেই থাকে। কেউ কেউ রাগে দুঃখে যন্ত্রণায় সেই হাতুড়ি দিয়ে নিজের মাথাতেই এক ঘা মেরে বসে এক-এক দিন। তাতে কারারক্ষীরা একটুও বিচলিত হয় না। কয়েদির সংখ্যা কমলে তাদের কোনও দুঃখ নেই। কেউ তাদের কাছে কোনও কৈফিয়ৎ চায় না।

কিন্তু এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও সুরপতি তার মাথায় এক দিনও সেই হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করেনি। সে বাঁচতে চায়।

॥ ৪ ॥

সুরপতির বৈচিত্র্যহীন কারাবাসের পঞ্চম বছরে একটা ঘটনা ঘটল।

কোনও ক্রমে চার বছর কাটিয়ে দেবার পর সে অনুভব করেছিল দশটা বছর সে কাটিয়ে দিতে পারবে ঠিকই। আবার সে মুক্তি পাবে। তারপর সুভদ্রা এবং ধ্রুবকুমার যদি বেঁচে থাকে তাহলে পৃথিবীর যে-প্রান্তেই তারা থাকুক, সুরপতি ঠিক খুঁজে বার করবে তাদের।

দুর্গতির চরম সীমায় গিয়েও সুরপতি হেরে যায়নি। বেঁচে থাকার একটা অদ্ভুত জেদ আছে মানুষের। তার মাথায় ক্ষতস্থানটা সারতে দীর্ঘ দিন লেগেছিল। হঠাৎ হঠাৎ যন্ত্রণা জেগে উঠত, তখন মনে হত, সে বুঝি পাগল হয়ে যাবে। সেই সময় মাঝে মাঝে সে নিজের পরিচয় ভুলে যেত। নির্জন কারাকক্ষে শুয়ে ব্যথায় ছটফট করতে করতে সে চিৎকার করে উঠত, আমি কে? আমি কোথায়? উত্তর দেবার কেউ নেই।

খানিকটা পরে যন্ত্রণা একটু কমে গেলে সে নিজেই ফিস ফিস করে নিজেকে শোনাত, আমি সুরপতি, আমাকে বাঁচতে হবে।

এই কারাগারের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর কোনও যোগাযোগ নেই। বাইরের কোনও সংবাদই এখানে কেউ পায় না। সুরপতি জানে না সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারের ভাগ্যে কী ঘটেছে, তবু সে আশা করে, এক দিন না এক দিন দেখা হবেই।

এই ক'বছরে সুরপতির শরীর অনেক সবল হয়েছে। কঠিন পরিশ্রমের ফলে তার প্রতিটি মাংসপেশী এখন সুদৃঢ়। তাছাড়া অসহ্য এই কারাজীবনকে কিছুটা সহনীয় করার জন্য সে কয়েকটি উপায় উদ্ভাবন করেছে।

যেমন পাথর ভাঙতে ভাঙতে সে এক দিন একটি চকমকি পাথর আবিষ্কার করে। কারুকে সে-কথা না জানিয়ে সেই চকমকির দু'টি টুকরো সে নিজের কুঠুরিতে নিয়ে এসেছে। সেগুলি ঠুকলে বেশ বড় বড় ফুলকি বেরোয়, সেই আলোয় সম্পূর্ণ ঘরটা দেখা যায়। এর ফলে তার মূষিক মারার অনেক সুবিধে হয়েছে। প্রতি রাতেই দু'টি তিনটি করে মূষিক সে মারতে পারে। ইদানীং মূষিকরাও তাকে ভয় পেতে শুরু করেছে, তার কুঠুরিতে আর তারা সহজে আসে না।

চকমকির আলোয় সে কুঠুরির দেয়ালে একটা খড়িপাথর দিয়ে দিনের হিসেব রাখতে শুরু করেছে। কত দিন, কত মাস, কত বছর পার হল তার হিসাব রাখতে পারবে এখন।

নানা রকম পাথরের টুকরো দিয়ে অস্ত্র বানাতেও শুরু করেছে। পাথরগুলি ভাঙবার সময় বিভিন্ন আকৃতির হয়। রক্ষীদের চোখের আড়ালে সে বিভিন্ন টুকরো নিয়ে ঘর্ষণ করে করে পাথরের ছুরি বানায়। একটি ছুড়ি রীতিমতো ধারালো ও মজবুত। সেটা ঠিক কোন ব্যবহারে লাগবে, তা সুরপতি এখনও জানে না, তবু নিজের কাছে সযত্নে লুক্কায়িত রেখেছে।

পাথরের টুকরো দিয়ে সে কখনও-সখনও নানা রকম পুতুলও বানায়। এ ব্যাপারেও তার সহজাত দক্ষতা আছে। একটিতে সে বানিয়েছে সুভদ্রার মুখ, আর একটিতে ধ্রুবকুমারের। মূর্তি দু'টি তার ঘরের কোণে বসানো আছে। রক্ষীরা কোনও দিন কয়েদিদের দুর্গন্ধ কুঠরির মধ্যে ঢোকে না, তাই ওই মূর্তি দু'টির কথা কেউ জানে না। প্রতি রাত্রে সুরপতি ওই মূর্তি দু'টির সঙ্গে মনে মনে কথা বলে। এখন আর সে ততটা একা নয়।

এক-এক দিন রাত্রে বড় বিভ্রম ঘটে যায়। সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারের পাথরের মূর্তি দু'টি শিয়রের কাছে নিয়ে শুয়ে থাকে সুরপতি। মাঝ রাত্রে হঠাৎ কোনও শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে যায় তার। ধ্রুবকুমার যেন আকুল ভাবে ডাকছে, বাবা! বাবা! একেবারে সত্যিকারের কণ্ঠস্বর। সুরপতি আমূল চমকে ওঠে। সুরপতি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, ধ্রুব, ধ্রুব, বাছা, তুই কোথায়? অমনি সে একটি কচি বালকের হাতের স্পর্শ পায়। ধ্রুবকুমার বলে ওঠে, এই তো!

এ তো স্বপ্ন নয়! এ যে বাস্তবও। অন্ধকারের মধ্যে সুরপতি কিছু দেখতে না পেলেও শিশু ধ্রুবকুমারের স্পর্শ তো সে ঠিকই অনুভব করছে। তাহলে সুভদ্রা কোথায়? সে-কথা জিজ্ঞেস করতেই ধ্রুবকুমার বলে, মা তো আপনার পায়ের কাছেই বসে আছেন!

তাই তো। সুরপতি টের পায়, সুভদ্রা তার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে সুরপতির পা টিপে দিচ্ছে। তার সেই নরম উত্তপ্ত হাতের স্পর্শ চিনতে ভুল হয় না।

আনন্দে, বিস্ময়ে সুরপতির আবার মাথার যন্ত্রণা হতে শুরু করে। সে চেঁচিয়ে বলে, আমি কে? আমি কোথায়? সুভদ্রা, তুমি এত দিন কোথায় ছিলে?

সুভদ্রা মৃদু কণ্ঠে উত্তর দেয়, আপনার কষ্ট হচ্ছে, আপনি আর একটু ঘুমিয়ে নিন।

সুরপতি ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে বলে, আমার চেয়ে বেশি কষ্ট বুঝি এ পৃথিবীতে আর কেউ পায়নি। কেন আমার এ শাস্তি!

সে আবার ঘুমিয়ে পড়ে শ্রান্তিতে। কিছুতেই চোখ খুলে রাখতে পারে না। এক প্রহর বাদে যখন আবার চোখ মেলে, তখন হাত বাড়িয়ে আর ধ্রুবকুমার বা সুভদ্রাকে খুঁজে পায় না। শুধু দু'টি পাথরের মূর্তি। সেই কঠিন কারাগার।

এই কারাগার থেকে ক্বচিৎ দু-একটি কয়েদি মুক্তি পায়। আবার মাঝে মাঝে নতুন কয়েদিরাও আসে। কেউ মুক্তি পাবার দিন অন্য কয়েদিরা চোখের জলে তাকে বিদায় দেয়, যেন ঘনিষ্ঠ কোনও বান্ধব চলে যাচ্ছে। নতুন কয়েদিদের প্রথম প্রথম অন্যরা পছন্দ করে না। যেন তারা অন্য জাতের লোক, তাদের গায়ে অন্য রকম গন্ধ।

সুরপতির কারাজীবনের পঞ্চম বছরে এক দিন এক সঙ্গে সাত জন নতুন কয়েদি এল। তাদের মধ্যে এক জনকে দেখে সুরপতি তীব্রভাবে চমকে উঠল। উত্তেজনায় তার শরীরে রীতিমতো কম্পন শুরু হয়ে গেল। যদিও লোকটির একটি হাত দুর্বল হয়ে শুকনো গাছের ডালের মতো ঝুলছে ও একটি চক্ষু নষ্ট, তবু তার বিশাল চেহারা ও বিরাট মুখখানা থেকে চিনতে অসুবিধা হয় না।

এ সেই দস্যুসর্দার বুধনাথ।

সুরপতির মনে হল, এই লোকটিই তার জীবনের সমস্ত দুঃখ দুর্দশার মূল। এ তার চোখের সামনে সুভদ্রার ওপর অত্যাচার করেছে, নির্দোষ ধনরাজকে হত্যা করিয়েছে। এর জন্যই সুভদ্রা মূক। সুভদ্রা যদি মূক না হত, তাহলে সুরপতি দারুকেশ্বরে থামত না, বংশীলাল বলে ভুল করে ধরাও পড়ত না।

সুরপতির সর্বাঙ্গে প্রতিশোধ প্রতিশোধ এই শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকল।

বুধনাথের সঙ্গে যে আর ছ'জন এসেছে, তারা ওরই দলের লোক। গৌড়বঙ্গে টুপিওয়ালা ইংরেজদের হাতে নাস্তানাবুদ হয়ে বুধনাথ তার দলবল নিয়ে পালিয়ে এসেছিল দারুকেশ্বরে। প্রথমে একটি সরাইখানায় আত্মগোপন করেছিল। সেখানেও একদিন এ রাজ্যের সৈন্যদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয়। সেই সংঘর্ষে বুধনাথের একটি হাত ও চোখ নষ্ট হয়েছে।

এই সব কথা টুকরো টুকরো ভাবে সুরপতির কানে আসে। সরাইখানার কথা শুনেই তার বুক কেঁপে ওঠে। এ কি সেই বলভদ্রের সরাইখানা? তাহলে সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারের কোনও ক্ষতি হয়নি তো? যদিও, একটিও কানাকড়ি সম্বল না করে এই চার-পাঁচ বছর সুভদ্রা তার ছেলেকে নিয়ে সেই সরাইখানাতে যে থাকবে কী করে, সে-কথাও তার মাথায় আসে না।

আরও খবর সংগ্রহের জন্য সুরপতি বুধনাথের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করে। এক-এক সময় প্রচণ্ড রাগে তার ইচ্ছে হয়, তার হাতুড়ির এক ঘায়ে বুধনাথের খুলি ফাটিয়ে একেবারে ঘিলু বার করে দেয়। কিন্তু তাহলে বুধনাথের দলের লোকরা তাকে ছাড়বে না, তারাও তাকে হত্যা করবে সঙ্গে সঙ্গে। কয়েদখানার মধ্যে এ-রকম সংঘর্ষ হয় মাঝে মাঝে। অকস্মাৎ বিবাদে মত্ত হয়ে সংঘর্ষে মেতে ওঠে কয়েদিরা। তিন-চার জন খুনোখুনি করে মরে। রক্ষীরা বাধা দেবার চেষ্টাও করে না। দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে। বন্দিদের প্রাণ সম্পর্কে যেন তাদের দায়িত্বই নেই। এরা যত কমে ততই মঙ্গল। সুরপতি এ-ভাবে মরতে চায় না।

বুধনাথ সুরপতিকে চিনতে পারেনি। চিনতে পারার কথাও নয়। সে কত জায়গায় দস্যুতা করেছে, কত মানুষের সর্বনাশ করেছে, সকলের মুখ সে মনে রাখবে কী করে? অত্যাচারিতরাই অত্যাচারীকে মনে রাখে।

কয়েক মাস কেটে যাবার পর সুরপতি বুঝতে পারল, বাকি জীবনটা কয়েদি হিসেবে কাটিয়ে দেবার মতো মানুষ বুধনাথ নয়। ইতিমধ্যেই সে পলায়নের ফন্দি আঁটছে। তখন সুরপতি সুকৌশলে বুধনাথের দলে ভিড়ে গেল। তার পাথরের তৈরি ছুরি দেখে খুশি হল বুধনাথ। এগুলি কাজে লাগবে। তাছাড়া বুধনাথের দলের প্রায় সকলেই এখন অল্প-বিস্তর অঙ্গহীন, শেষ যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। এখন সুরপতির মতো এক জন সবল স্বাস্থ্যবান লোকের সাহায্যের বিশেষ দরকার। বুধনাথ যখন শুনল যে, সুরপতির কাছে আগুন জ্বালাবার সরঞ্জাম আছে, তখন সে সব চেয়ে খুশি হয়ে উঠল। বন্ধুর মতো সে সুরপতির কাঁধে হাত রেখে বলল, তোমার ওপরেই আমাদের জীবন-মরণ নির্ভর করছে।

সুরপতির মনে হল, যেন কোনও নোংরা প্রাণী তার কাঁধের ওপর পিচ্ছিল হাত রেখেছে। তার ইচ্ছে হল, ঘৃণায় সে হাতটা ঠেলে সরিয়ে দেয়। এই হাত সুভদ্রাকে স্পর্শ করেছে, এই হাত সভুদ্রার শাড়ি খুলে নিয়েছে।

কিন্তু সুরপতি তখন বুধনাথের ওপর কোনও ক্রোধের ভাবই দেখাল না। সে বুঝে নিয়েছে, তাদের এখন পরস্পরের ওপর নির্ভর করতে হবে।

সে বিগলিত ভাবে হেসে বলল, আপনাকে যদি কোনও রকম সাহায্য করতে পারি, সে তো হবে আমার পরম সৌভাগ্য। তমলুক থেকে দারুকেশ্বর পর্যন্ত — আপনার নাম জানে না কে?

বুধনাথ বলল, আবার আমার দিন আসবে। আবার আমি দল গড়ব। টুপিওয়ালা গোরাদের সঙ্গে সামনাসামনি লড়াই করে পারা যাবে না, ওদের কৌশলে শেষ করতে হবে।

একটু থেমে, হঠাৎ সুরপতির দাড়ি চেপে ধরে বলল, তোমার নাম বংশীলাল নয়?

সুরপতি বলল, না তো!

বুধনাথ হা-হা করে হেসে বলল, আমার কাছে লুকোতে পারবে না। যতই বড় বড় দাড়িগোঁফ রাখো, আমি ঠিক চিনেছি। বল্লারপুরে তুমি একবার আমার মুখোমুখি পড়েছিলে, মনে আছে? তুমি একটি গৃহস্থবাড়ির মেয়েকে নিয়ে পালাচ্ছিলে, হঠাৎ আমি দলবল নিয়ে এসে পড়ি, মনে নেই?

সুরপতি বুঝল, প্রতিবাদ করে লাভ নেই। তাই চুপ করে রইল।

বুধনাথ বলল, সেবার তুমি অতি কৌশলে আমার হাত ছাড়িয়ে পালিয়েছিলে। ছদ্মবেশ ধারণে তোমার জুড়ি নেই। তুমি প্রায় চোখের নিমেষে রূপ পালটে ফেলে এক সন্ন্যাসী সাজলে। আমারও চোখে ধন্ধ লেগে গেল। স্ত্রীলোকটিকে তুমি অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে রেখে গিয়েছিলে এক গাছতলায়। অবশ্য যাবার আগে তুমি তার গয়নাগাঁটি সব খুলে নিয়েছিলে। ধূর্তচূড়ামণি, এবার তোমাকে হাতের কাছে পেয়েছি! তোমার এই দাড়িও কি নকল নাকি?

বুধনাথ সুরপতির দাড়ি ধরে টান দিল জোরে। প্রচণ্ড ব্যথা লাগলেও মুখ অবিকৃত রাখল সুরপতি। গম্ভীর স্বরে বলল, বুধনাথ, এখন তুমি আর আমি একই জায়গায় এসে ঠেকেছি। এখন আর শত্রুতা করে লাভ কী? হাত সরাও।

বুধনাথ বলল, তুমি একা একা কাজ সারতে, কখনও দল গড়োনি। একা কারবার চালাবার অবশ্য কিছু সুবিধে আছে, বিশেষত যদি মেয়েদের কারবার হয়। ধরা পড়লে কী করে?

এবার কোনও কথা না বলে সুরপতি নিজের কপালটা ছুঁয়ে দেখাল।

বুধনাথ বলল, ঠিক! নিয়তিকে এড়াবার কোনও উপায় নেই। যাই হোক, পুরনো কথা মনে রেখে আর লাভ নেই। আজ থেকে আমরা দোস্ত। হাতে হাত দাও।

সুরপতি সহাস্যে বুধনাথের ডান হাতটা চেপে ধরল। মনে মনে বলল, প্রথম সুযোগেই আমি তোমাকে খুন করব বুধনাথ। তোমাকে আমি ছাড়ব না।

সেই দিন থেকে বুধনাথ সব সময় সুরপতির কাছাকাছি থাকে, আর জেল ভেঙে পালাবার বুদ্ধি আঁটে। এক-একটা মতলবের ঠিক হয়, আবার নানা দিক চিন্তা করে সেটা বাতিল হয়ে যায়। বুধনাথের দলের লোকেরা অন্ধের মতো এখনও তার হুকুম মেনে চলে। অন্য কয়েদিদের মধ্য থেকে খুব বেছে বেছে আরও তিন জনকে দলে আনা হল। তবে এর মধ্যে সুরপতিই সব চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য, কারণ এখন সে যেমন সকলের চেয়ে বেশি বলশালী, তেমনি তার বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ। সে ঠাণ্ডা মাথায় সব দিক ভেবে দেখতে পারে। সে আর আগের সেই নিরীহ বিনীত সুরপতি নেই।

বুধনাথ জীবনে কখনও কারুর হুকুম মেনে চলেনি, তাই কারাগারের জীবন মানিয়ে চলা তার পক্ষে খুবই শক্ত হচ্ছিল। সে নানা রকম বিকৃত ভোগলিাসে অভ্যস্ত, এ-রকম প্রতি দিনের পাথর-ভাঙা শ্রম তার সহ্য হয় না। সব চেয়ে অসহ্য হয় রক্ষীদের হুকুম মেনে চলা। কথায় কথায় সে দপ করে জ্বলে ওঠে।

এক দিন এক রক্ষী প্রায় খেলাচ্ছলেই বুধনাথের পিঠে কশাঘাত করতেই বুধনাথ খেপে গিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর রক্ষীর হাত থেকে কশা কেড়ে নিয়ে সপাটে মারল তার মুখে। আরও কয়েক জন রক্ষী তার দিকে ছুঠে আসতেই সে এলোমেলো ভাবে কশা চালাতে চালাতে ছুটল প্রধান দ্বারের দিকে।

দূর থেকে তা দেখেই সুরপতি বুঝল, বুধনাথের মস্তিষ্ক-বিভ্রম ঘটেছে। প্রধান দ্বারের কাছে বর্শাধারী প্রহরীরা রয়েছে, তারা নিমেষে বুধনাথের দেহ ফুঁড়ে ফেলবে। সুরপতি একটা বড় পাথরের খণ্ড গড়িয়ে দিল বুধনাথের পায়ের দিকে। তাতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল বুধনাথ আর অমনি এক জন কশাধারী সৈনিক গিয়ে তার চুলের মুঠো ধরল। তারপর মারতে মারতে তাকে নিয়ে গেল কারাকক্ষের দিকে। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সুরপতি। প্রধান দ্বার পর্যন্ত পৌঁছলে বুধনাথ কিছুতেই প্রাণে বাঁচত না।

তারপর সুরপতি নিজেই বিস্মিত হল। সে কেন বুধনাথকে প্রাণে বাঁচাতে গেল? বুধনাথ তার চরমতম শত্রু! জেল থেকে পলায়নের সঙ্গী হিসেবে সে বুধনাথকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়? তাও নয়, কারণ পলায়নের সব ব্যবস্থা সে করে ফেলেছে, তাতে বুধনাথের সাহায্যের খুব বেশি প্রয়োজন নেই। তবে? সুরপতি বুধনাথকে সামান্য এক জন রক্ষীর হাতে নিহত হতে দিতে চায় না। তার সঙ্গে সুরপতির নিজস্ব বোঝাপড়া আছে।

তারপর এক দিন সন্ধের পর, কারাগারের মধ্যে মাঠের এক পাশে জেলরক্ষীদের ছাউনিতে আগুন লাগল। ছাউনির মধ্যে জেলরক্ষীদের স্ত্রী-পুত্রকন্যা থাকে, আগুন দেখে তারা দিশেহারা হয়ে গেল।

বন্দিদের তখন খাবার সময়, তাদের সারিবদ্ধ ভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল খাবার ঘরে, হঠাৎ সব কিছু বিপর্যস্ত হয়ে গেল। বন্দিরাও চেঁচিয়ে উঠলো, আগুন, আগুন। জল। জল।

যেন বন্দিরাও কারারক্ষীদের ছাউনিতে আগুন নেভাতে সাহায্য করতে চায় — এইভাবে তারা ছুটে গেল সে-দিকে। কিছু কিছু চেষ্টাও করলো আগুন নেভাবার। এবং সুরপতি ও বুধনাথ এরই মধ্যে আরও বেশি করে আগুন ছড়িয়েও দিতে লাগল। এক জন কারারক্ষী বুধনাথকে সেই অবস্থায় দেখে ফেলেছিল, বুধনাথ সবলে তাকে উঁচুতে তুলে ছুঁড়ে দিল আগুনের মধ্যে। তারপর নিজেই সে চেঁচিয়ে উঠল, বাঁচাও, বাঁচাও! মানুষ পুড়ছে!

বুধনাথ এবার অন্ধকারের মধ্যে তীক্ষ্ণ শিস দিতে দিতে উলটো দিকে দৌড়াল। তার দলের লোকেরাও চলে এল তার পিছু পিছু।

দড়ির মই আগে থেকেই তৈরি করে লুকিয়ে রাখা ছিল, ঝপাঝপ সেই মই বেয়ে সকলেই উঠে গেল প্রাচীরের ওপরে, তারপর উলটো দিকে লাফ দিল। প্রাচীরের এ-পারে কী আছে কেউ জানে না, অত উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়ায় কারুর হাত ভাঙল, কারুর পা ভাঙল, কিন্তু মুক্তির আনন্দে সবাই উল্লসিত।

সুরপতির মাথা ঠাণ্ডা, সে অমন ভাবে লাফাল না। সে প্রাচীরের ওপর উঠে সাবধানে চারপাশ চেয়ে দেখল। এখানে প্রাচীরের নিচে গড়ানে পাহাড়। সে দড়ির মইটা গুটিয়ে নিয়ে প্রাচীরের ওপর দিয়েই সাবধানে হাঁটতে লাগল।

বুধনাথ তাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ?

সুরপতি গম্ভীর ভাবে বলল, এসো আমার সঙ্গে।

তারপর একটা সুবিধা মতো জায়গা দেখে মই লাগিয়ে সুরপতি শেষবার কারাগারের ভেতরটা দেখে নিল। আগুনের শিখা এখন লক লক করছে সারা ছাউনি জুড়ে। এ-দিকে এখন কেউ আসবে না। বুধনাথ ও সুরপতি নেমে পড়ল উলটো দিকে।

সুরপতি বলল, এবার চলো, সঙ্গীদের খোঁজে যাই।

বুধনাথ তার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল, দুর নির্বোধ! ওদের খোঁজে গিয়ে কী হবে? ওই সব কানা খোঁড়াদের নিয়ে আমার কোনও কাজ হবে না। আমি দল গড়ব নতুন লোক নিয়ে। ওরা মরুক বাঁচুক, তাতে আমাদের কী? এসো আমরা পালাই।

সুরপতি বলল, ওরা তোমার এত দিনের সঙ্গী, তুমি ওদের খবর নেবে না?

বুধনাথ বলল, গোল্লায় যাক!

দু'জনে অন্ধকারের মধ্যে ছুটল।

কারাগারটি তৈরি করা হয়েছিল বেছে বেছে একটা দুর্গম জায়গাতেই। এক দিকটা শুধু উঁচু-নিচু পাথর আর জঙ্গল, পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটা খরস্রোতা নদী। এই রাস্তায় দৌড়ানো খুব সহজ কাজ নয়। যে-কোনও মুহূর্তে রক্ষীরা বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে। একমাত্র উপায় নদীটা পার হওয়া।

সুরপতি নদীর জলে একটুখানি পা দিয়ে দেখল, অসম্ভব তেজি স্রোত, জলও তেমনি ঠাণ্ডা। এ নদী সাঁতরে পার হওয়া যাবে না। তখন তার অনুতাপ হল, কেন দড়ির মইটা ফেলে এসেছে! সেটা থাকলে গাছের ডালে বেঁধে একটা কিছু উপা করা যেত। কিন্তু এখন আর ফিরে গিয়ে নিয়ে আসার সময় নেই।

নদীর ধার ঘেঁষেই হাঁটতে লাগল ওরা। কিন্তু এ-ভাবে বেশি দূর যাওয়া যাবে না। সামনেই খাড়া পাহাড়, এ পাহাড়ে উঠতে বহু সময় লেগে যাবে। তাছাড়া রক্ষীরা যদি ঘোড়া ছুটিয়ে আসে, তাহলে ধরে ফেলবে অনায়াসেই। সুরপতির মধ্যে বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙক্ষা ছটফট করছে, সে আর কিছুতেই ধরা দেবে না। এক জায়গায় দেখল, নদীর ওপর একটা তালগাছ অনেকখানি হেলে আছে। সেটা প্রায় নদীর তিন-চতুর্থাংশ পেরিয়ে এসেছে, কিন্তু বাকিটা পেরুবার উপায় কী?

সুরপতি তবু বলল, বুধনাথ তুমি দাঁড়াও, দেখি আমি কোনও উপায় করতে পারি কি না।

সুরপতি তালগাছটার ওপরে উঠে গেল। একেবারে ডগার কাছে এসে দেখল, এখনও বেশ খানিকটা দূরে তীর। এখান থেকে লাফাবার কথা ভাবলেই গা ছম ছম করে।

বুধনাথ চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী, পার হওয়া যাবে?

সুরপতি বলল, না।

তবু সে তালগাছের ডালটা ধরে ঝুলে পড়ল। নিচে জলের স্রোত, ওর মধ্যে পড়ল আর বাঁচার আশা নেই। তা-ও সে অনেক কষ্টে নিজের শরীরটাকে দুলিয়ে তারপর হাত ছেড়ে দিল।

সুরপতি জলের মধ্যেই পড়ল, তবে তীরের অনেকটা কাছে। স্রোতে ভেসে যাবার আগেই সে হ্যাঁচোড় প্যাঁচোড় করে একটা গাছের শক্ত শিকড় ধরে ফেলল। তারপর ওপরে উঠে আসতে আর বিশেষ বেগ পেতে হল না।

ওপরে উঠে সে হাঁপাতে লাগল। সে নিশ্চিত মৃত্যুর কাছ থেকে ফিরে এসেছে। নদীটা যেন জীবন্ত, প্রবল শক্তিতে তাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছিল। একবাব এই স্রোতের টানে পড়লে আর নিস্তার নেই।

বুধনাথ ও-পার থেকে সুরপতিকে লক্ষ্য করছিল। সুরপতি নির্বিঘ্নে পারে উঠে যাবার পর সে দুঃখিত ভাবে বলল, বংশীলাল, তুমি আমাকে ফেলে চলে গেলে?

সুরপতি বলল, তুমিও এসো।

বুধনাথ বলল, আমি ও-ভাবে পারব না। তুমি বেঁচে গেছ দৈবাৎ। দৈবতা আমার ওপর সদয় নাও হতে পারে!

সুরপতি বলল, তাহলে আর আমি কী করতে পারি বলো? আত্মরক্ষা মানুষের ধর্ম, আমিও আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছি মাত্র।

এই সময় দূরে কিছু কোলাহল শোনা গেল। তবে কি রক্ষীদল এই দিকেই আসছে? সুরপতি দেখল আর অপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সে প্রস্থানের উদ্যোগ করে বুধনাথের উদ্দেশে বলল, বিদায়।

বুধনাথ কাতর ভাবে বলল, যেও না! যেও না! আমি আসছি, তুমি আমাকে একটু সাহায্য করো।

বুধনাথ তালগাছের ওপর উঠে এল। তার এক হাতে জোর নেই, তাই তাকে অতি সাবধানে আসতে হয়। ডগার কাছে এসে সে খুব ভয় পেয়ে গেল। এখান থেকে লাফিয়ে পড়া খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু দূরের কোলাহলটা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। আর দেরি করার উপায় নেই।

সে-ও সুরপতির মতো ঝুলে পড়ল। কিন্তু এক হাতে সে শরীর দোলাতে পারছে না। তার বিশাল শরীরের ভার ওই এক হাতে ধরে রাখাও যাচ্ছে না। সে চিৎকার করে বলল, বংশীলাল আমাকে ধরো, আমি পারছি না!

সুরপতি জলের মধ্যে খানিকটা নেমে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়েও হাতটা গুটিয়ে নিল।

তারপর সে দৃঢ়স্বরে বলল, না। বুধনাথ, তুমি কোনও দিন কারুর সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়েছ? তবে আজ কেন নিজে সাহায্য চাইছ? এইমাত্র তুমি তোমার পুরনো সঙ্গীদের ফেলে এলে।

বুধনাথ আর্তনাদ করে বলল, বাঁচাও। আমি আর পারছি না। তুমি যা চাও, তাই দেব। আমার এখন অনেক ধনরত্ন লুকোনো আছে, তোমাকে সব দেব, বাঁচাও বংশীলাল।

সুরপতি বলল, আমার নাম বংশীলাল নয়। আমি সুরপতি। বল্লারপুরের কাছে জঙ্গলের মধ্যে তুমি আমার স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছিলে, আমারই চোখের সামনে।

বুধনাথ বলল, তুমি আমাকে একশো ঘা চাবুক মেরো, আমি তোমার ক্রীতদাস হয়ে থাকব, বাঁচাও, আমার হাত ছিঁড়ে যাচ্ছে!

সুরপতি বলল, কুকুর, তুই যার জীবন নষ্ট করে দিয়েছিস, তার কাছেই আজ আবার নিজের প্রাণভিক্ষা করছিস?

বুধনাথ বলল, তুমি আমার নাকটা কেটে দাও, কান দুটো কেটে নিও, তবু আমাকে বাঁচতে দাও, আমাকে শুধু প্রাণে বাঁচিয়ে রাখো।

আমার স্ত্রী বিষ খেয়ে মরতে চেয়েছিল, তুই তবু তাকে —।

তুমি আমার চোখ দুটো অন্ধ করে দিও। আমার পুরুষত্ব নষ্ট করে দিও, তবু তুমি আমার প্রাণটা শুধু ভিক্ষে দাও, আমি আর পারছি না। আমার হাত ছিঁড়ে যাচ্ছে, পারছি না, বাঁচাও।

নিচের দিকে চেয়ে দেখ কুকুর! এই নদীর জল তোকে কামড়ে খেয়ে ফেলবার জন্য হাঁ করে আছে।

আমাকে বাঁচাও, আমার যা ধনরত্ন আছে, তাতে তোমার সাত পুরুষ সুখে থাকবে, সব তোমাকে দেব, আমি পথের ভিখির হয়ে থাকব।

ভিখারিরও হৃদয় আছে, তোর তা-ও নেই, তুই বেঁচে থাকার যোগ্য নোস।

অসম্ভব মনের জোর বুধনাথের, সে এখনও এক হাতে ধরে আছে গাছটা। যদি একবার শরীরটা দোলাতে পারে, তাহলেই এ-পারের দিকে এসে লাফিয়ে পড়বে। সেইটুকুই সে পারছে না। তার ভারি শরীর, তার একটা হাত অকেজো।

বুধনাথকে মারার জন্য সুরপতি নদীর কিনারা থেকে একটা বড় প্রস্তরখণ্ড তুলল, কিন্তু সেটা ছুঁড়ে মারার আগেই বুধনাথের হাত ছেড়ে গেল, সে ঝুপ করে গিয়ে পড়ল জলের মধ্যে।

বুধনাথ পায়ের তলায় মাটি পেল না। বিকট আঁ-আঁ শব্দ করে সে স্রোতে ভেসে যেতে লাগল। নদীর মধ্যে মাঝে মাঝে মাথা জাগিয়ে আছে বড় বড় পাথব। তারই কোনও একটাতেই মাথায় ধাক্কা লাগায় একটু বাদেই বুধনাথেব কণ্ঠস্বর থেমে গেল।

সুরপতি জল থেকে উঠে মাটির ওপর বসে পড়ল। উত্তেজনায় তার নাক দিযে বিরাট বিরাট দীর্ঘশ্বাস পড়ছে। চোখ দু'টি যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তার শরীরে অসম্ভব ক্রোধ এসে গিয়েছিল। বুধনাথকে সে নিজের হাতে খুন করতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত যে বুধনাথের রক্তে তার হাত রঞ্জিত হল-না। সেটা এক হিসেবে ভালই। তার প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে, কিন্তু বীভৎস কিছু করতে হয়নি। সে বুধনাথকে বাঁচার সুযোগ দেয়নি মাত্র, কিন্তু হত্যা তো করেনি!

সুরপতি খুবই ক্লান্ত বোধ করছিল। কিন্তু আর দেরি করার উপায় নেই। ও-পারে খানিকটা দূরে এখনও মশালের আলো দেখা যাচ্ছে। আবার সে উঠে দৌড়াতে দৌড়াতে বনের মধ্যে মিলিযে গেল।

॥ ৫ ॥

ক্রমে পার হয়ে গেল তিথির পর তিথি, মাসের পর মাস। সুরপতির কাছে কালের হিসাব নেই। তবু সে মনে মনে গণনা করে খানিকটা অনুমান করল যে, কারাগারের দিনগুলি সমেত প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর কেটে গেছে।

এর মধ্যে সে সুভদ্রা ও ধ্রুবকুমারের কোনও সংবাদই পায়নি। তারাও জানে না সুরপতির খবর। তারা বেঁচে আছে কি না কে জানে!

সহায়সম্বলহীন অস্থায় কী-ভাবেই-বা বেঁচে থাকবে!

তবু সুরপতি কারাগার থেকে বেরিয়ে প্রথমেই দারুকেশ্বর গেল না। কারাজীবনের বিভীষিকার কথা সে ভুলতে পারে না। আব্বার সে কোনও ক্রমেই ধরা পড়তে চায় না। সে তো সুরপতি হিসেবে

ধরা পড়েনি, সে ধরা পড়েছে বংশীলাল হিসেবে। বোঝা যায় বংশীলালের ওপর অনেকেরই অনেক রাগ আছে। সুতরাং জেলপলাতক বংশীলালের জন্য আবার খুব খোঁজাখুঁজি চলবেই।

সুরপতির মুখে এখন দাড়িগোঁফের জঙ্গল। সেগুলো সে ইচ্ছে করেই নির্মূল করল না। কারণ তার দাড়ি কামানো মুখের সঙ্গেই বংশীলালের মিল।

আন্দাজে দিকনির্ণয় করে সে চলতে লাগল দারুকেশ্বরের বিপরীত দিকে। প্রথম কিছু দিন রইল সে এক অরণ্যের মধ্যে লুকিয়ে। অতিকষ্টে ফলমূল সংগ্রহ করে ক্ষুধা মেটায়। ক্বচিৎ-দৈবাৎ কোনও মানুষজন দেখলেই সে ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে, যেন সে অরণ্যের এক ভীত অসহায় পশু। যে-কোনও মানুষকেই তার ভয়।

এইভাবেও কাটল কয়েক মাস। তারপর সুরপতি এক দিন সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। অরণ্যের জীবনে সে যেন বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, কোনও রকমে ক্ষুধানিবৃত্তি করতে পারলেই আর কোনও চিন্তা নেই, তারপর নিশ্চিন্তে নিদ্রা দেওয়া যায়। আর কোনও দায়িত্ব নেই, আর কোনও ভয় নেই। এইভাবেই তার কাটবে নাকি সারা জীবন? সে সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারেব কোনও সন্ধান করবে না? সে এত স্বার্থপর?

এই উপলব্ধি হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে বেরিয়ে পড়ল অরণ্য থেকে। এখন আর তাকে দেখে কেউ সভ্য সমাজের মানুষ বলেই মনে করবে না, কে চিনতে পাববে তাকে? তবু সে সতর্ক হয়ে থাকে।

অরণ্য থেকে বেরিয়ে সে এমন এক রাজ্যে উপস্থিত হল, যেখানকার মানুষজনের পোশাক-পরিচ্ছদ অন্য রকম, ভাষাও আলাদা। যাক, তাহলে এ রাজ্যে নিশ্চয়ই কেউ বংশীলালকে চেনে না!

সে অজানা গ্রামগঞ্জে ঘুরতে লাগল। তার পোশাক শতছিন্ন, শরীরে পুরু ময়লা, দাড়িগোঁফের মধ্যে কোটরগত চোখ, তাকে দেখায় ঠিক পথের পাগলের মতো। খিদের জ্বালায় সে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে। যে-দিন ভিক্ষে ঠিক মতো পায় না, সে-দিন রাগে তার শরীর জ্বলে। তার এখন শক্তসমর্থ দেহ, প্রচুর খাদ্যেব প্রযোজন, অনাহারের কষ্ট সে সহ্য করতে পারে না। এক-এক দিন সন্ধের দিকে তার ইচ্ছে হয়, পথের ধারে লুকিয়ে থেকে কোনও পথিকের মাথায় ডাণ্ডা মেরে তার যথাসর্বস্ব কেড়ে নেয়।

কিন্তু অতি কষ্টে সে নিজেকে দমন করে। সে পাপের পথে কিছুতেই যাবে না। একবার ও-পথে গেলে আর ফেরার উপায় নেই। তাহলে সে আর কোনও দিনই সুভদ্রা ও ধ্রুবকুমারের কাছে যেতে পারবে না। ওদের দু'জনের কথা মনে পড়লেই তার চোখে জল আসে। সে তো জ্ঞানত কোনও অপরাধ করেনি, তবু এই দুর্ভাগ্যের মালা কে তার গলায় পরিয়ে দিল! নিয়তি? তাকে নিয়ে নিযতির এই নিষ্ঠুর খেলা কেন?

সারা দিন ভিক্ষার পর যেটুকু খাদ্য সে পায়, তা নিয়ে সে কোনও নির্জন প্রান্তরের বৃক্ষতলায় বসে। যতটুকু খাদ্যই তার কাছে থাক, সে তার তিনভাগ করে। নিজে একভাগ খেয়ে, বাকি দু'ভাগ রাখে সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারের নামে। ক্ষুধায় তার পেট জ্বলে, তবু সে নিজের স্ত্রী-পুত্রকে ভাগ না দিয়ে খাবে না। এইভাবে সে সুভদ্রা ও ধ্রুবকুমারের কথা মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখে।

রাত্রিবেলা সে শুয়ে থাকে উন্মুক্ত আকাশের নিচে। গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে তার চোখে জল আসে। কেউ তাকে দয়া করল না। স্ত্রী-পুত্রের কথা অনেকক্ষণ ভাবতে ভাবতে তার মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়। চোখে ঘোর আসে। সব কিছু অন্ধকার হয়ে যায়। আবাব মনে হয়, তার শিয়রের কাছেই বসে আছে সুভদ্রা ও ধ্রুবকুমার, সে তাদের জীবন্ত স্পর্শ পাচ্ছে। তখন খুব চেষ্টা করেও কিছুতেহ

জেগে উঠতে পারে না সুরপতি। সে গভীর দুঃখে চেঁচিয়ে ওঠে, আমি কে? আমি কে? সুভদ্রা, বলো বলো, আমি কি সেই সুরপতি? তাহলে তোমরা লুকিয়ে আছ কেন?

সে এক অঞ্চলে বেশি দিন থাকতে পারে না। গ্রাম্য শিশুরা তাকে পাগল মনে করে বড় জ্বালাতন করে। তাকে কাঠি দিয়ে খোঁচায়, তাকে ঢিল মারে।

সুরপতি শিশুদের উদ্দেশে হাতজোড় করে বলে, বাবা সকল, আমাকে মেরো না, আমি বড় দুঃখী লোক।

শিশুরা সেই কথা শুনে খল খল করে হাসে। শিশুদের মতো নিষ্ঠুর আর কেউ নেই। তারা সুরপতির অনুনয়-বিনয়কে নতুন ধরনের পাগলামি মনে করে তাকে ভ্যাঙায়। সুরপতি যখন রাস্তা দিয়ে যায়, তখন একপাল শিশু তাকে ভেঙাতে ভেঙাতে পিছু পিছু যায়।

সুরপতি লোকের বাড়িতে গিয়ে কাজ চেয়েও দেখেছে। কেউ দেয় না। সকলেই তার চেহারা ও পোশাক দেখে ভয় পায়। কিন্তু নতুন পোশাক কেনার সামর্থ্য যে তার নেই, কেউ বোঝে না। সকলেই তার কথা শোনার আগেই তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়।

একটি গ্রামের দুষ্ট শিশুরা তাকে জ্বালাতন করতে করতে এক সময় তার পরিধানের কাপড়টা সম্পূর্ণই ছিড়ে দিল। তার কাপড় এমনিতেই ঝুলিঝুলি হয়ে গিয়েছিল, এখন আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না।

রাস্তার ওপর সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে সুরপতি হঠাৎ সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে গেল। বালকরা তার গায়ে ঢিল মারছে, কাঠির খোঁচা দিয়ে তার শরীর রক্তাক্ত করে দিচ্ছে, তবু তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে মনে মনে ভাবছে, দেখো সুরপতি, আজ তোমার কী অবস্থা! তুমি সপ্তগ্রামের সম্ভ্রান্ত বংশের আদরের দুলাল ছেলে। আজ তুমি ক্ষুধার্ত, উলঙ্গ, অপমানিত। এর চেয়ে চরম অবস্থা আর কী হতে পারে? এরপর কি আরও কিছু আছে? যদি থাকে তো শেষ দেখে নাও।

কাছাকাছি বাড়ি থেকে একটি লোক মোটা বাঁশ নিয়ে ছুটে এল। সুরপতির পিঠে সেই বাঁশের এক ঘা বসিয়ে দিলে লোকটি বলল, হতভাগা, আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে নচ্ছারপনা হচ্ছে? দূর হয়ে যা!

লোকে যে-রকম ষাঁড় বা পথের কুকুরকে মেরে তাড়ায়, এর ভঙ্গি ঠিক সেই রকম। সুরপতির একবার মনে হল, লোকটির হাত থেকে বাঁশটা কেড়ে নিয়ে ওরই মাথায় এক ঘা মেরে দেয়। নিরপরাধকে শাস্তি দেবার ফল কী হয়, ও একটু টের পাক।

তারপর সুরপতি ভাবল, নিরপরাধরাই তো শাস্তি পায়। তার অর্থবল নেই, তার প্রতিপত্তিসম্পন্ন বান্ধব নেই। সে কারুর কাছে প্রমাণ করতে পারবে না যে সে নিরপরাধ। সবাই তাকে আবার শাস্তি দেবে। আবার সেই কারাগার।

সে লোকটির সামনে মাথা নিচু করে বলল, মারুন! আমাকে মেরে শেষ করে দিন।

আবার সে মাথা সরিয়ে নিল। না, এ-ভাবে মরা চলবে না। তাহলে সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারের সঙ্গে আর দেখা হবে না। ওদের সঙ্গে একবার শেষ দেখা করতেই হবে। যদি সুভদ্রা আজও বেঁচে থাকে, তাকে সুরপতি জানাবে যে, সে ইচ্ছে করে ওদের পরিত্যাগ করে চলে যায়নি। বুধনাথের কাছে ধর্ষিতা হবার পর লজ্জায় ঘৃণায় সুভদ্রার বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সুরপতি তো লজ্জায় ঘৃণায় পত্নী-পুত্রকে পরিত্যাগ করতে চায়নি!

সে বংশধারী লোকটিকে বলল, আমি চলে যাচ্ছি।

লোকটি তবু পিছন থেকে এক ঘা মারল সুরপতির পিঠে। কেটে গিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। মানুষ মানুষকে এমনিই মেরে আনন্দ পায়।

অন্য একটি বাড়ি থেকে আর একটি লোক বেরিয়ে এসে বলল, এখানে কী ব্যাপার হচ্ছে?

আগের লোকটি বলল, এই বেল্লিকটা আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কু-দৃষ্টি দিচ্ছিল। একে শায়েস্তা করা দরকার। আবার মুখের ওপর বলে কিনা মারুন!

দ্বিতীয় লোকটি বলল, মোটেই না, একে দেখে তো অসৎ লোক মনে হয় না। ইনি নিশ্চয়ই কোনও মুক্ত সাধুপুরুষ। আসুন সাধুবাবা, আমার বাড়িতে আসুন।

দ্বিতীয় লোকটি সুরপতিকে ডেকে নিয়ে গেল নিজের গৃহের দিকে। তারপর ফিস ফিস করে বলল, বাপু হে, তুমি তো সাধুপুরুষ নও, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা নেই, হাতে কমণ্ডলু নেই, দেখেই বুঝতে পারছি তুমি কোনও খুনি আসামি। তা হোক, তোমাকে আমি পরিধানের বস্ত্র দেব, পেট-চুক্তি আহার দেব, আরও দশটি সিক্কা টাকা দেব। তার বদলে তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। ওই যে লোকটি তোমার পিঠে বাঁশের ঘা মারল, ওর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিতে হবে। পারবে?

দুই পড়শিব বিবাদ, তার মধ্যে এক জন অপর জনের বিরুদ্ধে সুরপতিকে কাজে লাগাতে চায়। সুরপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এর নাম সংসারধর্ম। এর চেয়ে তার অরণ্যের জীবন অনেক ভাল ছিল।

সুরপতি লোকটির কথার কোনও উত্তর দিল না। শুধু একটু হেসে পিঠ ফেরাল।

সুরপতি সোজা হাঁটতে আরম্ভ করল। এক সময় সে এসে পৌঁছল গ্রামের শ্মশানে। এক শান্ত নদীর তীরে।

যাক, শ্মশানে কোনও ভয় নেই। শ্মশানে কেউ অত্যাচার করে না। এখানে সে উলঙ্গ থাকলেও কারুর সম্ভ্রম নষ্ট হবে না। শ্মশানের পাশেই তিন-চারটি প্রাচীন বটগাছ। কিছু পোড়া কাঠ, কয়েকটা ভাঙা হাড়ি পড়ে আছে, মানুষজন নেই।

সুরপতি একটা গাছতলায় উপুড় হয়ে শুয়ে অনকক্ষণ ধরে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদল। লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে তার কান্নায় কেউ ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে না।

কেঁদে কেঁদে বুক হালকা করে এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

তারপর অন্ধকার হল, প্রবল বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির মধ্যে একবার জেগে উঠেও সুরপতি স্থানত্যাগ করল না। গাছের তলার চেয়ে আর কোন্ ভাল জায়গা সে পাবে? ক্ষুধায়, ক্লান্তিতে তার উঠতেও ইচ্ছে করল না। আবার ঘুমোল।

তার পরিপূর্ণ ঘুম ভাঙল শেষরাত্রে। কয়েকটি নিশ্বাসের ফোঁস ফোঁস শব্দে। চোখ মেলে দেখল, তার কাছাকাছি শেয়াল ঘোরাফেরা করছে। এরা কি তাকে মৃত ভেবে খেতে এসেছিল? সুরপতি ধড়মড় করে উঠে বসল।

সে দেখল অদূরে সাদা পোশাক পরা আর একটি লোক চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তার পাশে চার-পাঁচটা শেয়াল।

সুরপতি ভাবল, তার মতো এমন দুর্ভাগা আর কে আছে যে, এই শ্মশানে ঘুমোতে এসেছে?

সে দু'একটা পোড়া কাঠ তুলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে শেয়ালগুলোকে তাড়াল। তারপর সেই লোকটির কাছে চলে এলে।

লোকটির পাশে নিঃশব্দে বসল সুরপতি। লোকটির অঙ্গে বেশ শৌখিন পরিচ্ছদ। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে প্রায় সুরপতির মতো। লোকটির মুখ অবশ্য দেখা যাচ্ছে না, লোকটি শুয়ে আছে মাটিতে মুখ গুঁজে।

লোকটি তো সুরপতির মতো উলঙ্গ আর নিঃস্ব নয়। তবু কী তার এমন দুঃখ যে, শ্মশানে এসে শুয়ে আছে!

সুরপতি ভাবতে লাগল, লোকটিকে জাগানো ঠিক হবে কি না। যদি লোকটি বিরক্ত হয়? কিন্তু যে-ভাবে শেয়ালের দল ঘোরাফেরা করছে, তাতে এখানে এ-ভাবে শুয়ে থাকাও বিপজ্জনক। সে মৃদুস্বরে ডাকল, ভদ্র, উঠুন!

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

সে আবার ডাকল, ভদ্র, উঠুন! এ-ভাবে শুয়ে থাকবেন না!

এবারেও সাড়া না পেয়ে সুরপতি লোকটির অঙ্গ স্পর্শ করল। সঙ্গে সঙ্গে সে চমকে উঠল। স্পর্শমাত্রই বোঝা গেছে যে, লোকটি মৃত। নিশ্চয়ই লোকটিকে দাহ করতে আনা হয়েছিল, বৃষ্টি-বাদলার মধ্যে শ্মশানবন্ধুরা ওকে এই অবস্থায় ফেলে পালিয়েছে।

সুরপতি মৃতদেহটি উলটে দিয়ে আবার বিস্ময়ের শব্দ করে উঠল। মৃতের বুকে একটি আমূল ছুরি বেঁধা। এবং মৃত লোকটিকে দেখতেও যেন ঠিক সুরপতির মতো। যেন সুরপতিই এখানে ছুরিবিদ্ধ অবস্থায় নিহত হয়ে পড়ে আছে। সুরপতির এখনকার চেহারা নয়, সপ্তগ্রামে ধনীর দুলাল হিসেবে তার এই রকমই রূপ ছিল। তাহলে এই কি বংশীলাল? এই তার জীবনের কুগ্রহ? বংশীলালের শেষ পর্যন্ত এই নিয়তি হল? কিন্তু আর একটু খুঁটিয়ে দেখার পর সুরপতি বুঝতে পারল, লোকটির সঙ্গে তার চেহারার বেশ কিছু অমিলও আছে। এর নাক একটু বেশি তীক্ষ্ণ, মাথায় চুল সামান্য কুঞ্চিত। বোধহয় এ বংশীলাল নয়, অন্য কেউ।

মৃতদেহটির পাশে একটি মাটির মালসায় কিছু চাল আর ফুল বেলপাতা। ক্ষুধার জ্বালায় সে সেই কাঁচা চালই চিবিয়ে চিবিয়ে খেল খানিকটা। আর খানিকটা চাল সেই মৃত লোকটির মুখেও গুঁজে দিল, যাতে কোনও অবিচার না হয়।

মৃত লোকটির দিকে তাকিয়ে সুরপতির মাথায় একটা পরিকল্পনা এল। এবার তার জীবন পালটাতে হবে। আর দেরি করা চলে না। সে প্রথমে নদীতে নেমে খুব ভাল করে স্নান সেরে নিল। বালি মাটি দিয়ে সারা শরীর মেজে পরিষ্কার করল। তারপর উঠে এসে মৃত লোকটির সমস্ত পোশাক খুলে সে নিজে পরে নিল। লোকটি প্রায় তারই বয়সী হবে। লোকটির দুই হাতে দু'টি সোনার আংটি ছিল। সে-দু'টিও খুলে নিতে সে দ্বিধা করল না। একটি আংটি লাল পাথরের, অন্যটি সবুজ। চুনি আর পান্না।

মৃত্যের কাছ থেকে এই উপকার পাওয়ার বিনিময়ে সে সেই মৃতদেহটি শিয়ালের খাদ্য হতে দিল না। কী ভেবে সে শেষ মুহূর্তে মৃতের বক্ষে বেঁধানো ছুরিটাও খুলে নিয়ে লুকিয়ে রাখল নিজের পোশাকের মধ্যে। দেহটি কোলে করে এনে সে নদীতে ভাসিয়ে দিল। তারপর সে পা চালাল জোরে জোরে।

রাত্রি শেষ হবার আগেই তাকে এ গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। এবার আর কোথাও নয়। দারুকেশ্বর।

মৃতের পোশাক পরে প্রায় নতুন মানুষ হয়ে সুরপতি শ্মশান ছেড়ে এসে উপস্থিত হল জনপদে। তার প্রথম কাজই হল কিছু অর্থ সংগ্রহ করা। দু'টি আংটির মধ্যে একটি বিক্রয় করলেই কিছু অর্থ পাওয়া যাবে। অপরের দ্রব্য বিক্রয় করার ব্যাপারে সুরপতির বিবেকে একটু খোঁচা লাগতে লাগল। সুরপতি এর আগে কোনও দিন পরের দ্রব্য ভোগ করেনি। কিন্তু সে এই বলে তার মনকে বোঝালো যে, মৃতের সম্পত্তি কারুর নয়। মৃতদেহটি সব সমেত নদীতে ভাসিয়ে দিলে এই আংটি দু'টি নদীগর্ভে লীন হয়ে যেত। তার বদলে কোনও মানুষের ভোগে লাগা অন্যায় নয়।

কিছু মানুষজনের কাছে খোঁজখবর নিয়ে সুবপতি জানল যে, দারুকেশ্বর সেখান থেকে বহু দূর। অন্তত সাত দিনের পথ। এই সাত দিনের একটা রাহাখরচ আছে। দারুকেশ্বরের সেই সরাইখানায় সুভদ্রা এবং ধ্রুবকুমার এখনও আছে কি না তার ঠিক নেই, তবু সেখান থেকেই অনুসন্ধান শুরু করতে হবে। নিঃস্ব অবস্থায় সুরপতি অনুসন্ধান চালাবেই-বা কী করে?

গঞ্জের হাটে এক মণিকারের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল সুরপতি। দু'টি আংটিই এক সঙ্গে বিক্রয় করা উচিত নয়, একটা থাক ভবিষ্যতের জন্য। একটা থাক আঙুলে,একটা যাক মণিকারের কাছে।

এবারেও একটা সমস্যা দেখা দিল। কোনটা বিক্রয় করবে, লাল না সবুজটা? চুনি না পান্না? দুটি আংটিই সমান সুন্দর, ওজনও দু'টিরই সমান। সুরপতি কিছুতেই মনস্থির করতে পারে না, একবার বাঁ হাত একবার ডান হাতের দিকে তাকায়। লাল না সবুজ? চুনি না পান্না?

শেষ পর্যন্ত সুরপতি পান্না-বসানো আংটিটিই নিজের কাছে রাখবে ঠিক করল। সবুজ পাথরটি যেন সাপের চোখের মতন দৃষ্টি আকৃষ্ট করে রাখল। সুরপতি লাল পাথর-বসানো আংটিটি নিয়ে মণিকারের দোকানে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে নিয়তি তার সঙ্গে আর একটা নিষ্ঠুর খেলা খেলল।

পৃথিবীর সব দেশের মণিকাররাই অতিশয় ধূর্ত হয়। এই মণিকারটিও সুরপতির কথাবার্তা শুনেই বিদেশি বলে বুঝে নিয়েছিল, তাই সেই মূল্যবান আংটিটি নিয়ে বহু দরাদরি করে শেষ পর্যন্ত পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রার বেশি দিতে কিছুতেই সম্মত হল না। সুরপতি সেই পাঁচ স্বর্ণমুদ্রা নিয়েই বেরিয়ে এল।

প্রথমেই তার প্রয়োজন জঠরাগ্নি নিবারণের। সেখানে গঞ্জের ব্যাপারিদের জন্য কয়েকটি ছোট ছোট পান্থশালা আছে, সেগুলি থেকে ভাত রান্নার গন্ধ ভেসে আসছে। একটি পান্থশালায় ঢুকে সুরপতি প্রায় তিন জন মানুষের খাদ্য এক সঙ্গে খেয়ে ফেলল। বহু দিন পর, সেই সপ্তগ্রাম ছেড়ে আসার পর এই প্রথম সে সুস্থির ভাবে বসে ইচ্ছানুরূপ আহার্য ভোগ করতে পারছে।

একটি স্বর্ণমুদ্রা ভাঙিয়ে সে দাম চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তারপর যাত্রা শুরু করল দারুকেশ্বরের পথে। বেশি দূর যেতে পারল না অবশ্য, এক প্রহর বাদেই সে একটি গাছতলায় বসে বমি করল। এত দিন বাদে এত প্রভূত পরিমাণে আমিষ-সহ খাদ্য তার সহ্য হবে কেন? অবশ্য বমির ফলে তার শরীর অনেকটা হালকা হয়ে গেল, সে তেমন অসুস্থ বোধ করল না। তবু তক্ষুনি পথ চলার বদলে সে ঘুমিয়ে রইল সেখানে।

ঘুম ভাঙার পর সে দেখল তার শিয়রের কাছে এক ব্যক্তি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুরপতি দ্রুত উঠে পড়ল। তার মনে হল, লোকটি নিশ্চয়ই কোনও তস্কর বা দস্যু। সুরপতির কাছে স্বর্ণমুদ্রা আছে, একটি মূল্যবান আংটি আছে, দস্যু তস্কররা তো আকৃষ্ট হবেই। অবশ্য এক-আধ জন দস্যু তার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। সুরপতি এখন আত্মরক্ষায় সক্ষম।

সুরপতি প্রশ্ন করল, আপনি কে?

লোকটি বলল, আমি এক জন পথিক। আপনার নিদ্রা-ভাঙার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

সুরপতি বলল, আপনার সঙ্গে আমার পূর্ব-পরিচয় আছে, এমন তো স্মরণ হয় না। আমার সঙ্গে আপনার কী প্রয়োজন?

লোকটি বলল, আমার মনে হল, আপনিও এক জন পথিক। আমার ইচ্ছা, আপনার সঙ্গে এক সঙ্গে পথ চলি। অপরাহ্ন হয়ে আসছে, পথে অনেক বিপদের আশঙ্কা আছে, তাই উভয়ের এক সঙ্গে যাওয়াই ভাল।

সুরপতি তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করল, আপনি কী-ভাবে ঘুমন্ত অবস্থাতেও আমাকে দেখে অনুমান করলেন যে, আমি এক জন পথিক?

লোকটি এবার হেসে উত্তর দিল, পথিক ছাড়া অন্য কেউ কি পথের ধরে বৃক্ষতলায় ঘুমোয়? বিরক্ত হবেন না, আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমি এক জন বণিক, আমার সঙ্গে বেশ কিছু অর্থ আছে, তাই আপনার সহায়তা চাই।

সুরপতির সন্দেহ আরও দৃঢ় হল। তস্কর বা প্রতাকরাই এরকম দুর্বল সেজে আসে। অন্য কেউ স্বেচ্ছায় নিজের কাছে অর্থ থাকার কথা প্রকাশ করে না।

সুরপতি জিজ্ঞেস করল, মহাশয় কোন পথে যেতে ইচ্ছে করেন? লোকটি দারুকেশ্বরের দিকের পথই দেখাল।

সুরপতি বলল, আমি এক জন ভবঘুরে, কোন পথে যাব তা এখনও স্থির করতে পারিনি, আপাতত আরও কিছুক্ষণ এই বৃক্ষতলে বায়ু সেবন করতে চাই। আপনি অন্য সঙ্গীর খোঁজ করুন।

লোকটি খুবই দুঃখের ভঙ্গি করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিনা বাক্যব্যয়ে চলে গেল। সুরপতি আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সেখানে। তারপর যাত্রা শুরু করল।

অপরাহ্ন গাঢ় হয়ে এসেছে, দীর্ঘ ছায়া নেমে আসছে ধীরে ধীরে। ধূ-ধূ করা প্রান্তরের মধ্যে পথ। সাবধানতার জন্য সুরপতি রাত্রে পদযাত্রা করতে চায় না। রাত্রে কোনও সরাইখানায় বিশ্রাম নেবে। দু'তিন ক্রোশের মধ্যেই আর একটি নগর আছে। সন্ধ্যার আগেই সেখানে পৌঁছতে হবে। আকাশের অবস্থা ভাল নয়, রাশি রাশি কালো মেঘ উড়ে আসছে কোথা থেকে।

কিছু দূরেই দেখা গেল একটা বৃক্ষের আড়ালে সেই লোকটি দাঁড়িয়ে আছে। পাশে এক জন সঙ্গী। স্থানটিতে ছায়া ছায়া অন্ধকার। সুরপতি বুঝে নিল যে, লোক দু'টির মতলব ভাল নয়। কিন্তু ভয়ের চিহ্ন দেখালে আরও বেশি বিপদ। তাই সে লোক দু'টিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই এগিয়ে গেল।

পিছন থেকে সেই লোকটি জিজ্ঞেস করল, ভবঘুরে মহাশয়, শেষ পর্যন্ত এই পথেই যাওয়া ঠিক করলেন নাকি?

সুরপতি বলল, হ্যাঁ।

দাঁড়ান, আমরাও সঙ্গে যাব।

আমার আগ্রহ নেই।

সুরপতি ঠিক সময়েই পিছনে ঘুরে তাকিয়েছিল, তখন এক জন তাকে মারবার জন্য একটি লাঠি তুলেছে। লাঠির আঘাত তার মাথায় না লেগে লাগল ঘাড়ে। সুরপতি ব্যাঘ্রের মতো লোক দু'টির ওপর লাফিয়ে পড়ল।

কারাগারে নিয়মিত কঠোর পরিশ্রম করার ফলে তার শরীর এখন লোহার মতো শক্ত। সুরপতি অতি অল্প সময়েই সেই দস্যু দু'টিকে জব্দ করে ফেলল, সে ছুরিকাঘাতে তাদের শেষ করে দিতে পারত, কিন্তু তার বদলে মুষ্টির আঘাতেই ওদের অজ্ঞান করে ফেলল। তারপর ওদেরই বস্ত্র নিয়ে ওদেরই হাত-পা শক্ত করে বেঁধে ফেলে রাখল সেখানে।

এই ক্ষুদ্র ঘটনায় সুরপতির মনের জোর বেড়ে গেল অনেক। দু'জন দস্যুকে সে এত সহজে ভূপাতিত করেছে যে, এরপর একটি বড় দল আক্রমণ করলেও সে তেমন ভয় পায় না।

লোক দু'টি মুক্তির জন্য কাকুতি মিনতি করছে। কিন্তু সুরপতি আর ভ্রূক্ষেপ করল না। লোক দু'টিকে সারা রাত এখানে পড়ে থাকতে হবে, সকালবেলা কেউ না-কেউ নিশ্চয়ই ওদের মুক্তি দেবে। এইটুকু শাস্তি ওদের প্রাপ্য। ওরা যদি লাঠির ঘা সুরপতির মাথায় ঠিক মতো কষাতে পারত, তাহলে

সুরপতির মৃতদেহ পড়ে থাকত এখানে। অবশ্য রাত্রের মধ্যে হিংস্র পশু আক্রমণ করতেও পারে ওই দু'জনকে। কিন্তু যারা নিজেরাই হিংস্র, তাদের এই রকম নিয়তির ওপর নির্ভর করাই উচিত। আজ থেকে ছ'বছর আগেও সুরপতি দু'জন মানুষকে এ-রকম অবস্থায় ফেলে রেখে যেতে পারত না, কিন্তু এখন সে অনেক বদলে গেছে।

বনের মধ্য দিয়ে সুরপতি সতর্ক হয়ে হাঁটতে লাগল। সায়াহ্ন ঘনিয়ে এসেছে। রাত্রিকালে সুরপতি বিশ্রাম নিতে চায়, তাকে বহু দূর যেতে হবে। বেশি ব্যস্ততা দেখাবার কোনও প্রয়োজন নেই, এতগুলি বছর পার হয়ে গেছে যখন, তখন আর দু'চার দিন কাটলেই-বা কী এমন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে। সব চেয়ে বড় কথা, তাকে বেঁচে থাকতে হবে এখন।

ভালয় ভালয় সে বনপথটা পার হয়ে এল। এবার পথের ধারে দু'একটি গৃহ দেখা যাচ্ছে। তাহলে অদূরেই কোনও জনপদ থাকার কথা। সুরপতির জঠরে কোনও খাদ্য নেই, সব বমির সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। শরীর দুর্বল লাগছে। এ-বেলা অল্প কিছু আহার করে কোনও সরাইখানায় বিশ্রাম নেবে।

কিন্তু এই সময় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির সঙ্গী হয়ে এল ঝড়। বাতাস ও জল তোলপাড় করে দিল সমস্ত প্রকৃতিকে। এত বৃষ্টি ও ঝড়ের মধ্যে গুলে গেছে অন্ধকার। সামনের পথ আর কিছুই দেখা যায় না। তবু সুরপতি ছুটল, তাকে যে-কোনও উপায়ে একটা সরাইখানায় পৌঁছতেই হবে।

কিন্তু বেশি দূর অগ্রসর হওয়া গেল না। এত ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ছুটে যাওয়া প্রায় উন্মাদের প্রয়াস। বেশ কয়েক বার হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল সুরপতি। বাধ্য হয়ে সুরপতিকে এক বৃক্ষতলে দাঁড়াতে হল। কিন্তু সেখানেও আশ্রয় নেই, অবিশ্রান্ত জল ঝরছে। এবং একটু পরেই প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। বিদ্যুতের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল সুরপতির, বাজের শব্দে কানে তালা লাগল এবং তার চেয়েও বড় একটা বিপদের চিন্তা ধাক্কা মারল তার বুকে। এ-রকম দুর্যোগের মধ্যে কোনও বড় বৃক্ষের নিচে দাঁড়ানো মোটেই নিরাপদ নয়। বড় বড় বৃক্ষগুলিই বজ্রপাতকে আকর্ষণ করে। বাজে পোড়া বৃক্ষ সুরপতি অনেক দেখেছে।

পর পর আরও দু'বার বজ্রপাত হল। খুব কাছেই। তাকে এ স্থান ছেড়ে যেতেই হবে। সামনের দিকে তাকিয়ে বিদ্যুতের চকিত আলোকে সুরপতি দেখল খানিকটা দূরে একটি দ্বি-তল গৃহ। সাদা রঙের। কাছাকাছি আর কোনও গৃহ নেই, মাঠের মধ্যে অন্ধকারে ওই একটি গৃহ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে যেন।

আর কোনও কিছু চিন্তা না করে সুরপতি দৌড়ে গেল সে-দিকে। তার মনে হল, এখন যেন তার মাথায় একটি বাজ পড়বে। কোনও ক্রমে সে সেই গৃহের ফটকের কাছে পৌঁছল। সৌভাগ্য ক্রমে ফটকটি খোলাই ছিল। দ্বিধা না করে সে ভেতরে ঢুকে গিছে দাঁড়াল অলিন্দের নিচে। এখন সে নিরাপদ।

সুরপতির সর্বাঙ্গ ভেজা, মাথা থেকে জল গড়াচ্ছে। এই অবস্থায় তাকে কতক্ষণ থাকতে হবে কে জানে। ঝড়বৃষ্টি থামবার কোনও লক্ষণ নেই। এই গৃহটি কার? এখানে কি আশ্রয় পাওয়া যাবে? কোনও মানুষজনের সাড়াশব্দ নেই। সুরপতি দ্বারে আঘাত করতেও সাহস পেল না। এই ক'বছরে তার এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, সে কোনও মানুষকেই আর বিশ্বাস করে না। মানুষ দেখলেই তার ভয় হয়। সে একলা পথিক, এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে একটি গৃহের অলিন্দে এসে আশ্রয় নিয়েছে, এ-জন্যও যদি কেউ তাকে অন্য রকম সন্দেহ করে?

একটু পরেই ভিতরের দ্বার খুলে গেল। প্রদীপশিখা করতলে ঢেকে এক জন স্ত্রীলোক এসে দাঁড়াল সেই দ্বারে। স্ত্রীলোকটি মধ্যবয়সিনী, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, কিন্তু চোখে সুর্মা টানা, ওষ্ঠে তাম্বুলরাগ।

স্ত্রীলোকটি সুরপতির দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি ভিতরে আসুন।

সুরপতি কয়েক পলক তাকিয়ে দেখল রমণীর দিকে। তারপর বিনীতি ভাবে বলল, প্রবল বৃষ্টির জন্য আমি এখানে আশ্রয় নিয়েছি। বৃষ্টি ফুরালেই চলে যাব।

রমণী আবার বলল, আপনি ভেতরে আসুন

সুরপতি বলল, তার প্রয়োজন নেই। আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, আমি এখানেই বেশ আছি।

রমণী বলল, আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ সব ভেজা, আমাদের মালিকানি আপনাকে ভেতরে আসতে বললেন।

সুরপতি সেই রমণীর সঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করল। ভেতরে একটি লম্বা চত্বর। দু'দিকে সারি সারি ঘর। একটি ঘরের দ্বার খুলে রমণীটি সুরপতিকে বলল, এই গোসলখানার মধ্যে পানি আছে, আপনি হাত-পা ধুয়ে নিন। শুষ্ক বস্ত্রও আছে, সে-সব পরে নেবেন, লজ্জা করবেন না।

সুরপতি ভেতরে ঢুকে দেখল, গোসলখানার মধ্যে বড় বড় দু'টি রুপোর বাতিদানে মোম জ্বলছে। মাটির বড় বড় জালা ভর্তি জল। একটি তাকে রয়েছে কয়েকটি আতর ও কেশ তৈলের শিশি। এক পাশে একটি দড়িতে ঝোলানো কয়েক প্রস্ত পুরুষের পোশাক। পোশাকগুলি বেশ মূল্যবান ও নতুন।

সুরপতি বিমূঢ় হয়ে গেল। এ কোথায় এল সে? এরা তাকে এত খাতির করছে কেন? আবার কি সে কোনও বিপদের মধ্যে পা দিতে যাচ্ছে? তার তো কোনও দোষ নেই। কিন্তু শুধু কি দোষী ব্যক্তিরই বিপদ আসে?

একটুক্ষণ সাত-পাঁচ ভাববার পর সুরপতির বস্ত্র বদলে নিল। নতুন বস্ত্র তার অঙ্গে মানিয়ে গেল বেশ। এখন সে যেন একটি নতুন মানুষ।

দরজা খুলে বাইরে আসতেই দেখল, সেই রমণীটি অপেক্ষা করছে। সে বলল, আসুন।

এবার তারা প্রবেশ করল আর একটি কক্ষে। কক্ষটি দারুণ ভাবে সাজানো। মেঝেতে লাল রঙের গালিচা পাতা, একটু উঁচু পালঙ্কের ওপর সাদা দুগ্ধফেননিভ শয্যা পাতা। পালঙ্কের শিয়রের কাছে একটি কাশ্মীরি কাজ করা কাঠের পাত্রে কিছু ফলমূল রাখা।

রমণীটি বলল, আপনি এখানে বিশ্রাম করুন।

সুরপতি জিজ্ঞেস করল, আপনি কে? আমাকে কেন এত যত্ন করছেন?

রমণী বলল, আমি কেউ নই, আমি এ বাড়ির এক জন বাঁদি। আপনি অতিথি আমাদের।

সুরপতি বলল, আমি এক জন সামান্য লোক। ভবঘুরে পথিক। আমি আপনাদের এত যত্নের যোগ্য নই।

রমণী বলল, আপনি অতিথি সেই তো যথেষ্ট।

রমণীটি সুরপতিকে একা রেখে চলে গেল। সুরপতি অভিভূতের মতো বসে রইল। এ-সব কি স্বপ্ন? যে-বাড়ির বাঁদিরই এত সাজসজ্জা, সে-বাড়ির মালিকানি যেন কত না ধনী। বাড়িতে কোনও পুরুষমানুষ নেই? আর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

একটু পরেই সেই রমণীটি আবার এল, হাতে একটা রুপোর বড় রেকাব, তাতে কিছু কাবাব, রুটি, একটি বাটিতে মিষ্টান্ন, আর একটি পাত্র ভরা সুরা।

রমণী বলল, আপনি নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত। সামান্য কিছু খাদ্য এনেছি, খেয়ে নিন। তারপর আমাদের মালিকানি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।

সুরপতি বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞেস করল, আপনাদের মালিকানি কে?

রমণী বলল, বেগম রশিদা খানম্। আপনি তাঁর নাম শোনেননি?

সুরপতি বলল, আমি পরদেশি মানুষ। এখানকার কিছুই জানি না।

বেগম রশিদা খানম্ এ রাজ্যের সব চেয়ে বড় তয়ফাওয়ালি। রাজা বাদশারা তাঁর দয়া পেয়ে ধন্য হয়ে যান।

তিনি যে আমার মতো সামান্য এক জন মানুষকে এত দয়া করছেন, সে-জন্য আমি কৃতার্থ হয়ে গেছি। বেগমকে আমার একশো কুর্নিশ জানাবেন।

বেগমের মন ভাল নেই। উনি সাধারণত থাকেন আজিমগঞ্জে। এটা ওঁর মন খারাপের বাড়ি। মন খারাপ হলে নগরের ভিড় ওঁর ভাল লাগে না, এখানে চলে আসেন।

বেগমের মন খারাপ কেন?

বেগমের পেয়ারের মানুষ ইউনুস খাঁ ওঁকে ছেড়ে চলে গেছেন। আজ দশ দিন, তার আর দেখা নেই।

ইউনুস খাঁর সঙ্গে বেগমের শাদি হয়েছিল?

তয়ফাওয়ালির কখনও শাদি করতে নেই। ইউনুস খাঁ ছিলেন বেগমের দিল-পসন্দ পেয়ারের লোক। তিনি বিবাহিত। কিন্তু প্রত্যেক দিন মাঝ রাতে বেগমের সঙ্গে এসে দেখা করতেন। হঠাৎ তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। নিজের বাড়িতেও যাননি। আপনি খেয়ে নিন। একটু পরে মালিকানি এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

রমণীটি চলে গেল। সুরপতির মনে হল, এই সবটাই যেন রূপকথা। এ কোথায় সে এসে পড়ল? এত সুখ তার সইবে তো? এমন মনোরম আশ্রয়টা যখন পাওয়া গেছে, তখন রাত্তিরটা এখানেই কাটানো যাক। কিন্তু কাল ভোরেই সে চলে যাবে। বেশি লোভ করতে নেই।

সত্যিই তার খিদে পেয়েছিল খুব, সে দ্বিধা না করে সব খাবারটুকু শেষ করল। সুরার পাত্র স্পর্শ করল না। তাদের পরিবারের কেউ কোনও দিন সুরা পান করেনি।

আহার শেষ করে সে ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে বিছানায় একটু গড়াতে যেতে আবার দারুণ চমকে উঠল। বাইরে হঠাৎ একটা বাঘ ডেকে উঠল। খুব কাছ থেকে, যেন এ গৃহের প্রাঙ্গণেই। সর্বনাশ, গৃহের মধ্যে বাঘ ঢুকে এসেছে নাকি?

আত্মরক্ষার জন্য সুরপতির প্রথমেই মনে হল তার কক্ষের দ্বার বন্ধ করে দেওয়া দরকার। কিন্তু সে-পর্যন্ত যেতে পারল না, তার আগেই দ্বার ঠেলে ঢুকে এল একটা পূর্ণবয়স্ক বাঘের মুখ, তীব্র জ্বলন্ত দুই চোখে তাকাল সুরপতির দিকে।

সুরপতি ভাবল, এই তার শেষ। এবার বাঘের মুখেই তাকে প্রাণ দিতে হবে। তার কাছে একটা ছুরিকা আছে, কিন্তু সামান্য ছুরিকা নিয়ে কে কবে বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে পেরেছে! সে আস্তে আস্তে দেয়ালের দিকে পিছিয়ে যেতে লাগল। বস্ত্রের অভ্যন্তর থেকে সে ছুরিকাটা বার করে এক হাতে মুঠো করে ধরেছে।

বাঘটা ঘরের মধ্যে ঢুকে স্থির হয়ে দাঁড়াল। তক্ষুনি সুরপতির ওপর লাফিয়ে পড়ার কোনও উদ্যোগ করল না। তখন সুরপতি লক্ষ্য করল, বাঘটির গলায় একটি সোনার শৃঙ্খল বাঁধা।

সেই শৃঙ্খলের এক প্রান্ত ধরে ঘরে ঢুকল আর একটি রমণী। কালো মখমলের কাঁচুলি ও ঘাঘরা পরা। মুখের ওপর একটা সূক্ষ্ম বস্ত্রের ওড়না চাপা দেওয়া। তবু তাতেও তার মুখ স্পষ্ট দেখা যায়। রমণী অসাধারণ রূপসী।

ভীত, কম্পিত শরীরে সুরপতি তাকে অভিবাদন জানাল।

বীণার ঝঙ্কারের মতো কণ্ঠে রমণী বলল, আপনি বসুন। শের আলিকে দেখে আপনি ভয় পাবেন না। নিরীহ লোককে এ কখনও আক্রমণ করে না। পরদেশি আপনার নাম কী?

সুরপতি নিজের নাম জানাল।

রমণী বলল, আমার নাম রশিদা খানম্, আমার বাঁদির কাছে বোধহয় শুনেছেন আগেই। এই দারুণ দুর্যোগের মধ্যে আপনি আমার অলিন্দে আশ্রয় নিয়েছিলেন, আমি গবাক্ষ থেকে দেখেছিলাম। আপনার নিবাস কোথায়? কোথায় যাচ্ছিলেন?

সুরপতি আত্মপরিচয় গোপন করে বলল, আমি পথিক, পথই আমার ঘর। আমি দেশে দেশে ভ্রমণ করি নিজের খেয়ালে।

রশিদা খানম্ একটা কেদারায় বসল। বাঘটি দাঁড়িয়ে রইল দরজার কাছে। রশিদা খানম্ বলল, আমি সাত দিন কারুর সঙ্গে কথা বলিনি, আমার মন ভাল নেই। আজ আমার বড় বেশি কষ্ট হচ্ছে, আমার অন্যমনস্ক হওয়া দরকার। আপনি বহু দেশ ঘুরেছেন। অনেক কাহিনি কিস্যা জানেন, আমাকে তার দু-একটি শোনান। আসুন, এক পাত্র সুরা পান করতে করতে আপনার কিস্যা শুনি।

রশিদা খানম্ দু'টি পাত্রে সুরা ঢেলে একটি সুরপতির দিকে এগিয়ে দিতেই সে হাত জোড় করে বলল, মাপ করুন বেগম, আমি সুরা পান করি না, আমার অভ্যাস নেই।

রশিদা খানম্ একটু কৌতূহলী হয়ে বলল, আপনি সুরা পান করেন না? হিন্দুর তো সুরাপানে নিষেধ নেই! আপনি ব্রাহ্মণ?

সুরপতি বলল, না। আমি বৈশ্য এবং বৈষ্ণব।

রশিদা খানম্ বলল, ও তাই। বৈষ্ণব! বৈষ্ণবদের কারণবারি পান করাও গুনাহ্।

তারপর রশিদা খানম্ অধরোষ্ঠ ফাঁক করে মুক্তাপংক্তির মতো দাঁতে ঝর্ণার মতো হাসি ঝরিয়ে জিজ্ঞেস করল, কিন্তু আপনি যে যবনের বাড়িতে আহার করলেন, তাতে আপনার জাত যাবে না?

সুরপতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ক্ষুধার্তের আবার জাত কী? আপনি যে আমাকে আশ্রয় এবং আহার্য দিয়েছেন, এ-জন্য আমি কৃতার্থ।

রশিদা খানম্ বলল, হিন্দুদের অনেক ব্যাপার আমি জানি। আমার যে মনের মানুষ, সে-ও আগে হিন্দু ছিল। ধর্মান্তরিত হবার আগে তার নাম ছিল কৃষণ। আমি এখনও তাকে কৃষণ বলে ডাকি। আমি যে গান গাই, তাতে কৃষণজি আর রাধার অনেক কথা থাকে। হায়, আমার সেই কৃষণ আমাকে ছেড়ে কোথায় যে গেল!

সুরপতি মাথা নিচু করে স্তব্ধ হয়ে রইল। এই রমণীর দিকে সে ভালভাবে তাকাতেই পারল না। অসম্ভব তীব্র এর রূপ। তার স্ত্রী সুভদ্রাও অসামান্য রূপসী, কিন্তু সুভদ্রার রূপে আছে স্নিগ্ধ আলো। আর এই তয়ফাওয়ালির রূপ যেন দীপ্ত বহ্নি।

রশিদা খানম্ জিজ্ঞেস করল, আপনি যে পথ ধরে এলেন, সে পথে ইউনুস খাঁ বলে কোনও ব্যক্তির সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছে?

সুরপতি সংক্ষেপে বলল, না।

রশিদা খানম্ সুরার পাত্রে চুমুক দিয়ে বলল, সে যেখানেই থাক, সে ঠিক ফিরে আসবে। আপনি একটা কিস্যা বলুন।

মুখে মুখে গল্প বলার অভ্যেস নেই সুরপতির। সে বাক্‌পটু নয়। তবু রশিদা খানমের বার বার অনুরোধে সে নিজের জীবনের কাহিনিই খানিকটা অন্য রূপ দিয়ে সবিস্তারে বলল। দু'টি লোক ছিল ঠিক একই রকমের চেহারার। এক জনের নাম রঘুপতি, আর এক জনের নাম বংশীলাল। তারপর বংশীলালের বদলে ভুল করে রাজসেনারা রঘুপতিকে ধরে...।

সুরপতি গল্প শেষ করার পর রশিদা খানম্ ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করল, তারপর? তারপর? রঘুপতির সঙ্গে বংশীলালের দেখা হয়নি?

সুরপতি বলল, জেল থেকে পালিয়ে এসেছে রঘুপতি, সেই সময় তার সঙ্গে আমার এক সরাইখানায় দেখা হয়। তার মুখেই আমি তার এই বিড়ম্বিত জীবনের কাহিনি শুনেছি। রঘুপতি এর পর যাবে তার স্ত্রী-পুত্রকে খুঁজতে। শেষ কী হবে, আমি জানি না।

রশিদা খানমের চোখে অশ্রু এসে গেল। সে বলল, আহা, মানুষটা বড় দুঃখী। পরদেশি, আমার মন খারাপ, এর ওপর আপনি আমাকে আবার একটা দুঃখের গল্প শোনালেন কেন? আপনি কোনও মজাদার কিস্যা জানেন না?

সুরপতি বলল, আমি আর তো কিছু জানি না।

রশিদা খানম্ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি ক্লান্ত, আপনি এখন বিশ্রাম করুন। কাল আবার কথা হবে। চল শের আলি।

সুরপতি বলল, আমি কাল প্রভাতেই এখান থেকে চলে যেতে চাই।

বিচিত্র হাস্য করে রশিদা খানম্ বলল, কেন, এখানে আপনার কোনও কষ্ট হচ্ছে?

সুরপতি বলল, না না, কষ্ট কী! এত খাতির-যত্ন আমি জীবনে পাইনি। কিন্তু কত দিন আর এই অকারণ আতিথ্য নেব আপনার কাছে?

রশিদা খানম্ বলল, আপনি পথিক, আপনার তো কোনও নির্দিষ্ট জায়গায়, নির্দিষ্ট সময় পৌঁছনোর কথা নেই। সুতরাং ব্যস্ততা কীসের? মানুষ শুধু মৃত্যুর কাছেই পৌঁছয়।

কী বললেন?

সব মানুষ শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কাছে পৌঁছয়। আর তো কোথাও তার পৌঁছবার কথা থাকে না।

রশিদা খানম্ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সুরপতি অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, ওর এই শেষ কথাটার মানে কী? হঠাৎ মৃত্যুর কথা কেন? একটা পূর্ণবয়স্ক বাঘকে শেকল বেঁধে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাখে। এ নারী অতি সাংঘাতিক। অথচ কত নরম, কত সুন্দর, নিষ্পাপ মুখ। এমন নারীর সন্দর্শনও ভাগ্যের কথা। মুর্খ ইউনুস একে ছেড়ে চলে গেছে কেন?

একটু পরে সুরপতি শুনল, বাড়ির ভেতর থেকে গান ভেসে আসছে। তয়ফাওয়ালি রশিদা খানম্ একা একা গলা সাধছে। ঠিক মনে হয়, কোনও বিরহী রাতপাখির ব্যাকুল চিৎকার।

সেই গান শুনতে শুনতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল সুরপতি। ঘুমের মধ্যে মানুষের স্মৃতিতে বহু রকমের খেলা চলে।

আবার খানিক পরে সুরপতির ঘুম ভাঙল। সে টের পেল তার মাথায় একটা কোমল হাতের স্পর্শ। সে অন্ধকারের মধ্যে হাত বাড়িয়ে ধরল সেই হাত। সত্যি কারও বাস্তব হাত।

সুরপতি জিজ্ঞেস করল, কে সুভদ্রা?

স্পষ্ট উত্তর শুনল, হ্যাঁ।

সুরপতি আবার জিজ্ঞেস করল, তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

উত্তর এল, আমি তো এখানেই।

সুরপতি বলল, না, তুমি এখানে ছিলে না, তুমি হারিয়ে গিয়েছিলে। সুভদ্রা আমার মাথায় দারুণ যন্ত্রণা, আমি চোখ মেলতে পারছি না, তুমি আমাকে ফেলে চলে গিয়েছিলে কেন?

উত্তর এল, আপনার মাথায় এখনও যন্ত্রণা আছে?

সুরপতি বলল, হ্যাঁ, দারুণ যন্ত্রণা, তুমি জানো না, ওরা আমাকে কী সাংঘাতিক ভাবে মেরেছে।

তুমি আর একটু ঘুমোও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

সুরপতি এখন ঘুমোবে কী, সুভদ্রাকে সে খুঁজে পেয়েছে, এই কি তার ঘুমোবার সময়?

সে ব্যস্তভাবে উঠে বসল।

সুরপতি দেখল, তার এক হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে তয়ফাওয়ালি রশিদা খানম্। রশিদার অন্য হাতে একটি দীপ। তার সুন্দর মুখখানি এখন ক্রোধে কঠিন।

সুরপতি বলল, এ কী!

রশিদা বলল, পরদেশি, সত্য করে বলো তুমি কে?

সুরপতি রশিদার এই রূপান্তরের কোনও কারণই বুঝতে পারল না। হঠাৎ মধ্যরাত্রে এই রূপসী রমণী তার শিয়রের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কেন? উন্মাদ নয় তো?

সুরপতি বলল, আমি তো বলেইছি, আমি সামান্য এক জন পথিক। আমার অন্য কোনও পরিচয় নেই।

রশিদা হিমশীতল কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করল, তুমি আমার কোন সর্বনাশ করতে এখানে এসেছ?

সুরপতি বলল, বেগম, আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি আপনার সর্বনাশ করব কেন? আপনি আমার এত উপকার করছেন, আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

সুরপতির হাতখানি আরও শক্ত করে ধরে, অন্য হাতের দীপটা কাছে এনে রশিদা জিজ্ঞেস করল, এই সবুজ পান্না বসানো অঙ্গুরীয় তুমি কোথায় পেলে?

সুরপতি চমকে উঠল। তৎক্ষণাৎ কোনও উত্তর দিতে পারল না।

রশিদা ক্রোধে চিৎকার করে বলল, চুপ করে রইলে কেন? বলো, কোথায় পেয়েছ? দুনিয়ায় এই অঙ্গুরীয় শুধু এক জনেরই হাতে থাকবার কথা।

সুরপতি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, আপনার নিশ্চয়ই কিছু ভুল হয়েছে। এ-রকম পান্না বসানো সাধারণ অঙ্গুরীয় অনেকেরই থাকতে পারে।

রশিদা বলল, সাধারণ। তোমার চক্ষু নেই? ভাল করে দেখো, এই সবুজ পাথরটির আকার একটি পদ্মফুলের মতো। এই পদ্মফুলটি আমার হৃদয়, তা আমি শুধু এক জনকেই দিয়েছিলাম। তুমি এটা কোথায় পেলে? বলো, সত্য করে বলো!

সুরপতি দেখল, পান্নাটির আকৃতি অনেকটা পদ্মফুলের মতোই বটে। আগে সে ঠিক লক্ষ্য করেনি। এই অঙ্গুরীয় যে বিশেষ ভাবে নির্মিত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সে বিনীত ভাবে বলল, আমি দরিদ্র পথিক, এ জিনিস আমার নিজস্ব নয়, তা সত্য। আমার চলার পথে পড়ে ছিল, লোভ সম্বরণ করতে পারিনি, কুড়িয়ে নিয়েছি।

পথে পড়ে ছিল? কোথায়?

অবন্তীপুর ছাড়িয়ে, কানসোনা প্রান্তরের মধ্যে।

মিথ্যা কথা।

রশিদা গলা চড়িয়ে ডাকলো, বাঁদি বাঁদি!

বাঁদি এসে দ্বারের কাছে দাঁড়াল। রশিদা বলল, সেগুলো নিয়ে আয়।

বাঁদি প্রায় তৎক্ষণাৎ ফিরে এল। তার হাতে সুরপতির পরিত্যক্ত ভিজে পোশাক এবং একজোড়া নাগরা।

সুরপতির সর্বাঙ্গে শিহরণ বয়ে গেল।

রশিদা জিজ্ঞেস করল, এ-সব কার? তোমার নয়!

সুরপতি বিস্ফারিত চক্ষে বলল, হ্যাঁ, আমার।

শঠ! মিথ্যুক! এ-সব তোমার? বাঁদি চিনতে পারেনি, কিন্তু আমি দেখামাত্র চিনেছি। এই পোশাক, এই নাগরা, এই অঙ্গুরীয় — এইসব ইউনুস খাঁর। তুমি তাকে নিয়ে কী করেছ?

সুরপতি একটি বিরাট দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কোন দুষ্ট শনি তাকে বার বার এমন বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে! স্বর্ণকারের কাছে কেন সে দু'টি অঙ্গুরীয়ই বিক্রয় করে দেয়নি তখন? কেন সে নতুন বস্ত্র কিনে মৃতের বস্ত্র পরিত্যাগ করে আসেনি?

সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বেগম, আপনাকে আমি সব সত্য কথা বলব। আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে। কিন্তু আপনি মন শক্ত করুন। আমার সব কথা শুনলে আপনি আঘাত পাবেন খুব।

সুরপতি সংক্ষেপে তার পূর্ব ইতিহাস বর্ণনা করল। তারপর বলল, এক সময় আমার অনেক কিছুই ছিল, কিন্তু ভাগ্যদোষে সব হারিয়েছি। শেষ পর্যন্ত আমার এমন দশা হল যে পরনের বস্ত্রখানি পর্যন্ত ছিল না। মানুষের তাড়া খেয়ে আমি লোকালয় থেকে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম শ্মশানে। এক সময় নিদ্রা ভেঙে দেখি, সেখানে একটি মৃতদেহ পড়ে আছে। এক জন অতি সুপুরুষ যুবার দেহ। এখন বুঝতে পারছি সে-ই ইউনুস খাঁ। যেহেতু মৃত ব্যক্তি কোনও সম্পত্তির মালিক হতে পারে না, সেই হেতু তার সম্পদ অন্য কেউ নিলে তা চুরি করা হয় না। আমি সর্বস্ব-বঞ্চিত, অসহায়, তাই মৃতের অঙ্গ থেকে তার বস্ত্র এবং অঙ্গুরীয় খুলে নিয়েছি। এটা আমি কিছু দোষের মনে করিনি। তারপর দৈবের কৌতুকে ঘুরতে ঘুরতে এসে আশ্রয় নিয়েছি আপনার গৃহে।

রশিদা বলল, ইউনুস খাঁ বেঁচে নেই?

তার সেই কণ্ঠস্বরে যেন নিখিল বিশ্বের হাহাকার ধ্বনিত হল। কম্পিত হল তার সারা দেহ। হাতের দীপ খসে পড়ল মাটিতে। বাঁদির কাঁধের ওপর মাথা লুটিয়ে সে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

সুরপতি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু পরে অশ্রুসিক্ত দুই চক্ষু তুলে রশিদা বলল, কিন্তু ইউনুস খাঁর শব হিন্দুর শ্মশানে পড়ে থাকবে কেন?

সুরপতি বলল, সে-কথা আমি জানি না।

রশিদা ওড়নার প্রান্ত দিয়ে চক্ষু মুছে বলল, চলুন, আমাকে এখনি সেখানে নিয়ে চলুন। আমি নিজে তাকে বহন করে নিয়ে আসব। আমার চোখের জলে ধুইয়ে দেব তার শরীর। আমার এই দেহ হবে তার কাফন্। আমরা এক সঙ্গে বেহস্ত-এ যাব।

সুরপতি আড়ষ্ট ভাবে বলল, ইউনুস খাঁর দেহ তো আর সেখানে নেই। শৃগাল-কুকুরে ছিঁড়ে খাবে এই ভয়ে আমি সেই দেহ নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছি।

মুসলমানের শব তুমি জলে ভাসিয়ে দিলে? মাটি খুড়ে কবরও দিতে পারোনি?

আমি তখন তো বুঝিনি।

এই সব তোমার ছলনা। তুমি অতি নিচ, শয়তান। তুমিই ওকে খুন করেছ। তুমি ওকে খুন করে সব কিছু কেড়ে নিয়েছ।

আপনি বিশ্বাস করুন, আমি জীবনে কখনও কারুর ক্ষতি করিনি।

তোমাকে বিশ্বাস করব? তোমার এই অলীক কিস্যা দুনিয়ার কোন কাজি, কোন বিচারক বিশ্বাস করবে? তুমি হত্যাকারী।

সুরপতি সভয়ে নিজের বক্ষ চেপে ধরল। তার পোশাকের মধ্যে লুকোনো আছে সেই ছুরিকা। সেটা হঠাৎ দেখতে পেলে তো সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হবে।

সুরপতির একবার ইচ্ছা হল, পোশাকের মধ্যে থেকে ছুরিকাটি নির্গত করে সে ওই রমণী দু'টিকে ভয় দেখায়। এই দুই রমণীকে পর্যুদস্ত করা মোটেই শক্ত কাজ নয়। তারপর সে এখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যাবে। এরা আর তাকে ধরতে পারবে না।

কিন্তু এই চিন্তাটা মনে আসা মাত্র দ্বারের বাইরে গম্ভীর গলায় ব্যাঘ্রনিনাদ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল সুরপতি। সাংঘাতিক এক দ্বাররক্ষী রয়েছে, সামান্য একটা ছুরিকা নিয়ে সে কী করবে?

রশিদা খানম্ সুরপতির চক্ষে স্থির দৃষ্টি রেখে বলল, আমি তো তোমার কোনও ক্ষতি করিনি। সুন্দর, নিষ্পাপ ইউনুসও তো তোমার কোনও ক্ষতি করেনি। তুমি — তুমি আমাদের এই সর্বনাশ কেন করলে? আমরা দু'জনে দু'জনকে ভালবেসে এক আলাদা দুনিয়া গড়েছিলাম। ইউনুস আমার চোখের তারায় দেখত সারা আশমান, আমি তার চোখের তারায় দেখতাম অকূল দরিয়া, ইউনুসকে ভালবেসে আমি এই দুনিয়ার সব কিছু, এমনকী একটা পিঁপড়েকেও ভালোবাসতাম, সেই ইউনুসকে কেন তুমি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলে? কেন?

সুরপতিরও চোখে জল এসে গেল। সত্যিই যারা ইউনুসকে হত্যা করেছে, তারা মহা পাপিষ্ঠ। কিন্তু সে তো তার জন্য দায়ী নয়।

সে রশিদা খানমের হাত জড়িয়ে ধরে বলল, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি হত্যাকারী নই, আমি এ-সবের কিছুই জানি না।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রশিদা খানম্ বলল, আমি ফৌজদারের কাছে নিয়ে গিয়ে তোমাকে ফাঁসিতে লটকাব। না না, তোমার সর্বাঙ্গ ছুরি দিয়ে চিরে লবণ মাখিয়ে দেব। না, তোমার দুই পায়ে শিকল বেঁধে বিপরীত ভাবে ঝুলিয়ে রাখব, তার চেয়েও ভাল, শের আলিকে তিন দিন অভুক্ত রেখে ছেড়ে দেব তোমার সামনে। ইউ-নুস, আমার ইউনুস!

রশিদা আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল বাঁদির কাঁধেব ওপর। বাঁদি তাকে ধরে আস্তে আস্তে নিয়ে গেল কক্ষের বাইরে।

পাথরের মূর্তির মতো সুরপতি দাঁড়িয়ে রইল ঘরেব মাঝখানে।

সেইভাবে কেটে গেল দণ্ডপল। সুরপতি মাথার মধ্যে অসংখ্য চিন্তা ফেউয়ের মতো আছনে এসে পড়ছে। সে আর দিশা রাখতে পারছে না। কী কুক্ষণেই যে বৃষ্টি নেমেছিল। এই বাড়ির অলিন্দে আশ্রয় না নিলে এতক্ষণ সে চলে যেত অনেক দূরে। সবই কুগ্রহ।

খানিকটা পরে সুরপতির ঘোর ভাঙল। এ-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না, একটা কিছু উপায় বার করতেই হবে। বাঁচতে তাকে হবেই, সে কিছুতেই হেরে যাবে না।

সে সন্তর্পণে দ্বারের কাছে এসে বাইরে উঁকি দিল। বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ, বাইরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সে দ্বারের বাইরে এক পা বাড়াতেই দেখতে পেল হলুদ আগুনের টুকরোর মতো দুটো চোখ। তারপর একটা চাপা গর্জন।

সুরপতি সঙ্গে সঙ্গে কক্ষের মধ্যে চলে এসে দ্বার রুদ্ধ করে দিল। বাইবে প্রহরী রয়েছে শের আলি। সুরপতির পলায়নের কোনও উপায় নেই।

কক্ষে রয়েছে দু'টি গবাক্ষ। অনেক উঁচুতে। সেখানে সুরপতির হাত পৌঁছয় না। এই কক্ষটি একটি কারাগার। সেখানে সুরপতি আবার বন্দি। তবে এবারে প্রভেদ এই, তার শয়নের জন্য রয়েছে পালঙ্কের ওপর নরম সজ্জা, তার অঙ্গে বহুমূল্য পরিচ্ছদ, তার আহার্যের জন্য রয়েছে অনেক ফলমূল।

পালঙ্কের ওপর বসে আরও কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর সুরপতি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। নিদ্রা সমস্ত সন্তাপহারিণী। তাই ইচ্ছে করেই যেন সুরপতি নিদ্রার মধ্যে ডুবে যেতে লাগল অনেক অনেক গভীরে।

সুরপতির যখন ঘুম ভাঙল, তখন প্রখর দিনের আলো এসে পড়েছে ঘরে।

প্রথমে সুরপতি মনেই করতে পারল না সে কোথায়। এ কার শয্যা? এ কার পোশাক তার শরীরে? তারপর সব মনে পড়ল। অমনি ভয়ে কেঁপে উঠল আবার।

দ্বার খোলার সাহস তার হল না। বাইরে নিশ্চয়ই শের আলি রয়েছে। এখান থেকে পালাবার উপায় কী?

কোনও উপায়ই মনে আসে না। কোনও একটি গবাক্ষ দিয়ে বাইরে বেরুবার চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু গবাক্ষ দু'টিই এত ছোট যে, সেখান দিয়ে তার শরীর গলবে কি না সন্দেহ।

পালঙ্কটা সরিয়ে সে নিয়ে গেল দেয়ালের ধারে। তার ওপর একটা কেদারা বসিয়ে তার ওপরে সুরপতি উঠে দাঁড়াল। সে ঠিকই সন্দেহ করেছিল, গবাক্ষ দিয়ে তার মাথা গলে না।

বাইরে দেখা যায় একটি মনোরম উদ্যান। সেখানে সাজি ভরে ফুল তুলছে এক রমণী। তার মুখ সুরপতি দেখতে পাচ্ছে না। সুরপতি এক দৃষ্টে চেয়ে রইল সে-দিকে।

একটু বাদে রমণীটি মুখ ফেরাতেই সুরপতি চমকে উঠল। রশিদা খানম্! কিন্তু তার মুখ এখন প্রফুল্ল হাস্যময়, সদ্য স্নানসিক্ত চুল, তাকে পবিত্র সুন্দর দেখাচ্ছে। সে গুন গুন করে গাইছে একটি গান।

সুরপতির সব কিছু অবিশ্বাস্য মনে হল। কাল যে রশিদা খানম্ অমন কান্নায় ভেঙে পড়েছিল, প্রিয়জনের বিচ্ছেদবেদনায় রিক্ত হয়ে গিয়েছিল, এক রাত্রির মধ্যে তার এতখানি রূপান্তর সম্ভব? এখন সে স্নান করে সেজেগুজে বাগানে এসে ফুল তুলতে তুলতে গান গাইছে? তাহলে কি কাল রাত্রির সব কিছুই অলীক? একটা দুঃস্বপ্ন?

এক সময় রশিদা খানমের সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল। সুরপতি চেঁচিয়ে বলল, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি অপরাধী নই। আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন।

গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে রইল রশিদা খানম্।

সুরপতি ওই একই কথা আবার বলল।

এবার রশিদা বলল, কে আপনি?

আমি সুরপতি।

কে সুরপতি?

আমি এক জন পথিক। কাল রাত্রে আমি...।

আপনি এখানে কী করে এলেন?

সুরপতি ভাবল, রশিদা খানম্ কি উন্মাদিনী? এখন তাকে চিনতেই পারছে না? অথবা শোকে-দুঃখে ওর মস্তিষ্কে বিকার দেখা দিয়েছে?

রশিদা খানম্ এগিয়ে এল গবাক্ষের দিকে। তারপর নদীর বাঁকের মতো ভুরু দু'টি তুলে বলল, এমন সকালবেলা আপনি চিৎকার করে ক্ষমা চাইছেন কেন? ক্ষমা কি কেউ মানুষের কাছে চায়? ক্ষমা চাইতে হয় খোদাতাল্লার কাছে।

সুরপতি বলল, আমি নিরপরাধ। আমি এখান থেকে মুক্তি চাই। একমাত্র আপনিই আমাকে মুক্তি দিতে পারেন।

রশিদা খানম্ বলল, কে আপনাকে আবদ্ধ করে রেখেছে? বাইরে আসুন!

বাইরে শের আলি রয়েছে।

রশিদা খানম্ চূর্ণ হাসিতে ভেঙে পড়ল। হাসতে হাসতে বলল, আপনি শের আলিকে ভয় পান? ও তো একটা বিড়াল।

রশিদা খানম্ সরে গেল সেখান থেকে। একটু পরেই দ্বারে শব্দ হল। সুরপতি সভয়ে দ্বার খুলে সরে দাঁড়াল দেওয়ালের পাশে।

দ্বার খোলার সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠল শের আলি, কিন্তু ভিতরে এল না। কিন্তু তার বদলে এল রশিদা খানম্। আজ সকালে তার রূপ যেন আরও ফেটে পড়ছে। গভীর কালো কুঞ্চিত কেশরাশির মধ্যে তার গৌরবর্ণ মুখখানি যেন একটি দুর্লভ ফুল। দেখা মাত্র যার ঘ্রাণ নিতে ইচ্ছে হয়।

রশিদা খানম্ জিজ্ঞেস করল, কে তুমি?

সুরপতি দীন কণ্ঠে বলল, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না? কাল রাত্রে আপনি আমাকে —।

রশিদা খানম্ আর একটু এগিয়ে এসে বলল, কাল আমি সন্ধ্যা থেকেই ঘুমিয়ে ছিলাম। আমি কিছুই জানি না। আপনার মুখে এত দাড়ি কেন? আপনি কি ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন?

আমি নিতান্ত এক অভাজন। এই রকমই আমার বেশ।

আপনার অঙ্গে ইউনুসা খাঁর পোশাক, অথচ মুখে দাড়ি। কিন্তু আপনি ইউনুস খাঁ নন, সে আপনার চেয়ে একটু খর্বকায়। আপনিও তো বেশ সুপুরুষ, বলিষ্ঠ দু'টি হাত, প্রশস্ত বুক — এমন এক জন পুরুষ গৃহে এসেছে, অথচ আমি তা জানি না!

আপনার কিছুই মনে নেই?

কী মনে থাকবে?

আপনি আমাকে ভুল সন্দেহ করেছিলেন।

না না, আপনাকে আমি সন্দেহ করব কেন? আপনাব মুখ সুন্দর, চোখ সুন্দর, কথা সুন্দর — এমন মানুষকে কেউ সন্দেহ করে?

এমন সময় দ্বারের পাশে বাঁদি এসে ডাকল, বিবিসাহেবা?

রশিদা খানম্ মুখ ফিরিয়ে বলল, বাঁদী, এই মানুষটা কে রে?

বাঁদি বলল, ও কেউ নয়। আপনি ওপরে চলুন।

কেউ নয় কী রে? একটা জ্যান্ত মানুষকে চোখেব সামনে দেখতে পাচ্ছি, আর তুই বলছিস কেউ নয়?

আপনি ওপরে চলুন। মালিকানি আপনাকে ডাকছেন।

যাচ্ছি, যাচ্ছি। এই মানুষটা কে বল না? এই মানুষটাকে আমাকে দিবি? এই বলিষ্ঠ মানুষটাকে আমার চাই।

বাঁদি এসে তার হাত ধরে বকুনি দিয়ে বলল, শিগগির ওপরে চলুন। নইলে মালিকানি খুব রাগ করবেন।

বাঁদি প্রায় জোর করেই তাকে টেনে নিয়ে চলে গেল।

বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুরপতি। রশিদা খানম্ কি সত্যি গত রাত্রের সব কথা ভুলে গেছে? এ কখনও সম্ভব? বাঁদিই-বা ওকে জোর করে টেনে নিয়ে গেল কেন? মালিকানি আবার কে? কাল তো রশিদা খানমকেই মালিকানি বলেছিল বাঁদি!

একটু পরেই বাঁদি ফিরে এল একা। বিচিত্র ভাবে হেসে সে বলল, শেঠ, খুব ধন্ধে পড়েছেন তো?

সুরপতি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল, তুমি আমাকে বাঁচাও। আমি তোমার ক্রীতদাস হয়ে থাকব।

বাঁদি বলল, আপনি ইউনুস খাঁকে হত্যা করেও এ গৃহ থেকে বেঁচে ফিরে যাবেন, তা কখনও হয়?

তুমি বিশ্বাস করো, আমি খুন করিনি। কেন আমি তাঁকে খুন করব, তাঁর ওপর কি আমার কোনও রাগ আছে? আমি তো তাঁকে চিনিই না।

তাহলে ইউনুস খাঁর পোশাক আর অঙ্গুরীয় আপনার কাছে এল কী করে?

এগুলি আমি ইউনুস খাঁর শরীর থেকে খুলে নিয়েছি ঠিকই, কিন্তু তার আগেই কেউ তাঁকে খুন করেছিল। কে খুন করেছে আমি জানি না।

আপনার মিথ্যা কাহিনিও এত দুর্বল!

মিথ্যা নয়। তুমি বিশ্বাস করো, আমি যে-কোনও শপথ নিয়ে বলতে পারি।

আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কী আসে যায়!

রশিদা খানম্ তো সব কথা ভুলে গেছেন।

ও, আপনি বুঝি তাই ভেবেছেন? একটু আগে যে এসেছিল সে রশিদা খানম্ নয়। আপনি চিনতে পারলেন না?

নিশ্চয়ই রশিদা খানম্! তাছাড়া আর কে?

এর বাম গণ্ডে একটা তিল ছিল দেখেননি? আমাদের মালিকানির শরীরে কোনও তিল নেই।

তিল? তিল আছে কি না আছে তা তো দেখিনি!

এঁর নাম রেশমি বিবি। রশিদা খানমের যমজ বোন। অনেক দিন থেকেই এর মাথার ঠিক নেই।

সুরপতি মাথায় হাত দিয়ে পালঙ্কে বসে পড়ল। এ কী অদ্ভুত কথা! মানুষে মানুষে এমন মিল হয়! এর কথা শুনে তো একে একটুও উন্মাদিনী মনে হল না।

বাঁদি আবার বলল, শেঠ, আপনাকে আমি সাবধান করে দিতে এসেছি। আপনি শের আলিকে ভয় পান, কিন্তু এই রেশমি বিবি বাঘিনীর চেয়েও সাংঘাতিক। পুরুষমানুষকে গিলে খায়। দেখবেন, ইনি আবার সুযোগ পেলেই এসে আপনাকে শাদি করতে চাইবেন।

সুরপতি বলল, আমি শাদি করব কী করে? আমার নিজের স্ত্রী আছে।

কথার মধ্যে সুরপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর অনেকটা আপন মনেই বলল, আমার স্ত্রী ছিল, পুত্র ছিল, এখন কোথায় আছে জানি না। তাদের সন্ধানেই যেতে চাই।

শেঠ, তবু আপনাকে সাবধান করে দিলাম। রেশমি বিবিকে এমনিতে দেখে কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু হঠাৎ যখন খেপে ওঠেন তখন কী যে সাংঘাতিক নিষ্ঠুর হন তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

বাঁদি চলে গেল। সুরপতি আবার দ্বার বন্ধ করে বসে রইল একা। বেলা বাড়তে লাগল আপন মনে। বাইরে মাঝে মাঝে শের আলির ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা যায়। ওকে বোধহয় খাদ্য দেওয়া হয়নি। এই রকম তিন দিন ওকে ক্ষুধার্ত রাখা হবে, তারপর সুরপতিকে ওর সামনে...। দ্বার বন্ধ থাকলেও কি ওরা জোর করে ভেঙে ফেলবে দ্বার?

দিনের পর রাত এল। তারপর যখন রাত বেশ গভীর, সেই সময় তার দ্বারে শোনা গেল টক টক শব্দ। এ শব্দ শের আলির নয়, কোনও মানুষের।

সুরপতি প্রথমে ভাবল, দ্বার খুলবে না। কিন্তু শব্দ হতেই লাগল। সেই শব্দের মধ্যে যেন একটা ব্যাকুল আহ্বান আছে। শুধু শুধু বসে থেকেই-বা লাভ কী। সুরপতি উঠে গিয়ে দ্বার খুলে দিল।

দ্বারের বাইরে দীপ হাতে এক সুন্দর রমণী। এ কে? রশিদা খানম্, না রেশমি বিবি?

সুরপতি জিজ্ঞেস করল, কে আপনি?

রমণী মৃদু হেসে বলল, আমাকে চিনতে পারছ না? আমি রশিদা খানম্। সুরপতি, আমি তোমাকে মুক্তি দিতে এসেছি।

ঠিক সেই সময় সুরপতি সেই রমণীর বাম গণ্ডে একটা বড় তিল দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে সে পিছিয়ে এসে বলল, মিথ্যে কথা, আপনি রেশমি বিবি!

রমণী আরও বেশি হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে বলল, বাঁদি তোমাকে ভুল কথা বলেছে। বাম গণ্ডে তিল আছে রশিদা খানমের, রেশমি বিবির শরীরে কোনও তিল নেই। তুমি কি আজ সকালে তার গণ্ডে তিল দেখেছিলে?

সুরপতি একেবারে দিশেহারা হয়ে গেল। এরা কী সত্যিই দুই বোন? নাকি এক জনই এক-এক বার এক-এক নাম নিয়ে আসছে? বাঁদিই ইচ্ছে করে তাকে ভুল বুঝিয়েছে? এ-রকম বেশিক্ষণ চললে সুরপতি নিজেই উন্মাদ হয়ে যাবে। এরা কি তাকে অত্যাচার করার এই নতুন কৌশল আবিষ্কার করেছে?

সে নতজানু হয়ে বলল, আপনারা আমাকে নিয়ে কী করতে চান? যদি মারতে চান, এক্ষুনি মেরে ফেলুন।

রমণী এগিয়ে এসে সুরপতির হাত ধরে কোমল কণ্ঠে বলল, ওঠো সুরপতি, তোমার কোনও ভয় নেই। মিথ্যা বলব না, আমি রশিদা খানম্ নই, আমি রেশমি বিবি। তুমি আমার সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছ তো! আমি উন্মাদিনী, আমি বাঘিনীর চেয়েও সাংঘাতিক, আমি তোমাকে শাদি করতে চাইব — এ-সব শোনোনি? আমার মুখের দিকে চেয়ে সত্যি কথা বলো তো, আমাকে এ-রকম সাংঘাতিক মনে হয়?

সুরপতি নিঃশব্দে দু'দিকে মাথা নেড়ে জানাল, না।

এটা তার সত্য অনুভূতি। রেশমি বিবিকে দেখে কিছুতেই ভয়ঙ্করি মনে হয় না। নিষ্পাপ সরল মুখ। মস্তিষ্ক-বিকৃতির কোনও লক্ষণই নেই। বাঁদি এর নামে মিথ্যা অপবাদ দিতে পারে অনায়াসে।

রেশমি বিবি বলল, পাছে লোকজনের কাছে নিজের কদর কমে যায়, তাই আমার বোন রশিদা খানম্ আমাকে বাইরে যেতে দেয় না। লোকসমাজে রটিয়ে দিয়েছে আমার মস্তিষ্ক ঠিক নেই।

সুরপতি চুপ করে রইল।

হঠাৎ রেশমি বিবির চোখ সজল হয়ে এল। কম্পিত স্বরে বলল, ওরা রটনা করে, সুন্দর চেহারার পুরুষমানুষ দেখলেই আমি তাকে প্রলোভন দেখিয়ে শাদি করতে চাই। তারপর তাকে মেরে ফেলি। এ যে কত বড় মিথ্যা! পরদেশি, তোমাকে আমি সত্য কথা বলি, আমি খুব ভালভাবেই জানি, কোনও দিন কোনও পুরুষ আমাকে গ্রহণ করবে না। আমাকে সম্পূর্ণভাবে দেখলেই ঘৃণায় দূরে সরে যাবে।

সুরপতি বিস্মিত ভাবে বলল, ঘৃণা! এমন রূপসী রমণীকে কেউ ঘৃণা করতে পারে? আপনাকে দেখলে তো সন্ন্যাসীরও চিত্ত বিচলিত হবে।

রেশমি বিবি বলল, না, আমি রূপসী নই। আমি কুৎসিত। অনেক সময় কোনও বান্দরিকেও সুন্দর পোশাকে মুড়ে রাখলে ভাল দেখায়। আমি হচ্ছি সেই রকম। তুমি দেখবে?

রেশমি বিবি একটানে তার বুকের বসন উন্মুক্ত করে ফেলল। সুরপতি লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছিল, কিন্তু এক পলক দেখেই তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, এ কী।

রেশমি বিবির অনাবৃত বুকের ঠিক মাঝখানে পূর্ণচন্দ্রের আকারের একটা গোল কালো দাগ। তার সুগঠিত বর্তুল দুই স্তনও কালো। রেশমী বিবির সর্বাঙ্গ অত্যন্ত ফর্সা, মাঝখানে এই কালো দাগ হঠাৎ ভয় পাইয়ে দেয়।

সুরপতি চোখ সরাতে পারল না। স্থির দৃষ্টিতে সে-দিকে চেয়ে রইল। অস্ফুট স্বরে বলল, এমন কখনও দেখিনি!

রেশমী বিবি বলল, এবার আমাকে ঘৃণা হচ্ছে তো?

সুরপতি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না না, ঘৃণা নয়। আপনি তবু সুন্দরী, এ-রকম কখনও দেখিনি, তবু মনে হচ্ছে এতে আপনার রূপ অনেক বেড়ে গেছে, পৃথিবীতে আপনার মতো আর কেউ নেই, কিন্তু এ-রকম কী করে হল?

রেশমি বিবি নিজের বক্ষে হাত রেখে বলল, আসমান থেকে অভিশাপ এসেছিল, আজ থেকে আট বছর আগে, সন্ধ্যাবেলা আমি একটা গোলাপবাগে একা দাঁড়িয়েছিলাম, চাঁদের আলোয় চারদিক ভেসে যাচ্ছিল, এমন সময় কে যেন আমার নাম ধরে ডাকল। আমি চমকে উঠে বললাম, কে? চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম কোথাও কেউ নেই। তবে কে ডাকল আমাকে? স্পষ্ট শুনেছিলাম। আমার সে-দিন খুব মন খারাপ ছিল, আমি এক জন সঙ্গী চাইছিলাম, কেউ আসেনি আমার কাছে। মনে হল, কেউ যেন আমাকে দেখছে। চারদিকে কেউ নেই, তবু যেন আসমান থেকে কেউ দেখছে আমাকে এক দৃষ্টে। আমি আসমানের দিকে চেয়ে রইলাম। বললাম, তুমি কে? এসো এসো। কেউ এল না। হঠাৎ আশমানে প্রচণ্ড শব্দ হল আর একটা বিজলি হানল। আমি খুব জোরে কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেলাম, মনে হল আমি মরে গেছি। তুমি বাজে-পোড়া গাছ দেখেছ? আমি ঠিক সেই রকম দাঁড়িয়ে রইলাম প্রহরের পর প্রহর। সকালবেলা লোকজন এসে আমাকে ধরে নিয়ে যায়। আমি মরিনি, বিজলিতে আমার বুক পুড়িয়ে দিয়ে গেছে, তবু আমি মরিনি। সে-দিনই আমি বুঝেছিলাম, আমি খোদাতাল্লার না-পসন্দ, কোনও পুরুষমানুষও আমাকে চাইবে না। সবাই আমাকে ঘৃণা করবে।

সুরপতি বলল, কেউ আপনাকে ঘৃণা করবে না। যে-কোনও পুরুষমানুষ আপনাকে মাথায় করে রাখবে।

রেশমি বিবি আরও কাছে এগিয়ে এসে ব্যগ্র ভাবে বলল, তুমি — তুমি? তুমি আমাকে ঘৃণা করবে না?

সুরপতি বলল, আপনি এত সুন্দর, আপনি সকলের চেয়ে সুন্দর।

রশিদা খানমের থেকেও?

হ্যাঁ। আপনার মতো আর কেউ নেই।

প্রমাণ দাও, তুমি আমার বুকে হাত রাখো, দেখি তোমার ঘৃণা হয় কি না।

বিবিসাহেবা, আমি এক জন সামান্য মানুষ।

প্রমাণ দাও?

সুরপতি তার কম্পিত হাত রেশমি বিবির বুকে রাখল। কী নরম, কী স্নিগ্ধ!

আঃ কী শান্তি! আমার যে হৃদয় পুড়েছে তা কেউ দেখেনি। তুমিই শুধু দেখলে। তুমি মহান।

তারপর রেশমি বিবি সুরপতির হাত চেপে ধরে বলল, চলো, তুমি আর আমি এখান থেকে পালিয়ে যাই।

কোথায়?

যে-দিক দু'চোখ যায়। তুমি আমি কোনও নির্জন বনের মধ্যে এক ঝরনার ধারে থাকব। আমাদের আর কেউ দেখবে না। শুধু তোমার জন্য আমি আর আমার জন্য তুমি। চলো, এখনি চলো।

সুরপতি নিজে যে বিবাহিত, তার যে প্রিয়তমা পত্নী আছে, সে-কথা এই সময় তার মনে এল না। পলায়নের চিন্তায় সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। কক্ষের পাইরে পা দিতে গিয়েও সে বলল, কিন্তু শের আলি যে পাহারায় আছে!

রেশমি বিবি অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, ও কিছু করবে না। ও আমার হুকুম শোনে।

দু'জনে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল অলিন্দে। শের আলি সেখানে নেই। সমস্ত গৃহটি নিস্তব্ধ। প্রাঙ্গণ পার হয়ে ওরা বাইরের দিকে আসতেই দেখল মূল দ্বারের কাছে দু'টি চক্ষু জ্বলছে। চাপা গর্জন করে শের আলি ছুটে এল সে-দিকে।

শের আলি সুরপতির ওপরে ঠিক ঝাঁপিয়ে পড়ত, তার আগেই রেশমি বিবি এসে পড়ল মাঝখানে। শের আলিকে দু'হাত ধরে ফেলে সে বলল, যা, এখন যা।

শের আলি রেশমি বিবির গায়ে মাথা ঘষতে লাগল।

রেশমি বিবি বলল, তুমি দ্বার খুলে ফেলে বাইরে দাঁড়াও, আমি আসছি।

রেশমি বিবি শের আলিকে আদর করে বলল, যা যা, ভেতরে যা! এ আমার দোস্ত, একে কিছু বলবি না।

শের আলিকে নিরস্ত করে রেশমি বিবি যেই দ্বার পেরিয়ে পথের ওপর এসেছে, অমনি শের আলি লাফ দিয়ে দ্বার ডিঙিয়ে পথের ওপর এসে পড়লল। সে সুরপতিকে আক্রমণ করার আগেই রেশমি বিবি আবার তার মুখ ধরে ফেলে বলল, তোকে যেতে বললাম না! যা, যা — আচ্ছা, তোকে আদর করে দিচ্ছি!

রেশমি বিবি মুচকি হেসে বলল, তোমার সঙ্গে যাচ্ছি কিনা, তাই ওর ঈর্ষা হয়েছে। ও আমাকে খুব ভালবাসে।

তারপর সে শের আলির মুখ চুম্বন করল, দু'হাতে আদর করতে লাগল তাকে। সেই হিংস্র ব্যাঘ্রও নখ গুটিয়ে নিয়ে তার থাবা বোলাতে লাগল রেশমি বিবির সর্বাঙ্গে। রেশমি বিবি খল খল করে হাসতে লাগল। একবার সে মুখ তুলে সুরপতির দিকে তাকিয়ে বলল, কী, তোমার আবার ঈর্ষা হচ্ছে না তো?

সুরপতি উত্তর দেবে কী, তার সমস্ত অনুভূতি যেন অসাড় হয়ে গেছে। এ-রকম কাণ্ড সে কখনও দেখেনি। ব্যাঘ্র ও মানবী সম্পূর্ণ প্রণয়লীলা চালাচ্ছে।

একটু পরে রেশমি বিবি উঠে দাঁড়িয়ে পোশাকের ধুলো ঝেড়ে শের আলির মুখে এক চাপড় মেরে বলল, এবাব যা!

শের আলি এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে সুরপতির দিকে। সে যাবে না। সেই চাহনি দেখে সুরপতির রক্ত-চলাচল থেমে যাবার উপক্রম হল। এই ব্যাঘ্র তাকে নিষ্কৃতি দেবে না।

রেশমি বিবি বলল, আমি কখনও কখনও ওর পৃষ্ঠে চড়ে বেড়াতে যাই তো, তাই ও অপেক্ষা করছে। আজ যাবে না রে, আজ তুই ফিরে যা। আচ্ছা, এই একবার বসছি। তারপর ফিরে যাবি তো?

শের আলি, আমি আমার দুলহা পেয়ে গেছি, আর কোনও দিন তোর সঙ্গে যাব না!

রেশমি বিবি ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে চেপে বসল। তার কাঁধের কাছে চাপড় মেরে বলল, এবার হয়েছে তো? এই শেষ বার।

শের আলি সুরপতির দিকে তাকিয়ে একবার চাপা গর্জন করল, তারপর বিরাট লম্ফ দিল সামনে দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটল। রেশমি বিবিকে পৃষ্ঠে নিয়ে সে প্রায় কয়েক পলকের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। মাত্র দু-একবার রেশমি বিবির কণ্ঠ শোনা গেল, থাম, থাম — তারপর মিলিয়ে গেল শব্দ।

সুরপতি বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। কোথায় গেল? কখন আসবে? সুরপতি কি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে? কতক্ষণ?

কিন্তু মুক্তির চিন্তায় সুরপতির আবার চেতনা ফিরে এল। সে এখন মুক্ত, স্বাধীন। সে এখন যেখানে খুশি যেতে পারে। গৃহের দ্বি-তলের একটি গবাক্ষ খুলে গেল না?

আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে সুরপতি সামনে দিকে ছুটল। একবার সে ভেবেছিল, কিছু দূর গিয়ে বোধহয় রেশমি বিবির দেখা পাবে। কিন্তু কোথাও কোনও চিহ্ন নেই।

বেশ কিছু দূর আসবার পর সুরপতি দেখল পথটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। একটা পথ গেছে বনের দিকে, অন্যটি নগরে। রেশমি বিবিকে নিয়ে কোন দিকে গেছে শের আলি? বনের প্রাণী নিশ্চয়ই বনের দিকেই যাবে। সুরপতি কি বনের মধ্যে দিয়ে রেশমি বিবিকে খুঁজবে? কিন্তু শের আলির হিংস্র চোখ দু'টির কথা মনে পড়তেই তার বুকে কেঁপে উঠল। সে বুঝতে পারল, শের আলি কিছুতেই রেশমি বিবিকে তার সঙ্গে যেতে দেবে না।

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অস্ফুট স্বরে বলল, বিদায় রেশমি বিবি!

তারপর নগরের দিকে ছুটল প্রচণ্ড জোরে, অন্ধের মতো। মুক্তির আনন্দ তার পায়ে অনেক দ্রুত গতি এনে দিয়েছে। তবু অন্ধকারের মধ্যে সে আচমকা ধাক্কা খেয়ে একবার পথের ওপর লুটিয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল।

এক প্রহর বাদে ক্ষীণভাবে জ্ঞান ফিরে এল সুরপতির। এবারও তার মনে হল, কে যেন তার মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে। তার চুলের মধ্যে কার যেন নরম হাত। তবে কি রেশমি বিবি ফিরে এসেছে? শের আলিকে ত্যাগ করে আবার খুঁজে পেয়েছে তাকে?

সুরপতি জিজ্ঞেস করল, কে, রেশমি বিবি?

উত্তর এল, না, আমি সুভদ্রা।

সুভদ্রা! সুরপতি অমনি সর্বশক্তি দিয়ে উঠল কিন্তু কোথায় সুভদ্রা? সুভদ্রাও নেই, রেশমি বিবিও নেই। সে পথের ওপর একলা পড়ে আছে।

॥ ৬॥

সে-রাত্রে সুরপতি সম্মুখবর্তী এক পান্থশালায় বিশ্রাম নিল। আবার বেরিয়ে পড়ল পরদিন খুব সকালেই। দ্রুত সে এই এলাকা ছাড়িয়ে যেতে চায়। এবার সে আর কোনও ভুল করবে না, কথা বলবে না কোনও অচেনা ব্যক্তির সঙ্গে, আশ্রয় নেবে না কোনও গৃহে। ঝড়-বৃষ্টি-মহাপ্লাবন যাই আসুক, সে শুধু অগ্রসর হবে দারুকেশ্বরের দিকে।

একবার সে ভাবল, দাড়িগোঁফ মুণ্ডন করে ফেলবে। কিন্তু একটু পরেই সে মত পরিবর্তন করল। এই দাড়িগোঁফই এখন তার ছদ্মবেশ। নইলে দারুকেশ্বরে আবার যদি কেউ তাকে বংশীলাল বলে ভুল করে!

তার কাছে এখনও কিছু অর্থ আছে, তার খাদ্যাভাব হবে না। পান্না বসানো অঙ্গুরীয়টি সে আঙুল থেকে খুলে কোমরের কাছে গুঁজে রাখল। তারপর তিন দিন তিন রাত্রি সমানে পদব্রজের পর সে পৌঁছল দারুকেশ্বরে।

. সুরপতি নগবে প্রবেশ করল বিপরীত দিক দিয়ে। এ-দিক দিয়ে সেই সরাইখানার পথ খুঁজে পাওয়া শক্ত। তবু এক সময় সে এসে পৌঁছল রাজবৈদ্য বাসবদত্তের প্রাসাদের সামনে। এখানে থেকে তার আর পথ চিনে নিতে ভুল হবে না।

বাসবদত্তের প্রাসাদের সামনে যথারীতি অসংখ্য লোকের ভিড়। সকলেই কী একটা বিষয় নিয়ে গুঞ্জন করছে। সুরপতি একটু কাল দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনল।

লোকেরা বলাবলি করছে যে, রাজবৈদ্য বাসবদত্ত নিজে গুরুতর রকমের অসুস্থ। প্রতি দিন তাঁর অবস্থার অবনতি হচ্ছে। দেশে আর এমন কোনও বৈদ্য নেই যে বাসবদত্তের চিকিৎসা করতে পারে। বাসবদত্ত অন্য কোনও চিকিৎসককে তাঁর কাছেই ঘেঁষতে দেখেন না। তিনি ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর মৃত্যু রোধ করার ক্ষমতা কারুর নেই। এই অবস্থাতেও কিন্তু বাসবদত্ত রোগী দেখেন। এক সময় তাঁকে ধরাধরি করে ওপর তলা থেকে নিচে নামানো হয়। রোগীদের মধ্য থেকে তিনি বেছে মাত্র তিন-চার জনকে নিদান দেন। এবং এখনও তিনি ধন্বন্তরি। তাঁর ওষুধে মুমূর্ষও খাড়া হয়ে ওঠে। এখন কথা হচ্ছে, রোগীদের মধ্যে কোন তিন-চার জন সে-রকম ভাগ্যবান।

সুরপতি রাজবৈদ্য বাসবদত্তের জন্য একটু দুঃখ বোধ কবল। যে-কোনও কারণেই হোক এই বিস্ময়কর মানুষটি সম্পর্কে তার একটা শ্রদ্ধাবোধ আছে। হায়, একবার এঁর চোখে পড়লেই সুভদ্রা সেরে উঠত। সুভদ্রা কি এখনও সেই রকম আছে?

সুরপতি বিষণ্ণ মনে ধীর পায়ে হাঁটতে লাগল। সবাইখানাটি আর বেশি দূর নয়। তবু সেখানে যেতে সুরপতির এখন ভয় করছে। কী দেখবে সেখানে গিয়ে? যদি সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমাব ইতিমধ্যে —!

সুরপতি বার বার থেমে যাচ্ছে, তবু এক সময় সে এসে পৌঁছল সরাইখানার সামনে।

সরাইখানাটি নতুন রঙ করা হয়েছে। সামনের আস্তাবলে অনেকগুলি বলবান অশ্ব বাঁধা। মনে হয় ওই সব অশ্ব সৈনিক পুরুষদের। ভিতরে বেশ একটা সবব উৎসব চলছে মনে হয়। সুরপতিব গা ছম ছম করে উঠল। সব কিছুই কেমন যেন নতুন নতুন মনে হয়।

যে-ঘরটায় সুরপতিদের থাকতে দেওয়া হয়েছিল, সুরপতি আস্তে আস্তে সেই ঘরটির সামনে এসে দাঁড়াল। তক্ষুনি সেখান থেকে বর্মচর্ম পরা দু'জন সৈনিকপুরুষ বেরিয়ে এল, সুরপতির প্রতি সন্দেহজনক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তারা প্রশ্ন করল, মহাশয়ের কী চাই?

সুরপতি একটু সংকুচিত হয়ে পড়ল। বিনীতি ভাবে বলল, আমি বলভদ্রের সঙ্গে দু'একটি কথা বলতে এসেছিলাম।

বলভদ্র কে?

সুরপতি বিস্মিত ভাবে বলল, এই সরাইখানার মালিক!

মালিকের নাম তো জীবক। সে আবার বলভদ্র হল কবে থেকে?

সৈনিক দু'টি অবশ্য সুরপতিকে নিয়ে আর কালক্ষেপ করল না। তারা ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

সুরপতি হতভম্ব হয়ে গেল। এ আবার কী? বলভদ্রকে এরা কেউ চেনে না? জীবক আর বলভদ্র কি এক?

সে আর ভেতরে প্রবেশ করল না। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এল। সে কারুর মনে কোনও রকম সন্দেহের উদ্রেক করতে চায় না।

সরাইখানার বাইরে একটি কশাইয়ের দোকান আছে। এই কশাইকে সুরপতি আগেও দেখেছে।

সে কশাইয়ের দোকানের পাশে একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর এক সময় নিরালা দেখে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল, ভাই, এই সরাইখানার মালিক কি বলভদ্র নয়?

কশাই সুরপতিকে একটুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করল। তারপর বলল, আপনি বুঝি অনেক দিন পর এ-দিকে আসছেন?

সুরপতি বলল, হ্যাঁ, পাঁচ-ছ'বছর পর হবে অন্তত।

কশাই বলল, এই সরাইখানা এক সময় বলভদ্রেরই ছিল বটে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, দু-দু'বার এই সরাই লুটপাট হয়ে যায়। জানেন না, ইদানীং দলভ্রষ্ট পাঠান-মোগল সৈনিকদের উৎপাত বড় বেড়েছে!

সুরপতি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, বলভদ্র আর নেই?

সে এই সরাইখানা বিক্রি করে দিয়ে চলে গেছে। শুনেছি, নগরীর উত্তর দিকে সে নতুন এক সরাইখানা খুলেছে।

কোন পথ দিয়ে সে-দিকে যেতে হয়?

এই পিপুল গাছের পাশ দিয়ে যে-পথ, সেই পথ দিয়ে সোজা চলে যান, সামনে দেখবেন রাজপুষ্করিণী, তার দক্ষিণ দিক দিয়ে আবার রাস্তা —।

সুরপতি তখুনি চলে যাচ্ছিল, আবার ফিরে এল। সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারের কথা কি এই কশাই জানে? অত দিন আগেকার কথা কি এর মনে থাকবে?

তবু সে জিজ্ঞেস করল, ভাই, আর একটি কথা — এই সরাইখানাতে কি কোনও স্ত্রীলোক আর শিশু —।

কশাই তাকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, ভদ্র না পণ্যা?

ভদ্র রমণী, সঙ্গে একটি শিশু।

এখান এত সৈনিকের উৎপাত, এখানে কোনও ভদ্র রমণী থাকতে পারে? কেউ নেই। সৈনিকরা রাত্তিরের দিকে কিছু স্ত্রীলোক নিয়ে আসে বটে, কার ঘরের সর্বনাশ করে কে জানে। আমি সামান্য লোক, সে-খবর জানি না।

সুরপতি আর আপেক্ষা করল না। সে এক প্রকার ছুটতেই লাগল। বলভদ্রের সন্ধান পেলেই একমাত্র সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারের কথা জানা যাবে।

খানিক দূর এসে সে বিশাল রাজপুষ্করিণী দেখতে পেল। এবার এর দক্ষিণ দিকে রাস্তা। সে-দিকে যেতে গিয়েও সে একটি বৃক্ষের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল।

বৃক্ষের গায়ে একটি ইস্তাহার ঝুলছে। তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা —

বংশীলাল! বংশীলাল! কুখ্যাত অপরাধী এবং কারা-পলাতক বংশীলালকে যে বা যারা জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় রাজসরকারে উপস্থিত করতে পারবে, তাকে বা তাদের এক সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে।

সুরপতির গায়ে একটা শিহরণ বয়ে গেল। সে বংশীলাল নয়, কিন্তু বংশীলালের নামে ওই ঘোষণা দেখে মনে হল যেন তারই মৃত্যুদণ্ড। জীবিত অথবা মৃত। না, জীবিত অবস্থায় কেউ আর তাকে কারাগারে নিয়ে যেতে পারবে না।

সুরপতি নিজের মুখে হাত বোলাল। এত দাড়িগোঁফ ভেদ করে কেউ আর তাকে বংশীলাল বলে মনে করবে না। সে শুনেছে, বংশীলালের রোগা পাতলা চেহারা। সে-তুলনায় সুরপতি এখন অনেক সবল স্বাস্থ্যবান।

বংশীলালের সঙ্গে কি তার কোনও দিন দেখা হবে? মনে হয় যেন নিয়তিতে কোথাও বাঁধা আছে যে, এক দিন সে বংশীলালের মুখোমুখি দাঁড়াবে, সব বোঝাপড়া হবে সে-দিন।

দক্ষিণের রাস্তা দিয়ে এক ক্রোশ আসার পর সুরপতি দেখতে পেল একটি সরাইখানা। এটাই কি বলভদ্রের? হঠাৎ ভিতরে প্রবেশ না করে সুরপতি ভাবল, আগে একটু অনুসন্ধান করা যাক।

এই সরাইখানার সামনে একটি ছোট কুঠরিতে থাকে এক জন ক্ষৌরকার। সুরপতি তার সামনে গিয়ে কোনও প্রশ্ন করতে যাবে, এমন সময় সরাইখানা থেকে বেরিয়ে এল একটি ন'দশ বছরের বালক।

সুরপতির চিনতে এক মুহূর্ত দেরি হল না। তার পুত্র ধ্রুবকুমার।

॥ ৭ ॥

সুরপতি তক্ষুনি সব কিছু ভুলে ধ্রুবকুমারকে কোলে তুলে যাচ্ছিল, কিন্তু তা আর হল না।

বালকটি নিজেই দৌড়ে এল এ-দিকে। সুরপতির দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। ক্ষৌরকারের সামনে এসে দাঁড়াল।

সুরপতির নিজেকে সংযত করে রাখল কোনওক্রমে। তার এই বিশাল দাড়িগোঁফ সমন্বিত চেহারা দেখে চিনতে পারবে না ধ্রুবকুমার। হঠাৎ ভয় পেয়ে যাবে।

ধ্রুবকুমার ক্ষৌরকারকে সম্বোধন করে বলল, আপনাকে একবার বাবা ডেকেছেন।

সুরপতির মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। বাবা? ধ্রুবকুমারের আবার বাবা কে?

ক্ষৌরকার বলল, ডেকেছেন? কেন, সকালেই যে তোমার বাবার ক্ষৌরি করে দিয়ে এলাম?

ধ্রুবকুমার বলল, আমার ভাইয়ের হাতে বড় বড় নখ হয়েছে। সে নিজেই নিজের গাল আঁচড়ে ফেলেছে। তাই বাবা বললেন, আপনাকে ডেকে ওর নখ কেটে দিতে।

সুরপতি আবার আঘাত পেল। ভাই? ধ্রুবকুমারের আবার ভাই কোথা থেকে এল? তবে কি এই বালকটি ধ্রুবকুমার নয়? কিন্তু সেই মুখ, সেই চোখ! এ কখনও ভুল করা যায়?

ক্ষৌরকার একটু পরে যাবে শুনে বালকটি আবার দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে সরাইখানায় ঢুকে গেল। সুরপতি এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

তারপর মুখ ফিরিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, ভাই ক্ষৌরকার, এই বালকটির নাম কী?

ক্ষৌরকার বলল, সকলে তো ওকে ধ্রুব বলেই ডাকে।

সুরপতি আবার জিজ্ঞেস করল, এই সরাইখানার মালিক কে?

ক্ষৌরকার বলল, তুমি নতুন লোক বুঝি? এই সরাইখানার মালিক বলভদ্রকে কে না চেনে?

সুরপতি আর কোনও বাক্য উচ্চারণ করতে পারল না। সেখানেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। একটা পাথরে মাথা ঠুকে রক্ত বেরুতে লাগল তার কপাল থেকে।

ক্ষৌরকার লোকটি বৃদ্ধ। সামান্য একটা চালাঘরে সে বহু কাল ধরে এখানে বাস করে আসছে। ত্রি-সংসারে তার কেউ নেই। এই নগরীর খানিকটা অংশ ব্যতীত বাইরের পৃথিবীর কোনও সংবাদই সে রাখে না। এবং তারই চালাঘরের দরজার কাছে এক জন অচেনা বলশালী লোকের হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার মতো ঘটনা তার জীবনে বেশি ঘটে না।

প্রথমে সে ভাবল, সুরপতি মারা গেছে। সে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল শুধু। মানুষ জন্মায় ও মরে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এক জন অচেনা লোক মারা গেছে বলে সে তো তার কাজ বন্ধ রাখতে পারে না। সে তার ক্ষুরে শান দিচ্ছিল, আবার তেমনিই শান দিতে লাগল।

খানিকটা বাদে সে আবার চোখ তুলে দেখল, সুরপতির কপাল থেকে তখনও তাজা রক্ত গড়াচ্ছে।

ক্ষৌরকার শুধু এইটুকু জানে যে, কোনও মরা মানুষের শরীর থেকে তাজা রক্ত বেরোয় না। রক্ত জিনিসটা জীবিত মানুষেরই সম্পদ। এই রক্ত বন্ধও করা যায়।

সে সুরপতির কপালে খানিকটা জল ঢেলে দিয়ে সেখানে ফিটকিরি ঘষতে লাগল। তাতেও রক্ত বন্ধ হয় না। তখন সে খানিকটা ঘাস ছিঁড়ে এনে ক্ষতস্থানে চেপে ধরল।

যন্ত্রণায় সুরপতির জ্ঞান ফিরে এল। সে অস্ফুট গলায় বলল, মা!

ক্ষৌরকার বলল, হায় রে মাতৃহীন! এই নিঃস্বের ঘরে তুমি মাকে খুঁজতে এসেছ? বরং কোনও দেবালয় গেলে না কেন?

সুরপতি বলল, আমি কোথায়?

ক্ষৌরকার জিজ্ঞেস করল, তুমি কে হে বাপু? কোথা থেকে এসেছ? তোমার মুখভর্তি দাড়িগোঁফের জঙ্গল। তুমি যদি আমার কাছে ক্ষৌরকার্যের জন্য এসে থাকো, তাহলে বলো, আমি তা এখনই করে দিচ্ছি।

সুরপতি চোখ মেলে দেখল, ক্ষৌরকারের বার্ধক্য-কুঞ্চিত মুখ তার মুখের কাছে ঝুঁকে আছে। তার এক হাতে তখনও ক্ষুর ধরা।

সুরপতি বলল, আমার দাড়ি কাটবার দরকার নেই। তুমি আমার গলাটা এক পোঁচে কেটে দাও। বাঁচার সাধ আমার মিটে গেছে।

ক্ষৌরকার বলল, এ-রকম অদ্ভুত কথা আমি কখনও শুনিনি! এ-জন্য তুমি আমার কাছে এসেছ কেন? রাজপথে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো, কোনও সৈনিকপুরুষ দেখলে রাজার নামে কিছু নিন্দা উচ্চারণ করো, তারা আরও অনেক সহজে তোমার মুণ্ডু উড়িয়ে দেবে। তুমি যন্ত্রণাও টের পাবে না।

সুরপতি উঠে বসে জিজ্ঞেস করল, রাজার নামে কী নিন্দা উচ্চারণ করব বলো তো?

ক্ষৌরকার বলল, অনেক অনেক রকম কথা বলে। তবে আমার কাছে রাজার একটাই দোষ। আমাদের রাজা মাকুন্দ, তাঁর দাড়িগোঁফ নেই। সুতরাং আমার কাছে এমন রাজা থাকা না-থাকা সমান।

সুরপতি বিস্মিত হয়ে গেল। এমন সরল কথা সে বহু দিন শোনেনি।

ক্ষৌরকার বিড় বিড় করে আপন মনে বলতেই লাগল, এই রাজা আমার কোন উপকারে লাগছে? তবে এ-কথা আমি প্রকাশ্যে জানাতে পারি না, কারণ আমি এখনও আমার এই বৃদ্ধ মুণ্ডুটিকে ভালবাসি। তুমি ভালবাসো না?

সুরপতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, না। জীবনের আনন্দ আমার শেষ হয়ে গেছে।

ক্ষৌরকার বলল, মৃত্যু অতি সহজ। বেঁচে থাকাই বড় শক্ত কাজ, এই বয়েসে আমি এখনও সেই শক্ত কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

সুরপতি বলল, আমি আর পারছি না।

ক্ষৌরকার বলল, আর একটু পরেই রাজপথ দিয়ে সৈনিকেরা টহলে বেরুবে। তুমি যাও, আর দেরি কোরো না।

সুরপতি বলল, আমি উঠে দাঁড়াতে পারছি না। আমার পায়ে জোর নেই। চোখেও ঝাপসা লাগছে। একটু বিশ্রাম করি আগে।

সামনেই সরাইখানা। সেখানে যাও, আরামের শয্যা পাবে। সুন্দর বিশ্রাম হবে।

তার বদলে আমি তোমার শয্যায় যদি একটু শুয়ে থাকি? তুমি শুতে দেবে একটু?

তুমি হঠাৎ এ-রকম অজ্ঞান হয়ে পড়লে কেন? তোমার কি মৃগী ব্যাধি আছে?

আগে তো ছিল না। তবে একবার আমার মাথায় একটা সাংঘাতিক চোট লাগার পর এ-রকম হয়েছে। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে এখন। একটু শুয়ে থাকতে দেবে তোমার শয্যায়?

ক্ষৌরকার একটুক্ষণ চিন্তা করল। তার শয্যা বলতে এক টুকরো চট ও একটা মলিন বালিশ। সেখানে আর একটা লোক এসে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলে কী আর এমন ক্ষতি? তবু একটা লোক এ-রকম বিচিত্র প্রস্তাবই-বা দেয় কেন? সব জিনিসেরই তো মাথা-মুণ্ডু থাকবে!

সে বলল, কিন্তু ভাই, তোমাকে আমি শুতে দেব কোন সুবাদে? তুমি আমার কে?

সুরপতি তার কুর্তার জেব থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা বাব করে ক্ষৌরকারের হাতে দিয়ে বলল, এটা তুমি রাখো। এক দিন না এক দিন আমি ঠিক তোমাকে দিয়ে ক্ষৌরকার্য করাব। এটা তার আগাম দক্ষিণা। সুতরাং এখন আমি তোমার ভাবী খরিদ্দার হয়ে গেলাম।

ক্ষৌরকার এই যুক্তিটা বুঝল। স্বর্ণমুদ্রাটি সে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল। বিড় বিড় করে বলতে লাগল, জীবনে কেউ আমাকে কখনও স্বর্ণমুদ্রা দেয়নি। এটা আমি গলায় ঝুলিয়ে রাখব। ওহে বিদেশি, তুমি এসো, ভিতরে এসো!

সেই দিন থেকে সুরপতি সেই ক্ষৌরকারের জিনিসপত্র ধুয়ে দেয়, তার রান্না করে দেয়, নদী থেকে জল আনে। আর একটু অবসর পেলেই সে সরাইখানার দিকে তাকিয়ে থাকে।

সরাইখানাব সামনে একটা গোল চত্বর। সেখানে কয়েকটি কাঠের চৌকি পাতা। বাইরের লোক এসে ওখানেই প্রথমে বসে। অনেকে ওখান থেকেই খাবার-দাবার খেয়ে নিয়ে চলে যায়। আবার যারা ভেতরে কক্ষ ভাড়া নিয়েছে, তারাও সন্ধ্যার দিকে ওখানে বসে মজলিশ জমায়। সরাইখানাব মূল বাড়িটি পাথরের। বলভদ্র বেছে বেছেই এই সরাইখানাটি কিনেছে, যাতে সহজে আর আগুন না লাগে। দ্বি-তলের একটি ঘরের জানলা সব সময় বন্ধ থাকে। সুরপতি জেনেছে ওই ঘরেই থাকে সুভদ্রা। তাকে কখনও দেখা যায় না।

এর মধ্যে ধ্রুবকুমারের সঙ্গে একটু একটু ভাব হয়েছে সুরপতির। ধ্রুবকুমার তাকে চিনতে পারেনি। ধ্রুবকুমারের ছোট ভাইটিকেও সে দেখেছে। তার মুখখানি অবিকল বুধনাথের মতো। সেই শিশুটির বয়েস হিসেব করেও সুরপতি বুঝেছে যে, এ সেই বুধনাথেরই বলাৎকারের সন্তান। এক-এক সময় সুরপতির এমন অসহ্য রাগ হয় যে তার ইচ্ছে হয়, আদর করার ছলে সে শিশুটিকে ঘাড় মুচড়ে মেরে ফেলে। সুভদ্রার গর্ভে বুধনাথের সন্তান, এ যে তার চোখের বিষ!

পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে নেয়। অবোধ কোমল শিশু, এর তো কোনও দোষ নেই! এর জন্মের জন্য তো এ নিজে দায়ী নয়!

তবে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে ধ্রুবকুমারকে। তার জন্য সে পাখি ধরে দেয়, গাছের ডাল ভেঙে খেলনা তৈরি করে। সুরপতি এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে পারছে না শুধু ধ্রুবকুমারের টানে। এ যে রক্তের টান।

সুভদ্রার কথা সে অনেক বার ভেবেছে। এখন যদি সে বলভদ্রের কাছে গিয়ে সুভদ্রার স্বামী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে বলভদ্র কি ফিরিয়ে দেবে না সুভদ্রাকে? বলভদ্র এমনি মানুষটা খারাপ নয়। এই ক'দিনে তার ব্যবহার দেখে, কথাবার্তা শুনে সুরপতি বুঝেছে, মানুষটার মধ্যে মায়া-দয়া আছে। দু'টি সন্তান সমেত সে সুভদ্রাকে আশ্রয় দিয়েছে, এটাও কম কথা নয়।

কিন্তু সুভদ্রাকে নিয়ে সুরপতি যাবে কোথায়? তার সহায় সম্বল নেই, আর এক কপর্দকও সঞ্চয় নেই, সে তো কোথাও নতুন করে সংসার পাততে পারবে না। এক হয়, যদি তমলুকে আবার ফিরে যাওয়া যায়। সেখানে রোগের উপদ্রব নিশ্চয়ই এত দিনে থেমে গেছে। কোনও রকমে খুব কষ্ট

করেও সেখানে একবার পৌঁছতে পারলে কিছু একটা গতি হয়ে যাবে। কিন্তু সেখানে এই কুলটা রমণীকে নিয়ে সে সমাজে বাস করবে কী করে? সুভদ্রা একবার দস্যুদ্বার ধর্ষিতা হয়েছে, সে তো না হয় নিজের অনিচ্ছায়, কিন্তু তারপর তো সে এতগুলো বছর পরপুরুষের ঘর করেছে! কথাটা মনে পড়লেই যেন সুরপতির বুকটা একেবারে পুড়ে যায়। সেই সুভদ্রা — যার ধ্যান জ্ঞান সব কিছুই ছিল সুরপতিকে কেন্দ্র করে, কোনও দিন অপর পুরুষের দিকে চোখ তুলে তাকায়নি পর্যন্ত!

সুভদ্রার কথা চিন্তা করে এত কষ্ট করেও জীবনধারণ করেছে সুরপতি। কারাগার থেকে পলায়ন করেছে কত ঝুঁকি নিয়ে। তার পরও কত রকম বিপদ আসে, তবু সে এখনও বেঁচে আছে, সে নিছক মনের জোরে। সবই সুভদ্রার জন্য। সেই সুভদ্রা তার জন্য অপেক্ষা করতে পারল না?

সুরপতি তো অন্য কোথাও থেকেও যেতে পারত। রেশমি বিবির মতো রমণীর আহ্বানও সে পেয়েছিল। আর কিছু না হোক, সে তো সন্ন্যাসী হয়ে পাহাড়ে যেতে পারত। কিন্তু সুভদ্রার কথা এক মুহূর্তের জন্যও সে ভোলেনি। এখন এত কষ্ট করে ফিরে এসেও সে দেখল, সুভদ্রা আর তার নয়। তার নিজের পুত্র তাকে বাবা বলে চিনতে পারে না।

তবু সুভদ্রার ওপর ঠিক রাগ করতে পারে না সুরপতি। মনটা আবার কোমল হয়ে যায়। সুভদ্রার মতো নারী নিশ্চয়ই স্বেচ্ছায় এমন হয়নি। সুভদ্রার ওপর রাগ করলে তো সুরপতি এখনও যে-কোনও দিন এখান থেকে চলে যেতে পারে। কিন্তু তা সে পারে না।

প্রথম দিন সরাইখানায় ঘুম থেকে জেগে সুভদ্রা নিশ্চয়ই ভেবেছিল যে, সুরপতি তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। সুরপতি আর ফিরে আসেনি বলে সেই ধারণাটাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারপর পুত্রসন্তান নিয়ে সুভদ্রা চরম অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছিল, নিশ্চয়ই খুব সহজে সে আত্মসমর্পণ করেনি বলভদ্রের কাছে। ক্ষুধার জ্বালায়, বিশেষ করে শিশুপুত্রের মুখ চেয়েই বোধহয় সে শেষ পর্যন্ত বেছে নিয়েছে এই কলঙ্কের জীবন।

সুভদ্রা, ধ্রুবকুমারকে এখানে ফেলে রেখে অন্য কোনও জায়গায় চলে যেতেও তার মন চায় না। অথচ নিজের স্ত্রী-সন্তানকে ফিরিয়ে নেবারও কোনও উপায় নেই। অন্তত সুভদ্রাকে সে যদি একবার চোখের দেখাও দেখতে পেত!

সুরপতি ধ্রুবকুমারের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে জিজ্ঞেস করে, বাছা, তোমার মা কি কখনও বাইরে বেরোন না?

ধ্রুবকুমার বলে, না। মা বাইরে আসতে চান না। যদি দুষ্ট লোকেরা মাকে ধরে নিয়ে যায়?

সুরপতি আবার জিজ্ঞেস করে, তোমার মা বুঝি খুব সুন্দর?

ধ্রুবকুমার বলে, আমার মা পৃথিবীর সব চেয়ে সুন্দর মা!

আচ্ছা ধ্রুবকুমার, লোকে নাকি বলে, তোমার মা বোবা! উনি কথা বলতে পারেন না!

ধ্রুবকুমার রেগে গিয়ে উত্তর দেয়, কে বলেছে? দুষ্ট লোকেরা এ-কথা বলে।

তোমার মা তাহলে কথা বলতে পারেন?

হ্যাঁ, মা তো রোজ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন। তবে শুধু আমাদের সঙ্গে কথা বলেন, অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলেন না।

তোমার বাবার সঙ্গেও কথা বলেন না?

না।

তারপর একটু থেমে ফিস ফিস করে ধ্রুবকুমার বলে, উনি তো আমার বাবা নন। আমার বাবা তো দূরে বিদেশে চলে গেছেন।

সুরপতি আর চোখের জল সামলাতে পারে না। কান্নায় তার বুক ভিজে যায়। কোনও রকমে মুখটা অন্য দিকে সরিয়ে রাখে যাতে ধ্রুবকুমার দেখতে না পায়। তার সন্তান অন্তত তাকে মনে রেখেছে। সে আর কখনও অন্য লোককে বাবা বলবে না। তবু সে সন্তানের কাছে নিজের পরিচয় দিতে পারছে না! ধ্রুবকুমারকে একলা সে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু সুভদ্রা? সুভদ্রাকে সে এত দিন পরে কী করে ফিরিয়ে নেবে? তাছাড়া লজ্জায়, পাপের ভয়ে সুভদ্রা হয়তো এখন আর তার কাছে ফিরে আসতেও চাইবে না।

একটুক্ষণ পরে সে আবার ধ্রুবকুমারকে জিজ্ঞেস করে, তোমার বাবাকে তোমার মনে আছে?

ধ্রুবকুমার সুর করে টেনে উত্তর দেয়, হ্যাঁ —।

তোমার বাবা তোমাদের ফেলে কেন দূর বিদেশে গেছেন?

তা আমি জানি না। মা জানেন।

মা কিছু বলেন না তোমাদের?

না, বাবার কথা জিজ্ঞেস করলেই মা কাঁদতে থাকেন। তাই আর জিজ্ঞেস করি না।

আমার কি মনে হয় জানো? তোমার বাবা বোধহয় কোনও রাজার কারাগারে বন্দি হয়ে ছিলেন, তাই তোমাদের খোঁজ নিতে আসতে পারেননি। তোমার মাকে একটা কথা জিজ্ঞেস কোরো তো। তোমরা যদি খবর পাও, কোনও রাজার কারাগারে তোমার বাবা বন্দি হয়ে আছেন, তাহলে তোমরা কি তাঁকে উদ্ধার করতে যাবে?

ধ্রুবকুমার দর্পের সঙ্গে বলল, নিশ্চয়ই যাব। আমি যাব।

যদি তোমাদের এই বাবা, মানে সরাইখানার মালিক বলভদ্র যেতে না দেন?

আমি তবু একা যাব। তলোয়ার নিয়ে লড়াই করব।

তবু কথাটা তোমার মাকে একবার জিজ্ঞেস কোরো। আমার কথা কিছু বোলো না, এমনি জিজ্ঞেস কোরো, কেমন?

সুরপতি আবার অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখের জল লুকোয়।

॥ ৮ ॥

কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর সুরপতির পাওয়া হল না। তার আগেই আর একটি ঘটনা ঘটে গেল।

সে-দিন তখন নিদারুণ দ্বিপ্রহর। রৌদ্রের তেজে পথঘাট একেবারে ফাঁকা। সেই সময়েই একজন অশ্বারোহী এসে থামল সরাইখানার সামনে। অশ্বারোহীটি বেশ সুপুরুষ, মাথায় বিশাল পাগড়ি বাঁধা।

সরাইখানার চত্বরে ঢুকে সে একটা চৌকিতে বসল। তারপর পাগড়িটা খুলে হাওয়া খেতে খেতে বলল, কে কোথায় আছ হে? এক পাত্র জল নিয়ে এসো!

সেই চত্বরের এক পাশে একটি বড় পেয়ারা গাছ। ধ্রুবকুমার তখন সেই গাছে চড়ে পেয়ারা পাড়ছিল। গাছের ওপর থেকেই সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, বাবা!

সেই ডাক শুনে ক্ষৌরকারের চালাঘরে বসে চমকে উঠল সুরপতি। ধ্রুবকুমার তো বলভদ্রকে এ-রকম ভাবে বাবা বলে ডাকে না। বাইরে এসে সে দেখাল, ধ্রুবকুমার গাছ থেকে নেমে এসে দৌড়ে গিয়ে একটি লোককে জড়িয়ে ধরে আনন্দে চিৎকার করছে, বাবা — বাবা এসেছে! আমার বাবা এসেছে!

চৌকিতে বসে থাকা লোকটিকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল সুরপতি। অবিকল তার যৌবনের চেহারা, ঠিক যেন তার একটি প্রতিবিম্ব বসে আছে ওখানে। ধ্রুবকুমার তো ভুল করবেই।

সুরপতির চিনতে এক মুহূর্ত দেরি হল না। এই তবে সেই বংশীলাল! বংশীলালের দাড়িগোঁফ কামানো, চকচকে চেহারা, বেশ একটা শৌখিনতার ভাব আছে। এই সেই নটবর চূড়ামণি। লোকটার সাহস আছে, এ-রকম দিনের বেলা সে প্রকাশ্যে ঘুরতে পারে এখানও!

ধ্রুবকুমারের চিৎকার শুনে বেরিয়ে এসেছে বলভদ্র। সে-ও স্তম্ভিত হয়ে গেছে। একটুক্ষণ পরে সে বলল, তুমি ফিরে এসেছ, এত দিন পর! কেন এসেছ? দূর হয়ে যাও।

বংশীলাল কোনও কথা বলল না। সে অতি চতুর লোক, প্রথমেই কিছু ভুল বলে না ফেলে ব্যাপারটা বুঝে নিতে চায়।

বলভদ্র হুকুম করল, ধ্রুবকুমার, যাও ভেতরে যাও!

ধ্রুবকুমার বলল, না, আমি যাব না। আমার বাবা এসে গেছে — মা, মা, মা, এসো দেখো বাবা এসেছে!

এত দিন পর দ্বি-তলের সেই বন্ধ কক্ষটির একটি জানলা ফট করে খুলে গেল। সুরপতিও ততক্ষণে সরাইখানার চত্বরে এসে দাঁড়িয়েছে। সে আর বংশীলাল এক সঙ্গে দেখল সুভদ্রাকে। এতগুলি বছরেও সুভদ্রার সেই রূপ একটুও ম্লান হয়নি।

সুন্দরী রমণী দেখে বংশীলালের চোখ চক চক করে উঠল। এতক্ষণ সে ধ্রুবকুমারের চিৎকারে কোনও মনোযোগ দেয়নি, এবার সে দক্ষ অভিনেতার মতো কণ্ঠস্বর কম্পিত করে বলল, এসো বৎস, তোমাদের জন্যই তো আমি এত কাল পরে ফিরে এসেছি!

সুরপতির শরীরের রক্ত চলাচল যেন থেমে গেছে। এক সঙ্গে দু'টি চরম উত্তেজক ব্যাপার তার সহ্য হচ্ছে না। এত দিন পর সে সুভদ্রাকে দেখল। সেই চোখ, সেই ওষ্ঠ! একরাশ কালো চুলের মধ্যে সুভদ্রার ফরসা মুখখানি দেখে মনে হয় ঠিক যেন এক অপ্সরী, এই মাটির পৃথিবীতে বন্দি হয়ে আছে।

সুরপতি সুভদ্রার নাম ধরে ডাকার চেষ্টা করল। কিন্তু গলা দিয়ে কোনও শব্দ বেরোল না। সুভদ্রা তার দিকে তাকায়নি। সে এক দৃষ্টিতে বংশীলালকে দেখছে।

বংশীলালকে দেখেও সুরপতি কম বিহ্বল হয়নি। এই সেই লোক, যার জন্য বিনা অপরাধে সুরপতিকে এত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। জীবনের কতগুলি মূল্যবান বছর নষ্ট হয়ে গেছে তার। এই বংশীলালের জন্যই সে নিজের স্ত্রী-পুত্রকে হারিয়েছে।

এই বংশীলাল এখন এসেছে তার বাকি জীবনটাও বিড়ম্বিত করতে। সে এখন সুভদ্রাকে হরণ করতে চায়।

বংশীলাল লুব্ধের মতো কয়েক বার সুভদ্রার দিকে তাকাল। তারপর দু'হাত উচ্চে তুলে বলল, দেখো, আমি এসেছি! আমি ফিরে এসেছি। আমি মরিনি।

সুভদ্রা এখনও নিঃশব্দ, কোনও উত্তর জানাল না বংশীলালকে।

বংশীলাল ধ্রুবকুমারকে কোলে তুলে নিয়ে বলল, আমি ফিরে এসেছি, আর কোনও ভয় নেই।

তারপর বলভদ্রের দিকে ফিরে বলল, ভাই, তুমি যে আমার স্ত্রী-পুত্রকে এত দিন আশ্রয় দিয়েছ সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এবার এদের সব ভার নেব।

বলভদ্র তিক্ত গলায় বলল, এবার এদের ভার তুমি নেবে? নির্লজ্জ, কাপুরুষ! এক সময় এদের ফেলে পালিয়েছিলে কেন? স্ত্রীর জন্য চিকিৎসক ডাকার নাম করে ভোররাত্রে চুপি চুপি কেন পালিয়েছিলে? তখন এদের কথা মনে পড়েনি? একটি কানাকড়িও সম্বল রেখে যাওনি এদের জন্য!

বংশীলাল তাকে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করে বলল, সে-সব কথা পরে বলব। আমার দারুণ বিপদ হয়েছিল।

বলভদ্র গর্জে উঠে বলল, পরে নয়, এখুনি সব কথা হয়ে যাক। কোন অধিকারে তুমি এদের ওপর দাবি জানাতে এসেছ?

বংশীলাল মৃদু হাস্য করে বলল, স্বামীর অধিকারে। পিতার অধিকারে। সে-অধিকার নষ্ট হয় না।

বলভদ্র বলল, যে-স্বামী তার স্ত্রীকে অসহায় অবস্থায় রেখে পলায়ন করে, তার আবার অধিকার কী? যে-পিতা তার পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের কথা ভাবে না, সে আবার কী-রকম পিতা? তুমি এখান থেকে শীঘ্র দূর হও। আমার ক্রোধ জাগ্রত হবার আগে তুমি আমার চোখের সামনে থেকে সরে যাও।

বংশীলাল এ-কথায় ভয় পেল না। সুভদ্রার মতো সুন্দরী রমণী সে আগে কখনও দেখেনি। এমন নারীরত্ন দৈবাৎ পেয়ে গিয়ে সে কিছুতেই ছাড়বে না। সে মিষ্টভাবে বলল, অত রাগ করছ কেন ভাই? নিশ্চয়ই কোনও গুরুতর কারণ ঘটেছিল, তাই আমি ফিরে আসতে পারিনি এত দিন। এখন তো এসেছি, এখন আর আমি দেরি করতে পারছি না, অধীর হয়ে পড়েছি, তুমি আমাকে সুভদ্রার কাছে যেতে দাও।

দাঁড়াও।

কেন আমাকে বাধা দিচ্ছ?

তোমার লজ্জা করছে না? তুমি এমন ভাব করছ যেন সব কিছুই স্বাভাবিক আছে। সুভদ্রার ওপরে তোমার চেয়ে আমার অধিকার অনেক বেশি। তুমি যে-দিন ওদের পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলে, সে-দিন থেকে সুভদ্রা অনশন নিয়েছিল।

এই সময় সুভদ্রার ঘরের জানলা আবার রুদ্ধ হয়ে গেল। সকলেই সে-দিকে তাকাল একবার।

বলভদ্র আবার বলল, হ্যাঁ, অনশন নিয়েছিল সুভদ্রা। আমি অনেক বুঝিয়েও তাকে অন্নগ্রহণ করাতে পারিনি। সে কারুর দয়ার দান গ্রহণ করবে না। শিশুপুত্রটি কাঁদছিল, তবু সুভদ্রা ভ্রূক্ষেপ করেনি। তিন দিন এইভাবে থাকার পর সুভদ্রা বুঝেছিল যে, তুমি আর ফিরবে না। তোমার অনুসন্ধানে আমি নিজে লোক পাঠিয়েছিলাম চতুর্দিকে। কেউ তোমার সন্ধান আনতে পারেনি। তুমি এ রাজ্য ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলে, সে-কথা সুভদ্রাকে জানাতে, সে শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে পাগলিনীর মতো পথে বেরিয়ে পড়েছিল। কেউ তাকে ফেরাতে পারেনি, বেশ কিছু দূর গিয়ে সে পথের মধ্যে পড়ে যায়। তার শরীর অসুস্থ, তার ওপর উপবাসের দুর্বলতা, এই অবস্থায় সে হাঁটবে কী করে? আমি প্রথম থেকে তাকে আশ্রয় দিতে চেয়েছি বিনাশর্তে। সে রাজি হয়নি। শেষ পর্যন্ত আমি তার শিশুপুত্রকে কেড়ে নিয়ে এসেছিলাম। সিংহিনী যেমন তার শাবককে ছেড়ে থাকে না, সেই রকম সুভদ্রা তার সন্তানের টানে আবার ফিরে এসেছিল সরাইখানায়। আমার আশ্রয়ে।

বংশীলালের চোখ দিয়ে কৃত্রিম অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। সে বলল, ভাই, তুমি যে উপকার করেছ, সারা জীবনে কী-ভাবে সেই ঋণ শোধ করব তা জানি না। তবু যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করব।

বলভদ্র বলল, তোমার ঋণশোধের তোয়াক্কা আমি করি না। আমি এদের আশ্রয় দিয়েছি, আমার নিজের অন্তরের টানে। আমি এই শিশু আর তার জননীকে নিজের বলে গ্রহণ করেছি। আমি জানতাম না সুভদ্রা দ্বিতীয় বার অন্তঃসত্ত্বা। তবু আমি তার বিন্দুমাত্র অযত্ন করিনি। তুমি এমনই পাষণ্ড যে নিজের গর্ভিণী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতেও তোমার বিবেকে আটকায়নি। সুভদ্রার জন্য আমি কত ক্ষতি সহ্য করেছি, তুমি জানো! এই দারুকেশ্বরে সব চেয়ে বড় সরাইখানার মালিক ছিলাম আমি। সুভদ্রা যখন সুস্থ হয়ে উঠল, তার রূপ আবার খুলে গেল, তখন সেই রূপের লোভে শৃগালেরা ঘোরাফেরা করতে লাগল দিন-রাত। সুভদ্রাকে কেড়ে নেবার অনেক চেষ্টা করেছে কামুকেরা। আমি বুক দিয়ে ওদের আগলেছি। দিবারাত্রি প্রহরা দিয়েছি। আমার সরাইখানায় দু-দু'বার ওরা অগ্নিসংযোগ করেছে,

তবু আমি সুভদ্রাকে অন্য কারুর হাতে তুলে দিইনি। তাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি এখানে। আমি আজও সুভদ্রার ওপর বলপ্রকাশ করিনি এক দিনও, শুধু তার করুণা চেয়েছি।

বংশীলাল বলল, ভাই, আমার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছিল। এক সাধুর আস্তানায় আমি গিয়েছিলাম সুভদ্রার জন্য ঔষধ আনতে।

সুরপতি স্তম্ভিত হয়ে সরাইখানার দ্বারের পাশে দাঁড়িয়ে এ-সব শুনছে। জালিয়াৎ বংশীলালের দুঃসাহসের কোনও সীমা নেই। এত অনর্গল মিথ্যা সে বলতে পারে! কিন্তু এখনও যদি তাকে জেরা করা যায়, সে ধরা পড়ে যাবে। সুভদ্রার পূর্ব-পরিচায সে কিছুই জানে না। বস্তুত সুভদ্রা সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। সুভদ্রার শরীরের কোথায় কোথায় তিল আছে, সে-প্রশ্ন করলেই সে মির্বাক হয়ে যাবে। সে অতি চতুর, বলভদ্রকে রাগিয়ে দিয়ে সে পূর্ব-কথা সব শুনে নিচ্ছে। এখনও যদি সুরপতি ওর সামনে গিয়ে প্রশ্ন করে —।

কিন্তু সুরপতিকে কে চিনবে? ধ্রুবকুমার পর্যন্ত তার পিতাকে চিনতে পারেনি। সুভদ্রাও যদি তাকে এই বেশবাসে চিনতে না পারে? সুভদ্রা কি বংশীলালকেই সুরপতি ভাবছে?

আর দেরি করলে মহা সর্বনাশ হয়ে যাবে। অতি ধূর্ত বংশীলাল নিজের স্মৃতিভ্রংশের কথা তুলেছে, ওই এক যুক্তিতে সে সব পুরনো কথা অস্বীকার করতে পারে। সে যদি সুভদ্রার ওপর নিজের স্বামীত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, বলভদ্র কি আটকাতে পাববে? হাকিমের কাছে গেলে বলভদ্রই তিরষ্কৃত হবে!

আর সময় নেই। সুরপতি দৌড়ে ফিরে এল ক্ষৌরকের আস্তানায়। ওঠো, ওঠো! তোমাকে সেই স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম মনে আছে? আজ তার হিসাব মেটাও। আমার চুল-দাড়ি সব কেটে দাও।

ক্ষৌরকার চোখ মেলে বলল, এত ব্যস্ততার কী আছে? তুমি কি বিবাহ কবতে যাচ্ছ নাকি?

সুরপতি তাকে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, হ্যাঁ, তাই যাচ্ছি। আব এক মুহূর্তও সময় নেই।

ক্ষৌরকার বলল, তোমার মতো সহায়সম্বলহীনকে কে বিবাহ করবে হে? দারুকেশ্বরের পাত্রীরা এত শস্তা তো নয়!

সুরপতি তাকে তুলে বসিয়ে দিয়ে বলল, কোনও পাত্রীর সঙ্গে নয়, আমার বিবাহ হবে মৃত্যুর সঙ্গে। শীঘ্র করো।

ক্ষৌরকার সুরপতির চুল ছেঁটে, দাড়িগোঁফ নির্মূল করে দিল সযত্নে। তারপর সুরপতির মুখে নিজ শিল্পকীর্তির দিকে তাকিয়ে সে বলল, তোমার মুখখানি তো মন্দ নয়! মৃত্যু নিশ্চয়ই পছন্দ করবে তোমাকে!

সুরপতি লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষৌরকারের হাত থেকে ক্ষুরটি কেড়ে নিল। তাকে আর কোনও বাক্য উচ্চারণ করতে না দিয়ে সে ছুটে গেল সরাইখানার দিকে।

বংশীলাল তখন জোর করে সরাইখানার দ্বি-তলে ওঠার চেষ্টা করছে। বলভদ্র বাধা দিচ্ছে তাকে। বংশীলালের মুখ থেকে এতক্ষণে বিনয় ও কৃতজ্ঞতার ভাব খসে পড়েছে। সে রুক্ষভাবে বলভদ্রকে ধাক্কা দিয়ে বলছে, লম্পট, তুমি আমার স্ত্রীকে ভোগ করতে চাও? যদি এখনও তুমি সরে যাও, তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারি। নইলে হাকিমকে দিয়ে তোমাকে শূলে চড়াব।

সুরপতি পিছন থেকে ছুটতে ছুটতে এসে চিৎকার করে বলল, দাঁড়াও!

বলভদ্র আর বংশীলাল দু'জনেই সেই চিৎকার শুনে ঘুরে দাঁড়াল। দু'জনেরই মুখ গোলাকার হয়ে গেল। তারা যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না।

বলভদ্রই বলল, এ কে?

বংশীলাল বলল, এ নিশ্চয়ই কোনও প্রতারক। আমার চেহারার মতো রূপসজ্জা করে এসেছে।

সুরপতি আর বংশীলাল মুখোমুখি দাঁড়াল। এক বিচিত্র হাস্য ফুটে উঠল সুরপতির ওষ্ঠে। তার জীবনের এক অশুভ চক্র যেন আজ সম্পূর্ণ হল। এক দিন এই বলভদ্রের সরাইখানায় এসে প্রথম দাঁড়াবার পর তাকে বংশীলাল বলে ভুল করা হয়েছিল। তারপর থেকে তার জীবনটাই বদলে গেল।

সুরপতি বলল, এবার?

বংশীলাল বলল, এ জীবনে কত কিছুই দেখেছি, কিন্তু এমন বিচিত্র দৃশ্য কখনও দেখিনি। কে তুমি ওস্তাদ? আমারই প্রতিচ্ছবি হয়ে কোথা থেকে এলে?

সুরপতি জিজ্ঞেস করল, আমাকে চিনতে পারছ না?

বংশীলাল ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, না, আমি নিজেকে এখনও চিনি না। চেনার চেষ্টাও করি না।

সুরপতি ধারালো ক্ষুরটা উঁচুতে তুলে ধরে বংশীলালকে বলল, নরাধম, আজ তোর সব পাওনা মিটিয়ে দিতে এসেছি!

বংশীলাল তবু ভয় না পেয়ে বলল, তুমি কে? তুমি কি কোনও প্রেতাত্মা? তুমি কি আমার মনেরই কোনও অন্ধকার রূপ? তুমি অলীক?

সুরপতি বলল, তোমার রক্তের ফোয়ারায় যখন আমি হাত ধোবো তখন তুমি বুঝবে আমি কে! তুমি এ জীবনে যত পাপ করেছ, তার শাস্তিভোগ করতে হয়েছে আমাকে। এবার আমার হাত থেকেই নাও তোমার শেষ শাস্তি।

বংশীলাল তার কটিবন্ধ থেকে ছুরিকাটি বার করারও সময় পেল না। তার আগেই ক্ষুর নিয়ে সুরপতি লাফিয়ে পড়ল তার ওপর। ফালা ফালা করে ফেলল বংশীলালের গলা। সত্যিই ফোয়ারার ধারার মতো রক্ত ফিনকি দিয়ে লাগল সুরপতির হাতে।

বংশীলাল বলল, এবার তাহলে গেলাম!

সেটাই বংশীলালের শেষ কথা।

নির্বাক প্রস্তরমূর্তির মতো দণ্ডায়মান বলভদ্রকে স্পর্শ করে সুরপতি বলল, আমাকে প্রথম দিন দেখেই তুমি বংশীলাল বলে ভুল করেছিলে। আজ সত্যিকারের বংশীলালকে দেখেও তুমি চিনতে পারলে না?

বলভদ্র অস্ফুট কণ্ঠে বলল, এ বংশীলাল!

সুরপতি বলল, কোনও সন্দেহ নেই।

তাহলে তুমি কে?

আমি সুরপতি। তুমি বংশীলালের মৃতদেহটি রাজদরবারে নিয়ে যাও। জীবিত বা মৃত অবস্থায় তাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারলে এক সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করা আছে। সেই পুরস্কার তুমি নাও। আমি আমার স্ত্রীর কাছে যাচ্ছি।

এই সময় দ্বি-তলের কক্ষ থেকে তীক্ষ্ণ আ-আ-আ শব্দ হল। তারপর মনে হল, কেউ পড়ে গেল ভূমিতে।

বলভদ্র বলল, এ তো সুভদ্রার গলা! এ তো সুভদ্রার চিৎকার!

সুরপতি বলল, তোমার আগে আমি ওই কণ্ঠস্বর চিনেছি।

বলতে বলতে সে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল।

ঘরের দ্বার ভিতর থেকে বন্ধ।

সুরপতি প্রাণপণ শক্তিতে সেই দ্বারে ধাক্কা দিল।

ততক্ষণে বলভদ্রও সেখানে উঠে এসেছে। ধ্রুবকুমার মা মা বলে চিৎকার করছে।

সুরপতি বলভদ্রকে বলল, তুমি আমাকে এই দ্বার ভেঙে ফেলতে সাহায্য করো। করবে না?

দু'জনের মিলিত ধাক্কায় দ্বার ভেঙে পড়ল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। ঘরের মধ্যে দেখা গেল, সুভদ্রা নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে মেঝের ওপরে। তার পাশে একটি বিষের কৌটো।

বলভদ্র হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল। ধ্রুবকুমার ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মায়ের বুকে। শুধু সুরপতি চঞ্চল হল না। সে নিচু হয়ে ঝুঁকে সুভদ্রার ওষ্ঠ ও অধর ফাঁক করে দেখল। সুভদ্রার জিহ্বায় তখনও বিষের সাদা সাদা গুঁড়ো লেগে আছে। তখনও উত্তাপ আছে সুভদ্রার শরীরে।

সুরপতি উন্মত্তের মতো চিৎকার করে বলল, এখনও সময় আছে! আমি বাঁচাব, আমি সুভদ্রাকে বাঁচাব। আমি এমন ভাবে সব কিছু ব্যর্থ হতে দেব না।

সুভদ্রার দেহটা পাঁজাকোলা করে নিয়ে সে ছুটল। এই পৃথিবীতে মাত্র এক জন ব্যক্তিই আছেন, যিনি সুভদ্রাকে বাঁচাতে পারেন। তিনি রাজবৈদ্য বাসবদত্ত।

বাতাসের মতো বেগে ছুটে সুরপতি সুভদ্রাকে কোলে নিয়ে এসে পৌঁছল রাজবৈদ্য বাসবদত্তের বাসভবনে। সেখানে তখন লোকে লোকারণ্য। সকলের চোখেই কাতর অশ্রু।

তবে কি বাসবদত্ত আর বেঁচে নেই? সুরপতির সব আশা শেষ?

কিছু লোককে প্রশ্ন করে সুরপতি জানল, বাসবদত্ত এখন একেবারে উত্থান-শক্তিরহিত। তিনি খুব মৃদুকণ্ঠে শ্রীবিষ্ণু নাম করছেন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর আয়ু আর কয়েক দণ্ড মাত্র। সকলেই শোকের সেই চরম মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছে।

সুরপতি কাতর ভাবে বলে উঠল, আমাকে যেতে দাও! তোমরা আমাকে একবার যেতে দাও!

জনতা সরে গিয়ে পথ করে দিল। সুরপতি সুভদ্রাকে কোলে নিয়ে উঠে এল বাসবদত্তের বাসভবনের দ্বি-তলে। মাঝখানে প্রধান কক্ষটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন বাসবদত্ত। তাঁকে ঘিরে নতমুখে বসে আছে তার পরিচারিকাবৃন্দ। সুরপতিকে দেখে সবাই চমকে তাকাল।

সুরপতির সারা শরীরে রক্ত, তার বক্ষে বিদ্যুৎলেখার মতো এক নারী। যেন স্বয়ং মহাদেব সতীকে বক্ষে নিয়ে উন্মাদের মতো উপস্থিত হয়েছেন সেখানে। কেউ কোনও কথা বলার সাহস পেল না।

সুরপতি আস্তে আস্তে সুভদ্রার দেহ নামিয়ে রাখল মাটিতে। তারপর বাসবদত্তের শিয়রে এসে দাঁড়াল। বাসবদত্তের ঠোঁট একটু একটু নড়ছে। মুখে প্রশান্ত হাসি।

সুরপতি বাসবদত্তের কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকল, প্রভু! প্রভু! আমি একবার আপনার শরণ নিতে এসেছিলাম। তখন আপনার কৃপা গ্রহণ করার সুযোগ পাইনি। তাই আমি এখন এসেছি।

বাসবদত্ত চোখ মেলে বললেন, কে?

সুরপতি বলল, আমি এক জন সামান্য মানুষ। কিন্তু ওই দেখুন, ভূমিতে পড়ে আছে এক অসামান্য নারী। ও বিষ খেয়েছে। একমাত্র আপনার কৃপাতেই ও বাঁচতে পারে।

বাসবদত্ত চোখ মেলে বললেন, আমাকে তুলে ধরো।

সুরপতি বাসবদত্তের মাথাটা উঁচু করে তুলে ধরতে তিনি তাকালেন সুভদ্রার দিকে। তাঁর চক্ষু করুণায় আর্দ্র হয়ে উঠল। তিনি বললেন, আহা, এমন চন্দ্রলেখার মতো রূপ, এ কেন অকালে প্রাণত্যাগ করবে! কিন্তু মূর্খ, আর একটু আগে আসতে পারোনি? আমার যে সময় ফুরিয়ে এসেছে!

প্রভু আপনি তবু কিছু নিদান বলে দিন।

শুধু নিদানে হয় না। আমার স্পর্শ করা চাই। আমি এ পর্যন্ত যতগুলি মানুষকে বাঁচিয়েছি, তার বদলে নিজে একটু একটু করে মরেছি। আমার আর যেটুকু প্রাণশক্তি আছে, তাতে কী আর একটা প্রাণ বাঁচবে! তবু নিয়ে এসো, ওকে আমার এই শয্যায় নিয়ে এসো।

সুরপতি সুভদ্রাকে তুলে এনে শুইয়ে দিল বাসবদত্তের পাশে। তিনি তিনটি ওষুধের নাম বললেন। পরিচারিকারা সঙ্গে সঙ্গে সেই ওষুধগুলো এনে সুভদ্রার মুখে ঢেলে দিল।

বাসবদত্ত নিজের ডান হাতখানা সুভদ্রার কপালে রেখে মৃদুস্বরে বলতে লাগলেন, ওঁ শ্রীবিষ্ণু, ওঁ শ্রীবিষ্ণু...।

কয়েক মুহূর্ত পরে সুভদ্রার চোখের একটা পাতা নড়ে উঠল। পরিচারিকারা সঙ্গে সঙ্গে তুমুল স্বরে বলল, জ্ঞান আসছে, জ্ঞান আসছে।

বাসবদত্ত সুভদ্রার কপাল থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে অতি কষ্টে জানলার বাইরের সূর্যদেবকে প্রণাম করলেন। তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি আনন্দে চলে গেলাম!

তাঁর শেষ নিশ্বাস বেরিয়ে গেল, তিনি ঢলে পড়লেন।

আর তখনই জেগে উঠে বসল সুভদ্রা। প্রথমেই সে দেখল সুরপতিকে। সে আবেগ ভরে ডাকল, নাথ?

সুরপতি সুভদ্রাকে ধরে বললেন, আমাকে চিনতে পেরেছ? আমি সুরপতি। তোমার স্বামী।

সুভদ্রা বলল, কেন চিনব না? আমি তো দীর্ঘকাল ধরে আপনারই প্রতীক্ষায় ছিলাম। আমি এক দিনও ধর্মচ্যুতি হইনি। আমি জানতাম, আপনি ঠিক এক দিন আসবেন।

সুরপতি বলল, সুভদ্রা!

সুভদ্রা বলল, নাথ! এ আমি কোথায়? আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলুন।

সুরপতি আর দাঁড়াতে পারছে না। তার শরীরের সব শক্তি চলে যাচ্ছে। তার চোখের সামনে একটা অন্ধকার সমুদ্র দুলে উঠল। পালঙ্কের দণ্ড ধরে সে নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করল। এত আনন্দ, এত তীব্র সুখ, হঠাৎ এক শরীরে বুঝি ধারণ করা যায় না। অথচ এই সময় ঘরের মধ্যে কান্নার কলরোল কেন? এই আনন্দের সময় সবাই কেন শোক করছে?

সুভদ্রা ডাকছে তাকে। সুভদ্রা তার হাত ধরেছে, তবু সুরপতি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। তার সব স্নায়ু অবশ হয়ে গেল, সে জ্ঞান হারিয়ে ঝুপ করে পড়ে গেল ভূমিতে।

॥ ৯॥

সুভদ্রার 'নাথ' ডাক শুনে সুরপতি চোখ মেলে তাকাল। ঘনঘোর অন্ধকার। এ কী, সে কোথায়? কিছুই তো সে দেখতে পাচ্ছে না!

সে ডাকল, সুভদ্রা? আমি — আমরা এ কোথায়?

সুভদ্রা বলল, অরণ্যে।

অরণ্যে? অরণ্য কেন?

সুভদ্রা বলল, অরণ্যই তো আমাদের আশ্রয়।

সুরপতি কিছুই বুঝতে পারল না। সে অনুভব করল, সে সুভদ্রার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে। কিন্তু অরণ্যে কেন? সে তো ছিল বাসবদত্তের কক্ষে!

সে ধড়মড় করে উঠে বসল।

সুভদ্রা বলল, উঠবেন না। আপনি শুয়ে থাকুন আর একটু। রাত পোহাতে আর দেরি নেই।

সুরপতি জিজ্ঞেস করল, সুভদ্রা, এ কোন অরণ্য? এখানে আমরা এলাম কোথা থেকে?

সুভদ্রা বলল, এ তো বল্লারপুরের অরণ্য। দস্যু বুধনাথের দল আমাদের সর্বনাশ করে গেছে। আপনার মনে নেই?

সুরপতি বিস্মিত ভাবে বলল, বুধনাথ? সে আবার সর্বনাশ করবে কী করে? বুধনাথ তো মরে গেছে। আমিই তাকে নদীতে ডুবিয়ে মেরেছি!

আপনি বুধনাথকে কী করে মারবেন? সে মহাপরাক্রমশালী। আবার যে-কোনও সময়ে সে এখানে আসতে পারে। আমি সারাক্ষণ দেবতাদের পায়ে মাথা খুঁড়েছি। আপনার জ্ঞান না ফিরলে যে-কোনও সময় আবার বিপদ ঘটতে পারে। আপনার জ্ঞান ফিরেছে, কাল ভোরেই আমরা এ স্থান ত্যাগ করে চলে যাব।

কী, বুধনাথ মরেনি? সে কি সেই প্রবল নদীর স্রোত থেকেও আবার বেঁচে উঠেছে? ঠিক আছে, আসুক সে। আমি আর তাকে ভয় পাই না। তার এখন একটি মাত্র চক্ষু, তার এক চক্ষু নেই, সে আজ আমার সঙ্গে লড়াইয়ে পারবে না।

নাথ, আপনি আর একটু শুয়ে থাকুন। আপনার স্নায়ু দুর্বল।

না, আমি এখন ঠিক আছি। কিন্তু এই অরণ্যে কী করে এলাম তা তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না। সুভদ্রা, একটু আলো জ্বালতে পারো? আমি দেখতে পাচ্ছি না কিছুই।

কেন, এই তো বেশ চন্দ্রালোক রয়েছে! সব কিছুই তো দেখা যায় এর মধ্যে!

আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

আপনি আর একটু সুস্থ হয়ে নিন। আপনি ঘুমোন, আমি আপনার কপালে হাত বুলিয়ে দিই।

সুরপতি আবার ঘুমিয়ে পড়ল। সত্যিই তার স্নায়ু দুর্বল।

ভোর হতে সুরপতির যখন ঘুম ভাঙল, তখন সে আরও বিমূঢ় হয়ে গেল।

সে শুয়ে আছে এক বনের মধ্যে। পাশেই ঘুমন্ত ধ্রুবকুমার। তার বয়স অনেক কম, তিন-চার বছর মাত্র। ধ্রুবকুমারের বয়স এ-ভাবে কমে গেল কী করে?

সুভদ্রা একটা বৃক্ষে হেলান দিয়ে বসে আছে, তার ক্রোড়ে সুরপতির মাথা।

সুরপতি উঠে বসে সুভদ্রাকে জাগিয়ে তুলে জিজ্ঞেস করল, আমার কী হয়েছিল? আমরা এখানে কেন?

সুভদ্রা বলল, আপনার মস্তিষ্কে চোট লেগেছিল। আপনার দীর্ঘদিন সংজ্ঞা ছিল না।

তোমার আর একটি সন্তান কোথায় সুভদ্রা? ধ্রুবকুমারের কনিষ্ঠ ভাই?

এ আপনি কী বলছেন? আমাদের তো একটিই সন্তান!

বুধনাথ তোমার সর্বনাশ করেনি? আমি নিজের চোখে দেখেছি!

হ্যাঁ, করেছিল। তারপর আমি স্বেচ্ছায় পাণত্যাগ করব ভেবেছিলাম। শুধু আপনার আর ধ্রুবকুমারের কথা চিন্তা করে আমি নিরস্ত থেকেছি। এখন আপনার চেতনা ফিরেছে, এখন আপনিই ধ্রুবকুমারের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবেন। এবার আমি প্রাণত্যাগ করতে পারি।

সুরপতি ব্যাকুল ভাবে বলল, না না, সুভদ্রা, সে-কথা চিন্তাও কোরো না। তুমি অশেষ পুণ্যবতী। সামান্য একটা পশুর স্পর্শে তোমার ধর্মনাশ হতে পারে না কখনও। তাছাড়া তুমি চিন্তা কোরো না, বুধনাথকে আমি শাস্তি দিয়েছি।

সুভদ্রা চুপ কবে রইল।

সুরপতি আবার জিজ্ঞেস করল, আমরা কত দিন ধরে এখানে আছি?

সুভদ্রা বলল, জানি না। দিন পনেরো-ষোলো। হিসাব রক্ষা করার তো কোনও উপায় ছিল না। তবে অনুমানে মনে হয় এক পক্ষকাল তো হবেই। বুধনাথ যে-দিন আমাদের সর্বনাশ করে গেল, সে-দিন আপনার মাথায় খুব চোট লেগেছিল, তাবপব থেকে আপনার আব সংজ্ঞা ফেরেনি।

কী বলছ এ-সব কথা, আমরা দারুকেশ্বরে যাইনি?

দারুকেশ্বর কোথায?

তুমি দারুকেশ্বর চেনো না? তুমি বলভদ্র নামে কারুকে চেনো না?

নাথ, আপনি আর একটু বিশ্রাম নিন। আপনাব মস্তিষ্ক এখনও দুর্বল।

সুভদ্রা, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে আমি কি সবই স্বপ্নে দেখলাম? এ কি কখনও স্বপ্ন হয়? একটা কথা বলো তো, এখানে এক পক্ষকাল যে আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে রইলাম, তখন তোমরা কী করলে?

সুভদ্রা বলল, সেই কালরজনী প্রভাত হওয়ায় আমি প্রথমে দেখলাম আমাব চারপাশে শুধু কতকগুলি মৃতদেহ। আপনিও নেই, ধ্রুবকুমারও নেই। আমার তখন আর বাঁচাব ইচ্ছা ছিল না, তবু আমি আপনাদেব সন্ধানে বেরুলাম। শেষ পর্যন্ত এক প্রান্তরে পেলাম আপনাদের, দু'জনই অচৈতন্য। ধ্রুবকুমাবের জ্ঞান যদি ফিরল, আপনার আর ফেরে না। আমি অবলা নারী। তখন আর কী করি! কোনও ক্রমে আপনাকে বয়ে বয়ে নিয়ে এলাম এই ঘোর অরণ্যে। এখানে লোকচক্ষুর আড়ালে রইলাম।

এত দিন তোমরা খেলে কী?

বণিকদের কিছু খাদ্যদ্রব্য সেই লুণ্ঠনের স্থানে ছড়ানো ছিল। আমি তার কিছু কিছু এনেছি। আর আছে বনের ফলমূল।

সুরপতি বলল, কিছুই বুঝি না! কিছুই বিশ্বাস করি না!

সুরপতি নিজের শরীরের দিকে তাকাল। তারপর আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার ডান বাহুতে একটা চৌকো পোড়া ছাপ। সে বলল, এই দেখো, কারাগারে আমার গায়ে এই ছাপ দেওয়া হয়েছিল। যে-কারাগার থেকে আমি বুধনাথের সঙ্গে পালিয়েছিলাম!

সুভদ্রা বলল, লুণ্ঠনের দিনে আপনার হাতের ওই জায়গায় ছ্যাঁকা লেগেছিল।

না না, তা হতেই পারে না। তুমি শপথ করে বলো, আমরা এখান থেকে আর কোথাও যাইনি? তুমি দারুকেশ্বরে সরাইখানায় ছিলে না?

দারুকেশ্বর কোথায়?

চলো চলো, এক্ষুনি চলো!

কিন্তু কয়েক পা গিয়েই সুরপতি আবার মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। আবার তার জ্ঞান ফিরল একটু পরেই।

সে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। তার মন কিছুতেই শান্ত হয় না। এ কখনও স্বপ্ন হতে পারে? স্বপ্নের মধ্যে মানুষ এত কষ্ট পায়?

সে সুভদ্রাকে বলল, সুভদ্রা, সুভদ্রা! মাঝে মাঝে আমি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলছি। এক-একবার তোমাদের দেখছি, আবার সব অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।

সুভদ্রা বলল, আপনি আমার হাত ধরুন। আমি আপনাকে শক্ত করে ধরে থাকব।

বালক ধ্রুবকুমার, সে-ও এসে সুরপতির অন্য হাত ধরে বলল, বাবা, আমিও তোমার হাত ধরব!

স্ত্রী ও পুত্রকে দু'পাশে নিয়ে হাঁটতে লাগল সুরপতি। মাঝে মাঝেই তার চোখ অন্ধকার হয়ে আসে, তখন সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। একটু পরেই আবার উঠে দাঁড়ায়, আবার চলে।

খানিক দূর এসে একটা গোচক্রযান মিলল। তাতেই উঠে বসল ওরা। গাড়িটি দারুকেশ্বর যাবে। তার আগে আর তেমন কোনও বড় শহর-গঞ্জ নেই। তবু এর মধ্যে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম পড়ল, সে-গ্রাম সুরপতির চেনা। সুরপতি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল শুধু, মুখে কিছুই বলল না।

সারা দিন ধরে চলার পর সন্ধ্যার সময় তাদের একটি অরণ্য পার হতে হল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, শীঘ্রই বুঝি বৃষ্টি নামবে।

অরণ্যটি পার হবার পর আবার কিছু দূরে গিয়ে পথের পাশে একটি সাদা রঙের দ্বি-তল গৃহ চোখে পড়ল। ধক্ করে উঠল সুরপতির বুক। এই তো সেই গৃহ! প্রবল বৃষ্টির মধ্যে সুরপতি এসে আশ্রয় নিয়েছিল এখানে! হঠাৎ সেই গৃহের ভেতর থেকে ভেসে এল ব্যাঘ্রের হুঙ্কার।

সুরপতির সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। সে শকটচালককে বলল, শীঘ্র চলো, শীঘ্র এ জায়গাটা পার হয়ে যাও!

শকটচালক বলল, ভয় পাবেন না। এই কুঠিতে একটি ব্যাঘ্র আছে আমি জানি, কিন্তু সে কখনও বাইরে আসে না।

সুরপতি মুখ ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, আর কে কে আছে এই গৃহে?

শকটচালক বলল, দুই সুন্দরী মুসলমান রমণী। তাদের এক জনের গলার গান কোকিলকে হার মানায়। আর এক জনের মাথার ঠিক নেই।

সুরপতি নিজের মাথা চেপে ধরে বেদনা দমন করে সুভদ্রাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি আমাকে মিথ্যা কথা বলছ কেন? কেন বলেছ যে আমরা ওই অরণ্য ছেড়ে কোথাও যাইনি?

সুভদ্রা বলল, কোথাও যাইনি, এটাই তো সত্য। দস্যুর হাত থেকে আমাকে বাঁচাবার জন্য আপনি এসেছিলেন, এক জন আপনার মাথায় ডাণ্ডা মারে, আপনি অজ্ঞান হয়ে যান। আর জ্ঞান ফেরেনি।

অনেক রাত্রে গোযানটি এসে পৌঁছল দারুকেশ্বরে। নগরে প্রবেশের মুখে সেই প্রথম সরাইখানাটি। এক নজর মাত্র তাকিয়েই সুরপতি চিনতে পারল। সে সুভদ্রাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি এই সরাইখানাটি চেনো না?

সুভদ্রা অবাক মুখে উত্তর দিল, আমি তো এখানে কখনও আসিনি।

তবে আমি এলাম কী করে?

সুভদ্রা নীরব।

সুরপতি চিৎকার করে ধ্রুবকুমারকে জিজ্ঞেস করল, ধ্রুব, তুমি এখনে কখনও থাকোনি?

বালক ধ্রুবকুমার কিছুই বুঝতে পারল না।

সরাইখানার সামনে সেই পরিচিত মাংসের দোকানটি ঠিকই আছে। সেই পরিচিত কশাই সেখানে বসে আছে। এবং সরাইখানার মালিক যখন বেরিয়ে এল, তখন দেখা গেল সে আর কেউ নয়, সে-ই বলভদ্র!

সুরপতি তাকে জিজ্ঞেস করল, কী বন্ধু, চিনতে পারো?

বলভদ্র সামনে এগিয়ে এসে ভাল করে সুরপতির মুখ নিরীক্ষণ করে বলল, কে আপনি? বংশীলাল?

সুরপতি বলল, ফের বংশীলালের কথা? সে-সব তো মিটে গেছে। আমি সুরপতি।

বলভদ্র অপ্রসন্ন ভাবে বলল, আপনি বংশীলাল হন বা যে-ই হন, আমার এখানে স্থান নেই।

এই সময় বালক ধ্রুবকুমার বলল, বাবা, আমার খিদে পেয়েছে, আমার ঘুম পেয়েছে।

সুরপতি আবার চক্ষে অন্ধকার দেখল। আবার সে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল সরাইখানার চত্বরে।

জ্ঞান ফিরে দেখল, সরাইখানারই এক তলার একটি ছোট ঘরে সে শুয়ে আছে। পাশে সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমার। অনেক দিন পর তারা নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে।

তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। সুরপতি বাইরে এসে দাড়াল। তাব মন এক বিষণ্ণ অবসাদে ভরে আছে। এর আগে যা যা ঘটেছিল, তা সবই কি স্বপ্ন? তাহলে এই বলভদ্রের সরাইখানা সে চিনল কী করে? স্বপ্নে এমন অপরিচিত সব স্থান ও মানুষজন কি হুবহু দেখা যায়? তবে কি স্বপ্নে যে যে ঘটনা ঘটেছিল, সেগুলো এবার তার জীবনে ঘটবে?

এ-কথা মনে হতেই সুরপতির শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল।

বেলা বাড়ার পর বলভদ্র এসে তাকে বলল, আপনার দেখছি মৃগীরোগ আছে। আপনি চিকিৎসা করান, সেরে যাবে। আমাদের এখানে এক জন খুব ভাল চিকিৎসক আছেন, প্রায় ধন্বন্তরি বলা যায়।

সুরপতি শ্লেষের সঙ্গে বলল, নিশ্চয়ই তাঁর নাম রাজবৈদ্য বাসবদত্ত!

আপনি তাঁর নাম জানেন নাকি? তা জানতেই পারেন, দেশ-বিদেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে গেছে।

কিন্তু তাঁর তো বেঁচে থাকার কথা নয়।

এ কী কথা বলছেন? রাজবৈদ্য বাসবদত্ত যমকে জয় করেছেন, তিনি অমর।

সুরপতি পাগলের মতো হা-হা করে হেসে উঠল। তারপর বলল, আচ্ছা দেখাই যাক না। আমি যাব সেখানে।

সুভদ্রাকে কিছু না বলেই বেরিয়ে পড়ল সুরপতি। পথ তার চেনা। বাসবদত্তের গৃহ খুঁজে বার করা তার পক্ষে কিছুই নয়। কিন্তু কিছুটা এসেই সুরপতি থমকে দাঁড়াল। তার কোমরের কাছে তার টাকার পুঁটুলিটা রয়েছে। সুভদ্রার কাছে আর কিছুই নেই। যদি সে আর না ফেরে কোনও কারণে, তাহলে সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমার সেই রকম অসহায় অবস্থায় পড়বে!

না না, এ-রকম ভুল সে আর দ্বিতীয় বার করবে না।

সুরপতি আবার ফিরে এল। ঘরে এসে দেখল সুভদ্রা মাথায় দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টেনে বসে আছে। ধ্রুবকুমার খেলা করছে একটা ভাঙা মৃৎ-শকট নিয়ে।

সুরপতি ধ্রুবকুমারকে ঝট করে কোলে তুলে নিয়ে সুভদ্রাকে বলল, চলো আমার সঙ্গে।

কোথায়?

রাজবৈদ্যের কাছে। আমি যে মাঝে মাঝে চোখে অন্ধকার দেখি তা সারিয়ে তুলতে হবে। নইলে আমি নতুন কাজকর্ম শুরু করব কী-ভাবে।

চলুন।

তুমি সব সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে তুমি চিকিৎসক ডাকবার জন্যও কোথাও যেও না। মনে রেখো তুমি অন্য কোথাও গেলেই বিপদ হতে পারে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা এসে পৌঁছল রাজবৈদ্য বাসবদত্তের প্রাসাদের সামনে, সেখানে অসংখ্য মানুষ। ঘরের ভেতর ভরতি করে, বাইরেও বহু মানুষ অপেক্ষা করছে।

সুরপতি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, বাসবদত্ত কি বেঁচে আছেন?

অমনি কয়েক জন লোক হা-হা করে উঠল। তারা সুরপতিকে ধমক দিয়ে বলল, তুমি তো আচ্ছা বেকুব হে! মহাপ্রাণ বাসবদত্ত সম্পর্কে এমন কু-কথা উচ্চারণ করতে আছে? তিনি বেঁচে থাকবেন না কেন?

সুরপতি বুঝতে পারল, তার ভুলই হয়েছে। প্রথম দৃশ্যে বাসবদত্ত তো বেঁচেই ছিলেন।

সুরপতি বলল, তিনি কখন নিচে নামবেন?

এক জন বলল, তিনি আগে যাবেন রাজার কাছে। রাজা লোক পাঠিয়েছেন, তাঁর শরীর অসুস্থ।

সুরপতি হাসল। সে খুব নিচু গলায় বলল, জানতাম। আমি সবই জানি।

ঘরের মধ্যে বেশ গরম। বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, তাই সুরপতি স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে বাইরে এল। সামনে একটি সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রান্তর। সে-দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। অদূরে রয়েছে একটি নদী।

একটুখানি ভ্রমণের জন্য সুরপতি সবেমাত্র সেই প্রান্তরের মধ্যে এগিয়েছে, এমন সময় দেখল চার জন রাজপুরুষ তার দিকে আসছে। তারা সবাই সশস্ত্র।

তারা সুরপতির সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রশ্ন করল, কে? বংশীলাল না?

সুরপতি আঁতকে উঠল। এরপর কী হবে, তা-ও সে জানে। সে যে অতি সাংঘাতিক!

সে দু'হাতে মুখ ঢেকে উন্মাদের মতো চিৎকার করতে লাগল, না, আমি বংশীলালন নয়, সব মিথ্যে, সব মিথ্যে — সুভদ্রা, আমাকে বাঁচাও।

সুরপতির যখন আবার জ্ঞান ফিরল, তখন দেখল তার চারপাশে একটা বিরাট জনতা হয়ে গেছে। সে প্রথমেই সুভদ্রাকে খুঁজল। সুভদ্রা তার পাশেই দাঁড়িয়ে তার একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে আছে।

সে কান্না-মেশানো গলায় বলল, আমি বংশীলাল নয়, এই আমার স্ত্রী-পুত্র, এরা সাক্ষী আছে।

জনতার মধ্য থেকে কয়েক জন বলল, মহাশয়, আপনার ভয় নেই, রাজপুরুষেরা তাঁদের ভুল স্বীকার করেছেন। আপনি তো মুক্তই আছেন।

সুরপতি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সুভদ্রা চলো, আমরা এক্ষুনি এ-দেশ থেকে চলে যাই। দারুকেশ্বর বড় সাংঘাতিক স্থান, অন্তত আমাদের পক্ষে। এখানে বংশীলাল আছে। তার জন্য আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

অবিলম্বে একটি অশ্বশকট ডাকা হল। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তাতে উঠে বসে সুরপতি বলল, আমরা আবার তাম্রলিপ্তেই ফিরে যাব। সেখানে আমার পূর্বপুরুষের বাস। সে আমার নিজের স্থান। যদি মরি তো সেখানেই মরব। এ-দেশে আর নয়।

স্ত্রী ও পুত্রের হাত শক্ত করে ধরে রইল সুরপতি। এই তার ছোট্ট সংসার। এদের নিয়েই তার পৃথিবী। সে আর এদের ছাড়বে না।

শকট ছুটে চলল তাম্রলিপ্তের দিকে।।

এর বাড়ি ওর বাড়ি

মানুষের মৃত্যুর সময় নাকি শৈশব ফিরে আসে? সিরাজুল চৌধুরী ভাবলেন, তাহলে কি আমার শেষ সময় ঘনিয়ে এল? রিপোর্ট এসে গেছে এর মধ্যে?

চোখ বুজলেই তিনি একটি বাচ্চা ছেলেকে দেখতে পাচ্ছেন। দশ-এগারো বছর বয়েস, ইজের পরা, খালি গা, ডান বাহুতে একটা তাগা বাঁধা। এই বালকটি কে? তিনি নিজে? একটু একটু চেনা লাগছে ঠিকই। তাঁর ওই বয়সের কোনও ছবি নেই, তখনকার দিনে ছবি তোলার তেমন রেওয়াজ ছিল না। এখন পোলাপানদের হাতেও ক্যামেরা থাকে। সেই সময় ছবি তোলাতে হত দোকানে গিয়ে।

ছেলেটি একা সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে নেমে আসছে। বার বার ওই একই দৃশ্য। কীসের যেন ব্যস্ততা, হুড়মুড় করে নামছে। যে-কোনও মুহূর্তে আছাড় খেয়ে পড়তে পারে। এই দৃশ্যটা তিনি দেখছেন কেন? এর তাৎপর্য কী?

সিরাজুল চৌধুরী চোখ মেলে তাকালেন। নার্সিংহোমের কেবিন। সাদা ধপধপে দেয়াল। পায়ের দিকে একটা জানলা। সেই জানলা দিয়ে আকাশ দেখা যায় না। মাঝখানে একটা পুকুর আছে। তার ও-পারে পাশাপাশি দু'টি আকাশচুম্বী বাড়ি। আগে বলা হত স্কাইস্ক্র্যাপার, এখন বলা হয় মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং।

পেটজোড়া ব্যান্ডেজ, কিন্তু শরীরে বিশেষ ব্যথা-বেদনা বোধ নেই। একটু ঘুম ঘুম ভাব আছে। সকালে হরলিক্স আর বিস্কুট দিয়েছিল, খেতে কোনও অসুবিধে হয়নি। তারপর খবরের কাগজ পড়তে পড়তে আবার ঘুম এসে গেল। রাত্তিরে ঘুমের ওষুধ দিয়েছিল, দিনেরবেলাতেও তার জের থাকে।

ওই বালকটিকে দেখা মানে কি তিনি নিজের বাল্যকাল দেখছেন? এখুনি মরে যাবেন, এটা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। একটু খিদে খিদে পাচ্ছে। মৃত্যুর আগে কি মানুষের খিদে পায়? ক্ষুধা-তৃষ্ণাই তো বেঁচে থাকার লক্ষণ।

বিছানার পাশে একটা সুইচ আছে। সেটা টিপলেই নার্স আসে। হাত দিয়ে সুইচটা খুঁজতে লাগলেন, তার মধ্যেই এক জন নার্স ঘরে ঢুকল।

নার্সটির বয়স বছর পঁয়তিরিশের হবে, স্বাস্থ্য ভাল, মুখখানি কমনীয়। বেশ ফিটফাট পোশাক। নার্সদের একটু দেখতে ভাল হলে মনটা ভাল লাগে। সে-দিক থেকে ঠিক আছে, কিন্তু এই নার্সটির ব্যবহার বড় যান্ত্রিক। গলার আওয়াজটাও কর্কশ। অনেকটা কাকাতুয়া পাখির মতো।

নার্সটি বলল, হাঁ করুন, আপনার টেম্পারেচার নেব!

সিরাজুল চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, আমি কেমন আছি?

নার্সটির ভুরু কুঁচকে গেল। বলল, কেমন আছেন, তা তো আপনিই ভাল জানবেন!

সিরাজুল চৌধুরী বললেন, আমার তো মনে হয়, আমি এখন বেশ ভালই আছি।

নার্সটি বলল, তাহলে ভালই আছেন! নিন, হাঁ করুন!

সিরাজুল চৌধুরী এর পরেও জিজ্ঞেস করতে চাইছিলেন, আমি যদি ভাল থাকি, তাহলে আমি চোখ বুজে বার বার একটা বাচ্চা ছেলেকে দেখতে পাচ্ছি কেন?

কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলেন, এমন একটা প্রশ্ন করলে ওর কাছে ধমক খেতে হবে।

মুখে থার্মোমিটার ঢোকানো থাকলে কথা বলা যায় না। নার্সটি বিছানা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। সিরাজুল তার শরীরের গড়ন ও রেখা দেখছেন। লোকে তাঁকে বুড়ো মানুষ মনে করে, চুল সব পেকে গেছে, কিন্তু শরীরের রস-কষ এখনও শুকিয়ে যায়নি। এখনও স্বাস্থ্যবতী স্ত্রীলোকদের দেখলে মনটা চনমনে হয়। এত বড় একটা অপারেশন হয়েছে, এই অবস্থাতেও মেয়েটি কপালে হাত রাখলে মনে হয়, আরও খানিকক্ষণ রাখুক।

থার্মোমিটার তুলে নিয়ে নার্সটি বলল, সত্যিই তো ভাল আছেন। খুব তাড়াতাড়ি ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে।

সিরাজুল চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, আমার বাড়ির লোক আসেনি?

ন'টা তো বাজেনি। ন'টার আগে ভিজিটার্স নট অ্যালাউড।

এখন ক'টা বাজে?

আটটা কুড়ি।

আমার একটু চা খেতে ইচ্ছে করছে। চা পেতে পারি?

অবশ্যই পাবেন। আর কিছু চাই?

একটা আণ্ডা সেদ্ধ!

সেটা দিতে পারব না। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করতে হবে। কর্নফ্লেক্স খাবেন?

না। তাহলে শুধু চা। আপনার বাড়ি কোথায়?

পার্ক সার্কাসে। কেন বলুন তো?

আপনার বাবা, মানে আপনারা কি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ?

আমার বাবার বাড়ি ছিল টাঙ্গাইল, শুনেছি।

টাঙ্গাইল? কোথায় কোথায়? শহরে? না বাইরে? আমি টাঙ্গাইল খুব ভাল চিনি।

নার্সটি এ আলোচনায় কোনও উৎসাহ না দেখিয়ে বলল, আপনার প্রেসারটা একটু মাপতে হবে। তারপর দুটো ওষুধ।

সে কোনও রকম ব্যক্তিগত আলোচনায় যেতে রাজি নয়। এদের বুঝি এই রকমই ট্রেইনিং দেয়?

সিরাজুল চৌধুরীর কথা বলার ইচ্ছা হচ্ছিল। এক-এক সময় মানুষের সাহচর্য, মানুষের সঙ্গে কথা বলার জন্য একটা ব্যাকুলতা জাগে। কিন্তু নার্সটি গম্ভীর ভাবে কাজ সেরে বেরিয়ে গেল।

মিণ্টু কি আজই রিপোর্ট পাবে?

জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে রয়েছে ওই একটা রিপোর্ট।

ঢাকায় তিন জন ডাক্তারই বলেছিল, ক্যানসার। অপারেশন ছাড়া গতি নেই। কিন্তু সিরাজুল রাজি হননি। মরতে যদি হয়, তাহলে শরীরটা কাটা-ছেঁড়া না করেই মরতে চান।

এ বছর ব্যথাটা খুব বেড়েছিল, তাঁর শালা মিণ্টু জোর করে নিয়ে এল কলকাতায়। মিণ্টুর মায়ের অপারেশন করেছেন অংশুমান রায়, তাঁর ওপর মিণ্টুর খুব ভরসা। তা ভালভাবেই অপারেশন হয়ে গেছে ক'দিন আগে। এই ডাক্তার কিন্তু ক্যানসার সম্পর্কে নিশ্চিত নন। তিনি বলেছেন, এবারের বায়োপসি রিপোর্ট না দেখে কিছু বলা যাবে না।

সেই রিপোর্টের জন্য অধীর প্রতীক্ষা। দারুণ সাসপেন্স। যেন কোনও এক বিচারক ফাঁসি দেবেন কি দেবেন না, সেই রায় দেবার জন্য চিন্তা করছেন।

যদি ক্যানসার হয়, তাহলে আর কত দিন আয়ু? বড় জোর ছ'মাস। তার পরেই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে?

সেই নার্সটি আর এল না, এক জন আয়া এসে চা দিয়ে গেল।

মিণ্টুরা ঠিক ন'টার সময়েই আসবে তো? দেরি করে বেরুলে রাস্তায় খুব জ্যাম হয়।

চায়ে দু'বার চুমুক দিতে না-দিতেই সিরাজুল চৌধুরীর আবার ঘুম এসে গেল।

আবার তিনি দেখতে পেলেন সেই বালকটিকে। সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড়িয়ে নামছে।

এটা কোন বাড়ির সিঁড়ি? রট আয়রনের রেলিং। মাঝখানটা ঘুরে গেছে। সিঁড়িগুলো লাল রঙের। সিঁড়ির নিচে দেখা যাচ্ছে একটা চৌকো উঠোন, একটু খুব বড় কাতলা মাছ, জ্যান্ত, লাফাচ্ছে সেই উঠোনে। এক জন স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে পেছন ফিরে।

এটা কি স্বপ্ন, না ভুলে যাওয়া স্মৃতির এক ঝলক? ওই স্ত্রীলোকটি কে?

সিঁড়ির বাঁক ঘুরতে গিয়েই বালকটির পা পিছলে গেল, পড়তে লাগল গড়িয়ে। সিরাজুল চৌধুরীর বুকটা ধক করে উঠল। ঠিক এ-রকমই তিনি আশঙ্কা করেছিলেন। অত জোরে কেউ সিঁড়ি দিয়ে নামে? অতি দুরন্ত ছেলে! এবার মাথা ফাটবে। প্রাণে বাঁচবে তো?

যেন নিজেই যন্ত্রণা পাচ্ছেন, এইভাবে কঁকিয়ে উঠলেন তিনি।

তার পরই দৃশ্যটা মুছে গেল।

এর পরের ঘটনাটা তিনি দেখবার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু দৃশ্যটা আর ফিরে এল না। পুরোপুরি ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছু একটা স্বপ্ন দেখে হাসি ফুটে উঠল তাঁর ঠোঁটে।

ঘুম ভাঙল ফিসফিসানি শুনে। চোখ মেলে দেখলেন, মিণ্টু আর রেহানা এসে গেছে। একটা সুন্দর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, সুস্থ মানুষের গন্ধ। তাছাড়া রেহানা বোধহয় কোনও ভাল পারফিউম মেখে এসেছে। মিণ্টুর ছোট মেয়ে রেহানা। বয়েস হল বাইশ না তেইশ? হালকা, স্নিগ্ধ নীল রঙের সালোয়ার-কামিজ পরে আছে, মুখখানি যেন ফুলের মতো। দেখলে মনে হয়, অতি সরল, এখনও পৃথিবীর বিশেষ কিছুই জানে না। কিন্তু ও-মেয়ের বুদ্ধি খুব চোখা, জেনেটিক্‌স নিয়ে এমএসসি পড়ছে।

তাঁকে চোখ মেলতে দেখে মিণ্টু জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন দুলাভাই?

সিরাজুল চৌধুরী কয়েক মুহূর্তের জন্য ভুলে গেলেন যে, তিনি নার্সিংহোমে বিছানায় বন্দি হয়ে আছেন।

তাড়াতাড়ি উঠে বসার চেষ্টা করতেই পেটের ব্যান্ডেজে টান লাগল, ব্যথা বোধ হল। তবু তিনি বললেন, ভালই আছি, বেশ ক্ষুধা হচ্ছে।

রেহানা হাসিমুখে বলল, মুসাফির, ইউ লুক ফ্রেস! চলো, বেড়াতে যাই।

সিরাজুল চৌধুরী দৈনিক পত্রিকায় মুসাফির ছদ্মনামে নিয়মিত কলম লেখেন, তাই পরিবারের ছোটরা সবাই তাঁকে মুসাফির নামেই ডাকে। তাঁর শুনতেও ভাল লাগে।

তিনি মিণ্টুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, রিপোর্ট পাওয়া গেল?

মিণ্টু বলল, তিনটার সময় পাওয়া যাবে। আমার তো মনে হয়...।

এরপর কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপ। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা আসবে কি আসবে না? তিনটে বাজতে আর কত দেরি?

॥ ২ ॥

মিউজিয়ামের পাশের রাস্তাটার নাম সদর স্ট্রিট। এক সময় এই রাস্তার একটি বাড়িতে দাদা-বউদির সঙ্গে থাকতেন তরুণ রবীন্দ্রনাথ, এখানেই লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। তখন এখানকার দৃশ্য কী-রকম ছিল, এখন আর তা বোঝার উপায় নেই, এ রাস্তায় পর পর শুধু হোটেল।

বাংলাদেশ থেকে অনেকেই কলকাতায় এসে এই রাস্তার কোনও হোটেলে ওঠে। এখান থেকে নিউ মার্কেট খুব কাছে, কেনাকাটার সুবিধে হয়। শহরের যে-কোনও জায়গাতেই যাতায়াত সহজ।

নিয়মিত বাংলাদেশি খদ্দেরদের পেয়ে এখানকার দু'একটা ছোটখাটো হোটেল ফুলে-ফেঁপে বড় হয়ে গেছে। দো-তলা হয়েছে চার তলা, লিফট বসেছে।

সিরাজুল চৌধুরী সাত বছর আগে কলকাতায় এসেছিলেন, তখন এই হোটেলটার চেহারা ছিল অতি সাধারণ। এখন রীতিমতো ঝলমলে ভাবে সাজানো। নতুন ঘরগুলির বাথরুম শ্বেত পাথরের।

বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সিরাজুল চৌধুরী হাঁ করে নিজের দাঁত দেখছেন। তাঁর ওপরের পাটির একটি দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। তিনি আপন মনে হাসলেন।

তাঁর এই একটা দাঁত অনেক দিনই নেই। স্কুলে পড়ার সময় সহপাঠীরা তাঁকে ফোকলা বলে খেপাত। তখন তিনি গর্ব করে বলতেন, একদল গুণ্ডার সঙ্গে মারামারি করতে গিয়ে তাঁর ওই দাঁত ভেঙে যায়। এটা অবশ্যই মিথ্যে কথা। তবে অনবরত ওই মিথ্যে কথাটা রোমহর্ষক ভাবে বর্ণনা করতে করতে সেটা তাঁর নিজের কাছেই সত্যি হয়ে গিয়েছিল। আসল কারণটা ভুলেই গিয়েছিলেন।

সেটা মনে পড়ল এত কাল বাদে! সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামতে গিয়ে আছাড় খেয়ে গড়িয়ে পড়েছিলেন একবার। মাথা ফেটেছিল, একটা দাঁত ছিটকে গিয়েছিল। গত কাল টেলিফোনে ঢাকায় বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি তাঁর আম্মাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আম্মার ঠিক মনে আছে, তিনিও সিঁড়ি দিয়ে পড়ে যাওয়ার কথা বললেন।

ভুলে যাওয়া স্মৃতিটা এত কাল পরে ফিরে এল কেন?

মনটা বেশ খুশি খুশি লাগছে। রিপোর্টে ঠিক ফাঁসির হুকুম আসেনি, আবার পুরোপুরি ছাড়া পাওয়াও যায়নি। দণ্ডাজ্ঞা কিছু দিনের জন্য স্থগিত রইল। বায়োপসিতে ক্যানসার ধরা পড়েছে ঠিকই, কিন্তু ডাক্তার দৃঢ়ভাবে বলেছেন, অপারেশনে তিনি যতখানি বাদ দিয়েছেন, তারপর আর ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তবে ছ'মাস অন্তর অন্তর চেক আপ করাতে হবে।

নার্সিংহোম থেকে এত তাড়াতাড়ি ছাড়া পাওয়া যাবে, তা-ও আশা করা যায়নি। তিনি কানাঘুষো শুনেছিলেন, কলকাতার ডাক্তাররা বাংলাদেশিদের কাছ থেকে বেশি টাকা রোজগার করার জন্য ইচ্ছে করে বেশি দিন নার্সিংহোমে আটকে রাখে। কিন্তু মিণ্টুর সঙ্গে আগে থেকে পরিচয় থাকার জন্যই হোক বা যে-কারণেই হোক, এ ডাক্তারটি সে-রকম চশমখোর নয় দেখা যাচ্ছে। সিরাজুল চৌধুরীকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে তিনি বললেন, শুধু শুধু নার্সিংহোমে শুয়ে থেকে কী করবেন? বাড়ি চলে যান। হাঁটুন। সিগারেট ছাড়া আর যা ইচ্ছে করে খাবেন। স্বাভাবিক জীবন যাপন করুন।

ইচ্ছে করলেই তো ফিরে যাওয়া যায় না। টিকিট কাটা আছে সাত তারিখের। সে-টিকিট বদলানো যাচ্ছে না। ঢাকায় ক্রিকেট খেলা হচ্ছে বলে বিমানের টিকিটের খুব ডিমান্ড, বড়জোর একটা পাওয়া যেতে পারে, একই ফ্লাইটে তিনখানা অসম্ভব।

অগত্যা আরও দু'দিন থেকে যেতে হবে।

রেহানা এই প্রথম বার ইন্ডিয়ায় এসেছে। তার খুব আগ্রা-দিল্লি দেখার শখ। এবারে তা সম্ভব নয়। তবে, এক দিনের জন্য শান্তিনিকেতন ঘুরে আসা যেতে পারে।

সিরাজুল চৌধুরীও কখনও শান্তিনিকেতন যাননি। মিণ্টু অবশ্য দু'বার গেছে, সে কবি, নানা কবি সম্মেলনে আমন্ত্রণ পায়।

সিরাজুল চৌধুরীর দুই ছেলেই জার্মানিতে থাকে। দুই মেয়ের বিয়ে হয়েছে রাজশাহি আর সিলেটে। স্ত্রী গত হয়েছেন দু'বছর আগে। শ্যালক মিণ্টুই এখন তাঁর প্রধান ভরসা। শান্তিনিকেতনে বেড়াবার প্রস্তাবে রেহানাও খুব খুশি।

শান্তিনিকেতনের ট্রেন সকাল দশটায়। সিরাজুল চৌধুরী নিজেই দিব্যি প্ল্যাটফর্মে হেঁটে গিয়ে ট্রেনে উঠলেন। এ ট্রেনে তেমন ভিড় হয় না, লোকজনের ঠেলাঠেলি নেই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত শান্তিনিকেতন যাওয়া হল না।

ট্রেনটা বর্ধমান স্টেশানে পোঁছতেই সিরাজুল চৌধুরীর বুকের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করে উঠল। চোখে আবার ভেসে উঠল সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়া বালকের দৃশ্যটা। তিনি উতলা ভাবে বললেন, মিণ্টু, এখানে একবার নামবে?

মিণ্টু বলল, বর্ধমানে? এখানে কী দেখার আছে?

সিরাজুল চৌধুরী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলো চলো নামি, কথা আছে, নেমে বলব।

তাড়াহুড়ো করে ওঁরা নামতেই ট্রেনটা ছেড়ে গেল।

রেহানা বলল, মুসাফির, তুমি তোমার নামটা সব সময় সার্থক করতে চাও? কখন কোথায় যাবে, ঠিক নেই! বর্ধমানে নামার কথা আগে বলোনি!

সিরাজুল চৌধুরী একটু অপরাধী, একটু লাজুক মুখ করে বললেন, আমি আগে ভাবিনি। স্টেশনের নামটা দেখে মনে পড়ল। এইখানে আমাদের বাড়ি ছিল, আমি এখানে জন্মেছি। সেই জন্মস্থানটা দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল। একবার শুধু দেখে আসি, পরের ট্রেনে না হয় শান্তিনিকেতন যাব।

সে-বাড়ি বর্ধমানে শহরে নয়, খানিকটা দূরে, জায়গাটার নাম তালিত। সিরাজুল চৌধুরীর মনে আছে। বাস যায়, কিন্তু তিনি ভিড়ের বাসে উঠতে পারবেন না। মিণ্টু একটা গাড়ি ভাড়া করে ফেলল।

গাড়িতে ওঠার পর মিণ্টু বলল, সে-বাড়ি কি এখন আছে? আপনারা অ্যাবান্ডান করে চলে গিয়েছিলেন, এখানকার লোকেরা জবরদখল করে ভেঙেচুরে ফেলেছে। কত কাল আগের ব্যাপার!

সিরাজুল চৌধুরী বললেন, আমরা বাড়ি অ্যাবান্ডান করিনি। রিফিউজি হয়ে ঢাকায় যাইনি। ভাগ্য ভাল ছিল, আমরা বাড়ি এক্সচেঞ্জ করেছিলাম। নারায়ণগঞ্জে আমাদের বাড়িটা ছিল আগে এক হিন্দু ভদ্রলোকের। তাঁর সঙ্গে আমরা এই বাড়িটা বদল করতে পেরেছিলাম ঠিক সময়ে। ফার্নিচার সমেত। পার্টিশনের সময় আমরা মনে করেছিলাম, ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের মধ্যে যাতায়াতের জন্য ভিসা-পাসপোর্ট লাগবে না। আবার এ বাড়িটা দেখতে আসব। তা আর হল কই? পাকিস্তানি আমলে তো আসাই যেত না।

রেহানা বলল, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তো তুমি কয়েক বার কলকাতা এসেছ। তখন যাওনি?

সিরাজুল চৌধুরী বললেন, না রে। প্রত্যেক বার কাজেই এসেছি। একবার সোজা গেলাম আজমিড় শরিফ, এই বর্ধমানের ওপর দিয়েই তো সে-ট্রেন গেল, তখন ইচ্ছে হয়নি। ঠিক মনেও পড়েনি।

এতগুলি বছর, কত বছর হয়ে গেল?

তোর বয়সের থেকে দ্বিগুণ তো হবেই।

এখন গেলে চিনতে পারবে?

একটা আশ্চর্য ব্যাপার কি জানিস? ভুলেই গেছিলাম। কিন্তু নার্সিংহোমের বিছানায় শুয়ে শুয়ে কী করে যেন আবার সব মনে পড়ে যেতে লাগল। স্পষ্ট দেখলাম বাড়িটাকে। পিছনে একটা মস্ত বড় দিঘি। কাকচক্ষুর মতো পরিষ্কার, টলটলে পানি, মাঝখানে পদ্মফুল। লাল রঙের বাঁধানো ঘাটলা। বাগানও ছিল। অনেক গাছ, কিন্তু বেশি করে মনে পড়ল পাশাপাশি দুটো জম্বুরা গাছের কথা। এ-দেশে বলে বাতাবি লেবু। এত বেশি জম্বুরা হত, খাওয়ার লোক নাই, বড় বড় জম্বুরা, আমরা ছোটরা সেইগুলি দিয়ে ফুটবল খেলতাম।

সে-বাড়ি কি আর আছে? পঞ্চাশ বছরে কত কিছুই বদল হয়ে যায়।

গিয়ে দেখাই যাক না। বেশিক্ষণ লাগবে না।

ঠিকানা মনে আছে?

ঠিকানা? তখন তো ঠিকানা ছিল না। বাড়ির কর্তার নাম শুনলে লোকে বলে দিত। নারায়ণগঞ্জের যে-হিন্দু ভদ্রলোকের সঙ্গে বাড়িটা এক্সচেঞ্জ করেছিলাম, তাঁর নামটাও মনে পড়ে গেছে। বলরাম চৌধুরী। তাঁর ছোট ভাইয়ের নাম ছিল শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী। হিন্দুদের মধ্যেও চৌধুরী হয়, জানিস তো?

মিণ্টু বলল, এটা সবাই জানে। প্রমথ চৌধুরী নামে এক জন বড় রাইটার ছিলেন না? রবীন্দ্রনাথের ভাইয়ের মেয়ে ইন্দিরাকে যিনি বিয়ে করেছিলেন, 'সবুজ পত্র' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

সিরাজুল বললেন, তোরা যে কতখানি জানিস, আর কতখানি জানিস না, তা আমি ঠিক বুঝি না।

রেহানা বলল, আমাদের মধ্যেও ঠাকুর পদবি হয়। আমি কাগজে দেখি নাম মাঝে মাঝে। তাহের ঠাকুর আছে না এক জন?

সিরাজুল বললেন, ঠিক বলেছিস। ঠাকুররা পিরিলিব বামুন। ওদেব ফ্যামিলির একটা ব্রাঞ্চ মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তারাই বোধহয় এখনও নামেব সঙ্গে ঠাকুর জুড়ে বেখেছে।

রেহানা জিজ্ঞেস করল, বাড়িটা কি শহরেব মধ্যেই ছিল?

সিরাজুল বললেন, না, বেশ ফাঁকা ফাঁকা জায়গা। তালিত-এর বাজারে গেলেই আমার চিনতে অসুবিধে হবে না। বাজারের পুব দিকে একটা সোজা রাস্তা গেছে। প্রায় আধ মাইল পর আর বাড়িঘর বিশেষ নাই, ফাঁকা ফাঁকা, ধানখেত, একটা বড় বটগাছের কাছে রাস্তাটা দুই ভাগ হয়ে গেছে, তাব নিকটেই আমাদের বাড়ি। একেবারে ছবির মতো স্পষ্ট দেখতে পাই।

তালিত বাজারের কাছে পৌঁছে কিন্তু দিশা পাওয়া গেল না। সাইকেল রিকশা, ঠেলা গাড়ি, ট্রাকেব গ্যাঞ্জাম। তিন দিকের তিনটে রাস্তা, তার মধ্যে কোনটা পুব দিকে তা বোঝাই শক্ত। কয়েক জনকে জিজ্ঞেস করা হল, বলরাম চৌধুরীর বাড়িটা কোথায়? কেউ কিছু বলতে পারে না।

তারপর জানা গেল, ওরা গাড়িতে যে-পথে এসেছে, সেটাই পুব দিকের রাস্তা। অর্থাৎ সিরাজুল চৌধুরী তাঁর জন্মস্থানের পাশ দিয়েই এসেছেন। তিনি চিনতে পারেননি।

রেহানা ফিক ফিক করে হাসতে লাগল।

খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে সিরাজুল বললেন, ধানখেত তো দেখলাম না। আর সেই বটগাছটাও .।

গাড়ি ঘুরিয়ে নেওয়া হল।

রাস্তার দু'ধারে একটুও ফাঁকা নেই, পর পর বাড়ি। আধ মাইল কেন, এক মাইলেব মধ্যেও কোনও বড় বটগাছ নেই।

রেহানা বলল, মুসাফির, তোমার সেই বটগাছ কবে ঝড়ে পড়ে গেছে!

মিণ্টু বলল, তাহলে বর্ধমানেই ফিবে যাওয়া যাক?

সিরাজুল আফশোসের সুরে বললেন, শুধু শুধু ট্রেন থেকে নামলাম! গেল কোথায় বাড়িটা? অদৃশ্য হয়ে যেতে তো পারে না? বাগান, দিঘিটা তো থাকবে?

আবার লোকজনদের জিজ্ঞেস করায় কয়েক জন একটা চৌধুরীবাড়ি দেখিয়ে দিল। সেটা এক তলা বাড়ি, সঙ্গে চুন-সুরকির দোকান। তারা চৌধুরী বটে, কিন্তু বলরাম-শ্রীকৃষ্ণের নাম শোনেনি।

তারা আর একটা চৌধুরীবাড়িতে পাঠিয়ে দিল।

স্মৃতি খানিকটা প্রতারণা করেছে সিরাজুল চৌধুরীর সঙ্গে।

বড় রাস্তায় কোনও বটগাছ নেই। একটা সরু রাস্তা দিয়ে এঁকেবেঁকে খানিকটা যাবার পর দেখা গেল ধানের খেত, দূরে মাঠের মধ্যে একটা বটগাছ। এই সরু রাস্তার শেষ বাড়িটা দেখে সিরাজুল প্রায় লাফিয়ে উঠে বললেন, এই তো! এটাই সেই বাড়ি! পেয়েছি!

সিরাজুল চৌধুরীর মনের ছবিতে তাঁদের বসতবাড়িটা ছিল তিন তলা, কিন্তু এ বাড়িটা দো-তলা। বড় দিঘি নেই, একটা মাঝারি আকারের পুকুর আছে বটে, তার অর্ধেকটা পানায় ভর্তি। বাগান কোথায়? কোথায় জম্বুরা গাছ?

কিন্তু দো-তলার একটা বারান্দা আর সদর দরজাটা দেখে সিরাজুল চৌধুরী দৃঢ়ভাবে বললেন, এইটাই সেই বাড়ি। আই অ্যাম ডেফিনিট!

বাড়িটার অবস্থা প্রায় জরাজীর্ণ। এক দিকের দেয়ালের গা দিয়ে অশত্থ গাছের চারা উঠেছে। রঙ করা হয়নি অনেক দিন।

সদর দরজা বন্ধ।

সবাই নামল গাড়ি থেকে। বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা, সূর্য মধ্যগগনে, এর মধ্যেই গরম পড়েছে খুব।

দরজার পাশের দেয়ালে একটা শ্বেত পাথরের ট্যাবলেটে লেখা 'চৌধুরী ধাম'। তা দেখে শিশুর মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে সিরাজুল বললেন, দেখেছিস, নামটা প্রায় একই আছে। আমাদের সময় লেখা ছিল 'চৌধুরী লজ'।

রেহানা বলল, যাক, পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত! দেখাও হল। এখন অন্যের বাড়ি, ভিতরে কি আর যেতে দেবে?

সিরাজুল বললেন, একবার শুধু ভিতরের সিঁড়িটা দেখব।

কলিং বেল নেই, কড়া নাড়তে হল।

একটু পরে দরজা খুলে দিল এক জন মাঝবয়সী স্ত্রীলোক। ছিরিছাঁদহীন ঢ্যাঙা চেহারা, চুলের খোঁপাটা মাথার মাঝখানে, শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে বাঁধা।

তিন জন আগন্তুককে চোখ বুলিয়ে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বেশ খ্যারখেরে গলায় সে জিজ্ঞেস করল, কাকে চাই?

যা বলার তা সিরাজুল চৌধুরীকেই বলতে হবে, মিণ্টু আর রেহানা তাঁর পেছনে।

সিরাজুল বললেন, এটা কি বলরাম চৌধুরীর বাড়ি?

স্ত্রীলোকটি বলল, না। এটা অবনী চৌধুরীর বাড়ি।

সিরাজুল বুঝলেন, বলরাম চৌধুরী ছিলেন তাঁর বাবার বয়সী। এত দিন তাঁর বেঁচে থাকার কথা নয়। কিন্তু এরপর কী বলা উচিত, তা তিনি আগে ভাবেননি।

একটু আমতা আমতা করে বললেন, আমরা এই বাড়ির ভেতরটা একবার দেখতে পারি?

স্ত্রীলোকটি মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, কেন? এ বাড়ি বিক্রি আছে, তা আপনাদের কে বলেছে? মোটেই বিক্রি নেই।

সিরাজুল বললেন, না না, আমরা বাড়ি কিনতে আসিনি। শুধু ভেতরটা একবার দেখেই চলে যাব!

স্ত্রীলোকটি বলল, যে-সে উটকো লোক এসে ভেতরে ঢুকতে চাইলেই দেব? মামাবাড়ির আবদার!

তারপর সে মুখ ফিরিয়ে বাড়ির ভেতরের কারুকে উদ্দেশ করে বলল, অ বউদি! কারা সব এসেছে, ভেতরে ঢুকতে চাইছে। সঙ্গে আবার এক জন পুলিশ এনেছে!

সিরাজুল বিস্মিত ভাবে বললেন, কই, আমরা তো পুলিশ আনিনি!

স্ত্রীলোকটি মিণ্টুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওই লোকটাই তো পুলিশ। আর এক দিন এসেছিল!

মিণ্টু যেন আকাশ থেকে পড়ে বলল, আমি পুলিশ? আমাদের সাত জন্মে কেউ পুলিশে কাজ করেনি। আমি জীবনেও এখানে আগে আসিনি।

ভেতর থেকে একটা নারীকণ্ঠ শোনা গেল, এই নারানী, অত কথা বলার দরকার কী? দরজা বন্ধ করে দে!

স্ত্রীলোকটি ঝপাস করে দরজা বন্ধ করে দিল ওদের মুখের ওপর।

অপমানে মুখখানা কালো হয়ে গেল রেহানার।

সে ফিরে যেতে লাগল গাড়ির দিকে।

সিরাজুল অতটা অপমান গায়ে মাখলেন না। তিনি বললেন, তাহলে বাইরে থেকেই একটু দেখে যাই! ছোটবেলায় এই পুকুরটাকেই মনে হত কত বড়। অনেক মাছ ছিল! অ্যাত্ত বড় বড় কাতল্ মাছ!

রেহানা ঝাঁঝালো গলায় বলল, আর দেখতে হবে না। এবার চলো ফিরে যাই। এরা অতি অভদ্র।

এই সময় সাইকেলে চেপে এক জন লোক এল সেখানে। বছর তিরিশেকের এক যুবক। খানিকটা কৌতূহল, খানিকটা সন্দেহমাখা চোখে সে দেখল এঁদের। তারপর জিজ্ঞেস করল, আপনারা কোথা থেকে আসছেন? কাকে চাইছেন?

মিণ্টু গম্ভীর ভাবে বলল, আমরা কারুকে চাই না। দুলাভাই, চলেন, চলেন।

ওরা দু'জনে এগোল গাড়ির দিকে।

যুবকটির ভুরু কুঁচকে গেল। সে সাইকেল থেকে নেমে কাছে এসে বলল, কী ব্যাপার? আপনারা আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারছিলেন। এখন কিছু না বলে চলে যাচ্ছেন? আপনাদের কে পাঠিয়েছে?

মিণ্টু কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে সিরাজুল বললেন, ব্যাপার কিছু নয়। কেউ আমাদের পাঠায়নি। ইট সো হ্যাপেন্ড, আমি এই বাড়িতে জন্মেছিলাম। তাই শুধু একবার দেখতে এসেছি। আপনাদের আপত্তি থাকলে ভিতরেও যেতে চাই না। বাইরে থেকে দেখায় কি দোষ আছে?

আপনি এখানে জন্মেছিলেন মানে?

আপনার বয়স কম, আপনার জানবার কথা নয়। পার্টিশনের আগে, এ জায়গাটা ছিল আমার বাবা-দাদাদের প্রপার্টি। নারায়ণগঞ্জের বলরাম চৌধুরীর বাড়ির সঙ্গে এটা এক্সচেঞ্জ করা হয়েছিল। এর ওপর আমাদের কোনও দাবি নেই। শুধু একটু চোখের দেখা। নস্টালজিয়া বলতে পারেন।

আপনারা বাংলাদেশ থেকে আসছেন?

জি। আমার নাম সিরাজুল চৌধুরী। এ আমার শ্যালক, আবদুল কাদের, এক জন নামকরা কবি, আপনি হয়তো নাম শুনে থাকতে পারেন। আর ওই যে রেহানা, আমার শ্যালকের কন্যা।

যুবকটির ভুরু ও কপালের ভাঁজ মিলিয়ে গেল। হাসিমুখে বলল, ও এই ব্যাপার? আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন।

মিণ্টু বলল, না, আর ভেতরে যাবার দরকার নেই। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

যুবকটি বলল, একটু বসবেন চলুন। আসল ব্যাপার কি হয়েছে জানেন, আমার খুড়তুতো ভাইদের সঙ্গে এই বাড়িটা নিয়ে মামলা চলছে। মামলা এখনও শেষ হয়নি, ওরা জোর করে বাড়িতে ঢুকে পজেশান নিতে চাইছে। একবার ঢুকে পড়লে তাড়ানো মুশকিল। তাই সাবধানে থাকতে হয়। আসুন!

রেহানা বলল, আমি গাড়িতে বসে থাকছি। তোমরা দেখে এসো।

যুবকটি হেসে বলল, তা বললে কি হয়? এই গরমে গাড়িতে বসে থাকবেন? এক গেলাস জল খেয়ে যান অন্তত।

॥ ৩॥

পৌরাণিক কাহিনিতে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুই ভাইয়ের খুব গলাগলি ভাব ছিল। কৃষ্ণ মহাশক্তিমান হলেও মান্যগণ্য করতেন তাঁর বড় ভাই বলরামকে। বলরাম বেশ মাতাল ছিলেন, কৃষ্ণ ও অর্জুনের সঙ্গে বসে মদ্যপান করতেন বটে, তবে কখনও বেচাল হতেন না, বলরাম কখনও বাড়াবাড়ি করে ফেললে কৃষ্ণই সামলাতেন।

নারায়ণগঞ্জের কাঠের ব্যবসায়ী বলরাম চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর ছোট ভাই কৃষ্ণ চৌধুরীর কিন্তু তেমন সদ্‌ভাব ছিল না। বলরাম ছিলেন উদ্যমী, কর্মী পুরুষ, কৃষ্ণ সেই তুলনায় কোনও কম্মের নয়। বলরাম নিজের চেষ্টায় কাঠের ব্যবসা দাঁড় করিয়েছিলেন, আর কৃষ্ণ তাস-পাশা খেলে সময় কাটাত, গাঁজার নেশাও করত। টাকার চিন্তা ছিল না, সে জানত, দাদাই তাকে সারা জীবন খাওয়াবে।

বলরাম চৌধুরী ছিলেন নিঃসন্তান, কৃষ্ণর চার ছেলে মেয়ে। কৃষ্ণ ধরেই রেখেছিল, দাদার বিষয়-সম্পত্তি তার ছেলে মেয়েরাই পাবে। সেটাই স্বাভাবিক ছিল।

হঠাৎ একটা অঘটন ঘটে গেল। প্রৌঢ় বয়সে বলরাম চৌধুরীর স্ত্রী একটি পুত্রসন্তান জন্ম দিলেন। জন্মের পর সেই সন্তানের জীবন-সংকট দেখা গিয়েছিল। বেঁচে গেল কোনও ক্রমে। তাতেই বদলে গেল সব কিছু।

বেশি বয়সের ছেলে অতি আদরের হয়। বাবা-মায়ের সে একেবারে নয়নের মণি। যথারীতি বলরাম চৌধুরী নিজের সন্তানকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করলেন। সেই সন্তানের নাম অবনী।

বলরাম চৌধুরী তাঁর ছোট ভাই কৃষ্ণ এবং তার ছেলে-মেয়েদেরও একেবারে বঞ্চিত করেননি। দেশবিভাগের পর এক মুসলমান পরিবারের সঙ্গে বাড়ি বদল করে বর্ধমানে চলে আসেন। সঙ্গে যথেষ্ট টাকাকড়িও নিয়ে আসতে পেরেছিলেন, নৈহাটিতে কৃষ্ণর জন্য একটি ছোট বাড়ি কিনে দিলেন, স্টেশনের কাছে একটা জামাকাপড়ের দোকানও সাজিয়ে দিলেন, তার আয়ে কৃষ্ণর সংসার বেশ ভালভাবেই চলে যাবার কথা।

বলরাম এবং কৃষ্ণ দু'জনেই মারা গেছেন বছর পনেরো আগে।

বলরামের ছেলের অবনী লেখাপড়ায় বেশ ভাল হয়েছে। এখন সে সায়েন্স কলেজে ফিজিক্স পড়ায়, তাছাড়া তার ইলেকট্রনিক্সের ব্যবসা আছে। কলকাতাতেও ফ্ল্যাট কিনেছে, সেখানেই বেশির ভাগ সময় থাকে।

সেই তুলনায় কৃষ্ণর ছেলেরা অপদার্থ। ছোট ছেলেটি তো হিংস্র প্রকৃতির, জুট মিল এলাকায় গুণ্ডামি করে বেড়ায়, আপাতত সে জেলে। বড় ছেলেটি অসুস্থ। মেজোটিই ধুরন্ধর। কাপড়ের দোকানটা ঠিক মতো চালাতে পারে না, সে-ই মামলা করেছে অবনীর বিরুদ্ধে। তার দাবি, বর্ধমানের এত বড় বাড়িটা, পুকুর ও অনেকখানি জমি, এটা তাদের পারিবারিক যৌথ সম্পত্তি, সুতরাং এই সব কিছুতে তাদেরও ভাগ আছে। এ মামলায় তাদের জয়ের সম্ভাবনা কম, কারণ বলরাম চৌধুরীর উইলে সব কিছু তাঁর ছেলের নামে স্পষ্ট লেখা আছে। মামলা নিষ্পত্তির আগেই কৃষ্ণর ছেলেরা জোর করে এ বাড়িতে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করেছে দু'বার।

অবনীর বৃদ্ধা মা কলকাতায় যাননি, তিনি এ বাড়িতেই থাকেন। আর থাকে এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়া, তার যেমন উগ্র মেজাজ, সেই রকম চোপা। সেই নারায়ণীই সিরাজুল চৌধুরীর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

অবনীর সঙ্গে সেই দলটিকে ফিরে আসতে দেখে নারায়ণী তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। বিশেষ করে মিণ্টুর দিকে। তার বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে, এই লোকটি ছদ্মবেশী পুলিশ।

ভেতরের উঠোনে এসে অবনী বলল, সিরাজ সাহেব, চিনতে পারছেন? ভেতরটা বিশেষ বদলায়নি।

সিরাজুল তাকালেন সিঁড়িটার দিকে।

নার্সিংহোমে শুয়ে চোখ বুজে তিনি এই সিঁড়িটাই দেখছিলেন বার বার।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো তিনি সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন খানিকটা। আবার নেমে এলেন।

মিণ্টু আর রেহানা খানিকটা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের তো এই বাড়ি নিয়ে কোনও স্মৃতি নেই। তারা উদ্বেল হবে কেন? সিরাজুল সাহেবের ব্যবহার তাদের কাছে খানিকটা বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে।

সিরাজুল নেমে এসে, মুখ ফাঁক করে সোনার দাঁতটা দেখিয়ে বললেন, এই যে দেখছ আমার একটা দাঁত ভাঙা? এই সিঁড়ি দিয়ে পড়ে গিয়ে ভেঙেছিল।

রেহানা এবার হেসে ফেলে বলল, শুধু দাঁত ভাঙার কথাটাই তোমার আগে মনে পড়ল?

সিরাজুল বললেন, সত্যি রে, কেন জানি, এটাই বার বার মনে আসছিল। পুকুর থেকে একটা বড় কাতলা মাছ ধরে এনে এই উঠোনে রেখেছিল, মাছটা লাফাচ্ছিল। সেটা দেখার জন্যই তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে —।

অবনী বলল, চলুন, ওপরে চলুন!

সিরাজুল বললেন, না না। আর উপরে যাবার দরকার নেই।

অবনী বলল, কেন, ওপরটা ঘুরে দেখলে আপনার হয়তো আরও অনেক কিছু মনে পড়ে যেতে পারে।

রেহানা বলল, আমাদের এবার যেতে হবে।

অবনী বলল, এত তাড়া কীসের?

রেহানা বলল, আমরা শান্তিনিকেতনে যাব।

সিরাজুলের দিকে ফিরে বলল, তোমার জন্মস্থানের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান আমি ভাল করে দেখতে চাই। এবার চলো!

সিরাজুল কিছু বলার আগেই অবনী বলল, শান্তিনিকেতন তো রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান নয়। সে যাই হোক, শান্তিনিকেতনও দেখবার মতো। দেখবেন, দেখবেন। শান্তিনিকেতনের ট্রেন তো সেই বিকেলে।

সিরাজুল বললেন, রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। সেটাও দেখাব।

অবনী বলল, ওঃ আপনাদের জল দেওয়া হয়নি। ও পিসি, বাড়িতে মিষ্টি-টিষ্টি কিছু আছে? নেই বোধহয়। আমি তো কালই এসেছি। একটু বসবেন চলুন।

সিরাজুল হাত তুলে বললেন, না না, মিষ্টির দরকার নেই। আমার ডায়াবেটিস আছে, তাছাড়া রিসেন্টলি অপারেশন হয়েছে। মিষ্টি খাওয়া একেবারে নিষেধ। আগে কলকাতার মিষ্টি ভালবাসতাম। আর ওই যে আমার শালার মেয়েকে দেখছেন, আজকালকার মেয়ে, মিষ্টি ছোঁয় না। ফিগার ঠিক রাখতে হবে তো, ডায়েটিং করে।

অবনী এক পলক রেহানার দিকে তাকিয়ে তার তনুশ্রীর তারিফ করল।

মিণ্টু বলল, আমার এক গেলাস পানি, ইয়ে, জল পেলেই চলবে।

অবনী ওদের প্রায় জোর করেই নিয়ে এল বসবার ঘরে।

পুরনো আমলের সোফা ও চেয়ার-টেবিল দিয়ে সাজানো, কিন্তু ধূলিমলিন। অনেক দিন ব্যবহার করা হয় না, বোঝাই যায়।

অবনী জিজ্ঞেস করল, এই ঘরটা চিনতে পারেন?

সিরাজুল দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, না।

অবনী বলল, ঘরটা আগে ছোট ছিল। বাবা মাঝখানের দেয়ালটা ভেঙে দুটো ঘর মিলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বোধহয় ভেবেছিলেন, বাড়িতে অনেক লোকজন আসবে, বড় বৈঠকখানা দরকার। কোথায় লোকজন? আমাদের তো এখন এখানে থাকাই হয় না। কলকাতায় আমার অনেক কাজ।

একটা ঝাড়ন দিয়ে সে ধুলো সাফ করতে লাগল।

একটি বাচ্চা ছেলে কাচের জাগে জল আর কয়েকটা গেলাস নিয়ে এল একটু পরে।

অবনী বলল, ইস, শুধু জল, এমন লজ্জাব ব্যাপার!

সিবাজুল বললেন, আগেকার দিনে দেখেছি, হিন্দুবাড়িতে কারুকে জল দেবার সময়, অন্য মিষ্টি না থাকলে কয়েকখানা বাতাসা দিত। এখন বোধকরি বাড়িতে বাতাসা রাখা হয় না।

অবনী বলল, বাতাসা? প্রায় উঠেই গেছে। অনেক দিন দেখি না।

রেহানার মুখে-চোখে অধৈর্য ফুটে উঠেছে। গেলাস নামিয়ে রেখে সে বলল, আমরা এখন যাব না?

সিবাজুল বললেন, হ্যাঁ যাব। চলো। ধন্যবাদ অবনীবাবু। আপনিও একবার বাংলাদেশ আসুন। নারায়ণগঞ্জে আপনাদের বাড়িটা প্রায় একই রকম আছে। দেখে আসবেন।

অবনী হেসে বলল, সে-বাড়ি তো আমি জীবনে দেখিইনি। আমার জন্ম দেশভাগের অনেক পরে। আমার তো কোনও নস্টালজিয়া নেই!

সিরাজুল বললেন, তবু বাপ-দাদার ভিটে তো। উঠানে একটা তুলসিমঞ্চ ছিল, সেটাও ভাঙা হয় নাই। তুলসিগাছ আর নাই অবশ্য।

অবনী জিজ্ঞেস করল, একটা ব্যাপারে আমার কৌতূহল হচ্ছে। আপনারা এই বাড়ি ছেড়ে ইস্ট পাকিস্তানে চলে গেলেন কেন? এখানে কি দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়েছিল?

সিরাজুল বললেন, আমি তো তখন বালক ছিলাম, সব মনে নাই। আমার বাবার কাছে অনেক গল্প শুনেছি। না, দাঙ্গা বোধহয় এ-দিকে হয়নি তেমন। কারণটা ছিল অন্য। আমার বাবা ছিলেন সরকারি উকিল। সে-সময়, ইন্ডিয়া-পাকিস্তান ভাগ হবার পর, সরকারি কর্মচারীদের অপশান দেওয়া হয়, যার ইচ্ছা ইন্ডিয়ায় থাকবে, যার ইচ্ছা পাকিস্তানে চলে যাবে। বাবা তবু দোনামোনা করছিলেন। সাধারণ অবস্থা থেকে উঁচুতে উঠেছিলেন, এ বাড়িটা অনেক শখ করে বানিয়েছিলেন। ছেড়ে যাবার ইচ্ছা ছিল না।

এই অঞ্চলে তো অনেক মুসলমান রয়ে গেছে। দু'জন মুসলমান উকিলও আছেন। আমাদের মামলা দেখছেন মিস্টার আমিনুল হক।

আমাদের যাবার কারণ অন্য। বর্ধমানে তখন খুব বড় নেতা ছিলেন আবুল হাসেম। এ-কালের ছেলে মেয়েরা বোধহয় তাঁর নাম জানে না, তবে সে-কালে তাঁর খুব প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। এখনকার নামজাদা লেখক বদরুদ্দীন ওমনর ওনারই ছেলে। আবুল হাসেম শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে যান। ওই হাসেম সাহেব ছিলেন আমার বাবার মুরুব্বি। বাবা তাঁর পরামর্শ নিতে গেলেন। হাসেম সাহেব বললেন, আমিও যাচ্ছি, তুমিও চলো ও-পারে। নতুন দেশ গড়া হচ্ছে, তোমাদের মতো শিক্ষিত লোকদের খুব দরকার হবে। তাছাড়া নারায়ণগঞ্জের বাড়িটা সুবিধামতো পাওয়া গেল। বাবা ওখানে গিয়ে বাড়ির পাশে পুকুর কাটালেন।

আমার বাবাকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনিও দাঙ্গার ভয়ে পালিয়ে আসেননি।। নারায়ণগঞ্জে ওঁর কাঠের ব্যবসায়ে নাকি এক জন রাইভাল ছিল। সে খুব শত্রুতা করত। দেশভাগের ডামাডোলে সে যদি কোনও ক্ষতি করে, এই আশঙ্কা ছিল বাবার। তাঁরও ইচ্ছে ছিল না আসার। তবু তো আমরা লাকি, সম্পত্তি এক্সচেঞ্জ করতে পেরেছি। কত লোক তা-ও পারেনি।

ও-দিকে আপনাদের আর কেউ নাই?

টাঙ্গাইলে আমার পিসেমশাইরা রয়ে গেছেন শুনেছি। অনেক দিন কোনও যোগাযোগ নেই। আমার মায়ের অনেক বয়স হয়েছে, সব কথা মনে রাখতে পারেন না।

আমাদেরও কিছু কিছু আত্মীয় আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে। বারাসাতে থাকেন আমার মামাতো ভাইরা।

এই সময় নারায়ণী দরজার আড়াল থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকল অবনীকে।

অবনী উঠে গিয়ে ফিস ফিস করে কথা বলে ফিবে এল। তারপর হাত জোড় করে বলল, মা বলে পাঠিয়েছেন, অনেক বেলা হয়ে গেছে, আপনাদের দু'টি ডালভাত খেয়ে যেতে হবে।

রেহানা আর মিণ্টু এক সঙ্গে বলে উঠলো, না না, আমরা এখন খাব না।

অবনী বলল, গৃহস্থবাড়ি থেকে কিছু না খেয়ে গেলে অকল্যাণ হয়। এই ভরদুপুরে... অবশ্য ভাতের বদলে লুচিও খেতে পারেন।

মিণ্টু এবার মিথ্যে করে বলল, আমাদের তাড়াতাড়ি বর্ধমান ফিরতে হবে, ওখানকার একটা হোটেলে খাওয়ার কথা বলে এসেছি।

হাত নেড়ে হোটেলের কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিয়ে অবনী বলল, হোটেলে তো জীবনে আরও কতবারই খাবেন, আমাদের বাড়ি থেকে কিছু অন্তত... সত্যি কথা বলছি, আপনাদের আপ্যায়ন করার মতো তেমন কিছুই নেই, আমার লজ্জাই করছে, তবু যদি দয়া করে... দেখুন খুব মেঘ করেছে হঠাৎ, বৃষ্টি নামবে, খিচুড়ি করে দেওয়া যেতে পারে, তাড়াতাড়ি হবে।

রেহানা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ধন্যবাদ। শুধু খাওয়ার জন্য আর দেরি করার কোনও মানে হয় না। এবার আমাদের যেতেই হবে।

অবনী সিরাজুলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, থাকবেন না?

সিরাজুল এতক্ষণ কিছু বলেননি। এবার তাঁর সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কী রে, কী করবি?

রেহানা অস্থির ভাবে বলল, মুসাফির, ওঠো।

সিরাজুল গা মুচড়ে বললেন, এঁরা এত করে বলছেন। আমার লুচি খাওয়ার নিষেধ আছে, তবে খিচুড়ি আমি ভালবাসি!

এরপর আর অন্য দু'জনেব আপত্তি টেঁকে না।

সোফায় হেলান দিয়ে বসে সিরাজুল বললেন, একটা খুব আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, এত দিন আমার ধারণা ছিল, এই বাড়ি সম্পর্কে আমার বিশেষ কিছুই মনে নাই। এখানে এসে টুকরো টুকরো অনেক কিছুই মনে পড়ে যাচ্ছে। সাব-কনশাস মাইন্ডে এ-সব লুকিয়ে ছিল! আতাউর নামে আমার এক খেলার সাথি ছিল এখানে, ডাক নাম ছিল আতা। আমাদের চলে যাওয়ার দিনে সে খুব কেঁদেছিল। স্পষ্ট মনে পড়ে তার মুখখানা। তাদের পরিবারের কেউ পাকিস্তানে যায় নাই, কী জানি সেই আতাউর এখন এখানে থাকে কি না!

অবনী বলল, এখানে বেশ কিছু খানদানি মুসলমানের বাড়ি আছে, সেখানে গিয়ে খোঁজ করা যেতে পারে।

সিরাজুল বললেন, আতাউররা খানদানি ছিল না, ওর বাবা ছিল আমাদেরই কর্মচারী, ওর একটা ছোট বোন ছিল, তার নাম পারভিন, তার মুখের হাসিটা এত মিষ্টি, ওই যে বলে না, কথা বললে মুক্তা ঝরে পড়ে।

মিণ্টু বলল, তার সাথে আপনার রোমান্স ছিল নাকি?

সিরাজুল বললেন, ছিল তো বটেই। নয় বছরের ছেলের সাথে সাত বছরের মেয়ের যতখানি রোমান্স হতে পারে! আর একটা কথাও মনে পড়ছে। আমাদের এ বাড়ির ছাদ থেকে ট্রেনলাইন দেখা যায়, তার পাশে পাশে কাশফুল ফুটে থাকত। ট্রেন আসাব শব্দ শুনলেই আমি ছাদে উঠে ট্রেন্ দেখতাম। তখন অবশ্য আমরা বলতাম রেলগাড়ি। পরে সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালি ফিল্মটা যখন দেখলাম, অপু আর দুর্গা ছুটতে ছুটতে কাশফুলের মধ্য দিয়ে ট্রেন দেখতে যাচ্ছে, তখন নিজের সঙ্গে খুব মিল খুঁজে পেয়েছিলাম।

রেহানা বলল, তুমি বললে, 'আমাদের বাড়ি'! পঞ্চাশ বছর আগে ছেড়ে চলে গেছ!

সিরাজুল বললেন, সেটাও পিকিউলিয়ার ফিলিং হচ্ছে। এত বছর নারায়ণগঞ্জের ওই বাড়িতে আছি, কিন্তু যেহেতু বাপ-দাদারা ওই বাড়ি তৈরি করেননি, তাই ওটা ঠিক যেন নিজের বাড়ি মনে হয় না। এটাই যেন আসল নিজের বাড়ি। বার বার ফিরে যাচ্ছি শৈশবে। বৃদ্ধ বয়সে বোধকরি এ-রকমই হয়।

অবনী বলল, আপনি এ বাড়িটা কিনে নিন না। আবার আপনার নিজের বাড়ি হবে।

কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে সিরাজুল তাকিয়ে রইলেন।

অবনী বলল, মামলার রায় বেরুবে সামনে সপ্তাহে। আমরা জিতবই। তারপর এ বাড়ি নিয়ে কী হবে, সেটাই সমস্যা। আর ঠিক দেড় মাস পরেই আমি চলে যাচ্ছি আমেরিকা। তখন কে দেখবে? মাকে কলকাতায় নিয়ে রাখব। আমরা এখানকার পাট তুলে দিতে চাই! আপনারা বাড়িটা নিয়ে নিন। এখানে এসে মাঝে মাঝে থাকবেন।

সিরাজুল এক গাল হেসে বললেন, তা হয় নাকি? আমরা অন্য দেশের নাগরিক, অন্য দেশে প্রপার্টি রাখতে পারি না।

অবনী বলল, বাংলদেশের লোক আমেরিকা কিংবা ইংল্যান্ডে বাড়ি কিনতে পারে না?

সিরাজুল বললেন, তা পারে। কিন্তু এখানে সম্ভব নয়। আপনাদেরও একই ব্যাপার। ইন্ডিয়ানরাও ইওরোপ-আমেরিকায় বাড়ি কিনতে পাবে, কিন্তু বাংলাদেশে পাববে না। এই রকমই তো ব্যাপার।

অবনী বলল, তাই বুঝি! জানতাম না। আমাকে আপনি বলছেন কেন, তুমি বলুন। চলুন, একবাব ছাদে যাবেন? রেললাইন এখনও দেখা যায়।

সিরাজুল সঙ্গে স[illegible] উঠে দাঁড়ালেন।

মিণ্টু বলল, দুলা[illegible] আপনার পক্ষে কি অত সিঁড়ি ভাঙা উচিত হবে?

সিরাজুল উৎসাহের সঙ্গে বললেন, আস্তে আস্তে উঠব। একবার দেখে আসি।

অবনীব পাশ দিয়ে উঠতে উঠতে রেহানা জিজ্ঞাসা করল, আপনি আমেরিকায় কোথায় যাচ্ছেন?

অবনী বলল, বোস্টনে। একটা স্কলারশিপ পেয়েছি, এমআইটি'তে জয়েন করব।

মিণ্টু বলল, খুকিও তো যাচ্ছে। তবে, ও অন্য জায়গায়, বাফেলো। ওখানে পিএইচডি করবে।

দো-তলায় একটা টানা বারান্দা। পর পর ঘর। একটি ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এক বৃদ্ধা। সাদা শাড়ি পরা, মাথার চুল সব সাদা, ফর্সা রঙ, মুখে অনেক ভাঁজ। মাথায় অর্ধেক ঘোমটা।

অবনী বলল, আমার মা।

সিরাজুল অস্ফুট স্বরে বললেন, আশ্চর্য, আমার মায়ের সঙ্গে অদ্ভুত মিল। চমকে উঠেছিলাম। যেন আমার মা-ই দাঁড়িয়ে আছেন।

অবনী সকলের সঙ্গে মায়ের পরিচয় করিয়ে দিল।

মিন্টু আর রেহানা সালাম জানাল। আবেগের আতিশয্যে সিরাজুল এগিয়ে গিয়ে অবনীর মায়ের পা ছুঁয়ে কদমবুসি করে ফেললেন।

অবনীর মা সসঙ্কোচে বললেন, এ কী, এ কী, থাক থাক!

সিরাজুল বললেন, মাসিমা, আপনার নিশ্চয়ই নাবায়ণগঞ্জের কথা মনে আছে? একবার চলেন না সেখানে।

অবনীর মা বললেন, আমার দু'পায়ে বাত। আর চলাফেরার সাধ্য নেই। নিচেই নামতে পারি না।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নারায়ণী বলল, আমাব একবাব বাংলাদেশ দেখে আসতে খুব ইচ্ছে করে।

তার গলার স্বর এখন নরম।

রেহানা তার বাবার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলল।

সিরাজুল নারায়ণীকে অগ্রাহ্য কবে অবনীব মাকে বললেন, প্লেনে গিয়ে উঠবেন আর নামবেন। এয়ারপোর্ট থেকে গাড়ি করে নিয়ে যাব। কোনও অসুবিধে হবে না।

অবনীর মা বললেন, তা আর হবে না। আপনারাই এ বাড়িতে কয়েকটা দিন থেকে যান। কত ঘব খালি পড়ে আছে।

সিরাজুল ভদ্রতা করে বললেন, সম্ভব হলে নিশ্চয় থাকতাম। কিন্তু আমার শবীর ভাল না, ফিরে যেতে হবে। আপনাদের নারায়ণগঞ্জেব বাড়িটা ঠিকঠাকই আছে।

অবনীর মা আর কোনও কথা না বলে তাকিয়ে রইলেন। যেন তাঁর দৃষ্টি সুদূবে চলে গেছে। অতীতে, কিংবা শেষ দিনগুলির ও-পারে।

ছাদের সিঁড়ির দিকে ফিরে আসতে আসতে আর একটা ঘরের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে সিরাজুল বললেন, এই ঘরখানায় আমার বড় আপার বিয়ে হয়েছিল। আমার তখন তিন-চার বছর বয়েস, স্পষ্ট মনে পড়ছে, দুই হাতে মেহেন্দির ছাপ দেওয়া হয়েছিল। আমার আর দুই বোন, এখন বেঁচে নাই, মুখ দেখতে পাচ্ছি।

ছাদ থেকে দেখা যায় বাড়ির পেছন দিকে অনেকখানি মাঠ ও জলাভূমি, তার মাঝখানে রেললাইন। একটু দূরে সেই বটগাছ। এমন কিছু আহামরি দৃশ্য নয়। কাশফুল এখন ফোটেনি।

ঠিক সেই সময়েই একটা ট্রেন এল।

সিরাজুল হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন, ওই যে ওই যে, দেখ, ট্রেন যাচ্ছে।

রেহানা বলল, মুসাফির, তুমি যে একেবারে বাচ্চা হয়ে গেলে!

সিরাজুল বললেন, তাই বোধহয় হয়ে গেছি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বোধহয় একটু একটু অপু চরিত্রটা থাকে। ট্রেনটা দেখে বাচ্চা বয়সের মতোই আনন্দ হল।

আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। এক্ষুনি বৃষ্টি নামবে। আর ছাদে থাকা যায় না। কিন্তু সিরাজুল যেতে চাইলেন না। এক দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ওইখানে দুটো বাতাবি লেবুর গাছ ছিল। এখনও একটা আছে দেখছি।

রেহানা বলল, ওই গাছ কি অত দিন বাঁচে? ওটা নিশ্চয়ই অন্য একটা নতুন গাছ।

সিরাজুল তবু জোর দিয়ে বললেন, না না, নতুন না, কত বড় দেখছিস না, সে-আমলেরই। মানুষ কত কথা ভুলে যায়, কিন্তু গাছ মনে রাখে। ওই গাছটা কি আমাকে মনে রেখেছে?

॥ ৪ ॥

ঠিকানা দেওয়া-নেওয়া হয়েছিল, চিঠি লেখা ও আবার দেখা হবার প্রতিশ্রুতি বিনিময় হয়েছিল। কিন্তু সে-সব আর পরে মনে থাকে না।

সিরাজুলরা ফিরে গিয়ে চিঠি দেননি। অবনীও বিদেশে যাবার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। খুড়তুতো ভাইদের সঙ্গে মামলা সে জিতেছে, তবুও বাড়ি জবরদখলের সম্ভাবনা রয়েই গেল। মাকে সে নিয়ে এসেছে কলকাতার ফ্ল্যাটে। অবনী বিয়ে করেনি, তার অনুপস্থিতিতে এক মামাতো ভাই সস্ত্রীক এই ফ্ল্যাটে থেকে মায়ের দেখাশুনো করবে।

কিছু দিন আগে একবার সে ভেবেছিল, খুড়তুতো ভাইদের সে ও-বাড়িটা ব্যবহার করতে দিতে রাজি হয়ে যাবে। কিন্তু ওরা মামলা করার পর আর সে প্রশ্ন ওঠে না। মামলার সময় তারা অবনীকে অকথ্য-কুকথ্য গালিগালাজ করেছে। বলরাম চৌধুরীর বেশি বয়সের সন্তান অবনী, কিন্তু ওরা ইঙ্গিত করেছিল, অবনী আসলে বলরামের ছেলেই নয়, তার জনক অন্য কেউ। এটা অবনীর মায়ের চরিত্র সম্পর্কেও কুৎসিত অপবাদ। তাই অবনীর জেদ চেপে গেছে, ও-বাড়ি সে জলের দরে বেচে দেবে, তবু সে খুড়তুতো ভাইদের ও-বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেবে না।

আপাত সে বাড়ি পাহারা দেবার জন্য এক জন নেপালি দারোয়ান নিযুক্ত করেছে।

মাকে ফেলে রেখে বিদেশে চলে যেতে হবে, সে-জন্য অবনীর মনে খানিকটা খুঁতখুঁতুনি ছিল। কিন্তু মা-ই তাকে যেতে বলছেন বার বার। মা যেন তাঁর জীবন থেকে স. চাওয়া-পাওয়া ঝেড়ে ফেলেছেন। বাব বার বলেছেন, তাঁর কোনও অসুবিধে হবে না। টেলিফোনে তো কথা হবেই।

যাবার আগের কয়েকটা দিন অবনী তার মায়ের সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে চায়।

মা যশোরের মেয়ে। বিয়ের পর গিয়েছিলেন নারায়ণগঞ্জ। তা-ও খুব বেশি দিন সেখানে থাকেননি। স্বামীর সঙ্গে তাঁর বয়সের বেশ তফাৎ ছিল।

মায়ের মুখে পুরনো কথা বিশেষ শোনেনি অবনী।

সিরাজুল সাহেবরা ঘুরে যাওয়ার পর হঠাৎ যেন মায়ের স্মৃতির দরজা খুলে গেছে। বলতে শুরু করেছেন শ্বশুর-শাশুড়ির কথা। ঠাকুর্দা-ঠাকুমাকে চোখেই দেখেনি অবনী, তাঁদের ছবিও নেই। নারায়ণগঞ্জের বাড়িটা প্রায় শীতলাক্ষা নদীর ধারে, বড় বাগান ছিল। আগে দু'একবার অবনী শুনেছে, মা শ্বশুর বাড়ির চেয়ে বাপের বাড়ি বেশি পছন্দ করতেন। নারায়ণগঞ্জের চেয়ে যশোর অনেক বেশি সুন্দর শহর। সেই তুলনায় নারায়ণগঞ্জ ঘিঞ্জি, সব সময় লোকজনের চ্যাঁচামেচি। এখন মা নারায়ণগঞ্জের বাড়িটার কথাই বলতে লাগলেন বার বার। একবার একটা ব্রত উপলক্ষে তিনি চাঁপাগাছের চারা পুঁতেছিলেন নিজের হাতে। সেই গাছটাকে বড় হতে দেখেছেন, ফুল ফোটার আগেই অবশ্য সে-বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হয়। সেই গাছটা এখনও আছে কি না কে জানে!

মা বললেন, তুই তো একবার বাড়িটা দেখতে গেলেও পারিস!

অবনী বলল, এখন সময় কোথায়? দেখি যদি ফিরে আসার পর —।

আমেরিকায় যাবার পথে ঢাকার অবশ্য থামতে হল অবনীকে।

বাংলাদেশ বিমানের টিকিট, কলকাতা থেকে উড়তে না-উড়তেই পৌঁছে গেল ঢাকা। পরবর্তী ফ্লাইট সাড়ে তিন ঘণ্টা পর, এই সময়টা কাটাতে হবে ট্রানজিট লাউঞ্জে।

পৃথিবীর সব দেশের এয়ারপোর্ট প্রায় একই রকম। কোনওটা বেশি বড়, কোনওটা তুলনায় ছোট। ট্রানজিট লাউঞ্জ থেকে বাইরে বেরুতে দেবে না, শহরটাও দেখা যাবে না।

বসে বসে তন্দ্রা এসে গিয়েছিল অবনীর, হঠাৎ একটা ঘোষণা শুনে সে চমকে উঠল। কিছু একটা যান্ত্রিক গোলযোগে পরবর্তী বিমান ছাড়তে অনেক দেরি হবে, ট্রানজিট প্যাসেঞ্জারদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে হোটেলে।

অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে একটা বাসে তুলে দেওয়া হল অবনীকে। রাত প্রায় এগারোটা। বড় বড় রাস্তা, ঝকঝক করছে আলো, এ ছাড়া শহরের আর কিছু দেখার নেই। দোকানপাটও সব বন্ধ।

কলেজের ছাত্র অবস্থায় একবার ক্রিকেট টিমের সঙ্গে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে গিয়েছিল অবনী। বিদেশযাত্রা তার কাছে একেবারে নতুন নয়। বিদেশের হোটেলেও থেকেছে। মাঝারি ধরনের হোটেল সব জায়গায় এক।

ভোরবেলায় আবার তুলে নিয়ে যাওয়া হবে তাদের। অবনী দাঁত-টাত মেজে তৈরি হয়ে রইল। কেউ এল না। একটু বেলা হবার পর জানা গেল, আরও একটা দিন অপেক্ষা করতে হবে তাদের। হোটেলের খরচ বিমান কোম্পানিই দেবে।

পুরো একটা দিন তাকে কাটাতে হবে ঢাকায়। এখানকার কারুকেই সে চেনে না। তখন তার মনে পড়ল নারায়ণগঞ্জের কথা। নারায়ণগঞ্জ কত দূরে? হোটেলের এক জন বেয়ারার কাছে জিজ্ঞেস করে সে জানল, নারায়ণগঞ্জ বেশ কাছেই, দশ-বারো মাইলের দূরত্ব। ঢাকা আর নারায়ণগঞ্জকে টুইন সিটি বলা যায়, অনবরত লোকজন যাতায়াত করছে।

যাঃ, সিরাজুল চৌধুরীর ঠিকানা লেখা কাগজটা তো সে আনেনি!

হোটেলটা শহরের কেন্দ্রস্থলে। বাইরে বেরিয়ে খানিকটা ঘুরে এল অবনী। বড় বড় সব বাড়ি, ঝলমলে দোকান, কলকাতার চেয়েও সুদৃশ্য মনে হয়। তবে বড় বেশি সাইকেল রিকশা, ট্রাফিকও খুব বিশৃঙ্খল।

একা একা নতুন কোনও জায়গায় ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে না। তাছাড়া অবনীর মনটা আমেরিকার চিন্তায় আবিষ্ট হয়ে আছে। বোস্টনে তার এক দাদার বন্ধু থাকে, তার এয়ারপোর্টে রিসিভ করার কথা ছিল। সে এসে ফিরে গেছে। তাকে একটা ফোন করতে হবে, কিন্তু পরের ফ্লাইট ঠিক কখন যাবে, তাই-ই যে এখনও নিশ্চিত করে জানা যাচ্ছে না।

দিনেরবেলা শুধু শুধু হোটেলের ঘরে বসে থাকতেও খুব খারাপ লাগে। একটা গাড়ি ভাড়া করে অনায়াসে নারায়ণগঞ্জ ঘুরে আসা যেত। বর্ধমানের তালিত একটা ছোট জায়গা, সেখানে সিরাজুল চৌধুরীরা যে-ভাবে বাড়ি খুঁজে পেয়েছিলেন, সে-ভাবে কি নারায়ণগঞ্জে বাড়ি খুঁজে পাওয়া সম্ভব? তাছাড়া সিরাজুল চৌধুরীর কিছুটা স্মৃতিও ছিল।

সিরাজুল চৌধুরীর শ্যালক মিণ্টু এক জন নামকরা কবি। কিন্তু কী যেন তার ভাল নামটা? একেবারেই মনে পড়ছে না। মুসলমানদের নাম একবার-দু'বার শুনলে মনে রাখা শক্ত। কারণ মানে বোঝা যায় না, শব্দগুলোও পরিচিত নয়। অমল, কমল, বিমল কিংবা অভিজিৎ, অনির্বাণ, রণজয় ধরনের নামগুলি চোখ বা কানে বহুপরিচিত। সেই তুলনায় ইফতিকার, আনোয়ারুল, ইমতিয়াজ বা খন্দকার যেন নিছক শব্দ। মুসলমানরা নিশ্চয়ই মানে বোঝে, হিন্দুরা বোঝে না। ওদের এই সব নাম পৃথিবীর যে-কোনও দেশের মানুষের হতে পারে, বাঙালি বলে আলাদা ভাবে চেনার উপায় নেই।

সকালে ঘরে একটা ইংরিজি ও একটা বাংলা কাগজ দিয়েছিল। তাতে চোখ বোলাতে গিয়ে অবনী লক্ষ্য করেছে, কেউ কেউ নিজেদের বাঙালিত্ব বোঝাবার জন্য। আরবি নামের শেষে মিলন, মুকুল, মিণ্টু, বাবু এই সব জুড়ে দিয়েছে। এগুলো বোধহয় এঁদের ডাকনাম।

সিরাজুল চৌধুরীর নামটা তার মনে আছে অবশ্য। তার কারণ সিরাজ নামটা কোন না বাঙালি জানে? তবে সিরাজুল চৌধুরীও যে ছদ্মনামে কিছু লেখেন, তা সে জানে না।

হোটেলের লবিতে একটা ছোট বইয়ের দোকানও আছে। দোকানের কর্মচারীটির সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে দু'জন যুবক। অবনী সেখানে গিয়ে কয়েকটা বইয়ের পাতা উলটে দেখল, তারপর খুব সঙ্কোচের সঙ্গে ওদের জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা কিছু মনে করবেন না, বোকার মতো একটা প্রশ্ন করছি, আপনাদের এখানে এক জন কবি আছেন, নামটা কিছুতেই মনে করতে পারছি না, তবে মিণ্টু বলে তাকে অনেকে চেনে।

অবনী আর কিছু বলার আগেই ওদের এক জন বলল, আবদুল কাদের। তাঁর বই চান? আপনি ইন্ডিয়া থেকে এসেছেন?

অবনী মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। ওঁর সঙ্গে আমার একবার পরিচয় হয়েছিল। ঠিকানা জানি না, একবার দেখা করার ইচ্ছা ছিল।

ওদের এক জন বলল, মিণ্টুভাই এলিফ্যান্ট রোডে থাকেন না?

আর এক জন বলল, ইত্তেফাকে আছেন, সেখান থেকেই তো জানা যায়।

নিজেরাই উৎসাহ করে ইত্তেফাক পত্রিকা অফিসে ফোন করল। সেখানে জানা গেল, আবদুল কাদের ছুটিতে আছে, তার বাড়ির ফোন নম্বর পাওয়া গেল।

সেই নম্বরে ফোন করার পর এক জন মহিলা বললেন, আস্‌সালামু আলাইকুম!

কথাটা এত দ্রুত বলা হল যে অবনী কিছুই বুঝল না।

সে জিজ্ঞেস করল, আবদুল কাদের সাহেব আছেন?

জি না। এখন বাসায় নাই।

কখন ফিরবেন?

আপনি কে বলছেন?

আমি ইন্ডিয়া থেকে এসেছি। ঠিক আছে, আমি পূর্বাণী হোটেলে আছি, পরে ফোন করব।

আপনার নামটা বলেন, লিখে রাখব।

আমার নাম অবনী চৌধুরী।

কী নাম বললেন?

অবনী আর একবার নিজের নাম বলতেই সেই মহিলাটি বললেন, আপনি হোটেলের লবিতে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করুন। কাদের সাহেবকে খবর দিচ্ছি, তিনি পৌঁছে যাবেন।

অবনী আবদুল কাদেরের একটি কবিতার বই কিনে এক জায়গায় বসে পড়তে শুরু করে দিল।

সে বিজ্ঞানের ছাত্র, খেলাধূলাতেই উৎসাহ ছিল বেশি, সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক নেই। গল্প-উপন্যাস তবু কিছু পড়েছে, শখ করে কবিতা পড়েনি কখনও। আবদুল কাদেরের কবিতাগুলি দুর্বোধ্য নয়, বেশ বোঝা যায়।

একটা ব্যাপারে সে খুব বিস্মিত হয়েছে। শুধু ডাকনাম শুনেই এরা এক জন কবিকে চিনে ফেলল? কবিরা এখানে এত জনপ্রিয়? কিংবা এমনও হতে পারে, বইয়ের দোকনে যে ছোকরা দু'টি দাঁড়িয়ে ছিল, তারাও কবিতা লেখে!

সে যাই হোক, মিণ্টু অর্থাৎ আবদুল কাদের এক জন বিখ্যাত ব্যক্তি। তিনি অবনীর মতো এক জন সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা করার জন্য হোটেলে আসবেন কেন? অবনীরই যাওয়া উচিত তাঁর বাড়িতে। মহিলার কাছ থেকে বাড়ির ঠিকানাটা জেনে নিলেই হত।

মাঝে মাঝে হোটেলের প্রবেশ পথটার দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে অবনী। হঠাৎ এক সময় তার বুকটা ধক করে উঠল। মিণ্টু নয়, তাঁর মেয়ে রেহানা আসছে দ্রুত পায়ে।

বর্ধমানে সে রেহানাকে দেখেছিল সালোয়ার-কামিজ পরা অবস্থায়। মনে হয়েছিল, ছোটখাটো চেহারা। মুখে রাগী রাগী ভাব। আজ সে পরে আছে একটা ঘি রঙের শাড়ি, মাথার চুল খোলা, যেন অন্য রকমের এক পূর্ণ যুবতী।

রেহানা চঞ্চল চোখে এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে খুঁজতে লাগল, অবনী বসেই রইল চুপ করে। তাকে দেখতে পেয়ে রেহানা কাছে এগিয়ে এসে ধমকের সুরে বলল, ঢাকায় এসেছেন, আগে খবর দেননি?

অবনী বলল, এখানে থাকার কথা ছিল না। বিমানেব কী যেন গণ্ডগোল হয়েছে!

রেহানা বলল, চলুন, উঠুন, উঠুন!

কোথায় যাব?

আপনাব ফ্লাইট কোন সময়?

সম্ভবত আজ রাত্তিরে।

অনেক সময় আছে। উঠুন!

এত ভাল ভাল বিদেশি গাড়ি কলকাতায় কেন, ভারতের কোথাও দেখা যায় না। রেহানা তাকে তুলল একটা বড় জাপানি গাড়িতে। এক জন কবির মেয়ে এমন দামি গাড়িতে চড়ে? ড্রাইভারের পরিষ্কার সাদা উর্দি।

ড্রাইভারকে কিছু একটা নির্দেশ দিয়ে রেহানা অবনীব দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বলল, এখানে আপনাকে বাগে পেয়েছি। আর ছাড়ছি না। আপনার ওপর আমার রাগ আছে। আজ আপনার ফ্লাইট মিস করাব!

অবনী বলল, সে কী! আমি কী দোষ করেছি?

রেহানা বলল, আপনি আমাদের শান্তিনিকেতন যেতে দেননি! শান্তিনিকেতন না দেখে শুধু বর্ধমান দেখে এসেছি, তা শুনলে এখানকার মানুষ হাসে।

সে-দিন খিচুড়ি রান্নার পর খেতে খেতে বেলা তিনটে বেজে গিয়েছিল। তারপর নামল তুমুল বৃষ্টি। তার মধ্যে বেরুনো যায় না। বসে বসে গল্প হয়েছিল শেষ-বিকেল পর্যন্ত।

শান্তিনিকেতনের প্রোগ্রাম ক্যানসেল করতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। অবনীরও সে-দিন ফেরার কথা। ওদের সঙ্গেই বর্ধমান এসে, একই ট্রেনে ফিরেছিল কলকাতায়।

শান্তিনিকেতন তো এর পরেও একবার এসে দেখে যেতে পারেন।

একবার কেন, একশো বার যেতে পারি। কিন্তু সেবারই আমার দেখার ইচ্ছে ছিল, সেই জন্যই বেরিয়েছিলাম। আপনি খিচুড়ি খাওয়াবার নাম করে আমাদের দেরি করালেন।

এক্সট্রিমলি সরি। খিচুড়ি যে আপনার একেবারে পছন্দ নয়, তা বুঝতে পারিনি।

সে-কথা হচ্ছে না। খিচুড়িটা ইম্‌মেটিরিয়াল, দেরিটাই আসল।

পরে যে অত বৃষ্টি নামবে, সে-ব্যাপারে আমার হাত ছিল না।

আপনি শহিদ মিনার দেখেছেন? সাভারের স্মৃতিসৌধ দেখেছেন?

আমি তো বাংলাদেশে আগে আসিনি। কিছুই দেখিনি।

ও-সব কিছু আপনাকে দেখাব না। নারায়ণগঞ্জের একটা পুরনো শ্যাওলাধরা বাড়ির মধ্যে আপনাকে ঠেসে রাখব। আপনি যেমন বর্ধমানে আমাদের রেখেছিলেন।

আমরা কি এখন নারায়ণগঞ্জে যাচ্ছি? সিরাজুল চৌধুরী সাহেব কি সেখানে? তাঁর সঙ্গে দেখা হলে ভাল লাগবে।

আমার বাবাও সেখানে।

ঢাকা শহর ক্রমশই বাড়ছে। গাড়ির সংখ্যাও প্রচুর। মাঝে মাঝেই যানজট, গাড়ি থেমে থাকে কিছুক্ষণ। গরম অবশ্য নেই। তাছাড়া এ গাড়িটা এসি।

অধিকাংশ দোকানের নাম বাংলায় লেখা। এমনকী ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপনও বাংলায়, এ-সব অবনীর চোখে অভিনব লাগে।

নারায়ণগঞ্জে পৌঁছতে দূরত্বের তুলনায় অনেকটা বেশি সময় লাগল।

গাড়ি থেকে নেমে প্রথম দর্শনে অবনী তাজ্জব বনে গেল। এত বড় বাড়ি? মনে হয় যেন দু'মহলা। রেহানা বলেছিল, শ্যাওলাধরা, বাইরের দিকে অন্তত সে-রকম কোনও চিহ্নই নেই।

এ বাড়ির সঙ্গে বর্ধমানের বাড়িটার কোনও তুলাই হয় না। এটাকে মনে হয়, রীতিমতো কোনও ধনীর বাড়ি। গেটে দারোয়ান রয়েছে।

প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় অবনীর মনে হল, এক্সচেঞ্জের ব্যাপারে তার বাবা খুব ঠকে গিয়েছিলেন। এই বাড়ির বদলে বর্ধমানের ওই বাড়ি কেউ নেয়? বাধ্য হয়ে নিতে হয়েছিল।

বাড়িভর্তি অনেক লোক।

গেট দিয়ে ঢুকে, একটা লন পেরিয়ে প্রশস্ত বৈঠকখানায় পাওয়া গেল সিরাজুল ও মিণ্টুকে। অন্য দু'জন ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে তাঁরা কী সব বৈষয়িক ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রেহানা বলল, আব্বু, দেখো, কাকে ধরে এনেছি।

মিণ্টু মুখ তুলে বলল, আরেঃ! সারপ্রাইজ! সারপ্রাইজ! কোথায় পেলি একে?

সিরাজুল বললেন, অবনী? এসো, এসো, ওয়েলকাম হোম!

একটু পরেই চা এল, তার সঙ্গে একটা বড় প্লেটভর্তি বিস্কুট আর মিষ্টি। তারপর অগণিত মানুষের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দেওয়া হল। কেউ নানির মেয়ে, কেউ ফুফার ছেলে, কেউ বড় আপা।

নানী, ফুফা ঠিক কাদের বলে, তা অবনী জানে না। তবে আপা মানে দিদি, তা সে জনে, আর দাদাকে এরা বলে ভাই। এত আত্মীয়-স্বজন এই বাড়িতেই এক সঙ্গে থাকে, না কোনো উৎসব উপলক্ষে এসেছে, তা ঠিক বোঝা গেল না।

প্রথম দেখা হলে সকলেই একটা হাত বুকের কাছে খানিকটা তুলে বলে, সেলাম আলেকুম। এটাই সম্বোধন। কিন্তু সবাই খুব তাড়াতাড়ি বলে কেন? অবনীব বয়সী পশ্চিম বাংলার ছেলেরা আজকাল আর সচরাচর হাতজোড়ও করে না, নমস্কার কথাটাও উচ্চারণ করে না। এমনিই কথা শুরু করে।

এদের এইভাবে সম্বোধনের উত্তরে কী করা উচিত, তা বুঝতে না পেরে অবনী বেশ অস্বস্তিতে রইল।

গল্পের বইতে সে পড়েছে, মুসলমানরা প্রথম সম্বোধনে আদাব বলে। এখানে আদাব শব্দটা সে কারুকেই ব্যবহার করতে শোনেননি!

চা শেষ করার পর সিরাজুল বললেন, চলো, তোমাদের আসল বাড়িটা দেখিয়ে আনি। সামনের পোরশানটা নতুন, খানিকটা জমি কিনে আমরা বাড়িয়েছি!

বাবা ঠকে গেছেন, এই রকম একটা চিন্তা নিয়ে অবনীর ভেতরে খানিকটা ক্ষোভ জমেছিল। এবার সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল। বাড়িটা আদতে এত বড় ছিল না, জমিও ছিল না এতটা। তাছাড়া সিরাজুল

সাহেবরা এটাকে বসতবাড়ি করে রেখেছেন, বর্ধমানের বাড়িটার সে-রকম ব্যবহার হয়নি অনেক দিন।

পেছন দিকে একটা উঠোন, তারও দিকের বাড়িটার গড়নই পুরনো ধরনের। মোটা মোটা দেওয়াল। এক তলায় অনেকখানি খোলা বারান্দা, যা এখন অপ্রয়োজনীয়। আগেকার কালে বাড়ির মহিলারা ওখানে বসে তরকারি কুটতেন বোধহয়।

এ বাড়ির দেওয়ালে কিছু কিছু শ্যাওলার ছোপ আছে।

সিরাজুল বললেন, পুরনো বাড়িটাই আমার বেশি ফেভারিট। দো-তলার জানলা দিয়ে শীতলাক্ষা নদী দেখা যায়। আমি সেই ঘরেই থাকি।

অবনীর কিছুই রোমাঞ্চ হচ্ছে না। এখানে সে জন্মায়নি। তার বাবা-মা এখানে ঘুরে বেড়াতেন, সে কল্পনা করার চেষ্টা করছে। উঠোনে একটা তুলসিমঞ্চ রয়েছে, গাছটা নেই। একেবারে খালি। ওখানে মা প্রতি সন্ধেবেলা প্রদীপ জ্বালতেন?

মায়ের নিজের হাতে পোঁতা চাঁপা গাছটা কি এখন আছে?

সে-কথা জিজ্ঞেস করতেই সিরাজুল বললেন, একটা চাঁপাগাছ ছিল বটে, অনেক ফুল ফুটত। আমি ছোটবেলায় দেখেছি। একবার খুব ঝড়ে সেই গাছটা পড়ে যায়।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে মিণ্টু বলল, দুলাভাই, বর্ধমান গিয়ে দেখার পর বুঝলাম, সম্পত্তি বদলাবদলি করে আপনারাই জিতেছেন।

সিরাজুল বললেন, কেন? দুটো বাড়ির সাইজ প্রায় সমান সমান। উনিশ-বিশ!

মিণ্টু বলল, তা হতে পারে। কিন্তু পোজিশান? বর্ধমানের ওই তালিত নিতান্তই মফঃস্বল। সে-তুলনায় নারায়ণগঞ্জ অনেক জমজমাট। এখান থেকে ঢাকা যাওয়া-আসাও অনেক সহজ।

সিরাজুল বললেন, পার্টিশনের সময় এখান থেকে ঢাকাও বেশ দূর মনে হত। তখন তো এত মোটরগাড়ি ছিল না! আমরা যেতাম নৌকায়।

দুপুরে খাওয়ার টেবিলে বসে অবনীর চক্ষু চড়ক গাছ!

একটা লম্বা টেবিল ভর্তি বিভিন্ন আকারের পাত্রে কত রকম যে খাদ্যদ্রব্য সাজানো, তার ঠিক নেই।

খাবে মাত্র চার জন, সিরাজুল, তাঁর একবড় ভাই গনি সাহেব, মিণ্টু আর অবনী।

রেহানা আর এক জন মহিলা পরিবেশন করবেন। অবনী বসার বদলে চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে আছে দেখে রেহানা বুঝিয়ে দিতে লাগল কোনটা কী। টাকি মাছের শুঁটকি, শাক-শুঁটকি, আলুভাজা, বেগুনভাজা, দু'রকম ডাল, কই মাছ, চিতল মাছের পেটি, বড় বড় গল্দা চিংড়ি, দু'রকম মাংস, চাটনি, দই, তিন রকম মিষ্টি...।

সিরাজুল বললেন, বিফ নেই, চিন্তা করো না, আমি আগেই বলে দিয়েছি।

অবনী বলল, সেটা চিন্তার বিষয় নয়। কলেজে পড়ার সময় আমরা নিয়মিত নিজামের দোকানের বিফ রোল খেয়েছি। কিন্তু... এত খাবার কি মানুষে খেতে পারে?

রেহানা বলল, ও-সব শুনব না। প্রত্যেকটা আপনাকে খেতে হবে।

অবনী একেবারে মরমে মরে গেল। ছি ছি ছি, তাদের বাড়িতে এই অতিথিদের সে খিচুড়ি, বেগুনভাজা, ডিমভাজা আর একটা করে পার্শে মাছ ছাড়া আর কিছু খাওয়াতে পারেনি। আগে থেকে ব্যবস্থা ছিল না, অত বেলায় তালিতের বাজারে ভালো মাছও পাওয়া যায় না।

রেহানার ঠোঁটে দুষ্টুমির হাসি।

অবনী অত সামান্য খাবার আয়োজন করেছিল বলেই যেন রেহানা তার প্রতিশোধ নিতে চাইছে!

এত কম সময়ের মধ্যে এত পদ রান্না হল কী করে? এরা কি প্রত্যেক দিনই এত রকম জিনিস খায়?

শুঁটকি মাছ আগে কখনও খায়নি অবনী। শুনেছে, ওতে খুব বদগন্ধ থাকে। তবে কোনও খাদ্য সম্পর্কেই তার মনে কোনও পূর্ব-সংস্কার নেই, সব কিছুই সে চেখে দেখতে রাজি আছে।

একটুখানি শুঁটকি মাছ সে মুখে তুলে দেখল, কোনও গন্ধ নেই তো!

তার ভয় ভয় ভাবটা দেখে সিরাজুল বললেন, শুঁটকি মাছ রান্না হলে আর গন্ধ থাকে না। কেমন লাগল?

অবনী বলল, বেশ নতুন ধরনের। আর একটু খাব।

তারপর সে মনের কথাটা বলেই ফেলল। সিরাজ সাহেব, আমাদের বাড়িতে আপনাদের কিছুই খাওয়াতে পারিনি। সে-রকম ব্যবস্থা ছিল না। তবু আপনাদের জোর করেছিলাম!

সিরাজুল বললেন, কী বলো! খিচুড়ি আমার দারুণ ফেভারিট! প্রায়ই খাই। তাছাড়া পার্শে মাছ ছিল, কত দিন পর খেলাম। ও-মাছটা আবার এ-দিকে পাওয়া যায় না।

মিন্টু বলল, খিচুড়ির কী চমৎকার স্বাদ হয়েছিল। আমাদের বাড়িতে অত পাতলা খিচুড়ি বানাতে জানে না, বেশি ঘন হয়ে যায়।

অবনী বুঝল, এ-সবই ভদ্রতার কথা। এঁরা আবার পশ্চিম বাংলায় বেড়াতে গেলে... কিন্তু সে আর কবে হবে? আগামী দু'বছরের মধ্যে অন্তত তার আমেরিকা থেকে ফেরা সম্ভব নয়।

রেহানা বলল, আপনি পাঙাস মাছ খেয়েছেন?

অবনী ও-মাছের নামও শোনেনি। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় কিছু কিছু মাছের নাম আলাদা। মায়ের মুখে সে বাঁশপাতা, চ্যালা, ভ্যাদা এই সব নাম শুনেছে, পশ্চিম বাংলায় ও-রকম নামের চল নেই।

সে দু'দিকে মাথা নাড়ল।

রেহানা বলল, রাত্তিরে আপনাকে পাঙাস খাওয়ানো হবে। খুব মজার খেতে লাগে।

অবনী বলল, রাত্তিরে? আমাকে তো বিকেলেই চলে যেতে হবে। রাত্তিরে আমার ফ্লাইট।

রেহানা বলল, আপনার ফ্লাইট কাল বেলা এগারোটাব আগে যাবে না। আরও দেরি হতে পারে। রাত্তিরে আপনি এখানেই থেকে যাবেন। আপনাকে যেতে দেওয়া হবে না!

অবনী প্রায় আঁতকে উঠে বলল, না না, আমাকে ফিরতেই হবে। ফ্লাইট মিস করলে... আপনি কী করে জানলেন, কাল এগারোটার আগে ফ্লাইট যাবে না?

রেহানা বলল, জানা খুব সোজা। টেলিফোন করলেই জানা যায়! আপনাদের কলকাতার মতো তো নয় যে, এয়ারপোর্টে ফোন করলে কেউ ধরবেই না।

মিণ্টু বলল, সব খবর নেওয়া হয়ে গেছে। বিমানে আমার এক বন্ধু কাজ করে। কোনও চিন্তা নেই, সে ঠিক সময় আমাদের জানাবে।

সিরাজুল বললেন, সন্ধ্যার সময় এখানকার কিছু গণ্যমান্য লোককে ডেকেছি। তোমাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। তুমি তো এখানকারই সন্তান। নারায়ণগঞ্জের এক কৃতী সন্তান উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকা যাচ্ছে, এ তো আমাদেরও গর্ব।

অবনী বলল, কী যে বলেন! হাজার হাজার ছেলে মেয়ে বিদেশে যায়, এটা আবার কোনও ব্যাপার নাকি! এই রেহানাও তো যাচ্ছেন শুনলাম। বরং ওঁকে সম্বর্ধনা দিন।

রেহানা বলল, আমাকে কেন? আমি মেয়ে বলে?

মিণ্টু বলল, আমাদেব এখান থেকে অনেক মেয়েও পিএইচডি করতে গেছে। তবে জেনেটিক্সেব মতো সাবজেক্ট নিয়ে ওর মতো এত ভাল রেজাল্ট আগে কেউ করেনি।

রেহানা বাবাব দিকে চোখ পাকিয়ে বলল, তুমি খববর্দার ওই সব কথা বলবে না লোকের সামনে।

সব ক'টা পদ একটু একটু করে খেলে দারুণ পেট ভরে যায়। অবনীর মনে হল, জীবনে কখনও সে এত বেশি খায়নি।

খাওয়ার পর সিবাজুল প্রস্তাব দিলেন অবনীকে খানিকটা বিশ্রাম নিতে। একটা ঘর তার জন্য রেডি করা আছে। সে ঘুমিয়েও নিতে পারে।

অবনীব দুপুরে ঘুমোনোর অভ্যেস নেই। ভেতরে ভেতরে সে অস্থির বোধ করছে খুব। সত্যিই কি তার বিমান কাল এগারোটাব আগে ছাড়বে না? নাকি এরা প্র্যাকটিক্যাল জোক করছে তার সঙ্গে। সে নিজে একবার টেলিফোনে জেনে নিতে পাবলে নিশ্চিন্ত হতে পারত। কিন্তু এদের মুখের ওপব অবিশ্বাসই-বা কবে কী কবে!

রেহানার ঠোঁটে চাপা হাসিটাই সন্দেহজনক।

বিশ্রাম নেবার প্রস্তাবটা না মেনে সে বলল, আমি বরং চারপাশটা ঘুবে টুবে দেখি!

সিরাজুল চৌধুরীবও দুপুরে শোওয়ার অভ্যেস নেই। বাগানে ঘুরে ঘরে দেখছিলেন। বাড়ির পেছনে দিকে খানিকটা জায়গায় বেগুন ও লঙ্কাব চাষ হয়েছে। বেশ নধর বেগুন ফলেছে, লঙ্কাগুলিও সূর্যমুখী।

অবনীকে বললেন, তোমার বাবার আমলেব এক জন লোক এখানে আছে এখন। সে তোমাকে পুবনো কিছু কথা বলতে পাববে। দাঁড়াও তাকে ডাকি! এক জন মালিকে বললেন, এই শশাকে একবার আসতে বল তো এখানে!

একটু পরেই লুঙ্গি গেঞ্জি পবা এক জন বৃদ্ধ এল সেখানে। শরীরটা বেঁকে গেছে খানিকটা, মাথায় ঠিক টাক নেই, খামচা খামচা কবে চুল উঠে গেছে।

সিরাজুল বললেন, এর নাম শশধর, সবাই শশা বলে ডাকে। তোমার বাবার আমলেও এই বাড়িতে কাজ করত, এখনও করে।

শশা, তোমার বলরাম চৌধুবীকে মনে আছে তো? ইনি তেনার ছেলে। শশধর ফ্যাল ফ্যাল করে অবনীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, হ, সব মন আছে। এনাবেও মনে আছে। ছুট ছিলেন, দুই-তিন বছরের বাইচ্চা, আমি কোলে নিছি।

অবনী হাসল, এই বাড়ি বদলের আঠেরো বছর পর সে জন্মেছে কলকাতায়। এই মাটিতে সে আগে কখনও পা দেয়নি। এই লোকটি তাকে কোলে নিয়েছে?

সিরাজুল বলসেন, যাঃ, তা কী কবে হবে? সেই সময় বলরাম চৌধুরীর কোনও ছেলে-মেয়ে ছিল না

এতেও দমে না গিয়ে শশধর বলল, ওই সইজনা গাছটার তলায় বইয়া বলরাম চৌধ্রি তামুক খাইত। তেনার কোলে একটা শিশুরে দেখছি কতবার।

সিরাজুল বললেন, ওই সজিনা গাছটা আমাদের আমলের। আগে ছিল না।

শশধর বলল, দুর্গাপূজা হইত এ-বাড়িতে। কত ধুমধাম। একবার ছত্রিশটা রাজভোগ খাইছিলাম, তারপর মাটিতে গাড়াগড়ি।

সিরাজুল হাসতে হাসতে বললেন, ছত্রিশটা রাজভোগ? এখনকার দিনে কেউ খেলে আর বাঁচবেই না।

দুর্গাপুজোর কাহিনিটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না অবনীর। সে তার মায়ের কাছে এ বিষয়ে কিছু শোনেনি।

সে জিজ্ঞেস করল, আপনার কি মনে আছে, এখানে একটা চাঁপা ফুলের গাছ ছিল? ঠিক কোন জায়গাটায়?

অবনী লক্ষ্য করেছে, কিছু কিছু শব্দে সামান্য উচ্চারণের পার্থক্য থাকলেও সিরাজুল-মিণ্টু-রেহানাদের মুখের ভাষা আর তার নিজের ভাষা প্রায় একই রকম। এই শশধরের মুখেই সে প্রথম কাঠ বাঙাল ভাষা শুনছে। শশধর সম্ভবত তার উচ্চারণ বুঝতে পারছে না।

অবনীর প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, অনেক গাছ আছিল, বোরোই গাছ, কদম গাছ, চাইলতা গাছ।

পঞ্চাশ বছরের স্মৃতি ক'জন ধরে রাখতে পারে? পুরনোও কথা শোনার কোনও রোমাঞ্চও বোধ করছে না অবনী।

সন্ধেবেলা সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হল না বটে, তবে ছোটখাটো একটা গান-বাজনার আসর বসল। স্থানীয় প্রতিভার অভাব নেই। দু'জন আবৃত্তি করে শোনাল লম্বা লম্বা কবিতা। রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, লালন ফকিরের গান গাইল কয়েক জন। রেহানাও বেশ ভাল গান জানে। প্রথমে সে কিছুতেই গাইতে রাজি হয়নি, মিণ্টুর পেড়াপিড়িতেই তাকে হারমোনিয়াম ধরতে হল। মেয়ের গুণাবলীর জন্য খুব গর্বিত মিণ্টু। সে নিজেও কবিতা পাঠ করল একেবারে শেষে।

অবনী গান জানে না। কবিতা আবৃত্তি করেনি কখনও। তবু তাকেও কিছু বলতে হল। প্রথম বাংলাদেশ দেখার অভিজ্ঞতা। পূর্বপুরুষদের জন্মস্থান প্রসঙ্গে তার গলায় তেমন আবেগ ফুটল না।

এর মধ্যে সে অন্তত তিনবার মিণ্টু ও রেহানাকে জিজ্ঞেস করেছে, তার ফ্লাইট সত্যিই ডিলেইড কি না।

আসর ভাঙার পর সে রেহানাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি বাফেলোতে কবে জয়েন করছেন?

রেহানা বলল, সামনের মাসের দশ তারিখে।

অবনী বলল, বাফেলোর কাছেই নায়েগ্রা জলপ্রপাত না? একবার নিশ্চয়ই দেখতে যাব। তখন খোঁজ করব আপনার।

রেহানা বলল, অবশ্যই আসবেন। আমিও বোস্টনে যাব। খব সুন্দর শহর শুনেছি।

পাশ থেকে মিণ্টু বলল, একটু মুশকিল কি হয়েছে জানেন? রেহানার হাজব্যান্ড আনোয়ার থাকে ক্যালিফোর্নিয়ায়। একেবারে অন্য প্রান্তে। দু'জনে থাকবে অত দূরে দূরে, যাওয়া-আসার খরচও তো অনেক। যদি মেয়েটা ওয়েস্ট কোস্টের কোনও ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন পায়, অনেক সুবিধে হয়।

রেহানা বলল, আব্বু, আমি যেখানে অ্যাডমিশান পেয়েছি, আমার সাবজেক্টের জন্য সেই ইউনিভার্সিটির খুব নাম আছে। ওটাই আমার পক্ষে ভাল।

সিরাজুল বললেন, অবনী, তুমি মেয়েটার একটু খোঁজখবর নিও। তোমার ঠিকানা, ফোন নাম্বার...।

অবনী বলল, হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আমি লিখে দিয়ে যাচ্ছি!

॥ ৫ ॥

অক্টোবরের কুড়ি তারিখ, এর মধ্যেই বরফ পড়তে শুরু করেছে।

বরফ পড়াটা কথার কথা, আসলে তুষারপাত। পেঁজা তুলোর মতো কিংবা পাখির সাদা পালকের মতো দুলতে দুলতে নামে, একটু পরেই গাছপালাগুলো সব সাদা হয়ে যায়।

প্রথম কয়েক বার এ দৃশ্য বিমোহিত করে রাখে। কাচের জানলায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখতে ইচ্ছে হয়। আস্তে আস্তে বদলে যায় পৃথিবীর রূপ। সব দিকে শুভ্রতা।

কয়েকদিন পরএ দৃশ্যে অভ্যস্ত হয়ে গেলে আর ওই মুগ্ধতাবোধ থাকে না। তখন নানা অসুবিধের কথা মনে পড়ে। তুষারপাত হলেই তো আর ঘরে বসে থাকলে চলে না, কাজে বেরুতে হয়, দোকানে যেতে হয়। তার জন্য পরতে হয় একগাদা পোশাক, ঠাণ্ডা ছাড়াও যখন তখন পা-পিছলে পড়ার সম্ভাবনা।

অবনীর গাড়ি নেই। গাড়ি চালানো সে শিখে এসেছে কলকাতা থেকেই, ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্সও নিয়ে এসেছে, কিন্তু এখনও গাড়ি কেনার সামর্থ্য হয়নি। একটা সেকেন্ডহ্যান্ড সাইকেল কিনেছে, অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়েছে জ্যাকসন স্ট্রিটে, কাছেই একটা টিউব স্টেশন।

এখন তুষারপাত হলেই অবনীর মনখারাপ লাগে। নিঃসঙ্গতা বোধটা তাকে চেপে ধরে। বিশেষত শেষ বিকেলের দিকে।

ওভারকোটের কলার তুলে দিয়েছে, দু'হাতে গ্লাভস, পাড়ায় গ্রসারি স্টোর থেকে কিছু মাছ-মাংস আর সবজি কিনে, খাকি রঙের ঠোঙাটা বুকে চেপে বাড়ি ফিরছে অবনী। রাস্তা একেবারে ফাকা। মনে হয় যেন পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

এই রকম সময় মনে হয়, ধুৎ, কেন বিদেশে এই রকম ভাবে পড়ে থাকা! একটা আমেরিকান ডিগ্রি কিংবা কিছু ডলার জমিয়ে কী এমন হাতি-ঘোড়া পাওয়া যাবে? আজকাল বিদেশি ডিগ্রির তেমন কোনও কদর নেই। দেশে অবনীর অবস্থা বেশ সচ্ছলই ছিল, আরও বেশি উপার্জনের লোভেও সে আসেনি। কিন্তু বিদেশে না আসাটা যেন দারুণ অযোগ্যতা। নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এ ভাল রেজাল্ট করেও বিদেশে না গেলে অন্যরা বলে, কী রে, তুই চান্স পেলি না? তাই, যেন যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্যই আসা।

সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ উঠে দু'পা ঠুকে বরফ ঝাড়ল অবনী। মাথা থেকে টুপিটা খুলে পকেটে রাখল। প্রধান দরজাটা বন্ধ থাকে সব সময়, প্রত্যেক ভাড়াটে কোড নাম্বার টিপে সেই দরজা খোলে।

বাড়িটা চার তলা। অবনীর অ্যাপার্টমেন্ট সব চেয়ে ওপরতলায়। অ্যাটিকের ঘর খানিকটা সস্তা হয়। ব্যাচেলরের পক্ষে দেড়খানা ঘরই যথেষ্ট।

চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল অবনী। ঘড়িতে এখন বিকেল শেষ হয়নি, এর মধ্যে আকাশ অন্ধকার। এ ঘরের এক দিকে বিরাট জানলা, অনেকখানি আকাশ দেখা যায় অন্য সময়।

রোজ রোজ শুধু নিজের জন্য রান্না করতে কী যে একঘেয়ে লাগে! একা একা বসে খাওয়া।

কলকাতায় অবনীর ফ্ল্যাটটা বেশ বড়। এক বিধবা মামাতো দিদি সেখানে আছেন অনেক দিন। তাঁর দুই ছেলে। ওরাই সংসার চালায়। হাট-বাজার করার কথা অবনীকে কখনও ভাবতে হয়নি। সে কখনও এককাপ চা-ও বানায়নি নিজে। এখানে সব কিছুই করতে হয়। বাসন মাজার সময় এক-এক দিন তার ইচ্ছে হয় সব কিছু ছুঁড়ে ভেঙে ফেলতে।

ঘরে ঢুকেই প্রথমে টিভি চালিয়ে দেয় অবনী। বেশির ভাগ প্রোগামই দেখতে তার ভাল লাগে না, তবু টিভি চলতে থাকলে মনে হয়, ঘরের মধ্যে অন্য কেউ কথা বলছে, তাতে নির্জনতা খানিকটা কাটে।

প্রায় মাস দু'এক কেটে গেলে বোস্টনে। এখানে অনেক বাংলাদেশি এবং ভারতীয় আছে। কয়েক জনের সঙ্গে পরিচয়ও হয়েছে। তবে ঘনিষ্ঠতা হয়নি কারুর সঙ্গে।

ছাত্রদের তুলনায় অবনী বয়সে খানিকটা বড়। পড়াশুনো শেষ করেই অবনী আসার চেষ্টা করেনি, কয়েক বছর অধ্যাপনা করেছে। ছাত্র ছাড়া, আর যারা অনেক দিন ধরে আছে, তারা সবাই বিবাহিত, সস্ত্রীক সংসার পেতেছে।

অবনী এদের মাঝামাঝি। সে বিয়ে করার কথা এত দিন চিন্তা করেনি। মা আর মামারা মাঝে মাঝেচাপ দিয়েছে বটে, কিন্তু খবরের কাগজ দেখে একটা অচেনা মেয়েকে বিয়ে করা যায় নাকি?

যাকে প্রেম বলে, সে-অভিজ্ঞতা অবনীর কখনও হয়নি। কিছু কিছু মেয়েকে চেনে অবশ্যই। আলগা ভাবে বন্ধুত্ব হয়েছে, তার বেশি কিছু নয়। এম এসসি পড়ার সময় জয়া নামের একটি মেয়ে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু অবনী তখন পড়াশুনো নিয়ে এমনই ব্যস্ত যে, জয়া সম্পর্কে বেশি মাথা ঘামাতে পারেনি। জয়া একটা চিঠিও লিখেছিল, উত্তর দেওয়া উচিত ভেবে ভেবেও লেখা হয়নি শেষ পর্যন্ত। অবনীর পরীক্ষা যখন শেষ হল, তার মধ্যে বিয়ে করে ফেলেছে জয়া। পরে একবার জয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে কথাই বলেনি। জয়ার তো রাগ হতেই পারে, অবনীরই দোষ।

বাফেলো থেকে রেহানা ফোন করেছিল এক দিন।

সে ভালভাবে পৌঁছে গেছে, আপাতত পেয়িং গেস্ট হয়ে আছে এক বাড়িতে, আগামী মাসে অ্যাপার্টমেণ্ট পেয়ে যাবে।

রেহানার ফোন নাম্বার লেখা কাগজটা সাঁটা আছে ফ্রিজের গায়ে, কিন্তু অবনী এক দিনও ফোন করেনি। রেহানা নিজে থেকেই প্রথম ফোনটা করেছে, এরপর একবার অন্তত তাকে ফোন করা উচিত, অন্তত নিছক ভদ্রতাবশতই করা উচিত ছিল।

কেন রেহানাকে ফোন করার ইচ্ছে হয়নি অবনীর?

সে নিজেকেই বিশ্লেষণ কবতে চায়।

বাংলাদেশে সিরাজুল সাহেবের বাড়ির আতিথেয়তায় সে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছে। এত আন্তরিক ব্যবহার, এত সহজে আপন করে নেওয়া!

ঢাকার হোটেলে পড়ে বইল মালপত্র, অবনীকে রাত কাটাতে হল নারায়ণগঞ্জে। মিন্টু এক ঘণ্টা অন্তর অন্তর বাংলাদেশ বিমানে তার বন্ধুকে ফোন কবে ফ্লাইটের খবর জেনে অবনীকে আশ্বস্ত করেছে।

সিবাজুল সাহেব বলেছিলেন, নিজের বাপ-ঠাকুর্দার বাড়িতে অন্তত একটা রাত্রি বাস করে যাও!

অবনীকে আপ্যায়ন করার জন্য ওঁদের তো কোনও স্বার্থ ছিল না। একেই বলে আন্তরিকতা।

রেহানাকে তার বেশ ভাল লেগেছিল। যদিও মাত্র দু'দিনের পরিচয়। কারুর কারুর সঙ্গে অনেক বার দেখা হলেও আড়ষ্টতা কাটে না, আবার কারুর কারুর সঙ্গে অল্প সময়েই ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়। রেহানার স্বভাবটাই ঝর্নার জলের মতো।

কিন্তু রেহানা বিবাহিত, এটা জানার পরই অবনী সহজ ভাবটা হারিয়ে ফেলল কেন? আর সে রেহানার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা চালিয়ে যেতে পারেনি!

তাহলে কি সে রেহানার প্রেমে পড়েছিল, কিংবা তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল? মোটেই না। সে-রকম চিন্তা ঘুণাক্ষরেও তার মনে আসেনি। এমনিই সম্পর্কটা এগোচ্ছিল বন্ধুত্বের দিকে।

একটি তরুণী মেয়ে বিবাহিত জানলেই সম্পর্কের এত তফাৎ হয়ে যায়?

প্রথম পরিচয়ের সময় কেউ তো আর জানতে চায় না, তুমি বিবাহিত না অবিবাহিত? অবনী সম্পর্কেও ওরা কিছু জানতে চায়নি।

অবনী যেন ধরেই নিয়েছিল, রেহানা যেহেতু এখনও ছাত্রী, তাই তার বিয়ে হয়নি। ছাত্রবয়সে কারুর বিয়ে হয় না? শুধু মেয়ের কেন, ছেলেদেরও হয়। অবনীর বন্ধু মৃণালই তো মাত্র বাইশ বছর বয়েসে তার এক সহপাঠিনীকে বিয়ে করে ফেলেছে।

রেহানার স্বামী এ-দেশে থাকে, এটা শোনার পরই কেন চুপসে গিয়েছিল অবনী?

রেহানার স্বামী আনোয়ার খুব গুণী পুরুষ। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, চাকরি করে আই বি এম-এর মতো বড় কোম্পানিতে। নিজের সাবজেক্টে তার একটা বইও ছাপা হয়েছে এখান থেকে। সে আবার কবিতাও লেখে। বাংলাদেশে সবাই কি কবিতা লেখে? আনোয়ারের ছবিও দেখেছে অবনী, রীতিমতো সুপুরুষ। রেহানার সঙ্গে সুন্দর মানিয়েছে, বলতেই হবে।

পূর্বাণী হোটেলের লবিতে অবনী যখন অপেক্ষা করছিল, ভেবেছিল মিণ্টু তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, তার বদলে রেহানা হঠাৎ এসে হাজির হল। তার সেই ঝলমলে রূপ দেখে অবনীর বুকের মধ্যে ধক করে উঠেছিল। এখনও রেহানার মুখটা মনে করলেই তার বুকের মধ্যে একটু ব্যথা ব্যথা করে। একেই কি প্রেম বলে? যদি হয়ও, এই প্রেম নিজের মধ্যে গোপন রাখাই ভাল।

টেলিফোনটার দিকে মাঝে মাঝে চোখ পড়ে অবনীর।

মাকে সপ্তাহে একবার সে ফোন করে। মা এখন কলকাতার ফ্ল্যাটে এসে আছেন। অবনীর আত্মীয়-স্বজনের সংখ্যা বড় কম। সহপাঠী বন্ধুদের মধ্যে বেশ কয়েক জন এখন ইউরোপ-আমেরিকায়। তবে বোস্টনে কেউ থাকে না। কাছাকাছির মধ্যে। অতীন আছে ওয়াশিংটন ডি সি-তে। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে কথা হয়।

রেহানাকে ফোন করে কী কথা বলবে, তা অবনী ভেবেই পায় না।

এই তুষার-ঝরা সন্ধেবেলা কারুর সঙ্গে কথা বলতে খুব ইচ্ছে করে। অতীন কালই ফোন করেছিল, আজ কি তাকে ফোন করা যায়?

ফোনটা ঝন ঝন করে বেজে উঠল।

কণ্ঠস্বর শুনে অবনী কেঁপে উঠল। অবিশ্বাস্য। যার কথা এতক্ষণ ভাবছিল, সে-ই ফোন করেছে! এ কি ফোন না টেলিপ্যাথি?

রেহানা বলল, কেমন আছেন? আপনি এর মধ্যে ফোন-টোন করলেন না তো'

অবনী আমতা আমতা করে বলল, এই তো আজকেই ভেবেছিলাম, আসলে কয়েক দিন খুবই ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল।

রেহানা কৌতুকের সুরে বলল, আজকেই ভেবেছিলেন? এটা সত্যি কথা?

হ্যাঁ সত্যি।

আচ্ছা, আপনাকে বেনিফিট অফ ডাউট দেয়া গেল। আজ এখানে কী দারুণ বরফ পড়ছে। সারা দিন। কী মজা! কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে! আমার হাজব্যান্ড দুপুরে ফোন করেছিল। ও ক্যালিফোর্নিয়ায় যেখানে থাকে, সেখানে সারা বছরেই একবারও বরফ পড়ে না। ওকে বললাম, তুমি এসে দেখে যাও! নায়েগ্রা ফল্‌স অনেকটা জমে গেছে। সে বলল, পাখি হলে ডানা মেলে উড়ে যেতাম! আপনাদের ওখানে...।

এখানেও সারা দিন বরফ পড়ছে। কিন্তু আমার মোটেই সুন্দর লাগছে না।

কেন?

ঘরে বসে ও-সব দেখতে ভাল লাগে। আমাকে কাজে যেতে হয়েছিল, বাজার করতে হল, তখন বিরক্তিকর মনে হয়।

আপনি খুব বেরসিক তো! আমিও বেরিয়েছিলাম। কাজ ছিল না, ইচ্ছে করে। চোখ একেবারে জুড়িয়ে গেল। আপনি কি রেস্টুরেন্টে খেতে যান না নিজে রান্না করেন?

রোজ রেস্টুরেন্টে খাব! অত পয়সা কোথায়? নিজেই রান্না কবি।

রাঁধতে জানেন?

ঠেলায় পড়ে শিখে নিয়েছি।

কী রাঁধেন, খিচুড়ি?

সেই খিচুড়ির কথা ভুলতে পারছেন না? খুব খারাপ খাইয়েছি, স্বীকার করছি। মাপ চাইছি।

শুধু মাপ চাইলে চলবে না। পরে এক দিন ভাল করে খাওয়াতে হবে।

নিশ্চয়ই।

আপনি নায়েগ্রা ফল্‌স দেখতে আসবেন না? দেখেননি তো আগে। এখানে সবাই বলছে, শীতকালে নায়েগ্রার একেবারে অন্য রূপ। এটাই বেশি ভাল।

সময় করে যেতে হবে। শীত তো এখন অনেক দিন চলেবে।

তাড়াতাড়ি আসুন। কয়েকটা সহজ রান্না শিখিয়ে দেব! এর মধ্যে কী কী শিখেছেন? ভাত?

বাঃ, ভাত ছাড়া রোজ রোজ রুটি খাওয়া যায় নাকি?

ফ্যান গালতে জানেন?

ইন্‌সট্যান্ট রাইস পাওয়া যায়, ফ্যান গালতে হয় না। ডাল রাঁধতেও পারি। আর মাছ ভাজা, ডাব্‌ল ডিমের ওমলেট।

ওমলেট? কলকাতায় ওমলেট যেখানেই খেয়েছি, যাচ্ছেতাই! আপনারা ওমলেট বানাতে জানেন না। শুধু কয়েক টুকরো পেঁয়াজ আর কাঁচা মরিচ দিলেই বুঝি ওমলেট হয়? ওমলেট কী করে সুন্দর, নরম হয় বলুন তো? কী দিতে হয়?

আমার তো নরমই হয়!

হতেই পারে না। ডিম ভাঙার পর তাকে এক চামচ দুধ দিতে হয়। তারপর ভাল করে ফ্যাটাতে হয়। দেখবেন কী-রকম ফুলে উঠবে।

আচ্ছা, পরীক্ষা করে দেখব।

এই সব অতি সাধারণ কথাবার্তাতেই কেটে গেল আধ ঘণ্টা।

ফোনটা রাখার পর অবনী ভাবল, সে রেহানার সঙ্গে কী কথা বলবে বুঝতে পারছিল না, কিন্তু এ-রকম সাধারণ কথা দিয়েই তো মানুষের সঙ্গে আলাপ চালানো যায়। কোনও ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নেই।

রেহানার কথার মধ্যে খানিকটা কৌতুক আর খানিকটা বকুনির সুর থাকে। শুনতে বেশ লাগে।

ওর কথামতো খানিকটা দুধ মিশিয়ে একটা ওমলেট বানিয়ে ফেলল। সত্যিই তো অন্য রকম।

একটা টেলিফোন পেয়েই নিঃসঙ্গতা বোধই কেটে গেল অনেকটা। অবনী কমপিউটারে কাজে বসে গেল এর পরে।

পরের সপ্তাহে স্থানীয় বাঙালিদের একটি অনুষ্ঠানে টিকিট কাটতে হল অবনীকে। পশ্চিম বাংলার বাঙালি আর বাংলাদেশিদের আলাদা গোষ্ঠী, তা অবনী লক্ষ্য করেছে। এ-রকম দু'একটা অনুষ্ঠানে তারা মিলিত হয়। বাংলাদেশিদের সংখ্যাই বেশি, বাংলা অনুষ্ঠানে তারাই বেশি উৎসাহ দেখায়। টিকিট বিক্রির টাকা পাঠানো হবে বাংলাদেশের বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য।

এ-রকম অনুষ্ঠানে যেতেই হয়। গান-বাজনা-নাচ সবই আছে, কোনওটাই তেমন আহামরি কিছু নয়। এখানে হলভাড়া অনেক, তাই অনুষ্ঠান হচ্ছে একটা বাড়ির বেসমেন্টে, চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ জন শ্রোতা।

টিকিটের সঙ্গে খাদ্য-পানীয়ও যুক্ত। আজ আর অবনীকে রান্না করতে হবে না। অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও হল।

এদের মধ্যে একটি দম্পতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

একটা গেলাসে বিয়ার নিয়ে অবনী দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল, সাদেক নামে একটি ছেলে প্রথমে নিজে এসে যেচে আলাপ করল তার সঙ্গে। সাদেক একটি দোকানের মালিক, সে বাংলাদেশ থেকে অনেক রকম মাছ আনায়। মাছ-প্রিয় বাঙালিরা সবাই তার দোকান চেনে।

একটু পরে সে অবনীকে জিজ্ঞেস করল, আপনার সঙ্গে জহির ভাইয়ের আলাপ নেই? আসেন আসেন, পরিচয় করিয়ে দিই। জহির ভাইয়ের বাসায় আমাদের প্রায়ই আড্ডা বসে।

জহির নামের লোকটি মনে হয় ছ'ফুটের বেশি লম্বা। মাথার চুল কাঁচা-পাকা, তবে চল্লিশের বেশি বয়স নয়। দামি সুট পরা, এমনই ফর্সা রঙ যে, দাড়ি কামাবার জায়গায় গালে একটা নীলচে ছোপ পড়েছে। প্রথম দর্শনে অবনীর মনে হল, ভদ্রলোক বাঙালি নয়, পাকিস্তানি হতে পারে।

কিন্তু জহিরের মুখের ভাষা বাংলা তো বটেই, সম্ভাষণে সে সেলাম আলেকুম-এর বদলে বলল, নমস্কার। তারপর জিজ্ঞেস করল, আপনি পশ্চিম বাংলা থেকে এসেছেন? কোথায় বাড়ি, কলকাতায়?

অবনী বলল, কলকাতায় থাকি বটে, আসল বাড়ি বর্ধমানে।

জহির সহাস্যে হাত বাড়িয়ে বলল, আসুন, আসুন, তাহলে কোলাকুলি করি। আমরা দেশোয়ালি। আমার বাড়িও বর্ধমান জেলার রানিগঞ্জে।

জহিরের স্ত্রী একটু দূরে অন্যদের সঙ্গে গল্প কবছিল, তাকে ডেকে আনা হল।

জহির বলল, আমার স্ত্রী কিন্তু বাংলাদেশের মেয়ে। টাঙ্গাইলের। সীতা, এই ভদ্রলোক আমাদের বর্ধমান জেলার লোক। এক দিন বাড়িতে ডাকো।

মহিলাটি নমস্কার করে বলল, নিশ্চয়ই, আসুন এক দিন। আপনাকে আগে দেখিনি। নতুন এসেছেন?

সাদেক বলল, আমি পর্যন্ত চিনি না, এমন বাংগালি আছে? দাদার কাছে শুনলাম, জ্যাকসন স্ট্রিটে একলা একলা থাকেন।

বাঙালি মুসলমান মেয়েদের বীথি, কাজল, নীলা এই ধরনের ডাকনাম থাকে। কিন্তু সীতা? ঠাকুর-দেবতার নাম বাদ দেওয়াই ওদের পক্ষে স্বাভাবিক। অবনী সীতার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রইল।

সাদেক বলল, সীতা ভাবির হাতের রান্না একবার খেলে জীবনে ভুলবেন না। সত্যি কথা বলতে কি, হিন্দুরাই মাছটা ভাল রান্না করতে জানে। আমরা আবার মাংসটা ভাল জানি।

সীতা বলল, সে কী রে, আমি মাংস ভাল রাঁধি না? গত শনিবার যে বললি —।

জহির বলল, এখানে বাঙালিরা দেখা হলেই বড় বেশি খাওয়া-দাওয়ার কথা বলে। আপনার ভাল্‌গার মনে হয় না?

অবনী চুপ করে রইল। কথাটা সত্যি। সে-ও লক্ষ্য করেছে।

জহির আবার বলল, কিছু দিন পর আপনারও অভ্যেস হয়ে যাবে। আপনিও সাদেকের দোকানে ইলিশ মাছ দেখলে বন্ধু-বান্ধবদের ফোন করে জানাবেন। বাঙালির কালচারে শিল্প-সাহিত্য না মাছ-ভাত, কোনটার টান বেশি, তা বলা শক্ত! দিনের পর দিন স্যান্ডুইচ খেতে হলে বাঙালির রস-কষ শুকিয়ে যায়।

সীতা বলল, আমার স্বামী খুব সাহেব। সপ্তাহে এক দিন মোটে ভাত খায়।

জহির বলল, শুধু শনিবার রাত্রে। শনিবার আড্ডাও হয়। এই শনিবার আপনি চলে আসুন! যারা নতুন আসে, তাদের কিছু কিছু অসুবিধে ফেস করতে হয়। সে-ব্যাপারে আমি টিপ্‌স দিতে পারি।

জহিররা থাকে সমারভিল-এ স্প্রিংফিল্ড্ স্ট্রিটে। রাস্তা চিনে যাওয়া অবনীর পক্ষে শক্ত ঠিক হল, বিপুল নামে এক জন ছাত্র তাকে তুলে নিয়ে যাবে।

ছাত্র হলেও বিপুলের অবস্থা বেশ সচ্ছল মনে হল। দেশ থেকে স্ত্রীকে আনিয়েছে, তার গাড়িটিও বেশ দামি। অনবরত সিগারেট খায়। তার স্ত্রী মৃদুলার ছোট্টখাট্টো চেহারা, কিন্তু দু'একটা কথা শুনলেই বোঝা যায়, বেশি বুদ্ধিমতী।

গাড়িতে উঠে সামান্য মামুলি আলাপের পরই বিপুল জিজ্ঞেস করল, দাদা, আপনার পদবি তো চৌধুরী। আপনি কি ব্রাহ্মণ? চৌধুরীরা তো অনেক কিছুই হয়।

অবনী কিছুটা অবাক হয়ে বলল, হ্যাঁ, ব্রাহ্মণই বটে। চৌধুবী তো খেতাব। আমাদের অরিজিনাল টাইটেল ছিল নাকি চক্রবর্তী। হঠাৎ এ-কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?

বিপুল বলল, আমরা মেদিনীপুরের লোক। আমাব টাইটেল দাস মহাপাত্র। হাফ ওড়িয়া হাফ বাঙালি বলতে পারেন। মৃদুলারা ব্রাহ্মণ। আমাদের বিযের সময খুব ঝামেলা হয়েছিল। ব্রাহ্মণরা বড্ড জ্বালায়!

অবনী বলল, আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি ব্রাহ্মণ কি না তাতে কী আসে যায়? ব্রাহ্মণরা তোমার বিয়ের সময় জ্বালিয়েছিল বলে কি তুমি আমাকে গাড়িতে নেবে না?

বিপুল বলল, তা বলছি না। হঠাৎ কথাটা মনে এল। ব্রাহ্মণরা জাত-পাত নিয়ে এখনও এত মাথা ঘামায়, আপনাদের মতো শিক্ষিত লোকরা এটা বদলাতে পারেন না?

অবনী বলল, একটু একটু বদলেছে। অনেকে এখন সব মানে না।

বিপুল বলল, গোটা হিন্দু ধর্মের মধ্যেই এত জাত, এত ভেদাভেদ, এতে কত যে ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, সেটা কেন আমরা বুঝি না! কেন সব হিন্দু সমান হবে না?

অবনী বলল, বিদ্যাসাগর বা বিবেকানন্দর মতো বড় মাপের কোনও মানুষ তো আমাদের মধ্যে এখন নেই। ওই রকম কেউই বদলাতে পারেন। তোমার-আমার কথা কে শুনবে? তবে কিছু না-কিছু জাতিভেদ বা আলাদা সম্প্রদায় তো সব ধর্মেই আছে। মুসলমানদের মধ্যে শিয়া-সুন্নি নেই? তারপর কাদিয়ানি, আরও কী সব যেন আছে। তাদের মধ্যে মারামাবিও হয। আয়ারল্যান্ডে ক্যাথলিক-প্রেটেস্টান্টদের মধ্যে মারামারি হয় না? এই আমেরিকাতেও অন্য ক্রিশ্চানদের চেয়ে অ্যাংলো স্যাক্সান প্রোটেস্টান্টদের দাপটই বেশি।

পেছনের সিট থেকে মৃদুলা বলল, আমাদের বিয়েতে আর এমন কী ঝামেলা হয়েছে! আপনি জহির সাহেব আর সীতা বউদির রোমান্সের কথা শুনেছেন? আমেরিকার মতো জায়গাতেও তা নিয়ে তুলকালাম হয়েছিল।

অবনী বলল, আমি কিছু শুনিনি, এই তো সদ্য আলাপ হল।

মৃদুলা বলল, সীতাবউদিরা বাংলাদেশের হিন্দু। তার ওপর ব্রাহ্মণ। অসম্ভব গোঁড়া। গীতাবউদির মুখেই শুনেছি, ঢাকায় পড়াশুনোর সময় একটি কায়স্থ ছেলে ওঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, বাড়ির লোক রাজি হয়নি। তারপর তো উনি চলে এলেন ব্লুমিংটন, ইন্ডিয়ানা-তে। সেখানে ওঁর এক মামা থাকেন, তাঁর বাড়িতে থেকেই সীতাবউদি পড়াশুনো করতেন। জহির সাহেবও পড়াশুনোতে ভাল, ইঞ্জিনিয়ার, এখন অবশ্য এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের ব্যবসা করেন। দু'জনের আলাপ, তারপর প্রেম। বিয়ের কথা উঠতেই দুই পরিবারের ঘোর আপত্তি। জহির সাহেবের বাবা-মা, ভাই সবাই এ-দেশে।

জহিরের বাড়ি থেকেও আপত্তি করল? সাধারণত ওরা এত কিছু মানে না।

ভুল ধারণা। ওরা নাকি বনেদি বংশ। ওদের বাড়িতে শিয়া সম্প্রদায়ের কোনও মেয়েও বউ হয়ে আসতে পারে না। হিন্দু মেয়ে তো দূরের কথা। জহির সাহেবের মা কান্নাকাটি করে আত্মহত্যার ভয় দেখিয়েছিলেন। আর সীতাবউদির মামা তো আরও কেলেঙ্কারি করেছিলেন, তিনি ভাগ্নিকে ঘরে আটকে রেখেছিলেন তালাচাবি দিয়ে।

সীতা তখন অ্যাডাল্ট নয়?

অবশ্যই অ্যাডাল্ট, ছাব্বিশ বছর বয়স।

তাহলে, এ-ভাবে আটকে রাখা সম্পূর্ণ বে-আইনি। পুলিশ জানতে পারলে —।

জহির সাহেব তারপর কী করলেন, শুনুন না। নিজের বাড়িতে বললেন, ঠিক আছে, ওই হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করব না। আর সীতাবউদির মামার বিরুদ্ধে পুলিশেও খবর দিলেন না। যেন খুব উদাসীন হয়ে গেলেন। আসলে তক্কে তক্কে থাকতেন। সীতাবউদির মামা কখন বাড়িতে থাকেন না, সে খবর নিতেন। এক দিন সেই রকম সময়ে ও-বাড়ির জানলা ভেঙে সীতাবউদিকে বার করে আনলেন। তারপর দু'জনে মিলে চম্পট।

এ যে রীতিমতো সীতা উদ্ধার কাহিনি!

হ্যাঁ, কিন্তু এরপর দু'জনের আর পাত্তাই পাওয়া গেল না। দু'পক্ষ থেকেই প্রচুর খোঁজাখুঁজি, তারপর কান্নাকাটি। সাড়ে চার মাস ওঁরা একেবারে উধাও! প্রকাশ্যে উদয় হলেন এই বোস্টন শহরে, এর মধ্যে রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়ে গেছে। তত দিনে দু'পক্ষই ঠাণ্ডা!

বিপুল বলল, পুরো ঠাণ্ডা নয়। জহির সাহেবের বাবা এখনও ছেলেব সঙ্গে কথা বলেন না।

মৃদুলা বলল, কথা বলেন না, কিন্তু ছেলের টাকা তো নিতে হয়।

বিপুল বলল, সাত-আট বছর হয়ে গেল, ওদের দু'জনের প্রেমকাহিনি এখনও অনেকে বলাবলি করে। এমন একটা চমৎকার কাপ্‌ল খুব কম দেখা যায়।

জহির-সীতারা ফ্ল্যাটে থাকেন না, নিজস্ব বাড়ি। সামনে লন, পেছনে সুইমিং পুল। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা প্রায় কুড়ি-বাইশ জন। প্রতি শনিবারই নাকি এ-রকম হয়। প্রচুর খাদ্য-পানীয়র ব্যবস্থা।

অবনীর একটা ব্যাপার বেশ পছন্দ হল।

সিরাজুল সাহেবরা বর্ধমানের বাড়িতে আসার আগে আর কোনও বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় হয়নি। পাকিস্তানি আমলে সে খুব ছোট ছিল, বাংলাদেশ সৃষ্টি হবার পরেও ও-দিকে কখনও সে যেতে আগ্রহী হয়নি। কাগজে মাঝে মাঝে কিছু খবর পড়েছে, তাহলেও ও-দিককার বৃহত্তর বাঙালি জাতি সম্পর্কে তার বিশেষ কিছু ধারণা ছিল না। কাগজে তো ঝড়, বন্যা বা মাবামারির খবরই বেশি থাকে। বাংলাদেশ থেকে যারা কলকাতায় আসে, তারাও তো বাজার-টাজার করে ফিরে যায়, ক'টা পরিবারের সঙ্গে মেলামেশা হয় তাদের?

কিন্তু এখানে এসে সে দেখছে, আলাদা আলাদা গোষ্ঠী হলেও, দু'দিকের বাঙালিদের মধ্যে পারিবারিক যোগাযোগও আছে যথেষ্ট। এ বাড়িতে এত জন অতিথির মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের কোনও প্রশ্নই নেই যেন। শুধু নাম শুনে বোঝা যায়, আর তফাৎ নেই কিছু।

জহির-সীতার মতো মিশ্র বিবাহও দুর্লভ নয় মোটেই।

অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বার বার অন্য মনস্ক হয়ে যেতে লাগল অবনী।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রায় বারোটা হয়ে গেল।

তার অ্যাপার্টমেন্টটা আজ এত ঠাণ্ডা কেন? সেন্ট্রাল হিটিং চালায়নি? বিছানাটা ঠাণ্ডায় স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে। সে আর একটা রুম হিটার চালিয়ে দিল।

হঠাৎ খুব ইচ্ছে করল রেহানাকে ফোন করতে। এত রাতে কি ফোন করা উচিত? উইক এন্ডে সকলেরই বেশি রাত হয়। তাহলেও...।

ফোনের আনসারিং মেশিনে লাল আলো টিপ টিপ করছে। অর্থাৎ জমে আছে বার্তা। অবনী বোতাম টিপল।

প্রথম বার্তাটা তার বন্ধু অতীনের। সে আগামী মাসে দেশে যাচ্ছে। দ্বিতীয়টি এক অধ্যাপকের, তিনিও ভারতে যাচ্ছেন, ব্যাঙ্গালোরে বক্তৃতার আমন্ত্রণ পেয়েছেন, ভারত সম্পর্কে দুই-একটা বই পড়তে চান। তৃতীয় বার্তাটা...।

আবার অবনী কেঁপে উঠল। রেহানার কণ্ঠস্বর।

এই নিয়ে রেহানা তৃতীয় বার তাকে ফোন করল। অবনী নিজে থেকে করেনি একবারও। এটা কি চূড়ান্ত অভদ্রতা নয়?

মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে, কিন্তু প্রথম কী কথা দিয়ে শুরু করবে, সেটাই ঠিক করতে পারেনি।

রেহানা ফোন নাম্বার দিয়ে রেখেছে মানে অবনীকে ফোন করতে বলা হচ্ছে। জরুরি কোনও ব্যাপার আছে? অবনীর সঙ্গে রেহানার এমন কী জরুরি কথা থাকতে পারে?

এখন, না কাল সকালে?

রেহানা অন্যের বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকে, এত রাত্রে সেখানে ফোন করা চলে না। তবু অবনী কৌতূহল দমন করতে পারছে না।

দু'বার বাজতেই রেহানার গলা পাওয়া গেল।

আমি অবনী। তুমি ফোন করেছিলে?

করেছিলাম তো। মেসেজ পাননি?

হ্যাঁ, সেটা শুনেই... এত রাত্রে ফোন করা আমার উচিত হয়নি।

রাত্রে কেন, দিনেও তো আপনি ফোন করেন না।

দিনেরবেলা ব্যস্ত থাকি, তুমি নিজে এই ক'বার ফোন করলে... ও আই অ্যাম সরি, তুমি বলে ফেলেছি, আজ খানিকটা হুইস্কি খেয়ে ফেলেছি তো।

শুনুন, আমি ফোন করেছিলাম আমার নতুন নাম্বারটা জানাবার জন্য। আজই আমি নিজের অ্যাপার্টমেন্টে এসেছি, এখানে ফোন আছে।

তাই নাকি? আজই নতুন অ্যাপার্টমেন্টে... কী-রকম, কারুর সঙ্গে শেয়ার করতে হবে?

না। আর একটা কথাও জানাবার ছিল। মুসাফির, মানে সিরাজুল চৌধুরী আগামী মাসে চেক আপ করাবার জন্য এ দেশে আসছেন। উনি আপনাকে জানাতে বললেন। উনি যখনই ফোন করেন, আপনার কথা জিজ্ঞেস করেন।

এ-দেশে আসছেন? খবর পেলে নিশ্চয়ই আমি দেখা করব।

খবর পাবেন। ঠিক আছে, এবার রাখি? খোদা হাফেজ!

হঠাৎ-ই যেন রেখে দিল রেহানা। আজ তার কথার মধ্যে কৌতুক ছিল না, কেমন যেন গম্ভীর গম্ভীর। ওকে তুমি বলে ফেলাটা পছন্দ করেনি? বলল না তো, হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমিই বলবেন!

ভুল হয়েছে, তুমি বলাটা ভুল হয়েছে। রেহানা বয়সে এমন কিছু ছোট নয়!

নতুন অ্যাপার্টমেন্টে, নতুন ফোন নাম্বার সবাইকে জানাতে ইচ্ছে করে। রেহানা নিশ্চয়ই অনেককেই জানিয়েছে, তাদের মধ্যে অবনী এক জন। জরুরি কোনও খবরও ছিল না।

আর একবার ফোন করে তুমি বলার জন্য মাপ চাইবে?

অবনী টেলিফোনটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল।

॥ ৬॥

একটা অ্যালার্ম ঘড়ি কিনব কিনব করেও কেনা হয়নি। এক-এক দিন সকালে ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে যায়।

বড় কাচের জানলাটার পর্দা খোলাই রাখে অবনী, যাতে সকালের রোদ এসে চোখে পড়ে কিন্তু হায়, এ-দেশে শীতকালে সূর্যই যে দুর্লভ। প্রায়ই সারা দিন আকাশ থমথমে থাকে।

হঠাৎ যে-দিন ঝকঝকে রোদ ওঠে, সে-দিন দলে দলে মানুষজন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। গায়ে রোদ মাখাটা যেন উৎসবের মতো।

আশ্চর্য ব্যাপার, যখন বরফ পড়ে, তখন খুব বেশি শীত থাকে না। রোদ্দুর উঠলেই শীত লাগে বেশি।

আজ ঘুম ভেঙেছে, তবু বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না।

জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সমুদ্র রঙের আকাশ। একটু দূরে পাশাপাশি দুটো উইপিং উইলো গাছ। শীতকালে একেবারেই পাখি দেখা যায় না। বাতাসে কী যেন ভাসছে।

উইক ডেজ আর উইক এন্ডে অনেক তফাৎ। উইক ডেজ মানেই দায়িত্ব আর ব্যস্ততা। সব কিছুই নিয়মে বাঁধা। ঘুম থেকে উঠেই জল গরম করতে দেওয়া। এক কাপ কফি খেয়েই বাথরুমে দৌড়। তারপর দাড়ি কামানো ও স্নান। শিট, শেভ অ্যান্ড শাওয়ার যাকে বলে। তারপর পোশাক পরে নিতে নিতে স্যান্ডুইচ বানানো। এক ফাঁকে হুড়মুড়িয়ে নিচে গিয়ে ডাকবাক্স খুলে দেখে আসা, কোনও চিঠি এসেছে কি না। স্যান্ডুইচে কামড় দিতে দিতে আর এক কাপ কফিতে চুমুক। ঘড়ির দিকে চোখ। কফি শেষ না হতেই ছুট ছুট, রাস্তায় সবাই একরকম।

এ-দেশে কেউ ধীর লয়ে হাঁটে না, সবাই ছোটে। সকালবেলা মনে হয়, পুরো দেশটাই ছুটছে।

আজ অফিস যেতে ভাল লাগছে না। কিন্তু যেতেই হবে, হঠাৎ হঠাৎ ছুটি নেবার বিলাসিতা এ-দেশে চলে না।

ঘড়িতে সাতটা দশ, তবু এখনও উঠছে না কেন অবনী? সে ভাবছে, আচ্ছা, আরও দশ মিনিট যাক।

বারো মিনিট বাদে অবনী কম্বলটা সরিয়ে উঠে বসল। মাথাটা প্রচণ্ড ভারি লাগছে, দপ দপ করছে কপালের দু'পাশের শিরা। জ্বর জ্বর লাগছে।

বাথরুমের দরজায় একটা লম্বা আয়না লাগানো আছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল, চোখ দুটো বেশ লালচে। তাহলে কি হে ফিভার হল নাকি? আমাদের দেশের মতো এখানেও নানা রকম জ্বল হয়, তার একটার নামে হে ফিভার। কোনও কোনও ফুলের রেণু থেকে নাকি হয়।

আজ শুক্রবার, আজ তো কাজে যেতেই হবে। কাল-পরশু ছুটি।

অতি কষ্টে তৈরি হয়ে নিল অবনী। একেবারেই ইচ্ছে করছে না, তবু না গিয়ে উপায় নেই। টিউব ট্রেনে এই সময়টায় দারুণ ভিড় হয়। গোটা রাস্তাটাই দাঁড়িয়ে যেতে হল অবনীকে।

বাড়ি ফিরতে ফিতে সাড়টা বেজে গেল।

টিভিটা খুলতেই শুনল আবহাওয়ার সতর্কবাণী। এর আগের তিন দিন পরিষ্কার আকাশ ছিল। আজ সন্ধে থেকে আবার খুব তুষারপাত শুরু হবে। তুষারঝড় হতে পারে। বিমানবন্দর বন্ধ করে দিতে হবে হয়তো। ট্রেনও চলবে না।

অবনী জানলার কাছে এসে উঁকি মেরে দেখল, এখন পর্যন্ত তুষারপাতের কোনও চিহ্ন নেই।

জ্বর একটুও কমেনি। দুটো অ্যাসপিরিন খেয়ে শুয়ে পড়তে হবে। তার আগে কিছু খাদ্য পেটে যাওয়া দরকার। খিদেও পেয়েছে।

ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে অবনী শুধু খানিকটা সুপ আর একটা হটডগ খেয়েছে দুপুরে। তখন খিদে ছিল না। এ-দেশে আমেরিকানরা সন্ধে সাড়ে ছ'টা-সাতটার মধ্যে ডিনার সেরে নেয়।

যাঃ, বাড়িতে যে কিছুই নেই। শুক্রবার সন্ধেবেলায় ফেরার পথে অবনী বাজার করে। আজ সে-কথা মনেই পড়েনি। মাছ-মাংস সব শেষ। ফ্রিজ একেবারে খালি, শুধু রয়েছে কয়েকটা ডিম।

চাল আর ডাল আছে অবশ্য। ডাল-ভাতের সঙ্গে ডিমভাজা খেয়ে নেওয়া যেতে পারে।

এই অবস্থায় রান্না করতে কারুর ইচ্ছে করে? মাঝে মাঝে রেস্তোরাঁতেও খেতে যায় অবনী, আজ আর বেরুবার প্রশ্নই ওঠে না। আহা, আজ যদি কেউ তাকে রান্না করে খাওয়াত!

খানিকক্ষণ শুয়ে রইল অবনী। তারপর একবার চোখ বুজে আসতেই উঠে পড়ল ধড়ফড় করে। একেবারে ঘুমিয়ে পড়লে আর কিছুই খাওয়াই হবে না।

রান্নাঘরে এসে একটা বড় সসপ্যানে চাল-ডাল মিশিয়ে ফেলল। আলাদা ডাল-ভাত রান্নার কী দরকার! খিচুড়ি খেলেই হয়। ডিমও ভাজবে না, ওর মধ্যে সেদ্ধ করতে ফেলে দেবে। ইস, দু'একটা আলুও যদি থাকত! রয়ে গেছে শুধু একটু বাঁধাকপি। এটাও খিচুড়িতে মিশিয়ে দিলে কেমন হয়?

খিচুড়ি চাপিয়ে দিয়ে অবনী টিভি'র সামনে বসল।

অফিসের কিছু জরুরি কাজ বাড়িতে নিয়ে এসেছে, এখন আর তাতে মন বসানো সম্ভব নয়। কাল দেখা যাবে।

অবনী বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করে, তাকে একটা ছোট ঘর দেওয়া হয়েছে, সেটাকে অফিস বলে। তাকে পড়াতেও হয়। ভাগ্যিস কাল-পরশু ছুটি।

টিভি'র দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু দেখছে না। মন চলে গেছে দেশে। এখানে রাত, কলকাতায় এখন সকাল। নভেম্বরের শেষে ওখানে নরম নরম শীত, একটা পাতলা সোয়েটার গায় দিলেই চলে। এখানকার মতো গাদা গাদা গরম পোশাক পরতে হয় না। রোজ রোজ গেঞ্জি, জামা, তার ওপরে সোয়েটার, জ্যাকেট, ওভারকোট পরতে পরতে বিরক্তি লেগে যায়।

খিচুড়িটা ফুটছে। এই রে, তলায় লেগে যেতে পারে। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে স্টোভ বন্ধ করতে যেতেই টেলিফোন বেজে উঠল।

একটি অপরিচিত পুরুষকণ্ঠ প্রথমে ইংরিজিতে বলল, কুড আই স্পিক টু মিস্টার অবনী চৌধুরী?

অবনী ইয়েস স্পিকিং বলতেই লোকটি বাংলায় বলল, আমার নাম আনোয়ার হোসেন, আপনি আমাকে চিনবেন না। আমি লস অ্যাঞ্জেলিসে থাকি। তবে আমার স্ত্রী রেহানার সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছে।

অবনী সঙ্গে সঙ্গে বলল, ও হ্যাঁ। আপনার কথাও শুনেছি।

আমরা আজ সকালেই এসেছি, আমার বড় ভাই এখানে থাকেন, তাঁর মেয়ের বিয়ে আগামী কাল।

এখানে, মানে, বোস্টনে এসেছেন?

জি। আমরা শপিং করতে বেরিয়েছিলাম, এখন আপনার বাড়ির কাছেই আছি। আপনি কি সন্ধেবেলা ফ্রি আছেন?

ফ্রি, হ্যাঁ, বাড়িতেই আছি।

আমরা ভাবছিলাম, আপনার যদি অসুবিধা না হয়, কয়েক মিনিটের জন্য আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারি। কাল আর সময় পাওয়া যাবে না। পরশুই আমাদের ফিরে যেতে হবে।

না না, কোনও অসুবিধে নেই, চলে আসুন। অবশ্যই চলে আসুন। আমরা দরজার কোড নাম্বারটা লিখে নিন।

ঘরদোর সবই অগোছালো হয়ে আছে। কোনও রকমে তাড়াহুড়ো করে একটা ভদ্র চেহারা দেওয়া হল।

এই রে, ওদের কী খেতে দেওয়া হবে? চা, কফি ছাড়া কিছুই নেই। কয়েক মিনিটের জন্য আসছে বলল, নিশ্চয়ই কিছু খেতেই চাইবে না। বিয়েবাড়ির ব্যস্ততা আছে।

খিচুড়িটা ঢাকা দিয়ে রাখল অবনী। এত গরম অবস্থায় ফ্রিজেও ঢোকানো যাবে না।

সাত-আট মিনিটের মধ্যে ওরা এসে পড়ল।

আনোয়ারকে দেখলেই বোঝা যায় বেশ শক্তসমর্থ পুরষ। মেদহীন শরীর, মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল। উজ্জ্বল দু'টি চোখ। গায়ের রঙ কালো হলেও চকচকে ভাব আছে।

রেহানাকে প্যান্ট-কোট পরা অবস্থায় কখনও দেখেনি অবনী। এ-দেশে এসে এর মধ্যেই আরও ফর্সা হয়ে গেছে নাকি?

স্বামী-স্ত্রী দু'জনের মুখেই বেশ একটা প্রফুল্ল ভাব আছে।

আনোয়ার অবনীর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, গুড ইভিনিং, কেমন আছেন? আপনার কথা সব শুনেছি। নারায়ণগঞ্জে যে-বাড়িটা এক কালে আপনাদের ছিল, সেই বাড়িতেই আমার বিয়ে হয়েছে গত বছর। সেই হিসেবে, আমি আপনাদের বাড়ির জামাই, তাই না?

বলেই হো-হো করে হেসে উঠল আনোয়াব।

অবনীও হেসে বলল, তাই তো হয়। বসুন, বসুন, কোট খুলে ফেলুন।

রেহানা বলল, বেশিক্ষণ বসব না। হঠাৎ ঝড় উঠেছে। আপনার বাসাটা দেখতে এলাম। ফোনে কথা বলেছি।

আনোয়ার বলল, ঘণ্টা খানেক বসতে পারি? কী মশাই, খুব ব্যস্ত না তো?

অবনী বলল, না না, আমার কোনও কাজ নেই এখন।

আনোয়ার ওভারকোটের পকেট থেকে একটা স্কচের বোতল বার করে বলল, একটুখানি পান করব। আমার বড় ভাইয়ের বাসায় এ-সব চলে না। ওদের গাড়ি আমাদের এখানে নামিয়ে দিয়ে গেল, আমরা একটা ট্যাক্সি ডেকে চলে যাব। আপনার এতে আপত্তি নেই আশা করি?

এ-দেশে এসে অবনী একটু-আধটু হুইস্কি বা বিয়ার পান করে। নেশা নেই। একা খায় না, বাড়িতে বোতলও রাখে না।

আনোয়ারের সঙ্গে তাকেও খেতে হবে। গায় এত জ্বর, তাছাড়া পেট একেবারে খালি, এই অবস্থায় কি খাওয়া উচিত?

তবু অবনী দুটো গেলাস এনে, রেহানাকে জিজ্ঞেস করল, আপনাকে কী দেব? আনফরচুনেটলি বাড়িতে কোল্ড ড্রিঙ্কস কিছু নেই, চা কিংবা কফি বানিয়ে দেব?

রেহানা জিজ্ঞেস করল, আপনার চোখে কী হয়েছে?

অবনী বলল, চোখে? কিছু হয়নি তো?

রেহানা বলল, চক্ষু দুটো এত লাল?

গেলাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে আনোয়ার মুখ তুলে অবনীকে দেখে বলল, ইউ লুক সিক। আপনার কি শরীর খারাপ নাকি?

অবনী বলল, না না, কিছু হয়নি।

আনোয়ার অবনীর হাতটা চেপে ধরে বলল, বলেন কী মশাই, আপনার তো জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। মিঠু, তুমি দেখো তো!

রেহানা হাত রাখল অবনীর কপালে।

তারপর আস্তে আস্তে বলল, অন্তত একশো চার-পাঁচ জ্বর।

অবনী বলল, ও কিছু না, এমনি একটু জ্বর হয়েছে। ঠাণ্ডা লেগেছে বোধহয়।

আনোয়ার বলল, মেয়েদের চোখ ফাঁকি দিতে পারবেন না। মিঠু আপনার চোখ দেখেই বুঝেছে।

রেহানা বলল, এই জ্বর নিয়ে আপনি হুইস্কি খেতে যাচ্ছিলেন? খরদার খাবের না। ডাক্তার দেখিয়েছেন?

অবনী বলল, এমনিই সাধারণ জ্বর, আজই হয়েছে, অ্যাসপিরিন খেলেই সেরে যাবে।

আনোয়ার স্ত্রীকে বলল, মিঠু, ব্যস্ত হয়ো না। পুরুষমানুষরা অত জ্বর-টর গ্রাহ্য করে না। আর অ্যাসপিরিন এখন ম্যাজিক ড্রাগ, সব অসুখেই কাজে লাগে।

অবনী রেহানাকে বলল, আপনি কী খাবেন, আমি চা-কফি করে দিই?

রেহানা বলল, আপনাকে কিছু করতে হবে না। এক কাপ চা খেতে পারি, কোথায় আছে বলুন আমি বানিয়ে নিচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে জানলায় গুম গুম শব্দ হল, সমস্ত বাড়িটা যেন কেঁপে উঠল। প্রবল বেগে আছড়ে পড়েছে ঝড়।

রেহানা বলল, ঝড় বেড়ে গেল। এরপর বাড়ি যাব কী করে? চলো, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি!

আনোয়ার বলল, এর মধ্যে কেউ বেরোয়? ব্যস্ত হয়ো না। ঝড় একটু কমুক।

কিন্তু সে-ঝড় কমার আর কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। দারুণ দাপাদাপি করছে প্রকৃতি। টিভিতে শোনা যাচ্ছে, এর মধ্যেই ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে গেছে। আরও আট-ন'ঘণ্টা এ-রকম ঝড় ও তুষারপাত চলবে। সমস্ত ট্রেন আর বাস বন্ধ হয়ে গেছে, রাস্তায় অনেক গাড়ি উলটে গেছে।

এখানে ফোন করলেই ট্যাক্সি আসে। আজ যতবার ফোন করা হল, ততবারই এক উত্তর, সরি, নট অ্যাভেইলেবল।

একটা সময় বোঝা গেল, আজ আর ওরা দু'জন ফিরতে পারবে না। এই অবস্থায় রাস্তায় বেরুনো খুবই বিপজ্জনক। আনোয়ারের দাদার বাড়িতে ফোন করা হলে তাঁরাও বললেন, না ফিরতে।

অবনী দুর্বল গলায় বলল, আমার ছোট ঘরটায় যে-সোফাটি আছে, সেটা টানলে বিছানা হয়ে যায়। আপনাদের খুবই অসুবিধে হবে যদিও...।

আনোয়ার বলল, আরে মশাই, একটা রাত তো! এই দুর্যোগের মধ্যে গাছতলায় যে থাকিনি, তাই তো যথেষ্ট। খাবারদাবার কী আছে বাড়িতে?

রেহানা সসপ্যানের ঢাকনাটা তুলে প্রায় আঁতকে উঠে বলল, অ্যাঁ? আবার খিচুড়ি?

তারপর সে হাসিতে ভেঙে পড়ল।

আনোয়ার হাসির কারণটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, অত হাসির কী আছে? খিচুড়ি খারাপ কী? ভাগাভাগি করে খাওয়া যাবে।

হাসি থামিয়ে রেহানা বলল, ফ্রিজ একেবারে খালি। আপনি এত কৃপণ কেন?

অবনীর কাচুমাচু অবস্থা দেখে আনোয়ার বলল, ব্যাচেলারদের এ-রকমই হয়, কখনও ফ্রিজ বেশি ভর্তি থাকে, কখনও একেবারে খালি। তাছাড়া, দেখছ না ভদ্দরলোকের অসুখ হয়েছে। বাজারে যেতে পারেননি।

রেহানা বলল, কয়েকটা ডিম আছে। দেখুন, আমি কী চমৎকার ওমলেট বানাতে পারি।

আনোয়ার বলল, চৌধুরীবাবু, আপনি চুপটি কবে বসে থাকুন। আপনাকে কিছু করতে হবে না। খিচুড়িটা আমি গরম করে নিচ্ছি। গরম মশল্লা আছে?

সেই খিচুড়ি আর ওমলেটেই তৃপ্তি করে খাওয়া হল। এক সময় আনোয়ার আর রেহানা শুতে চলে গেল পাশের ঘরটায়।:

আলো নিভিয়ে শুয়ে রইল অবনী। তার ঘুম আসছে না। বাইরে ঝড়ের তাণ্ডব বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে। কাগজে সে পড়েছে, এখানে মাঝে মাঝে এমন ঝড় হয় যে, গাড়ি পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে যায়। সমুদ্রের জল উঠে এসে ডুবিয়ে দেয় শহরেব রাস্তা-ঘাট।

রেহানা আর আনোযার কি ঘুমিয়ে পড়েছে এর মধ্যে? কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

আনোয়ার সম্পর্কে একটু একটু ঈর্ষা হচ্ছে ঠিকই। আবার, আনোয়ার এমনই দিলখোলা, প্রাণবন্ত মানুষ যে, তাকে পছন্দ না করে পারা যায় না।

রেহানা যে একবার তার কপালে হাত রেখেছে, তাই তো যথেষ্ট!

নারায়ণগঞ্জে রেহানাদের বাড়িতে অবনী এক রাত কাটিয়েছিল, এখানে অবনীর বাড়িতে পাকেচক্রে রেহানাকে রাত কাটাতে হল। ব্যাস, শোধবোধ হয়ে গেল। অবশ্য, এটা অবনীর নিজের বাড়ি নয়, অস্থায়ী অ্যাপার্টমেণ্ট। বর্ধমানের বাড়িটাই কি তার নিজের বাড়ি? সে-বাড়ি আগে ছিল সিরাজুল চৌধুরীদের, তারও আগে ওই জমির মালিক কে ছিল কে জানে।

নারায়ণগঞ্জে বাড়িটাও রেহানাদের নয়, তার পিসেমশাই সিরাজুল চৌধুরীদের। তার আগে ও-বাড়ি ছিল অবনীর বাবার। তারও আগে ওই জমি ছিল অন্য কারুর।

কোনও বাড়িই কি মানুষের ঠিক ঠিক নিজের বাড়ি?

সব মানুষই এই পৃথিবীর অতিথি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মায়ের চিঠির মধ্যে একটা অন্য চিঠিও এসেছে। অচেনা হাতের লেখা।

চিঠি লেখার অভ্যেস তো চলেই যাচ্ছে, হয় টেলিফোন, নয়তো ই-মেইল। টেলিফোনের চেয়েও ই-মেইল সস্তা। অবশ্য বাংলা ই-মেইল এখনও চালু হয়নি।

মায়ের সঙ্গে সপ্তাহে এক দিন কথা হয় ফোনে। তবু মা চিঠি লেখেন। মা চিঠি লিখতে ভালবাসেন। সে-চিঠির উত্তর টেলিফোনে দিলে চলবে না। প্রত্যেক চিঠিতে লেখা থাকে, উত্তর দিবি। টাইপ করে নয়, নিজের হাতে লিখে উত্তর দিবি।

মা কেন হাতে লেখা চিঠি চান, তা বুঝতে পারে অবনী।

টেলিফোনের কথা চার-পাঁচ মিনিটে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু প্রবাসী ছেলের হাতের লেখা চিঠি মা বার বার পড়েন। প্রত্যেকটা চিঠি জমিয়ে রাখেন তাঁর গয়নার বাক্সে। এর আগে অবনী একবার শ্রীলঙ্কা গিয়েছিল, সেখান থেকে দু'খানা চিঠি লিখেছিল মাকে। সে বেশ কয়েক বছর আগের কথা। সেই চিঠি দুটোও মা জমিয়ে রেখেছেন।

আমেরিকায় বসে দিনের পর দিন বাংলা কথা বলারই সুযোগ হয় না। শনি-রবিবার দেখা হয় বাঙালি বন্ধুদের সঙ্গে। বাংলায় কিছু লেখার তো প্রশ্নই নেই।

মা অবশ্য মোটামুটি ইংরেজি জানেন। ইংরেজি ডিটেকটিভ গল্পের বই পড়েন। তবু মাকে ইংরেজিতে চিঠি লেখার কোনও মানে হয় না। মাকে লেখা চিঠিতেই অবনী কোনও ক্রমে বাংলা লেখার অভ্যেসটা বজায় রাখতে পেরেছে।

কিন্তু আজ একই খামে দুটো চিঠি।

অবনী মায়ের চিঠি পড়ার আগে অন্য চিঠিটাই পড়তে গেল। তলায় নাম লেখা, নিশা।

নিশা? এই নামে তো কারুকে চেনে না অবনী!

চিঠিটা এই রকম :

অবনীদা,

আপনি আমার চিঠিটা পেয়ে নিশ্চয়ই অবাক হবেন। আমাকে নিশ্চয়ই মনে নেই আপনার। মনে থাকার কথাও নয়। আপনার মাসতুতো বোন পৃথার আমি বন্ধু, এক সঙ্গে কলেজে পড়েছি। বছর পাঁচেক আগে আমরা চার বন্ধু মিলে আপনাদের বর্ধমানের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ছিলাম দু'দিন। আপনি তখন আমাকে দেখেছেন। আমার ডাকনাম খুকু, বন্ধুরা সবাই এই নামেই ডাকে।

এবারে আসল কথায় আসি। জানি, আপনি খুবই ব্যস্ত। তবু বাধ্য হয়েই আপনাকে এই চিঠি লিখছি। আমার বিয়ে হয়েছে সাড়ে চার বছর আগে। আমার স্বামীর নাম অরূপরতন দাস। বিয়ের দু'বছর পর তিনি একটি চাকরি পেয়ে আমেরিকায় চলে যান। চাকরিব জন্য তাঁকে প্রায়ই জায়গা বদল করতে হয়। আমেরিকার বিভিন্ন শহর থেকে তাঁর চিঠি পেয়েছি। শেষ চিঠি পেয়েছি নিউ ইয়র্ক স্টেটের বাফেলো শহর থেকে। পাঁচ মাস আগে। তারপর তাঁর আর কোনও চিঠি আসেনি। ওঁর কোনও খবরই পাওয়া যাচ্ছে না। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি জীবিত নেই, শুধু ওঁর এক দাদা-বউদি আছেন, তাঁরাও কোনও খবর জানেন না। এ-জন্য আমরা দারুণ দুশ্চিন্তায় আছি। দাদা, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি লজ্জিত। ও-দেশে আমার চেনা আর কেউ নেই। আপনি যদি খোঁজখবর নিয়ে ওঁর সন্ধান পান, আমাকে জানালে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

ইতি

প্রণতা নিশা

চিঠিটা পড়ে প্রথমে খানিকটা বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে গেল অবনীর। আমেরিকা দেশটা যে কত বড় তা আমাদের দেশের অনেকেরই ধারণা নেই। আমেরিকা-কানাডা মিলিয়ে একটা মহাদেশ, এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যেতে তিন ঘন্টা সময় বদলে যায়। এখানে লক্ষ লক্ষ বাঙালি, তার মধ্যে এক জনকে খুঁজে বার করা সম্ভব? এই অরূপ দাস আবার বিভিন্ন শহরে ঘুরে বেড়ায়।

মাঝে মাঝে শোনা যায় এ-রকম কাহিনি। এক-এক জন কীর্তিমান দেশে বিয়ে করে বউকে ফেলে এসে এখানে কোনও বিড়ালাক্ষী বিধুমুখীর সঙ্গে বসবাস শুরু করে। বেচারি স্ত্রীটি কিছু জানতেও পারে না।

এ-ও সে-রকম কিছু ব্যাপার নাকি?

অবনীর ভুরু সোজা হয়ে গেল আবার। মেয়েটির মুখটা মনে করার চেষ্টা করল কয়েক মুহূর্ত। তার মাসতুতো বোন পৃথার কয়েকটি মেয়ে একবার বর্ধমানের বাড়িতে এসেছিল বটে, তাদের মধ্যে এই মেয়েটি ঠিক কোনটি তা এখন বোঝা মুশকিল। কারুরই নাম মনে নেই।

মায়ের প্রত্যেক চিঠিই ঠিক তাঁর আগের চিঠির মতো। নতুন কথা বিশেষ কিছু থাকে না। তুই কেমন আছিস, ঠিক মতো খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে তো, শরীরের যত্ন নিবি ইত্যাদি। দেশের খবর এখন আর চিঠি পড়ে জানতে হয় না। ইন্টারনেটে সব খবর পাওয়া যায়।

এবারের চিঠিতে মা নিশার কথা লিখেছেন। 'তুই একটু খোঁজখবর নিস। মেয়েটা চিন্তায়-ভাবনায় রোগা হয়ে যাচ্ছে। আমার কাছে এসে কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিল। নিশা খুব ভাল মেয়ে, ওর জন্য আমারও কষ্ট হয়। আমি যা চেয়েছিলাম, তা তো আর হল না!'

মায়ের শেষ বাক্যটির মানে কী?

হঠাৎ বিদ্যুচ্চমকের মতো একটা কথা মনে পড়ে গেল।

মা কতবার যে অবনীর বিয়ের সম্বন্ধ করতেন, তার ইয়ত্তা নেই। একবার একটি মেয়েকে বিয়ে করার জন্য খুব ঝুলোঝুলি করেছিলেন। সে পৃথারাই কোনও সহপাঠিনী। এই মেয়েটিই নয় তো? হ্যাঁ, খুব সম্ভবত এই নিশাই।

অবনী বিয়ের প্রসঙ্গ পাত্তাই দেয়নি কখনও। সেই সময় সে পিএইচডি নিয়ে ব্যস্ত ছিল খুব।

এবারে অবনীর মুখে একটা পাতলা হাসি ফুটে উঠল।

মজারই তো ব্যাপার। যে-মেয়ে তার বউ হলেও হতে পারত, সে এখন তার স্বামীকে খোঁজার জন্য অবনীর সাহায্য চাইছে।

নিশার স্বামী অরূপরতন দাস শেষ চিঠি লিখেছিল বাফেলো থেকে। বাফেলোতে গিয়ে তার খোঁজখবর করা অবনীর পক্ষে সম্ভব নয়। তার এখন দারুণ কাজ। পোস্ট ডক্টরেট করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে এখন পড়াতেও হচ্ছে। এক দিনও ছুটি পাবার উপায় নেই।

চেনাশুনোর মধ্যে একমাত্র রেহানা থাকে বাফেলোতে। কয়েক মাসের মধ্যেই ও চলে যাবে ইস্ট কোস্টে। ওর স্বামীর সঙ্গে থাকতে পারবে এক শহরে। এখন ওরা দু'জনে দুই প্রান্তে, টেলিফোনে খরচ হয় প্রচুর।

রেহানাকে তো আর বলা যায় না, তুমি অরূপরতন দাসকে খুঁজে বার করো!

একটা বিয়ারের ক্যান খুলে টিভির সামনে বসল অবনী। এ-দেশে এসে নিজের অজান্তেই টিভির নেশা হয়ে গেছে তার। কয়েকটা বিশেষ সোপ-সিরিয়াল না দেখলে ভাত হজম হয় না। এক্ষুনি শুরু হবে খবর। অনেকগুলো চ্যানেলেই খবর শোনা যায়, কিন্তু সি বি এস-এ পিটার ফিঞ্চের খবরই বেশি ভাল লাগে অবনীর। এটাও একটা নেশা।

আজ আর রান্নাবান্নার ঝামেলা নেই। কালকের অনেকখানি মাংস রয়ে গেছে। সেটা গরম করে পাঁউরুটি দিয়ে খেয়ে নিলেই হবে।

ফোনটা বেজে উঠতেই টিভি'র আওয়াজ কমিয়ে দিল অবনী।

কী করছিলেন? ব্যস্ত?

রেহানার গলা।

অবনী বলল, একেই বলে টেলিপ্যাথি। আমি একটু আগেই তোমার কথা ভাবছিলাম।

ঝির ঝির করে হেসে উঠল রেহানা। হাসতে হাসতে বলল, জানি, কথাটা মোটেই সত্যি নয়। তবু শুনতে ভাল লাগে। একে বলে মধুর মিথ্যে। আপনি বেশ শিখে গেছেন তো।

রেহানা আর তার স্বামী এখানে এক রাত থেকে যাবার পর ওদের সঙ্গে সম্পর্কটা অনেক স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আনোয়ারই জমিয়ে তুলেছিল। এখন বেশ স্বচ্ছন্দে ইয়ার্কি-ঠাট্টা করা যায়। আনোয়ারও ফোন করে মাঝে মাঝে।

অবনী বলল, না, এখনও ভাল করে শিখিনি। যা বললাম, সেটা কিন্তু সত্যি।

রেহানা বলল, সত্যি? তাহলে তো সেটা মোটেই ভাল কথা নয়। সন্ধ্যেবেলা এক জন বিবাহিতা মহিলাকে ধ্যান করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এর মধ্যে কোনও গার্ল ফ্রেন্ড জোটাতে পারলেন না?

অবনী বলল, আমার সে-এলেম নেই। মেয়েদের সঙ্গে ভাল করে কথাই বলতে পারি না। তুমি তো কারুর সঙ্গে আলাপ করিয়েও দিলে না!

আমি এত দূর থেকে কী করে আলাপ করাব? আপনি তো জহির সাহেবের আড্ডায় যান, ওখানে অনেক মেয়ে আসে শুনেছি। কারুর সঙ্গে ভাব জমাতে পারলেন না?

দু'এক জনের সঙ্গে একটু একটু ভাব হয়। তার পরই অন্য কেউ তাদের নিয়ে চলে যায়। আমি সকলের সঙ্গেই কমপিটিশানে হেরে যাই।

আহা রে, কী দুঃখের কথা! এ-দেশে কারুকেই তো একা থাকতে দেখি না। একা থাকলেই নাকি ডিপ্রেশান হয়। আপনি এক কাজ করুন, দেশে গিয়ে একটি শান্ত-শিষ্ট মেয়েকে বিয়ে করে আনুন!

কিন্তু আমি যে এক সময় প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছি, সম্বন্ধ-করা বিয়েতে কখনও রাজি হব না!

সে-প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেলুন। আপনার দ্বারা নিজে নিজে বিয়ে করা কোনও দিন সম্ভব হবে না। সে আমি বুঝে গেছি।

তুমি এর মধ্যে এতখানি বুঝে ফেলেছ? যাকগে, তুমি ফোন করলে... বিশেষ কোনও কারণ আছে কী?

বিনা কারণে বুঝি ফোন করা যায় না? মানুষ মানুষের খবব নেয় না? আপনি তো ভুলেও কখনও নিজেব থেকে ফোন করেন না।

আমার অভ্যেস নেই। মনে মনে ভাবি, কিন্তু ফোন আব করা হয়ে ওঠে না।

মনে মনে ভাবলে লোকে জানবে কী কবে? টেলিপ্যাথি?

তা-ও তো হয়। এই তো আমি তোমার কথা চিন্তা করছিলাম, অমনি তুমি ফোন করলে!

এবার বলুন, কেন আমার কথা চিন্তা করছিলেন?

সেটা শুনলে তুমি বোধহয় রেগে যাবে।

রেগে যাব? কেন?

মানে ব্যাপারটা অতি সাধারণ। এক জন একটা চিঠিতে বাফেলো শহরের কথা লিখেছে। বাফেলো নামটা দেখেই মনে পড়ল তোমার কথা। কারণ, ওখানে শুধু তোমাকেই চিনি!

কোয়াইট ওবভিয়াস। আমার সামনে যদি কেউ বর্ধমান শব্দটা উচ্চারণ করে, আপনার কথাই মনে পড়বে আগে। একে বলে অ্যাসোসিয়েশান! কী লিখেছে বাফেলোর কথা?

সেখানে এক জন থাকে। রেহানা, তুমি কি বাই এনি চান্স ওখানকার অরূপরতন দাস নামে কারুকে চেনো?

ভদ্দরলোক কি গান করেন?

তা আমি জানি না। ইন ফ্যাক্ট, আমি ভদ্রলোককে কখনও দেখিনি। চিনি না। আমার মা এর সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে বলেছেন।

এখানে রফিক নামে আমাদের নারায়ণগঞ্জের একটি ছেলে থাকে। তার ওখানে প্রায়ই গান-বাজনা হয়। সেখানে কলকাতার এক ভদ্রলোক এক দিন অনেকগুলি গান শোনালেন, বেশ ভাল গান করেন, নামটা বোধহয় অরূপ না অপূর্ব কী যেন ঠিক মনে নেই!

তাহলে তুমি কি একবার ওই রফিককে জিজ্ঞেস করবে, সেই গায়কটির নাম অরূপরতন কি না, আর সে এখনও বাফেলোতে আছে কি না? যদি তোমার খুব অসুবিধে না হয় —।

খুবই অসুবিধা হবে! ভূতের ব্যাগার কাকে বলে জানেন?

ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমাকে খোঁজ নিতে হবে না।

এবার আমি কেন ফোন করেছি, বলি? আমি এই শনিবার ওয়াশিংটন ডি সি যাচ্ছি। আনোয়ারও আসবে সেখানে। আনোয়ার আপনাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছে, আপনি যাবেন? আপনি তো আমেরিকায় এসে এ পর্যন্ত কিছুই দেখলেন না। এমনকী নায়েগ্রা ফল্‌সও দেখতে এলেন না!

এই শনিবার? নাঃ, সম্ভব না। অনেক কাজ।

উইক এন্ডেও কাজ? সোমবারও ছুটি। এটা লং উইক এন্ড!

আমার প্রফেসরের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে। রবিবার সারা দিন কাটাতে হবে ওঁর সঙ্গে।

তাহলে আপনি কাজই করুন। যেতে হবে না। আজ কী রান্না করেছেন? নাকি আজও খিচুড়ি!

না না, কালকের মাংস লেফ্‌ট ওভার আছে। এবার আমার জিজ্ঞেস করা উচিত, তুমি কী রান্না করেছ, তাই না?

আমি কিছুই রান্না করিনি। অর্ডার দিয়েছিলাম, এইমাত্র পিৎসা ডেলিভারি দিয়ে গেল।

তাহলে খেয়ে নাও। পিৎসা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে খাওযা যায় না।

ঠিক আছে, বাই-ই।

ফোন রেখে দিল অবনী। এর মধ্যে খবর শেষ হয়ে গেছে টিভিতে। এখন দেখানো হচ্ছে ফুটবল। এই খেলাটা অবনী একেবারে পছন্দ করে না। হাত দিয়ে খেলে, তবু এর নাম ফুটবল?

বিয়ারের ক্যানটা ফুরিয়ে গেছে। আর একটা বিয়ার খাবে কি খাবে না এই দোনামনা করতে করতে অবনী রান্নার জায়গায় গিয়ে স্টোভটা জ্বালাল। মাংসটা গরম করতে হবে।

প্রবাস জীবনে সব চেয়ে কষ্টকর, এই একা একা খাওয়া।

দেশে খাবার সময় খেতে বসলে মা পাশে দাঁড়াবেনই। তাছাড়াও কেউ না-কেউ এক সঙ্গে বসেই।

এখানে দিনের পর দিন একই রকম নিঃসঙ্গতা। সেই জন্যই যারা একা থাকে, তার সব সময় টিভি চালিয়ে রাখে। তবু তো মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

এর মধ্যে অন্য মনস্ক ভাবে অবনী আর একটা বিয়ার খুলে ফেলেছে।

দেশে থাকতে তার এ-সব অভ্যেস ছিল না। কিন্তু এখানে বিয়ারকে কেউ মদ বলে গণ্য করে না। আমেরিকান বিয়ার অবশ্য খুব পাতলা, অ্যালকহল কনটেন্টও কম। অনেকটা জলেরই মতো।

মিনিট দশেকের মধ্যে আবার টেলিফোন বাজল।

আবার রেহানা।

সে ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলল, এবার শুধু কাজের কথা। রফিককে জিজ্ঞেস করলাম। সেই গায়ক ভদ্রলোকের নাম অরূপরতন দাস ঠিকই। রফিকের সঙ্গে একই বাড়িতে অন্য অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন। ক'দিন আগে ভদ্রলোকের পা ভেঙে গেছে, প্লাস্টার করে শুয়ে আছেন বাড়িতে। আর কিছু খোঁজ নিতে হবে?

থ্যাঙ্কস্। হঠাৎ তুমি ভূতের ব্যাগার খাটতে গেলে কেন?

আপনার মা খোঁজ নিতে বলেছেন, সেটা ভূতের ব্যাগার?

তুমিই তো বললে?

আপনি কেন জিজ্ঞেস করলেন, আমার অসুবিধে হবে কি না? বেশি বেশি ভদ্রতা! খুব আমেরিকান কায়দা শিখে গেছেন, না?

আমেরিকায় থাকতে গেলে তো কিছু কিছু কায়দা শিখে যেতেই হয়। এ-সব কথা এমনিই মুখে এসে যায়।

বাঙালিদের মুখে থ্যাঙ্কস শুনতেও আমার ভাল লাগে না।

তুমি কিন্তু সত্যি খুব উপকার করলে রেহানা। শনিবার মাকে ফোন কবব।

আপনার মা ওই ভদ্রলোক সম্পর্কে... বিয়ে-টিয়ের ব্যাপার নাকি?

না না, ভদ্রলোক বিবাহিত। অনেক দিন বাড়িতে চিঠিপত্র লেখেন না।

গায়ক মানুষ, খেয়াল থাকে না বোধহয়। তাছাড়া পা ভেঙে শুয়ে আছেন।

পা ভাঙলে চিঠি লেখা যায় না, এমন কখনও শুনিনি। তাছাড়া পা ভাঙলে ফোন করাও যেতে পারে। তুমি ভদ্রলোকের ফোন নাম্বারটা জোগাড় করে দিতে পারো?

আবার আমার ওপর দায়িত্ব চাপানো হচ্ছে? আমি রফিকের ফোন নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, বাকিটা আপনি নিজে ব্যবস্থা করুন মশাই।

সেই ভাল। রফিককে আমি চিনি না। তাঁকে ফোনে এ-সব কথা জিজ্ঞেস করলে কিছু মনে করবেন না আশা করি।

রফিকের সঙ্গে আলাপ হলে বুঝবেন, সে হচ্ছে ভদ্রতার প্রতিমূর্তি। খাঁটি জেন্টলম্যান। সেই জন্য বন্ধুরা তার নাম দিয়েছে জেন্টু। বিশ্বসুদ্ধ মানুষের উপকার করার দায়িত্ব সে নিজের কাঁধে নিয়েছে। দেশ থেকে যারা প্রথম আসে, অনেকেই রফিকের কাছে ওঠে। দু'তিন মাস বিনা পয়সায় খায়-দায়। এখনও তো একটা ছেলে ওব বাসায় আছে।

তাহলে তো ওঁর সঙ্গে আলাপ করতেই হবে। পিৎসা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে তোমার?

এখনও খাচ্ছি।

খাওয়ায় মন দাও। তোমার স্বামীটিকে বলো, এবার যেতে পারলাম না। পরে একবার এক সঙ্গে বেড়াতে যাব। তুমি ভাল করে ঘুরে এসো।

খোদা হাফেজ।

এত সহজে কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে, অবনী আশা করেনি।

খবরটা না দিতে পারলে মা প্রত্যেক চিঠিতে একই কথা লিখবেন। নিশা নামের মেয়েটিকে যেন একটু একটু মনে পড়ছে। বেশ লম্বা, প্রায় ছেলেদের মতো ছোট করে চুল কাটা, চোখ দুটোতে ঘুম ঘুম ভাব। বর্ধমানে বেড়াতে এসে সে-ই তো গান গেয়েছিল।

প্রবাসী স্বামী যদি চিঠি না লেখে, অনেক দিন খোঁজখবর না নেয়, সেটা মেয়েদের পক্ষে অপনামজনক ব্যাপার। লোকে নানা রকম ভাবতে পারে। অরূপরতনের ফোন নাম্বার জানিয়ে দেবে, তারপর নিশা নিজেই ফোন করতে পারবে। এরপর আর অবনী ওদের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না।

খাবারের প্লেটটা হাতে নিয়ে অবনী জানলার কাছে এসে দাঁড়াল।

শীত শেষ হয়ে গেছে। কাগজে-কলমে এখন বসন্ত। তবু দু'দিন আগে হঠাৎ কিছুক্ষণ তুষারপাত হয়েছিল। এখন অবশ্য আর কোথাও বরফ জমে নেই। ফুল ফুটতে শুরু করেছে।

আকাশ খুব নীল। এখানকার বসন্তকালেও গায়ে সোয়েটার পরতে হয়। কলকাতায় নিশ্চয়ই এর মধ্যে বেশ গরম পড়ে গেছে। কত দূরে কলকাতা!

॥ ২॥

একটা পায়ে পুরো প্লাস্টার, হাঁটতে হয় ক্রাচ নিয়ে। বেশিক্ষণ শুয়ে থাকার ধৈর্য নেই অরূপের। পাঁচ মিনিট বই পড়ার পরই উঠে বসে। টিভি খোলে, চ্যানেল বদলে বদলে পছন্দমতো প্রোগ্রাম না পেলে একটা গানের সিডি চালিয়ে দেয়। অন্য সময় সর্বক্ষণ এখানে-সেখানে ঘোরাঘুরি করা অভ্যেস, এখন বাধ্য হয়ে নিজের ঘরে বন্দি।

একখানা ঘর, সঙ্গে বাথরুম আর রান্নার জায়গা। শোওয়ার আলাদা খাট নেই, সোফা-কাম-বেড, এ-দেশে তাকে বলে ড্যাভেনপোর্ট। দিনেরবেলা সেটা গুটিয়ে রাখতে হয়। ঘরের সব কিছুই এলোমেলো। এ-রকমই অরূপের স্বভাব। মুখ মোছার পর তোয়ালেটা হাত থেকে মেঝেতে পড়ে গেলে সেখানেই পড়ে থাকে।

বাথরুমে বসে দরজার বেল শুনতে পেল অরূপ।

একা থাকে বলে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে না। দরজা বন্ধ থাকলে শুনতে পেত না বেলের আওয়াজ।

ক্রাচ না নিয়েই এক পায়ে লাফাতে লাফাতে এসে সে দরজা খুলে দিল।

খোলার পর এক মুহূর্তের জন্য তার মুখে একটা ছায়া খেলে গেল। সে অন্য এক জনকে প্রত্যাশা করেছিল।

পরের মুহূর্তেই ঝলমলে হাসি দিয়ে বলল, আসুন, আসুন রফিক সাহেব।

রফিক অরূপের প্রতিবেশী, থাকে নিচের তলার অ্যাপার্টমেন্টে। তার সুন্দর স্বাস্থ্যবান চেহারা, মাথার চুল পাট করে আঁচড়ানো, সারা বছরই সে পুরো মোজা-জুতো না পরে সে ঘর থেকে বেরোয় না।

তার তুলনায় অরূপ যেন ঠিক বিপরীত। সে বেশ রোগা ও লম্বা, নাকটাও বড়, তবে মুখখানি অসুন্দর নয়, বুদ্ধির ছাপ আছে। মনে হয় যেন চুল আঁচড়ায় না সাতজন্মে, কপালের ওপর এসে পড়ে চুল, কথা বলতে বলতে আঙুল দিয়ে চুল সরানো তার মুদ্রাদোষ। সে বাড়ি থেকে চটি পায়ে বেরিয়ে পড়তে পারে অনায়াসে।

এখন তার মুখে কয়েক দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

ভেতরে এসে রফিক বলল, আপনি আমাকে সাহেব সাহেব বলেন কেন? শুধু রফিকই তো যথেষ্ট।

অরূপ বলল, ঠিক। তাহলে তো আপনি বলাও তো চলে না। এখন থেকে তুমি বলব আমরা।

রফিক বলল, আপনাকে অরূপদা বলে ডাকব। আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড়।

অরূপ বলল, আরে, ও-সব বয়স-টয়স ছাড়ো। এ-দেশে সবাই সবাইকে নাম ধরে ডাকে। প্রথম এ-দেশে এসে বাবা-জ্যাঠামশাইয়ের বয়সী লোকেরা যখন বলত শুধু নাম ধরে পল কিংবা হ্যারি বলে ডাকতে, খুব অস্বস্তি হত। দাঁড়িয়ে কেন, বোসো রফিক!

রফিকের হাতে একটার বড় পেপার ব্যাগ। সেটা নামিয়ে রেখে বলল, আপনার জন্য আলু-ফুলকপি, কিছু ভেজিটেবল, কিছু মাছ আর চিকেন নিয়ে এসেছি। আপনি তো শপিং করতে যেতে পারছেন না।

ব্যাগটার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে অরূপ বলল, ওরে বাবা, এ তো অনেক জিনিস। বিয়ারও রয়েছে কয়েকটা। সত্যি, তোমার তুলনা নেই। ঠিক মনে করে এ-সব নিয়ে এসেছ।

আপনি আটকা পড়ে আছেন ঘরের মধ্যে।

আমার স্টক যা ছিল, ফুরিয়ে এসেছে। আজ সকালেই ভেবেছিলাম তোমাকে রিকোয়েস্ট করব। তার আগেই তুমি নিয়ে এলে? আমার প্রতিবেশী ভাগ্য এমন ভাল! হ্যাঁ, সব মিলিয়ে কত লেগেছে?

সে ঠিক আছে, এমন কিছু নয়।

না না, রফিক, তুমি মনে করে নিয়ে এসেছ, এ-জন্যই আমি গ্রেটফুল। দাম নিতে হবে।

ঠিক আছে, পরে দেবেন। আপনি তো দু'চার দিনের মধ্যে বেরুতে পারছেন না। আরও তো কিছু কিছু বাজার লাগবে। আমি হিসেব রাখব।

ঠিক হিসেব রাখতে হবে কিন্তু! দু'বোতল স্কচ এনে দিও। একদম ফুরিয়ে গেছে।

সন্ধের সময় পেলে চলবে?

হ্যাঁ হ্যাঁ, আজ না হয় কাল পেলেও।

আপনার প্লাস্টার কবে কাটবে?

আরও এক মাস তো লাগবেই। কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার।

খুব জোর বেঁচে গেছেন। গাড়িটায় যদি স্পিড বেশি থাকত!

আমার আরও এ-রকম অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে আগে। প্রত্যেক বারই বেঁচে যাই!

মুচকি মুচকি হাসতে লাগল অরূপ। যেন অ্যাকসিডেন্ট হওয়াটা একটা আনন্দের ব্যাপার।

তারপর দুটো বিয়ারের ক্যান তুলে নিল।

রফিক বলল, আমি কিন্তু খাব না এখন।

অরূপ বলল, আরে বোসো, বোসো। অত তাড়া কীসের?

রফিক বলল, একটু তাড়া আছে ঠিকই। তাছাড়া দিনেরবেলা আমি পান করি না।

অরূপ বলল, এ-সবের আবার দিন আর রাত্তির কী! অমৃতে কখনও অরুচি হয়?

দু'জনেই হেসে উঠল। কিন্তু রফিক বসল না। দরজার কাছে গিয়ে বলল, যখন যা কিছু লাগবে, আমাকে জানাবেন। প্লিজ ডোন্ট হেজিটেট।

অরূপ বলল, আবার আপনি?

রফিক বলল, অভ্যেস হতে দু'এক দিন সময় লাগবে।

রফিক চলে যাবার পর দরজা বন্ধ করেও আবার ব্যস্ত হয়ে দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল, রফিক, রফিক, প্লিজ, আর একটা কাজ করে দিতে হবে।

সিঁড়ি থেকে ফিরে এল রফিক।

ড্রয়ার খুলে একটা চেক বার করে রফিকের হাতে দিয়ে বলল, এটা আমার ব্যাঙ্কে জমা করে দেবে প্লিজ?

স্বাভাবিক ভাবেই চেকটায় চোখ বোলাল রফিক। এবং চমকে উঠল।

কুড়ি হাজার পাঁচশো ডলার! এক সঙ্গে এত টাকা?

অরূপের মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু অরূপ কোনও ব্যাখা দিল না বলে রফিকও ভদ্রতা বজায় রেখে জিজ্ঞেস করল না কিছু।

আবার দরজা বন্ধ করে বিয়ারের ক্যান খুলে সিগারেট ধরাল অরূপ।

ঘণ্টা খানেক পরে আবার বেল বাজল। এবারে এসেছে আকাঙ্ক্ষিত অতিথি। উজ্জ্বল হয়ে উঠল অরূপের মুখ।

একটি তরুণী, এ ও বেশ দীর্ঘাঙ্গিনী, একটা সবুজ ঢোলা পোশাক পরা, চুলের রঙ সোনালি, ঠোঁটেও প্রায় ওই রকম কাছাকাছি রঙের লিপস্টিক, দু'দিকের কাঁধে তিনটে ঝোলা ব্যাগ।

অরূপ বলল, হাই সুইটি!

মেয়েটির নাম লিজ, সে-ও হাই বলে নিজের গালটা ফেরাল অরূপের ঠোঁটের দিকে।

তারপর ভেতরে এসে ঝোলা ব্যাগগুলো ছুঁড়ে ফেলে বলল, আই অ্যাম স্টার্ভিং! দারুণ খিদে পেয়েছে। আমি কলিফ্লাওয়ার ফ্রায়েড খাব। আই লাইক ইট সো মাচ!

অরূপ বলল, ফুলকপি ভাজা!

লিজ ইংরিজিতে বলল, হ্যাঁ, পু-ল-কো-প্পি বাজা! আমি এত ভালবাসি, আগে কখনও খাইনি, এত ভাল লাগে, রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে ভাবছি, অরূপের কাছে গিয়ে ফুলকপি ভাজা খাব!

অরূপ বলল, এই রে, ফুলকপি কি আছে আমার ফ্রিজে?

লিজ বলল, না থাকলে আমি এক দৌড়ে সুপার মার্কেট থেকে কিনে আনব!

অরূপ বলল, না না, আছে। রফিক একটু আগে দিয়ে গেল।

লিজ বলল, তুমি চুপ করে বসে থাকো। আমি ভেজে ফেলছি।

অরূপ বলল, তুমি পারবে না। আমরা দু'রকম ফুলকপি ভাজা খাই। সোজাসুজি ভাজা আর ব্যাসনে ডুবিয়ে ভাজা। তুমি তো দ্বিতীয়টাই পছন্দ করো। তুমি ব্যাসন গুলতে পারবে না।

লিজ বলল, ঠিক পারব। আগের দিন দেখেছি। আমার মাকে ফোন করেছিলান। তখন বললাম, মা, তুমি কখনও কলিফ্লাওয়ার ফ্রাই করে খেয়েছ? গ্রেট, গ্রেট! মা জিজ্ঞেস করল, রেসিপি কী রে? মা ব্যাসন কাকে বলে বুঝতে পারল না।

অরূপ বলল, ব্যাসন তো ইন্ডিয়ান স্টোর ছাড়া পাওয়া যায় না। তোমার মাকে খানিকটা পাঠিয়ে দেব বরং।

রান্নাঘর বলতে কিছু নেই। বাথরুমের পাশে এক চিলতে রান্নার জায়গা, দুটো গ্যাস স্টোভ, সামান্য কিছু বাসনপত্র।

লিজ টপাটপ ফুলকপি কুটে, ব্যাসন গুলে ফেলল। তারপর স্টোভ জ্বেলে কড়াই চাপিয়ে বলল, ডু য়ু মাইন্ড, যদি আমার পোশাকটা খুলে রাখি? তেল ছিটকে লাগতে পারে।

অরূপ বলল, হ্যাঁ, খুলে রাখো।

লিজ তার লম্বা পোশাকটা খুলে ভাঁজ করে রাখলো সযত্নে। তলায় প্যান্টি ছাড়া আর কিছু নেই। সে ব্রা পরে না, তার স্তন দু'টি অতিরিক্ত বড়।

বুক খোলা, তাতে সামান্যতম লজ্জার ভাবও নেই তার।

কড়াইতে তেল ঢালতে ঢালতে লিজ বলল, আজ আমাকে পর পর তিনটে ক্লাস নিতে হয়েছে। আ অ্যাম সো টায়ার্ড অ্যান্ড হাংগ্রি।

অরূপ বলল, এই, কপিতে নুন মাখাবে না?

লিজ বলল, ব্যাক সিট ড্রাইভিং-এর মতো তুমি ওখান থেকে নির্দেশ দিও না প্লিজ। ওদিকে গিয়ে বসো। আমি ভেজে নিয়ে আসছি। ব্যাসনে একটু নুন দিয়ে দিয়েছি, তাতে ভাল স্বাদ হয়।

তবু গেল না অরূপ। পেছন থেকে লিজকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তার ঘাড়ে চুমু খেতে খেতে বলল, তোমার কাছ থেকে যে সরে যেতে ইচ্ছে করে না!

লিজ বলল, এই, এই দুষ্টু ছেলে, ও-রকম করলে কি রান্না হয়? বিরক্ত কোরো না!

অরূপ গান গেয়ে বলল, একটি চুম্বন দাও, সখী একটি চুম্বন দাও।

লিজ মুখ ফেরাল। তার ঠোঁটের বাঁ-কোণে একটি বড় আঁচিল, সেটা ঘিরে কিছু ছোট ছোট রোম। তার মুখখানি অসুন্দর নয়, শুধু ওই একটাই খুঁত। ওইটুকুর জন্যই আমেরিকান যুবকেরা তার সঙ্গে ডেট করে না।

চুম্বনটি সমাপ্ত করার পর লিজ বলল, যাও এবার, আমার ব্যাগটা খুলে দেখো, তোমার জন্য কী এনেছি!

অরূপ ঠিক বুঝতে পেরেছে, সে লুব্ধভাবে এক পায়ে লাফাতে লাফাতে গিয়ে লিজের ব্যাগ ঘাঁটতে লাগল। দুটো ঝোলা ব্যাগই বই-খাতাপত্রে ভর্তি। লিজ দারুণ পড়াশুনো করে। সোসাল সায়েন্সে পিএইচডি করার পর সে আবার সাইকোলজির কোনও একটা বিষয় নিয়ে পিএইচডি শুরু করছে।

ছোট হ্যান্ডব্যাগটায় পাওয়া গেল একটা পুরিয়া।

অরূপ উল্লসিত ভাবে জিজ্ঞেস করল, কোথা থেকে জোগাড় করলে?

লিজ বলল, নিক নামে ছেলেটাকে মনে আছে? সে দিয়েছে। নিয়মিত সাপ্লাই দেবে বলেছে।

অরূপ একটা সিগারেট নিয়ে টিপে টিপে ভেতর থেকে বার করে ফেলল সব তামাক। তারপর তার মধ্যে ভরতে লাগল গাঁজা।

গরম তেলে ফুলকপি ভাজার চড়বড় শব্দ হচ্ছে, আর অরূপ গুন গুন করে গান করতে করতে গাঁজা সাজছে।

সম্পূর্ণ হবার পর সেটা ধরিয়ে লিজের কাছে এসে বলল, এই নাও!

প্রথম টানটা লিজ দেবে। হাত মুঠো করে সে বেশ জোরে টানতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ দুটো লাল হয়ে যায়।

লিজ জিজ্ঞেস করল, তুমি উডস্টকের কথা জানো?

অরূপ বলল, হ্যাঁ, জানব না কেন?

লিজ বলল, উডস্টকের মতোই একটা বিরাট গান-বাজনার আসর হচ্ছে ক্লিভল্যান্ডে, তুমি গান এত ভালবাসো, ওখানে গেলে তোমার খুব ভাল লাগত! কিন্তু ভাঙা পা নিয়ে যাবে কী করে?

অরূপ বলল, ভাঙা পা তো কী হয়েছে? তোমার গাড়িতে যেতে পারি!

পারবে?

অফ কোর্স পারব। কাল সিঁড়ি দিয়ে একবার নিচে নেমেছিলাম। কোনও অসুবিধে হয়নি।

তাহলে চলো, চলো!

তুমি ছুটি পাবে?

অরূপ, আমি ছুটি-ফুটি গ্রাহ্য করি না। ইচ্ছে হয়েছে, যাব, ব্যাস, সোজা কথা! শুধু একটাই মুশকিল, বেশ কিছু টাকা-পয়সা লাগবে, টিকিটই তিনশো ডলার, তাছাড়া অত দূরে যাওয়া, গাড়ির গ্যাস, খাওয়া-দাওয়া।

টাকার জন্য চিন্তা? কত টাকা লাগবে? আমার হাতে এখন অঢেল টাকা। তুমি টাকার জন্য একদম চিন্তা করবে না লিজ।

তুমি কোথা থেকে টাকা পেলে?

চেকটা এসে গেছে!

এসে গেছে? এত তাড়াতাড়ি! ও গ্রেট, গ্রেট!

এক হাতে খুন্তি, সেটা নিয়েই লিজ জড়িয়ে ধরল অরূপকে। দু'জনের শরীরে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। যেন একটা দারুণ ষড়যন্ত্র সফল হয়েছে, এই ভাবে হাসতে লাগল ওরা।

অরূপ জিজ্ঞেস করল, ক্লিভল্যান্ডের উৎসবটা শুরু হচ্ছে কবে?

লিজ বলল, পরশু দিন। চলবে তিন দিন। তাহলে কবে যেতে চাও?

অরূপ বলল, আজই। দেরি করে কী লাভ?

লিজ বলল, কিছু জিনিসপত্র কিনে নিতে হবে। কাল সকালে স্টার্ট করা যায়।

অরূপ বলল, না না, আজই। এক্ষুনি! জিনিসপত্র আবার কী? চেকটা জমা পড়ে গেছে। ক্রেডিট কার্ড নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হবে। জিনিসপত্র সব পাওয়া যাবে রাস্তায়। চলো, চলো লিজ। ঘরে আটকে থাকতে আমার আর একটুও ভাল লাগছে না।

পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে ওরা দু'জন বেরিয়ে পড়ল দীর্ঘ যাত্রায়।

।। ৩।।

ফোনটা বাজতেই অবনী ভাবল রেহানার কথা। এই রকম সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে অবনী রান্নাবান্নার জোগাড় করে, তখনই রেহানা ফোনে নানা রকম উপদেশ দেয়।

ফোনটা তুলে প্রথম গলা শুনে অবনী দারুণ চমকে উঠল। অন্য মেয়ের কণ্ঠস্বর। এ পর্যন্ত রেহানা ছাড়া আর কোনও মেয়ে তাকে নিজে থেকে ফোন করেনি।

দাদা, আমি নিশা।

নিশা! নিশা মানে?

আপনাকে আমি চিঠি লিখেছিলাম। আপনি উত্তরও দিয়েছিলেন।

ও হ্যাঁ, তুমি কোথা থেকে কথা বলছ?

বোস্টন থেকে।

বোস্টন থেকে? তুমি এখানে কবে এলে?

আজই। এই মাত্র। গ্রে হাউন্ড বাস স্টেশনে এখন রয়েছি।

তুমি আমেরিকায় কবে এসেছ? কিছু খবর পাইনি তো।

আজ সকালেই নিউ ইয়র্ক পৌঁছেছি। খবর দিতে পারিনি আগে। দাদা, খুব বিপদে পড়ে আপনার সাহায্য চাইছি।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি হঠাৎ আমেরিকা এলে, নিউ ইয়র্ক থেকে এখানে এলে কেন?

সব আপনাকে বুঝিয়ে বলব। এখন কি একবার আপনার বাড়িতে যেতে পারি? কী করে যাব যদি বুঝিয়ে দেন। ঠিকানাটা আছে আমার কাছে। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললে...।

দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমার বাড়ি খুঁজে পাওয়া একটু মুশকিল। ট্যাক্সি অনেক ঘোরাবে। তুমি গ্রে হাউন্ড স্টেশনেই থাকো। আমি আসছি।

দাদা, ঠিক আসবেন তো? আমার ভয় করছে।

আরে, ভয়ের কী আছে! গ্রে হাউন্ড স্টেশনে ভয়ের কিছু নেই। আমার পৌঁছতে বড় জোর আধ ঘণ্টা লাগবে।

ফোন ছেড়ে দিয়ে জেট বিমানের গতিতে চিন্তা করতে লাগলো অবনী।

এ কী অভাবনীয় ব্যাপার! মেয়েটা হুট করে চলে এল আমেরিকায়? তা ইচ্ছে হলে আসতে পারে, কিন্তু বোস্টনে কেন? ওর স্বামীর টেলিফোন নাম্বার দিয়ে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানেই তো যাওয়া উচিত ছিল।

অবনী এখন কী করবে?

সন্ধে হয়ে গেছে, মেয়েটি থাকবে কোথায়?

দেশ থেকে যারা আসে, তারা অনেকেই বোঝে না যে, এখানে অনেকেই থাকে এক ঘরের ফ্ল্যাটে। সেখানে কি কোনও অনাত্মীয় মেয়েকে আশ্রয় দেওয়া যায়?

রেহানা এক দিন এখানে ছিল, সে-দিন সঙ্গে তার স্বামীও ছিল। কষ্ট করে শুতে হয়েছে, সে আর কী করা যাবে! কিন্তু একটি বিবাহিতা মেয়ে একা এসেছে, অবনীর ঘরে তাকে আশ্রয় দেবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। দু'জনেরই মন পরিশুদ্ধ থাকলেও অন্য কেউ যে তা মানবে না। ওর স্বামী কী মনে করবে? মেয়েটিরই ক্ষতি হবে বেশি।

কিন্তু কথা যখন দিয়ে ফেলেছে, তখন যেতেই হবে গ্রে হাউন্ড স্টেশনে।

এই সময় বাড়ি থেকে বেরুতে ইচ্ছে করে না একেবারে। জামা-জুতো-মোজা খুলে ফেলা হয়েছে। পরতে হবে আবার।

অবনী যখন গ্রে হাউন্ড বাস স্টেশনে পৌঁছল, তখনও তার চোখে-মুখে বিরক্তি মাখানো।

ওয়েটিং রুমে পাঁচ-সাত জন ভারতীয় বা বাংলাদেশি বা পাকিস্তানি রয়েছে, শুধু এক জন রমণীর সামনেই একটি বড় সুটকেস। দূর থেকে দেখে অবনী চিনতেও পারল নিশাকে।

প্রথম বার যারা এ-দেশে আসে, তাদের চেহারার মধ্যেই কিছুটা ভয়, উদ্বেগ, অস্বস্তি মিশে থাকে। এয়ারপোর্টে পরিচিত কারুকে না দেখলে সে সব আবও বেড়ে যায়। সেই তুলনায এই মেয়েটিকে বেশ সপ্রতিভই বলতে হবে।

একা এসেছে নিউ ইয়র্কে, সেখানে কেউ তাকে অভ্যর্থনা জানায়নি। তারপর সে খোঁজখবর নিয়ে একাই বাসে চেপে বোস্টনে এসেছে। নিশার পরনে সালোয়ার-কামিজ, একটা সাদা রঙের শাল গায়ে জড়ানো।

অবনী সামনে আসতেই নিশা উঠে দাঁড়িয়ে আবেগের সঙ্গে বলল, এসেছেন? অবনীদা, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি খুবই লজ্জিত। যদি আপনি সব শোনেন —।

অনেক ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল নিশার দিকে।

পাশের একটি চেয়ার খালি, সেখানে বসে পড়ে অবনী বলল, ঠিক আছে, সব শুনব। একটু আস্তে কথা বলো, এ-দেশে কেউ পাবলিকলি চেঁচিয়ে কথা বলে না। তুমি হঠাৎ চলে এলে, তোমার স্বামীকে জানাওনি? তিনি রিসিভ করতে আসেননি?

নিশা মৃদু গলায় বলল, আপনি আমার চিঠি পাননি?

অবনী বলল, চিঠি... মানে সেই একটা আমার মায়ের চিঠির সঙ্গে...।

নিশা বলল, এখানে আসার কথা জানিয়ে যে একটা চিঠি দিয়েছি দশ দিন আগে।

না, সেটা এখন পৌঁছয়নি। অনেক সময় দেরি হয়।

আপনাকে টেলিফোন করে পাইনি। টেলিফোনে অনেক খরচ আজ সকালে নিউ ইয়র্কে পৌঁছেও চেষ্টা করেছি দু'বার, ফোন বেজেই গেল।

আমি সকালে সাড়ে সাতটার মধ্যে বেরিয়ে যাই। ছুটির দিন ছাড়া পাবে কী করে?

কথা বলতে বলতেও অবনী খুব অস্থির বোধ করছে। নিশা তাকে চিঠি লেখা, তাকে ফোন করার ওপর জোর দিচ্ছে কেন? তার সঙ্গে তো নিশার সে-রকম কিছু সম্পর্ক নেই। যোগাযোগ করার কথা তো ওর স্বামীর সঙ্গে। অবনী ওর স্বামীর ঠিকানা ও ফোন নম্বর জানিয়ে দিয়েছে।

অবনী এবার সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল, তুমি কি অরূপবাবুকে কিছু না জানিয়েই চলে এসেছ?

সরাসরি অবনীর মুখের দিকে তাকাল নিশা। হঠাৎ জলে ভরে গেল তার দু'চোখ। ফুঁপিয়ে উঠল একবার।

এ-রকম অবস্থায় যে কী করতে হয়, তা অবনী জানেই না।

অন্য লোকরা কী ভাবছে, এই তরুণীটি তার প্রেমিকা? কী মুশকিল।

ইংরেজি সিনেমায় এই রকম সময়ে পুরুষরা একটা রুমাল এগিয়ে দেয় মেয়েটির দিকে। সিনেমার নায়িকারা কান্নার পরেও চোখ মোছে না, সেই রুমালে নাক ঝাড়ে।

একটু সামলে নিয়ে নিশা বলল, আপনি নাম্বার দিয়েছিলেন, ওর সঙ্গে ফোনে একবার কথা হয়েছে। পা ভেঙে গিয়েছিল তখন ওর। শরীরটাও খারাপ ছিল। তারপর থেকে যতবার ফোন করেছি, ওকে পাইনি। একটা রেকর্ড করা কথা শোনা গেছে, ও বাড়িতে নেই। অন্তত দশবার, প্রত্যেক বার ওই একই কথা।

অবনী বলল, আনসারিং মেশিন। তাতে কোনও মেসেজ রাখোনি? বিপ বিপ শব্দ হওয়ার পর...

নিশা বলল, হ্যাঁ তা-ও রেখেছি। ও নিজে থেকে একবারও ফোন করেনি।

অবনী মাথা নাড়ল। এটা ইদানীং একটা নতুন কায়দা হয়েছে। অনেকে বাড়িতে থাকলেও ফোন ধরে না। কয়েক বার রিং হবার পর নিজে থেকেই চালু হয়ে যায় আনসারিং মেশিন, যে ফোন করছে শোনা যায় তার কণ্ঠস্বর। তখন ইচ্ছে করলে রিসিভার তুলে কথা শুরু করা যায়। পাওনাদার কিংবা বিরক্তিকর কেউ ফোন করলে, তার কথা শুনতে পেয়েও ফোন না ধরার সুবিধে হয়েছে এখন।

নিশা বলল, নিউ ইয়র্কে পৌঁছেছি ভোর সাড়ে ছ'টায়। তখন থেকে তিনবার ওকে বাফেলোর নাম্বারে ফোন করেছি, কোনও উত্তর নেই। তখন আমার ভয় হল। অরূপ যদি বাফেলো শহরেই না থাকে এখন, তাহলে আমি ওখানে পৌঁছে উঠব কোথায়? আর তো কারুকে চিনি না।

অবনী মনে মনে বলল, ফোন না ধরলেও বাড়িতে থাকতে পারে।

নিশাকে জিজ্ঞেস করল, অরূপবাবুর সঙ্গে ডেফিনিট যোগাযোগ না করেই তুমি এত দূর চলে এলে? এ যে বিরাট ঝুঁকি!

নিশা আর কাঁদবে না ঠিক করে ফেলেছে।

ওড়না দিয়ে মুখ মুছে বলল, সবাই বলেছিল, ভিসা পাওয়া খুব শক্ত। আমি আশ্চর্য ভাবে এক চান্সেই ভিসা পেয়ে গেলাম। আমার এক বান্ধবীর দাদার ট্রাভেল এজেন্সি আছে, তিনি আমাকে একটা টিকিট দিয়ে বললেন, একবছরের মধ্যে টাকা শোধ করলেও চলবে।

অবনী বিরক্তি গোপন না করে খানিকটা ধমকের সুরে বলল, শুধু ভিসা আর ফ্রি টিকিট পেলেই হল? অরূপবাবু যদি সত্যিই বাফেলো থেকে অন্য কোথাও চলে গিয়ে থাকেন, তাহলে তুমি থাকবে কোথায়? থেকেই-বা কী করবে?

নিশা বলল, তা বলে একটা মানুষ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে তার কোনও খোঁজ করা হবে না? যদি সত্যি তার কোনও গুরুতর অ্যাকসিডেন্ট হয়ে থাকে? মাসের পর মাস আমি কোনও খবর পাব না, অথচ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকব? অরূপদের বাড়িতে, মানে আমার শ্বশুর বাড়িতে আমি কী-ভাবে থাকি, তা আপনারা বুঝতে পারবেন না। আমাব মা-বাবা কেউ নেই, দাদার কাছে থাকতাম। বিয়ের

পরেও কোনও মেয়ে যদি দাদার বাড়িতে ফিরে গিয়ে আশ্রয় চায়, সেটা তার পক্ষে কত অপমানজনক, সেটুকু অন্তত বুঝবেন আশা করি। শ্বশুর বাড়িতে একগাদা লোক, এখন সবাই ভাবছে, আমার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে অরূপের, সেই জন্য সে আর কারুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে না। অথচ বিশ্বাস করুন, কোনও দিন ঝগড়া হয়নি। বরং ও আমাকে কত রকম প্রমিজ করেছিল। বলেছিল এক বছর বাদেই ডেফিনিটলি আমাকে এ-দেশে নিয়ে আসবে।

তুমি কলকাতায় কিছু কাজ-টাজ করতে?

হ্যাঁ, একটা মিশনারি স্কুলে পড়াতাম। ভাল কাজ ছিল। বিয়ের পর জোর করে ছাড়িয়ে দিল। তখন আপত্তি করিনি। এখন আবার নতুন করে খুঁজতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু সহজে কি চাকরি পাওয়া যায়! এর মধ্যে গত মাসে, অরূপ দুম করে ওর মায়ের নামে এক হাজার ডলার পাঠিয়ে দিয়েছে। চিঠি-টিঠি কিছু নেই, শুধু একটা চেক। তাতেই আরও ওদের ধারণা হয়েছে, অরূপ ওর মায়ের প্রতি কর্তব্য পালন করতে এখন রাজি, কিন্তু স্ত্রীর প্রতি কোনও কর্তব্য নেই। সবই যেন আমার দোষ। আমার সত্যিই কী দোষ, সেটাই আমি জানতে চাই। সেটা না জেনে আমি মরতেও রাজি নই!

অরূপের যদি খোঁজ না পাওয়া যায়, এ-দেশে একা একা তোমার পক্ষে বেশি দিন থাকা খুবই কঠিন ব্যাপার। তুমি টুরিস্ট ভিসা নিয়ে এসেছ নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ। দু'মাসের।

তার মানে তুমি এ-দেশে কোনও কাজও করতে পারবে না। টাকা-পয়সা কিছু আনতে পেরেছ?

চারশো ডলার। দু'খানা গয়না বিক্রি করে।

নস্যি! ও-টাকায় আর কত দিন চলবে!

আমার রিটার্ন টিকিট আছে। সে-রকম হলে ফিরে যাব। দাদা, আমি আপনার ওপর কোনও দায়িত্ব চাপাতে চাই না। শুধু পরামর্শ চাইছি। কোথা থেকে আমার শুরু করা উচিত।

আপাতত আজকের রাতটা তুমি কোথায় কাটাবে, সেটা ঠিক করা দরকার। আমার অ্যাপার্টমেন্টে তোমাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি ছোট্ট একটা একখানা ঘরের অ্যাপার্টমেন্টে থাকি।

ছোট হলেও আমার কোনও অসুবিধা নেই। আমি মেঝেতেও শুয়ে থাকতে পারি।

তুমি বুঝতে পারছ না, অসুবিধেটা অন্য রকম। কাছাকাছি কিছু সস্তার মোটেল আছে, চলো দেখি, কোনওটাতে যদি ঘর পাওয়া যায়।

ঠেলাগাড়িতে মালপত্র চাপিয়ে নিশাকে নিয়ে বেবিয়ে এল অবনী। ট্যাক্সি নিয়ে মোটেল খুঁজতে গেলে অনেক খরচ হয়ে যাবে। সে নিশাকে বলল, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকে, এমনিতে ভয়ের কিছু নেই, শুধু মালপত্রেব কাছ থেকে এক মুহূর্তের জন্যও নড়বে না। এটা হাত দিয়ে ধরে থাকো। কেউ কোনও কথা বলতে এলেও মাথা নাড়বে, অন্য দিকে তাকাবে না। ভিখিরি এলেও পয়সা দেবে না। আমি পায়ে হেঁটে গিয়ে ঘর ঠিক করে আসছি।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে ফিরে এল।

ঠেলাগাড়িটা দু'হাতে চেপে একই জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে আছে নিশা। একটু দূর থেকে তাকে দেখে মনে হল কোনও ট্র্যাজেডির নায়িকা। মুখে গাঢ় অভিমানের রঙ।

এবারে অবনীকেই হাতে করে সুটকেসটা বয়ে নিয়ে যেতে হল। বেশ ভারি।

একেবারেই সস্তার মোটেল, তা-ও কাল দুপুর বারোটা পর্যন্ত ঘরভাড়া পঁয়তাল্লিশ ডলার। একচিলতে ঘর, অবশ্য সংলগ্ন টয়লেট আছে। মোটেলটির মালিক এক গুজরাটি, কর্মচারীরা সবাই কালো।

ঘরটার চারপাশে চোক বুলিয়ে নিশা বলল, কোনও দিন হোটেলে একা একা থাকিনি।

অবনী বলল, দরজা বন্ধ করে রাখবে। এখানে খাবার-টাবার পাওয়া যায় না। কেউ এসে তোমাকে ডাকবেও না। তোমার খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই?

নাঃ, আমার একটুও খিদে নেই।

খিদে না পেলেও খেতে হবে। এখানকার কলের জল খাওয়াও ঠিক নয়। তোমার জেট ল্যাগ হবে, যখন-তখন ঘুম পাবে। আমি কিছু খাবার আর জলের বোতল নিয়ে আসছি। ফিরে এসে আমি তিনবার বেল দেব, তখন দরজা খুলো।

নিশা হ্যান্ডব্যাগ খুলে টাকা বার করতে গেল।

অবনী বলল, এখন থাক।

নিশা বলল, অবনীদা, আমার জন্য আপনাকে টাকা-পয়সা খরচ করতে হবে না। প্লিজ, কত লাগবে বলুন।

অবনী বলল, শোনো নিশা, আমার উপার্জন বেশি নয়। চাকরি তো করি না। এল হিসেবে এখন আমি ছাত্র। তবে বিদেশ থেকে কোনও অতিথি এলে এক সন্ধে তাকে কিছু খাওয়াবার সামর্থ্য নিশ্চিত আমার আছে।

কাছেই একটা বার্গার কিং-এর দোকান দেখে এসেছে অবনী। দুটো বড় হ্যামবার্গার, আলুভাজা, দুটো কফি ও দুটো জলের বোতল কিনে নিল। এরা চা কিংবা কফিও এমন ঢাকনা দেওয়া গেলাসে দেয় যে, বয়ে নিয়ে যেতে অসুবিধে হয় না।

এর মধ্যে পোশাক বদলে ফেলেছে নিশা। শাড়ি পরেছে। পোশাক বদলালেই মেয়েদের চেহারা ও রূপও যেন বদলে যায় অনেকখানি। নিশাকে বেশ সুশ্রীই বলতে হবে। তার কথা বলার ভঙ্গিতেও ন্যাকামি নেই, অনেক পুরুষই আকৃষ্ট হতে পারে তার দিকে। তবু এমন একটি মেয়েকে কেন অবহেলা করছে তার স্বামী? সেই লোকটির মনের কথা কী করে বুঝবে অবনী?

একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এ মেয়েটির সাহস আছে। জীবনে যে কখনও বিদেশে যায়নি, সে একা একা, কারুর সঙ্গে সঠিক যোগযোগ না করে আমেরিকায় চলে এল, ক'জন বাঙালি মেয়ে এটা পারবে?·

ঘরের মাঝখানে একটি খাট ছাড়া আর কোনও আসবাব নেই। সেই খাটের ওপর বসেই খাবার খেতে শুরু করল।

হ্যামবার্গারে প্রথম কামড় দিয়ে নিশা জিজ্ঞেস করল, বিফ না পর্ক?

অবনী বলল, কোনওটাই নয়। মুর্গি। তোমার ওই সব মাংসে আপত্তি আছে? এ-দেশে ও-সব সংস্কার থাকলে মেনে চলা খুব মুশকিল। খাচ্ছ নিরীহ আলুভাজা, কিন্তু সেটা যে লার্ড দিয়ে ভাজা, সেটা হয়তো গরুর চর্বি।

নিশা বলল, বিয়ের পর আমার স্বামী কলকাতায় আমাকে পার্ক স্ট্রিটের কয়েকটা রেস্তোরাঁয় খাওয়াতে নিয়ে যেত। প্রায় জোর করেই আমাকে বিফস্টেক খাইয়েছে। অলিম্পিয়াতে এগ অ্যান্ড সসেজও খেয়েছি, সসেজ তো শুয়োরের। যে-কোনও মাংসই আমার ভাল লাগে। শুনেছি, এ-দেশে নাকি পাঁঠার মাংস পাওয়া যায় না।

অবনী বলল, চেষ্টা করলে পাওয়া যায়। আরও অনেক রকম মাংস পাওয়া যায় এ-দেশে। তোমার সঙ্গে কি অরূপবাবুর সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়েছে? নাকি তোমরা নিজেরা পছন্দ করে —।

মুখ নিচু করে নিশা বলল, বলতে পারেন, অরূপই আমাকে পছন্দ করেছিল। আমি মাঝে মাঝে কবিতা আবৃত্তি করতাম। একটা আসরে আমার কবিতা শুনে ওর ভাল লাগে। যেচে এসে আলাপ

করে আমার সঙ্গে। আমাদের বাড়িতেও আসতে শুরু করে। আমাকে নিয়ে গেছে কয়েকটা গানের আসরে, ও নিজে খুব ভাল গান করে, আমার ভাল লেগেছিল। তারপর যেমন হয় আর কী।

ওর গানের খ্যাতি এখানেও ছড়িয়েছে।

গান কিন্তু শেখেনি কোথাও। কিন্তু গান-পাগল যাকে বলে।

এখানে উনি কী চাকরি নিয়ে এসেছেন?

তা ঠিক জানি না। বলেছিলেন ঘুরে ঘুরে বেড়াবার চাকরি। কোনও ইন্ডিয়ান মালিকের কোম্পানিতে।

ওঁর ডিসিপ্লিন কী ছিল?

সোসিওলজিতে এমএ করেছিল। তারপর আরও কী কী ট্রেনিং নিয়েছিল।

উনি শিক্ষিত লোক, তোমার স্কুলে পড়ানোটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন কেন?

ও দেয়নি। ওর মায়ের আপত্তি ছিল খুব।

খুব মাতৃভক্ত ছেলে?

ঠিক তা নয়। আমাদের তো জাতের মিল নেই, তাতেই ওর মা প্রথমে আপত্তি করেছিলেন। পরে অবশ্য মেনে নেন। সেই জন্যই চাকরির ব্যাপারে আর মায়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করা যায়নি। একটা কোনও কাজ থাকলে তবু আমি...।

আমি তাহলে এখন উঠি?

আমার এখন কী করা উচিত, তা বললেন না তো!

বাফেলোয় অন্য দু'এক জনকে আমি চিনি। তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখি। যদি কেউ কিছু খবর দিতে পারে।

ওখানে আমাকে তো প্রথমে যেতেই হবে।

তা যাবে। কিন্তু অরূপ যদি না-ই থাকে সেখানে, তুমি একলা গিয়ে আরও মুশকিলে পড়ে যাবে।

আমি কাল সকলে কী করব?

উম্‌ম... আমি তো কাল সকালেই আসতে পারব না। তুমি ঘুম থেকে উঠে তৈরি-টৈরি হয়ে নিয়ে ঘর বন্ধ করে বেরুবে। রাস্তাটা ক্রস করলেই দেখবে ডান দিকে একটা বার্গার কিং-এর দোকান। ওরা খুব ভোরেই খোলে। ব্রেকফাস্ট খেয়ে নেবে। পারবে না? কাল শুক্রবার, আমরা তো এখানে হুট করে ছুটি নিতে পারি না, ইউনিভার্সিটি যেতেই হবে। সাড়ে দশটা-এগারোটার মধ্যে চলে আসব।

আপনার অসুবিধে হলে আরও দেরি করে আসতে পারেন।

দুপুর বারোটায় তোমার চেকিং আউট টাইম। যদি কালকেই বাফেলো যেতে হয়... ঠিক আছে, সেটা কাল এসে ঠিক করব। আমার ফোন নাম্বার তো তুমিই জানোই, রাত্তিরে কোনও রকম অসুবিধে হলে আমাকে ফোন করবে।

অবনীদা, আমি কি এ-রকম ভাবে এসে পড়ে খুব ভুল করেছি?

এসেই যখন পড়েছ, তখন আর ও-কথা ভেবে লাভ নেই। এরপর কী হবে, সেটাই এখন ভাবতে হবে।

দরজা পর্যন্ত অবনীর সঙ্গে এগিয়ে এল নিশা।

সামনের লম্বা করিডরটা একেবারে শূন্য। একটা মাত্র মৃদু আলো জ্বলছে। এমনই নিঃশব্দ যে, মনে হয় ধারেকাছে আর একটিও মানুষ নেই।

অবনী বলল, হয়তো কাল অনেক বেলা পর্যন্তও তোমার ঘুম ভাঙবে না। জেট ল্যাগে এ-রকম হয়। ঘুমোতে ইচ্ছে করলে ঘুমিয়েই থেকো।

নিশা অন্য রকম গলায় ডাকল, অবনীদা —।

আর কিছু বলল না।

অবনী মুখ ফিরিয়ে দেখল, আবার নিশার দু'চোখের কোণে চিক চিক করছে অশ্রু। ঠোঁটটা একটু একটু কাঁপছে।

এক লহমার জন্য অবনীর মনে হল, মেয়েটি কি চাইছে, আমি ওকে একটা চুমু খাব?

পরে মুহূর্তেই সে ভাবল, না না, তা কী করে হয়! এ পর্যন্ত সে নিশার হাতও ছোঁয়নি। তার সঙ্গে কোনও রকম অন্তরঙ্গ সম্পর্ক নেই, তবু কি চুমু খাওয়া যায়? এ-দেশে অবশ্য ও-সব কিছু সম্পর্ক লাগে না, এক ঘণ্টার পরিচয়ে ছেলেরা-মেয়েরা বিছানায় চলে যায়। কিন্তু নিশা তো এ-দেশের মেয়ে নয়। আর অবনীরও ও-রকম অভিজ্ঞতা এ পর্যন্ত হয়নি।

তবে কি শুধু কৃতজ্ঞতার জন্য?

আর কিছু বলছে না নিশা, অবনীও শোনার অপেক্ষা না করে এগিয়ে গেল। সে টের পাচ্ছে বুকের মধ্যে একটা আলোড়ন। শরীর যেন হঠাৎ জেগে উঠে নিজস্ব আবেদন জানাচ্ছে, আর একটু হলেই একটা কিছু ঘটে যেত।

বাইরে বেরিয়ে আসার পর অবনীর মনে হল, এই মেয়েটি তার স্ত্রী হলেও তো হতে পারত। তাহলে ওর জীবন হত অন্য রকম। এমন অপমানের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ওকে আসতে হত না এ-দেশে।

নিশাও কি সেই কথাই ভাবছে?

॥ ৪ ॥

বাড়ি ফিরতে ফিরতে এগারোটা বেজে গেল।

এত রাতে কি কারুকে টেলিফোন করা যায়? অথচ বাফেলোতে খোঁজ নেওয়া বিশেষ দরকার। যত দেরি হবে, ততই নিশাকে মোটেলের ঘরভাড়া গুণতে হবে। বাফেলোতে ওকে আদৌ যেতে হবে কি না, সেটাই তো এখনও বোঝা যাচ্ছে না। মাত্র চারশো ডলার সম্বল করে বেচারি এসেছে এই দেশে।

বোস্টনেও অনেক বিবাহিত বাঙালি পরিবার আছে। সে-রকম কোনও পরিবারে নিশাকে কয়েক দিনের জন্য আশ্রয় দেবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, সে-রকম কোনও পরিবারের সঙ্গেই অবনীর ঘনিষ্ঠতা নেই। অনেকেই বাড়িতে অতিথি এসে থাকতে শুরু করলে আড়ালে বিরক্তি প্রকাশ করে। একমাত্র জহিরভাই এই ঘটনাটা কোনও ক্রমে জানতে পারলেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। কিন্তু জহির আর সীতা ঢাকা-কলকাতায় গেছেন গত সপ্তাহে।

নিশার স্বামীর হদিশ যদি শেষ পর্যন্ত না পাওয়া যায়, তাহলে ওকে দেশেই ফিরে যেতে হবে। কোথায়? সেই শ্বশুর বাড়িতেই। সেখানে তার অবস্থা এরপর আরও খারাপ হয়ে যাবে না? যে-মেয়েকে তার স্বামী ত্যাগ করেছে, স্বামীর বাবা-মা তাকে কী চোখে দেখবে?

অবনী এত সব ভাবছে কেন?

এই উটকো ঝামেলার জন্য অবনী যতটা বিরক্ত হয়েছিল প্রথমে, এখন তা অনেক কমে গেছে, মেয়েটিকে দেখার পর তার মন নরম হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। নিশার তো কোনও দোষ নেই, তবু সে কেন কষ্ট ও অপমান সহ্য করবে?

না না, যাই-ই হোক না কেন, অবনী ওর দায়িত্ব নিতে পারবে না।

আনিসারিং মেশিন চালিয়ে দেখল, হ্যাঁ, রেহানা ঠিক ফোন করেছিল। মেসেজ রেখেছে, ফিরে এলেই ফোন করবেন।

কিন্তু সে তো সাতটার সময়। এখন নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে রেহানা। ছুটির দিন ছাড়া কেউ এখানে বেশি রাত জাগে না।

রেহানা অবশ্য এক দিন রাত পৌনে বারোটায় সময় ফোন করে আকাশে ঈদের চাঁদ দেখতে বলেছিল।

দ্বিধা কাটিয়ে ফোন তুলল অবনী।

ঘুমিয়ে পড়েছিলে?

আমি কি প্যাঁচা যে, মাঝরাত্তিরে জেগে থাকব?

এখনও ঠিক মাঝ রাত হয়নি। তুমি ফোন করতে বলেছিলে।

এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

সে একটা ব্যাপার হয়েছে। তোমার ধৈর্য থাকলে শোনাতে পারি। তার আগে বলো, তুমি কেন ফোন ব্যাক করতে বলেছিলে? জরুরি কিছু?

তেমন জরুরি নয়, অন্তত আপনার পক্ষে নয়। আমার হাজব্যান্ড আনোয়ার বোস্টনে যাচ্ছে আগামী কাল, দু'দিন থাকবে। ও জানতে চেয়েছে, আপনি ফ্রি থাকবেন কি না, তাহলে আপনার সঙ্গে এক সন্ধে আড্ডা দেবে। আসল কথা, ওর চাচার বাড়িতে তো ড্রিঙ্কিং চলে না, তাই আপনার ওখানে —।

হ্যাঁ, আমি ফ্রি থাকব। আনোয়ার বোস্টনে আসছে, তুমি আসবে না?

আমার ক্লাস রয়েছে! আনোয়ার ওখান থেকে বাফেলোতে এসে কয়েক দিন থেকে যাবে। তাই আমি আর যাচ্ছি না। আপনি চলে আসুন না আনোয়ারের সঙ্গে!

তোমরা কপোত-কপোতী অনেক দিন পর এক সঙ্গে থাকবে, এর মধ্যে আমি গিয়ে কী করব? টু ইজ কম্পানি, থ্রি ইজ ক্রাউড। একটা ফরাসি কথাও আছে, মেনাজে ত্রোয়া!

আর ফরাসি ঝাড়তে হবে না। আমাদের বিয়ে হয়েছে সাড়ে পাঁচ বছর আগে, এখনও কপোত-কপোতী? আপনাকে আসতে হবে না। এক বছর হয়ে গেল, এর মধ্যেও নায়েগ্রা ফল্‌স দেখেনি, এ-বকম বেরসিক আর এক জনও আছে কিনা জানি না। এবারে বলুন, আজ সন্ধেবেলা কী ঘটল?

সেটা বলতে খানিকটা সময় লেগে যাবে। তুমি ঘুমোচ্ছিলে, ঘুমোও। কাল বরং —।

আমি ঘুমোচ্ছিলাম না। টিভিতে একটা ফিল্ম দেখছিলাম। খুব সাঙ্ঘাতিক ভূতের গল্প। ভয়ও করছিল, ছাড়াও যাচ্ছিল না। এখন বন্ধ করে দিয়েছি।

রেহানা, ওই যে অরূপ নামে ভদ্রলোক তোমাদের ওখানে থাকেন, তাঁর স্ত্রী আজ হঠাৎ দেশ থেকে এসে উপস্থিত হয়েছে। বার বার ফোন করেও অরূপের কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। আপাতত মেয়েটি এখানকার একটা মোটেলে আছে।

নিশার কাহিনিটি পুরোটাই শোনাতে হল।

রেহানা চুপ করে শোনবার পর বলল, ভদ্রলোককে আমি দু'দিন আগেও দেখেছি সুপার মার্কেটে, অনেক বাজার করলেন, এর মধ্যে কি বাফেলো ছেড়ে চলে গেলেন? ঠিক আছে, আমি খবর নিয়ে জানাব।

কাল সকালে আমি সাড়ে সাতটার মধ্যে বেরিয়ে যাব।

আপনি এখন ফোন রাখুন।

ঠিক দশ মিনিট বাদে আবার বেজে উঠল ফোন। রেহানা বলল, আমি রফিককে ফোন করে অনেক খবর জেনে নিয়েছি। ভাল করে শুনে নিন।

অবনী সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, ছি ছি, এত রাতে তুমি রফিককে বিরক্ত করলে? কাল সকালে —।

রেহানা বলল, রফিককে জাগাতে হয় না। ওকে সবাই বলে রাত রফিক। ইনসম্‌নিয়ার রুগি। আমরা বলি, বিয়ে না করলে ওর এ রোগ সারবে না। শুনুন, রফিক বলল, ওই অরূপ নামে ভদ্দরলোক এমনিতে বেশ ভাল, চমৎকার গান করেন, খুব মজার, কিন্তু খেয়ালি ধরনের। বাঙালি ছাড়াও অন্য বন্ধু-বান্ধবী আছে। হঠাৎ হঠাৎ কোথায় যেন চলে যান। মনে হয়, বাঁধা কোনও চাকরি করেন না। কিছু দিন আগে কোথা থেকে যেন অনেক টাকা পেয়ে গেছেন, দু'হাতে ওড়াচ্ছেন। কাল থেকে ওঁর অ্যাপার্টমেন্ট বন্ধ, গাড়িটাও নেই, আবার কোথাও গেছেন মনে হচ্ছে, কিন্তু অ্যাপার্টমেন্ট তো ছাড়েননি। আবার ফিরে আসবেন।

নিশা তাহলে এখন কী করবে?

ওকে বাফেলোতে পাঠিয়ে দিন।

অরূপের অ্যাপার্টমেন্ট বন্ধ। নিশা গিয়ে উঠবে কোথায়?

আপাতত আমার কাছে।

তোমার কাছে? পাগল নাকি?

এর মধ্যে পাগলামির কী হল?

আনোয়ার সাহেব যাচ্ছেন তোমার কাছে। এর মধ্যে আবাব এক জন অতিথি, না না, এটা ঠিক নয়।

একটি মেয়ে বিপদে পড়েছে, তাকে যদি আমি সাহায্য না করি, তাহলে কি আমি মানুষ? না জন্তু? আনোয়ারই জানতে পারলে আমার ওপর রাগ করবে। ও-সব কথা ছাড়ুন। ভদ্রমহিলা কি একা একা ট্রাভেল করতে পারবেন? না হলে আনোয়ারের সঙ্গে ওকে পাঠিয়ে দিন। এখানকার দায়িত্ব আমার।

একা ট্রাভল করতে পারে।

বাসে তুলে দিয়ে আমাকে জানাবেন। আমি এখানে রিসিভ করে নেব। এর মধ্যে রফিক ওর হাজব্যান্ডের খোঁজখবর নেবে। ভদ্রলোক এমন ইরেসপনসিব্‌ল কেন?

আমি তো তাকে চিনিই না।

ওর স্ত্রী, তাকে চিনতেন আগে থেকে, ওদের বিয়েতে অ্যাটেন্ড করেননি? আগেই চলে এসেছিলেন?

তা ঠিক নয়। একে আমি মাত্র একবারই দেখেছি।

ঠিক আছে, এখানে পাঠিয়ে দিন। তারপর সব দায়িত্ব আমার। গুড নাইট। খোদা হাফিজ।

অবনীও অজান্তে বলে ফেলল, খোদা হাফেজ।

ফোন ছেড়ে দিয়ে কয়েক মিনিট সে রেহানার কথাই ভাবল।

আশ্চর্য মেয়ে। অদম্য এর প্রাণশক্তি। চেনে না, শোনে না, অথচ একটি মেয়ে অসুবিধেয় পড়েছে শুনেই তার দায়িত্ব নিয়ে নিল স্বেচ্ছায়!

এরপর আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেও অনেকক্ষণ ঘুম এল না অবনীর। মনের মধ্যে একটা অপবাধবোধ খচ খচ করছে। যেন নিজের ঘাড় থেকে দায়িত্ব নামিয়ে নিশাকে সে তুলে দিল রেহানার হাতে। যদিও রেহানাকে সে জোর করেনি, কোনও ইঙ্গিতও দেয়নি। অবশ্য, একটি মেয়ে হয়ে রেহানা যতটা সাহায্য করতে পারবে নিশাকে, তা অবনীর পক্ষে সম্ভব নয়।

সকালে ঘুম থেকে উঠতে খানিকটা দেরি হয়ে গেল।

অন্য কোনও দিন এ-রকম দেরি হলে সে ছোটাছুটি শুরু করে। দাড়ি কামাতে কামাতে কফিতে চুমুক দেয়, দাঁত মাজতে মাজেতে প্যান্ট পরে। আজ সে-রকম ইচ্ছে করল না। অলস ভাবে দু'কাপ কফি শেষ করার পর সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, আজ আর ইউনিভার্সিটিতে যাবেই না। গত এক বছরে সে এ-রকম এক দিনও করেনি।

একটা টেলিফোন করে জানিয়ে দিল তার প্রফেসারকে।

তারপর তৈরি হয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল আধ ঘণ্টার মধ্যে।

মোটেলটায় এসে, লম্বা করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ তার বুকটা ধক করে উঠল। কী হয়েছে?

এক জায়গায় দেওয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিশা। চুল আঁচড়ায়নি, মুখখানা যেন রক্তশূন্য। যেন সর্বস্ব লুঠ হয়ে গেছে তার।

অবনী জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার? এখানে দাঁড়িয়ে আছ?

নিশা কোনও উত্তর দিল না।

অবনী আরও উৎকণ্ঠিত ভাবে বলল, কী হয়েছে? রাত্তিরে কোনও বিপদ হয়েছে?

নিশা তবু চুপ।

এবার অবনী তার বাহু ছুঁয়ে বলল, কী হয়েছে, বলো আমাকে।

নিশা এবার বলল, আমার মরে যাওয়াই উচিত।

অবনী মৃদু ধমক দিয়ে বলল, এ-সব কী ছেলেমানুষের মতো কথা? যা হয়েছে খুলে বলো, বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

নিশা অবনত মুখে বলল, চাবিটা... চাবিটা ভেতরে রেখে দরজা বন্ধ করে ফেলেছি।

এবারে অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে অবনী বলল, এই ব্যাপার? এটা এমন কিছু নয়। রিসেপশান কাউন্টারে গিয়ে বললে না কেন? ওদের কাছে মাস্টার কী থাকে, ওরা এসে খুলে দেবে।

নিশা তবু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

অবনী বলল, দাঁড়াও, আমি চাবি নিয়ে আসছি। প্রথম প্রথম অনেকেরই এই ভুল হয়।

নিশা বলল, অবনীদা, অবনীদা, এখন আমি কী করব? আমার সব শেষ হয়ে গেছে।

রাত্তিরবেলার মতো জায়গাটা এখন আর তেমন নির্জন নয়। দু'চারজন লোক যাতায়াত করছে, দেখছে আড়চোখে। তবে, এ-দেশে কেউ এ-রকম দৃশ্য দেখলেও থমকে দাঁড়ায় না, কোনও মন্তব্য করে না।

অবনী বলল, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি চাবি আনছি।

দরজা খোলবার পর অবনী নিশার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে এসে বলল, শান্ত হও, চোখ মোছো, কী হয়েছে, আস্তে আস্তে খুলে বলো।

খাটে বসতে গিয়েও কাত হয়ে নিচে পড়ে গেল নিশা। আর উঠল না। সেই অবস্থাতেই বলল, আমার আর কিছু নেই, যা বোকামি করেছি, তাতে আমার এখন মরে যাওয়াই উচিত।

অবনী বলল, শোনো, আগে তোমাকে আমি একটা ভাল খবর দিচ্ছি। আমি এর মধ্যে খবর নিয়েছি, তোমার স্বামী এখনও বাফেলো শহরেই থাকেন। বোধহয় দু'এক দিনের জন্য বাইরে গেছেন, কিন্তু অ্যাপার্টমেন্ট ছাড়েননি। তুমি আপাতত ওখানে একটি মেয়ের বাড়িতে থাকতে পারবে।

এ-কথা শুনেও নিশা শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

অবনী জিজ্ঞেস করল, ঘুম থেকে উঠে চা কিংবা কফি খেয়েছ? তোমাকে বলেছিলাম, রাস্তার উলটো দিকেই দোকান!

আবার পাগলের মতো কান্না শুরু করল নিশা।

সকালবেলাতেই কোনও মেয়ের এমন কান্নাকাটির দৃশ্য অবনীর মতো এক জন অবিবাহিত পুরুষের একেবারেই অভিজ্ঞতার বাইরে।

ধমক দিতে গিয়েও সামলে নিয়ে সে নরম গলায় বলল, শুধু কাঁদলে আমি বুঝব কী করে যে কী হয়েছে? তোমাকে কালকে তো বেশ স্মার্ট মেয়ে মনে হয়েছিল।

এরপর নিশা আস্তে আস্তে যে-ঘটনা বলল, তা শুনে অবনীকেও বেশ কিছুক্ষণ বাক্যহারা হয়ে যেতে হল।

রাত্তিরে একেবারেই ঘুম হয়নি নিশার।

ভোরের আলো ফুটতে না-ফুটতেই তার চা খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল। অত সকালে দোকান খোলে কি না তা সে বুঝতে পারেনি। তাই খানিকটা দেরি করে অবনীর নির্দেশ মতো বাইরে বেরিয়ে দেখতে পেয়েছিল বার্গার কিং। সকালবেলাতেই সেখানে বেশ ভিড়। কত রকম খাবার! ফ্রুট জুসই সাত রকম। চমৎকার কফির গন্ধ। সে একটা ফ্রুট জুস, এক প্লেট আলুভাজা আর কফি নিয়ে বসেছিল একটা টেবিলে। সে-টেবিলে আর এক জন লোক কাগজ পড়ছিল। চোখাচোখি হতে একবার শুধু হাই, মরনিং বলে আর কোনও কথা বলেনি। কফিটা শেষ করাব পর নিশার শবীরটা বেশ চাঙ্গা লাগল। সেখানে কত রকম মানুষ, কত রকম পোশাক, দেখতেও ভাল লাগে। আব এক কাপ কফি খেতে ইচ্ছে হল নিশার। যে-কোন কিছু কিনতে গেলেই লাইন দিতে হয়।

একটু পরে কফি নিয়ে ফিরে এসে নিশা দেখল, টেবিলের ওপর রাখা তার হ্যান্ডব্যাগটা নেই। কাগজ-পড়া লোকটিও নেই!

সেই হ্যান্ডব্যাগেই তার পাসপোর্ট, টিকিট এবং সব ডলার।

সকালবেলায় কোনও মানুষই তেমন সাবধান হয় না। চুরি-ডাকাতির কথা মনে পড়ে না। ও-সব যেন অন্ধকারের ব্যাপার। আদিম কাল থেকেই মানুষের মনেব মধ্যে রয়ে গেছে অন্ধকার-ভীতি। সব রকম বিপদ অন্ধকারের সঙ্গে জড়িত।

দীর্ঘ বিমানযাত্রা, সারা রাত ঘুম নেই, ভবিষ্যতের উদ্বেগ, এই সব মিলিয়ে নিশার মাথাটা স্বাভাবিক ছিল না। সাহেবদের দেশে, এমন প্রকাশ্যে সকালের আলোয় কেউ যে তার হ্যান্ডব্যাগটা তুলে নিয়ে যেতে পারে, এটা তার কল্পনাতেই আসেনি।

যে-নোটবইতে অবনীর ফোন নাম্বার লেখা ছিল, সেটাও ছিল ওই হ্যান্ড ব্যাগের মধ্যে। অবনীকে ফোন করারও কোনও উপায় ছিল না নিশার।

সেই দোকানের কাউন্টারে গিয়ে নিশা জানিয়েছিল তার ব্যাগ খোওয়া যাওয়ার কথা। অল্পবয়সী মেয়েরা সেখানে কাজ করে, তারা শুনে শুধু কাঁধ ঝাঁকিয়েছিল। খদ্দের সামলাতে তারা ব্যস্ত, সহানুভূতি জানাবারও সময় নেই। পাশের টেবিলে বসেছিল কয়েক জন, নিশা তাদের জিজ্ঞেস করেছিল সেই কাগজ-পড়া লোকটির কথা। তার কোনও কথা না বলে এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছে, এ-সব ব্যাপারে মাথা গলাতে চায় না কেউ।

ধাতস্থ হতে কয়েক মিনিট সময় লাগল অবনীর।

এর আগেও এ-রকম দু'একটা ঘটনা শুনেছে অবনী। এয়ারপোর্ট থেকে বেরুতে না-বেরুতেই চুরি হয়ে গেছে সব কিছু। নিশা তো তবু অনেকটা সামলে এসেছিল।

অবনী যদি ইউনিভার্সিটিতে চলে যেত, তাহলে এগারোটা-সাড়ে এগারোটার আগে তার পক্ষে এখানে আসা সম্ভব হত না। ততক্ষণ কী করতো নিশা? ওই রকম দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, না কি হঠাৎ ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত কোনও চলন্ত গাড়ির নিচে? অবনী বিশ্ববিদ্যালয়ে গেল না কেন? সে কি অবচেতনে কোনও তরঙ্গে নিশার এই বিপদের কথা টের পেয়েছিল?

এখন নিশাকে বকুনি দেবার কোনও মানে হয় না। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। থানায় একটা খবর দিতে হবে অবশ্যই, যদিও ওই ব্যাগ আর ফিরে পাবার বিন্দুমাত্র আশা নেই।

নিশার মাথায় হাত রেখে সে বলল, কেঁদো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

দু'হাতে অবনীর হাঁটু জড়িয়ে ধরল নিশা।

অবনীর শরীর শির শির করে উঠল। নিজেকে ছাড়িয়ে নিল না। আস্তে আস্তে বলল, নতুন পাসপোর্ট করা এমন কিছু ঝামেলার ব্যাপার নয়। তাছাড়া তোমার এক্ষুনি লাগবেও না। এ-দেশে একবার ঢুকে পড়লে আর কেউ পাসপোর্ট দেখতে চায় না। টিকিটও ডুপ্লিকেট পাওয়া যাবে, কমপিউটারে তো তোমার নাম আছে। শুধু চারশো ডলার। এ-দেশে এমন কিছু নয়। আর দামি কিছু ছিল না তো?

নিশা দু'দিকে মাথা নাড়ল।

অবনী বলল, আমার কাছে ক্রেডিট কার্ড আছে, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। অরূপবাবুর খোঁজ পাওয়া গেছে, এটাই তো সব চেয়ে বড় কথা। পরে ওঁকে বোলো, আমার টাকাটা শোধ করে দিতে। এখন তৈরি হয়ে নাও, আমি তোমাকে টিকিট কেটে বাফেলোর বাসে তুলে দেব। ওখানে রেহানা নামে একটি বাংলাদেশের মেয়ে আছে, আলাপ করলে তোমার খুব ভাল লাগবে। সে তোমার স্বামীকে খবর দেবার চেষ্টা করছে, যদি তিনি শহরে এখন না থাকেন রেহানা নিজে তোমাকে বাস স্টেশনে রিসিভ করবে। কোনও ভয় নেই, কোনও চিন্তা নেই।

নিশা মুখ তুলে বলল, অবনীদা, আপনি না থাকলে আমি কী করতাম এখন?

এক ঘণ্টা বাদে মোটেলের ভাড়া মিটিয়ে নিশাকে বাসে তুলে দিল অবনী। বাসটা ওখানে এক পাক ঘুরে আবার সামনে দিয়ে যায়, ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। জানলার কাচে নিশাব মুখ। কেমন যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

সেই মুখখানা সারা দিন তার মন জুড়ে রইল।

॥ ৫ ॥

রেহানার কাছে দু'দিন থাকল নিশা।

তার হ্যান্ডব্যাগ চুরি নিয়ে এমন ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে লাগল রেহানা যে, নিশার মন খারাপের কোনও অবকাশই রইল না।

প্রথম দিনেই দু'জনের তুমি তুমি সম্পর্ক হয়ে গেল। যেন কত কালের চেনা।

রেহানা বলল, ব্যাগ চুরি গেলে সব চেয়ে বেশি ক্ষতি কী হয় জানো? টাকা-পয়সার ক্ষতির চেয়েও, দু'দিন-তিন দিন পর্যন্ত মুখখানা বোকা বোকা হয়ে থাকে। অনেক শিক্ষিত মহিলাকেও তখন দেখে মনে হয়, যেন একটুও লেখাপড়া জানে না, গাঁইয়া বলদ!

নিশা জিজ্ঞেস করল, তুমি কী করে জানলে? তুমি কি এ-রকম কারুকে দেখেছ?

রেহানা বলল, আমার নিজেরই তো একবার ব্যাগ চুরি গিয়েছিল। তখন আয়নায় মুখ দেখেছি।

তারপর দু'জনেরই কী হাসি!

রেহানার কাছে সে বাংলাদেশের গল্প শোনে।

নিশার বাবা-মায়েরও বাড়ি ছিল আগেকার পূর্ববঙ্গে, জায়গাটার নাম নরসিংদি, এইটুকুই শুধু নিশা জানে, সে-জায়গা সে দেখেনি, কখনও বাংলাদেশে যায়নি।

রেহানা তাকে বাংলাদেশে বেড়াতে নিয়ে যাবে।

রবিবার, ছুটির দিন, দুপুরের দিকে একটা ফোন এল। ফোন ধরল রেহনা।

একটি পুরুষকণ্ঠ বলল, নমস্কার, আমার নাম অরূপতন দাস, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, হঠাৎ ফোন করছি, আশা করি বিরক্ত হবেন না। আমার প্রতিবেশী রফিক একটা খবর দিল, জানি না প্র্যাকটিকাল জোক কি না, তবু জিজ্ঞেস করছি, আমার স্ত্রী নাকি আপনার কাছে আছে?

রেহানা বলল, আলাপ না হলেও আপনাকে আমি চিনি, আপনার গান শুনেছি। আপনার স্ত্রী কি হারিয়ে গেছে?

অরূপ বলল, সে হারিয়ে গেছে, না আমি হাবিযে গেছি, তা বলা মুশকিল। সত্যি কথা বলতে কী, মাঝে মাঝে আমি নিজেকে খুঁজে পাই না।

রেহানা বলল, আমার কাছে একটি মেয়ে এসে রয়েছে। সে আপনার স্ত্রী কি না প্রমাণ দিতে হবে। প্রমাণ না পেলে তো যার-তার হাতে তুলে দিতে পারি না।

অরূপ বলল, প্রমাণ না পেলে আমিই-বা যে-কোনও মেয়েকে নিজের স্ত্রী হিসেবে মেনে নেব কী করে? তার সঙ্গে কি একটু কথা বলা যেতে পাবে?

রেহানা বলল, সেটুকু অনুমতি দেওয়া যায়।

নিশা ফোন ধরে শান্ত গলায় বলল, তুমি কেমন আছো? তোমাব পা ভেঙেছিল?

দারুণ আবেগের সঙ্গে অরূপ বলল, নিশা? তুমি সত্যিই এ-দেশে এসেছ? কী আশ্চর্য! আমাকে আগে খবর দাওনি?

নিশা বলল, তুমি আমার চিঠি পাওনি? টেলিফোনও করেছিলাম।

অরূপ বলল, না, চিঠি তো পাইনি। কয়েক দিন আমি শহরে ছিলাম না। ঠিক আছে, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি, তোমাকে নিয়ে আসব।

ঠিক পনেরো মিনিটের মধ্যে গাড়ি নিযে চল এল অরূপ।

ঘরে ঢুকে, রেহানাব সঙ্গে কথা বলার আগেই সাড়ম্বরে জড়িযে ধরল নিশাকে। গালে গাল ঠেকিয়ে চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত।

তারপর বলল, হোয়াট আ প্লেজান্ট সারপ্রাইজ! দারুণ কাণ্ড কবেছ নিশা। তুমি যে এত স্মার্ট মেয়ে আমি বুঝিনি। বেশ করেছ, খুব ভাল করেছ। আমি নিজেই তোমাকে —।

অরূপের পরনে জিন্‌সের প্যান্ট, জিন্‌সেরই শার্ট, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথায় লম্বা চুলের প্রান্তে একটা গিঁট বাঁধা। স্বামীর এ-রকম চেহাবা আগে দেখেনি নিশা।

রেহানা বলল, অরূপবাবু, আপনার সুন্দরী স্ত্রীটিকে খুব সাবধানে আগলে বাখতে হয়েছিল, পাছে অন্য কেউ নজর দেয়।

অরূপ রেহানার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনাকে মনে হচ্ছে আমার স্ত্রীর যমজ। আপনি অনায়াসে আমার শ্যালিকা হতে পারেন। নিশার আর কোনও বোন নেই, এই নিয়ে আমার খুব দুঃখ

রেহানা বলল, ঠিক আছে, আর দুঃখ করার দরকার নেই। কী খাবেন বলুন?

অরূপ বলল, আপনি খুব ভাল ওমলেট বানাতে পারেন শুনেছি, সেই একটা টেস্ট করে দেখতে চাই।

আপনি কী করে জানলেন?

রফিকের কাছ থেকে আপনার সব খোঁজখবর নিয়েছি। আপনার স্বামী তো আজই আসছেন।

অনেক খবর নিয়েছেন দেখছি।

আপনার অ্যাপার্টমেন্টটা তো ভারি সুন্দর। জানলা দিয়ে অনেকখানি ফাঁকা, মনে হচ্ছে যেন ক্যানাডা পর্যন্ত দেখা যায়! ঢাকাতে আপনার কোথায় বাড়ি?

ঢাকা!

একবার গান গাইতে গিয়েছিলাম। বিয়েব আগে। খুব ফ্যাসিনেটিং শহর। আমার বউকে আপনি কী করে চিনলেন?

আপনি এখানে ছিলেন না। এক জন কমন ফ্রেন্ড খবর দিল, তাই নিশাকে এখানে এনে রেখেছি।

সব কথা পরে শুনব। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানানো উচিত। অনেক মানে কত? একের পিঠে চারটে শূন্য দিলে হবে?

আরও দুটো শূন্য যোগ করুন। তাতেও ঠিক শোধ হবে না। এক দিন ভাল করে অনেকক্ষণ গান শোনাতে হবে। আর নিশা রান্না করে খাওয়াবে।

গ্র্যান্টেড। আপনার স্বামী এসে পড়বে, এখন আমাদের চটপট কেটে পড়াই উচিত। নিশা সব গুছিয়ে নাও।

অরূপের গাড়িটা ঝরঝরে, এ-দেশে যাকে বলে জ্যালোপি। ধোয়-টোয় না কোনওদিন। চালায় খুব জোরে।

গুন গুন করে গান গাইছে অরূপ, দেশের কথা, বাবা-মা কেমন আছেন, কিছুই জিজ্ঞেস করল না। মাঝে মাঝে শুধু বলতে লাগল, চিনে রাখো, এই সুপার মার্কেটে আমরা বাজার করি, এখানে মশলাপাতি সস্তা, আর কোণের ওই দোকানটা বাংলাদেশিদের, ওখানে টাটকা মাছ পাওয়া যায়। আমাদের বাড়িতে ওয়াসিং মেশিন নেই, এই লন্ড্রোম্যাটে জামা-কাপড় কাচতে হবে।

বাড়িটা তিন তলা, অরূপের ঘর সব চেয়ে ওপরে, অ্যান্টিকে। লিফ্‌ট নেই। অত বড় সুটকেস সে সিঁড়ি দিয়ে টেনে তুলবে? অরূপের পায়ে এখনও একটু একটু ব্যথা আছে।

সে কাচুমাচু মুখ করে বলল, নিশা, তুমি কি এটা তুলতে পারবে? আমি তুলতে গেলে যদি আবার খোঁচ-টোঁচ লেগে যায়!

নিশা বলল, না না, তুমি হাত দিও না, আমি পারব।

বেশ কষ্ট হচ্ছে নিশার।

দো-তলার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল রফিক। উজ্জ্বল মুখ করে বলল, ইনিই বুঝি ভাবী?

অরূপ বলল, ভাবী-টাবী কিছু না। ওর নাম নিশা, ওর নাম ধরেই ডাকবে।

রফিক বলল, এত বড় সুটকেস, দিন, দিন! আমাকে দিন।

অরূপ বলল, নিজের বউকে দিয়ে সুটকেস বওয়াচ্ছি, লোকে ভাববে আমি একটা পাষণ্ড। কিন্তু আমার যে পায়ে এখন ব্যথা।

রফিক বলল, জানি তো! আমি তুলে দিচ্ছি।

অরূপ বলল, চিনে রাখো, এই হচ্ছে পরপোকারী রফিক। যখন যা অসুবিধে হবে, বিনা দ্বিধায় এর শরণাপন্ন হবে।

নিশা কৃতজ্ঞ চোখে তাকাল রফিকের দিকে।

রফিক বলল, আমি দো-তলায়, আপনাদের পদতলেই আছি!

চাবি দিয়ে দরজা খুলে অরূপ বলল, এসো রফিক, এক কাপ কফি খেয়ে যাও।

রফিক বলল, না, আমি এখন দৌড়োব। অলরেডি লেট করে ফেলেছি। ভাবী, আপনার সাথে পরে আলাপ হবে। আসি।

নিশা মাথা হেলাল।

যে-সব মেয়ে স্বামীর পেছনে কাপড়ের পুঁটুলির মতো দাঁড়িয়ে থাকে, নতুন কারুর সঙ্গে আলাপ হলেও কথা বলতে পারে না, নিশা সে-রকম নয়। সে নিজেই অনুভব করল, রফিকের সঙ্গে কিছু বলা উচিত ছিল, অন্তত ধন্যবাদ জানানো, কিন্তু কিছুতেই সে আড়ষ্টতা কাটাতে পারছে না।

যথারীতি ঘরের মধ্যে সব জিনিসপত্র এলোমেল ভাবে ছড়ানো।

অরূপ বলল, এই তোমার নতুন সংসার। এবার নিজের মতো করে গুছিয়ে নাও। ওঃ, কত দিন পরে আবার সংসারী হচ্ছি!

ফ্রিজ খুলে সে একটা বিয়ারের ক্যান বার করল।

নিশার মনে হচ্ছে, সে যেন অন্য কারুর বাড়িতে অতিথি হয়ে এসেছে। অরূপ যে মাসের পর মাস চিঠি লেখেনি, চিঠির উত্তরও দেয়নি, টেলিফোন ধরেনি, তার কোনও চিহ্ন নেই তার ব্যবহারে। যেন সে নিশার প্রতীক্ষাতেই বসে ছিল।

তবু নিশা অনুভব করছে, অরূপের ব্যবহারে কেমন যেন একটা সূক্ষ্ম কৃত্রিমতা আছে।

ঘরের ঠিক মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে রইল নিশা।

অরূপ বলল, অ্যাপার্টমেণ্টটা ছোট, পরে একটা বড় জায়গায় যাব ঠিক করে ফেলেছি।

নিশা বলল, আমি একটা কথা বলব?

বলো!

শুনলে তুমি রাগ করবে, তবু আমাকে বলতেই হবে।

রাগ করব? আগে শুনি!

আমি হ্যান্ডব্যাগটা হারিয়ে ফেলেছি। তার মধ্যে আমার পাসপোর্ট, টিকিট, চারশো ডলার, সব গেছে! আমারই বোকামির জন্য।

হ্যান্ডব্যাগ হারিয়েছে! এতে রাগ করব কেন? বেশ করেছ! যারা সব জিনিস ঠিকঠাক করে, জিনিসপত্র সামলে রাখে, কখনও কিছু হারায় না, তাদের সঙ্গে আমার একটুও মেলে না। মোটে চারশো ডলার? ফুঃ!

সাইড পকেট থেকে একটা মোটাসোটা পার্স বার করে সেটা নিশার হাতে দিয়ে বলল, এটা রাখো, অনেক টাকা আছে, যেমন ইচ্ছে খরচ করবে!

তারপর সে আপন মনে, নাচের ভঙ্গিতে বলতে লাগল, ব্যাগ হারিয়েছে, ব্যাগ হারিয়েছে, হা-হা-হা-হা!

দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল নিশাকে। চুমু দিল, যাকে বলে প্রগাঢ় চুম্বন। শুরু হল আদর। টানতে টানতে নিয়ে গেল সোফার ওপর।

শারীরিক মিলনে উদ্বোধন হল এই নতুন সংসারের।

দিন সাতেকের মধ্যে এই জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেল নিশা।

সে এখন একা একা রাস্তায় বেরোয়। দোকানে কেনাকাটি করে। সে দেশে কিছু দিন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়িয়েছে, ইংরিজি বলতে তার অসুবিধে হয় না।

অরূপ যখন-তখন বেরিয়ে যায়। কোথায় যায়, বলে না। আবার কখনও ঘন্টার পর ঘণ্টা টেবিলে বসে লেখালেখি করে, সে ইংরিজিতে একটা উপন্যাস লিখতে শুরু করেছে। একটা কমপিউটার এনেছে, তবু হাতেই লেখে, এক-এক সময় অনেকগুলো পাতা ছিঁড়ে ফেলে।

সেই ছেঁড়া টুকরোগুলো উড়তে থাকে ঘরের মধ্যে।

বাড়িতে থাকলে সর্বক্ষণই সে বিয়ার খায়, গাঁজা খায়। বেশি রাতে হুইস্কি নিয়েও বসে, তখন নেশার ঝোঁকে গান গায়, বিড় বিড় করে আপন মনে বকে।

এক-এক সময় নিশা যে ঘরের মধ্যে আছে, তা যেন সে গ্রাহ্যই করে না। টেলিফোনে কারুর সঙ্গে গল্প করে বহুক্ষণ।

নিশা বুঝতে পারে, তার স্বামী এত দিনের দূরত্বে তার কাছে এখন অনেকখানি অচেনা হয়ে গেছে।

নিশার সঙ্গে অবশ্য সে খারাপ ব্যবহার করে না। সংসার নিয়ে মাথাও ঘামায় না।

শুধু এক রাত্তিরে, অরূপ মদের বোতল পাশে নিয়ে লেখার টেবিলে অনেকক্ষণ ধরে ব্যস্ত, একটাও কথা বলছে না, একা একা টিভি দেখে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে নিশা। হঠাৎ অরূপ তাকে এক ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে জড়িত গলায় জিজ্ঞেস করল, অ্যাই, তুই কে রে?

ধরমড় করে উঠে বসল নিশা।

অরূপ আবার জিজ্ঞেস করল, তুই কে? আমার বিছানায় শুয়ে আছিস কেন?

নিশা বলল, তুমি কী বলছ?

অরূপ ধমক দিয়ে বলল, কী বলছি, শুনতে পাচ্ছিস না? কানে কালা? তুই কে?

আমি নিশা। তোমার স্ত্রী।

আমার স্ত্রী! আমি আবার বিয়ে করলাম কবে?

তোমার নেশা হয়ে গেছে!

আলবাৎ নেশা হবে! কারুর বাপের টাকায় নেশা করি না। গায়ে খেটে, হা-হা-হা-হা, নিজের শরীর দিয়ে রোজাগার করি।

তুমি এবার শুয়ে পড়ো প্লিজ!

শোবো? তোর পাশে? তুই কে, তা না জেনে?

নেশা করলে কি মানুষের চোখের দৃষ্টিও নষ্ট হয়ে যায়? ভাল করে তাকিয়ে দেখো, আমি নিশা।

নিশা? নেশা! আমার কি নিশা হয়েছে, না নেশা হয়েছে? ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার নিশা নামে একটা বউ আছে। ভাল মেয়ে। সুন্দর মেয়ে। কিন্তু সে তো ইন্ডিয়ায়, এখানে আসবে কী করে? কেনই-বা এখানে আসতে যাবে? এখানে কিছু নেই। ফক্কা! কেন এখানে এসেছিস?

এসেছি তোমার জন্য!

আমার জন্য? আমি, আমি অরূপ দাস, একটা বিফল মানুষ। আমি মরে যেতেও পারতাম। জীবন নিয়ে জুয়া খেলেছি। নিশার মতো একটা সরল, পবিত্র মেয়ে আমার কাছে কী পাবে? আমার কেন পা ভেঙেছিল জানো? আমার একটাও পয়সা ছিল না, নট আ সিংগ্‌ল ডাইম, হা-হা-হা-হা, কেউ বুঝতে পারেনি, ড্যাম ইট, আমি বেঁচে আছি কেন, কেন, কেন?

হঠাৎ নিশাকে ছেড়ে দেওয়ালে মাথা ঠুকতে লাগল অরূপ।

প্রথমে ভেবেছিল, এ-সব মাতালের প্রলাপ, এখন নিশা আরও ভয় পেয়ে গেল। মানুষটা পাগল হয়ে গেছে নাকি? এত জোর মাথা ঠুকছে যে দুম দুম শব্দ হচ্ছে, সেই সঙ্গে কাঁদছে অরূপ।

নিশা উঠে গিয়ে জোর করে টেনে হিঁচড়ে তাকে শুইয়ে দিল বিছানায়। একটা তোয়ালে ভিজিয়ে এনে মুছে দিল মুখ। তখনও অরূপ অবোধ শিশুর মতো কেঁদেই চলেছে, কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়।

সকালে সে আবার স্বাভাবিক মানুষ। আগের রাতের কথা উল্লেখও করল না একবারও। নিশাও কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পেল না।

প্রথম দিন অরূপ যে-রকম প্রবল ভাবে শারীরিক আদর করেছিল নিশাকে, তারপর আর একবারও তাকে সে-রকম ভাবে স্পর্শ করেনি। কিছু একটা যেন দুশ্চিন্তা তার মাথা জুড়ে আছে।

রফিক আসে মাঝে মাঝে। তখন বেশ স্বাভাবিক ভাবে গল্প হয়। রফিক দারুণ গান ভালবাসে, এলেই অরূপকে কোনও না-কোনও গান শোনাবার জন্য ফরমাস করে। অরূপ গান গায়। এখন সে ইংরিজি গানও বেশ গাইতে পারে। কয়েকটা বাউল গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত ইংরিজিতে অনুবাদ করেছে, স্থানীয় টেলিভিশানেও এক দিন অরূপ সেই সব গান গেয়েছে।

এক দুপুরে বেল শুনে নিশা দরজা খুলে দেখল, একটি লম্বা মতো আমেরিকান মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার দু'কাঁধে কয়েকখানা ঝোলা ব্যাগ, মাথার চুল উলুস ঝুলুস, ঠোঁটের এক কোণে একটা বড় আঁচিল।

দু'জনেই দু'জনকে দেখে কয়েক মুহূর্ত থমকে রইল।

তারপর লিজই আগে খানিকটা যান্ত্রিক ভাবে বলল, হাই! আই অ্যাম লিজ সেগান।

অরূপ টেবিলে বসে লিখছিল, উঠে এসে বল, লিজ! কাম অন ইন। মিট মাই ওয়াইফ নিশা।

ওয়াইফ কথাটা শুনে লিজের মুখে সামান্য একটা ছায়া খেলে গেল। তার পরই সে নিশার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, গ্ল্যাড টু মিট ইউ!

অরূপ জিজ্ঞেস করল, লিজ, তুমি মেরিল্যান্ড থেকে কবে ফিরলে? অনেক দিন তোমার পাত্তা নেই।

লিজ বলল, আজই সকালে। মা অসুস্থ ছিল, তাই থেকে যেতে হল। মা এখন ভাল আছে।

অরূপ নিশাকে বলল, নিশা, এই আমার বান্ধবী লিজ। ওর কাছে আমি স্প্যানিশ ভাষা শিখছি।

নিশা বলল, আপনি বসুন। একটু চা কিংবা কফি খাবেন?

অরূপ বলল, ও চা-কফি একদম খায় না। বিয়ার দিচ্ছি।

লিজ নিশাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি বেঙ্গলি? ক্যালকাটা থেকে আসছেন? বেঙ্গলি হলে নিশ্চয়ই ফুলকপি ভাজা করতে পারেন? এক্ষুনি খেতে পারি।

দু'চার মিনিট কথার পর নিশা ফুলকপি ভাজতে গেল, আর অরূপ সিগারেটে ভরতে লাগল গাঁজা।

অরূপের জোরাজুরিতে নিশা এর মধ্যে দু'একবার গাঁজা-সিগারেটে টান দিয়ে দেখেছে, তার সহ্য হয়নি। তার বেদম কাশি হয়। এরপর অনেকক্ষণ ধরে লিজ আর অরূপ গাঁজা টানতে টানতে গল্প করতে লাগল নিজেদের মধ্যে, নিশাকে পাত্তাই দিল না।

তারপর দু'জনেই এক সঙ্গে বেরিয়ে গেল সন্ধের সময়।

পরদিন দুপুরে প্রায় ওই একই সময় বেজে উঠল টেলিফোন। নিশা ফোন তুলে শুনল স্ত্রীকণ্ঠ। লিজ। সে জিজ্ঞেস করল, নিশা, তুমি কি খুব ব্যস্ত আছ? আমি একবার তোমার ওখানে আসতে পারি?

অরূপ দশটার সময় বেরিয়ে গেছে, লাঞ্চ খেতেও আসেনি।

সে বলল, অরূপ তো এখন বাড়িতে নেই।

লিজ বল, অরূপ নেই তা জানি, আমি তোমার সঙ্গেই কয়েকটা কথা বলতে চাই। আসব?

এসো।

আজ লিজের চুল আঁচড়ানো, স্কার্ট-ব্লাউজ পরা, মুখখানায় বেশ শান্ত ভাব। অতগুলো ঝোলা ব্যাগ নেই। একটা দামি পারফিউম ও এক বাক্স ভাল সাবান এনেছে।

সেগুলো নিশার হাতে দিয়ে বলল, আমি দুঃখিত, কাল তোমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলা হয়নি। অত দূর থেকে তুমি আমাদের দেশে এসেছ, তোমাকে ওয়েলকাম করা উচিত ছিল। এক-এক দিন আমার মাথার ঠিক থাকে না। তোমার কেমন লাগছে এ-দেশে?

নিশা শুকনো ভাবে বলল, ভালই তো।

দেশের জন্য মন কেমন করছে না? আমি শুনেছি, ও-দেশ থেকে যারা নতুন আসে, তার প্রথম কিছু দিন হোম সিকনেসে ভোগে।

দেশের জন্য? হ্যাঁ, মন কেমন করে। যদিও দেশে আমার আপন জন বলতে বিশেষ কেউ নেই।

আমি তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে এসেছি নিশা। কী করে শুরু করব, বুঝতে পারছি না। একটা অনুরোধ করব? আমি যা বলব, তুমি বিশ্বাস করবে? আই হেট টু টেল লাইজ!

শুধু শুধু তুমি দুপুরবেলা মিথ্যে কথা বলতে আসবে কেন? আমি তো তোমার কাছে কিছু জানতে চাইনি।

তবু আমার বলা দরকার। অরূপ আমার বেশ কিছু দিনের বন্ধু। ও নানা রকম গান করে। গান ভালবাসে খুব, সেখানেই আমাদের মিল। মানুষ হিসেবেও খুব ইন্টারেস্টিং। কিন্তু ও যে বিবাহিত, সে-কথা আমাকে কোনও দিন ঘুণাক্ষরেও বলেনি। আমি ওর বাড়ির কথা অনেক বার জানতে চেয়েছি। ও অনেক লোকের কথা বলেছে, কিন্তু নিজের স্ত্রীর অস্তিত্বের কথা উচ্চারণও করেনি।

হয়তো আমার কথা ভুলেই যেতে চেয়েছিল। আমি জোর করে এখানে এসেছি। জানি না, সেটা আমারই ভুল হয়েছে কি না।

সেটা তোমাদের দু'জনের ব্যাপার। কিন্তু সে-জন্যে আমি কোনও কারণ হতে চাই না। পৃথিবীতে বিবাহিত লোকেরা অনেকেই বউয়ের কথা গোপন করে অন্য মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, প্রেম করে, এমনকী শয্যাসঙ্গীও হয়, এটা এমন কিছু নতুন ব্যাপার নয়। বিবাহিত মেয়েরাও কি এ-রকম করে না? বিয়ে জিনিসটাই তো একটা কৃত্রিম সামাজিক বন্ধন! আমি ও জিনিসটার কানাকড়িও মূল্য দিই না।

সেটা তোমাদের দেশে সম্ভব। কিন্তু আমাদের দেশে —।

শোনো নিশা, বিয়ে হোক বা না হোক, কোনও নারীর কাছ থেকেই তার পুরুষকে আমি কেড়ে নিতে চাই না। সেটা আমার রুচিতে বাধে! তাছাড়া মিথ্যে কথা বলে ও আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে গেল কেন? কাল আমি আগে থেকেই একটু নেশা করে এসেছিলাম, তখন মাথার ঠিক থাকে না। ঠিক খেয়াল করিনি। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে হল, অরূপের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ। এটা একশো ভাগ সত্য। আগে যা হয়েছে, সেটা যদি তুমি মেনে নিতে পারো, তবে আমি বলছি, আমার দিক থেকে তোমার কোনও রকম বিপদ হবার সম্ভবনা নেই। এরপর অরূপ আমার কাছে গেলে আমি তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেব।

নিশা চুপ করে রইল।

লিজ নিশার বাহু ছুঁয়ে আবেগের সঙ্গে বলল, এটা তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে।

নিশা কী বলবে, ভেবে পেল না।

লিজ আবার বলল, তুমি একটি মেয়ে, আমিও একটি মেয়ে, আমি জীবনে কক্ষনও কোনও মেয়ের ক্ষতি করব না। পুরুষরা এখনও কত রকম ভাবে মেয়েদের দমিয়ে রাখে, তার পরে মেয়েরাও যদি মেয়েদের সঙ্গে শত্রুতা করে, তাহলে আমরা ওদের সঙ্গে সমান হয়ে দাঁড়াব কী করে?

ধন্যবাদ, লিজ।

এখনও বিশ্বাস করছ না?

করছি।

অরূপ মানুষটা ঠিক খারাপ নয় কিন্তু। অনেক গুণ আছে। এক-এক জন মানুষ বোধহয় একাকিত্বের অসুখ নিয়ে জন্মায়। কিছুতেই সেটা ঘোচে না। তাই তারা এক-এক সময় ছটফট করে, হিংস্র হয়ে ওঠে, অনেকের মধ্যে নিজেকে লুকোতে চায়, অরূপও সে-রকম। আমি ছাড়াও ওর আরও বান্ধবী আছে। মার্থা নামে একটা মেয়েকে নিয়েও ক'দিন খুব মেতে উঠেছিল। কিন্তু আমি জানি, কারুর সঙ্গেই ওর গভীর সম্পর্ক হয় না, সবই ওপর ওপর, সব সময় অস্থির। তোমাকে একটা কথা বলব নিশা? শুধু এক জন মানুষের স্ত্রী হয়ে থাকা ছাড়াও তোমার একটা নিজস্ব অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা উচিত। তোমার একটা আলাদা পরিচয়। তাহলে অরূপও তোমাকে সম্মান করতে বাধ্য হবে।

সে-কথা আমিও অনেক বার ভেবেছি।

তুমি একটা কিছু কোর্স নাও। বাড়িতে বসে থেকো না। অথবা পৃথিবীতে একটি নতুন শিশুকে নিয়ে এসো।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে লিজ বলল, আমি বেশি বেশি কথা বলছি, না? বক্তৃতার মতো শোনাচ্ছে? মাস্টারি করি তো! আমি ক্লাসে ভাল পড়াই। আবার আমার মধ্যেও সব কিছু ভাঙার একটা প্রবণতা আছে। নিজেকেও ভাঙতে চাই। সব রকম নিয়ম ভাঙতে চাই। বোধহয় সেই জন্যই নেশা কবা —। চলি, আমার কাজ আছে।

দরজার কাছে গিয়ে সে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে তোমার বন্ধু বলে গণ্য করলে খুব খুশি হব।

॥ ৬॥

পর পর দু'দিন অরূপ প্রায় একটাও কথা বলল না নিশার সঙ্গে।

কখনও সে লিখছে, কখনও পায়চারি করছে ঘরের মধ্যে, অথবা ঝুপ করে শুয়ে পড়ছে লম্বা সোফাটাতে। হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়ে যাচ্ছে, কিংবা খেতে বসেও উঠে যাচ্ছে মাঝখানে। নিশা কিছু জিজ্ঞেস করলে, উত্তরে শুধু হ্যাঁ কিংবা না।

দিনের পর দিন সে স্নান করে না, দাড়ি কামায় না, জিন্‌সের যে প্যাণ্ট-শার্ট পরে থাকে সারা দিন, তাই পরেই ঘুমোয়। সিগারেটের টুকরো জমে জমে অ্যাশট্রেটা পাহাড় হয়ে যায়।

তৃতীয় দিন আবার একটা দারুণ চমক পেল নিশা। ঘুম থেকে চক্ষু মেলেই। এত সকালেই স্নান করে নিয়েছে অরূপ, চুল ভিজে। পরিষ্কার দাড়ি কামানো। সব চেয়ে বড় কথা, সে পরে আছে ধপধপে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। যেন সম্পূর্ণ নতুন মানুষ।

নিজে দু'কাপ চা বানিয়ে নিশাকে ডেকে তুলেছে।

বিছানায় উঠে বসে চায়ে চুমুক দিল নিশা। অরূপ একটু দূরে, চেয়ারে।

অরূপ শান্ত গলায় বলল, তোমাকে কয়েকটা কথা বলা দরকার নিশা। ক'দিন তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিনি, তাতে তুমি নিশ্চয়ই কষ্ট পেয়েছ। সে-জন্য আমার মায়াও হচ্ছিল, অথচ মেজাজ ঠিক করতে পারছিলাম না। আমি এ-রকমই। একটা কথাজিজ্ঞেস করি, আমার সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি, কথা হয়নি, তবু তুমি হুট করে এই দূর দেশে চলে এলে কোন সাহসে?

নিশা সরাসরি অরূপের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমিও এ-রকমই।

অরূপ বলল, বাঃ! তুমি এসেছ বলে আমি যে খুশি হইনি, তা নয়। কেন খুশি হব না? আমি তোমাকে ভালবেসে বিয়ে করেছি, কেউ তো জোর করে বিয়ে দেয়নি। সে-ভালবাসা চলেও যায়নি। আবার এ-কথাও ঠিক, খানিকটা অস্বস্তিও বোধ করেছি। সংসার মানেই দায়িত্ব! দায়িত্ব নেবার অভ্যেস আমার চলে গেছে। যখন যা খুশি করি। এখন একটা দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে নেওয়া —।

নিশা বেশ জোর দিয়ে বলল, আমি তোমার বোঝা হয়ে থাকতে চাই না। তুমি আমার পাসপোর্ট আর টিকিট উদ্ধার করার ব্যবস্থা করে দেবে? আমি ফিরে যাব।

অরূপ বলল, হ্যাঁ, সেগুলি উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে হবে এবার। কিন্তু তুমি কেন ফিরে যাবে? আমি তো তোমাকে বোঝা বলিনি। দায়িত্বটাই বোঝা। সেটা যদি ভাগ করে নেওয়া যায়...। আসলে কি জানো নিশা, আমি নিজেকেই বিশ্বাস করতে পারি না। এবার সামলে উঠতে হবে। আজ সকালে হঠাৎ মনে হল, এবার অন্য জীবন শুরু করা দরকার। তুমি আমাকে সাহায্য করবে?

নিশা বলল, আমি কী সাহায্য করব জানি না। তবে, তুমি যদি বলে দাও, সাধ্যমতো নিশ্চয়হ — ।

অরূপ বলল, তোমাকে একটা কথা বলা দরকার। আমার অনেক দিন চাকরি নেই, এলেবেলে চাকরি করতেও ইচ্ছে করে না, মন টেঁকে না। এর মধ্যে আমি এমন একটা কাণ্ড করেছি, শুনলে তুমি শিউরে উঠবে। জীবন নিয়ে জুয়া খেলেছিলাম। তখন আমার হাতে একটাও পয়সা ছিল না। বাড়িভাড়া বাকি, চতুর্দিকে ধার। তখন লেসলি নামে একটা কালো ছেলে একটা বুদ্ধি দিল। ইনসিওরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে টাকা আদায় করা। তার একটা উপায়, বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া। আগে ফায়ার ইনসিওরেন্স করিয়ে তারপর ক্ষতিপূরণ চাওয়া। কিন্তু তাতে ঘরের মধ্যে কিছু অন্তত দামি দামি জিনিস রাখতে হয়, আগুন ধরার আগে সেগুলো সরিয়ে নিলেই হল। কিন্তু দামি জিনিস রাখার সামর্থ্যও ছিল না, আগেই সব বিক্রি করে দিয়েছি। আর একটা উপায়, কোনও চলন্ত গাড়ির সামনে ঝাঁপিয়ে পড়া। এমন ভাবে পড়তে হবে, যাতে বিশেষ ক্ষতি না হয়। বড় রাস্তায় গাড়ি খুব স্পিডে ছোটে। কোনও গলি থেকে বড় রাস্তার মুখে, সকালে, যখন রাস্তায় অনেক লোক থাকে, কাছাকাছি পুলিশ আছে কি না দেখে রাখতে হয়, ইনসিওরেন্স কোম্পানি ক্লেইম দিতে বাধ্য... আমার একটু ভুল হয়েছিল, টাইমিং-এর ভুল, তাই বাঁ-পায়ের ওপর একটা চাকা এসে পড়ল, সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, আমি বুঝি মরেই গেছি।

নিশা এমন ভাবে তাকিয়ে আছে, যেন সে ভূত দেখছে। ইচ্ছে করে কোনও শিক্ষিত মানুষ, শুধু টাকা রোজগারের জন্য চলন্ত গাড়ির সামনে লাফিয়ে পড়তে পারে?

অরূপ হাসতে হাসতে বলল, এটা জুয়া খেলা নয়? রাশিয়ান রুমেৎ নামে এক রকম জুয়া আছে, রিভলবারের মধ্যে একটা মাত্র গুলি ভরে, তারপর নিজের কপালে... অবশ্য ইনসিওরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে ভাল টাকা আদায় করতে গেলে মামলা লড়তে হয়। উকিলের খরচও অনেক। সে-টাকা পাব কোথায়? এ-দেশে এক রকমের উকিল থাকে, তাদের বলে ভাল্‌চার, শকুনি। এ ধরনের ঘটনা ঘটলে তারা নিজেরাই উড়ে আসে। নিজেরাই মামলা লড়ে। ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করে, খরচ-খরচা বাদ দিয়ে তার অর্ধেকটা উকিল নিয়ে নেয়। আমি বেশ ভাল টাকাই পেয়েছিলাম! এই হচ্ছে আমার পা ভাঙার রহস্য।

নিশা বলল, তুমি আমার ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দাও, প্লিজ!

অরূপ আরও জোরে হেসে উঠে বলল, ভয় পেও না। ও-রকম কাজ দ্বিতীয় বার করতে গেলে ধরা পড়ে যাব। জীবনটা বাজি রেখে একবারই জুয়া খেলা যায়। এবার একটা কিছু চাকরি করতেই হবে। পেয়ে যাব। কিন্তু তার আগে —।

কয়েক মুহূর্তে সে স্থিরভাবে চেয়ে রইল নিশার দিকে। অনেকটা যেন আপন মনেই বলতে লাগল, তার আগে শ্লেটটা মুছে ফেলতে হবে। আই মাস্ট স্টার্ট উইথ আ ক্লিন শ্লেট। পারব কি? কেন পারব না!

আবার নিশাকে বলল, লিজি তোমাকে কী বলে গেছে আমি জানি। কিছুই অস্বীকার করছি না। এ-রকম কিছু কিছু কাণ্ড আমি করেছি। লোকে যা ইম্‌মরাল বলে, সে-রকম অনেক কীর্তি করেছি নেশার ঝোঁকে। আমার লিবিডো প্রবল। সংযম-টংযম গ্রাহ্য করিনি। কিন্তু এবার সত্যিই সে-সব পুরনো ব্যাপার মুছে ফেলতে চাই। তোমাকে নিয়ে একটা সুস্থ, সুন্দর জীবন শুরু করতে চাই। আগে যা যা করেছি, তার জন্য কি তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে? স্বামী হিসেবে নতুন করে মেনে নিতে পারবে আমাকে?

নিশা হঠাৎ কাঁদতে শুরু করে দিল।

অরূপ অস্থির ভাবে বলল, নিশা, চুপ করে থেকো না, বলো, বলো, আমি সব কিছুর জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।

নিশা কান্না সামলাতে পারছে না, কথা বলতে পারছে না।

এরপর সারা দিনটা যেন নিশার জীবনে সব চেয়ে মধুর দিন।

অরূপ বাইরে বেরুল না। সে নিজে নতুন নতুন রান্না করে খাওয়াল নিশাকে। বিয়ার পান করল না, গাঁজা টানল না, শুধু মুখোমুখি বসে অনেক গল্প।

এক সময় অরূপ বলল, তুমি এত দিন এসেছ, তোমাকে তো কিছুই দেখানো হয়নি। এই শহরে এসে সবাই আগে নায়েগ্রা ফল্‌স দেখতে যায়। একটা ব্রিজ পেরিয়ে, ও-পারে ক্যানাডার দিক থেকে দেখা যায় খুব ভাল করে। চলো, কালই নিয়ে যাব তোমাকে।

একটু ভেবে সে আবার বলল, আরও কয়েক জনকে নিয়ে বেশ একটা পিকনিক করলে হয়। দাঁড়াও, রফিককে জিজ্ঞেস করি।

ফোনে কথা হল রফিকের সঙ্গে। রফিক রাজি, কিন্তু কালই যেতে পারবে না, তিন দিন পরেই শনিবার, সেই দিনই তার সুবিধে।

অরূপ তাতেই রাজি। রফিকের গাড়িটা বড়, যাওয়া হবে সেই গাড়িতে।

পরবর্তী দু'দিন বেশ ব্যস্ত রইল অরূপ। নানা জায়গায় চাকরির সন্ধান করছে। সন্ধের সময় সে অনেক রকম কেক-পেস্ট্রি কিনে আনে। নেশা করে না। গান শোনে। সত্যিই সে যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে।

শনিবার বেলা এগারোটায় বেরিয়ে পড়ার কথা। তার আগে অরূপ বলল, তাকে এক জায়গায় ইণ্টারভিউ দিতে যেতে হবে। ফিরে আসবে ঠিক এগারোটার মধ্যে। বড় জোর পাঁচ-দশ মিনিট দেরি হতে পারে।

স্নান-টান সেরে তৈরি হয়ে নিল নিশা। আজ সে বেশ সাজগোজ করল। এই প্রথম তার বেড়াতে যাওয়া।

এর মধ্যে রেহানার সঙ্গেও কথা হয়েছে, সে-ও যাবে। এখানকার পাট চুকিয়ে রেহানা চলে যাচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ায় আর চার দিন পরে। সেখানে সে তার স্বামীর কাছাকাছি থাকবে।

এগারোটার একটু আগেই পৌঁছে গেল রেহানা।

রফিকও ওপরে এসে তাড়া দিল, সব রেডি তো?

একটা বাস্কেটে নানা রকম খাবার-দাবার, বিয়ার, কোল্‌ড ড্রিংকস গুছিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখন শুধু অরূপের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা।

সাড়ে এগারোটা, বারোটা বেজে গেল, অরূপের পাত্তা নেই।

ওরা তিন জন গল্পে মেতে আছে বটে, মাঝে মাঝেই ঘড়ি দেখছে অস্থির ভাবে। সাড়ে বারোটা, একটা, দেড়টা...।

টেলিফোন বেজে উঠল। নিশা ধরার পর অরূপ বলল, ছি ছি, কী লজ্জার কথা, তোমরা নিশ্চয়ই তৈরি হয়ে বসে আছ, আমি বিশ্রীভাবে আটকে গেছি। এখানকার জেনারাল ম্যানেজার আমাকে বসিয়ে রেখেছে, কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমাকে কথা বলিয়ে দিতে চায় আজই। তোমরা বেরিয়ে পড়ো, ফোনটা রফিককে দাও।

রফিক বলল, তুমি আসতে পারছ না? তাহলে আজ থাক।

অরূপ বলল, না না, শুধু শুধু তোমরা দিনটা নষ্ট করবে কেন? তোমরা চলে যাও। আমি যদি আর কিছুক্ষণের মধ্যে ছাড়া পাই, আমি ওখানে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে জয়েন করব। তুমি গাড়িটা পার্ক করবে কোথায়? আমি খুঁজে নেব। আর দেরি কোরো না, মেঘলা হয়ে গেলে রামধনুটা দেখতে পাবে। নিশাকে ভাল করে ঘুরিয়ে দেখিও। নিশার ভার তোমার ওপর।

ফোন ছেড়ে দিয়ে রফিক বলল, অরূপের কি শরীরটা খারাপ? গলার আওয়াজ ভাঙা ভাঙা শোনাল!

নিশা বলল, আমারও কেমন যেন লাগল। সকালবেলা তো ঠিকই ছিল।

একটু মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল নিশার। কিন্তু বেড়াতে গিয়ে সে অপূর্ব আনন্দ পেল। নায়েগ্রা জলপ্রপাতের বিষয়ে সে জানত, ছবিতেও দেখেছে, কিন্তু নিজের চোখে দেখার অভিজ্ঞতাই অন্য রকম। এত বিশাল! এমন স্পষ্ট, স্থায়ী রামধনুও সে আগে কখনও দেখেনি।

এই শহরে যারা থাকে, তাদের বার বার নায়েগ্রা দেখতে হয়, অতিথিদের জন্য। রেহানা দেখেছে তিনবার, রফিক দেখেছে সতেরো বার। ওদের আর তেমন আগ্রহ থাকার কথা নয়। কিন্তু ওরা, বিশেষ করে রফিক এমন যত্ন নিয়ে সব কিছু দেখাতে লাগল নিশাকে, যেন সে-ও প্রথম বার দেখছে।

একেবারে নিচে বোটে চড়তে গিয়ে বেশ ভয় পাচ্ছিল নিশা, রফিক তার হাত ধরে রইল। রেহানা অবশ্য ভয় পায় না, সে সব কিছুতেই হাসে।

বাড়ি ফিরে এল রাত সাড়ে ন'টায়।

অরূপ তখনও ফেরেনি। অরূপকে সব গল্প শোনাবার জন্য ছটফট করছে নিশা। খিদে নেই, তবু সে জেগে বসে রইল।

সে-রাতেই আর ফিরল না অরূপ।

পরদিনও না।

পাঁচ দিন কেটে গেল, অরূপের কোনও সাড়াশব্দ নেই। যেন মানুষটা একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

টেলিফোন বাজলেই নিশা ছুটে যায়। অন্য নারী বা পুরুষ। তারা অরূপের খোঁজ করে।

রফিক প্রত্যেক দিনই একবার করে আসে। অরূপ ফেরেনি শুনে মুখ কালো করে চলে যায়।

ষষ্ঠ দিনে রফিক একগাদা মাছ-তরকারি বাজার করে নিয়ে এল।

সে বলল, ভাবী, আমি লক্ষ্য করেছি, আপনি এর মধ্যে একবারও বাড়ি থেকে বেরোননি। টেলিফোনের জন্য অপেক্ষা করেন, তাই না?

নিশা বলল, তা বলে আপনি এত জিনিস কিনে আনবেন? আমি একা একা কত খাব?

রফিক বলল, আমাকেও তো নিজে রান্না করে খেতে হয়। কখনও আপনি রাঁধবেন, আমরা দু'জনে খেতে পারি।

নিশা বলল, তাহলে আজই আপনি এখানে খেয়ে যান।

চেয়ারে বসে রফিক বলল, ভাবী, ব্যাপারটা যদিও খুব অস্বস্তিকর, তবু আপনার জানা দরকার। আপনার স্বামী গায়ক মানুষ, স্বভাবটা খুবই বাউণ্ডুলে হয়ে গেছে। এখানকার যে-সব ছেলে-মেয়ে খুব নেশা-ফেশা করে, তাদের সঙ্গে খুব ভাব। আমি অনেক বার ঠারেঠোরে নিষেধ করেছি। এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কি আমরা পারি? লিজি নামে একটা মেয়ে আছে, এখানে অনেকেই চেনে, এ বাড়িতে বেশ কয়েক বার আসতে দেখেছি। মাঝে মাঝেই সে উধাও হয়ে যায় কোনও ছেলের সঙ্গে। সে-ই হয়তো ভুলিয়ে ভালিয়ে অরূপকে কোথাও নিয়ে গেছে।

লিজির নাম শুনে নিশার মুখখানা কয়েক মুহূর্তের জন্য কঠিন হয়ে গেল। মেয়েটা এক দিন এসে কত বড় বড় কথা শুনিয়ে গেল। সে নাকি মিথ্যে কথাকে ঘৃণা করে। তার পুরোটাই মিথ্যে! এ-দেশের মেয়েরা এমনই হয়?

মুখ তুলে সে বলল, অরূপ কি ছেলেমানুষ যে-তাকে কেউ ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে যাবে? একটা খবর পর্যন্ত দিল না!

রফিক বলল, এমনিতে মানুষটা ভাল, মাঝে মাঝে কী যে পাগলামি চাপে মাথায়!

আপনি আমার একটা উপকার করবেন? আমার পাসপোর্ট, টিকিট হারিয়ে গেছে, সেগুলোর ডুপ্লিকেট জোগাড় করার ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন?

হারিয়ে গেছে?

হ্যাঁ, বোস্টনে, চুরি গেছে! থানায় ডায়েরি করা আছে, সে-প্রমাণও আছে আমার কাছে।

টিকিটের আগে, আপনার পাসপোর্টের ব্যবস্থা করতে হবে। সেটাই আপনার আইডেনটিটি। এখানে হবে না, নিউ ইয়র্ক থেকে... আপনার ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট, ওখানে তো আমার কেউ চেনা নেই, দেখি খোঁজখবর নিয়ে।

দেখুন প্লিজ, আমি বুঝে গেছি, এ-দেশে আমার থাকা হবে না।

অত চিন্তা করবেন না। একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবেই!

কী রান্না করব, আপনি কী ভালবাসেন বলুন!

ছোট বাঁধাকপি এনেছি, তার সঙ্গে চিংড়ি মাছ দিয়ে কেমন হয়?

ভালই হবে। চিংড়ি মাছকে আপনারা ইচা মাছ বলেন না বাংলাদেশে?

অনেকে বলে। আপনি জানলেন কী করে?

আমার মা-বাবা সবাই তো বাঙাল!

দিনের পর দিন কেটে যায়, অরূপের কোনও সাড়াশব্দ নেই। কোনও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে? আবার কি সে জীবন নিয়ে জুয়া খেলতে গেছে? গাড়িটা নিয়ে গেছে, সঙ্গে ক্রেডিট কার্ড আছে, দুর্ঘটনায় পড়লে পুলিশ ঠিক পরিচয় বার করে ফেলে। টিভি-তে সেই রকম কত ঘটনা দেখায়।

প্রত্যেক দিন রফিক একবার খোঁজ নিয়ে যায়। তার আচরণ অত্যন্ত ভদ্র। দু'জনে এক সঙ্গে বসে খায় প্রায়ই, কিন্তু রফিক কক্ষনও কোনও অসভ্যতা তো দূরে থাক, হাতটাও ধরেনি।

রেহানা এখানে নেই, আর কার সঙ্গেই-বা কথা বলবে নিশা!

কয়েক বার অবনীর কথা ভেবেছে। কিন্তু অবনী তো নিজে থেকে একবারও তার খোঁজ করে না। অবনীর কাছে তার ধার আছে শুনে অরূপ তক্ষুনি সে টাকাটা পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সেই সময় অবনীর সঙ্গে ফোনে তার কথা হয়েছে। অবনী এখানকার ফোন নাম্বার জানে। সে যেন নিশার সঙ্গে কোনও রকম ব্যক্তিগত সম্পর্ক চায় না।

একবার অবনী যথেষ্ট সাহায্য করেছে, আবার বিপদে পড়ে সে অবনীর কাছে সাহায্য চাইবে কেন? না, কোনও দরকার নেই।

নিছক কৌতূহলে সে একবার ফোন করল লিজকে। সে বাড়ি নেই, চারবার রিং হবার পরেই চালু হয়ে গেল আনসারিং মেশিন। দূর ছাই বলে রেখে দিল নিশা।

শুধু ওই দূর ছাইটুকু শুনেই রাত্তিরে ফোন করল লিজ। কিন্তু এখন আর নিশার কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।

সে বলল, ফোন করেছিলাম বলে দুঃখিত। আমার কিছু বলার নেই।

লিজ বলল, এক সেকেন্ড। তুমি কি আমার সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা করেছ?

আমার আর কিছু যায় আসে না।

শোনো, আমি আজই জানতে পারলাম যে, অরূপ শহরে নেই। তোমার সঙ্গে কথা হবার পর আর একবারও অরূপের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। আমি আমার বাড়িতে তাকে আসতে বারণ করে দিয়েছি। তবে আমাদের কয়েক জন কমন বন্ধু আছে, তাদের কাছ থেকে নানা রকম খবর পাই। অরূপ তোমাকে না জানিয়ে কোথাও চলে গেছে?

সে বেঁচে আছে কি না আমি তা-ও জানি না।

মার্থা নামে আমাদের বান্ধবীকেও কয়েক দিন দেখছি না। তার গাড়ি রয়েছে বাড়ির সামনে, সে নেই। অরূপ কি গাড়ি নিয়ে গেছে?

হ্যাঁ।

তাহলে মার্থার সঙ্গেই কোথাও গেছে মনে হয়। বাল্টিমোরে একটা মিউজিক ফেস্টিভাল হচ্ছে।

থাক, আমি আর শুনতে চাই না।

সত্যিই এই ধরনের কথা আর শুনতে ইচ্ছে করে না নিশার।

এর মধ্যে সে এক দিনও আর কাঁদেনি। বরং সব সময় যেন রাগে ফুঁসছে। অনেকটা নিজেরই ওপর রাগ। কেন নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই তার?

সেই রাগটা পরদিন অকারণে রফিকের ওপরই প্রকাশ করে ফেলল।

ইলিশ মাছ জোগাড় করে এনেছে রফিক। টাটকা। নিশা দরজা খোলার পরই সে উল্লাসের সঙ্গে বলে উঠল, বৃষ্টি আসছে, আজ খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা।

রাগে গনগনে মুখ করে নিশা বলে উঠল, কেন রোজ রোজ এ-সব নিয়ে আসেন আপনি? আমি কি আপনার রাঁধুনি? আমার ওপর করুণা করছেন? আমি করুণা সহ্য করতে পারি না। আমি নিজেই নিজের ব্যবস্থা করতে পারব। ফেরত নিয়ে যান ওটা। এ পর্যন্ত কত খরচ করেছেন আমার জন্য, বলে দেবেন, আমি মিটিয়ে দেব।

মুখটা চুপসে গেল রফিকের। তবু সে মিন মিন করে বলল, আপনাকে রান্না করতে হবে না। আমি রাঁধলে আপনি খাবেন আজ?

গলা চড়িয়ে নিশা বলল, না, আমি কিছু খাব না। আমি খাই বা না খাই, তাতে আপনার কী যায় আসে?

রফিক বলল, আপনার আজ খুবই মেজাজ খারাপ দেখছি। তাহলে ইলিশ থাক ডিপ ফ্রিজে।

পরদিন সকালে আর রফিক এল না, নিশাও তাকে ডাকতে গেল না।

কেন সে বার বার অন্যের অনুগ্রহের ভিখারি হবে?

দুপুরবেলা ফোনটা হঠাৎ অচল হয়ে গেল।

রফিক এক দিন ইঙ্গিত দিয়েছিল, এখানে ফোনের বিল এক মাসের বেশি বাকি রাখলেই লাইন কেটে দেয়। এই ভাবে বান্নার গ্যাসও বন্ধ হয়ে যায়।

এই অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া কত দিন বাকি আছে কে জানে! এখানে মামলা-টামলার দিকে কেউ বড় একটা যায় না। ভাড়া দাওনি, গেট আউট। যে-কোনও দিন বাড়িওয়ালা এসে নিশাকে এখান থেকে বার করে দিতে পারে।

পাসপোর্টের ডুপ্লিকেট করার জন্য নিশাকে নিউ ইয়র্কে যেতে হবে। কে তাকে নিয়ে যাবে, কোথায় উঠবে, ভাড়ার টাকাই-বা কোথায় পাবে? এর মধ্যে আবার একমাত্র বন্ধু রফিককে মনে দুঃখ দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

ক্রেডিট কার্ডের যুগ, বাড়িতে ক্যাশ টাকা বিশেষ কেউ রাখে না। শুধু খুচরো পয়সা অনেক জমে যায়। একটা কাচের বোলের মধ্যে রাখা ডাইম আর কোয়ার্টারগুলো গুনে দেখল নিশা, মোট বিয়াল্লিশ ডলার, চল্লিশ সেন্ট। এই তার সম্বল।

অরূপ তার নামে একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে দেবে বলেছিল, দেওয়া হয়নি।

ফ্রিজ খালি, ওই খুচরো পয়সা দিয়ে এখনও রুটি-মাখন-ডিম কিনে আনা যায়, তবু বেরুল না নিশা। না খেয়ে থাকবে। কত মানুষই তো এক দিন-দু'দিন খায় না। এখনও চা-চিনি আছে।

চার দিন হয়ে গেল, রফিক আর খোঁজ নিতে আসেনি।

খুব অভিমান হয়েছে! রফিক তার ওপর জোর করে না কেন? নিশা যখন ধমকাচ্ছিল, উলটে সে-ও কেন ধমক দেয়নি? রফিক কি বুঝতে পারে না, কেন নিশার মেজাজ খারাপ হয়? তাহলে আর কীসের বন্ধুত্ব! ইলিশ মাছটা কি সে নিজে রান্না কবে খেযে ফেলেছে এব মধ্যে?

কিংবা রফিকও অন্য কোথাও চলে গেল নাকি?

নিশা রফিকের খোঁজ নিতে যাচ্ছে না বটে, কিন্তু সর্বক্ষণ মনে মনে বফিকের সঙ্গেই যেন কথা বলছে।

অরূপের ফেলে যাওয়া কিছু সিগারেট বয়ে গেছে। কোনও দিন খায় না, তবু আজ একটা সিগারেট ধরালো নিশা। না, এর মধ্যে গাঁজা-টাঁজা নেই। অনববত কাশছে, তা-ও ফেলবে না। গান বাজাতে লাগল খুব ভোরে জোরে। সাবা দিন যে কিছু খায়নি, সে-জন্য বেশ একটা অহঙ্কাব বোধ করছে। পয়সা একেবারে ফুরোয়ানি, রফিকের কাছেও কিছু চাইবে না, সে ইচ্ছে করেই না খেয়ে থাকতে পারে।

দিনের পর দিন না খেয়ে সে এই ঘরেই মরে পড়ে থাকবে। তাতে কার কী আসে যায়? এ-দেশে অনেক নিঃসঙ্গ বুড়ো-বুড়ির এই দশা হয়, দুর্গন্ধ পেয়ে দবজা ভেঙে বাব করা হয় তাদের মৃতদেহ। নিশার বয়েস এখন একত্রিশ বছর চার মাস।

পরদিন সকালে মত বদলে ফেলল নিশা।

সে কেন সম্পূর্ণ হার মানবে? সে কি নিজের চেষ্টায় বাঁচতে পারবে না? কোনও ক্রমে যদি একটা কাজ জোগাড় করা যায়, যাতে ঘরভাড়াটা অন্তত, আব খাওয়াব খরচ তো সামান্য।

অনেক দোকানের বাইরে নিশা 'হেল্প ওয়ান্টেড' এই বোর্ড ঝোলানো দেখেছে। ওগুলো অস্থায়ী চাকরি। এক মাস, দু'মাসের জন্য রাখে। আপাতত সেই রকমই একটা পেলে হয়। সে রেস্তোরাঁয় কাপ-ডিশ ধুতে পারবে, টেবিল মোছার কাজ নিতেও আপত্তি নেই। এ-দেশে অনেক ভাল ভাল ঘরের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ার খরচ জোগাবার জন্য ওই চাকরি নেয়। কোনও কাজই অসম্মানের নয়।

মন দিয়ে সাজগোজ করল নিশা। প্যান্ট-শার্ট পরল, ভুরু আঁকল, লিপস্টিক দিল ঠোঁটে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল নিজেকে। বাইরেটা দেখে কেউ কি বুঝতে পারবে যে, তার বুকটা একেবারে খালি?

দরজা বন্ধ করে নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। অনেক দিন পর।

দো-তলায় রফিকের ঘরের দরজা বন্ধ। বেরিয়ে গেছে, না ঘরেই আছে? সপ্তাহে কবে কবে যেন সে বেলা করে বেরোয়?

বাচ্চা মেয়ের মতো পা টিপে টিপে সে রফিকের দরজায় কান পেতে রইল। কার গলার আওয়াজ? ওঃ, টিভি চলছে, তার মানে রফিক ঘরেই আছে। ডাকল না নিশা।

প্রথমে একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দ্বিধা করতে লাগল। কী করে কথাটা বলতে হয়? প্রথম বাক্যটা কী হবে? আমি তোমার কাছে চাকরি চাইতে এসেছি? কিংবা আই অফার মাই সারভিস টু ইউ? কিংবা কিছু কি লিখে আনতে হয়?

এসে যখন পড়েছে, চেষ্টা করে দেখতেই হবে।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে সে কাউন্টারের কাছে দাঁড়াল। এক জন মোটাসোটা লোক সেখানে বসে আছে।

নিশা বাইরে ঝোলানো 'হেল্‌প ওয়ান্টেড' বোর্ডটার দিকে আঙুল দেখিয়ে কিছু বলার আগেই লোকটি বলল, আহ্-হা, তুমি দেরি করে এলে? একটু আগেই এক জন কথা বলে গেছে, বোর্ডটা খোলা হয়নি। তোমার মতো এক জন ফাইন, ইয়াং লেডিকে পেলে আমি খুবই লাভবান হতাম। তুমি সামনের মাসে আবার খোঁজ নিও। অবশ্যই এসো।

এর পরের দু'টি দোকানেও কাজ পাওয়া গেল না, এবং প্রথমটির মতো ভাল ব্যবহারও পেল না। দু'জায়গাতেই গম্ভীর ভাবে উত্তর পেল, দুঃখিত, আমরা পুরুষ খুঁজছি।

চতুর্থ জায়গাটিতে একটি সাংঘাতিক কাণ্ড হল।

কাউন্টারের লোকটির চওড়া ধরনের মুখ, চেহারাটি প্রায় দৈত্যের মতো। রেস্তোরাঁ চালাবার বদলে কুস্তিগির হলেই যেন তাকে মানাত।

নিশার দু'একটা কথা শোনার পরই সে বলল, পাসপোর্ট দেখি!

নিশা ইতস্তত করে বলল, পাসপোর্ট আমার সঙ্গে নেই।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, পাকিস্তানি?

নিশা বলল, না, ভারতীয়।

লোকটি এবার ঠোঁট উলটে বলল, ওই একই হল। ইল্‌লিগাল ইমিগ্রান্ট। এরা দেশটা ছেয়ে ফেলল!

নিশা পেছন ফিরে চলে যাবার উদ্যোগ করতেই লোকটি চেঁচিয়ে বলল, দাঁড়াও! আই মাস্ট ইনফর্ম দা পুলিশ! ততক্ষণ তুমি যেতে পারবে না।

পাশের টেবিল থেকে এক জন খদ্দের বলল, হেই, তুমি কোনও মহিলাকে জোর করে আটকে রাখতে পারো না।

মালিকটি বলল, ওকে ছেড়ে দিলে ও ভিড়ে মিশে যাবে। আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। পুলিশকে খবর দেওয়া আমাদের নাগরিক কর্তব্য।

খদ্দেরটি বলল, খুঁজে বার করা পুলিশের দায়িত্ব। যতক্ষণ না কিছু প্রমাণ হয়, ততক্ষণ কারুকে ধরে রাখার অধিকার তোমার নেই!

অন্য দু'এক জন খরিদ্দার উঠে দাঁড়িয়ে তাকে সমর্থন করল। আবার কয়েক জন মালিকের পক্ষে গিয়ে বলল, ও ঠিকই বলেছে, এই ইল্‌লিগাল ইমিগ্রান্টরা হাজার রকম সমস্যা তৈরি করছে। পুলিশের হাতেই ওকে তুলে দেওয়া উচিত।

শুরু হয়ে গেল দু'পক্ষের তর্কাতর্কি। পাংশু মুখে দাঁড়িয়ে আছে নিশা।

মালিকটা কাউন্টার ছেড়ে নিশার পাশে চলে এসে অসম্ভব আত্মম্ভরিতার সঙ্গে বলল, যে-যাই বলুক, আমি ওকে ছাড়ছি না। পাসপোর্ট দেখতে চাইলেই এরা পালায়। অল দিজ ডার্টি ওরিয়েন্টাল্‌স।

ভিড় ঠেলে সামনে চলে এল রফিক। শান্ত গলায় বলল, খবর্দার, ওর হাত ধরবে না।

মালিকটি চোখ দু'টি হিংস্র করে বলল, তুমি আবার কে?

রফিক বলল, এই মহিলা আমার স্ত্রী।

তারপর তেজের সঙ্গে বলল, তুমি কী করে জানলে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী? আমি আমেরিকার নাগরিক। তোমারই মতো আমার সমান গণতান্ত্রিক অধিকার। আমার স্ত্রীরও একই অধিকার।

মালিকটি বলল, দেখি তোমার পাসপোর্ট।

রফিক বলল, তুমি কি সব সময় পাসপোর্ট নিয়ে ঘোরো? তাছাড়া আমার পাসপোর্ট তোমাকে দেখাতে বাধ্য নই। এই আমার কার্ড। অফিস, বাড়ি দু'জায়গায়ই ফোন নাম্বার আছে। তুমি যত ইচ্ছে পুলিশকে খবর দিতে পারো।

মালিকটি এবার খানিকটা চুপসে গিয়ে বলল, তোমার স্ত্রী পাসপোর্ট আনেনি কেন? চাকরি চাইতে গেলে পাসপোর্ট দেখাতে হয় জানো না?

রফিক বলল, ওর পাসপোর্ট চুরি গেছে। কোনও একজন ডার্টি, হোয়াইট শিট, সান অপ আ বীচ ওর হ্যান্ডব্যাগ চুরি করেছে। পুলিশে খবর দেওয়া আছে।

তারপর বাংলায় সে নিশাকে বলল, ভাবী, চলে আসুন আমার সঙ্গে।

ভিড় দু'ফাঁক হয়ে গেল। নিশার হাত ধরে, মাথা উঁচু করে বেরিয়ে এল রফিক।

কিছুক্ষণ ওরা হাঁটল নিঃশব্দে।

একটু পরে রফিক ক্ষমাপ্রার্থীর মতো সঙ্কুচিত ভাবে বলল, ভাবী, আমাকে ওই কথাটা বলতে হল বাধ্য হয়ে। কিছু মনে করবেন না।

নিশা বলল না কিছুই।

রফিক আবার বলল, আপনার হাত ধরেছি, সে-জন্য মাপ করবেন।

নিশা মুখ নিচু করে রাস্তা দেখছে।

রফিক বলল, আপনি চাকরি করতে চান .. আমাকে বললে, কোনও ইন্ডিয়ান বা বাংলাদেশি দোকানে ব্যবস্থা করা যেত, ওরা বিশেষ কিছু জিজ্ঞেস করে না, বেতন অবশ্য কম দেয়।

এবারে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে নিশা জিজ্ঞেস কবল, আপনি ঠিক এই সময়েই এই দোকানে হাজির হলেন কী করে?

লাজুক ভাবে হেসে রফিক বলল, কাকতালীয় হতে পারে।

নিশা বলল, হতে পারে নয়, কী হয়েছে জানতে চাই।

রফিক বলল, আজ আপনি বেরোলেন অনেক দিন পর, আমার দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, টের পেয়েছি। তারপর ইচ্ছে হল, আপনার পিছু পিছু ঘুরছিলাম। প্রত্যেকটা দোকানেই দূর থেকে দেখেছি। ও-রকম গোলমাল না হলে আমি সামনে আসতাম না।

রফিকের চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে নিশা বলল, আজ থেকে আমাকে আর ভাবী বলে ডাকবে না। আমার নাম নিশা। সেটাই আমার পরিচয়। আজ থেকে আমি আর অরূপের স্ত্রী নই। স্বামীরা স্ত্রীকে ত্যাগ করে পালাতে পারে, স্ত্রীরা কেন তা পারবে না? আমার জীবন থেকে আমি অরূপের নাম মুছে দিলাম।

সে নিজে হাত বাড়িয়ে রফিকের একটা হাত ধরল।

রফিক বলল, বৃষ্টি এসে গেল, আসুন দৌড়োই।

ছুটতে লাগল দু'জনে।

ছুটতে ছুটতেই রফিক বলল, ইলিশটা এখন ডিপ ফ্রিজে রাখা আছে। আজ খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা হবে?

নিশা বলল, হবে।

॥ ৭॥

দরজার বেল শুনে খুলে দিল রফিক। ও-পাশের মানুষটিকে দেখে সে প্রথমে কথাই বলতে পারল না।

সারা সন্ধে বৃষ্টি হচ্ছে। সেই লম্বা মানুষটির গায়ে একটা রেনকোট। চুল উস্কোখুস্কো, চোখ দুটো লাল, দেখে মনে হয়, সারা দিন নেশা করেছে।

মিষ্টি হেসে অরূপ বলল, আসসালামু আলাইকুম, কী রফিক মিঞা, চিনতে পারছ না নাকি? মরিনি। জলজ্যান্ত ফিরে এসেছি। তারপর খবর-টবর কী?

শুকনো ভাবে রফিক বলল, ভাল।

অরূপ বলল, ওপরে আমার ফ্ল্যাটটা বেদখল হয়ে গেছে দেখলাম।

রফিক বলল, ভাড়া বাকি থাকলে কি মালিক ফেলে রাখে?

আমার মালপত্তর?

নিচে বেসমেন্টে রাখা আছে।

আর আমার বেটার হাফটি কোথায় বলতে পারো? তাকে তো আর বেসমেন্টে ডাম্প করা যায় না!

আপনি এত দিন পরে তার খবর নিচ্ছেন?

মতিভ্রম! মতিভ্রম! বুঝলে ভাই, মুনি-ঋষিদেরও মতিভ্রম হয়। পাগল হইয়া বনে বনে ঘুরি আপন গন্ধে মম... হা-হা-হা-হা। তা সে গেল কোথায়? দেশে ফিরে গেছে? দা বয় স্টুড অন দা বার্নিং ডেক-এর মতো সে ভাঙা সংসারে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে না জানি, কিন্তু কোথাও তো থাকবে। এ কী রফিক, তুমি দরজা আটকে দাঁড়িয়ে রইলে, আমাকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না? তোমার মতো এত ভদ্র মানুষ... বদলে গেলে নাকি?

আসুন।

ভেতরে এসে, চারদিক তাকিয়ে, নাক দিয়ে ফুঁ ফুঁ করে সে বলল, মেয়েলি গন্ধ পাচ্ছি! এর মধ্যে বিয়ে করে ফেলেছ নাকি?

রফিক বলল, না।

ভুরু নাচিয়ে অরূপ জিজ্ঞেস করল, তাহলে লিভিং টুগেদার?

রফিক বলল, কথাটার যেমন মানে হয়, সে-অর্থে নয়!

সোফায় বসে পড়েও আবার লাফিয়ে উঠে অরূপ বলল, নিশা, নিশা! আমার ধর্মপত্নী! গন্ধটা ঠিক চিনেছি। আমার নাকটা কত চোখা দেখেছ? নিশা এখানে আছে, তাই না?

রফিক ঘাড় হেলাল।

অরূপ ছুটে এসে রফিকের কাঁধ চাপড়ে বলল, গ্রেট, গ্রেট! তুমি বিপদের সময় নিশাকে আশ্রয় দিয়েছ। উপকারী রফিক! অসময়ের বন্ধুই তো আসল বন্ধু। তোমাকে কত যে ধন্যবাদ দেব! তুমিই তোমার তুলনা। নিশা কি এখন আছে? একবার ডাকো।

একটু ইতস্তত করে রফিক ভেতরে চলে গেল।

তার অ্যাপার্টমেন্টটা বড়। বসবার ঘর ছাড়াও একটা শয়নকক্ষ, রান্নাঘরেও অনেকটা জায়গা। সেই রান্নাঘরের জানলার কাছে পাথরের মর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে নিশা।

রফিক বলল, কে এসেছে, বুঝতে পেরেছ?

নিশা চুপ করে রইল।

রফিক বলল, তোমাকে ডাকছেন।

নিশা মুখ না ফিরিয়েই বলল, বলে দাও, দেখা হবে না।

রফিক বলল, যদি কিছু বলতে চান।

নিশা বলল, আমি শুনতে চাই না।

তারপর মুখ ফিরিয়ে বলল, আমি ওর মুখও দেখতে চাই না, কিছুতেই না।

রফিক বসবার ঘরে ফিরে এসে বলল, দাদা, উনি এখন দেখা করতে চাইছেন না আপনার সঙ্গে।

অরূপ বলল, রাগ করে আছে? তা তো হতেই পারে। আমার মতো একটা পাষণ্ডের ওপর রাগ করবে না? রফিক, তুমি আমার সঙ্গে আপনি আজ্ঞে করে কথা বলছ কেন? আমাদের তুমি-তুমি'র সম্পর্ক ছিল।

অনেক দিনের কথা। ভুলে গেছি।

ঠিক চার মাস। গলা শুকিয়ে গেছে, তোমার কাছে বিয়ার-টিয়াব নেই?

না। চা খাবেন?

চা? সন্ধের পর চা খেলে শরীর খারাপ হয়। ওঃ হো, আমার কাছেই তো খানিকটা আছে।

রেনকোটের পকেট চাপড়ে সে একটা স্কচের পাঁইট বার করল। খানিকটা গলায় ঢেলে দিয়ে বলল, একটু বসি। খানিক বাদে রাগ কমলে ডেকে দিও।

রফিক বলল, উনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান না স্পষ্ট বলে দিয়েছেন।

তুমিই তো বললে, তোমাদের বিয়ে হয়নি। হবেই-বা কী করে! আমার সঙ্গে তো ডিভোর্স হয়নি। তার মানে, নিশা এখন আমার আইনসঙ্গত স্ত্রী। ওর সঙ্গে দেখা করাব আমার রাইট আছে।

উনি যদি না চাম...।

আমি ভেতরে যাব।

সেটা সম্ভব নয়।

আমি যেতে চাইলে তুমি কী করবে?

বাধা দেব। আপনি জানেন, আপনার থেকে আমার গায়ের শক্তি বেশিই হবে। কিন্তু আমি বলপ্রয়োগ একেবারে পছন্দ করি না।

চোপ শালা! আমাকে গায়ের জোর দেখাচ্ছিস? আইন আছে না, পুলিশ আছে না? আমার বিয়ে করা মাগ, আমি চুল ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাব।

হুইস্কিতে আর একটা চুমুক দিল অরূপ।

কঠিন মুখে রফিক বলল, আপনি আইন দেখাচ্ছেন, পুলিশ দেখাচ্ছেন! ও-সব বাইরে গিয়ে যা ইচ্ছে করুন। আমার এখানে ও-রকম কোনও কথা শুনতে চাই না। প্লিজ গো।

না, যাব না! আমার বউকে তুই লুকিয়ে রেখেছিস শালা! দেখা করতে দিবি না কেন রে?

আমি মোটেই লুকিয়ে রাখিনি। তিনি এখানে আছেন, তা আমি অস্বীকার করিনি। তিনি দেখা করতে চাইলে আমার কোনওই আপত্তি নেই। কিন্তু আপনাকে আমি জোর ফলাতে দেব না!

নিশা! নিশা!

প্লিজ, ও-রকম চিৎকার করবেন না। আপনি নিজের মান-সম্মান নষ্ট করছেন।

আমার মান-সম্মান বলে কিছু নেই। আমি শালা পাগলা দিগম্বর! বোম ভোলা! নিশা, নিশা, একবারটি এখানে এসো। লক্ষ্মীটি!

ও-রকম ভাবে চেঁচিয়ে কোনও লাভ নেই।

আমাকে ভয় দেখাচ্ছ, রফিক। নিশাকে তোমার বিয়ে করার মতলব?

আমার কোনওই মতলব নেই।

লিভিং টুগেদার কত দিন চালাবে? তোমাদের বাংলাদেশিরাই বয়কট করবে তোমাকে। বিয়ে করতে পারবে না। আমি ডির্ভোস দিলে তো! দেব না, কিছুতেই দেব না। তোমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাব।

এ-সব অবান্তর কথা আমি শুনতে চাই না।

তোমাকে গালাগালি দিয়েছি বলে আমি দুঃখিত। হঠাৎ হঠাৎ মাথা গরম হয়ে যায়। ওটাই তো আমার রোগ। মাপ করে দাও! এবার ঠাণ্ডা মাথায় বলছি, নিশা এত দিন তোমার সঙ্গে ছিল, আই ডোনট্ মাইন্ড, আমিও তো... ওতে কিছু আসে যায় না। জানো তো, অমৃত কখনও উচ্ছিষ্ট হয় না? এখন নিশাকে আমি ফেরত চাই। আমি আবার সংসার পাতব। চাকরি পেয়েছি, আর কোনও প্রবলেম নেই। এবার থেকে সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে। এই কথাগুলো বলতে দাও আমাকে!

উনি আসতে চাইছেন না, তা আমি কী করব?

কোন ঘরে আছে?

যে-ঘরেই থাক, আপনার জোর করে যাওয়া চলবে না!

তাহলে এখান থেকেই বলি? নিশা, ফিরে এসো! তুমি আমার বউ! নিজের অধিকারে, নিজের সংসারে থাকবে। পুরনো সব কিছু মুছে ফেলব। ট্রাস্ট মি! নতুন ভাবে জীবন শুরু হবে। আই ওয়ান্ট আ চাইল্ড! নিশা, ফিরে এসো! সোনা আমার, লক্ষ্মী আমার! তোমার জন্য বুকটা টন টন করে। মাইরি বলছি! অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে তোমার তুলনাই হয় না!

নিশা ঠায় একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে জানলার দিকে মুখ করে। এবার সে দু'হাতে কান চাপা দিল।

আর এক চুমুকে বোতলটা শেষ করে ছুঁড়ে ফেলে দিল অরূপ। সেটা ভাঙল ঝন ঝন করে।

তারপর বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে উঠল, এই হারামজাদি, বেরিয়ে আয়! বড় বেশি দেমাক হয়েছে, তাই না? তোর বিষদাঁত কী করে ভাঙতে হয় আমি জানি।

রফিক সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, মাইন্ড ইয়োর ল্যাঙ্গোয়েজ। আমার ধৈর্য শেষ হয়ে যাচ্ছে।

চোপ শালা, বলে রফিককে একটা ধাক্কা দিতে গিয়ে অরূপ নিজেই টলে গিয়ে ধড়াম করে পড়ে গেল মেঝেতে। বেশ জোরে মাথা ঠুকে গেছে।

কয়েক বার উঃ উঃ করার পর সে গলার সুর বদলে ফেলে কাতর ভাবে বলতে লাগল, ভুল, ভুল, সবই ভুল হয়ে গেছে। আর তোমাকে কষ্ট দেব না নিশা। তুমি নতুন জীবন শুরু করো। শুধু একবার দেখতে দাও তোমাকে। এই পাপী, হতভাগাটাকে তুমি ক্ষমা করো। তোমার পা ছুঁয়ে ক্ষমা চাইব। সত্যি কথা, এটা আমার অন্তরের কথা। একবার দেখা দাও, নিশা, নিশা —।

কাতরাতে কাতরাতে সে থেমে গেল। উপুড় হয়ে পড়ে রইল সে একটা ধ্বংসস্তূপের মতো।

রফিক একটা জলের বোতল এনে বলল, একটু পানি খেয়ে নিন।

মাথা তুলে অসহায়ের মতো রফিকের দিকে চেয়ে রইল অরূপ। জল পান করল অনেকখানি।

বিড় বিড় করে বলল, পাগলামি করছি। সত্যি পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি? আমার হাতটা ধরে তোলো তো রফিক!

রফিক তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল।

চোখে যেন কিছু দেখতে পাচ্ছে না, মাথাটা ঝাঁকাল কয়েক বার। তারপর অরূপ বলল, লস্ট কেস! আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়! চলি রফিক, আর কোনও দিন তোমাদের ডিসটার্ব করব না। নিরুদ্দেশের পথিক, সেই-ই ভাল। সে-ই ভাল সে-ই ভাল, আমারে না হয় না জানো —।

রফিক বলল, গাড়ি এনেছেন? এহ অবস্থায় চালাতে পারবেন?

কোনও উত্তর দিল না অরূপ, টলতে টলতে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। দরজা খোলা রেখেই বেরিয়ে গেল। রফিক এসে দাঁড়াল সেখানে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে একবার হুড়মুড় করে পড়ে গেল অরূপ। আবার নিজেই উঠে দাঁড়াল। আবার রেলিং ধরে ধরে নেমে, সদরের বাইরে চলে গেল।

রফিক ও নিশার জীবন থেকে সেটাই তার অন্তিম প্রস্থান।

নতুন বছরে সস্ত্রীক বাংলাদেশে বেড়াতে এসেছে রফিক।

নিশার নাম এখন মেহেরুন্নিসা, ডাকনাম নিশাই আছে। রফিক অবশ্য বলেছিল. ধর্মান্তর গ্রহণের কোনও প্রয়োজন নেই, যে যার নিজের মতো থাকবে। নিশা বলেছিল, ওতে কিছু যায় আসে না, প্রতি দিনের জীবনে কোনও ধর্মীয় আচরণই তো পালন করা হয় না। নামটা বদলে পাসপোর্ট-ভিসার অনেক ঝামেলা এড়ানো গেছে। তাছাড়া শুধু নিশার চেয়ে মেহেরুন্নিসা নামটা তার বেশি পছন্দ, এতে ইতিহাসের গন্ধ পাওয়া যায়।

প্রথম চার দিন কাটাল ঢাকায়। গুলশান আর এলিফ্যান্ট রোডে রফিকের দুই বড় ভাই থাকে, তাছাড়া তার অনেক বন্ধুবান্ধব। সকলের সঙ্গে মিশে যেতে নিশার কোনও অসুবিধে হল না। শুধু দু'বেলা নেমন্তন্ন খেতে খেতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার জোগাড়।

অনেকে মিলে দল বেঁধে কক্সবাজারে বেড়াতে যাওয়া হবে, সে-রকম পরিকল্পনা করে রেখেছে রফিকের বন্ধুরা। তার আগে রফিককে একবার যেতে হবে দেশের বাড়িতে, মা আছেন সেখানে। ঢাকা থেকে বেশি দূর নয়।

বেরিয়ে পড়া হল একটা গাড়িতে।

শহর ছাড়িয়ে বাইরে আসার পর নিশা বলল, এটা আমার মা, বাবার দেশ ছিল। ওঁরা কত গল্প বলতেন এখানকার। মা তো এক-এক সময় কেঁদেই ফেলতেন। অথচ আমার সে-রকম কোনও অনুভূতি হত না। আমার জন্ম জামশেদপুরে। ওখানে আমার বড় মামা থাকতেন।

রফিক বলল, তা হলেও তুমি বাঙাল। এখানকার মাটির সাথে তোমার রক্তের সম্পর্ক!

নিশা বলল, কিন্তু যা-ই বলো, এখানে যা দেখছি, নতুন কিছুই মনে হচ্ছে না। একই তো রকম। তবু মা অত হা-হুতাশ করতেন কেন বুঝি না। কতবার বলতেন, তোরা হতভাগ্য, পৈতৃক ভিটেটাও দেখতে পেলি না। কী সুন্দর বাগান ছিল, কত বড় নদী! আচ্ছা বলো তো, পশ্চিমবাংলায় কি বাগান নেই, নদী নেই?

তবু নিজস্ব বাগান আর অন্যের বাগান কি এক হয?

নদীটা তো আর নিজস্ব নয়। মামার বাড়িতে বাগান ছিল জামশেদপুরে। সুবর্ণরেখা নদী আছে। খুব সুন্দর নদী!

তোমার দেখছি ওই দিকটাই বেশি পছন্দ!

বাঃ, আমি যেখানে জন্মেছি, সে-জায়গার ওপর আমার বেশি টান থাকবে না? আমার মা এখানে জন্মেছেন, মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঁদতেন। আমার সে-রকম ফিলিং হয় না, আমি কী করব?

ইতিহাসে বহু মানুষ বার বার জায়গা বদলেছে, দেশ বদলেছে। আমি যেমন জন্মেছি বাংলাদেশে, এখন হয়ে গেছি মার্কিন দেশের নাগরিক। কিন্তু ইচ্ছের বিরুদ্ধে যদি দেশত্যাগ করতে হয়, কেউ তাড়িয়ে দেয়, সে-অপমান আর দুঃখ কখনও ভোলা যায় না। যেমন হয়েছিল হিটলারের জার্মানিতে। আমাদের দেশভাগও তো সেই রকম, দুই দিকেই তো কত অসংখ্য পরিবারকে ভিটে-মাটি ছেড়ে পালাতে হয়েছে। তোমাদের বাড়ি ছিল কোথায়?

বিশেষ কিছুই জানি না। শুধু নরসিংদি এই নামটা মনে আছে।

আমাদের গ্রামও তো নরসিংদি'র কাছেই। খোঁজ করা যেতে পারে।

কত কাল আগেকার কথা। বাবা-মা চলে গিয়েছিলেন পঁয়ষট্টি সালে। এখন আর তাঁদের কথা কে মনে রাখবে?

পুরনো আমলের লোক তো কিছু কিছু আছে এখনও।

আমার জন্মের আগের সব কিছুকেই মান্ধাতার আমল মনে হয়!

নরসিংদি গঞ্জ মতো শহর, প্রচুর মানুষ। সেখান থেকে রফিকদের গ্রাম রসুলপুরের রাস্তা মোটেই ভাল নয়। কিছু দূর পর একেবারে কাঁচা রাস্তা। কোনও রকমে গাড়ি চলে। ধানখেত, পুকুরপাড় দিয়ে যেতে হয় এঁকেবেঁকে। এক জায়গায় একটা ছোট খালের ওপর বাঁশের সাঁকোর কাছে গাড়িটা থেমে গেল। এরপর হাঁটা ছাড়া উপায় নেই।

নিশা জীবনে এই প্রথম বাঁশের সাঁকোয় উঠল।

দুটো বাঁশ পাতা, এক পাশে ধরার ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু সাঁকোটা খুব দোলে। একেবারে শহুরে মেয়ের মতো নিশা ভয়ে চ্যাঁচাতে লাগল।

রফিক ইচ্ছে করে আরও দোলাতে লাগল সাঁকোটা।

নিশা বলল, তোমরা এখানে একটা ব্রিজ বানিয়ে দিতে পারো না? তোমার দাদারা তো বেশ বড়লোক দেখলাম। তুমিও ডলারে রোজগার করো।

রফিক বলল, গ্রামে আর কে থাকে এখন? আমার ভাইরা এত কাছে থাকেন, তবু আসতে চান না। যত দিন মা আছেন...।

সাঁকো থেকে নেমে রফিক বলল, নিশা, তোমাকে একটা অনুরোধ আছে। আমার আম্মার বয়স হয়েছে, কখন কী-রকম ব্যবহার করেন ঠিক নেই। দু'বার আমার বিয়ে ঠিক করেছিলেন, আমি রাজি হইনি। তোমাকে দেখে প্রথমটায় যদি উলটো-পালটা কিছু বলেন, তুমি প্লিজ মেনে নিও। পরে ঠিক হয়ে যাবেন, সে-বিষয়ে আমি শিওর!

রফিকদের বাড়িটা ছবির মতো। একটা পুকুর ঘিরে কত রকম গাছ, এক পাশে একটা সাদা রঙের এক তলা বাড়ি। উঠোনে ধানের গোলা।

দেখলেই মনে হয়, এই রকম বাড়িতে শান্তি আছে, এখানেই সারা জীবন থাকি! তবু মানুষ এ-সব ছেড়ে শহরের ভিড়, ধুলো, ধোঁয়া, বিকট শব্দ পছন্দ করে।

রফিকের মায়ের সামনে যাবার আগে নিশার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। উলটো-পালটা ব্যবহার মানে কী, গালমন্দ করবেন? পছন্দ করবেন না হিন্দু বলে? কিন্তু নিশা তো আর হিন্দু নেই।

একটা ছোট্ট মোড়ার ওপর বসে আছেন মা। প্রথম দেখেই দারুণ চমকে গেল নিশা। ঠিক যেন তার নিজের মা!

সাদা শাড়ি পরা, একটু ভারি শরীর, মাথার চুল কাঁচ-পাকা, গায়ের রঙ ফর্সা টুকটুকে। নিজের মায়ের অবিকল এই চেহারাটাই মনে আছে নিশার। একটু যেন বয়স বেড়েছে।

মানুষে মানুষে এমন মিল হয়!

এ-রকম কথা মনে হলেও তক্ষুনি বলতে নেই। আবেগ দমন করল নিশা। মাথায় আগেই ঘোমটা দিয়েছিল, হাঁটু গেড়ে বসে ফতিমা বিবির পা দুটি ছুঁয়ে বলল, মা, আমি মেহেরুন্নিসা, আপনার কাছে দোয়া চাইতে এসেছি।

ফতিমা বিবি নিশার মাথায় হাত রেখে বললেন, এসো মা, এসো। আশীর্বাদ করছি, ধনে-পুত্রে সুখী হও! কী সুন্দর লক্ষ্মীশ্রী তোমার মুখে, ঘর আলো করে থাকো।

নিশার জন্য আর একটা চমক অপেক্ষা করে ছিল।

পরদিন নিশাকে নদী দেখাতে নিয়ে গেল রফিক। এখানে মেঘনা নদীর রূপ অপূর্ব। নিশা সুবর্ণরেখা নদীর প্রশংসা করেছে, একবার তুলনা করে দেখুক তো!

কোনও নদীর সঙ্গেই কোনও নদীর তুলনা চলে না। সুবর্ণরেখার পটভূমিকায় পাহাড় আছে, তা এখানে নেই। আবার মেঘনা নদীতে এত অসংখ্য নৌকো, এর রূপ অন্য রকম।

একটা নৌকোয় চেপে ঘুরতে ঘুরতে খানিক বাদে চোখে পড়ল একটা পরিত্যক্ত বাড়ি। সামনের বাগান জঙ্গল হয়ে গেছে। দরজা-জানলা ভাঙা, শুধু খাড়া হয়ে আছে কাঠামোটা।

রফিক বলল, এলাট নিশ্চয়ই কোনও হিন্দু বাড়ি ছিল।

নিশা কিছু না বলে শুধু তাকিয়ে রইল সে-দিকে।

রফিক কৌতুক করে বলল, এমন হতে পারে, এটাই ছিল তোমাদের বাড়ি!

নিশা কোনও রকম উৎসাহ দেখালো না।

রফিক নৌকোর মাঝিদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। তার অনুমান ঠিক, এক জন বুড়ো মাঝি জানে, ওটা ছিল দত্তবাবুদের বাড়ি।

রফিক জিজ্ঞেস করল, নিশা, তোমার বাবার পদবী কি দত্ত ছিল?

নিশা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল।

রফিক উত্তেজিত হয়ে বলল, তবে? দত্তদের বাড়ি! তোমাদের সেই বাড়ি!

নিশা বলল, যাঃ, এতটা মিল হয় নাকি? আরও কত দত্ত থাকতে পারে!

রফিক তবু বলল, তবু গিয়ে দেখা যাক। যদি কারুর নাম লেখা-টেখা থাকে। তোমার নিজের বাড়িতে পা দেবে।

মাঝিদের সে বলল সেই বাড়িটার ঘাটের দিকে যেতে।

কেন যেন নিশার মুখখানা লাল হয়ে গেছে। চোখ দুটো বেশি উজ্জ্বল।

সে রফিকের হাত চেপে ধরে বলল, না, ওখানে যাবার দরকার নেই।

রফিক বলল, কেন? দেখতে ইচ্ছে করছে না?

নিশা বলল, আমি মিলিয়ে দেখতে চাই না। কোনও দরকার নেই। আমি তো তোমার কাছে এসেছি। তোমার বাড়িতে। আমি সবটা অতীত মুছে ফেলতে চাই।

একটু থেমে সে খুব নরম কাতরতার সঙ্গে বলল, তুমি আমার কাছ থেকে দূরে চলে যেও না কখনও॥

সংসারে এক সন্ন্যাসী

সকালবেলা ঘুম ভাঙার পরই মানবেন্দ্রর মনে পড়ল প্রজাপতিটার কথা। তিনি মাথা ঘুরিয়ে ডান পাশে তাকালেন। প্রজাপতিটা এখনও নিথর নিস্পন্দ হয়ে দেয়ালের গায়ে লেপটে আছে। গুণ্ডা টিকটিকিটা ধারেকাছে কোথাও নেই।

প্রজাপতি নয়, মথ। বেশ বড়, দুই ডানার বিস্তৃতি প্রায় তিন ইঞ্চি, গাঢ় বেগুনি ভেলভেটের মতো গা। প্রাণীটি বড়ই শান্ত এবং সুন্দর। প্রজাপতির চাঞ্চল্য মথের থাকে না। মথের কোনও প্রচলিত বাংলা নামও নেই। কাল রাতে মানবেন্দ্র কিছুক্ষণ শুয়ে চিন্তা করেছিলেন মথের বাংলা ডাকনাম কী হতে পারে। পছন্দমতো কিছু খুঁজে না পেয়ে এক সময় বিরক্ত হয়ে ভেবেছিলেন, আমাকে তো কেউ প্রতিশব্দ খোঁজার দায়িত্ব দেয়নি। আমার মাথা ঘামাবার দরকার কী! যদিও প্রজাপতির মতো মথেরও একটা সুন্দর নাম প্রাপ্য ছিল।

মানবেন্দ্র বিছানা থেকে উঠে এসে একটা জানলা খুলে দিলেন। কাল রাতে খুব শীত ছিল, সব জানলা বন্ধ রাখতে হয়েছিল। এখন টাটকা হাওয়া ঝলকে ঝলকে ঘরে আসে। এবং শরীরের মধ্যেও ঢুকে, মনে হয় যেন রক্ত, শিরা-উপশিরা ধুয়ে দিচ্ছে, পরিচ্ছন্ন করে তুলছে সকালবেলার মানুষকে। মানবেন্দ্র একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে। তার জানলার ঠিক নিচেই একটি চন্দ্রমল্লিকা ফুল গরবিনীর মতো ভুরু তুলে আছে। যেন সে মানবেন্দ্রর সঙ্গে কথা বলতে চায়।

মানবেন্দ্র চন্দ্রমল্লিকাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী, ভাল আছ?

হাওয়ায় দুলছে ফুলটি।

মানবেন্দ্র আবার বললেন, রাত্রে কেউ অভিসারে এসেছিল? কাল খুব জ্যোৎস্না ছিল আমি জানি।

দরজায় টকটক শব্দ হল। মানবেন্দ্র জানলা থেকে সরে গিয়ে দরজা খুললেন। সাদা উর্দি পরা টুরিস্ট লজের বেয়ারা। সে বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করল, স্যার, বেড টি?

মানবেন্দ্র বললেন, নেহি রামচন্দ্রন, এক পট কফি লে আও।

ব্রেকফাস্ট কেয়া

কুছ নেই, নো ব্রেকফাস্ট।

বেয়ারাটি তবু দু'এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে। খাওয়া-দাওয়ার প্রতি সাহেবদের এই অনিচ্ছা তার পছন্দ হয় না। মানবেন্দ্র প্রায়ই কিছু খেতে চান না। অনেক সময় সারাটা দিন ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে বসে থাকেন।

নিজে থেকে সে আর কিছু বলতে সাহস পেল না। একটুক্ষণ দাঁড়িয়েও কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে সে বেরিয়ে গেল।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে মাবেন্দ্র আবার এলেন জানলার কাছে। এই জানালাটি তাঁর খুব প্রিয়। জানলার বাইরে বহু দূর পর্যন্ত শূন্য প্রান্তর, একটা গাছ পর্যন্ত নেই। এ-দিকে চাষবাস বিশেষ হয় না, রুক্ষ পাথুরে মাটি। কিছুই দেখার নেই, তবু এই বিশাল ব্যাপ্ত শূন্যতা চক্ষু ভরায়। দিগন্তের কাছে আবছা পাহাড়ের রেখা। আজ আকাশ মেঘলা। হালকা মেঘের উপচ্ছায়ায় একটি ম্লান দিন সবুজকে ধূসর হতে ডাকে!

তিনি দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বেগুনি ভেলভেটের মতো মথটিকে বললেন, তুই কেন চুপচাপ বসে আছিস রে?

মথটি কোনও উত্তর দেয় না।

মানবেন্দ্রর ইচ্ছে হয় মথটির ডানায় একবার আঙুল ছোঁয়াতে। ও এমন ভয়হীন ভাবে বসে আছে যে, মনে হয় উড়ে পালাবে না। কিন্তু প্রজাপতি বা মথকে মানুষ একবার ছুঁলে তারা নাকি আর বাঁচে না। সুতরাং মানবেন্দ্র নিবৃত্ত হলেন।

মানবেন্দ্র আবার জিজ্ঞেস করলেন, কী রে, তই কি সারা দিন এখানে বসে থাকবি নাকি? তোর খিদে পায় না?

জানলার পাশ থেকে চন্দ্রমল্লিকা ফুলটি বলল, আমার সঙ্গে তোমার কথা কিন্তু শেষ হয়নি। তুমি চলে গেলে কেন?

মানবেন্দ্র সে-কথা শুনতে পেলেন না। মথটিকে নিয়ে এখন ব্যস্ত।

মানবেন্দ্র ঘাড় ঘুরিয়ে গুণ্ডা টিকটিকিটাকে খুঁজলেন। সেটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কাল সেই টিকটিকিটা এই মথটিকে খাবার জন্য বহুক্ষণ তাক করে বসে ছিল।

এই ঘরে তিনটি টিকটিকি আছে। এই টুরিস্ট লজটি একটি ছোটখাটো টিলার ওপরে তৈরি। কাছাকাছি আর কোনও বাড়ি নেই। তবু এখানে টিকটিকি কী করে এল সে-সমস্যার সমাধান করা যবে না। মানবেন্দ্র যেহেতু বেশির ভাগ সময়েই ঘরের মধ্যে একা একা থাকেন এবং দেয়ালের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকা তাঁর পুরনো স্বভাব, তাই টিকটিকিদের জীবন সম্পর্কে তিনি এক জন বিশেষজ্ঞ, এ-কথা বলা যায়। তিনি জানেন, টিকটিকিদের মতো এমন যৌনকাতর প্রাণী আর আছে কি না সন্দেহ। ওদের সমাজে স্নেহ-প্রেম-দয়া-মমতার কোনও অস্তিত্ব নেই, ওরা কেউ কারুর ভাই-বোন-পিতা-মাতা, বন্ধু হয় না। দু'টি টিকটিকি কাছাকাছি এলেই পরস্পরকে আক্রমণ করে এবং পালায়। কখনও যে জয়ী হয় সে পরাজিতের টুঁটি কামড়ে ধবে দ্রুত যৌনমিলন সেরে নেয়।

এ ঘরের তিনটি টিকটিকির মধ্যে তিনি একটার নাম রেখেছেন তিনি মাফিয়া। সেটার চেহারা দুর্দান্ত গুণ্ডার মতো। পুরনো ঘিয়ের মতো রঙ, চওড়া বুক টেরাডাকটিলের মতো ঘাড় ঘুরিয়ে হিংস্র ভাবে তাকায়। সেই টিকটিকিটাকে মানবেন্দ্র বেশ ভয় পান। যাবা আরশোলা, টিকটিকি বা মাকড়শা দেখলে আঁতকে লাফিয়ে ওঠে, মানবেন্দ্র সেই জাতের মানুষ নন, তিনি জানেন, টিকটিকিব কোনও ক্ষতি করার ক্ষমতা নেই। তবু ওই মাফিয়া শুধু তাব চেহারাতেই ভয় দেখায়।

অপর একটি টিকটিকির ছিমছাপ পরিচ্ছন্ন চেহারা, একটু দুঃখী দুঃখী ভাব, মানবেন্দ্র একে বেহুলা বলে ডাকেন। কোনও যুক্তি নেই, এমনি মনে পড়েছে নামটা।

তৃতীয় টিকটিকিটা বেরোয় খুব কম, ঘুলঘুলির আশ্রয় ছেড়ে সে কদাচিৎ আত্মপ্রকাশ করে, রোগা-লম্বা মতো, এর নাম শাইলক। সর্দার মাফিয়া, বেহুলা এবং শাইলক, এই তিনটি চরিত্র নিয়ে নতুন কোনও কাব্য সৃষ্টি করা যায় কি না, সে-সম্পর্কে মানবেন্দ্র চিন্তা করেন এদের দেখে।

কাল রাত্রে মথটি বড় অদ্ভুত ভাবে এসেছিল। মানবেন্দ্র এক মুহূর্ত আগেও দেখেছিলেন সাদা দেওয়াল, পরের মুহূর্তেই দেখলেন দেয়ালে ডানা মেলে মথটি স্থির হয়ে বসে আছে। ও কখন ঘরে ঢুকল কে জানে। ঠিক যেন ম্যাজিক। মাফিয়াটি ওকে খাওয়ার জন্য তাক করে বসল। মাফিয়ার হাত থেকে ওর নিস্তার পাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। মথটি কিন্তু একবারও আর নড়েনি, জায়গা পালটায়নি, মহারানির মতো অভিজাত ভঙ্গিতে আর সব কিছু অগ্রাহ্য করে বসেছিল। তৎক্ষণাৎ তিনি ওর নাম দিলেন মহারানি। নাটকের চতুর্থ চরিত্র।

মানবেন্দ্র একবার ভেবেছিলেন মাফিয়ার সামনে একটা লাঠি নিয়ে নাড়াচাড়া করে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেবেন কিংবা একটু খোঁচা দিয়ে উড়িয়ে দেবেন মথটাকে। এমন একটা সুন্দর জিনিসকে ওই গুণ্ডাটা শেষ করবে, এটা তাঁর পছন্দ হয়নি। পরে আবার ভেবেছিলেন, প্রকৃতির মধ্যে তো প্রতিনিয়ত এই খেলাই চলছে। তিনি সে-খেলা বদলাবার কে? তার চেয়ে দূর থেকে এই খেলার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা অনেক ভাল। হয়তো টিকটিকির খাদ্য হবার জন্যই মথটা উড়ে এসেছে এখানে।

মথটা যে সকালবেলাতেও বেঁচে আছে, সেটাই খুব আশ্চর্যের ব্যাপার। কাল রাতে অনেকক্ষণ ধরে খেলাটা দেখতে দেখতে মানবেন্দ্র কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। মহারানির থেকে মাফিয়া ছিল প্রায় তিন হাত দূরে। অন্য দেয়ালে বেহুলা তখন চুপচাপ উদাসীন। মাফিয়া চুল চুল করে এগোচ্ছে, এই সময় ঘুলঘুলি থেকে বেরিয়ে এল শাইলক, সোজা ছুটে গেল বেহুলার দিকে। ঘাড় না ফিরিয়েও মাফিয়া তা দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যকে ছেড়ে সে-ও তাড়া করে গেল ওই দু'জনের দিকে। ওদের লড়াই মানে তো শুধু ছুটোছুটি, অঙ্গস্পর্শ খুব কম হয়। অন্য দু'জনকে ঘরের দুই প্রান্তে তাড়িয়ে মাফিয়া আবার মনঃসংযোগ করেছিল মহারানির প্রতি।

বেয়ারা কফি এনেছে। বাইরে কয়েকটি শিশুর কলকণ্ঠ ও ছোটাছুটির আওয়াজ। মানবেন্দ্রর মনে পড়ল, কাল মাঝরাত্রে একটি গাড়ি এসেছে, বিভিন্ন কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয়েছিল, বেশ বড় একটি পরিবার। ব্যাপারটা মানবেন্দ্রর পছন্দ হয়নি। এই টুরিস্ট লজটি নতুন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এখনও জনপ্রিয় নয়, মানবেন্দ্র নির্জনতা আশা করেছিলেন।

বিল সই করতে করতে মানবেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, রামচন্দ্রন, কাল কারা এসেছে?

রামচন্দ্রন উৎসাহ দেখিয়ে বলল, বাঙালি ফ্যামিলি, দো ঠো কামরা লিয়া।

বাঙালি শুনে মানবেন্দ্র আর একটু নিরাশ হলেন। জল যেমন জলকে টানে, তেমনি বাঙালি যায় বাঙালির কাছে। ওরা নিশ্চয় তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে আসবে।

ভুরু ও মুখ কুঁচকে একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন মানবেন্দ্র। তারপর ফস করে একটা চুরুট ধরালেন। আজ সকালে এইটি তাঁর প্রথম ভুল। ঘুম থেকে উঠে মুখ ধোয়ার আগেই চুরুট ধরালে সারা দিন মুখটা বিস্বাদ হয়ে থাকে।

আড়াই কাপ কফি শেষ করার পর মানবেন্দ্র একটা বই (সোয়ান্‌স ওয়ে, ২য় খণ্ড) নিয়ে আবার বিছানায় ফিরে গেলেন। তিনি নিজের কাছে প্রতিশ্রুতি দিলেন, আজ শুয়ে শুয়েই কাটাবেন সারাটা দিন। চুরুটের ছাই ফেলার অ্যাশট্রের জন্য একবার তাকালেন এ-দিক ও-দিক। অ্যাশট্রেটা রয়েছে একটু দূরে টেবিলের ওপর। আবার উঠে গিয়ে ওটা আনার কোনও মানে হয় না। তার চেয়ে মেঝেতে ছাই ফেলা ভাল। জমাদার আসবে এগারোটার সময়ে।

প্রুস্তের উপন্যাসটির বারো ভল্যুম তিনি কিনেছিলেন অনেক দিন আগে, যে-সময় তাঁর যথেষ্ট টাকার টানাটানি ছিল, যে-সময় ট্রামে বাসে এক দিন টিকিট ফাঁকি দিলে আনন্দ হত। যে-সময় কোনও বন্ধুকে দু'টাকা ধার দিলেও সব সময় মনে থাকত সেই টাকাটার কথা। যাই হোক, অনেক কষ্টে টাকা সংগ্রহ করে বইগুলি কিনলেও পড়া হয়ে ওঠেনি। নিজের কেনা বই সম্পর্কে পড়ার আগ্রহ কম থাকে। অপরের কাছ থেকে চেয়ে আনা বই দ্রুত শেষ হয়ে যায়। প্রথম খণ্ডের বেশি এগোতে পারেননি। এবার ঠিক করেছেন শেষ করবেনই — বিক্রি করে দেবার আগে। আর দু'মাসের মধ্যে মানবেন্দ্র তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সব বিক্রি করে দেবেন ঠিক করা আছে।

আর মাত্র দু'মাস সময় আছে তাঁর জীবনটা নিয়ে পরীক্ষা করার। তারপর একটা কিছু হেস্তনেস্ত তো করতেই হবে।

পড়ায় মন বসছে না। বাইরে শিশু, নারী ও পুরুষের নানা রকম কণ্ঠস্বর। বাংলা। টুকরো টুকরো কথা কানে আসে। এক জন কেউ গুন গুন করে দু-এক লাইন গান গেয়ে উঠছে। কোনও নারী। মানবেন্দ্র গানের কথাগুলি শোনার জন্য উৎকর্ণ হলেন।

...আজ কোকিলে গেয়েছে কুহু মুহুর মুহু
আজ কাননে ওই বাঁশি বাজে।

মান করে থাকা আজ কি সাজে॥
আজ মধুরে মিশাবি মধু, পরানবঁধু
চাঁদের আলোয় ওই বিরাজে...

বইটা মুড়ে সরিয়ে রাখলেন মানবেন্দ্র। তাঁর ঠোঁটে একটা পাতলা হাসি ফুটে উঠল। অকস্মাৎ আনন্দ পেলে এ-রকম হয়। কোকিলে গেয়েছে কুহুর পরই মুহুর মুহু শব্দটা তো খুব ভালই লাগিয়েছে বুড়ো! এর মধ্যে একটা স্নিগ্ধ বুদ্ধির পরিচয় আছে। অবশ্য এর পরেই 'আজ কাননে ওই বাঁশি বাজে' অতি বাজে লাইন। এবং পর পর চার লানে 'আজ'! কত কবিতায় আর কত গানে যে উনি বাঁশি বাজিয়েছেন, তার আর ইয়ত্তা নেই। আসলে প্রণয় কাব্য লিখতে গিয়ে উনি রাধাকৃষ্ণর উমেজটা মন থেকে সরাতে পারেননি কখনও। যত মিলন, যত অভিসার, যত বিরহ, সবই রাধাকৃষ্ণ টাইপের।

মেয়েটির গানের গলা ভাল। কী-রকম দেখতে? বিছানা থেকে উঠে দরজা খুললেই দেখা যায়। কিন্তু সেটুকু আলস্য কাটাতেও রাজি নন মানবেন্দ্র।

কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয়, ওরা লনে চেয়ার পেতে বসেছে। একটি গম্ভীর পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল, আর এক কাপ চা হবে নাকি?

আর একটি তরল পুরুষকণ্ঠ : নিশ্চয়ই। চমৎকার ওয়েদার! চলো, এবার বেরোই!

মেয়েটির গান হঠাৎ থেমে গেল। মেয়েটি কারুকে শোনাবার জন্য নয়, আপন মনেই গাইছিল, কিন্তু দু'টি শিশু ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছে। তার পরই কান্না।

মানবেন্দ্র আবার বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকালেন। এই বাচ্চাগুলো খুব জ্বালাবে। যে-নির্জন বিশ্রামের সন্ধানে মানবেন্দ্র এখানে এসেছিলেন, আজ থেকে তা গেল। মানবেন্দ্র বাচ্চাদের পছন্দ করেন না। 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা শহরতলিতে।' 'খোঁকা ঘুমোলো, পাড়া জুড়োলো' — পরম সত্য এই অমর দুটি লাইন যে রচনা করেছে, সে মহাকবি।

বাইরে গোলমাল বেশি বাড়ছে। নারীকণ্ঠ এক জনের নয়, দু'জনের, এদের মধ্যে কে গান গাইছিল! ফরাসি সাহিত্যের বিখ্যাত রচনার চেয়েও এই সব কলকণ্ঠ মানবেন্দ্রর মনোযোগ কেড়ে রাখে।

মানবেন্দ্র একটুক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আবার যখন জেগে উঠলেন, তখন সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ। ওরা নিশ্চয়ই বেড়াতে গেছে। তাঁর স্নান করার ইচ্ছে হল। শীতের আয়াসে গত দু'দিন স্নান করেননি। আজ শরীরে একটা আঠা-আঠা ভাব। স্নান টান করতে তাঁর প্রায় আধ ঘণ্টা লাগল। বাথরুম থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন উলঙ্গ হয়ে। একা বন্ধ ঘরে তিনি অনেক সময়ই উলঙ্গ হয়ে থাকেন। কিন্তু এখন বেশ শীত করছে। তিনি এক জোড়া নতুন কাচা পায়জামা আর পাঞ্জাবি পরে তার ওপর শালটা জড়িয়ে নিলেন। আঃ, এর মতন আরাম আর নেই। টেবিলের কাছে চেয়ারের ওপর পা গুটিয়ে বসে তিনি একটুক্ষণ এই আরমটুকু উপভোগ করলেন। সামান্য খিদে খিদে পাচ্ছে। এই খিদেটাও উপভোগ্য।

দেয়ালে মথটা সেই একভাবেই বসে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী মহারানি, আজ কি প্রায়োপবেশন নাকি?

মহারানি একটুও বিচলিত হয় না।

না, এর একটা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার। মানবেন্দ্র চেয়ার থেকে উঠে এসে মহারানির খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। এর কোনও ভয় পাবার লক্ষণ নেই। এ-রকম ভয়হীন সুন্দর সহজে দেখা যায় না। টিকটিকি তিনটিই আজ সকাল থেকে অদৃশ্য হয়ে আছে কেন কে জানে।

তিনি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চন্দ্রমল্লিকাকে বললেন, ভাই, তোমার গাছ থেকে একটা পাতা নিচ্ছি, কিছু মনে করো না।

পাতাটা ছিঁড়ে এনে তিনি মথটার মুখের সামনে দাঁড়ালেন। এই প্রথম সে একটা ডানার কম্পন দেখাল। তারপর বিরক্ত হয়ে স্থান ত্যাগ করে উড়ে বেড়াতে লাগল ঘরের মধ্যে। মানবেন্দ্র তাড়াতাড়ি বাকি দু'টি জানলা ও দরজাও খুলে দিলেন, যাতে ও যে-কোনও জায়গা দিতে বেরুতে পারে। কিন্তু ওর মতিগতিই অদ্ভুত। এবার ও গিয়ে বসল বেশ উঁচুতে, ঘুলঘুলির পাশে। ওই ঘুলঘুলিতেই টিকটিকিগুলোর বাস। যে-কোনও সময় বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। মথটা কি বাইরে কোথাও যেতে পারত না! যাক, কী আর করা যাবে, ওর নিয়তি! দিনেরবেলা মথেরা কোথায় যায়, মানবেন্দ্র জানেন না।

ঘরে তালা দিয়ে মানবেন্দ্র বেরিয়ে পড়লেন। এক তলা, অর্ধ-বৃত্তাকার বাড়ি। ভারি সুদৃশ্য। আটখানি ঘর। সামনে দিয়ে চওড়া বারান্দা। মাঝখানের বাগানটি এমন ভাবে তৈরি করা, যাতে প্রত্যেকটি ঘর থেকেই তার শোভা উপভোগ করা যায়। মানবেন্দ্র এখানে এসেছেন ছ'দিন আগে, এর মধ্যে আরও কিছু যাত্রী এসেছে, চলে গেছে। একটি ঘরে এক জোড়া ছেলে মেয়ে আছে তিন দিন ধরে, স্বামী-স্ত্রী যে নয় তা এক পলক দেখলেই বোঝা যায়, তারা অন্য কারুর সঙ্গে মেশে না। এ দু'দিনে মানবেন্দ্র সব মিলিয়ে দশ-বারোটার বেশি কথা বলেননি কোনও মানুষের সঙ্গে।

মানবেন্দ্রর এক বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি পর্যটন দপ্তরের প্রায় এক জন কর্তাব্যক্তি। তিনিই মানবেন্দ্রকে এই জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিছুদিন আগে মানবেন্দ্রর লিভারে বেশ গণ্ডগোল দেখা যায়। ডাক্তার ও বন্ধুরা বলেছিলেন, তাঁর একটু বিশ্রাম দরকার। ছন্নছাড়া জীবনে লিভার আহত হয়।

পর্যটন দপ্তরের বন্ধুটি এখানে কী চিঠি পাঠিয়েছিলেন কে জানে, তার ফলে এখানকার ম্যানেজার বড্ড বেশি খাতির করে। যেটা অস্বস্তিকর। আবার ব্যাঘাতও সৃষ্টি করছে, যেমন, মানবেন্দ্র প্রথম দিন এসে এক বোতল মদ কিনতে চেয়েছিলেন, বেয়ারারা রাজি হয়নি, তাদের সাহেবের নাকি নিষেধ আছে! কোনও ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি তাঁর পছন্দ হয় না। তিনি চান, তাঁকে নিয়ে কেউ যেন কোনও ব্যাপারে ব্যস্ত না হয়, তাঁকে নিজের মনে থাকতে দেয়। তিনি এই পৃথিবীতে, নিজের ছাড়া আর কারুর কখনও কোনও ক্ষতি করবেন না।

টুরিস্ট লজ থেকে বেরিয়ে মানবেন্দ্র বাঁ-দিকের সরু রাস্তাটা ধরে হাঁটতে লাগলেন। ডান দিকের রাস্তাটা গেছে শহরের দিকে। মাইল খানেক দূরে ছোট অকিঞ্চিৎকর শহর। বাঁ-দিকের সরু রাস্তাটা আধ মাইলের পরই নেমে গেছে ঢালু হয়ে মাঠের মধ্যে। সেখানে একটি বস্তি। তার ওপর দিকটায় পাহাড়ের মতো খাড়া পাথর। মানবেন্দ্র এসে সেই পাথরে বসলেন। এখানে বসলে যত ইচ্ছে আকাশ কিংবা দিগন্ত দেখা যায়। আবার নীচের দিকে তাকালেই দেখা যায় বস্তির মানুষদের বিভিন্ন সংসার। এদের ঘরে কোনও আব্রু নেই। ধর্মকাহিনি পড়লে যেমন মনে হয় ঈশ্বর ওপর থেকে পৃথিবীর সব মানুষের সংসারে দৃষ্টি রাখছেন, সেই রকম মানবেন্দ্রও এখানে একটি ছোটখাটো ঈশ্বরের ভূমিকা নিতে পারেন। যদিও এঁদের ভাল বা মন্দ কিছুই করার ক্ষমতা তাঁর নেই।

এখানকার বিখ্যাত ঐতিহাসিক মন্দির এবং তার দেয়ালের কারুকার্য ও আদিরসাত্মক মূর্তি দেখার জন্যই ভ্রমণকারীরা আসে। এই ক'দিনের মধ্যে মানবেন্দ্র একবারও সেই মন্দিরের কাছে যাননি। তিনি তো মন্দির দেখতে আসেননি, এসেছেন বিশ্রামের জন্য। মন্দিরটা কোনও এক সময় দেখে নিলেই চলবে, ব্যস্ততার কিছু নেই। তার বদলে এই উঁচু পাথরটা মানবেন্দ্রর প্রিয় জায়গা।

চুরুটটা নিভে গিয়েছিল, মানবেন্দ্র আবার ধরালেন। হঠাৎ তাঁর অনুভূতি হল, কেউ যেন তাঁকে লক্ষ্য করছে। তিনি ঘাড় ফিরিয়ে এ-দিক ও-দিক তাকালেন। কাছাকাছি মানুষজন কেউ নেই। কিন্তু একটা কুকুর চুপচাপ এক দৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মানবেন্দ্র একটু সতর্ক হলেন।

অচেনা কুকুরকে সহজে বিশ্বাস করা যায় না। ল্যাজটা একটু বেশি ঝুলে আছে মনে হচ্ছে না? ল্যাজটা ঠিক কী অবস্থায় থাকলে যেন পাগলা কুকুর চেনা যায়? দুর ছাই, দরকারের সময় এই সব তথ্য একেবারেই মনে পড়ে না।

মানবেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, কী চাই?

কুকুরটা ছিপ ছিপ ছিপ ছিপ শব্দ করে আরও খানিকটা এগিয়ে এল। হঠাৎ আবার থমকে দাঁড়াল।

মানবেন্দ্র গলায় নকল গাম্ভীর্য ফুটিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন, কী চাই? এখানে কী চাই তোমার?

কুকুরটার চেহারা ভদ্রগোছের, গৃহপালিত ধরনের। তখন মানবেন্দ্রর মনে পড়ল, অনেক কুকুরই ইংরেজি ছাড়া আর কোনও ভাষা বোঝে না। তিনি বললেন, গো অ্যাওয়ে! গো!

কুকুরটা চঞ্চল ভাবে মাটিতে গন্ধ শুঁকল, তারপর ধপ করে বসে পড়ল সেখানে। এক একটা কুকুর হঠাৎ দৌড়োয়, কেন দাঁড়ায়, কেন যেখানে সেখানে বসে, তার কোনও যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনও দেখা গেছে, একটা কুকুর মাথা গুঁজে ঘুমোচ্ছে, হঠাৎ আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ ঘেউ ডাকতে শুরু করে। আশেপাশে আর কোনও মানুষ বা প্রাণী কিছুই নেই। ওরা কি স্বপ্ন দেখে, না অশরীরীদের দেখতে পায়?

কুকুরটার থেকে তাঁর মনোযোগ সরে গেল একটি কান্নার আওয়াজে। তিনি দেখলেন এক জন স্ত্রীলোক হন হন করে ঢালু রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বস্তির দিকে, তার থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটি আট-ন বছরের মেয়ে। কাঁদছে ওই মেয়েটাই।

মানবেন্দ্র ওদের চিনতে পরলেন। স্ত্রীলোকটির নাম মুনিয়ার মা। সেই হিসেবে মেয়েটির নাম মুনিয়া। ওরা ডাকবাংলোয় আসে মাঝে মাঝে। মুনিয়াব কী অসুখ আছে। মানবেন্দ্র ক'দিনই দেখেছেন, মুনিয়ার মা তার মেয়েকে ওষুধ খাওয়াচ্ছে। ওপর থেকে ওদের ঘরের দৃশ্য স্পষ্ট দেখা যায়। তিনি দেখেছেন মুনিয়ার মা পক্ষীমাতার মতো স্নেহপ্রবণা এবং ব্যাকুল, মেয়েকে নিয়ে তার আদরযত্ন এবং আদিখ্যেতার শেষ নেই। মেয়েকে ওষুধ খাওয়াবার সময় তার মাথায় হাত বোলায় আর কল কল করে কত কথা যে বলে! এত দূর থেকে অবশ্য কথাগুলো বোঝা যায় না।

এক দিন মানবেন্দ্র একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিলেন। একটি শিলে মুনিয়ার মা কয়েকটা শুকনো শিকড় বাটছিল। মেয়ের জন্য ওষুধ। এ-দিকে অ্যালোপ্যাথির তেমন চল হয়নি বোধহয়। অনেকক্ষণ ধরে বাটছিল শিকড়গুলো, তারপর বুকের আঁচল সরিয়ে নিজের বাঁ-স্তনটা চেপে ধরল। টপ টপ করে দুধ পড়তে লাগল শিলের ওপর।

মানবেন্দ্র তা দেখেই প্রথমে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। একটু পরেই তাকিয়েছিলেন আবার। মুনিয়ার মা তখন অন্য স্তনটা টিপে দুধ বার করছে। মানবেন্দ্রর প্রথম বিস্ময় ছিল এই যে, যার মেয়ের বয়েস ন'বছর, তার বুকে দুধ থাকে কী করে? ওর ঘরে আর তো ছোট বাচ্চা নেই। কিছু দিন আগেই একটা জন্মে মরেছে?

কবিরাজি বা হেকিমি ওষুধ সম্পর্কে মানবেন্দ্রর কোনও ধারণা নেই। শিকড়বাটার সঙ্গে অনুপান হিসেবে দুধ মেশাবার ব্যবস্থা থাকে কি না তিনি জানেন না। নিজের বুকের দুধ! কিংবা হয়তো এমনি দুধ মেশাতে বলেছিল, মুনিয়ার মা তা জোগাড় করতে পারেনি। পুরো ব্যাপারটার মধ্যে একটা অনৈসর্গিক কিছু আছে বলে মনে হয়। একাগ্র ভাবে দৃশ্যটি দেখতে দেখতে মানবেন্দ্র এক সময় লজ্জিত হয়ে উঠেছিলেন।

মুনিয়ার মায়ের স্বাস্থ্য ভাল। কারণ তাকে খেটে খেতে হয়। কোনও নারীকে নিজের হাতে তার স্তন ধরে থাকতে মানবেন্দ্র অনেক দিন দেখেননি। কিংবা কখনও দেখেছেন কি? হয়তো মেয়েরা

আয়নার সামনে কিংবা বাথরুমে এ-রকম করে থাকে। মানবেন্দ্র ভাবছিলেন শহুরে মেয়েদের কথা, কিন্তু মুনিয়ার মা'র স্তনে কোনও নগর-সভ্যতা নেই। তাঁর শরীরে একটা শিহরন জেগেছিল। দৃশ্যটা বাৎসল্যের, একটি জননী তার সন্তানের জন্য ওষুধ তৈরি করছে, তবু অন্য পুরুষের চোখ নিজস্ব আনন্দ খুঁজে নেয়।

পরদিনও সেই পাথরটার ওপরে এসে বসবার একটু পর মানবেন্দ্র নিজের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলে। তিনি আবার এসেছেন কি ওই দৃশ্যটা আবার দেখার লোভে? লোভ? অল্প বয়েসে, কৈশোরে কোনও নারীর অনাবৃত বুকের একটু আভাস পেলেই শরীর ঝন ঝন করে উঠত। এই দৃশ্য পুরনো হয় না ঠিকই, কিন্তু এখন মানবেন্দ্র প্রায় চল্লিশে পা দিয়েছেন, এখনও শুধু ওইটুকু দৃশ্য দেখার জন্য তিনি এতটা রাস্তা হেঁটে আসবেন, তা হতে পারে না! কী, ঠিক বলছি তো? মানবেন্দ্র প্রশ্ন করলেন তাঁর মনকে। মন বেশ দৃঢ়ভাবেই উত্তর দিল, ঠিক। তুমি ওই জন্যই আসোনি। লোভ নয়, তুমি এসেছ কৌতূহলে।

তবু একটু সংশয় থেকে গিয়েছিল। মানুষ কি সব সময় নিজের কাছেও সত্যি কথা বলে?

আজ তিনি দেখছেন আবার অন্য একটা দৃশ্য। মুনিয়ার মা হেঁটে যাচ্ছে হন হন করে, দুলছে তার ভারি শরীরটা, অর্থাৎ রাগ। পেছন ফিরে তাকাচ্ছে না একবারও। আর মেয়েটা কাঁদছে অশ্রান্ত ভাবে, সে দৌড়ে এসে মাকে ধরছে না, সে আসছে আস্তে আস্তে।

বাচ্চাদের কান্না বিরক্তির। অনেক সময় রাগ ধরে যায়। কিন্তু মুনিয়ার কান্না মানবেন্দ্রর বুকে এসে লাগছিল। এই কান্নাটা তীব্র অভিমানের।

বাচ্চা ছেলে মেয়েরা অন্য সময় কাঁদে মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। কিন্তু মায়ের ওপরেই যখন রাগ কিংবা অভিমান, তখন আর কার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইবে? শিশুর কাছে তার মায়ের চেয়ে ঈশ্বরও অনেক ছোট। এই জন্যই শিশুর অন্য সময়ের কান্না আর নিজের মায়ের ওপর অভিমান করে কান্না — এই দুটো আওয়াজ সম্পূর্ণ আলাদা।

মুনিয়ার মায়েরই-বা এ কী ব্যবহার? যে অসুস্থ মেয়ের জন্য তার এত ব্যাকুলতা, এত মমতা, এখন তাকে এমন অবহেলা করে কেন সে হন হন করে হেঁটে যাচ্ছে? মুনিয়ার মা ডাকবাংলোতে তরকারি বেচতে আসে, সেই জন্যই মানবেন্দ্র দূর থেকে তার নামটা শুনেছেন। তিনি দেখেছেন, স্ত্রীলোকটির মধ্যে মাতৃত্বের ভাব বেশি। খুব সম্ভব ওর স্বামী নেই, ওই মেয়েই ওর একমাত্র অবলম্বন। অথচ ওর বুকে দুধ থাকে কী করে? সে যাই হোক, কী দোষ করেছে ওর মেয়ে? কিংবা অসম্ভব কোনও আবদার? হয়তো চেয়েছে কোনও খেলনা কিংবা রঙিন ছিটের ফ্রক, তা-ই ওর মায়ের পক্ষে অসম্ভব। কত লোকের কাছে এটা নিতান্ত হেলাফেলার ব্যাপার।

মুনিয়ার মা একবারও পেছন ফিরে তাকাচ্ছে না, এইবার সে ঢালু জায়গাটা দিয়ে নামবে। মেয়েটা থমকে দাঁড়িয়েছে, ডুকরে ডুকরে কান্নায় সে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করতে চাইছে।

এই হারামি! এই খানকির বাচ্চা! তোর বাপের মুখে লাথি মারি! আমি তোর মাকে —

মানবেন্দ্রর বুকে যেন কেউ একটা বর্শা বিঁধিয়ে দিল। তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। মুনিয়া মাটিতে বসে পা ছটফটিয়ে ওই সব গালাগালি দিচ্ছে। তার মায়ের উদ্দেশে। কী অসম্ভব সব খারাপ কথা। যদিও ওইটুকু মেয়ে নিশ্চয়ই এ-সব কথার মানে জানে না। বস্তিতে শুনে শুনে শিখেছে। হয়তো ওরই মায়ের মুখে —।

মানবেন্দ্রর চোখটা কড় কড় করে উঠল। গভীর দুঃখে বুকটা ভারি হয়ে গেছে। কেন এই দৃশ্যটা দেখতে হল, কেন এই কথাগুলো শুনতে হল! তিনি ওপরের দিকে তাকালেন। কী বিশাল এই

আকাশ। চতুর্দিকে মহিমার মতো রোদ্দুর। এক ঝাঁক তার মধ্য দিয়ে সুন্দরকে আরও সুন্দর করে চলে যায়। যত দূর দেখা যায় ছড়ানো প্রান্তর। এই সব কিছুর মধ্যেই অসীমতার সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে যেন। অথচ এরই মধ্যে এক শিশুর গলায় বীভৎস গালিগালাজ, এক জন মা এত নিষ্ঠুর, এমনকী ওই কুকুরটা হঠাৎ দৌড়ে এসে কেন বসে পড়ল — এ সবই যেন বিপুল রহস্যময়। এই বিশ্বসৃষ্টিতে কোনও কিছুর মধ্যেই আসলে হয়তো সঙ্গতি নেই।

মানবেন্দ্র বিমূঢ় হয়ে বসে রইলেন। পর্যায়ক্রমে তিনি তাকাতে লাগলেন মা, কুকুর ও বাচ্চা মেয়েটির দিকে। তাঁর মনে হল, এ পৃথিবীকে তিনি কিছুই চেনেন না।

মুনিয়ার মা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, মর, মর, তুই মরিস না কেন? যমেও তোকে নেয় না?

মানবেন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে। তিনি একটা পাথর ছুঁড়ে মারলেন কুকুরটার দিকে। কুকুরটা ভিতুর মতো ছুটে পালাল। তিনি ওপর থেকে দ্রুত নেমে আসতে লাগলেন মুনিয়াকে লক্ষ্য করে।

কিন্তু তিনি এসে পৌঁছবার আগেই মুনিয়া কাঁদতে কাঁদতে এবং সমানতালে গালাগাল করতে করতে ছুটে গেল তার মায়ের দিকে। অবিলম্বেই দু'জনে মিলিয়ে গেল ঢালু জমিতে।

মানবেন্দ্র আবার একটা পাথর তুলে নিয়ে একটা পাথরের গায়ে ঘষে ঘষে লিখতে লাগলেন কিছু। একটুক্ষণের মধ্যেই লেখাটা ফুটে উঠল :

না, এসব কিছুই সত্যি না —

॥ ২॥

আমার নাম অসীম রায়চৌধুরী। আমি বার্ড কোম্পানিতে আছি।

আমার নাম মানবেন্দ্র মজুমদার।

নিজের নাম বলে মানবেন্দ্র কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। আর দেখলেন অসীম রায়চৌধুরীর মুখ। না, সেখানে কোনও পরিবর্তন নেই। অসীম রায়চৌধুরী তাঁর নাম শুনে চিনতে পারেনি।

খাবার ঘরে মানবেন্দ্র একেবারে কোণের দিকে একটা টেবিল নিয়ে বসেছিলেন। ইচ্ছে হলে তিনি নিজের ঘরেও খাবার আনিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু তখন এখানে কেউ ছিল না। একটু বাদেই বাঙালি পরিবারটি সদলবলে এসে ঢোকে। ওরা অনেক ঘোরাঘুরি করে এসেছে, খুবই ক্ষুধার্ত। রীতিমতো সোরগোল তুলে দু'টি টেবিল জোড়া দিয়ে ওরা বসল।

মানবেন্দ্র যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খাওয়া সেরে নিয়ে উঠে পড়বেন ভেবেছিলেন। কিন্তু সুপটা সাঙ্ঘাতিক গরম, জিভে ছোঁয়ানো যাচ্ছে না। তিনি সঙ্কুচিত ভাবে বসেছিলেন, যাতে তাঁর উপস্থিতি কেউ গ্রাহ্য না করে।

কিন্তু তিনি একটি ভুল করেছিলেন। ওদের মধ্যে এক জনের হাতে ছিল একটা খবরের কাগজ। মানবেন্দ্র গত ছ'দিনের মধ্যে একবারও খবরের কাগজ পড়েননি, আগ্রহও হয়নি। কিন্তু দূরের খবরের কাগজের হেড লাইনের দিকে চোখ চলে যায়ই। কার যেন মৃত্যু সংবাদ ছাপা হয়েছে, কোনও বিরাট নেতার, নামটা দেখা যাচ্ছে না।

অসীম রায়চৌধুরী উঠে এসে বলেছিল, আপনি কাগজটা পড়বেন? এখানে বারোটার সময় কাগজ আসে। স্টেশনে গিয়েছিলাম তো।

এটা আলাপের ছুতো। যারা সামাজিক লোক তারা সমশ্রেণীর মানুষ দেখলে আলাপ না করে পারে না। সেটাই ভদ্রতার অঙ্গ। মানবেন্দ্রও অভদ্র হতে চান না, তিনি মুখটা হাসি হাসি করে রাখলেন।

কথা আর বিশেষ বললেন না। আপনি কবে এসেছেন, মন্দির দেখেছেন কি না ইত্যাদি দু'একটা প্রশ্ন সেরে অসীম রায়চৌধুরী ফিরে গেল আপন টেবিলে। কাগজটা মানবেন্দ্রর হাতেই রইল। কিন্তু কাগজ পড়ার আগ্রহ তাঁর একেবারেই চলে গেছে। কেন্দ্রের যে মন্ত্রী মারা গেছেন, তাঁর জীবিতকাল সম্পর্কেও মানবেন্দ্রর কোনও কৌতূহল ছিল না।

কাগজের আড়ালে তিনি তাকিয়ে রইলেন ওই দিকের জোড়া টেবিলে। তিন জন পুরুষ, দু'জন মহিলা, তিনটি বাচ্চা। দু'টি পরিবার না একই পরিবার, তা ঠিক বোঝা যায় না। নারী ও পুরুষেরা সকলেই প্রায় সমবয়সি, কেউই যৌবন পেরোয়নি। তিন জন পুরুষ কেন?

একটি নারীর মুখ তিনি দেখতে পাচ্ছেন। ধারালো নাটক, টানা টানা চোখ, এই সব মেয়ের সাধারণত একটু অহঙ্কারী অথচ কোমল স্বভাবের হয়। মেয়েটি বহু লোকের কাছ থেকে এতবার শুনেছে সে সুন্দরী যে, এ বিষয়ে তার আর কোনও দ্বিধা নেই। বঙ্কিমচন্দ্র এই মেয়েটিকে দেখলে এর সৌন্দর্য বর্ণনায় নিশ্চয়ই পুরো এক পৃষ্ঠা ব্যয় করতেন। মানবেন্দ্র কিন্তু মেয়েটিকে তেমন পছন্দ করলেন না। তিনি আপন মনেই মাথা নাড়লে। যেন তিনি এক সম্রাট, তাঁর এক পারিষদ ওই মেয়েটিকে নিয়ে এসেছে তাঁকে উপহার দেবার জন্য, তিনি প্রত্যাখ্যান করছেন।

অন্য নারীটি তাঁর দিকে পিছন ফিরে বসে আছে। একবারও তাকায়নি। বহু দিনের অভিজ্ঞতায় মানবেন্দ্র জানেন যে, বসে-থাকা অবস্থায় কোনও নারীকে পেছন দিক থেকে দেখে তার রূপ বিচার করা যায় না। শুধু রূপ কেন? নারী মানেই কি রূপ? না, তা নয়। তবে, এ-কথাও তো সত্যি প্রথমেই মনে হয়, ওকে দেখতে কেমন। দেখতে ভাল হলেও অনেককে ভাল লাগে না। এবং দেখতে খারাপ হলে তাকে ভাল লাগতে অনেকটা সময় দরকার। পুরুষ তিন জনের মধ্যে এক জনের চেহারা রীতিমতো চোখে পড়ার মতন। অসীম রায়চৌধুরী নয়। অন্য এক জন, পুরুষোচিত চেহারা যাকে বলে। এই পুরুষটি কোন মেয়েটির স্বামী? মানবেন্দ্র একটু হাসলেন, এটা জানা তাঁর পক্ষে কি খুব দরকারি? তবু, এটা যেন একটা সরল অঙ্ক, না মিললে স্বস্তি নেই। দু'টি নারী, তিনটি পুরুষ ও তিনটি বাচ্চা — এদের কার সঙ্গে কী সম্পর্ক সেটা যতক্ষণ না জানা যায়, ততক্ষণ প্রশ্নটা সব সময় মাথার মধ্যে ঘুরবেই।

মানবেন্দ্র নজর ফিরিয়ে দেখলেন, তাঁর সুপ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বিস্বাদ। ঠেলে সরিয়ে রাখলেন সেটা। এর পরবর্তী খাবারগুলো কোনওটাই ভাল করে খেলেন না তিনি। পেটে খিদে রেখেই উঠে পড়লেন।

আপনাদের কাগজটা।

অসীম রায়চৌধুরী কৃত্রিম ব্যস্ততার সঙ্গে বলল, ও, আচ্ছা, ঠিক আছে! আপনি কাগজটা এখন রাখতে পারেন, আমরা তো এখন পড়ছি না।

না, আমার হয়ে গেছে।

আপনি কি আজই চলে যাচ্ছেন?

মানবেন্দ্র একটু বিস্মিত হলেন। হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন! তার চেহারার মধ্যে কি কোনও রকম বিদায় নেবার ভাব আছে?

না, আমি আরও দিন পনেরো থাকব।

দিন পনেরো!

এই বিস্ময়ের উক্তি অসীম রায়চৌধুরীর নয়, অন্য সুদর্শন পুরুষটির। সে আবার বলল, আপনি এখানে আরও পনেরো দিন থাকবেন?

অর্থাৎ ওরা জানতে চায়, এখানে দেখবার মধ্যে আছে তো শুধু একটা মন্দির, অনেকে এ-বেলা এসে ও-বেলা চলে যায়, কেউ কেউ এক রাত বা দু'রাত থাকে। কিন্তু পনেরো দিন?

আমি এমনিই সময় কাটাতে এসেছি। অনেকটা বিশ্রাম নেবার জন্য।

অসীম রায়চৌধুরী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আলাপ করিয়ে দিই, ইনি গৌতম ব্যানার্জি, ইনি হিরণ্ময় বোস, আর ইনি অনুরাধা ব্যানার্জি, ইনি মানসী রায়চৌধুরী। আর ইনি হচ্ছেন মিস্টার মজুমদার, মানবেন্দ্র মজুমদার।

কাঁটা চামচ থাক সত্ত্বেও মুর্গির ঝোল ও ভাত সকলে হাত দিয়েই খাচ্ছিল। এঁটো হাতে নমস্কার করা যায় না। তবু ওরই মধ্যে কেউ কেউ দু'হাতের মাঝখানে একটু দূরত্ব রেখে নমস্কারের ভঙ্গি করল।

মানবেন্দ্র একমাত্র লক্ষ্য করছিলেন সেই নারীটিকে, যার মুখ তিনি আগে দেখতে পাননি। এর নাম মানসী রায়চৌধুরী, হালকা হালকা শ্যামলা রঙ, পাতলা চেহারা, মুখখানা শান্ত ধরনের। মুখ দেখলেই বোঝা যায়, এই সব মেয়ে বাইরের লোকের সামনে কক্ষনও রাগে না।

পদবি শুনেই মানবেন্দ্র বুঝে নিয়েছেন কার সঙ্গে কী সম্পর্ক। এর মধ্যে হিরণ্ময় বসুই আলাদা। সে এবার প্রশ্ন করল, মানবেন্দ্র মজুমদার? মানে আপনিই কি...

মানবেন্দ্র তৎক্ষণাৎ কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, আপনারা তো বোধহয় বেশি দিন থাকছেন না। তা হলে শুধু মন্দির দেখেই চলে যাবেন না, এখানে একটা চমৎকার ঝরনা আছে, সেটাও দেখবার মতো।

বাচ্চাদের মধ্যে এক জন একটা ঝোলের বাটি উলটে ফেলেছে। সব মনোযোগ সেই দিকে ঘুরে গেল। মানবেন্দ্র খবরের কাগজটা রেখে আর কোনও কথা না বলে সরে এলেন সেখান থেকে। আর একবার তাকিয়ে দেখলেন শ্যামলা ধরনের ছিপছিপে মেয়েটির দিকে। কী-রকম যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে একে দেখে। এর বসে থাকার ভঙ্গি, তাকানো কিংবা টেবিলের ওপর বাঁ-হাতের পাতাটা মেলে রাখা — এ-সবই অন্য রকম। তিনি মনে মনে বললেন, এই মেয়েটি এসেছে তাঁর শান্তি নষ্ট করতে। যদিও মেয়েটি তাঁর দিকে দু'এক পলকের বেশি তাকায়নি।

খাবার ঘরের দরজার কাছে এসে মানবেন্দ্র আর একবার তাকালেন। মানসী নামের মেয়েটির মুখ অন্য দিকে ফেরানো, চোখাচোখি হল না। তবু মানবেন্দ্রর মনে হল, মেয়েটিকে যেন চেনা চেনা লাগছে। অথচ মুখটা একেবারেই চেনা নয়, কোনও মেয়ের মুখ মানবেন্দ্র একবার দেখলে আর ভোলেন না, কিন্তু এই মেয়েটির সব কিছু মিলিয়ে যেন একটা পূর্ব পরিচয়ের আভাস।

মানবেন্দ্র তালা খুলে ঢুকলেন নিজের ঘরে। জানলা খুলেই রেখে গিয়েছিলেন, তাই বন্ধ ঘরের ভ্যাপসা ভাবটা নেই। প্রথমেই তিনি খুঁজলেন মহারানিকে। মথটা কিন্তু তখনও ঘুলঘুলির পাশে ঠিক সেই রকম ভাবেই বসে আছে। মাফিয়া কিংবা শাইলককে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বেহুলা নিয়ন টিউবের ধার ঘেঁষে শুয়ে আছে চুপ করে। আশ্চর্য ব্যবহার তো মহারানির, তার কি ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই? শুধু নিজের সৌন্দর্যটুকু মেলে ধরে থাকাই তার কাজ? মানবেন্দ্র একটু বিরক্ত ভাবে বললেন, কী হচ্ছে কী? এই খুকি, একটু বাইরে থেকে ঘুরে এসো না।

মানবেন্দ্র এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে একটা খোলা খিল খুঁজে পেলেন। সেটা তুলে মথটার খুব কাছে গিয়ে ঠুকতে লাগলেন। মথটা আবার একবার উড়ে গিয়ে অন্য দেয়ালে বসল। হঠাৎ খুব মায়া হল মানবেন্দ্রর। তিনি বুঝতে পারলেন, এই মথটির মৃত্যু তাঁকে নিজের চোখে দেখে যেতে হবে।

মানবেন্দ্র আবার একটা চুরুট ধরালেন। চুরুটের স্বাদ তাঁর একটুও ভাল লাগে না। মুখটা তেতো হয়ে থাকে। ইদানীং তিনি সিগারেট ছেড়ে স্বেচ্ছায় চুরুট ধরেছেন। আজকাল নানা ব্যাপারে নিজেকে কষ্ট দিতেই তাঁর ভাল লাগে। একমাত্র এই উপায়েই তিনি তাঁর অসুখটা সারাতে পারবেন।

মানবেন্দ্রর আসল অসুখটার নাম পাগলামি। এমনিতে তাঁর শরীর যথেষ্ট সুস্থ। স্বাভাবিকতা ও পাগলামির মাঝখানে একটা সূক্ষ্ম সীমারেখা আছে, তিনি কিছু দিন হল সেই সীমারেখাটার ঠিক ওপরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, কখনও কখনও একটু ঝুঁকে যেতেন অন্য দিকে। হঠাৎ এমন এক একটা কাজ করে ফেলছিলেন, যে সম্পর্কে আগের মুহূর্তেও কিছু চিন্তা করেননি। কিংবা চোখে ভুল দৃশ্য দেখা। কোনও সুস্থ মানুষ এ-রকম করে না, এমনকী শিল্পীরাও না। কোনও ডাক্তার বলেনি, মানবেন্দ্র নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন এটা। নিজেই নিজের চিকিৎসা করছেন।

প্রথম এই ব্যাপারটা টের পান মাস ছয়েক আগে। কলেজ স্ট্রিটে একটা বইয়ের দোকান বসে অনেকক্ষণ আড্ডা দিচ্ছিলেন। সন্ধের সময় হঠাৎ যেন একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়ায় ধড়মড় করে উঠে পড়লেন। কারুর কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। ট্রাম ও বাস বদলাবদলি করে চলে এলেন মানিকতলায়। ব্রিজ পেরিয়ে বাঁ-দিকের রাস্তা ধরে একটু হেঁটে ঢুকে পড়লেন একটা গলির মধ্যে। গলির শেষ বাড়িটার সদর দরজা খোলাই ছিল। মানবেন্দ্র হন হন করে ঢুকে গিয়েছিলেন ভেতরে। মাঝখানে একটা উঠোন, তার ও-পাশে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। সিঁড়ির পাশেই যে-ঘরটা, তার সামনে এসে মানবেন্দ্র পা থেকে চটি খুলে রাখলেন এক পাশে। তারপর দরজাটা ঠেললেন। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। দরজায় দুম দুম করে ধাক্কা দিয়ে ডেকেছিলেন — মা মা।

দরজা খোলেনি।

মানবেন্দ্র আরও জোরে ডেকেছিলেন।

সারা বাড়ি গম গম করে উঠেছিল তাঁর মা মা ডাকে।

একটু বাদে দরজা খুলেছিল এক জন যুবতী, যেন সদ্য ঘুম থেকে উঠে এসেছে। মানবেন্দ্র তাকে দেখেও বলেছিলেন, মা, এতক্ষণ দরজা খুলছিলে না কেন!

যুবতীটির চোখে এক পৃথিবীব্যাপী বিস্ময়। প্রথমটায় কথা বলতে পারেনি। তারপর জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি কে?

মানবেন্দ্রর চোখে নিবিড় বিরক্তি। তিনি চিনতে পেরেছেন যে, এই মেয়েটি তাঁর মা নয়। তবে এই মেয়েটি এখানে কেন? তিনি পালটা প্রশ্ন ক'রছিলেন, আপনি কে? আমার মা কোথায়?

ততক্ষণে বাড়ির আরও অনেকগুলি ঘরের দরজা খুলে গেছে। কয়েক জন কৌতূহলী মানুষ এগিয়ে এসেছে কাছে। একজন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আপনার কী চাই এখানে?

মানবেন্দ্র বলেছিলেন, কী মুশকিল, আমরা তো এই ঘরের থাকি। আমার মা কোথায় গেল?

সেই সময় পায়জামা ও গেঞ্জি পরা রোগা মতো একজন লোক দো-তলা থেকে নেমে এসে বলল, আপনি, মানে চেনা চেনা লাগছে, তুই মানু না?

মানবেন্দ্র বললেন, জীবন!

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘোর কেটে গেল। এ কী অসম্ভব একটা কাণ্ড করেছেন তিনি! এই বাড়িতে ছাব্বিশ বছর আগে ভাড়া থাকতেন মানবেন্দ্ররা। তখন তিনি স্কুলের ছাত্র। সিঁড়ির পাশের এই ঘরটিতে থাকতেন তাঁর মা। বছর তিনেক বাদেই এ বাড়ি ছেড়ে উঠে গিয়েছিলেন শোভাবাজারে। কুড়ি-বাইশ

বছরের মধ্যে এ গলিতেও আর কখনও আসেননি। অথচ আজ ঠিক যেন নিজের বাড়িতে ফিরছেন, এইভাবে দরজার বাইরে চটি খুলে রেখে ভেতরে ঢুকতে চাইছিলেন। এই সময়-বিস্মৃতি কী করে হল?

এত দিনে সেই বাড়ির অধিকাংশ বাসিন্দাই পালটে গেছে। হয়তো সন্দেহের বশে লোকজনেরা তাঁকে মারধোরই করত, একমাত্র বাড়িওয়ালার ছেলে জীবন, তাঁর বাল্যবন্ধু, কোনও ক্রমে চিনতে পেরেছে।

জীবন বলল, কী ব্যাপার রে, তুই এত দিন বাদে?

মানবেন্দ্র বিমূঢ় ভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, কী জানি, আমি তো জানি না, আমার সব ভুল হয়ে গেছে।

পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখ দুটো ভাল করে মুছে ধাতস্থ হলেন। তারপর অচেনা যুবতীটির উদ্দেশে হাত জোড় করে বলেছিলেন, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

মানবেন্দ্রর ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিটি এমনই বিনত ও কাতর ছিল যে যুবতীটি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিল, না না, ওতে আর কী হয়েছে!

যবুতীটির ডান চোখের পাশে একটা বড় তিল।

সেটা দেখে আবার কেঁপে উঠেছিলেন মানবেন্দ্র। ছাব্বিশ বছর আগে মানবেন্দ্র যখন এই ঘরটাতে থাকতেন, তখন তাঁর মায়ের বয়স ছিল ওই যুবতীটিরই প্রায় সমান। একই ধরনের চেহারা, এবং মায়ের ডান চোখের পাশে ঠিক ওই রকমই একটা তিল।

মানবেন্দ্র অবশ্য এই ব্যাপারটাব ওপর বেশি গুরুত্ব দিলেন না। তাঁর মায়ের সঙ্গে ওই যুবতীটির চেহারার আপাত সাদৃশ্য কাকতালীয় গোছের। এ-রকম হতেই পারে। বাল্যবন্ধু জীবন তাঁকে নিয়ে গিয়ে বসাতে চায়, অনেক প্রশ্ন করতে চায়। কিন্তু মানবেন্দ্র এত লজ্জা পেয়েছিলেন যে আর এক মুহূর্তও থাকতে চাননি। কোনও রকমে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

তারপর অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে যাচাই কবার চেষ্টা কবেছিলেন। তিনি ওখানে গিয়েছিলেন কেন? বইয়ের দোকানের আড্ডা ছেড়ে হঠাৎ উঠে পড়ে ছাব্বিশ বছর আগেকার সময়ে ফিরে যাওয়ার মধ্যে কী যুক্তি থাকতে পারে? তিনি কোনও উত্তর খুঁজে পাননি।

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটে এর কয়েক দিন পরেই। মানবেন্দ্র সন্ধেবেলা চৌরঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিলেন, হঠাৎ একটা চলন্ত ট্যাক্সির দিকে তাঁর চোখ পড়ল। তিনি দেখলেন, জানলার পাশে বসে আছে চঞ্চল। তিনি বিস্ময়ের হাতছানি দিয়ে ওকে ডাকতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ট্যাক্সিটা হুস করে বেরিয়ে গেল।

মানবেন্দ্রর মনটা আনন্দে ভরে গিয়েছিল। চঞ্চল তা হলে ফিরে এসেছে। বছর দশেক আগে চঞ্চল চলে গিয়েছিল আফ্রিকায়। চঞ্চল ছিল ছেলেবেলায় তাঁর সব চেয়ে প্রিয় বন্ধু। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খ্যাতি-অখ্যাতি-সার্থকতা আসার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু অনেক কমে গেছে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা সরে গেছে দূরে। টেনশানমুক্ত হয়ে কথা বলা যায়, এমন মানুষ প্রায় নেই-ই বলতে গেলে। একমাত্র চঞ্চল সম্পর্কেই এ প্রশ্ন আসে না। কিন্তু চঞ্চল সেই যে কিছু টাকা রোজগার করে ফিরে আসার ইচ্ছে নিয়ে চলে গেল নাইজিরিয়ায়, আর ফিরল না। তারপর থেকে নানা দেশে ঘুরছে। চিঠি লেখার স্বভাব চঞ্চলের কোনও কালেই নেই। কদাচিৎ দু'একটা পোস্টকার্ড লেখে। সেই চঞ্চল তা হলে ফিরেছে এতদিন পর!

মানবেন্দ্র আশা করেছিলেন সেই দিনই বা পরের দিন চঞ্চল তার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। ট্যাক্সিতে চঞ্চলের পাসে একটি মেয়ে ছিল। বাঙালি মেয়ে। মানবেন্দ্র তার মুখটা ভাল করে দেখতে পাননি।

সুতপা হতে পারে। সুতপার বিয়ে হয়ে গেছে। চঞ্চলও জানে সে-খবর। সুতপার বিয়েতে সে নাকি কোনও আপত্তিও করেনি। কিন্তু চঞ্চলকে দেখলে সুতপা যে সব কিছু অগ্রাহ্য করে আবার চলে আসবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অসম্ভব তীব্র ভালবাসা ওদের।

সেই সন্ধেবেলাই দু'জন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় মানবেন্দ্র বলেছিলেন, জানো, চঞ্চল ফিরে এসেছে!

ওরাও উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। চঞ্চলের অমলিন স্বভাবের জন্য সবাই তাকে ভালবাসে, সকলেই তাকে মনে রেখেছে।

কিন্তু দু'দিনের মধ্যেও চঞ্চল তাঁর খোজ করল না। মানবেন্দ্র রীতিমতো আহত ও অবাক হয়েছিলেন। তবু তিনি নিজেই খোঁজ কবতে চেয়েছিলেন চঞ্চলের। চঞ্চল কোথায় উঠেছে তিনি জানেন না। চঞ্চলের বাবা-মা এখন থাকেন এলাহাবাদে। চেনাশুনো লোকদের কাছে চঞ্চলের কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। কেউ এ পর্যন্ত চঞ্চলকে দেখেনি।

এরপর মানবেন্দ্র আর এক দিন দেখলেন, চঞ্চল ভবানীপুরে একটি সিনেমা হলে ঢুকছে। সঙ্গে একটি মেয়ে, সুতপারই মতো। সাহেবি কায়দায় চঞ্চল মেয়েটির কোমরে হাত দিয়ে আছে। চঞ্চল সব পারে। বন্ধুদেব সঙ্গে বাজি রেখে চঞ্চল একবার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে একটি অচেনা মেয়েকে বলেছিল, তুমি যদি আমাকে একটা গান শোনও, আমি তোমাকে দশবাব চুমু খেতে পারি। গান না শোনালে কিন্তু চুমু পাবে না, আগেই বলে দিচ্ছি!

মানবেন্দ্র রাস্তার ও-পারে ছিলেন, এ-দিকে আসতে আসতেই চঞ্চল মেয়েটিকে নিয়ে সিনেমা হলে ঢুকে গেল। শো শুরু হয়ে গেছে। মানবেন্দ্র একবার ভাবলেন, খানিকটা ঘুরেফিরে এসে ঠিক শো ভাঙার সময় বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে চঞ্চলকে ধরবেন। কিন্তু যদি ফস্কে যায় এই ভয়ে মানবেন্দ্র একটা টিকিট কেটে নিজেও ঢুকে পড়লেন সেই সিনেমায়। অন্ধকারে তক্ষুনি খুঁজে পাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু ইন্টারভ্যাল কিংবা ছবি শেষ হবার পরেও চঞ্চলকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। সে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। কিংবা চঞ্চল কি ইচ্ছে করেই মানবেন্দ্রকে এড়িয়ে বেড়াচ্ছে? সেরকম কোনও কারণই নেই, চঞ্চলের সঙ্গে তাঁর কোনওদিন মন কষাকষি হয়নি। একমাত্র চঞ্চলই এখনও মানবেন্দ্রর ওপর হুকুম করে কথা বলতে পারে। তবু কলকাতায এসে চঞ্চল তাঁর সঙ্গে দেখা কববে না, একী হতে পারে? মানবেন্দ্রর মনে একটা সূক্ষ্ম অভিমান জেগেছিল। শুধু শুধু তাঁকে একটা বাজে সিনেমা দেখতে হল।

চঞ্চলকে তিনি তৃতীয় বার দেখেছিলেন ওই সিনেমা হলের কাছেই বাস-স্টপে। এবার মানবেন্দ্রই ট্যাক্সিতে যাচ্ছিলেন, অকস্মাৎ চঞ্চলের সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হল, চঞ্চল হাসল পরিচিত ভঙ্গিতে। এখন সে একা, সঙ্গে সুতপা নেই।

মানবেন্দ্র চেঁচিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলেছিলেন, রোককে রোককে! ট্যাক্সি খানিকটা এগিয়ে থামল। মানবেন্দ্র ঝট করে দরজা খুলে নেমে দৌড়ে এলেন। দৈত্যের মতো একটা দো-তলা বাস তাঁর সামনে। এত কাছে মৃত্যু, মানবেন্দ্র আর কিছু চিন্তা করার বদলে শুধু ভাবলেন, মুখের ওপর দিয়ে চাকাগুলো চলে গেলে চঞ্চলও আর তাঁকে চিনতে পারবে না। হাত দিয়ে মুখটা আড়াল করে নিরুপায়ের মতো তাঁকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। বাসটা মানবেন্দ্রকে দয়া করে চাপা দিল না, চলে গেল পাশ কাটিয়ে। চোখ থেকে হাত নামিয়ে মানবেন্দ্র দেখলেন চঞ্চল নেই। হয়তো ওই বাসেই চঞ্চল উঠে গেছে। চঞ্চল কি বুঝতে পারেনি যে মানবেন্দ্র ট্যাক্সি থামাবেন! এ কখনও হতে পারে?

কিন্তু পরিচিত ও বন্ধুবান্ধবরা এর মধ্যে বলতে শুরু করেছে যে চঞ্চল কলকাতায় আসেনি। আর কেউ তাকে দেখেনি। কোথাও তার কথা শোনা যায়নি। চঞ্চলের মতো ছেলে কলকাতায় এলে এক দিনের মধ্যেই সে-কথা রটে যেত। নিজেকে গোপন করার ক্ষমতা চঞ্চলের নেই। মানবেন্দ্র নিশ্চয়ই ভুল দেখেছেন।

এ-কথা শুনে রীতিমতো চটে গিয়েছিলেন মানবেন্দ্র। তিনি কি নির্বোধ না ছেলেমানুষ যে, তিন-তিনবার ভুল দেখবেন? চঞ্চলকে কি তিনি অন্য কারুর সঙ্গে ভুল করতে পারেন?

অনেকের কাছে খোঁজ নিতে নিতে শেষ পর্যন্ত তিনি গিয়েছিলেন সুতপার কাছে। তাঁর মনের মধ্যে একটা ভয় ঢুকেছিল। এ-রকম কথা তিনি লোকের মুখে শুনেছেন বা বইতে পড়েছেন যে, দূর বিদেশে কোনও লোক যদি হঠাৎ মরে যায়, তাহলে ঠিক সেই সময়েই তার কোনও নিকট আত্মীয় বা বন্ধু দেখতে পায় তাকে। মানবেন্দ্র কোনও দিন এটা বিশ্বাস করেননি, তবু একটু ভয় ভয় করছিল।

সুতপা রেগে গিয়েছিল মানবেন্দ্রর ওপরে। ঝাঁজালো গলায় বলেছিল, আমি জানি, তুমি এত দিন পরে কেন এসেছ। তুমি এমনিতে কক্ষনও আমার বাড়িতে আসো না। আজ এসেছ চঞ্চলের খোঁজ নিতে। তুমি জানতে এসেছ ও আমাকে চিঠি লেখে কি না! হ্যাঁ, আমার স্বীকার করতে কোনও লজ্জা নেই, ও আমাকে এখনও চিঠি লেখে। আমার স্বামীও সে-কথা জানে। কিন্তু সে কখনও ওর চিঠি পড়ে দেখতে চায় না।

চঞ্চলের শেষ চিঠিটা আমাকে দেখাবি?

না!

মানবেন্দ্রর ইচ্ছে হয়েছিল উঠে গিয়ে সুতপারে সুন্দর মুখে ঠাস করে এক চড় মারেন। তখন তাঁর মনের অবস্থা এই রকম।

তিনি হাতটা বাড়িয়ে গম্ভীর ভাবে বলেছিলেন, দে!

বলছি তো দেব না!

মানবেন্দ্র একটুখানি সময় নিলেন রাগ সামলাবার জন্য। তারপর ক্লান্তভাবে বলেছিলেন, সুতপা, কী করছিস কী! আমি চঞ্চলের একটা চিঠি পড়তে পাব না, আমি কি এতই দূরে সরে গেছি?

সুতপা মানবেন্দ্রর আপন মাসতুতো বোন। বাল্যকালে ওরা অনেক সময় এক খাটে শুয়ে ঘুমিয়েছে। মানবেন্দ্রর জীবনের প্রথম চুম্বন ওই সুতপাকেই।

সুতপা শেষ পর্যন্ত চিঠিখানা দিয়েছিল। কুয়েত থেকে লিখেছে চঞ্চল। দারুণ দামি কাগজ, সোনার জলে ওর নাম লেখা। অদ্ভুত সেই চিঠির ভাষা — 'সুতপা, আমার নতুন বান্ধবীর নাম ক্যারেন। নামটা মোটেই আমার পছন্দ নয়। লোকে আমাদের স্বামী-স্ত্রী বলে জানে, কিন্তু আমরা বিয়ে করিনি। ব্যাপারটা সামান্য বিপজ্জনক। যাই হোক, আমি কি ওকে সুতপা নামে ডাকতে পারি? তোমার অনুমতি চাই। শিগগিরই লিবিয়াতে ফিরব। মানুর খবর কী? তোমার চোখের ব্যথাটা কমেছে? ইতি তোমারই চঞ্চল।'

মানবেন্দ্র চিঠিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। এক সময় তাঁর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। তিনি চঞ্চলের কথা ভাবছেন না, তিনি ভাবছেন নিজের কথা। চিঠির তারিখ মাত্র আট দিন আগের। মানবেন্দ্র তারও কয়েক দিন আগে চঞ্চলকে প্রথম কলকাতায় দেখেছেন। পুরো ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য।

সুতপা মানবেন্দ্রর বাহুতে হাত রেখে আন্তরিক গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, এ কী, তুমি কাঁদছ কেন মানুদা! কী হয়েছে? চঞ্চল তোমার সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করেছে?

আমি কয়েক দিন আগে চঞ্চলকে দেখেছিলাম।

কোথায়?

স্বপ্নে নয়, রাস্তায়।

তুমি পাগল হয়েছ? চঞ্চল এসে থাকলে কারুর সঙ্গে দেখা না করে চলে যেতে পারে?

সুতপাই পাগল কথাটা প্রথম উচ্চারণ করেছিল। তারপর থেকে সেটা মানবেন্দ্রর মাথায় গেঁথে যায়। পুরো ব্যাপারটাই তাঁর পাগলামি না চোখের ভুল? কিন্তু এ-রকম চোখের ভুল তাঁর হবে কেন? আগে তো কখনও হয়নি।

মা, প্রিয় বন্ধু, তারপর ঈশ্বর। এরপর মানবেন্দ্র এক দিন ঈশ্বরকে দেখলেন। পৌত্তলিক হিন্দুধর্মের ঈশ্বর। সে-দিন মানবেন্দ্রকে একটা মিটিং-এ যেতে হয়েছিল চন্দ্রননগরে। বড্ড বেশি কথা বলতে হয়েছে। অসহ্য গরমের মধ্যে সারাটা দিন কেটেছে বেশ কষ্টে। রাত্তিরে অনেকক্ষণ ঘুম আসছিল না। মানবেন্দ্র নিজের ঘরে একা শুয়েছিলেন। আলো নেভানো, তবু রাস্তায় আলো এসে অন্ধকারকে আবছা করে দেয়।

মানবেন্দ্র দেখলেন, তার ঠিক চোখের সিধে দেয়ালের সামনে শঙ্খ-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণু এসে দাঁড়িয়ে আছেন। একেবারে ছবির মতো। মানবেন্দ্রর ঘরে একটিমাত্র ক্যালেন্ডারে বিদেশি নিসর্গ। চোখের সামনে পূর্ণাঙ্গ বিষ্ণুমূর্তি দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরলেন। হাত ঝুলিয়ে খাটের তলা থেকে টেনে আনলেন সিগাবেট-দেশলাই। অ্যাশট্রে নেই কাছাকাছি, তাতে কোনও ক্ষতি নেই, মেঝেতে ছাই ফেলা যায়। দেশলাইটা জ্বেলে আবাব চিত হয়ে সেই আলোয় দেখলেন, বিষ্ণুর সর্বাঙ্গ চক চক করছে।

ভিশান্ দেখা মানবেন্দ্রর বহু দিনের অভ্যেস। এখনও যে-সব রাত্তিরে তিনি মদ্যপান করেন না, ঘুম আসতে একটু দেরি হয়, চোখ বুজলেই চোখের সামনে অনেক দৃশ্য ভেসে ওঠে। সাধারণত নানা রকম ডিজাইন অথবা যে-সব জায়গায় মানবেন্দ্র কখনও যাননি, যে-সব রাস্তা বাড়ি তিনি কক্ষনও চোখে দেখেননি, সেই সব দেখতে পান। দৃশগুলো পর পর বদলে যায়, অদ্ভুত আনন্দ পান তাতে মানবেন্দ্র। তিনটি গল্প এবং একটি উপন্যাসের কাহিনিও তিনি পেয়েছেন এইভাবে।

কিন্তু সে তো চোখ বুজে দেখা। সেই রাতে মানবেন্দ্র সম্পূর্ণ চোখ খুলে দেয়ালের সামনে বিষ্ণুকে দেখতে পেয়েছিলেন। পৌরাণিক কাহিনির সমস্ত বেশভূষা নিয়ে।

বাড়ির ছাদটা খারাপ। ছাদে বৃষ্টির জল জমলে ঘরের দেয়ালগুলিতেও চুঁইয়ে এসে নোনা ছাপ পড়ে। দেয়ালের সেই সব ছাপ কিংবা ফাটাফুটি থাকলে সেই দিকে চেয়ে চেয়ে অনেক রকম মূর্তি কল্পনা করা যায়।

মানবেন্দ্র উঠে আলো জ্বাললেন। হ্যাঁ, ঠিকই দেয়ালে নোনা ছাপ পড়েছে। নিতান্তই আঁকাবাঁকা দাগ, সে-দিকে তাকিয়ে কোনও মানুষ বা জীবজন্তুর চেহারাও কল্পনা করা যায় না। মানবেন্দ্র হাত দিয়ে দেয়ালের সেই জায়গাটা ঘষে দিলেন। তারপর আবাব আলো নিভিয়ে এসে শুয়ে পড়লেন বিছানায়।

এবারও দেখতে পেলেন বিষ্ণুমূর্তি। মানবেন্দ্র মাথা ঠাণ্ডা করে সিগারেট টানতে লাগলেন। হ্যাঁ, চোখের ভুল তো নিশ্চয়ই। কিন্তু বিষ্ণুমূর্তি কেন?

যৌবনের শুরু থেকেই মানবেন্দ্র ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন। তিনি কখনও সরবে নাস্তিকতা প্রচার করতেও যাননি অবশ্য। ব্যাপারটা সম্পর্কেই তিনি নির্লিপ্ত থাকতে চান। তবে তাঁর পরিচিতদের মধ্যে যাঁরা কোনও রকম পুজোআচ্চা কিংবা নামাজ-প্রার্থনায় অংশ নেয়, তাদের সম্পর্কে তাঁর মনের মধ্যে একটু করুণা বোধ আছে। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে নিজের চেষ্টায় ওপরে উঠে এসেছেন,

কোনও দিন কারুর সাহায্য নেননি, ঠাকুর-দেবতাদেরও সাহায্য চান না। তিনি জানেন, এই জীবন একটাই। এবং মুক্তি সম্পর্কে তাঁর কোনও আগ্রহ নেই।

তাহলে তাঁর দৃষ্টিবিভ্রমে বিষ্ণুমূর্তি কেন? এর তো কোনও যুক্তি পাওয়া যায় না। তবু তিনি সিগারেটটা শেষ করার পর উঠে বসলেন। আবার ভাল করে তাকালেন। এখনও বড্ড স্পষ্ট।

ঘরে কোনও ভদ্রলোক এলে তাঁকে যেমন খাতির করা উচিত সেই রকম ভাবে হাত জোড় করে মানবেন্দ্র বিনীত গলায় বললেন, নমস্কার। আপনি কি আমাকে কিছু বলবেন?

কোনও উত্তর নেই।

মানবেন্দ্র প্রশ্নটা তিনবার করলেন।

তারপর তড়াক করে খাট থেকে নেমে এসে দেয়ালের গায়ে দুম করে এক লাথি মেরে বললেন, শালা, ইয়ার্কি করার আর জায়গা পাওনি!

লাথিটা বেশ জোরেই মেরেছিলেন। মানবেন্দ্রর পায়েই লেগেছিল খুব। হাঁটুটা চেপে ধরে তিনি ঘরের মেঝেতে কিছুক্ষণ বসেছিলেন গুম হয়ে। তিনি বার বার এ-রকম ভুল দেখছেন কেন? হঠাৎ নমস্কারই না করলেন কেন, লাথি মারতেই-বা গেলেন কেন? এই কি পালগামির লক্ষণ?

মানবেন্দ্রর মুখটা কুঁকড়ে গিয়েছিল। চোখ দুটোতে কান্নার মতো জ্বালা। তিনি ভেবেছিলেন, না না, আমাকে পাগল হলে চলবে না। আমি নিজেই নিজেকে বাঁচাব।

॥ ৩॥

মানবেন্দ্র আবার ঘর থেকে বেরুলেন সন্ধের পর। বেশ শীত পড়েছে। শালটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে তিনি মন্থর গতিতে হাঁটছিলেন। বাগানে চেয়ার পেতে ওরা বসে আছে। ওদের সঙ্গে যাতে চোখাচোখি না হয়, সেই জন্য তিনি তাকিয়ে আছেন অন্য দিকে।

একটি মেয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে। জড়তাহীন স্বচ্ছ গলা। নারী দু'জনের মধ্যে কোন জন গায়িকা — সেটা জানার কৌতূহল ছিল মানবেন্দ্রর। রবীন্দ্রসঙ্গীত তিনি পছন্দ করেন না। ত্রিসপ্তকের মাত্র একটি সপ্তকে ওই গানগুলি গাওয়া হয় — একে সঙ্গীত বলে না। তার সপ্তকে তুলতে হলেই অধিকাংশ গায়ক-গায়িকা ফলসেটো ব্যবহার করে — প্রকাশ্যে তাই শোনানো হয়, রেকর্ড হয়, আশ্চর্য ব্যাপার।

বারান্দাটুকু পার হতে হতে মানবেন্দ্র গানটির চারটি লাইন শুনলেন —

আমারে করো তোমার বীণা,
লহো গো লহো তুলে
উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি
মোহন অঙ্গুলে॥
কোমল তব কমল করে
পরশ করো পরাণ-'পরে,
উঠিবে হিয়া গুঞ্জরিয়া
তব শ্রবণমূলে॥

শুনতে শুনতে মানবেন্দ্রর চোখের সামনে ভেসে উঠল ৩৩ সংখ্যা। তিনি ভুরু কোঁচকালেন। অন্য কথা ভাববার চেষ্টা করলেন। এই ৩৩ সংখ্যাটা বিরাট বড় হয়ে তাঁর পথ জুড়ে যেন দাঁড়াল। তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন, যাও! কিন্তু গেল না!

মানবেন্দ্রর স্মৃতিশক্তি এক সময় ছিল অসাধারণ। মাঝখানে কয়েকটা বছর অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে তা অনেকটা নষ্ট হয়ে গেলেও এখনও সে-ক্ষমতা মাঝে মাঝে ফিরে আসে। এ-রকম ফিরে এলেই তিনি বরং বিরক্ত হন। কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেছে যে, মৃত্যুর ঠিক আগে তিনি সমস্ত অস্ত্রের কথা ভুলে যাবেন।

মানবেন্দ্র আসলে দেখতে পাচ্ছেন 'গীতবিতানে'র একটি পৃষ্ঠা, তার ঠিক মাঝখানে ৩৩ নম্বর গান, 'আমার করো তোমার বীণা...'। এর ঠিক নীচেই 'ভালোবেসে, সখী, নিভৃত যতনে...' সঙ্গীত হিসেবে রবীন্দ্রনাথের গান তিনি পছন্দ না করলেও, এক কালে শুধু সাহিত্যগুণের জন্য গোটা গীতবিতানটা প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছিলেন।

পৃষ্ঠাটার ওপরে লেখা আছে প্রেম। এটা প্রেম বিষয়ক গান। এ আবার কী ধরনেব প্রেম? 'আমারে করো তোমার বীণা, লহো গো লহো তুলে' — এই বর্ণনা কি শারীরিক? একটি মেয়েকে কোলের ওপর বসিয়ে তার উরু ও বুকের ওপর দু'টি হাত রাখলে অনেকটা বীণার মতোই মনে হতে পারে বটে। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের তরুণ সম্পাদক কি এ-রকম শারীরিক বর্ণনা দেবেন? না। সেই জন্যই লিখেছেন, পরশ করো পরাণ-'পরে। শরীর স্পর্শ করার ব্যাপার নয়, পরাণের ওপর আঙুল রাখতে বলছেন। একটা উদ্ভট ব্যাপার। সত্যি সত্যি একটি নারীকে বীণা কিংবা তম্বুরার মতো কোলের ওপর বসানো কি এর চেয়ে অনেক সুন্দর দৃশ্য নয়? 'উঠিবে হিয়া গুঞ্জরিয়া তব শ্রবণমূলে' — এ-রকম একটা বাজে লাইন কল্পনাও করা যায় না। শ্রবণমূলে? এখানে শ্রবণমূলে মানে ঠিক কী?

এই সব কথা চিন্তা করতে করতে মানবেন্দ্র টুরিস্ট লজের অফিস ঘরে ঢুকছিলেন, এমন সময় পেছনে পায়ের শব্দ পেলেন।

আচ্ছা একটু শুনুন।

মানবেন্দ্র মুখ ফেরালেন। হিরণ্ময় বসু। প্রত্যেক দলের মধ্যেই এক জন বোকা লোক থাকে। ওদের দলের মধ্যে এ হচ্ছে সেই ভিলেজ ইডিয়েট, মানবেন্দ্র এক নজরে দেখেই বুঝেছেন।

আমাকে কিছু বলছেন?

হিরণ্ময় বসু বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? আপনিই কি সেই মানবেন্দ্র মজুমদার, মানে রাইটার?

মানবেন্দ্র একটু ইতস্তত করলেন। মিথ্যে কথা চট করে তাঁর মুখে আসে না। তিনি নির্লিপ্ত ভাবে বললেন, হ্যাঁ।

হিরণ্ময় বসুর মুখখানা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে গেল। সে বলল, আমি ঠিকই ধরেছি। আমি আগেও দু'একবার দেখেছি আপনাকে।

হিরণ্ময় বসু গলা চড়িয়ে বাগানে বসে থাকা দলটির উদ্দেশে বলল, এই অসীম, তুই বাজিতে হেরেছিস!

মানবেন্দ্র চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন, পুলিশে গ্রেপ্তার করা আসামির মতো। তিনি বুঝতে পেরেছেন, আজ আর তাঁর সান্ধ্যভ্রমণ হবে না।

হিরণ্ময় বসু বলল, আসুন না, আমাদের সঙ্গে একটু বসবেন। আমরা চা খেতে খেতে আড্ডা দিচ্ছিলাম।

যে-ব্যাপারে মানবেন্দ্রর সম্পূর্ণ অনিচ্ছা, তাতেও আজকাল তিনি আগ্রহে রাজি হয়ে যান। ইদানীং নিজেকে কষ্ট দেবার ব্রত নিয়েছেন কিনা।

তিনি হাসিমুখে বললেন, চলুন।

অন্য পুরুষ দু'জন মানবেন্দ্রকে অত্যন্ত সম্মান দেখিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হিরণ্ময় দৌড়ে বারান্দা থেকে অতিরিক্ত একটা চেয়ার এনে বলল, বসুন, আপনি এখানে বসুন।

মানবেন্দ্রর চেয়ার ঠিক শ্যামলা রঙের ছিপছিপে মেয়েটির মুখোমুখি। সে-ই গান গাইছিল। মানসী রায়চৌধুরী। চোখের দৃষ্টি খুব স্নিগ্ধ। মেয়েদের মুখের কয়েকটি বিভিন্ন প্যার্টান আছে। যে-কোনও মেয়েকে দেখলেই অনায়াসে বলা যায়, একে অনেকটা অমুকের মতো দেখতে। যেমন অনুরাধা ব্যানার্জির মুখের আদল অনেকটা দীপার ছোট বোন জয়ার মতো। কিন্তু মানসী রায়চৌধুরীর মুখ দেখে অন্য কোনও মেয়ের কথা মনে পড়ল না। অথচ খুব যেন চেনা চেনা। এটা কী করে হয়?

মানসী রায়চৌধুরীর উদ্দেশে মানবেন্দ্র ভদ্রতা করে বললেন, আমি আসার জন্য আপনার গান বন্ধ হয়ে গেল।

মানসী নম্রভাবে বলল, আমি এমনিই গাইছিলাম।

গৌতম ব্যানার্জি বলল, আমি অপানার অনেক লেখা পড়েছি। কখনও আপনাকে দেখিনি। তাই হিরণ্ময় যখন বলল, ঠিক বিশ্বাস করিনি।

অসীম রায়চৌধুরী বলল, আমি একদমই বিশ্বাস করিনি।

এ-সব ক্ষেত্রে যা বলা উচিত, মানবেন্দ্র সেই বাঁধাধরা কথাটাই বললেন। লেখার সঙ্গে লেখকদের চেহারা একদমই মেলে না। তাছাড়া —।

একটু থেমে, সকলের মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে মানবেন্দ্র আবার বললেন, আমার নামে এক জন আধুনিক গায়ক আছেন, অনেকে আমার নাম শুনে তাঁর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন।

গৌতম ব্যানার্জি বলল, না, আমরা সে-কথা ভাবিনি। চেহারার জন্যও না। মানে, হঠাৎ এ-রকম জায়গায় এক জন লেখকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, কী-রকম যেন অবিশ্বাস্য লাগে। তাছাড়া আমরা ভেবেছিলুম, আপনার আরও অনেক বেশি বয়েস হবে। লেখকদের তো আমরা সাধারণত খুব প্রবীণ মনে করে থাকি। আমার সঙ্গে শৈলজানন্দ আর অচিন্ত্যকুমারের আলাপ আছে।

ওঁরাও একসময় তরুণ ছিলেন এবং তরুণ বয়েস থেকেই বিখ্যাত। আর আমার বয়েসটাও কম নয়

হিরণ্ময় বসু মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, গৌতমও এক সময় কিন্তু লিখত-টিখত।

গৌতম অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে বলল, না না, সে কিছু নয়।

মানবেন্দ্র একটু অবাক হলেন। গৌতম অত্যন্ত সুশ্রী যুবা পুরুষ। চওড়া কাঁধ, টানা টানা চোখ, রঙ অত্যন্ত ফর্সা হলেও বোকা বোকা ভাবটি নেই, দাড়ি কামাবার পর গালে নীল রঙের আভা পড়ে। অত্যন্ত ভদ্র। মার্জিত কথা বলার ভঙ্গি। দেখলেই বোঝা যায়, জীবনে খুব সার্থক, ভাল চাকরি কিংবা নিজস্ব ব্যবসা আছে, রূপসী স্ত্রী। এই রকম মানুষ তো সাধাবণত সাহিত্য-টাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহী হয় না। বাংলা সাহিত্য জিনিসটাই তো এখন মধ্যবিত্তদের ব্যাপার।

অনুরাধা ব্যানার্জি পট থেকে ঢেলে এক কাপ চা এগিয়ে দিল মানবেন্দ্রর দিকে। কী সুন্দর পেলব তার আঙুলগুলো। সেই আঙুলে চামচে ধরে জিজ্ঞেস করল, আপনাকে ক'চামচ চিনি?

সবাইকে স্তম্ভিত করে দিয়ে মানবেন্দ্র বললেন, পাঁচ চামচ।

কোনও আধুনিক মানুষই চায়ে এক চামচ-দেড় চামচের বেশি চিনি নেয় না। সকলেই স্বাস্থ্যবিধি মানে। অনুরাধা তার নদীর মতো ভুরু দু'টি তুলে বলল, পাঁচ?

মানবেন্দ্র আবার বললেন, হ্যাঁ। অনেকেই নিশ্চয়ই আপনাকে বলে যে, আপনার হাতের ছোঁয়াতেই চা মিষ্টি হয়ে যায়? আমি একটা উলটো কথা বললাম।

অন্যরা হাসল। এটা মোটেই উচ্চাঙ্গের রসিকতা নয়। বরং একটু অসমীচীন। কিন্তু মানবেন্দ্র প্রথম থেকেই অনুরাধাকে অপছন্দ কবে ফেলেছেন। কারণ তিনি বোধহয় আগেই বুঝে ফেলেছেন যে, অনুরাধাও তাঁকে পছন্দ করবে না! কী করে এটা বুঝলেন? এক ধরনের পাগলামির যুক্তিবোধ। তিনি সত্যিই সেই অত্যন্ত মিষ্টি বিস্বাদ চা খেতে লাগলেন।

হিরণ্ময় বলল, আপনি মানসীব গান শুনবেন? ও খুব ভাল গান করে। ইচ্ছে করলেই রেডিয়োতে গাইতে পারে। কিন্তু ও নিজেই কিছুতেই রাজি হয় না।

মানবেন্দ্র ওই ভিলেজ ইডিয়টির দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, আপনার পরিচয়টা কিন্তু এখনও জানা হল না।

অসীম বলল, হিরণ্ময় আমাদেব বন্ধু, স্টুয়ার্ট অ্যান্ড লয়েডসে আছে, এখন ব্যাচিলার।

এই সব আলোচনার থেকে গান ভাল। মানবেন্দ্র মানসীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, আপনি একটা গান করুন।

গৌতম সমর্থন করল তাঁকে। এবং আরও বলল, মানসীর একটা গুণ আছে, ওকে বেশি অনুরোধ করতে হয় না। কখনও বলে না, সঙ্গে বই নেই কিংবা গলা খারাপ।

মানসী তাকে মৃদু ধমক দিয়ে বলল, থাক হয়েছে! কী গান গাইব?

গৌতম বলল, যেটা খুশি।

মানসী এবার মানবেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার সামনে গান গাইতে কিন্তু আমার লজ্জা করছে!

এই প্রথম তার মানবেন্দ্রর সঙ্গে সরাসরি কথা বলা। মেয়েটি খুব স্বাভাবিক গলায় স্পষ্টভাবে কথা বলে। কিন্তু একটু কম কথা বলে মনে হয়।

মানবেন্দ্র বুঝতে পারলেন, তিনি এদের মাঝখানে লেখক সেজে একটু ভারিক্কি ভাবে বসে আছেন। এঁরা তাঁকে বিশেষ অতিথির সম্মান দিচ্ছে। তিনি এই সম্মানেব যোগ্য নন। এরা তো জানে না, তিনি কত জায়গায় কত রকম অপমান সহ্য করেন, এখনও।

অনেকের কাছেই এক জন সাহিত্যিকের কোনও দাম নেই। যারা সুখী সুখী জীবন কাটায়, বেশি বই-টই পড়ে না, তাদের কাছে এক জন লেখক মানে এমন আর কী! তারা অনেক গল্প-উপন্যাস পড়ে লেখকের নামটাও মনে রাখে না। মানসী যে বলল, 'আপনার সামনে' — তার মানে ঠিক কী? মানসী তাঁকে চেনে?

মানবেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, কেন?

মানসী বলল, আমি তো ঠিক গান শিখিনি। এমনিই ইচ্ছে হলে...আপনার ভাল লাগবে কি না।

মানবেন্দ্র বললেন, একটু আগে বারান্দা দিযে যেতে যেতে আপনার গান শুনছিলাম। আর একটা গান করুন।

মানসী ভুরু কুঁচকে একটুক্ষণ চিন্তা করল। গুন গুন করল একটা সুর। তারপর ধরল —

কেন যে মন ভোলে আমার মন জানে না।
তারে মানা করে কে, আমার মন মানে না।...

গানটি শেষ করতে সময় লাগল মিনিট পাঁচেক। মানবেন্দ্র একেবারে গুম হয়ে বসে রইলেন। গানটা তাঁকে অসম্ভব স্পর্শ করেছে। যেন এটা তাঁর নিজেরই কথা। এক জন পাগলের কথা। 'কেউ বোঝে না তারে, সে যে বোঝে না আপনারে' — এ-রকম ভাবে আগে ভেবে দেখেননি। আগাগোড়া এত সরল ভাষা, কিন্তু একটা তুলনাহীন লিরিক। 'তারে মানা করে কে' — এখানে মানা শব্দটা কী চমৎকার নতুন! বিশ্বাসই করা যায় না, 'উঠিবে হিয়া গুঞ্জরিয়া' যাঁর লেখা, তিনিই এটা লিখেছেন।

গান শেষ হবার পরও মানবেন্দ্র একটুক্ষণ চুপ করে বসে ছিলেন। তারপর সচকিত হয়ে উঠলেন। একটা কিছু বলা দরকার। গান নয়, গানের কথাগুলোই তাঁকে দারুণ ভাবে আলোড়িত করেছে।

তিনি মুখ তুলে মানসীকে বললেন, গানটা নতুন ভাবে শুনলাম।

এ-সব গান কি কখনও পুরনো হয়? এই ধরনের আজেবাজে কথা বলতে শুরু করল হিরণ্ময়। মানবেন্দ্র সে-দিকে মনোযোগ দিলেন না। তিনি দেখলে লাগলেন মানসীকে।

মানসী সোজা চেয়ে আছে মানবেন্দ্রর দিকে। কী অদ্ভুত সেই দৃষ্টি। যেন সে কিছু বলতে চাইছে। কিন্তু মানবেন্দ্র সব সময় চোখের ভাষা পড়তে পারেন না। তিনি বোঝেন স্পর্শের ভাষা। তিনি চোখ সরিয়ে নিলেন, আবার তাকালেন। তখনও মানসী চেয়ে আছে, কিছু বলতে চাইছে। মানবেন্দ্রর ভেতরের পাগলামিটা হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তাঁর দুর্দান্ত ইচ্ছে জাগল হাতখানা বাড়িয়ে মানসীর থুতনিটা একটু ছুঁয়ে দেবার। তিনি নিজেকে দমন করতে পারছেন না। হাতটা নিশপিশ করছে। ওকে একবার ছুঁতেই হবে। আর কিছু না, শুধু একটা ছোঁয়া। যেন ওকে একবার ছুঁয়ে দিলেই বোঝা যাবে, ও কী বলতে চাইছে। মানসী বেশ খানিকটা দূরে বসে আছে। অত দূর হাত পৌঁছবে না।

মানবেন্দ্র চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

গৌতম জিজ্ঞেস করল, এ কী, আপনি যাচ্ছেন!

মানবেন্দ্র কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন মানসীব দিকে।

মানসী বলল, বসুন!

যেন একটা হুকুম। মানসীর ওই কথাতেই মানবেন্দ্রর ঘোর কেটে গেল। তিনি কী কবতে যাচ্ছিলেন! এত লোকজেনর সামনে —। মানসী কি বুঝতে পেরেছে তাঁর উদ্দেশ্য? নইলে কেন শুধু বলল, বসুন। ঠিক হুকুমের সুর। যেন সিংহকে পোষ মানাবার অভ্যেস আছে ওর! স্বাভাবিক ভাবে কি ওর বলা উচিত ছিল না, আপনি আর একটু বসুন!

মানবেন্দ্র গৌতমের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি একটা চুরুট আনতে যাচ্ছিলাম। ঘরে ফেলে এসেছি।

অসীম তক্ষুনি তার সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, সিগারেট নিন না! আপনার সিগারেট চলে না?

মানবেন্দ্র সিগারেট নিয়ে ধরালেন। প্রথম ধোঁয়া টেনেই ভারি ভাল লাগল। প্রায় চার-পাঁচ মাস বাদে তিনি আবার সিগারেট টানছেন। যেন হারিয়ে যাওয়া প্রেমিকাকে নতুন চুম্বন।

কিন্তু মানবেন্দ্র লক্ষ্য করলেন, তাঁর হাত কাঁপছে। বেশ চোখে পড়ার মতো কাঁপুনি। এ-রকম তো আগে কখনও হয়নি। অন্যরা যাতে কিছু বুঝতে না পারে সেই জন্য তিনি হাতটা রাখলেন উরুর ওপরে। তার পর টের পেলেন, তাঁর বুকের মধ্যেও দুপ দুপ শব্দ হচ্ছে বেশ জোরে। এই শব্দ অন্য কেউ শুনতে পাচ্ছে না তো?

গৌতম জিজ্ঞেস করল, আপনি যে এখানে একটা ঝরনার কথা বলছিলেন।

প্রশ্নটা শুনে মানবেন্দ্র এমন ভাবে তাকালেন যেন একটা নতুন কথা শুনলেন। ঝরনা? এখানে আবার ঝরনা কোথায়?

গৌতম আবার বলল, আপনিই তো একটা ঝরনার কথা বলেছিলেন।

ততক্ষণে মানবেন্দ্র খানিকটা কৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ, সেটা দেখে যাবেন, যদি পারেন। এমন কিছু নয়, কিন্তু জায়গাটা খুব নির্জন, খানিকটা জঙ্গল মতো।

কত দূরে?

মাইল তিনেক।

ঝরনাটার কথা তো এখানে আর কেউ বলেনি!

আমি হাঁটতে হাঁটতে এক দিন গিয়েছিলাম। হাঁটা-পথ ছাড়া আর কোনও পথও নেই অবশ্য।

আমরা তো পরশু সকালেই চলে যাব ঠিক করেছি, তাহলে কালই দেখে ফেলতে হয়।

সব মিলিয়ে ঘণ্টা দু-এক লাগবে।

হিরণ্ময় মাঝখান থেকে বলল, আপনি কি এখানে কিছু লেখবার জন্য এসেছেন?

মানবেন্দ্র সংক্ষিপ্ত ভাবে উত্তর দিলেন, না।

আপনি এখানে নতুন কী লিখছেন?

কিছু না।

হিরণ্ময় আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, গৌতম তাকে বাধা দিয়ে মানবেন্দ্রকে বলল, আপনি বোধহয় নিজের লেখা সম্পর্কে কোনও রকম আলোচনা করতে চান না, তাই না? অনেক সহিত্যিক চায় না, আমি জানি।

এই কথারও উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই, এইভাবে মানবেন্দ্র ঈষৎ স্মিত মুখে চুপ করে বসে রইলেন।

অনুরাধা বলল, রাইটাবরা কী কবে এত সব বানান বুঝতে পারি না। আচ্ছা, সবই কি বানানো, না কিছুটা সত্যি থাকে?

মানবেন্দ্র মুখের হাসিটা একটু চওড়া করে বললেন, সবই সত্যি। একটুও বানানো নয়।

আপনারা যা লেখেন সবই সত্যি?

হ্যাঁ।

অনুরাধার মুখখানি এই কথার পর একটু ম্লান হয়ে গেল। যেন সে বুঝতে পেরেছে মানবেন্দ্র তার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন। তার কথার কোনওই গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

মানবেন্দ্র সেটা লক্ষ্য কবে এবার একটু বেশি উৎসাহের সঙ্গে বললেন, আপনি বিশ্বাস করলেন না? পৃথিবীতে যা আছে, তা ছাড়া মানুষ আর কিছুই কল্পনা করতে পারে না। এমন কী মানুষ যে মিথ্যে কথা বলে, কোথাও না কোথাও সেগুলোও সত্যি।

অনুরাধা বলল, আপনি আমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখতে পারেন?

মানবেন্দ্র বললেন, যদি আর্টিস্ট হতাম, অর্থাৎ পেইন্টার, তা হলে এক্ষুনি বলতাম, পারি। লেখকদের পক্ষে চট করে বলা শক্ত।

কেন?

এক জন ডাক্তার অপারেশান টেবিলে তার পেসেন্টকে যেমন ভাবে জানে, এক জন লেখককে তার চেয়েও বেশি জানতে হয় তার পাত্র-পাত্রীদের।

বাবাঃ, আপনি এমন ভাবে বললেন, যেন আমি ভাবলাম, আমি সত্যিই একটা অপারেশন টেবিলে শুয়ে আছি। ভাবলেই ভয় করে!

মানবেন্দ্র সিগারেটে আর একটা দীর্ঘ টান দিয়ে বললেন, তাছাড়া, জানেন তো, অবৈধ প্রেম ছাড়া গল্প হয় না! বেশ সুখী বিবাহিত জীবন নিয়ে পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত সার্থক কিছু লেখা হয়নি!

অনুরাধা একবার চট করে স্বামীর দিকে তাকিয়ে নিয়ে মুচকি হেসে বলল, কী করে জানলেন, আমার সে-রকম কিছু প্রেম-টেম নেই? বিয়ে করলেই কি সব শেষ হয়ে যায়!

সিনেমার নায়িকা হিসেবে কিন্তু আপনাকে খুব ভাল মানাত!

তথ্য সরবরাহকারী হিসেবে হিরণ্ময় বলল, অনুরাধাকে তো সত্যজিৎবাবু একবার পছন্দ করেছিলেন ওঁর একটা ছবির জন্য। কিন্তু অনুরাধার মা-বাবা কিছুতেই রাজি হলেন না।

হিরণ্ময়কে তার বন্ধুপত্নীদের জন্য বেশ গর্বিত দেখা যায়। এক জন ইচ্ছে করলেই রেডিয়োতে গান গাইতে পারত, গায় না। এক জন সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে সুযোগ পেয়েও নেয়নি। এই রকম গুণান্বিতা তৃতীয় কোনও মেয়ে পাচ্ছে না বলেই বোধহয় সে নিজে বিয়ে করতে পারছে না।

মানবেন্দ্র তাকালেন মানসীর দিকে। যদিও সে প্রায় কোনও কথাই বলছে না। অথচ তার দৃষ্টিতে মনে হয়, সে-ই সব চেয়ে বেশি কথা বলছে। মানবেন্দ্র চোখের ভাষা বোঝেন না।

বাচ্চারা খেলা করছে অদূরের বারান্দায়। মাঝে মাঝে তাদের চ্যাঁচামেচি ও ঝগড়ার আওয়াজ শোনা যায়। এই দুই রমণীর মধ্যে কার দু'টি বাচ্চা, কার একটি? এদের দেখলে কিন্তু বোঝা যায় না এরা জননী। শুধু নারী হয়ে বসে আছে এখন।

গৌতম মানসীকে জিজ্ঞেস করল, তুমি আর একটা গান গাইবে?

মানসী বলল, না, আজ থাক।

অনুরাধা বলল, আর একটা গান কর না, ও তোর গান শুনতে এত ভালোবাসে।

মানবেন্দ্র একটু চমকে তাকালেন।

মানসী বলল, আমি তো সব সময়েই গান করছি।

অনুরাধা মানবেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, আমি একদম গান জানি না।

অসীম বলল, কিন্তু অনুরাধা, তোমারও সেতারে ভাল হাত ছিল, চর্চাই কবলে না।

হিরণ্ময় সেই সঙ্গে যোগ করল, নিখিল ব্যানার্জির ছাত্রী ছিল।

মানবেন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এখন তিনি এখান থেকে উঠে পড়লে কিছুই অভদ্রতা হবে না। কিন্তু কেউ যেন তাঁকে পেরেক দিয়ে চেয়ারের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে। তিনি বার বার তাকাতে লাগলেন গৌতমের দিকে। এত সুন্দর যুবাপুরুষটি যে-কোনও কাবণেই হোক তার স্ত্রীকে খুব ভয় পায়। সে আড়ষ্ট হয়ে আছে। অসীমের ব্যবহার সহজ ও স্বাভাবিক।

আড্ডা ভাঙল রাত ন'টায়। মানসীই প্রথম উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি যাই, বোধহয় বাচ্চাদের খিদে পেয়েছে।

মানসী আর একবার তাকাল মানবেন্দ্রর দিকে। কোনও বিদায়-বাক্য উচ্চারণ করল না।

একটু বাদেই সবাই উঠল। মানবেন্দ্র তার পরেও অনেকক্ষণ বসে রইলেন সেখানে। অন্যরা খাবার ঘরে গেল, বেয়ারা ডাকতে এল তাঁকে খেয়ে যাবার জন্য। তিনি ফিবিয়ে দিলেন। চুপ করে বসে থেকে তিনি যেন কোনও কিছুর প্রতীক্ষা করছেন। তারপর, সকলেই যখন যে-যার ঘরে চলে গেল খাওয়া দাওয়া সেরে, তখন মানবেন্দ্র চলে এলেন নিজের ঘরে। বেয়ারাকে ডেকে বললেন ঘরেই খাবার দিতে। তারপর বই খুলে গভীর মনোযোগে ডুব দিলেন।

রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ মানবেন্দ্র বইটা মুড়ে রেখে এসে দাঁড়ালেন ঘরের দরজার কাছে। এর মধ্যেই অন্য সব ঘরে আলো নিভে গেছে, টুরিস্ট লজটা একেবারে নিস্তব্ধ।

বাগানে চেয়ারগুলো এখনও ঠিক সেইভাবে পাতা রয়েছে। সেই দিকে তাকিয়ে মানবেন্দ্রর একবার সামান্য দৃষ্টিবিভ্রম হল। তিনি দেখলেন, চেয়ারগুলো যেন ভর্তি, যে যেখানে ছিল, সে সেখানেই বসে আছে। এমনকী নিজেকেও দেখতে পেলেন সেখানে।

আকাশে ফট ফট করছে জ্যোৎস্না। কী নিথর, সুন্দর এই রাত্রি। এখানকার রাত্রির আকাশে সব তারাই খুব স্পষ্ট। মানবেন্দ্র দেখতে পেলেন কালপুরুষকে, কোমরবন্ধে তলোয়ার এঁটে যেন পাহারা দিচ্ছেন এই গ্রহটিকে।

সে-দিকে তাকিয়ে মানবেন্দ্র অস্ফুট ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, আমার আয়ু আর কত দিন?

কালপুরুষ বললেন, আরও অনেক দিন। এখনও তো জীবনের অর্ধেকও কাটেনি।

মানবেন্দ্র বললেন, কেন? এ-কথা বলার পর আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে মানবেন্দ্র নিজেকে প্রশ্ন করলেন, আমি কি বেশি দিন বাঁচতে চাই না? নিশ্চিয়ই চাই। সব মানুষই চায়। তবু কেন যেন মনে হচ্ছে আর বেশি দিন আয়ু নেই। পাগল হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

পায়ের শব্দ না করে মানবেন্দ্র হেঁটে এলেন বাগানে। যে-চেয়ারটাতে তিনি বসেছিলেন, সেই চেয়ারটাতেই বসলেন। তারপর প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। মানসী আসবে।

মানসী শুয়ে আছে নিজের বিছানায়। বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়েছে। স্বামীকে ঘুম পাড়াতে তার কতটা সময় লাগবে, কে জানে! যত সময়ই লাগুক, মানবেন্দ্র অপেক্ষা করবেন। মানসীর নিশ্চয়ই এক সময় মনে পড়ে যাবে, মানবেন্দ্রকে সে কোনও কথাই বলেনি। এমনকী, বিদায় নিয়েও যায়নি। মানসী একবার শুধু তাকে হুকুম করেছিল, বসুন। তারপরে তো আর বলেনি, আমি যাচ্ছি, আর আপনার বসে না থাকলেও চলবে!

বিরাট লম্বা লম্বা এক একটা মিনিট কাটতে লাগল। মানবেন্দ্র পায়ের ওপর পা তুলে চুপ করে বসে আছেন। শীত পড়েছে বেশ জাঁকিয়ে। খোলা মাঠে হিম পড়ছে মাথায়। মানবেন্দ্রর ভ্রূক্ষেপ নেই।

কতক্ষণ কাটল কে জানে। শীতে হাত-পায়ে খিল ধরে যাচ্ছে। তাছাড়া আছে মশা। মানসী আসবে। মানসীর কিছু বলার আছে। তাছাড়া মানসীকে জিজ্ঞেস করতেই হবে, ওকে দেখে কেন আমার বুক কাঁপল, এখনও কাপছে। এটা একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। অনেক দিন তো এ-রকম হয়নি।

এক সময় মানবেন্দ্রকে উঠে পড়তেই হল। তবু তিনি খুব সতর্ক ভাবে পায়চারি করতে লাগলেন বারান্দায়। হয়তো মনের ভুলে মানসী ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু রাত্তিরে কি তার একবারও ঘুম ভাঙবে না? অনেকের তো ভাঙে। ঘুম ভাঙলেই মানসীর মনে পড়ে যাবে, মানবেন্দ্রকে সে হুকুমের সুরে বলেছিল, বসুন! এ-কথা বলার পর তো কেউ বিদায় না নিয়ে যায় না। মানসী নিশ্চয়ই বাইরে এসে দেখবে, লোকটা এখনও বসে আছে কিনা। যদি মানসী একবার দরজা খুলে বাইরে বেরোয়, মানবেন্দ্র তার সামনে গিয়ে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলবেন, চুপ!

কোনও ঘরের দরজা খুলল না। মানবেন্দ্র দেখে রেখেছেন, কোনটা মানসীর ঘর। এক সময় তিনি নিঃশব্দে সেই ঘরের সামনে দাঁড়ালেন। চোরের মতো দরজায় কান লাগিয়ে শুনবার চেষ্টা করলেন, ভেতরে নিশ্বাসের শব্দ পাওয়া যায় কিনা! মানসী কী ভঙ্গিতে শুয়ে আছে? পাশ ফিরে? সে কি রাত্রে শাড়ি ছেড়ে পোশাক পরে?

ডাইনিং হলের দিকে কীসের যেন একটা শব্দ হল। মানবেন্দ্র দারুণ চমকে উঠলেন। এখানকার বেয়ারারা কেউ জেগে উঠতে পারে, এ-দিকে আসতে পারে। গেটে দারোয়ান আছে। এ-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

মানবেন্দ্র ফিরে এলেন নিজের ঘরে। দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে মানবেন্দ্রর খেয়াল হল, মানসী যদি আসে, যদি দরজা বন্ধ দেখে ফিরে যায়? তা তো হতেই পারে না। তিনি দরজাটা আধখানা ভেজিয়ে রাখলেন। তারপর একটা চেয়ার টেনে বাগানের দিকে জানলাটার কাছে বসে রইলেন। এখান থেকে চেয়ারগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মানসী যেই এসে চেয়ারে বসবে, অমনি তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে সেখানে যাবেন। কিংবা ওখানে মানসী তাঁকে দেখতে না পেলে আসবে এই ঘরের দিকে।

ধ্যানে ঈশ্বরকে ডাকার মতো মানবেন্দ্র চোখ বুজে তীব্র ইচ্ছার তরঙ্গ পাঠিয়ে দিয়ে মনে মনে বলতে লাগলেন, মানসী, তোমার ঘুম ভেঙে যাক। মানসী, তুমি জেগে ওঠো, তুমি আমার কাছে চলে এস!

মানবেন্দ্র যখন শেষ আশা ছাড়লেন, তখন রাত প্রায় সাড়ে তিনটে বাজে। তার মুখখানা দারুণ বিমর্ষ হয়ে গেল। এ কী এক অসম্ভব চিন্তায় তিনি নিজেকে এতক্ষণ কষ্ট দিচ্ছিলেন! মানসীর সঙ্গে তাঁর আজই আলাপ হয়েছে, কথা হয়েছে মাত্র দু'তিনটে, সাধারণ কথা। সেই মেয়েটি কেন রাত্রে তার স্বামীর পাশ থেকে উঠে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবে? এ কখনও হয়? ভুল ধারণা! শীতের মধ্যে এতটা রাত জেগে যে তিনি বসে রইলেন, এটা কি নিছক পাগলামি নয়? নিজের কাছে তিনি আবার হেরে যাচ্ছেন।

মানবেন্দ্র একটা কাচের গেলাস তুলে ছুঁড়ে মারলেন মেঝেতে। ঝন ঝন শব্দ রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে অনেক বেশি তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। তবু সেই শব্দেও কারুর ঘুম ভাঙল না।

কিন্তু মানবেন্দ্র ধাতস্থ হলেন।

মাথা ঠাণ্ডা করে তিনি ভাবলেন, একটা কাচের গেলাস ভাঙা কিছুই নয়। মানুষ শখ করেও ভাঙতে পারে। আমি এ-রকম আগেও ভেঙেছি। শব্দটা আমার ভাল লাগে। একে পাগলামি বলে না।

টেবিলের ড্রয়ার খুলে তিনি ঘুমের ওষুধের শিশিটা বার করলেন। এর গোটা চল্লিশ-পঞ্চাশেক খেলেই সব ঠিক হয়ে যায়। তাঁর কাছে বিরানব্বইটা আছে। ইচ্ছে করেই এতগুলো এই ওষুধ কাছে রেখেছেন। এর থেকে একটা দুটোর বেশি কখনও যে খেতে ইচ্ছে করে না, এটাই তো তাঁর স্বাভাবিকতা। বেঁচে থাকার ইচ্ছের মতো স্বাভাবিক আর কী!

দুটো ট্যাবলেট খেয়ে মানবেন্দ্র আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন।

॥ ৪ ॥

পরদিন ঘুম ভাঙার পরই মানবেন্দ্র ঠিক করেছিলেন, ওই দলটা টুরিস্ট লজ ছেড়ে যাবার আগে তিনি আর ঘর থেকেই বেরুবেন না। এক দিন দেড় দিন ঘরের মধ্যে কাটিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে কিছুই না। ওদের সঙ্গে আর দেখা করতে চান না তিনি। জীবনে আর জটিলতা বাড়িয়ে লাভ নেই। ওরা যদি তাঁর কাছে বিদায় নিতে আসে, তিনি এখান থেকে শুকনো ভদ্রতা সেরে দেবেন।

ঘরে বসেই ব্রেকফাস্ট খেয়ে তিনি আবার বই খুলে বসলেন। টিকটিকিগুলো কিংবা মথটার কথা তিনি ভুলেই গেছেন।

একটু পরে একটা শব্দে তিনি বই থেকে চোখ তুলে তাকালেন। একটি বাচ্চা মেয়ে তাঁর দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

মানবেন্দ্র মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলেন, কিছু বললেন না। মেয়েটিও কিছু বলল না। বাচ্চারা এই রকম হয়, অনেক সময় মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, কোনও কথা বলে না। মানবেন্দ্রও ছোটদের সঙ্গে একেবারেই ভাব জমাতে পারেন না।

মেয়েটি মিনিট দু'এক ও-রকম ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর জিজ্ঞেস করল, তুমি বুঝি এ ঘরে থাক?

হ্যাঁ।

এটা

না, এটা তো গভনমেন্টের বাড়ি।

মেয়েটি ঘরের মধ্যে এগিয়ে এল কয়েক পা। বছর পাঁচেক বয়েস। বেশ ফর্সা রঙ, সম্ভবত গৌতম-অনুরাধারই মেয়ে হবে। টেবিলের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞেস করল, তোমার ওই বইটাতে ছবি আছে?

না তো।

তোমার কাছে কোনও ছবির বই নেই?

উঁহু।

আমার অনেক ছবির বই আছে, কিন্তু সেগুলো আনিনি। কলকাতায় ফেলে এসেছি।

তুমি ছবি আঁকতে পারো না?

হ্যাঁ। আমি অনেক ছবি এঁকেছি।

আমার কাছে সাদা কাগজ আছে, কলম আছে, তুমি ছবি আঁকবে?

তোমার লাল-নীল পেনসিল নেই?

বাইরে থেকে কার গলা শোনা গেল, রিনি! রিনি!

বাচ্চা মেয়েটি হেসে বলল, আমার নাম রিনি।

মানবেন্দ্র এবার হেসে বললেন, ও তাই বুঝি! আমার নাম মানবেন্দ্র। নমস্কার রিনি দেবী।

দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে মানসী। জিজ্ঞেস করল, আপনাকে বিরক্ত করছে বুঝি?

না, না।

রিনি, কেন এখানে এসেছ?

রিনি সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমি কিন্তু কোনও জিনিসে হাত দিইনি। তারপর সে এক ছুটে মায়ের পাশ দিয়ে বাইরে চলে গেল।

মানসী একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। দরজার কাছে। রহস্যময় গভীর দৃষ্টি। মানবেন্দ্রর মনে হল, মানসীর দৃষ্টির রঙ গাঢ় নীল।

তিনি মানসীকে ঘরের ভেতরে এসে বসার জন্য অনুরোধ করলেন না। তিনিও মানসীর চোখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন।

মানসী নিজে থেকেই ঘরের মধ্যে এক পা এগিয়ে এসে বলল, বাঃ, কী সুন্দর প্রজাপতিটা!

মথটা তখনও দেয়ালে তার রূপ মেলে দিয়ে বসে আছে। ও এখনও বেঁচে আছে, এটা সত্যিই একটা বিস্ময়কর ঘটনা।

মানসী বলল, এত বড় প্রজাপতি আগে কখনও দেখিনি।

প্রজাপতি নয়, মথ। একরঙা, ডানাগুলো একটু মোটা।

ও হ্যাঁ। ওগুলো তো রাত্তিরে আসে।

ও নিজে নিজেই আমার ঘরে এসেছে পরশু রত্তিরবেলা।

মানসী আরও এগিয়ে দেয়ালের কাছে এসে মথটাকে দেখতে লাগল। কোনও রকম আড়ষ্টতা নেই তার মধ্যে। সে নিজে থেকেই কথা বলছে।

মানবেন্দ্রর মনে মনে হাসি পেল। কাল প্রায় সারা রাত তিনি মানসীর জন্য অপেক্ষা করে জেগে বসে ছিলেন। মানসী সে-কথা কোনও দিন জানতে পারবে না। ওকে বললেও বিশ্বাস করবে না। আজ সকালে মানসী নিজের থেকেই এসেছে। এখন দিনের আলো, এখন সব কিছু অন্য রকম। মানসী তো মথ নয়, প্রজাপতি, তাই ও রাত্রে আসেনি।

মুখ ফিরিয়ে আচম্বিতে মানসী বলল, আমি আপনাকে অন্য রকম ভেবেছিলাম।

তার মানে?

যে-মানবেন্দ্র মজুমদারকে আমি অনেক দিন থেকে চিনি, তাকে আমি অন্য রকম ভেবেছিলাম।

আমাকে আপনি...চেনেন?

চিনি না? বাঃ।

ও। অন্য রকম মানে কী-রকম ভেবেছিলেন? গল্পের নায়কের চেহারা আর লেখকের চেহারা কখনও এক রকম হয় না।

আমি চেহারার কথা বলছি না। চেহারায় কী আসে যায়! পুরুষরা যত চেহারা নিয়ে মাথা ঘামায়, মেয়েরা কিন্তু ততটা নয়।

আমার অভিজ্ঞতা অন্য রকম।

আপনার কি সব কিছু সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে?

না, তা নেই। সে-রকম দাবি করতে পারি না।

আপনি যে এত গম্ভীর তা ভাবিনি।

আমি গম্ভীর? না তো! এক এক সময় আমি খুবই বক বক করি। তবে সব সময় কথা বলতে ভালো লাগে না, তা-ও ঠিক। কিন্তু আপনিই তো কাল প্রায় সব সময় চুপ করে ছিলেন।

আমি তো গান গাইলাম।

গান তো কথা নয়।

আপনার ওপর আমার খুব রাগ আছে। কখনও দেখা হলে বলব ভেবেছিলাম।

আমি তাহলে ঠিকই বুঝেছিলাম, আপনি আমাকে কিছু বলতে চান। বিশ্বাস করুন, কাল সন্ধেবেলাই আপনার চোখ দেখে মনে হয়েছিল আমাকে কিছু বলবেন। আলাদা ভাবে। তাহলে আমি ভুল করিনি।

আপনি অতীনকে মেরে ফেললেন কেন?

মানবেন্দ্রর চোখে-মুখে একটা উৎসাহের দীপ্তি এসেছিল, হঠাৎ আবার সেটা নিভে গেল। তিনি নিরাশ ভাবে বললেন, ও, এই কথা!

হঠাৎ ওকে মেরে ফেলেই বইটা শেষ করে দিলেন।

গল্পের নায়করা তো কোনও এক সময় মরবেই।

ও কি শুধু গল্পের নায়ক? আমাদের কাছে সত্যি হয়ে উঠেছিল, ও তো অনেক আগেই মরতে পারত, বিপ্লবের সময় কিংবা জেলখানায়। শেষ পর্যন্ত ওকে দীপ্তিদির কাছে ফিরিয়ে এনে তারপর হঠাৎ।

আপনি একটু বসবেন?

আমরা সবাই এক্ষুনি বেরুচ্ছি।

তবু দু'এক মিনিট।

না, ওরা আমাকে খোঁজাখুঁজি করবে।

মানবেন্দ্র দ্রুত চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে মানসীর একটা হাত ধরে কাতর ভাবে বললেন, তুমি একটু বসো!

মানসী একটুও চমকাল না। মানবেন্দ্রর হাতের দিকে একবার তাকাল, তারপর নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে হাসিমুখে বসে পড়ে বলল, আপনার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতেও আমার ভাল লাগবে। কিন্তু আপনার তো অত সময় নেই।

আমার অফুরন্ত সময়।

কিন্তু আমি যে আগে সকলের মুখে শুনেছি, আপনি খুব ব্যস্ত মানুষ!

তার মানে, আমার কথা কে বলেছে তোমাকে?

মানসীকে আপনি থেকে হঠাৎ তুমি সম্বোধন করার জন্য মানবেন্দ্র কোনও কৈফিয়ত দিলেন না। এইটাই যেন খুব স্বাভাবিক। যদিও মানবেন্দ্র অচেনা নারীদের কক্ষনও তুমি সম্বোধন করেন না।

আপনাকে অনেকে চেনে। তার মধ্যে দু'এক জনকে আমি চিনি। আমারও খুব ইচ্ছে ছিল আপনার সঙ্গে দেখা করার। অনেক দিন থেকে।

মানবেন্দ্র দুঃখিত ভাবে বললেন, কেন দেখা করোনি?

ইচ্ছে থাকলেই কি সব কিছু করা যায়! তাছাড়া, আপনার মতো ব্যস্ত লোকের সঙ্গে দেখা করা, যদি বলতেন...।

সেই সব ব্যস্ততা এখন ফুরিয়ে গেছে।

আমিও দেরি করে ফেলেছি।

মানসী এই কথাটা বলল মুখ নিচু করে, খুব আস্তে। মানবেন্দ্র ভাল করে শুনতে পেলেন না, জিজ্ঞেস করলেন, কী?

মানসী বলল, না, কিছু না।

মানসী আবার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, অন্য কারুর সঙ্গে আলাপ করতে অনেক দেরি লাগে। কিন্তু আপনাকে আমি মনে মনে অনেক দিন থেকেই চিনি।

তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, আমিও তোমাকে অনেক দিন থেকে চিনি।

না, সেটা ঠিক নয়।

মানসী এগিয়ে গেল দরজার কাছে, সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আপনি কাল অনুরাধাকে ও-রকম মনে আঘাত দিয়ে কথা না বললেই পারতেন।

মনে আঘাত দিয়েছি?

হ্যাঁ দিয়েছেন। ও যখন বলল ওকে নিয়ে একটা গল্প লেখার কথা...।

কারুকে একবার দেখলেই কি গল্প লেখা যায়!

আপনার সব নায়িকাই তো ওই রকম সুন্দর হয়।

আমার মনে হয়, তুমি —।

অনুরাধা সত্যিই চায়, ওকে নিয়ে কেউ...।

আমার মনে হয়, তুমি...।

আপনি আমাকে তুমির বদলে আপনি বললেই ভাল করতেন। সেটাই ভাল দেখায়।

আমি কাল সন্ধে থেকেই মনে মনে তোমাকে তুমি বলে ফেলেছি, সেটা এখন আর ফেরানো যায় না।

মানসী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে একটু হাসল। সেই হাসিতে ভরে গেল সম্পূর্ণ ঘরটা। হাসির সময় মানসীর মুখটা সম্পূর্ণ অন্য রকম দেখায়। মনে হয়, এ পৃথিবীর মানুষই নয়। অন্য কোনও গ্রহ থেকে কিছু দিনের জন্য বেড়াতে এসেছে।

মানসী বলল, সব লেখকই বুঝি এ-রকম পাগল হয়?

মানবেন্দ্র বলতে গেলেন, অন্যদের কথা জানি না। কিন্তু তিনি আর মানসীকে দেখতে পেলেন না। হাওয়ায় অদৃশ্য হয়ে যাবার মতো মানসী চকিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

মানবেন্দ্রই উঠে এলেন দরজার কাছে। কিন্তু সংকল্পটা রক্ষা করলেন, ঘর থেকে বেরুলেন না।

মানবেন্দ্র ডান হাতখানা মেলে সে-দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই হাত দিয়ে তিনি মানসীর হাত ছুঁয়েছিলেন। কোনও রকম আপত্তি তো ও করেনি। একটুখানি ছুঁয়েই অনেক কিছু পাওয়া যায়।

ঘরে যেন একটা সুগন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। হয়তো মানসী কোনও দুর্লভ পারফিউম মেখে এসেছিল। কিন্তু সে যতক্ষণ ঘরে ছিল, ততক্ষণ তো এই গন্ধটা পাওয়া যায়নি।

তিনি চলে এলেন মাঠের দিকের জানলার কাছে। অনেকখানি বিস্তৃত প্রান্তর ও তার মাথার ওপর সমান্তরাল আকাশের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলে মনটাও একটু বড় হয়ে যায় মনে হয়। আজ বেশ জোরে হাওয়া বইছে। এক জন লোক একা একা হেঁটে যাচ্ছে মাঠের মধ্য দিয়ে। কাঁধে একটা ঝোলা। লোকটি যেন দিগন্তেরও ও-পার পর্যন্ত হেঁটে যাবে। এই সব লোক দেখলেই পথিক কথাটা মনে পড়ে।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরই মানবেন্দ্র দেখতে পেলেন, গৌতমদের গাড়িটা বেরিয়ে যাচ্ছে। সামনের সিটে পুরুষ তিন জন, পেছনে মেয়েরা ও বাচ্চারা। মোটর গাড়ির যাত্রী ও যাত্রিণীদের জন্য পথিক-এর মতো এমন সুন্দর কোনও শব্দ এখনও তৈরি হয়নি।

সে-দিক থেকে চোখে ফেরাতেই তিনি দেখতে পেলেন জানলার ঠিক নিচের চন্দ্রমল্লিকা ফুলটিকে। ফুলটা আজ বেশ যুবতী হয়েছে। হাওয়ায় দোলাচ্ছে মাথা।

মানবেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ?

ফুলটি মাথা দোলাতে দোলাতে উত্তর দিল, আমি সব দেখছি! আমি সব দেখছি!

ও, তুমি সব দেখছ? আমার এই শুকনো ঘরে আজ একটি মেয়ে এসেছিল, তুমি দেখেছ?

তিনি ফুলটির ওপর আলতো করে আঙুল ছুঁইয়ে আবার বললেন, আচ্ছা বলো তো ফুলকুমারী, ফুলেরও কি হিংসে থাকে? তুমি না বলছ? আমি বিশ্বাস করি না। হ্যাঁ থাকে, আমি জানি।

ফুলটার ওপর হাত রেখে আঙুলে একটা সুন্দর অনুভূতি হল। মানবেন্দ্র ভাবলেন, নারীর থেকে ফুলও কম সুন্দর নয়।

জানলার কাছ থেকে সরে এসে তিনি তিলককামোদের একটা সুর ধরলেন। মাথার ওপর হাত তুলে ব্যায়ামের ভঙ্গি করলেন খানিকক্ষণ। তারপর বেয়ারাকে ডেকে সিগারেট আনতে দিলেন এক প্যাকেট। মনটা খুব খুশি লাগছে। আজ চুরুটের বদলে সিগারেটই খেতে হবে।

মনটা খুশি খুশি লাগছে কেন? একটি মেয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেছেন, সেই জন্য? নারী-সঙ্গ পাওয়ার জন্য তাঁর মনটা সব সময় উন্মুখ হয়ে থাকে। কিন্তু নিজেকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করার জন্য, কষ্ট দেবার জন্যই তো তিনি এখানে এসেছেন!

তাছাড়া যে-কোনও নারীই এখন তাঁকে আর আকর্ষণ করে না। এক সময় ছিল, যখন অন্ধের মতো নারীদের শরীরে এমন কিছু খুঁজে বেড়াতেন যা কখনও পাওয়া যায় না। এখন সেই ভুল ভেঙেছে। এক সময় তাঁর রূপের প্রতি মোহও ছিল সাঙ্ঘাতিক। চোখ ঠিকরোনো রূপসী নারীদের দেখলেই পতঙ্গের মতো তাদের চারপাশে ঘুর ঘুর করতেন। প্রেমে ব্যর্থ হতে ভারি ভাল লাগত।

এখন সেই মোহ ঘুচেছে। এখন বুঝতে পারেন, সকলেই যাদের রূপসী বলে, তারা আসলে সুন্দর নয়। রূপকে আবিষ্কার করতে হয়। সৌন্দর্য হচ্ছে একটা অভিজ্ঞতা। অন্য সব কিছুর থেকে আলাদা হওয়াই সৌন্দর্যের একটা বড় শর্ত। ফুল প্রকৃতপক্ষে সুন্দর নয়, কারণ, এক জাতের ফুল সব এক রকম। ফুল সেই রকমই সুন্দর যেমন বাঘ সুন্দর, জেপ প্লেন সুন্দর, গোরুর চোখ সুন্দর, বৃষ্টির পর আকাশ সুন্দর, কিংবা একটা স্বাস্থ্যবান আপেল কিংবা কোকিলের স্বর। নারীর সঙ্গে এ-সব কিছুরই তুলনাই হয় না। অনুরাধাকে সকলেই সুন্দরী বলবে, কিন্তু মানবেন্দ্র প্রথমেই মুগ্ধ হয়েছিলেন মানসীকে দেখে। মানসীকে দেখে চেনা মনে হয়েছিল। অন্য কারুর মতো দেখতে নয়, মানবেন্দ্রও আগে কখনও ওকে দেখেননি, তবু চেনা। এই অনুভূতির ব্যাখ্যা তিনি করবেন কী করে?

এ বিষয়ে মানবেন্দ্রর কোনও সন্দেহও রইল না যে, মানসী তাঁর জন্যই ঠিক এই সময়ে এসেছে এই বাংলোতে বেড়াতে। পৃথিবীতে কোথাও একটা কার্য-কারণের হেড অফিস আছে, সেখান থেকে অনেক বাছাবাছি করে শুধু মানসীকেই পাঠানো হয়েছে প্রায়-উন্মাদ লেখকের শুশ্রূষার জন্য।

এ-রকম হয়। অনেক দিন আগে একবার মানবেন্দ্র বদ্ধমাতাল হয়ে মাঝরাত্রির পর ট্যাক্সিতে চেপেছিলেন। এমন বেঘোর অবস্থা যে, চিনতে পারছিলেন না রাস্তা। ট্যাক্সিওয়ালা বহু রাস্তা ঘুরে হয়রান হয়ে পড়ে। মানবেন্দ্র তাকে অনবরত ধমকাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বেহালার সখেরবাজার ছাড়িয়ে একটা ফাঁকা রাস্তায় ট্যাক্সিওয়ালা ও তার সহকারী মানবেন্দ্রকে গাড়ি থেকে ঠেলে ফেলে দেয় রাস্তায়। দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, তবু মানবেন্দ্র দাড়ি চেপে ধরেছিলেন ড্রাইভারের। তার সহকারী তখন একটা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মারল তাঁর ঘাড়ে। তিনি ঘুরে পড়ে গেলেন, তবু এত বেশি জেদ, ভয় পেলেন না, বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, তোমাদের গাড়ির নম্বর আমি দেখে রেখেছি, তোমাদের সহজে ছাড়ব না। তখন তারা দু'জনে মানবেন্দ্রকে একেবারে মেরে ফেলাই মনস্থ করে। মেরেই ফেলত, কিন্তু ঠিক সেই সময় উলটো দিক থেকে আর একটা ট্যাক্সি এসে থামে। সেই ট্যাক্সির ড্রাইভার কেন যে অকারণে দয়ালু হয়, তার কারণ বোঝা যায় না। সে অন্য দুজনকে নিবৃত্ত করে নিজের ট্যাক্সিতে মানবেন্দ্রকে তুলে নিয়ে যায় এবং হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শুইয়ে রাখে। পরে মানবেন্দ্র প্রথম ট্যাক্সির নাম্বার ধরে ড্রাইভারকে ঠিক খুঁজে বার করেছিলেন ঠিকই। ক্ষমা চাইবার জন্য। দু'জনেই দু'জনের কাছে ক্ষমা চায়।

আর একবার মানবেন্দ্র বিষম দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েছিলেন। তিন মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি। কোনও দিক থেকেই কোনও রোজগারের আশা নেই। মাস আষ্টেক আগে রাগারাগি করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে আর কিছু জোটাতে পারেননি। প্রকাশকদের কাছেও প্রাপ্য নেই কিছু। অতিরিক্ত আত্মম্ভরিতার জন্য কারুর কাছ থেকে ধার চাইতেও পারেন না। সেই সময় হঠাৎ রাস্তায় এক জন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা। স্কুল-জীবনের বন্ধু। তারপর বহু বছর দেখা হয়নি, এখন সে একটা বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে মোটমুটি বড় চাকরি করে। সে বলল, তোকেই আমি খুঁজছিলাম রে, মানবেন্দ্র। তুই তো আজকাল লিখিস-টিখিস, নামটাম হয়েছে, আমাদের কোম্পানির জন্য একটা ছোট বিজ্ঞাপনের ছবির স্ক্রিপ্ট লিখে দিতে পারবি? কাজটা এমন কিছু নয়, হাজার আড়াইয়ের মতো টাকা পাবি।

তখন অন্তত দু' হাজার টাকারই বিশেষ দরকার ছিল। এই রকম আরও অনেকবার হয়েছে। তাঁর বিশ্বাস ছিল, সঙ্কটের সময় কেউ না-কেউ এসে যাবে। কিন্তু অসুখের ব্যাপারে তো কেউ এ-রকম সাহায্য করতে পারে না। এখন যেন মনে হচ্ছে, মানসীই এসেছে তাঁকে বাঁচাতে।

বাথরুমে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মানবেন্দ্র বললেন, মানসীকে আমার চাই।

কিন্তু মানসীর স্বামী আছে, সন্তান আছে। চাইলেই-বা তাকে পাওয়া যাবে কী করে? পাওয়া মানে কী-রকম পাওয়া?

মানবেন্দ্র স্নানের জন্য জামা-টামা খুলতে লাগলেন। নিজের শরীরটার দিকে তাকিয়ে মায়া হল। চোখের নিচে গাঢ় কালি পড়েছে। দু'চোখের পাশেই কাকের পায়ের ছাপ। মেদ জমেছে গায়ে। দিনের পর দিন উপুড় হয়ে শুয়ে লিখে লিখে জীবনীশক্তি ক্ষয় করেছেন। তাতে পৃথিবীর কোনও উপকার হয়নি। এবার পৃথিবী বুঝি বিদায় করতে চাইছে তাকে। না, আমি সহজে যাব না।

নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে মানবেন্দ্র বললেন, যতই চালাকি করো আমি কিছুতেই বুড়ো হচ্ছি না। তুমি, মানবেন্দ্র, তোমার হাত দিয়ে মানসীকে ছুঁয়েছ। এর মর্যাদা রাখতে হবে!

হঠাৎ আবার তাঁর খটকা লাগল। মানসী কি তাঁর ঘরে একটু আগে সত্যিই এসেছিল? নাকি এটা তাঁর চোখের ভুল? চঞ্চলকে যেমন তিনি ভুল দেখেছিলেন। আসলে কোনও এক জন বন্ধুর জন্য তাঁর মনটা বোধহয় আঁকুপাঁকু করছে। মানসী কি তাঁর বন্ধু হবে!

মানসী সত্যিই এ ঘরে এসেছিল কি না এর প্রমাণ নেবার জন্য মানবেন্দ্র বাথরুম থেকে ওই অবস্থাতেই ফিরে এলেন ঘরে। মানসীর রেখে যাওয়া গন্ধটা নেওয়ার চেষ্টা করলেন। ঠিক যেন পেলেন না। তিনি হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন একটুক্ষণ। সত্যি এসেছিল? চোখের ভুল নয়?

জানলার পাশ থেকে ফুলটা মাথা দুলিয়ে বলল, আমি সব দেখেছি! আমি সব দেখেছি!

তখন মানবেন্দ্রর খেয়াল হল, তাঁর শরীরে একটুও সুতো নেই। বাইরের দরজাটা খোলা। আরে, সত্যি কি আমি পাগল হয়ে গেলাম নাকি! মানবেন্দ্র দৌড়ে এসে দরজাটা বন্ধ করলেন, তারপর ফুলটাকে বললেন, তুমি ভারি দুষ্টু হয়েছ তো!

তিনি জানলার কাছে এসে বললেন, তুমি তো সব দেখেছ, তুমি বলো তো, একটু আগে মানসী কি এ ঘরে এসেছিল?

দেয়ালে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল। মানবেন্দ্র মুখ ফিরিয়ে দেখলেন বেহুলা। কোনও কথার মাঝখানে টিকটিকি ডেকে উঠলে নাকি সেই কথাটা সত্যি হয়। কিন্তু এটা তো একটা প্রশ্ন। যাই হোক, ও বোধহয় বলছে, আমার ধারণাটাই সত্যি। তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ বেহুলা।

তারপর ফুলটার চিবুক ধরে নেড়ে দিয়ে বললেন, তুমি কী সুন্দর! তোমাকে আমি ভীষণ ভালবাসি!

মানবেন্দ্র আবার বাথরুমে ফিরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ধমক দিয়ে বললেন, ভণ্ড কোথাকার! নিজের কাছেও মিথ্যে না বললে চলে না?

॥ ৫ ॥

সে-দিন বিকেলবেলা অসীম তাঁকে ডাকতে এল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলল, আমরা চা খাচ্ছি। আপনি আসবেন নাকি!

মানবেন্দ্র শুকনো ভাবে বললেন, আমি একটু আগে চা খেয়েছি।

অসীম তৎক্ষণাৎ বলল, ও। আমি কি আপনাকে ডিসটার্ব করলাম? আপনি কি লিখছিলেন?

না না, কিছুই করছিলাম না।

আপনাকে সারা দিন ঘর থেকে বেরুতেই দেখিনি।

এমনিই, বই-টই পড়ছিলাম।

অসীমের পাশে এসে মানসী দাঁড়াল। মানসী একটা ঝলমলে ছাপা সিল্কের শাড়ি পরেছে, তার ছিপছিপে শরীরটাকে দেখাচ্ছে মোমবাতির আলোর মতো।

মানসী বলল, আমরা ঝরনা দেখতে যাচ্ছি। আপনি যাবেন?

মানবেন্দ্র বললেন, আমি তো ঝরনাটা আগেই দেখেছি।

মানসী হেসে ফেলল। তার হাসিমুখটা একটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতো হয়ে গেল মানবেন্দ্রর চোখে।

হাসতে হাসতেই মানসী বলল, ঝরনা বুঝি একবার দেখলে আর দু'বার দেখা যায় না? চলুন না আমাদের সঙ্গে।

অসীম তার স্ত্রীকে বলল, না না, শুধু শুধু ওনাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছ কেন? ওঁর দেখা আছে যখন...।

মানসী বলল, আর একবার গেলে কী হয়েছে?

মানবেন্দ্র চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মানসী যা বলছে, তা তো অনুরোধ নয়। হুকুম। এ অগ্রাহ্য করার উপায় আছে নাকি তাঁর? মানসী এত জোর পেল কোথা থেকে?

মানবেন্দ্র বললেন, আচ্ছা চলুন, আমিও ঘুরে আসি। আমি এক্ষুনি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

আমরা বাগানে বসে ততক্ষণে চা-টা খেয়ে নিচ্ছি।

ওরা দু'জনে চলে যাবার পরই মানবেন্দ্র সুটকেসটা খুলে জামাকাপড় বার করতে গেলেন। সব কিছু ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগলেন ব্যস্তভাবে। ছেলেমানুষের মতো কোনও জামাকাপড়ই তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। মানসী নিজে থেকে তাঁকে ডেকেছে, বিশেষ পোশাকে যেতে হবে না? ইস, ভাল কিছু জামা টামা আনাই হয়নি।

শেষ পর্যন্ত মানবেন্দ্র এক জোড়া কাচা প্যান্ট-শার্ট পরে নিলেন, তার ওপর একটা বুক-খোলা সোয়েটার। অনেক দিন বাদে মোজার সঙ্গে শু পায়ে দিলেন। তারপর নবীন যুবকের মতো হালকা পায়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে। অসীমদের সঙ্গে তাঁর বয়েসের তফাত বেশি না, ছ'সাত বছর হবে, কিন্তু ওরা তাঁকে বেশি সম্ভ্রম দেখিয়ে ভারিক্কি করে তুলছে।

বাগানে বাচ্চারা একটা রবারের বল নিয়ে খেলছিল, এখন বড়রাও মেতে উঠেছে এই খেলায়। অসীম, গৌতম, হিরণ্ময় এমনকী অনুরাধা এবং মানসীও শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে হুড়োহুড়ি করছে সারা মাঠ জুড়ে। অসীম বলটাকে নিয়ে বিদ্যুৎবেগে ছোটাচ্ছে এ-দিক ও-দিক, সহজে কেউ ধরতে পারছে না। সবাই চ্যাঁচাচ্ছে, এই আমাকে দাও, আমাকে দাও!

একটি সুন্দর প্রাণবন্ত যৌবনের ছবি। যে-পৃথিবীতে দারিদ্র আছে, ক্ষুধা আছে, নোংরামি আছে, তার সঙ্গে এই মাঠের ছবিটির কোনও মিল নেই। এমনকী, মায়ের কোলে শিশু, আর্ত-আতুরের পাশে সেবাপরায়ণা নারী, প্রেমিকের কণ্ঠলগ্ন প্রেমিকা কিংবা ডানামেলা পাখি প্রভৃতি প্রথাগত সুন্দর দৃশ্যের চেয়েও এই যৌবনের ছবিটি বেশি সুন্দর।

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দেখে মানবেন্দ্র ঠিক করলেন, তিনিও খেলায় যোগ দেবেন। অনেক দিন ছুটোছুটি করা হয়নি। শরীর থেকে ঘাম ঝরলে বেশ একটা আনন্দ পাওয়া যায়।

তিনি বারান্দা ছেড়ে বাগানে পা দিতেই খেলা থেমে গেল। হিরণ্ময় চেঁচিয়ে বলল, এই চলো চলো, আর খেলা না। এখন না বেরুলে দেরি হয়ে যাবে। উনি এসে গেছেন।

মানবেন্দ্র একটু দুঃখিত হলেন। ওরা তাঁকে খেলায় নিল না।

গৌতম এ-দিকে সোজা হেঁটে এসে জিজ্ঞেস করল, আমরা কি হেঁটেই যাব, না গাড়ি নিতে হবে?

মানবেন্দ্র বললেন, হেঁটে যাওয়াই তো ভাল। গাড়ি তো শেষ পর্যন্ত যাবেও না।

আপনাকে বোধহয় জোর করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

না না, আমিই আজ আপনাদের পথ-প্রদর্শক হতে চাই।

বাচ্চাদের সামলে জিনিসপত্তর গোছগাছ করে নিতে আরও মিনিট পাঁচেক সময় লাগল। তারপর বেরিয়ে এল টুরিস্ট লজের বাইরে।

সেখানে মুনিয়ার মা হল্লা লাগিয়ে দিয়েছে। মাথায় একটা খালি টুকরি, মুনিয়ার মা যুদ্ধং দেহি ভাবে দাঁড়িয়ে, সঙ্গে মুনিয়া নেই। তাকে ঘিরে দু'তিন জন বেয়ারা তার সঙ্গে মশকরা করছে।

মুনিয়ার মা সকালবেলা টম্যাটো দিয়ে গেছে, দু'টাকা ছ'আনা তার প্রাপ্য। সকালবেলা তাকে বলা হয়েছিল, খুচরো পয়সা নেই, দামটা পরে নিতে। বিকেলবেলাও তাকে বলা হচ্ছে দশ টাকার খুচরো নেই, এখন দাম দেওয়া যাবে না। এ কী-রকম ব্যবহার! সে কি শেঠদের মতো কারবার করে যে, দশ টাকার নোট ভাঙিয়ে দিতে পারবে? দু'টাকা ছ'আনা না পেলে সে চাল কিনবে কী করে? তার ন্যায্য পয়সা এক্ষুনি চাই।

বেয়ারারা ক্ষেপাচ্ছে তাকে। তাদের নিজস্ব ভাষায় বলছে, আরে, আমরা কি পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি নাকি? পয়সা তোমার ঠিকই পাবে।

মুনিয়ার মা বলছে, না, আমার পয়সা আজই দিয়ে দাও। কাল পর্যন্ত বাঁচি কি মরি তার ঠিক কী? আজ না খেতে পেলে কাল বাঁচব কী করে? গভর্নমেন্টের হোটেলকে কোনও বিশ্বাস নেই।

মুনিয়ার মা এত জোরে চিৎকার করে কথা বলছিল যে, সে-দিকে না তাকিয়ে উপায় নেই। ওরা একটুক্ষণ সেখানে দাঁড়াল, তারপর এগিয়ে গেল। বেশ কিছুটা দূর আসার পরও মুনিয়ার মায়ের গলা শোনা যাচ্ছে।

অসীম ছিল মানবেন্দ্রর পাশেই, সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর বলল, আমার কাছে খুচরো টাকা আছে, ওকে দিয়ে আসি, পরে বিল থেকে বাদ দিলেই হবে। ওই মেয়েটির বোধহয় পয়সাটার খুবই দরকার।

অসীম হন হন করে ফিরে গেল টুরিস্ট লজের দিকে। মানবেন্দ্র অন্য কথা চিন্তা করছিলেন বলে মুনিয়ার মায়ের ব্যাপারটাতে তিনি গুরুত্ব দেননি।

তিনি সপ্রশংস ভাবে তাকিয়ে রইলেন অসীমের চলে যাওযার দিকে। মানবজাতির মধ্যে এই শ্রেণীর মনুষ্য খুবই বিরল, যারা যে-কোনও ব্যাপারেই চট করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। মানুষের স্বভাবই হচ্ছে সব কাজই একটু পিছিয়ে দেওয়া, আচ্ছা আজ থাক, কাল এটা কবব — এই রকম। একমাত্র নিজের মৃত্যুভয়ের সামনে ছাড়া। মানবেন্দ্রর জীবনেও পথেঘাটে এমন অনেক ছোটখাটো ঘটনা ঘটেছে — যখন তাঁর মনে হয়েছিল একটা কিছু কবা উচিত, সামান্য কিছু — কিন্তু ভাবতে ভাবতেই আসল সময়টা পেরিয়ে গেছে, কিছুই করা হয়নি। মুনিযাব মায়ের ব্যাপাবটা নিয়েই হযতো তিনি রাত্তিরবেলা শুয়ে শুয়ে ভাবতেন, ইস, ওকে কেন দু'টাকা ছ'আনা নিজের পকেট থেকে দিলাম না! এই ধরনের অনুশোচনায় বিবেক খুব আদর খায়!

অসীম ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলেন। এবং এইটুকু ঘটনার জন্য তিনি তাঁর মনের মধ্যে অসীমকে একটা বিশিষ্ট জায়গা দিলেন।

তিন মাইল রাস্তা বিকেলে বেড়াবার পক্ষে খুব কম নয়। শহরের বিপরীত দিকে বেশ কিছুটা লাল সুরকির রাস্তা, তারপর হালকা জঙ্গল। বনবিভাগ থেকে নতুন ইউক্যালিপটাস ও শালগাছ লাগানো হয়েছে। পর পর অনেক গাছ, কিন্তু একে ঠিক বনও বলা যায না, বাগানও বলা যায় না।

অসীম জিজ্ঞেস করল, আপনি এই জায়গাটার সন্ধান পেলেন কী করে?

মানবেন্দ্র বললেন, ডাকবাংলোর বেয়ারাদের কাছে শুনে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছিলাম।

আপনি অনেক জায়গা ঘুরেছেন, না?

কিছু জায়গা ঘুরেছি, আরও বহু জায়গা দেখা বাকি আছে।

আপনাদের তো সারা বছরই ঘুরে বেড়াতে হয়?

কেন, ঘুরে বেড়াতে হবে কেন?

লেখার মেটিরিয়াল সংগ্রহ করার জন্য।

মানবেন্দ্র সামান্য হেসে বললেন, ওষুধ কোম্পানির এজেন্টদের যেমন অর্ডার সংগ্রহের জন্য ঘুরে বেড়াতে হয়, আমাদের অবশ্য সে-রকম ভাবে ঘুরে বেড়াবার কোনও দরকার নেই। লেখার মেটিরিয়াল নিজের ঘরে বসেও পাওয়া যায়।

অদূরে হিরণ্ময় অনুরাধা আর মানসীকে হাত পা নেড়ে কী যেন বোঝাচ্ছে। আর হাসিতে এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ছে দুই নারী। গৌতম সামলাচ্ছে বাচ্চাদের। সেই দিকে তাকিয়ে মানবেন্দ্র ভাবলেন, মানুষের কোনও ভূমিকাটাই সঠিক নয়।

বনের মধ্যে এক জায়গায় বড় বড় পাথরের চাই। পাথর নয়, কেউ যেন ভীমাকৃতি পাথরগুলো এলোমেলো ভাবে ছুঁড়ে ফেলে গেছে এখানে। তারই মাঝখান দিয়ে মাটি ফুঁড়ে উঠেছে ঝরনাটা। ঝরনার উৎস মুখটা দেখা যায় না ঠিক, সেটা চাপা পড়েছে বিরাট একটা পাথরের তলায়। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই, মাটি থেকে বেরুবার খানিকটা পরেই সেটা বেশ চওড়া হয়ে গেছে, অন্তত বারো চোদ্দো ফুট, বেশ তেজ আছে স্রোতের। এক জায়গায় খানিকটা প্রপাতের মতোও সৃষ্টি হয়েছে।

জায়গাটা অত্যন্ত নির্জন। অসংখ্য ফড়িং ওড়াওড়ি করছে মাথার ওপরে। ঝরনার শব্দ শুনলেই ফড়িঙেরা ভাবে, ওখানে বুঝি আরও ফড়িঙের ঝাঁক আছে। এইভাবে তারা সবাই এসে জড়ো হয়।

হিরণ্ময় হাততালি দিয়ে বলল, গ্র্যান্ড, গ্র্যান্ড জায়গাটা! আমরা তো দুপুরে এখানে এসে পিকনিক করতে পারতাম।

মানবেন্দ্র মনে মনে বললেন, না, পারতে না। আমি তোমাদের বাধা দিতাম।

অনুরাধা মানবেন্দ্রর পাশে এসে বলল, অনেক নামকরা জায়গার চেয়েও এই জায়গাটা ভাল।

মানবেন্দ্র শুধু হাসলেন।

অনুরাধা আবার বলল, এ-রকম নির্জন জায়গা দেখলে মনে হয়, সারা জীবন এখানে একা একা থাকি। কেউ ডিসটার্ব করবে না।

মানবেন্দ্র মনে মনে বললেন, আমি আগের দিন এসে দেখেছি রাখালরা এখানকার জলে তাদের মোষগুলোকে চান করাচ্ছে। সেই দৃশ্য দেখলে আপনার একটুও ভাল লাগত না।

মানবেন্দ্র মুখে বললেন, আপনি এই পাথরটার ওপরে বসুন, পা দুটো ডুবিয়ে দিন জলে, আপনাকে খুব সুন্দর মানাবে।

মানবেন্দ্র যেন মানসীর হুকুমে অনুরাধাকে খুশি করার জন্য বলছেন এই সব কথা।

অনুরাধা খুশিই হল। কুন্দফুলের মতো দাঁতের পাটি দিয়ে নিচের ঠোঁটের ভেতরটা একবার কামড়াল। এটা তার মুদ্রাদোষ। কিংবা এই সময় তাকে আরও সুন্দর দেখায়, সে জানে। সে বলল, আপনিও আসুন না, আপনিও বসবেন আমার সঙ্গে।

আমি? না, আপনি একা বসুন, তারপর ওদের কারুকে বলুন আপনার একটা ছবি তুলতে।

সে হবে এখন। আপনি আসুন, আপনার সঙ্গে বসতেই আমার ইচ্ছে করছে।

অপ্রাসঙ্গিক ভাবে মানবেন্দ্রর মনে পড়ে গেল 'সোয়ানস্ ওয়ে'র দুটো লাইন। কানট ইউ সি হাউ ম্যাচ অফ ইয়োর অ্যাট্রাকশন ইউ থ্রো অ্যাওয়ে হোয়েন ইউ স্টুপ টু লাইং? কথাটা সোয়ান বলেছিল ওদেত্‌কে, আজ দুপুরেই মানবেন্দ্র পড়েছেন।

মানবেন্দ্র দেখলেন, মানসী অনেক দূরে। গৌতমের কাছ থেকে বাচ্চাদের ভার নিয়ে নিয়েছে, বাচ্চাদের নিয়ে সে এখন জলের ধারে। গৌতম, অসীম ও হিরণ্ময় আর একটা বড় পাথরের ওপর বসে সিগারেট ধরিয়েছে। মানবেন্দ্র লক্ষ্য করেছেন গৌতম তার স্ত্রীর কাছাকাছি থাকে না।

মানবেন্দ্র অনুরাধাকে বললেন, আসুন।

পাথরটার ওপরে ওঠা সহজ। তবু অনুরাধা কৃত্রিম ভয়ে টল টল করছে। যেন সে আশা করেছিল, মানবেন্দ্র তার হাতে ধরবেন। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মানবেন্দ্র যে-হাতে মানসীকে ছুঁয়েছে আজই সকালে, সেই হাতে আর অনুরাধাকে ছুঁতে চান না। মানবেন্দ্রর দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল অনুরাধা, সেই হাতটা শূন্যেই রইল। যাই হোক, কোনও রকমে সে বসল জলের ধারের ঢালু দিকটায়। জলে পা দিয়েই চেঁচিয়ে উঠল, উরেঃ বাবা, কী ঠাণ্ডা!

শীতকালে ঝরনার জল তো ঠাণ্ডা হবেই। অনুরাধা যদি মানবেন্দ্রর বান্ধবী বা বন্ধুপত্নী হত, তাহলে মানবেন্দ্র ওকে জোর করে জলে নামিয়ে দিতেন এখন। কিন্তু মাত্র দু'দিনের পরিচয়, এমন কৌতুক করা যায় না।

অনুরাধা চটি জোড়া খুলে রেখেছিল পাশে, তারই হাতের ধাক্কায় একটা চটি পড়ে গেল জলে। স্রোতে ভাসতে লাগল। অনুরাধা চেঁচিয়ে উঠল, এই যাঃ, চটি পড়ে গেল যে। হিরণ্ময়, এই হিরণ্ময়, দেখো না —।

মানবেন্দ্র বেশ মজা পেলেন। চটি জলে পড়ে গেলে অনুরাধা তার স্বামীকে ডাকে না, সে ডাকে অপর পুরুষকে।

গৌতমই কিন্তু দৌড়ে এল এ-দিকে।

সে এসে পৌঁছবার আগেই মানবেন্দ্র ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে চটিটা ধরে ফেলেছেন।

গৌতম এসে অনুরাধাকে বলল, এ কী, জলের এত কাছে বসেছ কেন? তুমি নিজেই পড়ে যাবে যে!

অনুরাধা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে উদাসীন গলায় বলল, পড়ে গেলেই-বা কী আর হবে তাতে!

অর্থাৎ দুপুরবেলা স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হয়েছে। ঝগড়া মিটিয়ে নেবার এই তো উপযুক্ত স্থান। মানবেন্দ্র বুঝলেন, তাঁর আর এখানে থাকা উচিত নয়।

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে অন্য দিকে পা বাড়িয়ে গৌতমকে বললেন, এখানে কোথাও ডুব-জল নেই। হঠাৎ পড়ে গেলেও ভয়ের কিছু নেই তাতে।

গৌতম বলল, ওই দিকের পাথরটা বেশ পরিষ্কার আছে, আসুন সবাই মিলে এক জায়গায় বসি।

অনুরাধা উঠল না।

গৌতম বলল, এসো।

অনুরাধা আবার গম্ভীর ভাবে বলল, আমার এখানে বসতেই ভাল লাগছে। আমি এখানে ওঁর সঙ্গে থাকব।

এই বলে সে মানবেন্দ্রর বাহুতে হাত ছোঁয়াল। তারপর হেসে আবার বলল, আমি জলে পড়ে গেলে আপনি আমাকে ধরবেন না?

মানবেন্দ্র বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলেন।

আর কিছু না বলে ওদের দুজনকে সেখানে কথা কাটাকাটির জন্য রেখে মানবেন্দ্র পাথরটা থেকে নেমে এলেন। হঠাৎ একটু বোকা বোকা লাগছে তাঁর। এদের মধ্যে তাঁর কোনও জায়গা নেই। তিনি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছেন না।

অনুরাধার ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পেরেছেন। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বলেই সে মানবেন্দ্রকে তার পাশে এসে বসবার জন্য এত করে বলছিল। সেই জন্যই ডাকছিল হিরণ্ময়কে। এটা পুরনো কায়দা। গৌতম ছেলেটি অন্য ধরনের, তাকে এইভাবে উত্তেজিত করা যায় না বোধহয়। অনুরাধা তার স্বামীকে ঠিক চেনে না।

অনেক দিন আগে একটি মেয়ে মানবেন্দ্রর কাছে প্রায়ই আসত। মেয়েটির নাম ছিল সুস্মিতা। সুস্মিতাই তো? হ্যাঁ। খুব অল্পবয়সে বিয়ে হয়েছিল তার। সে তার নিজের কথা বলতে ভালবাসত খুব। অর্থাৎ তার নিজস্ব কিছু দুঃখের কথা কোনও এক জনের কাছে মন খুলে বলার দরকার ছিল। সে-রকম মানুষ পায়নি, তাই এসেছিল এক জন লেখকের কাছে।

সুস্মিতার কথা শুনে মনে হত, তার স্বামী একটি বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। তার প্রধান শখ, রাত্তিরবেলা স্ত্রীর পাশে শুয়ে গল্প বলা, জীবনে এ পর্যন্ত ক'টি মেয়েকে সে ভালবেসেছে এবং তাদের জন্য তার

কতখানি কষ্ট হয়। লোকটিকে চাকরির জন্য ঘুরে বেড়াতে হয়, মাসের অর্ধেক দিন বাইরে থাকে, সেই সব সময় দু'একটি নারী সমন্বিত রাত্রি কাটানো অস্বাভাবিক কিছু না। কিন্তু স্ত্রীর কাছে সেই সবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়াতেই ওর বেশি আনন্দ। সুস্মিতা কাঁদলে সে হো-হো করে হাসে। সুস্মিতা না কেঁদে শান্তভাবে ব্যাপারটা গ্রহণ করলে সে গালাগালির ঝড় তুলতে শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত একটা চাবুক নিয়ে মারে। সুস্মিতার কোনও বাপের বাড়ি নেই। নিজের এবং ছেলের ভরণপোষণের কথা চিন্তা করেই সে দরকার মতো কাঁদে কিংবা অন্যের কাছে দুঃখের কথা জানাতে হয়।

মানবেন্দ্রর বুঝতে কোনও অসুবিধা হয়নি যে, লোকটি একটি সেডিস্ট। সমাজ এঁদের কোনও শাস্তি দিতে পারে না। যে, লোক তার স্ত্রীকে দু'বেলা খেতে-পরতে দেয়, সে তার শয়নকক্ষে স্ত্রীকে অপমান করছে কিংবা চাবুক মারছে কি না সমাজ তা জানতে চায় না। আদালত কোনও নির্দেশ দিতে পারে বটে, কিন্তু সেখানে চাবুকের দাগ প্রমাণ করতে হবে। অপমানের কোনও দাগও থাকে না।

কিছু একটু বলতে হবে বলেই মানবেন্দ্র বলেছিলেন, ভারি অদ্ভুত তো!

সুস্মিতা বলেছিল, দিনেরবেলা ওকে দেখলে কিন্তু কেউ কিছু বুঝতে পারবে না। এমন ভদ্র ব্যবহার, লেখাপড়া জানে, সব বিষয়ে কথা বলতে পারে, আপনার বই-টইও পড়ে। আপনারা সাহিত্যিকরা এই সব লোককে বদলে দিতে পারেন না?

মানবেন্দ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন। এক জন লেখকের কোনও ক্ষমতাই নেই। সে ডাক্তার নয়, বিচারক নয়, মন্ত্রী নয়। সে বড় জোর মানুষের দুঃখের সঙ্গী হতে পারে, আর কিছু না।

মানবেন্দ্র বলেছিলেন, আমি আমার নিজের জীবনের কোনও সমস্যারই সমাধান করতে পারিনি।

এই সুস্মিতা সপ্তাহের পর সপ্তাহ এসে ঝুলোঝুলি করেছে। নিজেই তারিখ ঠিক করে গেছে, মানবেন্দ্র যাননি, পরে এসে সুস্মিতা জানিয়েছে যে, তার খাবার নষ্ট হয়েছে। সে চায়, মানবেন্দ্র একবার অন্তত তাঁর স্বামীকে দেখুক। ডাক্তার দেখাবার বদলে এক জন লেখককে ধরেছে।

শেষ পর্যন্ত মানবেন্দ্রকে এক দিন যেতেই হয়েছিল। সুস্মিতা আগে থেকেই একটা দিন বলে গিয়েছিল, সেই দিনটাতে সে মানবেন্দ্রকে দুপুরবেলা টেলিফোন করে বলেছিল, আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছি, আপনি তা-ও আসবেন না? তাহলে কিন্তু আমরা ট্যাক্সি করে গিয়ে আপনাকে ধরে নিয়ে আসব।

সুস্মিতাদের বাড়ি টালিগঞ্জে। মানবেন্দ্র সেখানে পৌঁছে দেখলেন বাড়িতে সুস্মিতা একা। তিনি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনার স্বামী কোথায়?

সুস্মিতা অদ্ভুত ভাবে হেসে বলেছিল, আমি জানি, আপনি অচেনা লোকের সঙ্গে আলাপ করা পছন্দ করেন না। ও দু'দিন আগে পাটনায় গেছে।

বেশ একটা পরিকল্পনা করেই সুস্মিতা মানবেন্দ্রকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। এমনকী ছেলেকেও পাঠিয়ে দিয়েছে এক বান্ধবীর বাড়িতে। শোবার ঘরে ডেকে এনে পরিপাটি বিছানাটা দেখিয়ে মানবেন্দ্রকে বলল, বসুন!

মানবেন্দ্রর চরিত্রে বিন্দুমাত্র নীতিবাতিক নেই। তিনি মনে করেন, স্বয়মাগতা কোনও নারীকে ভোগ করার মধ্যে অন্যায় কিছু থাকতে পারে না। সুস্মিতার চেহারাও খুব খারাপ নয়। একটুক্ষণের জন্য মানবেন্দ্র প্রলুব্ধও হয়েছিলেন। কিন্তু জুতো খুলে বিছানার ওপর পা তুলে বসতে গিয়ে তাঁর একটু খটকা লাগে। তিনি তখন সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ, তাই অন্যদের ব্যবহারের সামান্য অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করার ক্ষমতাও ছিল খুব বেশি। তাঁর মনে হয়েছিল, শুধু সুস্মিতার স্বামী নয়, সুস্মিতার নিজের চরিত্রেও খানিকটা পাগলামি আছে। সে মানবেন্দ্রকে শুধু শারীরিক আনন্দের জন্যই ডেকে আনেনি।

পাগলদের সংসর্গে এলেই গা-টা কী-রকম ছম ছম করে। সুস্মিতা যখন তাঁকে প্রথম চুম্বনটি দিতে আসে, তখন তার মনে হয়েছিল বিষকন্যাদের কথা। তিনি তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে জুতো পায়ে দিয়েছিলেন। রীতিমতো ভয়ে বুক কাঁপছিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সুস্মিতার স্বামী এসে পড়েছিল। সুস্মিতা দারুণ অবাক ও ভয় পাবার ভাব দেখিয়েছিল। মানবেন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন, এটাও ওর ভান। ও জানত ঠিকই।

সুস্মিতার স্বামী মানবেন্দ্রকে এমন খাতির করতে শুরু করে যে, মানবেন্দ্রর মনে হয়েছিল, লোকটি তাকে ব্যঙ্গ করছে। এরা স্বামী-স্ত্রীতে মিলে তাঁর ব্যক্তিত্বটাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চাইছে।

মানবেন্দ্রর প্রতি সুস্মিতার কোনও ভালবাসা বা টান ছিল না, ছিল শুধু একটা উদ্দেশ্য। তাঁকে ডেকে এনে স্বামীর মনে ঈর্ষা জাগানোর চেষ্টা। নিজের ওপরেই ঘেন্না হচ্ছিল তাঁর। এই উদ্দেশ্যে সুস্মিতা তাঁকে এত দূর টেনে এনেছে। কেন, পাড়ার বেকার ছোকরার কি অভাব? তাদের যে-কোনও এক জনকে প্রেম করতে ডাকলে ছুটে আসত না? সুস্মিতা হয়তো ভেবেছে, বেকার ছোকরা ডেকে আনলে বিপদ হতে পারে, সে যদি তার স্বামীর সঙ্গে মারামারি শুরু করে? এক জন লেখকই হচ্ছে সব চেয়ে নিরীহ মানুষ।

মানবেন্দ্র এত রেগে গিয়েছিলেন যে, পকেট থেকে একটা পিস্তল বার করে তৎক্ষণাৎ সুস্মিতা আর তার স্বামীকে খুন করে ফেললেন। মনে মনে।

মানবেন্দ্র এবারও পিস্তল তুলে নিশানা কবতে গেলেন অনুরাধার দিকে। তিনি দেখলেন, গৌতম তখনও অনুরাধাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। মানবেন্দ্র সত্যিই হাতের আঙুলটা পিস্তলের ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন, কিন্তু এখন গুলি করতে গেলে গৌতমের গায়েও লাগবে। কিন্তু গৌতমেব ওপরে তাঁর কোনও রাগ নেই। তিনি একটু সরে গিয়ে অনুরাধাকে আলাদা ভাবে দেখবার চেষ্টা করলেন।

পাশে সরতে গিয়ে মানবেন্দ্র দেখলেন, তাঁর সামনে একটা দাগ কাটা। কে যেন চুন দিয়ে একটা অর্ধবৃত্ত এঁকে দিয়ে গেছে। আগে কি এই দাগটা ছিল?

মানবেন্দ্র সেই দাগটা পার হবার জন্য পা তুলতে গিয়ে অনুভব করলেন, তাঁর পা পাথরের মতো ভারি। কে যেন তাঁকে ওই দাগটা পার হতে নিষেধ করছে। তাছাড়া চেষ্টা করলেও তিনি পারবেন না, তাঁর পা এত ভারি হয়ে গেছে।

এ কী অসম্ভব ব্যাপার! তিনি একটা দাগ পার হতে পারছেন না! অনুরাধার দিকে অস্ত্র তুলেছিলেন বলেই কি এই গণ্ডি? অস্ত্রটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে মানবেন্দ্র সেই গণ্ডিটা লাফিয়ে পার হবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছাশক্তি শরীরকে নড়াতে পারছে না।

মানবেন্দ্র পেছনে ফিরলেন। ওই দিক দিয়ে চলে যাবেন। কিন্তু তিনি ভুল দেখেছিলেন। দাগটা তো অর্ধবৃত্তাকার নয়, পুরো বৃত্ত। কেউ তাঁকে একটা গণ্ডির মধ্যে বন্দি করে গেছে। এখান থেকে তাঁর বেরুবার উপায় নেই।

শীতের মধ্যেও তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ওরা কেউ জানে না, তিনি বন্দি। তিনি অসহায় ভাবে তাকালেন, দূরের বড় পাথরটার ওপরে আস্তে আস্তে সবই জমা হচ্ছে, গৌতম অনুরাধাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ও-দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে, মানসী পা ধুচ্ছে ঝরনার জলে, হিরণ্ময় লাইটারটা ফটাস ফটাস করে টিপছে, সিগারেট ধরাতে পারছে না, এত হাওয়া। ফড়িংগুলো ছুঁই ছুঁই খেলা খেলছে জলের সঙ্গে। প্রাক্-সন্ধ্যার আকাশ লাল হয়ে এসেছে, তার ছায়া খেলছে জলের সঙ্গে। প্রাক-সন্ধ্যার আকাশ লাল হয়ে এসেছে, তার ছায়া পড়েছে জলে। চারিদিকে এত সুন্দর, অথচ মানবেন্দ্র একটা ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে বন্দি। এটা তুচ্ছ করে বেরিয়ে আসার সামর্থ্য তাঁর নেই।

তাঁর হচ্ছে হল, চিৎকার করে অন্য মানুষকে ডাকেন। তোমরা আমাকে বাঁচাও। তোমরা আমাকে বাঁচাও। মানসী, তুমি এসে আমাকে উদ্ধার করো।

কিন্তু তাঁর গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না। বেরুবেই-বা কেন, তিনি তো কারুকে কখনও উদ্ধার করেননি। তিনি স্বার্থপর। দারুণ স্বার্থপর!

মানবেন্দ্র সেখানেই মাটিতে বসে পড়তে যাচ্ছিলেন। তাছাড়া আর কোনও উপায় নেই। এই সময় দেখতে পেলেন একটা বাচ্চা ছেলেকে। অনুরাধার ছেলে। তার দু'হাতে দুটো ললি পপ্। লোভীর মতো মানবেন্দ্রর মনে হল, ও কি আমাকে একটা দেবে? ওর তো দুটো আছে!

মানবেন্দ্রকে নিথর ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শিশুটি বোধহয় একটু অবাক হল। সে পা দুটো কেষ্টঠাকুরের মতো করে দাঁড়াল সামনে।

মানবেন্দ্র তাকে ডাকলেন, এই শোনো।

ছেলেটি দু'পা এগিয়ে এসে বলল, কী?

মানবেন্দ্র তার মাথাটা ছুঁয়ে ফেললেন।

অমনি তাঁর শরীর ঝিম ঝিম করে উঠল। যেন হঠাৎ জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে! মানবেন্দ্র তাকিয়ে দেখলেন, গণ্ডি-ফণ্ডি কিছুই নেই। তিনি আবার দৃষ্টিবিভ্রম অসুখে ভুগছিলেন। ছেলেটির হাত ধরে তিনি কয়েক পা এগিয়ে গেলেন।

অনুরাধা ও গৌতমের ছেলে তাকে গণ্ডি থেকে মুক্ত করে দিয়ে গেল।

মানবেন্দ্রর ভয়টা কাটেনি। আজ সারা দিন তিনি সুস্থ ছিলেন। কোনও ব্যবহারে ভুল হয়নি। হঠাৎ এ আবার কী হল! যেন কোনও মন্ত্রে তাঁর পা মাটির সঙ্গে আটকে গিয়েছিল। অনুরাধাকে খুন করতে চেয়েছিলেন বলেই কি?

শরীরটা খুব দুর্বল লাগছে। ওদের কিছু টের পেতে দেওয়া ঠিক হবে না। আচার-ব্যবহারে যদি কোনও অসঙ্গতি বেরিয়ে পড়ে! তিনি ওদের থেকে উলটো দিকে হাঁটতে লাগলেন। একটু বাদেই চলে গেলেন বড় পাথরটার আড়ালে। কেউ বোধহয় তাঁর নাম ধরে ডাকছে। তিনি গ্রাহ্য করলেন না।

আরও খানিকটা দূরে, ঝরনার উৎস যে জায়গাটায়, তার কাছাকাছি মানবেন্দ্র বসে পড়লেন। এখান থেকে ওরা তাঁকে দেখতে পাবে না। পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরাতে গেলেন। দেশলাই জ্বালাতে গিয়ে স্পষ্ট বুঝতে পারলেন তাঁর হাত কাঁপছে। এই হাত কাঁপার লক্ষণটা ভাল নয়। কোনও কালে তো তাঁর স্নায়ুর অসুখ ছিল না।

জলের ধারে একটা ছোট চারা গাছ। সেই গাছ ও পাথরের মধ্যে জাল বিস্তার করে একটা মাঝারি-আকারের মাকড়শা বসে আছে। মানবেন্দ্র দেখলেন, মাকড়শাটা ঠিক তাকিয়ে আছে তাঁর দিকেই। আশ্চর্য, মাকড়শার মুখ কি অবিকল মানুষের মতো দেখতে হয়!

মানবেন্দ্র মাকড়শাটার দিকে ভুরু নাচালেন।

মাকড়শার দৃষ্টি স্থির, অবিচল।

মানবেন্দ্র বললেন, আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়নি, আমার নাম মানবেন্দ্র মজুমদার। আমি এক জন ব্যর্থ মানুষ। হেরে যাওয়া মানুষ।

মাকড়শাটা জায়গা ছেড়ে একটুও নড়ল না।

মানবেন্দ্র আবার বললেন, আমার যখন এগারো কি বারো বছর বয়েস, তখন আমি একটা মাকড়শা মেরেছিলাম। আমি মাকড়শা জাতটাকেই ঘৃণা করতাম। এখন আর করি না। আপনার ভয় নেই।

কোনও উত্তর না পেয়ে মানবেন্দ্র বিরক্ত হলেন। মাকড়শাটার এই ভারিক্কি প্রশান্ত ভাব তাঁর সহ্য হল না। মাকড়শাটা তো আর প্রজাপতি কিংবা মথের মতো সুন্দর নয় যে, উত্তর না দেবার অধিকার থাকবে।

তিনি একটা শুকনো ডাল তুলে মাকড়শাটাকে খোঁচা মারতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর কানে ভেসে এল মানসীর গান। মানসী একটু আগে থেকেই গাইছে, মানবেন্দ্র এইমাত্র খেয়াল করলেন।

হাতের কাঠিটার দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবলেন, আমি এ কী ছেলেমানুষী করতে যাচ্ছিলাম, শুধু শুধু মাকড়শাকে খোঁচা মারা? আমার কি বয়েস বারো? একটু আগে অনুরাধার ছেলের হাতে ললি পপ্ দেখে আমার খেতে ইচ্ছে হয়েছিল। সত্যি কি পাগল হয়ে গেলাম নাকি?

তার বদলে মানসীর গানের দিকে মন দেওয়া যাক। দু'দিন ধরে বিভিন্ন সময় মানসীর গলার টুকরো টুকরো গান শুনে তিনি গানের কথাগুলো নতুন ভাবে যাচাই করছেন। এতে অন্য দিকে মন ফেরে।

ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
আরো কি তোমার চাই
ওগো ভিখারি আমার ভিখারি
চলেছ কী কাতর গান গাই॥
প্রতিদিন প্রাতে নব নব ধনে
তুষিব তোমারে সাধ ছিল মনে —
ভিখারি আমার ভিখারি...

মানবেন্দ্রর ডান হাতখানা মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল। তিনি আপন মনে বললেন, কোনও শুয়োরের বাচ্চার সাধ্য নেই, এ-রকম গান লেখে। 'ভিখারি আমার ভিখারি' — এই জায়গাতেই দারুণ ভাবে মেরে দিয়েছে বুড়ো। দু'জনেই ভিখারি। এক জন সব দিয়েছে, এক জন সব পেয়েছে, তবু দু'জনেই ভিখারি। রবীন্দ্রনাথের মতো অত বড় প্রেমিক তো আর এক জনকেও দেখলাম না।

এ-ও কি শরীর ছাড়া প্রণয়? কী জানি, হতেও পারে। আমি তার স্বাদ পেলাম না। রয়ে গেলাম নিচুতেই। 'হায়, আরো যদি চাও মোরে কিছু দাও, ফিরে আমি দিব তাই' — পৃথিবীর এই সর্বশ্রেষ্ঠ দেওয়া-নেওয়ার কথা আমার কখনও মনে পড়েনি। আমি শুধু চেয়েছি, কিছু দিইনি, দেবার মতো কিছু নেই ভেবে। 'ভিখারি আমার ভিখারি' গানের মাঝখানে হঠাৎ এই জায়গাটা শুনলেই কান্না পেয়ে যায়।

কখন গান শেষ হয়ে গেছে, অন্য গান শুরু হয়েছে, তা-ও থেমেছে এক সময়, মানবেন্দ্রর খেয়াল নেই। তিনি 'ভিখারি আমার ভিখারি' — এই সামান্য শব্দ ক'টা নিয়ে ঝিম হয়ে বসে আছেন। কিংবা যেন ধ্যান করছেন।

আপনি এখানে একা একা বসে আছেন কেন?

মানবেন্দ্র চমকে মুখ তুলে তাকালেন। মানসী এসেছে। আজ বিকেলে বাইরে বেরুবার পর মানসী এতক্ষণ তাঁর সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। অথচ সে-ই তো ডেকে এনেছিল মানবেন্দ্রকে। এখন মানসী একা এসেছে এখানে, এর নিশ্চয়ই কোনও মানে আছে।

মানসী আবার বলল, আমি তখন আপনাকে ডাকলাম।

ধরা-পড়া চোরের মতো মানবেন্দ্র অসহায় কাতর চোখে তাকালেন।

মানসী সামান্য হেসে বলল, আপনি আমার গান না শুনে চলে এসেছেন, তাতে আমি কিছু মনে করিনি।

মানবেন্দ্র বলতে চাইলেন, আমি এর আগে রবীন্দ্রসঙ্গীত এ-রকম মন দিয়ে কখনও শুনিনি। সত্যিই শুনিনি।

কথাটা উচ্চারণ করলেন না লাজুক ভাবে তাকিয়ে রইলেন মানসীর মুখের দিকে। সন্ধ্যার লাল আলোয় মানসীকেও অরুণবর্ণ দেখাচ্ছে। তাব ছিপছিপে শরীরটা মানবেন্দ্রর চোখ থেকে আড়াল করেছে দিগন্তকে। মানসীর কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা চামড়ার ব্যাগ। তার স্ট্র্যাপটা চলে এসেছে মানসীর বুকের ওপব দিয়ে। সে-দিকে তাকিয়ে মানবেন্দ্র যেন শিউরে উঠলেন। এই রূপ, আমি এর পূজা করব। মানসী তুমি দাঁড়াও, আমি তোমার পায়ের কাছে পুরোহিতের মতো বসি।

মানসী একটু কাছে এগিয়ে এসে বলল, এবার ফেরার সময হল, ওরা আপনাকে ডাকছে। আপনি কি আরও থাকবেন? কী করবেন এখানে একলা একলা!

তুমি একটু দাঁড়াও।

আপনি তো একা একা নিজের মনে কথা বলছিলেন।

তাই নাকি?

আমি দেখলাম তো দূর থেকে। ভেবেছিলাম আপনাকে বিরক্ত করব না।

ওটা আমার পুরনো স্বভাব। ও এমন কিছু না।

চারা গাছটার দিকে তাকিয়ে মানসী বলল, বাঃ এই গাছটা বেশ সুন্দর তো।

মানবেন্দ্র শুকনো ডালটা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি মাকড়শাটাকে তাড়িয়ে দিলেন, যাতে মানসী ওটাকে দেখে ভয না পায়।

মানবেন্দ্র টের পেলেন, তাঁর মাথাটা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ লাগছে। মানসীকে দেখলেই এ-রকম হয়।

মানসী গাছটাকে দেখবার জন্য নিচু হয়ে বলল, দেখেছেন, এ জায়গাটায বালির রঙও খুব সুন্দর। সোনার মতো ঝকঝকে। এই বালিতে সোনা মেশানো নেই তো!

কী জানি!

কোনও কোনও নদীর ধারের বালিতে থাকে শুনেছি। যেমন সুবর্ণরেখায়।

তারপর মুখ তুলে মানসী অপ্রত্যাশিত ভাবে বলল, পায়ের নিচে শুকনো বালি, একটু খুঁড়লে জল, গভীরে যাও, গভীরে যাও —

মানবেন্দ্র স্তম্ভিত ভাবে বললেন, এ কী?

চিনতে পারছেন না?

না।

আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন আপনার এই কবিতাটা বেরিয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায়।

মানবেন্দ্র তীব্র চোখে তাকালেন মানসীর দিকে। যেন এক্ষুনি এই রমণীকে তিনি ভস্ম করে ফেলবেন।

মানসী বলল, নিজের লেখাও চিনতে পারেন না? এ কী, আপনার চোখ-মুখের চেহারা এ-রকম হয়েছে কেন? আপনার শরীর খারাপ নাকি?

মানবেন্দ্র স্পষ্ট ধীর গলায় বললেন, আমি এইমাত্র নোবেল প্রাইজ পেয়েছি।

ঝরনার জলের মতো শব্দ করে হাসল মানসী। বড় পরিচ্ছন্ন সরলতা রয়েছে তার মধ্যে। এবং মানসীর চোখে সব সময়েই একটা বিস্ময়ের ভাব। অর্থাৎ এ পৃথিবীর কিছুই পুরনো হয়ে যায়নি তার কাছে।

হাসিটা অসম্পূর্ণ রেখে সে বলল, এত সামান্যতেই খুশি হন আপনারা?

মানবেন্দ্র ধমক দিয়ে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে বহুবচনে কথা বলবে না।

তার মানে? ও! প্রত্যেক লেখকই বুঝি আলাদা?

হ্যাঁ।

আমি কী করে জানব। আমি তো আর কারুকে দেখিনি।

তুমি ওই কথাটা আমাকে আর একবার বলো।

কোন কথাটা?

একটু আগে যেটা বললে।

আবার বলতে হবে কেন?

আমি শুনতে চাই।

মানসী একটু ভেবে নিয়ে বলল, এত সামান্যতেই খুশি হন আপনি?

মানবেন্দ্র ডান হাতটা মানসীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, দাও!

কী?

ওই সামান্যর চেয়ে যা বেশি।

আমি কী দেব আপনাকে?

ওই সামান্যর চেয়ে যা বেশি! তুমি পারো।

আমি আপনাদের কথা বুঝতে পারি না।

আবার আপনাদের!

আমি আপনার কথা বুঝতে পারি না!

ও-সব শুনতে চাই না, তুমি আমাকে দাও।

মানসী এবার একটা উদাসীন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, জানি না, আপনাকে দেবার মতো আমার কী আছে! আপনি তো অনেক দেশ ঘুরেছেন, অনেক মানুষের সঙ্গে মিশেছেন, অনেক মেয়ের সঙ্গেও আপনার আলাপ-পরিচয় হয়েছে। আমি এমনিই একটি সাধারণ মেয়ে, আপনাকে আমি কী দিতে পারি?

মানবেন্দ্র একবার চোখ তুলে সন্ধ্যা আবছা হয়ে আসা দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, আঃ আমি একে কী ভাবে বোঝাব! সেই ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। ভাষা কত দীন! আমি এই দীন ভাষারও সবটুকু জানি না।

মানসী বলল, চলুন, এবার যেতে হবে। ওরা ভাবছে।

মানবেন্দ্রর মুখখানা আক্রমণোদ্যত সিংহের মতো হিংস্র হয়ে এল। তাঁর ভেতরের পশুটা ফুঁসে উঠছে। তিনি এক্ষুনি যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে এই রমণীর টুঁটি চেপে ধরবেন। অতি প্রিয় জিনিস হাতছাড়া হয়ে যাবার মুহূর্তে যেমন তাকে ধ্বংস করে দেবার ইচ্ছে জাগে।

মানসী কয়েক পা এগিয়ে গেল। মানবেন্দ্র মনে মনে বললেন, যাক না, কত দূরে যাবে, আমি ওকে ঠিক ধরব।

মানসী বড় পাথরটার গায়ে হাত রেখে বলল, আপনার সামনে এলেই আমার কী-রকম যেন ভয় করে। কেন জানেন তো?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই মানসী আবার বলল, আমাদের সবারই তো কিছু কিছু গোপন কথা আছে। আপনার চোখ দেখলে মনে হয়, আপনি বুঝি সব বুঝে ফেলছেন। লেখকেরা এমন ভাবে মেয়েদের মনের কথা লিখে দেয়।

এটা একটা অন্য দিক। এর মধ্যে লুকোনো গল্পের ইঙ্গিত আছে। মানবেন্দ্র নিজের চিন্তা ভুলে গিয়ে এই ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, গোপন কথা মানে কী? দুঃখ?

দুঃখ?

মানসী যেন দুঃখ কথাটা নিয়ে মনে মনে কয়েক বার খেলা করল, তারপর বলল, কী জানি।

হঠাৎ হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটাবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে মেয়েদের। মানসী পরক্ষণেই বলল, আপনার বাড়িতে আর কে কে আছে?

মানবেন্দ্র আকস্মিক প্রশ্নের প্রথম ধাক্কাটা সামলে উত্তর দিলেন, ও কথা থাক। আমার কোনও অতীত নেই।

আপনি বুঝি ব্যক্তিগত কথা পছন্দ করেন না।

না, সে-জন্য নয়। আমি যদি বলি, পৃথিবীতে আমি সম্পূর্ণ একা, তাহলে কথাটা একটু বোকা বোকা শোনাবে। আসলে আমি একাই থাকি, আমি বিয়ে করব বলে তিনবার প্রায় ঠিক করে ফেলেছিলাম, শেষ পর্যন্ত আর হয়ে ওঠেনি।

আমি বাইরের লোকের সঙ্গে চট করে মিশতে পারি না। সেই জন্যই যদি কিছু উলটো-পালটা কথা বলে ফেলি —।

দূর থেকে একটি বাচ্চার গলায় মা ডাক শোনা যাচ্ছে। মানবেন্দ্র বুঝতে পারলেন, আর সময় নেই। তিনি মানসীর খুব কাছে গিয়ে চট করে তার হাত চেপে ধরে বললেন, আমি তো তোমার অচেনা নই।

নিজের ঘরে আজই সকালে মানবেন্দ্র যখন মানসীর হাত ধরেছিলেন, তখন মানসী বিন্দুমাত্র বিকার দেখায়নি। কিন্তু এবার চট করে সরে গিয়ে দুঃখিত গলায় বলল, আপনি যে আমায় তুমি তুমি করে বলেন, এতে আমার খুব অস্বস্তি লাগে।

মানবেন্দ্রর এইটুকু কাণ্ডজ্ঞান আছে এবং তিনি বোঝেন যে, মাত্র দু-এক দিনের আলাপের পর কোনও মেয়ের, বিশেষত কোনও বিবাহিত নারীর হাত ছোঁয় যায় না। স্পর্শ করার জন্য একটা অধিকার চাই। অন্তত লম্পট হিসেবে একটা অখ্যাতি থাকলেও চলে। তবু মানসী দ্বিতীয় বার এই কথা বলায় মানবেন্দ্র খুবই দুঃখিত বোধ করলেন। যুক্তি নেই, কোনও যুক্তি নেই এ-রকম দুঃখ পাওয়ার। তাহলেও বুকের মধ্যে গঙ্গার মতো একটা ঢেউ ওঠে। তিনি হাতজোড় করে সত্যিকারের নম্র ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বললেন, আচ্ছা বলব না, আর কখনও বলব না!

মানসীর মুখ থেকে দুঃখের ভাবটা মিলিয়ে গেল। আবার সে দু'চোখে বিস্ময় এবং মুখে সরল হাসি ফুটিয়ে বলল, আপনাকে কিন্তু সত্যিই আমার অনেক দিনের চেনা মনে হয়। তাছাড়া, আপনি তো আমাকে তুমি বলতেই পারেন।

অর্থাৎ মানসী বলতে চাইছে, তুমি বলে সম্বোধন করলেই গায়ে হাত ছোঁয়ানো যায় না। বিশেষত এই নির্জনে।

মানবেন্দ্র সব বুঝতে পেরে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেন।

মানসী আর দাঁড়াল না। তর তর করে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, আমি চললাম, আপনি আসবেন তো আসুন।

মানবেন্দ্র বললেন, আমি এখন যাব না! তিনি বড় পাথরটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েই রইলেন। ওদের সঙ্গে এসেছেন যখন আজ ওদের সঙ্গেই ফেরা উচিত, এ-কথা মানবেন্দ্র ভালভাবেই জানেন। তবু তিনি গেলেন না। জ্ঞানপাপী কিনা।

মানবেন্দ্র পাথরটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, পাথর, ক'লক্ষ বছর ঘুমিয়ে আছ? এবার জাগো। এইমাত্র মানসী তোমাকে ছুঁয়েছিল, তুমি টের পেলে না? তোমাকে আমি অহল্যা

বলতে চাই না। তোমাকে দেখে পুরুষ মনে হয়। মাটি স্ত্রীলিঙ্গ হতে পারে, কিন্তু পাথর পুরুষ। কেমন লাগল মানসীর স্পর্শ? তুমি দেখলে তো, ও আমাকে অবহেলা করে চলে গেল।

মানবেন্দ্র আর একটা সিগারেট ধরিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। আকাশ এখনও প্রত্যক্ষ, কিন্তু তরুণ শালবনের ওপর ঝুপ ঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসছে। দূরের আকাশে এখনও খানিকটা এলোমেলো লাল রঙ ঠিক যেন রুয়োর একটি অসমাপ্ত ছবি।

আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে মানবেন্দ্র দেখলেন, অপস্রিয়মাণ শালবন, দেখলেন ঝরনার জলের অন্য রকম রং, দেখলেন পাথরের চাঙড়ের গম্ভীর অবস্থান, দেখলেন শেষ সন্ধ্যা ও আসন্ন রাত্রিকে। কিন্তু সব কিছুর চেয়ে বেশি সুন্দর একটি নারী। যে এই মাত্র ছিল, এখন নেই। পৃথিবীতে এর চেয়ে অনেক বেশি রূপসী নারী আছে, অনেক, কিন্তু মানবেন্দ্র এর গোপন সৌন্দর্য দেখছেন। যৌবনের মাঝামাঝি এসেও এই নারীকে দেখে তার হাত কাঁপে, বুকের মধ্যে টিপ টিপ শব্দ হয়। এই রূপের প্রচণ্ড ঝাপটায় তাঁর মন অবশ হয়ে আসছে।

মানবেন্দ্র বললেন, হে আকাশ, হে বিশ্বপ্রকৃতি, হে বালুকণা, হে দারিদ্র, হে সামাজিক বৈষম্য, হে রাজনীতি, হে বিশ্বশান্তি, তোমাদের চেয়েও একটি নারীর রূপ আমার কাছে বেশি জরুরি মনে হচ্ছে এখন। আমাকে দোষ দিয়ো না। আমি এই নারীর রূপের পূজা করতে চাই। এই নারী বিবাহিতা, তবু, হে সমাজ, আমাকে শাস্তি দিয়ো না। আমি তো একে কেড়ে নিচ্ছি না। ফুলের গন্ধ শুঁকলে কি বাগানের মালিকের কোনও ক্ষতি হয়? তাছাড়া আমি পাগল-ছাগল লোক, আমার কথা বাদ দাও! আমার কি কারও কোনও ক্ষতি করার ক্ষমতা আছে!

মি. মজুমদার, আপনি যাবেন না?

পাথরটার ওপরে এসে দাঁড়িয়ে অসীম বলছে এই কথা। মানবেন্দ্র ওপরের দিকে তাকালেন।

এই পরিবেশে মি. মজুমদার বলে সম্বোধন করে অসীম একটু ভুল করে ফেলেছে। কিন্তু মানবেন্দ্র তাতে একটুও বিরক্ত হলেন না। তিনি অসীমকে খুবই পছন্দ করে ফেলেছেন। অসীম এবং গৌতম এরা দু'জনেই ভারি চমৎকার মানুষ। ভাল চাকরির মোহে অসীমের বাবা-মা ওকে আগাগোড়া সাহেবি স্কুলের শিক্ষা দিয়েছেন, তাই ও মাতৃভাষাটা ভাল শেখেনি এবং দেশীয় সহবৎ ভাল জানে না, কিন্তু সে-জন্য ওর চরিত্র মলিন হয়নি। যে-কোনও নিপীড়িত শ্রমিকের চেয়ে অসীমের কম সমবেদনা পাবার কোনও যুক্তি নেই।

মানবেন্দ্র হাসিমুখে বললেন, আপনারা যান। আমার তো কোনও কাজ নেই। আমি এত তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে আর কী করব! আমি আর একটু থাকি!

অসীম বলল, জায়গাটা সত্যি খুব ভাল। আমরা আর একটু থাকতাম, কিন্তু বাচ্চারা যে বড্ড জ্বালাতন করছে। তাছাড়া ওদের আবার খাওয়া-দাওয়া আছে।

সে তো বটেই। আপনারা এগিয়ে যান, আমি একটু বাদেই আসছি। রাস্তা চিনতে পারবেন তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, এ আর কী!

অসীম চলে যাবার পর মানবেন্দ্র কান পেতে রইলেন। বনপথে তিনি শুনতে লাগলেন পদশব্দ। তিনি পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে। যেন এক জন পলাতক। আস্তে আস্তে সেই শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল।

মানবেন্দ্র আবার চোখ তুললেন। তিনি দেখলেন, আকাশ, শালবন, ঝরনা, পাথর —কিছুই আর সুন্দর নয়। সব জায়গায় কালি, শুধু কালি। হঠাৎ যেন ঘোর অন্ধকার নেমে এসেছে!

মানবেন্দ্র বুঝতে পারলেন, মানসী তাঁর পাগলামি সারাবার জন্য আসেনি। মানসী এসেছে তাঁকে আরও বেশি পাগল করতে!

॥ ৬॥

নিজের ঘরে ফিরে এসে মানবেন্দ্র ষড়যন্ত্র করতে বসলেন। এই মেয়েটিকে তাঁর চাই। যে-কোনও উপায়ে পেতেই হবে!

তার আগে দেখতে হবে মেয়েটি আসলে কে। এক জন বিবাহিতা নারী, যার রূপের একটা আকর্ষণ আছে, কিন্তু আহা মরি কিছু না। তার ব্যবহারের মধ্যে আছে একটা খেয়ালিপনা, সেটাই বেশি আকর্ষণীয়। আজ সন্ধেবেলাতেই মানবেন্দ্র জানতে পেরেছেন যে তিনটি বাচ্চার মধ্যে মানসীরই দু'টি। দু'টি সন্তানের জননী হয়েও এ-রকম আকর্ষণীয় থাকা কোনও নারীর পক্ষে যথেষ্ট কৃতিত্ব নিশ্চয়ই। সে কিছুটা সাহিত্য পড়েছে, ঠিক সময় মানবেন্দ্ররই কবিতার লাইন উচ্চারণ করে অভিভূত করে দিয়েছে এই পাগল লেখককে। কিন্তু সেই জন্যই কি এত টান? না, এর চেয়ে বেশি কিছু আছে!

মানসী পেতেই হবে। কিন্তু তার স্বামী আছে। অসীম চমৎকার মানুষ। তার মনে দুঃখ দেওয়া সম্ভব নয়। দরকার হলে মানবেন্দ্র অসীমের কাছ থেকে মানসীকে একটুখানি চেয়ে নেবেনে। তিনি বলবেন, অসীম, তোমার স্ত্রীকে নিশ্চিন্তে আমার কাছে দাও। অসামান্যা নারীদের কোনও কিছুই ক্ষয় হয় না, ব্রহ্ম কিংবা অমৃতের মতো তারা উচ্ছিষ্ট হয় না। যখন তুমি ফিরে পাবে, তখন সম্পূর্ণই পাবে। ওকে পেলে আমি ধন্য হবে কিন্তু তুমি একটুও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

কী করে পাওয়া যায় মানসীকে? এর আগে মানবেন্দ্র যে-সব রমণীদের চেয়েছেন, তাদের পাবার একমাত্র উপায় ছিল প্রতীক্ষা। ঠিক মতো আহ্বান জানালে প্রতীক্ষার পর ঠিকই পাওয়া যায়। উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে বকুল গাছের নিচে তিনি প্রতীক্ষা করতেন সুনন্দার জন্য। এক দিন, দু'দিন, তিন দিন — সুনন্দা আসেনি। তিনি তখন ঠিক করেছিলেন, সুনন্দা যদি সত্যিই না আসে, তাহলে তিনি কলেজের লাইব্রেরিতে আগুন ধরিয়ে দেবেন। অন্যান্য প্রতিশোধের চেয়ে লাইব্রেরিতে আগুন ধরানোর ব্যাপারটাই তাঁর বেশি মনঃপূত হয়েছিল। তখন মনীষা ভয় পেয়ে সুনন্দাকে পাঠিয়েছিল তাঁর কাছে। সুনন্দাকে সাড়ে তিনশো চুম্বনের পর মানবেন্দ্র ভেবেছিলেন, সুনন্দাকে পাবার জন্য আমি শেক্সপিয়র, রবীন্দ্রনাথ, টয়েনবি, হ্যারল্ড ল্যাস্কি প্রভৃতির কাছেও ঋণী। এবং বকুল গাছটার কাছেও কিছুটা ঋণী।

কিন্তু মানসীকে পাবার জন্য তো প্রতীক্ষার সময় নেই। ওরা কাল সকালেই চলে যাবে। এক্ষুনি একটা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার। মানবেন্দ্রর মুখখানা খাঁটি ষড়যন্ত্রকারীর মতো হয়ে এল।

তিনি ঘরের মধ্যে ছটফট করতে লাগলেন। বুদ্ধিতে একটু শান দেওয়া দরকার। তিনি পকেট থেকে এক গাদা খুচরো পয়সা বার করে ছড়িয়ে ফেললেন মেঝেতে। তারপর বেল বাজিয়ে ডাকলেন বেয়ারাকে।

রামচন্দ্রন আসতেই তিনি ঝাঁজের সঙ্গে বললেন, ঘরটা ভাল করে পরিষ্কার করো না? এক্ষুনি সাফা করে দাও।

রামচন্দ্রন একটা লম্বা বুরুশ এনে ভেতরে এসে বলল, সাব, বহুত পয়সা গিরা হ্যায়।

মানবেন্দ্র জানলার কাছে একটা বই খুলে দাঁড়িয়ে অবহেলার সঙ্গে বললেন, সাপা করো, সব সাফা করো!

ঘর পরিষ্কার করার পরেও রামচন্দ্রন প্রায় দু-তিন টাকার মতো খুচরো হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মানবেন্দ্র আবার তাকে ধমক দিয়ে বললেন, ঠিক আছে। দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও।

এ-রকম ধমকেও খুশি হয় না এমন পরিচারক ভূ-ভারতে নেই। সে হাসিমুখে সেলাম করে চলে যাচ্ছিল, দরকার কাছে যেতেই মানবেন্দ্র তাকে বললেন, দাঁড়াও। পকেট থেকে তিনটে দশ টাকার নোট দিয়ে বললেন, একটা জিনের পাঁইট নিয়ে এসো।

রামচন্দ্রন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার উপরে স্পষ্ট নির্দেশ আছে, সে মানবেন্দ্রর জন্য কক্ষনও মদ কিনে দেবে না। তার মুখে ফুটে উঠল দারুণ দ্বিধা।

মানবেন্দ্র আবার হুকুমের সুরে বললেন, যাও!

জিনের শিশিটা আসবার পর মানবেন্দ্র ফেরত খুচরোটা সবটাই বকশিস দিলেন তাকে। তার বদলে সে লুকিয়ে এনে দিল অনেকগুলো লেবুর টুকরো ও বরফ। মানবেন্দ্র জিনের গেলাসে মস্ত বড় একটু চুমুক দিয়ে বললেন, আঃ!

তারপর ভাবলেন, পাগল যদি হতেই হয়, একটি মেয়ের জন্যই পুরোপুরি পাগল হওয়া ভাল।

আমি মানসীকে পুজো করব। তার পায়ের কাছে বসে বলব, তুমি এক জন সামান্য নারী, মনে কোনও অহঙ্কার এনো না। আমিও এক জন অতি সাধারণ মানুষ। আমার মধ্যে ঈর্ষা আছে, লোভ আছে, রাগ আছে। কিন্তু তোমাকে যখন দেখি, তখন তো আর কিছুই মনে পড়ে না। আমার হাত কাঁপে। আমার বুকের মধ্যে টিপ টিপ করে, আমার চল্লিশ বছর বয়েসের কঠিন বুক। তোমাকে মনে হয় এই বিশ্বপ্রকৃতির চেয়েও বেশি সুন্দর। এই যে মোহ, এর চেয়ে চমৎকার আর কিছু নেই। আমি এই মোহকে বন্দনা করি। তুমি দেবী হও।

আমি তোমাকে শুধু পুজো করব না, আমি আদরও করব। আমি তোমার ওষ্ঠ থেকে নেব সেই সবটুকু, নারীর ওষ্ঠ যতখানি দিতে পারে। আমার জিভ তোমার জিভের সঙ্গে খেলা করবে। আমি শিশুর মতো তোমার স্তনে দাঁত ছোঁয়াব। আমি তোমার উরুতে চেপে ধরব আমার মুখ। আমি দুর্দান্ত পাগল হয়ে উঠব। আমার পুজো এই রকম। আমি নির্লোভ হতে পারি না। শরীর না ছুঁয়ে আমি নারীর কোনও ভাষাই বুঝতে পারি না।

আমি তোমাকে লোভ করেছি। কিন্তু তোমাকে পেলেই আমার লোভ চলে যায়, তখন পূজা হয়ে ওঠে। অর্থাৎ লোভ আমাকে মহত্ত্বের রাস্তা দেখায়।

তোমার কাছ থেকে আমি পাব। সাম্রাজ্যের চেয়েও ঢের বেশি। কিন্তু এর বদলে আমি কিছু দিতে পারব না। কাগজ-কলমে অক্ষরের সারি সাজানো ছাড়া আমার আর কিছু দেবার সাধ্য নেই। শুধু, কখনও কখনও হয়তো তোমার মনে পড়বে, এক জন শুধু তোমাকে চায়নি, তোমাকে পুজো করেছিল। সেইটুকুর কি কোনওই দাম নেই?

এখানে, আমার খাটে, এই পবিত্র বেদিতে, মানসী, আমি তোমাকে পুজো করতে চাই। সময় বেশি নেই, মানসী, তুমি চলে এসো।

জিনের শিশিটা অর্ধেক মাত্র শেষ হয়েছে, এই সময় দরজার বাইরে থেকে গৌতম বলল, আপনি কি ব্যস্ত আছেন? আসতে পারি?

মানবেন্দ্র বসে আছেন চেয়ারে। টেবিলের ওপর মদের গ্লাস। অন্য কারুকে দেখে গ্লাস লুকোবার অভ্যেস তাঁর নেই। তিনি বললেন, আসুন!

গৌতম ঘরের মধ্যে এসে কোথায় বসবে ভাবছে, মানবেন্দ্র তাকে খাটটা দেখিয়ে দিলেন। অন্য আর একটি মাত্র চেয়ার ছিল, সেটাতে বইপত্র স্তূপাকার।

মানবেন্দ্র বললেন, আমি একটু জিন খাচ্ছি। আপনার চলবে?

গৌতম একটু চিন্তা করে বলল, আচ্ছা, অল্প একটু

সে ভাবছিল, মানবেন্দ্রর কাছে বেশি নেই, এর থেকে সে ভাগ বসাবে কি না। কিন্তু সে কথাটা উচ্চারণ করা ঠিক ভদ্রতা নয়। নিজেই সে গেলাস-টেলাস এগিয়ে দিয়ে সাহায্য করল।

আপনারা তো কালই চলে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ। ভোরেই বেরিয়ে পড়ব।

এরপর কোথায়?

আমার কাজের জায়গায়। ছুটি বেশি নেই। আপনাকে একটা কথা বলতে এলাম। নর্থ বেঙ্গলে. আমি একটা চা বাগানে কাজ করি, আমিও ওখানকার ম্যানেজার।

বাঃ, আমি কখনও কোনও চা বাগানের ম্যানেজারকে স্বচক্ষে দেখিনি। আগে তো সাহেবরাই হত।

হ্যাঁ, মানে, বাগানটা আগে আমাদের পরিবারের ছিল, বিক্রি হয়ে গেছে, এখন আমি ওখানে কাজ করি। আমি বলছিলাম, আমাদের বাংলোতে অনেক জায়গা আছে, আপনি তো এখানে বিশ্রামের জন্য এসেছেন। যদি আমাদের সঙ্গে ওখানে যান, তাহলে আপনার খুব ভাল লাগবে। আমাদেরও খুব ভাল লাগবে।

আপনাদের সঙ্গে?

অসীমরাও যাবে আমাদের সঙ্গে। হিরণ্ময় এখান থেকেই ফিরতে চাইছে, আমরা ওকে আটকাবার চেষ্টা করছি অবশ্য। গাড়িতে জায়গার অসুবিধে নেই, আপনার একটু কষ্ট হবে হয়তো।

এত লোভনীয় প্রস্তাব যে, মানবেন্দ্রর মুখ চোখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার কথা ছিল। একেই তো বলে সুবর্ণ সুযোগ। তিনি মানসীকে কাছাকাছি পাবেন আরও কয়েকদিন। প্রতীক্ষা আরও বিস্তারিত হতে পারবে।

কিন্তু মানবেন্দ্রর ভেতরে থেকে কে যেন চিৎকার করে বলল, না। বড় দীর্ঘ সেই না, প্রতিধ্বনি তুলে গুমরোতে লাগল বুকের মধ্যে। হঠাৎ এইভাবে কেউ নেমন্তন্ন করলে তিনি তো কখনও কোথাও যাননি। অচেনা কারুর আতিথ্য গ্রহণ করতে তাঁর অত্যন্ত অস্বস্তি হয়। এখন, এমনকী মানসীর কথা ভেবেও তিনি রাজি হতে পারছেন না।

মানবেন্দ্র যদি ঠিক এই রকম একটি গল্প লিখতেন, অর্থাৎ নিজেই হতেন একটি গল্পের চরিত্র, তাহলে এই রকম জায়গায় ঠিক এই রকম কোনও ঘটনা ঘটত না। কেউ এসে তাঁকে অনুরোধ করত না চা-বাগানে আতিথ্য নেবার জন্য।

বাস্তবে অনেক উদ্ভট ব্যাপার ঘটে। এক নজর দেখেই একটি ছেলে বা মেয়ে পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হতে পারে। কিন্তু গল্পের মধ্যে এর জন্য অনেক প্রস্তুতির দরকার হয়। এখানে বাস্তবের এই উদ্ভট পরিস্থিতিকে মানবেন্দ্র যুক্তিতে প্রত্যাখ্যান করলেন।

তিনি বললেন, আপনাদের সঙ্গে যেতে পারলে তো খুবই ভাল লাগত, কিন্তু আমি এখানে বেশ কিছু দিন চুপচাপ থাকব বলেই এসেছি।

গৌতম বলল, আমাদের ওখানেও কিন্তু আপনার বিশ্রামের কোনও ব্যাঘাত হবে না। আপনি গেলেই বুঝতে পারতেন, খুব শান্ত জায়গা, আপনার থাকার জায়গা একদম আলাদা হবে। যদি ইচ্ছে মতো বেড়াতে চান, জিপ গাড়ি আছে।

মানবেন্দ্রর ঠোঁটের পাশে একটা চাপা হাসি দেখা দিল। এরা আমাকে এত খাতির করছে কেন? এরা কি জানে, আমার মনের মধ্যে একটা শয়তান লুকিয়ে আছে? আমি স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই চিন্তা করিনি। আমি যদি তোমাদের সংসারে অশান্তি এনে দিই?

মানবেন্দ্র বললেন, আচ্ছা, জানা রইল, পরে কোনও এক সময় —।

কেন, এখনই চলুন না।

মানবেন্দ্রর ইচ্ছে হল, গর্জন করে বলে ওঠেন, তুমি জানো, আমি পাগল! আমি কখন কী করে ফেলব তার ঠিক নেই! আমি উপযুক্ত নই তোমাদের সমাজের। আমি পতিত।

তার বদলে তিনি দু'বার ঘাড় হেলিয়ে বললেন, না, থাক।

গেলে কিন্তু আপনার ভাল লাগত। আমাদেরও খুব ভাল লাগত। আপনার সঙ্গে দেখা হল, অথচ ভাল করে গল্প করা হল না। পাঠকদের তো অনেক কৌতূহল থাকে লেখকদের সম্পর্কে।

আবার বহুবচন।

মানবেন্দ্র বললেন, আমাকে যারা চেনে না, আমি তাদের সঙ্গে মিশতেই ভালবাসি। বেশি লোকজনের মধ্যে আমি কী-রকম যেন গুটিয়ে যাই।

অনুরাধা আপনার সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী।

সুন্দরী মেয়েদের সংস্পর্শ আমার খুবই ভাল লাগে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কী, তাদের প্রত্যেকেরই আগে থেকে স্বামী কিংবা প্রেমিক আছে।

গৌতম হো-হো করে হেসে উঠল। তারপর বলল, লেখকরা বুঝি প্রেমিক বা স্বামী হয় না? তারা অন্য কিছু হয়?

মানবেন্দ্র এক চুমুকে নিজের গেলাসটা শেষ করে চুপচাপ বসে রইলেন। বোতলটাও শূন্য।

গৌতম বলল, আমি এক্ষুনি আসছি।

অবিলম্বে সে ফিরে এল আর একটা জিনের বোতল হাতে নিয়ে। বিনীত ভাবে বলল, আমার কাছে সামান্য কিছু ছিল।

অসম্ভব ভদ্র ও বিনীত এই যুবকটি। চা-বাগানের কুলিকামিন বা অফিসের কেরানিদের সঙ্গেও কি সে ঠিক এই রকম ব্যবহার করে? নাকি তখন অন্য একটা মুখোশ পরে নেয়? মানবেন্দ্রকে যদি ও লেখক হিসেবে না চিনত, তাহলে কী-রকম ব্যবহার হত ওর? চা বাগানের ম্যানেজারের বই-টই পড়ার সময় হয় কী করে? ও, বুঝেছি, ওর নিজেরই তো এক সময় লেখার বাতিক ছিল।

মানবেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, আপনি নিজে এখন আর কিছু লেখেন না?

আগের দিনের মতো গৌতম এখন আর তেমন লজ্জা পেল না। নতুন গেলাসে চুমুক দিয়ে সে পরিষ্কার ভাবে বলল, লেখক হবার সাধ্য আমার নেই, এটা আমি জেনে গেছি। এক সময় শখ ছিল। তবে, এখনও আমি লিখি, একটাই গল্প, বার বার লিখি, প্রতি বছর নতুন করে লিখে যাই। কোনও দিন সেটা ছাপা হবে না, কেউ সেটা পড়বে না, মানে আমি কারুকে পড়াতেও চাই না —

তবে লেখেন কেন?

নিজের আনন্দের জন্য!

মানবেন্দ্র ভাবলেন, বাঃ, এটা বেশ একটা শাশ্বত উত্তর। মানুষ লেখে কেন? আনন্দের জন্য। কিন্তু সব সময় এটা ঠিক নয়। ডস্টয়েভস্কি অনেকগুলো লিখেছেন শুধু পয়সার জন্য। কেউ লেখে আদর্শবাদ প্রচারের জন্য। অনেক সময় একদম লিখতে ইচ্ছে করে না, তবু লিখতে হয়। তিনি প্রথম যৌবনে লিখতে শুরু করেছিলেন শুধু অন্য কয়েকজনকে বোঝাবার জন্য, দ্যাখ, আমিও লিখতে পারি। এটা কি আনন্দ না আত্মশ্লাঘা?

বাঃ, আমাদের বাদ দিয়ে?

দরজার কাছ থেকে গৌতমকে এই কথা বলল হিরণ্ময়। সঙ্গে অসীমও এসেছে।

মানবেন্দ্র বললেন, আসুন, ভেতরে আসুন।

ওরা দু'জনে খাটে এসে বসল। অসীম বলল, উঃ, কী দারুণ ঠাণ্ডা পড়েছে আজ! হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে একেবারে।

হিরণ্ময় গৌতমকে জিজ্ঞেস করল, কী খাচ্ছিস রে? জিন? এই ঠাণ্ডায় ব্র্যান্ডি হলে জমত।

গৌতম বলল, ব্রান্ডি আছে তো, নিয়ে আয়। অসীম, তোর ঘরেই তো আছে।
অসীম উঠে গেল আনতে।
হিরণ্ময় বলল, আপনার সঙ্গে পরিচয় হবার পর আমরা একটু লুকিয়ে-চুরিয়ে খাচ্ছিলাম, যদি আপনি কিছু মনে করেন। আমি অবশ্য ওদের বলেছিলাম, অনেক রাইটারই ড্রিঙ্ক করে। কী, ঠিক বলিনি? রবীন্দ্রনাথ ড্রিঙ্ক করতেন না?
মানবেন্দ্র বললেন, তাতে কিছু আসে যায় না।
গৌতম বলল, রবীন্দ্রনাথ কক্ষনও ড্রিঙ্ক করেননি।
হিরণ্ময় বলল, তুই কী করে জানলি? অতবড় জমিদার ফ্যামিলি —।
রবীন্দ্রনাথ সব ব্যাপারেই আলাদা ছিলেন।
তোরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করিস। ড্রিঙ্ক করলেই বা দোষের কী আছে! সব লেখককেই ড্রিঙ্ক করতে হয়, কিংবা কোনও একটা নেশা, ওদের নার্ভকে রিলাক্স করাবার জন্য।
হিরণ্ময় হঠাৎ নিজের কথা থামিয়ে মানবেন্দ্রকে সাক্ষ্য মেনে জিজ্ঞেস করল, আপনি বলুন না, রবীন্দ্রনাথ ড্রিংক করতেন না? শরৎবাবু ড্রিংক করতেন না?
মানবেন্দ্র বললেন, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সে-রকম কিছু জানা যায় না। ওঁর বাড়ির প্রাইভেট টিউটর লরেন্সকে উনি নিজের বাড়ি থেকে এক বোতল মদ পাঠিয়েছেন বটে, কিন্তু নিজে কখনও খেতেন কি না তার উল্লেখ নেই। তার আগে বঙ্কিমচন্দ্র খেতেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নৈহাটির বাড়িতে মাঝে মাঝে মদের আসর বসাতেন, যেখানে আসতেন নবীন সেন ইত্যাদি। শরৎচন্দ্রও দিশি মদ খেতে ভালবাসতেন। তার পরের আমলেও অনেকে যদিও খেতেন-টেতেন, কিন্তু লেখার মধ্যে সেটা গোপন করে গেছেন, মানিকবাবু ছাড়া।
আবার আমি এমন অনেক লেখককে জানি, যাঁরা এ জিনিস কখনও স্পর্শ করেন না। তাতে কিছু যায় আসে না। লেখার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্কই নেই। লেখকরাও তো অনেকটা মানুষের মতোই এক ধরনের প্রাণী। মানুষ যেমন নানা রকম হয়, লেখকরাও সে-রকম হতে পারে।
গৌতম বলল, তবু আমার মনে হয়, লেখক-শিল্পীরা ঠিক সামাজিক মানুষের মতো হতে পারে না। এমন একটা কাজে তারা নিজেদের জীবনীশক্তি ব্যয় করে, যার বিনিময়ে কী পাবে তারা জানে না। তাছাড়া লেখার সময় অত্যন্ত বেশি মনঃসংযোগ করতে হয় বলেই অন্য সময় তাদের মনটা খুব ছটফটে থাকে, নিয়মকানুনের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না। কি, আমি ঠিক বলছি?
মানবেন্দ্র অন্য মনস্ক ভাবে উত্তর দিলেন, কী জানি!
হিরণ্ময় বলল, আচ্ছা, আজকালকার অন্য সব লেখকের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে?
মুখ চেনা আছে।
লেখকদের মধ্যে আপনার বন্ধু কেউ নেই?
এক সময় ছিল।
লেখকদের কাছে আমাদের একটা প্রশ্ন আছে। দেশের এই যে অবস্থা, কিছু শকুন দেশের অধিকাংশ মানুষকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে, চারদিকে শুধু কালোবাজার আর কালো টাকার খেলা, মানে আমি বলতে চাইছি, দেশটা একেবারে উচ্ছন্নে যাচ্ছে, একটা টোটাল অরাজকতা। এই সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন না? আপনারা যদি চাবুক মেরে জাগিয়ে তোলেন এই পচা-গলা সমাজটাকে, কিন্তু তার বদলে আপনার শুধু প্রেমের গল্প লেখেন কিংবা অ্যাডভেঞ্চার।
মানবেন্দ্র দুঃখিত ভাবে তাকালেন হিরণ্ময়ের দিকে। এই সব কথা যদি একটা স্কুলে বা কলেজের ছেলে বলত, তাহলে মানাত। অল্প বয়সে আদর্শবাদটা আন্তরিক থাকে, মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা

ভেবে সত্যিই কষ্ট হয়। কিন্তু সাহেবি কোম্পানিতে ভাল চাকরি করে যে-লোক, ডাকবাংলোয় বসে মদের গেলাস হাতে নিয়ে তার মুখে এই সব কথা যে অত্যন্ত অশ্লীল শোনায়, সে জ্ঞান এর নেই। অধিকাংশ মানুষেরই ঔচিত্যবোধ থাকে না। সাধে কী আর এর নাম ভিলেজ ইডিয়ট দিয়েছিলেন!

মানবেন্দ্র হাত জোড় করে বললেন, এই দেশের দুঃখ-দুর্দশা ঘোচাবার কাজে আমি কিছুই করতে পারিনি, সে-জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।

মানবেন্দ্রর কণ্ঠস্বর এমন তীব্র যে হিরণ্ময় একটু হকচকিয়ে গেল। তারপর বলল, না না, আপনি ক্ষমা চাইছেন কেন? আমি সেভাবে বলিনি।

আপনি একটা অভিযোগ করেছেন, সেই জন্যই আমি ক্ষমা চাইছি। আমি পারিনি, কী করব বলুন। এ-জন্য আমাকে যদি কিছু শাস্তি পেতে হয় —

হিরণ্ময় আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, গৌতম তাকে বাধা দিয়ে বলল, লেখকদের কাছ থেকে এ-রকম দাবি করা যায় কি না, সে-সম্পর্কে কিন্তু আমার সন্দেহ আছে। কোনও কোনও লেখক বা কোনও কোনও বই সমাজ পরিবর্তনে কিছু সাহায্য করেছে বটে, কিন্তু শিল্প-সাহিত্যের কাছ থেকে আমরা আনন্দই পেতে চাই। শুধু বড় বড় সামাজিক আদর্শের কথা মনে রেখে যেগুলো লেখা হয়, সেগুলো বেশির ভাগই অপাঠ্য। সেগুলো শিল্পও হয় না, আবার তা দিয়ে সমাজের উপকারও হয় না।

হিরণ্ময় বলল, অধিকাংশ মানুষের জীবনেই যদি কোনও আনন্দ না থাকে, তাহলে আর্ট থেকে আনন্দ পাবে কী করে?

তা-ও পেতে পারে।

তুই বলতে চাস, লোকে যখন খেতে পাচ্ছে না —।

তখন সে বইও পড়বে না। কোনও বই-ই মানুষকে খেতে দিতে পারবে না।

পৃথিবীতে এমন অনেক বই লেখা হয়েছে, যা দিয়ে —।

বই আর সাহিত্য এক নয়। যেমন রাইটার্স বিল্ডিং কথাটার মানে সাহিত্যিকদের বাড়ি নয়। যে-কোনও লেখা আর সাহিত্য এ দুটো আলাদা ব্যাপার। কথা হচ্ছে, আমরা যাকে সাহিত্য বলি, তার কাছ থেকে কী আশা করি? আমার সোজা কথা, যে-বই পড়ে আমি আনন্দ পাব না, সে-বই আমি পড়তে চাইব না! জোর করে কি কারুকে বই পড়ানো যায়?

মানবেন্দ্রর সর্বাঙ্গে যেন অজস্র সূঁচ ফুটছে। জীবনে অন্তত হাজার বার তিনি এই ধরনের তর্ক বা আলোচনার মধ্যে পড়েছেন। তিনি জানেন, এর কোনও মীমাংসা নেই। এখানেও তিনি এই আলোচনা একটুও চান না, এখানে তিনি নির্জন মনকে শান্ত করার জন্য এসেছিলেন।

অসীম আগাগোড়া চুপচাপ বসে আছে। সে বই-টই বিশেষ পড়ে না। সে বুদ্ধিমান বলেই, যে-সম্পর্কে জানে না, সে-সম্পর্কে কথাও বলতে চায় না।

অসীম তার বন্ধুদের বলল, তোরাই তো শুধু কথা বলছিস, ওনাকে কিছু বলতে দে।

মানবেন্দ্র অসীমের দিকে তাকিয়ে বললেন, না না, ঠিক আছে। সাহিত্য কীরকম হওয়া উচিত, সে-সম্পর্কে সাহিত্যিকরা কিছু জানে না, অন্যরাই ভাল জানে।

গৌতমের তর্কের নেশা লেগে গেছে, সে গলা চড়িয়ে হিরণ্ময়কে বলল, ও-সব বাজে কথা রাখ। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি — 'ঘরেও নহে, পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে, সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে' — এই লাইনটার অন্য আর কী মূল্য আছে? এ-রকম লাইন মানুষের দুঃখ-দারিদ্র ঘোচায় না, কিন্তু শুনলেই মনের মধ্যে যে একটা অদ্ভুত ভাব জেগে ওঠে, সেটাই এর আসল মূল্য।

গৌতম তার উৎসাহিত উজ্জ্বল মুখখানা ঘোরালো মানবেন্দ্রর দিকে। মানবেন্দ্র বললেন, স্বীকার করতেই হবে। চা-বাগানের ম্যানেজার হিসেবে আপনি এক্সেপশনাল!

গৌতম লজ্জা পেয়ে গেল এ-কথায়। মিনিট খানেক চুপ করে রইল সবাই। এক-এক সময় হয় এ-রকম, যখন ঘরের সবাই হঠাৎ এক সঙ্গে চুপ করে যায়, শুদু শোনা যায় ঘড়ির টিক টিক শব্দ।

সে নিস্তব্ধতা ভাঙার আগেই এসে পড়ল অনুরাধা। সে দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, বাঃ, তোমরা এখানে আড্ডা জমিয়ে বসেছ, আমাদের ডাকোনি যে?

অসীম বলল, তোমরা তো বাচ্চাদের ঘুম পাড়াচ্ছিলে।

বেড়াতে এসেও আমরাই বাচ্চাদের সামলাব, আর তোমরা আড্ডা মারবে!

ঠিক আছে, এবার তোমরা আড্ডায় বসো, আমরা বাচ্চাদের দেখতে যাচ্ছি।

বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়েছে।

মানসী কোথায়?

কী জানি, বাচ্চাদের সঙ্গে সঙ্গে ও নিজেও ঘুমিয়ে পড়ল কিনা!

মানবেন্দ্র অনুরাধাকে বললেন, আপনি ভেতরে আসুন!

অনুরাধা ঘরে ঢুকে চারদিকটা একবার দেখে নিল। তারপর বলল, আপনার ঘরটায় ব্যাচিলার ব্যাচিলার গন্ধ!

মেয়েদের ঘ্রাণশক্তি বিখ্যাত। কোনও কোনও নারীর আরও বেশি থাকে। মানবেন্দ্র তাকালেন অনুরাধার দিকে। তীক্ষ্ণনাসা নারী। ভুরু দুটো আরও সুদৃশ্য। মানবেন্দ্র লক্ষ্য করলেন, তাঁর হাত কাঁপছে না, বুকের মধ্যেও টিপ টিপ করছে না। তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

গৌতম বলল, আমি মানসীকে ডেকে আনি। ও বেচারা একলা একলা রয়েছে।

অনুরাধা বিচিত্র ভাবে তাকাল স্বামীর দিকে। কিন্তু গৌতমের সঙ্গে তার চোখাচোখি হল না। গৌতম বেরিয়ে গেল।

অনুরাধা বিছনায় বসতে দ্বিধা করছে বোধহয়। অনাত্মীয় পুরুষের বিছানায় মেয়েরা সহজে বসে না, এ ব্যাপারে তাদের একটা কুসংস্কার আছে।

মানবেন্দ্র তাড়াতাড়ি নিজের চেয়ারটা ছেড়ে দিয়ে বললেন, আপনি এখানে বসুন!

অনুরাধা সেখানে বসে বলল, আপনি ওদের অনেক গল্প শোনালেন বুঝি? আমাকে একটা বলুন!

আমি নিজেই ওদের গল্প শুনছিলাম।

ওদের আবার গল্প কী?

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই তো একটা করে গল্প থাকে?

থাকে বুঝি? আমার গল্পটা কী বলুন তো?

আমি তো জ্যোতিষী নই। আপনিই বলুন।

আমারও একটা গল্প আছে ঠিকই, কিন্তু আমি তো সাহিত্যিক নই, কী করে বলতে হয় জানি না।

মুখে মুখে গল্প বলার জন্য সাহিত্যিক হওয়ার দরকার হয় না। আপনি বলুন। আমরা উদ্‌গ্রীব।

শুনবেন? একটি মেয়ের যখন চোদ্দো বছর বয়েস, তখন সে এক সঙ্গে দু'টি ছেলের প্রেমে পড়ে। এক জন তার মাসতুতো ভাইয়ের বন্ধু আর এক জন বাবার বন্ধুর ছেলে। দু'জনেই খুব হ্যান্ডসাম। দু'জনেই লেখাপড়ায় ভাল। মেয়েটি যখন উনিশ বছর বয়েস হল, তখন প্রশ্ন জাগল যে, এই দু'জনের মধ্যে কাকে সে বিয়ে করবে। দু'জনের এক জনকে বেছে নেওয়া খুবই শক্ত। একটি মেয়ে তো এক সঙ্গে দু'জনকেই বিয়ে করতে পারে না।

কথা বলতে বলতে অনুরাধা বার বার তাকাচ্ছে দরজার দিকে। পা দুটো দোলাচ্ছে। তার মুখে একটু যেন বেশি উত্তেজনা। গল্পের মাঝখানে বাধা দিয়ে মানবেন্দ্র বললেন, এক সঙ্গে দু'জনকে বিয়ে করার ব্যাপরটাও কিন্তু মন্দ না। আবার চালু করে দিলেই হয়!

অনুরাধা বলল, সে যাই হোক, এই মেয়েটির বেলায় তো আর তা হয়নি! এক জনকেই বিয়ে করতে হল। এবং বিয়ের পরদিন সে বুঝতে পারল, ভুল করেছে। অন্য ছেলেটিকে পেলেই সে সুখী হতে পারত।

অসীম বলল, মেয়েটি যদি প্রথম ছেলেটিব বদলে দ্বিতীয় ছেলেটিকে বিয়ে করত, তাহলেও হয়তো তার ওই একই কথা মনে হত। এ-রকম হয়।

অনুরাধা বলল, মোটেই না। মানুষ শুধু এক জনকেই ভালবাসতে পারে, দু'জনকে না!

মানবেন্দ্র বললেন, আমি জ্যোতিষী নই। কিন্তু আমি এটুকু অন্তত বুঝতে পারি, এটা আপনার জীবনের গল্প নয়!

অসীম বলল, এ দু'জন ছেলের মধ্যে এক জন রয়ে গেল প্রেমিক, আর একজন স্বামী। স্বামীদের তুলনায় প্রেমিকরা সব সময়েই জিতে যায়। তাই না! কী রে হিরণ্ময়, তুই কী বলিস।

আমি কী করে জানব?

তুই তো স্বামী হোসনি এখনও।

অনুরাধা বলল, উনি তো প্রেমিকও হননি।

হিরণ্ময় অবাক হবার ভান করে বলল, সে কী? আমাকে এতই অযোগ্য মনে হয়?

আপনাকে দেখলেই কী-রকম যেন ভাই ভাই মনে হয়।

কী সাঙঘাতিক কথা, আমার তাহলে কোনও চান্স নেই?

অনুরাধা মানবেন্দ্রর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আপনি নিশ্চয়ই অনেক প্রেম করেছেন? মেয়েদের ভালভাবে না জানলে তাদের সম্পর্কে লিখবেন কী করে?

মানবেন্দ্র বললেন, আমি অনেক মেয়ের প্রেমে পড়লেও মেয়েরা কেউ আমার প্রেমে পড়েনি। ঘণ্টায় ষাট মাইল-স্পিডে গাড়ি যাচ্ছে, তার মধ্যে বসে থাকা একটি মেয়েকে এক পলকের জন্য দেখেই এত প্রেমে পড়েছিলাম তার যে, সাত দিন ভাল করে খেতে পারিনি!

আহা, মেয়েটা যদি জানতে পারত!

এই সময় গৌতম ফিরে আসতেই অনুরাধা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ভাগ্যিস তুমি ফিরতে দেরি করলে, তাই এর ফাঁকে আমি ওঁকে একটা গল্প শুনিয়ে দিলাম।

গৌতম বলল, দেরি করিনি তো। মানসী আসতে চাইল না। ও বলছে, ওর খুব খিদে পেয়েছে!

গেলাসে ব্রান্ডি ঢেলে গৌতম দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে সেটা জল-টল না মিশিয়েই শেষ করল এক চুমুকে। তারপর তাকাল আবার এ-দিকে। তার মুখের চামড়ায় অতিরিক্ত রক্তের ঝলক।

অনুরাধার ঠোঁটে লুকোনো হাসি, সে স্বামীর দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে। গৌতম বলল, শোনো, উনি কিন্তু আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি হচ্ছেন না।

অনুরাধা মানবেন্দ্রকে বলল, আপনি যাবেন না আমাদের সঙ্গে?

না।

কেন? চলুন না। অনেক গল্পের খোরাক পাবেন।

আমার এখানে কাজ এখনও বাকি আছে।

কাজ? আপনি কি এখানে কাজ করতে এসেছিলেন নাকি?

এখানে আকাশ আর বাতাসের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। এখনও সেটা শেষ হয়নি।

অনুরাধা নিচের ঠোঁটটা কামড়ে মধুর ভাবে তাকাল। মানবেন্দ্র একটু লজ্জা পেয়েছেন। তিনি একটু সাজিয়ে কথা বলছেন এদের সঙ্গে। এ-রকম আর্ট করে কথা বলা তাঁর একদম স্বভাব নয়।

অনুরাধা বলল, দাঁড়ান, মানসীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ও আপনাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে।

অনুরাধা কী করে বুঝল, মানসীই একমাত্র জোর করে মানবেন্দ্রর ওপরে। কিংবা মানবেন্দ্র ওর কথা অবহেলা করতে পারবেন না।

মানবেন্দ্র বললেন, নেমন্তন্ন তো রইলই, অন্য কোনও সময় —।

অসীম এমনিতেই কম কথা বলে। সে প্রায় চুপ করেই বসে ছিল। কিন্তু তার গ্লাসই ঘন ঘন শেষ হচ্ছে। মনে হয়, এদের মধ্যে তারই মদের নেশা বেশি। যদিও সে কোনও রকম মাতলামি করে না, উত্তেজনা দেখায় না। কিন্তু তার চোখ দু'টি লালচে হয়ে এসেছে, মাথার চুলগুলো খাড়া খাড়া।

অনুরাধারই অসীমকে এক সময় ধমক দিয়ে বলল, এই, তুমি এত বেশি খাচ্ছ কেন?

অনুরাধা তার স্বামীর মদ্যপান সম্পর্কে তেমন আপত্তি না জানিয়ে বকছে অসীমকে। সাধারণত উলটোটাই হয়। তবে, গৌতম বোধহয় কখনও মাত্রা ছাড়ায় না, এবং তার স্ত্রী সে-কথা জানে।

অসীম অনুরাধার বকুনি গ্রাহ্য না করে আবার গেলাসে ঢালল অনেকখানি। অনুরাধা কেড়ে নিল গেলাসটা। অসীম উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ও কী করছ, দাও! বেশ পা টলছে অসীমের।

মানবেন্দ্র ওদের দিকে সহাস্য মুখে তাকিয়ে রইলেন। সামান্য ব্যাপার, বাইরে বেড়াতে এসে এ-রকম হয়ই। মানসী এখানে থাকলেও কি অসীম এতটা মদ্যপান করত?

একটু পরেই গৌতম বলল, চলো, এখন খেয়ে নেওয়া যাক। পরে আবার আড্ডা দেওয়া যাবে।

সবাই উঠে দাঁড়াল। মানবেন্দ্র বললেন, আপনারা যান, আমি একটু পরে আসছি।

মানবেন্দ্র ঠিক করেই ফেলেছেন, রাত্রে কিছু খাবেন না। ব্রান্ডির স্বাদটা জিভে চমৎকার লাগছে, খাদ্যদ্রব্যের মতো আজেবাজে জিনিস দিয়ে এটা নষ্ট করা উচিত নয়।

মানসী এ ঘরে আসেনি বলে মানবেন্দ্র একটুও দুঃখিত হননি। বরং মনে মনে একটু মজা পাচ্ছেন। সবাই যখন এই ঘরে, তখন মানসীর আলাদা ভাবে একা একা থাকার একটা তাৎপর্য আছে। তুমি ঠিকই করেছ। তোমাকে তো আমি ভিড়ের মধ্যে চাই না।

মানবেন্দ্র দেখলেন, গৌতমদের রেখে যাওয়া ব্র্যান্ডির বোতলে এখনও কিছুটা রয়েছে। তিনি উঠে গিয়ে গেলাসে আর একটু ঢাললেন। একটা ব্যাপার অন্তত বিস্ময়কর। মানবেন্দ্র এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। কোনও রকম অসংবদ্ধতা নেই চিন্তায়। শরীরে ছটফটানি নেই। এটা কি অনেকখানি বাদে মদ্যপানের ফল? ব্যাপারটা খুব বিপজ্জনক তাহলে। পাগলের পক্ষে কোনও রকম উত্তেজক পদার্থ গ্রহণ করা একেবারে নিষিদ্ধ। আজকের সুস্থতা তাঁকে আরও কোনও ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে টানছে।

একটা ঠক ঠক শব্দে মানবেন্দ্র চমকে তাকালেন। ঠিক যেন দরজায় কেউ ধাক্কা দিচ্ছে। কিন্তু এ-রকম গোপন সংকেতে কে তাঁকে ডাকবে? দরজা খুলে কারুকে দেখতে না পেয়েও মানবেন্দ্র অবাক হলেন না। মানসী এ-ভাবে আসবে না।

আবার সেই রকম শব্দে হতেই মুখ ফিরিয়ে তিনি দেয়ালের দিকে তাকালেন। প্রায় ঘুলঘুলির কাছে মাফিয়া টিকটিকিটা মথটাকে ধরে ফেলেছে। অত বড় মথটাকে মারবার জন্য সে দেয়ালের গায়ে ঠুকছে বার বার। এ-রকম করে ওরা। মথটাকে শেষ পর্যন্ত মরতে দেখে তিনি নিশ্চিত হলেন। ও তো মরতেই এসেছিল। কোনও সুন্দর জিনিসই বেশিক্ষণ থাকে না। অন্য দিকে শাইলক আর বেহুলা খুব কাছাকাছি। ওদের প্রণয় আসন্ন।

মানবেন্দ্র দেশলাইটা ছুঁড়ে মারলেন মাফিয়াব দিকে। ওর গায়ে লাগল না অবশ্য। মাফিয়া তার ভাঁটার মতো চোখে কটমট করে তাকাল মানবেন্দ্রর দিকে। তারপর বীরদর্পে সরে গেল খানিকটা। ফুলের পাপড়ির মতো মথটার ডানা টুকরো টুকরো করে খসে পড়ছে।

মানবেন্দ্র তাড়াতাড়ি টেবিলের কাছে গিয়ে প্যাড খুলে বড় বড় অক্ষরে লিখলেন, মহারানির মৃত্যু। যেন এই নামে তিনি এক্ষুনি একটা রচনা শুরু করলেন। শিরোনামের তলায় কলমটা ঘষলেন কয়েকবার। তারপর লিখলেন, 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়'।

লাইনটা লিখেই তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের লাইন লিখলেন কেন? তাঁর নিজের চিন্তা প্রকাশ করার জন্যও কি রবীন্দ্রনাথের ভাষা দরকার? তাঁর নিজস্ব ক্ষমতা কি শেষ হয়ে গেছে? চেষ্টা করেও মানবেন্দ্র একটাও নতুন লাইন ভাবতে পারলেন না?

কলমটা ছুরির মতো হাতে ধরে মানবেন্দ্র ভাবলেন, এই কি সেই মুহূর্ত? রথের চাকা বসে যাচ্ছে মাটিতে, আমি সব মন্ত্র ভুলে গেছি?

মানবেন্দ্র বিড় বিড় করলেন, 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়।'

তারপর বললেন, না, এ সর্বনাশ পুরুষের নয়, নারীর। আমার নয়। আমি তো সর্বনাশের আশা নিয়ে কখনও বসে থাকব না, নিজেই নিজের সর্বনাশ করে যাব।

পাতাটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দিলেন জানলা দিয়ে। পরমুহূর্তেই তিনি নিজেকে ভীষণ একাকি বোধ করলেন। শীতের চেয়েও এই একাকিত্ব যেন বেশি শরীর কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

সমস্ত ব্রান্ডিটা শেষ করে মানবেন্দ্র বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। দ্রুত খাবারের ঘরের দিকে এসে দেখলেন, ওদের খাওয়া সদ্য শেষ হয়েছে, ওরা বেসিনের কাছে জড়ো হয়েছে হাত ধোওয়ার জন্য। অসীমের কণ্ঠস্বর বেশ জড়ানো। কী যেন বলছে তাকে মানসী।

মানবেন্দ্র আর সেখানে ঢুকলেন না। তিনি টুরিস্ট লজ থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটতে লাগলেন হন হন করে। কোন দিকে যাচ্ছেন খেয়াল নেই। পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে মুঠো পাকিয়ে ধরে আছেন ডান হাতে।

ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে মানবেন্দ্র হোঁচট খেতে খেতে এগোচ্ছেন। খানিকটা বাদে পৌঁছে গেলেন পাথুরে এবড়োখেবড়ো জায়গাটায়। যার পর থেকে জমিটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। সেই ঢালু জমিতেও খানিকটা নেমে মানবেন্দ্র দশ টাকার নোটটা বস্তির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, মুনিয়ার মা, তোমার মেয়েকে দুধ কিনে খাইও।

কথাটা বললেন বেশ চেঁচিয়ে। নিজের গলার আওয়াজটা কানে আসতেই তিনি সজ্ঞানে এলেন। একটু চমকে ওঠার পর বোধ করলেন খানিকটা স্বস্তি ও আনন্দ। যাক, পাগলামির ধাতটা ব্র্যান্ডিতে সম্পূর্ণ যায়নি। বদ্ধ পাগল ছাড়া কেউ এ-রকম ভাবে টাকা দিতে আসে না। টাকাটা ছুঁড়ে দেওয়ার চেয়েও বড় কথা এই সময় এই ঝোঁক চাপা। সন্ধেবেলার কোনও ঘটনার সঙ্গে তো এর যোগ নেই। সাধারণ মাতালরাও এ-রকম করে না।

পকেট থেকে দেশলাই বার করে জ্বেলে মানবেন্দ্র খুঁজতে লাগলেন টাকাটা। এ-রকম ভাবে খেয়ালের বশে টাকা ছুঁড়ে ফেলা তাঁকে মানায় না। তিনি গরিবের ছেলে। এখন অবস্থা সচ্ছল হলেও টাকার মর্ম বোঝেন।

টাকাটা খুঁজে পেয়ে মানবেন্দ্র ফিরতে লাগলেন আবার। এবার গতি অত্যন্ত ধীর। বিষম শ্রান্ত লাগছে। মুখখানা খুব বিষণ্ণ হয়ে গেছে। কিছুই করার নেই এক জন মানুষের।

টুরিস্ট লজে ফিরে মানবেন্দ্র দেখলেন সব ঘরের আলো নিবে গেছে। সারা রাত জেগে আড্ডা দেবার পরিকল্পনাটা পরিত্যক্ত। অসীমের বেশি নেশা হয়ে গেছে বলেই বোধহয় তাকে ঘুম পাড়ানো দরকার। কিংবা ওরা মানবেন্দ্রর খোঁজ করে পায়নি। মানবেন্দ্র বুঝলেন, আজ আর বেশিক্ষণ জেগে থাকার ক্ষমতা নেই তাঁর।

পা থেকে জুতোও খুললেন না, ঝুপ করে এসে পড়লেন বিছানায়। এবং বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলেন।

॥ ৭ ॥

জেগে উঠে মানবেন্দ্র দেখলেন, অনেক বেলা হয়ে গেছে। কাল রাত্রে তিনি দরজা-জানলা কিছুই বন্ধ করেননি। রোদ লুটোচ্ছে ঘরের মধ্যে।

প্রথমেই তাঁর মনে হল, যাক, ওরা চলে গেছে।

কিন্তু তিনি শুনতে পেলেন বাইরে শিশুদের কোলাহল। অন্য কোনও দল এসেছে। বিছানা ছেড়ে দরজার কাছে এসে দেখলেন, না, ওরাই। যাবার জন্য সেজেগুজে তৈরি, ভোর-ভোর বেরুতে পারেনি।

মানবেন্দ্র মুখ-হাত ধুয়ে দাড়ি কামিয়ে তৈরি হয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। খুব খিদে পেয়েছে। সোজা এসে বসলেন খাবার ঘরের টেবিলে।

ওদের মালপত্র এনে রাখা হয়েছে বারান্দায়। পুরুষ তিন জনই গাড়ির কাছে। বাচ্চারা ছুটোছুটি করছে বাগানে। মানসী ওদের কী যেন খাওয়াতে গিয়ে খুব ব্যতিব্যস্ত। দৌড়ে দৌড়ে পালাচ্ছে ওরা। এখান থেকে মানবেন্দ্র সব দেখতে পাচ্ছেন।

অনুরাধা বারান্দার একটা রেলিং ধরে তাকিয়ে আছে উদাসীন ভাবে দূরের দিকে। মানবেন্দ্র মানসীর দিকেই চোখ রেখেছেন। স্নান সেরে নিয়েছে মানসী, ভিজে চুল, আজ পরেছে একটা সাদা সিল্কের শাড়ি, মস্ত চওড়া কালো পাড়। আজ সকালে তাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। মানবেন্দ্র মনে মনে বললেন, এ পৃথিবীর নয়, অন্য কোনও গ্রহ থেকে বেড়াতে এসেছে।

মানসী নানা কাজে ব্যস্ত। ঘরের মধ্যে যাচ্ছে বার বার, কখনও বেতের বাস্কেটে কিছু ঢোকাচ্ছে কিংবা কিছু বার করছে তার থেকে। আবার ওরই মধ্যে ছেলে-মেয়েদের মুখে পুরে দিচ্ছে চামচে করে কোনও খাবার। এই ব্যস্ততাটুকুই সৌন্দর্য।

মানবেন্দ্রর মনে হল, আজ সকালবেলা তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, এই কথাটা, এই কথাটা মানসীকে এক্ষুনি বলা দরকার। চলে যাবার আগে মানসীকে এই কথাটা জানাতে না পারলে যেন মানবেন্দ্রর সারা জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

মানবেন্দ্র ভাবলেন, এক্ষুনি উঠে গিয়ে বলে আসব? যদি পরে আর সময় না পাওয়া যায়! অনুরাধা খুব কাছাকাছিই দাঁড়িয়ে। কী করে বলা যাবে কথাটা? অথচ বলতেই যে হবে। মানবেন্দ্র এমনই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যে, তাঁর শরীরে রোমাঞ্চ হতে লাগল। খাড়া হয়ে গেল হাতের লোম।

তিনি বিড় বিড় করে অসংখ্যবার বলতে লাগলেন ওই এক কথা এবং সর্বক্ষণ চোখ দিয়ে অনুসরণ করছেন মানসীকে।

একবার উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। অন্যদের সামনেই বলে আসবেন কথাটা, তাতে যা হয় হোক। সেই সময়ই মানসী একটি বাচ্চার হাত ধরে এগিয়ে আসতে লাগল খাবার ঘরের দিকে। মানবেন্দ্রকে দেখে পরিচয়সূচক হাসি দিয়ে বেসিনের কল খুলল। বাচ্চাটার মুখ ধোওয়াবে।

মানবেন্দ্র ভাবলেন, আমি কি চিৎকার করে কথাটা ওকে জানাব? না, কাছে গিয়ে? শিশুটির সামনে? না, আলাদা? তিনি এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন মানসীর দিকে, যদি সে আবার তাকায়।

বাচ্চাটার মুখ ধোয়া হতেই এক ছুটে পালাল। মানবেন্দ্র এগিয়ে এলেন বেসিনের দিকে। মানসী একটা বাটি আর তিনটে চামচ ধুচ্ছে।

মানবেন্দ্রকে দেখে মুখ তুলে মানসী বলল, আপনি হাত ধোবেন? আমার এক্ষুনি হয়ে যাবে।

মানবেন্দ্র ভূতগ্রস্ত মানুষের মতো মানসীর দিকে চেয়ে থেকে বললেন, আজ সকালে —।

পুরো কথাটা বলা হল না। দরজার কাছ থেকে অনুরাধা বলল, এই ফ্লাস্কে গরম জল নিয়েছিস?

গভীর দুঃখে মানবেন্দ্রর মুখটা কুঁচকে গেল। দুই নারীর পরস্পরের কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। যদি অনুরাধা চলে যায়, মানসী থাকে। যদি এক মিনিটের জন্যও তাকে একা পাওয়া যায়। একটা তো মাত্র বাক্য!

কিন্তু অনুরাধা গেল না। তার পাশে আবার হিরণ্ময় এসে দাঁড়াল। তারপর অনুরাধার উদ্দেশে বলল, আপনাদের বেরুতে তো অনেক দেরি হয়ে গেল।

অনুরাধা বলল, গাড়িটা কী যেন গোলমাল করছে। আমরা তো সব তৈরি।

কথা বলতে বলতে ওরাও এসে ঢুকল খাবার ঘরে। মানবেন্দ্র তখনও মানসীর পাশে দাঁড়ানো। একটু সঙ্কুচিত বোধ করলেন। হিরণ্ময় সিগারেট বাড়িয়ে দিতেই সেটা নেবার ছলে তিনি একটু সরে গেলেন দূরে। আর একবার কাতর দৃষ্টিপাত করলেন মানসীর মুখে, যে-মুখ আজ সকালবেলা অনেক বেশি সুন্দর।

কয়েকটা সামান্য কথা বলে মানবেন্দ্র চলে এলেন নিজের ঘরে। মুখে রীতিমতো রাগী ভাব। এ পৃথিবীটা আমার ইচ্ছে মতো চলছে না। আমি কেন মানসীকে ঠিক সময়ে ঠিক কথাটা বলতে পারলাম না?

ওরা যে-কোনও সময়ে চলে যাবে। প্রবাসে দু'দিনের জন্য দেখা, যাবার সময় কিছু ভদ্রতা বিনিময় ছাড়া আর তো কিছু করণীয় নেই।

হুটোপুটি করতে করতে দুটো বাচ্চা ঢুকে পড়ল ঘরে। মানবেন্দ্রকে অগ্রাহ্য করেই তারা খাটের চারপাশে দৌড়দৌড়ি করে আবার বেরিয়ে গেল।

মানবেন্দ্র ডাকলেন, রিনি, একটু শোনো।

খেলা ছেড়ে রিনি এখন কথা শুনতে আসবে না। সাড়া না দিয়ে সে চলে গেল অন্য দিকে।

মানবেন্দ্র উঠে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে চন্দ্রমল্লিকা ফুলটিকে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ?

ফুলটি বলল, তুমি তো আমার কথা ভুলেই গেছ।

মানবেন্দ্র দেখলেন, ফুলটার ওপর একটা কাগজের টুকরো পড়ে আছে। কাল রাত্তিরে তিনি প্যাডের পাতাটা কুচিকুচি করে জানালা দিয়ে ফেলেছিলেন, তার একটা টুকরো।

মানবেন্দ্র টুকরোটা তুলে নিয়ে দেখলেন, তাতে লেখা আছে 'সর্বনাশের'। তাঁর হাসি পেল। 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়' — এই লাইনটা তা হলে ফুলটির ক্ষেত্রেই সত্য।

তিনি দাড়ি কামাবার ব্লেডটা এনে অনেকখানি বোঁটাসুদ্ধ ফুলটাকে কুচ করে কেটে নিলেন। তারপর বললেন, তোমাকে আমি মানসীর হাতে তুলে দেব।

ফুলটা বলল, তুমি আমাকে মেরে ফেললে?

মানবেন্দ্র বললেন, সব সুন্দরের সঙ্গেই কিছু কিছু নিষ্ঠুরতা থাকে। তুমি তো তাজমহল কিংবা খাজুরাহো মন্দিরের সৃষ্টির ইতিহাস পড়োনি!

পেছন ফিরেই মানবেন্দ্র দেখলেন, দরজার কাছে মানসী। মানবেন্দ্রর বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ শব্দ হতে লাগল, ফুল সমেত হাতটা কেঁপে গেল।

মানসী বললেন, ইস, ফুলটা ছিঁড়ে ফেললেন?

অন্যায় করে ধরা পড়ে যাওয়া শিশুর মতো মানবেন্দ্র লজ্জা পেলেন প্রথমটায়। তারপর হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, তোমার জন্য।

মানসী বলল, এত বড় একটা ফুল নিয়ে আমি কী করব?

কিছু না! ফুল দিয়ে আবার কেউ কিছু করে নাকি?

মানসী এক পা ঢুকে এল ঘরের মধ্যে। মানবেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, যাবার সময় হয়ে গেছে?

কী জানি! গাড়িটা বোধহয় গোলমাল করছে।

মানসী ফুলটা হাতে নিয়ে মুখের কাছে নিয়ে এল। মানবেন্দ্র দেখতে পেলেন, মানসীর হাতে গিয়ে ফুলটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মানসী ফুলটা টেবিলের ওপর রাখার পর তিনি সে-দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

আপনি আমাকে তখন কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন?

এমন কিছু নয়।

বলতে বলতে থেমে গেলেন কেন?

এমনিই।

মানবেন্দ্র সেই কথাটা বলতে এখনও দ্বিধা করলেন, কারণ আবার যদি বাধা পড়ে? যদি সম্পূর্ণ বাক্যটা শেষ করা না যায়!

আপনার ধরনধারণ কী-রকম যেন অদ্ভুত!

আজ সকালবেলা তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে!

কী?

মানবেন্দ্র এমন বিচলিত ভাবে তাড়াতাড়ি কথাটা বললেন যে, সত্যিই সবটা বোঝা যায়নি। কিন্তু এক কথা দ্বিতীয় বার বলা আরও কঠিন। মানসী এখন বুঝতে না পারলেও পরে ঠিকই পারবে।

মানসী কিন্তু চা বাগানে যাবার জন্য মানবেন্দ্রকে একবারও বলেনি। মানবেন্দ্র প্রতি মুহূর্তে আশা করছিলেন। এবার বুঝে গেলেন, ও বলবে না। এটাই ওর কায়দা।

মানসী জিজ্ঞেস করল, এখান থেকে ফিরে গিয়ে নতুন কী লিখবেন?

কী জানি!

আপনার লেখা যখন পড়ি —।

লেখার কথা থাক।

আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আপনার লেখার কথা মনে পড়েই।

মানসী, আর বেশি সময় নেই। সংক্ষেপে দু-একটা কথা আমাকে বলতে দাও! লেখক হিসেবে আমার ব্যর্থতা আমি জানি। যা লিখতে চাই, তার কিছুই লিখতে পারিনি। আমার একটিও লেখা পুরোপুরি সার্থক হয়ে ওঠেনি। এই ব্যর্থতা আমাকে সাঙঘাতিক কষ্ট দেয়। আমি আস্তে আস্তে বোধহয় অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছি। আমি কিছুতেই আর সব দিক সামলে চলতে পারি না। তুমি আমাকে একটু সাহায্য করবে?

কী সাহায্য?

তুমি আমাকে বাঁচাবে?

মানসী এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল মানবেন্দ্রর চোখের দিকে। মানবেন্দ্র দেখলেন একটা বিশাল জলাশয়। কুচকুচে কালো রঙের জল। তার মাঝখান দিয়ে একটা ধপধপে রাজহাঁস সোজা এগিয়ে

আসছে, চিরে যাচ্ছে জল। এই দৃশ্যটা মানবেন্দ্রকে এমনই মুগ্ধ করল যে, তিনি কয়েক মুহূর্তের জন্য ভুলে গেলেন মানসীর কথা।

মানসী বলল, এসব আপনি কী বলছেন?

আমি তোমার কাছে অসম্ভব ঋণী।

তার মানে? আমি কী করেছি?

তুমি যে তুমিই, সেটাই তোমার ঋণ।

এ তো রবীন্দ্রনাথের কবিতা।

হ্যাঁ। ক'দিন ধরে রবীন্দ্রনাথের ভূত আমার ঘাড়ে চেপে বসেছে, আমার চিন্তাগুলো বেরিয়ে আসছে ওঁর ভাষায়।

রবীন্দ্রনাথের ভূত আবার কী? ছিঃ, এ-রকম ভাবে বলতে নেই।

ওটা আদরের কথা। রাগের নয়। থাক, শুধু শুধু দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি তোমার সাহায্য চাই। আমি তোমাকে —।

আমি কিছুই মানে বুঝতে পারছি না আপনার কথার।

তুমি এত সুন্দর, তোমাকে আমার দারুণ প্রয়োজন। আমি তোমাকে চাই —

এ-কথা অন্য কেউ বললে —।

তুমি তাকে খুব খারাপ লোক ভাবতে!

না, তা নয়। অন্য কেউ বললে, তাকে উত্তর দেওয়া সহজ হত। কিন্তু আপনাকে উত্তর দেওয়া কঠিন।

মানসী পেছন ফিরে বাইরের দিকে একবার তাকাল। যেন সে দেখে নিল সংসারটা। তারপর বলল, আপনি আমাকে ভুল চোখে দেখেছেন। আপনাকে সাহায্য করার কোনও ক্ষমতা নেই আমার।

আছে।

আমি তো নিজে জানি, আমি কত সাধারণ।

তোমার জন্য একটা বেদি তৈরি করে দেব। তুমি তার ওপরে উঠে দাঁড়ালেই অসাধারণ হয়ে যাবে।

এ-সব কথা কবিতার মতো, বাস্তব জীবনের নয়।

জীবনটা তো ইচ্ছে মতো তৈরি করে নেওয়া যায়।

আমি কি ইচ্ছে মতো সব কিছু করতে পারি? মেয়েরা পারে?

মানবেন্দ্র অধীর হয়ে উঠলেন। কথাবার্তা অন্য দিকে চলে যাচ্ছে। আর তো বেশি সময় নেই।

মানবেন্দ্র নিজের বুকের ওপর হাত রেখে বললেন, তোমাকে দেখলেই আমার বুকের মধ্যে দুপ্ দুপ্ শব্দ হয়। আমার সারা শরীর কাঁপে কেন? তুমি এর উত্তর দাও? এ-রকম তো আর কখনও হয়নি?

মানসীর মুখে একটা দুঃখের রেখা ফুটে উঠল। মানবেন্দ্র সেটা লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, আমি কিন্তু তোমাকে মিথ্যে কথা বলছি না। তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে, এ-কথা আমি অন্য কোনও মেয়েকে কখনও বলিনি।

মানসী বলল, আপনি আমাকে বিপদে ফেলে দিচ্ছেন। আমার নিজেরই অনেক সমস্যা আছে, ভেবেছিলাম আপনার কাছ থেকে সাহায্য চাইব।

তোমার কোনও বিষাদ নেই। তোমার কোনও সমস্যা নেই।

আমি কি রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ নই?

ছিলে এক সময়। এখন তার চেয়েও উঁচুতে।

আমার ভয় করছে এ-সব কথা শুনে। আমি চলে যাচ্ছি।

দাঁড়াও।

মানসীর মুখে লালচে রঙ ধরেছে। সেখানে মিশে আছে খানিকটা লজ্জা ও কাতরতা। অসহায় ভাবে বলল, আপনাকে আমার ভাল লাগে। কিন্তু আপনাকে যে সাহায্য করতে পারবে, আমি সে নই।

তুমিই।

আপনি আমাকে ভুল ভেবেছেন।

তুমি একটি বিবাহিতা মেয়ে, তোমাকে এ-রকম কথা বলা হয়তো অন্যায় মনে হতে পারে। তুমি কি অপমানিত বোধ করছ আমার কথায়?

না, আমি সে-সব কিছু ভাবছি না। আসলে আমার মনের মধ্যে —।

লোকে যাকে বলে অবৈধ প্রেম, আমি তোমার কাছে ঠিক তা চাই না। তাছাড়া আমাকে প্রেমিক হিসেবে একদম মানায় না, আমি চাই পূজারি হতে। তুমিই একমাত্র আমাকে সুস্থতা দিতে পারো। বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে অপমান করতে চাইনি কোনও রকম ভাবে।

না, আমি জানি। তাছাড়া অনেক দেরি হয়ে গেছে।

দেরি হয়নি, এই তো সময়।

আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না। আমি ভেবেছিলাম, একটা ব্যাপারেই আমি আপনার কাছে সাহায্য চাইব। কিন্তু তা আর হবে না। আমি খুব অসহায়। আমি যাই?

সেই সময় রিনি দরজার কাছে এসে লাফাতে লাফাতে বলতে লাগল, আমাদের আজ যাওয়া হবে না, আমাদের আজ যাওয়া হবে না!

মানসী ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন?

রিনি আনন্দের সঙ্গে বলল, গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে।

মানবেন্দ্রর সঙ্গে আর একটাও কথা না বলে মানসী মেয়ের হাত ধরে চলে গেল। ফুলটা সে নেয়নি।

এরপর ঘটনা বদলে গেল। সত্যিই ওদের সেদিন যাওয়া হবে না। গাড়িটাতে বেশ গোলমাল দেখা দিয়েছে। গাড়ির মিস্ত্রি এসে বলেছে, ইঞ্জিন নামাতে হবে, সারা দিনের কাজ।

মানবেন্দ্র কিন্তু এটা একটুও পছন্দ করলেন না। তাঁর নিজের সুবিধের জন্য পুরো দলটিকেই এক দিন আটকে রাখতে তো তিনি চাননি। এরকম অবিবেচক তিনি নন। তাছাড়া, শিল্পের দিক থেকে এ-রকম ব্যাপারের যুক্তি নেই। শিল্পের মানসীরা সাধারণত এই সময় ঠিকই চলে যায়। বিচ্ছেদই এই ধরনের ঘটনার নিয়তি। মানবেন্দ্রও ধরে নিয়েছিলেন মানসী চলে যাবে। গাড়ি খারাপ হওয়াটা একটা অত্যন্ত স্থূল ব্যাপার।

হিরণ্ময়কে সে-দিন ফিরতেই হবে। সে যাবে ট্রেনে। মাইল সাতেক দূরে রেল স্টেশন। ওরা সবাই গেল হিরণ্ময়কে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসতে। গৌতম একা রইল গাড়ির তদারকিতে।

একটু বাদেই টুরিস্ট লজে আরও দু'টি গাড়ি-ভর্তি লোকজন এসে হাজির। এক গাড়িতে বাঙালি। রীতিমতো একটা শোরগোল পড়ে গেল। ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে শান্তিতে বই পড়া অসম্ভব। মানবেন্দ্র বেরিয়ে পড়লেন। মন্দিরটা দেখা হয়নি, এইবেলা সেরে ফেলা যাক।

মন্দিরের কাছে গোটা দু-এক হোটেল আছে। অনেক লোকজনের ভিড় তাজা রোদ উঠেছে বলে, দিনটা বেশ আরামদায়ক। মানবেন্দ্র চত্বরে ঘুরতে লাগলেন নিজের খেয়ালে। একটা কথা বার বার তাঁর মনে ঝিলিক দিতে লাগল। কয়েকটা ডিনামাইট এনে মন্দিরটা একেবারে উড়িয়ে দিলে কেমন হয়? প্রচণ্ড শব্দে সব কিছু হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে, আঃ, কী চমৎকার দৃশ্য। যে-কারণে মানবেন্দ্র একবার লাইব্রেরিতে আগুন লাগাতে চেয়েছিলেন, সেই কারণে তিনি এই মন্দিরটাকে ধ্বংস করতে চাইছেন। তিনি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন বড় বড় পাথরের টুকরো ছিটকে যাচ্ছে চারদিকে।

মন্দিরের দেয়ালে দেয়ালে শারীরিক আনন্দের প্রদর্শনী। নারী ও পুরুষ পরস্পরকে ভোগ করছে। কয়েকটা মূর্তি দেখার পরই মানবেন্দ্র শরীরে বেশ যৌন উত্তেজনা বোধ করলেন। যাক, তাহলে আর সন্দেহ নেই যে এগুলি শিল্প। নগ্ন নারীর চিত্র দেখলেও যদি মনে মহৎ ভাব জাগে, তাহলেই সেগুলো শিল্প হবে — এ-কথা বলত আগেকার সমালোচকরা। যত সব গাঁজাখুরি কথা। লগ্ন মূর্তি দেখে যার উত্তেজনা হয় না, সে তো শিল্পের কিছু বোঝেই না। তাকে নপুংসকই বলতে হবে। রদ্যাঁ যেমন ছিলেন এক জন নীতিহীন দৈত্য, তাই সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

মন্দিরের গায়ে কেন এই সম্ভোগ চিত্র? উত্তরের জন্য সমালোচকরা মাথা খুঁড়ে মরুক। আমার দেখতে ভাল লাগছে, সেটাই যথেষ্ট। এটা শুধু একটা মন্দির হলে আমি দেখতে আসতাম না। মন্দিরের ভেতরে কাল্পনিক মূর্তি, বাইরে নারী-পুরুষের শরীরে পূজা। ব্যাপারটা বেশ মজার।

মন্দিরের চত্বরে প্রচুর মানুষজনের মধ্যে দুটো গাধাও চড়ে বেড়াচ্ছে অনাবশ্যক ভাবে। সে-দু'টিকে দেখে মানবেন্দ্র বেশ কৌতুক বোধ করলেন। ওদের এখানে কে পাঠিয়েছে? সেই যে পৃথিবীতে কোথাও একটা কার্যকারণের হেড অফিস আছে, সেখান থেকেই নাকি? হতেও পারে। কেননা, কোনও কোনও সন্ন্যাসী শরীবের তুলনা দিয়েছেন গাধার সঙ্গে। শরীরটা একটা গাধা!

মানবেন্দ্র একটা গাধার গায়ে হাত রাখলেন। নিরীহ প্রাণীটি সেই জায়গার চামড়াটা বার বার কোঁচকায়।

মানবেন্দ্র বললেন, ওহে, অ্যাসিসিতে ফ্রান্সিস বলে এক জন সাহেব সাধু ছিল। সে তোমাদের খুব সম্মান করেছে। জানো না বোধহয়! আর এক জন নোবেল প্রাইজ পাওয়া কবি, হিমেনেথ, কবিতা লিখেছেন তোমাদের এক জনকে নিয়ে। সুতরাং তোমাদের দিকেও লোক আছে।

একটা গাধা হঠাৎ এমন ভাবে ডেকে উঠল যে, মানবেন্দ্র চমকে তিন পা পিছিয়ে গেলেন। কাছাকাছি কয়েকটা বাচ্চা ছেলে হেসে উঠল। মানবেন্দ্র গাধা দু'টির উদ্দেশ্যে বললেন, আমি কিন্তু তোমাদের দিকে নই। আমি ওই মন্দিরের দেয়ালের দিকে।

গাধাটাকে ছোঁয়ার জন্য হাতটা একুট নোংরা-নোংরা লাগছে। অদূরে বটগাছের তলায় একটা জলের কল। মানবেন্দ্র সেখানে এলেন হাত ধুতে। পাশেই কাঠের বেঞ্চে বসে আছে এক জোড়া বিদেশি। পুরুষটি প্রায় সত্যজিৎ রায়ের মতো দীর্ঘকায় এবং সুদর্শন। এই শীতের মধ্যেও মেয়েটি পরে আছে মিনি স্কার্ট; সে সুন্দরী নয়, কিন্তু তার স্বাস্থ্য এমনই চমৎকার যে শরীর থেকে একটা শোভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

মানবেন্দ্র তিনবার তাকালেন মেমটির দিকে। তারপর মনে মনে বললেন, অ্যাসিসির সন্ত ফ্রান্সিস কি এই রকম একটা শরীরকেও গাধা বলতে চেয়েছিলেন? সন্ত ফ্রান্সিস, আপনি হেরে গেছেন। যেমন হেরে গেছেন যিশু ও গৌতম বুদ্ধ। পৃথিবীটা ওঁদের মত অনুযায়ী চলেনি। খ্রিস্টান আর বৌদ্ধরা মাঝে মাঝে পৃথিবী জুড়ে কী মারপিটই না শুরু করে!

ভারতীয় গাইডটি সাহেব-মেমের জন্য একটা ম্যাপ-বই জোগাড় করে আনতে গিয়েছিল। অবিলম্বে সে হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এল, এবং গদ গদ কণ্ঠে নানা কথা বলতে লাগল। তার ভাঙা ইংরেজি থেকে

মানবেন্দ্র এইটুকু সংগ্রহ করতে পারলেন যে, ওই দীর্ঘকায় পুরুষটি হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। নিঃসন্দেহে এক জন জ্ঞানী লোক। তার সঙ্গে ওই মেয়েটি কে? এই ধরনের মেয়েদের মার্কিন ইংরেজিতে বলে ডল। সত্যি, রক্তমাংসের একটি চিত্তহারী জ্যান্ত খেলনা।

অত বড় এক জন পণ্ডিতও একটি সুন্দর খেলনা নিয়ে এত দূর বেড়াতে এসেছেন। আর মানবেন্দ্র তাঁর অসুস্থতার চিকিৎসার জন্যও মানসীকে পেতে পারেন না?

ডাকবাংলোতে ফিরতে মানবেন্দ্রর বেশ দেরি হল। ততক্ষণে মানসী-অসীমরা ফিরে এসেছে, খাওয়া-দাওয়াও হয়ে গেছে। বিছানায় শুয়ে, সকালবেলা মানসীকে তিনি যা যা বলেছিলেন, তার প্রত্যেকটি কথা আবার উচ্চারণ করতে লাগলেন, যাচাই করে দেখছেন, তাঁর কোনও ভুল হয়েছে কি না। ভুল বা ঠিক যাই হোক, সব ব্যাপারটাই স্বতঃস্ফূর্ত। এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় ছিল না।

মানসী কি আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবে? একা? মানসীর উত্তরগুলো ঠিক যেন বোঝা যায় না।

তাঁর চোখ জুড়ে ভেসে উঠল মানসীর মুখ। এই মেয়েটির দৃষ্টিতে এমন কিছু আছে, যা মানবেন্দ্র কিছুতেই ঠিক অনুধাবন করতে পারছেন না। ও যেন কিছু বলতে চায়। মানসী বলেছিল, ওরও কিছু গোপন কথা আছে। গোপন কথা মানে কি দুঃখ?

মানসী, আমি তোমাকে দেবতার আসনে বসাব। তোমাকে পুজো করতে না পারলে আমার নিস্তার নেই। আমি কোনও দিন কোনও ঠাকুর-দেবতার পায়ে ফুল দিইনি। তোমার পায়ের পাতায় আমি চুম্বন দেব। তোমাকেই, শুধু তোমাকে, আর কারুকে নয়। তুমি তো সেই জন্যই এসেছ। নইলে হঠাৎ এই সময়, কলকাতা ছেড়ে এত দূরে এই মন্দিরে দেখতে আসার মানে কী? ঘটনাটি এই নয় যে, আমি ডাকবাংলালোতে হঠাৎ একটি মেয়েকে দেখে আকৃষ্ট হয়েছি। আমাকে যে আকর্ষণ করবে, সেই রকম একটি মেয়েই ঠিক এই সময়ে এসেছে। তোমার স্বামী আছে, দু'টি সন্তান আছে, তাতে কোনও ক্ষতি নেই। তোমাকে যথেষ্ট দিলেও তোমার কিছুই কমবে না এক তিলও। কোনও রকম মালিন্য ছুঁতে পারে না তোমাকে।

একটি মেয়েকে পুজো করা আবার কী ব্যাপার? যে কেউ শুনলেই বলবে পাগলামি। হ্যাঁ তাই। বৃহত্তর পাগলামি থেকে বাঁচবার জন্য এই সব ছোটখাটো পাগলামি আমার দরকার। আমি এই রকম ধাতুতে গড়া।

বিকেলবেলা মানবেন্দ্র ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলেন, মানসী-অনুরাধারা সবাই একটা সিনেমায় যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। শহরের মধ্যে বাজারের কাছে একটি রিকেটি চেহারার সিনেমা হল আছে, সেখানে বহুকালের পুরনো হিন্দি ছবি দেখানো হয়। সেই ছবি দেখার জন্য ওদের উৎসাহ। মধ্যবিত্ত বাঙালিদের সাংস্কৃতিক জীবনটা বড্ড গোলমেলে। যারা রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখে, তারাও হিন্দি সিনেমা দেখে নিয়মিত। অবশ্য, বাইরে বেড়াতে এসে যে-কোনও একটা সিনেমা দেখার উৎসাহ অন্য রকম।

মানবেন্দ্র চেষ্টা করলেন মানসীর চোখে চোখ ফেলতে। তুমি কি আমাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছ? না, সেটা সম্ভব নয়, পৃথিবীর শেষ প্রান্তেও আমি তোমাকে তাড়া করে যাব। সব মানুষই বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। আমাকেও বাঁচতে হবে তো!

মানবেন্দ্র কাছাকাছি এসে পড়ার পর মানসী লঘু গলায় জিজ্ঞেস করল, আপনিও যাবেন আমাদের সঙ্গে?

মানবেন্দ্র মাথা নেড়ে বললেন, না!

অসীম বলল, যাঃ, ওনাকে কী এই সব আজেবাজে সিনেমা দেখতে বলছ! আমরা যাচ্ছি নেহাত তোমাদের পাল্লায় পড়ে।

অনুরাধা বলল, মোটেই বাজে না। এটা দিলীপকুমারের প্রথম ছবি!

ওদের আগেই মানবেন্দ্র বেরিয়ে এলেন টুরিস্ট লজ থেকে। মুখে অস্বস্তির চিহ্ন। মানসীকে না বলার পর মানবেন্দ্রর একবার মনে হয়েছিল, রাজি হলে ক্ষতি ছিল কী! কত আজেবাজে লোকের সঙ্গে মিশতে হয়। কত বিরক্তিকর সভা-সমিতিতে বসে থাকতে হয়, কিন্তু সেই তুলনায় ঘণ্টা তিনেক যে-কোনও একটা সিনেমা দেখলে এমন কী ক্ষতি ছিল! এমনকী, তিনি হয়তো মানসীর পাশে বসার সুযোগ পেলেও পেয়ে যেতে পারতেন। পাশে না বসলেও কাছাকাছি তো। মানসীর শরীরে সুগন্ধ, তার মুখের পার্শ্বচিত্র — এ-ও তো অনেকখানি পাওয়া।

তবু মানবেন্দ্র একটুখানি চিন্তা না করেই না বলেছিলেন মানসীকে। এ-রকম তাঁর স্বভাব। কোনও একটি জিনিস পাওয়ার চেয়ে না পাওয়ার দিকেই যেন তাঁর ঝোঁক বেশি। প্রথম জীবনে, যখন তাঁর চাকরি পাওয়ার খুব দরকার ছিল, ঘুরতে হয়েছিল অনেক দরজায় — তখনও এমন হয়েছে, কোনও এক জন বিশিষ্ট লোকের বাড়িতে গেলে চাকরির সুরাহা হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা, তবু মানবেন্দ্র সেই লোকটির বাড়ির কাছে এসেও ফিরে গেছেন। অন্য লোকের সঙ্গে এলে, সেই বাড়ির দরজায় আঘাত দেবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ভেবেছেন, উনি যেন এখন বাড়িতে না থাকেন!

সত্যিই বাড়িতে না থাকলে মানবেন্দ্র ভেবেছেন, যাক বাঁচা গেল! পরক্ষণেই দুঃখ হয়েছে, ইস, এবারেও চাকরিটা হল না।

নারীদের ক্ষেত্রেও হয়েছে এ-রকম। প্রথম যে-মেয়েটির জন্য পাগল হয়েছিলেন মানবেন্দ্র, সেই শ্রাবন্তীকেও তিনি প্রায় স্বেচ্ছায় চলে যেতে দিলেন হিরণ্ময়ের কাছে। শ্রাবন্তীকে অসম্ভব ভালবাসতেন অল্পবয়েসি যুবক মানবেন্দ্র, কিন্তু যখন তিনি দেখছিলেন হিরণ্ময় আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে শ্রাবন্তীর দিকে, তখনও তিনি বাধা দেননি। অথচ একটিমাত্র কথা বললেই হত। হিরণ্ময় খুব ভদ্র, সে কখনও জোর করত না। আর, শ্রাবন্তীকে শুধু বুঝিয়ে দেওয়া দরকার ছিল, মানবেন্দ্র তাকে কতখানি চান। প্রত্যেক দিন এ-জন্য মানবেন্দ্র নিজেকে তৈরি করে রাখতেন আগে থেকেই। অথচ শ্রাবন্তীর বাড়ির কাছে এসে ভেবেছেন, আজ না, কাল বলব। তারপর এক দিন যখন চৌরঙ্গিতে চায়ের দোকানে শ্রাবন্তী জানাল, আমি হিরন্ময়কে বিয়ে করছি, জানি না, ভুল করছি কি না, তখন মানবেন্দ্র নিশ্চিত বোধ করেছিলেন। যাক, সময় পেরিয়ে গেছে। আর কিছু বলতে হবে না।

পরবর্তী কালে অন্তত দু'খানি উপন্যাস ও পনেরোটি কবিতায় তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রকাশ করেছেন শ্রাবন্তীকে তাঁর না-পাওয়ার বেদনা।

মানবেন্দ্র অস্ফুটভাবে বললেন, মানসী, তুমি আমাকে ময়নাগুড়ির চা বাগানে যাবার জন্য নেমন্তন্ন করোনি, আজ শুধু একটা সিনেমায় যাবার জন্য বললে! আমি এত সহজে ভুলি না।

মানবেন্দ্র হাঁটতে হাঁটতে এসে সেই উঁচু পাথরটায় বসলেন। নিচে ঢালু জমিতে সেই বস্তি। কনকনে হাওয়া দিচ্ছে আজ। শালটা ভাল করে মুড়ি দিয়ে বসলেও শীত কমে না। এই শীতের মধ্যে একা বাইরে বসে থাকা উপভোগ্য নয়। তবু মানবেন্দ্র উঠে গেলেন না।

মুনিয়ার মা কিংবা মুনিয়াকে দেখা যাচ্ছে না। কালকে রাত্তিরে ঘোরের মাথায় মানবেন্দ্র ওই বস্তিতে নেমে যাচ্ছিলেন আর একটু হলে। একটা বিশ্রী ব্যাপার হত। কেউ বুঝতে পারত না আসল ব্যাপারটা। বোঝারও তো কিছু নেই।

আজ আকাশ, প্রান্তর, দিগন্ত বা সূর্যাস্ত — কোনওদিকেই তাঁর চোখ যাচ্ছে না। ক্ষুধার্ত লোক যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে না, সেই রকম মানবেন্দ্রও শুধু মানসীর কথা চিন্তা করছেন। এই অবৈধ চিন্তাটিতে তিনি রীতিমতো উত্তেজনা বোধ করছেন, শরীরটা একেবারে সৈনিকের মতো সুস্থ।

কিন্তু এরই মধ্যে এক সময় তিনি মানসীর মুখটা ভুলে গেলেন। খুব চেষ্টা করেও মনে করতে পারছেন না। অন্যান্য পরিচিত মেয়েদের মুখ এসে ভিড় করছে। দীপা, শ্রাবন্তী, নন্দিনী, রেণু, মনীষা — এমনকী খুব অল্প অল্প চেনা যে-সব মেয়ে, যেমন দীপ্তি, সান্ত্বনা — আর মানসী, যাকে তিনি একটু আগেও দেখেছেন, তার মুখটাই মনে পড়ে না! এ কী-রকম?

মানবেন্দ্র মাথার চুল চেপে ধরলেন। নিজেকে প্রচণ্ড কিছু শাস্তি দেওয়া দরকার। এই পাথরের ওপর থেকে নিচের বস্তিটার দিকে লাফিয়ে পড়লে কেমন হয়? উল্লুক, শেষ করে দেব তোমাকে। দাও, মানসীকে ফিরিয়ে দাও, এক্ষুনি!

মানসীর গলার আওয়াজ, হাঁটার ভঙ্গি সবই স্মরণ আছে। শুধু তিনি ওর মুখটা দেখতে পাচ্ছেন না। সব চেয়ে বেশি করে যাকে চাই, না-পাওয়া তাকেই জড়িয়ে থাকে। মানুষ যা মনে রাখতে চায় না, শুধু সেটাই নাকি ভুলে যায়। আমি মানসীকে মনে রাখতে চাই না?

অসম্ভব রাগী মানুষের মতো মানবেন্দ্র নিজের স্মৃতিকে বললেন, আমি তোমাকে দশ পর্যন্ত গোনার সময় দিলাম।

চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গুনতে লাগলেন, এক, দুই, তিন —।

দশ গোনার পরেও মানসীর মুখচ্ছবি ফিরে এল না।

মানবেন্দ্র পাথরটার ওপর দাঁড়িয়ে উঠে নিচের দিকে এক লাফ দিলেন।

ধুতি পরে না থাকলে ওই সময়েই তাঁর মৃত্যু ঘটা বিচিত্র কিছু ছিল না। কিন্তু ধুতিতে পা জড়িয়ে যাওয়ায় লম্ফটি বিশেষ সুবিধের হয়নি। তবু নিচে পড়ে মানবেন্দ্র বেশ খানিকটা গড়িয়ে গেলেন। হ্যাঁচোড়-প্যাচোড় করে কোনও রকমে সামলে নিলেন নিজেকে।

ডান পায়ের হাঁটুর কাছে অনেকখানি কেটে গেছে। রক্তে ভিজে যাচ্ছে ধুতি। তবু মানবেন্দ্র প্রথমেই চারদিকটা একবার দেখে নিলেন। অন্য কেউ দেখে ফেলেনি তো! দেখলে ব্যাপারটা হাস্যকর হত। তারা ভাবত, এক জন জলজ্যান্ত পূর্ণ বয়স্ক লোক পাথর থেকে আপনা আপনি পড়ে গেছে।

খানিকটা ঘাস ছিঁড়ে থেঁতো করে তিনি সেই কাটা জায়গাটায় লাগালেন। জায়গাটায় বেশ জ্বালা জ্বালা করছে। শরীরে এ-রকম কোথাও কেটে গেলে তখনই আবার নতুন করে বোঝা যায়, শরীরটা কত প্রিয়। হাঁটতে গিয়ে তাঁকে একটু একটু খোঁড়াতে হল। আর কোথাও মচকে-টচকে যায়নি তো!

এই সময় মানবেন্দ্র দেখলেন, বস্তির দিক থেকে মুনিয়া উঠে আসছে ওপরের দিকে। মানবেন্দ্র সোজা হয়ে ঠিকঠাক পা ফেলে হাঁটতে লাগলেন। ধুতিতে রক্তটা বেশ বোঝা যাচ্ছে, এটা এক্ষুনি বদলানো দরকার।

একটুখানি হেঁটে আসার পর মানবেন্দ্রর মনে পড়ল, মুনিয়ার কাছে তাঁর কিছু ঋণ আছে। তিনি পিছন ফিরে মুনিয়াকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

মুনিয়া কাছে আসতেই তিনি পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বার করে ওর দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

মুনিয়া অবাক হয়ে তাকাতেই তিনি বললেন, এমনিই, তুমি কিছু কিনেটিনে খেয়ো।

মুনিয়া তবু দাঁড়িয়ে রইল। মানবেন্দ্রর এটা পছন্দ হল না। ও এখন চলে গেলেই তো পারে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী অসুখ?

মেয়েটি বলল, কিছু না।

ঠিক আছে, যাও। তোমার মাকে বলো, দুধ কিনে দিতে।

পরক্ষণেই তাঁর মনে পড়ল, তিনি মুনিয়াকে পাঁচ টাকা ঠকাচ্ছেন। কাল রাত্তিরে তিনি ওর উদ্দেশে দশ টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। আর আজ সুস্থ অবস্থায় এরই মধ্যে পাঁচ টাকা বাঁচাবার চেষ্টা। একবার দিয়ে আবার নিয়ে নিলে কালীঘাটের কুকুর হয় না!

তিনি পকেট থেকে আরও পাঁচটা টাকা একটু অনিচ্ছা সত্ত্বেও বার করে আবার এগিয়ে দিলেন মুনিয়ার দিকে। বললেন, এই নাও, এটা ভুলে গিয়েছিলাম।

মুনিয়া বলল, কী করব? মাকে দেব?

হ্যাঁ।

মুনিয়া দৌড়ে চলে গেল। একটু বাদেই শোনা গেল মুনিয়ার মায়ের গলা। এই দিকেই যেন আসছে।

মানবেন্দ্র ভয় পেয়ে গেলেন। মুনিয়ার মা বেশ দজ্জাল ধরনের স্ত্রীলোক। এই টাকা দেওয়ার ব্যাপরটার সে যদি অন্য কোনও মানে করে? অনেক সময় গরিবদেরও আত্মসম্মান বোধ থাকে। সেটা আবার এক অস্বস্তিকর ব্যাপার।

হন হন করে তক্ষুনি পা চালিয়ে, প্রায় দৌড়ে মানবেন্দ্র রওনা হলেন টুরিস্ট লজের দিকে। শেষ পর্যন্ত মুনিয়ার মা তাঁকে ধরতে পারেনি।

টুরিস্ট লজের গেটে পা দেবার পর মানবেন্দ্রর মনে পড়ল, মানসীর মুখখানা মনে পড়ছে না বলে নিজেকে শাস্তি দেবার জন্য তিনি পাথর থেকে লাফ দিয়েছিলেন। কিন্তু পা কাটার পর এতক্ষণের মধ্যে আর একবারও তিনি মানসীর কথা ভাবেননি। এটাও অদ্ভুত নয়? মানুষের জীবনে যে কত মজার ব্যাপার আছে!

॥ ৮ ॥

ধুতিটা বদলে একটা প্যান্ট পরে মানবেন্দ্র একটা চেযার টেনে বসলেন বারান্দায়। ওরা কেউ এখনও ফেরেনি। কিন্তু মানবেন্দ্রর এখন ঘরের মধ্যে থাকতে ইচ্ছে করছে না। তিনি নিজেই এখন মানুষের সঙ্গে পাবার জন্য ব্যাকুল।

মানসীরা ফিরল বেশ রাত্তির করে। বাইরে থেকেই খেয়ে এসেছে। জিনিসপত্রও কেনাকাটি করেছে অনেক কিছু, সিনেমা হলের পাশেই হাট বসেছিল। অনেক ঘোরাঘুরি করে এসে সবাই খুব ক্লান্ত।

আজও দেখা গেল, অসীম বেশ নেশা করেছে। তার চোখ লাল, পা টলছে, যদিও কথাবার্তা বলছে না একেবারেই, মনে হল সবাই যেন অসীমকে নিয়ে একটু বিব্রত। অসীমের এই পরিচয়টা প্রথম দিকে বোঝা যায়নি। এত ভদ্র ও বিনীত যুবক, সুন্দরী স্ত্রীর স্বামী। দু'টি ফুটফুটে বাচ্চা, সব ব্যাপারেই অসীম বেশ দায়িত্ববান, তবু তার এ-রকম নেশা করার ঝোঁক কেন? মানসী আর গৌতম অসীমকে ধরাধরি করে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল।

আজ আর আড্ডা জমল না। বারান্দায় দাঁড়িয়েই কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। তাছাড়া বাগানে আজ বসবার জায়গাও নেই, নতুন যাত্রীরা সব ক'টা চেয়ার দখল করে নিয়েছে।

গৌতম গাড়িটাকে মোটামুটি চালু করেছে, কিন্তু পুরো ঠিক হয়নি। এই অবস্থায় গাড়ি নিয়ে দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়া যাবে না। ওদের পরিকল্পনা একটু বদলেছে। কাল ভোরেই বেরিয়ে পড়বে, কাছাকাছি একটা বড় শহরে গিয়ে গাড়িটাকে আবার ভাল করে দেখাতে হবে। অসীমরাও এবার বোধহয় আর ময়নাগুড়ি চা বাগানে যাবে না, কলকাতার ট্রেন ধরবে। কলকাতায় কী যেন একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে গেছে। কিংবা অন্য কোনও কারণও থাকতে পারে।

একটু বাদেই যে-যার ঘরে চলে গেল।

ওরা একটা অতিরিক্ত দিন থাকার ফলে মনে হয়েছিল যেন অনেক রকম নতুন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটবে। কিন্তু কিছুই ঘটল না। সারাটা দিন এলেবেলে ভাবে কেটে গেল। তাহলে ওদের গাড়ি খারাপ হল কেন? কেন আর একটা দিন থাকতে হল? কার্যকারণের হেড অফিসের এটা একটা সাঙঘাতিক ভুল। বাকি আছে শুধু রাত্তিরটা।

মানবেন্দ্র ক্ষুব্ধভাবে ফিরে এলেন নিজের ঘরে। এরই মধ্যে শুয়ে পড়ার ইচ্ছে নেই তাঁর, কিন্তু আর কী-ই বা করার আছে। ওরা এত তাড়াতাড়ি তাঁকে ছেড়ে চলে গেল! গৌতম আর অসীমও যদি আসত! এখন আর বই পড়ার মেজাজ নেই, এত রাত্তিরে কোথাও বেড়াতে যাওয়া যায় না, হাঁটুতে ব্যথা হয়েছে।

বাগানে নতুন লোকদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। কাল ভোরে মানসীরা চলে যাবে। হয়তো এই নতুন লোকদের কারুর সঙ্গে মানবেন্দ্রর আলাপ হবে। আবার অন্য রকম কথাবার্তা। নতুন যারা এসেছে তাদেরও মধ্যেও এক জন রূপসী নারী ও দু'টি সুশ্রী কিশোরী রয়েছে, কিন্তু মানবেন্দ্র কোনও আগ্রহ বোধ করেননি। একটা ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন যে, শুধু রূপের জন্য মানসী তাঁকে এমন ভাবে উতলা করেনি। মানসীর মধ্যে এমন কিছু আছে, যা রূপের চেয়ে বেশি।

মানবেন্দ্র এখানে এসেছিলেন, কারুর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় না করে শুধু চুপচাপ একা কাটাবার জন্য। কিন্তু এখন, ওরা তাঁর সঙ্গে আর একটুক্ষণ কথা না বলে শুতে চলে গেল বলে তিনি অপমানিত বোধ করছেন।

এর আগে, কখনও এ-রকম একা কোনও জায়গায় বেশি দিন থাকেননি মানবেন্দ্র। ডাকবাংলো বা টুরিস্ট লজে অনেক বার এসেছেন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে, নিজেরাই হই-হল্লা ও উদ্দামতায় এমন ভাবে মেতে থাকতেন যে, সময় পার হয়ে যেত আলোর চেয়েও দ্রুতগতিতে। অন্য কারুর দিকে নজর দেবার মতো অবস্থা থাকত না। এবার তিনি টের পাচ্ছেন, একা একা থাকা কত শক্ত। মানসীরা যদি এখানে না আসত, তাহলে কি এ-রকম অস্থিরতা জাগত?

হাতের বইখানা মেঝেতে ছুঁড়ে দিয়ে মানবেন্দ্র বললেন, মানসীকে আমার চাই! আমি আর কোনও কথা শুনতে চাই না, চাই, চাই, আজ রাত্রেই, ও চলে যাবার আগেই।

মানবেন্দ্র ক্রুদ্ধভাবে পায়চারি করতে লাগলেন ঘরের মধ্যে। বাইরে বেরুবার উপায় নেই, সেখানে নতুন লোকরা বসে আছে এখনও। যদি ওরা আলাপ করতে চায়! এখন মানসী ছাড়া আর কোনও প্রাণীর সঙ্গে তিনি কথা বলতে চান না।

এক একবার থমকে দাঁড়িয়ে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, আজ সন্ধের পর থেকে মানসী তাঁর সঙ্গে ঠিক ক'টা কথা বলেছে। বেশি নয়, সামান্যই। মানবেন্দ্র জিজ্ঞেস করেছিলেন, ফিরতে এত দেরি হল? মানসী বলেছিল, কাল তো চলে যেতেই হবে, তাই জায়গাটা আবার ভাল করে ঘুরে দেখে এলাম।

অর্থাৎ চলে যেতে হবে বলে মানসী জায়গাটাকে আবার দেখছে। এখানকার মানুষদের শেষবার দেখে যেতে চায়নি। মানবেন্দ্র দুঃখিত হয়েছিলেন। এর পরেই মানসী বলেছিল, আপনার কাছ থেকে কয়েক লাইন লিখিয়ে নেবার ইচ্ছে ছিল, কলকাতায় গিয়ে অন্যদের দেখাতাম।

মানবেন্দ্র বলেছিলেন, আচ্ছা, লিখে দেব।

কিন্তু মানসী সেটা কখন লিখিয়ে নেবে, কাল ভোরবেলা? তখন কি সময় হবে? মানবেন্দ্রর যদি তখন ঘুম না ভাঙে!

মানসী বলেছিল, কলকাতায় আমাদের বাড়িতে আসবেন? আপনি তো খুব ব্যস্ত?

অথচ মানসী কলকাতায় তাদের বাড়ির ঠিকানা বলেনি। হয়তো ভেবেছে, সেটা অসীমই জানিয়ে দিয়েছে।

যাই হোক, এ-সব খুবই সাধারণ। অথবা বলা যায়, কথার কথা। রাত্তিরে এই কথা নিয়ে বার বার চিন্তা করার কিছু নেই। তবে মানসী যে-কোনও কথা বলার সময়েই চোখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকে। অনেকেই চোখের দিকে স্পষ্টভাবে তাকাতে পারে না। মানসী যখন চেয়ে থাকে, তখন মনে হয় সে যেন আরও কিছু বলতে চাইছে। মানবেন্দ্র চোখের ভাষা বুঝতে পারেন না। এই জন্য তিনি জীবনে অনেক বার পরাজিত হয়েছেন। তিনি খুব ভাল করে চেনেন স্পর্শের ভাষা। মানসী যদি একটা আঙুল দিয়েও তাঁকে একবার ছুঁয়ে দিত।

মানসীকে আমার চাই! আমি ওকে পুজো করব। আমি ওর সর্বনাশ করব! ও কেন এখানে এসেছে? ও কেন আমাকে চেনে? কেন ওকে দেখলে আমার বুক কাঁপে? এর মূল্য ওকে দিতেই হবে। আমি যেমন ওর কাছে ঋণী, তেমনি মানসীও ঋণী আমার কাছে। পূজারির কাছে দেবতাও কি ঋণী থাকে না?

পায়চারি করতে করতে মানবেন্দ্র মাঝে মাঝেই উঁকি দিয়ে দেখছেন বাইরে। নতুন লোকেরা তখনও বসে আছে সেখানে। এত শীতের মধ্যেও ওরা কেন এতক্ষণ বসে থাকতে চায় বাগানে? মানবেন্দ্র পাগল সেজে ওদের ভয় দেখিয়ে আসবেন?

এই চিন্তাটা মানবেন্দ্রকে বেশ আকৃষ্ট করল। আধা পাগলের পক্ষে পুরো পাগল সাজা খুবই সহজ। পাগল দেখলে সবাই ভয় পায়। ওদের এমন ভয় দেখাতে হবে যাতে এক্ষুনি পালিয়ে যায়।

মানবেন্দ্র সত্যিই চাদরটা মাথায় পাগড়ির মতো করে বাঁধলেন, প্যান্টের পা দুটো গুটিয়ে নিলেন অনেকটা, তারপর খোলা খিলটা হাতে নিয়ে নিলেন। বাথরুমের আয়নায় দেখতে গেলেন, তাঁকে কী-রকম দেখাচ্ছে।

নিজের চেহারা দেখে নিজেরই হাসি পেল তাঁর। আরও ভয়ঙ্কর করবার জন্য আয়নার সামনে কয়েক বার লাফিয়ে নাচানাচি করলেন। হাতে লাঠি, মাথায় পাগড়ি এই চেহারায় আয়নার সামনে নাচানাচি করার একটা নেশা লেগে গেল। এবং একবার ঝোঁকের মাথায় লাঠিটা ঠক করে ঠুকে গেল আয়নায়।

আয়না জিনিসটা ভঙ্গুর, কিন্তু এত ফঙ্গবেনে হবার কোনও মানে হয় না। এই সামান্য আঘাতেই আয়নাটার মাঝখান থেকে চিড়ে গেল অনেকটা। টাকার চিন্তায় পাগলামিও সাময়িক ভাবে কেটে যায়। কত গুনাগার দিতে হবে? মানবেন্দ্র আয়নার দাম জানেন না, তবু মনে মনে ভাবলেন, অন্তত তিন-চারশো টাকা নিশ্চয়ই। একবার চিন্তা করে নিলেন, এই টাকাটা দিলেও তাঁর চলবে কি না।

লাঠিটা নামিয়ে রেখে ফাটা আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখলেন আবার। পাগড়িটা খুলে ফেললেন। এবার বেশ চেনা যাচ্ছে এক জন হেরে যাওয়া মানুষকে। এক জন সার্থক হেরে যাওয়া মানুষ।

দেয়াল থেকে কেউ বলল, ঠিক ঠিক ঠিক।

মানবেন্দ্র তাকিয়ে দেখলেন, মাফিয়া এসে বাথরুমের দেয়ালে আশ্রয় নিয়েছে। ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে।

মানবেন্দ্র লাঠিটা আবার তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বুঝি সব জায়গায় জিতে যাও।

টিকটিকিটা বলল, আমি যা চাই, তা ঠিকই পাই।

মানবেন্দ্র শান্তভাবে বললেন, তোমাকে আমি এক্ষুনি খুন করতে পারি। তুমি কি মৃত্যু চেয়েছিলে?

মৃত্যুচিন্তা আছে তোমার। আমরা ও-সব কথা ভাবিই না।

তুমি সুখী?

নিশ্চয়ই। তোমরাই তো দুঃখ তৈরি করো।

আচ্ছা, তাহলে দেখো, মরতে কেমন লাগে!

মানবেন্দ্র বিদ্যুৎ বেগে লাঠিটা দিয়ে আঘাত করলেন ওকে। কিন্তু মাফিয়া তার চেয়েও দ্রুতগতিতে সরে গেছে। ঠকাস করে লাঠির শব্দ হল দেয়ালে। সে কিন্তু প্রাণভয়ে একেবারে পালাল না। খানিকটা দূরে গিয়ে আবার ঘাড় তুলে তাকিয়ে রইল।

মানবেন্দ্র আবার মারতে গেলেন তাকে। কিছুক্ষণ এই রকম খেলা হল। শেষ পর্যন্ত মাফিয়া যেন অনেকটা বিরক্ত হয়েই ঢুকে গেল ঘুলঘুলির মধ্যে। যাবার আগে মানবেন্দ্রকে একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি দিয়ে গেল।

মানবেন্দ্র বাথরুম থেকে ঘরে এসে চিতপাত হয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। টিকটিকিটার চিন্তা মন থেকে তাড়াবার জন্য তিনি একটা সিগারেট ধরালেন।

তখন তাঁর মনে হল, টুরিস্ট লজে এখনও কয়েকটা ঘর খালি আছে। অনেক সময় সেই ঘরগুলোর দরজা খোলাই থাকে। এক সময় চুপি চুপি সেই রকম খালি ঘরের বাথরুমে ঢুকে সেখানে এই ভাঙা আয়নাটা রেখে ভাল আয়নাটা নিয়ে এলেই হবে। তাহলে কেউ আর তাঁকে দোষ দিতে পারবে না।

মানবেন্দ্র এটা ভাবলেন বটে, কিন্তু করা হয়ে উঠবে না। একটা ভাঙা আয়না হাতে নিয়ে তিনি চুপি চুপি অন্য ঘরে ঢুকেছেন, এ দৃশ্যটা অবাস্তব। সমস্ত চিন্তাকেই কার্যে পরিণত করতে পারে শুধু পৃথিবীর কর্মী পুরুষরা। মানবেন্দ্র সে-দলে পড়েন না।

সিগারেটটা শেষ হবার আগেই মানবেন্দ্র ঘুমিয়ে পড়লেন। জ্বলন্ত সিগারেটটা হাত থেকে খসে পড়ল নিচে চটি জুতোর ওপর, সেটাকে খানিকটা পুড়িয়ে তারপর নিভল।

ঘুমন্ত মানবেন্দ্রর চিবুকে ও ওষ্ঠে দুঃখের লেখা। অতৃপ্তি ও ক্লান্তির চিহ্ন ছোট ছোট রেখায় ছড়িয়ে আছে তাঁর সারা মুখে। শিশুর মতন হাত দুটো গুটিয়ে আছে বুকের কাছে।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে, শীত করার জন্যই হোক বা চোখের ওপর আলোর জন্যই হোক, মানবেন্দ্রর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি ধড়মড় করে উঠে বসে বিভ্রান্তের মতো তাকালেন চারদিকে। একটু আগেকার কোনও কথা মনে করতে পারলেন না।

প্রথমেই আলোটা নিভিয়ে দিলেন। সেই সময় একটি এরোপ্লেনের বিশাল গম্ভীর শব্দ তাঁকে খানিকটা সচেতন করে দিল। পায়ে চটি লাগিয়ে তিনি এলেন দরজার কাছে।

এর মধ্যে টুরিস্ট লজ একেবারে নিস্তব্ধ। বাইরের সমস্ত আলো নিভে গেছে। কিন্তু আকাশে আজ জ্যোৎস্না আছে। সেই জ্যোৎস্নায় তিনি দেখলেন, বাগানের এলোমেলো ছড়ানো চেয়ারগুলোর মধ্যে একটি মাত্র চেয়ারে এক জন কেউ বসে আছে।

প্রথমে মানবেন্দ্র ভাবলেন, ওখানে বসে আছেন তিনি নিজেই। যেমন মানসীর সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রথম রাত্তিরে বসেছিলেন। তাছাড়া আর কে থাকবে! দরজার কাছে যে দাঁড়িয়ে আছে, সে আর কেউ নয়, সে অবাস্তব। কিংবা, আমি একই সঙ্গে বাগানের চেয়ারে বসে আছি এবং এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

ঘরের বাইরে এক পা ফেলে তিনি বুঝলেন, না, অন্য কেউ। আমি নয়।

মানবেন্দ্র চমকে উঠলেন। পুরুষ না নারী? সাদা পোশাক। মানবেন্দ্র কোনও শব্দ না করে বাইরে বেরিয়ে এলেন। মূর্তিটা তাঁর দিকে পেছন ফিরে বসা। মানবেন্দ্রর চিনতে অসুবিধে হল না, সাদা প্যান্ট-শার্ট পরে বসে আছে গৌতম।

চেয়ারে এক দিকে কাত হয়ে গৌতমের বসে-থাকা মূর্তিটা দেখে একবার মনে হয়, ও বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু একটু বাদেই তার ঝুলন্ত ডান হাতটা ওপরে উঠল, সেই হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

মানবেন্দ্র গৌতমকে ডাকলেন না। আজ সারা দিনই গৌতম খানিকটা গম্ভীর ছিল। হঠাৎ গাড়ি খারাপ হবার জন্য তো প্রোগ্রাম ওলোট-পালোট হয়ে যাবার জন্য তার মেজাজ খারাপ থাকতে পারে। সকালে-বিকেলে গৌতম ওদের দলের সঙ্গে বেরোয়নি, গাড়ির পেছনে লেগে ছিল। সন্ধেবেলা মানবেন্দ্র যখন বারান্দায় বসে ছিলেন, তখন গৌতম গাড়ি নিয়ে ফিরল একা। মানবেন্দ্রকে সে লক্ষ্য করেনি, সোজা ঢুকে গেল নিজের ঘরে। খানিকটা বাদে মানবেন্দ্র একবার ওর ঘরের সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন, গৌতমের হাতে একটা ড্রিঙ্কসের গ্লাস, সে গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা বই পড়ছে।

মানবেন্দ্র ওকে ডাকেননি। নিজে থেকে কারুর ঘবে যাওয়া কিংবা ডাকা তাঁর স্বভাবে একেবারেই নেই। তিনি আস্তে আস্তে সেখান থেকে চলে এসেছিলেন। গৌতমও আর তাঁর খোঁজ করতে আসেনি আগের দিনের মতো।

গৌতম ছেলেটি মোটেই সাধারণ নয়। সে একটা গল্পই সারা জীবনে বার বার লিখছে। চা বাগানের ম্যানেজারকে খুব খাটতে হয় নিশ্চয়ই, তবু সে বই পড়ে। সার্থক মানুষদের মতো ছটফটানি নেই তার চরিত্রে।

মানবেন্দ্র দাঁড়িয়েই রইলেন বারন্দায়। কুয়াশায় মতো জ্যোৎস্না। তারাগুলি আজ অনেক পরিষ্কার। চোখ তুললেই দেখা যায় কালপুরুষকে। তিনি এই গ্রহটিকে পাহারা দিচ্ছেন কোমরবন্ধে তলোয়ার এঁটে।

মানবেন্দ্র অস্ফুট স্বরে কালপুরুষকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি পাব কি পাব না?

কালপুরুষ বললেন, তুমি পাবে না।

মানবেন্দ্র একটু ভর্ৎসনার সঙ্গে বললেন, একটু ভেবে-চিন্তে উত্তব দিতে হয়। হাউ ক্যান ইউ বি সো সিওর?

কালপুরুষ বললেন, আমাব এক মুহূর্তই তো অনন্তকাল। অনন্তেব মধ্যে কোনও ভুলের জায়গা নেই।

ড্যাম ইয়োর অনন্তকাল! আমার কাছে ছোট ছোট ক্ষণিক মুহূর্তগুলোই সত্য।

তুমি ওকে পাবে না।

আপনাকে বলে দিচ্ছি, জীবনে আর কিছু পাই বা না পাই, এই নারীকে আমি পাবই।

কালপুরুষ চোখের ইঙ্গিতে বললেন, ওই দ্যাখো —।

এত আস্তে দরজা খোলার আওয়াজ হয়েছিল যে, মানবেন্দ্র টেরও পাননি। গৌতমকে উঠে দাঁড়াতে দেখেই তিনি সচকিত হলেন। দেখতে পেলেন, একটি ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকার বারান্দা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে একটি নারীমূর্তি।

মানবেন্দ্র প্রথমে ভেবেছিলেন অনুরাধা। জ্যোৎস্নার বাগানে মেয়েটি পা দিতেই তিনি চিনতে পারলেন। মানসী ছাড়া আর কে হবে?

গৌতম এত বাত্রে নিজের স্ত্রীর জন্য বাইরে অপেক্ষা করবে কেন? এ-রকম কোনও নিয়ম আছে নাকি?

মানবেন্দ্র শরীরে একটা শিহরণ বোধ করলেন। সহসা কোনও উপলব্ধিতে এ-রকম হয়। চিবুকটা চেপে ধরে তিনি ভাবলেন, আমি কি এই ক'দিন অন্ধ হয়ে ছিলাম? প্রথম থেকেই তো বোঝা উচিত ছিল, গৌতম আর মানসীর মধ্যে বাল্যপ্রণয়। অনুরাধা যে গল্পটা বলেছিল, সেটা আসলে মানসীর গল্প।

মানবেন্দ্র নিজেকে গোপন করলেন স্তম্ভের আড়ালে। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। স্বামীর কাছ থেকে তার স্ত্রীকে কিছু সময়ের জন্য অন্তত সরিয়ে আনা যায়, কিন্তু প্রেমিকের কাছ থেকে এক মুহূর্তের জন্যও ছিনিয়ে আনা যায় না। মানসী আমার জন্য নয়।

মানবেন্দ্র কালপুরুষের দিকে তাকিয়ে আবার ভর্ৎসনার সুরে বললেন, এত সত্যবাদী না হলেও তোমার চলত। এমন কিছু অপবাদ রটত না।

গৌতম এগিয়ে এসে মানসীর হাত ধরল। মানসী ছাড়িয়ে নিল হাত। গৌতম তখন দু'হাতে মানসীর কাঁধ আঁকড়ে ধরে চুম্বন করল তাকে। কী অসম্ভব আবেগময় সেই চুম্বন, গৌতম যেন মানসীকে মিশিয়ে দিচ্ছে তার শরীরের সঙ্গে, মানবেন্দ্র দেখতে পেলেন, মানসীর গোড়ালি দু'টি উঁচু উঠছে।

তিনি ভাবলেন, খুব সাহস তো ওদের। দু'টি ঘরের দরজা খোলা, তার মধ্যে শুয়ে আছে এক জনের স্ত্রী, এক জনের স্বামী। যে-কোনও মুহূর্তেই —। মানবেন্দ্র নিজেও এ-রকম সাহস দেখিয়েছেন অনেক বার, কিন্তু তিনি ভাবতেন, পৃথিবীতে এ ব্যাপারে তিনিই সব চেয়ে সাহসী।

দীর্ঘকাল পরে চুম্বনটি শেষ হবার পর মানসী হাত দিল নিজের মুখে। তারপর কিছু বলল, এত দূর থেকে শোনা যায় না। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, সে গৌতমকে মিনতি করছে।

লেখক হিসেবে মানবেন্দ্র সহজেই অনুমান করতে পারলেন যে, মানসী এখন গৌতমকে কী কথা বলছে। সে বকছে গৌতমকে। সে বলছে, কেন গৌতম পাগলের মতো বাইরে বসে আছে। বার বার ঘুম থেকে উঠে উঠে মানসী জানলা দিয়ে গৌতমকে ওইভাবে বসে থাকতে দেখে আর স্থির থাকতে পারেনি। সে বেরিয়ে এসেছে, গৌতমকে ঘরে ফিরে যেতে বলার জন্য।

মানবেন্দ্রও এক দিন আগে ওই রকম ভাবে বসেছিলেন। মানসী টের পায়নি।

গৌতম মানসীর হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বাইরের দিকে। মানসী হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে, কাকুতি-মিনতি করছে, কিন্তু গৌতম ছাড়বে না। সে মানসীকে নিয়ে গেল টুরিস্ট লজের বাইরে।

মানবেন্দ্র স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এখন যদি অসীম বা অনুরাধা ওঠে? কী আর হবে? দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মধ্যে এক জন যদি আর এক জনের স্ত্রীর সঙ্গে মাঝরাতে একটু বেড়াতে যায়, তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। পৃথিবী এখন অনেক বদলে গেছে। অনেক হালকা হয়ে গেছে পাপ-পুণ্য সম্পর্কে ধারণা। অনুরাধা কিছু কিছু জানে, তবু প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারে না। অসীমরা আর গৌতমরা দু'জায়গায় থাকে এখন, হয়তো বছরে একবার দু'বার দেখা হয়। তাতে সমাজ-সংসার উলটে যায় না।

তবু, ঘুমন্ত স্বামীর পাশ থেকে উঠে কোনও নারী কি অন্য পুরুষের সঙ্গে দেখা করতে যায়? মানসী তো বাঙালি ঘরের মেয়ে। রাধা এ-রকম ভাবে স্বামীকে ছেড়ে যেত। কিন্তু রাধা বাঙালি নয়।

এমনও হতে পারে, অসীম নেশাগ্রস্ত হয়েছে বলেই মানসী জানে, সে আর সারা রাতে জাগবে না। স্ত্রীরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে। কিন্তু অনুরাধা তো নেশা করেনি। সে যদি হঠাৎ জেগে উঠে স্বামীকে পাশে না দেখে? কিংবা অনুরাধা কি জানে ব্যাপারটা? মুহূর্তে অনুরাধাকে অনেক মহান মনে হল। অসীমও কি জানে? নিজের বাল্যবন্ধুর এই দুর্বলতা সে ক্ষমা করে দেয়? মানসী বলেছিল, তারও একটা সমস্যা আছে, তা হলে এটাই?

মানবেন্দ্র চোখের সামনে দেখলেন এক বিশাল শূন্যতা। এই অন্ধকার পৃথিবীর থেকেও তা বড়। মানসী নেই। এত সহজে কী তাকে চোখের আড়াল করা যায়।

চটি খুলে রেখে মানবেন্দ্র খালি পায়ে দ্রুত অনুসরণ করলেন ওদের। টুরিস্ট লজ থেকে বেরিয়ে ওরা ডান দিকের রাস্তাটা ধরেছে। জ্যোৎস্নায় পাতলা হয়ে যাওয়া অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে ওদের শরীরের রেখাচিত্র। মাঝে মাঝে দু'টি শরীর এক হয়ে যাচ্ছে।

বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে মানবেন্দ্র পথের পাশ ঘেঁষে এগোতে লাগলেন। এ-দিকে রাস্তায় বাড়িঘর নেই, আর কোনও মানুষজন নেই। ওরা দু'জনে নিশ্চিন্তভাবে হাঁটছে। শুধু মানবেন্দ্র ভাবভঙ্গিই চোরের মতো। যদি ধরা পড়ে যান ওদের কাছে! ওরা ধরা পড়বে না, তিনিই ধরা পড়বেন। বুকের ভেতরটা এমন ফাঁকা, যেন এক জন সর্বস্বহারা মানুষ।

মানবেন্দ্র বেশি কাছে যেতে সাহস পাচ্ছেন না। যদিও তাঁর খুব ইচ্ছে করছে ওদের কথাবার্তা শুনতে। মানসীর জীবনের গল্পটার সমস্ত খুঁটিনাটি তিনি জানতে চান। কিন্তু তার উপায় নেই। কাল রাত্রে এই রাস্তাতেই মানবেন্দ্র পাগলের মতো দৌড়েছিলেন, আর আজ ওরা কত সুখের সঙ্গে হাঁটছে সেই রাস্তা দিয়ে।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা এগিয়ে গেল সেই উঁচু পাথরটার দিকে, যেটা মানবেন্দ্রর খুব প্রিয় জায়গা। ওরা পাথরটার ওপর বসবার পর মানবেন্দ্র একটা গাছের তলায় থমকে দাঁড়ালেন। একটা জিনিস অনুভব করে তিনি একটু অবাক হলেন, এখন তো তাঁর চিন্তায় বা ব্যবহারে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। এখন তিনি পাগল নন। কী জন্য এ-রকম হল? রাগ কিংবা দুঃখবোধও তো নেই। ঈর্ষা আছে? না, না, না —।

মানবেন্দ্র তাকালেন ওদের দিকে। ওরা পাথরে পা ঝুলিয়ে বসেছে। কী সুন্দর এই দৃশ্য। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া আকাশের নিচে বসে আছে দুজন নারী-পুরুষ, যেন ওরা ভাসমান। পুরুষটির ভঙ্গির মধ্যে আছে ব্যাকুলতা। মেয়েটির মধ্যে স্বভাবব্রীড়া এবং অনেকখানি কুণ্ঠা। তবু মাঝে মাঝে মুখচুম্বন করছে ওরা। যেন এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করছে।

দ্বিধা কেটে গিয়ে মানবেন্দ্রব মনটা নির্মল হয়ে গেল। ওদের দু'জনের এই বসে থাকার দৃশ্যটাই এত সুন্দর যে, তার ওপরে আর কথা নেই। এখানে তৃতীয় ব্যক্তিকে মানায় না। এর আগে এক দিন মানবেন্দ্র যখন এখানে বসেছিলেন, তখন কোথা থেকে একটা কুকুবও অকারণে এসে বসেছিল তার মুখের দিকে চেয়ে। মানবেন্দ্রর নিজেকে এখন সেই কুকুরটার মতো অবান্তর মনে হল।

এখন এই জ্যোৎস্নার আকাশ, নির্জন পৃথিবী, পাহাড় জোড়া দিগন্ত এবং সুগন্ধ বাতাস — শুধু ওদের মনে পড়ে দুজনেরই প্রাপ্য।

মানবেন্দ্রর হঠাৎ মনে পড়ে গেল একটা গানের লাইন। 'এই যে ধরণী চেয়ে বসে আছে, ইহার মাধুরী বাড়াও হে —'। ওরা দু'জনেই এই ধরণীর মাধুরী বাড়িয়েছে। সামাজিক সাংসারিক হিসেবে মেলে না, তবু তিনি টের পেলেন সেই মাধুরী।

ওদের সেখানেই রেখে মানবেন্দ্র ফেরার পথ ধরলেন। তাঁর আত্মপরীক্ষার কাল শেষ হয়ে গেল। এখন ওষুধ ছাড়া অসুখ সারবে না। এক জন হেরে-যাওয়া মানুষ যদি আবার হারে —।

কয়েক পা গিয়েই মানবেন্দ্র শুনতে পেলেন একটা অস্ফুট শব্দ। বেশ ধ্বনিময়। তিনি প্রথমে ভাবলেন গান। মানসী গান গাইছে। মুখ ফিরিয়ে একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেই বুঝতে পারলেন, গান নয়, কান্না। মানসী কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। এখানে এ সময় এই কান্না কেন?

মানবেন্দ্র আর অপেক্ষা করলেন না। কান্নারও অনেক মানে হয়, এই কান্নাও ওদের দু'জনের নিজস্ব।

টুরিস্ট লজে ফিরে এসে মানবেন্দ্র দেখলেন, দু'টি ঘরে কোনওটিরই আলো জ্বলেনি।

তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। মানসী আর গৌতম কোনও ক্রমে ধরা পড়ে যাক, এটা তিনি চান না। ওদের ব্যাপারটা গোপন থাক। অসীম আর অনুরাধা এখন ঘুমিয়ে থাকুক। এতে বিশ্বসংসারের কোনও ক্ষতি হবে না।

নিজের খাটের ওপর অনেকক্ষণ সিধে হয়ে বসে রইলেন মানবেন্দ্র। মেরুদণ্ডটা টন টন করছে, তবু শুয়ে পড়ছেন না। মনটা নির্মল হয়ে গেছে। মানসীর জন্য সেই সাংঘাতিক ব্যাকুলতাটা আর বোধ করছেন না একটুও।

মানবেন্দ্র এক সময় অস্ফুট স্বরে বললেন, গৌতম আর মানসীও সুখী নয়, ওরাও দুঃখী। গোপন কথা মানে দুঃখ।

॥ ৯॥

কী রে মানু, অনেক দিন পর দেখছি।

কলকাতায় ছিলাম না।

রঙটা কালচে হয়ে গেছে। কোথায় গিয়েছিলি?

নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম।

তাপস মুখার্জি একটা চেয়ার টেনে মানবেন্দ্রর উলটো দিকে বসলেন। টুসকি দিয়ে বেয়ারাকে ডেকে বললেন, আমাকেও একটা হুইস্কি দাও। বিলটা এই বাবুকে দেবে।

তাপস মুখার্জি সিগারেট এগিয়ে দিলেন মানবেন্দ্রর দিকে। মানবেন্দ্র বিনাবাক্য ব্যয়ে একটা সিগারেট নিয়ে ধরালেন। তিনি প্রতীক্ষা করছেন, তাপস মুখার্জি কোন দিক থেকে তাঁকে আক্রমণ করবেন।

তাপস মুখার্জির বিশাল চেহারা। গলার আওয়াজ গমগমে। এঁর প্রবল উৎসাহী ভঙ্গি দেখলে মনে হয়, বেঁচে থাকা একেই বলে। ইনি মানবেন্দ্রর প্রায় বাল্যবন্ধু, এখন বিখ্যাত প্যাথোলজিস্ট, অতি ব্যস্ত ও সার্থক পুরুষ, কিন্তু এরই মধ্যে হিমালয় ভ্রমণ বিষয়ে একটি চমৎকার বই লিখেছেন, তাই সাহিত্যিকদের কাছে অপরিচিত নন। তাপস মুখার্জি পেশাগত ভাবে খুবই পরিব্যাপ্ত লোক হলেও কাজের কাছে সম্পূর্ণ ধরা দেননি। মনের মধ্যে ছুটি লুকিয়ে আছে। খুব কাজের মধ্যে থেকেও হঠাৎ এক-এক দিন বেরিয়ে পড়েন, ঘুরে বেড়ান উদ্দেশ্যহীন ভাবে। বারে, রেস্তোরাঁয় এসে খোঁজ করেন পুরনো বন্ধুদের।

তাপস আর মানবেন্দ্রর জীবন-দর্শন আলাদা। তাপসের জীবনে কোনও দ্বিধা নেই, তিনি জানেন, জীবনটা কী-রকম ভাবে চলবে বা চলা উচিত। সেই জন্যই মানবেন্দ্রর প্রতি ব্যাপারেই ইতস্তত ভঙ্গি তাঁর পছন্দ হয় না।

তাপস আকস্মিক ভাবে বললেন, তোকে জেলে আটকে রাখা উচিত। আমি যদি চিফ মিনিস্টার হতাম, তাহলে তোকে ডি আই আর-এ গ্রেপ্তার করে রাখতাম।

মানবেন্দ্র হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন, কেন? আমি কী দোষ করেছি!

কারণ, তোর লেখা খারাপ হচ্ছে। গত দু-তিন বছর ধরে কিচ্ছু ভাল লিখতে পারিসনি। যারা খাবারের কিংবা ওষুধে ভেজাল দিচ্ছে, তারা যেমন দেশের ক্ষতি করছে, সেই রকম যে-সব রাইটার ভাল লেখে না তারাও সমান দোষী। সমাজ থেকে তাদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তোমাদের আর কিছু করতে হবে না বাপু, তোমার শুধু মন দিয়ে ভালো করে কবিতা লেখো, কিংবা উপন্যাস লেখো, গান গাও, ছবি আঁকো — তোমাদের তো কারখানায় গিয়ে হাতুড়ি ধরতে বলছি না, কিংবা দশটা-পাঁচটার অফিস করতে বলছি? ময়দানে গিয়ে পলিটিক্যাল মিটিংও করতে বলছি না।

মানবেন্দ্র সবটা মন দিয়ে শুনে বললেন, তাপস, তোরই চিফ মিনিস্টার হওয়া উচিত ছিল।

কি, আমি বেঠিক কথা বলছি?

না। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলো যারা শাসন করে, তারা এ-কথা বলে না।

তাপস ধমক দিয়ে বললেন, আস্তে আস্তে খাচ্ছিস কেন? ভাল করে খা। যখন মদ খাবি, তখন সেটাও ভাল করে খাবি। যখন যেটা করবি, প্রত্যেকটাই ফাস্ট রেট হওয়া দরকার।

তিনি হুঙ্কার ছেড়ে বেয়ারাকে ডেকে বললেন, শিগগির আরও দু'পেগ নিয়ে এসো। সব বিল এই বাবুকে দেবে, আমাকে না।

মানবেন্দ্র লক্ষ্য করলেন, তাপসের চোয়াল অন্য অনেকের চেয়ে বেশি চওড়া। এই রকম মুখ যাদের তারা বেশি সাহসী হয়। তারা অন্যদের ওপর হুকুম করে কথা বলতে পারে।

তাপস তাঁর গেলাসে লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন, দেশের কোনও খবর রাখিস? তোকে আমি দুটো খবর দিই। পরশু দিন ক্যানিং-এর দিকে গিয়েছিলাম। দেখলাম, গ্রামের লোক ঘাস-পাতা কচু-ঘেঁচু খাচ্ছে। যাদের সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের মধ্যে শতকরা আশি জনই সাত দিনের মধ্যে এক দিন ভাত খায়। কী বুঝলি এতে?

মানবেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, দ্বিতীয় খবর কী?

পরে বলছি। তুই 'টেন ডেইজ দ্যাট শুক দা ওয়ার্ল্ড' বইটা পড়েছিস তো? এ-দেশের অবস্থাও সেই দশ দিনের আগের দিনগুলোব মতো ঠিক। তবু এ-দেশে বিপ্লব হচ্ছে না। হবেও না। এই দেশে কিস্যু হবে না।

তুই আজ একটু বেশি উত্তেজিত আছিস মনে হচ্ছে? এমনকী তোর তুলনাতেও একটু বেশি।

হবে না? এইসব শুনে তোর রক্ত টগবগ করে ফোটে না? ইচ্ছে হয় না, সব শালাকে গুলি করে মেরে ফেলি?

দ্বিতীয় খবরটা তো এখনও বললি না?

দ্বিতীয় খবর হচ্ছে এই, দেশেব যখন এ-রকম অবস্থা, সেই সময় তুই আব আমি এখানে বসে মদ খাচ্ছি। কী বুঝলি এতে?

অনেক কিছু বোঝার আছে, তাই না?

হ্যাঁ, বোঝার আছে। আমি বলছি না, অন্যরা খেতে পাচ্ছে না বলে আমরাও খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেব। আমার ডিম্যান্ড হচ্ছে, আমরা যেমন খাচ্ছি, অন্যরাও সে-রকম খেতে পাক। আমি ওই গরিবদের মতো হতে চাই না। গরিববা আমাব মতো হোক। ঠিক কি না?

ঠিক।

চল, তুই আর আমি এক্ষুনি বেবিয়ে পড়ি। দুটো রাইফেল জোগাড় করে সব ব্যাটা বদমাসের খতম করে দিই। কী, পারব না?

আমি কখনও রাইফেল ছোঁড়া শিখিনি।

খাঁটি কথা। যার যেটা কাজ। আমিই ভুল বলছিলাম। আমাদের দিয়ে হবে না। সোলজার চাই। সোলজার ছাড়া বিপ্লব হয় না, কোনও দেশে হয়নি।

তাপস, তুই একটু আস্তে কথা বল। বড্ড জোরে চ্যাঁচাচ্ছিস!

মানু, তোর জন্য আমার কষ্ট।

আমার জন্য? এত গরিব থাকতে আবার আমার জন্য কষ্ট কেন?

রাইটারদের ব্যাপার কি আমি বুঝি না! তারা সব ব্যাপারেই ফিল করে, মনে মনে কষ্ট পায়, কাজে কিছু করতে পারে না। আমি যা পারব, তুই তা-ও পারবি না। আমি তবু গ্রামে গিয়ে ওষুধ বিলি করতে পারি। তুই কী করবি? লিখে কিস্যু হবে না। লেখা-ফেখা ছেড়ে দে।

যখন-তখন প্রসঙ্গে বদলান তাপস। বহু কথারই উত্তর আশা করেন না। নিজের মন থেকে কথাটা বার করে দিয়েই খুশি। কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন, ও, তোকে একটা ঘটনার কথা তো এ এখনও বলিনি রে?

মানবেন্দ্র বললেন, আমি জানি তোর সে-ঘটনা আরও বেশি চমকাবার মতো হবে।

তুই বাণীশঙ্করের খবর শুনেছিস? কত বয়েস এখন? তিয়াত্তর না চুয়াত্তর। উনি আজকাল একটা সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ের সঙ্গে —।

এটা কি একটা খবর?

আরে শোন না! এই জন্য লোকে ওঁকে নিন্দে করছে। আমি একটু আগেও এক জায়গায় আলোচনা শুনে এলুম। কিন্তু নিন্দে করার কী আছে এর মধ্যে? আসলে বেশির ভাগ লোকই হিংসুটে। তারা ভাবছে ওই রকম একটা বুড়ো একটা কচি মেয়েকে পেয়ে গেল, আর আমরা পেলুম না! আরে বাবা, তোরা জোগাড় করে নে না, কে বারণ করছে? তা না, শুধু শুধু হিংসে। তাছাড়া, উনি আর্টিস্ট। তোদের যদি সে-রকম ট্যালেন্ট থাকে।

মানবেন্দ্র পকেটে হাত দিতেই তাপস তাঁর হাতটা চেপে ধরলেন। আবার ধমক দিয়ে বললেন, চালাকি করিস না। চুপ করে বসে থাক। আমি সব বিল মেটাব। আজ একটা মাড়োয়ারিকে বধ করে আড়াইশো টাকা পেয়েছি!

মানবেন্দ্র বললেন, আমি কিন্তু এবার উঠব!

কোথায় যাবি?

বাড়ি

বাড়ি! বাড়িতে কে আছে? তোর আবার বাড়ির ওপর এত টান হল কবে থেকে?

এখন পৃথিবীতে সব চেয়ে ভাল লাগে নিজের বিছানায় নিজের বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকতে।

তাহলে এখানে এসেছিলি কেন?

এখন বুঝতে পারছি, এসে ভুল করেছি। মাঝে মাঝে মনে হয় মানুষজনের সঙ্গে না মিশলে আমি পাগল হয়ে যাব। আবার মানুষজন কাছে এলে...।

ও-সব ছাড়। তুই এখন আমার সঙ্গে যাবি।

আমি কোথায় যাব?

একটা পার্টি আছে, চল তোর ভাল লাগবে।

মানবেন্দ্র কখনও কোনও উৎসব বা নিমন্ত্রণ বাড়িতে যান না। অনেক পার্টির নেমন্তন্ন গ্রহণ করেও কথা রাখেন না শেষ পর্যন্ত। অনাহূত ভাবে কোনও অচেনা জায়গায় যাবার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তাপসের হাত থেকে নিস্তার নেই। কোনও রকম যুক্তি-আপত্তি শুনবেন না তাপস।

জোর করে টেনে নিয়ে গেলেন। গাড়িতে মানবেন্দ্রকে পাশে বসিয়ে তাপস বললেন, তুই বড্ড একলা হয়ে যাচ্ছিস দিন দিন। আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে তোকে নিয়ে যাওয়া উচিত না। অনেক মেয়েটেয়ে থাকবে সেখানে, মেয়েদের কাছে তোর যা ফিল্ড আছে, আমি আর পাত্তাই পাব না।

তবু কেন নিয়ে যাচ্ছিস!

ওই তো মজা। নিজের ক্ষতি হবে জেনেও মানুষ অনেক কাজ কি করে না?

সান্ত্বনা কেমন আছে?

ভালই আছে। তুই আমাদের বাড়িতে আসিস না কেন? সান্ত্বনা মনে মনে তোকে খুব পছন্দ করে, জানিস তো? আমি যখন বাড়ি থাকব না, সেই সময় গিয়ে তুই ওর সঙ্গে প্রেম করতে পারিস।

যাব। তুই কোন কোন সময় বাড়ি থাকিস না?

পুরো দুপুরটা। সন্ধে সাড়ে সাতটা আটটার আগে তো কোনও দিন বাড়ি ফিরি না। ছেলে স্কুল থেকে ফেরে চারটের সময়, তার আগে বেচারা একলাই থাকে, কিছুই করার নেই। তোর মতো এক জন লাভার-টাভার যদি পায়, মন ভাল থাকবে।

মানবেন্দ্র অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। একটা সাদা রঙের দোতলা বাড়ি। সেই বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে মানসী। একটা স্কুল-বাস এসে থামল। দুটি ছেলেমেয়ে নামছে।

তাপসের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, জীবনটা আবার নতুন ভাবে শুরু করা যায় না? কোনও উপায় নেই? না। আর সময় নেই। যে-জীবন শালিকের, দোয়েলের, তার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

তাপস তখনও বলে চলেছেন, জানিস তো, সান্ত্বনার স্বাস্থ্য বেশ ভাল হয়েছে। আমি ফিল করি, ওর এখন এক জন প্রেমিক দরকার। সব ম্যারেড মেয়েদেরই, বিয়ের সাত-আট বছর বাদে এক জন আলগা ধরনের প্রেমিক থাকা ভাল —

মানবেন্দ্র বললেন, তাপস, তুই কীসে মরবি জানিস?

তাপস এক মুহূর্তও চিন্তা না করে বললেন, হ্যাঁ। অ্যাকসিডেন্টে। আর তুই?

পাগলা গারদে।

গোটা দুনিয়াটাই তো।

না, সেরকম অর্থে নয়।

তবে সেখানেই মর। যেখানে খুশি মরলেই হল। তবে, বেশির ভাগ লোকই ভাল করে মরতে জানে না। পুরো ব্যাপারটা ক্লামজি করে ফেলে।

তাপস অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিয়ে গাড়ির গতি অনেক বাড়িয়ে ফেললেন হঠাৎ। যেন এক্ষুনি একটা অ্যাকসিডেন্ট করার খুব ইচ্ছে তাঁর। মানবেন্দ্র স্থির হয়ে বসে রইলেন।

বাড়িটি এক ডাক্তারের। সেখানে পনেরো-কুড়ি জন নারী-পুরুষ উপস্থিত। তাপসের সঙ্গে মানবেন্দ্রকে দেখে অনেকেই অবাক। অনেকেই মানবেন্দ্রর খ্যাতির কথা শুনেছে, বই না পড়লেও নাম জানে। সেই রকম এক জন মানুষ বিনা আমন্ত্রণে উপস্থিত। অতিরিক্ত খাতির-যত্ন করে তারা আরও অস্বস্তিতে ফেলল মানবেন্দ্রকে।

প্রচুর পানীয়, আনন্দ, মুরগি, সুন্দরী নারী। তাপস মানবেন্দ্রকে অন্যদের হাত থেকে উদ্ধার করে এনে বসিয়ে দিলেন দু'জন মহিলার পাশে, সরবে বললেন, এরা দু'জন তোর অনেক বই পড়েছে, খুব ভক্ত।

মানবেন্দ্র লাজুক, মুখচোরা হয়ে গেলেন। মহিলা দু'টি মানবেন্দ্রর কোনও লেখাই পড়েনি। বই পড়ার স্বভাব নেই। ভদ্রতা দেখিয়ে কথা বলতে লাগল মানবেন্দ্রর সঙ্গে। এ-সব তাপসের দুষ্টুমি।

তাপস দুটো হুইস্কির গেলাস হাতে করে এনে মহিলা দু'টিকে বললেন, জানেন তো, ওর পরের নভেলে আপনারা দু'জনেই নায়িকা হয়ে যাচ্ছেন।

মহিলাদের মধ্যে এক জন সুশ্রী ভুরু তুলে বললেন, দু'জনেই?

মানবেন্দ্র তাপসের হাত থেকে হুইস্কির একটা গেলাস নিয়ে এক চুমুকে অনেকটা খেয়ে ফেললেন। তৃষ্ণার্ত মানুষের মতো। তারপর তাঁর ইচ্ছে হল, গেলাসটা মাটিতে ছুঁড়ে ভেঙে ফেলতে।

সেই ভঙ্গিতে গেলাসটা ধরে তিনি কঠোর ভাবে তাকালেন তাপসের দিকে। তাপস এক জন উল্লসিত সুখী মানুষ। মানুষের জন্য দুঃখ বোধ করার মতো অনুভূতি আছে, আবার নিজের জীবনে

আনন্দ খুঁজে নিতে জানেন। তিনি মানবেন্দ্রকে বললেন, তুই গম্ভীর হয়ে আছিস কেন? মানুষের সঙ্গে না মিশলে তাদের কথা লিখবি কী করে?

পাশ থেকে এক জন লোক মানবেন্দ্রর কাঁধে টোকা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, আপনি কি অনিরুদ্ধ মুখার্জিকে চেনেন? ওঁর স্ত্রী সুজাতা মুখার্জি এক দিন বলছিলেন।

মানবেন্দ্র বিড় বিড় করে বললেন, পুরুষ মানুষের স্পর্শ আমি একদম পছন্দ করি না।

লোকটি তা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, কী বললেন?

হ্যাঁ চিনি। আমি যখন খেতে পেতাম না, তখন এক কাপ চা ও বিস্কুটের লোভে ওদের বাড়িতে যেতাম মাঝে মাঝে।

যেন দারুণ একটা হাসির কথা, এই ভঙ্গিতে হেসে উঠলে লোকটি।

তাপস বললেন, সুজাতা তো আমাদের ক্লাসমেট ছিল। আর অনিরুদ্ধটা তো একটা গ্রেট বাস্টার্ড।

মহিলাদের সামনে এই কথাটা উচ্চারণ করেও একটুও লজ্জা পেলেন না তাপস। পাশের লোকটি বলল, অনিরুদ্ধ আমার পিসতুতো ভাই।

মানবেন্দ্র মনে হল, এই ঘরটার কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এখানকার লোকজন, কথাবার্তা, সবই যেন দারুণ দুর্বোধ্য। কোনও কিছুরই মানে হয় না। আমি এখানে কেন?

ঘরের অন্য কোণ থেকে একটি কুমারী মেয়ে মানবেন্দ্রর সামনে এসে বলল, আমি কিন্তু অপানার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। আপনি বিরক্ত হবেন না তো?

তাপস মানবেন্দ্রর দিকে চোখের চটুল ইশারা করে বললেন. বলেছিলাম না!

অন্য দু'টি মহিলা সরে গিয়ে এই নতুন মেয়েটিকে বসার জায়গা করে দিল। মেয়েটি বলল, আমি আপনার সব বই পড়েছি। এর মধ্যে একটা বই আপনি আমাকে নিয়ে লিখেছেন। আপনি কী করে আমার কথা জানলেন?

মানবেন্দ্র মনে মনে বললেন, আই ওয়ান্ট টু শ্লিপ উইথ ইউ। আমি একা ঘরে থাকি। তুমি আজ রাত্তিরেই আমার সঙ্গে সেখানে যাবে?

মেয়েটির ছোট্টখাট্টো চেহারা। গলার আওয়াজটা বেশ মিষ্টি। একে বুকে জড়িয়ে ধরলে বুকের অনেকটা জায়গা ফাঁকা থেকে যাবে। যেন একটা সুন্দর পাখি।

মানবেন্দ্র বললেন, এবার সেই বইটার দ্বিতীয় খণ্ড লিখব।

ঠিক লিখবেন? লিখুন তো, দেখি, পরেরটুকুও মেলে কিনা।

পরের সব ঘটনা এখনও ঘটেনি। কিছু কিছু বাকি আছে না?

আপনি যে এক জায়গায় লিখেছেন —।

মানবেন্দ্র ভাবলেন, আমি পর পর তিন দিন বাড়ি থেকে একেবারেই বেরোইনি। অসহ্য লাগছিল। মানুষের মুখ দেখার জন্য তাই সন্ধেবেলা বেরিয়েছিলাম। সেখান থেকে তাপস টেনে এনেছে এখানে। একে বলে ঘটনার পরম্পরা। এর পর কী হবে?

সুস্থ থাকতে হলে, আমার দরকার কাজ। লেখালেখি ছাড়াও আরও নানা রকম প্রচণ্ড কাজের মধ্যে নিজেকে যদি ব্যস্ত রাখা যায়। আর দরকার নারী। এই যে মেয়েটি এসে বসেছে।

ঘরের অন্য সকলে তখন দেশের দুর্দিন বিষয়ে আলোচনা করছে।

মানবেন্দ্র একটু হাসলেন। এই মেয়েটি যদি জানতে পারত, তার শ্রদ্ধেয় লেখক মনে মনে কী ভাবছে। মানবেন্দ্র ভাবলেন, এখান থেকে উঠে গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে নিরিবিলিতে এক জায়গায় কথা বলবেন। সেখানে দু-একটা অসভ্য কথা শোনাবেন ওকে। এখন একটু আদর করা ও ফস্টিনস্টি করারই তো সময়!

সেই মুহূর্তেই তাঁর মনে হল, একটু দূরেই মানসী বসে আছে। চমকে তাকালেন। মানসীই তো। মানসী ভ্রূভঙ্গি করছে তাঁর দিকে। মানসী অসভ্য কথা বলা একদম পছন্দ করে না। আবার দেখলেন, না। মানসী না। যে-মহিলা কথা বলার সময় ভুরু তোলে তাকে মানসী ভেবেছিলেন। অথচ এর সঙ্গে মানসীর কোনও মিল নেই।

মানবেন্দ্র একটু শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। আবার রোগের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে নাকি?

অন্যমনস্ক হবার জন্য তিনি এ-পাশের মেয়েটির দিকে ফিরে বললেন, তোমাকে আমার খুব ভালো লাগছে। আমার সৌভাগ্য যে তোমাব সঙ্গে দেখা হল।

এ কী বলছেন? সৌভাগ্য তো আমারই।

পাশ থেকে মানসী বলল, সে তো অনেক দিন আগেকার কথা!

মানবেন্দ্র আবার চমকে তাকালেন। সত্যিই তো মানসী। এতক্ষণ তিনি মানসীকে দেখতে পাননি? সেই সাদা সিল্কের শাড়ি পরা।

মানসী যেই এ-পাশে মুখ ফেরাল অমনি সে আবাব সেই ভুরু-তোলা মহিলা হয়ে গেল।

মানবেন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

নতুন মেয়েটিকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নামটাই জানা হয়নি।

মেয়েটি বলল, আমার নাম নিশি। নিশি লাহিড়ী।

নিশি? এ-রকম নাম কখনও শুনিনি। নিশীথ ছেলেদের নাম হয়।

কিন্তু রাত্রি মেয়েদের নাম হয়। নিশি কেন হবে না?

মেয়েটির নাম শুনেই মানবেন্দ্রর আবাব মনে হল, আজকেব পুরো সন্ধেটাই অবাস্তব। এই ঘটনার অস্তিত্ব নেই, এই মানুষজনের অস্তিত্ব নেই, তিনি এখন কোনও অনূঢ়ার সঙ্গে কথা বলছেন না। এটা একটা মায়া-দৃশ্য।

তিনি মনে মনে বললেন, এবা আমার কেউ নয়। আমি এদের কেউ নেই।

অথচ বাঁচতে হলে মানুষেব সঙ্গে মিশতে হবে। চাই কাজ। চাই প্রেম, সহানুভূতি, ছোট ছোট সুখ। সব কিছু সম্পর্কে একটা দায়িত্ব বোধ।

মানবেন্দ্র নিশিকে জিজ্ঞেস করলেন, ভালবাসা কাকে বলে?

এ কথা আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন?

আমি জনি না। সত্যিই জানি না।

এ-কথা বলার সময় মানবেন্দ্রর মুখখানা এমন করুণ হয়ে গেল যে, নিশি বেশ চমকে গেল। তার বয়েস কম। ভালবাসা শব্দটা শুনেই তার মুখে একটা অরুণ আভা ফুটেছে।

মানবেন্দ্র ভাবলেন, আমি যদি এক্ষুনি আড়ালে গিয়ে নিশিকে চুম্বন করি, যদি তার বুকের আঁচল সরিয়ে — তা হলে সেটাকে নিশ্চয়ই কেউ ভালবাসা বলবে না। অথচ আমার মনে সেই রকম একটা ইচ্ছে জাগছে।

কে যেন কাঁদছে? স্পষ্ট কান্নার শব্দ শুনে মানবেন্দ্র ডান পাশে তাকালেন। দেয়ালের পাশে একা বসে আছে মানসী। ব্যাখ্যা করা যায় না এমন একটা দুঃখে সে কাঁদছে। সেই বাইরে, টুরিস্ট লজ থেকে খানিকটা দূরে বড় পাথরটার ওপর মধ্যরাত্রে গৌতমের পাশে বসে যেমন ভাবে সে কাঁদছিল।

মানবেন্দ্র আর সব কিছু ভুলে গেলেন। এক দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন সেই কান্না। তাঁর বুকের মধ্যে দুপ দুপ শব্দ হচ্ছে, হাত কাঁপছে।

তিনি অস্ফুট গলায় বললেন, মানসী —।

এর মধ্যেই ভুলে গেলেন, আমার নাম নিশি, মানসী নয় —।

মানবেন্দ্র শুনতে পেলেন, কী একটা হাসির কথায় ঘরের সবাই এক সঙ্গে হাসছে। মানসী অদৃস্য হয়ে গেছে।

মানবেন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে নিশিকে বললেন, আমি একটু আসছি।

কয়েক পা এগোবার পরেই তাপস তাঁর হাত চেপে ধরে বললেন, কোথায় যাচ্ছিস?

তাপসের পাশেই এক জন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, মানবেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, সেই জায়গাটা কোথায়?

তাপস বললেন, ওই তো দরজা থেকেই বেরিয়ে ডান দিকে। আলাপ করিয়ে দিই। এঁর নাম মানসী চ্যাটার্জি। অ্যাসট্রো ফিজিক্স নিয়ে রিসার্চ করছেন।

মানবেন্দ্র একটুও চমকালেন না। মানসী একটা বহু প্রচলিত নাম। তিনি নিজেই আরও দু'জন মানসীকে চেনেন। মহিলার মুখের দিকে ভাল করে না তাকিয়েই তিনি একটা নমস্কার করে বললেন, আমি এক্ষুনি আসছি।

বাথরুমে ঢুকে মানবেন্দ্র টলে পড়ে যাচ্ছিলেন, দেয়ালে হাত দিয়ে কোনওক্রমে দাঁড়ালেন। ভয় করছে। বাঁচতে হবে। আমি এদের কেউ নই, এরা আমার কেউ নয়। এই বাথরুম থেকে বেরুতে পারব তো?

বাথরুমটা মস্ত বড়। ঝকঝকে মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধানো। দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। একটা দেয়াল-তাকে নানা রকম সুদৃশ্য শিশি-বোতল-টিউব।

আবার পা টলে গেল কেন? আমার কি বেশি নেশা হয়েছে? সে-রকম তো হবার কথা নয়। এখনও আমার পা কাঁপছে।

মানবেন্দ্র চুলের মুঠি আঁকড়ে ধরে বললেন, এ-রকম করলে চলবে না! আমি কেন এত চোখে ভুল দেখছি! এত স্বপ্ন নিয়ে জীবন কাটানো যায় না। সামাজিক হও, দায়িত্ববান হও, মানুষের কথা ভাবো —

বেসিনের কাছে এসে মানবেন্দ্র ভাল করে চোখে মুখে জল দিয়ে খানিকটা সুস্থ বোধ করলেন। আরও ঝাপটা দিলেন কয়েক বার। মুকে খানিকটা জল দিয়ে কুলকুচি করতেই ঠকাস করে একটা শব্দ হল। মানবেন্দ্রর মনে হল, তাঁর একটা দাঁত খুলে গেল। বেসিনে নয়, মাটিতে।

মানবেন্দ্র ভুরু কুঁচকে দাঁতটা খুঁজতে লাগলেন। এ আবার কী ব্যাপার! হঠাৎ একটা দাঁত ভেঙে পড়বে কেন!

খোঁজাখুঁজি করে সেটা পাওয়া গেল না। বেসিনে মাথা ঠুকে গেল একবার। তবু মানবেন্দ্রর জেদ চেপে গেছে, জিনিসটা কী দেখতেই হবে।

আমি খুঁজে দিচ্ছি।

মানবেন্দ্র তাকিয়ে দেখলেন, গৌতম এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। একটু অবাক হয়ে ভাবলেন, গৌতম কী করে এল? তিনি কী বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন?

মানবেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী খুঁজবেন?

আপনার দাঁতটা!

আমার দাঁত? তার মানে? আমার কি বাঁধানো দাঁত নাকি? এই দেখুন, আমার সব দাঁত ঠিক আছে। কোনও দিন দাঁত-টাঁত ভাঙেনি আমার!

মানবেন্দ্র ঠোঁট ফাঁক করে নিজের দু'পাটি দাঁত দেখালেন গৌতমকে।

গৌতম জিজ্ঞেস করল, আপনি তাহলে কী খুঁজছিলেন?

কী জানি। জানি না তো!

এই দেখুন, আমার দুটো দাঁত ভাঙা, আপনি সে-দিন এত জোরে আমাকে মেরেছিলেন! মানবেন্দ্র স্তম্ভিত ভাবে বললেন, আমি মেরেছি? আপনাকে? তা কখনও হতে পারে?

সে-দিন আপনি খুব রেগে গিয়েছিলেন।

মানবেন্দ্র চিৎকার করে বলেলন, অসম্ভব! অসম্ভব!

গৌতম ভদ্র ও বিনীত ভাবে বলল, মানসীকে আমি খুব ছেলেবেলা থেকে চিনি। আমরা কেউ কারুকে চাই না। আমি চাই না আমার বন্ধু অসীমকে ঠকাতে। আমি চাই না অনুরাধাকে দুঃখ দিতে। মানসীও চায় না অসীমকে দুঃখ দিতে, অনুরাধাকে দুঃখ দিতে। মানুষের এমনিতেই তো কত দুঃখ আছে। আমরা চাই না আড়ালে দেখা করতে। তবু মানসী আমাকে চুম্বকের মতো টানে। ও যেন আমারই আর একটা সত্তা।

এ-সবই তো আমি জানি।

আপনি মানসীকে চেয়েছিলেন?

সে অন্য রকম চাওয়া।

আমি মানসীকে রাত্তিরবেলা নিয়ে গিয়েছিলাম বলে আপনি এমন রেগে উঠলেন।

মানবেন্দ্র আবার চেঁচিয়ে বললেন, এ-সব কী হচ্ছে কী? আমি পাগলের মতো একা একা বক বক করছি। কোথায় গৌতম! বন্ধ বাথরুমের মধ্যে কী করে আসবে?

মানবেন্দ্র আবার চোখে জলের ঝাপটা দিলেন। চোখ পরিষ্কার হয়ে গেল। বাথরুমে আর কেউ নেই। তিনি নিজের গালে একটা রাম চিমটি কেটে বললেন, আমি মাঝে মাঝেই নানা রকম কাল্পনিক দৃশ্য দেখি বটে। কিন্তু মানুষ মনে মনে যা চায়, সেই রকমই তো স্বপ্ন কিংবা দিবাস্বপ্ন দেখে। তাহলে এ-রকম দেখলাম কেন? আমি কি গৌতমকে মারতে চেয়েছি? কক্ষনও না। গৌতম চমৎকার ছেলে! কারুকে মেরে দাঁত ভেঙে দেওয়া তো একটা উদ্ভট ব্যাপার।

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে মানবেন্দ্র বেরুবেন ঠিক করছিলেন, আবার মনে পড়ে গেল দাঁতটার কথা। দাঁত বা যাই হোক, মুখ থেকে কী যে একটা ঠক করে পড়ল। কী হতে পারে? সেটা না জানতে পারলে রাত্তিরে ঘুম হবে না। মানবেন্দ্র আবার সেটা খুঁজতে লাগলেন।

খুঁজতে খুঁজতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন মাটিতে। তারপর আবার দেখলেন, গৌতম এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। মানবেন্দ্র মনের একটা স্তরে বুঝতে পারলেন, এটা চোখের ভুল, এটা কল্পনা। আর একটা স্তরে প্রশ্ন করলেন, আমার কল্পনায় আমি গৌতমকে এখানে দেখতে পাচ্ছি কেন?

মানবেন্দ্র হাত জোড় করে অত্যন্ত কাতর ভাবে বললেন, গৌতম, বিশ্বাস করো, আমি তোমার ওপর একটুও রাগ করিনি! আমি যদি ভুলেও তোমাকে কোনও কষ্ট দিয়ে থাকি, আমাকে ক্ষমা করো।

মানবেন্দ্রবাবু, আপনি এ কী করছেন? আপনি উঠুন! আপনি পৃথিবীতে যা চান, সবই আপনাকে দিতে পারি, শুধু মানসীকে ছাড়া। আমরা পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা, তবু যদি আপনি রাগ করে থাকেন আমার ওপরে —।

না, আমি রাগ করিনি! রাগ করিনি!

আপনি অসীমকে অপছন্দ করেন না, তার ওপর আপনার রাগ নেই, কিন্তু আপনি আমাকে ঘৃণা করেন।

না না।

আপনি সত্যি কথা বলছেন না।

গৌতম, কী করে তোমাকে বিশ্বাস করাব!

আপনি উঠুন!

না, উঠব না। আগে বলো, তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না!

আপনি উঠুন, শিগগির উঠুন।

আমি উঠতে পারছি না! আমার পা এখানে গেঁথে গেছে।

কে যেন দরজায় দুম দুম করে ধাক্কা দিচ্ছে। আর সময় নেই। এর মধ্যে গৌতমকে বোঝাতেই হবে। মানবেন্দ্র কেঁদে ফেললেন। হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, গৌতম, আমি রাগ করিনি। তুমি আমাকে বুঝো না, আমাকে ক্ষমা করো।

মানবেন্দ্রকে অনেকক্ষণ অনুপস্থিত দেখে তাপস ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। বাথরুমের দরজায় অনেক ধাক্কা দিতেও মানবেন্দ্র খোলেননি। সকলে তখন ভয় পেয়ে যায়। দরজার ওপরে, স্কাইলাইট সরিয়ে সেখান থেকে দেখতে পাওয়া গেল মানবেন্দ্র মেঝের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন!

দরজা খুলে মানবেন্দ্রকে ধরাধরি করে আনা হল বাইরে। সেখানে বেশ কয়েক জন ডাক্তার। অনেক রকম পরীক্ষা ও বিভিন্ন উপদেশ। মানবেন্দ্রর গুরুতর কিছুই হয়নি। অতিরিক্ত মদ্যপান কিংবা অতিরিক্ত ক্লান্তি বলে ধরে নেওয়া হল।

একটি ইঞ্জেকশন দেবার পরই মানবেন্দ্রর জ্ঞান ফিরে এল। তাপস তাকে পৌঁছে দিতে এলেন বাড়িতে।

বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নেমে মানবেন্দ্র বললেন, ঠিক আছে, তোকে আর আসতে হবে না। আমার এমনিই হঠাৎ মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

তাপস তবু এলেন ওপরে। তালা খোলার পর ঘরে ঢুকে তাপস আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

ঘরটা একেবারে শূন্য। আগে এই ঘর বই ও জিনিসপত্তরে ঠাসা ছিল। এখন একটাও বই বা আলমারি বা চেয়ার-টেবিল কিচ্ছু না! শুধু মাঝখানে একটা খাট পাতা। সাদা চাদর ও বালিশ। বালিশের পাশে একটা লেখার প্যাড আর কলম। প্যাডের প্রথম পাতাটা খোলা, সেখানে একটা আঁচড় পড়েনি।

তাপস জিজ্ঞেস করলেন, এ কী?

মানবেন্দ্র শান্তভাবে বললেন, একটা নতুন কিছু লিখব ভাবছি, কিছুতেই শুরুটা মাথায় আসছে না।

ঘরের সব জিনিসত্র কোথায় গেল?

বিক্রি করে দিয়েছি।

কেন?

এমনিই।

তুই কি বাড়ি বদলাবি নাকি?

হয়তো।

তাপস এবার মানবেন্দ্রর কাঁধে হাত রেখে গাঢ়স্বরে বললেন, মানু, আমি তোর পুরনো বন্ধু।

মানবেন্দ্র বললেন, চঞ্চল আমাকে ভুলে গেছে।

চঞ্চলের কথা জানি না, তবে আমার মনের মধ্যে তোর জন্য একটা নরম জায়গা আছে। তোর কী হয়েছে আমাকে বলবি না?

তাপস, আমি আস্তে আস্তে পাগল হয়ে যাচ্ছি।

কী আজেবাজে কথা বলছিস?

আমি ঠাট্টা-ইয়ার্কির সময়েও মিথ্যে কথা বলি না তোকে।

তাপস এবার এক ধমক দিয়ে বললেন, তোর মাথায় বুঝি এই সব ঢুকেছে! এ-সব শিল্পীদের খামখেয়ালিপনা! মনটাকে শক্ত কর।

আমার মন কোথায় আমি জানি না।

ডোন্ট বি অ্যান অ্যাস। শোন, আমি ডাক্তার হিসেবে বলছি। এখন চুপ করে ঘুমিয়ে থাকবি। কাল সকালে কোথাও বেরুবি না। আমি কাল নিজে এসে তোকে আমার ইনস্টিটিউটে নিয়ে যাব। দেখবি, দুটো-চারটে ইঞ্জেকশান ফুঁড়লেই মনটা চাঙ্গা হয়ে যাবে!

আচ্ছা।

আচ্ছা মানে কী? আমার সব কথা শুনে চলতে হবে তোকে এখন থেকে।

শান্ত ছেলের মতো মানবেন্দ্র বললেন, শুনব।

এখন ঘুমো। তোর ভাল করে ঘুম দরকার।

তাপস চলে যাবার পরও মানবেন্দ্র খাটেব পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটু পরে বললেন, ইস, মানুষের ঈর্ষা এত সাঙঘাতিক হয়! নিজের চোখে আজ দেখলাম!

খুব ব্যস্তভাবে মানবেন্দ্র আবার বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বাথরুমে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পব জামা-প্যান্ট ভিজে গিয়েছিল, সেগুলো বদলাবার কথাও মনে পড়ল না। তালা না লাগিয়েই নেমে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে। তাপসের গাড়ি কাছাকাছি নেই। বেশ রাত হয়েছে, রাস্তা জনশূন্য। মানবেন্দ্র হাঁটতে লাগলেন হন হন করে।

প্রায় দেড় ঘণ্টা হেঁটে আসার পর মানবেন্দ্র থামলেন একটা সাদা রঙের দো-তলা বাড়ির সামনে। অন্তত একশো বার এই বাড়ির সামনে দিয়ে মানবেন্দ্র পারাপার করেছেন, কখনও ভেতরে ঢোকেননি।

মানসী আসতে বলেছিল, অসীম ঠিকানা দিয়েছিল, তবু আসেননি মানবেন্দ্র। মনের মধ্যে কোথাও তো একটা শক্ত জায়গা থাকা দরকার। মানসীব সামনে আবার দাঁড়াতে গেলে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মানুষের মতোই যেতে হবি।

বড় রাস্তার ওপর দুটো ঠ্যালা গাড়ির ওপরে ঘুমোচ্ছে তাদের চালকরা। নিচে দুটো কুকুর। কাছেই একটা দুধের গুমটি। একটা ট্যাক্সি ছুটে গেল ভয-পাওয়া গতিতে।

মানবেন্দ্র একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে টের পেলেন, তাঁর বুক কাঁপছে, হাত কাঁপছে। ফিস ফিস করে বললেন, মানসী, আমি এসেছি!

সাদা বাড়িটার সব ক'টি ঘরই অন্ধকার। ওপর তলার বাঁ-দিকের একটি ঘরের সব ক'টা জানলা খোলা। মানবেন্দ্র জানেন, ওই ঘরে মানসী শোয়।

উলটো দিকের ফুটপাথে একটা বন্ধ দোকানঘরের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন মানবেন্দ্র। তাকিয়ে রইলেন সেই জানলা-খোলা ঘরটির দিকে।

একটু বাদে মানবেন্দ্র বুঝতে পারলেন, তাঁর মন শান্ত হয়েছে। তিনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তিনি নিম্নস্বরে বললেন, আমি বুঝতে পারিনি, আমার ভেতরে এতটা ঈর্ষা ছিল। আজ টের পেয়েছি বলেই সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি অত্যন্ত পছন্দ করি অসীম আর গৌতম দু'জনকেই। তোমাকে যেমন ভালবাসি, তেমনি ভালবাসি ওদেরও। আমি ভালবাসি তোমার ভালবাসাকে। আমি সমাজের প্রভু নই। তোমার আর গৌতমের ভালবাসার বিচার করার ভার আমার ওপরে নয়।

সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মানবেন্দ্র বললেন, এই যে রাত্রির আকাশ, এটা আমার নয়। তবু আমি একে ভালবাসতে পারি। তুমিও সেই রকম।

একটা বিড়াল গুটি গুটি পায়ে মানবেন্দ্রর অদূরে থমকে দাঁড়াল। বেশ তুলতুলে চেহারা বেড়ালটির।

মানবেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী!

বেড়ালটি বলল, ইডিপাশ।

মানবেন্দ্র বললেন, ও হ্যাঁ, তাই তো! আচ্ছা, তুমি কি মানসীকে বলে দিতে পারবে যে আমি এসেছিলাম?

বেড়ালটি বলল, ওই তো মানসী, জানলায়।

মানবেন্দ্র চোখ তুলে তাকালেন। না, জানলায় কেউ নেই। মানবেন্দ্র চোখে ভুলও দেখলেন না। তিনি বললেন, আমি যদি পাগল হতাম, তাহলে ও-বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিয়ে মানসীকে এক্ষুনি ডাকতাম। এই রাত-দুপুরে ওর সামনে হাজির হয়ে বলতাম, আমার সেই যে পূজা বাকি ছিল —। অসীমকে বলতাম, আমি কিছুই চুরি করতে আসিনি কিংবা আমি সে-রকম কিছুই করিনি। এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কী হতে পারে!

মানবেন্দ্র আবার হাঁটতে লাগলেন উলটো দিকে। বাড়ি ফিরতে হবে। নতুন লেখাটা শুরু করতে হবে এবার। আজই। মানবেন্দ্রর হাঁটার মধ্যে এখন আর ব্যস্ততা নেই। একটুক্ষণ হাঁটার পর তিনি খেয়াল করলেন, রাস্তায় আর একটাও জনপ্রাণী নেই। এত বড় একটা রাস্তায় মাত্র এক জন মানুষ থাকলে মনে হয় যেন এই রাস্তাটা তারই নিজস্ব। কিংবা, এই পথটাও যেন তার নিজের মনগড়া।।